বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
অবসর-প্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

প্রায় সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশিত হইল। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অধুনা-লুপ্ত 'নব্যভারত' মাসিক পত্রে ইহার প্রথম আরম্ভ হয়। প্রায় বৎসরাধিক কাল ধারাবাহিকভাবে উক্ত মাসিকপত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া উহার লোপের সঙ্গে লেখাও বন্ধ হইয়া যায়। তারপর ১৩৩৫ সালে 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রে আবার পূর্ব সূত্র অনুসরণের চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'বঙ্গবাণী'ও কিছুদিন পরে উঠিয়া যাওয়ায় লেখাতে দ্বিতীয়বার ব্যবচ্ছেদ-রেখা পড়ে। পুনরায় কিয়ৎকালব্যাপী বিরতির পর 'উদয়ন'-এ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোচনা আরম্ভ করি—এবং এই তৃতীয় চেষ্টা এক বৎসর স্থায়ী হয়। 'উদয়ন'-এর অপ্রত্যাশিত অস্তগমনের পর আমারও উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদকপরম্পরার নির্বন্ধাতিশয্যে এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। রাজসাহী কলেজে বদলী হইবার পরে রাজসাহী কলেজ ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় কয়েকটি অধ্যায় স্থানলাভ করে। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুগ্রহপূর্বক গ্রন্থটির প্রকাশভার লওয়াতে, ইহাকে কোনও প্রকারে শেষ করিবার একটি প্রেরণা লাভ করি এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রেরণা হইতেই ইহার পরিসমাপ্তি সম্ভব হইয়াছে। রচনার এই ইতিহাস হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বাহিরের তাগিদ ভিতরের ক্ষীণ ইচ্ছাকে ঠেলা না দিলে কল্পনা কার্যে পরিণত হইত না।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সমাপ্তির জন্য আমি আমার স্নেহভাজন পূর্বছাত্রবৃন্দ ও দুই এক-জন সহকর্মীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। প্রথম প্রেরণা আসে অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে। ইনি আমার সমস্ত বাধা-আপত্তি ও বাংলা ভাষায় রচনার অনভ্যস্ততার সংকোচ তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রচণ্ড তাগিদের বলে খণ্ডন করিয়া সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথম অবতীর্ণ করান। আমার আর দুই জন ভূতপূর্ব ছাত্র, অধুনাতন ইংরাজী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট আমার ঋণ এত বেশী যে, তাহা উপযুক্তভাবে স্বীকার করা অসম্ভব। শ্রীমান্ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—ইঁহাদের সমালোচনা ও উপদেশ আমার অগ্রগতির প্রত্যেক পদক্ষেপ নিয়মিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে প্রবন্ধগুলির পুনরুদ্ধার, গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের যথাযথ বিন্যাস ও মুদ্রাঙ্কনকালে সংশোধনভার—এই সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব লইয়া ইঁহারা আমার পথ সুগম না করিলে আমার প্রারব্ধ কার্য কখনই শেষ হইত না। গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন প্রশংসাযোগ্য উপাদান থাকে, সেই প্রশংসার বেশীর ভাগই যে ইঁহাদের প্রাপ্য সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আর একজন ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীমান্ শৌরীন্দ্রনাথ রায় এই বিষয়ে ইঁহাদের সহযোগিতা করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীমান্ নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রধান অধ্যাপক সুপণ্ডিত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ও দুই একটি মূল্যবান্ উপদেশের দ্বারা গ্রন্থের অপূর্ণতা হ্রাস করিবার হেতু হইয়া-ছেন—তিনিও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে আমার এই গ্রন্থের প্রকাশ-ভার লইয়া ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন ও মুদ্রাঙ্কন-সময়ে কয়েকটি অসমাপ্ত অধ্যায় লিখিবার অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। মুদ্রণকার্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং এই কার্যে যাহাতে অত্যধিক বিলম্ব না হয় তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এইবার গ্রন্থে অবলম্বিত প্রণালী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচ্য গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রত্যেক গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় না—লেখকেরা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনরীতির বিবৃতি ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরথীদের একটা সংক্ষিপ্ত উৎকর্ষ-নিরূপণ-চেষ্টাতেই আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের তালিকা খুব দীর্ঘ না হওয়ায় প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়াস পাইয়াছি। বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সেইজন্য পাঠকের সম্মুখে কেবল শেষ মীমাংসাটি (conclusion) উপস্থাপিত না করিয়া যুক্তিধারার প্রত্যেক শৃঙ্খলটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা আমার অনুসৃত পদ্ধতি ও দোষ-গুণ-বিচার সম্বন্ধে সবিস্তারে পরিচিত হইয়া নিজ নিজ মত গঠন করিতে পারেন। হয়তো আলোচনা অতি দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ন্যায়সংগত আপত্তি তুলিতে পারেন। এ অভিযোগ আমি সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইতেছি। গ্রন্থটি মাসিক পত্রিকার জন্য প্রথম লেখা হয় বলিয়া গোড়া হইতেই একটু বিস্তৃত আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ও ইহার প্রথম-উদ্দেশ্যঘটিত অতিবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত করা সর্বদা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহাকে ঠিক সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া না লইয়া রসবিচারমূলক দীর্ঘ প্রবন্ধসমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার প্রতি সুবিচারের সম্ভাবনা বেশী হইতে পারে।

গ্রন্থের অন্যান্য দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট সচেতন আছি। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক মাল-মশলার অভাব সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। কোন লেখকের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রথম প্রকাশের তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'বসুমতী' আফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীসমূহ আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব মোচন করিয়াছে ইহা সত্য; তথাপি এই সমস্ত গ্রন্থাবলীতে কোন সমালোচনামূলক ভূমিকা বা গ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিক রীতিতে সাজাইবার চেষ্টার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে আমার নিজেরও কোন প্রবণতা নাই। কাজেই সাল, তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে হয়ত অনেক স্থানেই ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে। গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ রসবিশ্লেষণের চেষ্টা হিসাবে লইয়া পাঠক এই জাতীয় ত্রুটিকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন ইহা আশা করা যাইতে পারে।

তার পর গ্রন্থের ভাষা লইয়াও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার অবসর থাকিতে পারে এরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে। আমার যে কিছু সামান্য সমালোচনা-জ্ঞান তাহা প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্য হইতেই আহৃত। বাংলা ভাষায় সমালোচনার পরিভাষাও এ পর্যন্ত তৈয়ারি হয় নাই।

সুতরাং সমালোচনাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী ভাব ও ভাষার অনুবর্তন করিতে হয়। সেইজন্য গ্রন্থের ভাব ও ভাষার মধ্যে যদি বৈদেশিক গন্ধ সময় সময় উগ্র হইয়া উঠে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। সূক্ষ্ম ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনার জন্য ভাষাও সব সময় আশানুরূপ সরলতা লাভ করিতে পারে নাই; হয়ত স্থানে স্থানে অতিরিক্ত গম্ভীর বা দুর্বোধ্য হইয়া থাকিবে। অনভিজ্ঞতা, অক্ষমতা ও স্থলবিশেষে অনিবার্যতা ছাড়া ইহার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই। তবে আমার মনে হয়, পাঠক যদি এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যাশা কিছু খর্ব করেন, তবে আশাভঙ্গজনিত দুঃখের তীব্রতাও সেই পরিমাণে হ্রাস হইবে। সমালোচনার পরিভাষার সহিত পরিচয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও ভাবের মধ্যে বৈদেশিকতাও আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রথম যুগের পাঠকেরা যে উৎকট অস্বাভাবিকতায় প্রতিহত হইয়াছিলেন তাহা আর অনুভূত হয় না—বরং তাঁহার লিখন-ভঙ্গীই এখন শিক্ষিত, অনুশীলন-মার্জিত বাঙালীর অন্তরতম প্রকাশ বলিয়া অভিনন্দিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই অবশ্য বাঙালী পাঠকের এই যুগান্তরকারী রুচি-পরিবর্তনের প্রধান কারণ। কিন্তু তথাপি ইহা সাধারণ সত্য যে, অপরিচয়ের বিরুদ্ধতা একটা অস্থায়ী সাময়িক মনোভাব মাত্র। আরও একটা কথা বোধ হয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাবের তাগিদ অনুসারে ভাষাও নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের সুললিত পদবিন্যাস সাহিত্য-সমালোচনার মত নীরস, বস্তুতন্ত্র-প্রধান কারবারে চলে কি না তাহা চিন্তার বিষয়। এখানে যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়, তাহা ঠিক 'অমিয় ছানিয়া' প্রস্তুত নয়। এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও ব্যবহার-নৈপুণ্যের অভাব জন্য যে অনেক ভাষাগত ত্রুটি আছে তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা দেখি না। যদি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয় তবে এই ত্রুটি-সংশোধনের একটা সুযোগ পাওয়া যাইবে।

ভূমিকার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের অনেক অংশ বহু পূর্বের লেখা। বিশেষতঃ গ্রন্থ ছাপিতে দেওয়ার সময় আধুনিক লেখকদিগের যে সমস্ত রচনা অসম্পূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। হয়ত বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নূতন পুস্তকও লিখিত হইয়া থাকিবে। আমার আলোচনায় এই সমস্ত নূতন গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় পায় নাই—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও স্বীকার করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার এই প্রথম উদ্যম—সুতরাং প্রথম উদ্যমের অপূর্ণতা ইহার মধ্যে অনিবার্য। যে সমস্ত জীবিত লেখক-লেখিকার রচনা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সাহিত্য এখনও নূতন নূতন উন্মেষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে শেষ মতগঠনের এখনও সময় হয় নাই। তাঁহাদের বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন দাবী নাই, ইহা স্বীকার না করিলেও চলে। কোন কোনও শক্তিশালী উদীয়মান লেখক হয় স্থানাভাব জন্য, না হয় অনবধানতা-প্রযুক্ত গ্রন্থমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন নাই। যাহা হউক, অপূর্ণতার তালিকা দীর্ঘতর করিয়া কোন লাভ নাই। গ্রন্থের উন্নতির জন্য যিনি যে নির্দেশ দিবেন তাহা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি—

কলিকাতা
২৪শে মাঘ, ১৩৪৫

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র প্রথম সংস্করণ প্রায় তিন বৎসর পূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছে। যুদ্ধকালীন বাধা-নিষেধের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ-কার্যে এত বিলম্ব ঘটিল। এই অপরিহার্য বিলম্বের জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। গত দুইবৎসর যাবৎ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে নানা শ্রেণীর পাঠক ও সাহিত্যানুরাগীর নিকট হইতে নানা প্রকারের অনুরোধ ও অনুযোগ-পত্র পাইয়াছি। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের তাগিদই সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। প্রধানতঃ সুবিখ্যাত প্রকাশক 'মডার্ণ বুক এজেন্সী'র উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার জন্যই নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। এজন্য তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

নূতন সংস্করণে গ্রন্থখানির কিছু উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক আধুনিক লেখকের রচনার পূর্ণতর আলোচনা করা হইয়াছে ও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশেও নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অনেক বিরুদ্ধ সমালোচকের মতে প্রথম সংস্করণে মহিলা ঔপন্যাসিকদের গ্রন্থালোচনায় অতিরিক্ত স্থান দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সমস্ত বইটির পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ব-প্রদত্ত স্থানের কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করা হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ পুস্তকটির আয়তন প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। আশা করা যায়, এই নূতন ব্যবস্থায় ইহা সাহিত্যরসিকদের পরিতৃপ্তি-বিধানের জন্য আরও উপযোগী হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে আমার কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির জন্য অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছিল। এবার যথাসাধ্য সেগুলির সংশোধন হইয়াছে। বাক্যের দৈর্ঘ্যহ্রাস ও রচনার সরলতা-সম্পাদনের দিকেও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইয়াছি। ভরসা করি, এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থখানি অধিকতর সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইবে।

প্রথম সংস্করণের বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ পাঠকের নিকট হইতে যে সমস্ত প্রতিকূল ও অনুকূল অভিমত পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যথাসম্ভব সমস্ত যুক্তিপূর্ণ অভিমতই গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে আমার সমালোচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমপ্রসার এমন একটি বৃহৎ ব্যাপার যে, ইহাকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা ও নানা মূল সূত্রের সাহায্যে আলোচনা করা সম্ভব। সুতরাং ভবিষ্যতে নূতন নূতন সমালোচক এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়া ইহার মধ্যে আলোচনার অভিনবত্ব প্রবর্তন করিবেন ইহা আশা করা যাইতে পারে। আমরা সাগ্রহে নবযুগের নূতন আলোচনাপদ্ধতির প্রতীক্ষা করিব।

পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে আমার বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তনির্ণয়ে যে অপরিহার্য ভ্রান্তি-প্রমাদ ঘটিয়াছে পূর্বস্বীকৃতির দ্বারাই তাহার গুরুত্ব লাঘব করিতে চাই। ভবিষ্যৎ আলোচনার ফলে এই সমস্ত ত্রুটির আবিষ্কার ও সংশোধন হইবে ও লেখকদের চিরন্তন মূল্য অভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমার এই সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সেই পরিণতির পথ কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৪	বিনীত
ইং ২৫শে মার্চ, ১৯৪৮	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা	রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে কয়েকজন লেখকের রচনার আলোচনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতি-আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে নূতন সম্ভাবনা ও শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপন্যাস-সাহিত্য যেরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে যেরূপ নূতন আঙ্গিক ও আলোচনাপদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সমালোচনার ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাসের আদর্শ ও রূপ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার সম্প্রসারণ করিয়া নূতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইবে। সমাজবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের যে আবেগ-সংঘাত নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপরেও উপন্যাসের গঠনবিন্যাস ও ভাবকেন্দ্র নির্ভরশীল। আগামী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা উপন্যাসের যে কিরূপ বৈপ্লবিক রূপান্তর-সাধন ঘটিবে তাহা নিশ্চিতরূপে অনুমান করাও সম্ভব নয়। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনধারা নূতন [illegible]ক ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে, প্রচলিত সমালোচনা-সেতুর তলা হইতে ইহা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এ সব ভবিষ্যৎ [illegible]বর্তনের জল্পনা-কল্পনা বর্তমান গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক। পরিবর্তনশীল সাহিত্য-জগতে সাহিত্যের [illegible] অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হইবে—আমার গ্রন্থের শেষ দিকে হয়ত তাহার কিছু পূর্বসূচনা [illegible]ভাসিত হইয়াছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৬৩
ইং ২৪শে মে, ১৯৫৬
৩১ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নূতন সংস্করণে অনেক অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণে যে সমস্ত কৃতী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনার আলোচনা বাদ পড়িয়াছিল সেই ফাঁকগুলি এবারে যথাসম্ভব পূর্ণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর বিস্তৃততর বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়া এতৎসম্বন্ধীয় অসম্পূর্ণতার অনেক পরিমাণে নিরসন হইয়াছে। এই সংস্করণ পাঠে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতম অগ্রগতির সহিত পাঠকের আরও ব্যাপক পরিচয় ঘটিবে এইরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

অত্যন্ত সাবধানতা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও এই জাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা অপরিহার্য। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য বিদগ্ধ পাঠকের অনুকূল মনোভাবপ্রসূত মার্জনা চাহিতেছি।

স্নানযাত্রা
৩১, সাদার্ণ এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে আরও কিছু নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল। এই সংস্করণ মুদ্রণযোগ্য করিতে ও নূতন প্রসঙ্গগুলির যথাযথ সংযোজনায় কবি-সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই সহযোগিতা না পাইলে গ্রন্থপ্রকাশে অনেক বেশী বিলম্ব হইত। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সমস্ত বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন ও পুরাতন রচনার মধ্যে নূতন লেখাগুলির অন্তর্ভুক্তির মূল্যবান নির্দেশ দিয়া গ্রন্থকারের শ্রম অনেকটা লঘু করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধাপ্রণোদিত, নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য তিনি আমার আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন।

উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান পরিধির সহিত সমতা রক্ষা করা সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ইচ্ছাসত্বেও সমস্ত আলোচনাযোগ্য নবপ্রকাশিত উপন্যাসকে গ্রন্থের মধ্যে স্থান দিতে পারি নাই। এই অনিবার্য বর্জন ও তজ্জনিত অসম্পূর্ণতার জন্য ঔপন্যাসিক ও বিদগ্ধ পাঠক উভয়েরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তথাপি নূতন যুগের সৃষ্টি সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি সুধীসম্প্রদায় এই অসম্পূর্ণ প্রয়াসকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

উপন্যাস-সাহিত্যের সমালোচনায় বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাগণের অনুরোধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হইল। আশা, ঔপন্যাসিক ও সমালোচনা-সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট পুস্তকখানি পূর্বের ন্যায়ই সমাদর পাইবে।

পরিশেষে, যে-সকল নূতন-পুরাতন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস—যাহা নূতন নূতন উন্মেষের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই গ্রন্থে সমালোচিত হয় নাই, ভবিষ্যতে সেই পরিবর্তনশীল সাহিত্য-জগতের সমালোচনা, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় প্রকাশ করিবার আশা রাখি।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

প্রথম অধ্যায়

(১) প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূচনা

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদেব দেশে যে সব নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। পুরাতন যুগের আকাশ-বাতাসের মধ্যে ইহার জন্ম সম্ভবপর নয়। আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। সর্ব শ্রেণীর সাহিত্যেব মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। এই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির উপরেই ইহাব প্রতিষ্ঠা। উপন্যাস যে সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা অতীত কালের সমাজ হইতে অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন হওয়া চাই। প্রথমতঃ, মধ্যযুগের সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মানুষের মুক্তিলাভ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্‌বোধন উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মধ্য-যুগে সমাজ কতকগুলি সনাতন অপরিবর্তনীয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত থাকে এবং মানুষ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া আপনাকে কোন একটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ও সেই শ্রেণীর মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে আত্মবিলোপ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ও উপন্যাসের আবির্ভাবের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ আর আপনাকে একটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া রাখিতে চায় না; সমুদয় সামাজিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা তাহার একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়াছে। এই ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের আবির্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের মনেও যে একটা আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়া উঠে ও যাহা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহাও উপন্যাস-সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। উপন্যাসের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব এখানেও সুপরিস্ফুট। প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় প্রধানতঃ অতি-মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ; ইহা সাধারণ লোকের বিশেষ ধার ধারে না। যে সমস্ত স্থলে সাধারণ মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে, সেখানেও সে দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া—নিজের মনুষ্যত্বের জোরে নহে। পক্ষান্তরে, অতি সামান্য লোকের দৈনিক জীবন লিপিবদ্ধ করা ও উহা হইতে জীবন-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ, ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলাই উপন্যাসের প্রধান কার্য। সুতরাং কোন দেশের সামাজিক অবস্থার এই সমস্ত পরিবর্তন সংসাধিত

না হইলে, তাহা উপন্যাসের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে পারে না। এই সমস্ত কারণেব জন্যই উপন্যাসের আধুনিকত্ব, বর্তমান যুগের পূর্বে, গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের পূর্বে, ইহার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।

অবশ্য উপন্যাস যে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মত সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও ইহার ক্ষীণ সংকেত ও সুদূর ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাব্যে, ধর্ম-গ্রন্থে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতায়, আখ্যায়িকায় (narrative poetry) ও নাটকে, যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়, যেখানেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায় বা সামাজিক মনুষ্যের সম্পর্ক ও সংঘাত ফুটিয়া উঠে, সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে। উপন্যাসেব জন্ম হইবার পূর্বেই, উহার লক্ষণ ও উপাদানগুলি বিক্ষিপ্ত—বিপর্যস্তভাবে সাহিত্যের মধ্যে ছড়ান থাকে। তারপর যথাসময়ে কোন প্রতিভাবান্ লেখক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ও তাহাদিগকে একটি বাস্তব আখ্যায়িকার মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া, একপ্রকার নূতন সাহিত্যের জন্ম দান করেন ও চিরপ্রবহমান সাহিত্য-স্রোতকে নূতন প্রণালীতে সঞ্চারিত করেন।

(২) প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও সমস্ত ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যায়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক সাহিত্যে, সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ও ঐশীশক্তিব বিকাশেব মধ্যে, সময়ে সময়ে বাস্তব সমাজচিত্রের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ও বাস্তব মনুষ্যের অকৃত্রিম সুখ-দুঃখের মৃদু প্রতিধ্বনি আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেব-দেবীর স্তুতিগান ও ভক্তি-উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া, অতিপ্রাকৃতের কুহেলিকাময় যবনিকা ভেদ করিয়া, যে ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা দেশকালনিরপেক্ষ মানবহৃদয়েরই বাণী বলিয়া আমরা চিনিতে পারি। প্রাচীন সাহিত্যেব মধ্যে এই সমস্ত বাস্তবতার ছাপ-মারা দৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা ও আধুনিক সাহিত্যের সহিত তাহাদের প্রকৃত যোগসূত্র আবিষ্কার করা কাব্যামোদীর একটি প্রধান আনন্দ। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য—'কথাসরিৎসাগব', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসেব মৌলিক উপাদানগুলি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হইয়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ, সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনায়, বাস্তবতার সুরটি অধিকতর তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বোধ হয় ইহার একটি কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানুষকে একটি নূতন ঐক্য ও সাম্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং চিরপ্রথাগত রাজন্য ও অভিজাতবর্গের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে নিজ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

(৩) পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতক

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে বৌদ্ধ জাতকগুলি ঈসপের গল্প বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অনুরূপ ও তাহাদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত। বৌদ্ধধর্মের মহিমা-প্রচার ও বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়-দানই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং অনৈসর্গিক, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ইহাদের মধ্যে [illegible]ষ্ট পরিমাণেই বর্তমান আছে। আবার ঈসপের গল্পের মত পশুপক্ষীর ব্যবহার ও [illegible]পকথনের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্র সমালোচনা ও তাহাকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা [illegible] চেষ্টাও খুব পরিস্ফুট। তথাপি বাস্তব রসধারা ইহাদের মধ্যে প্রচুরতর [illegible]হিত; সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, গল্প বলিবার একটা বিশেষ [illegible] ও কৌশল এবং বাস্তব জীবনের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ইহাদিগকে সম- [illegible] অন্যান্য গল্প হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র'-এ নীতিজ্ঞান [illegible]তাকে অভিভূত করিয়াছে; গল্পের অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া নীতি-[illegible]ার কঙ্কাল সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পশুপক্ষীর কথোপকথনের মধ্যে কোন বিশেষ সরসতা, গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে কোন বিশেষ উৎকর্ষ বা নাটকোচিত গুণ-বিকাশের চেষ্টা, কিছুই খুঁজিয়া পাই না। লেখকের দৃষ্টি কেবল মানব-জীবন সম্বন্ধে খুব সাধারণ রকম অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতিজ্ঞান বা ব্যবহার-চাতুর্যের প্রতিই আবদ্ধ আছে। এই নীতিটিকে সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে স্মরণীয়ভাবে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টাতেই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; তাহার অনুভূতিকে বহির্জগতের অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল দৃশ্য হইতে নিবর্তিত করিয়া অন্তর্জগতের শুষ্ক নীতি-নিষ্কাশন-কার্যেই প্রেরণ করিয়াছেন। গল্পগুলিও যেন দেবভাষার শব্দাড়ম্বরে এবং সমাস ও সন্ধি-বাহুল্যে ব্যথিত-গতি হইয়া নিতান্ত ক্ষীণ ও মন্থর পদে চলিয়াছে। তাহারা যেন তাহাদের অন্তর্নিহিত নীতিসারটুকু বাহির করিয়া দিতেই অত্যন্ত ব্যগ্র, কোনমতে নিজদিগকে নিঃশেষ করিয়া তাহাদের কুক্ষিগত নীতিটুকু উদ্‌গার করিয়া দিলেই যেন তাহারা বাঁচে। শিক্ষা দিবার প্রবল আগ্রহেই তাহারা আপনাদের জীবনীশক্তিকে নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে। অবাধ্য, দুঃশীল রাজপুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্যই যে তাহাদের জন্ম এবং প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিষ্ণুশর্মা যে তাহাদের লেখক—তাহাদের এই গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে তাহারা মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয় নাই। তাহারা তাহাদের এই বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছিল, দুঃশীল রাজপুত্রদের দুঃশীলতাকে এক অবসর-সংক্ষেপ ছাড়া অন্য কোন দিকে সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত নাই, এবং এই অখণ্ডনীয় প্রমাণের অভাবে যদি আমরা তাহাদের সংস্কারকোচিত শক্তিতে সন্দিহান হই, তবে বোধ হয় আমাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

অবশ্য ঈসপের গল্পগুলি গল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য হইতে এতটা বিপথগামী হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও নীতি-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, এবং প্রত্যেক গল্পের শেষে নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিলেও নীতি গল্পকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে নাই। ঈসপের গল্পগুলি সহজ, সরল ভাষায় রচিত, অলঙ্কার-বাহুল্যে অযথা ভারাক্রান্ত নহে; সংস্কৃত

'পঞ্চতন্ত্র'-এর ন্যায় তাহাদের বাস্তব জীবনের সহিত ব্যবধান এত বেশি নয়। তথাপি গল্প-হিসাবে তাহাদের কোন বিশেষত্ব নাই; গল্পটি বলিবার মধ্যে এমন কোন বিশেষ ভঙ্গী, এমন কোন সরসতা নাই, যাহা আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে। গল্পের অন্তর্নিহিত রসটি ফুটাইয়া তোলা বা সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাহার আখ্যান-অংশটিকে সজীব ও লীলায়িত করিয়া তোলার কোন চেষ্টা নাই। গল্পটি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে, যেন এক নিঃশ্বাসে সারিয়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে উপদেশটি বাহির করিয়া লইতেই লেখক ব্যস্ত। গল্পের মধ্যে বাস্তবতার একটি ক্ষীণ সুর আমাদের কানে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু এই ক্ষীণ বাস্তবতার মধ্যে জীবনের সহিত কোন নিবিড় সংস্পর্শের আভাস পাওয়া যায় না। মোট কথা, ইহাদের মধ্যে খাঁটি গল্পের প্রতি লেখকের অবিমিশ্র অনুরাগের পরিচয় বড় একটা মেলে না। মানব-সমাজের যে আদিম অবস্থায় গল্প-বর্ণিত ঘটনাগুলি জীবনের প্রকৃত সমস্যার বিষয় ছিল, আমরা সেই অবস্থা হইতে এখন বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি; সেই ঘটনাগুলি এখন আমাদের বাস্তব-জীবনের মধ্যে আর প্রতিফলিত হয় না। কেবল তাহাদের অন্তর্নিহিত উপদেশগুলি আমাদের বর্তমান জটিলতর অবস্থার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রয়োগ করা হয় মাত্র; অর্থাৎ আমাদের নিকট গল্পের কোন মূল্য নাই, উপদেশটিরই যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আছে। সামাজিক যে অবস্থায় বক সিংহের গলায় নিজের ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া পুরস্কার চাহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল, বা সিংহচর্মাবৃত গর্দভ আপনাকে সিংহ বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিল, আমাদের বর্তমান জীবনে সেই অবস্থাগুলির পুনরাবৃত্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাহাদের নীতি-অংশটুকুই আমাদের অভিজ্ঞতার অংশীভূত হইয়া বর্তমানের অধিকতর জটিল ও সমস্যাসংকুল পথে আমাদিগকে সাবধানে পদক্ষেপ করিতে শিক্ষা দেয় মাত্র। অবশ্য ঈসপের দুই একটি গল্পের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্যার চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন অন্য জন্তুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার জন্য অশ্বের মনুষ্যকে আহ্বান ও মনুষ্যের নিকট তাহার অধীনতা-স্বীকার নিঃসন্দেহ একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যার আভাস দেয়; কিন্তু মোটের উপর পূর্ব মন্তব্য ঈসপের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

গল্প-হিসাবে বৌদ্ধ জাতকগুলি 'পঞ্চতন্ত্র' ও ঈসপের গল্প হইতে সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। বাস্তব জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ ইহাদের প্রত্যেকটির উপর অত্যন্ত গভীরভাবে মুদ্রিত। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া, ইহার সহিত আমাদের যেরূপ বিস্তারিত ও ব্যাপক পরিচয় আছে এমন বোধ হয় ইস্‌লামধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের সহিত নাই। ইহার রীতি-নীতি ও অনুশাসন, ইহার কার্য-প্রণালী ও ধর্ম-বিস্তার-চেষ্টা, বিশেষতঃ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ, প্রাত্যহিক সম্পর্ক—এ সমস্তই আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। হিন্দুধর্মের ভিতরে একটা প্রবল অনাসক্তির, একটা বিশাল ঔদাসীন্যের ভাব জড়িত রহিয়াছে। ঋষির তপোবন গৃহীর প্রাত্যহিক জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শের চিহ্ন অতি বিরল। তপোবনের আদর্শ শান্তি গৃহস্থের শত শত ক্ষুদ্র কলরবে, তুচ্ছ কোলাহলের দ্বারা বিচলিত হয় নাই। কচিৎ কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা ঋষির চরণোপান্তে শিষ্যের ন্যায় আসিয়া

প্রণত হইয়াছেন; ঋষিও তাঁহাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করাইয়াছেন; তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কৌতূহল-প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই। অথবা সময়ে সময়ে ঋষিই কোন বিশেষ প্রয়োজনে তপোবনের পবিত্র গণ্ডি ছাড়াইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং কার্য শেষ হইলেই নিজ আশ্রমের নিভৃত, ছায়াস্নিগ্ধ কোণে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মোট কথা, হিন্দুধর্মে এক বিরল প্রয়োজন ছাড়া তপোবন ও গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী সংযোগ-সেতু নির্মিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে আশ্রম ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুরা প্রতিদিনই গ্রাম বা নগরের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা ও ধর্মদেশনার জন্য যাইতেন এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইতেন—আশ্রম হইতে গ্রামের পথখানি সর্বদাই গমনাগমনের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রত্যেক তুচ্ছ কলহ বা অশান্তির কারণ লইয়া বুদ্ধের চরণে নিবেদন করিতে আসিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ লইয়া ফিরিত। এই সাধারণ জীবনের সহিত নৈকট্যই বৌদ্ধ জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষের কারণ হইয়াছে।

এই বাস্তব-নৈকট্যের নিদর্শন জাতকগুলির মধ্যে অজস্র প্রাচুর্যের সহিত উদাহৃত। ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের নানা সমস্যা, তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের জীবনযাত্রা, এমন কি পশুপক্ষীর ও বুদ্ধদেবের চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্রই এই বাস্তবতাপ্রবণ মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি ইহাদের ভাষা ও উপমা-উদাহরণ-নির্বাচনের মধ্যেও এই বাস্তবতার চিহ্ন সুপ্রকট। সামান্য দুটি একটি উদাহরণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মজীবনের প্রত্যেক সমস্যা, প্রত্যেক প্রকারের প্রলোভন, ধর্মবিষয়ক প্রত্যেক প্রকারের মতভেদ ও বাদানুবাদ, ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও ঈর্ষ্যা, ধর্মোপদেশ-পালনে নিষ্ঠা ও শৈথিল্য, ভক্তি ও ভণ্ডামি—এই সমস্ত ব্যাপারেই একটা নিখুঁত, জীবন্ত ছবি জাতকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের প্রকৃতিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-পিপাসা ও উচ্চাভিলাষ বিলয় প্রাপ্ত হয় না তাহা ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। নির্বাণপ্রদ শাসনে অবস্থিত হইয়াও ভিক্ষুরা উৎকৃষ্ট ভোজ্য, চীবর ও বাসস্থানের মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই, অন্তরের গূঢ় শঠতা ও অভিমান বিসর্জন দিতে পারে নাই। আশ্রমের মধ্যেই এই আদিম ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে; ভিক্ষুরা পরস্পর কলহ করিতেছে, ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া মিথ্যানিন্দা প্রচার করিতেছে; স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে অহংকার-স্ফীত হইতেছে। কোন নির্বোধ বুদ্ধির অতীত বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কেহ বা অপর সকলকে সঞ্চয়ের দোষ দেখাইয়া তাহাদেরই পরিত্যক্ত পাত্র-চীবরে আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে; কেহ বা জীর্ণ চীবরকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার দ্বারা অপরকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, ও তৎপরিবর্তে নূতন চীবর ঠকাইয়া লইতেছে (বক-জাতক, ৩য়)। এই প্রকারের বাস্তব জীবনের ঘটনাসন্নিবেশে জাতকগুলি বিশেষ উপভোগ্য ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

আবার সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবন-বর্ণনাতেও এই বাস্তবতার প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি

করা যায়। বিষয়-নির্বাচনে ও বর্ণনাভঙ্গীতে একটা নূতনত্ব, সাধারণ পরিচিত প্রণালীকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা সর্বত্রই পরিস্ফুট। সাধারণতঃ গল্প যে সমস্ত বাঁধা-ধরা মামুলি ঘটনাতেই (conventional situation) আবদ্ধ থাকে, জাতকে তাহা হয় নাই। শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে গিয়া কিরূপে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ধূর্তেরা অর্থলোভে কিরূপে ধনীদের মদ্যে বিষ মিশাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এক মূর্খ শৌণ্ডিক কিরূপে তাহার মদ্য অতিরিক্ত লবণাক্ত করিয়া স্বীয় ব্যবসায় নষ্ট করিয়াছিল, এক প্রত্যন্তপ্রদেশের শাসনকর্তা কিরূপে দস্যুদের সহিত লুণ্ঠিত ধনের অংশ লইবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে জনপদ লুণ্ঠন করিতে দিয়াছিল (খরস্বর-জাতক); একজন বণিক্ কিরূপে নিজ অমঙ্গলসূচক নামের ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল (কালকর্ণী ও নাম-সিদ্ধিক জাতক), একজন দাসপুত্র কিরূপে আপনাকে নিজ প্রভুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া সেবাগুণে প্রভুর ক্ষমা ও প্রসাদ পাইয়াছিল (কটাহক-জাতক), একজন নাপিতপুত্র কিরূপে উচ্চকুলজাত লিচ্ছবি বংশের রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল (শৃগাল-জাতক), এক গৃহস্থ কিরূপে মহামারীর সময়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইয়া নিজ জীবন রক্ষা করিয়াছিল (কচ্ছপ-জাতক), —এই সমস্ত জীবনের বিচিত্র, বিবিধ ঘটনায় জাতকগুলি পূর্ণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য প্রাচীন গল্পের সহিত তুলনায় জাতকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীতি-প্রচারের জন্য গল্পকে বলি দেওয়া হয় নাই। গল্পটিকে মনোহর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পশু-বিষয়ক গল্প ও অনৈসর্গিকের অবতারণা যথেষ্ট আছে—কোন দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য হইতে এই অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জন করা সম্ভবপর ছিল না—কিন্তু সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে সাহিত্য রসধারার প্রবাহ খণ্ডিত ও প্রতিহত হয় নাই। পশু-বিষয়ক গল্পের মধ্যেও যে পরিমাণ পরিহাসরস, বাস্তব-বর্ণনা ও পশুদের প্রকৃত স্বভাব ও ব্যবহার ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে তদনুরূপ কিছুই দেখিতে পাই না। কণ্ডলকুক্ষি সৈন্ধব-জাতক, কৃষ্ণ-জাতক, বক-জাতক, কাক-জাতক—এই সমস্তই পশু-বিষয়ক জাতকগুলির বাস্তবতা-প্রাধান্যের উদাহরণ। 'পঞ্চতন্ত্র'-এ যে জরদ্গবের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই গৃধ্র বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না, তাহার গৃধ্রোচিত কোন লক্ষণই আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে পঙ্কনিমগ্ন শার্দূল ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পথিককে কঙ্কণ লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, তাহাকে আমরা কোন মতেই বনের বাঘ বলিয়া চিনিতে পারি না, সংস্কৃত শ্লোকের আতিশয্যে, সাধুভাষার আড়ম্বরে তাহার শার্দূল-প্রকৃতি, ব্যাঘ্রোচিত নখর-দংষ্ট্রা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ঈসপের গল্পগুলিতে যেমন একদিকে নীতিকথার বাহুল্য নাই, তেমনি অপরদিকে সরস বাস্তব বর্ণনারও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না, পশুদের বিশেষ প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অবশ্য জাতকেও যে এই দোষের অভাব আছে, তাহা বলা যায় না, সেখানেও হস্তী, মর্কট, তিত্তির প্রভৃতি পশুপক্ষীর মুখে বুদ্ধমাহাত্ম্যকীর্তন ও পঞ্চশীলের গুণগান শোনা যায়। কিন্তু লেখক ইহার মধ্যেও এমন বাস্তব বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, পশুপক্ষীদের প্রকৃতিসুলভ দুই একটি লক্ষণের এমন সুকৌশলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহাদের প্রকৃত রূপ চিনিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

আরও নানাদিক্ দিয়া জাতকের মধ্যে এই বাস্তবতাগুণের স্ফুরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের কাহিনী যে পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জনসাধারণের যেরূপ প্রভাব দেখা যায়, হিন্দুধর্মে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কাজেই জাতকের মধ্যে শিল্পী, বণিক্, শ্রেষ্ঠী, কর্মকার, সূত্রধর, প্রভৃতি সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। বরঞ্চ রাজা-উজীরের বর্ণনাগুলি অনেকটা মামুলি ধরনের ও বিশেষত্ববর্জিত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর চিত্রে লেখকের সত্যানুরাগ ও বাস্তবানুগামিত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আবার বুদ্ধের নিজের চরিত্রও যতদূর সম্ভব অতিরঞ্জনবর্জিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক বুদ্ধ-চরিত্রের অলৌকিক মাহাত্ম্য দেখাইতে বিশেষ কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু তথাপি সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক অত্যুক্তি-প্রবণতার সহিত তুলনা করিলে জাতকের ভাষার মধ্যেও একটা সংযম ও পরিমিত ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব যে কেবল রাজকুল ও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহাকে সময়ে সময়ে নিতান্ত নীচ-কুলোদ্ভূত করিয়াও দেখান হইয়াছে। তিনি যে সকল সময়ে একটা আদর্শ, অপরিম্লান, পুণ্য জ্যোতির মধ্যে বাস করিয়াছেন তাহাও নহে, অনেক জাতকেই তাঁহার পদস্খলন ও নিবুদ্ধিতার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি অনেক জাতকে নিতান্ত নীচ ও হেয়বৃত্ত্যনুসারী বলিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছেন—এমন কি একটি জাতকে তিনি চোরের সর্দার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সকল ধর্মেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে আদর্শচরিত্র ও অতিমানব গুণের অধিকারী বলিয়া দেখান হয়, কিন্তু জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত-বর্ণনে এই সর্বধর্মসাধারণ প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের চরিত্র-বর্ণনে বাস্তবানুরক্তির পরিচয় দিয়া জাতককার যে আশ্চর্য সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে সুলভ নহে।

এই বাস্তব ফ্রেমে আঁটা বলিয়া জাতকগুলির গল্পাংশে উৎকর্ষ এত বেশি। 'পঞ্চতন্ত্র' বা ঈসপের গল্পগুলিতে তাহাদের বর্তমান উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কোন পরিচয় মেলে না; বাস্তব জীবনে তাহাদের ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ থাকি। তাহারা যেন কতকগুলি সর্বদেশসাধারণ, মানব-প্রকৃতিসুলভ, কাল্পনিক অবস্থার চিত্র বলিয়া মনে হয়—কোন বিশেষ দেশের মৃত্তিকার সহিত তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না, কোন বিশেষ জাতির জীবনীরস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করি না, আমাদের সামাজিক ও প্যারিবারিক অবস্থার মধ্যেই তাহাদের মূল গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপন্যাসলেখকের মনোভাব (mentality) সম্পূর্ণভাবে প্রকট। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সরস বর্ণনাই ভাবী ঔপন্যাসিকের প্রথম গুণ; প্রাচীন সাহিত্যে ঠিক এই মনোবৃত্তির অভাবই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন লেখকেরা যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির গৌরব ও কথাসম্পদ্ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিক মতের অভ্রভেদী স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহার তলে এই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলি প্রোথিত করিয়া ফেলেন। মহাকাব্য জীবনের বীরত্বপূর্ণ, বৃহৎ বিকাশগুলিকেই ফুটাইয়া তোলে, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিকে, ঘরের ছোটখাটো হাসি-কান্না,

সুখ-দুঃখগুলিকে সাহিত্যের অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া যায়। অথচ এই অতিপরিচিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে লক্ষ্য ও তাহাদের অন্তর্নিহিত রসটি উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিতেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত আছে। সেইজন্য ইংরেজী সাহিত্যে চসারকেই আমরা ভাবী ঔপন্যাসিকের নিকটতম জ্ঞাতি ও পূর্বপুরুষ বলিয়া সহজেই অনুভব করি। তিনি ঔপন্যাসিক না হইলেও উপন্যাসের উপাদান ও ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যদি বা বহু অনুসন্ধানের পরে দুই একটি বাস্তবচিহ্নাঙ্কিত দৃশ্যের সন্ধান মিলে, কিন্তু তখনই যেন মনে হয় যে, লেখক নিজ দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া এই বাস্তবতার চিহ্নটি যথাসাধ্য লোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; বাস্তব অংশগুলিকে কল্পনা বা আদর্শবাদের সাহায্যে যথাসম্ভব রূপান্তরিত করিয়া, এই দরিদ্রের সন্তানগুলিকে সাহিত্যোচিত রাজবেশ পরাইয়া সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে বাস্তবতার এই বিরাট দৈন্যের মধ্যে জাতকগুলির বাস্তব প্রতিবেশ যে সমস্ত দুষ্পাপ্য বস্তুর ন্যায় আরও উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখিয়া সত্যই মনে হয় যে, পরবর্তী যুগে যদি এই গল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, বাস্তবের সহিত নিবিড় স্পর্শের বাধা না ঘটিত, তবে বোধ হয় আমরাই সর্বপ্রথমে উপন্যাস-আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিতে পারিতাম; এবং তাহা হইলে বোধ হয় উপন্যাসকে ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে, বিদেশীয়-ভাব-বিকৃত হইয়া, খিড়কি দরজা দিয়া আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে হইত না।

এই জাতকসমূহের বিষয়-বৈচিত্র্য রচয়িতাদের লোকচরিত্র পর্যবেক্ষণের প্রসার ও বিভিন্ন জাতীয় উপাদান হইতে রস-আহরণ-নৈপুণ্যের নিদর্শন। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিষয় ভারতীয় জীবনধারার সাধারণ গতিপথের ব্যতিক্রমধর্মী। কতকগুলি গল্পে নারীজাতির চরিত্র-স্খলন ও অবিশ্বাসিতা বিষয়ে লেখকদের একটি বদ্ধমূল ধারণা, নারীবিদ্বেষের এক দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত মানসপ্রবণতা আশ্চর্যভাবে উদাহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের উগ্র ও ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ স্ত্রী-বিরোধী মনোভাব কিরূপ সামাজিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মে। 'অন্ধভূত-জাতকে' নারী যে শুধু ব্যভিচারিণী তাহা নহে, সে সতীত্বস্পর্ধী অহঙ্কারে অগ্নিপরীক্ষা দিতে সমুদ্যত। এই পরীক্ষা-গ্রহণে প্রস্তুতির মধ্যে একটি অতি চতুর কূটকৌশলের উদ্ভাবনও আমাদিগকে বিস্মিত করে। অগ্নিতে প্রবেশের পূর্বে তাহার প্রণয়ী যেন নিরপরাধার মৃত্যুবরণে সমবেদনায় উত্তেজিত হইয়া তাহার স্বামীকে ভর্ৎসনা করে ও স্ত্রীকে হাত ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে। তখন স্ত্রী পরপুরুষস্পর্শ-দোষে তাহার সতীত্ব কলঙ্কিত হইয়াছে এই অজুহাতে অগ্নি-পরীক্ষা হইতে বিরত হয়। বিশুদ্ধ কৌতুক রসপূর্ণ ও রোমান্সজাতীয় গল্পও এই গল্প-সংগ্রহের বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে।

পূর্বে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে সহজেই বোধ হইবে যে, জাতকগুলি উপন্যাসোচিত গুণে বিশেষ সমৃদ্ধ; তাহাদের মধ্যে যে কেবল বাস্তব উপাদানই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তাহা নহে; একটা প্রবল বাস্তবতাপ্রবণ মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই বিষয়েই তাহারা যে উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও অগ্রদূতের গৌরব দাবি করিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ।

সংস্কৃতের অন্যান্য গল্পসংগ্রহগুলির—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার-চরিত প্রভৃতির রচনা কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক বা তৎপূর্ব হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। এই রচনাগুলিতে নীতিশিক্ষা ছাড়াও আর যে সাধারণ আখ্যানগুণ দেখা যায়, তাহা দাম্পত্য জীবনে প্রধানতঃ নারীর ছলনাময়তার জন্য ব্যভিচারের ব্যাপকতা বিষয়ক। মনুসংহিতা ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে নারী সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে, এই গল্পসংগ্রহসমূহের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্রে তাহার বাস্তব সমর্থন মিলে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বীভৎস বিকৃতি ও হিন্দুধর্মের আদর্শভ্রষ্টতার ফলেই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান আক্রমণের যুগ পর্যন্ত এই অবক্ষয়-প্রক্রিয়া জাতির জীবনীশক্তিকে যে দ্রুত হ্রাস করিতেছিল তাহার প্রচুর নিদর্শন এই আখ্যানসমূহের মধ্যে নিহিত। ইহাদের রচনাপদ্ধতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আখ্যানবস্তু ও জীবনচিত্রণের দিক্ দিয়া ইহারা একই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী ও অভিন্ন জীবনবোধের সূচক। মনে হয় যেন এই কয়েক শতাব্দীর ভারতবর্ষ, উহার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও নীতিহীনতা, উহার সমাজজীবনের বিশৃঙ্খলা ও ভোগাসক্তি, উহার কূটকৌশলপ্রয়োগের নির্বিচার তৎপরতা লইয়া যেন চতুর্দশ শতকের ইতালীর সগোত্রীয় ও চসার ও বোকাচ্চিও-এর জীবনবোধের সহিত অতিনিকটসম্পর্কিত। এই বিলাসী, ঐহিক-সুখপরায়ণ, রুচিবিকারগ্রস্ত, গল্পরসবিভোর সাহিত্যধারা পরবর্তী যুগে জাতীয় জীবনের উপরিভাগ হইতে অপসৃত ও নূতন ভাবাদর্শে খানিকটা পরিশ্রুত হইয়া উহার তলদেশে অদৃশ্য ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে ও গল্প ছাড়িয়া গীতিকবিতার আশ্রয় লইয়াছে।

'পঞ্চতন্ত্র'-এ প্রাণিবিষয়ক নীতিমূলক গল্প ছাড়াও আরও নানাজাতীয় সমাজ-চিত্র ও কৌতুকরসপূর্ণ গল্পও আছে। 'মিত্রভেদে'র পঞ্চম গল্প কৌলিক-রথকারের কাহিনীটি অবতারবাদের একটি কৌতুককর পরিহাস প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। তাঁতি রাজকন্যার প্রেমে পড়িলে রথশিল্পী তাহার বন্ধুর জন্য একটি শূন্যচর যান প্রস্তুত করিল—এই যানারূঢ় হইয়া ও নিজেকে বিষ্ণুর অবতাররূপে ঘোষণা করিয়া সে রাজকন্যার পতিত্বে বৃত হইল। রাজাও স্বয়ং বিষ্ণুকে জামাতারূপে লাভ করিয়া ও আত্মবল বিচার না করিয়াই প্রতিবেশী রাজাদের আক্রমণ করিয়া প্রায় সর্বনাশের সম্মুখীন হইলেন। তখন সত্যিকার বিষ্ণু নিজের সম্মান রক্ষার জন্য রাজার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন ও জাল বিষ্ণুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। রাজকন্যা দেবতার সহিত বিবাহে সংকোচ প্রকাশ করায়, তাঁতি বলে যে, সে বিগত জন্মে রাধারূপে তাহার প্রণয়িনী ছিল। এই যুক্তিতে বোঝা যায় যে, রাধাকৃষ্ণের অসামাজিক প্রণয়-সম্পর্কের কথা সেই প্রাচীন যুগেও লৌকিক সংস্কারের অঙ্গীভূত ছিল।

সাধারণ বুদ্ধিহীন, পুঁথিসর্বস্ব পাণ্ডিত্য কেমন বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করে তাহা চারিজন পণ্ডিতমূর্খের কাহিনীতে কৌতুকাবহরূপে উদাহৃত হইয়াছে। তাহারা শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক ও স্থূলবুদ্ধি ব্যাখ্যার অনুসরণে নানারূপ বিপদে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত একজন মজ্জমান বন্ধুর শিরশ্ছেদ করিয়া ও আর একজনকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবাক্যের মাহাত্ম্যের সহিত আত্মরক্ষার অত্যাজ্য প্রয়োজনের সঙ্গতি বিধান করে।

নারীর অবিশ্বাসিতা যজ্ঞদত্ত-কাহিনীতে উদাহৃত। ব্যভিচারিণী পত্নী স্বামীর অচিরাৎ

মৃত্যুর জন্য দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিলে বিগ্রহের অন্তরালে লুক্কায়িত স্বামী যেন দেবতার প্রত্যাদেশরূপে তাহাকে জানায় যে, স্বামীর ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেই তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটিবে। অনন্তর দধিদুগ্ধক্ষীরে পুষ্টকায় ব্রাহ্মণ অন্ধত্বের ভান করিয়া স্ত্রীকে প্রকাশ্য ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, ও তাহার পর আমন্ত্রিত প্রেমিক ও অসতী স্ত্রীর যথাযোগ্য সংকারের ব্যবস্থা করে। এই গল্পটি যেন সপ্তদশ শতকের ইংরেজী নাটকের কথা মনে পড়াইয়া দেয় ও যৌন ব্যাপারে ভারতীয় চিন্তাধারা স্বাধীনচিত্ততার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহার উপভোগ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে।

'হিতোপদেশ'-এ গল্পরস নীতি-প্রতিপাদক শ্লোকের সন্নিবেশ-প্রাচুর্যে খানিকটা প্রতিরুদ্ধ। 'হিতোপদেশ'এর গল্পগুলি প্রায়ই মৌলিক উদ্ভাবন নহে, পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য কোষগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনায় উহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'কথাসরিৎসাগর'-এ অলৌকিক ইন্দ্রজালঘটিত ব্যাপারেরই প্রাধান্য। এখানে বাস্তব জীবন ছায়ারূপে উপস্থিত ও রোমান্সেরই অসপত্ন রাজত্ব। অনেক রূপকথার কাহিনী-বীজ এখানে বিন্যস্ত আছে। নানা বিচিত্র আখ্যানবস্তুর অপর্যাপ্ত সমাবেশে এই মহাকোষ গ্রন্থখানি বাস্তবিকই সমুদ্রবৎ বিশাল। ইহাতে রাজনৈতিক ও ধর্মবিকৃতিসূচক গল্প ও 'পঞ্চতন্ত্র'-এর কথাবস্তু 'প্রাজ্ঞকথা' নামে সংগৃহীত আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক রস-কাহিনী ও কৌতুক-কাহিনী ইহার অন্তর্ভুক্ত।

'দশকুমারচরিত' দিগ্বিজয়-অভিযানে বহির্গত দশজন রাজকুমারের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী। ইহাতে প্রধানতঃ রাজনৈতিক শৌর্যবীর্য, কূটনীতি-প্রয়োগ, প্রণয়-প্রসঙ্গ ও নানাবিধ ইন্দ্রজালঘটিত অদ্ভুতরসাত্মক ঘটনারই সমাবেশ। এই রাজকুমারেরা কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোনরূপ দুর্নীতির আশ্রয়-গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন না এবং ইহাদের সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত ও শঠতাপূর্ণ কার্যাবলী সে যুগের ভারতীয় সমাজের নৈতিক শিথিলতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। কুট্টনীর সহায়তায় রাজমহিষীর চরিত্রস্খলন ঘটাইয়া রাজার নিধন-সাধন সমকালীন দাম্পত্য-সম্পর্কে পচনশীল বিকৃতির ঘৃণ্য নিদর্শন। ভণ্ড সন্ন্যাসী সাজিয়া, অভিচার-প্রক্রিয়ার দ্বারা অন্ধ্ররাজ জয়সিংহকে অপরূপ রূপলাবণ্য-প্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইয়া ও সুড়ঙ্গ-পথে সরোবর তলায় নামিয়া সেই মুগ্ধ রাজাকে নিহত করিয়া মন্ত্রগুপ্ত যেরূপে রাজার বিমুগ্ধা প্রণয়িনী ও রাজ্যলক্ষ্মীকে কৌশলে লাভ করিলেন তাহা গল্পরসের দিক্ দিয়া যেমন আকর্ষণীয়, কূটনীতি ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের ছলনাময় প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই যুগের লোকব্যবহারেরও সেইরূপ যথার্থ প্রতিচ্ছবি। মোটকথা, 'দশকুমারচরিত'-জাতীয় গল্পসংগ্রহে আমরা তৎকালীন জীবনের যে ছবি পাই তাহাতে সাধারণ সুস্থ গার্হস্থ্য জীবনচর্যা অপেক্ষা রাজসভার চক্রান্ত-কুটিল, লালসা-পঙ্কিল, অপ্রাকৃত কুহকশক্তিতে আস্থাশীল, বিকৃত জীবনাদর্শেরই অধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরবর্তী যুগে গল্প রাজনীতিজাল-বিমুক্ত হইয়া সরল, ভক্তিরসপ্রধান, দৈবনির্ভর ধর্মানুশীলনের লৌকিক আশ্রয়রূপেই আবির্ভূত হইয়াছে। রাজসভা বিদ্যাপতির পদাবলীতে ক্রূর কর্মব্যসনের মৃগয়াভূমি হইতে ভক্তিমিশ্র শৃঙ্গাররসচর্চার ললিত লীলাক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। উত্তর ভারতে পৌরাণিক নব ধর্মচেতনার স্ফুরণে দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে

রাজপরিবেশের কলঙ্কিত আবহ কিয়ৎ পরিমাণে পরিশুদ্ধ হইয়া প্রেমের দক্ষিণা বাতাসে ও কৌতুকময় হাস্য-পরিহাসে সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য—কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মুকুন্দরাম

তারপর যখন আমরা আমাদের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন ইহার মধ্যেও অনেকটা অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকারী; সুতরাং ইহা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন উপাখ্যান-আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় নবজাত বঙ্গভাষার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি ভাষান্তরের দ্বারা আত্মসাৎ করা। এই ভাষান্তরের দ্বারাই বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কেন না, যখন এই অনুবাদের কার্য আরম্ভ হইল, তখন শিশু বঙ্গভাষা প্রাচীন উপাদানগুলিকে অনেকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া, নিজের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইল। দেব-ভাষার অতিরঞ্জনস্ফীত, অলংকার-মুখর, শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত বর্ণনাগুলিকে কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া, কতকটা সংযত করিয়া, বঙ্গভাষা আপনার মধ্যে গ্রহণ করিল; বাস্তবতার চিহ্নগুলিকে স্ফুটতর করিয়া প্রাচীন উপাখ্যান-সমূহকে আপন সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; প্রাচীন সমাজের চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক বর্ণযোজনা ও রস সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে বাঙালীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের এইরূপ রূপান্তরের, এইরূপ ভাবগত গভীর পরিবর্তনের, এমন কি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তরণীসেন-বধ ও চন্দ্রকেতু-বিষয়ক উপাখ্যান এইরূপে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঙ্গদেশের বিশেষ ভাবমাধুর্য দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বাঙালীর ভক্তি-রস ও সুকুমার স্নেহ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, আমাদের বাস্তব জীবনের একটি পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের অঙ্গদ-রায়বার নামক সর্গে আমাদের বাঙ্গালীর ব্যঙ্গবিদ্রূপরসিকতা; খাঁটি বাঙ্গালীর রহস্যরুচি সংস্কৃত সাহিত্যের অটল গাম্ভীর্যের মধ্যে এক অশোভন, বিসদৃশ চাপল্যের বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গসাহিত্য ধীরে ধীরে বাস্তবতার পথে পদক্ষেপ করিয়াছে, ও পুরাতন উপাদানের মধ্যে নিজের বিশেষ প্রকৃতি ও রসবোধ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সংস্কৃতপ্রভাবমুক্ত বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার ধারা আরও প্রবল ও অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মসাহিত্য, ইহার চণ্ডী ও মনসার কাব্যে, বাস্তবচিত্রগুলি আরও স্ফুট ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; ইহাদের অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেবকীর্তিবর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তবচিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি।

মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।

(৫) রূপকথা, চৈতন্যচরিতগ্রন্থ ও ময়মনসিংহ-গীতিকা

আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথার মধ্যেও উপন্যাস-সাহিত্যের বিস্ময়কর পূর্বসূচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রূপকথাই উহার অবাস্তবতা সত্ত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অন্ততঃ দুইটি দিক্ দিয়া উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ, উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যানভাগ ইহার সর্বপ্রধান বিষয়বস্তু ও আকর্ষণ; ইহা একটি খাঁটি, অবিমিশ্র গল্প—ধর্মকাব্যের মত ইহার গল্পাংশটি শুধু কোন ধর্মতত্ত্বপ্রমাণ বা দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনের উপায়মাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ, উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশ-বাতাসে মায়া-মোহ-ইন্দ্রজালের একটি ঘন প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও, একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিণাম দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং মূলতঃ ঔপন্যাসিকেরও যে উদ্দেশ্য, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই; এবং ধর্মকাব্যকারের অপেক্ষা রূপকথাকার এই উদ্দেশ্য আরও প্রত্যক্ষভাবে, আরও সরল ও প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন—ধর্মের কুহেলিকার মধ্যে ইহাকে বিশেষ ম্লান হইতে দেন নাই। মোট কথা ধর্মকাব্যের সহিত তুলনায় রূপকথা ধর্মের অনধিকারপ্রবেশ হইতে অধিকতর মুক্ত; ও সেইজন্য খাঁটি আখ্যায়িকার গুণসমূহ ইহার মধ্যে প্রকটতর হইয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে উপন্যাসের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ মিলে। তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনাগুলিতে অনেক সময়ে চরিতকারদের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও তাঁহার দেবত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য অলৌকিকত্বের রং মাখানো হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনযাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক, প্রভৃতি বিষয়ের যে বিবরণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়, তাহা বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল যে আমাদের ধর্মজীবনের নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ঐতিহাসিক বোধকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের সহিত সম্পর্কিত তুচ্ছতম ঘটনাও সযত্নে লিপিবদ্ধ হইয়া বিস্মৃতি-বিলোপ হইতে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ জীবন সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের প্রবল আগ্রহ অসংখ্য ভক্তকে মহাকাব্য, কড়চা, জীবনচরিত, নাটক, ধর্মব্যাখ্যা, প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করিয়াছে—সাহিত্যের মরাখাতে একটি কূলপ্লাবী জোয়ার আনিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক সত্য-

নিষ্ঠার খাঁটি আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে—ভক্তিপ্লাবনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সন্দেহপ্রবণ সতর্কতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! তথাপি এই ধর্মোন্মাদের প্রভাবে একটা ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংবাদসংগ্রহ ও যথাশক্তি তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহপূর্ণ প্রবণতা, সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী ভক্ত ও অনুচরবর্গ নবদ্বীপ হইতে পুরী ও বৃন্দাবনে অবিরত গমনাগমনের দ্বারা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পথে ধ্যানমগ্ন ভক্তিবিহ্বলতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি তথ্যানুসন্ধিৎসা হাত ধরিয়া পাশাপাশি যাত্রা করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস যত সর্বব্যাপী হইয়া পড়িল, ততই এই তথ্যানুরক্তি, অলৌকিকত্ব-আবিষ্কারে উন্মুখ কল্পনা ও আপন আপন গোষ্ঠী-গুরুর মাহাত্ম্য-প্রচারাকাঙ্ক্ষী অন্ধভক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া, অতিরঞ্জনস্ফীত কিংবদন্তীর পর্যায়ে অবনমিত হইল। কাজেই চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে ইহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এই সম্পর্কে ময়মনসিংহের নিরক্ষর কৃষিজীবীর মুখ হইতে সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত অধুনা-বিখ্যাত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গীতি-আখ্যায়িকার রচনাকাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমান ঠিক হইলে ইহাদের আবিষ্কার আমাদের সাহিত্যিক ক্রমবিবর্তনের একটি লুপ্ত অধ্যায় পুনরুদ্ধার করিয়াছে। কৃত্তিবাস-কাশীদাস-মুকুন্দরামের যুগ ও ভারতচন্দ্রের যুগের মধ্যে যে একটি বৃহৎ ব্যবধান অনুভূত হয়, 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' তাহা পূরণ করিয়াছে। বাস্তবরসপ্রধানতার দিক্ দিয়া মুকুন্দরামের নিঃসঙ্গ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের যে ধারণা, তাহা এই সমস্ত রচনার দ্বারা খণ্ডিত ও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ধর্মগ্রন্থ-প্রণয়নের ফাঁকে ফাঁকে মুকুন্দরাম যে বাস্তবরসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে একাকী নহেন, পরন্তু তিনি একটা নূতন সাহিত্যের ধারা প্রবর্তিত করেন, এবং এই বাস্তবতা-সৃষ্টিতে তাঁর অনেক সহকর্মী ও অনুচর ছিল—এই তথ্য এই সমস্ত আখ্যায়িকার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের শূন্যপ্রায় সাহিত্যিক মানচিত্রে ইহাদের দ্বারা অনেক নূতন নগর-গ্রামের অবস্থিতি চিহ্নিত হইয়াছে।

সুতরাং ইতিহাস-সংগঠনের দিক্ দিয়া ইহাঁদের মূল্য সামান্য নহে। ইহারা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ব্যবধানের উপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করিয়াছে, মুকুন্দরামের একটা বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-পরিবারের সন্ধান দিয়াছে ও ভারতচন্দ্রের কৃত্রিম-কারুকার্যপূর্ণ, তীব্রদ্যুতি-ঝলসিত রাজপ্রাসাদের ভিত্তিমূলে যে বাস্তবজীবনের মৃত্তিকাস্তর বিদ্যমান তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। আবার রূপকথার সহিতও ইহাদের একটা নিকট আত্মীয়তা আশ্চর্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। গীতি-আখ্যানের সহিত 'কাজলরেখা' নামক রূপকথাটির একত্র সন্নিবেশ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্করহস্যটি স্ফুটতর করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীথ-তারকার ন্যায় রূপকথার যে অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, এই আখ্যানগুলি তাহার বৃন্ত ও মূল; বাস্তবজীবনের যে স্তর হইতে এই রূপকথা রস আহরণ করিয়াছে সেই বিস্মৃতপ্রায় প্রতিবেশের উপর ইহারা আলোকপাত করিয়াছে। আকাশের সুদূর কুহেলিকাচ্ছন্ন নক্ষত্রটিও আমাদের সংসারযাত্রার শত-প্রয়োজন-চিহ্নিত মৃৎপ্রদীপরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রূপকথার নামগোত্রহীন, রহস্যাবগুণ্ঠিত অস্তিত্বের জন্মস্থান-নির্ণয় হইয়াছে ও

বংশপরিচয় মিলিয়াছে। কয়লা ও হীরকখণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন, তেমনি বাস্তবতামূলক করুণ উৎপীড়ন-কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব দৈব-সংঘটন একই প্রতিবেশ-প্রভাব ও মনোবৃত্তির অভিন্ন অভিব্যক্তি।

এই সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কতকটা প্রতিক্রিয়া ও কতকটা সমধর্মত্বমূলক। বাস্তবের কঠোর অভিঘাত দৈবানুকূল্যের প্রতি একটা করুণ লোলুপতা জাগায় ও পাতালপুরীর অবাস্তব ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিতে প্রণোদিত করে। যেখানে অত্যাচার শত বাহু বিস্তার করিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে চায়, সেখানে মানুষ অনুকূল দৈবের অতর্কিত প্রসাদলাভ কল্পনা করে। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বমূলক গূঢ় সত্যও নিহিত আছে। সেইজন্যই ময়মনসিংহ-গীতিকায় যে প্রতিবেশের পরিচয় মেলে, তাহার মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই রূপকথা জন্মলাভ করিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের উৎপীড়নমূলক নিরোধই রূপকথার সূতিকাগার।

আর একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় প্রকার রচনাকে সমধর্মী বলিয়া মনে হইতে পারে। যথেচ্ছাচারমূলক শাসনপদ্ধতি ও জীবনযাত্রার মধ্যেই দৈবের অতর্কিত আবির্ভাবের প্রচুরতম অবসর। অত্যাচারীর কবল হইতে উদ্ধারলাভের মধ্যেই দৈবানুগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে প্রাত্যহিক জীবনে বজ্রপাতের মত বিপদ্ আসিয়া পড়ে, সেখানে খুব স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই অপ্রত্যাশিত উদ্ধার অনুকূল দৈবশক্তির ইঙ্গিত দেয়। যেখানে রাক্ষস-খোক্কসের ছড়াছড়ি, সেইখানেই শুকসারীর মুখ দিয়া বিপন্মুক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যে দুশমন কাজী মলুয়াকে তাহার স্বামী-বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, অদৃষ্টচক্রের খুব স্বাভাবিক আবর্তনে সে শূলে প্রাণ দিয়া ভগবানের নিগূঢ় ন্যায়নীতির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। কমলা উৎপীড়নের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে গৃহত্যাগিনী হইয়া দৈবপ্রসাদের ন্যায়ই 'মৈষাল বন্ধু' ও রাজকুমারের দর্শন পাইয়াছে। যে ঝঞ্ঝাবাত গৃহের নিরাপদ্ বেষ্টনী হইতে টানিয়া বাহির করে, তাহাই আবার পথিক-জীবনের নিরাশ্রয়তার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য মিলাইয়া দেয়,—পথে বাহির হইলেই ঘর-ছাড়া রত্ন কুড়াইয়া পায়। 'মলুয়া' গল্পটির মধ্যে রূপকথার লক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকট; যে 'মন-পবনের নাও'-এ চড়িয়া নায়িকা নিরুদ্দেশযাত্রা করিয়াছে, তাহা রূপকথার অতল সমুদ্রে পাড়ি দিতেই অভ্যস্ত।

বাহ্য অভিভবের বাহ্য উপশম আছে, অনুকূল দৈব দুর্দৈবের প্রতিষেধক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমাজপীড়নের কোনও সুলভ সমাধান নাই। যে সামাজিক সংকীর্ণতা মলুয়ার সুখের পথে শেষ অন্তরায় হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান দৈবেরও ক্ষমতাতীত। কাজীর শূলের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ বা তাহার আচারমূঢ় আত্মীয়-স্বজনের জন্য সেরূপ কোন আশুফলপ্রদ প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। কারকুনকে নরবলি দিয়া আখ্যায়িকা হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থলোভী আত্মীয়াধম ভাটুক ঠাকুরের আসন সমাজবক্ষে স্থিরতর রহিয়াছে। অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান, প্রভৃতি প্রবল প্রতিক্রিয়ার বেগে জ্যা-নির্মুক্ত ধনুকের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নেতাই কুটনী, চিকণ গোয়ালিনী, প্রভৃতি জীব,

যাহারা অপরের লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি-পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, তাহারা চিকিৎসাতীত দুষ্ট ব্রণের ন্যায় সমাজ-দেহে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই দিক্ দিয়া বর্তমান কালের সমাজজীবনের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের একটা অক্ষুণ্ণ যোগসূত্র রহিয়া গিয়াছে।

এই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ-গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আংশিক হইলেও বাস্তবতার দিক্ দিয়া একেবারে নিখুঁত। কি প্রকৃতি-বর্ণনা, কি রূপবর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণ—সর্বত্রই এই অকুণ্ঠিত বাস্তবতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সংস্কৃত-প্রভাবে অনুপ্রাণিত বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা বঙ্গ-সমাজ ও প্রকৃতির যে চিত্র পাই, তাহা ঠিক খাঁটি জিনিসটি নয়, তাহার মধ্যে দেবভাষার সংশোধন ও পরিমার্জন-চেষ্টা যেন বিশেসভাবে প্রকট। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল শাল্মলীতরু, বা তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্র-বেলাভূমি, এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্যের কেলিকদম্বকুঞ্জ—ইহারা কেহই বাঙলার বহিঃ-প্রকৃতির খাঁটি প্রতীক নহে—ইহাদের মধ্যে একটা ভাবমূলক আদর্শবাদ নিছক বস্তুতন্ত্রতাব চারিদিকে একটি সুষমাময় বেষ্টনী রচনা করিয়াছে। যুগব্যাপী অনুকরণের ফলে এইরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা বৈশিষ্ট্যহীন প্রথাবদ্ধতায় দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ মনে হয় যেন পৌরাণিক আদর্শ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া ইহার স্বাধীন, স্বচ্ছন্দলীলাকে এক বিশেষ ছন্দের নিগড়ে নিয়মিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙলার অন্তর-বাহিরের আসল স্বরূপটি চিনিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত-প্রভাব-নির্মুক্ত পল্লী-সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। আমাদের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘনবিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্বত্যনদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসংকুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্মসম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্য সভ্যতা ও ধর্মসংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'য় আমরা এই আরণ্য বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র সুদুর্লভ। ইহার নায়িকারা শাস্ত্রের অনুশাসনবাহুল্যের দ্বারা বিড়ম্বিত না হইয়া সতীত্বের আসল মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়বাণীর অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের অন্তরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শাস্ত্রানুশীলনের শান্তিবারিসেচনে একেবারে স্তিমিত-নির্বাপিত হইয়া যায় নাই। ইহাদের চরিত্রদৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা ইহাদিগকে অসাধারণ-গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে।

নায়িকাদের চরিত্রচিত্রণের ন্যায় তাহাদের রূপবর্ণনাতেও গতানুগতিকতাহীন বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়। যে সমস্ত উপমার সাহায্যে তাহাদের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত সংস্কৃত কাব্য-অলংকার-সাহিত্য হইতে সংগৃহীত নহে; লেখকদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি বাঙলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী হইতে সেগুলির অধিকাংশকে আহরণ করিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষুর স্বাভাবিক গতি বাঙলার নিজস্ব বহিঃ-প্রকৃতির দিকে; আখ্যায়িকার ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির এই অপর্যাপ্ত আরণ্য-সম্পদ উঁকি মারিয়া আমাদের সৌন্দর্যবোধকে পরিতৃপ্ত

করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাও এই বাস্তবতাকে আরও তীব্রতর করিয়াছে—ভাষার তীক্ষ্ণ, অকুন্ঠিত সরলতা গভীর ভাবপ্রকাশকে বেদনামাধুর্যে পূর্ণ করিয়াছে। নায়িকাদের শোকোচ্ছ্বাস গ্রাম্য কথ্য ভাষার সংযোগে একেবারে আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে, সাহিত্যিক ভাষার অলংকার-শিঞ্জন হৃদয়-বাণীর অকৃত্রিম সুরটিকে চাপা দেয় নাই। এই সমস্ত দিক্ দিয়াই 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' উপন্যাস-সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত। বাঙলা দেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। আখ্যায়িকাগুলির কোথাও কোথাও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ বা দেবকীর্তি-প্রচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের উপর যে মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব, তাহা অকৃত্রিম বাস্তবপ্রীতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, প্রতিবেশের ও সমাজ আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন। ভাবপ্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে। পল্লী-সাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ভারতচন্দ্রের বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিন আরও অগ্রবর্তী হইত। উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্বসূচনার দিক্ দিয়া 'মনমনসিংহ-গীতিকা'র প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য।

(৬) মুসলমানী রোমান্স-আখ্যান, গল্প-সাহিত্য ও নাথ-সাহিত্য

ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ও ভাবী উপন্যাসের আগমনের জন্য আপনাকে কতদূর প্রস্তুত করিয়াছিল, আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহার উপসংহার করিব। ইংরেজী-সাহিত্যের সম্পর্কে আসিবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্য আর একটি বৈদেশিক সাহিত্যের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিল—তাহা মুসলমান-সাহিত্য। এই মুসলমানীগল্পসাহিত্যের দুইটি ধারা আছে। প্রথম, সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে রচিত আরাকান রাজসভার সাহিত্য, যাহার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন আলাওল। আর দ্বিতীয় ধারাটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রচলিত আরব্য-পারস্য রোমান্স কাহিনীসম্ভারের বঙ্গানুবাদপুষ্ট।

আরাকান রাজসভায় বর্ণিত মুসলমানী গাথা-সাহিত্যে সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এই মুসলমান কবিগোষ্ঠী ভাষারীতি ও উপমা প্রয়োগের দিক্ দিয়া সংস্কৃতানুসারী প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তন করিলেও ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়-কাহিনীর প্রবর্তনে ইহারা নূতন বিষয়বস্তু ও আখ্যানভঙ্গীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বলিতে গেলে প্রণয়-রোমান্সের বর্ণবৈভব ও চমকপ্রদ সংঘটন ইহারাই প্রথম বাংলা কাব্যে আনিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের ধর্মনিয়ন্ত্রিত পরিবার ও সমাজজীবন চিত্রের একঘেয়েমির সঙ্গে তুলনায় এই আখ্যানসমূহে স্বাদের অভিনবত্ব ও ঐহিক জীবনের দৈবপ্রভাবহীন স্বাধীন আবেদন অনুভব করা যায়। ইহারা সমকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; ইহাদের মধ্যে কবিদের ধর্মপ্রধান অলৌকিকতা হইতে রোমান্সসুলভ বিস্ময়রসের দিকে মোড় ফেরার নিদর্শন মিলে। বরং মঙ্গলকাব্যে ঐহিক ও পারলৌকিক জীবন পাশাপাশি

সন্নিবিষ্ট আছে; দেবজগতের প্রবল আকর্ষণে মানবিক জীবন-কথা নিজ স্বাভাবিক কক্ষচ্যুত হইয়া ভিন্ন পথে পরিক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই কক্ষ-পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে মঙ্গল-কাব্যের লৌকিক জীবন যে বাস্তবচিহ্নাঙ্কিত, সমাজের সত্য প্রতিচ্ছবি তাহা নিঃসন্দেহ। মুসলমানী কাব্য-কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আছে সুফী মতবাদের প্রভাব ও ছদ্মবেশী রূপকাভিপ্রায়; ও ইহার ঘটনাবলীও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবিম্ব নহে, জীবনোদ্ভূত এক উচ্চতর আদর্শ-কল্পনার সুকুমারভাবরঞ্জিত ও অসাধারণত্বের স্পর্শদীপ্ত। তথাপি মোগল যুগের রাজসভা-সংশ্লিষ্ট জীবন-যাত্রায় পরিবর্তনের দ্রুত-আবর্তিত ছন্দ, আমীরি ও ফকিরির মধ্যে অস্থিরভাবে আন্দোলিত ভাগ্য-বিপর্যয়, দুঃসাহসিক প্রেরণার স্পর্ধিত আবেগ একটি বাস্তব জীবনসত্যরূপে সক্রিয় ছিল। আলাওল-প্রমুখ কবিরা এই ছন্দটিকে তাঁহাদের কাব্যে বিধৃত করিয়া জীবনের একটা উপেক্ষিত অধ্যায়কে প্রকাশ করিয়াছেন ও উপন্যাসের বস্তুরসপ্রধান অংশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও উহার রোমান্সপ্রবণতার একটি বাস্তব ভিত্তি যোগাইয়াছেন। 'পদ্মাবতী', 'সিকন্দরনামা', 'সপ্তপয়কর' প্রভৃতি কাব্যের সহিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী-কাব্য ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীর একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

আলাওল-প্রমুখ মুসলমান কবির কাব্যের রচনাগত উৎকর্ষ ও আস্বাদন-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইহা সমকালীন কাব্যধারা ও সাহিত্য-রুচির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে কবিতার প্রধান আবেদন ছিল প্রথানুগত্যে ও ধর্মবিশ্বাস-উদ্দীপনে; বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য গৌণভাবে আদরণীয় ছিল। সুতরাং ঐতিহ্যধারার সহিত সংযুক্ত থাকাই কবির পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত। মাল্যগ্রন্থিচ্যুত স্বতন্ত্র ফুলের সৌরভের প্রতি বিশেষ কোন্ মূল্য দেওয়া হইত না। সেইজন্য মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা জনরুচিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই কবিসমাজের বিশেষ কাম্য ছিল। দলছাড়া একক কবি বিশেষ স্বীকৃতি পাইতেন না। আরাকান রাজসভায় রচিত মুসলমানী কাব্যগুচ্ছ সংস্কৃত রচনারীতির ও হিন্দু পুরাণ হইতে সংকলিত উপমা উল্লেখ প্রভৃতির ব্যাপক ও নিপুণ অনুসরণ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত কাব্যধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে সাহিত্যিক প্রভাব ও জনসাধারণের, এমন কি মুসলমান গোষ্ঠীরও রুচি-সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। একেবারে হাল আমলে আমরা এই সাহিত্যকে পুনরাবিষ্কার করিয়া ইহাদের কাব্যোৎকর্ষ ও আবেদনের অভিনবত্ব, বিশেষতঃ ইহাদের অকৃতার্থ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছি।

নাথ-সাহিত্যের আখ্যানভাগের সহিত জীবনের যে বাস্তব রূপ ঔপন্যাসিক উপাদান-রূপে গৃহীত তাহার সম্বন্ধ বিশেষ লক্ষণীয় নহে। 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর ভাববস্তু অতি প্রাচীনকালের—বোধ হয় 'চর্যাপদে'র অব্যবহিত পরেই এই দার্শনিক ধর্মমতের সূচনা। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইহার কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। গ্রীয়ারসন সাহেব রংপুর অঞ্চলের নিরক্ষর কৃষকের মুখ হইতে এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রথম প্রকাশ করেন ও উনবিংশ শতকের শেষ পাদে এতৎবিষয়ক আরও কয়েকজন কবির রচনার উদ্ধার ও প্রকাশ

হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ইহার আখ্যানবস্তুর যে কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই। এই আখ্যায়িকা অভিজাত-সাহিত্যের লিপি-নিরূপিত স্থির রূপ না পাইয়া সমাজের নিম্নবর্ণের অন্তর্গত নাথসম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামবাসীদের মৌখিক আবৃত্তি ও অলিখিত স্মরণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। ইহার মধ্যে একদিকে দুরূহ ধর্মতত্ত্ব ও যোগসাধনার হেঁয়ালিমূলক বর্ণনা, অন্যদিকে আদিম লোক-কল্পনার ও মাত্রাজ্ঞানহীন বীভৎস রসের সীমালঙ্ঘী অতিরঞ্জনপ্রবণতা। এই দুই চাপের মধ্যে পড়িয়া ইহার বাস্তবতা যে অনেক পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। নাথ-সাহিত্যের কাহিনী-অংশ রূপকথাধর্মী হইলেও রূপকথার সরল ঘটনা-প্রবাহ, নাটকীয় পরিণতি ও অতিপ্রাকৃত আবরণের স্বচ্ছ অন্তরালস্থিত লৌকিক জীবনের যথার্থ প্রতিরূপ ইহাতে নাই। তবু সময় সময় ভাব-কুয়াশার অন্তরালে আশ্চর্যরূপ বর্ণোজ্জ্বল জীবনের খণ্ডচিত্র-পরম্পরা ইহার মধ্যে হঠাৎ দীপ্তিতে ঝলকিয়া উঠিয়াছে। রাজারাজড়ার সংসার-বিলাস ও ঐশ্বর্য-সমারোহ অভিজাত সাহিত্যের আলংকারিক অতিরঞ্জন-মুক্ত হইয়া প্রাকৃত কল্পনার সীমাবদ্ধ জীবনবোধের ক্ষুদ্র ও মলিন দর্পণে এক ঘরোয়া ও ঈষৎ উপহাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই মহিমান্বিত দৃশ্যগুলি যেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উল্‌টো দিক্ দিয়া দেখা এক খর্বকায় বামনমূর্তির হাস্যকর ভঙ্গীতে প্রতিভাত হইয়াছে। স্থানে স্থানে অনভিজ্ঞাত উপমা ও গ্রাম্য জীবন-সমালোচনা সাহিত্য-স্তম্ভের নীচে চাপ-পড়া মৃত্তিকা-স্তরটিকে উপভোগ্যরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। মোটের উপর নাথ-সাহিত্যে বাস্তবতার যে বিচ্ছিন্ন উপাদান আবিষ্কার করা যায়, তাহা অতি আধুনিক ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর রচনার—যথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র ক্ষীণ পূর্বাভাসরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে।

পরবর্তী যুগের মুসলমানী-সাহিত্যের গল্পভাণ্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। 'আরব্য উপন্যাস,' 'হাতেমতাই', 'লয়লা-মজনু,' 'চাহার-দরবেশ,' 'গোলে-বকাওলি', প্রভৃতি আখ্যায়িকাগুলি নিশ্চয়ই বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তিতপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগৎ উন্মুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত আখ্যায়িকা যে বঙ্গসাহিত্যের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরবর্তী সাহিত্য সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বৈদেশিক গল্পগুলি রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক বিরোধ ও রুচিগত অনৈক্যের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাঙালী পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। বাঙালী পাঠক সম্ভবতঃ ইহার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য ও অপরিচিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অনেকটা সন্দেহ ও বিরোধের চক্ষে দেখিয়াছিল, ও ইহার সম্মোহন প্রভাব হইতে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। তথাপি ইহার প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকা খুঁজিলে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ও অনুবাদের কল্যাণে বৈদেশিক সাহিত্য-সম্ভার আমাদের সাহিত্য-শালায় জমা হইতেছিল, তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। উহারা কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ বা রুচি আকর্ষণ করিতে না

পারিলে, আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনই উহাদের অনুবাদের প্রতি নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্ততঃ এই সমস্ত গল্পের মধ্যে যে একটা চমকপ্রদ (sensational), বর্ণ-বহুল (romance), একটা নিয়ম-সংযমহীন সৌন্দর্য-বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের একশ্রেণীর পাঠকের ধর্মশাস্ত্রাস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই আকর্ষণ যে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইহাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, ইহাদিগকে নিজের বেশ-বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। বর্তমান উপন্যাসের মধ্যে যে এই ধারা রক্ষিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে ইহার অব্যবহিত-পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ঘটিত ও মুসলমানী মায়া-ইন্দ্রজাল-বেষ্টিত যে একপ্রকারের ছদ্ম-ঐতিহাসিক (pseudo-historical) উপন্যাসের আবির্ভাব হয়, তাহার সহিত বোধ হয় ইহাদের কতকটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে দিল্লী-আগ্রার রাজসভার মণি-মাণিক্য-দীপ্ত ঐশ্বর্য বা মুসলমান রাজা-বাদশাহের খামখেয়ালি অস্থিরমতিত্ব বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্য ও এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা-জগতের প্রেরণা কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। মোটের উপর ইহাই বঙ্গসাহিত্যের উপরে মুসলমানী গল্পের প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন।

ইংরেজী উপন্যাসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইবার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার ধারা কতখানি প্রবাহিত হইয়াছিল, ও উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ ইহাতে কতটা পাওয়া যায়, এ পর্যন্ত তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য হইতে বাস্তব-রস-সিক্ত জীবনের খণ্ডাংশগুলি পৃথক্ করিয়া তাহাদিগকে উপন্যাসের দিকে অগ্রসরণের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে, এ আপত্তি বিশেষ মারাত্মক নহে। ইহা নিশ্চিত যে, ‥সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-আখ্যায়িকা হইতে এই সমস্ত বাস্তবতার চিহ্নাঙ্কিত অংশ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের লেখকদের মধ্যে কাহারও উপন্যাস লিখিবার কল্পনা ছিল না, বা উপন্যাস বলিয়া যে সাহিত্যের একটা দিক্ আছে, তাহারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন। তথাপি এই বাস্তব অংশগুলিকে উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এই সর্বদেশসাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার চরিত্রস্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে। সুতরাং যেখানেই গল্পের মধ্য দিয়া—তা সে গল্প যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হউক না কেন—বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সাধারণ রক্তমাংসের নরনারীর চিত্র অস্পষ্ট ছায়া-রেখাতেও চারিদিকের কুহেলিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই উপন্যাসের মৌলিক বীজের দর্শন লাভ হইয়াছে বুঝিতে

হইবে। সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের ইহাই সাধারণ নিয়ম। বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় ধর্ম-প্রধান বাস্তবতাবিমুখ, পরমার্থপর সাহিত্যে, যেখানে সমগ্র পার্থিব ব্যাপারকে মরীচিকার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, যেখানে উচ্চতর ধর্মের নামে আমাদের প্রকৃত জীবনের ভাষার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে, সেখানে এই সমস্ত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বাস্তব-চিত্রেরও মূল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও বেশি। অন্ততঃ এইগুলিই আমাদের উপন্যাস-রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন; বাস্তবতার দিকে এইটুকু প্রবণতা লইয়া আমরা ইংরেজী উপন্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই আয়োজনের পর্যাপ্ততার উপরেই আমাদের নিজের উপন্যাস-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধার-করা উপন্যাস-সাহিত্য আমরা কতদূর আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছি, কতদূর ঘনিষ্ঠভাবে ইহাকে আমাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলের সহিত যোগ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাস

(১)

ইংরেজী উপন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পূর্বে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল ও উপন্যাসের আগমনের জন্য আপনাকে কতখানি প্রস্তুত করিয়াছিল, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ইংরেজী উপন্যাসের সহিত পরিচয়ের ফলে বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের কিরূপে আবির্ভাব হইল ও তৎকালীন সমাজের পরিস্থিতি কিরূপ ছিল, তাহার কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানুরাগের বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত স্ফুরণকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্র-সংহত রূপ দিল। কিন্তু তাহারও পূর্বে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙালী-সমাজে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন চলিতেছিল। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তনের সূচনা করিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বাঙালী কেবল ইংরেজদিগের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের বাহন মাত্র নহে—তাহাদের শিক্ষাসংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও মূঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মনোভাব অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নিরূপিত হইল।

এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়—তথ্যবিচার সাহিত্যপদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শানিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকস্পৃষ্ট বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু-প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া উঠে—এই নব-জাগ্রত দেবতার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক

পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কন উপন্যাসরচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।

(২)

এই সময়ে (১৮১৮) সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা কিছুদিন ধরিয়া মনোমধ্যে সঞ্চিত শ্লেষ-প্রবণতাকে অভিব্যক্তির ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইল। সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের মধ্যে যাহা কিছু বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন। নানারকমের উড়ো পাখী—আজগুবি খবর, অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনা, যাহা মনকে নাড়া দেয় ও হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করে—এই সাংবাদিক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাসা বাঁধে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যার লঘু, সরস আলোচনা, নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের কুৎসা-রটনা ও তাহার দুর্নীতির নানা মুখরোচক উদাহরণ ইহাকে বাস্তব জীবনের সত্য ও উপভোগ্য প্রতিচ্ছবির মর্যাদা দেয়। সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ, অন্তঃসংগতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাস-সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। শ্রেণীবিশেষের জীবনের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলি কিরূপে কাল্পনিক চরিত্রের সমগ্রতায় পরিণত হইল, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ খৃঃ অঃ 'সমাচারদর্পণ'-এ "বাবু"-চরিত্র-আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটি সংখ্যায়—২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৯ই জুন—১৮২১—বড়লোকের আদুরে-গোপাল, শিক্ষাচরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই তিলকচন্দ্র উপন্যাস-জগতের প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত বাবু-বংশের আদিপুরুষ। ইনি মোসাহেবমণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও আত্মাভিমানপুষ্ট হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া, নানা হাস্যকর অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও লেখকের বিদ্রূপ-বাণবিদ্ধ হইয়া পাঠকের শিক্ষাবিধান ও মনোরঞ্জনের দ্বৈত-উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় হইয়াছেন। এই আদি 'বাবু'র চরিত্রে দুঃশীলতা ও ব্যসন-বিলাস অপেক্ষা মোসাহেব-মহলে প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৩)

ইহার পর দুই বৎসর পরে (১৮২৩ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার রচিত 'নববাবু-বিলাস' প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবি করে। প্রমথনাথ শর্মা "সমাচার-চন্দ্রিকা" ও "সংবাদ-কৌমুদী" পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের মুখপাত্র, ধর্মসভার কার্যাধ্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। সম্ভবতঃ ইনিই 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত তিলকচন্দ্রের জীবনকাহিনীর সংকলয়িতা। এই অনুমান সত্য হইলে 'নববাবু-বিলাস' 'সমাচার-দর্পণ'-এর "বাবু" কাহিনীর পরিবর্তিত সংস্করণ—প্রথম মৌলিক পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত পল্লবিত বিস্তার। ইহাতে বাবু-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব,

সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রস্ফুরণ নহে, সমস্ত সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। বাবু অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশি।

'নববাবু-বিলাস'—গদ্যে পদ্যে, ছড়ায়-অনুপ্রাসে, সংস্কৃত গুরুগম্ভীর শব্দসমাবেশের ব্যঙ্গানুকৃতিতে ও চটুল কথ্যরীতিতে, নানাভঙ্গীর সংমিশ্রণজাত বর্ণসঙ্কর ভাষাবিন্যাসের মাধ্যমে ও কৌতুকোচ্ছল, ব্যঙ্গসরস মেজাজে লিখিত। সদ্যোজাত গদ্যশিশু যেন খেয়াল-খুশীমত আবার পদ্যের তরলতা ও মৃদু সুরসংগতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে অতিমাত্রায় উন্মুখ। শিশুটি যেন ক্রীড়াকৌতুকের আবেশে রং-এর ও কর্দমে মিশাইয়া এই মিশ্রিত পদার্থটি ক্ষেপণাস্ত্র-রূপে প্রয়োগ করিতে একেবারে মশগুল হইয়াছে। মোটকথা, উপন্যাসোচিত স্থির দৃষ্টিভঙ্গী ও যৌবনোচিত পরিণত প্রকাশরীতি এখনও অনায়ত্ত রহিয়াছে। জীবনবৃত্তের একটি অতিক্ষুদ্র খণ্ডাংশকে, ক্ষণিক বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম উৎক্ষেপকে জীবনের নিগূঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলিত সামগ্রিকতার সহিত সমার্থকরূপে দেখান হইয়াছে—বহির্বিক্ষোভ মথিত উদ্‌ভ্রান্তিকে অন্তরের সত্য পরিচয়ের বিকল্পরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

নববাবুর পূর্বপুরুষের ধনার্জন-রহস্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার, পণ্ডিত-মুন্সী—ইংরেজী শিক্ষকের শিক্ষাদানপ্রণালীর বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর অমাত্যবর্গের স্তাবকতার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাবুর বিষয়কর্মে হাতে-খড়ির কথাও লেখক আমাদের সবিস্তারে শোনাইয়াছেন। তাহার পর খলিপা তাহাকে বাবুগিরির জীবনতত্ত্ব ও সাধনামার্গে দীক্ষিত করিয়াছে। এই দীক্ষার ফল অচিরেই ফলিয়াছে—নববাবু সমস্ত ধনসম্পদ হারাইয়া ফতুর হইয়াছে। তাহার স্ত্রীও তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। কারাবাস, সম্ভ্রমহানি, কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ততা ও নিষ্ফল খেদে বাবুর জীবন চরম পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাবু একেবারে ব্যক্তিত্বহীন, সে কেবল পরবুদ্ধি-চালিত পুত্তলিকামাত্র, বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান তৃণগুচ্ছের ন্যায় অসহায়ভাবে তরঙ্গতাড়িত। কখন কোন উপলক্ষ্যেই সে নিজ স্বাধীন ইচ্ছার পরিচয় দেয় নাই। তাহার জীবন সর্বতোভাবে পরপ্রভাবগঠিত ও পরমুখাপেক্ষী। তাহার পিতার জীবদ্দশাতেই সে সমস্ত বদখেয়ালির নিরঙ্কুশ চর্চা করিয়াছে। তাহার জীবনে পারিবারিক প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তাহার স্ত্রীও তাহাকে সংশোধন করিবার কোন চেষ্টা করে নাই—তাহার সংসারানভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া নিজ দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর নায়ক মতিলালের সহিত তুলনায় সে একেবারে নিষ্প্রাণ, পারিবারিক-সংযোগসূত্র-বিচ্ছিন্ন ও ইচ্ছা-শক্তিহীন। তাহার ব্যক্তিসত্তা নাই; সে কেবল প্রতিবেশ-বিক্ষিপ্ত ব্যসনাসক্তির একটা কেন্দ্র-সংহত বিন্দুমাত্র, সমাজদেহে ছড়ান বিষের ঘনীভূত বিস্ফোটক। সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণার পরিবর্তে সহানুভূতিই জাগে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মতিলালের সংশোধন হইয়াছিল, একতাল অক্ষম মাংসপিণ্ডরূপ নববাবুর অনুতাপও শিরাস্নায়ুগত দৈহিক আক্ষেপের ঊর্ধ্বে উঠে নাই। বইটির প্রকৃত নায়ক ও গতিনিয়ামক খলিপা ঠক চাচার অগ্রদূত। অবশ্য ঠকের চক্রান্ত-

কুশল শঠতা উহার নাই; সে মতগববাজ নহে, তাহার মুরুব্বিকে সরল ও খোলাখুলি-ভাবে উপদেশ দিয়াছে। সে চার্বাক-নীতির অবিমিশ্র সাধক, উহার সহিত চাণক্য-নীতির কোন উপাদান মেশায় নাই। কাজেই তাহার প্রতিও আমাদের অনুযোগের বিশেষ কারণ নাই। 'নববাবু-বিলাস'এ তত্ত্ব প্রধান, মানুষ গৌণ; 'আলাল'-এ মানবিকতা রক্ত-মাংস-সংযোগে আর একটু সুপরিস্ফুট।

এই সময়ের কলিকাতা-সমাজে যে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তাহা মনে হয় না। যে 'বাবু' এই সমাজের বিশিষ্ট সৃষ্টি, তিনি ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ ধার ধারেন না। 'নববাবু-বিলাসে'র ৩৫ বৎসর পরে রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর (১৮৫৮) নায়ক মতিলাল শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কয়েকটা ইংরেজী শব্দ ও কিছু ইংরেজী হাব-ভাব ও চাল-চলন শিক্ষা ব্যতীত তাহার বিদ্যা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। এই দিক্ দিয়া ইহাদের সহিত পরবর্তী যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের সত্যকার অনুরাগী, সমাজবিদ্রোহী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজ মতবাদের জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত, দৃঢ়চেতা যুবকসম্প্রদায়ের প্রভেদ। মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বুলি, তাহাদের বিলাতী খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা —কিন্তু মানস আদর্শের দিক দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

আসল কথা, বাবু-সমাজের অমিতাচারের জন্য দায়ী ইংরেজী শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নহে, ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রথম সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙালী বেনিয়ান এদেশে ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহংকারে স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক-প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নূতন অভিজাত-সম্প্রদায় গঠন করিতেছিল। কেহ দালালি করিয়া, কেহ নিমক-মহালের ইজারা লইয়া, কেহ বা ইংরাজের রাজস্ব-সংগ্রহ-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন, তাহার দুই একটা পাপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিল। এই সময়ে কলিকাতার বনিয়াদি পরিবারবর্গের অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইল। মহানগরী সমুদ্র-গর্ভোত্থিতা ঐশ্বর্যদেবীর ন্যায় আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে নিজ সমৃদ্ধির দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল। সমস্ত শহরের আকাশে-বাতাসে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসন—ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রহসনের নানা উদ্ভাবনে, চড়কের গাজনে, বারোয়ারী উৎসবে, কবির লড়াই-এ, সুরা-সংগীতের উন্মত্ত ভোগলিপ্সায়—বিজয়-অভিযানে নির্গত হইল। অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীসমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উচ্ছলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংঘের সম্মিলিত হৃৎস্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নব যৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্ততায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আশা ও সীমাহীন সম্ভাবনার পুলকোৎফুল্ল প্রতিবেশে বাবুর উদ্ভব। সে যেন জীবনোৎসবের এই

ফেনিল, মত্ত বিক্ষোভের প্রথম স্বল্পায়ু রঙ্গীন বুদ্‌বুদ্। আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই উদ্দাম, অসংস্কৃত জীবন-প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উগ্র উন্মাদনা, বিদ্রোহী নীতিবোধ ও নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতি যুক্ত হইয়া এক উচ্চতর সৃষ্টির বীজ বপন করিবে—বাবুর স্থূল ভোগবিলাস কবি ও সমাজ-সংস্কারকের সূক্ষ্মতর জীবনরসোপভোগে পরিবর্তিত হইবে। 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাচার নক্সা' (১৮৬২)—এই তিনখানি উপন্যাসে বাবু-চরিত্র ও বাবু-প্রসূতি সমাজ-জীবন আলোচিত হইয়াছে। 'নববাবু-বিলাসে'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'হুতোমপ্যাচার নক্সা' ঠিক উপন্যাস নহে—নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্যের নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবনযাত্রায় যে সমস্ত উদ্ভট অসংগতি ও রুচিবিকারের দৃষ্টান্ত, ফূর্তি-ইয়ার্কির নূতন নূতন প্রকরণ, উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র-শ্লেষপূর্ণ কশাঘাত করিয়া নিজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগচঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত চরিত্র সৃষ্টি হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।

সম্প্রতি পুনরাবিষ্কৃত, ১৮৫২ খৃঃ অঃ শ্রীমতী হানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স কর্তৃক রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামক গ্রন্থটি, কালের দিক্ দিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর অগ্রবর্তী। এই কালগত অগ্রাধিকারের বলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব ইহারই প্রাপ্য হইতেছে। এই উপন্যাসে শ্রীমতী ম্যালেন্স কয়েকটি খৃষ্টানধর্মান্তরিত বাঙালী পরিবারের জীবনযাত্রার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কেরীর 'কথোপকথন' ও বাইবেলের অনুবাদের যুগ্ম আদর্শে পরিকল্পিত। ইহাতে দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকের কথ্যরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থের উৎকট বৈদেশিকপন্থী বাগ্‌ধারার প্রচুর সংমিশ্রণ দেখা যায়। লেখিকা বাঙালী সমাজের আচরণ, সংসারযাত্রার সাধারণ ছন্দ ও সংলাপরীতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অর্জন করিয়াছিলেন ও বাংলা ভাষার উপর তাঁহার অধিকার সীমাবদ্ধ হইলেও প্রশংসনীয়। ইহার আখ্যানসূত্রের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নাই; কয়েকটি পরিবারের সংসার-জীবনের কিছু খণ্ডাংশের ইহা একটা যদৃচ্ছগ্রথিত সমষ্টি মাত্র। ঘটনাপ্রবাহের কোন সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্যস্ত পরিণতিরও বিশেষ চিহ্ন ইহাতে পাওয়া যায় না। লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য-ধর্মাবলম্বী লোকদের মনে এই ধর্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপন। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে মানুষের নৈতিক উন্নতি ও সদাচার-নিয়ন্ত্রিত, প্রলোভনজয়ী জীবনযাত্রা-নির্বাহের রুচিকর চিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহার প্রধান কাম্য।

ফুলমণি ও করুণার গার্হস্থ্য জীবনের বিপরীতমুখী চিত্র অঙ্কনের দ্বারাই তিনি তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ফুলমণি মনে-প্রাণে খৃষ্টধর্মানুরাগী; তাহার গার্হস্থ্য জীবনও সেইজন্য সুশৃঙ্খল ও নীতিনিষ্ঠ। তাহার স্বামী ও ছেলেমেয়েরাও অনিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ, সহৃদয় ও একই আদর্শের

অনুগামী। পক্ষান্তরে করুণা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেও উহাতে আন্তরিক-আস্থাহীনা। তাহার সংসারজীবন সেইজন্য দারিদ্র্যক্লিষ্ট, শোভন-আচারহীন ও বিরোধ-কণ্টকিত। তাহার স্বামী অন্যাসক্ত, মাতাল ও দায়িত্বহীন; তাহার দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে চোর, আর একজন কুপথগামী হইতে হইতে সৎসংসর্গের প্রভাবে পাপের কবলমুক্ত। করুণা নিজে অলস, আত্ম-সম্মানহীন, ইতরকলহপরায়ণ। শেষ পর্যন্ত লেখিকার আন্তরিক চেষ্টায়, খৃষ্টধর্মের জীবননীতির পৌনঃপুনিক প্রচারে ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোচনীয় অপমৃত্যুতে তাহার মনে যে আত্মগ্লানির আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার দ্রবীকরণশক্তির ফলে তাহার চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে। তাহার দাম্পত্য জীবনের বিচলিত ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা খৃষ্টধর্মেরই জয়-ঘোষণা। আবার মধু ও প্যারীর মৃত্যুদৃশ্যের বৈপরীত্য ঐ একই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হইয়াছে। ধর্ম ও নীতিভ্রষ্ট মধুর অন্তিমশয্যা অনুতাপকণ্টকিত; আর খৃষ্টে দৃঢ়বিশ্বাসী প্যারীর মরণ শান্তিপূর্ণ ও ভগবানের নিশ্চিন্ত করুণার স্থির আশ্বাসে আনন্দ-সমুজ্জ্বল। সুন্দরী ও রাণীর বিবাহ-ব্যাপারেও খৃষ্টধর্মের আদর্শের নৈতিক সমুন্নতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থটির প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, ইহা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খিড়কি দরজা দিয়া উপন্যাসের উচ্চমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, জীবনের সুমিত নীতিনিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তির উন্মূলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী। বিদেশিনী লেখিকা সমকালীন সমাজচিত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপাদান আবিষ্কার করিতে পারিবেন না ইহা স্বাভাবিক। এক খৃষ্টধর্মের মহৌষধে সমস্ত ভবরোগ আরোগ্য হইবে, সমস্ত সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচার ও পারিবারিক মনোমালিন্য দূরীভূত হইবে ইহা যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনি নিজ মানসিক গঠন ও রুচির দিক্ দিয়াই তির্যক কটাক্ষের ও লৌকিক নিন্দার পথ পরিহার করিবেন। জীবনের সহজ রূপই ঔপন্যাসিক-তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া তাঁহার চোখে প্রতিভাত হইয়াছিল—ইহা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রশংসার চরম প্রাপ্য। তিনি জীবনের সত্যরূপ দেখেন নাই, ধর্মান্ধতার ঠুলি পরিয়া জীবনের ঝাপ্‌সা রূপকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচিত্র সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট-উদ্দেশ্যপরতন্ত্র। তিনি কয়েকটি খৃষ্টান পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা লইয়া ব্যাপৃত; তাহাদের প্রতিবেশী বিরাট হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাঁহার মনোযোগের কণামাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যেখানে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসক্ষুব্ধ মহানদী তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত, সেখানে তিনি উহার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডে নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই খৃষ্টান সমাজ নিতান্ত প্রাণহীন, ধর্মের চাপে অভিভূত, বাইবেলের পাতা উল্টাইয়া ও উক্তি আওড়াইয়া জীবনের দুরন্ত আবেগকে শৃঙ্খলিত করে। ইহাদের জীবন-কাহিনী-আলোচনায় খৃষ্টধর্মের মহিমা ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু উহার নিজস্ব গতিবেগ ও নিগূঢ় তাৎপর্য কিছুই নাই।

তাঁহার চরিত্রাবলীও নিতান্ত নির্জীব ও নিষ্প্রভ। ফুলমণি ও উহার পরিবার যেন বাইবেলের ধর্মনির্দেশের গার্হস্থ্য সংস্করণ—উহাদের সমস্ত জীবন-সমস্যা ধর্মগ্রন্থের পাতার মধ্যে নিঃশেষ সমাধান লাভ করিয়াছে। বরং করুণার চরিত্রে কিছুটা অনুতাপের দুঃখ, কিছুটা

অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া, কিছুটা আত্মসংযমের প্রয়াস তাহাকে প্রাণস্পন্দিত করিয়াছে। তাহার স্বামীর দুঃশীলতা পোষমানা সর্পের মত বাইবেলের মন্ত্রের নিকট ফণা নত করিয়াছে ও এই মন্ত্র তাহার পারিবারিক সমস্যার একটা সহজ মুক্তিপথ নির্দেশ করিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রও নিতান্ত বাধ্যভাবে এই ধর্মপ্রধান নাটকে নিজ নিজ পূর্বনির্দিষ্ট অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে। খৃষ্টধর্ম-আন্দোলন বাংলার সমাজ-জীবনে ক্ষণিক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমতী ম্যালেন্সের কাহিনীটি বাংলা উপন্যাসের মূল বিবর্তন-ধারার সহিত নিঃসম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। ইহার মূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে, প্রাণরসোচ্ছল জীবনকথারূপে নহে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ যে আবিল অসংস্কৃত প্রাণপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার গৌণচরিত্রগুলিও অভিষিক্ত। সুতরাং উপন্যাসের আদি সূচনা 'করুণা ও ফুলমণি'তে* হইলেও, উহার সার্থক পরিণতি-সম্ভাবনাময় আরম্ভ 'আলাল'-এ।

(৪)

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ-বিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবু-বিলাস' ও 'হুতোম'-এর সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে কেবল হাল্‌কা স্ফূর্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয়—বর্ণিত হইয়াছে। 'আলাল'-এর প্রতিবেশ আরও পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব্ চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজশাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিচ্ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান খড়কুটামাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যে নদীতরঙ্গ-প্রহৃত পর্বতের ন্যায় কম্পিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না—ইহাতে চরিত্র-চিত্রণের এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। বাবুরাম বাবু নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয়, মতিলাল ও তাহার দুষ্ক্রিয়ার সহযোগিবৃন্দ—ইহারা সকলেই ঘটনা-তরঙ্গে গা ভাসাইলেও এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা মাত্র নহে—ইহারা জীবন্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, 'বাবু'র ন্যায় চর্মের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা কঙ্কাল, বা শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র নহে। তাছাড়া, লেখকের পরিকল্পনায় এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে, যাহাতে ঘটনার সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠকচাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; উহার মধ্যে কূটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রেও—কেহ বা অনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সংগীতপ্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্য-ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে—স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন-

* ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৫৯।

ব্যঙ্গচিত্রায় (caricature) প্যারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক্ দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ববর্জিত, কতকগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। কৃত্রিম সাহিত্যরীতি-বর্জনে ও কথ্য-ভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলাল'-এর বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কন আরও বাস্তবরস-সমৃদ্ধ হইয়াছে।

'আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। প্যারীচাঁদের অন্যান্য পুস্তকগুলি—'মদ খাওয়া বড় দায়', 'অভেদী,' 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি—অল্পবিস্তর উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত; তাহারা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, কেবল উপন্যাসের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছদের সমষ্টি মাত্র।

(১) প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) উদ্ভট-কল্পনা-মিশ্র ব্যঙ্গ-নক্‌সার পর্যায়ভুক্ত। চরিত্র-চিত্রণের লক্ষ্য-স্থিরতা এখানে কৌতুকরসের খণ্ডচিত্রের সুলভ আকর্ষণে বিচলিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে মদ্যপানের ক্রমপ্রসার, ভণ্ড, গোপনে অনাচারী রক্ষণশীল সমাজের দ্বারা হিন্দুধর্মরক্ষার ব্যপদেশে ছোটখাট সমাজবিধি-উল্লঙ্ঘনের প্রতি কঠোর শাস্তি-বিধান, সমাজ-শৃঙ্খলারক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ের সরস ও সময় সময় রূপকের আবরণে সঙ্কেতিত ব্যঙ্গচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই জাতীয় ভণ্ড ধর্মবাদীদের তিনি বেশ একটি কৌতুককর নামকরণ করিয়াছেন—'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার'।

প্যারীচাঁদ একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন, অপরদিকে আবার বিধবাবিবাহ-প্রথাকে সেইরূপ ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই দ্বৈতনীতি সম্ভবতঃ মধুসূদনের প্রায় সমকালে লিখিত প্রহসন দুইটির বিপরীতমুখী সমাজ-চেতনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আগড়ভম সেনের কৌতুকাবহ চরিত্র-চিত্রণই উহার ঔপন্যাসিক ধর্মের প্রধান ও একমাত্র নিদর্শন। সে পক্ষিনামধারী উৎকট নেশাখোরদলের দলপতিরূপে 'পক্ষিরাজ' অভিধায় পরিচিত। তাহাদের নেশার ও নেশার ঝোঁকে উদ্‌ভ্রান্ত স্ফূর্তি-আমোদ ও সঙ্গীত-চর্চার উপভোগ্য ব্যঙ্গচিত্র দেওয়া হইয়াছে। পক্ষিরাজ বিধবাবিবাহের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে, কিন্তু তাহার আশার মূলে ছাই পড়িয়াছে। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় প্যারীচাঁদ ত্রৈলোক্যনাথের পূর্বসূরিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

প্যারীচাঁদের 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) নূতন ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যাসদ্বয়ে লেখকের মনে যে অধ্যাত্ম চিন্তা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছিল, ঔপন্যাসিক ঘটনা-বিবৃতি ও চরিত্রসৃষ্টির বহিরবয়বের মধ্য দিয়া তাহারই প্রতিপাদন ও প্রকাশ হইয়াছে। 'অভেদী'-র অন্বেষণচন্দ্র ও পতিভাবিনী আদর্শ দম্পতি—তাহাদের রূপকাভিধানেই তাহাদের স্বরূপ-তাৎপর্য ব্যঞ্জিত। দীর্ঘবিচ্ছেদের ব্যবধানে সাধনার উচ্চস্তরে আরূঢ় হইবার পর তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে—এ মিলন সম্পূর্ণ দেহাতিসারী ও আধ্যাত্মিক। সরোবরে স্নানরতা, সম্পূর্ণ বস্ত্রহীনা যোগিনীদের দর্শনেও অন্বেষণচন্দ্রের মনে কোন বিকার হয় না। অধ্যাত্ম সাধনার সূক্ষ্ম ও অভ্রস্পর্শী বায়ুস্তরে বিচরণশীল

এই উপন্যাসে বোধ হয় বৈপরীত্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই জেঁকোবাবু, লালবুঝকড় প্রভৃতি কয়েকটি কৌতুকরসাত্তিবিক্ত মর্ত্যচারী চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় প্রকার ভাবস্তরের মধ্যে সঙ্গতি-বিধানের কোন চেষ্টা নাই। ব্রাহ্মসমাজের সমকালীন ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল, উপন্যাসে তাহার একটু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। নব্যদলের আতিশয্যের সহিত তুলনায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সংযত ও প্রাচীন-আদর্শানুযায়ী আচরণের প্রতিই প্যারীচাঁদের সহানুভূতি।

'আধ্যাত্মিকা'য় অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রায় একাধিপত্য ও বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে লৌকিক জীবনের চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায়। যে স্বল্পসংখ্যক পার্শ্বচরিত্র বাস্তবজীবনের প্রতিনিধিরূপে এই উপন্যাসে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদের সহিত উহার মুখ্য ঘটনা আবেদনের যোগ-সূত্র অতি ক্ষীণ। নায়িকা আধ্যাত্মিকা শৈশব হইতেই সংসারবিমুখা ও অধ্যাত্মসাধনারতা তাহাকে অবিবাহিতা রাখিয়া তাহার পিতার মৃত্যু তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উদ্বিগ্ন করিতে পারে নাই। তাহার পাণিগ্রহণ-প্রয়াসী যুবক তাহার অধ্যাত্মভাবাবিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে। আধ্যাত্মিকার লৌকিক বা সাংসারিক জীবন তাহার নিকট একেবারে মূল্যহীন এবং লেখক ইহার যে সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাহার সংসার-নিস্পৃহতা ও আদর্শনিষ্ঠার নিদর্শন-স্বরূপ।

প্যারীচাঁদের রূপক বা আধ্যাত্মিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয়—কোন পরবর্তী ঔপন্যাসিক তাঁহার ধারার অনুবর্তন করেন নাই। তাঁহার মনোভাব যুগোচিত প্রগতিশীলতা ও সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিনিষ্ঠতার এক আশ্চর্য সমন্বয়। তিনি আত্মার অমরতা ও পরলোকে পতি-পত্নীর মিলনে স্থির বিশ্বাস পোষণ করিতেন—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতিও সশ্রদ্ধ আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেন। প্রথমযুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি ভাববৈচিত্র্য ও জীবনবোধের নানামুখীনতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেন।

প্যারীচাঁদের এই তত্ত্বপ্রবণতা সত্ত্বেও তাঁহার ভাল-মন্দ সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার সুরটি এতই তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা এতই বেশি যে, তাহারা এই হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতই অতুলনীয়। দীনবন্ধু মিত্রের দুই একটি নাটক ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে আর কাহারও রচনায় বাস্তব জীবনের খাঁটি অবিমিশ্র রসটি এত সুপ্রচুর ও অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় নাই। প্যারীচাঁদের রচনায় এই বাস্তবরস রোমান্সে রূপান্তরিত হয় নাই, উচ্চ আদর্শের (idealisation) কৃত্রিম প্রণালীতে সঞ্চারিত হইয়া ইহার স্রোতোবেগ মন্দীভূত হয় নাই, বিশ্লেষণের দ্বারা ইহা ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হয় নাই। ইহা আপনার আদিম ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে শতসহস্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, আপনাকে শোধিত, সংস্কৃত ও উচ্চতর আর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। অবশ্য ইহা যে একটি অবিমিশ্র গুণ তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এই বাস্তব-প্রবণতা বঙ্গসাহিত্যে এতই দুর্লভ সামগ্রী যে, ইহা স্বতঃই আমাদের বিস্ময় ও প্রশংসা আকর্ষণ করে।

নূতন ও পুরাতনের যে বিরোধের চিত্র সমসাময়িক উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই বিরোধের আলোচনায় প্যারীচাঁদ মিত্র আশ্চর্য অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি দেখাইয়াছেন। নব্যযুগের নূতন সভ্যতার প্রতি তিনি যথেষ্ট সুবিচার করিয়াছেন; তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকের ন্যায় ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ ও সন্দেহের চক্ষে দেখেন নাই। সেইরূপ পুরাতন প্রথা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু শোভন, সুযুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয় তাহাকেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিতই বরণ করিয়া লইয়াছেন। আবার ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বন্যায় মদ্যপান, নাস্তিকতা, গুরুজনে অভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত আবর্জনারাশি ও পঙ্কিলতা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের উপরেও তিনি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি খড়গহস্ত ছিলেন পুরাতন দলের ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতার উপর—ইহাদিগকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অমার্জনীয় অপরাধ মনে করিতেন, এবং ইহাদেরই উপর তাঁহাব তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির সনাতন নীতিজ্ঞান তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট প্রবল ছিল, এবং সময়ে সময়ে তাহা একটু অশোভন তীব্রতার সহিতই আত্মপ্রকাশ কবিত। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' ও অন্যান্য খণ্ড-উপন্যাসে এই নীতিজ্ঞান, এই ধর্ম ও সুরুচির পক্ষপাতিত্ব, কলা-কুশলতার দিক হইতে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, ধর্মভাবের দিক্ হইতে বিশেষ প্রশংস-নীয়। অবশ্য এই নীতিজ্ঞানপূর্ণ মন্তব্যসমূহ যে উপন্যাসের উৎকর্ষ বর্ধন করে তাহা নহে, তবে তাহারা লেখকের ধর্মপ্রবণ ও তত্ত্বান্বেষী চিত্তের একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান করে।

সুতরাং 'আলালেব ঘরের দুলাল'-এ আমরা লেখকের মননশীলতার পরিচয় পাই—ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাত মনোভাবে, ইহার কুফলের প্রতি অন্ধ না হইয়া ইহার সুফলের প্রতি সচেতনতায়, লেখকের সমন্বয়কারী, চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে। রামলাল ও বরদাবাবু এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির শ্লাঘ্যতম ফল; তাহাদের উদার ক্ষমাশীলতা পরদুঃখকাতরতা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ অবশ্য সনাতন ধর্মসংস্কৃতির বিরোধী নহে; তথাপি এই সমস্ত সদ্‌গুণ ও সুকুমার বৃত্তি, যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজে শিথিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচুরতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হইতেছিল, তাহার সহিতই প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

এতদ্‌ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্র ভাষা-সংস্কারের মধ্য দিয়াও নিজ তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও স্বাধীনচিত্ততাব পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতবহুল গুরু-গম্ভীর ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরল ও সতেজ কথ্যভাষা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁহারই। উপন্যাস-রচনার জন্য যতটা না হউক, ভাষা-সংস্কার-প্রচেষ্টার জন্যই বিশেষ-ভাবে তিনি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তা অর্জন করিয়াছেন। বিষয়ের উপযোগিতা অনুসারে এই কথ্যভাষায় মাত্রাভেদ ও তারতম্য নির্ধারণ করিবার মত সচেতন মন তাঁহার ছিল।

উপন্যাস-হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে ইহার ত্রুটি ও অপূর্ণতার কতকটা আভাস দেওয়ার প্রয়োজন। 'আলালের ঘবের দুলাল' প্রথম পূর্ণাবয়ব উপন্যাস এবং বাস্তবরসে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে খুব উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় না। কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কন, বা জীবন-পর্য-

বেক্ষণই উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন তাহাদের কার্যকারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণা পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, মানব-হৃদয়ের গভীর সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বাহ্যঘটনার উপরেও একটা অচিন্তিত-পূর্ব গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিতে পারে। উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের ইহাই কৃতিত্ব। যে উপন্যাস কেবল বাস্তববর্ণনাতেই পর্যবসিত, যাহা দৈনিক তুচ্ছতার উপর কল্পলোকের রঙিন আলোক ফেলিতে পারে না, যাহা আমাদের সাধারণ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঐশ্বর্যপূর্ণ অনুভূতির নিগূঢ় লীলা দেখাইতে পারে না, তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। এই কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সহিত একাসনে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। আরও একটি কারণ ইহার উৎকর্ষের বিরোধী। প্রত্যেক উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসে motive অথবা উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার মৌলিক কারণটি সূক্ষ্ম ও গভীর হওয়া চাই; কেবল বাহ্যঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস সৃষ্ট হইতে পারে না। যে কারণে Goldsmith-এর 'Vicar of Wakefield' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—কেন না ইহা একটি অচল, অটল ধর্মপরায়ণতার প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে বাহ্য বিপদ্‌রাশির নিষ্ফল আক্রমণ মাত্র—সে কারণেই 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-জগতে খুব উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে না। ইহাতে যে সংঘাতটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের জিনিস—অন্তর্জগতের গভীরতর সংঘাতের কোন চিহ্ন ইহাতে পাওয়া যায় না। কুসঙ্গের জন্য আদুরে ছেলের পদস্খলন, এবং বিপদের ও সৎসঙ্গের ফলে তাহার নৈতিক পুনরুদ্ধার ইহার বর্ণনীয় বস্তু, ইহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন পরিচয় দিবার সুযোগ নাই। মতিলালের অনুশোচনা ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নহে। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' বা 'গোবিন্দলাল'-এর চরিত্রে যে অন্তর্বিপ্লবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এখানে তাহার আভাস মাত্র নাই। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক মাত্র, ইহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইবার স্পর্ধা রাখে না। পরবর্তী যুগের উচ্চতর উপন্যাসের সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর। তথাপি, অতীতের সহিত তুলনায় ইহার উৎকর্ষ সহজেই বোধগম্য হয়। 'নববাবু-বিলাস' হইতে মাত্র ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের বিবর্তন বহুদিনের প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে সার্থক রূপ দিয়াছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণপরিণতির ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে উপন্যাসের মহিমান্বিত, প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের আরম্ভ।

(৫)

'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবের যে স্তর চিত্রিত হইয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে উনবিংশের প্রথম পাদ (১৭৭৫-১৮২৫)—এই অর্ধ-শতাব্দীর সত্য প্রতিচ্ছবি। প্যারীচাঁদ মিত্রের নিজের যুগে এই প্রভাব সমাজ-জীবনে আরও ব্যাপক, বদ্ধমূল ও সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে পাশ্চাত্য ভাবধারার নিগূঢ় উন্মাদনা সমাজের মর্মস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া

ইহার গভীরতর রূপান্তর-সাধনে ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তী যুগের উপন্যাসে সমাজের এই নব-জীবনস্পন্দন, এই নবীন আদর্শের অনুপ্রেরণা সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্‌বোধন করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য ও উপন্যাসের সহিত যখন আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন আমাদের মধ্যে স্বভাবতঃই অনুকরণস্পৃহা প্রবল হইল ও আমাদের নিজের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে উপন্যাসের উপযোগী উপাদান আমরা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা আমাদের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করিল, তাহা ইংরেজী সভ্যতার সহিত সংস্পর্শ-জনিত আমাদের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনই আমাদের নব-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজী সভ্যতার তীব্র মদিরা তখন নব্য-বঙ্গ-সমাজে একটা উৎকট উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে; বাঙালী যেন দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও অবসাদের পর একটা নূতন জীবনস্পন্দন অনুভব করিয়াছে, ও একটা নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। সনাতন বন্ধনসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; পুরাতন নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলি তাহাদের পূর্বপ্রভাব হারাইয়াছে। পরিবারে পরিবারে একদিকে বিদ্রোহের উৎকট অভিব্যক্তি, অন্যদিকে গুরুজন-অভিভাবকদের মধ্যে একটা বিস্ময়বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ভাব; যেন পুরাণধর্মশাস্ত্রবর্ণিত, অনাচারময় ম্লেচ্ছযুগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেন তাঁহাদের সম্মুখে নরকের দ্বার সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিস্ময়ের প্রথম মোহ কাটিয়া গেলে বয়স্কদের এই হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইল; এবং তরুণ বিদ্রোহীদের দার্ঢ্য ও অহংকার প্রাচীনদের এই বিদ্বেষ ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ঘরে ঘরে একটা তুমুল অশান্তি ও খণ্ডবিপ্লব জাগাইয়া তুলিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে যখন উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা হইল, তখন সমাজ ভাবী ঔপন্যাসিকের সম্মুখে এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চিত্রখানি তুলিয়া ধরিল,—এবং আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি এই বিক্ষোভকেই নিজ বর্ণনার বিষয় করিয়া লইয়াছে।

অবশ্য ইহা সত্য নহে যে, এই বিদ্রোহের উন্মাদনা ও আবেগ আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহারা বিদ্রোহের পতাকা লইয়া সমাজ ও পরিবারের বন্ধন কাটিয়া বাহির হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করা বা নিজেদের অভিজ্ঞতার বিষয় লইয়া উপন্যাস লেখা তাহাদের কল্পনাতেও আসে নাই। এই বিদ্রোহী তরুণদলের মধ্যে দুই একজন ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্য-সেবাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বটে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বোধ হয় অনুকূল-দৈবপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার সমস্ত বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার মনঃকোকনদে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-মধু গোপনে সঞ্চয় করিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় কেহ কেহ বা পরিণত বয়সে আত্মজীবনকাহিনী লিখিয়া তাঁহাদের তরুণ-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটা স্নেহ-বিদ্রূপ-মণ্ডিত কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রবল ভাবাবেগ উপন্যাসে প্রতিফলিত করার কথা শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বে কাহারও মনে হয় নাই। পক্ষান্তরে অভিভাবক-গুরুজনেরাও বিপথগামীদের সুমতির জন্য দেবতার দ্বারে মাথা ঠুকিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াই নিশ্চিন্ত

ছিলেন। তাঁহাদের মনের গভীর বেদনাকে উপন্যাসের মধ্যে অভিব্যক্ত করার কথা তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু যুধ্যমান উভয়পক্ষের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এই বিরোধের কাহিনী ধীরে ধীরে উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু হইয়া উঠিতেছিল। বিরোধের প্রথম উগ্রতা কাটিয়া গেলে, বাঙলার ঔপন্যাসিকেরা ইহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইবার উপযোগিতা ক্রমশ স্পষ্টতরভাবে আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। আমাদের একান্ত বৈচিত্র্যহীন ও বিধিবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে, নীরস দৈনন্দিন কার্যের ঘন-সন্নিবেশের অবসরে যে-কোন প্রকারের সতেজ জীবনস্পন্দন, কোন গভীর ভাবের গোপন প্রবাহ ধরা যাইতে পারে, ইহা আমাদের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকদের অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তাঁহারা আমাদের জীবনের মধ্যে একটা বাহ্য-ঘটনাবৈচিত্র্যের জন্য একেবারে উন্মুখ হইয়া ছিলেন। অন্তর্জগতে বাহ্যঘটনার একান্ত অভাবের মধ্যেও যে একটা নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে পারে, একটা গভীর ভাবগত আলোড়নের সম্ভাবনা আছে, তাহা এই বর্তমান সময়ে মাত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিল, তাহা আমাদের জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়া সহজেই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিশেষতঃ, এই ইংরেজী শিক্ষা, যাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যেও পারিবারিক বৈষম্য গভীরতর করিয়া তুলিয়া তাহাদের জীবনেও একটা বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঞ্চার করিয়াছিল। আমাদের দেশে পূর্বে সকল পরিবারেই যে রাম-লক্ষ্মণের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইত, বা একটা সার্বজনীন সৌভ্রাত্র বিরাজিত ছিল, তাহা নহে; তবে আদর্শ ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর ঐক্যের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ তত প্রবল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু নূতন সভ্যতার প্রবর্তনের পরে পরিবারের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পারিবারিক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল। সেজন্যও এই সমস্ত পারিবারিক বিচ্ছেদের কাহিনী বিশেষ-ভাবে উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি অধিকার করিতে লাগিল।

আরও একটা কারণে এই সমস্ত বিষয় উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইল। যে বিদ্রোহী দল প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় সমাজ ও পরিবারের বন্ধন অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশ স্থলেই সমাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে সামাজিক ও পারিবারিক যে সমস্ত দাবি তাহারা উপেক্ষা করিয়াছিল, পরবর্তী অবসাদের সময়ে সেই সমস্ত দাবি প্রবলতরভাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং এই স্বাধীনতাপ্রয়াসীরা হয় নিষ্ফল ক্ষোভে জীবন শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অথবা সমাজের সহিত একটা আপোষ-সন্ধি করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছিল। এই প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মনু-পরাশরের দিন হইতে যে নীতিবিদ্ পুরুষটি জাগ্রত আছেন তাঁহার পক্ষে, আমাদের শাশ্বত, অতন্দ্র নীতিজ্ঞানের পক্ষে পরম তৃপ্তিকর হইয়াছিল। এই অনাচারীদের পরাজয়ে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা সনাতন নীতি-লঙ্ঘনের অবশ্যম্ভাবী শাস্তি, পাপের অনিবার্য প্রায়শ্চিত্তই দেখিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের নৈতিকজ্ঞানের দিক দিয়াও এই বিরোধের চিত্র বিশেষ আদরণীয় বোধ

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমাদের বর্তমান উপন্যাসের মধ্যেও ইংরেজী সভ্যতার সম্পর্ক-জনিত এই পারিবারিক বিপর্যয়ের চিত্র একটা প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে; 'স্বর্ণলতা'র সময় হইতে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা আমাদের উপন্যাসক্ষেত্রে সমান প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং একেবারে সাম্প্রতিক কালে একান্নবর্তী পরিবার-জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ উৎসাদনের ফলে পারিবারিক বিরোধমূলক উপন্যাসের ধারা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস

(১)

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, 'আলালের ঘরের দুলাল' ও পরবর্তী স্তরের উপন্যাসের (বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের) মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান। কালহিসাবে প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম ও রমেশ-চন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক। তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে) রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৫), 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯), এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৬), 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়,' 'রাধারাণী' (১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল' (১৮৭৮), প্রভৃতির পরে—প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপন্যাসের পুরাতন ও নূতন আদর্শ উভয়ই একসঙ্গে বর্তমান ছিল; সময়ের দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। উপন্যাস-সাহিত্যে উচ্চতর আদর্শের এই অতর্কিত আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুতরাং এই পরিবর্তনের গভীরতা ও প্রকৃত রূপটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই নূতন উপন্যাসে আমরা প্রধানতঃ দুইটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি: (১) উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা ও পরিণতি, (২) বাস্তবতা-প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে এক নূতন গভীরতা ও ভাবসমৃদ্ধির সঞ্চার। যেমন একবিন্দু শিশিরে বিশাল সূর্যের পরিধি প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আমাদের তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে গভীর ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মানব-জীবনের বিপুলতা ও বৈচিত্র্য প্রতি-ফলিত হইয়াছে। আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর আলোচনার সময়ে, ইহার সমস্ত গুণ ও উপভোগ্য বাস্তব রসের মধ্যে, এই দ্বিতীয় বিষয়ে ত্রুটি ও অপূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার গল্পের মধ্যে কেবল একটি সংকীর্ণ ও সাধারণ ধর্মনীতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; জীবনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, ইহার বিশালতা ও রহস্যময়তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া আমরা জীবনসমস্যার জটিলতা, জীবনের ভাব-সমৃদ্ধি ও উদারতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারি না। ইহাতে কতকগুলি বাস্তব চরিত্রের, কতকগুলি রক্ত-মাংসের মানুষের সমাবেশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সমাবেশের দ্বারা লেখক জীবন সম্বন্ধে কোন বৃহৎ, ব্যাপক সত্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। নূতন যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই অভাব বিশেষভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর মধ্যে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' এই দুইটি আখ্যান সন্নিবিষ্ট। উহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক উপন্যাস-জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূল সুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে দাবি করা যাইতে পারে।

'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'-এ ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে কিছুটা কাল্পনিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনে বিন্যস্ত করিয়া তাহাদের ইতিহাসের অজ্ঞাত মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চমকপ্রদ ঘটনা-পরিণতি দেখান হইয়াছে। শিবজী, আরংজেব, শাহজাহান, রোসিনারা, জয়সিংহ, রামদাস স্বামী ইঁহারা সকলেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র; এবং উপন্যাসে বর্ণিত তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও সাধারণভাবে সত্যানুগামী। কিন্তু এই সাধারণ সত্য কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে কিছু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহাতে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা ও কল্পনারসের সিদ্ধি যুগপৎ সম্পাদিত হইয়াছে। আরংজেব দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ও এই অভিযানে শিবজীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিয়াছিল ইহা সত্য ঘটনা। শিবজীর রণনীতি, তাঁহার সন্ধি-বিগ্রহের পিছনে কোন নীতিগত আদর্শের পরিবর্তে আত্মশক্তিবৃদ্ধির একনিষ্ঠ প্রেরণা, জয়সিংহের নিকট তাঁহার সাময়িক পরাভব, দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার, ও দিল্লীতে আরংজেবের কপট ব্যবহারে তাঁহার আনুগত্য-বর্জন—এ সমস্তই ইতিহাস-সমর্থিত যথার্থ ব্যাপার। কিন্তু গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ আকর্ষণ—রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবজী-রোসিনারার প্রণয়সঞ্চার, দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় অবস্থান-কালে শিবজীর তাঁহার নিকট বিবাহ-প্রস্তাব ও রোসিনারার মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় এই প্রেমের প্রত্যাখ্যান—এই সমস্ত আবেগপ্রধান ও গৌরবময় দৃশ্য লেখকের কল্পনা-উদ্ভাবিত। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ সৃষ্টি ও চরিত্র-চিত্রণ এবং গার্হস্থ্য জীবনের তথ্যবন্ধন-মুক্ত অথচ ভাবসত্য-নিয়মিত, রসসিক্ত ও মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ, সংযোজক ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাস ও সমন্বয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা।

ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণরহস্যটি নিজ সহজ ঔচিত্যবোধ ও ইতিহাস-জ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি, পার্বত্যযুদ্ধ-পরিচালনা, শিবজীর শাসন-ব্যবস্থা, আরংজেবের কূটনীতি, জয়সিংহের প্রতি তাঁহার বিষ-প্রয়োগের নির্দেশ, ও তাঁহার পুত্রের নিকট কপট পত্রপ্রেরণ প্রভৃতির ইতিহাস-তথ্য তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিহাস-তথ্য-পরিবেশনের শিথিল গ্রন্থনের মধ্যে তিনি যে মানবচরিত্রজ্ঞান ও জীবনসত্যের দৃঢ়তর গ্রন্থি সংযোজনা করিয়া আকস্মিক ঘটনাকে মনস্তত্ত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও মৌলিকতা। শিবজীর চরিত্র, সৈনিকদের মধ্যে তাঁহার পুরস্কার-বিতরণের নীতি, জাতির অভ্যুদয়কালে দেশদ্রোহীর মধ্যেও দেশাত্মবোধ ও চরিত্র-মহিমার লুপ্তাবশেষের অস্তিত্ব, স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক সেবাপরায়ণতা ও আর্তের প্রতি মমতাবোধ, অপরাধী সেনাটিকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে রত হওয়ার মধ্যে শিবজীর নিগূঢ় অভিপ্রায়, জয়সিংহের প্রতি শিবজীর উদারনৈতিক আবেদন, শাহজাহানের খেদপূর্ণ আত্ম-চিন্তন, আরংজেবের অন্তর-রহস্য-উদ্ঘাটক স্বগতোক্তি—এই সবই তাঁহার মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়।

ভূদেবের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর যতটা হউক বা না হউক, রমেশচন্দ্রের উপর উহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শিবজীর পার্বত্য-যুদ্ধ-বর্ণনা ও জয়সিংহের নিকট তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্বদেশ-প্রেমাত্মক আবেদন রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' উপন্যাসটিকে গভীরভাবে, সময় সময়

আক্ষরিকভাবেও প্রভাবিত করিয়াছে। যে সরস মন্তব্য ও পাঠকের সরাসরি সম্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনের হেতু হইয়াছে ও পাঠককে এই নূতন ধরনের সাহিত্যের রসগ্রহণে সহায়তা করিয়াছে তাহারও প্রথম সূচনা ভূদেবে দেখা যায়।

তবে ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনভ্যস্ত রচনার আড়ষ্টতা লেখকের স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় হইয়াছে। বর্ণনাপ্রথা ও মন্তব্য-যোজনা বহুস্থলেই গুরুভার গাম্ভীর্য ও নীরস তথ্য-বহুলতার দ্বারা অভিভূত ও মন্থরগতি। বর্ণনায়ও সরসতার অভাব অনুভূত হয়। কোন দৃশ্যই নাটকীয় তীব্রতা লাভ করিয়া পাঠকের মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় নাই। কি বিবৃতি, কি বর্ণনায়, কি ঘটনা-বিন্যাসে সর্বত্রই একটা স্তিমিত কল্পনা, একটা কুণ্ঠিত অনুভূতি, একটা তথ্যভার-জর্জর মানস মন্থরতার ছাপ পড়িয়াছে। ভূদেব এই নূতন সাহিত্যের সমিধ্ সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞশালা নির্মাণ করিয়াছেন, তুই এক কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গও নিঃসারিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার রচনায় প্রতিভাব হোমানলশিখা কোথায়ও পূর্ণতেজে দীপ্ত হইয়া উঠে নাই।

ক্রমপরিণতির দিক্ দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব-পর্যবেক্ষণশক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনাময়, অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতেছিলাম। উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিকসংখ্যায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ; বাস্তব জীবনের সহিত ইহাদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, অদৃশ্যপ্রায় ছিল। উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, ইহাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব ছিল। বাস্তবিক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ তুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনেব ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণ-সম্পদ্ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের অস্পষ্টতা ও অংশতঃ অনুমান-সিদ্ধ কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।

আমাদের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কুহেলিকাময়, সত্য-কল্পনাজড়িত আকাশ-বাতাসের মধ্যে এই নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান একেবারেই মিলে না। ইহাদের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবাস্তব রকমের; ইতিহাস কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য হইতে মুক্তিলাভের একটা উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; কেবল অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা-বাহুল্যের অবসর দিয়াছে মাত্র। ইহারা প্রকৃত ইতিহাসও নয়, প্রকৃত উপন্যাসও নয়। আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস-রচনা কোন কালে ছিল না, অতীত যুগের সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। অতীত যুগের মানুষের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, আমাদের সঙ্গে তাহার আচার-ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদের প্রভেদ, ইত্যাদি বিষয়ে কোনপ্রকার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ঐতিহাসিকদেরই নাই, ঔপন্যাসিকদের ত কথাই নাই। অতীতের মানুষ যে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের জীব, আমাদের মত তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষাজড়িত বাস্তব জীবন ছিল, তাহারা যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া স্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত করিত না, আমাদেরই মত তাহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধী ভাবের আলোড়ন ছিল, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সুতরাং অতীতের দিকে যাত্রা আমাদের পক্ষে একটা নিতান্ত স্বপ্নপ্রয়াণ বা অন্ধকারের মধ্যে লম্ফপ্রদানের মতই হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত বাস্তব জীবনের একটা অন্তরঙ্গ মিলনের সংঘটন করাও ঔপন্যাসিকদিগের কলাকুশলতার অতীত ছিল। সুতরাং সব দিক্ দিয়াই ভূদেবের রচনা ব্যতীত এই প্রথম যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে।

(২)

এই সমস্ত তথা-কথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়-বস্তু কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য আমাদের স্বভাবতঃই আগ্রহ হইতে পারে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থতালিকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, ১৮৭৫ হইতে ১৮৮২।৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জাতীয় অনেকগুলি উপন্যাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বিষয়-বস্তুর পর্যালোচনা করিলেই তাহাদের অবাস্তবতা ও অনৈতিহাসিকতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কাব্য ও উপন্যাস দুই-ই রচিত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে ভেদ-রেখা নিতান্তই সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয়। মোট কথা, উপন্যাসেব স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব সম্বন্ধে লেখকদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, ইহা কাব্যেরই একটা শাখা বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং কাব্যসুলভ কল্পনাপ্রবণতা ও অবাস্তবতা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইত।

এই শ্রেণীর উপন্যাসের দুই একটা উদাহরণ দিলেই তাহাদের স্বরূপ বুঝা যাইবে। বিনোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫) কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের আখ্যান। ললিতমোহন ঘোষ প্রণীত 'অচলবাসিনী' (১৮৭৫) একজন হিন্দু দুর্গাধ্যক্ষের সহিত একটি মুসলমান মহিলার বিবাহবর্ণনা। হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিহাস-মূলক গল্প, নবদ্বীপের রাজা কর্তৃক কাছাড় আক্রমণ ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ। 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) কেদারনাথ চক্রবর্তী প্রণীত—ইহার ঐতিহাসিকতা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া মনে হয়, যে জাতি তাহার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহার উন্নতি অসম্ভব—অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই উক্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, ইহার উপাখ্যানভাগ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য-চ্যুতির পর গোরাচাঁদ নামক একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গের কিয়দংশের পুনরুদ্ধার। রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী' (১৮৭৯) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের বর্ণনার সহিত মিশ্রিত প্রেম-কাহিনী। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'রাজকুমারী' (১৮৮০) বিক্রমপুরের একজন হিন্দু রাজার সহিত মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবাসী একজন

অনার্য রাজার যুদ্ধ-কাহিনী। হেমচন্দ্র বসু প্রণীত 'মিলন-কানন' (১৮৮২) সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা—জাহাঙ্গীর বুন্দির রাজকন্যার প্রেমপ্রার্থী ছিলেন; এই রাজকন্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতির প্রতি প্রণয়াসক্তা ছিলেন; অবশেষে নূরজাহানের প্রভাবে জাহাঙ্গীরের বিরতি ও প্রেমিকযুগলের মিলন—ইহাই 'মিলন-কাননের' বর্ণনীয় বস্তু। নীলরতন রায়চৌধুরীর 'যাবনিক পরাক্রম' (১৮৭১) পেশোয়ার দেশে হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কিত প্রেমের বিবরণ। তারকনাথ বিশ্বাসের 'সুহাসিনী' (১৮৮২) মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। সুহাসিনী ও তাহার সখী নীরজা উভয়েই একটি যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী; নীরজা যুবকের প্রেমলাভে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সুহাসিনীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাকে আনিয়া লেখক ইহাকে একটি ঐতিহাসিক বর্ণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েরও একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐ গ্রন্থতালিকার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

(৩)

এই উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করিলেই ইহাদের ঐতিহাসিকতার দাবি কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা জানা যাইবে। ইহাদের কতকগুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের উপাখ্যানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন সংযোগ ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা যুদ্ধ, ধর্মবিরোধ ও রাজনৈতিক ঘটনা লইয়াই ব্যস্ত। এই সমস্ত প্রবল বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহার ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করে, কিরূপ প্রবল বন্যার বেগে তাহার সাংসারিক সুখ-দুঃখের উপর বহিয়া যায়, তাহার কোনই নিদর্শন নাই। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে একটি প্রধান গুণ তাহা ইহাদের মধ্যে একেবারেই দুর্লভ। তারপর ইহাদের ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলিও প্রায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব; ইহাদের ইতিহাসের মধ্যেও যথেষ্ট মায়া ইন্দ্রজালের অবসর আছে। কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহ; একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গদেশ-জয়—এই সমস্ত গল্প যেন রূপকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসের কঠোর দিবালোক অপেক্ষা কল্পলোকের রঙীন আলোই যেন ইহাদের প্রকৃতির অধিকতর অনুগামী।

অপর কয়েকটি উপাখ্যান প্রকৃত ইতিহাস নহে, সম্ভাবিত ইতিহাসের কাল্পনিক রাজ্য হইতে গৃহীত, অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে,—যাহা ঘটিতে পারিত, যাহা ঘটা অসম্ভব ছিল না, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত; নবদ্বীপের রাজার কাছাড়-আক্রমণ বা বিক্রমপুরের রাজার সহিত পূর্বদেশবাসী কোন অনার্য রাজার যুদ্ধ এই অনিশ্চিত, কাল্পনিক বা অজ্ঞাত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। এই বিষয়েও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত ইহাদের প্রভেদ বেশ সুনির্দিষ্ট। স্কট বা অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। তাঁহারা সর্বজন-বিদিত, সুপরিচিত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলিকেই আপনাদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। কুসেড, স্যাক্সন ও নর্মানদের পরস্পর দ্বেষ ও জাতিবিরোধ; রাজপক্ষ ও পার্লিয়ামেন্ট-পক্ষীয়দের দ্বন্দ্ব-কাহিনী; বার্গাণ্ডির ডিউক চার্লসের সহিত ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই-এর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা-

সমূহই তাঁহাদের উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিবরণে তাঁহারা ইহাদের প্রকৃত স্বরূপটি, প্রাণের আসল স্পন্দনটি ধরিতে পারিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিকতা অবিসংবাদিত। এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিকেরা যেন প্রাচীন পুরাণকার বা সংস্কৃত লেখকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন, 'রামায়ণ-মহাভারত'-এ বা 'হিতোপদেশ', 'দশকুমার-চরিত' ও 'কাদম্বরী'-প্রমুখ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে আমরা সুপরিচিত স্থানসমূহের নাম—কাশী, কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, গুর্জর কাশ্মীর, প্রভৃতি দেশের—উল্লেখ পাইয়া থাকি, অথচ এই নামগুলিই তাহাদের বাস্তব জগতের সহিত একমাত্র যোগ-সূত্র; সেইরূপ এই সমস্ত আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা কেবল ঐতিহাসিক স্থানোল্লেখেই পর্যবসিত হইয়াছে—কাছাড়, কাশ্মীর, বিক্রমপুর, প্রভৃতি সুপরিচিত নামই তাহাদের বাস্তবতার একমাত্র চিহ্ন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে একেবারেই নাই। কাশ্মীররাজ কাছাড়রাজ হইতে একেবারেই অভিন্ন, বিক্রমপুররাজ্যের সৈন্যের সহিত মেঘনাতীরবর্তী অনার্য রাজার সৈন্যের কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। নাম-গুলি সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে, নিতান্তই যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাচিত হইয়াছে। এমন কি হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যেও ভেদ-রেখা নিতান্তই অস্পষ্ট; বড় জোর হিন্দু অত্যাচারিত ও মুসলমান অত্যাচারী, পরস্পর পরস্পরের ধর্ম ও আচারদ্বেষী—এই পর্যন্ত পার্থক্য দেখান হইয়াছে; কোথাও হিন্দু ও মুসলমানকে কেবলমাত্র বিরোধী জাতির প্রতিনিধিভাবে না দেখিয়া, ব্যক্তি-গতভাবে দেখা হয় নাই, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বসূচক গুণের কোনই বিশ্লেষণ হয় নাই। সুতরাং এই সমস্ত তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা যে বিশেষ মূল্যবান্ নহে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি তৃতীয় শ্রেণী পৃথক করা যায়। ইহারা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত গার্হস্থ্য জীবনের একটা সংযোগ ও সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনের ক্ষীণস্রোত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রবল প্রবাহ এই ক্ষীণস্রোতে সঞ্চারিত হইয়া ইহার গতিবেগ-বৃদ্ধি ও ইহাতে ঘূর্ণাবর্ত সৃজন করে তাহার কথঞ্চিৎ জ্ঞানের পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে আমরা যেটুকু গার্হস্থ্য বা পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত দেখি তাহা প্রধানত: প্রেমবিষয়ক। এই প্রেম-কাহিনী নিতান্তই বিশেষত্ব-বর্জিত ও প্রাণহীন; কেবল কতকগুলি প্রথাবদ্ধ আলংকারিক শব্দবিন্যাস ও নিতান্ত অর্থহীন উচ্ছ্বাসমাত্র। উহার মধ্যে মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বা প্রণয়ের উদ্দাম বেগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রেম-কাহিনী হিসাবে এই সমস্ত উপন্যাসের কোন মূল্য নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই প্রেম-কাহিনীর সমন্বয়সাধনেও লেখকেরা বিশেষ কোন কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। হয়ত কোন প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট্ কোন গৃহস্থ-ঘরের সুন্দরীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ স্নেহচ্ছায়ামণ্ডিত গৃহকোণ হইতে তাহার প্রণয়ভাজন পুরুষের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া তাহার শান্তিময় জীবনে একটি বিষাদময় জটিলতার প্রবর্তন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে পরিণাম প্রায়ই হয় সম্রাটের আত্মসংবরণ ও

অনুতাপ, না হয় নায়ক-নায়িকার আত্মহত্যা। অথবা কোনও কোনও স্থলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রণয়মিলন দেখাইয়া লেখক নিজ উপন্যাসের মধ্যে একটু নূতনত্ব আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রায়ই কোন উচ্চপদস্থ মুসলমান মহিলা হিন্দুবীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার পায়ে নিজ জাত্যভিমান ও ধর্মগৌরব বিসর্জন দিয়াছেন। এইরূপ আকারেই ইতিহাস সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিহাসের সহিত প্রাত্যহিক জীবনের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ। স্কটের উপন্যাসে যেমন ইতিহাস ও গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে একটা নিগূঢ়, অন্তরঙ্গ ঐক্য, একটা প্রাণের যোগ আছে, গার্হস্থ্য-জীবন ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে যেমন আপন রসমাধুর্য ও আকার-বৈচিত্র্য টানিয়া লইয়াছে, এখানে তাহার ছায়াপাত মাত্র হয় নাই। এখানে ইতিহাস একটা দুরন্ত দানবের মত গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিয়া তাহার সুখশান্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে মাত্র; তাহার সহিত কোন জীবন্ত সম্বন্ধ বা প্রাণের যোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না।

রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকদিগের রচিত এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটু সবিস্তার আলোচনা করা গেল; কেন না এই সমস্ত ব্যর্থ-প্রয়াসের মধ্য দিয়াই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিব। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইহাদের তুলনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে। আমরা এই দুই মনীষীর গ্রন্থ-সমালোচনার সময়ে দেখিতে পাইব যে, ইহারা, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, অনেকটা পূর্ববর্ণিতরূপ বিষয়ের মধ্যেও কিরূপে আপনাদের উচ্চতর কলাকৌশল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ও গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত ইতিহাসের বৃহত্তর ব্যাপারগুলিকে নিপুণ হস্তে গাঁথিয়াছেন। বিষয়-নির্বাচন-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই সমস্ত লেখকের বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। গৃহস্থ-সুন্দরীর প্রতি প্রবল অত্যাচারীর রূপমোহ অনেকটা 'চন্দ্রশেখর'-এর বিষয় বস্তু; মুসলমানীর হিন্দু-বীরের সহিত প্রেম 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকার সারাংশ-সংকলন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত অতি সাধারণ, নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জিত বিষয়ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দ্বারা কিরূপ আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, জীবনের জটিলতা ও প্রেমের বিপুল আবেগ ইহাদের মধ্যে কিরূপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা তুলনার দ্বারা আরও পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সাধারণ মনুষ্যের সহিত তুলনাই প্রতিভাবানের গৌরব স্ফুটতর করিয়া তোলে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা

(১)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত ও সাধারণ লেখকের হস্তে ইহার দোষ-ত্রুটি-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব ইতিহাস-সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিপুষ্টির যে দিকে গুরুতর বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সহজ প্রতিভার জন্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাহিত্যিক রচনা-সম্বন্ধে বঙ্কিম ও রমেশ প্রায় সমসাময়িক। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই প্রথম উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস; বঙ্কিমের ও সম্ভবতঃ ভূদেবের দৃষ্টান্তই ইংরেজী-সাহিত্যপুষ্ট রমেশচন্দ্রকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রথম সার্থক প্রবর্তকের যে সার্থক গৌরব তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ও ভূদেবের প্রাপ্য। ক্রমবিকাশের দিক্ হইতে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই খাঁটি, অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল ও মিশ্র ধরনের; তাহাদিগের মধ্যে ইতিহাস অনেকাংশে কল্পনারঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্কিমের আদর্শবাদ, জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপর কোথাও বা মহাকাব্যের বিশালতা, কোথাও বা গীতিকাব্যের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সত্যনিষ্ঠা-সম্বন্ধে যে কঠোর দায়িত্ব, তাহা তিনি সর্বত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'আনন্দমঠ'-এ একটা অবিখ্যাত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্যে তিনি নিজের উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম ও জলন্ত বিশ্বাস সঞ্চার করিয়া, তাহাকে একটা ভাবপূত, ম্লান-গৌরব-মণ্ডিত, মহিমান্বিত আদর্শের আকার দান করিয়াছে, একটা সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিপ্লবের গৌরব আরোপ করিয়াছেন; অতীত ইতিহাসের চিত্রপটের উপর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল বর্ণ বিন্যস্ত করিয়াছেন। অতীতকালের স্বরূপটিকে অনাবৃত করিয়া দেখাইতে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। প্রেমিক যেমন সমগ্র বাস্তব-জগৎকে নিজ আদর্শ স্বপ্নের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করে, কবি ও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রও অতীত ইতিহাসকে দেশভক্তির প্রবল শিখায় গলাইয়া, কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, তাহার উপর নিজ বিশাল, রাজোচিত মনের প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা আর যাহাই হউক, ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে ইহার বিচার ও রসগ্রহণ চলিতে পারে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' এবং কতকটা 'চন্দ্রশেখর' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস-সম্বন্ধে অনেকটা এই কথা বলা যাইতে পারে। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ অতিশয় ক্ষীণ ও আনুমানিক বলিয়াই মনে হয়; হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম যে-কোন আধুনিক যুগে ঘটিতে পারিত; তাৎকালিক সমাজ ও ইতিহাসের বিশেষ চিহ্ন উহার উপর মুদ্রিত। বঙ্কিমের প্রধান শক্তি ঐতিহাসিক আবেষ্টন-সংগঠনের বা ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের কার্যে নিয়োজিত হয় নাই, পরন্তু মনোরমার প্রহেলিকাময় চরিত্রের বিশ্লেষণেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দার্শনিক তত্ত্বপ্রিয়তা ইতিহাসকে অভিভূত করিয়াছে; ভবানী পাঠক সন্তান ব্রত গ্রহণ করিলেই অনায়াসে আনন্দমঠে স্থান পাইতে পারিত। তবে 'দেবী চৌধুরাণী' মূলতঃ পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নহে; সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক অংশকে সেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। 'সীতারাম'ও মূলতঃ চরিত্র-বিশ্লেষণের উপন্যাস; সীতারামের নৈতিক পদস্খলনের চিত্রটি ফুটাইয়া তোলাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য; ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ মাত্র। বিশেষতঃ সীতারামের ঐতিহাসিক অংশ ক্ষীণ হইলেও যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত হয় নাই। সীতারামকে প্রথম প্রথম একজন আদর্শ, দূরদর্শী হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া চিত্রিত করা হইলেও, তাঁহাকে কোন অসম্ভব অকালোচিত বাষ্পময় ভাবের দ্বারা স্ফীত করা হয় নাই, একজন সাধারণ অত্যাচার-পীড়িত, স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরূপেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং এখানে আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাস ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত হয় নাই। সেইরূপ 'চন্দ্রশেখর'-এও যে ঐতিহাসিক অংশটুকু আছে তাহাও আখ্যায়িকার মূল বস্তু নহে। তথাপি এখানে ইতিহাস কেবল পশ্চাৎ-পট মাত্র নহে, আখ্যায়িকার মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। বাঙলায় ইংরেজের প্রাদুর্ভাব কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংঘটন নহে, ইহা শৈবলিনীর গার্হস্থ্য জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিহাসের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহন ইংরেজ, নবাব মারকাসিম ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর উভয়েরই দুর্গতির হেতু। দলনী ও শৈবলিনী উভয়েই নিয়তির মর্মান্তিক ব্যঙ্গে ইতিহাস-প্রসারিত একই নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে—দুইটি আখ্যায়িকা একই সূত্রে অতি নিপুণভাবে গ্রথিত হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে দলনীর আত্মোৎসর্গ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের গৌরবময় ব্যর্থ প্রচেষ্টা ভাবের একই সুরে বাঁধা। সুতরাং 'চন্দ্রশেখর'-এ ইতিহাসের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের একটা সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে বলা যাইতে পারে। খুব সন্নিহিত অতীতের কাহিনী বলিয়া ইহার প্রতিবেশচিত্রও সুপরিচিত ও অপেক্ষাকৃত তথ্যবহুল।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' এই দুইটি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা অন্যান্য উপন্যাস হইতে একটু ভিন্ন স্তরের—ইহারা মূলতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস; ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ইহাদের নায়ক এবং তাহাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ই ইহাদের আখ্যান-বস্তু। অবশ্য ঐতিহাসিক উপাখ্যানে ইতিহাসখ্যাত পুরুষই যে নায়ক হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ স্কটের উপন্যাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা নায়কপদে উন্নীত না হইয়া অপ্রধান অংশই অধিকার করিয়াছেন। Ivanhoe-তে Richard I, Quentin Durward-এ Louis XI, Kenilworth-এ Elizabeth ও Leicester, Peveril of the Peak-এ James I, Woodstock-এ Charles II ও

Cromwell, প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিই ঐ সমস্ত উপন্যাসে অপ্রধান অংশ অধিকার করে; এবং কাল্পনিক ব্যক্তিরাই নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ আছে—প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি পাঠকের বিশেষ পরিচিত বলিয়া, তাহাদিগকে কল্পনার সাহায্যে রূপান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে; ঔপন্যাসিকের রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা চলে না। সুতরাং লেখক যে সমস্ত বিপ্লব-অভিঘাত দেখাইতে চাহেন, সমসাময়িক যে সমস্ত বিরোধের ধারা পরিস্ফুট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কাল্পনিক চরিত্রের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক যুগেরই সাধারণ জীবন, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্কট-এর জ্ঞান এতই ব্যাপক ও গভীর ছিল, প্রত্যেক শতাব্দীরই বিশেষ প্রাণস্পন্দন তিনি এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ধরিতে পারিতেন যে, সমাজচিত্রের কেন্দ্রস্থলে রাজাকে স্থাপন করা তাঁহার প্রয়োজন হইত না। সুতরাং তাঁহাব উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বাস্তবতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। রাজাদিগকে আখ্যায়িকার মধ্যে না আনিলেও উহাদের বাস্তবতার কোন হানি হইত না; রাজাদের প্রবর্তনের জন্য উহাদের বাস্তবতার গৌরব আরও বাড়িয়াছে মাত্র, আরও সংশয়হীন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত কারণের জন্য স্কট্ তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে আখ্যায়িকার অপ্রধান অংশে নিয়োজিত করিতে সাহসী হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, আমাদের নিকট এক যুগ হইতে অপরের ভেদ-রেখা অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সুদূর হিন্দু অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি মুসলমান অধিকারের পরেও কোন শতাব্দীরই বিশেষ রূপসম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ—সমস্ত শতাব্দীই আমাদের চক্ষে একাকার, বিস্মৃতির বৈচিত্র্যহীন ধূসর বর্ণে পরিব্যাপ্ত; এই অন্ধকারের মধ্যে রাজাগণের নাম ও উল্লেখযোগ্য বাজনৈতিক ঘটনাই যাহা কিছু ক্ষীণ আলোকরেখাপাত করিতেছে। আমাদের অতীত ইতিহাসের কোন অধ্যায়কে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত কবিবাব একমাত্র উপায় তৎকালীন বাজার নামের দিকে দৃষ্টিপাত করা: উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা কোন্ যুগে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ধাবণা করাব একমাত্র উপায় সেই সময়ের শাসনকর্তার কাল-নির্ধারণ—সে সময়ে রাজা কে ছিল,—আকবর, জাহাঙ্গীর, আরংজেব, সিরাজদ্দৌলা, কি মীরকাসিম এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা; আভ্যন্তরীণ প্রমাণেব দ্বারা কিছুই জানিবার উপায় নাই। এইজন্যই বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই কার্যের কঠোর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই, রাজা ও সম্রাট্-জাতীয় পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের কল্পনার জাল বুনিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত সত্যনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের রোমান্সের অপেক্ষা বিস্ময়কর, অথচ অবিসংবাদিত সত্যের উপর নিজ উপন্যাস-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক উপাদানের রূপান্তর সাধন করিয়া ইতিহাসেব মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে সংকুচিত হন নাই। দুই একটিতে

সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসেই নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

(২)

ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। (১) যে সমস্ত উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের চিহ্ন অধিকতর সুস্পষ্ট—'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' এই তিনখানি উপন্যাস এই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিকতা ক্ষীণ বটে, সামাজিক চিত্রাংকনের দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে বাস্তবপ্রিয়তা বা সত্যনিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তথাপি ইহার নায়ক একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, এবং ইহাতে যে ঐতিহাসিক চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কল্পনার আতিশয্য দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত হয় নাই। বিশেষতঃ ইহার ঐতিহাসিকতা ইহার মূল অংশ, 'মৃণালিনী'র মত অবান্তর বিষয় নহে; ইহার ঐতিহাসিক অংশ বাদ দিলে আখ্যায়িকার মূল বিষয়ই নষ্ট হইয়া যায়। 'রাজসিংহ'-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে; ইহা একটি প্রকৃত ইতিহাসবর্ণিত ব্যাপারেরই বিবৃতি। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ এই ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে রোমান্সের অনুরঞ্জন আনিয়া দিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে নূতন শক্তির যোগ করিয়া তাহাদের গতিবেগ বর্ধিত করিতেছে। অবশ্য ইতিহাসের বিশাল ঘটনার সহিত সাধারণ জীবনের যে অন্তরঙ্গ যোগ আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইতিহাস কোন দিনই আমাদের সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিজ শান্ত, অপরিবর্তিত প্রবাহ রক্ষা করিয়াছিল।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নিজ সত্যরূপ বিসর্জন দিয়াছে, ভাবপ্রাবল্য সত্যনিষ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'আনন্দমঠ' এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীব উপন্যাসে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণভাবে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কেবল ঘটনাবৈচিত্র্যের কারণমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, কোন উচ্চতর কলাকুশলতার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয় নাই। 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিক অংশ—মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়—চরিত্রসৃষ্টির উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রেম, মনোরমার রহস্যময় দ্বৈত-ভাব কোন বিশেষ কালের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না; ইহারা সর্বকাল-সাধারণ। 'চন্দ্রশেখর'-এ লরেন্স ফস্টরের সহিত শৈবলিনীর গৃহত্যাগ, এবং মীরকাসিম ও ইংরেজদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধজালে দলনী বেগম ও শৈবলিনীর জড়িত হওয়া ইতিহাসের সহিত পারিবারিক জীবনের যোগের প্রমাণ। অবশ্য শৈবলিনী-প্রতাপের ভিন্নাভিমুখী প্রেম, এবং শৈবলিনীর চিত্তবিকার ও প্রায়শ্চিত্ত—ইহাদের সহিত রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; দুইটি সূত্রকে পৃথক্ করা সম্ভব। স্কট্ বা থ্যাকারের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও পারিবারিক জীবনের

মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদসাধন সম্ভবপর নহে। গার্হস্থ্য-জীবন যেন ইতিহাস-বৃন্তে ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, যুগের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা হইতে নিজ রস ও বর্ণ গ্রহণ করিয়াছে, ছোট-বড় শত বন্ধনের নাগপাশে ইতিহাসের সহিত বিজড়িত হইয়াছে। এই প্রভেদের কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে ইতিহাস-ধারার গতি ও প্রবাহ ইউরোপ হইতে বিভিন্ন। ইতিহাস কখনও কখনও আমাদের সামাজিক জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেও ইহার সুকুমার বিকাশগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার মুষ্টি অতি শিথিল। সাধারণ লোক অতি গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবকেও নিজ প্রাণের মধ্যে কখনও গ্রহণ করে নাই—যতদিন সম্ভব ইহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে; যখন নিতান্তই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার প্রচণ্ড শক্তির তলে মাথা নত করিয়া দিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই ইহাকে অন্তরের বস্তু বলিয়া লইতে পারে নাই, ইহাকে হৃদয়ের আলোড়নের দ্বারা প্রাণবান্ করিয়া তুলিতে চাহে নাই। পাঠান গিয়াছে; মোগল আসিয়াছে; ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলি রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই পরম নিশ্চেষ্ট, পারমার্থিক জাতি তাহার ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া এই রক্তপাতের সহিত নিজ হৃদয়-রক্তের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে নাই, এই শোণিতোৎসবে নিজ প্রাণমন রাঙ্গাইয়া দেয় নাই।

(৪) 'সীতারাম' বা 'দেবী চৌধুরাণী' খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস। ইহাদের মধ্যে যাহাকিছু ঐতিহাসিকতা, তাহা কেবল ইহারা অতীত যুগের আখ্যায়িকা বলিয়া। কোন গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ইহাদের সংযোগ নাই। সীতারাম ইতিহাসের পুরুষ হইলেও, প্রধানতঃ তাঁহার নৈতিক ও গার্হস্থ্য-জীবনের সমস্যাই আলোচিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইতিহাস একেবারেই অনুপস্থিত; তবে ইতিহাস ও ধর্মের ক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত একটি কাল্পনিক আদর্শের জ্যোতি ইহার সামাজিক জীবনের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এই দুইটি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক আখ্যা না দিয়া, বা অতীতের সমাজচিত্র বলিয়া মনে না করিয়া, কেবল ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যা-হিসাবে আলোচনা করিলেই ভাল হয়।

'কপালকুণ্ডলা'তেও রোমান্সের অপরূপ মায়ার পার্শ্বে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও বিশেষত্ববর্জিত বলিয়াই বোধ হয়; ঐতিহাসিক অংশটুকু যেন মায়াময় সৌন্দর্যের রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার অনুপম, সমাজবন্ধনমুক্ত চরিত্রমাধুর্যের সঙ্গে চক্রান্তকুটিল রাজনৈতিক ইতিহাসের সংযোগ বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানেও ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বঙ্কিম তাহা পারেন নাই। তবে বঙ্কিমের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, এবং স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও তিনি যতটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভারই পরিচয়। স্থানে স্থানে তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতীত যুগের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরিয়াছেন, বা কোন ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষের আসল ব্যক্তিত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব-সত্ত্বেও অনুভব করা যায়। 'চন্দ্রশেখর'-এ জনসন্ ও গলস্টন্

প্রতাপের গৃহদ্বারের রুদ্ধ কপাটে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই পদাঘাতই ভারতে প্রথম যুগের ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগর্বিত আত্মাভিমানের যেন মূর্ত বিকাশ—এই এক পদাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুস্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে। 'মৃণালিনী'তে মুসলমান বিপ্লবের পর বক্তিয়ার খিলিজির সম্মুখে প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক পশুপতির যে বিবেকভীরু, কর্তব্যবিমূঢ়, অর্ধ-অনুশোচনা-অর্ধ-আত্মপ্রসাদমিশ্রিত ভাব তাহা ঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হউক, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার (historical imagination) পরিচয় দেয়। 'রাজসিংহ'-এ আরংজেবের যে কুটিল, ভাবগোপনদক্ষ, হাসির আবরণের মধ্যে বজ্রকঠিন প্রকৃতিটির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রমাণনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারের দ্বারা ইতিহাসের একেবারে মর্মস্থানে গিয়া হাত দিয়াছেন, সমস্ত জটিল ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যুগবিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের আসল স্বরূপটি টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইল। পরে যখন এই সমস্ত উপন্যাস আলোচিত হইবে, তখন কেবল তাহাদের কলাকৌশলের দিক্‌টাই লক্ষ্য করিতে হইবে, ঐতিহাসিক অংশ সম্বন্ধে অভিমতের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

রমেশচন্দ্র

(ক) ঐতিহাসিক উপন্যাস

(১)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির আলোচনা করিলেই বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের একটি বিভাগ সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে এক রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেই পাওয়া যায়। বঙ্কিমের সহিত তুলনায় কল্পনাকুশলতা তাঁহার অনেক কম। এই কল্পনাকুশলতার অভাবই সাধারণতঃ তাঁহার ভাবদৈন্যের কারণ ও জীবন-সমস্যার গভীর আলোচনার পক্ষে অন্তরায় হইলেও, অধিকতর সত্যনিষ্ঠার হেতু হইয়াছে। রমেশচন্দ্র কল্পনার আতিশয্য বা আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে চাহেন নাই, পরন্তু যথাসাধ্য সত্যচিত্রণেরই প্রয়াসী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ-বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতদূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্রের চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে স্থূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম উপন্যাসদ্বয়—'বঙ্গ-বিজেতা' ও 'মাধবী-কঙ্কণ'—এক শ্রেণীর অন্তর্গত; শেষের দুইখানি উপন্যাস—'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'-কে অপর শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম শ্রেণীতে কল্পনার আধিপত্য; দ্বিতীয় শ্রেণীতে সত্যনিষ্ঠার অধিক প্রাদুর্ভাব—কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের অনুগামী হইয়াছে। প্রথম দুইখানি উপন্যাসের বর্ণনীয় বস্তু ও মুখ্য চরিত্রগুলি প্রধানতঃ কাল্পনিক; কেবল ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসদ্বয় প্রধানতঃ ইতিহাসের সংশয়হীন ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত কাল্পনিক বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা কেবল বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিতেছে; তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শূন্য স্থানটুকু আছে, তাহাদিগকে রসে ও বর্ণে ভরিয়া তুলিতেছে। অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্যের চারিদিকেও কল্পনা-শক্তির ক্রীড়ার যথেষ্ট অবসর আছে। ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে, ঐতিহাসিক বাহ্য ঘটনাকে মানুষের প্রকৃত জীবনের ও হৃদয়াবেগের সহিত, ইতিহাসকে মানব মনের নিগূঢ় রসলীলার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য। রমেশচন্দ্রের শেষের দুইখানি উপন্যাসে যে কল্পনার পরিচয় পাই, তাহা মুখ্যতঃ এই জাতীয়। তাহা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী নহে, অনুগামী; তাহা ইতিহাসকে বিকৃত করে না, কেবল বিস্মৃতি মলিন সত্যের রেখা-

গুলির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের গতি কাল্পনিকতা হইতে সত্যনিষ্ঠার দিকে; প্রথম উপন্যাসদ্বয়ে যে ইতিহাস অপ্রধান ছিল, শেষের উপন্যাস দুইখানিতে তাহা প্রধান হইয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রসার এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের বীরত্বকাহিনীতে একটা প্রবল, প্রচুর রসধারার আবিষ্কার।

'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৩ খৃঃ অঃ) রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা; একটা অপরিণত হস্তের চিহ্ন ইহার সর্বত্রই বিরাজমান। ইহার ঐতিহাসিক অংশ রমেশচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একেবারে শুষ্ক, নীরস ও প্রাণহীন; কোন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে সংকলন বলিয়া বোধ হয়। জীবনের বেগবান্ স্পন্দন ইহার মধ্যে নাই; মানবের সাধারণ জীবন ও মানব-মনের গূঢ় রসধারার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। এমন কি কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষের পরিচিত মূর্তি হইতে একটা ক্ষীণ জীবন-স্পন্দনের অনুরণনও এই গ্রন্থবর্ণিত যুগের উপর সংক্রামিত হয় নাই। অবশ্য রাজা টোডরমল্লকে এই যুগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে; কিন্তু তিনিও বিশেষ জীবন্তভাবে চিত্রিত হন নাই এবং তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসধারার উপর কোন বিশেষত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের শেষে টোডরমল্ল যখন ইচ্ছাপুরে আহূত হন, তখন হিন্দু রাজার সভাড়ম্বর ও অভ্যর্থনাবিধির একটি চিত্র দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু এ বর্ণনাও বিশেষত্ববিহীন বলিয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। পরবর্তী গ্রন্থসমূহে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়দের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক যে সত্য ও জীবন্ত চিত্র পাই, তাহার সহিত তুলনায় এই চিত্র নিতান্ত নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এইখানেই আমরা বঙ্কিমের সঞ্জীবনী কল্পনাশিখার অভাব অনুভব করি; কল্পনা ও সত্যের মধ্যে সত্যই আদরণীয়, কিন্তু সত্য যেখানে প্রাণহীন, সেখানে কল্পনার রাজ্য হইতেও জীবনস্পন্দন-আনয়ন আর্টের পক্ষে অধিকতর কাম্য।

চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়াও এক বিরাট প্রাণহীনতা এই গ্রন্থের পাতাগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, বিমলা, প্রভৃতি সমস্ত চরিত্র conventional, বিশেষত্ববর্জিত। তাহাদের সকলেরই মধ্যেই একটা অস্পষ্টতা, বা ক্ষীণতা ও জীবনী-শক্তির অভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের জীবনের গোপন রহস্যটি প্রকাশিত হয় নাই, সেই অবর্ণনীয় কিন্তু অনায়াসবোধ্য জীবনের সুরটি বাজিয়া উঠে নাই। গল্পের villain শকুনিও এই অস্পষ্টতার হাত এড়ায় নাই, সে সম্পূর্ণ conventional. মহাশ্বেতার জিঘাংসাপূর্ণ হৃদয়ে বাস্তবতার ক্ষীণ স্পন্দন কতকটা অনুভব করা যায়। গ্রন্থের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে কেবল সরলা ও অমলার সখিত্বটুকুই কতকটা বাস্তবের সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে ও সহজেই অন্যান্য চিত্র হইতে পৃথক্ হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের চিত্রগুলির সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ উপেন্দ্রনাথ ও কমলা গ্রন্থমধ্যে বাস্তব-অবাস্তবের ভিতর যে ক্ষীণ ভেদ-রেখা আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বপ্নের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। এখানেও রমেশচন্দ্র অপেক্ষা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব অনায়াসেই অনুভব করা যায়। ইন্দ্রনাথের প্রতি বিমলার গোপন আকর্ষণ জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার ব্যর্থ-প্রেমের

একটা অক্ষম অনুকরণ মাত্র। বঙ্কিম নিজ প্রতিভার বলে এই সাধারণ প্রেমের চিত্রটিকে একটি dramatic climax, নাটকোচিত চরম পরিণতি ত লইয়া গিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে মানব-মনের গূঢ় মাধুর্য ও বেদনা ঢালিয়া দিয়া উহাকে আর্টের উচ্চস্তরে উঠাইয়া লইয়াছেন। রমেশচন্দ্র কল্পনাদৈন্যবশতঃ ইহার মধ্যে রসধারা প্রবাহিত করিতে পারেন নাই, কেবল একটা শুষ্ক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

'বঙ্গবিজেতা'তে রমেশচন্দ্র তাঁহার ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশেষ কিছু পরিচয় দেন নাই; কেবল ভবিষ্যতের আলোকে দুইটি দিক্ দিয়া তাঁহার ক্রমোন্নতির ক্ষীণ সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিগ্রহ-বর্ণনায় প্রথম হইতেই তাঁহার কতকটা সিদ্ধহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার প্রথম রচনায় সমস্ত অপরিপক্কতা ও অস্পষ্টতার মধ্যে এই এক যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ বাস্তবপ্রিয়তা ও একটা প্রকৃত আবেগ দেখা যায়। তাঁহার রক্তের মধ্যে কোথাও একটা রণোন্মাদ, একটা যুদ্ধ-সংগীতের ঝংকার সুপ্ত ছিল; তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসসমূহে এই যুদ্ধ-সংগীত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে এবং একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আর দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি-বর্ণনায়ও তাঁহার কতকটা সজীবতা ও দক্ষতার চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রকৃতির শান্তস্তব্ধ গাম্ভীর্য যেন তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনায়ও এই গভীর ভাব, এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমের কবিত্বময় প্রকৃতি-বর্ণনা বা রবীন্দ্রনাথের গূঢ় অন্তরঙ্গ স্পর্শটি তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য-সম্বন্ধে তাঁহার একটা সহজ সরল অনুভূতি, একটা জীবন্ত রসবোধ আছে। পরবর্তী উপন্যাসসমূহে এই গুণগুলি আরও বিকশিত হইয়াছে।

'বঙ্গবিজেতা'র তিন বৎসর পরে (১৮৭৬ খৃঃ অঃ) রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ' প্রকাশিত হয়। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি কলাকৌশল ও চরিত্রসৃষ্টিতে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। 'বঙ্গবিজেতা' একজন অপরিপক্ক তরুণের রচনা; 'মাধবীকঙ্কণ' একেবারে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনা। এই দুই-এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান।

'মাধবীকঙ্কণ' মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস; ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ। উপন্যাসের নায়ক গৃহত্যাগী হইয়া রাজনৈতিক জালের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন, এবং ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তখন যে রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইতেছিল তাহাতে একটি নিতান্ত সামান্য অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কাজে কাজেই ইতিহাস গল্পের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে; কিন্তু নায়কের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সহিত ইহা একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির এমন একটা বাস্তব, তথ্যপরিপূর্ণ, জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা একটা গুরুতর রাজনৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে, উহারা আমাদিগকে এই নীরস, যন্ত্রবদ্ধ, বণিগ্‌ধর্মী জীবন হইতে অতীতের এক বীরত্বপূর্ণ, গৌরবমণ্ডিত যুগে লইয়া যায়, সেখানে আমরা একটি মুক্ততর, বিশালতর জীবনের আস্বাদ পাই, যেখানে জীবন দুইটি পরস্পর-বিরোধী মহান্ আদর্শের দ্বন্দ্বক্ষেত্র, যেখানে কেবল বাঁচিয়া থাকিবারই

প্রবল চেষ্টায় মানুষের সমস্ত জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হইত না। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও আমরা এই বিপদসংকুল, গৌরবময়, বীরত্বকাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে নীত হই। এই হিসাবে রমেশচন্দ্র স্কটের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। 'মাধবীকঙ্কণ'-এ এই অতীত যুগের যে খণ্ড চিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহারাও স্বতঃই আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, বিশেষ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও আমরা তাহাদের সাধারণ সত্যতা মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই না। রাজমহলে সুজার দরবারের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তৎকালীন মোগলসম্রাটদের যথেচ্ছাচারিতা ও তোষামোদপ্রিয়তা, মোগল আমলাতন্ত্রের কুটিলচক্রান্তজালে সত্য কিরূপে লুপ্ত হইত, রামের বিষয় শ্যামের নিকট হস্তান্তরিত হইত, আজিকার জমিদার কাল পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেন, এই সমস্ত বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। নর্মদাযুদ্ধে পরাজয়ের পর যশোবন্ত সিংহের মাড়ওয়ার প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার মেওয়ারী ও মাড়োয়ারী সৈন্যদলের মধ্যে যে একটা লঘু হাস্য-পরিহাসের, একটা জাতিবিরোধমূলক কৃত্রিম কলহের ছোট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা ইতিহাসের বিশাল ঘটনার অন্তরালে মানুষের সংকীর্ণ সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি বলিয়া বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

তারপর বারাণসীর, ও নরেন্দ্রের বন্দী হওয়ার পর দিল্লীনগরের, যে জনবহুল, সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ চিত্র ও মোগলরাজ-অন্তঃপুরের যে চমৎকার সৌন্দর্য-বর্ণনা পাই তাহা কবিত্ব-হিসাবে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'-এর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে সত্যের সুরটি প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের আর একটি বিশেষ কলাকৌশল এই যে, মোগল-প্রাসাদের এই ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য নরেন্দ্রের বিস্ময়াবিষ্ট, বিপদবিমূঢ় মনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া, অনিশ্চয় ও সন্দেহের বাষ্পের মধ্যে দেখা দিয়া, আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐশ্বর্যের চিত্রগুলি যেন একটা উজ্জ্বল ছায়াবাজির মত তাহার অর্ধবিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া দ্রুত-সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছে। জেলেখার ব্যর্থ-প্রেমের করুণ কাহিনী নরেন্দ্রের স্বপ্নাবিষ্ট, উদাসীন মনের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত অনুরণিত হওয়ায় ইহার রহস্যময় সৌন্দর্যটি গাঢ়তর হইয়াছে। বাস্তবিক জেলেখার প্রেমটি, ইহার বিপদ্‌সংকুল আরম্ভ হইতে বিষাদময় পরিণতি পর্যন্ত যেরূপ অভ্রান্তভাবে একটি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে রাখা হইয়াছে, একটা আলো-আঁধারমেশা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া নীত হইয়াছে, তাহা খুব উচ্চ অঙ্গের কলাকৌশলের পরিচায়ক। এই অস্পষ্ট সাংকেতিকতাই (suggestiveness) এই প্রেমের রোমান্টিক সৌন্দর্যটি নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্র 'মাধবীকঙ্কণ'-এ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উন্নতি কেবল ঐতিহাসিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নহে। নরেন্দ্র-হেমলতার অন্তর্গূঢ়, প্রতিরুদ্ধ প্রণয়ের যে করুণ চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপন্যাস-সাহিত্যে বিরল। এই প্রেমের তীব্র জ্বালাময় আবেগ নরেন্দ্রকে গৃহছাড়া করিয়া তাহাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে ছুটাইয়াছে। ইহা হেমলতার মৌন, আত্মসংযমশীল হৃদয়ে বিষদিগ্ধ তীরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার যৌবনের সরস সৌন্দর্য, মুখের তরল হাসি শুকাইয়া তুলিয়াছে। বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রণয়চিত্র পাওয়া যায় তাহারা আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য হয় বিশেষত্বহীন, নয় অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে;

হয় তাহারা অতিরিক্ত সমাজবন্ধনের জন্য নির্জীব ও রসহীন হয়, নয় সমাজের বাস্তব অবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া এক শূন্যগর্ভ, অস্বাভাবিক আদর্শের দিকে উড়িয়া যায়। রমেশচন্দ্র অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার প্রণয়চিত্রটিকে এই উভয়বিধ অতিরেক (excess) হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমাজোপযোগী হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ তীব্র আবেগময় ও উচ্ছ্বসিত জীবনরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই বালক-বালিকাদের শৈশব-ক্রীড়ার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের উগ্র রোষপ্রবণ, উদ্দাম প্রকৃতিটিতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রেমের ব্যর্থ, বিষাদময় পরিণতির সুস্পষ্ট পূর্বভাস পাওয়া যায়। এই প্রেমচিত্রটিতে সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। নরেন্দ্র ও শ্রীশ উভয়ের সঙ্গে হেমের ব্যবহারের যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা লেখক অল্প কথায় কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরেন্দ্রের উচ্ছ্বসিত, অদম্য-রোষাভিমান-ক্ষুব্ধ প্রণয় হেমের সমস্ত বাহ্য সংকোচ ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ দুর্নিবার বেগ তাহার হৃদয়ের গোপন স্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে, নিজ মায়াময় স্পর্শে তাহার অন্তরে গভীর প্রেমকে সজাগ ও উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে; শ্রীশের শান্ত, চাঞ্চল্যহীন ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কেবল গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে। বাহ্যতঃ হেমের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য অসংকোচে শ্রীশকে আশ্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহার বালিকাহৃদয়ের সমস্ত নীরব, ফুটনোন্মুখ প্রেম নরেন্দ্রের জন্য গোপনে সঞ্চিত রহিয়াছে। সেইজন্য তাহার পরিবারস্থ সকলেই, তাহার পিতা পর্যন্ত তাহার প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধাকে প্রেমের চিহ্ন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। কেবল এক শৈবলিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সহানুভূতিই তাহাকে এই গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়াছে।

আবার ত্রিংশ পরিচ্ছেদে হেমলতার বিবাহিত জীবনের, শ্রীশের সহিত দাম্পত্য প্রেমের যে ছোট ছবিটি দেওয়া হইয়াছে তাহার রেখাগুলি কত ক্ষীণ, কত বর্ণ-বিরল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার মত একটা ম্লান, শান্ত-সংযত সৌন্দর্য তাহার উপর সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রেমের উজ্জ্বল শক্তির, বিদ্যুদ্দীপ্তির কিছুই নাই। হেমের শুষ্ক মুখ ও যৌবনোচিত উচ্ছ্বাসের অভাবই তাহার অন্তরের গভীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাক্ষ্য প্রদান করে।

পক্ষান্তরে নরেন্দ্র ও হেমের মধ্যে যে দুইটি দৃশ্য অভিনীত হইয়াছে তাহারা যেন আগ্নেয় অক্ষরে লেখা। এরূপ কৃত্রিম উচ্ছ্বাস ও শব্দাড়ম্বর-বর্জিত, অথচ স্বচ্ছ, সরল, তেজঃপূর্ণ ভাষায় বাংলা উপন্যাসে আর কোথাও প্রেমের বাণী নিবেদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ প্রথম বিদায়ের দিন নরেন্দ্রের হৃদয়ের প্রজ্বলিত অভিমানবহ্নি যেন তাহার প্রত্যেক বাক্যকে একটা বিদ্যুদ্‌গর্ভ শক্তি, একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি ও দাহ দিয়াছে। প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই একটা বজ্রকঠোর অথচ স্নেহসজল প্রত্যাখ্যানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। আর উপন্যাসের শেষভাগে মাধবীকঙ্কণের যমুনায় বিসর্জনের দৃশ্যে, উদ্ধত বিদ্রোহের পর শান্ত বিসর্জনের ও মৃদু সান্ত্বনার সংযত মাধুর্য আমাদের হৃদয়কে আর এক রকমে স্পর্শ করে। এই দৃশ্যে হেমলতার কথাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে অলংকারবাহুল্যের, নীতিকথার অযথা প্রভাবের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তথাপি মোটের উপর যে সুরটি শুনিতে পাই তাহা মানবহৃদয়ের গভীরতম ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ। শুষ্ক ছিন্ন মাধবীকঙ্কণটি নরেন্দ্র-হেমলতার অপ্রাপ্যব্যর্থ

কিন্তু অক্ষুণ্ণ-প্রভাবশীল প্রেমের একটি জীবন্ত রূপকে (symbol) রূপান্তরিত হইয়াছে। এই দুইটি দৃশ্যে রমেশচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেদীপ্যমান।

'মাধবীকঙ্কণ'-এর এই দৃশ্যগুলি স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমের সহিত 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই উভয় প্রেমচিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই রমেশচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া পারা যায় না। বঙ্কিম প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমের মধ্যে একটা তীব্র আবেগ ভরিয়া দিয়া, তাহাকে এক বর্ণ-বহুল রোমান্সের আবেষ্টনে ফেলিয়া, এবং একটা আদর্শ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তাহার অবসান ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে বাস্তব-জগৎ হইতে অনেক উচ্চে, একটা সুদূর কল্পলোকের চন্দ্রালোকের মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছেন। তিনি একজন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নানা অদ্ভুত ও বিচিত্র ব্যাপারের সংযোগে, বিবিধ রূপরসের সংমিশ্রণে, বাস্তব জীবনের প্রেমে কল্পলোকের আদর্শ সৌন্দর্য আরোপ করিয়াছেন। আদর্শলোকের এই সমস্ত আলোকরশ্মির সমাবেশে বাস্তবতার ক্ষীণ ভিত্তিটি একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। প্রথম যৌবনে যখন আমাদের চক্ষু হইতে মোহের অঞ্জন সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই, যখন একটা স্বপ্নময় আবেশ সুরভি নিঃশ্বাসের মত আমাদের প্রাণের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে, তখন কল্পনার এই ইন্দ্রজাল, এই আকাশ-সৌধের বর্ণ-সমাবেশকৌশল ও বিরাট সমন্বয়সৌন্দর্য আমাদিগকে একটা সুখের নেশার মত পাইয়া বসে, একটা মদির বিহ্বলতায় আমাদের বিচারবুদ্ধির সতর্ক দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দেয়। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আমাদের বিচারবুদ্ধি যৌবনের মোহ কাটাইয়া জাগিয়া উঠে ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা এই অপার্থিব সৌন্দর্যের বাস্তব স্বরূট আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে, তখনই আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বাস্তবতার সংমিশ্রণ কত অল্প; এবং যে যাদুবিদ্যার দ্বারা লেখক আমাদের সাধারণ জীবনের চারিদিকে এত অবাস্তব সুষমা পুঞ্জীভূত করিয়াছেন, তাহার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই। কিন্তু মোহভঙ্গের এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও আমরা লেখকের অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। যে কল্পনার বলে তিনি এই স্বপ্নলোককে পৃথিবীর পরিচিত বেশে সাজাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ শক্তি নহে। এই কল্পনাসৃষ্ট রোমান্স যে অপ্রাকৃত হয় নাই, ইহার মধ্যে যে একটা স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ সংগতি ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে একটা গূঢ় সংযোগ আছে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের চরম কৃতিত্ব।

রমেশচন্দ্রের শক্তির প্রসার যে বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক কম, এবং কল্পনার ইন্দ্রজালরচনা যে তাহার সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই সরল সত্যনিষ্ঠাই আমাদের পরিণত বিচারবুদ্ধির নিকট তাঁহার নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমচিত্রকে বঙ্কিমের প্রতাপ-শৈবলিনীর চিত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। যেমন অনেক সময়ে সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বর্ণপ্লাবন অপেক্ষা সবল, অকম্পিত হস্তের একটি সরল, বর্ণবিরল রেখা আর্টের দিক্ দিয়া অধিক আদরণীয় হয়, সেইরূপ রমেশচন্দ্রের এই বাস্তব প্রেমের সহজ অকৃত্রিম চিত্র বঙ্কিমের সমস্ত উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়কে অধিক গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক যে অল্প সময়ের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ ও

বৃক্ষ হইতে ফল উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই সমধিক বিস্ময়কর ; কিন্তু মোটের উপর গাছের ফলই বেশি রসযুক্ত ও মিষ্ট। এক্ষেত্রে প্রকৃত ও গভীর রসের দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩)

রমেশচন্দ্রের অপর দুইখানি উপন্যাস—'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯) —প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক, সাধারণ মানবের জীবনের কথা তাহাদের মধ্যে খুব অল্প স্থান অধিকার করে। অবশ্য ইতিহাসের উদ্দীপনা, বিপুল ঘটনাপুঞ্জের পরস্পর সংঘাতের যে আকর্ষণ তাহা ইহাদের মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু ইতিহাসের বিপুল বেগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য-জীবনকে নিয়মিত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এক কথায়, এই উপন্যাস দুইখানির মধ্যে আমরা উপন্যাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব অনুভব করি।

অবশ্য ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির স্ফুরণ ও মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপেও যেমন, আমাদের নিভৃত গৃহকোণস্থিত, স্তিমিত দীপশিখাতেও তেমনি, একই উপাদান, একইরূপ স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। সাধারণ জীবনের মুক্ত প্রান্তর ও সমতল ভূমি দিয়া যে নদী ধীর, শান্ত প্রবাহে বহিয়া যায়, ইতিহাসের উপলসংকুল, বাধাবিঘ্নভূয়িষ্ঠ ক্ষেত্রে তাহাই ফেনিল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে। ইতিহাসের বিপুল ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে পড়িয়া আমাদের এই ক্ষীণ জীবনস্পন্দন উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে, একটা হিংস্র, তীব্র ভীষণতা লাভ করে, এবং নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিকাশের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এইরূপ কোন চিত্র নাই। রাজপুত বীরের ইতিহাসবিশ্রুত আত্মবিসর্জনের ও রাজপুতরমণীর চিতানলে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণের যে দৃশ্য আমরা 'জীবন-সন্ধ্যা'তে পাই, তাহার একটা চিত্রসৌন্দর্য (picturesqueness) আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মনস্তত্ত্বমূলক উচ্চতর সৌন্দর্য নাই।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস দুইখানিতে ঐতিহাসিক সংঘাতের অবসরে যে দুই একটি কোমলতর বৃত্তির চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও মলিন। তাঁহার নায়কেরা কেহ কেহ যুদ্ধ-কোলাহলের অবসরে প্রেমের তান ধরিয়াছেন বটে, বর্ম খুলিয়া রাখিয়া প্রেমিকের পুষ্পমাল্য পরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রেম মোটেই জীবন্ত ও রসপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। 'জীবন-প্রভাত'-এ রঘুনাথ ও সরযূবালার প্রেম নিতান্তই নির্জীব ও বিশেষত্বহীন ; সংকটকালের যে একটা দুর্নিবার বেগ, একটা হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত ভাব 'রাজসিংহ'-এর প্রেমচিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার কিছুই এখানে দেখিতে পাই না। লক্ষ্মীবাঈয়ের শান্ত, গভীর, একনিষ্ঠ প্রেম অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা সুস্পষ্ট হয় নাই। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রেমেও কতকটা অভিমান এবং অলীকসন্দেহজাত জটিলতা থাকিলেও, জীবনস্পন্দনের চিহ্ন বিশেষ স্ফুট নহে। তবে এখানে বিপদের কালো মেঘ প্রণয়াবেশের উপর যে একটা নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আভাস মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে ; বিশেষতঃ, ভীলবালিকার গোপন ঈর্ষ্যা ও বালিকাসুলভ দুষ্টামি ইহার মধ্যে কতকটা বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর এখানে ইতিহাসেরই একাধিপত্য ;

রণডঙ্কার নিনাদে ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের ক্ষীণ, করুণ, রস-বিচিত্র সুরটি ঢাকিয়া গিয়াছে। ইতিহাসমহাবৃক্ষের ছায়ায় আমাদের সাংসারিক ফুলগাছটি বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

তবে কেবল ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই উপন্যাসদ্বয়ের নিতান্ত অল্প প্রশংসা প্রাপ্য নহে। মহারাষ্ট্রের উত্থান ও রাজপুতের পতন ভারতেতিহাসের দুইটি কীর্তিভাস্বর পৃষ্ঠা; এই দুইটি পৃষ্ঠাতে যত অনুপম বীরত্ব, যত উচ্চ ও পবিত্র হৃদয়াবেগ, যত গৌরবময় অনুভূতি ঘনীভূত হইয়া ইতিহাসের তুষারশীতল পাষাণফলকে নিশ্চল হইয়াছিল, রমেশচন্দ্র সেগুলিকে কল্পনার শিখায় দ্রবীভূত করিয়া মানব-মনের সজীব ভাবপ্রবাহের সহিত তাহাদের পুনর্মিলন সাধন করিয়া দিয়াছেন। এইটিই তাঁহার প্রধান গৌরব। তিনি ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানব-মনের বিস্ময়কর বিকাশ, ইহার বিস্ফোরক শক্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়াছেন, ইতিহাসের চিত্র-সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; যুগে যুগে যে কয়েকটি শক্তিশালী পুরুষ নিজ ইচ্ছাশক্তি, উচ্চাভিলাষ, প্রভৃতির সংঘাতের দ্বারা ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা হৃদয়বিশ্লেষণকে উপন্যাসের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা প্রত্যেক মানুষকে শ্রেণীবিশেষের আবেষ্টন ও বাহ্য সংঘাতের অনুচিত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাহার নিজ স্বাতন্ত্র্যবিকাশকে খুব সূক্ষ্মভাবে, যেন অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া, পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য রমেশচন্দ্রের রচনায় চিত্র সৌন্দর্যে বা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির একটা সাধারণ বিকাশে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। বাস্তবিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক্ হইতে রমেশচন্দ্র খুব উচ্চ প্রশংসার অধিকারী নহেন। স্কটের মত তাঁহারও মনস্তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রাথমিক (elementary) রকমের; বাহ্য ঘটনার সংঘাত ফুটাইয়া তুলিতে তিনি এত ব্যস্ত, ইতিহাসের বৃহত্তর বিকাশগুলিতেই তিনি এত নিবিষ্টচিত্ত যে, অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব বিপ্লব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার অবসর হয় নাই। তিনি যে যুগের ঔপন্যাসিক, তখন আধুনিক উপন্যাসের বিশ্লেষণমূলক আদর্শ এতটা প্রাধান্য লাভ করে নাই। মানবচিত্তের উপর বহির্জগতের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আধুনিক ও পূর্বতন উপন্যাসের মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। রমেশচন্দ্র যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহারা মানুষকে একটা বিশাল বাহ্যসংঘাতের মধ্যে স্থাপন করিয়া সেই সংকটকালে তাহার মানসিক অবস্থা ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতে ভালবাসিতেন। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জগৎ হইতে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত; এক্ষেত্রে তাহার সুদীর্ঘ যুগব্যাপী চিন্তার, ধীর মন্থর আত্মবিশ্লেষণের অবসর নাই। তাহাকে ক্ষণিক চিন্তার পর মতি স্থির করিতে হইবে; যে তরঙ্গ তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত, তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক উপন্যাসে খুব সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের স্থান নাই। এমন কি তাহার চিন্তাধারার মধ্যেও বহির্জগতের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বাহ্য ঘটনার গতিবেগের সহিত তাল রাখিয়াই তাহাকে নিজের চিন্তা নিয়মিত করিতে হইবে। দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব, রাজনৈতিক কর্তব্যের সহিত পারিবারিক কর্তব্যের বিরোধ হইলে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিব, দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিজ ব্যবহারের সুসংগতি ও সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা করিব, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুই

পরস্পর-বিরোধী নীতির মধ্যে কাহাকে বরণ করিয়া লইব—ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রদের মনের মধ্য দিয়া এইরূপ চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং উহাদের উপরে বহির্জগতের প্রভাব নিতান্ত সুস্পষ্ট। কাজে কাজেই ইহার নায়কেরা প্রায়ই অস্পষ্ট ও ছায়াময় হইয়া থাকে; তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বে তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা যে মুহূর্তমাত্র চিন্তার অবসর পায়, তাহাতেই তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপটি, চিত্তবিপ্লবের চিত্রটি যাহা কিছু ফুটিয়া উঠে। তাহার পরই যখন তাহারা আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তরঙ্গের সহিত ভাসিয়া যায়, তখন আর তাহাদের ব্যক্তিত্বটি খুব স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট থাকে না; কেবল তাহাদের মস্তকের উপর যশঃকিরীট সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করিতে থাকে মাত্র। সুতরাং স্কট ও রমেশচন্দ্রের নায়কেরা প্রায়ই ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্রে অস্পষ্ট জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের আসল ব্যক্তিত্বটি নিজ অনিন্দনীয় চরিত্রের অন্তরালে চাপা পড়িয়া যায়। আমাদের রঘুনাথজী হাবিলদার ও তেজসিংহ অনেকটা এই দুরবস্থার ভাগী হইয়াছেন। তাঁহারা আদর্শ বীরত্বের মূর্ত বিকাশ হইয়াছেন মাত্র, একটা সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আধুনিক উপন্যাসে বাহ্যসংঘাতের প্রসার অনেকটা খর্ব করিয়া মানবচিত্তের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণের অবসর দীর্ঘতর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বহির্জগতের সহিত একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ সম্ভবপর নহে, কেননা মানব মনের অধিকাংশ প্রবল প্রেরণাগুলিও এই বাহিরের জগৎ হইতেই আসে। তবেই এই বাহিরের ক্ষমতার একটা সীমা-নির্দেশ আবশ্যক, যাহাতে ইহা অন্তরের স্বাভাবিক বিকাশকে অযথা অভিভূত না করে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে মানুষ একপাশে সসংকোচে দাঁড়াইয়া আছে। আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার ভিড় যতদূর সম্ভব কমাইয়া মানুষকে প্রধান আসন দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার মানসিক বিক্ষোভের চিত্রটি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাহ্য ঘটনা অনেকটা দুর্দান্ত দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া মানুষের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতেছে এবং তাহাকে অধিক চিন্তার অবসর না দিয়া তাহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব আদায় করিয়া লইতেছে। সেই মুহূর্ত হইতে তাহার মানসিক পরিবর্তন বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক উপন্যাসে বহির্জগতের এই দোর্দণ্ড আততায়ী প্রতাপ অনেকটা ক্ষুন্ন হইয়াছে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনা মানুষের উপর জাল বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে তাহাকে শতবন্ধনের নাগপাশে জড়াইয়া ফেলে, তাহারা তাহার চিত্তকে অভিভূত না করিয়া আত্মবিশ্লেষণের যথেষ্ট অবসর দেয়, প্রত্যেক পাকটি কেমন করিয়া জড়াইয়া আসিতেছে এবং মানুষের মর্মস্থানে অল্পে অল্পে কাটিয়া বসিতেছে, ঔপন্যাসিক আমাদিগকে তাহা দেখাইবার সুযোগ পান। এইজন্যই আধুনিক উপন্যাসে বিশ্লেষণের প্রাধান্য এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই গুণের অভাবের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার উদ্দেশ্য ও সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করেন না।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশ্লেষণের অভাব অন্য দিক দিয়া পূরণ করে। ঘটনা বৈচিত্র্যে, একটা সমগ্র যুগের ব্যাপক বর্ণনায়, উচ্চভাব ও আদর্শের বিকাশে ও বীরত্ব-কাহিনীর প্রাচুর্যে

ইহা মানুষকে এমন একটি তৃপ্তি দেয়, এমন একটি বর্ণবহুল সৌন্দর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে, যাহা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা আমাদিগকে দিতে পারে না। অন্য সাহিত্যের পক্ষে যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ইহা একটি অবিসংবাদিত সত্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব-জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে এক বিচিত্র রসের আস্বাদ দেয়; এবং রমেশচন্দ্র এই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন, এক শূন্য পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের ক্ষীণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে-জাতীয় অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব, তাহা তাঁহার উপন্যাসে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, জাতীয় ভাগ্যবিধাতা বীরপুরুষদের জীবন্ত-চিত্র, গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিবরণ, যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চকর, উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা—এই সমস্তই রমেশচন্দ্রের আখ্যান-বস্তু। দূতের ছদ্মবেশধারী শিবজীর মোগল-শিবিরে গমন, তাঁহার দুঃসাহসিক নিশীথ-অভিযানে, রুদ্র-মণ্ডল দুর্গ-জয়ের জ্বলন্ত বর্ণনা, দিল্লী হইতে বিপদ্‌সংকুল গোপন পলায়ন, বিশ্বাসঘাতক চন্দ্ররাও-এর বিচারকালে শিবজীর দীপ্ত তেজ ও বজ্রকঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আহেরিয়ার মৃগয়া, রাঠোর-চন্দাবতের বংশপরম্পরাগত চির-বৈরিতা, রাজপুত-বীরের অসাধারণ স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও রাজপুতরমণীর ভয়ংকর আত্মাহুতি—এই সমস্ত দৃশ্য আমাদের মনের গভীরতম স্তরে মুদ্রিত হয়। ভারত-ইতিহাসে চাণক্যের পর আর কোন চতুর রাজনীতিজ্ঞ আমাদের নিকট সুপরিচিত নহেন এবং চাণক্যের রাজনীতিতেও দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্তেরই, সরল অপেক্ষা কুটিল গতিরই সমধিক প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ, এই রাজনীতির উপর একটা মহান্ আদর্শের গৌরব কোন জ্যোতিরেখা-পাত করে না। সুতরাং শিবজীর রাজনীতি-কুশলতা, যশোবন্ত সিংহের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতা, লোকচরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা, আবার তাঁহার কঠোর অলঙ্ঘনীয় শাসনপ্রথা, বিদ্রোহীর প্রতি ব্যাঘ্রবৎ হিংস্র ভয়ংকরমূর্তি, দক্ষতর চাতুর্যের দ্বারা আরংজেবের শঠনীতির প্রতিরোধ—আমাদের মনে একটা নূতন রকমের কৌতূহল সৃষ্টি করে। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় তেজসিংহ-দুর্জয়সিংহের মধ্যে একটা বংশগত চির-বিরোধ, প্রতাপসিংহের অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ও তাঁহার সামন্ত-গণের অবিচলিত প্রভুভক্তি ইউরোপের মধ্যযুগের feudalism-এর সহিত ভারতের বীরযুগের একটা গভীর ভাবগত ঐক্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশেষতঃ, দেশব্যাপী প্রলয়ের মধ্যে রাঠোর-চন্দাবতের বিরোধ একটি বিশালতর অগ্নিবেষ্টনের মাঝখানে এক অনির্বাণ, ক্ষুদ্র অথচ আকাশস্পর্শী হোমানলশিখার ন্যায় জ্বলে। চতুর্দিকে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই স্থির, অকম্পিত অনলজিহ্বাটি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার মত, ক্রূর দৈবের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, নিশ্চল অঙ্গুলির মত আরও তীব্র ও ভীষণ দেখায়। 'রাজসিংহ'-এ ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে জেবউন্নিসার দীর্ণ, রিক্ত হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন যেরূপ করুণতর সুরে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, এখানেও এই পূর্বপুরুষের রক্তরঞ্জিত জ্ঞাতিবিরোধ, বিদেশীয় আক্রমণকারীর প্রতি সাধারণ বিদ্বেষ ও সাধারণ দেশানুরাগের উচ্চস্বর ছাড়াইয়া আরও উচ্চতর, তীব্রতর সুরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই এই উপন্যাসগুলিকে ইতিহাসের সমতলভূমি হইতে কাব্যের উন্নত, বন্ধুর স্তরে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়া রমেশচন্দ্র যে খুব উচ্চ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই তাহা পূর্বেই

বলিয়াছি এবং ইহার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতিই অনেকাংশে দায়ী। তথাপি তাঁহার শিবজী একটি সম্পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শিবজী একটা অবিমিশ্র বীরত্বের বা নীতিজ্ঞানের মূর্ত বিকাশ মাত্র নহেন; তাঁহার একটি সুস্পষ্ট রকমের ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁহার চতুরতা, তাঁহার সাময়িক ভুলভ্রান্তি, তাঁহার অসংযত রোষোচ্ছ্বাস ও পরুষতা—এইগুলিই তাঁহাকে সাধারণ উপন্যাসের আদর্শ-চরিত্র, প্রেমপ্রবণ, কিন্তু প্রাণহীন বীরের দল হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। শিবজী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন কিনা, সেবিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—অনেকে যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা শিবজীর চরিত্র হইতে এই কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যসমালোচকের পক্ষে ঐ বিতণ্ডা নিতান্তই নিরর্থক—বরঞ্চ সাহিত্যের দিক্ হইতে এই কলঙ্কের জন্যই শিবজীর চরিত্রে একটা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য, একটা সতেজ প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শিবজীর চরিত্র হইতে কলঙ্করেখা নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশপ্রীতি প্রসন্ন হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু শিবজী কলাবিদের হস্তচ্যুত হইয়া, যে অস্পষ্ট-জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত আদর্শ রাজগণ প্রেতের ন্যায় ইতিহাসের মরুভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের দলবৃদ্ধি করিবেন মাত্র।

এই উপন্যাস দুইখানির মধ্যে আর একটি চরিত্রও বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে—তাহা মোগল সম্রাট আরংজেবের। আরংজেবের চরিত্র তাহার অসাধারণ জটিলতা ও গভীরতার জন্য প্রায়শঃই বঙ্গ-সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র আরংজেবের সম্পূর্ণ চিত্র দেন নাই, শিবজীর আখ্যায়িকার সহিত তাঁহার যতটুকু সংস্রব ছিল, তাহাতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। আরংজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে ধর্মান্ধতা ও উচ্চাভিলাষ মিশ্রিত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যে তুমুল কোলাহল তুলিয়াছিল এবং স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞান ও স্নেহ-মমতার সহিত যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার চিত্র রমেশচন্দ্রের সীমার বাহিরে পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি আরংজেবের পরিণত বয়সের কুটিল চক্রান্ত ও সন্দেহ-দিগ্ধ রাজনীতির যে চমৎকার চিত্রটি দিয়াছেন, তাহার সত্যতা ও কলাসৌন্দর্য আমরা স্বতঃই অনুভব করি। দানেশমন্দ ও রামসিংহের সহিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া রমেশচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত আরংজেবের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্ত বাহ্য-দৃশ্যের আবরণ ভেদ করিয়া একেবারে তাহার মর্মস্থলে গিয়া হাত দিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এবং বিশ্লেষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও আরংজেবের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের অনুরূপ কোন চরিত্র 'জীবন-সন্ধ্যা'তে পাওয়া যায় না এবং এই হিসাবে 'জীবন-প্রভাত'ই শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস।

কিন্তু যদিও চরিত্র-সৃজনের দিক্ দিয়া 'জীবন-সন্ধ্যা' অপেক্ষা 'জীবন-প্রভাত' শ্রেষ্ঠতর, তথাপি অন্য একটি বিষয়ে প্রথমোক্ত উপন্যাসখানি আপন শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে। রমেশচন্দ্র প্রতাপসিংহের জীবনব্যাপী স্বাধীনতাসংগ্রামের সমস্ত ভীষণতা যেন মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন, সমগ্র দেশের উপর যে বিপদরাশি কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায় ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা যেন তাঁহার কল্পনাকে এক বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই ভীষণ

সংকল্পের সমস্ত দুঃখক্লেশ, সমস্ত আত্মত্যাগ যেন তাঁহার প্রাণের তারে ঘা দিয়া তাঁহার মুখ হইতে এক সুদীর্ঘ সংগীতোচ্ছ্বাস বাহির করিয়াছে। এই সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি তাঁহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া সেই অতীত heroic age-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও সাধারণ চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিকে অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উপন্যাসখানির সর্বত্রই যে একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনার পরিচয় পাই, তাহা তাঁহাকে এমন কি নূতন চারণ-সংগীত রচনা করিতেও প্রণোদিত করিয়াছে। উপন্যাসের কথোপকথনের মধ্য দিয়াও একটা বাহুল্যবর্জিত, পুরুষোচিত ছন্দ বহিয়া গিয়াছে। এই সহজ, সরল, তেজস্বী ভাষার মধ্যে দৃঢ়পেশীবদ্ধ, কর্মঠ শরীরের ন্যায় একটা সতেজ সৌন্দর্য আছে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এই বীরোচিত, ওজস্বী, অতিনাটকীয়ত্ব-বর্জিত ভাষার প্রথম প্রবর্তনের গৌরব রমেশচন্দ্রের প্রাপ্য। এই গভীর ভাবগত ঐক্য 'জীবন-সন্ধ্যা'তে যেরূপ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, 'জীবন-প্রভাত'-এ ততদূর নহে; এবং ইহাই 'জীবন-সন্ধ্যা'র অন্যান্য অভাব পূরণ করিয়া ইহাকে 'জীবন-প্রভাত'-এর সমকক্ষ স্থান দেয়। 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে দুইখানি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস; বঙ্গসাহিত্যে তাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(খ) সামাজিক উপন্যাস

(৪)

রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া দুইখানি সামাজিক উপন্যাস—'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩) লিখিয়াছেন। এখন এই দুইখানি উপন্যাসের আলোচনা করিলেই রমেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রসার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিবে।

'সংসার' ও 'সমাজ'-এ রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সংকীর্ণ, এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে।

'সংসার' ও 'সমাজ'-এ তিনি পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর, রসপূর্ণ, সহানুভূতিমূলক চিত্র দিয়াছেন, যাহা বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না; মনে হয় যেন সমস্তই কেবল বাস্তব বর্ণনা, পল্লীসমাজের নিখুঁত ফটোগ্রাফ মাত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Jane Austen পড়িতে পড়িতে অনেকটা এইরূপ ভাবের উদয় হয়। লেখিকা এমন সহজ, সরলভাবে ঘটনাবিরল, প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র দিয়া যান, এতই সাবধানে বিশ্লেষণ-বাহুল্য ও গভীরতা বর্জন করেন যে, আমরা মনে করি যে, ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু কলাকৌশল নাই এবং কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী হইলেই আমরাও ঐরূপ লিখিতে

পারিতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই নাই; খুব উচ্চ রকমের কলাকৌশল না থাকিলে নিতান্ত সাধারণ উপাদান হইতে এত সুন্দর মর্মস্পর্শী উপন্যাস রচনা করা যায় না। যে আর্ট আত্মগোপন করিতে পারে, নিজের সমস্ত বাহ্য লক্ষণ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে, তাহাই উচ্চতম আর্ট।

আধুনিক উপন্যাসে যে বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের গুরুতর আতিশয্য দেখা যায়, তাহাকে কোন মতেই অবিমিশ্র গুণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বক্তব্যের সহিত মন্তব্যের, বর্ণনার সহিত বিশ্লেষণের একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন; বিশ্লেষণের আতিশয্যের দ্বারা সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে আর্টের ক্ষতি হয়। বক্তব্য বিষয়টি বেশ গভীররসাত্মক না হইলে, মানব-মনের নিগূঢ় লীলার পরিচায়ক না হইলে, তাহা অতিরিক্ত বিশ্লেষণের ভার সহ্য করিতে পারে না; নিতান্ত সাধারণ বা শূন্যগর্ভ ব্যাপারকে চিরিয়া দেখাইয়া কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ, যে বিশ্লেষণ দুই এক কথায় সারা যায়, সংকেত বা ইঙ্গিতের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা যায়, তাহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা টানিয়া বুনিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটান ও সমস্ত বিষয়টিকে নিতান্ত তিক্ত ও নীরস করিয়া ফেলেন। যাহা পাঠকের সহজ বুদ্ধি স্বাভাবিক সহৃদয়তা বা কল্পনাশক্তির উপরে অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকেও সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া লেখক প্রকারান্তরে পাঠকের বুদ্ধির অপমানই করেন। এই হইল একদিক্; আর একদিকে আমরা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রারম্ভে— আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত উপন্যাস দেখিতে পাই। এখানে মন্তব্য ও সমালোচনার একান্ত অভাব; লেখক কতকগুলি শুষ্ক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বাহির করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই; তাহার নিজের মন্তব্যের দ্বারা সেই ঘটনার কঙ্কালরাশি হইতে কোন প্রাণের রস নিষ্কাশিত করেন নাই, মানব-জীবন সম্বন্ধে কোন গভীর ও ব্যাপক ধারণা ফুটাইয়া তোলেন নাই। এইখানেই বিশ্লেষণের উপকারিতা। বিশ্লেষণ একেবারে বাদ দিলে উপন্যাস আর্টের গৌরব ও গভীরতা হারায়; আবার বিশ্লেষণে অযথা ভারাক্রান্ত হইলে উপন্যাসের স্বচ্ছন্দগতি নষ্ট হয় এবং উহা নির্জীব ও রসহীন হইয়া পড়ে।

রমেশচন্দ্রের এই দুইখানি উপন্যাসে বর্ণনার অনুপাতে বিশ্লেষণ অনেকটা অপ্রচুরই বলিতে হইবে। তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে, তাহার নিগূঢ় রহস্যের জন্মস্থানে প্রায়ই অবতরণ করেন নাই। তিনি জীবনের প্রাথমিক ভাবগুলি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ গভীরতা বা জটিলতা নাই, খুব গুরুতর অন্তর্বিপ্লবেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দ-লালের মত তাঁহার চরিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও প্রবল অনুশোচনা তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 'সংসার'-এ শরৎ ও সুধার প্রেম-বিকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষত্বহীন হইয়াছে; কোন প্রবল আবেগ বা দুর্দমনীয় মনোবৃত্তির বৈদ্যুতিক শক্তি তাহাদের মধ্যে খেলিয়া যায় নাই। এই সমস্ত বিষয়ে রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক পারদর্শিতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইলে ইহা সময়ে সময়ে একটা গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু সামাজিক জীবনের শান্ত

ক্ষীণ প্রবাহের মধ্যে ইহা কেবল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে, কোনরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। রমেশচন্দ্র জীবনের শান্ত প্রবাহ শান্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহার গভীর আবর্ত ও সমস্যাসংকুল জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে তিনি যে সুন্দর, সজীব চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। 'সংসার'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারিণীবাবু ও হেমচন্দ্রের কথোপকথনের দ্বারা বিষয়বুদ্ধিশালী তারিণীবাবুর চরিত্রটি কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য তারিণীবাবুর মধ্যে বিশেষ কোনও গভীরতা নাই; কিন্তু তাঁহার উপর বাস্তবতার ছাপটি একেবারে অবিসংবাদিত; বাস্তব পল্লীজীবনে তাঁহার সহিত আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আবার অল্প কয়েকটি রেখার দ্বারা বিন্দু, কালী ও উমার মধ্যে চরিত্রগত ও অবস্থাগত প্রভেদটিও অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে; উমার হাস্যোজ্জ্বল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত তরুণ জীবনে ভবিষ্যৎ দুঃখের ক্ষুদ্র বীজটি ও তাহার ক্রমপরিণতি লেখক খুব সুকৌশলেই দেখাইয়াছেন। এমন কি কালীতারার তিনটি খুড়ীশাশুড়ীও দুই একটি কথার মধ্যেই খুব সজীব ও পরস্পর হইতে পৃথক্‌ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের চরিত্রসৃজন খুব গভীর না হইলেও সম্পূর্ণ বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে এবং এই গভীরতার অভাবই চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার অন্যতম কারণ। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের পাতায় আমরা যে সমস্ত নরনারীর দর্শন পাই, বাস্তব সামাজিক জীবনে তাহারা আমাদের চিরসহচর—কেননা, আমাদের সমাজের সাধারণ জীবনে গভীর জটিল ভাবের লোক প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর হয় না।

সরল, দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি করুণ ও গভীর সহানুভূতি এই বাস্তব কাহিনীকে একটা ভাবগত ঐক্য দিয়াছে এবং আর্টের উচ্চস্তরে উঠাইয়া লইয়াছে। ধন ও বংশগৌরব অপেক্ষা হৃদয়ের মিলন যে জীবনে অধিক সুখের আকর—এই সত্যই রমেশচন্দ্র দার্শনিকের যুক্তির দ্বারা নহে, আর্টিস্টের রসবোধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'সংসার' উপন্যাসে তাঁহার সমাজ-সংস্কারের উৎসাহ তাঁহার কলাকৌশলকে ছাড়াইয়া যায় নাই; যদিও বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি বর্তমান উপন্যাসে এই উদ্দেশ্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়া আর্টের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। শরৎ ও সুধার জীবন-কাহিনী ও প্রীতির সম্পর্কটি এমন করুণ সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে, তাহাদের বিবাহকে আমরা আর্টের অনুমোদিত ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই গ্রহণ করি; সৌভাগ্যক্রমে সংস্কারকের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নই থাকিয়া যায়।

কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসে সমাজসংস্কারের এই উৎসাহ একেবারে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়া আর্টকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। 'সমাজ' উপন্যাসখানিকে বেশ সহজেই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম অংশের ঘটনাস্থল 'তালপুকুর' ও প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তব-চিত্রণ; দ্বিতীয় অংশে গল্পটি এক সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে এবং একটা নূতন পরিবারের ইতিহাস ও ভাগ্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই অংশের ঘটনাস্থল প্রধানতঃ তালপুকুরের নিকটবর্তী সনাতনবাটী গ্রাম; ইহার নায়ক সনাতনবাটীর জমিদার-বংশ এবং ইহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। এই দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্র খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয় নাই। প্রথম অংশের প্রধান রস আমাদের পূর্ব-পরিচিত

তারিণীবাবুর বৃদ্ধবয়সে পুনর্বিবাহের ব্যাপার লইয়া; ইহাতে হাস্যরস ও ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য, তবে পদ্মলিতা প্রথমা স্ত্রীর। কাহিনীটি এক স্বল্পভাষী করুণায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার যে দৃশ্যটি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে তারিণীবাবু ও গোকুলচন্দ্রের বিবাহবিষয়ক আলোচনা। এ যেন একেবারে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি; আমাদের পারিবারিক জীবনে এরূপ রাজনীতিসুলভ কূটবুদ্ধির, বিনয়-সৌজন্যের আবরণে এরূপ ক্ষুরধার চাতুর্যের এমন সুন্দর, বাস্তবরসপূর্ণ দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও পাই না। নববধূ বালিকা গোপবালার বিষয়বুদ্ধি ও উচ্চাভিলাষের যে সংকেত পাওয়া যায়, তাহাই আমাদিগকে তাহার গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠার পরের কূটবুদ্ধি ও নির্মমতার জন্য প্রস্তুত রাখে। আবার, 'ঠাকুমা' ও 'দাদামহাশয়ের' ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দাম্পত্যনীতির সরল ব্যাখ্যার অম্ল-মধুর স্বাদটি আদর্শ-ক্লিষ্ট রুচিকে সজীব করিয়া তোলে। দ্বিতীয় অংশে, বাস্তব বর্ণনার অভাব না থাকিলেও, লেখকের উদ্দেশ্য ও সংস্কার-প্রবৃত্তিই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রমাপ্রসাদ সরস্বতী যেন একটি মূর্তিমান্ শাস্ত্রজ্ঞান; হিন্দু-সমাজের বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ-সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। যোগমায়ার প্রতি প্রেম ও তাহার সহিত পুনর্মিলনই তাঁহার প্রাণের একমাত্র সজীব অংশ, এইখানেই সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার কথঞ্চিৎ যোগ দেখা যায়। সুশীলার সহিত দেবীপ্রসাদের বিবাহ ঘটাইয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সংস্কারকোচিত উৎসাহকে একেবারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়াছেন, আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থাকে একেবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। শরৎ-সুধার বিবাহকে যেমন আমরা তাহাদের পূর্বজীবনের একটা স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই দেখি, সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন সমর্থনযোগ্য কারণ পাই না; এ বিবাহ সংস্কারকের অত্যুৎসাহের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, আর্টের কোন ধার ধারে নাই। বিশেষতঃ, রমেশচন্দ্র তাঁহার উৎসাহাধিক্যে অন্ধ হইয়া বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহের যে আসল সমস্যা তাহার সম্মুখীন হন নাই; বিবাহের পর যখন সমাজে সমস্যাটি জটিল হইয়া উঠিবার কথা তখনই নিতান্ত সুবিধাজনকভাবে তাহার উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই ভালরূপ জানেন যে, জনসাধারণের যে জয়নাদের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, বাস্তব-জীবনে সেইরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই; সেখানে জনসাধারণের কোলাহল সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারই ধারণ করিয়া থাকে। এইখানে রমেশচন্দ্র কলাকৌশলের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত এক বাস্তবভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, এইবার তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিব। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই প্রকার উপন্যাসেই নিজ ক্ষমতায় পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুণ আছে—তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, নিজ রক্তের মধ্যে বীরত্ব-কাহিনীর উন্মাদনা অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের আর একটা গুণ—সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর ইতিহাসের

বিশাল ঘটনাগুলির প্রভাব-চিত্রণ—তাঁহার রচনায় নাই; কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে কোন গভীর বিশ্লেষণ নাই, কেননা তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ'-এ যে গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, তাহা রমেশচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু ইহার একটি কারণ এই যে, শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের বিকারগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; রমেশচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থারই বর্ণনা করিয়াছেন, বিকৃতির দিকটা কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। সুতরাং শরৎচন্দ্র সমাজদেহের ক্ষতপ্রদেশে যত গভীরভাবে ছুরিকা চালাইয়াছেন রমেশচন্দ্র সমাজের সুস্থদেহে সেরূপ পারেন নাই। কিন্তু এই বিশ্লেষণ-শক্তির অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় তাঁহার লঘু ও অন্তরঙ্গ স্পর্শটি ইংরাজী সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রমেশচন্দ্র আমাদের অনেক মহিলা ঔপন্যাসিকের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় স্ত্রীজাতিসুলভ সাহিত্যিক গুণের অধিকারী। সামাজিক উপন্যাসে তাঁহার প্রধান অপূর্ণতা একটা প্রবল আবেগের অভাব—মানব-জীবনের সংকট-মুহূর্তগুলি তাঁহার কল্পনাশক্তিকে খুব গভীরভাবে আন্দোলিত করে নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রধান প্রভেদ। বঙ্কিমের আবেগ বা উন্মাদনা তাঁহার নাই, বঙ্কিমের ন্যায় জীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তা, জীবনসমস্যার জটিলতা, জীবনের চরম মুহূর্তগুলির ভাবৈশ্বর্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বঙ্কিম অপেক্ষা তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অধিক ছিল; তাঁহার উপন্যাসে বঙ্কিমের বিচিত্র রোমান্স ও ঐন্দ্রজালিক মোহ নাই। কিন্তু তাঁহার সকল সত্যনিষ্ঠাই কোন কোন সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইয়াছে; 'মাধবীকঙ্কণ'-এ তিনি ব্যর্থপ্রেমের যে অগ্নিজ্বালাময় চিত্র দিয়াছেন, বঙ্কিমের উপন্যাসের রত্নভাণ্ডারের মধ্যেও তাহার অনুরূপ দৃশ্য আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

(১) উপন্যাস ও রোমান্স

বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন কেবল কলাকৌশলের দিক্ দিয়া তাঁহার উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক বিচার করিতে হইবে।

বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। রমেশ-চন্দ্রের উপন্যাসে যে ক্ষীণতা, কল্পনাদৈন্য ও ভাবগভীরতার অভাবের পরিচয় পাই, বঙ্কিমের উপন্যাস সেই সমস্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত। তাঁহার সব কয়টি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবী করি, রোমান্সের আকাশ-বাতাসে পরিবর্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পূরণ করেন না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয় এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে বাস্তবাতিশয্যের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কেননা, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরেই একটি বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথ্যের রন্ধ্রগুলি তিনি কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়াছেন; কিন্তু মোটের উপর তাঁহার জীবন-চিত্রণ সত্যানুগামী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যের সূর্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব; তিনি সত্যকে রসহীনতা ও নির্জীবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। জীবনের সত্য চিত্র দিতে গিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন নাই, পরন্তু বিচিত্র রসের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ইন্দ্রধনুবর্ণ-রঞ্জিত সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের সাধারণ আলোচনা পরে হইবে। এখন আমরা বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া উহারা কতদূর পর্যন্ত মানব-হৃদয়ের গভীরস্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ও জীবন সম্বন্ধে সত্য ধারণা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উপন্যাসে 'novel' ও 'romance' বলিয়া যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটি বিভা . বর্তমান।

এখন 'novel' ও 'romance'-এর মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদটুকু আছে, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক

প্রাধান্য লইয়া। 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব, ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণ; সত্য-পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়, কেবল আমাদের জীবন-প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শ লাভ করিতে পারে। 'Romance'-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উচ্চসুরে বাঁধা ঝংকারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু। সেইজন্য সূর্যালোক-দীপ্ত, অতিপরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘুমেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। অবশ্য এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধ্যেও রোমান্স বাস্তব-জীবনের সহিত একটি নিগূঢ় ঐক্য হারায় না; জীবনের সহিত যোগসূত্র হারাইলেই ইহা একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত হইয়া পড়িবে। মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ সম্পূর্ণ বাস্তব-সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাস-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্ধা ছিল না; তাহার অন্তহীন, মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড় একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের যে প্রবর্ধমান বাস্তব-প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই। রোমান্সলেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি আলোচনার সময়ে সামাজিক উপন্যাসের সহিত রোমান্সের এই মৌলিক প্রভেদটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলিকে রোমান্স-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে: (১) দুর্গেশ-নন্দিনী (১৮৬৫); (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬); (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯); (৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪); (৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); (৬) রাজসিংহ (১৮৮১); (৭) আনন্দমঠ (১৮৮২); (৮) দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪); (৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—কোথাও বা রোমান্স উপন্যাসের আকাশ-বাতাসে

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা সামাজিক জীবনের রন্ধ্রপথে মেঘান্তরালবর্তী বিদ্যুৎশিখার ন্যায় একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবার তাহাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্যও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই; কোথাও বা বাস্তবতার সহিত অসাধারণত্বের একটি চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়া উপন্যাসখানি অনিন্দনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা অসামঞ্জস্য প্রকট হইয়া উপন্যাসকে অবাস্তবতাদুষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া আমাদিগকে উপন্যাসগুলির বিচার করিতে হইবে।

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের সর্বপ্রথম উপন্যাস। ইহা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শচীশবাবু তাঁহার বঙ্কিম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমের ভ্রাতারা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই এবং অনেকটা তাঁহাদের প্রতিকূল মন্তব্যে নিরুৎসাহ হইয়াই বঙ্কিম উহার মুদ্রাঙ্কন কিছুদিন স্থগিত রাখেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রতিকূল সমালোচনার হেতু কি ছিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিরুদ্ধ মত আমাদের নিকট একটা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যুগান্তর শব্দটি আমরা যখন তখন ও নিতান্ত সামান্য কারণেই, অনেকটা ভাষাতে তীব্রতা যোজনার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' বাস্তবিকই বঙ্গ-উপন্যাস-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সম্পূর্ণ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, উপন্যাসের উপাদানগুলি অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকভাবে উপস্থিত থাকিয়া একটি রসমূলক ও মনস্তত্ত্বমূলক যোগসূত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিশেষতঃ ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্যাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একমুহূর্তে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশ্চর্যভাবে বাড়াইয়া দিলেন। ইতিহাসের ঘটনাবহুল, উদ্দীপনাময় ক্ষেত্র হইতে বিচিত্র রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ বর্ধিত করিলেন ও আমাদের হৃদয়স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের সংকটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, আমাদের সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন। অতএব 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম রচনায় অপরিণতির চিহ্ন অনেক। ইহার ঐতিহাসিক তথ্যসমষ্টির বিরল সন্নিবেশের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মোগল-পাঠানের যুদ্ধবৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পুরুষগুলির—মানসিংহ, কতলু খাঁ, প্রভৃতির—চরিত্রও বিশেষ গভীরতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত চিত্রিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রতিবেশরচনা বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বর্ণিত যুগের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ

দেখা যায় না। তবে ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যের উপর কিরূপ অতর্কিত বজ্রপাতের মত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটি চিত্র আমরা উপন্যাসটিতে পাই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের মধ্যেই বঙ্কিম এই প্রলয়-ঝটিকার প্রথম আবির্ভাব হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত দেখাইয়াছেন; উপন্যাসের ঘটনাধারা আশ্চর্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দিগ্‌গজ-বিমলার সমস্ত লঘু হাস্য-পরিহাসের অবাস্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত অথচ আসন্ন বিপদের শঙ্কা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। দুর্গজয়ের বিবরণে, বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে ও কতলু খাঁর হত্যাবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কারাগারে আয়েষার প্রেমাভিব্যক্তির দৃশ্যটাই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী বাস্তব ঔপন্যাসিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তিনি আয়েষার মনে প্রথম প্রণয়সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। তাহার সেবা ও সহানুভূতি যে কোন্ গোপন মুহূর্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল বা ওসমানের প্রতি স্নেহের সহিত এই নবজাত প্রেমের কোন বিরোধ-সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, একেবারে অনিবার্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাব-বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটি প্রকৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশা করিয়া থাকি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রও বর্তমান উপন্যাসে তিলোত্তমার ক্ষেত্রে ও তাঁহার পরবর্তী দুই-একখানি উপন্যাসে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'-এ—এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে, কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা-বাহুল্যের জন্য, ও কতকটা রোমান্সসুলভ অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বারা গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মনস্তত্ত্ব-আলোচনার দিক হইতে ইহাকে একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

চরিত্র-সৃজনের দিক্ দিয়াও বঙ্কিম এই উপন্যাসে খুব উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, চরিত্র ফুটাইয়া তোলা এখানে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। ঘটনার প্রবল প্রবাহের মধ্যে তিনি কোথাও অধিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক স্রোতের মধ্যে গভীর চরিত্রবিশ্লেষণের অবসর পান নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেকগুলি চরিত্র অল্প দুই-একটি রেখায় বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই-তিনটি দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রের অসীম দার্ঢ্য ও অহংকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওসমানের হৃদয়ে অনির্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র হিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটি বাস্তবমূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হইতে দেন নাই। এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধই তাহাকে একটি বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশকালোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে, তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল অদ্ভুত শব্দসম্পদের দ্বারাই ফুটাইয়াছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্পভাষিণী, অথচ কেবল মাত্র নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা লেখক তাঁহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদটি কবিত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, ও আয়েষার মহীয়ান্ গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মসংযম—ইহাদের মধ্যে এরূপ স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করিয়াছে যে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে ভুল করিবার আমাদের কোনও অবসর থাকে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ঘটনাবৈচিত্র্য ও গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্র-চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি দুই-একটি স্থলে কথোপকথনেও বঙ্কিম বেশ দক্ষতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শৈলেশ্বর-মন্দিরে বিমলা ও জগৎসিংহের যে দুইবার কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মধ্যে লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল গল্প-রচনার দিক্ দিয়াও নবীন লেখকের যে দুই-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় না, এমন নহে। বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে সম্বন্ধটি অনাবশ্যক জটিলতা ও রহস্যে আবৃত করা হইয়াছে, এবং বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রে কতকগুলি ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা পাঠকের অবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে। দিগ্‌গজ-উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত রসিকতা থাকা সত্ত্বেও, মোটের উপর আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্যাসেই যে সন্ন্যাসী-জাতীয় একটা চরিত্র আনয়ন করিয়া অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিবার পথটি খুলিয়া রাখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরাম স্বামীতে পাইয়া থাকি। অভিরাম স্বামীর আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য নাই; তিনি কেবল বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহের গোপন সম্বন্ধের একটা জীবন্ত নিদর্শন-স্বরূপেই উপন্যাস-মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন, আর বীরেন্দ্রসিংহকে মোগল-পক্ষ-অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয়া গল্পের tragedyকে আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বঙ্কিম এই প্রথম উপন্যাসে তাঁহার সন্ন্যাসীকে একেবারে রামানন্দ স্বামী বা সত্যানন্দের মত আদর্শলোকের কুহেলিকার মধ্যে লইয়া যান নাই। তাহাকে এক জ্যোতিষজ্ঞান ছাড়া আর কোন অতিমানবোচিত গুণের অধিকারী করিয়া দেখান নাই, এমন কি তাঁহার যৌবনের পদস্খলনের পরিচয় দিয়া তাহাকে সাধারণ লোকের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের আর একটি লক্ষণও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সূচিত হইয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব-বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যায় না, মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটা গূঢ় সাংকেতিকতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। ইউরোপের নিতান্ত আধুনিক গল্প-নাটকে যে symbolism, রহস্যের যে ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। ইহা প্রায়ই স্বপ্ন বা অন্য কোন গুরুতর মানসিক বিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থলে ইহার একটি সন্তোষজনক, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দনন্দিনীর ও 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্ন উল্লেখ করা যাইতে পারে; শৈবলিনীর বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের উপর নরক-বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ইহার চরম দৃষ্টান্ত। যোগবলের দ্বারা শৈবলিনীর অমানুষিক শক্তিলাভও 'চন্দ্রশেখর'-এ স্থান পাইয়াছে; 'আনন্দমঠ'-এ গ্রন্থশেষে যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই, তিনি অতিমানবেরও অনেক ঊর্ধ্বে। অবশ্য উপন্যাসের বাস্তবতার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; বাস্তব জগতের শেষ সীমা বা চরম সম্ভাবনার মধ্যেও আমরা তাহাদিগকে

স্থান দিতে পারি না। কিন্তু সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত হউক, অনুপযুক্ত হউক, এই আলো-ছায়া-মিশ্র, রহস্যসংকেতপূর্ণ বাস্তব-অবাস্তবের সীমান্ত-প্রদেশের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ও গূঢ় আকর্ষণ ছিল। তাঁহার সমস্ত অবাস্তব ব্যাপারের মধ্যেও এমন একটা গূঢ় সংযম ও সংগতি, এমন একটা আন্তরিকতা ও অভ্রান্ত কল্পনা-সমৃদ্ধির পরিচয় পাই, যাহাতে সেগুলিকে উচ্চ সৃজনী-শক্তির ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই। তাহারা যে কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম নহে, পরন্তু লেখকের অন্তঃকরণের গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল আছে, আমাদের স্বতঃই এইরূপ প্রতীতি জন্মে। বঙ্কিমের মধ্যে যে সুপ্ত কবিটি কবিতার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য ঔপন্যাসিকের বাস্তব চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আরোগ্যলাভের পর তিলোত্তমা তাঁহার রোগশয্যার যে স্বপ্নবিবরণটি জগৎসিংহের নিকট বলিয়াছেন, তাহা এই নিগূঢ় সৌন্দর্যের আলোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ উপন্যাসোচিত বাস্তবতার সীমাও লঙ্ঘন করে নাই। এই একটি ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই তাঁহার কল্পনা-শক্তির ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজটি পাওয়া যায়।

অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের ক্রমোন্নতির রেখাটি বেশ স্পষ্টভাবেই টানা যায়। তাঁহাদের রচনা-সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনাই প্রশস্ত; কালানুক্রমিক আলোচনার দ্বারাই তাঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশটি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রণালী তাদৃশ কার্যকরী হইবে না; কেননা তাঁহার প্রতিভা সময়ানুবর্তী হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কেবল এক 'দুর্গেশনন্দিনী'কেই তাঁহার অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলা যাইতে পারে; শুধু ইহার মধ্যেই কতকটা ক্ষীণতা ও অস্পষ্টতা, কতকটা গভীর অভিজ্ঞতার অভাব, কতকটা যৌবন-স্বপ্নাবেশের ছায়া অনুভব করা যায়। নবীন লেখক যে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে শব্দসম্পদ ও কল্পনারাগের দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি।*

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রায় দুই বৎসর পরেই 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিম-প্রতিভা তাহার সমস্ত ধূম্রাবরণ ত্যাগ করিয়া একটি প্রদীপ্ত অনল-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সংকোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্তন বঙ্কিম সবলে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র যে গুণটি খুব তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা উহার অন্তর্নিহিত ভাবটির অসামান্য মৌলিকতা। এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এখন হইতে বঙ্কিমের প্রতিভা যে একেবারে নির্দোষ ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এ সময়ের ভুল-ভ্রান্তি একটু নূতন রকমের; অতিসাহসের ফল, ভীরুতার নহে।

*কোন সমালোচক এই মন্তব্যের যাথার্থ্যে সংশয় প্রকাশ করিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মন্তব্য উপন্যাসের আর্টবিষয়ক, ভাষাবিষয়ক নহে।

সময়ে সময়ে বঙ্কিম আপন প্রতিভার উপর উপযুক্ত অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে গুরুভারপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন; উপন্যাসের মধ্যে এমন সমস্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিভাও সম্পূর্ণভাবে গলাইয়া মিশাইতে পারে নাই। সময়ে সময়ে উপন্যাসকে তিনি নিজ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উহার মৌলিক প্রকৃতিটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কল্পনার মুক্তপক্ষে উড়িয়া নীল আকাশের এমন সুদূরদেশে পৌঁছিয়াছেন, যেখানে আমাদের সহজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দুঃসাহসেব ফল, অক্ষমতার নহে, সুতরাং ইহারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এইজন্যই বলা যায় যে, বঙ্কিমেব প্রতিভা 'দুর্গেশনন্দিনীর' পরেই একেবারে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ক্রমবিকাশের মন্থর পথে অগ্রসর হয় নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহিত্যসুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতাব যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে কল্পনা-শক্তির অসামান্য সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীব-বাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা, চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি-কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমাদের রুদ্ধ-দ্বার, সংকীর্ণ-পরিসর বাস্তব-জীবনের রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্ত বায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময়ে সময়ে আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর দ্বারা আমাদের বাস্তব-জীবনের রোমান্সের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি; কিন্তু বাস্তব-জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যেব জন্য এই চেষ্টা সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটিতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙ্গীন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই বোমান্স তথাকার বাস্তব জীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তব-জীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন যে রস আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব জীবন-বৃন্তের রঙ্গীন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বা [illegible], বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের উপন্যাসে ঠিক স্বাভাবিক হয় না, বাস্তব জীবনের ঠিক অনুবর্তন করে না। কেন না পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপব তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে নাই। প্রেমের চিরন্তন লীলা আমাদের সাহিত্যে বা জীবনে ছিল না, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র

ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক সেরূপ হইতে পারে নাই। প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে। আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এতদূর সরিয়া গিয়াছে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা-দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই পুরাতন আবেগ কোন্ চিরবিস্মৃতির মরুভূমে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই উপন্যাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিশীথ-স্বপ্নের কুহেলিকাজড়িত বলিয়া মনে হয়, আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একটা ইন্দ্রজালরচিত আকাশসৌধের ন্যায় বাস্তবসংস্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে। আমাদের যুদ্ধজয় একটা মত্ত আস্ফালন ও অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয়; আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বহু পুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মতই শুনায়। 'আনন্দমঠ', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিভা এই কেন্দ্রস্থ ও অপরিহার্য দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেকে ব্যথিত করিয়াছে, অসাধারণ সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যেও একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্টিক আবেষ্টন-রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখনও কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদের দিক্ হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এইজন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তান্ত্রিক-প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্মপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আবার এই উপন্যাসের রোমান্টিক উপাদানগুলি—বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম ধর্ম-সাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্যবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।* কেননা ইহার সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য-জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক

*The beauty born of murmuring sounds
Has passed into her face.

বিধি-নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা ; অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্বত্রই রমণীয় কোমলতা , শিক্ষা-দীক্ষায় বিভিন্ন কিন্তু অন্তরে একটি চিরন্তনী স্ত্রীমূর্তি (eternal feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র-কল্পনা শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের পরেও বাল্যকালের রোমান্টিক প্রতিবেশ কপালকুণ্ডলাকে বেষ্টন করিতে ছাড়ে নাই। পারিবারিক জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খল, স্বামীর অপরিমিত ভালবাসাও তাহার নয়নের অপার্থিব স্বপ্নঘোর ঘুচাইতে পারে নাই। সমুদ্রতীরের বন্য-লতাটি গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত ও অজস্রস্নেহধারাসিক্ত হইয়াও নূতন স্থানে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, খুব আলগা হইয়াই লাগিয়া ছিল ; পুরাতন জীবন হইতে একটি তরঙ্গ আসিয়াই তাহাকে একেবারে উন্মূলিত করিয়া লইয়া গেল। তাহার অন্তরমধ্যে যে একটি চির-উদাসিনী আলুলায়িতকুন্তলা অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাকে সংসার শত আদর-প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাহার মধ্যে একটা অসামাজিক বন্যতা বা রমণীসুলভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' নামক গল্পের নায়ক 'তারাপদ'ই কপালকুণ্ডলার একমাত্র তুলনাস্থল ; অথচ আবেষ্টনের অসাধারণত্বে ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে উহাদের মধ্যে কত প্রভেদ ! তারাপদর ঔদাসীন্য একটি চিরচঞ্চল, ক্রীড়াশীল হরিণ-শিশুর বন্ধন-ভীরুত্বের ন্যায়, দিগন্তরেখাঙ্কিত নীল-মায়ার প্রতি একটা নামহীন, রহস্যময় আকর্ষণ মাত্র। কিন্তু কপালকুণ্ডলায় সংসারবিরক্তির পশ্চাতে আমরা একটি বিশেষ ধর্মসাধনার, একটি অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সমস্ত দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি। তাহা ছাড়া, তারাপদ কপালকুণ্ডলার একটা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বাস্তব সংস্করণ ; পল্লীর সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন জীবন একটা ক্ষণিক অথচ নিগূঢ় একাত্মতা লাভ করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার নিঃসঙ্গতা আরও প্রগাঢ়তর ; এক দয়া ও সমবেদনা ছাড়া সাধারণ সামাজিক জীবনের সহিত তাহার আর কোন যোগসূত্র নাই। সাধারণতঃ উপন্যাসে সমস্ত যে অলৌকিক ঘটনা, স্বপ্নদর্শন ইত্যাদি অবতারণা করা হয়, তাহারা প্রায় বাহ্যবৈচিত্র্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় ; কদাচিৎ খুব বড় কলাবিদের হাতে তাহাদের মধ্যে একটা গূঢ় সাংকেতিকতা থাকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা কবিকল্পনার ন্যায় সৌন্দর্যমাত্রাত্মক নহে ; পরন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্রের সহিত একটি নিগূঢ়-ও-সুসংগতসম্বন্ধবিশিষ্ট। নবকুমারের সহিত আগমনকালে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার জন্য দেবী-পদে বিল্বপত্রার্পণ কেবল একটা পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে ; ইহা কপাল-কুণ্ডলার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে একটি অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলিয়া তাহার নূতন জীবনের প্রতি অনাসক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছে ও ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের ক্ষেত্র-প্রস্তুতকরণে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনের মধ্যে এই আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারটি ধর্মপ্রাণ কপালকুণ্ডলার অন্তর্জগতে কিরূপ একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আবার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে

কপালকুণ্ডলা যে আকাশপট-লিখিতা নীল-নীরদ-নির্মিতা ভৈরবীমূর্তিকে মরণের পথে নীরব অঙ্গুলিসংকেত করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাও অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সাহায্যে তাহার স্বাভাবিক ধর্মমোহের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে। এই কুশল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সঙ্গে অসাধারণত্বের গভীর সামঞ্জস্যসাধনেই 'কপালকুণ্ডলা'র বিশেষত্ব।

এই চরিত্রবিশ্লেষণ স্বল্প অথচ গভীরার্থক কয়েকটি কথার দ্বারা সুনিপুণভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কোন বাস্তবতাপ্রধান লেখকের হাতে পড়িলে এই অর্থপূর্ণ মিতভাষিতা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী, সুদীর্ঘ বাগ্‌বিন্যাসে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষমতার দুই-একটি মাত্র উদাহরণ দিব। যখন কপালকুণ্ডলা সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃকপাত না করিয়া ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইল, তখন লেখক কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে তাহার এই অসাধারণ সংকল্পের মূলীভূত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন :

"কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তিরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ-বনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী ভক্তিভাব-বিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।" (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

অল্পকথায় গভীর বিশ্লেষণের আর একটি উদাহরণ পাই, কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রথম প্রণয়প্রকাশের বর্ণনায় :

"যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।...... ....এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ-প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই ; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই। পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগ-সিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল।.........এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমেষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত ; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত , যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত।"

কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটির অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে, সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ়-কলাকৌশল নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ও ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব পর্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারানাসক্তি, স্বামি-প্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্বল, গভীর প্রেম পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী-ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসংকেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ—একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথ-রজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে, নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

'কপালকুণ্ডলা'র তিন বৎসর পরে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয় (১৮৬৯)। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম আবার ইতিহাস ও প্রেমের ক্ষেত্র হইতে রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্সে যে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য ও সুসংগতি আছে, 'মৃণালিনী'তে অবশ্য তাহা নাই; তথাপি 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে তুলনা করিলে বঙ্কিম উন্নতির পথে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। চরিত্র-চিত্রণ এবং ঘটনাবিন্যাস উভয় দিকেই বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী'র সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা, প্রভৃতি চরিত্রে বাস্তবতার ভাগ অল্প; বিচিত্র ঘটনা স্রোতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব খব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'মৃণালিনী'র চরিত্রগুলিতে বাস্তবতার চিহ্ন প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র জগৎসিংহের মত কেবল একটা বীরোচিত আদর্শের ম্লান ছায়ামাত্র নহে, তাহার ব্যক্তিত্ব আরও সুস্পষ্ট। হেমচন্দ্রের দুর্জয় ক্রোধ ও অভিমান, তাহার চিত্তচাঞ্চল্য, পরিবর্তনশীল ও অন্যায় হঠকারিতাই তাহাকে জগৎসিংহ অপেক্ষা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দিয়াছে ও আদর্শ লোক হইতে নামাইয়া ভ্রান্তি-প্রমাদসংকুল রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে স্থান দিয়াছে। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম আরও একটু জটিলতর, বাস্তবতার আরও একটু গভীরতর স্তর স্পর্শ করে। মৃণালিনী নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীলা হইলেও তিলোত্তমার অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব; দুঃখের অভিজ্ঞতা ও বিপদে তেজস্বিতা তাহাকে একেবারে মোমের পুতুল হইতে দেয় নাই। গিরিজায়া বিমলার একটি অধিকতর স্বাভাবিক সংস্করণ. একজন পৌরমহিলার মুখে যে ব্যবহার অশোভন ও অসংযত বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভিখারিণীর পক্ষে সুসংগত ও উপযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, মনোরমার চরিত্রকল্পনায় বঙ্কিম যে মৌলিকতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পাই না, ইহার অনুরূপ কোন চরিত্র পূর্ববর্তী উপন্যাসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যে কয়েকটি অবাস্তব, কবি-কল্পনানুযায়ী স্ত্রী-চরিত্র পাই, মনোরমা তাহাদের অগ্রবর্তিনী। 'দেবী-চৌধুরাণী'তে দিবা, নিশা ও 'সীতারাম'-এ জয়ন্তী এই জাতীয় চরিত্র—বাস্তব-বন্ধনহীন কাল্পনিক, আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত সম্পর্করহিত, যেন লেখকের কতকগুলি প্রিয়

theoryর মত বিকাশ মাত্র। কেবল অসাধারণ বাক্‌পটুতা ও রসিকতার গুণেই তাহারা আমাদের নিকট জীবন্ত মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাদের বাক্যের সরসতা তাহাদের ব্যবহারের অবাস্তবতাকে অনেকখানি ঢাকিয়া দেয়। মনোরমা ইহাদের মত এতটা কাল্পনিক নহে, তাহার রহস্যময় দ্বৈতভাবের কোন মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বটে, এই অদ্ভুত প্রকৃতি-বৈষম্যের উদ্ভব কখন এবং কি প্রকারে হইল, সে সম্বন্ধে লেখক আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই বটে, কিন্তু যেরূপ আশ্চর্য দক্ষতা ও সুসংগতির সহিত তাহার কার্যে ও ব্যবহারে এই দ্বৈতভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ, পশুপতির সহিত তাহার প্রেমের অসাধারণত্ব, বাহ্য বিরোধ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে গোপন আকর্ষণ—হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর সাধারণ উচ্ছ্বসিত প্রেমের সহিত একটি সুন্দর বৈপরীত্যের (contrast) হেতু হইয়াছে।

কিন্তু 'মৃণালিনী'র প্রকৃত ত্রুটি হইতেছে ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সহিত প্রেমকাহিনীর সামঞ্জস্য-স্থাপনে। বঙ্কিম মুসলমান কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা কতদূর ইতিহাস-সম্মত তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে আমাদের বিশেষ দ্বিধা হয় না। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে একটা প্রবাদ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ধ কুসংস্কার উভয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, এবং বঙ্কিম পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও গৌড়-রাজের অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের বর্ণনা দ্বারা এই বিরাট বিপর্যয়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রকৃত তথ্যের অভাববশতঃ এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কাল্পনিক, ফাঁকা ফাঁকা রকমের ঠেকে। তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্নিবেশ হইলে একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্যাপার আমাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল, সেইজন্য তিনি তথ্যের অভাব কল্পনার বাহুল্যাতিশয্যে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল—একটা বিশাল রাজনৈতিক সংকটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্তিই জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভারে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল মুসলমান-প্লাবন-তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতই প্রতীয়মান হয়। এক তপসাধনারত ব্রাহ্মণ ও এক রাজ্যচ্যুত, প্রণয়োন্মত্ত রাজপুত্র—যাহাদের পিছনে অর্থ ও লোকবলের কোনই পরিচয় পাই নাই—ইহারাই মুসলমান সাম্রাজ্য-ধ্বংসের প্রধান ও একমাত্র উদ্‌যোগী, ইহা মনে করিলে ডন কুইক্সোট ও সাঙ্কোপাঞ্জার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ, যে হেমচন্দ্রের উপর মাধবাচার্য এত গভীর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমানজয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া সমস্ত প্রণয়বিলাস হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন, তাহার কার্যকলাপ আলোচনা করিলে এই গুরু দায়িত্বের জন্য তাহার অনুপযুক্ততার কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। আবার পশুপতির প্রায় অননুমেয় নির্বুদ্ধিতা, সম্পূর্ণ উদ্‌যোগহীন অবস্থায় আপনাকে এবং দেশকে শত্রুহস্তে সঁপিয়া দেওয়া, আমাদের অবিশ্বাসকে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে। লেখক নিজেও এই ত্রুটি, এই অবাস্তবতার বিষয়ে বেশ

সচেতন ছিলেন এবং পাঠকের বিদ্রোহ পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া একটা যেমন-তেমন রকমের কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—'উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।' বস্তুতঃ রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারটির উপরেই একটা অভিনয়োচিত অবাস্তবতা, একটা তীব্রশ্লেষাত্মক (ironic) অসংগতি ছায়াপাত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অবিশ্বাসের চরম সীমা অতিক্রমের পরে আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভাবিয়া দেখিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, আমাদের দেশে ইতিহাসের ধারাই কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সমসাময়িক কয়েকটি প্রধান ব্যক্তির কার্যাবলীর সমষ্টি মাত্র। জনসাধারণ নামে যে ব্যক্তিটি ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহার প্রভাব প্রতি পদক্ষেপেই ব্যক্ত করিয়াছে, সে আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্র হইতে একেবারে নিশ্চিহ্নভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের অতীতযুগের কোন গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করিতে গেলেই কয়েকটি ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে এবং ইহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে জনসাধারণের জাগ্রত, সচেষ্ট মনোভাব এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলিকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে পারিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাঘোরে কাটাইয়া দিয়াছে; বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে, নিশ্চেষ্টভাবে মার খাইয়াছে, কিন্তু কোনও প্রকারে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। আবার কবিকল্পনা যখন ইতিহাসকেই অনুসরণ করিয়া চলে, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা সজীবতর দেখিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণসেনই যখন এত ক্ষীণজীবী, কেবল কুসংস্কার ও অক্ষমতার একটা মাংসপিণ্ড মাত্র,* তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রুততর জীবনস্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আশা করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রের যে অসম্পূর্ণতা আমাদের অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহার জন্য বঙ্কিম অপেক্ষা আমাদের ইতিহাসধারার বিশিষ্টতাই দায়ী।

কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা গুরুতর ঐতিহাসিক সংঘটনের যতদূর মর্মোদ্‌ঘাটন করা যায়, তাহাতে বঙ্কিম কৃতকার্য হইয়াছেন। মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির গুপ্ত পরামর্শ ও বক্তিয়ার খিলিজির শাঠ্য প্রকৃত ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'যবনবিপ্লব' নামক অধ্যায়টি (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ) উচ্চাঙ্গের বর্ণনাশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা-শক্তির চরম বিকাশ, মানসিক বিপ্লব ও অগ্ন্যুৎক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয়স্থল—'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন' নামক অধ্যায়টি (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। এই অধ্যায়টি জীবন্ত বর্ণনাশক্তিতে ও জ্বালাময় শব্দপ্রয়োগে Dickens-এর বর্ণনার সহিত তুলনীয়। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমের কলাকৌশল ও চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

---

*পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন অন্ততঃ যৌবনকালে শক্তিশালী দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট ছিলেন—এমন কি শত্রুপক্ষও তাঁহার যশকীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বার্ধক্যের এই সাংঘাতিক বিভ্রমের কোন ব্যাখ্যা মিলে নাই।

(২) রোমান্সের আতিশয্য—'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'

'মৃণালিনী'র পাঁচ ও ছয় বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস—'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি আখ্যান অনেকটা আধুনিক ছোটগল্পের অনুরূপ—উপন্যাসের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তা ইহাদের নাই। বিশেষতঃ, ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময়ে অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহ লাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের (coincidence) কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' ঠিক একই জাতীয় উপন্যাস; প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমখানি অতীত যুগের কাহিনী, ও দ্বিতীয়টি ঘটনাকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এই প্রভেদ কেবল নামমাত্র। 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিবার কোন কারণ নাই, কোনরূপ ঐতিহাসিকতার ক্ষীণ আভাসমাত্রও ইহাতে নাই। তবে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে অতীতযুগের শ্রেষ্ঠী বণিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বঙ্কিম তাহাদের প্রেম-কাহিনীকে কতকটা স্বাভাবিকতা দিতে ও আধুনিক যুগের সন্দেহ-প্রবণতা ও অবিশ্বাস হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা সুদূর অতীতের আশ্রয়লাভে আমাদের চক্ষু এড়াইতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে।

রাধারাণী'তে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা পূর্ণভাবেই অনুভব করা যায়। 'রাধারাণী'র প্রেম সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের বলিয়া, ইহার স্বাভাবিকতা ও সুসংগতি রক্ষা করিতে লেখককে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে। রাধারাণীর সহিত রুক্মিণীকুমারের বোঝা-পড়া দীর্ঘ চারি অধ্যায় ধরিয়া চালাইতে হইয়াছে, এবং এই চারি অধ্যায়ের মধ্যে লেখক পদে পদে একটা অস্বাভাবিক বাধা অনুভব করিয়াছেন ও নানাবিধ কৈফিয়তের দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি বঙ্কিমের সহজ প্রতিভা এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তাহাদের উপর আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমের ক্ষমতার প্রধান পরিচয় এই যে, তিনি এই একটা ছেলেমানুষী গল্পের মধ্য দিয়াও—যেখানে গভীর চরিত্র-চিত্রণের কোন অবসর নাই সেখানেও—একটা মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সমস্ত অসংগতি কাটাইয়াও যে সমাধানে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে না।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তম রাজনৈতিক জগতের সম্মিলন প্রায় স্বাভাবিকভাবেই সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে 'চন্দ্রশেখর' পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি অপেক্ষা বেশি অগ্রসর হইয়াছে। যদি কখনও রাজনৈতিক জগতের

প্রবল প্রবাহ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তাহা অরাজকতা ও জাতীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের যুগগুলিতে। 'চন্দ্রশেখর'-এ এইরূপ একটা যুগ-পরিবর্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তখন বঙ্গে মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোন্মুখ ও ইংরেজ বণিকগণ অর্থ-উপার্জনের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য-স্থাপন অপেক্ষা প্রজাশোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এই আধুনিক যুগের ইতিহাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক অংশের মত একেবারে শূন্যগর্ভ ও কল্পনাসর্বস্ব হয় নাই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন এই সে দিনের কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যুগের সহিত তাহার মাত্র শতবর্ষ ব্যবধান। খুব নিকট অতীতের ব্যাপার বলিয়া সে যুগের স্মৃতি বাঙালীর মনে উজ্জ্বল হইয়াই জাগরূক ছিল, বিশেষতঃ, ইংরেজ তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার মুখ্য ঘটনাগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই। সুতরাং 'চন্দ্রশেখর'-এর ঐতিহাসিক চিত্রগুলিতে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে, সেই যুগের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। নবাগত ইংরেজ শাসকদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, দুঃসাহসিকতা ও সর্বপ্রকার নৈতিক সংকোচহীনতার চিত্রটি উপন্যাসে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, দেশবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্কটি একটা অপরিচয়ের রহস্যে মণ্ডিত হইয়া এক বিচিত্র রোমান্সের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখর'-এর রোমান্স প্রধানতঃ এই সর্বব্যাপী অরাজকতা ও কেন্দ্র-শক্তির শিথিলতা হইতে উদ্ভূত। অরাজকতা, প্রবল বৈদেশিক শক্তির অভিভব অনেক সময় আমাদের শান্ত স্রোতোহীন পারিবারিক জীবনের উপর অতর্কিত দৈববিপ্লবের মত আসিয়া পড়ে এবং ইহাতে একটা অননুভূতপূর্ব গতিবেগ ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করে, আমাদের অন্তঃপুরের ব্রীড়াসংকুচিত ফুলটিকে বাহিরের প্রবল ও পঙ্কিল বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায় কিন্তু এই জাতীয় রোমান্স প্রায় বিশেষ গাঢ় ও গভীর হয় না। বৈদেশিক শত্রুর অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়া ওঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র। আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে এবং অপর পক্ষ, ব্যাকুল, দুর্বলভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা করুণরসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে, সমবেদনার অশ্রুজলে রোমান্সের সৌন্দর্য কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক লেখকই এই শ্রেণীর কাহিনীকে তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহার স্বাভাবিক করুণরস-প্রবণতাকে অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বিচিত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের কল্পনাসম্পদ, গূঢ় কলাকৌশল ও মানব মনের সহিত গভীর পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন না। বঙ্কিম তাঁহার সমসাময়িক লেখকদের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, 'চন্দ্রশেখর'-এর সহিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের তুলনা করিলেই, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রথচক্রতলে নিষ্পেষিত একটি ক্ষুদ্র সুন্দর প্রজাপতি দেখিলে আমাদের মনে যে ভাব হয়, শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসখানিও অনেকটা সেইরূপ ভাবেরই উদ্রেক করে, পাঠকের মনকে একটি অবিমিশ্র কারুণ্য-রসে ভরিয়া তোলে, কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য কোন উচ্চতর কলা-কৌশলের

নিদর্শন পাই না। 'ফুলজানি' উপন্যাসের সরলা স্নেহময়ী নায়িকার উপর যে কেন একটা এরূপ নির্মম বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছাড়া অপর কোনরূপ ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না। তাহার নিজ চরিত্রে এরূপ ভীষণ পরিণামের কোন বীজ লুকাইয়া ছিল বলিয়া লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। প্রতিকূল-দৈব-পীড়িতা নায়িকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত নিতান্ত অকারণেই আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।

বঙ্কিমের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি শৈবলিনীকে চক্রপিষ্ট পতঙ্গের মত কেবল বাহ্যশক্তি-নিপীড়িত করিয়াই দেখান নাই। যে প্রবল ঝটিকা তাহাকে তাহার শান্ত গৃহকোণ ও সুরক্ষিত সমাজ-জীবন হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত হৃদয়তলে। লরেন্স ফস্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাচারিত অত্যাচারীর সম্পর্কের ন্যায় নহে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফস্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে; যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতেই উভয়েই ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকলে শুধু ফস্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না; আবার ফস্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনীটি সাধারণ অত্যাচারের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন এবং ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফস্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে যে অত্যা-চারিত তাহা বলা কঠিন। ফস্টর বলপ্রয়োগ করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেলেও শৈবলিনীর ইচ্ছাশক্তি ফস্টরের উপর জয়লাভ করিয়াছে; এমন কি সে ফস্টরকে নিজ গূঢ়তর অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উপায়-রূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে; এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে বাধা না আসিলে শৈবলিনী যে তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও অনেক দিক্ দিয়া 'চন্দ্রশেখর' সাধারণ ঔপন্যাসিকের অত্যাচারকাহিনী হইতে বিভিন্ন। যেমন শৈবলিনীর বিপদ্ তাহার অন্তরস্থ দুর্বলতার ফল, সেইরূপ ইহার পরিণতিও একটা গুরুতর অন্তর্বিপ্লব ও প্রায়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য উপন্যাসে মৃত্যু যে সুলভ সমাধানের পথ দেখাইয়া দেয়, বঙ্কিমের প্রতিভা তাহা গ্রহণ করে নাই। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া তাহার মূল্য কত বলা সুকঠিন। সাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হইবে কি না তাহাও বলা দুরূহ। এত বড় একটা যুগান্তরকারী, বিপ্লবপূর্ণ অনুভূতির জন্য শৈবলিনীর চিত্তক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত ছিল কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। বঙ্কিম যেরূপ অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে ও অসাধারণ আবেষ্টনের মধ্যে এই মানসিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা হয়ত মানব-হৃদয়ের ধীর, বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা অপেক্ষা যাদুবিদ্যারই অধিক অনুরূপ। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে যে অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির (poetic vision) পরিচয় পাই,

তাহা গদ্যসাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিল্টন ও দান্তের নরকবর্ণনার সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারে। বঙ্কিম এখানে কবির বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া, ঔপন্যাসিকের যে কর্তব্য-মন্থর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্যের সহিত কার্যকারণের শৃঙ্খলা-রচনা—তাহা হইতে নিজেকে অব্যাহতি দিয়াছেন; এবং প্রতিভার বিদ্যুৎশিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষুও তাহার বিচারবুদ্ধি পরিচালনা করিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতির ত্রুটি ধরিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

'চন্দ্রশেখ'র-এর রোমান্স মুখ্যত: মনস্তত্ত্বমূলক হইলেও ইহার মধ্যে চমকপ্রদ সংঘটনের অভাব নাই। ফস্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীর উদ্ধার ও শৈবলিনীর প্রত্যুপকার, গঙ্গা-বক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর স্মরণীয় সন্তরণ, মুসলমান কর্তৃক আমিয়টের নৌকা আক্রমণ ও ইংরেজদের মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের প্রকাশ—এই সমস্ত বিবরণের গল্প-হিসাবে আকর্ষণী শক্তি বড় কম নহে। মোটের উপর বঙ্কিম এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় ও রাজনৈতিক জটিলতাজালের বিবৃতিতে বেশ দক্ষতাই দেখাইয়াছেন, কোথাও অর্বাচীন-সুলভ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই—যুদ্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানরহিত বাঙালী লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্য এ বিষয়ে বঙ্কিম যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা বলা যায় না; বিশেষত:, শৈবলিনীর দ্বারা প্রতাপের উদ্ধার-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ সম্ভব, পাঠকের মনে সে বিশ্বাস নাও হইতে পারে। প্রতাপের দ্বারা শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রথম ঘটনা বলিয়া এবং ইংরেজদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলিয়া বরং বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একই চাতুরীর পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশ্বাস-প্রবণতায় একটু রূঢ় রকমেরই আঘাত দেয়। বিশেষত:, ইংরেজ-নৌকার পশ্চাদ্ধাবনের আসন্ন সম্ভাবনার মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গা-বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহার ও তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধানচেষ্টা একটু অসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। আবার উপন্যাসের মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অভ্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তোলে। কিন্তু এই বাস্তবতা-প্রিয় যুগের কঠোর পরীক্ষায় বঙ্কিম সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও মোটের উপর তাঁহার ঘটনাসমাবেশ-কৌশল যে খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের ঘটনাসমাবেশ-কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী-কাহিনীর সহিত দলনী-উপাখ্যানের গ্রন্থনে। এই দুইটি করুণ, বিষাদময় কাহিনী একসূত্রে গাথিয়া বঙ্কিম যে কি আশ্চর্য গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, উপন্যাসখানির ভাবগৌরব ও সার্থকতা কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়মগ্ন হইতে হয়। যে রাজনৈতিক ঝটিকা দরিদ্র গৃহস্থগৃহের পূর্ব হইতে শিথিলিত-মূল লতাটিকে সহজেই উড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রেয়সী মহিষীকে সমস্ত সম্ভ্রম—গৌরবের মাঝখান হইতে টানিয়া আনিয়া একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরের শিরোদেশে উপস্থাপিত করিয়াছে। শৈবলিনীর ন্যায় দলনীও প্রথমে ভ্রান্তি দ্বারা বাহিরের সর্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, অসাবধান মক্ষিকার ন্যায় রাজনৈতিক ঊর্ণনাভজালের সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। দলনী-জীবনের ট্র্যাজেডি ও ইহার অপ্রতিবিধেয় নির্মম শক্তি ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই আমাদিগকে একটা গভীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা

আমাদিগকে স্বতঃই মেটারলিংকের "Luck" নামক প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ নিয়তির অত্যাচারের যে সমস্ত রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান স্থান লাভ করে। দলনী স্বামীর অমঙ্গল-সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে দুরন্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন হিংসা তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে। সে বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই সাংঘাতিকভাবে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যে-কেহ তাহার আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে-ই তাহার হিতৈষণা দ্বারা তাহাকে সর্বনাশের অতল পংকে আরও গভীরভাবেই ডুবাইয়া দিয়াছে। যে কাল নিশীথে গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দলনীর দুর্গপ্রবেশপথ রুদ্ধ হইল, সেই রাত্রে সন্ন্যাসীবেশী চন্দ্রশেখর তাহার সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে সর্বনাশের পথে আর এক পদ অগ্রসরই করিয়া দিলেন। আশ্রয়ব্যপদেশে তাহাকে সমস্ত রাজধানীর মধ্যে এমন একটি বাটীতে লইয়া গেলেন, যেখানে সর্বনাশ তাহার কৃষ্ণ চিহ্ন অংকিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, যেখানে বিপদ্ নূতন জাল পাতিয়া তাহার প্রতীক্ষাতেই বসিয়া আছে। সেই রাত্রেরই শেষ ভাগে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভ্রান্তির বশে দলনী অতল গহ্বরের দিকে আর এক ধাপ নীচে নামিয়া গেল; শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল এবং নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমার বাহিরে, আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল। মহম্মদ তকির অনবধানতা ও দলনীর বিরুদ্ধে তাহার মিথ্যা-অভিযোগ-সৃষ্টি, দলনীর নির্বন্ধাতিশয্যে ফস্টর কর্তৃক তাহার পরিত্যাগ, কুলসমের সহিত বিচ্ছেদ, ব্রহ্মচারীর নিষেধসত্ত্বেও মুঙ্গেরযাত্রার কৃতসংকল্পতা—ঘটনার প্রত্যেক পদক্ষেপই দলনীর গলদেশে নিয়তির যে বজ্র ঝুলিতেছিল তাহার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে। শেষে নিয়তি যে বিষপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে তুলিয়া দিল তাহাতে অপূর্ব মাধুর্যরসের অমৃত সঞ্চার করিয়া দলনী তাহা পান করিল এবং অদৃষ্টের অবিচ্ছিন্ন পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এই অসাধারণ অদৃষ্ট-মন্থনে একদিকে যেমন বিপদের হলাহল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আর একদিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষকে ছাপাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। বাহিরের বিপদসংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে এবং হৃদয়ের গভীর বৃত্তি ও ভাবসমূহ আশ্চর্য সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ, যে অধ্যায়ে (ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কুলসমের তিক্ত, তীব্র সত্য-ভাষণে নবাবের দলনী-বিষয়ে ভ্রান্তির নিরসন হইল, তাহাতে মীরকাসেমের অসহ্য মনঃপীড়া ও নিষ্ফল অনুতাপ গৈরিক অগ্নিস্রাবের ন্যায়ই আমাদিগকে দগ্ধ করে। অন্যান্য তীব্রভাবপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে সুষুপ্তা শৈবলিনীর সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রশেখরের খেদপূর্ণ চিন্তা, ইংরেজ-হস্ত হইতে উদ্ধারের পর শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সন্তরণ, দলনীর বিষপান, মৃত্যুকালে প্রতাপের আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি বিরাট্ কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমাদের মনের মধ্যে সুগভীর রেখায় কাটিয়া বসে এবং বিচিত্র-ভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গূঢ়-রহস্যাবৃত এই মানবজীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

অবশ্য ভাষাগত উপযোগিতার দিক্ দিয়া সমস্ত দৃশ্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। কথোপকথনের সময়ে, একটা আলংকারিক শব্দাড়ম্বর সময়ে সময়ে বাস্তবতার সুরটিকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণপ্রাচুর্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যায়। বঙ্কিমের যুগে বাস্তব-জীবনের ভাষা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে নাই ;. করিলেও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা ভাবের এত উচ্চগ্রামে বাঁধা চলিত কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক, মোটের উপর, কতকগুলি দৃশ্য কতকটা ভাষাগত অতি-রঞ্জনের জন্য, আদর্শ সৌন্দর্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনের দিক দিয়া যাহা হউক, বর্ণনা ও ব্যঞ্জনায় এই ভাব-সমৃদ্ধ, অর্থগৌরবপূর্ণ ভাষা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্য-বর্ণনা, প্রতারণাশীল প্রভাত বায়ুর বিপদ্‌গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্বতারোহণের পর প্রকৃতির ভয়ানক বিপ্লব ও মানুষের সুখে-দুঃখে তাহার নির্মম উদাসীনতার বর্ণনা এবং প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি বঙ্কিমের ভাষার চরম গৌরবস্থল।

চরিত্রাঙ্কনের দিক্ দিয়া এক শৈবলিনীর চরিত্রেই অনেকটা জটিলতা আছে ; তাহারই অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত বঙ্কিম আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাইয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত চরিত্রই অপেক্ষাকৃত সরল ; তাহারা সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবন্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে অধিক গভীরতা নাই, দুই একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা গুণেরই প্রাধান্য আছে। বঙ্কিম অতি সুকৌশলে শৈবলিনীর অধঃপতনের ক্রমবিকাশটি চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যে যে ব্যর্থ প্রণয়জ্বালা-নিবারণের জন্য ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ হয়, তাহাতেই শৈবলিনীর স্বার্থপরতা ও চরিত্র-দৌর্বল্যের প্রথম অঙ্কুর দেখা যায়। প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞানু-সারে ডুবিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনা শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকিতে পারিল না, প্রাণের মায়া তাহার প্রণয়াবেগকে হটাইয়া দিল। এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বাজটিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে ক্রমবর্ধিত হইয়া তাহাকে এক গুরুতর পদস্খলনের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ। বিবাহের আট বৎসর পরে ভীমা পুষ্করিণীর জলমধ্যে এই অমঙ্গলের বাজে আবার বারি-সিঞ্চন হইল, অন্তরস্থ পাপ প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল। শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের এই আট বৎসরের ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই না—তবে চন্দ্রশেখরের আক্ষেপোক্তিতে তাহার একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রের আভাস পাই। চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমুখ, পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার প্রণয়তৃষ্ণা-নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই। তারপর শৈবলিনীর মানস পাপ বাহিরে প্রকাশ পাইল—ফস্টর ডাকাইতি করিয়া তাহাকে সমাজ-বক্ষ ও গার্হস্থ্য জীবন হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। এইখানে বঙ্কিম একটি অভিনব প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন—তিনি শৈবলিনীর গোপন অভি-প্রায় সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই, তাহার পাপের কাহিনীটি ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। যেমন বাস্তব জীবনে ধীরে ধীরে পাপের আবিষ্কার হয়, অনুমান, সন্দেহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস শেষে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়, শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে। সুন্দরীর সহিত বাড়ী ফিরিতে অস্বীকার-করণে তাহার পাপের প্রথম সন্দেহ পাঠকের মনে উদিত হয় ; পরে প্রতাপের নিকটে শৈব-

লিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে আমাদের সন্দেহ দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু শৈবলিনীর যুক্তিধারাটি ঠিক আমাদের মনে লাগে না—ফষ্টরের সহিত কুলত্যাগ করিয়া গেলে প্রতাপের প্রণয়লাভ যে কি প্রকারে সুলভ হইবে, তাহা দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরন্দরপুরের কুঠির বাতায়নে জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরার বিশেষ কি সুবিধা ছিল জানি না, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড হিসাব-ভুল করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। বোধ হয় সেই প্রণয়মূঢ়া ভাবিয়াছিল যে, সামাজিক ব্যবধানই তাহার প্রতাপ-লাভের পথে প্রধান অন্তরায়। প্রতাপের ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইবার পরও এই ভ্রমের নেশা তাহাকে ছাড়ে নাই—সে নবাবের নিকট দরবার করিয়া রূপসীর বিরুদ্ধে প্রতাপ-লাভের ডিক্রি পাইবার অসম্ভব আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরিয়া ভাসিবার চেষ্টার মত শৈবলিনীর প্রতাপ-লাভের এই অসম্ভব আশার মধ্যে একটা pathos—করুণ দিক—আছে। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য তাহার যে সমস্ত দুঃসাহসিক চেষ্টা, তাহাও তাহার প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতার পরিচয় দেয়। তারপর সব শেষ—দীর্ঘকালসঞ্চিত সুখস্বপ্ন এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেল, নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই পর্যন্ত শৈবলিনী-চরিত্রের বিশ্লেষণ চলে। তাহার পর সে মর্ত্যলোকের অনেক ঊর্ধ্বে, এক অভিনব অনুভূতির রাজ্যে বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রচণ্ড অনুভূতির ফলে ও ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার অন্তরালে শৈবলিনীর মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়া গেল—তাহার মর্মস্থান হইতে প্রতাপের প্রতি অনুরাগের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হইল এবং শৈবলিনী প্রকৃতপক্ষে নবজীবন লাভ করিল। কিন্তু এই শেষের দিকের শৈবলিনী আর সমালোচকের বিশ্লেষণের বস্তু নহে, খুব উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার অনুভূতির বিষয়।

'চন্দ্রশেখর'-এ বঙ্কিম যে নূতন কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এখানে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। লেখক শৈবলিনীতে একটি জটিল স্ত্রীচরিত্রের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব পূর্ব উপন্যাসের মধ্যে এক 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্র অনেকটা জটিল ও রহস্যময়, কিন্তু মনোরমা মুখ্যতঃ কল্পনা-রাজ্যের জীব, শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী। সকলের শেষে বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিবলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর'-এর কল্পনাশক্তির সমৃদ্ধি ও সুসংগতি আমরা উপভোগ করি, ইহার কলা-সৌন্দর্য আমাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকারপ্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ'-এর বাস্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অনুশীলন-তত্ত্ব-প্রিয়তার অগ্রদূত।

'চন্দ্রশেখর'-এর পরের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে কালানুক্রমিক পারম্পর্য লইয়া কতকটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। শচীশবাবুর তালিকায় 'চন্দ্রশেখর'-এর অব্যবহিত পরেই 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও তাহার পর ক্রমান্বয়ে 'আনন্দমঠ' (ডিসেম্বর, ১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম'

(১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই অন্বয় ঠিক অনুসরণ করার পক্ষে কিছু বাধা আছে। প্রথমতঃ, 'রাজসিংহ'-এর প্রথম সংস্করণের সহিত বর্তমান সংস্করণের (১৮৯৩) একেবারে মৌলিক ও গুরুতর প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও বর্তমান সংস্করণের 'রাজসিংহ' অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনেকটা বিভিন্ন; 'রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণের প্রারম্ভে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে এই পার্থক্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজ অভিমত এই বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত কাল্পনিকের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে লেখকের মতামত বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন বঙ্কিমের নিজের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস; তিনি লিখিয়াছেন, "পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক (?) উপন্যাস-প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" সুতরাং 'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ বলিয়া মনে করিলে, ইহাকে 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম'-এর পর আলোচনা করাই যুক্তিসংগত। সেইজন্য আপাততঃ 'রাজসিংহ'কে বাদ দিয়া 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এর আলোচনা আরম্ভ করাই সমীচীন হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'চন্দ্রশেখর'-এ যে কল্পনাতিশয্যের সূত্রপাত, তাহা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রকটতর হইয়াছে এবং বঙ্কিমকে অল্পবিস্তর ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে স্খলিত করিয়াছে। বিশেষতঃ, 'আনন্দমঠ'-এ এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র বিস্তারিত পৃথক্ আলোচনার পূর্বে তাহার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। উভয়েরই ঘটনা-কাল প্রায় এক—ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম পত্তনের সময়; 'দেবী চৌধুরাণী'র আখ্যায়িকা 'আনন্দমঠ'-এর কয়েক বৎসর পরে মাত্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ রোমান্সের কাল এই ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সূচনার সময়। বঙ্কিমের এই কালনির্বাচনের প্রধান হেতু এই যে, এই যুগে ইতিহাসের সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'মৃণালিনী'তে যে সুদূর অতীতের চিত্র তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের অতি ক্ষীণ সন্নিবেশ কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি যে সমাজচিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রায় আধুনিক যুগের; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবেশ হইয়াছে ও সাধারণ জীবনের উপর ঐতিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইখানি উপন্যাসেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়াই আমাদের সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ, উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম এমন দুইটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের পক্ষে অভাবনীয় ছিল, 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ ও 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠক উভয়েই এমন এক বিরাট্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের সামগ্রী

বলিয়া আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশভক্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ ইংরেজ রাজত্বে শতবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম অনায়াসে মুসলমান শাসনের শেষ যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; ইহার ফলে দুইখানিই উপন্যাসই অল্পবিস্তর অবাস্তবতা-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিক্ষোভের, যে রাজনৈতিক আদর্শের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত সমাজ-জীবনের কোনও যোগসূত্র দেখিতে পাই না। এই অবাস্তবতার ছায়া প্রায় সকল সমালোচকের চোখেই পড়িয়াছে; এই দোষের প্রতি প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অপরাধের গুরুত্বের পরিমাণ কত, ইহার দ্বারা উপন্যাসোচিত সৌন্দর্যের কতটা হানি হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুতরাং এই বিষয়েরই বিচার করিলে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র উপন্যাস-হিসাবে উৎকর্ষ স্থির করার সুবিধা হয়।

এই উপন্যাসদ্বয়ের পাঠকের মনে যে সন্দেহ সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহা এই—সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক যেরূপ জ্বলন্ত দেশভক্তি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের কোন বাঙালীর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য কল্পনা-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার শক্তি রাজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জিত বাঙালীজাতির ছিল কি না। বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে এই সন্দেহ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে; এই শত-ব্যবধান-খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে একতাবন্ধনে বাঁধা, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কত সুকঠিন, তাহার সাক্ষ্য আমাদের আজিকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে। বঙ্কিমের যুগে এই দুরূহতা উপলব্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল সাক্ষ্য তখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই, আদর্শ ও বাস্তব, কল্পনা ও কার্যের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহার পরিমাপ লওয়া হয় নাই। তখন কল্পনার একটা প্রথম সতেজ স্ফূর্তি, একটা অবাধ সাহস ছিল। সেই অবাধ কল্পনার বলে বঙ্কিম মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের সময়ে যে একটা বিরাট রাজনৈতিক আদর্শের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। কিন্তু মনে হয় যে, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই অবাস্তবতার অভিযোগ অন্ততঃ কতক পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহার স্বপক্ষেও কতকগুলি কথা বলিবার আছে, অন্ততঃ এই অবাস্তবতার মধ্যে কতকগুলি প্রকৃত ভাবের প্রেরণা ও বাস্তবসূত্র আছে। সম্পূর্ণ বিচার করিবার পূর্বে এই বাস্তব সূত্রগুলির পরিচয় লওয়া আমাদের উচিত।

অরাজকতা বলিলে কি বুঝায়, আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক জীবনের উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, উহা আমাদের মনের কোন্ গোপন, অপরীক্ষিত গুণগুলিকে টানিয়া বাহির করিবে, আমাদের যে চিন্তাধারা এখন শান্ত জীবন-যাত্রা-নির্বাহের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছে তাহাকে কোন্ নূতন, অপরিচিত প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে, তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা না করিতে পারিলে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা অসংগত। মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সময় কেবল অরাজকতা নহে, একটা বিরাট শূন্যতার যুগ। একটা পুরাতন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুসলমান রাজকর্মচারিবৃন্দ কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের

হাতে যে রাজশক্তি ন্যস্ত ছিল তাহা স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের কাজে অপব্যবহার করিতেছে। দেশের আকাশ-বাতাস একটা অবিশ্রান্ত কোলাহল ও কাতর আর্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; অথচ এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কোথাও কোন নূতন শক্তি গড়িয়া উঠার চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। আবার ইহার উপর, এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রলয়ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল, ইহা তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে। অরাজকতার যুগেও মানুষের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকে; সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক আকর্ষণ একতা-সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সমস্ত বৃহত্তর সত্তা হইতে বাহির করিয়া একেবারে আত্মসর্বস্ব হইতে দেয় না। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙলা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিয়া, মানুষকে সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহার সমস্ত বৃহত্তর ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহার বিচ্ছিন্ন অণু-পরমাণুগুলিকে ধূলির সহিত মিশাইয়াছে, চারিদিকের বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে।

এই সর্বব্যাপী ধ্বংসের সময়ে জীবনের যে সমস্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, তাহাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। যখন পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষদানবের তাড়নায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন যে তাহাদের মনে অভিনব ভাবের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে, তাহারা যে নানাপ্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে খুব বেশি বিস্ময়ের কারণ নাই। যাঁহারা সমাজের সহজ নেতা, যাঁহাদের হাতে সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তির কিয়দংশ এখনও রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তি যে এই সময়ে সর্বব্যাপী অত্যাচার ও অরাজকতার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে উদ্‌যোগী হইবেন, তাহাও স্বাভাবিক; প্রথমতঃ, হয়তো তাঁহাদের চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইবে; পরে ধীরে ধীরে যেমন তাঁহাদের শক্তি-সঞ্চয় হইবে, যেমন তাঁহারা বিরুদ্ধ শক্তির প্রকৃত বলনির্ণয়ে সমর্থ হইবেন, তেমনি তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছিবে। তাঁহারা দেশের উপরে নিজ আধিপত্য-বিস্তারে মনোযোগী হইবেন; বিশৃঙ্খল উপাদানগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটি নূতন রাজ্যস্থাপনের কল্পনা রহিয়া রহিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মত খেলিয়া যাইবে। এই প্রণালীতেই প্রত্যেক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠে; শিবাজী হইতে প্রতাপাদিত্য, সীতারামের রাজ্যস্থাপনের এই একই প্রক্রিয়া। সুতরাং এই সর্বদেশ-সাধারণ প্রণালীর দ্বারা, আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায় কি-ভাবে গড়িয়া উঠিল, তাহার একরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই যে বাধা মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা দুরতিক্রমণীয়। সন্তান-সম্প্রদায়গঠনের মূলে যে আশ্চর্য দেশপ্রীতি উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সেকালের কেন, একালের আদর্শকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইখানে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসোচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শলোকের রাজ্যে উঠিয়াছে। তারপর সন্তান-সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি বর্ণনা করিতে

গিয়াও বঙ্কিম বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সন্তানদের আনন্দ-কাননের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেন নাই, তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলস্বরূপ যে 'নগরের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরী হইয়াছে। নগরের এত নিকটে একটা এত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, রাজ-শক্তির অগোচরে কিরূপে পুষ্টিলাভ ও শক্তি-সঞ্চয় করিল, ইতিহাসের দিক্ হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই না। একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, খুব নিকট হইতে সূক্ষ্মভাবে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

বঙ্কিম কিন্তু এই সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত আরও কতকগুলি বাস্তব সূত্র জড়াইয়া ত্রুটি কতকটা সারিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রস্থ সন্তান-সম্প্রদায় কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কিরূপে সম্মিলন হইল, কিরূপ সহজে এই বুভুক্ষুদের দ্বারা তাহাদের দলপুষ্টি হইল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি দীক্ষিত সন্তান-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অদীক্ষিত জনসাধারণ কি করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এই সমস্ত সাধারণ সৈনিকের যুদ্ধ-বিগ্রহ যে লুঠতরাজেরই নামান্তর, তাহারা যে নায়কদের আদর্শবাদের বা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই, কেবল লুঠের লোভে বা একটা সুলভ আস্ফালন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই সন্তানদের সহিত মিশিয়াছিল, ইহা বঙ্কিমের বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি। বঙ্কিম এতটুকু পর্যন্ত বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যখন কাপ্তেন টমাসের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী সেনাপতিরা সত্যানন্দকে রাজধানী অধিকার ও বিজিত প্রদেশের শাসনের সুব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন, তখন ধীরানন্দ দেখাইলেন যে, রাজ্যজয়ের জন্য কোন সৈনিক পাওয়া যাইবে না, সকলেই লুঠের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং এই লুঠই তাহাদের সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে বঙ্কিম সন্তানদের প্রকৃত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কি অসার ভিত্তির উপরে সন্তান-ধর্মের আদর্শবাদের সৌধ নির্মিত হইয়াছে তাহার উপর একটা চকিতের জন্য আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায়ই অলক্ষিত ইঙ্গিতের দ্বারা লেখক বাস্তবতার দাবী রক্ষা করিতে ও প্রকৃত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই কল্পনাপ্রসূত সৌন্দর্যলোকের পশ্চাতে, একস্থানে নগ্ন বাস্তবতার কঙ্কাল তাহার গাঢ়-কৃষ্ণ, করাল ছায়াপাত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানবের যে দানবোচিত বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাই সে যুগের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিতেছে। তাহার উপর কোন কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস, কোন মহান্ আদর্শের জ্যোতি পড়িয়া তাহার সহজ বীভৎসতাটিকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে নাই। বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই কয়েকটি অধ্যায় উপন্যাসের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে বিভিন্ন; এখানে বঙ্কিমের আখ্যায়িকা আশ্চর্য দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে; ভাষার মধ্যে একটা অসাধারণ

শুষ্ক, কঠোর ব্যঞ্জনা-শক্তি, একটা অব্যক্ত ভীতি-সঞ্চারের ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে। সন্তান-ধর্মের জ্যোতির্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভাষণ বাস্তব জগতের ঈষৎ-প্রকাশ বঙ্কিমের শক্তির অন্য দিকেরও পরিচয় দান করে।

সন্তান-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সন্তানদের কার্যকলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ আছে। শিক্ষাহীন, উপকরণহীন, সৈনাপত্য-বর্জিত কতকগুলি বাঙালা চাষার দল যে ইংরেজ-সেনাপতিচালিত দুইদল সিপাহীকে পরাজিত করিল, ইহা অনেকেই অশ্রদ্ধেয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে ইহা কেবল একটা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির উচ্ছ্বাস মাত্র; বাস্তব জগতে আমাদের হীনতা—পরাজয়ের একটা সুলভ কলঙ্ক-ক্ষালন মাত্র। সময়ে সময়ে বঙ্কিমের ঘটনাবিন্যাস এরূপ সন্দেহ হইতে মুক্ত নয়। শান্তিকে দিয়া তিনি দুইবার দুইজন ইংরেজ সৈনিকের পরাজয় ঘটাইয়াছেন, একবার শান্তি গুলি করিতে উদ্যত কাপ্তেন টমাসের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, আর একবার লিগুলেকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিয়া ইংরেজদের গোপন অভিসন্ধি সত্যানন্দকে যথাসময়ে জানাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এই দুইটি উদাহরণই কেবল একটা অযথা জাত্যভিমানপ্রসূত বলিয়া মনে হয়; ইহারা ইংরেজদিগকে বোকা বানাইয়া সন্তানদের বুদ্ধি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণের একটা নিতান্ত সুলভ উপায়স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর আধুনিক যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত ও আধুনিক যুদ্ধোপকরণসমন্বিত ইংরেজের বিরুদ্ধে শিক্ষা-দীক্ষাহীন সন্তান-সৈন্যকে জয়ী দেখাইয়া যে তিনি একটা প্রবল অবিশ্বাসের অবসর দিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে সত্যের অনুরোধে তাঁহাকে কামান-বন্দুকের কাছে লাঠি-বল্লমধারী সন্তান-সৈন্যের পরাজয়ের কথা লিখিতে হইয়াছে। তবে এখানেও বঙ্কিমের অপরাধ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ইহা ঠিক ততটা নয়। তাঁহার প্রতি সন্দেহের মধ্যে আমাদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি যেন অল্প উঁকি মারিতেছে। মনে করুন, সন্তানদের এই বিজয় যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অবিশ্বাসের মাত্রা এতদূর হইত না। বঙ্কিমের পক্ষে বলিবার প্রধান কথা এই যে, ঐ দুইটি জয়ই ঐতিহাসিক; ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই এই সন্ন্যাসীদের এই দুইটি জয়ের কথা এবং দুইজন ইংরেজ সেনাপতির প্রাণনাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনাগুলি—আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে সন্তান-সৈন্যের অবিচলিতভাবে দাঁড়ান, ভবানন্দ-জীবানন্দের প্রশংসনীয় সৈনাপত্য-কৌশল প্রভৃতি—সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ের সম্ভাবনীয়তার বিচার করিতে হইলে আমাদের তৎকালীন ইংরেজদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। অনতিকাল পূর্বে ইংরেজশাসনাধীনে প্রায় দুই শতাব্দী বাস করার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়ান যেমন কল্পনাশক্তিরও অগোচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইংরেজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সময়ে অবশ্য তাহা হয় নাই। তখন ইংরেজ আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, সাম্রাজ্যস্থাপনের কল্পনা বোধ হয় তখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। তখনও দেশবাসী ইংরেজের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে একেবারে সংকুচিত ছিল না; আর ইতিহাসেই লিখিতেছে যে, একটা তুচ্ছ সন্ন্যাসীর দলও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা করে নাই। সে

সময়ে ইংরেজ জাতির অসাধারণ শৌর্য ও গৌরবময় ইতিহাস বাঙালীর প্রায় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। তখনও সে নেপোলিয়ন-বা জার্মান-বিজয়ীর যশোমুকুট পরিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই; তখনও তাহার নামের মহিমা আমাদের শারীরিক ও মানসিক তেজকে একেবারে অসাড় করিয়া দেয় নাই। মোট কথা এখন যাহা আমাদের কল্পনা করিতেও ভয় হয়, তখন তাহা কার্যে পরিণত করার দুঃসাহসেরও অভাব ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে বঙ্কিমের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয়, এবং যদি এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস উপন্যাসের রসোপভোগে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ দোষ লেখকের নহে।

'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—ইহার আখ্যান-বস্তুর সহিত বঙ্গের প্রকৃত জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই—তাহার যৌক্তিকতা-সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হইল। এই অভিযোগের সাধারণ সত্যতা স্বীকার করিয়া, কোথায় কোথায় বাঙলার বাস্তব জীবনের সহিত উপন্যাসের যোগসূত্র আছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এই অভিযোগের কারণ কতকটা বর্তমান আছে, কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এর সহিত তুলনায় আমাদের অবিশ্বাসের হেতু অনেক কম। প্রথমতঃ, ভবানী পাঠকের মধ্যে সত্যানন্দের ন্যায় একেবারে অবিমিশ্র আদর্শবাদ নাই, একটা বিশাল রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাহার মনে সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই। তাহার মধ্যে দস্যু-দলপতির চিহ্ন অনেকটা স্ফুটতর; সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন বা সংস্কারকের আদর্শের জ্যোতি সেই চিহ্নকে একেবারে ঢাকিতে পারে নাই। সত্যানন্দের সহিত তুলনায় ভবানী পাঠকের উচ্চাভিলাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ। সত্যানন্দের উদ্দেশ্য একটা নূতন ধর্মপ্রবর্তন, ও এই নবধর্মের ভিত্তির উপরে একটা নূতন রাজ্য-গঠন, ভবানীর উদ্দেশ্য একটি স্ত্রীলোকের চরিত্রগঠন দ্বারা তাহাকে দস্যুদলের নেত্রীপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা। জনসাধারণের ভক্তি-উদ্রেক ও কল্পনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সংঘেরই এরূপ একটি রাজা বা রাণীর প্রয়োজন হয়. দেবী চৌধুরাণীর সৃষ্টি যেন একপ্রকার নূতন রকমের পৌত্তলিকতার প্রবর্তন। সত্যানন্দ-ভবানী পাঠকের মধ্যে আর একটা মৌলিক প্রভেদ আছে; সত্যানন্দ তাহার সমস্ত ধর্মাবরণের মধ্যে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ—politician: ভবানী তাঁহার সমস্ত দস্যুতা ও পরহিতব্রতের মধ্যে বাস্তবিক একজন শিক্ষক, গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তোলার উদ্‌যোগী। 'আনন্দমঠ'-এ দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু ধর্ম অপ্রধান; 'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মই প্রধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং 'দেবী চৌধুরাণী'তে বাস্তবতার অংশ 'আনন্দমঠ' অপেক্ষা অনেক বেশি; বাঙলার বাস্তব জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাগুলির প্রবেশ করাইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। 'আনন্দমঠ'-এ সত্যানন্দের গরীয়ান্ আদর্শটি বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না, 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের নিষ্কামধর্মে দীক্ষার অংশ একেবারে বাদ দিলেও উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।

এইবার 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অন্যান্য দিক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে, ইহা উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার

বিরাট রাজনৈতিক কল্পনাকে ঢালিয়াছেন। বাস্তবিক 'আনন্দমঠ'-এর উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশি আছে তাহা বলা যায় না। অতীতের চিত্র আঁকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ'-এর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ বাস্তবলোকে ও অপর পদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে। বাস্তব ও রোমান্স—এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত। ডিকেন্সের কতকগুলি চরিত্রের মত ইহারা একটা মধ্যলোকের অধিবাসী, আদর্শলোকের কল্পনা বাঙালীর নাম ধরিয়া, বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিলে যতটুকু বাস্তবতার দাবী করিতে পারে, ইহারা ততটুকু বাস্তব। সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ— সকলেরই ব্যক্তিত্ব একটা কুহেলিকা-মণ্ডিত। ভবানন্দ ও জীবানন্দের প্রলোভন, ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত বাস্তব জীবনের সংঘাতের মত আমাদের মনের গভীর দেশে আঘাত করে না। বরং ভবানন্দের প্রলোভন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতকটা অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে কেননা এখানে অন্ততঃ একপক্ষ—কল্যাণী—বাস্তব জগতের জীব। বাহিরের জগৎ হইতে যে তিনটি প্রাণী—মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শান্তি—সন্তান-ধর্মের অপার্থিব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে মহেন্দ্র-কল্যাণী এই দুইজনই তাহাদের বাস্তবতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের সহিত সন্তানজগতের সম্পর্ক ও পরিচয় খুব অল্প দিনের, ইহারা বাহির হইতে যে প্রকৃতি লইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়াছিল, সে প্রকৃতি বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই। চারিবৎসরব্যাপী একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন ও অলৌকিক অনুভূতি হইতে জাগিয়া তাহারা আবার সেই পুরাতন, চিরপরিচিত বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। শান্তিকে সন্তান-রাজ্যের আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্ম করিবার জন্য তাহার সমস্ত পূর্ব জীবনকে বিকৃত ও একটা অপ্রকৃত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, কোন চরিত্রই একেবারে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হয় নাই, তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে ও পরস্পরের সহিত সম্পর্কে একটা সুন্দর ঐক্য ও সুসংগতি রক্ষিত হইয়াছে। লেখক যে আকাশ-বাতাস সৃষ্ট করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব না হউক, কোনরূপ আভ্যন্তরীণ অসংগতিদুষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'আনন্দমঠ'-এর মধ্যে দুই-একটি বাস্তব স্তরও আছে, উপন্যাসের সাধারণ অবাস্তবতা হইতে এই দৃশ্যগুলিকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। প্রথম চারিটি অধ্যায় একটি ভীষণ বাস্তব চিত্র, আর নিমির চরিত্রেও এই খাটি বাস্তবতার সুরটি পাওয়া যায়। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এর প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাস হিসাবে নহে; বাঙলার পাঠক-সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, 'আনন্দমঠ' আধুনিক বাঙলার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর সাধারণ মানসসম্পত্তি, বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন, ইউরোপের দেশপ্রীতি, বাঙালীর বিশেষ অবস্থার মধ্যে, বাঙালীর বিশেষ পূজোপকরণের সাহায্যে, বাঙালী-হৃদয়ের ভক্তি-চন্দন-চর্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্তমান যুগের এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার প্রথম

প্রেরণা এই 'আনন্দমঠ' হইতে আসে নাই; বাঙালীর রাজনীতিচর্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা পর্যন্ত বঙ্কিমের কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙালীর মানসস্বর্গে এক নূতন দেবী-প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন; বাঙালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। "বন্দেমাতরম্" আধুনিক বাঙালীর বেদমন্ত্র। সেইজন্যই 'আনন্দমঠ'কে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক উর্ধ্বে।

'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ'-এর দুই বৎসর পরে (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়, এবং 'আনন্দমঠ'-এর ন্যায় ইহাতেও একদল doctrinaire বা উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত দস্যুর অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র উপাখ্যানের মধ্যে অসাধারণত্বের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও, ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধান্য; ইহার মধ্যে অলৌকিক উপাদান যাহা আছে, তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত সহজেই মিলিতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার বা দেশের বাস্তব অবস্থার বিরোধী নহে। ভবানী পাঠক সত্যানন্দের ন্যায় অতিমানব মহাপুরুষের স্তরে উন্নীত হন নাই, প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম-শিক্ষার মধ্যে যাহা কিছু অবাস্তবতা আছে, তাহা সমগ্র উপন্যাসটির উপরে ছায়াপাত করিতে পারে নাই, এবং ইহার বাস্তবতার সুরটি ঢাকিয়া ফেলে নাই। আমাদের সামাজিক জীবনের সহজপ্রীতিপূর্ণ, অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ-বিড়ম্বিত চিত্রটিইই ইহার অধিকাংশ ব্যাপিয়া আছে। গ্রন্থশেষে কঠোর বৈরাগ্য ও দেশহিতব্রতের উপর গার্হস্থ্যধর্মেরই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণী তাহার সমস্ত রাণীগিরির ঐশ্বর্য ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্তার উচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া আবার গৃহধর্মপালনের জন্য হরবল্লভের সংকীর্ণ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তাহার নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা এই নূতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে পরমস্বার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈকুণ্ঠেশ্বর ও ব্রজেশ্বরের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরই জয়লাভ করিল; বৈকুণ্ঠেশ্বর তাঁহার বিরাট সত্তা সংকুচিত করিয়া ব্রজেশ্বরের পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন, এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ রমণীহৃদয়ের যে দেবদুর্লভ প্রেম ও ভক্তি উপহার পাইলেন, তাহাতে বোধ করি তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিল না।

'দেবী চৌধুরাণী'র আরম্ভ একেবারে সম্পূর্ণ বাস্তব; সামাজিক কারণে নিরপরাধ স্ত্রীর পরিত্যাগ, আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান লেখকলেখিকাদের নিতান্ত সাধারণ বিষয়। কিন্তু ইহারা যেমন এই বিষয়ের মধ্য দিয়া সামাজিক অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরেন, বঙ্কিম তাহা করেন নাই; তিনি সমস্ত বিষয়টিকে একটি গোপন প্রেম ও নিগূঢ় সহানুভূতির ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমাদের হিন্দু-সমাজে একটি স্বাভাবিক সংযম, ভক্তিশীলতা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য বিদ্রোহের খুব তীব্র আত্মপ্রকাশ বড় একটা হইতে পায় না—তাহা একটা গোপন ক্ষোভের মতই বক্ষঃতলে নিরুদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রতিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব আমাদের জীবনের পক্ষে যে সর্বদা হিতকর বা প্রকৃত পৌরুষ-বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় দুই পরস্পর-বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে যেটি আমরা বাছিয়া লই, তাহা কাপুরুষোচিত নির্বাচনই

হইয়া দাঁড়ায়; প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও মনের বল আমাদের থাকে না বলিয়াই আমরা সহজে বাঁধা রাস্তাটাই অবলম্বন করিয়া ফেলি। এই চরিত্রগুলি আর্টের দিক্ দিয়াও খুব সার্থক হইয়া উঠে না; সামাজিক ব্যবস্থার দাস-সুলভ অনুবর্তিতা তাহাদিগকে আর্টের দিক্ দিয়াও ব্যক্তিত্ব-বর্জিত বর্ণলেশশূন্য করিয়া ফেলে।

বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এই সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রেম ও পিতৃভক্তির একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছেন; তাহাকে একদিকে উদ্ধত অবিনয় ও অপর দিকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্কটের উপন্যাসসমূহের প্রায় সমস্তগুলিতেই নায়কের চরিত্র নীরস ও বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে; স্কট্ তাহাকে সর্বগুণোপেত করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রাণের ধারা মন্দীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ব্রজেশ্বরকে সর্বগুণসম্পন্ন করিয়াও তাহাকে ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বাঙালী সমাজের কতকগুলি বিশেষত্বই ব্রজেশ্বরের চরিত্রকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, ও তাহাকে স্কটের নায়ক হইতে পৃথক্ করিয়াছে। প্রথমতঃ, তাহার বহুপত্নীকত্ব—সাগর বৌ, নয়ান বৌ, প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের বিভিন্নতা, ও তাহার দাম্পত্য-ব্যাপার-সম্বন্ধে ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত সরস কথোপকথন ও পরিহাসকুশলতা তাহাকে আদর্শ নায়কের রক্তমাংসহীন, অশরীরী অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাহাকে একাধিক স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হয়, এবং সে বিষয় লইয়া ঠানদিদির সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পূর্ণ আলোচনা চালাইতে হয়, তাহার চারিদিকে একটা লঘু-তরল হাস্যরসের আবেষ্টন সৃষ্ট হয়; এবং সেইজন্যই আদর্শ নায়কের অবাস্তবতার ছায়া তাহার গায়ে লাগিতে পায় না। প্রফুল্লের সহিত ব্যবহারের মধ্যেও তাহার একটা সংযত অথচ গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা সর্বপ্রকারের নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-বর্জিত। এই বিষয়ে তাহার সহজ, সরল কথাবার্তা স্কটের নায়কদের গুরুগম্ভীর, সাড়ম্বর বাক্যবিন্যাসের অপেক্ষা গভীর ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী। আবার দশ বৎসর বিচ্ছেদের পর প্রফুল্লকে চিনিবার পর তাহার দস্যুবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ও তাহার প্রতি উদ্বেল প্রেমের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বটুকু তাহার বাস্তবতা বাড়াইয়া দিয়াছে। ব্রজেশ্বরের শ্বশুরবাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসা, ও সাগরের প্রতি দুর্জয় অভিমান; বজরাতে ডাকাতির সময় তাহার নির্ভীক, সপ্রতিভ ভাব, ও দেবী চৌধুরাণীর বজরাতে বন্দি-ভাবে নীত হইবার পর দেবীর সহচরীদের হাতে তাহার দুরবস্থা—এই সমস্তই তাহাকে আদর্শ-লোক হইতে নামাইয়া বাস্তব জগতের আসনে দৃঢ়তর করিয়া বসাইয়াছে, ও তাহার সহিত পাঠকের একটা মধুর-প্রীতিপূর্ণ সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছে। আবার প্রবল, অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তির অক্ষুণ্ণ মর্যাদা-রক্ষা, প্রফুল্লকে পাইবার লোভেও পিতার সহিত জুয়া-চুরি করিতে অস্বীকার করা, তাহার চরিত্রের উপরে একটা দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। মোটের উপর, ব্রজেশ্বর উপন্যাসজগতের চরিত্রের মধ্যে একটি বিশেষ সজীব সৃষ্টি। ব্রজেশ্বর আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী, দুই-একটি অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও তাহার বাস্তবতার কোন হানি হয় নাই।

অবশ্য গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা ব্রজেশ্বরকে লইয়া নয়, প্রফুল্লকে লইয়া; এবং প্রফুল্লের প্রতি

গ্রন্থকার যে অসাধারণত্বের আরোপ করিয়াছেন, তাহাই উপন্যাসটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিচারবিতর্কের বিষয়। অধিকাংশ সমালোচকই গ্রন্থের এই অংশটুকু বিস্ময়-মিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন; যেন এইখানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ-প্রচারক বঙ্কিমের নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ধর্মতত্ত্বের উপর আদিরসের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় দেখিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রফুল্লকে নিষ্কামধর্মে দীক্ষিত করিয়া দশ বৎসর বনে-জঙ্গলে দস্যুদলের সহিত ঘুরাইয়া, শেষে আবার তাহাকে হরবল্লভের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করিতে পাঠাইয়াছেন। এই পরিণতির জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এত সুদীর্ঘ আড়ম্বরের বা পাঠকের নিকটে খুব উচ্চকণ্ঠে এই শিক্ষার মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে তাহা স্বীকার্য। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসটির মধ্যে পর্বতের মূষিক-প্রসবের ন্যায় একটি হাস্যজনক অসংগতি আছে। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বঙ্কিমের অপরাধ তত গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। প্রফুল্লের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটি গ্রন্থের উপরে ধর্মতত্ত্বের একটা বাহ্য-প্রলেপ মাত্র, ইহার প্রভাব কেন্দ্র-স্তর পর্যন্ত ভেদ করিতে পারে নাই। এই নিষ্কামধর্ম প্রফুল্লের প্রকৃত চরিত্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তাহার প্রেমোন্মুখ, সুকোমল নারীহৃদয়ের উপর কোন বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করে নাই। ইহার প্রবল আক্রমণের মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ মাধুর্য ও উদ্বেল স্বামীভক্তি অক্ষুন্ন ছিল—শিক্ষাকালের মধ্যে একাদশীতে মাছ খাওয়ার নিষেধের প্রতি অবাধ্যতার দ্বারা গ্রন্থকার এই অনিবার্য প্রেম-প্রাবল্যের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রফুল্লের প্রকৃতি কোথাও এই গুরুভার দীক্ষার চাপে বাঁকিয়া চুরিয়া যায় নাই, শারদাকাশে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায়ই ইহাকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে। তাহার চরিত্র কোথাও পৌরুষ-বা-স্পর্ধা-যুক্ত হয় নাই; মধ্যে মধ্যে এক একটা দার্শনিক তত্ত্বের বিচার সত্ত্বেও কোথাও পাণ্ডিত্যবিড়ম্বিত হয় নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে তাহাকে আদর্শবাদের সর্বোচ্চ স্তরে, ভগবানের অবতারপদে উন্নীত করিলেও, পাঠকের কল্পনা ও সহানুভূতি এইরূপ ভীতিজনক পরিণতিতে কখনও সায় দিতে চাহে না। প্রফুল্লকে আমরা বরাবরই স্বামী-প্রেমে-বিহ্বলা, আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মতই দেখি, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন আদর্শের সহিত তাহার সম্বন্ধ আমাদের সহানুভূতিকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে, ঔপন্যাসিক ধর্মতত্ত্ববিদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিকেরই জয় হইয়াছে; কলাকৌশলের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি ধর্মতত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে নাই।

প্রফুল্ল-চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার নিষ্কামধর্মে দীক্ষা তাহাকে কখনও সন্ন্যাসের দিকে, গার্হস্থ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত করে নাই। এই বিষয়ে 'সীতারাম'-এর শ্রী-চরিত্রের সহিত তাহার প্রভেদ। স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের পরে শ্রীর চরিত্র যেমন জয়ন্তীর প্রভাবে রমণীসুলভ মাধুর্য হারাইয়া এক শুষ্ক, কঠোর, আসক্তি-লেশশূন্য নিষ্কামধর্মের মরু-বালুকার মধ্যে নিজ স্নেহ-প্রেমের শীতল ধারাকে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল, নিষ্কামধর্ম-দীক্ষিতা প্রফুল্লের চরিত্রে নিশির সাহচর্য-ফলেও তাহা হইতে পায় নাই। জয়ন্তীর মধ্যে যেমন একটা শিক্ষয়িত্রীর পরুষভাব ও আত্ম-প্রাধান্য-মূলক গর্বের রেশ আছে, নিশি-চরিত্রে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই; নিশির মধ্যে ধর্মপ্রচারকের সংকীর্ণতা কিছু দেখিতে পাই না। সখীর সমবেদনা তাহাকে

প্রফুল্লের সুখ-দুঃখভাগিনী করিয়া তুলিয়াছে। সে প্রথম হইতেই প্রফুল্লের অক্ষুণ্ণ স্বামিপ্রেম দেখিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে, প্রেমের প্রাকার-মূলে বেদান্তের dynamite লাগাইবার কোন চেষ্টা করে নাই। বরঞ্চ নিজেকে বেদান্ত-বর্মে আচ্ছাদিত করিয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতই সর্বান্তঃকরণে সখীর প্রেমের দৌত্য-কার্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। এইজন্যই বোধ হয় নিশি জয়ন্তী অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক স্নেহভাজন হইয়াছে। জয়ন্তীর গুরুগিরির জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটি গূঢ় প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন নাই, সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নীচে একটি স্বভাবদুর্বল, লজ্জাসংকুচিত নারীহৃদয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে বেশ যথেষ্ট রকমই অপ্রতিভ করিয়াছেন। আর নিশি-দিবার নিকট যে চেলাকাঠের উপঢৌকন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাহার অন্তরালে তাঁহার সহজ স্নেহ ও কৌতুকমণ্ডিত প্রীতিরই পরিচয় পাই।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ আলোচনা-যোগ্য নহে। নিশি-চরিত্রের আংশিক অবাস্তবতা-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা সকলেই সজীব চরিত্র, দুই-একটি স্বল্প-রেখাতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবানী পাঠক, আদর্শবাদের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াও, বাস্তবতা হারায় নাই। উপন্যাসটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত চরিত্র হরবল্লভের। হরবল্লভের কঠোর বৈষয়িকতা ও নির্মম সমাজানু-বর্তিতা, মিথ্যাপবাদকলঙ্কিতা পুত্রবধূর নির্দয় প্রত্যাখ্যান ও তাহার করুণ অনুরোধের হৃদয়হীন উত্তর—আমাদের বাঙালী পরিবারের একটি সুপরিচিত শ্রেণীর (type) কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর প্রতি তাহার অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা, ও দেবীর নিকট বন্দী হইবার পর তাহার নিতান্ত হেয় কাপুরুষতা তাহাকে সাধারণ সংকীর্ণমনা বাঙালী গৃহকর্তার শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিয়া চরম দুর্বৃত্ততার গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে ও ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে আরও কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছে। অথচ এই হরবল্লভের উপরে গ্রন্থকারের যথেষ্ট অবজ্ঞার সহিত অনেকটা অনুকম্পার ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে; তাহার আত্মাবমাননার গভীরতাই তাহাকে আমাদের ঘৃণা হইতে রক্ষা করিয়া শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃতি-বর্ণনাতেও বঙ্কিম নিজ কবিজনোচিত অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রালোকে বর্ষাস্ফীতা ত্রিস্রোতার চিত্র খুব উচ্চ অঙ্গের বর্ণনাশক্তির নিদর্শন। কিন্তু ইহা কেবল বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দেয় না; ইহাতে মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির একটা গূঢ়, অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। দেবীর উদ্বেল, প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের সহিত এই অন্ধকারমিশ্র চন্দ্রালোকের তলে প্রবাহিতা বেগবতী নদীর একটি সুন্দর সুসংগতি ও নিগূঢ় ভাবগত যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিমের প্রকৃতিবর্ণনা কেবল বহিঃসৌন্দর্যের নিপুণ সমাবেশমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; বহিঃসৌন্দর্যের পশ্চাতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা রসগ্রাহী দর্শকের মনের সহিত একটা গূঢ় ঐক্যস্থাপন করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে, বঙ্কিম তাহাকে প্রকৃত কবির ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অবশ্য গ্রন্থের অসাধারণ ঘটনাগুলি যে সম্ভাবনীয়তার দিক্ হইতে সর্বত্র প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রফুল্লের অতর্কিত অন্তর্ধান যে ভাবে তাহার মৃত্যুসংবাদে রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়; এবং রূপান্তরের

প্রকৃতিও সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে আলৌকিকে রূপান্তরিত হয়, ইহার বিপরীত রকমের পরিবর্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ রোগে মৃত্যু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা ভৌতিক ঘটনাতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু ভৌতিক ঘটনা যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে তাহার অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জন করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইবে, তাহা মোটেই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেখানে দুর্লভচন্দ্র ও ফুলমণির নিকটে প্রফুল্লের প্রকৃত অবস্থা অবিদিত নাই, সেইখানে যে তাহার অলীক মৃত্যুসংবাদ একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে তাহার স্বগ্রামে ও শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ এই অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের উপরেই উপন্যাসটি প্রতিষ্ঠিত; এই মৃত্যুসংবাদের উপরেই ব্রজেশ্বরের গভীর প্রেম স্থিতিলাভ করিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকাইতের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইলে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে এত গভীর দাগ পড়িত কি-না সন্দেহ। আর ইংরাজ পল্টনের হাত হইতে প্রফুল্লের অনুকূল দৈববশে উদ্ধারলাভেও আকস্মিকতার মাত্রা যেন একটু অধিক; বিশেষতঃ তাহার উদ্ধারের জ প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপরে একান্ত নির্ভর ও বিপৎকালে নিষ্কাম ধর্মশিক্ষার পরিচয়-দান একটু আতিশয্যদুষ্ট হইয়াছে। তবে এখানেও প্রফুল্লের সমস্ত তেজস্বিতা ও নিষ্কামধর্মাচরণের মধ্যে তাহার রমণীসুলভ কোমলতা ও চরিত্রের অবর্ণনীয় মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মোটের উপর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি অসাধারণ ঘটনাভারাক্রান্ত ও ধর্মভাবগ্রস্ত হইলেও একটি বাস্তবজীবন-চিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে।

'সীতারাম' (১২৮৭), 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—তিনখানি উপন্যাসেই ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আনন্দমঠ'এ আদর্শবাদ উপন্যাসের বাস্তব স্তরকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মতত্ত্ববিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াও বাস্তব চরিত্র-চিত্রণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। 'সীতারাম'-এও একটা ধর্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু এখানেও ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই, পরন্তু চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন-সংঘটনে ও তাহার কারণ-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য নিপুণতাই দেখাইয়াছেন।

এখানে বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বালোচনার প্রকৃতি ও উপন্যাসের উপর উহার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বালোচনার প্রভাব এতই কম, এমন কি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, আমাদের ইংরেজী-সাহিত্যপুষ্ট রুচি সহজেই উপন্যাসের সহিত ধর্মতত্ত্বের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও কলা-নৈপুণ্যের দিক্ হইতে ক্ষতিকর, এইরূপ একটা ধারণা করিয়া বসে। অবশ্য এইরূপ ধারণা করার জন্য যে যথেষ্ট হেতু নাই, তাহা বলিতেছি না, অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে, লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেই এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে ভুলিয়া যান, এবং তাহাদের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও পরিণতি তাঁহার মৌলিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অযথারূপ নিয়ন্ত্রিত করেন—

তাঁহার চরিত্রগুলি অনেকটা নৈতিক গুণের মূর্ত বিকাশ হইয়া পড়িতে চাহে। সুতরাং এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক সন্দেহ যদি অযৌক্তিক সংস্কারে পরিণত হইয়া প্রতিভাবান্ লেখকের রাসাস্বাদনের পক্ষে বাধা উপস্থিত করে, তাহা হইলে সমালোচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। 'সীতারাম'-এ সেরূপ কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে কি-না তাহাও আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

'সীতারাম' উপন্যাসের ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা যে বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা অবিসংবাদিত; ইহার মুখবন্ধে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক-সমষ্টিই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গীতা-আলোচনার ফলে বঙ্কিমের মনে গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের মাহাত্ম্য খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং তাহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা ও মানব-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি এই ধর্মের বিশেষত্ব, ইহার আদর্শ ও সাধনপথে বিঘ্নসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা আর্টের দিক হইতে শুনিতে ভাল লাগিবে না; কিন্তু ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধে একটা কথা মনে করিলে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের অনেকটা নিরসন হইবে। ধর্মশাস্ত্রকারেরা যে মানবমনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন না, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই—প্রত্যুত তাঁহাদের অনেক উপদেশ-অনুশাসন মানব-মনের গভীর জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ মনের উপর পাপের সূক্ষ্ম প্রভাব ও ইহার ক্রমবৃদ্ধিসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রবিদ্‌দের কল্পনা বিলক্ষণ সচেতন ছিল। 'সীতারাম' উপন্যাসে একটি স্বভাব-মহান্ চরিত্রের উপরে এই পাপের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চরম পরিণতির আলোচনা হইয়াছে। 'সীতারাম' পড়িতে পড়িতে যদি আমরা ইহার গীতোক্ত ধর্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেও ইহার কলাসৌন্দর্যের ও মানবিকতার (human interest) কোন হানি হয় না। যাঁহারা উপন্যাসের সহিত ধর্মতত্ত্বের একটি চিরবিরোধের কল্পনা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই 'সীতারাম'কে ধর্মতত্ত্বের আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধুনিক কালের ধর্মপ্রভাবমুক্ত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের আবেষ্টনের মধ্যে অনায়াসেই ফেলিতে পারেন। সীতারামের মধ্যে যে দুর্বলতার বীজ নিহিত ছিল, তাহা মনুষ্যহৃদয়ের একটি সাধারণ, চিরন্তন মোহ, গীতাকার কেবল তাহাকে একটি বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন, উহা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধন-পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিম তাঁহার সমৃদ্ধ কল্পনাভাণ্ডার হইতে এই বাস্তব মোহের একটি উদাহরণ লইয়াছেন; এবং যদিও সীতারামের জীবন-সমস্যার উপরে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব আসিয়া ইহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে—শ্রীর সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্কই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তথাপি তাঁহার নৈতিক অধঃপতনের চিত্রাঙ্কন ও ইহার কারণ-বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। নিতান্ত বাস্তবতা-প্রিয় পাঠকেরও এ বিষয় অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

অবশ্য বঙ্কিম ধর্মতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত দিক্‌টা মোটেই অবহেলা করেন নাই—শ্রী ও জয়ন্তীর ভিতর দিয়া এই দিক্‌টা যথেষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীর সহিত সীতারামের সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসেরই ফল; আবার উপন্যাসের শেষের দিকে জয়ন্তী—শিষ্যা শ্রীর সন্ন্যাসের প্রতি অবিমিশ্র নিষ্ঠাই সীতারামের চিত্ত-বিভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার

অধঃপতনের গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সীতারামের নিজের জীবনের উপর ধর্ম-তত্ত্বের প্রভাব লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাকে জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন। সীতারামের অপরিমিত রূপমোহ কিরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিল ও অনুকূল ঘটনাযোগে দুর্দমনীয় হইয়া তাঁহার রাজত্ব ও মনুষ্যত্বের যুগপৎ ধ্বংস-সাধন করিল, তাহার কাহিনীর রসোপলব্ধির জন্য আমাদের ধর্মতত্ত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

সীতারামের চরিত্রে অতৃপ্ত রূপমোহের দুর্বলতা যে প্রথম হইতেই সুপ্ত ছিল, তাহা বঙ্কিম বিপন্না সাহায্যপ্রার্থিনী শ্রীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই একটি সূক্ষ্ম অথচ অর্থ-পূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।—"তুমি, শ্রী, এত সুন্দরা!" পিতৃ-আজ্ঞা-অনুসারে নিরপরাধ শ্রীকে নিশ্চিন্তভাবে পরিত্যাগ, ও তাহার সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের সম্পূর্ণ বিসর্জন—ইহাও চরিত্র-দৌর্বল্যেরই সূচক। তাহার পর এত দিনের বিস্মৃত কর্তব্যজ্ঞান যে এরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে জাগিল, শান্ত হৃদয়ে যে গভীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিল, তাহার মূলে, সমবেদনা, আত্মগ্লানি, প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ-ভাবকে ছাপাইয়া যে শক্তি ছিল তাহাও এই রূপতৃষ্ণা। গঙ্গারামের জন্য তাহার অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবও এই মূল ভাব হইতে প্রসূত। অবশ্য রূপমোহ যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা সাধারণ প্রকৃতির লোককে এরূপ আত্মোৎসর্গে প্রণোদিত করিতে পারে না। সীতারামের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে কোন শক্তিই তাঁহার মনকে এত উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিতে পারিত না। সুতরাং এই দৃশ্য যেমন একদিকে সীতারামের স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই অন্যদিকে তাহার উপর রূপমোহের প্রবল প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—এখানে তাঁহার মহত্ত্ব ও দুর্বলতা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেখা দিয়াছে। তার পর যুদ্ধের সময়ে শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি সীতারামের অন্তরস্থ সুপ্ত উচ্চাভিলাষের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া শ্রীর প্রতি আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীতারাম এই সিংহবাহিনী মূর্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার নেশাকে আরও রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছেন ও তাঁহার রূপমোহের উপরে আর একটা উন্নততর আকাঙ্ক্ষার প্রলেপ দিয়াছেন।

তারপর শ্রীর সহিত প্রথম বোঝা-পড়া; শ্রীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ প্রকাশ করিতেই স্বামীর অমঙ্গলভয়-ভীতা শ্রীর অন্তর্ধান। এই অপ্রাপণীয়া শ্রী সীতারামের ধ্যানে আরও উজ্জ্বলতর মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল; শ্রী সীতারামের নিকটে অজ্ঞাত অনন্তের বিচিত্র-রহস্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিল। রূপমোহ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইল; সমস্ত কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার উপর জুড়িয়া বসিয়া জীবনের উপরে প্রবলতম প্রভাব হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে গঙ্গারামের ব্যাপার লইয়া যে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তাহা একটা ক্ষুদ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বসিল। সীতারাম অনেকটা অজ্ঞাতসারে অনেকটা ঘটনার প্রবল স্রোতে বাধ্য হইয়া, আপনাকে একজন স্বাধীন-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার আসনে আসীন দেখিতে পাইলেন। এই উত্তেজনা ও কোলাহলের সময়ে শ্রীর চিন্তার বাহ্যপ্রকাশ কতকটা মন্দীভূত হইয়া থাকিল; আত্মরক্ষা ও রাজ্যস্থাপনের প্রবল প্রয়োজন সীতারামকে শ্রীর চিন্তা

হইতে কতকটা অপসৃত করিল। কিন্তু এ সময়েও তাহার অন্তরস্থ ইচ্ছা যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কেবল অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, গ্রন্থকার তাহার প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন।

তারপর আর এক দৃশ্যে সীতারামের শ্লাঘ্যতম গৌরব-শিখরে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরস্থ দুর্বলতার বীজে নববারি নিষেক হইল। যে দিন ছদ্মবেশী সীতারাম সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রীর সাহায্যে একাকী দুর্গ রক্ষা করিয়া অমানুষিক বীরত্বের পরিচয় দিলেন, সেইদিনই তাঁহার চরম গৌরবের দিন, ও শ্রীর সহিত শুভতম সম্মিলনের লগ্ন। সেই শুভদিনের পর হইতেই তাঁহার সাংসারিক ও নৈতিক উভয়বিধ অধঃপতনের আরম্ভ হইল। রাজ্যরক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ যে রত্ন তিনি পাইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে দীর্ঘকালসঞ্চিত দাহ্যপদার্থের নিকটে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই আসিয়া পড়িল। আবার রমার গঙ্গারাম-ঘটিত কলঙ্ক-ব্যাপার ও তাহার প্রকাশ্য দরবারে বিচার, একদিকে সীতারামের মনে একটা গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া, অন্যদিকে রমার প্রতি একটা বদ্ধমূল বিরাগের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে উন্মত্ত, সর্বগ্রাসী প্রেমের আবর্তের দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল।

অতঃপর অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিতা সন্ন্যাসিনী শ্রীর সহিত মিলনের পর সীতারামের চিরপোষিত রূপতৃষ্ণা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া সাংঘাতিক বিষের ন্যায় তাঁহার সমস্ত মনে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার নৈতিক জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত টলমল করিতে লাগিল। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে এই প্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ভীষণ ক্রিয়া সীতারামের কার্যকলাপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ'-এ জমিদার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পুড়িয়া ও আপনার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মদ খাইতে লাগিলেন, এবং দুই একটা নিরীহ ভৃত্যকে প্রহার করিয়া নিজ অন্তর্দাহের পরিচয় দিলেন। স্বাধীন রাজা সীতারাম, নিজ পরিণীতা ভার্যার উপর স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, উগ্রতর রক্তের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিলেন, এবং নিজ উন্মত্তপ্রায় অস্থিরমতিত্বে একটা রাজত্বের উপর বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইয়া দিলেন। এখনও সংযমের শেষ বন্ধন ছিন্ন হয় নাই; শ্রীর প্রতি প্রকৃত প্রেম সীতারামকে পাশবিক অত্যাচারের পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এখনও পর্যন্ত তাহার অপরাধ কর্তব্যচ্যুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অত্যাচার ও পাপাচরণের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। এই কর্তব্যচ্যুতির ফলে একদিকে রমা মরিল, অন্যদিকে চন্দ্রচূড় তিরস্কৃত হইলেন ও রাজকর্মচারীরা শূলে গেল। তবে এখন পর্যন্ত সীতারাম নিজেরই ক্ষতি করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-দাস পশুতে পরিণত হন নাই।

কিন্তু এই চরম দুর্গতি ও অধঃপতনও বাকী রহিল না। শ্রী, কতকটা নিজ সন্ন্যাস-পালন-ক্ষমতায় আস্থা হারাইয়া, কতকটা রাজার অধঃপতনের গতিরোধ করিবার জন্য, জয়ন্তীর পরামর্শে ও তাহারই ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যান হইতে অন্তর্হিতা হইল। সীতারামের ক্ষিপ্ততা চরমে উঠিল; বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় জয়ন্তীর প্রতি দংষ্ট্রা-নখর-প্রয়োগে উত্তেজিত করিল। অন্তঃরুদ্ধ রূপতৃষ্ণা এইবার প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী কামানলের শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা মহিমময় সীতারাম একটা ঘৃণিত, কামার্ত পশুতে পরিণত হইলেন। সীতারাম-চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্তন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধরা হইয়াছে।

সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্বতোভাবে বীর ম্যাকৃবেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্মতত্ত্বের ক্ষীণতম:প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দুর্গ-প্রাচীর-ভেদকারী কামানের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে সীতারামের নৈতিক পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গভীর ধর্ম-বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। এইখানে ইংরেজ কবির সহিত হিন্দুগ্রন্থকারের প্রভেদ। ইংরেজ জাতি এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনে তাদৃশ বিশ্বাস করে না। সেই জন্য শেকস্‌পিয়ার, তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাকৃবেথকে হিংস্র পশুবৎ রাখিয়াই, শমনসদনে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের নৈতিক পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য মৃত্যুর প্রাক্কালে এই সমস্ত অধঃপতিত বীরের মুখে কবি যে সমস্ত ভাব ও উদাস খেদপূর্ণ বাণী দিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, তাহাদের মধ্যে নিষ্ফল ক্ষোভ ও অনুতাপের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমের সীতারাম এক মুহূর্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্বল্য ও চরিত্র-গ্লানি ধূলিজঞ্জালবৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া বঙ্কিম তাঁহার জাতিগত ও ধর্মবিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতির একটি বিশেষ-রকম রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে, এবং এই রোমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তব জীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্স আমাদের বাঙালী জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না; আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদের রোমান্সের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের রোমান্স আমাদের বাস্তব জীবনের অবস্থার সহিত বেশ সুসঙ্গতই হইয়াছে। সীতারামের পূর্বজীবনের স্বাভাবিক মহত্ত্বও এই পুনরুদ্ধারের কার্যে সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্কিম যেরূপ গভীর আবেগ ও সংযত অথচ মর্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত এই পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি কেবল একটা সুলভ ভাবাতিরেক (sentimentality) চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের কোন অবসর থাকে না; তাঁহার অস্থিমজ্জাগত গভীর ধর্মভাবই এই দৃশ্যের প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতারাম-চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসংগতিতে ইহা পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে-কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।

রোমান্সের যাহা কিছু আতিশয্য ও অসংগতি, তাহা শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্ম-চরিত্রের উপর দিয়াই ব্যয়িত হইয়াছে। জয়ন্তীকে আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই—সে রোমান্স-প্রাসাদের একটা আবশ্যকীয় গৃহসজ্জা মাত্র। শ্রীকে সন্ন্যাসে ব্রতী করিবার জন্য ও সীতারামের জীবনে একটা প্রলয়-ঝটিকা তুলিবার জন্য এরূপ একটা সংসার-বন্ধনশূন্যা, প্রলোভনাতীত: সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন ছিল; গ্রন্থকার নিজ কল্পনার ইন্দ্রজালবলে এরূপ একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা সন্ন্যাসিনীকে পাঠকের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন—তাহার অতীত জীবনের কোন আভাস দেন নাই। পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা যে লেখক-নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অসুবিধাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, বঙ্কিমের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না; এবং রোমান্সের

জগতে এরূপ তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি অনেকটা অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। যেমন আমাদের দ্বারপ্রান্তবাহিনী নদী কোন সুদূর পর্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-স্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেয়, ও উহার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করি না, সেইরূপ জয়ন্তীও অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে আসিয়া উপন্যাসের কর্মস্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং জয়ন্তীতে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখিবার আশা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু বঙ্কিম এরূপ একটি গৌণ রকমের চরিত্রেও যথেষ্ট মাধুর্য ও মানবিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীর সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষা ও তাহার চরিত্রগত গভীর পরিবর্তন সাধনের জন্য কৃতিত্ব, আর্টের দিক হইতে, জয়ন্তীর প্রাপ্য নহে; কেন না এই পরিবর্তন পাঠকের চক্ষুর অগোচরে, যবনিকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে। আবার শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিষ্কামধর্মসম্পর্কীয় যে-সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও তাহার সজীবতার পরিমাণ বাড়ে নাই। কিন্তু বঙ্কিম সন্ন্যাসের এই অশরীরী আদর্শকে এমন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছেন যে, তাঁহার মুখ হইতে মানুষের মর্মের কথা বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই মুহূর্ত হইতে জয়ন্তী আমাদের নিকট কেবল আদর্শ সন্ন্যাসিনী নহে, একটা সজীব ঘাত-প্রতিঘাতচঞ্চল মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্য যেমন একদিকে বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তি ও সৃজনীপ্রতিভার পরিচয়, তেমনি অপরদিকে তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক অনুভূতিরও নিদর্শন। জয়ন্তীর মনে যে মুহূর্তে একটু সূক্ষ্ম অহংকারের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যে মুহূর্তে তাহার সন্ন্যাসের মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের একটু সামান্য স্পর্শ হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এখানে অতিসূক্ষ্ম তাপমান-যন্ত্রের ন্যায় অন্তরস্থ অহংকারের সামান্য তারতম্য, ঈষৎ মাত্রাভেদও অভ্রান্তভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীর চরিত্রেই উপন্যাস-মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অবাস্তবতা দৃষ্ট হয়। শ্রীর চরিত্রের গুরুতর পরিবর্তনটি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সাধিত হওয়ায় তাহার গৌরব অনেকটা খর্ব হইয়াছে। শ্রীর স্বামিপ্রেমের যে গভীর, মর্মস্পর্শী বিবরণ পাই, তাহাতে তাহার পরিবর্তনের কাহিনীটি বিশ্বাসের উপর মানিয়া লইতে আমাদের আরও অনিচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ইহার পরে শ্রী জয়ন্তীর প্রভাবে পড়িয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; জয়ন্তীর একান্ত অনুগতা শিষ্যার অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। সীতারামের জীবনব্যাপী আকুল বাসনা, শ্রীর নিজ অন্তঃকরণে সন্ন্যাসের আদর্শ ও স্বামিপ্রেমের মধ্যে ক্ষীণ দ্বন্দ্ব ও বিলম্বিত (belated) অনু-তাপ—কিছুতেই তাহার ধমনীতে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্রী-র সিংহ-বাহিনীমূর্তিই আমাদের কল্পনার চক্ষে গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠে, তাহাই আমাদের তাহার সম্বন্ধে শেষ এবং সত্য ধারণা। সন্ন্যাসিনী শ্রী একটা আদর্শজ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্তিনী মূর্তি মাত্র; সে সীতারামের অনির্বাণ কামনার আগুনে রাঙা হইয়াও প্রভাতের স্তিমিত-জ্যোতি তারকার ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অবাস্তবতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বাস্তব চরিত্রদের মধ্যে রমাই সর্বপ্রধান। রমাই আমাদিগকে উচ্চ আদর্শ ও বীরত্বের রাজ্য হইতে আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। সীতারামের উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীনরাজ্য-স্থাপন তাহার দুই চক্ষের বিষ; মুসলমানের ভয়

তাহার দিবসের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে—উপন্যাসের যুদ্ধ-কোলাহল ও সন্ন্যাসধর্মের উচ্চ আদর্শের মধ্যে সে-ই খাঁটি বাঙালী নারীর সুরটি তুলিয়াছে—একমাত্র রমাই সীতারামকে বাঙালী বলিয়া নিঃসন্দেহে চিনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিবেশের প্রভাব এ-হেন রোদনপ্রবণা, অতিমাত্র স্নেহ-দুর্বলা নারীকেও রোমান্সের দীপ্তি ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে। প্রথমতঃ, গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণের ব্যাপারে তাহার শঙ্কাতিশয্যই তাহাকে দুঃসাহসের চরম-সীমায় ঠেলিয়া দিয়াছে। আর প্রকাশ্য দরবারে বিচারের দিন পুত্রস্নেহ তাহার সমস্ত লজ্জা-সংকোচ-দুর্বলতাকে সরাইয়া দিয়া তাহার কণ্ঠ অতুলনীয় বাগ্মিতায় ভরিয়া দিয়াছে, এবং সেই ক্ষীণপ্রাণা রমণীর উপর মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর জয়মুকুট পরাইয়াছে। রোমান্সের অসাধারণত্ব ও আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে তাহার অননুমেয় প্রভাব-সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল, রমার চরিত্র তাহার প্রকৃট উদাহরণ। সীতারামের অবহেলাজনিত শোচনীয় মৃত্যু তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ আভা আনিয়াছে, এবং মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়াও, সীতারামের -অধোগতির একটি সোপানস্বরূপেও, উপন্যাসে তাহার সার্থকতা আছে।

অন্যান্য চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতটা একটা অতর্কিত বিকাশ বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে অনুভূত হয়। কিন্তু লেখক উপন্যাসের প্রথম অংশে তাহার আত্মসর্বস্বতার একটু ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দিয়া বোধহয় তাহার শোচনীয় পরিণামের জন্য আমাদিগকে কতকাংশে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। কাজীর নিকট গঙ্গারামের বিচারের দিন, সীতারাম তাহার উদ্ধারের জন্য কতখানি আয়োজন করিয়াছেন, মুসলমানের সহিত লড়াই করিবার জন্য কতখানি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা গঙ্গারামের জানিবার কোন উপায় ছিল না; তাহার সহিত কার্যপ্রণালী-সম্বন্ধে সীতারামের নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ হইতে পারে নাই। অথচ গঙ্গারাম আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু না ভাবিয়া সীতারামকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সীতারামের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে পলায়ন করিল। অবশ্য কামারকে ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত-পা বেড়ি-মুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব-পরামর্শের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সুযোগ উপস্থিত হইলে যাহাতে গঙ্গারামের পলায়নের পক্ষে কোন বিঘ্ন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। গঙ্গারাম যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়া লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে না, ইহার জন্য বোধ হয় কেহই প্রস্তুত ছিল না। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই গঙ্গারামের মধ্যে স্বার্থপরতার বীজের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন; পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনুকূল ঘটনার আশ্রয়ে এই মৌলিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

'সীতারাম'-এ অসাধারণ ও রোমান্টিক দৃশ্য-বর্ণনায় বঙ্কিমের কল্পনায় বিশাল প্রসার ও পরিধি প্রস্ফুট হইবার অবসর হইয়াছে। বিশাল, উদ্বেল, জনসমুদ্র-বর্ণনে বঙ্কিম যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালী লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। এইরূপ তিনটি দৃশ্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, রমা ও গঙ্গারামের বিচার, ও জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা। এই তিনটি দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ জনতার

বিশেষ বিশেষ mood—কোথাও উত্তেজনা-ও-কোলাহল-ময়, কোথাও কৌতূহলী, কোথাও বা রুষ্ট-গাম্ভীর্য-ভীষণ বা অজ্ঞাত বিপদের ছায়াপাত-শঙ্কিত—বঙ্কিম অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। সীতারামের পুনরুদ্ধারের চিত্রের মহনীয়তার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু রোমান্সের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সীতারাম-এ বাস্তবতার কোন অভাব অনুভূত হয় না। কি উপায়ে বাস্তবতার ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহারও কতক বিচার করা হইয়াছে। সীতারামের চরিত্রে যে সংঘাত তাহা মূলতঃ একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব, রমা, নন্দা, গঙ্গারাম, প্রভৃতি বাস্তবচরিত্র উপন্যাসকে শ্রী-জয়ন্তী-ঘটিত অবাস্তবতার ছায়া হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রী ও জয়ন্তীর অলৌকিকত্ব সাধারণ লোকের মুখে-মুখে কিরূপ উদ্ভট আকার ধারণ করিতেছিল, তাহা আমরা রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের কথোপকথনেই বুঝিতে পারি। এই জন-সাধারণের সুরটি—মুরলার দৌত্য ও দুরবস্থা, যমুনার কৌতুকপ্রদ নীতিজ্ঞান, কবিরাজ-মণ্ডলীর চিকিৎসার নৈপুণ্য, এমন কি জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করিবার জন্য নির্বাচিত চণ্ডাল ও মুসলমান কসাই প্রভৃতির সমবেত আবির্ভাব—গ্রন্থমধ্যে সর্বদা জাগরূক রহিয়াছে, রোমান্সের শোভাযাত্রার কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যায় নাই। মোটের উপর 'সীতারাম' বাস্তব ও অসাধারণের মধ্যে একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য, ইহার মধ্যে ধর্মতত্ত্বের প্রভাব ইহাকে উপন্যাসোচিত আদর্শ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ঘটনাপরিণতি কোথাও নীতিবিদের বা তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতার সংকীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। পাপ-পুণ্যের তারতম্য-অনুসারে দণ্ড-পুরস্কার-বিতরণের যে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি (narrow poetic justice) তাহা উপন্যাসের বিশালতাকে সংকুচিত করে নাই। শেক্স্‌পিয়ারের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিগুলির মত 'সীতারাম' মানবমনের দুর্জ্ঞেয়তার, উহার রহস্যময় প্রকৃতির উপরে একটি উজ্জ্বল আলোক-রেখাপাত করে।

(৩) প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস—রাজসিংহ

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা ছিল তাহা 'রাজসিংহ' হইতে বুঝা যাইবে। 'রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলন করা যাইতে পারে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য, হিন্দুদের যে বাহুবলের অভাব ছিল না, এই বিষয়ের প্রতিপাদন করা। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবের ও ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্বদোষের জন্য বঙ্কিম উপন্যাসের আশ্রয় লইয়াছেন; কারণ যদিও সর্বত্র ইতিহাসের উদ্দেশ্য উপন্যাসের দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না, তথাপি বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রতিবন্ধক নাই; "যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

বঙ্কিমের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করা একটু দুরূহ। রাজপুতদের বাহুবল-প্রতি-পাদন-বিষয়ে উপন্যাস কেন ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনক্ষম, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই; বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণের পরস্পর-বিরোধিতার বিষয় বঙ্কিম নিজেই উল্লেখ

করিয়াছেন, ও এই পরস্পর-বিরোধী প্রমাণসমূহের মধ্যে সত্যনির্ণয়ের দুঃসাধ্যতাও স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য তাহা উপন্যাসের পক্ষে কেন সহজসাধ্য হইবে, উপন্যাস এই সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থিকে কিরূপে সরল করিবে, লেখক উহার কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেন নাই। ইতিহাসের উপরে উপন্যাসের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, ইহা সত্যের বন্ধন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু এই কল্পনাকে ইতিহাস-ক্ষেত্রে দুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায়; ইহা লেখককে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের অপ্রীতিকর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি-দানের উপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অথবা ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইতিহাসের পরস্পর-বিরোধী জটিল উক্তিসমূহ ভেদ করিয়া উহার মর্মগত সত্যে গিয়া হাত দিতে পারে। এখানে বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার কিরূপ ব্যবহার করিতে চাহেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে, হিন্দুদের বাহুবলের যদি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকে, তবে কল্পনার সাহায্যে তাহার প্রতিপাদন করিতে গেলে কল্পনার আশ্রয়ের পক্ষে কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ে পরিণত হইবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। বোধ হয় বঙ্কিমের উক্তির প্রকৃত মর্ম এই যে, রাজপুতদের বাহুবল এতই সুপরিচিত ব্যাপার যে, এ ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লওয়া তাদৃশ দূষণীয় নহে, কেন-না এখানে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, কল্পনা ও ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প হইবারই সম্ভাবনা।

রাজপুতদের বাহুবল-প্রতিপাদন যদি 'রাজসিংহ'-এ বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা উপন্যাসের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে কি-না সে বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে, কেন-না এরূপ একটা সংকীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য ঠিক উচ্চতম আর্টের পক্ষে অনুকূল নহে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য বঙ্কিমের কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার যুদ্ধবর্ণনাগুলির উপরে একটা তীব্রতা ও কল্পনা-গৌরব আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সত্য-চিত্রণ, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সত্য-নির্ধারণ যে উপন্যাসের আদর্শ, তাহার সহিত এইরূপ সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের সুসংগতি হইতে পারে না। বোধ হয় এখানে বঙ্কিম নিজ প্রতিভার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। রাজপুতদের বাহুবল প্রতিদান করা সম্বন্ধে তাহার যতই প্রবল ইচ্ছা থাকুক, তিনি সে ইচ্ছাকে কলাকৌশলের দ্বারা নিয়মিত ও সংযত করিয়াছেন, কোথাও কলাসৌন্দর্যের ও সুসংগতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেন নাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার ক্রিয়া কতদূর প্রসারিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত আধুনিক সমালোচনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এ বিষয়ে কল্পনার ক্রিয়ার সীমারেখা বঙ্কিম বেশ সুস্পষ্টভাবেই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিতে বাধ্য; তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে কল্পনা আপনার স্বাধীনতা দেখাইতে পারে। ইতিহাসের কার্যকারণপরম্পরা যেখানে যথেষ্ট পরিস্ফুট নহে, কল্পনা সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন যোগসূত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারে। ইতিহাসের যে সমস্ত ঘটনা আকস্মিক, তাহাদিগকে মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে পারে; ইতিহাসকে dramatic বা নাটকীয়-গুণ-মণ্ডিত করিবার জন্য তাহার বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারে। বঙ্কিম

'রাজসিংহ'-এ এই জাতীয় রূপান্তর-সাধনের উদাহরণ দিয়াছেন। যুদ্ধের ফলাদি স্থূল ঘটনা অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে তাহার নূতন প্রকরণ বা নূতন উদ্দেশ্য কল্পনার দ্বারা গড়িয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে ইহাদিগকে কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে ফেলিয়া ইহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর করিয়াছেন। যেখানে একই ঘটনাসম্বন্ধে দুই বা ততোধিক বিবরণ প্রচলিত আছে, সেখানে নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবেই তাঁহার নিজের নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এ সমস্ত সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত স্বাধীনতা; ঐতিহাসিক উপন্যাসকার ইতিহাসের বৃহত্তর সাধারণ সত্য দেখাইতেই বাধ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক (historical conscience) বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক সত্যের অংশ যে পরিমাণে কম, কল্পনার প্রসার ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হইতে বাধ্য, নচেৎ একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিতে পারে না। বঙ্কিম তাঁহার কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শূন্য রন্ধ্র পূরণ করিয়া যদি অতিসাহসের পরিচয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের দেশের ইতিহাস-সম্বন্ধে অপরিহার্য।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম' হইতে মূলতঃ ভিন্ন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা প্রতিবেশরচনায় সহায়তা করিয়াছিল মাত্র; তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার আলোচনা। ঐতিহাসিক বিপ্লব আসিয়া এই ব্যক্তিগত সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে সত্য, তথাপি মোটের উপর এই সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস অপ্রধান অংশ অধিকার করে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ উপন্যাসের অনেক অংশ ব্যাপিয়া আছে, এবং নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার প্রধান ব্যাপার ব্যক্তিগত জীবনের বাধা-বিঘ্ন-খণ্ডিত প্রণয় লইয়া। 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারাম'-এও ইতিহাসের এই দূরত্ব ও অপ্রধানতা সহজেই লক্ষিত হয়; শৈবলিনীর ও সীতারামের চরিত্র-বিশ্লেষণই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ 'সীতারাম'-এ সীতারামের অন্তর্দ্বন্দ্বই উপন্যাসের প্রধান বিষয়; তাহার রাজনৈতিক অধঃপতন নৈতিক অধঃপতনের পরোক্ষ ফল মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'রাজসিংহ' ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়াছে মাত্র। উপন্যাসের মূল ব্যাপার হইতেছে রাজসিংহের সহিত আরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধের বর্ণনা। তবে লেখক এই যুদ্ধের কেবল রাজনৈতিক ফলাফল নির্দেশ না করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনের উপরে ইহার প্রভাব দেখাইয়াছেন; এই যুদ্ধের মহাবর্তে পড়িয়া যে কয়েকটি প্রাণী পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মানসিক সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের চিত্রটিও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সুতরাং 'রাজসিংহ'-এ ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য; ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের উপরে বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা বজ্র-গর্ভ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া

একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা সুদূর দিগন্তরেখার ন্যায় পারিবারিক জীবনকে বেষ্টন করিয়াছে মাত্র, তাহার স্বাধীনতার গৌরবকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই। যদিও সময়ে সময়ে ইতিহাস-সমুদ্রের দুই-একটি প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিহত হইয়াছে, ও আমাদের শান্ত জীবনে একটা প্রলয়-বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি মোটের উপর ইহার সুদূর অস্পষ্ট কল্লোল ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের আর কোন স্পষ্টতর পরিচয় আমাদের গোচর হয় নাই। 'রাজসিংহ'-এ ইতিহাস তাহার উদাসীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতি-সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে ও আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় আলিঙ্গন করিয়াছে; তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমাদের শরীরে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি, রক্তের মধ্যে একটা দ্রুততর স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তিসমূহ, আমাদের প্রেম, ঈর্ষ্যা, বন্ধুত্ব, প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের অভিনেতৃবর্গ, ইতিহাসের ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টির তলে, ইতিহাসের নির্মম অঙ্গুলিসংকেতে চালিত হইয়া, একটা অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের পেষণে আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অসাধারণ তীব্র প্রভাবের বশে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার সহজ-সরল স্বাধীনতা ও প্রসার হারাইয়া আপনার বিকাশকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সংকুচিত করিয়া লইয়াছে, ও তীব্রতর গতিবেগের দ্বারা এই অপরিহার্য সংকীর্ণতার অসুবিধা পূরণ করিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে দেখিতে গেলে পদে পদে এই স্বাধীনতাসংকোচের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম—বিষয়-নির্বাচনে। 'রাজসিংহ'-এর বৃহত্তর সংঘটনের মধ্যে, ইহার যুগান্তকারী বিপ্লবের ভিতরে, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোন স্থান নাই। যাহারা শ্যামল সমভূমিতে বৃক্ষচ্ছায়াশীতল প্রদেশের পর্ণ-কুটিরে নিজ নিজ শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহারা এই উপন্যাসের জগতে প্রবেশাধিকার পায় নাই। ইহার পাত্র-পাত্রীরা সকলেই উচ্চপদস্থ, সকলেই রাজনৈতিক আবর্তের বিক্ষোভ-বিকম্পিত প্রদেশে, ইতিহাসের বজ্রমুষ্টির দুর্নিবার আকর্ষণ-পরিধির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত নিম্ন উপত্যকাবাসী ক্ষুদ্র বৃক্ষ তাহাদের ক্ষুদ্রত্বের জন্যই কালবৈশাখীর হাত এড়াইয়া যায়, এই উপন্যাসে তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। পরন্তু যে সমস্ত মহামহীরুহ উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবল ঝটিকার দুর্ধর্ষ বেগকে আহ্বান করে ও তাহার দ্বারা বিধ্বস্ত, বিদলিত হয় তাহারাই এই উপন্যাস-জগতের অধিবাসী। চঞ্চলকুমারী রাজকন্যা, নিজে আভিজাত্যগর্ব-গৌরবান্বিতা, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাধিরাজের সংঘর্ষের উপযুক্ত হেতু ও যোগ্য পুরস্কার। নির্মলকুমারী বংশ-গৌরবে সামান্য হইয়াও নিজ বুদ্ধি ও সাহস প্রভাবে এই রাজনৈতিক সংক্ষোভের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার বিবাহিত জীবন কোন্ অতল সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে; সে রাজপুতকুল-গৌরবের প্রতিনিধি হইয়া সগৌরবে ও অভ্রান্ত পদক্ষেপে রাজনৈতিক জগতের বন্ধুর, পিচ্ছিল রক্তপথে বিচরণ করিয়াছে, ও স্বয়ং বাদশাহের সম্মুখীন হইয়া বাগ্‌বৈভবে ও চাতুর্যে তাঁহাকে নিরস্ত, নিরাকৃত করিয়াছে। গরীব দরিয়া, কেবল সংবাদ-বিক্রেত্রী বলিয়া নহে, আরও উচ্চতর, শ্লাঘ্যতর অধিকারে, শাহজাদীর প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে, রংমহালের বহ্নিজ্বালাময় প্রাসাদসমূহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কেবল এক মাণিকলাল

তাহার অভাবনীয় রূপান্তর ও উচ্চপদে আরোহণ সত্ত্বেও, স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততার জন্যই তাহার প্রাকৃত উদ্ভবের (plebeian origin) চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

আবার অন্য দিক্ দিয়াও ইতিহাস পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিয়াছে, ও তাহার তুচ্ছতম ব্যাপারের সহিত একান্ত অপ্রত্যাশিত কঠোর পরিণতির সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছে। চঞ্চলকুমারীর একটা নিতান্ত তুচ্ছ কার্য, একটা সামান্য বালিকাসুলভ চাপল্য দুই জাতির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে; যে আকাশ-বাতাসে দাহ্য পদার্থ স্তূপীভূত হইয়া আছে, সেখানে একটা তুচ্ছ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রলয়ানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। পারিবারিক জীবনে যাহা সর্বপ্রধান সমস্যা, বিবাহ —এ বিদ্যুদগ্নিগর্ভ আকাশের তলে তাহার এক মুহূর্তেই সমাধান হইতেছে; প্রেম নিতান্ত অনুগত অনুচরের ন্যায় দেশভক্তি বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের অনুসরণ করিতেছে। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর যে অনুরাগ তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার খুব কমই আছে; তাহা মূলতঃ স্বজাতি-প্রীতির উচ্ছ্বসিত বিকাশ মাত্র; তাহা প্রণয়ীকে আত্মসমর্পণ নহে, বীরের পদে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি। নির্মলকুমারীর বিবাহ ত যুদ্ধের একটা অপ্রত্যাশিত আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। এই রাজনীতির oxygen-পূর্ণ বাতাসে অতি অভাবনীয় পরিবর্তনসকল এক মুহূর্তে সংসাধিত হইতেছে; দস্যু দেশভক্ত ও যুদ্ধকুশল সেনানীতে পরিণত হইতেছে—শ্রদ্ধা প্রেমে রূপান্তরিত হইতেছে, এবং প্রেম রমণীসুলভ লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিয়া, প্রত্যাখ্যানভয়শূন্য হইয়া প্রেমাস্পদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে; নির্মম প্রয়োজন ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মুহূর্তেকের পরিচিতের জন্য বরমাল্য রচনা করিতেছে। বিশেষতঃ 'রাজসিংহ'-এর সপ্তম খণ্ড হইতে প্রায় অবিমিশ্র ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রন্থকে ব্যাপ্ত করিয়া কল্পনাপ্রসূত উপন্যাসকে সবলে পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে। আরঙ্গজেব পার্বত্য রন্ধ্রপথে প্রবেশ করার পর ইতিহাসেরই প্রায় একাধিপত্য ; সেনার কোলাহলে, দ্রুত-সঞ্চারী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রায় নীরব হইয়া গিয়াছে। বিপুল ইতিহাস ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় গ্রাস করিয়া লইয়াছে। আরঙ্গজেব, রাজসিংহ ইঁহারা ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিই; কল্পনা-প্রসূত চরিত্রগুলিও—চঞ্চল, নির্মল, মাণিকলাল, প্রভৃতি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া ঐতিহাসিক কোলাহলের মধ্যে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশকে ঠিক উপন্যাস না বলিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ, ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল ইতিহাস-পৃষ্ঠা বলিলেও চলে। মোটকথা, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার স্বভাবমন্থর গতি হারাইয়া ঐতিহাসিক ঘটনার বেগবান্ প্রবাহের সহিত সমতালে চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

অবশ্য এই ইতিহাসের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে যুদ্ধ করেন নাই এমন নহে; ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আংশিক কৃতকার্যতা লাভও করিয়াছেন। যেখানে রাজনৈতিক কারণই আগুন জ্বালিবার পক্ষে পর্যাপ্ত, সেখানেও বঙ্কিম মানসিক-সংঘর্ষজাত অগ্নিশিখার ক্রীড়া দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যেখানে রাজপুতের অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা ও মোগলের মদোদ্ধত, বলদৃপ্ত অত্যাচার বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানেও বঙ্কিম মানব-

চিত্তের স্বাধীন ক্রিয়া হইতেই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ইতিহাসের সর্বগ্রাসী একাধিপত্য হইতে মানব-জীবনের স্বাধীনতা ও গৌরব বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। আরঙ্গজেবের হিন্দুদ্বেষিতা যথেচ্ছাচার, জিজিয়া কর-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলকুমারীকৃত অপমানের প্রতিশোধস্পৃহাও তাহার কার্য করিয়াছে। অগ্নি জ্বালিবার ইন্ধনের মধ্যে বিক্রম শোলাঙ্কির অভিশাপ ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীও স্থান পাইয়াছে। তা' ছাড়া ইতিহাসের দারুণ নিষ্পেষণের মধ্যেও চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই। চঞ্চল, নির্মল—ইহারা রাজনৈতিক যন্ত্রে ঘূর্ণিত হইয়াও তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয় নাই। দরিয়া সম্বন্ধে এই কথা আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য। সে ইতিহাস-প্রবাহের মধ্যে এক উন্মত্ত একাত্মতার সহিত, অভ্রান্ত লক্ষ্যে আপন হৃদয়ের প্রণয়ধারারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। স্বয়ং সম্রাট্ আরঙ্গজেবও সময়ে সময়ে নিজ উচ্চপদের মহিমা হইতে অবরোহণ করিয়া কুটিলতাবর্মাবৃত হৃদয়ের রুদ্ধকবাট খুলিয়াছেন ও সাধারণ মানুষের ন্যায় আপন প্রাণের গভীর-স্তরস্থ অতৃপ্তি ও ক্ষোভকে বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই ইতিহাস-নাগপাশের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন স্ফুরণ হইয়াছে মবারক ও জেব-উন্নিসার প্রণয়-কাহিনীতে। এইখানে বঙ্কিম ইতিহাসের বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাস এখানে মানব-হৃদয়-বিশ্লেষণকে অভিভূত না করিয়া তাহার অনুবর্তী হইয়াছে। মবারক রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে কোথাও ইতিহাস-প্রবাহে নিশ্চেষ্ট-নির্জীববৎ আপনাকে ভাসাইয়া দেয় নাই, তাহার নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তিই প্রধানতঃ তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জেব-উন্নিসার সহিত প্রথম প্রণয়-ব্যাপারে, মবারকের উৎপীড়িত বিবেক তাহার অবৈধ, কলুষিত প্রেমের বিরুদ্ধে অন্ততঃ একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও করিয়াছে, এবং তাহার পরবর্তী জীবনের সমস্ত ভাগ্য-বিপর্যয়কেও সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে। রূপনগরের যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসাকে ত্যাগ, আবার পার্বত্য যুদ্ধের পর দীনা, অনুতপ্তা সম্রাট-দুহিতাকে পুনর্গ্রহণ, স্বজাতিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া সম্রাট্-শিবিরে প্রত্যাগমন —এই সমস্তই তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ফল। ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীর তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার স্বাধীন আত্মাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাহার এই অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার শেষ প্রমাণ এই যে, রাজপুত-মোগলের অনলোদ্‌গারী কামানরাশির মধ্যে যে অস্ত্র তাহাকে মৃত্যুমুখে পাঠাইল তাহা দরিয়াহস্ত-নিক্ষিপ্ত।

উপন্যাসমধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে জেব-উন্নিসার চরিত্রে। যেমন পর্বতের কঠিন বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যে নির্ঝরিণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য সমধিক মনোহর, সেইরূপ ইতিহাসের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধা জেব-উন্নিসার অন্তরের গোপন কাহিনীটি অধিকতর মর্মস্পর্শী, অনুপমমাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে। জেব-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র; কিন্তু ঐতিহাসিকতাই তাহার প্রধান আকর্ষণ নহে; তাহার মধ্যে যে দুঃখজ্বালাপূর্ণ প্রণয়াবেগশালী মানবহৃদয় আছে তাহাই তাহার মুখ্য পরিচয়। গ্রন্থারম্ভে জেব-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্রহিসাবেই প্রবর্তিত হইয়াছে; সে-ই সম্রাটের প্রিয় দুহিতা, সাম্রাজ্যশাসনে

তাঁহার প্রধান সহায়, রংমহলের সর্বময়ী কর্ত্রী। মবারক তাহার প্রণয়াস্পদ বটে, কিন্তু এই প্রেমকে সে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছে—যেন প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া সে প্রেমের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। মবারকের বিবাহ-প্রস্তাবকে সে অবজ্ঞার হাসিতে উড়াইয়া দিয়াছে; প্রণয়ের মাহাত্ম্য সে প্রতি পদক্ষেপে অস্বীকার করিয়াছে, শেষে প্রণয়ী অপ্রাপ্য হইলে ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা অপেক্ষা বাদশাহ্‌জাদার কুপিত অহংকারই প্রেমাস্পদকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিতে তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে। ইহার পরই অপমানিত, অস্বীকৃত, নির্বাসিত প্রেম আপনার অনিবার্য দীপ্ত তেজে তাহার হৃদয়মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার স্বাভাবিক মহিমার অবিসংবাদিত, অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়াছে। এই নবজাগ্রত প্রেম তাহাকে সব ঐশ্বর্য হইতে নির্মমভাবে টানিয়া আনিয়া একান্ত রিক্ততার মাঝে দাঁড় করাইয়াছে, তাহার সর্ব অহংকার চূর্ণ করিয়া তাহাকে প্রেমের অতি দীনা ও অনুতপ্তা পূজারিণীতে পরিণত করিয়াছে, তাহার শাহজাদীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতলভূমিতে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তারপর তাহাকে আর ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া ধরা যায় না। বাহিরের সমস্ত বিপর্যয়ের মাঝে সে আপন চিন্তায় নিমগ্না, আপন শোকে অধীরা, পূর্বস্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে কাতরা। পিতার অপমান ও পরাজয়, নিজ উচ্চাভিলাষের উন্মূলন, সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূচনা—এ সমস্ত আর তাহার চিন্তায় স্থান পায় নাই। সর্বশেষে ইতিহাস আবার তাহার পুনর্লব্ধ প্রণয়ীকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের উপর আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহার ঐকান্তিক প্রেমের পরিসমাপ্তিকে এক মহাব্যর্থতার করুণ সুরে ভরিয়া দিয়াছে মাত্র:

"বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা ॥"

'রাজসিংহ'-এ এইরূপ দুই-চারিটি দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশি নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে 'রাজসিংহ'-এ তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিশাল সমুদ্র-মন্থনে যে রস উঠিয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ জীবনের পক্ষে অতিশয় তীব্র। দুই যুদ্ধোদ্যত সৈন্যদলের মাঝে স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা চঞ্চলকুমারীর মুখে যে সমস্ত তেজঃপূর্ণ বাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা জীবনের বীরত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলেরই উপযুক্ত; এই ভাব ব্যক্তিগত নহে, typical, সেইরূপ বাদশাহের নিকট নির্মলকুমারীর সরস বাকপটুতা ও সতেজ নির্ভীকতাও তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের অপেক্ষা জাতির প্রাতিনিধিত্বেরই অধিক সূচক। 'রাজসিংহ'-এ বিবৃত ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক যে, পাঠকের মন চরিত্র-বিশ্লেষণের দাবি করিতে ভুলিয়া যায়; আর এরূপ রোমাঞ্চকর সংঘটনের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিও অসম্ভব। সুতরাং সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে 'রাজসিংহ'-এর মধ্যে উপন্যাসোচিত গুণের অপেক্ষাকৃত অভাব লক্ষিত হইবে। কিন্তু কেবল আখ্যায়িকা হিসাবে, একটা জাতিসংঘর্ষমূলক মহাযুদ্ধের জীবন্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা হিসাবে 'রাজসিংহ' অতুলনীয়। ইহার গঠন কৌশলও (constructive power) অনবদ্য; দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও

অনাবশ্যক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেন্দ্রাভিমুখী রেখা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি হয় নাই। অবশ্য স্থানে স্থানে দুই একটি দৃশ্য অসম্ভবতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে; দরিয়ার মাগল অশ্বারোহীর ছদ্মবেশ, মাণিকলালের ঐন্দ্রজালিক চতুরতা রোমান্সের পক্ষেও ঠিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার আখ্যায়িকাকে এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়াছেন যে, পাঠক এই সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রুটির উপর মনোযোগ দিতেই অবসর পায় না। 'রাজসিংহ'-এ বঙ্কিম এক নূতন রকমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবর্তন করিয়াছেন; তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, তিনি একদিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে চরিত্র-মূলক শৃঙ্খল যোজনা করিয়া দিয়াছেন, অপরদিকে ব্যক্তিগত জীবনে ইতিহাসের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন; এবং এইরূপে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(৪) সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস—'ইন্দিরা', 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

এইবার বঙ্কিমের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চারিখানি উপন্যাসকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—'বিষবৃক্ষ' (১লা জুন, ১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'রজনী' (২রা জুন, ১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (২৯শে আগস্ট, ১৮৭৮)। বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেরও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতি-প্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট, 'বিষবৃক্ষ'-এও একটা সাংকেতিকতার আভাস বর্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসেও অনৈসর্গিকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই, 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' এই দুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে; ইহাদের মধ্যে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য বেশি। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইখানিই প্রকৃত উপন্যাস-পদবাচ্য, উপন্যাসের অর্থ-গৌরব ও সমস্যা-ও সমস্যা-বিশ্লেষণ ইহাদের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং আর্টের ক্রমবিকাশের দিক্ দিয়া প্রথমোক্ত উপন্যাস দুইটির আলোচনা প্রথমে হওয়া উচিত।

'ইন্দিরা' একটি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস, কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র অবয়ব ঘটনাবিন্যাসে অনবদ্য, তীক্ষ্ণ পরিহাস-নিপুণতায় উপভোগ্য, হাস্যালোকোজ্জ্বল ভাস্বর, একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা শাণিত ছুরিকার চাকচিক্যের ন্যায়ই গল্পটিকে উজ্জ্বল করিয়াছে, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য ও সহৃদয়তায়, কোমল প্রেম-বিহ্বলতায় মণ্ডিত হইয়াছে। পুরুষের পাণ্ডিত্যাভিমান ও অনিপুণ কর্কশতা কোথাও ইহাকে স্পর্শ করে নাই, রমণীর সুরই গল্পটির আদ্যোপান্ত অভ্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য চিলিয়ানওয়ালা ও শিখদের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ বঙ্গ-পুরস্ত্রীর মুখে একটু অসংগতই শুনায়, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। বিশেষতঃ শিখ-যুদ্ধ-প্রত্যাগত রসদ-বিভাগের কর্মচারীর পত্নীর পক্ষে এরূপ খবর রাখা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নাও হইতে পারে। এই বিষয়ে 'রজনী'র সহিত 'ইন্দিরা'র একটি গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়।

'রজনী'তে বিভিন্ন বক্তা ও বক্ত্রীর মধ্যে ভাষাগত বিশেষ কোন পার্থক্য রক্ষা করা হয় নাই—স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের মুখেই একরূপ ভাষা ধ্বনিত হইয়াছে, সে ভাষা লেখকের নিজের ভাষা হইতে অভিন্ন। অবশ্য বঙ্কিম যে এরূপ একটা প্রভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে; রজনীর অন্ধতা, অমরনাথের দার্শনিকোচিত চিন্তাশীলতা, শচীন্দ্রের ভিন্ন-প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তা, লবঙ্গলতার রমণীসুলভ স্নেহশীলতা ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসপ্রবণতা—এই প্রবৃত্তিগুলির বিশেষ প্রভাব তাহাদের মুখনিঃসৃত ভাষাতে প্রতিফলিত করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

'ইন্দিরা'র উপাখ্যান-ভাগ নিতান্তই সামান্য; দস্যুহস্তে অপহরণের পর ইন্দিরার দুঃখ ও স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের জন্য নানারূপ কৌশল-অবলম্বন—ইহাই ইহার মুখ্য বিষয়। এই সামান্য আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্যা আলোচিত হয় নাই, এবং বোধ হয় কোন গভীর সমস্যার অবসরও ছিল না। কিন্তু গ্রন্থখানির স্বল্প-সংখ্যক পরিচ্ছেদ আনন্দ-রসে সিঞ্চিত, ও করুণ-মধুর সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলি—ইন্দিরা, সুভাষিণী, তাহার শাশুড়ী 'কালির বোতল', সোণার মা পাচিকা ও হারাণী ঝি—অল্প কয়েকটি রেখাপাতেই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ঘটনা-বিরল, জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণরসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছেন; একটি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা ও চিত্তাকর্ষক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র দেখাইয়াছেন। অবশ্য ইহাদের কাহারও মধ্যে বিশেষ একটা চরিত্রগত গভীরতা নাই; ইন্দিরার অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, সুভাষিণীর সরল ও আন্তরিক সহানুভূতি, গৃহিণীর সন্দেহপ্রবণতা ও পুত্রস্নেহ, সোণার মার কৌতুক-জনক ঈর্ষ্যা ও আত্মবিস্মৃতি খুব গভীর স্তরের ভাব নহে, কিন্তু ইহারাই আমাদের সাধারণ জীবনের উপাদান; আমাদের অধিকাংশের জীবনের যাহা কিছু রস, যাহা কিছু বৈচিত্র্য, তাহা ইহাদেরই ক্রিয়া ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। অধিকাংশেরই জীবনে খুব গভীর স্তর থাকে না; ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে গভীরতা ও জটিলতা খুঁজিতে গেলে চরিত্রসৃষ্টি প্রায়ই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। বিশ্লেষণ-প্রাচুর্যে ও বিশ্লেষণযোগ্য পদার্থের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য জন্মে; অথবা এই সমস্ত উপর স্তরের নীচে যে একটা আদিম পাশবিক স্তর আছে তাহাতেই অবতরণ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দিরার চরিত্রগুলির মধ্যে গভীরতা না থাকুক, স্বাভাবিকতা যথেষ্ট আছে।

গ্রন্থমধ্যে যদি কোথাও কলা-কুশলতার দিক্ হইতে কোন সন্দেহের অবসর থাকে তবে তাহা ইন্দিরার স্বামি-লাভের জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের বিবরণে। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত গ্রন্থিই সমান বিচারসহ নহে; বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিজেকে স্বামীর উপর বিদ্যাধরী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। তবে ইন্দিরার স্বামীকে কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া বঙ্কিম ব্যাপারটিকে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীকে বশীভূত করিবার অন্যান্য উপায় ও প্রচেষ্টাগুলি খুব সুকৌশলেই নির্বাচিত হইয়াছে; স্ত্রীজাতির মোহ বাড়াইবার অমোঘ অস্ত্রগুলি সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর 'ইন্দিরা' সরস বর্ণনায়, অফুরন্ত হাস্যরসে ও একরূপ অবর্ণনীয় স্ত্রীজাতিসুলভ মাধুর্যে ও রমণীয়তায় উপভোগ্য হইয়াছে।

'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে বঙ্কিম উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটি নূতন প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটি নিজে না বলিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেই বক্তার আসনে বসাইয়াছেন। 'ইন্দিরা'তে একমাত্র ইন্দিরাই বক্ত্রী; সুতরাং এখানে ব্যাপার ততদূর জটিল হয় নাই। কিন্তু 'রজনী'তে উপাখ্যানটি বলিবার ভার অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থাতে বঙ্কিম একটি নূতন গুরুতর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে চাপাইয়াছেন; প্রত্যেক বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; বিভিন্ন বক্তার চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত প্রভেদ বঙ্কিম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নায়িকা রজনী-সম্বন্ধেই এই বিষয়ে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য চরিত্রের সাক্ষ্য হইতে অন্ধ রজনীর যে কোমল, ব্রীড়া-সংকুচিত, প্রকাশ-বিমুখ, সমবেদনাপূর্ণ ও স্বার্থবিসর্জন-তৎপর প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠে, তাহার নিজের পরিহাসপূর্ণ, মৃদু-বিদ্রূপমণ্ডিত ও বিশ্লেষণকুশল উক্তিগুলি ঠিক তাহার সমর্থন করে না। তারপর তাহার মুখে যে সমস্ত গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ, দার্শনিকোচিত উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতির পক্ষে ঠিক শোভন হয় নাই, তাহা অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মুখে অধিকতর সংগত হইত। আবার তাহার কথাবার্তায় যেরূপ গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও তাহার মত সমাজসংশ্রবরহিত, সরল, অন্ধ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়। তবে রজনীর চরিত্র-সম্বন্ধে যে অসামঞ্জস্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব নয়। রজনীর শান্ত, স্তব্ধ, পাষাণোপম মূর্তির অভ্যন্তরে যে একটা প্রবল প্রেমের আগ্নেয়গিরি জ্বলিতেছে, তাহা তাহার নিজেরই জানার সম্ভাবনা আছে; অপরের পক্ষে অন্ধের রূপোন্মাদ ও প্রবল চিত্তচাঞ্চল্য উপলব্ধি করা যে কত দুরূহ তাহা শচীন্দ্রের উক্তিতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, হৃদয়ের গোপন রহস্যের এরূপ পূর্ণ উদ্‌ঘাটন অপরের নিকটে আশা করা যায় না; সুতরাং রজনীর আত্মপরিচয় ও অপরের বিবরণের মধ্যে এরূপ একটা অনৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গল্পের যে অংশে উপাখ্যানের সূত্র রজনীর হাত হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার জীবনের একটা সন্ধিস্থল, তখন সে নির্জন, অন্তর্গূঢ় প্রেমের ধ্যান হইতে বাহ্য জগতের কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সময়ে তাহার চরিত্রের একটা পরিবর্তন ঘটাও সংগত। অমরনাথ ও শচীন্দ্র যখন বক্তার আসন গ্রহণ করিলেন, তখন রজনীর উপর বাহিরের জগতের দৃষ্টি পড়িয়াছে; সে যখন একটা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রেম লইয়া একটা কাড়াকাড়ি, একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গিয়াছে। তাহার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরাবদ্ধ চিন্তা এখন বাহ্য জগতের জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছে; সে নিজের নব-লব্ধ প্রাচুর্য হইতে বিলাইতে বসিয়াছে; সে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতেছে। এই সময়ে তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাস অনেকটা শান্ত-সংযত হইয়াছে, তাহার কোমল, মধুর রমণীপ্রকৃতিটি প্রস্ফুট হইয়াছে। আবার এই সময়ে রজনীর হৃদয়-বিশ্লেষণের কাজ তাহার নিজের হাত হইতে অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে; কাজেই তাহার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চিত্রটি ফুটিয়া উঠে নাই। অমরনাথ বা শচীন্দ্র প্রেমিকের মুগ্ধ-দৃষ্টিতেই তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়াছে; লবঙ্গলতাও তাহাকে বাহিরের দিক্ হইতে দয়াবতী, পরদুঃখকাতরা রমণীরূপে দেখিয়াছে। সুতরাং রজনীর এই দুই চিত্রের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য অনেকাংশে অপরিহার্য। কেবল অমরনাথের ক্ষেত্রেই উক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা যথেষ্ট সংগতি লক্ষ্য করা যায়; তাহার উদাসীন, সংসার-বিমুখ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রকৃতি তাহার বাক্যের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শচীন্দ্রের বাক্যে বা চরিত্রে সেরূপ উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নাই। লবঙ্গ-লতার ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে অতি-প্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসের—'কামার বউ-এর পিতলের টুক্‌নি সোনা করিয়া দিয়াছিলেন। উনি না পারেন কি ?'—ইত্যাদি উক্তির সামঞ্জস্য করা একটু কঠিন।

বঙ্কিম 'রজনী'তে যে বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আর একটি বিপদ্ আছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যে তাহাদের নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহা একদিকে খুব সরস ও জীবন্ত হইয়াছে; কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে। উপন্যাসবর্ণিত ঘটনার কোন্ অংশ বা stage হইতে তাহাদের এই আত্মবিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে? অবশ্য ঘটনার শেষ হইবার পরেই বিবৃতি আরম্ভ হইয়াছে; শচীন্দ্র-রজনীর প্রেম সার্থকতা লাভ করার পরেই সকলে আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহা হইলে লিখিবার সময়ে একজনও শেষ পরিণতি-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। এখন এই শেষ পরিণতির জ্ঞান তাহাদের অতীতের বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কিনা, বা করিয়া থাকিলে কতদূর করিয়াছে, ইহাই বিচার্য বিষয়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যখন কোন বিশেষ ঘটনার আলোচনা করিতেছে, তখন তাহাদের দৃষ্টি বর্তমানেই সীমাবদ্ধ, না ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে তাহাদের লক্ষ্য আছে? অবশ্য লেখক নিজে বর্ণনা করিলে, এ সমস্যা আসে না; কেন না তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাগ্য-বিধাতা, তাহাদের সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী; বর্তমানের ক্ষুদ্রতম ঘটনার সহিত অতীতের অঙ্কুর ও ভবিষ্যৎ পরিণতির সংযোগ তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে সর্বদাই দেদীপ্যমান। কিন্তু যখন উপন্যাসের মানুষগুলি আপন আপন কাহিনী বর্ণনা করিবার ভার লয়, তখন একটা অসুবিধা এই হয় যে, বর্তমানের আলোচনায় শেষকালের জ্ঞান তাহারা ধরিয়া লইবে কি না। পদে পদে এরূপ ভবিষ্যৎ পরিণতির জ্ঞান ধরিয়া লইলে বর্তমান মুহূর্তের রস জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। বর্তমান বিপদের বর্ণনার সময়ে যদি আমি আসন্ন উদ্ধারের উল্লেখ করি, তাহা হইলে নাটকোচিত সুসংগতির (dramatic fitness) হানি হয়; আবার কেবল বর্তমান মুহূর্তেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিলে, বর্তমানকে ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখাইলে, চিত্র খণ্ডিত, আংশিক, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই উভয়-সংকট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুব উচ্চাঙ্গের প্রতিভা ভিন্ন সুসাধ্য হইতে পারে না।

এবার কতকগুলি বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির আলোচনা করা যাউক। রজনীর উক্তিটি একেবারে আদ্যোপান্ত একটা গভীর ক্ষোভ ও খেদের সুরে পরিপূর্ণ; তাহার প্রেম যে এরূপ আশাতীত সাফল্য লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে কোন পূর্বজ্ঞান তাহার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহার দৃষ্টি—হীরালালের সহিত তাহার গৃহত্যাগ ও নির্জন গঙ্গা-সৈকতে তৎকর্তৃক বিসর্জন—ইহাতেই সীমাবদ্ধ; তৎপরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানের পরিচয় পাই না। রজনীর চক্ষে এইখানেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন, তাহার যাহা-কিছু খেদোক্তি ও নৈরাশ্য-ভাব, সৃষ্টি-বিধানের বিরুদ্ধে, যাহা-কিছু

বিদ্রোহ-জ্ঞাপন, সমস্তই এই সময়ের মানসিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বর্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ (concentration) নিশ্চয়ই আখ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; বর্ণনার মধ্যে একটা উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রাবল্য আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এইখানেই দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতিও আসিয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যতের বর্জন লেখক যেরূপ সম্পূর্ণভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহা হয় নাই; রজনীর আখ্যায়িকার দুই একটি উপাদান ভবিষ্যৎ হইতে আহরণ করিতে হইয়াছে। যেমন হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। এইখানে রজনীর উক্তি এই: "আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই, পশ্চাৎ শুনিয়াছি" (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। এই পরবর্তী জ্ঞানলাভ যে কখন হইল, হীরালালের জীবনের সহিত বিস্তৃত পরিচয় যে কিরূপে সম্ভব হইল—যদি গঙ্গাতীরে বিসর্জনই রজনীর জীবনের শেষ মুহূর্ত বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। অবশ্য এই ঘটনার পূর্বে হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে রজনীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, এই কথা বলিলে কোন দোষ হইত না। কিন্তু "পশ্চাৎ শুনিয়াছি" এই কথা স্বীকার করিলেও হীরালালের অতীত জীবনের বিস্তৃত কাহিনী সংগ্রহ করিতে হইলে বর্তমানের সীমা-রেখা অতিক্রম করিতে হয়, এবং যে ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে যাওয়া হইয়াছিল, তাহারই আশ্রয় লইতে হয়। সেইরূপ প্রথম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদে "কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবন-চরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।"—এই উক্তি ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া রজনীর মুখে সুসংগত হয় নাই। আবার রজনীর নিজ অন্ধত্ব-সম্বন্ধে যে খেদোক্তি, আলোকের ধারণা পর্যন্ত করিতে তাহার অক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে বর্তমানেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভের সহিত এ অংশের সমন্বয় করা কঠিন হইবে। যদিও অন্ধের আত্মবিশ্লেষণ কলা-কৌশল ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক হইতে প্রায় নির্ভুল হইয়াছে, তথাপি একটি ক্ষুদ্র চ্যুতি বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—যথা হীরালাল-সম্বন্ধে রজনীর উক্তি: "হীরালাল তৎকালে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল"; এ তথ্যের আবিষ্কার যে অন্ধের ক্ষমতাতীত, সে বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ গ্রন্থকারের মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

অমরনাথের উক্তির প্রারম্ভেই তাহার অতীত জীবনের যে একমাত্র গুরুতর পদস্খলন তাহার উল্লেখ আছে, এবং এই পদস্খলনের পরে তাহার মানসিক পরিবর্তনের, জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে নূতন ধারণার বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহার প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু নির্দেশ করিবার জন্য এই আখ্যায়িকা-বহির্ভূত অতীত ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার উক্তির সময়ে অমরনাথ সম্পূর্ণরূপে বর্তমানেই বদ্ধলক্ষ্য। ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে প্রতিদিনকার ঘটনা, দৈনন্দিন আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। রজনীকে পত্নীরূপে পাইবার সম্ভাবনায় তাহার মনে যে অভাবনীয় পুলক-সঞ্চার হইয়াছে, এবং ইহার পরেই যে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য আসিয়া তাহার হৃদয়কে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এই উভয় দৃশ্যই খুব বিশদ ও জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শচীন্দ্রের উক্তি-মধ্যে কেবলমাত্র একস্থানে ভবিষ্যতের পূর্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে—"দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার

মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে" (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু অন্য সর্বত্রই কেবল বর্তমানের ঘটনা-স্রোতই বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রজনীর প্রতি তাহার প্রথম দয়া ও সহানুভূতি, তাহার প্রেমে ঔদাসীন্য ও এমন কি বিরক্তির ভাবও যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎ প্রেমের ছায়া পড়িয়া ইহার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়া দেয় নাই। তাহার পীড়িতাবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের মধ্যে রজনীর প্রতি প্রেম কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহার একটি সুন্দর উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীন্দ্রের মুখে দিয়াছেন; এবং এই পরিবর্তনের যতটুকু মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তাহা দুই এক পরিচ্ছেদ পরেই সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, শচীন্দ্রের মনোভাব-পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিয়াছে, বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ-প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক্ হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটি অপরিহার্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে। বঙ্কিম রোমান্টিক যুগের লেখক, তাঁহার সময়ে বাস্তব প্রণালী উপন্যাসক্ষেত্রে তখনও নিজ আধিপত্য বিস্তার করে নাই। সুতরাং তিনি রোমান্সের সমস্ত convention, সমস্ত সংস্কার ও ধারণাগুলি অবলীলাক্রমে, অসংকুচিতভাবে উপন্যাসে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে একদিকে ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিকে যে লাভ হইয়াছে তাহাও সামান্য নহে। রোমান্সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, দীপ্তি ও গৌরব আমাদের সাহিত্যে এত সুপ্রচুর নহে যে, উপন্যাস-ক্ষেত্র হইতে উহাকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারি। তবে গ্রন্থশেষে রজনীর দৃষ্টিশক্তি-লাভের কাহিনীটি রোমান্সের অভাবনীয় বৈচিত্র্যের নিকটে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ ও অনুচিত আত্মসমর্পণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আখ্যায়িকা-বর্ণনের ভার বাঁটিয়া দেওয়ায়, আর একটি অসুবিধা আছে—উপন্যাসের গতি পদে পদে প্রতিহত ও মন্থর হইয়া থাকে। একই ঘটনা বিভিন্ন লোকের চক্ষু দিয়া দৃষ্ট হয়; একই ব্যাপার-সম্বন্ধে অনেকের মত লিপিবদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং পুনরুক্তিদোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিম তাহার ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে এই দোষ অনেকটা খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি এমনই সুকৌশলে বক্তাদিগের ক্রমনির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, গল্পের অগ্রগতি কোথাও নিশ্চল হয় নাই। যে যে অংশের প্রধান নায়ক তাহারই মুখে সেই অংশ বিবৃত করার ভার অর্পিত হইয়াছে। রজনীর গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জনের পর ঠিক তাহার উদ্ধারকর্তা অমরনাথের উক্তি আরম্ভ, আবার অমরনাথের দ্বারা রজনীর বিষয়-উদ্ধারের উপায় স্থিরীকৃত হইবার অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্রকে বক্তা করা হইয়াছে। রজনীকে পুনর্বার পাওয়ার পর শচীন্দ্রের সহিত তাহার মাতাপিতার পরিবর্তিত আচরণ ও তাহার সম্পত্তি-উদ্ধারের কাহিনী শচীন্দ্রের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শচীন্দ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রজনীকে বধূ করিতে কৃতসংকল্পা লবঙ্গলতার উক্তি আরম্ভ ও রজনীকে লইয়া অমরনাথের সহিত তাহার চাতুর্য-প্রতিযোগিতা। এইখানে নাটকীয় ভাব খুব ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে এবং সেইজন্য প্রায় প্রতি দৃশ্যেই বক্তার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। এই চাতুর্য-যুদ্ধে অমরনাথের মহানুভবতার নিকটে লবঙ্গলতার পরাজয় ঘটিয়াছে। এখানে আবার শচীন্দ্র রজনীর প্রতি বদ্ধমূল অনুরাগের নিদর্শন দেখাইয়া ব্যাপারটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। রজনী এখন কেবল একটা যুদ্ধ-জয়ের উপভোগ্য ফল মাত্র নহে; শচীন্দ্রের জীবনরক্ষার জন্য সে

এখন অবশ্য-প্রয়োজনীয়। উপন্যাসে তাহার মূল্য এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইখানে রজনীও প্রেমাস্পদের অবস্থা-দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহার সংযম ও আত্মদমন-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও অমরনাথের নিকট পূর্বভ্রম-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে শচীন্দ্রের প্রতি নিজ প্রবল অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছে। রজনীর এই স্বীকারোক্তিই উপন্যাসের সমস্যার সমাধান করিয়াছে, লবঙ্গের আবেদনের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা অমরনাথের মহানুভব হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে। লবঙ্গ চাতুরী ও ভয়-প্রদর্শনে যাহা পারে নাই, তাহা নায়িকার অশ্রুজলে, কাতরতায় ও প্রেমাভিব্যক্তিতে সহজেই সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তি দিয়া উপন্যাসটি বেশ সহজ, অপতিহত গতিতে পরিণতির দিকে চলিয়াছে, এবং প্রত্যেক নূতন চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের জন্য দুই একটি পরিচ্ছেদ ঘটনাস্রোতে বাধা প্রদান করিলেও মোটের উপর উপন্যাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। গঠন-কৌশলের দিক দিয়া 'রজনী'তে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুইখানিই বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস; এই দুইখানি উপন্যাসই গভীরবসাত্মক, ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ—অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-মুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাব-প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঘটনাবহুল, রসবৈচিত্র্যপূর্ণ নাটকের দৃশ্যের ন্যায় এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্যায় আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অনুসরণ করি; যে সমস্ত দুর্নিবার শক্তি আমাদের এই আপাত-নিশ্চল জীবনকে চালিত করিতেছে, তাহাদের প্রচণ্ড গতিবেগ অনুভব করি। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে একটি ক্রীড়াশীল, পরিহাসময় চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই, যাহা বসন্ত-পবনের মত মানবের উপরিভাগের বৈচিত্র্য স্পর্শ করিয়া যায়, হৃদয়মূলে যে অতল-গভীর জলাশয় আছে তাহার উপরে একটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, এবং অনুকূল দৈবের ন্যায় হঠাৎ এক মুহূর্তে জীবনসূত্রের গ্রন্থিসংকুলতাকে টানিয়া সরল করে, শেষমুহূর্তে বিরোধ শান্তি করিয়া, দুর্ভাগ্যের মেঘপুঞ্জকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটায়; বা যেখানে বিষাদময় পরিণতি অপরিহার্য, সেখানেও একটা আদর্শ, কল্পনাসুলভ জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে মৃত্যু-শয্যা বিছাইয়া দেয়। এই দুইখানি উপন্যাসে আমরা সেই ভাব-বিলাসের অনেকটা সংকুচিত অবস্থাই দেখিতে পাই। এখানে বঙ্কিম মানবহৃদয়ের গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, সত্যের নগ্নমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন; দুজ্ঞেয় ভাগ্যবিধাতা মানবের মর্মের মধ্য দিয়া যে গভীরকৃষ্ণ অথচ রক্তরঞ্জিত নিয়তির রেখাটি টানিয়া দেন, তাহার গতি-রহস্যটি খব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এখানেও বঙ্কিমের প্রকৃতি-সুলভ হাস্যপরিহাসের ও লঘুস্পর্শের অভাব নাই; বিষাদময় ট্রাজেডির মধ্যেও মানবমনের লঘু-তরল বিকাশগুলির চিত্র দিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জীবনকে একটা অবিচ্ছিন্ন ধূসর বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, তাহার মধ্যে আলো-ছায়ার যথাযথ বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রকৃতির লঘুতর উপাদানগুলি অনেকটা সংযত ও সংকুচিত হইয়াই এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে নিজ ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ'ও সম্পূর্ণরূপে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শশূন্য নহে; কুন্দের দুইবার স্বপ্নদর্শন বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের প্রতি অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান। কিন্তু ইহা গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় নহে। গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় হইতেছে আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপমোহ, এই অসংযত প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী তিনটি জীবনে একটা দারুণ আলোড়ন-সৃষ্টি, তিনটি জীবন-সমুদ্র-মন্থনে হলাহলোৎপত্তি। নগেন্দ্রনাথের পাপ-প্রলোভনের ক্রমপরিণতির চিত্রটি বঙ্কিম সুকৌশলে অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান ঔপন্যাসিকদের অতিরিক্ত-তথ্যভারাক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। স্বল্প কয়েকটি রেখাপাতে, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও আভাসের দ্বারা, আখ্যায়িকার মধ্য দিয়াই চিত্ত বিক্ষোভের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। কমলমণির প্রতি সূর্যমুখীর পত্রে এই চিত্ত বিকারের প্রথম উল্লেখ পাই; তখনও নগেন্দ্র প্রাণপণে প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, অন্তরের গভীর স্তরে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্য ব্যবহারে প্রস্ফুট হইতে দেন নাই; কেবল এক স্নেহময়ী পত্নীর অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিই এই নূতন ভাবপরিবর্তনের ঈষৎ আভাস পাইয়াছে। সূর্যমুখীর পত্রে এই বিকারের প্রথম পরিচয় দিয়া বঙ্কিম তাঁহার চিত্রকে কলাকৌশলের দিক্ হইতে এক অপূর্ব সংগতি ও শোভনত্ব দিয়াছেন। পর-পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি ঘটনার দ্বারা নগেন্দ্রের চিত্তবিকারের প্রথম বাহ্য বিকাশগুলি অতি সুন্দররূপে ও অদ্ভুত কলা-সংযমের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এদিকে কমলমণির সহানুভূতি-মিশ্র সূক্ষ্মদর্শিতা কুন্দনন্দিনীর গোপন প্রেমের রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রেম-ক্লিষ্টা সরলা, বালিকা-স্বভাবা কুন্দনন্দিনীর চিত্ত-ধারার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, এবং নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর প্রথম সাক্ষাৎ ও নগেন্দ্রের অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই সাক্ষাতের ফলে, কুন্দনন্দিনীর সলজ্জ প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও উভয়েরই মনোভাব যে আরও প্রবল ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্তী ঘটনা—হীরা কর্তৃক হরিদাসী বৈষ্ণবীর স্বরূপ-আবিষ্কার, তাহার ফলে কুন্দের চরিত্রে সন্দেহ, সূর্যমুখীর তিরস্কার ও অভিমানিনী কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগ। এই গৃহত্যাগের ফলে উভয়েরই প্রণয় আরও উচ্ছ্বসিত ও অপ্রতিরোধনীয় হইয়া উঠিল। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম উচ্ছ্বাসময়, কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে কুন্দের অনিবার্য প্রেমপিপাসা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এদিকে নগেন্দ্র যখন হীরার মুখে সূর্যমুখীর তিরস্কারের জন্য কুন্দের গৃহত্যাগের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার কষ্ট-সংযত প্রেম সকল বাধা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া একেবারে অসংবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল; এই কঠোর আঘাতে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে যে সংযম-সংকোচের একটা সূক্ষ্ম পর্দার ব্যবধান ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল। নগেন্দ্র অতি কঠোর নীরসভাবে, নিতান্ত হৃদয়হীনের ন্যায়, সূর্যমুখীর নিকট নিজ বহ্নিজ্বালাময় বাসনার কথা প্রকাশ করিলেন, এবং কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধে তাঁহার শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এই বিরহ-কালের অবসান হইল কুন্দের অনিবার্য প্রণয়-প্রণোদিত প্রত্যাবর্তনে; সূর্যমুখী প্রত্যাগতা পলাতকাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও স্বামীর সহিত তাহার বিবাহের উদযোগ করিয়া শুভকার্য সম্পন্ন করাইলেন। এইখানে বিষবৃক্ষের একপর্ব শেষ হইল, উদ্দাম বাসনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এইবার

ধীরে সুস্থে ফলভোগের পালা আরম্ভ হইল। প্রবল ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলই প্রবল প্রতিক্রিয়া।

এই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রথম আত্মবিসর্জন দিল সূর্যমুখী; কমলমণির আগমনের পর সূর্যমুখী কমলমণির নিকটে স্বামীর ব্যবহারে নিজ গভীর মনোবেদনার পরিচয় দিলেন, ও প্রত্যাখ্যানের অসহ্য দুঃখবশে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগেই নগেন্দ্রের ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল; কুন্দনন্দিনীর প্রতি অগাধ, অপরিমিত প্রেম এক মুহূর্তেই তীব্র বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাতে বিস্বাদ হইয়া গেল। কুন্দের মৌনভাব, সরস বাক্-পটুতার অভাব, নিরুদ্ধপ্রকাশ প্রেম নগেন্দ্রের বুভুক্ষিত হৃদয়কে পরিতৃপ্তি দিতে পারিল না; কুন্দের নিজের আশাতীত আনন্দের মধ্যেও অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশন অনুভূত হইতে লাগিল। বিষবৃক্ষের ফলাস্বাদনের পর প্রথম অনুভূতি হইল যে, সকল সুখেরই সীমা আছে। তারপর নগেন্দ্র-হরদেব ঘোষালের পত্রে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম বিশ্লেষিত হইয়া একটা বিরাট ভ্রান্তি, একটা অধম রূপজ মোহের পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আদর ও মিষ্ট কথার পরিবর্তে ভৎর্সনা ও তিরস্কারই কুন্দের নিত্য-ভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুহূর্তের জন্য মেঘাবৃত সূর্যমুখীর প্রতি প্রেম আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাত্র পনের দিনের মধ্যেই এই অদ্ভুত পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে—যে প্রেমসিন্ধু উদ্বেল ও কূলপ্লাবী হইয়া সমাজ, ধর্ম, কর্তব্যজ্ঞান সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তির আকর্ষণে নিমেষে শুকাইয়া গেল; সূর্যমুখীর প্রতি প্রেমের শুষ্ক খাতে পুনরায় প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে কয়েকটি অসাধারণ সৌন্দর্যপূর্ণ মহাকাব্যোচিত তুলনার দ্বারা পাঠকের মনে এই শোকপূর্ণ পরিবর্তনের চিত্রটি গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; এদিকে সূর্যমুখী নগেন্দ্রের নিকটে প্রত্যাগমনের পথে সংকটাপন্ন রোগে পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। এই মৃত্যু-সংবাদে নগেন্দ্রের মনে যে অনুতাপানল জ্বলিতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। বঙ্কিম অসাধারণ শব্দচাতুর্য ও কবিজনোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত নগেন্দ্রের এই অনুতাপ ও আত্মগ্লানি চিত্রিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করিবার ও গার্হস্থ্য জীবনের নিকট চির-বিদায় লইবার জন্য নিজগ্রামে ফিরিবার ঠিক পূর্বেই এক পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আমাদিগকে অভাগিনী, স্বামী-পরিত্যক্তা কুন্দনন্দিনীর অন্তরের নীরব যন্ত্রণার, নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যথার একটি ক্ষুদ্র চিত্র দিয়াছেন। বিষবৃক্ষের ফল কুন্দকেও যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তারপর নগেন্দ্রের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পর 'স্তিমিত প্রদীপে', নামক পরিচ্ছেদে লেখক নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পূর্ব-প্রণয়ের যে উচ্ছ্বসিত, আবেগময় কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, যে দুই তিনটি সুনির্বাচিত আখ্যানের দ্বারা তাহাদের প্রেমের গাঢ়তা ও সর্বাঙ্গীণ একাত্মতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা কলাকৌশল ও কবিত্বশক্তির দিক্ হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই করুণ পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনার মধ্যে এই তীব্র আত্মগ্লানির বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যে বঙ্কিম পুনর্জীবিত সূর্যমুখীকে আনিয়া দিয়া ও নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটাইয়া

একটি আনন্দপূর্ণ, অথচ সম্পূর্ণ কলাকৌশলসম্মত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের (surpise) সংঘটন করিয়াছেন।

কিন্তু ট্রাজেডির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই আনন্দের সুরে আখ্যায়িকাটি শেষ হইতে দিলেন না। তাঁহার নির্মম বিচারে একটি বলিদানের প্রয়োজন হইল, এবং চির-উপেক্ষিতা, অভাগিনী কুন্দনন্দিনীই এই বলির জন্য নির্বাচিত হইল। বিষবৃক্ষের ফল এতদিনে সত্যসত্যই ফলিল এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের ন্যায় গ্রন্থকারের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অমোঘ গ্রন্থিবন্ধনে এই গরল কুন্দনন্দিনীরই উদরস্থ হইল। কিন্তু যে তরঙ্গ আসিয়া কুন্দকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তাহার কোমল, লজ্জাসঙ্কুচিত হৃদয়ের নিজ প্রেরণা হইতে আসে নাই, তাহা নিকটবর্তী একটি পঙ্কিল আবর্ত হইতে ঈর্ষ্যা-ফেনিল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের রূপেই তাহার উপরে আপতিত হইল। বাস্তবিকই বঙ্কিম সুনিপুণ মালাকারের ন্যায়, অসাধারণ কৌশলের সহিত কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর অপেক্ষাকৃত উন্নত ও গভীর প্রেমের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে আর একটি কলঙ্কিত, অথচ মনোবৃত্তির নিগূঢ়-লীলা-বিচিত্র প্রণয়-কাহিনী একই সূত্রে গাঁথিয়াছেন, এবং এই দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন। হীরা উপন্যাসের villain; গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্য অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেইখানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। সে-ই সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে শেষ বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, সে-ই মর্মপীড়িতা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্ত্রণা ও অস্ত্র পৌঁছাইয়া দিয়া ট্রাজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করিয়াছে। প্রাকৃত জগতেও এইরূপ অন্তরস্থ ও বাহ্য শক্তির সম্মিলনেই আমাদের মনোরাজ্যে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়; হৃদয়-কন্দরে যে বহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, বাহিরের ফুৎকারেই তাহা প্রবল ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু হীরা কেবল পরের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসে নাই, তাহা হইলে সে উপন্যাসের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয়, বাহিরের জীবমাত্র হইত। তাহার নিজের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা হইতেই একটা প্রজ্বলিত শলাকা লইয়া সে অন্যের ঘরে আগুন দিয়াছে; নিজের অন্তরস্থ বহ্নিপ্রাচুর্য হইতেই তাহার চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। ইহাই আর্টিষ্টের কৃতিত্ব; তিনি হীরাকে একটা secondary বা গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে ফেলেন নাই, নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-সৌর-জগতের দূরপ্রান্তস্থিত একটা ক্ষীণ-প্রভ উপগ্রহমাত্র করেন নাই; তাহার উপর ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগ ও করাল দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন। হীরা-দেবেন্দ্রের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান প্রণয়-কাহিনীটিও বঙ্কিম তাহার অত্যন্ত সংযম ও মিতভাষিতার সহিত, কয়েকটি অর্থপূর্ণ আভাস ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পাপ-সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটা সহজ সংকোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল; সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই, আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্যায় প্রতি-দিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিহ্ন পুঞ্জীভূত করিয়া চিত্রকে মসীময় করিয়া তোলেন নাই, সর্ববিধ তথ্যবিস্তার সযত্নে বর্জন করিয়াছেন। কেবল পদস্খলনের পূর্ববর্তী অবস্থাগুলিকে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রাণপণ প্রলোভন-দমনের চেষ্টাটিকে সুরুচি ও রসজ্ঞানের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ফুটাইয়া

তুলিতে চাহিয়াছেন; পাপের পঙ্কিল প্রবাহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ, প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী আবর্তসৃজন অনুসরণ করেন নাই। কেবল স্বল্পকালব্যাপী চেষ্টার পর এই পঙ্কিল প্রবাহকে সূর্যালোকে তুলিয়া, তাহার পর এক অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূলে লইয়া গিয়া, প্রায়শ্চিত্তপর্বতের শিখরদেশ হইতে মৃত্যুর অতল শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কানে বাজিতে থাকে, একটা প্রাণবেগচঞ্চল, বিপুল শক্তির অতর্কিত অন্তর্ধানের বিরাট শূন্যতায় আমাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনের ক্রিয়া লেখক আমাদিগকে দেখিতে দেন না। এই সমস্ত মন্তব্য হীরার ক্ষেত্র অপেক্ষা গোবিন্দলাল-রোহিণীর চিত্র-সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রযোজ্য। তাহাদের পাপ-প্রণয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই না। প্রসাদপুরের বিজন প্রাসাদে যে শেষ দিনের চিত্রটি আমরা পাই, তাহার উপর আগন্তুক বিপৎপাতের একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। প্রেমের প্রথম স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়ায়, শীর্ণকায়া চিত্রার মতই একটা আগতপ্রায় দুর্দৈবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। রোহিণীর প্রণয়ের অতৃপ্ত যৌবন-পিপাসা অবিমিশ্র ভোগধারায় শান্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকসুলভ কৌতূহল ও ধর্মভয়বর্জিতার মাধুকরী বৃত্তি তাহাকে পাত্রান্তরান্বেষণের জন্য উন্মুখ করিয়াছে। গোবিন্দলালের প্রথম রূপমোহ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং নভেল-পাঠ ও সংগীতের ব্যবস্থা এই ক্ষীয়মান দীপশিখায় তৈলনিষেকের ন্যায়ই বিরক্তি-বিমুখ মনকে সতেজ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটি যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্রই এই বাহ্য-বিলাস-ভারাক্রান্ত, কিন্তু অন্তর্জীর্ণ জীবন-যাত্রা যেন যাদুমন্ত্রবলে ইন্দ্রজালনির্মিত প্রাসাদের ন্যায়ই শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বায়ুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-লীলা-সম্বন্ধে প্রায় মৌন রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমরের দীর্ঘ সপ্তবৎসরব্যাপী অভিমান-দুর্বিষহ প্রতীক্ষা একটু বিস্তারিতভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুতরাং পাপের প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার জন্যই হীরা ও দেবেন্দ্রের প্রণয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই না, কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীর বিশেষত্বগুলি লেখক বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিতই আলোচনা করিয়াছেন। হীরাচরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে তাহাই। হীরা সূর্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন মনে করে না। সুতরাং ভগবানের যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও সূর্যমুখী প্রভুপত্নী, তাহার বিরুদ্ধে তাহার একটা চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে এই গূঢ় আত্মাভিমান ও কঠোর আত্মসংযম তাহাকে প্রেমের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে শক্তি দিয়াছে। কিন্তু তাহার চরিত্রের মূলে একটা ধর্মনীতিমূলক দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল না; সুযোগ ও অবসরের অভাবই এ পর্যন্ত তাহাকে ধর্মপথে স্থির রাখিয়াছিল। এমন সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবীর খোঁজে আসিয়া সে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিল; এবং যে প্রেমকে সে এতদিন অস্বীকার করিয়া আসিয়াছিল, প্রথমদর্শন মাত্রই, সেই প্রেম তাহার দেহ-মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল।

তাহার হৃদয়ে এই অতর্কিত প্রেমাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জটিল আনুষঙ্গিক অবস্থাও তাহার চারিদিকে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম দেবেন্দ্র তাহাকে দাসী জ্ঞান করিয়াই কুন্দের প্রতি নিজ গোপন অনুরাগের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল, এবং কুন্দ-প্রাপ্তিবিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়া তাহার মনোমধ্যে একটা বিষম ক্রোধ ও কুন্দের প্রতি বিজাতীয় হিংসা জাগাইয়া তুলিল। তারপর ঘটনাক্রমে পলাতকা কুন্দ তাহারই গৃহে আশ্রয় লওয়ায়, একদিকে কুন্দের প্রতি তাহার হিংসা প্রবলতর হইবার সুযোগ পাইল, অপরদিকে সে কুন্দকে সূর্যমুখীর উচ্ছেদের জন্য শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবার সংকল্প পোষণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে সময় বুঝিয়া কুন্দ-অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটন করিল। এদিকে দেবেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও জটিলতর হইয়া উঠিল; দেবেন্দ্র কুন্দের সন্ধানে তাহার গৃহে আসিয়া একদিকে তাহার প্রণয়-স্বীকারের ও অপরদিকে তাহার আত্মসংযমের দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় লইয়া গেলেন। হীরা স্পষ্টই বলিল যে, সে দেবেন্দ্রকে ভালবাসে, কিন্তু দেবেন্দ্রের নিকট প্রণয়ের প্রতিদান না পাইলে তাহাকে ধর্মবিক্রয় করিবে না। দেবেন্দ্রও হীরার উপর তাঁহার অসীম প্রভাব আছে ও তাহাকে করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় চালাইতে পারিবেন এই ধারণা লইয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই। ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি আবার দত্তবাড়ি গেলেন ও হীরার নিকট আবার কুন্দসম্বন্ধীয় দুঃসাহসিক প্রস্তাব করিয়া দ্বারবান্-হস্তে অপমানিত হইয়া ফিরিলেন।

এই অপমানভোগের পর দেবেন্দ্র হীরার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন ও কপট-প্রণয়জালে শীঘ্রই লুব্ধচিত্তা, ধর্মভয়হানা হীরা-মক্ষিকাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। হীরার আত্মসংযমে ক্ষমতা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি রহিল না। তারপর হীরার বিষবৃক্ষের ফল ফলিল—ধর্মভ্রষ্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পদাঘাতে বিতাড়িত হইল। চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে কয়েকটি বাক্যেই বঙ্কিম অসাধারণ দক্ষতার সহিত হীরার এই কলুষিত প্রণয়ের শেষ পরিণামটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অপমানিতা হীরা পদাহতা সর্পিণীর ন্যায়ই ফণা ধরিয়া উঠিল; তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সংকল্পে পরিণত হইল। একদিকে প্রবল নৈরাশ্যের আঘাত তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তুলিল; অপর দিকে প্রকৃত শয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে কুন্দের চরম দুঃখের মুহূর্তে তাহাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে, তাহার হাতের নিকট আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে প্রণোদিত করিল। হীরার হৃদয়-মন্থনজাত, ঈর্ষ্যা-ফেনিল বিদ্বেষ-হলাহলই সে কুন্দের মুখের নিকট আনিয়া ধরিল, এবং কুন্দ সেই বিষপান করিয়াই মরিল। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই যে, হীরার উন্মাদরোগ আরও ভয়ংকর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বসুখস্মৃতি, অপমানের বৃশ্চিকদংশন, দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ ক্রোধানল—সমস্ত তাহার বিকারগ্রস্ত মনে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়াছে; এবং এই তুমুল কোলাহলকে ছাপাইয়া তাহার অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা পূর্বসুখস্মৃতি-বাঁশরীর রন্ধ্রপথে ফুৎকার দিয়া এক বিষাদ-করুণ সুর তুলিয়াছে :—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

এই সুরেই হীরার শেষ এবং সত্য পরিচয়—এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকারই তাহার ঈর্ষ্যাদিগ্ধ অভিমানবিকৃত, বিদ্বেষক্রূর হৃদয়ের অন্তরতম বাণী।

উপন্যাসের মধ্যে প্রধান সমস্যা হইতেছে অনিন্দিত-চরিত্র, পত্নী-বৎসল নগেন্দ্রের পদস্খলন; ইহার জন্য লেখক সন্তোষজনক কারণ দিয়াছেন কি না, ইহার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন কি না, তাহাই গ্রন্থসম্বন্ধে আমাদের প্রধান প্রশ্ন। কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের যে প্রথম পরিচয় বা সম্পর্ক তাহা সম্পূর্ণরূপে দয়ার ভিত্তির উপর স্থাপিত; কিন্তু এখানেও বোধ হয় একটা অস্বীকৃত প্রেমের ঘোর তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ও দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকে কুন্দের রহস্যময় সারল্যমণ্ডিত সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেই মোহের প্রথম ও সূক্ষ্মতম কুহেলিকা-জালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী ঘটনার আলোকে আমাদের সন্দেহ হয় যে, এই সৌন্দর্য-বিচার ঠিক দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা নহে; ইহার মধ্যেও বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ মোহের বীজ নিহিত আছে। সেই পরিচ্ছেদেই যখন নগেন্দ্র সূর্যমুখীর অনুরোধে কুন্দকে গোবিন্দপুর লইয়া গেলেন, তখন বঙ্কিম এই আপাত-সহজ ও স্বাভাবিক কার্যটিতেই বিষবৃক্ষের প্রথম-বীজ-রোপণের গুরুতর তাৎপর্য আরোপ করিয়াছেন। অনাথা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশমাত্রই যদি বিষবৃক্ষের বীজরোপণ হয়, তবে দয়াধর্মকে মনুষ্যের কর্তব্যতালিকা হইতে বিসর্জন দিতে হয়। আর এই অমঙ্গলাশঙ্কা সত্য হইলেও ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই; ইহা চাণক্যপণ্ডিতের সেই সনাতন সন্দেহনীতি—যাহাতে নারী ঘৃতকুম্ভ ও পুরুষ তপ্ত অঙ্গারের সহিত উপমিত হয়—তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নগেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে দুর্বলতাব বীজ নিহিত না থাকিলে এই দয়া-প্রকাশের ফল এত বিষময় হইত না। সুতরাং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই প্রাথমিক দুর্বলতার উপরই জোর দিতে হইবে, তাঁহার পদস্খলনের কেবল ঘটনামূলক নহে, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বঙ্কিম প্রথমতঃ কেবল ঘটনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেম-প্রকাশের পূর্বলক্ষণগুলিই বিবৃত করিয়াছেন; সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহা বলেন নাই, বা নগেন্দ্রের চরিত্রগত কোন বিশেষ দুর্বলতার সহিত তাহাদিগকে সম্পর্কান্বিত করেন নাই।

সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে একটি মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—নগেন্দ্রের পূর্বজীবনে কোন বিষয়ের অভাব হয় নাই বলিয়া তাঁহার চিত্তসংযম শিক্ষা হয় নাই; "অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না"—এই ব্যাখ্যাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, ইহা নীতিবিদের ব্যাখ্যা হইতে পারে, মনস্তত্ত্ববিদের নহে। আমরা আরও একটু ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর সম্পর্কের নির্দেশ চাহি। যেমন আকাশ হইতে জল হয় বলিলেই বৃষ্টির উপযুক্ত কারণ নির্দেশ করা হয় না, সেইরূপ নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার পদস্খলন হইল, এই অস্পষ্ট ও সাধারণ উক্তিতে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে না। কেবল নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যস্ত হয় নাই—এই উক্তি যথেষ্ট নহে; তাঁহার পূর্বজীবনের প্রকৃত কার্যকলাপের মধ্যে এই অসংযমের অঙ্কুরের আভাস দেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য ইহা সত্য যে, বাস্তবজীবনে এরূপ অনেক অতর্কিত বিকাশ ও অপ্রত্যাশিত পরিণতির উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে যে, অনেক সুস্থ ব্যক্তির দেহেও রোগের বীজাণু

লুক্কায়িত থাকে এবং উপযুক্ত অবসর পাইলে ফুটিয়া বাহির হয়; সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণেও অনেক গোপন দুর্বলতার বীজ প্রোথিত আছে, বিশেষ প্রলোভনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিজেরাই তাহাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি। সুতরাং কেবল ঘটনা হিসাবে নগেন্দ্রের এই অতর্কিত পদস্খলনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; তাঁহার অন্তঃকরণের রূপমোহসম্বন্ধে তিনি নিজেও হয়ত অজ্ঞ ছিলেন, এবং এ তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই, যখন তাঁহার অন্তরমধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হয়ত কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার এই রূপমোহ সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিন্দনীয় জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। আমাদের অধিকাংশের জীবনেই আমরা কারণ হইতে কার্যের দিকে যাই না; আমাদের সাধারণ গতি প্রায়ই বিপরীতমুখী—কার্যের প্রকাশ হইতে কারণের অন্ধকার গুহার দিকে। আমরা সকল সময় গাছ দেখিয়া ফল চিনি না; পরন্তু ফল হইতে গাছের অস্তিত্বের প্রথম নিদর্শন পাইয়া থাকি। কিন্তু এই যুক্তি বাস্তবজীবনের অনুগামী হইলেও, ঔপন্যাসিকের পক্ষে খাটে না। নগেন্দ্র নিজের রূপমোহসম্বন্ধে নিজে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্তার সেরূপ কোন অজ্ঞতার কৈফিয়ৎ নাই। আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি যে, ঔপন্যাসিক জীবনের যে খণ্ডাংশ তাঁহার বিষয়ের জন্য নির্বাচন করিবেন, তাহার কোন রহস্যই তাঁহার নিকট গোপন থাকিবে না; তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মনের প্রত্যেক অলিগলির, প্রত্যেক অন্ধকার গুহার উপরই তিনি আলোকপাত করিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ এখানে আশানুরূপ গভীর হয় নাই। যখন আমরা নগেন্দ্রের অনিন্দনীয় চরিত্রের ও উচ্ছ্বসিত পত্নীপ্রেমের কথা আলোচনা করি, যখন সূর্যমুখীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত প্রশংসাবাক্যগুলি আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাঁহার কোন্ দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে শনির প্রবেশ হইয়াছে। নগেন্দ্রের আদর্শ চরিত্রই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনকে অবিশ্বাসী করিয়া তোলে।

এই বিষয়ে আর একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নও মনে স্বতঃই মাথা তুলিয়া উঠে। তাহা এই যে, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মধ্যে এই বিচ্ছেদ-সংঘটনে সূর্যমুখীর কোন দোষ ছিল কি না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমরের অভিমানপ্রবণতা ও অন্যায় সন্দেহ গোবিন্দলালের পতনের দায়িত্বভার উভয়ের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ'-এ লেখক সূর্যমুখীকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রাখিয়াছেন, এবং অধঃপতনের সমস্ত অবিভক্ত দায়িত্ব নগেন্দ্রের স্কন্ধেই ফেলিয়াছেন। এরূপ একপক্ষের দোষ বাস্তবজগতে যে বিরল তাহা নহে। তবে উপন্যাসে ইহা সূর্যমুখীর চরিত্র-হিসাবে মুখ্যত্ব কতকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে; সে কেবল অন্যকৃত অত্যাচারে উৎপীড়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য সূর্যমুখী যেরূপ উচ্ছ্বসিত, অপরিবর্তিত পতিভক্তি, যেরূপ প্রতিবাদহীন মৌন গৌরবের সহিত এই বিপৎপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও নিঃস্বার্থ প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বোধ হয় একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সূর্যমুখীরও চরিত্রের মধ্যেই স্বামিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার কতকটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্যমুখী কিছু গর্বিতস্বভাবা ছিলেন। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাঁহার এই বিশেষত্বের, এই

মৌন অহংকারের, ধর্মশীলা, পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর একটা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত গর্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। সূর্যমুখী প্রথম হইতে বুঝিয়াছে যে, স্বামীর মন তাহার নিকট হইতে অপসৃত ও অন্যাসক্ত হইতেছে, কিন্তু সে কোথাও একমুহূর্তের জন্যও স্বামীর অনুরাগ ফিরিয়া পাইবার জন্য নগেন্দ্রের নিকটে অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখায় নাই; কোন অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা, কোন ভাব-বিলাস-মূলক নিবেদনের (sentimental appeal) দ্বারা, পূর্ব-প্রেমের দোহাই দিয়া স্বামীর পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। কেবল কমলমণির নিকটে রোদনের দ্বারা নিজ হৃদয়-ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নগেন্দ্রের নিকট কর্তব্য-পরায়ণা স্ত্রীর স্থির মুখকান্তির রেখামাত্র বিচলিত হইতে দেয় নাই; মনের পাষাণভার চাপিয়া রাখিয়া অকম্পিত হস্তে নিজের বধদণ্ডাজ্ঞায় নিজেই স্বাক্ষর করিয়াছে। পরস্ত্রীলোলুপ স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নীরবে আত্মবিসর্জন করিয়াছে; নিজেই তাহাকে সপত্নীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। বালিকা ভ্রমর যেমন বিপথগামী স্বামীর পায়ে ধরিয়া প্রেম-ভিক্ষা চাহিয়াছিল, আমরা গর্বিতা সূর্যমুখীকে কখনও সে অবস্থায় কল্পনা করিতে পারি না। যে বস্তু তাহার ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ প্রাপ্য, তাহাকে সে কখনও ভিক্ষার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথচ এই যে গর্ব, ইহার মধ্যে পরুষতা কিছুই নাই, ইহা স্বামীর প্রতি তিরস্কার-বাক্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ইহার মর্মস্থল পর্যন্ত একটা অকৃত্রিম ভক্তি ও স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত। একটা কঠোর অবিচলিত আত্মসংযমেই ইহার একমাত্র পরিচয়। সূর্যমুখী ভ্রমরের ন্যায় উচ্ছ্বাসপ্রবণা হইলে বোধ হয় নগেন্দ্রনাথকে ধরিয়া রাখা যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সূর্যমুখীর ব্যবহারও—তাহা একদিক্ দিয়া যতই অনিন্দনীয় হউক না কেন—ট্রাজেডির পরিণতির জন্য অন্ততঃ কতক অংশে দায়ী। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের সময়ে নগেন্দ্রের সূর্যমুখীর প্রতি ব্যবহার এত পরুষ ও কোমলতা-লেশ শূন্য ছিল যে, সূর্যমুখীর অশ্রুসিক্ত আবেদনও কতদূর ফলপ্রদ হইত বলা যায় না; কিন্তু সূর্যমুখীর বিশেষত্ব এই যে, সে কখনও সেরূপ আবেদনের কল্পনাও করে নাই। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—ইহাদের বিষয়-বস্তু ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি প্রায় একরূপ; কিন্তু বঙ্কিম যেরূপ নিপুণতার সহিত ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের পাত্র-পাত্রী ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা উচ্চাংগের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচায়ক।

এই দুই প্রেম-চিত্রের বিপরীত একটি চিত্র তৃতীয় কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের অনাবিল, একাত্ম, হাস্য-পরিহাসমধুর, কপট-মান-অভিমান-তীব্র প্রেম-কাহিনীতে অঙ্কিত হইয়াছে। এখানে শিশু সতীশচন্দ্র তাহার মনোহর শৈশব-চাপল্যের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচনা করিয়াছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী নিঃসন্তান, ভ্রমরের শিশু সূতিকাগারেই মৃত, বোধ হয় এই সন্তানের অভাবই এই দুইটি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদকে এরূপ সম্পূর্ণ ও গভীর করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নিঃসঙ্গ বিরহকে এরূপ অসহনীয়রূপে তীব্র করিয়াছিল। বোধ হয় উভয়ের স্নেহের একটা সাধারণ অবলম্বন থাকিলে তাহাদের মনোমালিন্য এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত না; তাহা হইলে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ অসম্ভব হইত, ও গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনের একটি পথ খোলা থাকিত।

সে যাহা হউক, বঙ্কিম একই উপন্যাসে প্রেমের যে বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন।

চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবিন্যাস ছাড়া অন্যান্য দিক্ দিয়াও 'বিষবৃক্ষ' খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সরল ও জীবন্ত বাস্তব বর্ণনায় বঙ্কিম বঙ্গ-উপন্যাসক্ষেত্রে অতুলনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নৌকা-যাত্রা, গঙ্গাতীরস্থিত গ্রামের ঘাটগুলি ও নৈদাঘঝটিকা-বৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাস্তব-রসটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সাধারণ জীবনযাত্রার বর্ণনাও তুল্যরূপে প্রশংসার্হ। আধুনিক উপন্যাসে সমস্যাবিশ্লেষণ আমাদিগকে এরূপভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, বাস্তব-বর্ণনাতে আমাদের উৎসাহ ও শক্তি অনেক ম্লান হইয়া আসিতেছে; হয় তাহা আদর্শের উচ্চ-গ্রামের সহিত সমান স্বরে বাঁধা, "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র গোধূলিরাগরঞ্জিত (idealised) হইয়াছে, নয় তাহার উপর সমস্যার ছায়া, একটা পাণ্ডুর রক্তহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র বস্তু-বর্ণনার যে একটা সজীব, সতেজ আনন্দ তাহা আমাদের সাহিত্যে লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন বাস্তব-বর্ণনাতেও আমরা হয় কবি না হয় দার্শনিক, জীবন-রসে অহেতুক আনন্দ আর আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাই না। মুকুন্দরাম, ঈশ্বরগুপ্ত হইতে প্রবাহিত যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে চরম গভীরতা ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্তমান সাহিত্যে প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের মধ্য দিয়া স্বর্গের অলকনন্দা ও পাতালের ভোগবতী বহিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মর্ত্যের সেই চিরপরিচিত, বহু-পুরাতন প্রবাহিণীর জলকল্লোল আর শুনিতে পাই না।

গভীরভাবাত্মক অথচ সংযত বর্ণনাতেও বঙ্কিম তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রোদনপ্রবণ বাঙালীজাতির মধ্যে জন্মিয়াও বঙ্কিম তাঁহার বর্ণনা বা জীবন-সমালোচনায় কোথাও ভাবাতিরেকের (sentimentality) পরিচয় দেন নাই—যেখানে মর্মভেদী দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, সেখানেও অশ্রুপ্রাচুর্যের পরিবর্তে একটা সংযত-গম্ভীর বিষাদই তাঁহার প্রকাশের স্বাভাবিক ভঙ্গী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বাক্-সংযমই কুন্দনন্দিনীর পিতাব দুর্দশার চিত্রটিকে একটি অসাধারণ অর্থগৌরবে ও করুণ-রস-প্রাচুর্যে ভরিয়া দিয়াছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মেঘান্ধকার নিশীথে কুন্দনন্দিনীর দত্তগৃহত্যাগ, অষ্টাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে শোকোচ্ছ্বাস, উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কুন্দের অতর্কিত বাক্পটুতার বর্ণনাগুলি বঙ্কিমের এই শক্তির উদাহরণ। অবশ্য স্থানে স্থানে কথোপকথনের ভাষা ঈষৎ শব্দাড়ম্বর-দুষ্ট ও সেইজন্য গভীর ভাবপ্রকাশের পক্ষে কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহা বঙ্কিমের শক্তির অভাবের পরিচয় নহে, ভ্রান্তিমূলক সাহিত্যাদর্শানুসরণেরই ফল। বঙ্গসাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষ'-এর স্থান খুব উচ্চ; বোধ হয় এক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-ই ইহাকে অতিক্রম করিয়া যায়; কেন-না সেখানে বিরোধের চিত্রটি সম্পূর্ণতর ও কার্যকারণসন্নিবেশ অধিকতর সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষে'র পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক্ব, অনিন্দনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন। 'বিষবৃক্ষ'-এ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক যে গুরুতর অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পূর্ণ হইয়াছে, কার্য-কারণ-পরম্পরায় কোন শৃঙ্খলই বাদ

যায় নাই। সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে, তাহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্রাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগসঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটি সেরূপ বিশদভাবে প্রকট করিয়া দেখান হয় নাই; সূর্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় নাই; সূর্যমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ-সংগঠনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাহ্যসম্পর্কশূন্য—বাহিরের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, সেগুলিকে যেন সযত্নে বর্জন করিয়াই উহার বিরোধের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—বাহিরের শক্তির মধ্যে এক হীরাই নায়ক-নায়িকার দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরদুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। অন্তরের যে গভীর স্তরে এই সমস্যার জাল পাকাইয়া আসিতেছিল, নিয়তির সেই গোপন কক্ষে কমলমণিও প্রবেশ-লাভে অধিকারিণী হয় নাই, কেবল বাহির হইতে সান্ত্বনা ও সমবেদনার কার্যেই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একান্নবর্তী বাঙালী গৃহস্থ-পরিবারে বাহিরের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কলোপ প্রায়ই সম্ভব হয় না; আমাদের অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পরিজন ও প্রতিবাসীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে। শতবন্ধনজাল-জটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমা-নিবদ্ধ (self-contained) থাকিতে দেয় না, তাহার উপর সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগ্য-সূত্রকে আরও গ্রন্থিসংকুল করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তবজীবনযাত্রার উপরে এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রভাব বড় অল্প নহে। অবশ্য অনেক সময়ে উপন্যাসকার আমাদের অন্তরের ভাবগুলির ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্টতররূপে দেখাইবার জন্য আমাদের অন্তর্জীবনকে প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পৃথক করিয়া লইয়া ইহাকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলে সমর্পণ করেন—কিন্তু বাঙালী-জীবনের উপন্যাসে এইরূপ প্রক্রিয়া যেন একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই বাহ্যজগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ করিয়া দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপরে সমুচিত ও ন্যায্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে।

এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেকবার উইল-পরিবর্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টনের অংশ বদলাইয়াছে তাহা নহে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্তনও করিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় উইল, যাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল, তাহা হরলালকে রোহিণীর সাহায্য-প্রার্থী করিয়া রোহিণীর জীবনে একটি অভাবনীয় নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। ইহা রোহিণীর যে তীব্র মনোবৃত্তি তাহার হৃদয়-বিবরে শীতাগমনিস্তেজ, কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় সুপ্ত ছিল তাহাকে তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়া জাগাইয়া তুলিল, দংশনলোলুপ বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। এই নব-জাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্টার চক্ষে গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও তৎপ্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্য অনুতাপ তাহার তৎকালীন মনোবিকারের মধ্য দিয়া শীঘ্রই প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্তন করিতে আসিয়া রোহিণী ধরা পড়িল; এবং এই বন্দী অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহানুভূতির নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া ভাগ্যপরিবর্তনের এক নূতন সোপানে পা দিল; গোবিন্দলালের নিকট নিজ অনিবার্য প্রণয়াবেগের কথা স্বীকার

করিয়া ফেলিল। গোবিন্দলাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর রোহিণীকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জরা, নৈরাশ্য-দগ্ধ-হৃদয়া রোহিণী সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল-কর্তৃক জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জীবন-দান, এবং তাহার রোহিণী কর্তৃক আকর্ষণের প্রথম অনুভব—এই সমস্তই এক অলঙ্ঘ্য-নিয়তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল-চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িল। আবার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে উইলের শেষবার পরিবর্তন ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের বিরাগের মাত্রা পূর্ণ করিয়া নিয়তি-হস্ত-প্রেরিত ছুরিকার ন্যায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধনসূত্রের শেষ গ্রন্থিটি ছেদন করিল। পুনশ্চ, এই উপন্যাসের মধ্যে যেটি প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি, যাহা নায়ক-নায়িকার ভাগ্য-স্রোতকে নূতন পথে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা ভ্রমরের গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাস ও অভিমানের বশবর্তী হইয়া পিতৃগৃহে যাত্রা। এই কাজটিই গোবিন্দলালের দোলাচল-চিত্তবৃত্তিকে একেবারে নিঃসংশয়িতভাবে রোহিণীর দিকে হেলাইয়াছে; অথচ এই গুরুতর পরিবর্তনটি বাহিরের লোকের ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, সহানুভূতির অভাব ও পরচর্চাপ্রিয়তার দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে (২০-২৩ পরিচ্ছেদ)। ঠিক যে মুহূর্তে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের একত্রাবস্থান তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময়ে ভ্রমরের শাশুড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এমন কি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুও এমন অসময়ে ঘটিল যে, ইহাও এই পরস্পর-বিভিন্ন দম্পতির মনোমালিন্য-লোপের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল; বিরোধের যে বাষ্প প্রথম অবস্থাতে একটা ফুৎকারেই উড়িয়া যাইতে পারিত, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া আলোকরেখার দ্বারা সম্পূর্ণ অভেদ্য করিয়া তুলিল। এইরূপ সর্বত্রই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; নিয়তি যেখানে দুর্ভাগ্য মানবের জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, যেখানে বাহ্য-জগতের ঈর্ষ্যা-ক্রূর শক্তি তাহাকে অনিবার্যবেগে সেই আসন্ন বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে, বাহিরের প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর ও অধিকতর দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বাহ্য-জগতের এই ঈর্ষ্যা-ক্রূর প্রতিকূলতা, তাহার মুখে এই বক্র-উপহাসপূর্ণ হাসি আমাদিগকে বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির ironic treatment of nature-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বিষয়ে 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

আরও একটি বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষ'-এর অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী —উপন্যাসের পরিণাম-সংঘটনে। 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন অনেকটা রোমান্স-সুলভ আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিপদ্-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনন্দিনীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; সূর্যমুখী-নগেন্দ্র যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নায়ক-নায়িকা এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই। লেখক পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া, বাধার উপর বাধা স্তূপীকৃত করিয়া, ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে; তাহাদের গভীর মনোব্যথার কোন সুলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই। ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী ইহাদের প্রত্যেকের উপর দিয়াই নিয়তি তাহার নিষ্করুণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে; কোন সদয় হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার বাহিরে পথপার্শ্বে সরাইয়া রাখে নাই।

লেখক এখানে রোমান্সের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির অমোঘ পথ-রেখারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর; সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মস্পর্শী; সূর্যমুখীর একান্ত ক্ষমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী। গোবিন্দলালের শেষ বয়সে সন্ন্যাসে শান্তিলাভ -প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের সীমাবহির্ভূত; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও বিশ্বাসেরই কথা; আর উপন্যাসের বাস্তবতার যে অসাধারণ তীব্রতা, তাহা ইহার দ্বারা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিম বাস্তব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটি অতিসূক্ষ্ম রঙীন যবনিকার ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম সমস্ত বাধা-ব্যবধান সরাইয়া ফেলিয়া, অকম্পিত চক্ষুতে অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটি অসাধারণ রসপূর্ণ ও দুঃখগৌরবমণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কাব করিয়াছেন।

এখানে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করার প্রয়োজন মনে করি। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—বঙ্কিমের আর্টে অসংগতি ও অস্বাভাবিকতার উদাহরণস্বরূপ রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, রোহিণীকে ঐরূপ অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিয়া বঙ্কিম সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলাবিদের কর্তব্য বিসর্জন দিয়াছেন; রোহিণীকে বলি দিয়া সমাজ-ধর্মের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমার আর একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও আমার সহিত কথোপকথনকালে অন্য একপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়রূপ সুলভ সমাধান। সুতরাং আমি এই প্রশ্নটি যথাসাধ্য অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা করিয়া বঙ্কিমের অনুসৃত পন্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং এই আলোচনার ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাই এখানে সসংকোচে ব্যক্ত করিতেছি। আমার মত এই যে, মোটের উপর বঙ্কিম এখানে ঠিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচকেরা হয়ত তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেন নাই। শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, তিনি এই বলিতে চাহেন—বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-কাহিনীটি বেশ সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেন আজন্ম-প্রণয়বঞ্চিত', বিধবা যুবতীর পক্ষে এরূপ প্রেমপ্রবণতা একটা স্বাভাবিক ইচ্ছার বিকাশ ও ন্যায়সংগত অধিকারের দাবি মাত্র। তারপর যখন তিনি দেখিলেন যে, রোহিণীর চিত্রটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল, ও তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পাঠকের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন হঠাৎ এই চিত্রের নৈতিক ফলাফলের কথা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, এবং তিনি কলাবিদের কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলিয়া অবৈধ প্রণয়ের নৈতিক বিষময় ফল প্রদর্শন করিলেন, ও তাঁহার নিজের নীতিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ আছে ইহা প্রমাণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে তাহার মধ্যে বিশেষ জোর থাকে না; কেন-না পাপের দণ্ডমাত্রই কলাকৌশলের দিক হইতে

নিন্দনীয় নহে; যদি পাপের শাস্তি, আর্টিষ্টের নিজ অভিরুচি বা সহানুভূতির বিরুদ্ধে, আর্টের অনহুমোদিত কোন উপায়ে, একটা অতর্কিত আকস্মিকতার সহিত দেওয়া হয়, তবেই তাহাতে অনুচিত নীতিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং যদি দেখান যায় যে, বঙ্কিম প্রথম হতেই রোহিণীর প্রেমসঞ্চারকে idealise করিতে, তাহার উপরে আদর্শবাদের মায়ালোক নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই, প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে একটা বিসদৃশতা, একটা ইতর মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার রোহিণীর চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে কোন আকস্মিক পরিবর্তন হয় নাই, তাহা হইলে অন্তত: আত্যন্তিক নীতিজ্ঞানবিমূঢ়তার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য ইহা সত্বেও বলা চলিবে যে, রোহিণীর অতর্কিত হত্যা bad art বা কলাকৌশলের দিক্ হইতে নিন্দনীয়, এ আপত্তি তখনও প্রবল থাকিবে। আমি প্রথম শরৎচন্দ্রের আপত্তি খণ্ডন করিয়া, পরে এই দ্বিতীয় আপত্তির সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা রোহিণীর চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও তৎসঙ্গে বঙ্কিমের মন্তব্যগুলি যত্নপূর্বক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব যে, যদিও রোহিণীর দুরবস্থার প্রতি লেখকের দয়া বা সহানুভূতির অভাব ছিল না, তথাপি এই অবৈধ প্রেমের পথে তাহার প্রত্যেক নূতন পদক্ষেপ তাহার চরিত্রের এক একটি অপ্রীতিকর অংশ বিকাশ করিয়াছে ও লেখকের সহানুভূতির ভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া আনিয়া ক্রমশ: কঠোরতর সমালোচনাই উদ্রিক্ত করিয়াছে। রোহিণীর এই প্রেমবিকাশের মধ্যে তাহার চরিত্রের যে অংশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে —সে এই অনিবার্য নূতন উন্মেষকে কুন্দনন্দিনীর ন্যায় সলজ্জ সংকোচ ও কঠোর আত্মগ্লানির সহিত গ্রহণ করে নাই; ইহাকে দুই হাত মেলিয়া, লজ্জা-শালীনতার সীমারেখা ছাড়াইয়া, একটা উৎকট বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছে। আমরা প্রথমে দেখি যে, হরলালের একটা সামান্য প্রলোভনের ইঙ্গিতমাত্রেই যে চুরি পর্যন্ত করিতে সংকোচ বোধ করে নাই—ইহাই কি তাহার চরিত্রগত ইতরতার একটা অবিসংবাদিত নিদর্শন নহে? তারপর হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ও গোবিন্দলালের নিকট অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহার মনে অনুতাপ ও অন্যায় প্রতিকার-সংকল্প প্রভৃতি দুই একটি সদ্গুণের ক্ষণিক বিকাশ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রেমের বিক্ষুব্ধ, বাত্যাতাড়িত সরোবরেই এই পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, এবং অল্পকালের মধ্যে ইহারাও প্রেম-লালসাতেই রূপান্তরিত হইয়াছে। অতঃপর চৌর্যাপরাধে ধৃত হইয়া রোহিণী নিতান্ত লজ্জাহীনার ন্যায়ই গোবিন্দলালের নিকট নিজ প্রণয়াসক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছে, এবং লালসা-তাড়িত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবিত স্থানত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। রোহিণীর এই অসম্মতির সহিত কুন্দনন্দিনীর কলিকাতা যাইতে সম্মতির তুলনা করিলেই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। ইহার পরবর্তী ব্যাপার হইতেছে রোহিণীর বারুণী-নিমজ্জন; অবশ্য ইহাই তাহার প্রণয়-জ্বালার অসহনীয়তার একটি অভ্রান্ত প্রমাণ, এবং এই প্রণয়ের জন্য আত্মহত্যা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাহার উপরে একটা আদর্শলোকের দীপ্তি ও রমণীয়তার স্পর্শ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম এখানেও দেখাইতে ভুলেন নাই যে, একটা অবিমিশ্র উৎকট লালসাই তাহার আত্মঘাতের মূল কারণ; ইহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি কিছুই নাই।

অতঃপর তাহার কলঙ্ক-রটনার পর সে যে কাজ করিয়া বসিল, তাহাই তাহার দুঃসাহসিক, দুরন্ত ও একান্ত লজ্জাহীন প্রকৃতিটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—সে যে গোবিন্দলালের অনুগৃহীত, তাহাই মিথ্যা-প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে সে ভ্রমরের বাড়ি চড়াও হইয়াছে। এইখানে (৩২শ পরিচ্ছেদ) বঙ্কিমের মন্তব্য হইতেছে:—"রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে" ও "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি, কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না।" ইহার পর রোহিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; সে বিনা বাক্যব্যয়ে, অনুতাপের বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া, সুখের পরিবারে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া, অবৈধ-প্রণয়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এই পর্যন্ত বিশ্লেষণে আমরা যাহা পাইলাম তাহাতে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয় যে, বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়লীলাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই, এবং উহার অন্তর্নিহিত ইতরতার উপরে কোন বিশেষ প্রকারের মাধুর্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং সদ্যোজাগরিত নীতিজ্ঞান যে তাঁহার আর্টের নৌকার -মুখ সবলে ফিরাইয়া স্বাভাবিক তরঙ্গপ্রবাহের বিপরীত দিকে লইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। রোহিণীর চরিত্র-চিত্রণ-সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছার প্রথম অঙ্কুর হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত অতর্কিত পথপরিবর্তনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

এইবার দ্বিতীয় আপত্তির আলোচনা করিব—রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যু, লেখকের প্রথমাবধি উদ্দেশ্যানুযায়ী হইলেও, bad art; কেন-না এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত করেন নাই। রোহিণীর চতুর্দিকে যে জটিল সমস্যা গড়িয়া উঠিতেছিল, লেখক তাহার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া, সেই সমস্যার সুলভ' সমাধান করিয়াছেন। এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে; কিন্তু বঙ্কিমের সপক্ষে যে যুক্তি আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে এই আপত্তির প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। বঙ্কিমের পাপ-চিত্রের বিস্তৃত বর্ণনায় যে একটা স্বাভাবিক সংকোচ আছে তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি; সুতরাং রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়চিত্র যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলে তাহার মধ্যে এই আকস্মিক পরিণতির ইঙ্গিত ও পূর্বলক্ষণ পাওয়া যাইতে পারিত, উপন্যাসে আমরা সেরূপ কিছু পাই না; সেইজন্য রোহিণীর মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পাঠকের মনে এই ধারণার সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমের রচনা-প্রণালী ও পাপ-বর্ণনার প্রতি অত্যধিক বিমুখতা যে কতকাংশে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিম মন্তব্য ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনার অভাব কতকটা সারিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই মন্তব্যগুলি মনোযোগের সহিত অনুসরণ করিলে রোহিণীর পরিণামের আকস্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ পরিবর্তিত হইবে। এই বিষয়ে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মধ্যে একটু উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিম প্রলোভনের চিত্রটি সংক্ষেপে সারিয়াছেন, ও ইহার পরবর্তী অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যটির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কিন্তু তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন; এখানে প্রলোভনের চিত্রটি বিস্তারিত ও প্রায়শ্চিত্তের চিত্রটি সংকুচিত ও

সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। শেষোক্ত উপন্যাসে ভ্রমরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, রোহিণীর মৃত্যু, গোবিন্দলালের অন্তর্দাহ ও প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র বিশ্লেষণের দ্বারাই বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমের একই প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে অনিচ্ছার জন্যই এই দুইখানি উপন্যাসে এরূপ বিপরীত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ প্রায়শ্চিত্তের খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে এই দোষ হইয়াছে যে, ইহার সমস্ত স্তরের পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয় নাই, এবং উহার কার্যকারণশৃঙ্খলের মধ্যে অনেক দুর্বল গ্রন্থি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠকের ধারণা হইয়াছে। এই ধারণা অনেকটা ন্যায্য ইহা স্বীকার করিয়া আমরা বঙ্কিমের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ হইতে তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি পুনর্গঠন করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

গোবিন্দলালের উপরে রোহিণীব আকর্ষণ যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, এবং রোহিণীকে গুলি করিয়া মারা যে কেবল তাহার দৈহিক মরণ নহে, পরন্তু গোবিন্দলালের উপরে তাহার প্রভাবের অবসান—এইটি ফুটাইয়া তোলা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল। প্রণয়-তরঙ্গে ভাটা না ধরিলে, অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবে ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গোবিন্দলাল একটা বর্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিল, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এ অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অন্তর্বিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ ক্ষোভই সুরেশকে প্লেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল; এই পূর্বগামী বিক্ষোভের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষমুহূর্তের ঝম্পপ্রদানটি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দিতেছিল, স্বরুচি ও সংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। ইহা আর্টের দিক্ হইতে দোষ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ কল্পনার অপরিণত অঙ্কুর যে তাঁহার মনোমধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইবে:

"রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকী-নিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়-সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে; কিন্তু তখন সেই পূর্ব-পরীক্ষিত-স্বাদ, বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা—স্বর্গীয়-গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ, রাত্রিদিবা স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী, ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্রই মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বিশেষ বর্ননা-বাহুল্য নাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা-গুলিতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, যেন গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাঁহার কল্পনা-বিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের সর্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্যবোধ, একটা নির্দোষ ঘটনা-বিন্যাসশক্তি, ও একটা বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ যেন নিয়তির অদৃশ্য রজ্জুর এক একটি পাক; উপন্যাসটি যেমন সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনই এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়া আমাদের হৃদয়ে গভীরতরভাবে বসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যময় সাং-কেতিকতার দিকে যে প্রবণতা, তাহা এই কঠোর বাস্তব উপন্যাসেও দুই-একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গোবিন্দলাল যে মুহূর্তে রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকার দিলেন, ভ্রমর ঠিক সেই মুহূর্তে বিড়ালকে লাঠি মারিতে গিয়া নিজের কপালে লাঠি মারিয়া বসিল। জগতের এই রহস্যময় ইঙ্গিতগুলির প্রতি সূক্ষ্মদর্শিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য E. A. Poe বা Nathaniel Hawthrone-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষেণ ও উচ্ছ্বসিত কল্পনা-লীলা প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। অতি অল্প স্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্বশক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। রোমান্সের বিশাল জগৎ হইতে সামাজিক জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভা এই নূতন সংযম-বন্ধনের মধ্যে একটা অসাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দ বিহার বিসর্জন দিয়া তৎপরিবর্তে এক নূতন বিশ্লেষণ-গভীরতা অর্জন করিয়াছে। যখনই আমাদের বঙ্কিমের ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরিহার্য দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি ম্লান করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তখনই 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর স্মৃতিমাত্রই আমাদের সকল তুচ্ছ সন্দেহ নিরসন করিয়া বঙ্কিম-প্রতিভায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া দিবে। অন্তরমধ্যে এই ক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের পুনঃ-সংস্থাপনই বঙ্গসাহিত্য-পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমের নিকট বিদায় লইবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মুহূর্ত।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও প্রতিবেশমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার উপর খুব বেশি অনুভূত হয় না, তবে উভয়ের চিন্তাধারা ও জীবন-পর্যালোচনা-প্রণালীর মধ্যে কতকটা ঐক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রে যে একনিষ্ঠতার অভাব ও সংকল্পের পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার রচিত উপন্যাসেও প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার বড় উপন্যাসদ্বয়—'মাধবীলতা' ও 'কণ্ঠমালা' —উপন্যাস হিসাবে অসম্পূর্ণতা ও সমন্বয়-কৌশলের অভাবের পরিচয় দেয়; তাহাদের মধ্যে খাটি উপন্যাসের রস জমাট বাঁধে নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একপ্রকারের গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, চিন্তাশীলতার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিশ্লেষণ-পটুতা তাঁহার মনে

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির সূচনা করে, ও তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভার ব্যাহত ও প্রতিরুদ্ধ বিকাশের জন্য আমাদের মনে একটা খেদের ভাব জাগাইয়া তোলে। তাঁহার প্রতিভার বিচ্ছিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া দীপ্ত, অচঞ্চল শিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই, ইহা যেমন তাঁহার পক্ষে, তেমনি বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যের পক্ষেও, একটা গুরুতর ক্ষতি, কেন না তাঁহার বিশিষ্টতা অপর কোন পরবর্তী লেখকে বিকশিত হয় নাই।

'মাধবীলতা' উপন্যাসটি যে অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত রহিয়া গিয়াছে। সেটা যে কোন্ যুগ, কতদিন পূর্বের সমাজচিত্র তাহা আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত থাকিয়া যায়—লেখকের কাল-জ্ঞাপক ইঙ্গিতগুলির অঙ্গুলিনির্দেশও সে বিষয়ে আমাদিগকে নিঃসংশয় করিতে পারে না। রাজা ইন্দ্রভূপের সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আচরণ; তিনি আদর্শ হিন্দু রাজার ক্রিয়াকলাপ ও শাসন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন—এক প্রজাবৃন্দের নৈতিক অসমর্থন ছাড়া তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা-পরিচালনায় আর কোন প্রতিবন্ধক নাই। মুসলমান বা ইংরেজ প্রভাবের ক্ষীণতম ইঙ্গিতও গ্রন্থে অনুপস্থিত। অথচ তাহার ঠিক পরবর্তী পুরুষের যে কাহিনী আমরা 'কণ্ঠমালা'য় পাই তাহা একেবারে বর্তমান যুগের দ্বারদেশে অবস্থিত—ইহাতে ইংরেজের শাসন-প্রণালী ও রীতি-নীতি সমাজে বদ্ধমূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমাদের বর্তমান যুগের সুপরিচিত শাসনতন্ত্রের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এখানে বিরাজমান। এই দুই নিকট যুগের মধ্যে যে অযথা ব্যবধান অনুভূত হয় তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলে না। এই অসামঞ্জস্য লেখকের পটভূমিরচনায় অকৃতিত্বই সূচনা করে। 'মাধবীলতা'তে রোমান্সের অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, এক পিতম পাগলার অলৌকিক দৈবশক্তিই ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের পর্যায়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত যে দুই-একটি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-জাতীয় জীব আছে তাহারা উপন্যাসের নিতান্ত অপ্রধান পাত্র; তাহারা কোনরূপ অতিমানুষী শক্তির অধিকারী নহে। কিন্তু 'কণ্ঠমালা'য় রোমান্স-সুলভ অসম্ভাব্যতার ছড়াছড়ি। এখানে শম্ভু কয়েদি ইংরেজ-রাজত্বের কেন্দ্রস্থলে এক প্রতিযোগী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে; সেখানে ভূগর্ভস্থ গুপ্ত-গৃহ, গূঢ়তম রহস্যভেদের অতি সহজ উপায়, জেল হইতে আগম-নির্গমের অনায়াসসাধ্য ব্যবস্থা, পাপের গুরুত্ব-অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত-বিধান প্রভৃতি রোমান্সের সমস্ত সুপরিচিত গৃহসজ্জাসম্ভার প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান। একেবারে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রা-প্রণালীর সহিত এই সমস্ত মধ্যযুগ-সুলভ আবির্ভাবের যে একটা অসংগতি আছে, লেখক তাহাকে নির্বিকার-চিত্তে মানিয়া লইয়াছেন, কোনওরূপ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। মোটকথা এই উপন্যাস দুইটির সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রতিবেশ মোটেই সুস্পষ্ট হয় নাই; একটা অস্পষ্ট বাষ্প-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত হইয়া অবাস্তবতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট কেবল গল্প বলিবার সহজ, সরল, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীও আখ্যায়িকা-রচনার নিখুঁত স্থাপত্য-কৌশল প্রত্যাশা করিলে পাঠককে হতাশ হইতে হইবে, লেখকের প্রতিও অবিচার করা হইবে। আসলে গল্পলেখকের মনোবৃত্তি অপেক্ষা চিন্তাশীল দার্শনিক ও বর্ণনাকুশল শিল্পীর মনোভাবই তাঁহার প্রবলতর। গল্প বলিতে বলিতে যখনই কোন সূক্ষ্মতত্ত্বা-লোচনা বা মন্তব্য-প্রকাশের অবসর উপস্থিত হয়, তখনই তিনি পূর্ণমাত্রায় সেই অবসরের

সদ্ব্যবহার করেন, গল্পের অগ্রগতিরোধের ভাবনা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী 'পালামৌ' যে সমস্ত গুণের জন্য উপভোগ্য, তাহাই উপন্যাসের বিস্তৃততর, অথচ অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলি যেন 'পালামৌ'-এরই বর্ধিত সংস্করণ—বস্তুতঃ তাঁহার উপন্যাস-রচনার মৌলিক বীজ 'পালামৌ-এর মধ্যেই নিহিত আছে। ইন্দ্রভূপ ও চূড়াধনের প্রকৃতিবৈষম্যমূলক আকৃতিবৈষম্যের আলোচনা, হাসি ও পাগলামির প্রকৃতি-বিশ্লেষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দেহপ্রসাধনে রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের প্রাদুর্ভাবের কারণ-নির্দেশ, শ্মশ্রু-গুম্ফ রাখা-না-রাখার সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য, বাঙলাদেশের মৃত্তিকার সহিত বাঙালী প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বর্ণমালার অক্ষরের আকৃতির দ্বারা জাতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়—এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল মন্তব্যই তাঁহার প্রতিভার বিশেষ প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বঙ্গদেশের সামাজিক ও রুচিবিষয়ক ইতিহাসের প্রমাণ-সংগ্রহে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে প্রকৃতি-বর্ণনায়, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে ও চিত্ত-সমালোচনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া তোলে।

অবশ্য খাটি ঔপন্যাসিক গুণের তাঁহার যে অভাব ছিল তাহা নহে, তবে ইহার স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা অনেকটা অনিশ্চিত। তাঁহার স্বপ্নময়, অন্যমনস্ক ভাবুকতার মধ্যে পরিচ্ছেদ-বিশেষে বাস্তব-চিত্র বা চরিত্র-বিশ্লেষণের অতর্কিত সমৃদ্ধি আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। রোমান্সের স্বচ্ছন্দ, লক্ষ্যহীন বায়ু-সঞ্চরণের মধ্যে আমরা হঠাৎ এই পরিচিত জীবনের অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-বদ্ধ হৃৎ-স্পন্দন অনুভব করি। চূড়াধনবাবুর চরিত্র-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, রাজার বিরুদ্ধে জন-সাধারণের বিদ্বেষ-উৎপাদন-চেষ্টা, রামসেবকের প্রতিবাসীদের ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ ও পরনিন্দা-কুৎসায় অত্যাসক্তি, অকস্মাৎ সৌভাগ্যোদয়ে রামসেবক ও পুঁটুর মার অস্বাচ্ছন্দ্য ও হতবুদ্ধি ভাব, কলঙ্ক-রটনার পর পুঁটুর মার হৃদয়ে তুমুল, আত্মঘাতী বিক্ষোভ, জ্যোৎস্নাবতীর মুখে পিতমের পূর্ব-জীবন-বর্ণনা, 'কণ্ঠমালা'র শৈলের উন্মাদ-রোগের সূত্রপাত—এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তব-রস-সমৃদ্ধির ও বিশ্লেষণপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কণ্ঠমালা'য় বিনোদের পত্রগুলির মধ্যে একটা উদাস, সংসার-সুখে বীতস্পৃহ ভাবের সুরটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পিতম পাগলার অসম্বদ্ধ উক্তিগুলি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রান্তিকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং বাস্তবিকই তাহাদের মধ্যে একটা অতিপল্লবিত ও আত্মসচেতন সচেষ্টতা অনুভব করা যায়। তথাপি তাহারা যে একেবারে উপভোগ্য নয় সেকথাও বলা যায় না—পাগলামির নিজস্ব তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ জ্ঞানের উপলব্ধিগুলিকে এক নূতন অনুভূতি-কেন্দ্রের চারিদিকে বিন্যাস, পরিচিত সত্যের উপরে উদ্ভট কল্পনার আলোকপাত, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান সবই তাহার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় : কেবল এই সমস্তই উপাদানের সংমিশ্রণ খুব স্বাভাবিক হয় নাই।

সঞ্জীবচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য 'মাধবীলতা'র মধ্যেই স্পষ্টতরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—'কণ্ঠমালা'র উপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয়, যদিও রচনা হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস বোধ হয় পূর্ববর্তী। শৈলের পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; তবে বঙ্কিমের মাত্রাজ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার অধিকারী সঞ্জীবচন্দ্র নহেন। শৈলের পাপ অতি স্থূল ও কোনরূপ সহানুভূতির অযোগ্য ; তাহার পদস্খলনেরও কোন ইঙ্গিত তাহার শোচনীয় পরিণতির জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না। শম্ভুর 'মহাকুলীন' সম্প্রদায়-

গঠনের পরিকল্পনা 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান-সম্প্রদায়ের স্মারক—কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ যাহা কেন্দ্রস্থ সংঘটন, 'কণ্ঠমালা'য় তাহা একটা অবিশ্বাস্য, ক্ষণিক খেয়াল মাত্র, ইতিহাসের আশ্রয়হীন একটা শূন্যগর্ভ কল্পনাবিলাস। 'কণ্ঠমালা'য় সঞ্জীবচন্দ্রের নিজস্ব শক্তি বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভাবে অভিভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'—এই দুইখানি উপন্যাস অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন—আয়তনের দিক্ দিয়া প্রায় ছোট গল্পের অনুরূপ। ইহাদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের স্বভাবতঃ মন্থর-গতি বিশ্লেষণশক্তি নিজ উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় নাই। রামেশ্বরের শিশু-পুত্রের বাৎসল্যরসপূর্ণ চিত্রে ও দামিনীর কিশোরী বয়সের অকালগাম্ভীর্যের বর্ণনায় লেখকের পূর্বশক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর ইহারা চমকপ্রদ ঘটনা-বিন্যাসের সীমা ছাড়াইয়া উপন্যাসের উচ্চতর রাজ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। চন্দ্রনাথবাবু ইহাদের মধ্যে লেখকের অনভ্যস্ত, এক-প্রকার খর, উদ্দাম আবেগের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু এই উদ্দাম চাঞ্চল্য মূলত বহির্ঘটনামূলক, লেখকের আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার কম্পন ইহাতে নাই। দামিনীর মায়ের পাগলামির মধ্যে চন্দ্রনাথবাবু একপ্রকারের poetic justice বা কাব্যোপযোগী ন্যায়বিচার আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনেকটা কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। এই পাগলামি কেবল রমেশের হত্যাকার্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা তাহার পূর্বতন ব্যবহার বা কথাবার্তার সহিত সামঞ্জস্যরহিত। এই দুইটি ক্ষুদ্র রচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতি দৃঢ়তর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' বঙ্কিমআদর্শ-প্রভাবিত ও বঙ্কিম-রচনা-প্রণালী-অনুসারী ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা রাজা প্রতাপাদিত্যের কিংবদন্তীমূলক জীবন-কাহিনী অবলম্বনে ও সমকালীন ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ উপন্যাস। লেখক প্রথম খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রকে অত্যন্ত হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে উহাকে উদার ও স্নেহশীলরূপে দেখাইয়া উভয় খণ্ডের চরিত্র-কল্পনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন। গ্রন্থখানির কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি ও পরিমাণবোধসম্বন্ধীয়। ইতিহাসের অন্তহীন প্রসার ও ক্রমবর্ধমান ঘটনা-শৃঙ্খলের সমস্তটাই উপন্যাস-পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইতিহাসের যে ঘটনাগুলি উপন্যাসরসসমৃদ্ধ ও একটি বিশেষ পরিস্থিতির সুষ্ঠুরূপদানের জন্য অপরিহার্য তাহারই মধ্যে লেখকের কল্পনা ও ইতিহাসজ্ঞানকে সুবলয়িত করিতে হইবে। অবশ্য যুগ পরিচয় দানের কিছুটা প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু উহাও ঔপন্যাসিকের বিশেষ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার, কেবল তথ্যজ্ঞান-প্রকাশের অবসররূপে ব্যবহৃত হইবে না।

প্রতাপচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এই মৌলিক শর্ত মানেন নাই। তিনি ইহাতে নানা অপ্রয়োজনীয় চরিত্র ও ঘটনার ভিড় জমাইয়া নিজ মূল উদ্দেশ্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে প্রতাপের ভাগ্যবিপর্যয় ও যুগচরিত্র ফুটাইবার জন্য স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি নর-নারীর প্রয়োজন—যথা জয়ন্তী-রাজপুত্র সূর্যকুমার, পর্তুগীজ জলদস্যু গঞ্জালেশ, প্রতাপের খুল্লতাত-পুত্র-

কচু রায়, তাঁহার শাস্তিবিধায়ক, নিয়তির অস্ত্রস্বরূপ রাজা মানসিংহ ও স্ত্রী-চরিত্রদের মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত পত্নীদ্বয় বিমলা ও কমলা ও বিমলার পালিতা কন্যা ইন্দুমতী। কিন্তু গ্রন্থকার উপন্যাসে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় পার্শ্ব-চরিত্রের প্রবর্তন করিয়া গ্রন্থের যে পরিমাণ কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন উহার কলাগত সঙ্গতি ও পরিমাণবোধও সেই পরিমাণে ক্ষুন্ন করিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্রের বিরাট গ্রন্থটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে মাত্রাজ্ঞানের অভাব ও উপকরণের অবিন্যস্ত অতিপ্রাচুর্যের প্রমাদময় স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ সাহিত্যের জীবন্ত ইতিহাস-ধারা হইতে অপসৃত হইয়া বিস্মৃত পুথির ধূলিমলিন সংগ্রহশালায় শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা আরও প্রমাণ করিয়াছে যে, এইজাতীয় উপন্যাসে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা লেখকের কল্পনাকুশলতা ও প্রাণসঞ্চারদক্ষতা, উপকরণ-সংগ্রহ, পাণ্ডিত্য-প্রকাশক ঘটনা-বিস্তার নহে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্কিম-যুগে আর একজন ঔপন্যাসিক– তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩—১৮৯১) তাঁহার একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসে বাঙালী সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের করুণরসপ্রধান ও ধর্মনীতিমূলক আখ্যানকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে ত্রিবিধ আকর্ষণ-সূত্র অনেকটা শিথিল গ্রন্থনে পরস্পর-সংসক্ত হইয়াছে। প্রথম, পারিবারিক জীবনে ভ্রাতৃবিরোধ ও দাম্পত্য সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ, দ্বিতীয়, পথিক জীবনের বিচিত্র আকস্মিকতা ও উদ্ভট অভিজ্ঞতা; তৃতীয়, অনুকূল দৈব সংঘটনের সহায়তায় পাপের শাস্তি ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং উপন্যাসখানি একদিকে বস্তুধর্মী, অপরদিকে নীতিতে আস্থাশীল ও রোমান্স-কৌতূহলী। অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালী মানসিকতায় যে বাস্তব দুঃখ ও দৈবনির্ভরতার বিপরীত-জাতীয় উপাদান মিশ্রিত ছিল, উপন্যাসে তাহারই সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে। তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উন্নত ভাবকল্পনা-মূলক রোমান্সের প্রতি বিমুখতা দেখাইলেও দৈবানুগ্রহভিত্তিক অপ্রত্যাশিত সংঘটনকে মানিয়া লইতে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না ও অবিমিশ্র বাস্তবতার সঙ্গে ইহার যে-কোন বিরোধ থাকিতে পারে তাহাও তিনি মনে করেন নাই। সুতরাং বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য অনেকটা রোমান্সের স্তরভেদ ও রোমান্স-বাস্তবের সংমিশ্রণে কলাবোধের আপেক্ষিক অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সে যাহাই হউক, বঙ্কিম-যুগে বাস করিয়া, বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ-জ্যোতির্মণ্ডল-বেষ্টিত হইয়াও, তিনি যে খানিকটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি ঠানদিদির রূপ-বর্ণনায় বঙ্কিমী রীতির প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করিয়াছেন। আখ্যান-বিবৃতির মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা ও ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীটি সুখপাঠ্য ও নানা কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র ও প্রসঙ্গের সন্নিবেশে উপভোগ্য, কিন্তু কোথাও গভীর মনস্তত্ত্ব জ্ঞান, চরিত্র-বিশ্লেষণ বা দৃশ্য-বর্ণনায় স্মরণীয় কলাকৌশল দেখা যায় না। শশিভূষণ ও বিধু-ভূষণের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ যেরূপ তুচ্ছ কারণে ও অবলীলাক্রমে ঘটিয়াছে তাহাতে উহাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধন যে কখন সুদৃঢ় ছিল এরূপ ধারণা হয় না। প্রমদা ও সরলা উভয়েই

শ্রেণী-প্রতিনিধি, ব্যক্তিত্বভাস্বর নয়, তবে প্রমদার কুটিল ও সরলার সরল, সহিষ্ণু প্রকৃতিটি শ্রেণীগত গণ্ডির মধ্যেই স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। গদাধরচন্দ্র ও নীলকমল উৎকেন্দ্রিকতার পাজী ও নিরীহ এই দুই প্রকার শ্রেণীর নিদর্শন। তবে গদাধরচন্দ্র উপন্যাসমধ্যে সক্রিয় আর নীলকমল একেবারে কাহিনীর সহিত অসংশ্লিষ্ট ও নিছক হাস্যরস-স্ফুরণোদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। যে স্বর্ণলতার নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে, তাহার উপন্যাস-কাহিনীতে সেরূপ প্রাধান্য নাই। উহার নাট্যরূপ 'সরলা'তে সরলাকে নায়িকাপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গোপাল ও স্বর্ণলতার পরিচয় সম্পূর্ণভাবেই আকস্মিক ও উহাদের প্রণয়-সঞ্চার ও বিবাহ অনেকটা রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। উপন্যাসে আকস্মিকতার বাহুল্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্ণলতার জোর করিয়া বিবাহ দিবার চেষ্টা ও হঠাৎ শশাঙ্কর ঘরে আগুন লাগায় তাহার উদ্ধার ও শশিভূষণের অবস্থা-বিপর্যয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন উপন্যাসটির উপসংহার হইল তখন দেখা গেল যে, সকল অপরাধীর দণ্ড হইয়াছে ও সকল সাধুপুরুষ সাংসারিক সচ্ছলতা ও মানসিক শান্তি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসখানি শেষ করিয়া আমাদের যে মনোভাব হয়, তাহা রূপকথা-পাঠের পর শিশুসুলভ তৃপ্তির সহিত তুলনীয়।

তথাপি বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন-ধারায় 'স্বর্ণলতা'র একটি গুণগত-উৎকর্ষনিরপেক্ষ মর্যাদা আছে। প্রতিভার দীপ্ত কক্ষপথে পরিক্রমা করিবার শক্তি উহার অনুচরদের মধ্যে খুব কম লোকেরই থাকে। কিন্তু প্রতিভার একটি অপেক্ষাকৃত ম্লান রশ্মিটি দিয়া অনেকেই তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহকোণের প্রদীপটি জ্বালাইতে পারে। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস তো তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংহরণ করিল—সেই মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র চালনার অধিকারী কেহ রহিল না! তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের নিগূঢ় মর্মবাণী ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য অনুরঞ্জন তাঁহার পরবর্তীদের নিকট অনধিগম্যই রহিয়া গেল। কিন্তু উহার বাহিরের কাঠামোটি ও স্থূল, অতিপ্রত্যক্ষ সংঘর্ষটি ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় বিবরূপেই প্রতিভাত হইল। এই জাতীয় উপন্যাসে অন্তর-সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা যেমন হ্রাস পাইল, উহার সমাধানটিও তেমনি সুলভ হইল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই নূতন ধারার পথিকৃৎ। তিনিই বঙ্কিমের প্রতিভার বিমিশ্র জটিলতা, বিচিত্রউপাদান-গঠিত অপূর্ব শিল্পসুষমা হইতে একটি মাত্র উপাদান পৃথক করিয়া উহাকে বাঙালীসুলভ সহজ জীবনপ্রীতি ও কোমল ভাব রমণীয়তায় অভিষিক্ত করিয়া পরবর্তী-যুগের ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করিলেন ও এই ধারা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে উহার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

রমেশ, বঙ্কিম ও সঞ্জীব—এই তিনজন প্রতিভাবান লেখককে লইয়াই বঙ্কিম-যুগের পরিসমাপ্তি। অবশ্য পরবর্তী যুগেও বঙ্কিমের অনুকরণের জের চলিয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত অনুকরণ-প্রচেষ্টার মধ্যে অক্ষমতারই প্রচুর নিদর্শন মিলে; তাহারা যেন প্রতিভার স্ফুলিঙ্গহীন শুষ্ক অঙ্গাররাশি মাত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের প্রাদুর্ভাব ও রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ।

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)

(১)

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছে। যাহাকে আমরা আধুনিক বা অতি-আধুনিক যুগ নামে অভিহিত করি, তাহার সূচনা বঙ্কিমের পরবর্তী যুগে। এই যুগের প্রবেশতোরণে যে নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের। প্রধানতঃ দুইটি লক্ষণের দ্বারা এই যুগ-পরিবর্তন সূচিত হইতেছে—(১) ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব; (২) সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্তন।

(১) বঙ্কিমচন্দ্র যে অদ্ভুত শক্তির সহিত কল্পনা ও তথ্য মিশাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, সে শক্তি কোন পরবর্তী লেখক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন নাই। যে মন্ত্রবলে তিনি অতীতের সিংহদ্বার খুলিয়া বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সে মন্ত্ররহস্য তাঁহার সহিতই লোপ পাইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।* বঙ্কিমের অন্ধ ও অক্ষম অনুকারিগণ তাঁহার প্রণালীর রহস্যটি মোটেই ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাস তাহাদের হাতে প্রাণহীন হইয়া উহার গৌরবময় উদ্দীপনা হারাইয়াছে; রোমান্স আতিশয্যদুষ্ট ও কল্পনাস্ফীত হইয়া একেবারে অপ্রাকৃতের চরম সীমায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিম যেরূপ সুকৌশলে ইতিহাস, রোমান্স ও বাস্তবজীবনকে এক-সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন, অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাদের একটা সুন্দর সমন্বয়-সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তীদের মধ্যে সেই গুণের একান্ত অভাব। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদের সমাজ-জীবনের চিরন্তন অভাব কল্পনার প্রভাবে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া একপ্রকার অসাধ্য সাধন করিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ-সাধনের দুরূহতা ও অতীত ইতিহাসের জীবন-স্পন্দনের সহিত আমাদের একান্ত অপরিচয় সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাসের পথে অনতিক্রমণীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমের পরবর্তী কোন প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিকই তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিকতার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই এবং যাতায়াতের অভাব-জন্য সেই পথের রেখা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নতা হারাইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান-বলে বঙ্কিম-প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও

---

* অবশ্য অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকগোষ্ঠী ঐতিহাসিক উপন্যাসে নূতন আগ্রহ দেখাইয়াছেন ও ঐ লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে পুনঃপ্রবাহিত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তথাপি পূর্বোক্ত মন্তব্য মূলতঃ যথার্থ।

ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন। যদিও বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসে তাঁহার বাস্তবপ্রবণতা অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যেও রোমান্সের দীপ্তি ও উত্তেজনা আনিবার জন্য লেখকের একটা বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'বিষবৃক্ষ'-এ সূর্যমুখীর আকস্মিক অন্তর্ধান ও অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাব রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানি, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পিস্তলের শব্দটি রোমান্সের ক্ষীণ নিঃশ্বাসবায়ুরূপেই আমাদিগকে স্পর্শ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হইতে এই রোমান্সসুলভ আকস্মিকতার ক্ষীণ ইঙ্গিত ও আভাসগুলিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহ্য বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ সংঘটনের পরিবর্তে তাঁহার উপন্যাসে যে রোমান্স পাওয়া যায়, তাহা আরও উচ্চ ও গভীর স্বরের—তাহা প্রকৃতির সহিত মানব মনের সুগভীর ভাববিনিময়, আত্মসমাহিত চিত্তের ধ্যানমগ্ন বিহ্বলতা, সৌন্দর্যের অসীম-প্রসারিত, অতলস্পর্শ রহস্যের চকিত উপলব্ধি প্রভৃতি রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি 'নৌকাডুবি' বা 'গোরা'র মত উপন্যাসে—যেখানে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘটন আমাদিগকে বিস্ময়কর পরিণতির প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখে, সেখানেও —রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাভাবিক আশার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বাস্তব ফলাফলের বিশ্লেষণের প্রতি জোর দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে রোমান্স আছে তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অন্তর্মুখী, বাহ্য বৈচিত্র্যের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী। এইখানে উপন্যাস-সাহিত্য অতীতের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া এক নূতন পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণেই ইহাদের প্রধান রস, অন্তরের প্রবৃত্তিসমূহের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও সংঘাত-বর্ণনাতেই ইহাদের মুখ্য আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের উপন্যাসে রোমান্সের অবসর কত অল্প এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জোর করিয়া অসাধারণত্ব আরোপ করিতে গেলে অস্বাভাবিকতাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে। বঙ্কিম তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও কল্পনার রঙ্গিন আলো ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বৈধ ও অবৈধ যে-কোনো উপায়েই হউক জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শলোকের আলোকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সহজ ধারা প্রবাহটির অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের জীবনের স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেইগুলিতেই আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা যে অল্প অথবা অগভীর, তাহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে—তবে তিনি অন্তর্দৃষ্টিবলে একটি বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া খুব অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; দীর্ঘকালব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের একটা সাধারণ সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা আভ্যন্তরীণ বিরোধের চিত্রটি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের গ্লানি ও বিরোধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চিত্রটি আরও অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন ও পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্বাচিত তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে বাস্তবতার ভাবটি দৃঢ়তরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই রোমান্স ও বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।

সুতরাং এই বাস্তবতার প্রবর্তনেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রথম পরিচয়। এই বাস্তবতার সুরই আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। ইহাই ক্রমশঃ তীব্রতর ও উগ্রতর হইয়া, বিদ্রোহের সুরটি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠাইয়া, অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শে প্রচলিত নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুলিয়া সমগ্র উপন্যাস-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের উপন্যাসেও বাস্তবতার এই বিশেষ পরিণতি, এই বিদ্রোহাত্মক রূপের সূচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থের শেষ অংশে এ বাস্তবতার প্রকৃতি ও সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই গভীরতর বাস্তবতাই বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের প্রধান হেতু ও উপন্যাস-ক্ষেত্রে নবযুগ-প্রবর্তনের সুস্পষ্ট সূচনা।

(২)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত নহে। তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত ও সেই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভা-যাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ প্রতাপাদিত্যের রুদ্র মূর্তি ও হিংস্র-ভীষণতা অপেক্ষা বসন্তরায়ের আনন্দ-বিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ জীবন-কাহিনী আমাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবনপাত্র যে করুণ-মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—যে উদাস বিরহ-ব্যথাতুর রাগিণী তাঁহার গীতিকবিতায় এরূপ মনোহরণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নহে—সংসারের নির্মম ক্রূরতা, যাহা আততায়ীর মত আমাদের সুখ-শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে ও আমাদের সুকুমার সৌন্দর্যপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দয় পেষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্তি মাত্র। সেইরূপ 'রাজর্ষি'তেও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটি আত্মার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্যই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মোগল-সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার রাজধানী—এ সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক-ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজির মত চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের জনশূন্য প্রান্তরের উপর রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার অর্থহীন কোলাহল ও ব্যর্থতর প্রচেষ্টার পশ্চাতে এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি নীরবে স্থির হইয়া আছে। এক বালিকার করুণ, কোমল হৃদয় ও একটি শিশুর অর্ধোচ্চারিত, অস্পষ্ট কথা তাঁহাকে সংসারের সাধারণ কর্মপ্রবাহ হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে ও তাঁহার গভীরতম অন্তরে যে শান্তির মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে অবিরত বারিসেকের দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই দুইখানি

উপন্যাসে ইতিহাস এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রসে ভরপূর হইয়া তাহার কঠিন বস্তু-তন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই সমস্ত মন্তব্য হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ ও 'রাজর্ষি'তে উপন্যাসের বিশেষত্ব সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। এই উপন্যাসে লেখকের মনোবৃত্তি ও কার্যপ্রণালী ঔপন্যাসিকের মত নহে। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ উভয়েই নিতান্ত সহজ, অগভীর ও জটিলতাবর্জিত। প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য, প্রভৃতি সকলেই যেন এক-একটি অবিমিশ্র গুণের প্রতিমূর্তি, কোন বিরোধী উপাদানের সমন্বয় তাহাদের চরিত্রকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে নাই। এমন কি যে দুইটি চরিত্র-চিত্রণে লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি ও বিশ্লেষণকুশলতা নিয়োগ করিয়াছেন সেই রাজা ও রঘুপতি ও ঠিক উপন্যাসোচিত প্রসার ও নমনীয়তা (flexibility) লাভ করে নাই। তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় যেন কবি-প্রতিভার ক্ষণিক বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে, উপন্যাসের প্রখর সূর্যালোকে নহে। তাহাদিগকে আমরা যত বারই উপন্যাসের মধ্যে দেখি না কেন, তাহারা কখনই প্রথম পরিচয়ের অস্পষ্ট কুহেলিকা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; তাহাদের মুখের যে অংশ লেখক আমাদের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন শেষ পর্যন্ত সেই খণ্ডাংশেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। রঘুপতির চরিত্রে লেখক অনেকটা জটিলতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—দ্বিধাহীন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মক্ষেত্রে রাজ-শক্তির অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ, ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা ও নির্মম ক্রূরতার সহিত জয়সিংহের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও রমণীসুলভ কোমলতা তাহার চরিত্রে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় ধারা মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। রঘুপতি-চরিত্রের এই দুইটি দিকের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহার উপর জীবনের সুগভীর, রহস্যময় সমন্বয় কোন সংযোগ-সেতু রচনা করে নাই। নক্ষত্ররায়ের নির্বুদ্ধিতা ও পরমুখাপেক্ষিতা একেবারে অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্ন; ইহার নগ্ন আতিশয্য কেবল হাস্যরসের ও ঘৃণার উদ্রেক করে। তবে সিংহাসন-লাভের পর তাহার চরিত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাই লেখকের ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণ-শক্তির একমাত্র পরিচয়। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগুচ্ছ 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যেমন, সেইরূপ তাঁহার প্রথম দুইখানি উপন্যাসেও, একটা অসমাপ্ত সৃষ্টি-কার্যের লক্ষণ প্রচুরভাবে বিদ্যমান—কবিতা বা উপন্যাসের বিশেষ রূপ ও আকৃতিটি স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।

যে সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) উপন্যাসটি রোমান্সের ন্যায় একটি বিস্ময়কর সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দৈব-বিপর্যয়ে রমেশ ও কমলা পরস্পরের সহিত দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে ফেলা যায় না; আবার নলিনাক্ষ ও কমলার পুনর্মিলনের মধ্যেও দৈবের অঙ্গুলি-সংকেত একটু বেশি রকম সুস্পষ্ট। যে ভ্রান্তি-যবনিকা রমেশ ও কমলার মধ্যের সম্বন্ধটি সত্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে তাহার অপসারণ একটু অনাবশ্যকরূপেই বিলম্বিত হইয়াছে। রমেশের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পক্ষে এই ভ্রান্তি-নিরসন নিতান্তই সহজ ছিল, দুই চারিটি কৌতূহলী প্রশ্নেই সমস্ত জটিলতার মর্মচ্ছেদ হইতে পারিত। সুতরাং উপন্যাসটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত অংশ একটু অনুচিত রকম বেশি এবং এই হিসাবে ইহা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ঘটনাবিন্যাস

বাদ দিলে লেখকের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন বাস্তবতার পথ অবলম্বন করিয়াছে। নৌকা-যাত্রার প্রত্যেকটি দিনের নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনাতে, প্রেমোন্মুখ অথচ অভিমানপ্রবণ কমলার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণে ও রমেশের প্রণয় ও কর্তব্যবুদ্ধির সংঘাতের চিত্রণে রমেশ ও কমলার মধ্যে সম্বন্ধটি খুব মধুর ও জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। উপন্যাসটি আগাগোড়া একটি মৃদু, স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে—ইহার লঘু, চপল প্রবাহ কোথাও গভীর আবর্তের দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। ইহার মধ্যে কোথাও খুব গভীর সুর ঝংকৃত হয় নাই বা খুব জটিল বিশ্লেষণের চেষ্টা নাই। রমেশ, কমলা, অক্ষয়, যোগেন, অন্নদাবাবু, চক্রবর্তী-খুড়া খুব সরল (বিশ্লেষণের দিক্ হইতে) ও স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ—ইহাদের মধ্যে কোন গভীর আলোড়ন বা বিক্ষোভের অবকাশ নাই। কোন বিশেষ দৃশ্যও গভীর ঘাত-প্রতিঘাতের বা রহস্য-গূঢ় উপলব্ধির পরিচয় দেয় না। যেখানেই হৃদয়-সংঘাত আসন্ন-বর্ষণ মেঘের মত একটা প্রগাঢ় সংকটময় পরিণতির লক্ষণ দেখাইয়াছে, সেখানে লেখক হাস্য-কৌতুকের বিশৃঙ্খল বাতাস বহাইয়া তাহার অশ্রু-ভারাকুল গাম্ভীর্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া প্রতীক্ষার গুরুভারের লাঘব করিয়াছেন। নৌকা-যাত্রার নির্জনতায় রমেশ ও কমলার সম্পর্কটি যখন একটা অসংবরণীয় পরিণতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখন লেখক কোথা হইতে উমেশ ও চক্রবর্তী-খুড়াকে আমদানি করিয়া সংকট কাটাইয়া দিয়াছেন ও গল্পের সবল প্রবাহকে বাধামুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি হেম-নলিনীর মিলন ও বিদায়ের দৃশ্যগুলিও খুব উঁচু সুরে বাঁধা হয় নাই—তাহাদের মিলনে নিবিড় আনন্দ ও বিরহে পরিপূর্ণ দুঃখের অতলস্পর্শ ব্যাকুলতা নাই।

চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক দিয়া গ্রন্থমধ্যে হেমনলিনীর স্থানই সর্বোচ্চ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে আমরা যে জাতীয় নায়িকার সহিত পরিচিত হই, হেমনলিনীই সেই সুপরিচিত type-এর প্রথম উদাহরণ। সে 'গোরা'র সুচরিতা, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও 'যোগা-যোগ'-এর কুমুদিনীর পূর্ববর্তিনী—শান্ত, সংযত, নীরব, একনিষ্ঠ প্রেমে আত্মসমাহিত, কোমল, অথচ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন। এই জাতীয় নায়িকারা একদিকে যেমন তাহাদের চারিদিকে একটি মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে, সেইরূপ অপরদিকে একটা উত্তেজনাহীন অন্তঃসঞ্চিত শক্তির আভাস দেয়। অবশ্য হেমনলিনীর চরিত্রে সুচরিতার পূর্ণতা, লাবণ্যের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও সুগভীর আত্মজিজ্ঞাসা বা কুমুদিনীর কবিত্বময় নারী-সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ নাই। সে সুচরিতার একটা অপরিণত সংস্করণের মত রহিয়া গিয়াছে—সে গ্রন্থের শেষ দিকে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, "আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে" পাঠকের চিত্তও তাহারই সমর্থন করে। সে প্রণয়িনীরূপে প্রেমের অনির্বচনীয় গৌরবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, নলিনাক্ষের শিষ্যা ও ভাবী স্ত্রী-রূপেও তাহার আকৃতি অস্পষ্টতার কুহেলিকাজাল কাটাইয়া উঠে নাই—কেবল পিতা-পুত্রীর মধুর অথচ সূক্ষ্ম সহানুভূতিময় সম্পর্কের মধ্য দিয়াই সে আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম অংশে কমলা-চরিত্র খুবই জীবন্ত। তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ রমেশের দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহজনক ব্যবহারে প্রতিহত হইয়া স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির আকারে রূপান্তরিত হইয়া নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছে। রমেশের প্রতি তাহার ব্যবহারে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। শৈলজার সহিত সখীত্ববন্ধনে

বদ্ধ হইয়া সে নিজের প্রেমের অবাস্তবতা ও অপূর্ণতা আরও স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছে ও অল্পে অল্পে রমেশের প্রতি একটা প্রগাঢ় বিমুখতা তাহার পূর্ব প্রণয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে ; তাহার জীবনের যে চরম সংকটময় মুহূর্ত—যখন হেমনলিনীকে লিখিত রমেশের পত্রে তাহার জীবনের লজ্জাকর রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে—তাহার বিশ্লেষণে আশানুরূপ গভীরতা ও আবেগের অভাব লক্ষিত হয়। যে আবিষ্কার বজ্রপাতের ন্যায়ই তাহার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত ও সংজ্ঞাহীন করিতে পারিত, তাহা যেন সামান্য সূচিবেধের ন্যায়ই অনুভূত হইয়াছে। তাহার পর কমলা যেন তাহার স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি হারাইয়া, তাহাকে স্বামি-পরিবারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চক্রবর্তী-পরিবার যে স্নেহময় চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া গিয়াছে ও অনেকটা যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত হইয়া গিয়াছে। নলিনাক্ষকে পাইবার আগ্রহাতিশয্যেই সে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে নলিনাক্ষ মোটেই ফোটে নাই—সে যেন বক্তার ও ধর্ম-প্রচারকের উচ্চ-মঞ্চ হইতে সাধারণ জীবনের সমতলভূমিতে কোন দিনই অবতরণ করে নাই। তাহার মাতৃভক্তির দিকটাও তাহার মধ্যে রক্তমাংসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। ক্ষেমঙ্করীর নিগূঢ় পুত্রাভিমান ও হেমনলিনীর প্রতি বিরাগ তাহার আচারপূত হিন্দু বিধবার চরিত্রে কতকটা বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে। রমেশ অনেকটা 'গোরা'র বিনয়ের সমশ্রেণীভুক্ত, তাহার সমস্যা তাহার শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত সিন্ধবাদ নাবিকের ন্যায় সে তাহার বোঝা ফেলিতে পারে নাই, আবার দৃঢ় সহিষ্ণুতার সহিত বহিতেও পারে নাই। হেমনলিনী ও কমলা-ঘটিত তাহার সমস্ত ব্যবহারই দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতায় টলমল। তাহার জীবন-সমস্যার সমাধানের সে কোন সহজ ও সরল উপায় অবলম্বন করে নাই, দৈবানুকূল্যের উপর একটা শঙ্কিত, অস্থির নির্ভরই তাহার প্রধান প্রচেষ্টা। কমলাকে বোর্ডিংএ রাখিয়া সে বিরক্তিকর বর্তমানকে চক্ষুর আড়াল করিয়াছে ও হেমনলিনীর উদ্বেগজনক প্রেম, অক্ষয়ের অশ্রান্ত খোঁচা ও অন্নদাবাবুর টেবিলে চা সমান অন্ধতার সহিতই গলাধঃকরণ করিয়াছে। হেমনলিনীর সহিত বিবাহের পূর্বে তাহার রহস্য-উদ্‌ঘাটনে অনিচ্ছার কোন সংগত কারণ পাওয়া যায় না—ইহাও তাহার চরিত্রগত দুর্বলতার অভিব্যক্তি মাত্র। স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাওয়ার এই প্রবৃত্তিই তাহার সহজ ভদ্রতা ও চরিত্র-সংযমের উপর বিশেষত্ব আনিয়া দিয়াছে।

মোটের উপর একটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, 'নৌকাডুবি' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ইহার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে ও নূতন ধরনের বাস্তবতাপ্রধান উপন্যাসের উদাহরণ বলিয়া উপন্যাস-সাহিত্যে ইহার স্থান যথেষ্ট উচ্চ।

(৩)

'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র পূর্ববর্তী হইলেও, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে 'নৌকা-ডুবি' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক অনন্যপূর্ব গভীরতা ও কৌশল দেখাইয়াছেন। 'নৌকাডুবি'র সরল-সহজ, একটানা প্রবাহের সহিত তুলনায় এখানে পদে পদে সংঘাত ও গভীর ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। আকস্মিকতার

স্থানে সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য কার্যকারণ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সমস্ত পরিবর্তনের স্রোত চরিত্রগত গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী ও আশা—এই চারিজনে মিলিয়া তাহাদের চারিদিকে যে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্রগত বিশেষত্ব একটি বিশেষ রকমের গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল এবং সেই সমস্ত অবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মহেন্দ্র ও বিনোদিনী গূঢ় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই এই ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রস্থ শক্তি; কিন্তু ইহার মধ্যে বিহারী ও আশাও তাহাদের সবল ও দুর্বল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নূতন জটিলতার সঞ্চার করিয়াছে। বিহারীর সবল, একনিষ্ঠ চিত্ত বিনোদিনীকে আকর্ষণ করিয়াছে; এবং তাহার অবজ্ঞাসূচক, কঠোর প্রত্যাখ্যান এই আকর্ষণকে অনিবার্য বেগ ও ব্যাকুলতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার বিহারীর মনের নিভৃততম কোণে আশার প্রতি যে গোপন অনুরাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহাই বিনোদিনীর ঈর্ষ্যাগ্নিতে নূতন ইন্ধন দিয়া তাহাকে আশা ও মহেন্দ্রের সর্বনাশ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছে। আশার সরল বিশ্বাস ও স্বভাবসিদ্ধ শিথিলতা মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে অবসর ও সুযোগ প্রদান করিয়া বিপদকে ঘনীভূত করিয়াছে; এবং বিহারীর প্রতি তাহার বিবেচনাহীন, প্রবল বিরাগ বিহারীকে কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমাভিনয়কে একেবারে বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। আশার প্রতি বিহারীর প্রেম মহেন্দ্রের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ও বিহারীর কল্যাণকামী মধ্যস্থতাকে প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা করিতে মহেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে। এইরূপে এই চারিজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সূক্ষ্ম ও জটিল শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়া একটি চমৎকার ঐক্য ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

এমন কি রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণাও এই গ্রন্থিসংকুলতার মধ্যে নূতন ফাঁস যোজনা করিতে সাহায্য করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থপরতা মহেন্দ্রের স্বার্থপরতার স্ত্রী-সংস্করণ মাত্র। মাতাপুত্র উভয়েই একছাঁচে ঢালা—মাতার পুত্রসর্বস্বতাই পুত্রের নির্লজ্জ, অসংযত ভোগলিপ্সার মূল উৎস। রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে বিনোদিনীর মন্তব্য তাহার চরিত্রের উপর একটি অপ্রত্যাশিত, শিহরণকারী আলোকপাত করে—বধূর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া মাতা বিনোদিনীর দ্বারা পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্গম-অভিমান-প্রবণ রাজলক্ষ্মীই তাঁহার গৃহাঙ্গনে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সদা-জাগ্রত সূক্ষ্ম অনুভূতি যে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ক্রম-বর্ধমান অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে নাই—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বধূর প্রভাব স্বহস্তে খর্ব করিয়া যখন তিনি সেই দুর্বল শৃঙ্খলের দ্বারা পুত্রের দুর্দমনীয় মনোবৃত্তিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন সেই চেষ্টার মধ্যে একটা করুণ দিক্ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটের উপর তাহা পাঠকের মনে সহানুভূতি অপেক্ষা তীব্র ব্যঙ্গের ভাবেরই উদ্রেক করে। অন্নপূর্ণার অবস্থাসংকটও এই জটিলতার সূত্র পাকাইতে সহায়তা করিয়াছে। অন্নপূর্ণা আশার মাসী বলিয়াই রাজলক্ষ্মীর অভিমান-জ্বালা বেশির ভাগ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইয়াছে—অপক্ষপাত বিচার করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। মহেন্দ্রের লঘু অপরাধে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনি সংসার হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কাশীবাসের দ্বারাই মহেন্দ্রের গুরু অপরাধের দ্বার প্রশস্ততর করিয়া দিয়াছেন।

মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক হইতে উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। আশার প্রতি সর্বগ্রাসী, আত্মবিস্মৃতিকর প্রেমে মহেন্দ্র সর্বপ্রথম বিনোদিনীর অস্তিত্বকেই আমল দেয় নাই—তাহার সহিত সহজ ভদ্রতার সম্ভাষণটুকু করিতেও বিরত ছিল। আশাকে মহেন্দ্রের বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণু প্রণয়ের নিকট কতকটা দুষ্প্রাপ্য করিয়াই প্রথম বিনোদিনী বিরক্তিকরভাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তারপর আশার নির্বন্ধাতিশয্যে ও চতুরা বিনোদিনীর স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতায় মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রথম পরিচয়ের আরম্ভ হইল। ইহার পর বিনোদিনীর কঠোর আত্মশাসনের নিকট মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিল। সে প্রেমের নহে, কতকটা আত্মাভিমানের বশবর্তী হইয়াই বিনোদিনীর সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিতে উদ্‌যোগী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিনোদিনী তরুণ দম্পতির প্রিয় সখী হইয়া উঠিল, তাহার হাস্যরস-পরিহাস, মনোরঞ্জন শক্তি ও সেবাকুশলতার দ্বারা উহাদের প্রণয়ের অবসাদ ঘুচাইয়া উহাকে নবীন সঞ্জীবনরসে ভরপুর করিয়া তুলিতে লাগিল। এখন পর্যন্ত মহেন্দ্রের মনে বিনোদিনার প্রতি কোনরূপ অনুচিত আকর্ষণের সঞ্চার হয় নাই—সে এখনও তাহাকে আশার পশ্চাদ্‌বর্তিনী করিয়াই দেখিয়াছে। কিন্তু এই সময় বিহারীর তীক্ষ্ণ সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি একটু গোলযোগের সূত্রপাত করিল, সকলের বিশেষতঃ মহেন্দ্রের মনে একটা অপার্থিব কদর্য সম্ভাবনার কথা জাগাইয়া দিয়া তাহার আত্মপ্রসাদের স্বচ্ছ প্রবাহ কতকটা পঙ্কিল করিয়া তুলিল। বিনোদিনীর কয়েক ফোঁটা অশ্রুর কৌশলময় অভিনয়ের দ্বারাই এই সন্দেহের প্রথম কলঙ্কস্পর্শ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

ইহার পর মহেন্দ্রের সচেষ্টতার পালা—তাহার ঔদাসীন্য বিনোদিনীর সচেষ্ট অনুসরণে রূপান্তরিত হইয়াছে। দমদমে চড়ুইভাতির আয়োজন এই নব পরিবর্তনের প্রতীক। এই দিনটি মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীর জীবনেতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিনের ঘটনাবলীর ফলে বিহারীর মূল্য বিনোদিনীর চক্ষে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বাল্যস্মৃতির দূরদিগন্তের মায়াময়, শীতল প্রলেপে তাহার ঈর্ষ্যা-কলুষিত, খর-জ্বালাতপ্ত প্রণয়-বিকার কাটিয়া গিয়া প্রেমের স্বভাবস্নিগ্ধ প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই নবজাগ্রত প্রেমের স্থির, অনুদ্‌ভ্রান্ত আলোকে সে বিহারীকেই নিজ জীবনের পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া চিনিয়াছে।

এইবার মহেন্দ্র নিজ হৃদয়-তন্ত্রীতে সত্যকার টান অনুভব করিয়াছে, কিন্তু ইহাও ঠিক প্রণয় নহে, বিহারীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিহারীর নিকট পরাজয়ের ধিক্কারই তাহার সমস্ত শক্তিকে বিনোদিনীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে—বিনোদিনীকে ভালবাসিয়া নহে, তাহার উপর নিজ দখলী-স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য। আশার প্রণয়-মোহ ছিন্ন হইলে পর তাহার ত্রুটি-অপূর্ণতার দিকে মহেন্দ্র প্রথম সজাগ হইয়াছে ও বিরক্তি-মিশ্রিত ভর্ৎসনা মুগ্ধপ্রেমের একস্বরা কপোত-কূজনের মধ্যে একটি তীব্র বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। শেষে মহেন্দ্র পলায়নে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এই ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদের মধ্যে আশার বেনামী বিনোদিনীর তিনখানি সুধা-হলাহল-মিশ্র প্রেমনিবেদন-লিপি মহেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে বিষদিগ্ধ বাণের মতই বিঁধিয়াছে। মহেন্দ্র এক অজ্ঞাত-শঙ্কা-উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া বিনোদিনীর সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়াছে। এইবার মহেন্দ্র একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা ও কর্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া বিনোদিনীর নিকট প্রথম প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু

এ ভ্রান্তি মুহূর্তের দুর্বলতা মাত্র। প্রণয়-ভিক্ষার পরমুহূর্তেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—তাহার ব্যাকুল-নিবেদনাত্মক কথা কয়টি প্রত্যাহার করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে ও বিহারীর নিকট তাহার আসন্ন পদস্খলনের সম্বন্ধে আবেগময় স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজ অনুতাপের গভীরতা প্রমাণ করিয়াছে। বিহারীও আশার কল্যাণের জন্য বিনোদিনীর নিকট উচ্ছ্বসিত অনুনয়ের দ্বারা তাহার সুপ্ত মহত্ত্বের ক্ষণিক উদ্বোধন করিয়াছে। বিনোদিনীর অশ্রু-গাঢ় আলিঙ্গন ও মহেন্দ্রের অস্বাভাবিক বেগে উৎসারিত সোহাগ-নির্ঝর যুগপৎ আশার উপর বর্ষিত হইয়া তাহাকে উভয়ের মধ্যে এক নিগূঢ় ঐক্য-রহস্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে এবং এই সম্মিলিত শক্তির, এই স্নেহাতিশয্যের ছদ্মবেশধারী বিরুদ্ধতার ক্ষীণ আভাস তাহার হৃদয়-মনে এক অজ্ঞাত ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছে।

তারপর মহেন্দ্রের দ্বিতীয় বার পলায়ন—এ পলায়ন ঠিক কাপুরুষের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন নহে, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তীর্থযাত্রা। কাশীতে অন্নপূর্ণার অখণ্ড ধর্মবিশ্বাস ও নীরব কল্যাণ-কামনার উৎস হইতে প্রলোভন-জয়ের শক্তি আহরণের জন্যই এবার মহেন্দ্র গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে। আশার প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রেম ও অবিচলিত বিশ্বস্ততার আশ্বাস লইয়াই সে ফিরিয়াছে। কিন্তু এইখানে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে। যে ঔষধ তাহার নিজের বিকারগ্রস্ত মনের নিকট এত উপকারের হেতু হইয়াছে, সুস্থ আশাকেও সেই ঔষধের আস্বাদ দিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগিয়াছে। আশাকে কাশী পাঠাইবার প্রস্তাব, তাহার ও বিহারীর মধ্যে ব্যবধানের এক নিষ্ঠুর, অতলস্পর্শ গহ্বরের মত দেখা দিয়াছে। বিহারী আশাকে ভালবাসে ও মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ভালবাসে না—এই দুইটি সুস্পষ্ট উক্তি তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ককে আবার প্রবলভাবে আলোড়ন করিয়াছে—ইহার মধ্যে যতটুকু অন্তরাল ও অপরিচয়ের স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিল নগ্ন সত্যের প্রখর আলোকে সেটুকু বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া তাহাদের চারিজনকে অনাবৃত বিরোধের এক ছায়ালেশহীন ঊষর মরুভূমির মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

আশার অনুপস্থিতির রন্ধ্রপথ দিয়াই মহেন্দ্রের জীবনে শনি প্রবেশ করিয়াছে। বিনোদিনীর অপরিমিত যত্ন ও আশ্চর্য সেবাকুশলতার ভিতর দিয়া তাহার অনুক্ষণ সাহচর্য মহেন্দ্রের কষ্টনিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে অনিবার্য বেগে উদ্দীপিত করিয়াছে। তথাপি সে প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়াছে, প্রলোভনের মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহার মনের দ্বারে আত্মসংযমের অর্গল নাই, তাহার শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর একবার শেষ চেষ্টার পর মহেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বিনোদিনীও আত্মসমর্পণের শেষ সীমায় পা বাড়াইয়াই বিহারী-সম্বন্ধীয় কুৎসিত শ্লেষবিদ্ধ হইয়া এক মুহূর্তে তাহার উন্মুখতাকে প্রত্যাহার ও সংকুচিত করিয়া লইয়াছে—ক্রোধের অগ্নি প্রেমের বিদ্যুৎকে পরিম্লান করিয়াছে। এই মুহূর্তটি মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কে একটি চরম পরিণতির মুহূর্ত (Crisis)। এখন হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিমুখতা বিনোদিনীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার জন্য প্রেমাভিনয়ের ছলনাও সে বর্জন করিয়াছে। এই সংকটময় মুহূর্তে বিহারীর আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক বিনোদিনীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান তাহাকে মহেন্দ্রের প্রেম-নিবেদনে সম্মত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সম্মতির মধ্যে একফোঁটা প্রেম নাই, আছে শুধু যে সামাজিক ও

নৈতিক শাসন বিহারীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে তিরস্কারের স্পর্ধা দেখাইয়াছিল, সেই স্পর্ধিত তিরস্কারের প্রতি ক্রুদ্ধ উপেক্ষা ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা।

ইহার পর মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের মধ্যে অপ্রত্যাশিতত্বের স্পর্শ মিলাইয়া গিয়াছে। আরও দুই-এক অধ্যায়ে বিনোদিনী মহেন্দ্রের অসংবৃত, লজ্জাসংকোচহীন প্রণয়-নিবেদন সহ্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয় ইহাতে কোন সাড়াই দেয় নাই। মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের সময় সে রাজলক্ষ্মীকে শরীর-রক্ষীরূপে সঙ্গে লইয়াছে, মহেন্দ্রের উন্মত্ত আবেগকে নির্জনতার কোন অবসর দান করে নাই। এখন হইতে সে মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপেই বিহারী-লাভের উপায় মাত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে শর্করা-ভারবাহী গর্দভের দুরবস্থা অনুভব করাইয়াছে। লোক-নিন্দা, সমাজ-গঞ্জনা সে স্পর্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত বরণ করিয়াছে, কিন্তু বেচারা মহেন্দ্র লোকচক্ষে অপরাধী হইলেও তাহার প্রকৃত প্রণয়ভাজনের সংবাদ বহির্জগতের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বিহারী-কর্তৃক দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান তাহার প্রেমকে রক্ত-মাংসের স্থূল বাস্তবতা হইতে এক উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল, ধ্যানগম্য আদর্শলোকে লইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের কায়িক অনুবর্তনের ছদ্মবেশে তাহার মন বিহারীর অভিমুখে প্রণয়-অভিসারের অতীন্দ্রিয় পথ ধরিয়া উধাও হইয়াছে। এই যাত্রাপথের চরমতীর্থ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে এলাহাবাদের যমুনাতীরস্থ কুঞ্জবনে। এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে মহেন্দ্র ও বিহারীর সহিত বিনোদিনীর মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল, অনুরাগ-বিরাগ-পঙ্কিল, ঘাত-প্রতিঘাত-নিষ্ঠুর, প্রত্যাখ্যান-নিবেদনের বিপরীত স্রোতে ঘূর্ণাবর্ত-সংকুল সম্বন্ধের একটা শেষ মীমাংসা ও সমাধান সংঘটিত হইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার সুদীর্ঘ মোহনিদ্রা অবসানে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ক্ষমা-স্নিগ্ধ মাতৃদৃষ্টির তলে আশার পার্শ্বে নিজ সংকুচিত স্থান গ্রহণ করিয়াছে, বিনোদিনী নিজ উদ্দীপ্ত কামনার উপর বৈরাগ্যের ধূসর ছাই ছড়াইয়াছে ও রোমান্সের নায়িকার ন্যায় প্রেমের সহস্রঝাড় রঙীন বাতি নিবাইয়া সেবার ম্লান-স্তিমিত ঘৃত-প্রদীপ হস্তে, এক চিরগোধূলিছায়াচ্ছন্ন রোগ-কক্ষের অভিমুখে ধীর পদে অগ্রসর হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া মহেন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রের সমস্ত পরিবর্তন এক আতিশয্য ও অসংযমের ঐক্য-বন্ধনে গাঁথা। তাহার অপরিমিত মাতৃভক্তি ও পত্নীপ্রেম, বিনোদিনীর সহিত সম্পর্কে তাহার নির্লজ্জ আতিশয্যেরই পূর্বসূচনা। তাহার পত্নীপ্রেম ও পরনারী আসক্তি—উভয়েরই মূলে আছে এক প্রবল আত্মাভিমান। ঈর্ষ্যা বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ প্রণয়েই তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। আশার ব্যাপারে বিহারীকে এত সহজে হঠাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই বিনোদিনীর হৃদয়-আকর্ষণ-চেষ্টায় তাহার অবলম্বিত উপায় এত ভ্রান্তি সংকুল ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বন্ধুত্বের মর্যাদা-রক্ষাই তাহার প্রেমের সিংহাসন-লাভের সোপান হইত, কিন্তু মূঢ় মহেন্দ্র নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে পারে নাই। ঈর্ষ্যার দমকা বাতাস বারবার তাহার প্রণয়-দীপটিকে কাঁপাইয়া গিয়াছে, তথাপি সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই। বিনোদিনীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে মহেন্দ্র চাহিবামাত্র পাইয়াছে—একমাত্র বিনোদিনীর ব্যাপারেই তাহাকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইয়াছে এবং এই পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হইয়াছে। সে যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্তজয়ের চেষ্টা

না করিয়াছে তাহা নহে এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য বেগের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাও ঠিক নয়,—কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনামাত্রই তাহার সমস্ত আত্মদমন-চেষ্টাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। 'আত্মাভিমান-মূঢ়তা' কথাটি মহেন্দ্রের সমস্ত চরিত্র ও ব্যবহারের উপর বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিনোদিনীর চরিত্রে স্থূল বাস্তবতা ও উচ্চ আদর্শবাদ—এই দুইটি বিপরীত ধারার সংযোগ হইয়াছে। অবশ্য এই সংযোগ আর্টের অনুমোদিত সমন্বয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। পিশাচী হইতে দেবীতে অতর্কিত পরিবর্তন রোমান্টিক উপন্যাসে অতি সাধারণ ব্যাপার। এখানে বিনোদিনীর পরিবর্তন খুব অতর্কিত হয় নাই, মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিহারীর প্রতি উন্মুখতা তাহার চরিত্রে ধীরে ধীরে, অথচ নিতান্ত অনিবার্যভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে। একটা প্রচণ্ড জালাময় ঈর্ষ্যা তাহাকে মহেন্দ্রের সহিত প্রেমাভিনয় করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার সেবাকুশলতা মহেন্দ্রের ঔদাসীন্যকে পরাজয় করিবার অস্ত্রমাত্র; মহেন্দ্রের প্রতি তাহার হিতেচ্ছা-প্রণোদিত কঠোর শাসন প্রেমের বাজার-দর উঁচু রাখিবার কৌশলময় প্রয়াস। তথাপি যদি সে মহেন্দ্রের চরিত্রে তাহার একান্ত-প্রার্থিত অটল নির্ভর ও বিশ্বস্ততা পাইত, তাহা হইলে তাহার চিত্তদুর্গে জয়-পতাকা উড়াইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিত, বিজয়িনীর গর্ব প্রণয়িনীর অন্তরের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে হঠাইয়া দিত। কিন্তু মহেন্দ্রের অন্তঃকরণে দৃঢ় ভিত্তির পরিবর্তে চোরাবালির আবিষ্কার করিয়া, তাহার একান্ত কৃতঘ্নতা ও অস্থিরমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার মন মহেন্দ্রের উপর ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিহারীর শত-ঝঞ্ঝাবাতে অক্ষুব্ধ হৃদয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বিহারীকে আহরণ-যোগ্য মণি বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে মহেন্দ্রকে খেলার পুতুলের মত ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য তাহার এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কাহিনী বাস্তব বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবি-কল্পনামূলক সহানুভূতির দ্বারাই পাঠকের মনে প্রবেশ করান হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ দিক দিয়া বিনোদিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী—সে বাস্তব বিশ্লেষণের পরিধি ছাড়াইয়া উদার অসীম ভাবরাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় আরোহণ করিয়াছে। তাহার জীবনের শেষ সংকল্প রোমান্সের রঙীন বাতাসে অঙ্কুরিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রেমের সহিত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমের তুলনা করিলেই রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুভূত হইবে। কুন্দের প্রেম অতি সলজ্জ ও সংকোচ-জড়িত, প্রণয়ের আবির্ভাব-অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত সরলতাই ইহার প্রধান উপাদান। ইহার বর্ণনাও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ, ইহার দৈনন্দিন ইতিহাস ও পরিণতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বিনোদিনীর প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—ইহা অতি সুচতুর, কৌশলজালময় মায়া-বিস্তার। কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধজলে ঝাঁপ দিয়াছে—বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কুন্দের অন্ধ, মূঢ় আবেগের সহিত বিনোদিনীর সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ ও ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতেরও ফলাফল সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার, আবেশজড়িমারহিত অনুভূতি তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বালবিধবার প্রথম প্রণয় সঞ্চার কবিত্বময় আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া, নববধূর লজ্জারক্তিম আভায় চিত্রিত করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ পূর্ণবয়স্কা যুবতীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ লোলুপতার, তাহার যত্ন-রচিত মায়া-নাগ-

পাশের প্রত্যেকটি গ্রন্থির, প্রত্যেকটি ফাঁসের সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। 'চোখের বালি'র পর হইতে বিধবা প্রেমের এক নূতন অভিনয়ে ব্রতী হইয়াছে। বিনোদিনী হীরা ও রোহিণীর মনোরাজ্য-বহির্ভূত এক উচ্চতর, বিচিত্রতর মঞ্চ অধিকার করিয়াছে; সে অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের পূর্ববর্তিনী ও পথপ্রদর্শিকা।

বিহারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে অত্যন্ত বিলম্বে। গ্রন্থের প্রথম হইতে সে কেবল মহেন্দ্রের অনুচর ও উপগ্রহরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার বন্ধুপ্রীতি এত প্রবল যে, তাহার খাতিরে সে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ পর্যন্ত বন্ধুকে তুলিয়া দিয়া‍ছে। তাহার চরিত্র ও ব্যবহারের সর্বত্রই প্রায় বিয়োগ-চিহ্নাঙ্কিত (negative)। মহেন্দ্রের ত্রুটি-অপূর্ণতা ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিহারীর চরিত্রে তদ্বিপরীত গুণগুলি আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ রাহুগ্রস্ত জীবন প্রায়ই ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অনুকূল হয় না। কেবলমাত্র বিনোদিনীই বিহারীকে মহেন্দ্র হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিয়াছে, তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আকর্ষণের দ্বারা বাহিরে আনিয়াছে। বিনোদিনী-সম্পর্কেও বিহারী নিজ হৃদয়-ভাবকে আমল দেয় নাই, মহেন্দ্রের হিতৈষী বন্ধু হিসাবেই তাহার কার্যাবলীর বিচার করিয়াছে। কেবলমাত্র তাহার নির্জন কক্ষ-মধ্যে বিনোদিনীর নিশীথ-অভিসারই তাহার প্রসুপ্ত যৌবনকে জাগরিত করিয়াছে; সে মহেন্দ্রের আনুচর্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমের সুরা-পাত্র সে ওষ্ঠে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু তাহার তীব্র গন্ধ তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্তকে উতলা ও মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এই অতর্কিত যৌবনোন্মেষই তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ—বিনোদিনীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব তাহার স্বাধীন সত্তার এক-মাত্র কার্য। তাহার চিরপ্রবীণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সদ্যোজাগ্রত তারুণ্যের মধ্যে যে বিরোধ তাহার সমাধান নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিহারীর অর্ধোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়-সমস্যার সুলভ ও আকস্মিক সমাধান তাহাকে শেষ পর্যন্ত কতকটা অস্পষ্ট ও ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে।

আশার সম্বন্ধেও অনেকটা এই মন্তব্যই প্রযোজ্য। মহেন্দ্রের দুর্জয় বন্যা-প্লাবনের ন্যায় অসংযত হৃদয়াবেগ ও বিনোদিনীর চক্ষুজ্বালাকারী, তীব্র রূপশিখার সম্মুখীন হইয়া সে অনেকটা ম্লান ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র-বিহারীর সম্পর্ক আমাদের একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের সংকীর্ণ পারিবারিক জগতে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধুত্বই সাধারণতঃ অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের রুদ্ধদ্বারগবাক্ষ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এক বন্ধুত্বের ছিদ্রপথ দিয়া বাহ্য বিপ্লব বাঙালী পরিবারে প্রবেশলাভ করিতে পারে। এক বন্ধুত্ব বা সহপাঠিত্বের দাবিতেই আমরা পরের অন্তঃপুরের অন্তর্গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া ভিন্ন পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারি। এখানে স্ত্রী-পুরুষে অসংকোচ মেলা-মেশার সুযোগ যতই সংকীর্ণ, বন্ধুত্বের প্রসার ও সম্ভাবনা ততই সুপ্রচুর। সেইজন্য বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিলতা বন্ধুত্বের স্নেহ-শীতল অথচ প্রতিযোগিতা-তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই উদ্ভূত। 'গোরা'তে গোরা ও বিনয়, 'ঘরে-বাইরে' নিখিলেশ ও সন্দীপ, 'গৃহদাহ'-এ মহিম

ও সুরেশ, 'দিদি'তে অমর ও দেবেন—এই উদাহরণ কয়েকটিই বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের উচ্চ দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

'চোখের বালি'কে উপন্যাস-সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি-আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমাজনীতির দিক্ হইতে বিগর্হিত—কিন্তু এই প্রেমের বিচারে কোন নীতিকথার আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ইহার ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এই প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে কোন নৈতিক অনুশাসনে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত শোভনতাবোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা। আবার বিহারী-বিনোদিনীর প্রেমে প্রেমের সনাতন সৌন্দর্য ও মহিমা সগৌরবে বিঘোষিত হইয়াছে। লেখক প্রেমের প্রতি পুরাতন মনোভাব একেবারে বর্জন না করিয়া নূতন মনোভাবের স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। 'চোখের বালি' এই নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এক হাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপর হাতে শরৎচন্দ্রের যুগকে নিবিড় ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছে।

(৪)

'গোরা' (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রসার ও পরিধি সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে। ইহার পাত্র-পাত্রীগণের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তাহা নহে, আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্মগত সংঘর্ষ-বিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের একটি বিরাট বৃহত্তর সত্তা আছে। বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগ-সন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ-আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্ম-বিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখ দিয়া ধর্মবিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারক—এই উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তি-তর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমস্ত ক্ষেত্র নিঃশেষভাবে অধিকৃত হইয়াছে। গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারাণ, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী—সকলেরই প্রধান আগ্রহ একটা মতবাদ-প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম ও ব্যবহারগত জীবনে একটা বিশেষ পথ বা চিন্তাধারার সমর্থনে। কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এই যুক্তিতর্কগত জীবন, এই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটা প্রতিহত ও অভিভূত হইয়াছে। তর্কের উদ্দাম কোলাহলে তাহাদের জীবনের সূক্ষ্ম রাগিণী, নিগূঢ় মর্মস্পন্দন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলিয়াই বেশি মনে হয়। সমস্ত উপন্যাসটির বিরুদ্ধেই অনেকটা এই প্রকারের অভিযোগ আনা হয়। ইহার চরিত্র-চিত্রণ যথেষ্ট গভীর ও ব্যক্তিত্বদ্যোতক নহে, ইহার চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব-উন্মেষ যথেষ্ট উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নহে। উপন্যাসখানি সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনার পূর্বে এই অভিযোগের বিচারই প্রথমে কর্তব্য।

সমালোচনার মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিলে এই অভিযোগের একটা সাধারণ সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত তর্কযুদ্ধে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির যে স্বরূপ প্রকাশ

পায় তাহাই তাহার সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় বলিয়া মনে করা যায় না। রণক্ষেত্রে বর্ম-কিরীট-পরিহিত সেনাপতির মুখাবয়ব যেমন অস্পষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ মতবাদের সংঘর্ষে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জলিয়া উঠে তাহাতে চরিত্রের সমগ্র অংশটি আলোকিত হইয়া উঠে না। তর্কের উত্তেজনার মধ্যে আমাদের যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুরধার তরবারির মত ঝকমক করিয়া উঠে, আক্রমণ-আত্মরক্ষার নিষ্ঠুর প্রয়োজনে যে যুধ্যমান গুণগুলির স্ফূর্তি হয়, তাহাদের অন্তরালে আমাদের গভীর-গুহা-শায়ী আসল মানুষটি অনেক সময়েই চাপা পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কোন বিশেষ মতবাদের পোষকতা কোন ব্যক্তির প্রধান পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে পরিচয় যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখনই গোরা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখনই সে যুদ্ধসাজ-পরা, তখনই আমরা পূর্ব হইতে অনুমান করিতে পারি যে, তাহার যুক্তি-তর্ক, তাহার চিন্তাধারা কোন প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে। সুতরাং জীবনের যে প্রধান রহস্য—তাহার বিস্ময়কর অতর্কিততা, তাহার নিগূঢ় আকস্মিকতা, তাহা তাহার ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। পরেশবাবুরও অভ্রান্ত ও অবিচলিত সত্যানুসরণ, তাঁহার ধর্মবুদ্ধির অবিমিশ্র উৎকর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রকে অনেকটা নিষ্প্রভ ও বৈচিত্র্যবিহীন করিয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া যে-সমস্ত চরিত্র মতবাদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যায় নাই, মতবাদ-সমর্থনে দ্বিধা বা দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিয়াছে, অথবা যুক্তি-তর্ক-আলোচনার মধ্য দিয়া যাহাদের জীবনে নিগূঢ় পরিবর্তন আসিয়াছে তাহারা প্রাণরসে অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবে দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বিনয়, অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিতা সুচরিতা ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পরায়ণা ললিতা আমাদের নিকট অধিকতর জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

অবশ্য যুক্তিতর্কোত্থিত ধূলিজালের মধ্য দিয়া যে হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করা যায় না, এরূপ বদ্ধমূল ধারণাও একটা কুসংস্কার। হৃদয়ের গভীর স্তরে অবতরণ করিবার পথ একটি নহে, অনেকগুলি। আমাদের পারিবারিক জীবনের রসধারাসিক্ত, ছায়াশীতল গ্রাম্য পথ দিয়াও যেমন, সেইরূপ যুক্তি-তর্কের স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গপথ দিয়াও অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছান যাইতে পারে। মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাকবিতণ্ডা যদি কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত না হইয়া অন্তরের আলোড়নে গভীরতা লাভ করে, তবে তাহার ভিতর দিয়াও আমরা আসল মানুষটির পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই বুদ্ধি-সংঘর্ষের ফলে যদি প্রেমের সোনার প্রদীপ জলিয়া উঠে, তবে তাহার স্বচ্ছ, সর্বব্যাপী আলোকে সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে বাকী থাকে না। গোরার তর্ক কেবল বুদ্ধির সুলভ আস্ফালন, কেবল নিপুণ তরবারি-সঞ্চালনের কৃতিত্ব নহে। তাহা এক দিকে তাহার অন্তরের গভীরতম উৎসটি হইতে উৎসারিত, অপর দিকে তাহার হৃদয়ের নিগূঢ় সম্পর্কগুলির উপর প্রভাবান্বিত। তাহার মাতৃভক্তি, তাহার বন্ধুপ্রীতি পদে পদে তাহার মতবাদের দ্বারা খণ্ডিত, প্রতিহত, পরিবর্তিত হইতেছে। আনন্দময়ীর সূক্ষ্ম অথচ প্রকাশরহিত বেদনাবোধ, বিনয়ের আসন্ন অথচ অপ্রতিবিধেয় বিচ্ছেদ-ব্যথা গোরার শুষ্ক মতবাদকে কোমল-করুণরসে, নিগূঢ় প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। শেষ পর্যন্ত ইহা তাহাকে সুচরিতার সম্মুখীন করিয়া তাহাকে প্রেমের গভীর উপলব্ধির দিকে অনিবার্য বেগে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। সাংসারিকতার সহজ-মসৃণ পথে গোরার

সহিত সুচরিতার পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না; দেখাশোনার কোন উপায় থাকিলেও সাধারণ শিষ্ট-সম্ভাষণ-বিনিময়ের দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রণয়াকর্ষণ কোনমতেই জন্মিতে পারিত না। মত-বিরোধের তীব্র সংঘর্ষই তাহাদিগকে পরস্পরের একান্ত সন্নিকটবর্তী করিয়াছে; এই তীব্র মন্থনের ফলেই তাহাদের হৃদয়-সমুদ্র হইতে প্রণয়-লক্ষ্মী সুধাভাণ্ড-হস্তে আবির্ভূতা হইয়াছেন। সুচরিতাকে স্বমতানুবর্তী করিবার জন্য গোরা বজ্র-নির্ঘোষে যে-সমস্ত যুক্তি-পরম্পরা সাজাইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া অস্বীকৃত প্রেমের বিদ্যুচ্চমক দীপ্ত-হইয়াছে; তাহার প্রবল আগ্রহ, তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতির সম্পূর্ণ শক্তি-প্রয়োগের পিছনে প্রেমের বিদ্যুৎগর্ভ, সুবিপুল বেগ ঠেলা দিয়াছে। সুচরিতার সহিত প্রথম পরিচয়ের পর নির্জন গঙ্গা-তটে তাহার কঠোর-তপস্যা-রত, ভাব-মগ্ন চিত্তের এক অসতর্ক ফাঁক দিয়া যে মুগ্ধ প্রণয়াবেশের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই তাহাকে দেশাত্মবোধের প্রতিনিধিত্ব হইতে অভিঘাত-চঞ্চল, উদ্ধরক্ত-সঞ্চরণশীল ব্যক্তিগত জীবনে উন্নীত করিয়াছে। যে মুহূর্তে প্রেম আসিয়া দেশপ্রীতির হাত হইতে রশ্মি কাড়িয়া লইয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতে যে গোরার জীবন-রথ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ পথ বাহিয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

আসল কথা, ব্যক্তিগত জীবনের প্রসার ও সীমা সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি সাধারণ ধারণা আছে। যখনই কোন ব্যক্তির জীবন এই সুনির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়, তখনই আমরা তাহার ব্যক্তিত্বের গভীরতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি। প্রসার যত বেশি হয়, গভীরতা তত কমে, ইহাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। সেইজন্য যখন কাব্যের বা উপন্যাসের চরিত্র একটা জাতির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন ধর্ম বা সভ্যতার বিশেষত্বের সহিত সম্পূর্ণ একাঙ্গীভূত হয়, তখন তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই অসাধারণ প্রসারের জন্য খর্ব হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা অনুভব করি। শতকণ্ঠের বাণী যদি একের মুখে ধ্বনিত হয় তখন তাহার সেই উক্তির মধ্যে তাহার নিজস্ব সুরটি খুব স্পষ্ট থাকে না। সেইজন্য গোরা বা 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপূর্বর জীবন ব্যক্তিগত গণ্ডিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া সমগ্র দেশের সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, অথবা দেশ-কাল নির্বিশেষে এক রহস্যময় অসীমতার দিকে পক্ষ বিস্তার করে বলিয়া ঔপন্যাসিকের দিক্ হইতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ ফিকে বা বর্ণবিরল বলিয়া মনে হয়। গোরা যেখানে নিছক তার্কিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে, যেখানে সে ঘোষচরপুরের প্রজাদের প্রতি অত্যাচার-নিবারণ-জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিয়াছে, সেখানে জাতীয়তার প্রবল অভিভবে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সে তর্কের সূত্র ধরিয়া আনন্দময়ীকে বেদনা দিয়াছে বা বিনয়ের সহিত বোঝা-পড়া করিবার জন্য তাহার অন্তঃকরণের তলদেশে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির আলোকপাত করিয়াছে, সর্বোপরি যেখানে সে সুচরিতার সহিত নিগূঢ় হৃদয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে যেখানে সে প্রতিনিধিত্বের ছায়ামণ্ডলমুক্ত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আলোকে ভাস্বর পুরুষ।

গোরার জন্ম-রহস্য তাহার সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গোরাকে আইরিশ-ম্যান প্রতিপন্ন করায় লেখকের কি উদ্দেশ্য তাহাও কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে এই জন্ম-রহস্য-প্রকাশ অতর্কিত বজ্রপাতের মতই গোরার উপর আসিয়া

পড়িয়াছে। অবশ্য ইহাতে তাহার দেশভক্তির কোন হ্রাস হয় নাই—কিন্তু এই দেশভক্তি যে বিশেষ সাধনার পথ ধরিয়া চলিতেছিল উহা তাহাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। হিন্দুধর্মের যে কঠোর নিয়ম-সংযম, যে অবিচলিত আচার-নিষ্ঠা গোরার জীবনের মহত্তম ব্রত ছিল, এক মুহূর্তেই প্রমাণ হইয়াছে যে, সে সেই ব্রতপালনের অধিকারী নহে। দেশানুরাগ ও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ সে বরাবর কল্পনা করিয়াছিল, নিয়তির নির্মম ছুরিকাঘাতে মুহূর্তমধ্যে সে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। যে শুষ্ক, নির্মম আচার-পালন তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তির উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া ছিল তাহা নিমেষ-মধ্যে বাষ্পাকারে শূন্যে মিশাইয়া গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যে হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা ভক্তিমান্, একনিষ্ঠ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিশীল সাধক ছিল সে অহিন্দু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে গভীর বেদনার সঙ্গে একটা বিপুল মুক্তির আনন্দ জড়িত হইয়াছে। গোরার পূর্বজীবনের প্রচেষ্টা, তাহার ব্যাকুল ও একাগ্র সাধনা তাহার পশ্চাতে ভস্মীভূত হইয়াছে; নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকাইয়া সে এক বিরাট্ ধ্বংসস্তূপ ও শূন্যতা নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এখন হইতে তাহার দেশপ্রীতির ধারা অতি স্বচ্ছন্দে ও বাধাশূন্যভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। আর মাতার গূঢ় বেদনা, বন্ধু-বিচ্ছেদ, প্রেম-নিরোধ তাহার হৃদয়কে অযথা ভারাক্রান্ত ও সহজ অগ্রগতিকে প্রতিরুদ্ধ করে নাই। বিনয়ের সহযোগিতায় ও সুচরিতার প্রেমে এক মুক্ততর, পূর্ণতর জীবনের অধিকারী হইয়া, প্রতিবেশের সহিত ব্যর্থ সংগ্রামে অযথা শক্তিক্ষয়ের দুর্ভাগ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, সত্যের মেঘাবরণমুক্ত, প্রসন্ন আলোকে, সে পূর্ণ উৎসাহে নূতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। উপন্যাসের যেখানে যবনিকাপাত, জীবনে সেইখানে কর্মের আরম্ভ। এই নব-দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, নববলে বলীয়ান্ গোরার জীবন-চরিত কোন ভবিষ্যৎ উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইবে কি না, কে বলিতে পারে।

বিনয় তাহার দ্বিধাসংকোচপূর্ণ, সুকুমার হৃদয়টি লইয়া আমাদের সাধারণ স্তরের মানুষ—একদিকে গোরার অনমনীয় মতবাদের প্রতি, অপর দিকে তাহার কোমল সামাজিক স্নেহ-বন্ধনের প্রতি, উন্মুখ হৃদয়ের বিশ্বস্ততার দাবি—এক দুই-এর মধ্যে সতত বিরোধে সে উভয়-সংকটে পড়িয়াছে। তাহার যুক্তি-তর্ক, মতবাদ হৃদয়াবেগের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। গোরার সহিত সমস্ত বাক্-বিতণ্ডায় উপেক্ষিত হৃদয়-বৃত্তিরই সে পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। একবার মনে হইয়াছিল বুঝি গোরার সহিত তাহার একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হইবে। পরেশবাবুর পরিবারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর যখন বিনয় উচ্ছ্বসিত, আবেগময় ভাষায় গোরার সমক্ষে তাহার হৃদয়ে প্রেমের অপরূপ প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনা করিয়াছিল ও গোরা এই আবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া নিজ আদর্শের বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছিল, তখন আশা করা গিয়াছিল যে, গোরা অন্ততঃ এই দুর্জয় শক্তির, এই নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিবে, তাহাকে যতদূর সম্ভবপর আপনার স্বেচ্ছা-নির্বাচিত পথে চলিতে দিবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে, সে বিনয়ের নবোন্মেষিত প্রণয়াবেগকে এক তিল স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নহে। সুতরাং গোরার পরবর্তী ব্যবহার এই দৃশ্যের বিরুদ্ধতাচরণ করে।

বিনয়ের সহিত ললিতার প্রেমের উদ্ভব ও পরিণতি খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একটা প্রবল বিরুদ্ধতা, এমন কি তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশের ছদ্মবেশে প্রেম কিরূপে ইন্দ্রজাল

বিস্তার করে, প্রেমের সেই চিররহস্যময় প্রকৃতিরই উদ্ঘাটন বিনয়-ললিতার সম্পর্কটিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতেই ললিতা বিনয়ের প্রতি একটা অপূর্ব আকর্ষণ, তাহার উপর নিজ অধিকার জারি করার একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। তাই সুচরিতার সহিত বিনয়ের প্রণয়-সম্ভাবনায় তাহার মন একটা ক্ষণস্থায়ী, তীব্র ঈর্ষ্যা-দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। সে সন্দেহ হইতে মুক্তি পাইয়া সে গোরার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতি-যোগিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কঠোর আঘাত ও নির্মম ব্যঙ্গ দ্বারা সে বিনয়কে গোরার প্রভাব হইতে ছিনাইয়া লইতে চাহিয়াছে, তাহাকে গোরার উপগ্রহত্ব পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজের কক্ষপথে আবর্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বিনয়ের উপর গোরার প্রভাবে যে একটু অস্বাভাবিকত্ব, একটু অনুচিত আতিশয্য আছে, বিনয়ের প্রকৃতিতে যে একটা অবরুদ্ধ বিদ্রোহোন্মুখতা আছে, প্রণয়ের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণদর্শিতার সহিত ললিতা প্রথম সাক্ষাতেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছে ও দাঁড়ি-পাল্লার অপরদিকে তাহার প্রভাবের সমস্ত গুরুভার নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার অবিরাম আকর্ষণে বিনয় অনেকটা বিচলিত হইয়াছে ও গোরার মতের বিরুদ্ধে অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হইয়াছে। এই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় ললিতা নিজ ব্যবহারে প্রেমের আকস্মিক ভাব-পরিবর্তন ও অস্থিরমতিত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করিয়াছে। স্টীমার-যাত্রার কালে বিনয়ের প্রতি একান্ত নির্ভরেই ললিতার প্রেমের প্রথম অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত প্রকাশ। কিন্তু এই অনিবার্য আত্মপরিচয়ের পরেও প্রেমের পথ ঠিক সরল রেখার অনুবর্তন করে নাই। শেষে ব্রাহ্মসমাজের নীচ আক্রমণ ও কাপুরুষোচিত ইতর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই এই ঈষৎ অম্লস্বাদ প্রেমের ফলে পরিপূর্ণ পক্কতার রং মাখাইয়া দিল। ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা তাহার প্রেমের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া তাহাকে সংকোচহীন ও মুক্তকণ্ঠ করিয়া তুলিল ও বিনয়েরও ভীরু, দ্বিধা-দুর্বল চিত্তে তাহার কতকটা উত্তাপ সংক্রামিত করিল। তাহাদের মিলনের পথে যে সমস্ত কৃত্রিম সমাজ ও ধর্মমতমূলক বাধা মাথা তুলিয়াছিল, ললিতার প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে কি হিন্দুমতে হইবে—এই আপত্তি প্রায় তিন অধ্যায় ধরিয়া পল্লবিত হইয়াছে এবং এই সমস্যার শেষ পর্যন্ত যে সমাধান হইয়াছে তাহাও মোটেই সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত নহে। শেষ পর্যন্ত ললিতার নির্বন্ধাতিশয্যে স্থির হইল যে, শালগ্রামশিলা বাদ দিয়া বিবাহ হিন্দুমতেই হইবে, কেন-না বিবাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া বিনয়ের পক্ষে অপমানজনক হইবে। এই আপত্তি ললিতার সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সমস্যার আসল মীমাংসা হইত উভয়-সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ বর্জনের দ্বারা। গ্রন্থের এই অংশটি তার্কিকতার দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। এক সামাজিক মূঢ়তা ও গোঁড়ামির চিত্র প্রদর্শন ছাড়া এই সমস্ত নূতন নূতন বাধা প্রবর্তনের অন্য কোন উপযোগিতা নাই।

ললিতার সহিত সুচরিতার ভাবগত ঐক্য, অথচ চরিত্রগত পার্থক্য খুব চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। ললিতার নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণার পাশে সুচরিতার শান্ত-ধীর, বিনয়-নম্র নূতন জ্ঞান-আহরণের জন্য উন্মুখ, ভক্তিপূর্ণ শিক্ষার্থীর ন্যায় প্রকৃতিটি একটি সুন্দর বৈপরীত্য-বিকাশের হেতু হইয়াছে। পরেশবাবুর সহিত তাহার সম্বন্ধটি ভক্তির সুরভি-অর্ঘ্যে, উদ্বিগ্ন স্নেহ-ব্যাকুলতায়, সর্বোপরি একটি গভীর অধ্যাত্ম-মিলনে, পিতা-পুত্রীর পরস্পর সম্পর্কের

আদর্শস্থানীয় হইয়াছে অথচ ইহার মধ্যে আদর্শলোকের ছায়াময় অস্পষ্টতা কোথাও নাই। সুচরিতার ন্যায় আত্মসুখে উদাসীন, আত্মবিসর্জনোন্মুখ প্রকৃতি যে হারাণকে প্রত্যাখ্যান করিতে উত্তেজিত হইয়াছে, তাহার কতকটা কারণ পরেশবাবুর প্রতি ভক্তি ও গোরার প্রতি নবজাত অনুরাগ; কিন্তু এই বিচ্ছেদ-সংঘটনের প্রধান কৃতিত্ব হারাণেরই। তাহার আধ্যাত্মিক অহংকার, তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তির একান্ত অভাবই সুচরিতার মত মিষ্টস্বভাবকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় নিজ আধ্যাত্মিক জাগরণ-সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রবলভাবে সচেতন, নবোৎসাহের মাদকতায় প্রচণ্ডভাবে উগ্র, নবীন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই হারাণের মত চরিত্রের আবির্ভাব সম্ভব। জড়, নিদ্রালস ও গভীর ঔদাস্যপূর্ণ হিন্দু-সমাজে সামাজিক অত্যাচারের আকৃতি অন্যবিধ। হিন্দুধর্মের অত্যাচার অনেকটা চেতনাহীন মূঢ় যান্ত্রিকতার অত্যাচার; হৃদয়হীন নির্বিকারতাই ইহার উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র; ইহার মধ্যে নির্মম ব্যূহরচনা, ক্রূর সৈনাপত্য-কৌশলের বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই। মোটের উপর চাণক্যনীতির অস্ত্রশালা হইতে ইহার অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় না বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উৎপীড়নের মধ্যে আধ্যাত্মিক দম্ভের সমস্ত অসহনীয় বিষজ্বালা বর্তমান; ইহার সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণতা, সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতার পাগড়ি বাঁধিয়া, ভগবানের নিজ-হাতে দেওয়া সনন্দকে জয়পতাকার মত আস্ফালন করিয়া ইহার হতভাগ্য অত্যাচার-পাত্রের জীবনকে বিষজর্জর করিয়া তোলে। আধুনিক যুদ্ধপ্রণালীর সমস্ত অস্ত্র ইহার করায়ত্ত ও নিজ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সম্বন্ধে অভ্রান্ত বিশ্বাস ইহার অস্ত্রক্ষেপকে আরও নিদারুণ ও দুর্বিবহ করে। নদীর জোয়ারে যেমন প্রচুর উর্বরতা-শক্তিসহ কচুরিপানা প্রভৃতি অনিষ্টকর উদ্ভিদ্ ভাসিয়া আসে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্মের জোয়ারে আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হারাণবাবুর মত বিরক্তিকর জীবও ভাসিয়া আসিয়াছে।

সুচরিতার হৃদয়ে প্রেম নিতান্ত নিঃশব্দপদসঞ্চারে ম্লান সন্ধ্যালোকের মত অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছে। ললিতার মত তাহার তীব্র বিদ্রোহ ও অসহ্য অন্তর্জ্বালা নাই, আছে একপ্রকার শান্ত, মৃদু, বিষণ্ণ বিস্ময়। গোরার উপেক্ষাতে একটা অনির্দেশ্য বেদনাবোধই তাহার প্রেমের প্রথম সূচনা। তারপর গোরার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, তাহার প্রবল আবেদন, তাহার স্বদেশ-প্রীতির উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতা, সুচরিতার সমস্ত বদ্ধমূল পূর্ব-সংস্কারকে সবলে উন্মূলিত করিয়া দুর্নিবার বেগে তাহাকে গোরার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। গোরার অলঙ্ঘ্য আকর্ষণী শক্তির স্পষ্টতম নিদর্শন এই যে, সুচরিতার হৃদয়ে তাহার জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত পরেশবাবুর প্রভাবও তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তাহার একনিষ্ঠ, ভক্তিপ্রবণ মনে ধর্মবিপ্লবের আঘাতের গভীরতা খুব নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক আঘাতেই সে পরেশবাবুর আদর্শ ও শিক্ষাকে আরও ব্যাকুলভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে; পুরাতনের সহিত দুর্জয় নবোপলব্ধির একটা সমন্বয়-সাধন করিতে চাহিয়াছে। প্রেমের গোপন সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া গোরার নূতন আদর্শ তাহার অন্তরের গভীরতম পুরে প্রবেশ করিয়া তথাকার বদ্ধমূল ধর্মসংস্কারগুলিকে বিস্ফোরকের মত তেজে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে এবং শেষে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া সে নিজেকে হিন্দু-নামে পরিচিত করিয়াছে। হরিমোহিনীর সমস্ত মূঢ় বিপক্ষতাচরণ তাহাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ, পীড়িত করিয়াছে, কিন্তু

তাহার স্বাভাবিক নম্র ও আদেশ-পালন-তৎপর প্রকৃতিটিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। শেষে এক মুহূর্তে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে। গোরার জন্ম-রহস্য-প্রকাশ নিতান্ত দ্বন্দ্বহীনভাবে সুচরিতার পূর্ব-সংস্কারের পুরাতন মঞ্চের উপরই তাহাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সুচরিতার আত্মজিজ্ঞাসাশীল হৃদয় অতীতের সহিত চিরবিচ্ছেদ স্বীকার না করিয়াই প্রেমের সহিত সমস্ত নবীন আদর্শকে এক বৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বরণ করিয়া লইয়াছে। সুচরিতার প্রেমই যেন তাহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণের তেজে গোরার অন্তর্নিহিত সারাংশটিকে বাহ্যসংস্কারের কঠিন বহিরাবরণ হইতে মুক্তি দিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে একাত্ম করিয়া লইয়াছে। তাহাদের বিবাহ দুই প্রজ্বলিত মানবাত্মার একান্ত মিলন।

সুচরিতার চরিত্রের বিশেষত্বই এই যে, আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়াই ইহার পূর্ণ বিকাশ। তাহার সমস্ত যুক্তি-তর্ক, তাহার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধূমাবরণের মধ্য দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্ব ক্রমোজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় ভাস্বর হইয়াছে। সাংসারিক কর্তব্যের চাপে এ প্রকৃতি ফুটিত না, উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ-ঘোষণায় ইহা স্বাধীনতা পাইত না, প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া ইহার সার্থকতালাভ হইত না। তর্কমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা গভীর জীবন-রহস্য ধরা যায় না—এই সাধারণ বিশ্বাস সুচরিতার চরিত্রের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।

হরিমোহিনীর চরিত্রের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে সে একজন খাঁটি হিন্দু ঘরের বিধবা—তেমনি কুণ্ঠিত, তেমনি পরমুখাপেক্ষী, তেমনি সর্বংসহা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সুচরিতার উপর নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহার দৃঢ় সংকল্প ও নূতন নূতন উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সুচরিতার শান্ত, নম্র প্রকৃতিকে দাবাইয়া রাখা ত' সহজ, কিন্তু মরণোন্মুখের চরম সাহসের সহিত সে গোরারও সম্মুখীন হইয়াছে ও একমাত্র সেই গোরার প্রবল, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করিয়া তাহাকে সংকোচের দ্বিধাভাব ও পরাজয়ের গ্লানি, অনুভব করাইয়াছে। তাহার পূর্বজীবনের ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি যে, তাহার দেবরেরা ফাঁকি দিয়া তাহার সম্পত্তিতে অধিকার-ত্যাগের সহি করাইয়া লইয়াছিল কিন্তু সুচরিতার সম্বন্ধে এরূপ ফাঁকি যে চলিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। সম্পত্তি-সম্বন্ধে হরিমোহিনী যতই বিষয়জ্ঞানশূন্য হউক না কেন, সুচরিতার উপর স্বত্বরক্ষা বিষয়ে তাহার পাকা জমিদারি চালের অভাব নাই। তাহার বিষয়-বুদ্ধি সারাজীবন সুপ্ত থাকিয়া হঠাৎ শেষ বয়সে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ও স্নেহাতিশয্য তাহাকে অসামান্য তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা দিয়াছে। এই অবস্থাসংকটই হরিমোহিনীকে সাধারণ হিন্দু বিধবা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার উপর কিয়ৎ পরিমাণে অসামান্যতার আরোপ করিয়াছে।

আনন্দময়ী ও পরেশবাবু সেই পিঙ্গল ও রক্তহীন জাতীয় জীব, যাহাদিগকে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ কাব্য-উপন্যাসে বর্ণিত আদর্শচরিত্র পুরুষ বা নারী অবাস্তবতা-দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক যুগে বাস্তব-জীবনে এইরূপ আদর্শচরিত্রে বিশ্বাস ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে, কেন-না ঔপন্যাসিক প্রায়ই এই আদর্শলাভের ক্রমবিকাশ দেখাইতে পারেন না। যে আগুনে আমাদের খাদ-মিশানো, ভালো-মন্দে-মাখা প্রকৃতিটি

একেবারে অনবদ্য বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে, প্রাত্যহিকতার ফুৎকারে সে আগুন প্রজ্বলিত হয় না। এরূপ আদর্শ চরিত্র দেখিলেই তাহাদের পূর্বজীবনী ও পরিণতির প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগে এবং উপযুক্ত কারণ-নির্দেশের দ্বারা সে কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিলে আমাদের অবিশ্বাস পরাজয় স্বীকার করে না। এখানে আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর মধ্যে আনন্দময়ীকে আমরা অধিকতর সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার পূর্ব-ইতিহাস তাঁহার চরিত্রের উপর অনেকটা সন্তোষজনক আলোকপাত করে। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব—সর্বপ্রকার আচার-বিচারগত সংস্কার-নিরপেক্ষতা, সর্ববিধ সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি. পরকে আপন করিবার ও সমস্ত বিষয়ের ভাল দিক্ লক্ষ্য করিবার অসামান্য ক্ষমতা, নীরব, নিরভিযোগ সহিষ্ণুতা ও করুণ সমবেদনা—গোরাকে পুত্ররূপে স্বীকার করা হইতেই সমুদ্ভূত। আনন্দময়ীর ব্যবহার ও কথাবার্তায় যে গভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোন পাণ্ডিত্য বা তার্কিকতার পরুষতা নাই, কোন অধীত বিদ্যার উগ্র গন্ধ নাই, তাহার প্রবাহ নিতান্ত স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক, করুণায় ও সহানুভূতিতে শীতল। বিনয় ও গোরার প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তন, মনোজগতের প্রত্যেক তরঙ্গলীলা তাঁহার নখদর্পণে—এক প্রকার সহজ সংস্কারের বলে যেন তিনি তাহাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়াছেন। যেখানে তাহাদের আচরণ অনুচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, সেখানেও উচ্চমঞ্চ হইতে উপদেশের আড়ম্বর নাই, আছে সস্নেহ অনুনয়। আনন্দময়ীর চরিত্রের খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ না থাকিলেও তাঁহার আশ্চর্য উদারতা ও অনাবিল করুণার্দ্র বিচার-বুদ্ধি কোন্ মূল উৎস হইতে প্রবাহিত তাহার একটা সাধারণ ধারণা আমরা করিতে পারি। আনন্দময়ী নিজ পূর্ব-ইতিহাস বিবৃতি-প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর চাকরির সময় তাঁহার পূর্বসংস্কারগুলিকে একটি একটি করিয়া সবলে উৎপাটিত করা হইয়াছে এবং তাহাই তাঁহার সংস্কার-মুক্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু এই কারণ-নির্দেশে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। তাঁহার মুক্তি এইরূপ জোর করিয়া বেড়ি ভাঙ্গার ফল নহে, কেন-না বেড়ি ভাঙ্গিলেও তাহার কলঙ্ক দেহ-মনকে স্পর্শ করিয়া থাকে। তাঁহার মুক্তি অন্যপথে আসিয়াছে—যে রহস্যময় পথে শীতারম্ভের দমকা হাওয়া আসিয়া পুরাতন জীর্ণ পত্রগুলিকে ঝরাইয়া উড়াইয়া দেয়, যে অজ্ঞাত উপায়ে সন্তানের জন্ম-মুহূর্তে মাতৃস্তনে ক্ষীরধারার সঞ্চার হয়, সেই মুহূর্ত-মাত্র-স্থায়ী আকস্মিক বিপ্লবে গোরাকে কোলে লইবার পর তাঁহার সমস্ত পূর্বসংস্কার জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাঁহার মন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

পরেশবাবুর প্রহেলিকা আরও দুরধিগম্য। 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' কবে ও কি উপায়ে যে তিনি তাঁহার আশ্চর্য আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করিলেন পাঠককে তাহার কোন আভাস দেওয়া হয় নাই। তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যেও পাণ্ডিত্যের গুরুভার বা অপরকে নিয়ন্ত্রণের অহংকার যথাসম্ভব বর্জিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গভীর অনুভূতির সুরও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি আনন্দময়ীর ন্যায় তাঁহার জ্ঞান একেবারে সহজ সংস্কারের কথা নহে; ইহা যুক্তি-তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গভীর তত্ত্বান্বেষণের ঘোর-পাকে আবর্তিত। সুতরাং আনন্দময়ীর অবিমিশ্র স্বাভাবিকতা তাঁহাতে নাই। তাঁহার অতীত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় অধ্যায়ই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বরদাসুন্দরীর মত সংকীর্ণমনা, সাম্প্র-

দাম্ভিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ কিরূপে হইল, ব্রাহ্মসমাজের দলে তিনি একদিন কিরূপে নিজেকে মিশাইয়াছিলেন, যে বিরোধের ফলে তিনি সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করিয়া নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই বিরোধের কারণ তাঁহার পূর্বজীবনে ঘটিয়াছিল কিনা—এই সমস্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আসল কথা পরেশবাবুর ধর্মসমস্যার গ্রন্থিচ্ছেদনের উপযোগী শাণিত অস্ত্রের মত করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ অস্ত্রশালায় তাঁহাকে শান দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন পরিচয় নাই। আবার পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক প্রভাব, ম্যাথু আর্নল্ডের culture-এর মত অনেকটা শীর্ণ ও অভাবাত্মক-প্রকৃতিবিশিষ্ট (negative)— ইহা ধ্যানকক্ষের নির্জনতায় নিজেকে পূর্ণতা ও পরিণতি দান করিতে পারে, কিন্তু সংসারের জনাকীর্ণ, বিরোধ-মুখরিত পথ দিয়া অপরকে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইবার মত শক্তি ইহার নাই। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল সুচরিতা ও ললিতাই তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এমন কি ললিতার উপরও তাঁহারও প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয় নহে। মোট কথা, পরেশবাবু খুব জীবন্ত বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন না. তাঁহার উক্তিগুলির সহিত তাঁহার চরিত্রের খুব ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সংসাধিত হয় নাই। বঙ্কিমের যুগ হইতেই আমাদের উপন্যাসে একজন করিয়া অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন, দিব্যদৃষ্টি মহাপুরুষের স্থান নির্দিষ্ট আছে—রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই সেই পুরাতন ধারার অনুবর্তন করিয়াছেন। বাস্তব যুগের আবহাওয়ায় পরেশ-বাবু তাঁহার অলৌকিকত্ব বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু মহাপুরুষের অসাধারণত্ব ও দুর্জ্ঞেয়তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

অন্যান্য গৌণ চরিত্রের মধ্যে মহিমই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শেষের কবিতা'তে অমিত নিজেকে 'রোমান্সের পরমহংস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, সেইমত মহিমকে 'বাস্তবতার পরম-বক' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সমস্ত আদর্শবাদ, সমস্ত প্রকারের উচ্চ তত্ত্ব হইতে সে স্থূল সুবিধার গাঢ় নির্যাস ছাঁকিয়া লইতে পারে। গোরা ও বিনয়ের আশৈশব বন্ধুত্বের মূলধন ভাঙ্গাইয়া সে নিজ কন্যার বিবাহের বর কিনিতে উৎসুক। গোরার হিন্দুধর্মে আত্যন্তিক নিষ্ঠা, বিনয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রসূত উদারতা, কৃষ্ণদয়ালের গুরুভক্তি ও যোগাভ্যাসপ্রবণতা—সমস্তকেই সে তুল্যরূপে ও অনুরূপ কারণে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। সকল ধর্মমতের তলদেশে যে পঙ্কিলতা জমান আছে, তাহাতেই সে তাহার বিরাট্ উদরের ও সংকীর্ণ মনের আরামের শীতল প্রলেপের উপাদান পাইয়া থাকে। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সে কোন ধার ধারে না, ভণ্ডামি তাহার নিকট হেয় প্রতারণা নয়, পরন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আধুনিক বণিক্-ধর্মী মানুষ যেমন Niagara Falls-এর প্রচণ্ড শক্তিকে কল-কারখানার কাজে লাগাইয়াছে, সেইরূপ সে গোরার বিরাট্ ব্যক্তিত্ব ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে নিজ সাং-সারিক সুবিধার তুচ্ছ প্রয়োজনে লাগাইতে চাহিয়াছে। কেবল এক জামাতা অবিনাশের নিকট সে ঠকিয়াছে, কেন-না সেখানে ভাব-মুগ্ধতার সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে তাহারই মত কঠিন বাস্তবতা স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এই নূতন অভিজ্ঞতাও তাহার আত্মপ্রসাদকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, আঘাতের ঢিলটিকে প্রতিঘাতের পাটকেলরূপে ব্যবহার করিবার জন্যই সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে ও প্রতিশোধের দিন পর্যন্ত সনাতন হিন্দুধর্মের জয়গানে আকাশ-

বাতাসকে মুখরিত করিয়াছে। উচ্চ আদর্শের বাদ-প্রতিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম মতদ্বৈধের মধ্যে মহিমের তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধি, সরস বাক্‌চাতুর্য ও অকুণ্ঠিত সুবিধাবাদের প্রতি আনুগত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

কেবল তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে গ্রন্থটির স্থান খুব উচ্চে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মতদ্বৈধের বিষয়গুলি ইহাতে নিঃশেষভাবে ও গভীর চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। তবে হিন্দুধর্মের অনুকূল যুক্তিগুলিই লেখকের সমধিক সহানুভূতি ও সমর্থন-কৌশল আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার গৌরবময় অতীত ইতিহাস, ইহার অধুনা-বিকৃত উচ্চ আদর্শ, জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার পিছনে যে সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার, উচ্চাঙ্গের কল্পনাবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, আত্মরক্ষা ও নিজ উচ্চতর কল্যাণের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা-নিয়ন্ত্রণে সমাজের যে নিগূঢ় অধিকার—হিন্দুধর্মের এই সমস্ত বিশেষত্ব—যাহা বিদেশীর চক্ষে এত হাস্যাস্পদ ও যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়—লেখক আশ্চর্য সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দু-ধর্মের বিকারগুলিকেও রমণীয় করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার সহিত তুলনায় ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষতা-মূলক উক্তিগুলি নিতান্ত সাধারণ ও প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। হারাণবাবু বা বরদাসুন্দরী কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত সমর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নয়। পরেশবাবু কোন সম্প্রদায়বিশেষের মুখপাত্র নহেন—তাঁহার উদারতা ও আধ্যাত্মিক পরিণতির জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের কোন প্রশংসা প্রাপ্য নহে। যে জলন্ত উৎসাহ ও সর্বত্যাগী ধর্মপ্রেরণা ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকদিগকে শত অসুবিধা তুচ্ছ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, 'গোরা'তে তাহার প্রতি কোন সুবিচার-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখকের যুক্তিতর্ক নূতন ধর্মের দিকে ঝুঁকিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সমস্ত কবিকল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপ-তীব্র আবেগ, হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবের লুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ,—তাহার দিকে অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হইয়াছে।

(৫)

'গোরা'র পর হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটি গভীর ভাবগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁহার রচনাভঙ্গী ও বিষয়-বর্ণনা অনেকটা অভিনব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ উপন্যাসে যে বিষয় বর্ণিত হয়, তাহার মধ্যে এক অখণ্ড সম্পূর্ণতার আভাস থাকে; একটি পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি পাঠকের মনে গভীর পরিচয়ের ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি',—এই সমস্ত উপন্যাসেই চরিত্রগুলির পূর্ব-পরিচয় ও ঘটনাবিন্যাসের অনেক অংশ অকথিত থাকে; উপন্যাস জীবন-চরিত নহে যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাই তাহাতে শৃঙ্খলাক্রমে লিপিবদ্ধ থাকিবে। তথাপি উপন্যাসগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হয় যে, উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা, সমস্ত বিচিত্র বহুমুখীনতা আমাদের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর-সংঘাতে যতটুকু রস ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে সমস্তটুকুই আমরা উপভোগ করিতে পারিয়াছি, অগস্ত্যের সমুদ্রপানের মত এক নিঃশ্বাসেই তাহা আমরা শুষিয়া লইয়াছি। জীবনের খণ্ডাংশ উপন্যাসের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্য দিয়া সমগ্রভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত

হয়। কিন্তু 'গোরা'র পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যেন এই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাই না। ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থি-বহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙ্গীন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথকীকরণের চেষ্টা খুব তীব্র-ভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিতে। শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের অনির্দিষ্ট সম্পর্কটি বিমলা-সন্দীপের মোহবিহ্বল আকর্ষণ, অমিত-লাবণ্যের দূর-দিগন্তের নীলমায়াস্পৃষ্ট, রহস্যময়, চির-অতৃপ্ত প্রেম, মধুসূদন-কুমুদিনীর বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব—ইহাদের সকলের মধ্যেই ঘন তথ্য-সন্নিবেশ ও মন্থরগতি বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঈষৎ-প্রকাশিত অসম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত আছে। ইহারা যেন উপন্যাস অপেক্ষা কাব্যলোকের অধিকতর উপযোগী। এইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন বিশ্লেষণ-মাত্র-সম্বল উপন্যাসের কচ্ছপ-গতিকে অসহিষ্ণু হইয়া কবি ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাংকেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবি-কল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপন্যাসগুলিতে তথ্য ও কবি-কল্পনা বিশ্লেষণ ও সাংকেতিকতার সমন্বয় মোটেই সন্তোষজনক মনে হয় না। কতক পায়ে হাঁটিয়া ও কতক আকাশযানের সাহায্যে ভ্রমণ করিলে যেমন একপ্রকার দিশেহারা ভাবের সৃষ্টি হয়, এ-গুলিতেও অনেকটা সেই প্রকার বৈষম্য-অসংগতি অনুভব করা যায়। স্থানে স্থানে ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত আকাশের মধ্যে পরিষ্কার সূর্যালোকরেখার ন্যায় উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার ভিতর দিয়া এক প্রকার তীব্র, আশ্চর্যকর বিশ্লেষণ-কুশলতার অতর্কিত সন্ধান মিলে, কিন্তু মোটের উপর বর্ণসুষমার সমাবেশ হয় নাই। মানচিত্রের বহির্বেষ্টনরেখাটি যেমন জল-স্থলের অনিয়মিত সংমিশ্রণের ফলে বন্ধুর ও তীক্ষ্ণাগ্র দেখায়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ একটা সমরেখাহীন তীক্ষ্ণতা আছে। এই লক্ষণ যে অপকর্ষের নিদর্শন, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না, তবে ইহা যে উপন্যাসের সাধারণ ও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উপন্যাসগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায়। লেখকের ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী প্রায় সর্বত্রই epigram-এর লক্ষণাক্রান্ত। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসে একপ্রকার তীক্ষ্ণ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত, অবসরহীন, সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত, অর্থগৌরবপূর্ণ উক্তি প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাববিভোরতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য—উভয় ধারাই পাশাপাশি বিদ্যমান। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীও এই বুদ্ধি-বৃত্তির অতিরেকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে—কতকগুলি অধ্যায় যেন প্রথম বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না, ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত, epigram-সমাকীর্ণ কোন পূর্বতন বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সারসংকলন বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ 'চতুরঙ্গ'-এ শচীশের জ্যাঠামশায়ের জীবনকাহিনী বা

'যোগাযোগ'-এ মধুসূদনের পূর্বজীবনের ইতিহাস-বর্ণনা উল্লিখিত হইতে পারে। লেখকের বর্ণনা যেন আখ্যায়িকার সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া epigram-এর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। ইহাতে চমৎকৃত হইবার যথেষ্ট উপাদান আছে, কিন্তু বিশ্রাম-উপভোগের অবসর নাই। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাধান্যের জন্য আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল জন্মিয়াছে। যে-সমস্ত বিষয়ের ভাবাবেগমূলক (emotional) আলোচনা সংগত ও প্রত্যাশিত সেখানেও বুদ্ধিমূলক বিশ্লেষণের আধিক্য হইয়াছে—যথা, 'যোগাযোগ'-এ বিপ্রদাসের পিতার পত্নীবিচ্ছেদজনিত অভিমান ও মৃত্যুবর্ণনা। এখানে বুদ্ধির শুষ্ক, প্রখর উত্তাপে করুণরস নিঃশেষে উবিয়া গিয়াছে, লেখক সমস্ত বিষয়টি ভাবাবেগের দ্বারা অনুভব না করিয়া বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রায় সর্বত্রই ক্ষুরধার বাক্যবিনিময়, তীক্ষ্ণ বাদ-প্রতিবাদ শাণিত অস্ত্রের ন্যায় ভাবাবেগমূলক মোহজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিতেছে, অবিশ্রাম আলোড়নে ইহার অন্তর্নিহিত রসটিকে জমাট হইতে দিতেছে না। এই বুদ্ধিপ্রাধান্যের আর একটি ফল এই যে, উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রটিরই কথাবার্তা ঠিক একই সুরে বাঁধা, সকলেই epigram-এর ধনুকে টংকার দিতেছে, কেহই ঠিক সরল স্বাভাবিক ভাষায় নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে রাজি নয়। ভাববিহ্বলা লাবণ্য ও কুমুদিনী তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততায় অমিত ও মধুসূদনের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে, এমন কি সনাতন-পন্থী মোতির মা-ও ইহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, সকলের মুখেই একই সুরের প্রতিধ্বনি। চরিত্রানুযায়ী ভাষার পার্থক্য-রক্ষার চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না এবং এই সুরের অভিন্নত্ব নাটকীয় সুসংগতির প্রবল অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। এই হ্রস্ব, বাহুল্যবর্জিত ভাষাই উপন্যাসগুলির গতিবেগ প্রচণ্ড-রূপে বাড়াইয়া দিয়াছে, কোথাও রহিয়া-সহিয়া রসোপভোগের অবসর নাই। কেবল স্থানে স্থানে প্রেমের মুগ্ধ বিহ্বলতা বা ধ্যানমগ্ন আত্মবিস্মৃতির বর্ণনাতে লেখক নিজ প্রচণ্ড গতিবেগের পায়ে কবি-কল্পনা ও ভাবগভীরতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন, এতদ্‌ব্যতীত সর্বত্রই উদ্দাম ঝড়ের হাওয়ার মত একটা অবিরাম চঞ্চলতা উপন্যাসগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সাধারণ উপন্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথের শেষ-যুগের উপন্যাসগুলির প্রকৃতি অনেকটা স্বতন্ত্র—এই স্বাতন্ত্র্য মোটের উপর এক অসাধারণ অভিনবত্বের হেতু হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাধারণ আলোচনার পর উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক সমালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(৬)

রবীন্দ্রনাথের শেষ-যুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে চতুরঙ্গ (১৯১৬) সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের (fragmentary) লক্ষণাক্রান্ত, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাবগভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ ঔপন্যাসিক যেরূপ গভীর দায়িত্ববোধ ও সর্বতোমুখী সতর্কতার সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করেন, এখানে তদনুরূপ কিছু নাই। শচীশ-দামিনীর সম্পর্কে অতর্কিত পরিবর্তন উচ্ছৃঙ্খল গিরি-নির্ঝরের অকারণ বক্রগতি বা খেয়ালী শিশুর লীলাচাপল্যের মতই ঠেকে। তাহাদের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা যেন কোন গভীরতর নিয়মের অনুবর্তী নয় বলিয়া মনে হয়। যেন কোন গণনাতীত উচ্ছ্বসিত প্রাণবেগের বলেই তাহারা

কখন পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, আবার মুখ ফিরাইয়া পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবশ্য এই সমস্ত পরিবর্তনের একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে এবং প্রয়োজন হইলে এই সব আভাস-ইঙ্গিতকে স্ফুটতর করিয়াও তাহাদিগকে পারম্পর্য-শৃঙ্খলে গ্রথিত করিয়া একটি ছেদহীন কার্যকারণ-সমন্বয় রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা চেষ্টাকৃত পুনর্গঠনক্রিয়া মাত্র, উপন্যাস-পাঠের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ফল নহে।*

দামিনীর ভাব-পরিবর্তনই গ্রন্থমধ্যে প্রধান সমস্যা। তাহাকে প্রথমে আমরা ভক্তির দস্যু-বৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারীরূপে দেখি—স্বামীর যে অন্ধ ধর্মোন্মাদ তাহাকে গুরুদেবের চরণে চির-শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার প্রবল উপেক্ষা ও দৃঢ় অস্বীকারই তাহার চরিত্রের প্রথম পরিচয়। গুরুদেবের নারী-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি তাহাকে সত্যই বুঝাইয়াছে যে, দামিনীর এই বিদ্রোহ একটা ক্ষণস্থায়ী বিকার, শান্তিকামী, নির্ভর-ব্যাকুল প্রাণের প্রাথমিক বিক্ষোভ মাত্র। তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দামিনীর পরবর্তী ব্যবহারেই প্রমাণিত হইয়াছে—শচীশের প্রেমের আস্বাদে এই বিদ্রোহ মধুর, পুষ্প-সুরভি আত্মসমর্পণে নিজ অশান্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। কিন্তু শচীশ তাহাকে রক্তমাংসে গড়া নারীর মত না দেখিয়া তাহাকে কেবলমাত্র অশরীরী সৌন্দর্য ও সেবার প্রতীক রূপেই দেখিয়াছে—তাহার নিকট অঞ্জলি ভরিয়া লইয়াছে, কিন্তু সে যে প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে, এ ধারণা তাহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কাজে কাজেই দামিনীর আত্মবিসর্জনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা বিদ্রোহের উগ্র বীজ, শ্বাসরোধকারী ধূম সাঞ্চত হইয়া উঠিয়াছে। পর্বত-গুহায় শচীশের নিকট ব্যর্থ আত্মসমর্পণে এই ভাবের চূড়ান্ত পরিণতি।

ইহার পর আর এক পরিবর্তনের ধারা আসিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা আবার বিদ্রোহের ফণা উঁচু করিয়াছে। দামিনী আবার গৃহিণীর কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ প্রণয়াবেগ পোষা পশু-পাখীর প্রতি আদরে আপনাকে নিঃসারিত করিতে চাহিয়াছে। শচীশের প্রেমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সে শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করিয়াছে ও তাহার সহিত সহজ সৌহাদ্যপূর্ণ ব্যবহারে, তাহাকে ফরমাইশ করিয়া খাটাইয়া, সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে সরস আলোচনা করিয়া নিষ্ফল প্রণয়ের গভীর খাত কোনমতে পূরাইতে চেষ্টা করিয়াছে। শচীশের প্রতি তাহার ব্যবহারে একটা গম্ভীর নীরবতা ও কঠোর আত্মদমন-চেষ্টা আসিয়া পড়িয়াছে।

এইবার শচীশের পরিবর্তনের পালা। তাহার একান্ত ধর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত গুরুসেবা নিজের মধ্যে একটা অজ্ঞাত অভাব অনুভব করিয়া বিচলিত হইয়াছে, দামিনীর প্রতি একটা অস্বীকৃত আকর্ষণ ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর সহজ, প্রীতি-অনুযোগপূর্ণ ব্যবহার তাহার মনে একটা ঈর্ষ্যার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই বিষয়ে তাহার বিচার-বিমূঢ়তা, লেখক, শ্রীবিলাসের মুখ দিয়া খুব চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, সে দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া ঈর্ষ্যা করিতেছে, সেই আড়ালটা আছে বলিয়া আমি তাকে ঈর্ষ্যা করি।" শচীশ এই দ্বিধার হাত এড়াইবার জন্য

* এই মন্তব্যের সহিত কোন কোন সমালোচক একমত হইতে পারেন নাই। আমি তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়াও আমার পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করিতে পারি নাই।

সমুদ্রতীরে যাত্রা করিল—শচীশের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীরও ভাব পরিবর্তিত হইল। শচীশকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাদের যে হাসি-খুসি-রসালাপের আসর জমিয়া উঠিত, তাহার অবর্তমানে সে কৌতুকরসের ধারা শুকাইয়া গেল। শচীশ একটা কর্তব্য-নির্ধারণ করিয়া সমুদ্রতীর হইতে ফিরিল—সে বুঝিল যে, দূর হইতে দামিনীর সেবা-শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া তাহার স্নেহপিপাসু নারী-প্রকৃতিকে অস্বীকার করা চলিবে না। সে দামিনীকে তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে অনুরোধ করিল। এ আহ্বান প্রেমের নয়, কর্তব্যের—তথাপি ইহা মানুষের প্রতি মানুষের আহ্বান, এই আহ্বানের পশ্চাতে আছে দামিনীর ব্যক্তিত্বের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। দামিনী যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল না—তথাপি ইহাতেই তাহার বিদ্রোহের জ্বালা প্রশমিত হইল। সে শচীশকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল ও ধর্মসম্প্রদায়ের কার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিল।

দামিনীর সমস্যার কতকটা সমাধান হইল, কিন্তু শচীশের সমস্যা উগ্রতরভাবে মাথা তুলিয়া উঠিল। সে দামিনীকে যে অর্ধ-আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে তুমুল অন্তর্বিক্ষোভ চলিতে লাগিল। ধর্ম-সাহচর্য হৃদয়-বিনিময়ে উন্নীত হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃত্রিম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের ধর্মমণ্ডলী মানবের অপ্রতিরোধনীয় মনোবৃত্তির এক প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল—একজন শিষ্যের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া এই ভক্তিবিলাসের অসারতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। এই ধর্ম-বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যাইবার পর শচীশের আর প্রেমকে ঠেকাইয়া রাখিবার কোন সংগত কারণ রহিল না—কিন্তু কারণ যতই কম রহিল, আত্মসংগ্রাম তত বাড়িয়াই চলিল। শেষে শচীশ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, দামিনীর সেবা-সাহচর্য পর্যন্ত তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল ও এই অন্তর্বিরোধের অসহনীয় তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া সে দামিনীকে চির-বিদায় দিয়া বসিল।

শচীশ-কর্তৃক চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দামিনীর আবার শ্রীবিলাসকে প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজনের মাত্রা বিবাহ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিল। দামিনীর এখন যে অটল নির্ভর ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন, তাহা এক বিবাহ ছাড়া অন্যত্র মিলিবার নহে, সুতরাং শ্রীবিলাসের অভিভাবকতা স্বভাবতঃই স্বামিত্বে পৌঁছিল। দামিনীর ও আরামদায়ক শান্ত নিশ্চিন্ততা প্রকৃত প্রণয়ে মুকুলিত হইয়া উঠিল। এই বিবাহে আশীর্বাদ-বর্ষণের জন্য গুরু-হিসাবে শচীশের ডাক পড়িল। তারপর দামিনীর আকস্মিক মৃত্যু। এই মৃত্যু-বর্ণনায় করুণরস অপেক্ষা শুষ্ক তীব্র আবেগেরই আধিক্য অনুভব করা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অপূর্ণ ও আংশিকতা-দুষ্ট। শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্তনগুলি যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর-সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্বত্রই পরিস্ফুট মাঝে মাঝে বর্ণনা বা বিশ্লেষণে অপ্রত্যাশিত কবিত্ব-শক্তি ও মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্বংসোন্মুখ নীলকুঠির অযত্ন-বর্ধিত ফুল ও ঘাসের বর্ণনায় আশ্চর্য রকমের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা-শক্তির সন্ধান মিলে। গুহামধ্যে

দামিনীর স্পর্শ অদ্ভুত কবিত্ব ও সুসংগতির সহিত সরীসৃপের ক্লেদাক্ত-পিচ্ছিল স্পর্শের সহিত উপমিত হইয়াছে। তপ্তবালুকাস্তীর্ণ শুষ্ক নদীর বর্ণনাতেও কবিত্বের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ অনুভব করা যায়—"যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।" উপন্যাসটির গঠন-শিথিলতার একটি প্রমাণ শচীশের জ্যেঠামহাশয়ের অনাবশ্যকরূপে পল্লবিত জীবন-বর্ণনায়। উপন্যাসমধ্যে শচীশের জীবনাদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ অংশ নাই। অথচ শচীশ অপেক্ষা তাঁহার জীবনকাহিনী অধিকতর ধারাবাহিকতার সহিত ও সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। গল্পের শিথিল আকস্মিকতা ও প্রাণবেগ-চঞ্চল লীলাচাপল্যের মধ্যে লেখক যেরূপ উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার অবসর পাইয়াছেন সাধারণ উপন্যাসের দায়িত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাধিক্যের মধ্যে তিনি কখনই সেরূপ অবসর পাইতেন না এবং কবিত্বের এই অতর্কিত বিকাশগুলিই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

(৭)

'ঘরে বাইরে'-এর (১৯১৬) আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি স্তর আছে—প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতির জোয়ারের তলে যে আত্মপ্রচার ও নীতিজ্ঞানবর্জিত সাফল্য-লোলুপতার একটা পঙ্কিল স্তর ছিল, লেখক সন্দীপের চরিত্রে তাহাই একেবারে অনাবৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। অবশ্য সন্দীপ যে এই আন্দোলনের খাঁটি প্রতীক, ইহা বলিলে আন্দোলনের প্রতি অবিচার করা হইবে। সমাজে এমন দুই-একজন লোক আছে, যাহারা মূলত anarchic, যাহাদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নীতি-জ্ঞানের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে অণুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, যাহাদের নিঃসংকোচ বস্তুতন্ত্রতা আদর্শবাদের ক্ষীণ প্রলেপেরও অপেক্ষা রাখে না। ভোগসুখ ও তাহার চরিতার্থতার মাঝে যে একটা অস্থিমজ্জাগত নৈতিক সংস্কার দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে তাহারা কাপুরুষোচিত দুর্বলতা বলিয়া উপহাস করে। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের সমাজনীতি, দিগ্‌বিজয়ী রাজারাই ইহাদের আদর্শ পুরুষ। সমাজের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ইহারা চতুষ্পার্শ্বের পেষণে সংকুচিত থাকিতে বাধ্য হয়, ইহাদের বিরাট্ আত্মম্ভরিতা পূর্ণ প্রসারণের অবসর পায় না। কিন্তু দেশের মধ্যে যখন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার হাওয়া প্রবাহিত হয়, যখন একটা প্রবল আবেগের ঝোঁকে আমাদের ন্যায়-অন্যায়-বোধের স্বচ্ছতা মলিন হয়, যখন চাণক্য-নীতি সাধারণ নীতিকে অপসারিত করিয়া দাঁড়ায়, যেন-তেন-প্রকারেণ কার্যসিদ্ধিই চরম সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তখনই এই জাতীয় লোক প্রাধান্যলাভের একটা সুবর্ণ-সুযোগ লাভ করে। তাহাদের চরিত্রে যে একটা রাজোচিত নির্ভীকতা ও দেশকে মাতাইয়া তুলিবার উদ্দীপনী শক্তি আছে, অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং দেশপ্রীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য আত্মপ্রীতি-সাধনে লাগাইবার যে প্রচুর অবসর মিলে, কোন স্বচ্ছদৃষ্টি, সত্যপ্রিয় সমালোচনার চাপে তাহা খণ্ডিত, সংকুচিত হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলন সন্দীপের ন্যায় চরিত্র সৃষ্টি করে না, তাহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনের নির্জন কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া দেশ-প্রতিনিধিত্বের রাজসিংহাসনে বসায় ও তাহাদের প্রকৃতিগত

দস্যুবৃত্তিকে অবাধ ছাড়-পত্র দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সন্দীপের সম্পর্ক এই অনুকূল-প্রতিবেশ-রচনামূলক, তাহা জন্ম-সম্পর্ক নহে।

কিন্তু এই অসামাজিক দস্যুবৃত্তি ছাড়া আরও এক প্রকারের দস্যুবৃত্তি আছে, যাহা সমাজ-অনুমোদিত বা যাহার উপর সমস্ত সামাজিক অধিকারই প্রতিষ্ঠিত। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সমস্ত সমাজ-দত্ত অধিকার বা স্বত্বাধিকারপ্রথার মূলেই আছে এই সমাজ-সমর্থিত জোর। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিশেষ রকম জটিলতা বা প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি আছে। স্ত্রীর উপর স্বামার যে অধিকার তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিহীনতার জন্যই অসীম ও সর্বব্যাপী; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি মূলতঃ বন্দীর নিরুপায় বশ্যতা-স্বীকার। অথচ এই একাধিপত্যমূলক স্বাধীনইচ্ছাবর্জিত সম্বন্ধ লইয়া আদর্শবাদের কতই না স্তব-স্তুতি রচিত হইয়াছে! নিখিলেশ এই আদর্শবাদের মধ্যে মিথ্যাবাদকে সবলে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। অন্তঃপুরের সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে সে বিমলাকে পাইয়াছে, কিন্তু এ পাওয়াতে সে সন্তুষ্ট নয়। স্বয়ংবর-সভা ব্যতীত গলদেশে বরমাল্যলাভ ঘটে না; সমাজের দোকানে ফরমাইশ দিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণশৃঙ্খল মাত্র, প্রকৃত প্রেমিকের তাহাতে মন উঠে না। বহির্জগতের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে যাহা লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী সম্পদ্, তাহাই অক্ষয় প্রেমস্বর্গ-রচনার উপাদান। সমাজ-দত্ত উপহারকে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার-রূপে পুনর্লাভ করিলে তবেই তাহাতে প্রকৃত স্বত্বের দাবি করা যায়। নিখিলেশ বরাবরই বিমলাকে এই স্বাধীন নির্বাচনের সুযোগ দিতে চাহিয়াছে; কিন্তু বিমলা নিষ্প্রয়োজনবোধে সে সুযোগ বরাবরই অস্বীকার করিয়াছে। তারপর একদিন হঠাৎ স্বদেশ-প্রীতির কূলপ্লাবী স্রোত তাহাকে গৃহাঙ্গন হইতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া সন্দীপের রাজসিংহাসনতলে ফেলিয়াছে। এই মত্ত আবেগের মোহে সে সন্দীপকে ব্যক্তি-হিসাবে বিচার করে নাই—দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানের চরণে ভক্তি-পূত অর্ঘ্যস্বরূপ আপনাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং এখানেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নির্বাচন আমল পায় নাই। নিখিলেশের ক্ষেত্রে যেমন জড় অভ্যাস, সেইরূপ সন্দীপের ক্ষেত্রে মত্ত আবেগ বিমলার বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়াছে—দেশানুরাগের অসংবরণীয় উত্তেজনা প্রেমের ছদ্মবেশধারণের দ্বারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। বাহিরের অগ্নিপরীক্ষায় তাহাদের প্রেম আরও একান্ত ও নিবিড় হইয়াছে কি-না, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে ইহার উত্তাপে তাহাদের সম্পর্কে যতটুকু অসার ভাবপ্রবণতার প্রলেপ ছিল, তাহা গলিয়া গিয়া তাহার মধ্যে জোড়াতালিগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে বিমলা ও নিখিলেশ আপন আপন ত্রুটি ও অপূর্ণতার বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। বিমলা স্বীকার করিয়াছে যে, অতিরিক্ত পাওয়া ও কিছু না-দেওয়াই তাহার প্রণয়-জীবনের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা। অপরিমিত প্রাপ্তি কৃপণেরও মনে একটা মিথ্যা প্রতিদানেচ্ছা জাগাইয়া তুলে এবং এই অপ্রকৃত মনোভাবের বশে সেও নিজেকে স্বভাব-দাতা বলিয়া ভ্রম করে। অপর পক্ষ হইতে অজস্র দান পাইলেও নিজের প্রতিদানের বিশেষ কিছু দিবার না থাকিলে, প্রেম রক্তহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে ও বাহিরের অভিভব-প্রতিরোধের ক্ষমতা হারায়। নিখিলেশের স্বীকারোক্তি এই মর্মে যে, সে নিজের নৈতিক আদর্শের উচ্চতার মাপে বিমলাকে অস্বাভাবিকরূপে খাড়া করিতে চাহিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিকাশের অবসর দেয় নাই। আদর্শবাদীদের স্বাভাবিক দণ্ড এই যে, তাহারা

তাহাদের চতুর্দিকে ভণ্ডামির সৃষ্টি করে। নিখিলেশের সমস্ত উদার নিরপেক্ষতা ও শাসনহীন প্রশ্রয়দানের মধ্যে একটা নৈতিকতার অত্যাচার কোথাও প্রচ্ছন্ন ছিল; বিমলার প্রতি তাহার সমস্ত ক্ষমতাশীল প্রণয়াবেগের মধ্যে কোথাও একটা হিমশীতল নিষেধাজ্ঞা উহার অদৃশ্য অঙ্গুলি তুলিয়াছিল। ইহারই ফলে বিমলার প্রকৃতিটি নিজের অজ্ঞাতসারেই সংকুচিত হইয়াছিল। প্রেমের অম্লান সূর্যকিরণে সে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, নিজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ আদর্শবাদের উত্তর বায়ু তাহার অন্তঃকরণেব চারিদিকে একটা সংকোচের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিল। নিখিলেশ ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহার প্রণয়ে নৈতিক তর্জনের ছায়ামাত্রও থাকিবে না, নিজের আদর্শে স্ত্রীকে গড়িয়া তোলার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রত্যেক স্বামীরই আছে, তাহাও সে বিসর্জন দিবে। প্রণয়ের ফুলশরকে সে গুরুমহাশয়েব বেত্রের ক্ষীণতম সাদৃশ্য লাভ করিতে দিবে না—এই সবপ্রকার ভেজালবর্জিত, বিশুদ্ধ প্রেমের বসন্ত-বায়ুহিল্লোলেই তাহাদের জীবন নব নব সৌন্দর্যে ও সার্থকতাব ভরিয়া উঠিবে।

কিন্তু এই অগ্নিপবীক্ষাব প্রকৃত যাচাই করার শক্তি কতখানি, তাহা আমাদের বিচার করিতে হইবে। এই বাহিরের দ্বারা গৃহের আক্রমণ অকস্মাৎ-বর্ষণস্ফীত পার্বত্য স্রোতের মতই ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। সন্দীপের বাহিরে রাজবেশের অন্তরালে খড়-মাটি-রাংতার শুষ্ক কঙ্কাল যদি বাহির হইয়া না পড়িত, দেশপ্রীতির আবরণে তাহার নির্লজ্জ ভোগলোলুপতার বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত না হইত, যদি সে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী-পদবাচ্য হইতে পারিত, তবে এই—অগ্নিপরীক্ষার কি ফল হইত, বলা যায় না। অবৈধ প্রেমকে হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া বৈধ প্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণ করা সহজ; মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবে ধরিলে বিচার এত সহজ হইত না। নিখিলেশ নিজে যাচিয়া এই পরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার আরম্ভ-মাত্রেই তাহার অন্তরের প্রেমিক-পুরুষ হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরীক্ষা-চক্র যত বেশি বার আবর্তিত হইয়াছে পিষ্ট-হৃদয়ের বেদনা ততই সত্যানুসন্ধিৎসাকে ছাপাইয়া আর্ত ব্যাকুলস্বরে হাহাকার-ধ্বনি তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম সে বর্তমান হইতে প্রেমের পূর্ব-স্মৃতি-সমাকুল অতীতে আশ্রয় লইয়াছে; তারপর ধীরে ধীরে মোহভঙ্গজনিত মুক্তি প্রেমের স্থান অধিকার করিয়াছে। সে প্রেমের শূন্য সিংহাসনে কঠোর ব্যঞ্জনাহীন সত্যকে বারে বারে আহ্বান করিয়াছে; এই হতাশ্বাসপূর্ণ সংগ্রামে মাষ্টার মহাশয় আসিয়া তাহার সহায় হইয়াছেন। কিন্তু এই সত্যের জয় theoretically বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, ব্যবহারিক জীবনে তাহার ফলাফল প্রদর্শিত হয় নাই। একবার বিমলার ছলকলাময় আবেদন সে প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র ব্যবহারিক পরিচয়। সর্বশেষে বিমলার নিঃসঙ্গ, দুর্বিষহ জীবনের প্রতি একটা বিরাট করুণা ও সহানুভূতি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রেমের নবরূপ কি-না তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত বিমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে কি-না, তাহা অনিশ্চয়তায় আবৃত আছে। তাহাদের কলিকাতা-যাত্রাকে প্রেমের নব-জীবন-যাত্রার আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহার সূচনাতেই একটা প্রচণ্ড ও সাংঘাতিক বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। নিখিলেশের গুরুতর আঘাত, বিমলা ও সন্দীপ উভয়ে মিলিয়া যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। মৃত্যু-

বিবর্ণতার সম্মুখে প্রেমের দীপ্ত অরুণরাগ যে কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে,উপন্যাস-মধ্যে তাহার কোন বর্ণনা নাই।

বিমলার দিক্ দিয়াও পরীক্ষার ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বিমলার উক্তিসমূহ আত্মগ্লানি ও অনুতাপের সুরে পরিপূর্ণ—কিন্তু প্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শ-চ্যুতিই যে ইহার কারণ, সেই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নহি। ইহার মধ্যে চুরি আসিয়া পড়িয়া ব্যাপারটির জটিলতা ঘনীভূত করিয়াছে। বিমলার অনুতাপ যেন মোহর-চুরির জন্যই বেশি, অন্ততঃ এই মোহর-চুরিই তাহার অধঃপতনের মানদণ্ডস্বরূপ তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছে। অমূল্যের প্রতি স্নেহ ও তাহাকে বিপদ্-সাগরে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রেরণও তাহার হৃদয়ের গভীর তলদেশকে আলোড়িত করিয়াছে ও তাহার অনুতাপের মধ্যে ইহাও একটি প্রধান সুর। পতিপ্রেম-রক্ষা অপেক্ষা পরিবারের মধ্যে নিজ সম্ভ্রম ও প্রাধান্য-রক্ষা, বিশেষতঃ মেজরাণীর বক্রোক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত হইতে নিজেকে অক্ষত রাখাই যেন তাহার প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়। সন্দীপের মোহ তাহার ক্রমশঃ টুটিয়াছে সত্য, কিন্তু নিখিলেশের প্রেমের যথাযথ মূল্যও যে সে বুঝিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মোট কথা, উপন্যাস-বর্ণিত পরীক্ষার প্রেমের কষ্টি পাথর হিসাবে সেরূপ সার্থকতা নাই।

উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে সন্দীপ ও বিমলার পরস্পর আকর্ষণ। এই ব্যাপারটিই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। সন্দীপের দেশ-সেবার জন্য সহযোগিতার অসংকোচ আহ্বান কিরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সুর চড়াইয়া ও রং মাখাইয়া প্রকাশ্য প্রণয়-নিবেদনের উঁচু পর্দায় গিয়া পৌঁছিল, বিমলার উপর তাহার প্রভাব কিরূপে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া শেষে সম্মোহন-শক্তির পর্যায়ভুক্ত হইল, কিরূপে তাহার অন্তর্নিহিত লোলুপতা ও ভোগাসক্তি সমস্ত আদর্শবাদের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া বীভৎসভাবে প্রকট হইয়া পড়িল, অমূল্যের উপর অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে কিরূপে তাহার দুর্বলতা ঈর্ষ্যার রন্ধ্রপথ দিয়া প্রত্যক্ষগোচর হইল—তাহার প্রকৃতির এই সমস্ত বিকাশই খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সন্দীপের চরিত্রে লেখক শেষ পর্যন্ত একটা মহত্ত্ব ও গৌরবের সুর লুপ্ত হইতে দেন নাই—সে নিখিলেশের সম্মুখেই বিমলাকে প্রণয়িনীরূপে আহ্বান করিয়াছে, কোন সংকোচ তাহার নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্বের ও অরাজকতামূলক মনোবৃত্তির কণ্ঠরোধ করে নাই। বিমলার প্রেমকে স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটা স্তরে সে অনুভব করিয়া হৃদয়ের চিরন্তন অধিকাররূপে গ্রহণ করিয়াছে। সে 'বন্দে মাতরম্'-এর পরিবর্তে 'বন্দে মোহিনীম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতকটা মালিন্যগ্রস্ত জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত হইয়া আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

বিমলার মনোবিকারের চিত্রও খুব স্বাভাবিকভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সন্দীপের জ্বালাময় প্রচণ্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির তুলনা করিয়া সে তাহার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষোচিত দুর্বলতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। তারপর ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে তাহার মোহাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। একটা দেশব্যাপী স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেত্রী যে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ

নৈতিক মাপকাঠির অধীন নহে, তাহার বৃহৎ প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া তাহাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নূতন নৈতিক আদর্শ খাড়া করিতে হইবে, শাস্ত্রের অনুশাসন ও স্বামিপ্রেম যে তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না—ইত্যাদিরূপ যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে বিমলার উপর নিজ প্রভাব বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে। এই মাদকতার অবিরাম সেচনে বিমলার মনে এক-প্রকার বিহ্বল অসাড়তার সৃষ্টি হইয়াছে—মানসিক ক্লোরোফর্মের মধ্যে নিখিলেশের সহিত তাহার প্রেম-সম্বন্ধ কখন ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অবশেষে এমন এক সময় আসিয়াছে যখন সে সন্দীপের উদ্দীপ্ত কামনার অনলে নিজেকে পতঙ্গবৎ আহুতি দিতে উন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দীপেরও মনে হিতাহিত-জ্ঞানের বিষ প্রবেশ করিয়াছে, নিখিলেশের অনমনীয় আদর্শবাদকে যুক্তি-তর্কে ও লৌকিক ব্যবহারে সে খণ্ডন ও অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অদৃশ্য প্রভাব তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই নব-জাত ধর্মজ্ঞানের প্রভাবে তাহার প্রণয়াভিযান দ্বিধা-দুর্বল ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত হইয়াছে। সে বিমলাকে একেবারে চরম অধিকারের অন্তঃপুরে না আনিয়া ভাবাবেশ-লীলার অশোক-বনে, চরিতার্থতার মধ্যপথে রাখিয়া দিয়াছে। এই অবসরে মাহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—অর্থের দাবি একটা বিসদৃশ ঝঞ্ঝনার সহিত প্রেমের মোহন ঐকতানে বেসুরা আনিয়া দিয়াছে। অর্থ চাওয়ার মধ্যে যে একটা আত্মবিসর্জন ও প্রেমের পরীক্ষার উচ্চ আদর্শ অন্ততঃ প্রেমিকার কল্পনায় বিদ্যমান ছিল, পাওয়ার লুব্ধতা ও কাড়াকাড়ির অসংযমের মধ্যে তাহার সমস্তটাই কর্পূরের মত কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে; শেষে সন্দীপের উদ্যত আলিঙ্গন তীব্র বিতৃষ্ণার সহিতই বিমলার নিকট প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে—সর্বজয়ীর দ্বিধাহীন আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে পরাজয়ের অনুযোগপূর্ণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বিমলা এইবার সন্দীপের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সবলে তাহার মোহাবেশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে। এই পুনরুদ্ধারের কার্যেই অমূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন খাঁটি টাকার সুরের সঙ্গে মেকির সুরের তুলনা করিয়াই আমরা উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারি, সেইরূপ অমূল্যের প্রতি স্নিগ্ধ-শীতল, যুগ-যুগান্তর হইতে নিরাপদ প্রণালীতে প্রবহনশীল স্নেহধারাই সন্দীপের প্রতি জ্বর-বিকার-তপ্ত, অস্বা ।বিক, উদ্ভ্রান্ত আকর্ষণের বিকৃতির দিকে বিমলার দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। এক প্রকারের স্নেহ, কল্যাণবুদ্ধি ও চিরাগত ধর্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া, স্নেহাস্পদকে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়াছে। অপরটি বিশ্ব-সংসারকে উপেক্ষা করিয়া, সর্ববিধ সংস্কার ও সংযম-বন্ধনকে সবলে বর্জন করিয়া এক আত্মঘাতী একাগ্রতার সহিত অনিবার্য বেগে রসাতলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অমূল্যর মধ্যে পুরাতনের সুরটিই বিমলাকে নূতনত্বের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং ভ্রাতৃস্নেহের সোপান বাহিয়াই সে পতিপ্রেমের মন্দিরে পুনরারোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে মতবাদ-প্রাধান্য 'গোরা'র অপেক্ষাও প্রবলভাবে বর্তমান; সুতরাং মতবাদ-প্রাধান্যের জন্য 'গোরা'র বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়, এখানে তাহা অধিকতর প্রযোজ্য। সন্দীপ, নিখিলেশ, মাষ্টার মহাশয়—সকলেই এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি ও সমর্থনকারী। সন্দীপের মতবাদের বিশ্লেষণ সন্দীপ-চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। তাহার নিজ জীবন-নীতির বিবৃতি তাহার ব্যবহারগত জীবনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নিখিলেশের সহিত তাহার সম্বন্ধ কখনও যুক্তি-তর্কের সীমারেখা

ছাড়াইয়া উঠে নাই। বিমলার সহিত সম্বন্ধও যে তাহার হৃদয়কে গভীরভাবে ও চিরকালের জন্য স্পর্শ করিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। উপন্যাসবর্ণিত ঘটনার ফলে তাহার চরিত্রে দুইটি মাত্র পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে—(১) তাহার দ্বিধাসংকোচহীন জীবনে 'কিন্তু'র আবির্ভাব; (২) পরাজয়ের গ্লানির প্রথম অনুভব। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তন তাহার মনের উপরিভাগের ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। বিদায়-মুহূর্ত পর্যন্ত সে মূলতঃ অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে—তাহার দীপ্তি কতকটা ম্লান হইয়াছে, তাহার গর্বিত আত্মপ্রত্যয় কতকটা মস্তক অবনত করিয়াছে। সংসারে এমন দুই-একটি বস্তু আছে যাহা সন্দীপেরও অপ্রাপনীয়, এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কিয়ৎ পরিমাণে তাহাকে সংকুচিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার অরাজকতা-মূলক জীবন-নীতির কোনরূপ মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয় নাই।

নিখিলেশকেও ঠিক বিপরীত মতবাদের প্রতীক ব্যতীত স্বাধীন-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করা দুরূহ। বিমলার উক্তির মধ্যে নিখিলেশের দাম্পত্যজীবনের পূর্ব-ইতিহাসের কতক কতক আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তাহার কার্যকলাপ একেবারে আদর্শবাদের কাঁটার সঙ্গে সমতাল রাখিয়া নিয়মিত হইয়াছে। কোন হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগ, কোন অচিন্তিত-পূর্ব প্রাণ-বেগ-স্পন্দন তাহাকে তাহার আদর্শবাদের বাঁধা রাস্তা হইতে একপদও বিচলিত করে নাই। বিমলাকে লইয়া যখন দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়াছে, তখনও সে এক মুহূর্তের জন্যও নিরপেক্ষ দ্রষ্টার অংশ ত্যাগ করে নাই, বিমলাকে আপনার দিকে টানিবার জন্য কোন ব্যগ্র বাহু বিস্তার করে নাই। সমস্ত ব্যাপারটি যেন একটা রসায়নগারে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ইহাতে যেন মানুষের চঞ্চল হৃদয়বৃত্তির কোন সংযোগে নাই। অবশ্য তাহার নির্জন আত্মচিন্তার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ সংক্রামিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিভৃত চিন্তার গণ্ডি ছাড়াইয়া কোন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই। তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের যে অংশ নিজমুখে প্রকাশ করা শোভন হয় না, সেই অপ্রকাশিত অংশের ফাঁক পূরণ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর আবির্ভাব। তিনি যেন নিখিলেশের নীরব সত্তাকে ভাষা দিয়াছেন। বিমলার সাহত পুনর্মিলনের দৃশ্যেও যথেষ্ট রক্তধারা ও জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। মোট কথা নিলিশের অবিমিশ্র আদর্শবাদ তাহার ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ ও ক্ষুণ্ন করিয়াছে। অবশ্য লেখকের দিক্ হইতে বলা যাইতে পারে যে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নিখিলেশের চরিত্রে তিনি রক্ত-মাংসের আধিক্য ইচ্ছাপূর্বকই বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এই প্রকার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক নহে, কেন-না উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যদি কোন আদর্শবাদের প্রবর্তন হয়, তবে তাহাকে অশরীরী ছায়ামূর্তি করিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাকে রক্তমাংসসমন্বিত, প্রাণবেগ-চঞ্চল করিয়া দেখাইতে হইবে। নিখিলেশের ক্ষেত্রে পাঠকের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত দাবি রক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থমধ্যে এক বিমলাই মতবাদের রিক্ততা অতিক্রম করিয়া প্রাণের পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। দুই বিরুদ্ধ মতবাদের বিপরীতমুখী আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া সে বিপর্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজে সে কোনও মতবাদের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। অবশ্য সন্দীপের মতবাদের প্রতি তাহার আকর্ষণ অধিক ছিল, কিন্তু ইহা স্ত্রীজাতির অস্থিমজ্জাগত বলপ্রয়োগের প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাত মাত্র। সন্দীপ ও নিখিলেশের তর্ক যুদ্ধ যেন 'বায়ু অস্ত্রের দ্বারা বায়ু-অস্ত্র

ঠেকান', কিন্তু এই আলোড়নের সমস্ত বেগ বিমলার সুখ-দুঃখ—চঞ্চল বক্ষের উপর প্রতিহত হইয়াছে। তা' ছাড়া, বিমলাকে তাহার গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে দেখান হইয়াছে —সন্দীপ ত' বাতাসে-উড়িয়া-আসা জীব ও নিখিলেশের সাংসারিক জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায় টলমল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিমলার প্রেম-জীবন অপেক্ষা সাংসারিক জীবনেরই উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—স্বামীর প্রেম হারাইবার সম্ভাবনা অপেক্ষা সংসারের কর্ত্রী-পদ-চ্যুতি ও নিষ্কলঙ্ক সুনামে কলঙ্কস্পর্শের ভয়ই তাহার গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়াছে। মোহর-চুরি ও অমূল্যকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া পাঠানর ব্যাপারেই তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র আবেগময় হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বিমলা তাহার আত্মাভিমান, তাহার প্রশংসা-লোলুপতা, তাহার আধিপত্যপ্রিয়তা, তাহার নারীসুলভ অস্থিরমতিত্ব ও চিত্তচাঞ্চল্য লইয়া সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিমলার চরিত্র আর একদিক্ দিয়াও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থমধ্যে সে-ই লেখকের সহিত সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে একাঙ্গীভূত হইয়াছে। একমাত্র সে-ই লেখকের ভবিষ্যদ্-জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া শেষ ফলের আলোকে বর্তমান ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই আত্মগ্লানির সুর তাহার মুখে ধ্বনিত হইয়াছে—গ্রন্থশেষে লব্ধ অভিজ্ঞতা গোড়া হইতেই তাহার উক্তিকে বিষাদভারাক্রান্ত ও মোহভঙ্গের হতাশ্বাসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই পূর্ব-জ্ঞানের মধ্যেও নিখিলেশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইল, তাহার আভাস পাওয়া যায় না। ইহাতে অতীত ভ্রান্তির জন্য অনুতাপ-খেদ আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের কোন ইঙ্গিত নাই। অন্ততঃ নিখিলেশের সাংঘাতিক আঘাত ও মুমূর্ষু অবস্থা তাহার মনে যে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিল, সে সম্বন্ধেও কোন আলোকপাতের চেষ্টা নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গ্রন্থারম্ভে বিমলার খেদোক্তি কতদূর পর্যন্ত ভবিষ্যদ্-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাতে সামান্য রকমের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মৃদু অনুতাপের সুর আছে, স্বামীর রক্তাপ্লুত দেহদর্শনে আর্তদীর্ণ শিহরণ নাই। বিমলার চরিত্র-সংকলনে ইহা একটা প্রধান দোষ বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্-জ্ঞান নাই, তাহাদের দৃষ্টি উপস্থিত বর্তমানেই সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। নিখিলেশ ও সন্দীপ উভয়েই বর্তমান ঘটনার আলোচনাকালে ভবিষ্যৎ পরিণতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। বিমলা যে গ্রন্থমধ্যে প্রধান চরিত্র, লেখকের সহিত একাঙ্গীভবনও তাহার আর একটা নিদর্শন।

আর একটা অপ্রধান চরিত্রও অতর্কিতভাবে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে—সে মেজরাণী। প্রথম প্রথম তাহার প্রবর্তন নিতান্ত গৌণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলিয়াই মনে হয়। বিমলার অপ্রত্যাশিত স্বামি-সৌভাগ্যের জন্য তাহার চতুর্দিকের প্রতিবেশে যে ঈর্ষ্যা ফণা ধরিয়াছিল, সে যেন তাহার বিষোদ্গিরণের একটা যন্ত্রমাত্র। তা' ছাড়া, তাহার দেবরের প্রতি স্নেহের মধ্যে অনুচিত লালসারও ইঙ্গিত যেন কিয়ৎ পরিমাণে মিশিয়া ছিল। ঈর্ষ্যা বিমলার পদ-স্খলনসম্ভাবনার প্রতি তাহার দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়াছিল—বিমলার সমস্ত হাবভাব-বিলাসকলার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থটির সে যেন সহজ সংস্কার-বলেই মর্মভেদ করিতে পারিয়াছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, এই ঈর্ষ্যামিশ্রিত লালসার পঙ্কিলতা ভেদ করিয়া বিমল স্নেহের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বিমলার চিত্ত নিখিলেশের নিকট হইতে যতই

সরিয়া গিয়াছে, মেজরাণীর স্নেহধারা ততই শঙ্কা-ব্যাকুল সহানুভূতির সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে ; এবং শেষে এই পবিত্র স্নেহের মূল উৎসেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাল্যসাহচর্যের গভীর স্তরের মধ্যেই এই স্নেহের শিকড় বদ্ধমূল হইয়াছে। যৌবনের উন্মত্ত আবেগ বাল্যের শান্ত-মধুর সখ্যকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করে বটে, কিন্তু যৌবনের আত্মঘাতী তীব্রতা ও প্রলয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত ইহার মধ্যে নাই। নিখিলেশের সমস্ত জ্বালাময় ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে মেজরাণীর স্নেহ স্থিররশ্মি দীপশিখারই মত একটি স্নিগ্ধ, অনির্বাণ আলোক-রেখা বিকীর্ণ করিতেছে।

উপন্যাসটির ভাষা ও বিষয়ালোচনা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসসমূহের যে সাধারণ সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। গ্রন্থমধ্যে এমন প্রচুর উক্তি আছে যাহার মধ্যে epigram-এর উচ্চতম উৎকর্ষ বর্তমান এবং যাহা এই গুণের জন্য বঙ্গসাহিত্যের সুভাষিত-সংগ্রহের মধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে। কতকগুলি মাত্র উদাহরণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত হইল। ['এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো' (পৃ: ৪৪), 'মেয়েদেরি বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়' (পৃ: ৮৭) ; 'যেন সৌর-জগৎকে গলিয়ে জামাই-এর জন্য ঘড়ির চেন ক'রবার ফরমাস' (পৃ: ৯৩) ; 'তোমাকে সাধু কথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কত দিন ?' (পৃ: ১৫৬) ; 'ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি' (পৃ: ১৬৩) ; 'তারা আপনার হীনতার বেড়া দ্বারাই সুরক্ষিত, যেমন পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে' (পৃ: ২২৫) ; 'চাঁদ সদাগরের মত ও অবাস্তবের শিব-মন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মান্‌তে চায় না।']

অন্যান্য উপন্যাস-সম্বন্ধে যাহা হউক, বর্তমান উপন্যাসে এইরূপ epigram-সূচ্যগ্র ভাষা ও দ্রুতসঞ্চারী আখ্যান-প্রণালীর সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে। এই উপন্যাসে বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ এতই তীব্র ও আপস-নিষ্পত্তির অতীত যে, তাহা epigram-এর তীক্ষ্ণ দংশনেই উপযুক্ত প্রকাশ লাভ করে। মধুসূদন-কুমুদিনীর গৃহ-বিবাদ-বর্ণনাতে এরূপ ধারাল অস্ত্রপ্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে যুদ্ধে এইরূপ অস্ত্রের উপযোগিতা অবিসংবাদিত। রাজনৈতিক যুদ্ধে ভাবগভীরতার অভাব অস্ত্রক্ষেপ নিপুণতার দ্বারা পূর্ণ করিতে হয় ; পারিবারিক বিবাদে সামান্য সূচিভেদেই গভীর হৃদয়-ক্ষত হয় বলিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রয়োগ অনেকটা অপব্যয় বলিয়া মনে হয়। অস্ত্রে শান্ দিবার অবসর তাহাদেরই থাকে, যাহারা তর্কের বিষয়ের গুরুত্বে অভিভূত হইয়া না পড়ে। তারপর আখ্যায়িকার দ্রুত গতিও এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়োপযোগী হইয়াছে। উপন্যাস-বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই এমন দ্রুততালে ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রলয়-সূচনার কম্পন সকলকেই এরূপ প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়াছে, উন্মত্ত ভাবাবেগ সকলেরই সহজ-গতিকে এত প্রবলভাবে বর্ধিত করিয়াছে যে, এই দ্রুতধাবনশীল বর্ণনাভঙ্গীই এ ক্ষেত্রে উপযোগিতার দিক্ দিয়া প্রায় অপরিহার্য হইয়াছে। ঘটনাপুঞ্জের সবেগ অগ্রগতি যেন তৎ-সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে অনিবার্য বেগে তাহাদের স্রোত-প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'শেষের কবিতা' বা 'যোগাযোগ'-এ কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ও ভাবগভীরতাসমন্বিত বিশ্লেষণ আরও অধিক পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সে

দিক্ দিয়া 'ঘরে বাইরে' উহাদের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে না। নিখিলেশের পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন বা বিমলার আত্মগ্লানি সময়ে সময়ে কবিত্বের উন্নত শিখর স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর 'ঘরে বাইরে' খুব কবিত্ব-গুণ-সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু কলাগত ঐক্য ও ভাবগত সুসংগতিতে—এক কথায় সাধারণ সমন্বয়-নৈপুণ্যে (general unity of atmosphere) ইহার স্থান খুব উচ্চে।

(৭)

'শেষের কবিতা'র সহিত তুলনায় 'যোগাযোগ'-এ (১৯২৯) ভাগবত ও গঠনগত ঐক্য অপেক্ষাকৃত কম। ইহাতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যের সহিত কবিত্বপূর্ণ ভাবগভীরতার সমন্বয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। বিশেষতঃ, ইহার গঠনে অনেক আলগা তন্তু আছে। ইহার আরম্ভ ও শেষ উভয়ের মধ্যেই একটা অতর্কিত আকস্মিকতা লক্ষিত হয়। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মধুসূদনের বংশপরিচয় ও পূর্ব-ইতিহাস লইয়াই ব্যাপৃত; তৃতীয় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত কুমুদিনীর পৈতৃক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন-কুমুদিনীর পরস্পর সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু বুঝিবার জন্য কতকটা অতীত-আলোচনা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কিন্তু গ্রন্থের কলেবরের সহিত তুলনায় উপক্রমণিকা যেন একটু অযথা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ কুমুদিনীর দিক্ দিয়া যখন কোন পালটা আক্রমণের চেষ্টা নাই, তখন তাহার পূর্ব-ইতিহাস অতটা বিস্তৃত না হইলেও চলিত। কুমুদিনীর প্রথম অবস্থায় স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল আত্মসমর্পণ কতকটা তাহার পিতা-মাতার গূঢ়-অভিমান-ব্যথিত tragic সম্বন্ধের প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি উচ্চবংশীয় হিন্দু-পরিবারে এই প্রকারের মধুর, আত্মবিসর্জনশীল দাম্পত্যসম্পর্ক এতই সাধারণ ও স্বাভাবিক যে, তাহার কোন বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রাথমিক অধ্যায় কয়টির ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীও ঠিক উপন্যাসের উপযোগী নহে—ইহাদের হ্রস্ব সংক্ষিপ্ততা ও তীক্ষ্ণ, ঝাঁজালো বাক্-প্রবণতা যেন পূর্ব-পরিচিত বিষয়ের সারাংশ-সংকলনের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দলালের মৃত্যুদৃশ্যেও করুণরস অপেক্ষা বুদ্ধিগত আলোচনারই প্রাধান্য, লেখক যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার অবতারণা করিয়াছেন, ইহার অন্তর্নিহিত করুণরসটি মোটেই তাঁহাকে অভিভূত করে নাই। Epigram-এর তীক্ষ্ণাগ্রভাগে যেটুকু অশ্রুবিন্দু উঠে, তাহা মোটেই পাঠকের হৃদয় দ্রব করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

গ্রন্থের শেষদিকে এই অসংলগ্ন অতর্কিততা আরও প্রবলভাবে পরিস্ফুট। কুমুদিনীর স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইল তাহার কোন আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। পুত্র-সম্ভাবনা তাহার সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বলিয়াই মানিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদের দাম্পত্যবিরোধের অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসটি অকস্মাৎ এক বিরাট শূন্যতার গহ্বরমুখে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। সাধারণ দম্পতির ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংযোগ-সেতুর কাজ করিয়া থাকে; কিন্তু কুমুদিনী-মধুসূদনের মধ্যে যে প্রবল ও মূলীভূত অনৈক্য স্পষ্ট হইয়াছে তাহা এই অতি সহজ ও সাধারণ উপায়ে পূরণ হইবার নহে। তদ্ব্যতীত কুমুদিনীর স্বামিগৃহ-ত্যাগের পরবর্তী অধ্যায়-গুলি কেবল স্ত্রী-জাতির অধিকার ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় পুরুষের হস্তক্ষেপের সীমা-বিচার লইয়া

তর্ক-যুক্তি ও বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ—উহা কেবল উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে বিরোধ-কাহিনী মানুষের হৃদয়ের মধ্যে শেষ হইয়াছে তাহাই সংস্কারকের বক্তৃতা-মঞ্চে অনর্থক পল্লবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের রস মোটেই সমৃদ্ধতর হইয়া উঠে নাই। উপন্যাসের দিক্ হইতে কুমুদিনীর স্বামিগৃহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে উহার গঠন-সৌষ্ঠব ও সমন্বয়-কৌশল আরও উন্নততর হইত।

কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা বাদ দিলে, চরিত্রবিশ্লেষণের দিক্ দিয়া মধুসূদন-কুমুদিনীর চরিত্র-বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। ভাগ্যদেবতা যাহাদিগকে বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, তাহারা যেন দুই স্বতন্ত্র রাজ্যের জীব, তাহাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কোথাও যেন একটা মিলন-ক্ষেত্র নাই। মধুসূদন যান্ত্রিক ব্যবসায়-সাফল্য-জগতের অধিবাসী; প্রতিবাদহীন, উদ্ধত আধিপত্য ও অবাধ প্রভুত্ব-বিস্তার তাহার জীবনের কাম্যতম প্রবৃত্তি: সে কুমুদিনীকে চাহিয়াছে প্রণয়িনীরূপে নহে, তাহার লাঞ্ছিত বংশগৌরবের সাহংকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, তাহার সর্বগ্রাসী দাম্ভিকতার পূর্ণতম পরিতৃপ্তি হিসাবে। সে কুমুদিনীকে তাহার স্নেহ-সুশীতল পিতৃগৃহ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহার উদ্ধত, আকাশস্পর্শী বিজয় মুকুট পরিবার জন্য, তাহার চিরপোষিত ক্রূরতম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য—কুমুদিনীকে লইয়া তাহার হৃদয়বৃত্তির কোন কারবার নাই। আর কুমুদিনী মধুসূদনকে চাহিয়াছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবৃত্তি লইয়া—দৈবসংকেত তাহার স্বাভাবিক মধুর আত্মসমর্পণ-প্রবৃত্তিকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। ফুল যেমন তাহার বিকাশোন্মুখ সমগ্র হৃদয় লইয়া বসন্ত পবনের প্রতীক্ষা করে, বাঁশি যেমন করিয়া তাহার সমস্ত রন্ধ্রপথে ব্যাকুল আবেগ সঞ্চারিত করিয়া বাদকের ওষ্ঠ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ কুমুদিনী তাহার হৃদয়ের পবিত্রতম, মধুরতম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আদর্শ দয়িতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যখন ডাক আসিল, তখন সে কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়া, ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া, তাহার সমস্ত ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসপ্রবণতার সহিত সে ডাকে ছুটিয়া বাহির হইল, সমস্ত দুর্লক্ষণ, অশুভ সংশয়, ভ্রাতার স্নেহপূর্ণ সতর্কবাণী, বহির্জগতের সন্দিগ্ধ নিষেধ—সে সবলে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার বিধিনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিবার জন্য পা বাড়াইল। বহির্জগতের মত অন্তর্জগতের সংঘর্ষের যদি কোন বাহ্য লক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদন-কুমুদিনীর মিলন-মুহূর্তে ধূমকেতু-পুচ্ছপৃষ্ঠ সৌর-জগতের ন্যায় একটা প্রলয়কারী অগ্ন্যুৎপাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে ঘটিল তাহাতে এক মধুসূদনের পক্ষে বিলাতী ব্যাণ্ডের বাজনা, গোরানাচ ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষপরিপূর্ণ শিষ্টাচার-বিনিময় ছাড়া এই অন্তর্বিপ্লবের আর কোন বাহিরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কুমুদিনীর পক্ষ হইতে এক আশঙ্কাজড়িত প্রতীক্ষা ও অন্তর্গূঢ় ভাববিপর্যয় নীরবে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিবাহের পর হইতেই এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতি মানবাত্মার মধ্যে এক প্রবল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আক্রমণের ঝ'ড়ো হাওয়ার সমস্তটা বহিয়াছে মধুসূদনের দিক্ হইতে। কুমুর দিকে প্রথম প্রাণপণ সহিষ্ণুতা, আদর্শের সহিত বাস্তবকে মিলাইবার করুণ, একাগ্র চেষ্টা ও এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর একটা মোহভঙ্গজনিত আত্মগ্লানি, নীরব বিমুখতা ও দৃঢ় অথচ সংস্কার-কুণ্ঠিত প্রত্যাখ্যান। এই প্রাণপণ সংগ্রামে উত্থান-পতন ও জয়-পরাজয়ের স্তর ও পরিবর্তনের চরম মুহূর্তগুলি অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মধুসূদনের বিবাহে প্রেমের নাম-গন্ধও ছিল না—ইহা কেবল বংশাভিমানের ও উৎপীড়নপ্রিয়তার নির্মম অভিব্যক্তি। এই মিলনে কোমল পুষ্পধনু অপেক্ষা ইস্পাতের অসিরই অধিক ব্যবহার হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরবংশের যৎপরোনাস্তি অপমানের পর মধুসূদন যখন কুমুকে বিবাহের গাঁট-ছড়ায় বাঁধিয়া যাত্রা করিল, তখন এই বন্ধন যে প্রকৃতপক্ষে বন্দীর লৌহশৃঙ্খল সে বিষয়ে সে কোন মৌখিক শিষ্টাচারের ছলনাও রাখে নাই; তাহাব যুদ্ধের বজ্রমুষ্টি কোনরূপ গোপনতার রেশমী দস্তানায় আবৃত হয় নাই। নূরনগরের সমস্ত কোমল, স্নেহমণ্ডিত স্মৃতিকে নির্দয় পেষণে পীড়িত করায় তাহার ক্রূরতম আনন্দ। সুতরাং তাহার প্রথম আক্রোশ পড়িয়াছে বিপ্রদাসের স্নেহোপহার নীলা আংটির উপর। কুমুদিনীর অনভ্যস্ত অপমান-ব্যথার মূর্ছাকে সে তীব্র ব্যঙ্গের সহিত উপহাস করিয়াছে; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও সে কুমুর স্বাধীন ইচ্ছাকে পদে পদে আহত ও অপমানিত করিয়াছে। হাবলুকে একটা সামান্য কাচের কাগজ-চাপা দিবারও যে তাহার অধিকার নাই, ইহা তাহাকে তীব্র অপমান-জ্বালার সহিত অনুভব করাইয়াছে, তাহার দাদার চিঠিপত্র ও আংটি চুরি করিয়াছে; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের সমস্ত মাধুর্য ও সহজ প্রীতিটুকু সে কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতব্যয়িতার সহিত নিঃশেষ করিয়াছে। এই রূঢ় আঘাতে কুমুদিনীর মানস আদর্শ ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়াছে; তাহার সমস্ত শিক্ষা-সংস্কার, আত্মদমন-ক্ষমতা লইয়াও সে এই মূঢ় পাশবিকতাকে স্বামীর ন্যায়সংগত অধিকার বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। আঘাতের কোন প্রতিঘাতচেষ্টা না করিয়া সে নীরব অসহযোগের অস্ত্র অবলম্বন করিয়াছে—শয্যাগৃহ ছাড়িয়া নীচে বাতিঘরে আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছে। এ দিকে ভিতরে ভিতরে মধুসূদনের অন্তরেও একটা পরিবর্তন চলিতেছিল; তাহার দাম্ভিক অত্যাচারপ্রিয়তার তপ্তবালুকার মধ্যে একটা অর্ধপরিণত প্রেম ও প্রশংসার অনিবার্য উচ্ছ্বাস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমুর রূপ, তাহার আত্ম-বিস্মৃত, ধ্যানবিমুগ্ধ ভাব, তাহার সংসারানভিজ্ঞ সরলতা মধুসূদনকে রহিয়া রহিয়া এক অভিনব অনুভূতির স্পর্শে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল; ব্যবসায়-ক্ষেত্রের লৌহ-দণ্ড, অফিসের অক্ষুণ্ণ কর্তৃত্বাভিমান যে এই নূতন রাজ্যে প্রযোজ্য নয়, এইরূপ একটা সম্ভাবনা তাহার বিস্ময়বিমূঢ়, সংকীর্ণ চিত্তে ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার আদেশের চড়া সুরে একটু অনুনয়ের কোমল আভাস মিশিল। সে কুমুর নিকট তাহার পর্বোন্নত শির একটু নত করিল—তাহার দাদার টেলিগ্রাম ফিরাইয়া দিল; নবীন ও মোতির মার নিকটে সে এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে নিজ ত্রুটি স্বীকার করিল। এইখানে দ্বন্দ্বের প্রথম স্তর শেষ হইল বলা যাইতে পারে।

এই প্রকাশ্য ত্রুটি-স্বীকারের দ্বারা মধুসূদনের আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল; কিন্তু কুমুর কর্তব্য-সমস্যা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মধুসূদনের যথেচ্ছাচারের মধ্যে যে বিমুখতা সহজ ও শোভন ছিল, তাহার নতি-স্বীকারের পর সেই বিমুখতা নৈতিক সমর্থন হারাইবার মত হইল ও উহাকে কর্তব্যচ্যুতির সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মধুসূদন যাহাকে শান্তির শ্বেত-পতাকা বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল, কুমুদিনী তাহাকে অবাঞ্ছিতের নিকট আত্মসমর্পণের, হৃদয়গত ব্যভিচারের কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত দেখিল। মধুসূদনের তর্জন-ভর্ৎসনা অপেক্ষা তাহার কামনা-চঞ্চল, ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গন-বিস্তার তাহার নিকট আরও ভয়াবহ মনে

হইল। অবশেষে একদিন মধুসূদনের লোলুপ নির্বন্ধাতিশয্যের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু একটা ক্লেদাক্ত, অশুচি স্পর্শের স্মৃতি তাহার সতীত্বের মানস-আদর্শের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। এ দিকে এই অনিচ্ছার, অবহেলার দানে মধুসূদনের মনে একটা গভীর ক্ষোভ ও অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল—তাহার অস্থিমজ্জাগত প্রভুত্ব-জ্ঞান ইহাতে তাহার অভ্যস্ত, প্রত্যাশিত সম্মান পাইল না। সে কুমুর হৃদয়—অথবা হৃদয়লাভের সূক্ষ্ম অধিকার-বোধ তাহার যদি নাও থাকে তবে—অন্ততঃ তাহার দেহের অক্ষুণ্ণ অসংকুচিত অধিকারলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। যেরূপ স্বতঃউৎসারিত একাগ্রতার সহিত কুমু হাবলুকে রুমাল দেয় বা তাহার নিকট এলাচদানার উপহার গ্রহণ করে, নির্লজ্জ ভিক্ষুকের ন্যায় মধুসূদন তাহার সহিত লেন-দেনের মধ্যেও সেই বেগবান্ আবেগের যাচ্ঞা করিয়া ফিরিতে লাগিল। মূঢ়, অনুভূতিহীন সে এখনও মনে করিল যে, উপহার কাড়িয়া লইলে স্নেহের উত্তপ্ত স্পর্শটুকুও সেই সঙ্গে তাহার মুঠার মধ্যে আসিবে বা উপহার দান করিলে তাহা সমান ব্যগ্রতার সহিত গৃহীত হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া সে হাবলুর রুমাল কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু রুমালের মধ্যে স্নেহের গন্ধরসটুকু অত্যাচারের প্রবল হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; কুমুকে থালাভরা এলাচদানা উপহার দিয়াছে, কিন্তু মিষ্টান্নে প্রেমের মধু কম পড়িয়াছে। অন্তরের সহিত সংযোগরহিত বাহ্য বস্তুকে সে যতই জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, ততই তাহার আকর্ষণের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিয়াছে, প্রবল আগ্রহ ধরিবার বস্তু না পাইয়া ব্যর্থ ক্ষোভে গুমরাইয়া মরিয়াছে। আসলে সে প্রেমিক নহে, সে প্রভু; সুতরাং প্রেমের প্রত্যাখ্যান অপেক্ষা প্রভুত্বের অপমান তাহাকে আরও বিষমভাবে বাজিয়াছে। তাহার অনভ্যস্ত নতি-স্বীকার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহার অপ্রতিহত প্রভুত্বগর্বকে আরও প্রবলভাবে উত্তেজিত করিয়াছে। কুমুদিনীর হাতে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত দাদার চিঠি দেওয়ার পরেও যখন তাহার মুখে প্রাপ্তি-স্বীকারের প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল না, তখন তাহার চিরাভ্যস্ত মর্যাদাবোধ মাথা তুলিয়া উঠিয়া প্রেমের ক্ষীণ প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে।

এই মুহূর্তে একটা অপ্রত্যাশিত ধারা আসিয়া রুদ্ধপ্রায় প্রেম-প্রবাহের সহিত মিশিয়াছে ও বর্ষাস্ফীত নদীর ন্যায় তাহার মধ্যে একটা দুর্বার গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। নবীনের ষড়যন্ত্রে উদ্‌যোগী মধুসূদন জীবনের মধ্যে প্রথমবার ভাগ্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে—কুমুদিনীকে সে নিজ বৈষয়িক সফলতার অধিষ্ঠাত্রী ভাগ্য-লক্ষ্মী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এইবার তাহার বলিষ্ঠ, একনিষ্ঠ প্রকৃতির সহৃদয় অবিভক্ত শক্তি তাহার প্রসন্নতা-লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—যখন প্রণয়িনীর সহিত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্মিলন হইল, তখন তাহার পূজার আর কোন দ্বিধা ভাব রহিল না। তাহার নতি-স্বীকারের চরম মুহূর্ত আসিল অপহৃত আংটির প্রত্যর্পণে—আংটি দিয়াই সে পুরাণ-বর্ণিত শচী ও রতির দ্বন্দ্বের অবসান অভিনন্দন করিয়া লইল। এই একাত্মীভূত শচী-রতির হাতে সে তাহার অগ্রজের উপহার সরস্বতীর বীণা পর্যন্ত তুলিয়া দিল, কিন্তু তাহার একান্ত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও বীণাতে প্রেমের সুর ঝংকৃত হইল না। মধুসূদন তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত দান-শক্তি লইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা দেবীর চরণে উপহার দিবার জন্য নতজানু হইয়া রহিল, কিন্তু দেবীর প্রার্থনার ক্ষুদ্রতায় এই মোহাবেশ নিঃশেষে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। যিনি ভক্তের সর্বস্ব লইতে পারিতেন তিনি

বেহারাকে একখানি শীতবস্ত্র দিবার অনুমতি মাত্র প্রার্থনা করিলেন; যাত্রার কার্পণ্যে আয়োজনের প্রাচুর্য-সম্ভার উপহসিত, বিড়ম্বিত হইল। ভক্তের অন্তর-বিকশিত হৃদ্‌পদ্ম হইতে অপসারিত হইয়া দেবী চিরকালের জন্য মৃন্ময়ী প্রতিমার ধূলিস্তূপে অবতরণ করিলেন। এই চরম রিক্ততার মুহূর্তে দেবী-পূজকের উপর ডাকিনীর দৃষ্টি পড়িল ও মধুসূদন-কুমুদিনীর বিপর্যয়ময় ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল।

কুমুর অনাবৃত বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা মধুসূদনের প্রেম-স্বপ্ন টুটাইয়া দিয়া আবার তাহার সুপ্ত আত্মসম্মান ও প্রভুত্ব-গৌরবকে অপমানের কশাঘাতে জাগাইয়া তুলিল। কুমুদিনীর সহিত তাহার সম্বন্ধ এইবার প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন হইল। এইবার মধুসূদন শ্যামার স্থূল লালসার ক্রোড়ে আপনাকে নিঃসংকোচে, এমন কি স্পর্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত নিক্ষেপ করিল। কুমুদিনীর সহিত মিলনের পথে নানা সূক্ষ্ম, অলক্ষ্য অন্তরায়, নানা অনির্দেশ্য সংকোচ, একটা সুদূর নির্লিপ্ততার স্পর্শাতীত ব্যবধান, একটা অসম্পূর্ণ অধিকারের অনিশ্চয়তা মধুসূদনকে বড়ই পীড়িত করিতেছিল। কড়া হুকুমের সোজা বাঁধা রাস্তায় তাহার চলা অভ্যাস—প্রেমের বাঁকা অলি-গলির মধ্যে, অগ্রসর-পশ্চাদ্‌বর্তনের দুর্ভেদ্য গোলক ধাঁধার সহিত তাহার কোনদিনই পরিচয় ছিল না। প্রেমের যে সনাতন নীতি—stooping to conquer—অবনতির দ্বারা জয়লাভ--তাহার রহস্য তাহার নিকট চিরদিন অপ্রকাশিত ছিল। হুকুম দেওয়া ও হুকুম মানা, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, ইহাই তাহার নিকট সংসারের একমাত্র সত্য ও বাস্তব নীতি। এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনটির দ্বারাই যখন কুমুদিনীকে মিলিল না, তখন সে তাহার দিক্ হইতে মনকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিয়া অনায়াস-লভ্য শ্যামার প্রতি নিবিষ্ট করিল। এই প্রেমে তাহার কর্তৃত্বাভিমান তিলমাত্রও সংকুচিত হইল না, কোন দুশ্চিন্তাপূর্ণ সমস্যা মাথা তুলিল না, কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা অঙ্কুরিত হইল না।

তাহাদের এই প্রেমাভিনয়ের চিত্রটির মধ্যে ইতর ভোগ-লিপ্সা ও রক্ত-মাংসের স্থূল আকর্ষণের দিকটা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মধুসূদন শ্যামাকে দাসীর অধিক সম্মান দেয় নাই—শ্যামাও বস্ত্রালংকার ছাড়া যদি সূক্ষ্মতর কোন দাবি করিয়া থাকে, তাহা একটা বিরাট্ সংসারের উপগৃহিণীত্বের ছদ্মগৌরব। লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি শ্যামার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণের একটা সম্পূর্ণ চরিত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়াছেন—শ্যামাকে সে চাহিয়াছে প্রণয়িনীরূপে নহে, এমন কি ইন্দ্রিয়লালসার জন্যও নহে; তাহার ক্ষত-বিক্ষত আত্মসম্মানের শীতল প্রলেপ-হিসাবে। কুমুদিনী-কৃত প্রত্যাখ্যানের পর শ্যামার সাগ্রহ অভিনন্দন তাহার নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার-করণের উপায়রূপেই তাহার নিকট এত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

মধুসূদন-শ্যামার এই অনুগ্রহ-নিগ্রহ-মিশ্রিত, পঙ্কিল-লালসাময় সম্পর্কের স্থিতিকালের মধ্যেই উপন্যাসের যবনিকাপাত হইয়াছে। এই পাপ-কলুষিত সংসারে কুমুদিনী কিভাবে ও কিরূপ মর্যাদা লইয়া ফিরিয়াছে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। মধুসূদন তাহাকে নিজ ভাবী বংশধরের জননী-হিসাবেই ডাক দিয়াছে এবং বিপ্রদাসের সমস্ত উচ্চ সমাজ-নীতি-মূলক বক্তৃতা সত্ত্বেও, নারী-স্বাধীনতার সীমানির্দেশ-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াই কুমুদিনীকে সে ডাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার সংসারের এই নূতন ও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের মধ্যে

তাহার স্থান কোথায়—এই প্রশ্ন আমাদের কল্পনা ও অনুমান-শক্তিকে পীড়িত করিতে ছাড়ে না। মধুসূদন কি শ্যামার কলুষিত আসনের এক পার্শ্বেই তাহার অবহেলার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, না, স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানের জননীকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? যে অববিনাশ ঘোষালের জন্মতিথি রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র ও পুষ্প-মাল্য-সম্ভারের দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে তাহার পিতা-মাতার মর্মান্তিক বিচ্ছেদকে কিরূপ যোগসূত্রে বাঁধিয়াছে, তাহাদের বিরোধ-বিড়ম্বিত সম্পর্কের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আপস-সন্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে, এই সমস্ত অনুচ্চারিত কৌতূহলপ্রশ্ন নীরবে উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াই উপন্যাসটির অতর্কিত পরিসমাপ্তি আর্টের দিক্ দিয়া একটা গুরুতর ত্রুটি বলিয়াই ঠেকে।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র-সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার নাই। নবীন ও মোতির মা মধুসূদনের প্রতিপাল্য হিসাবে তাহার সংসারে মাথা নীচু করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও মানব-চরিত্র-অভিজ্ঞতায় তাহারা মধুসূদনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের সমস্ত খামখেয়ালী ব্যবহার, তাহার ক্রোধের তাপমান-যন্ত্রে পারদের উত্থান-পতন-রহস্য তাহাদের নখ-দর্পণে, তাহার সমস্ত গতি-বিধি ও ক্রিয়াকলাপ তাহারা অভ্রান্ত গণনার দ্বারা পূর্ব হইতেই স্থির করিতে পারে। নবীনের ষড়যন্ত্রকৌশল যে-কোন আধুনিক রাজনীতিবিদের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে—সে এমন কৌশলে ফাঁদ পাতিয়াছে যে, মধুসূদনের ন্যায় শ্যেনদৃষ্টি, সদা-সন্দিগ্ধ-চিত্ত লোক কিছুমাত্র না বুঝিয়া সেই ফাঁদে পা দিয়াছে। তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে epigram-এর অতি-প্রাচুর্য-সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মোতির মার মুখে এই epigram একটু বে-মানান শোনায়—তাহার মত প্রচীন-পন্থী, কিন্তু মতপ্রকাশের ভঙ্গীটি অতি আধুনিক। আসল কথা, উপন্যাসের কোন পাত্র-পাত্রীরই চরিত্রানুযায়ী বাচনভঙ্গী নাই, সকলেই নির্বিচারে লেখকের বুদ্ধি-প্রদীপ্ত বাক্‌বৈদগ্ধ্য প্রয়োগ করিতেছে; কাহারও একটা নিজস্ব ভাষা বা প্রকাশবিধি নাই। ইহা যে উপন্যাসের নাটকোচিত গুণ-বিকাশের পক্ষে একটা প্রবল অন্তরায় তাহা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের স্নেহ-সম্পর্কটি অতি লঘু-কোমল স্পর্শের সহিত, অপরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কুমুদিনীর দাদার ও স্বামীর সহিত সম্পর্কের মধ্যে কি বিষম বৈপরীত্য। একদিকে সূক্ষ্ম মমতাময় সহানুভূতি, যাহাতে এক হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্পন্দন, ক্ষীণতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত অপর হৃদয়ে নিখুঁতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়; অন্যদিকে রুক্ষ-পরুষ ক্ষমতা-বিস্তার, হৃদয়ের কোমল অঙ্কুর ও নবজাত সুকুমার বিকাশগুলির নির্মমভাবে পদদলন। কুমুদিনীর চরিত্রে নারী-হৃদয়ের সমস্ত অবর্ণনীয় মাধুর্য ও নারী সৌন্দর্যের সমস্ত অপার্থিব রমণীয়তার ঘনীভূত নির্যাস কবিত্বের সুরভি-মিশ্রিত হইয়া যেন দেহ-ধারণ করিয়াছে—তাহার স্থান যেন কাব্যের কল্পলোকে, উপন্যাসের নির্মম, ঘাত-প্রতিঘাত-পীড়িত বাস্তব-ক্ষেত্রে নহে। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে অমিতের মুগ্ধ-চঞ্চল, আবেশময় প্রেমিককল্পনার সাহায্যে; তাহার অনুভূতি লইয়া না দেখিলে লাবণ্যকে বিশেষ লাবণ্যময়ী বলিয়া বোধ না হইতে পারিত; তাহার শিক্ষয়িত্রীত্বের ভিজে-ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্য হইতে প্রেমের দীপ্ত মণিরাগ বাহির হইয়া আসিবার পথ পাইত না। কুমুদিনীর সৌন্দর্য কিন্তু

এরূপ বাহ্য-সহায়তা-নিরপেক্ষ। কোন প্রেমিক নয়নের মুগ্ধ ইঙ্গিত তাহার অন্তরের রূপকে বহিঃপ্রকাশের পথ নির্দেশ করে নাই। গোলাপ যেমন কণ্টক-বাধার চারিদিকে তাহার আরক্ত সৌন্দর্য বিকাশ করে, তেমনি কুমুদিনীর চরিত্র-মাধুর্য মূঢ় অবিবেচনা ও অনাদরের আবেষ্টনের মধ্যে আরও চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য বাহির অপেক্ষা অন্তরেরই বেশি; তাহার সৌকুমার্য, তাহার গভীর ভক্তি ও বিশ্বাসপ্রবণতা, তাহার বাহ্য-জ্ঞানরহিত, আত্মজিজ্ঞাসাশীল ধ্যানময়তা তাহার চারিদিকে একটা অধ্যাত্ম জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করিয়াছে। সে যেন কাব্যের নায়িকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি (typical); তাহার মধ্যে উপন্যাসোচিত ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণের তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। উপন্যাসের বাস্তববিরোধ-কণ্টকিত জগৎ তাহার পরীক্ষাক্ষেত্র; কিন্তু কাব্যের অপরূপ সুষমা-মণ্ডিত কল্পলোকই তাহার জন্মস্থান।

'শেষের কবিতা' (১৯৩০) সমন্বয়-সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণশক্তির দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায়, অবান্তর বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনে ইহা অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অমিত ও লাবণ্যের প্রণয়-কাহিনী অনন্যসাধারণতার দিক্ দিয়া অতুলনীয়। অমিতের চরিত্রে যে একটা সদা-চঞ্চল, প্রথা-বন্ধন-মুক্ত, বিচিত্র-লীলায়িত প্রাণ-হিল্লোল আছে, তাহাই তাহার সমস্ত চিন্তা-ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে এমন একটা নৃত্যশীল গতিবেগ দিয়াছে, যাহা আমাদের পদাতিক জীবন-যাত্রার সম্পূর্ণ অননুমেয়। মানুষের এই প্রথাবদ্ধ, পদাতিক জীবনের যান্ত্রিক গতির মধ্যে প্রেম যেন এক বিচিত্র অননুভূতপূর্ব ছন্দের নূপুর-নিক্বণ। জীবনে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব যে মদির বসন্তবায়ুর মত প্রাণকে নব নব বিকাশে মুকুলিত করিয়া তোলে ইত্যাদি প্রকারের সাধারণ উক্তির সহিত কাব্য-সাহিত্য আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছে। কিন্তু 'শেষের কবিতা'য় এই সাধারণ জ্ঞান একটি অনন্যসাধারণ পুরুষ ও নারীর ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত ও প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া বাস্তব জগতের রূপ ও স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটি যেন Browning-এর অমর কবিতা "Two in the Campagna'-এর সুরে বাঁধা, তাহারই মর্মকথার আশ্চর্য কবিত্বপূর্ণ, উদাহরণ-সংবলিত ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতীকরণ। প্রেমের জল-স্থল-আকাশ-বিকীর্ণ সর্বব্যাপী ইঙ্গিত; ইহার বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল আকস্মিক ও সুদূর-প্রসারী বিস্তার; ইহার উদ্বেলিত আনন্দ-সাগর হইতে নূতন নূতন খেয়ালী কল্পনার ঢেউ; ইহার বাস্তব-বিদ্রূপ-শীল, ঊর্ধ্বপক্ষ আকাশ-বিহার; ইহার গভীর সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা ও মুহূর্ত পরের ক্লান্তি ও অবসাদ; ইহার সূক্ষ্ম, তৃপ্তিহীন অভাব-বোধ ও মিলন-পথের অতর্কিত অন্তরায়; সর্বোপরি ইহার গূঢ়-নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, অথচ অভাবনীয় শেষ পরিণতির চমকপ্রদ অসংগতি—প্রেমের এই সমস্ত রহস্যময় বৈচিত্র্যই উপন্যাসে পূর্ণভাবে আলোচিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আমাদের সাধারণ সাংসারিক জীবনে প্রেমের যে কতকটা অপব্যবহার ও আদর্শচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহা এইরূপ কাব্য-উপন্যাসই আমাদের স্বভাবতঃ লক্ষ্যহীন দৃষ্টির গোচর করে। সাংসারিকতার ক্ষুদ্র প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা প্রেমের প্রকৃতির সমস্ত বৈচিত্র্য ও দুর্জ্ঞেয়তা নষ্ট করিয়া ফেলি—সংসারের বাঁধা রাস্তায় চলিবার জন্য প্রেমের বিসর্পিত গতিকে অস্বাভাবিকরূপে সরল করি—প্রেমের সোনার ব্যব-

হারিক একনিষ্ঠতার খাদ মিশাইয়া প্রেমকে সাংসারিক বেচা-কেনার হাটে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ আকস্মিকতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাত্যহিক ব্যবহারের কাচাধারের মধ্যে নিরাপদ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কিন্তু এই আধার-পরিবর্তনে তাহার প্রকৃতিটি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেইরূপ প্রেমের বিদ্যুৎ-শিখাটি সংসারের স্নিগ্ধ তৈলপ্রদীপরূপে ব্যবহার করা সুবিধাজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রেমের বৈদ্যুতী শক্তি চিরদিন ম্লান ও নিষ্ক্রিয় থাকে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যে স্থির, নিরুদ্বেগ সম্বন্ধকে আমরা প্রেম নামে অভিহিত করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী কর্তব্যনিষ্ঠা। যে প্রাপ্তিতে প্রেমের চঞ্চল বিক্ষোভ নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে নিস্তরঙ্গ শান্তিতে বিলীন হয়, তাহা বাস্তবিক-পক্ষে তাহার পক্ষচ্ছেদ, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট তাহার আত্মসমর্পণ।

অমিত ও লাবণ্যের ক্ষেত্রে প্রেমের এই চিরচঞ্চলতা ও বিপুল গতিবেগ কোন নিয়মিত কক্ষাবর্তনের মধ্যে ধরা দেয় নাই; ইহার অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রগতি কোন নিশ্চল পঙ্কিলতার শেষ-শয়নে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। ইহার সুদূর প্রসার ও রহস্যময় ইঙ্গিত কোন অতি-পরিচয়ের পুঞ্জীভূত চাপে পিষ্ট, দলিত হয় নাই। অমিতের লঘুগতি, বন্ধন-অসহিষ্ণু মন এক আকস্মিক মোটর-সংঘর্ষের অবকাশ-পথে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া গিয়াছে—তাহার ঝঙ্কারসমস্ত পাখার গায়ে অকস্মাৎ আসক্তির আঠা লিপ্ত হইয়াছে। লাবণ্যের পূর্ব-ইতিহাস ঠিক প্রেমের অনুকূল ছিল না; পূর্বজীবনেও তাহার কোন গভীর আবেগপ্রবণতার রঙীন আভাস তাহার বুদ্ধির নির্মল শুভ্রতাকে রঞ্জিত করে নাই—তথাপি যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইয়াছে। মোটর-সংঘর্ষ অচিন্তিতপূর্বের রাজ্য হইতে প্রণয়-দেবতাকে আনিয়া তাহার সম্মুখীন করিয়াছে। এই প্রথম সাক্ষাতের পর অমিতের অকুণ্ঠিত অনুরাগ-প্রকাশ ও প্রবল প্রাণশক্তি লাবণ্যের সমস্ত সংকোচ-জড়তা ও প্রকাশকুণ্ঠাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—এই বাধা-বন্ধনহীন উদ্দীপ্ত প্রেমের আহ্বানে সে সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। অমিতের এই প্রেম-নিবেদন উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয়। ইহার লঘু চপলতা ও অস্থির উত্তেজনার মধ্যে গভীর ভাবাবেগের গোপন স্থিরতা ও সুদূরপ্রসারী কল্পনা-লীলার দীপ্তি অনুভব করা যায়। প্রেম মানুষের সূক্ষ্মতর, উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে যে কিরূপ আশ্চর্যভাবে বিকশিত করিয়া তোলে, তাহার সুপ্ত অসীমপ্রবণতাকে মায়াদণ্ডস্পর্শে জাগ্রত করে, অমিতের প্রেমে তাহার অখণ্ড-নীয় নিদর্শন মিলে। লাবণ্যের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত, ভাবজড়িমাহীন সৌন্দর্যই তাহার আকর্ষণের প্রধান হেতু—'অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেচে, তাহাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন, লাবণ্যের সৌন্দর্য সকালবেলাকার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নাই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত'। প্রেম তাহাদের নাম লইয়া খেলা করিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারিক জগতের অভিধানের বাহুল্য অংশ বর্জন করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছে, পরের কবিতাতে নূতন অর্থগৌরবের সন্ধান পাইয়াছে, পরের কথা আত্মসাৎ করিয়া তাহার সাহায্যে আপনার মৌলিক অভিনন্দন জানাইয়াছে। উষার প্রথম অরুণ-রাগ দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে যে অপরূপ মিলনসেতু রচনা করিয়াছে, তাহাই তাহাদের মিলনের প্রতীক ও মানদণ্ড-স্বরূপ হইয়াছে। 'ঘটকালি' অধ্যায়ে নিজ বিবাহ-প্রস্তাবে অমিতের সমস্ত বুদ্ধি উদ্দীপ্ত ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া এক বিস্ময়কর আতসবাজির সৃষ্টি করিয়াছে। যোগমায়া লাবণ্যের অভি-

ভাবিকা-স্বরূপ তাহার পক্ষ হইতে এই প্রেমনিবেদন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সংশয়ের প্রথম সুর তাঁহার মুখ হইতেই ধ্বনিত হইয়াছে। অমিতের যে প্রেম উন্মুখ হইয়া লাবণ্যের দিকে ছুটিয়াছে, প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত অনুসরণের প্রয়োজনহীন স্থিরতার মধ্যে তাহা স্থায়ী হইবে কি না, সন্দেহের এই অতি সূক্ষ্ম সত্য তাঁহারই মনে প্রথম ছায়া ফেলিয়াছে।

অমিতের সহিত আরও একটি গভীর পরিচয়ের ফলে লাবণ্যের মনেও সেই সংশয় সংক্রামিত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে, অমিতের সদাপরিবর্তনশীল কল্পনা ও আদর্শের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই, তাহার অবিশ্রাম অগ্রগতির সম্মুখে যাত্রা-শেষের পূর্ণচ্ছেদ টানা বোধ হয় কোন স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে মুহূর্তে মুহূর্তে লাবণ্যকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চাহে; বিবাহ সেই সৃষ্টির সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তাহার প্রধান আকর্ষণের মূলোচ্ছেদ করিবে। 'বিয়ে কর'লে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।' যে প্রেম বিবাহের মধ্যে নিজ নিশ্চল সমাধি-মন্দির রচনা করে, যাহা চিরজীবনের জন্য নীড়াশ্রয় খোঁজে তাহা অমিতের নয়। যে প্রেমে প্রিয়ালাভের সঙ্গে পথ চলার, সার্থকতার সহিত অগ্রগতির কোন বিরোধ নাই, তাহাই একান্তভাবে তাহার কাম্য—তাই রুদ্ধদ্বার বাসরঘর অপেক্ষা মুক্ত বায়ুর সপ্তপদী-গমনই তাহার পক্ষে বিবাহের শ্রেষ্ঠাংশ। অমিতের চরিত্রের গূঢ় মর্মভেদ ও নিজের সহিত তাহার চরিত্রের বৈপরীত্য-অনুভবে লাবণ্য আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। 'আমাকে ওর প্রয়োজন সেই জন্যই। যে সব কথা ওর মনে বরফ হ'য়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।' কিন্তু 'জীবনের উত্তাপে কেবল কথায় প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না ......আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।' অমিতের প্রেম পরের প্রতি আত্মসমর্পণ নহে, আত্মপ্রকাশের প্রবাহকে স্বচ্ছ ও সরল করার জন্য। প্রেম তাহার পক্ষে একটা বুদ্ধিগত প্রয়োজন মাত্র লাবণ্যের ভালবাসা কেবল অগ্রগমনের অফুরন্ত পথকে আলোকিত করার জন্য নয়, তাহা অন্তঃপুরের মঙ্গল-দীপ। সে রক্ষার প্রতীক, অমিত সৃষ্টির প্রতীক, সুতরাং উভয়ের বিরোধ চিরন্তন। 'রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন—যেখানে খুব ক'রে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবচি আমাদের সকলের চৈয়ে বড়ো যে পাওনা, সে মিলন-নয়, সে মুক্তি।' এই কথাগুলির ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিতর দিয়া লাবণ্য-অমিতের সম্পর্কের শেষ পরিণতির পূর্বসূচনা ধ্বনিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সমস্ত বৈষম্য ও অসংগতির আশঙ্কাময় সম্ভাবনা প্রেমের প্রথম জোয়ারের বেগে আপাততঃ ভাসিয়া গিয়াছে। অমিতের সংস্পর্শে লাবণ্য বুঝিয়াছে যে, সে কেবলমাত্র গ্রন্থ-কীট নহে, তাহার দেহ-মনে ভালবাসা অনুভব করিবার মত উত্তাপ আছে। অমিত যেন সবলে ধাক্কা দিয়া তাহার বহুদিনের অব্যবহৃত হৃদয়-কক্ষের এক দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। 'বাসা বদল' অধ্যায়ে অমিতের লঘু-চপল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে এক সজল সকরুণতা আসন্নবর্ষণ মেঘের ন্যায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার মুখের হাসির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুর আর্দ্র আভাস একটা অস্বীকৃত গাম্ভীর্য আনিয়া দিয়াছে। শিলং-এ এক ঝড়-বৃষ্টির দিনে প্রাকৃতিক উন্মত্ততার সুযোগ পাইয়া হৃদয়ের অসংবরণীয় আবেগেরও বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে—বাহিরের

দুর্যোগ অন্তরের উত্তেজনাকে আহ্বান করিয়াছে, বাদলের মত্ত হাওয়ায় প্রেম নিজ ঝটিকা-ক্ষুব্ধ বিজয়-কেতন উড়াইয়াছে (পৃঃ ১২২)। প্রেমের এই দুর্নিবার বহিঃপ্রকাশ সমস্ত মিতাচারিতার সংযমকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে, মনের ভারকেন্দ্রকে অকস্মাৎ লঘু করিয়া দিয়া উহাকে অপরিমিত পুলকের প্রাবল্যে মোরাদাবাদ পর্যন্ত দৌড় করাইয়াছে। অঙ্গুরীদানের প্রস্তাবটি প্রেমের অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত সোহাগ-কল্পনার পত্র-পুষ্পে ভূষিত হইয়াছে—প্রেমের তপ্ত-নিবিড় স্পর্শ যেন প্রেম-প্রকাশের উপায়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। 'মিলন-তত্ত্বে' প্রেমের দিবা-স্বপ্ন অপার্থিব সৌন্দর্যে মুকুলিত হইয়াছে—ভবিষ্যৎ নীড়-রচনার সুখময় কল্পনা মদির আবেশে গুঞ্জরিত হইয়াছে। গৃহস্থ জীবনের অভ্যাসবদ্ধ চক্রাবর্তনের মধ্যে প্রেমের প্রথম আবেশ ও তীক্ষ্ণ-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাটি কিরূপে জিয়াইয়া রাখিবে, ইহাই প্রেমিক-যুগলের আলোচনা-কল্পনার প্রধান বিষয়। গৃহস্থালীর চিরন্তন আবাসস্থলের চারিদিকে বিরহ-ব্যাকুলতার এক শাখা-সাগরের বেষ্টনী রচনা করিয়া তাহারা প্রেমের নবীন আস্বাদ রক্ষা করিতে চাহে। ইংরেজ কবি Matthew Arnold বিলাপ করিয়াছেন যে, দুই মিলনোৎসুক মানবাত্মার মধ্যে বিরহের অনন্ত গভীর লবণ-সমুদ্র প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক এই লবণ-সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র শাখাকে স্বেচ্ছায় আবাহন করিয়া তাহাদের মিলনৌৎসুক্যকে চির-নবীন রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 'শেষ-সন্ধ্যা'য় এই মিলনের চরম পরিণতি হইয়াছে, শিলং-এর সূর্যাস্তের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনাটি যেন প্রেমিক-হৃদয়ের গাঢ় রক্ত-রাগে অভিষিক্ত হইয়াছে।

ইহার পর হইতেই চড়াই শেষ হইয়া উৎরাই আরম্ভ হইয়াছে—বিচ্ছেদের সূচনা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের অব্যবহিত পূর্বে লাবণ্য ও অমিতের বিদায়-কবিতায় বিচ্ছেদের সুর অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হইয়াছে, শুকতারার প্রতি ম্লান চন্দ্রলেখার আবাহনে নবজাগরণের মাঝে প্রেমের স্বপ্নময়, অলস আবেশের বিসর্জন সূচিত হইয়াছে। শোভনলালের অতর্কিত উল্লেখও নিবিড় মিলনানন্দের উপর বিরহপাণ্ডুরতার ছায়াপাত করিয়াছে। প্রেমের অধীর ঔৎসুক্য ও তপ্ত দীর্ঘশ্বাসই যেন একদল অশরীরী আশঙ্কার ছায়ামূর্তিকে কোথা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।

এইবার বহির্জগৎ আততায়ীভাবে যে সমস্ত বাধাকে প্রেমের বিরুদ্ধে অভিযান-যাত্রায় পাঠাইল, তাহাদের ছায়ামূর্তি বলিয়া ভ্রম করার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহারা অতিমাত্রায় বাস্তব ও সজীব। অমিতের অতি-আধুনিক ভগিনীরা ও কে-টি মিত্র অমিতের তপোভঙ্গ করিবার জন্য এবার আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অমিতের অত্যন্ত ব্যস্ততাই তাহার প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরত্বের প্রমাণ, এবং লাবণ্যের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহাতে প্রেমের তাপমান-যন্ত্রের ক্রমাবরোহণের লক্ষণ পাইয়াছে। অমিতের অস্থির-চঞ্চল মন এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের অনুভূতি যতদূর সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ নীড়-রচনার কল্পনা এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এতদিন বাসা-বাঁধা ও পথ-চলার মধ্যে যে এক সূক্ষ্ম ও কষ্টসাধ্য সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছিল, আজ সে সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া চলার দিকে দাঁড়িপাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িল। শাখাসমুদ্র-বিচ্ছিন্ন মিলনদ্বীপের ছবি মুছিয়া গিয়া তাহার স্থানে এক বিরামহীন, অফুরন্ত যাত্রার ছবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিল। বিবাহের

স্থিতিশীলতাকে অস্বীকার করিয়া ইহার গতিশীলতাই ইহার একমাত্র উপাদান হইয়া উঠিল ; বিবাহের বন্ধনাংশ একেবারে বাদ পড়িয়া ইহার চিরন্তন, সংযোগবিন্দুবিহীন আকর্ষণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পথের চলিষ্ণুতার উপর প্রেমের ক্ষণিক বাসর-শয়ন রচিত হইল। 'ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দু'জনের', 'চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরানো হবার সময় পাওয়া যায় না। ব'সে থাকাটাই বুড়োমি।'—এই নূতন কল্পনার মধ্যে ইতিহাসের লুপ্ত-পথ-অনুসন্ধানকারী শোভনলালের পথিক-জীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুপস্থিত, পরাঙ্মুখীকৃত প্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। অমিত তাহার নির্বাসিত প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া তাহারই নিকট নিজ করতলগত প্রিয়াকে সমর্পণ করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

আততায়ী শত্রুপক্ষের আগমনের পর অমিত ও লাবণ্যের মধ্যে যে দেখা-শুনা হইয়াছে, তাহাতে পূর্বের অবাধ স্বাধীনতার স্থানে একটা গোপন অভিসারের শঙ্কিত সংকোচ দেখা দিয়াছে। অমিত তাহার পূর্বসহচর-সহচরীদের নিকটে লাবণ্য-সম্বন্ধে নির্ভীক স্বীকারোক্তি করিতে পারে নাই, যেন একটা কুণ্ঠিত আত্মগোপনচেষ্টা তাহার ব্যবহারকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শিলং-এর আত্মসমাহিত নির্জনতায় যে প্রেম ফুল-ফলে আশ্চর্যরূপ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, কলিকাতার সাহেবীয়ানার সমাজে তীক্ষ্ণ সমালোচনার উত্তর-বাতাসে তাহা যে শীর্ণশুষ্ক হইয়া যাইবে, এই ভীরু আশঙ্কা তাহার নৃত্য-চপল, উল্লাস-চঞ্চল প্রেমের প্রবাহকে যেন পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এই প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহার প্রেমের এরূপ অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয় ছিল না। শত্রুপক্ষের আক্রমণ-প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিল। দূর হইতে অস্ত্রক্ষেপে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা একেবারে কেল্লা-চড়াও হইয়া লাবণ্যকে মুখোমুখি আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের মধ্যে অমিত আসিয়া লাবণ্যের পার্শ্বে দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহার এই অর্ধোৎসাহিত পার্শ্বচারিতায় লাবণ্য ভরসা পাইল না। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কে-টির ফ্যাশানের মুখোশ হঠাৎ খুলিয়া গিয়া তাহার প্রণয়োৎসুক, অভিমানপ্রবণ, উদ্গতাশ্রু প্রকৃতিটি অনাবৃত হইয়া পড়িল—অমিতের প্রতি তাহার আকর্ষণের যথার্থ স্বরূপটি সমস্ত হাব-ভাব-লীলার ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইল। লাবণ্য এই অতর্কিত অশ্রু-উচ্ছ্বাসের মধ্যে সত্য ও গভীর হৃদয়-স্পন্দনের পরিচয় পাইয়া নীরবে নিজ দাবি প্রত্যাহার করিয়া কেতকীতে রূপান্তরিত কে-টির হাতে অমিতকে সমর্পণ করিল। শোভনলাল যেরূপ অমিতকে প্রতিহত করিয়াছে, কে-টিও সেইরূপ লাবণ্যকে অপসারিত করিল। পুরাতন দাবির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নূতনের অনধিকার-প্রবেশকে অনায়াসেই স্থানচ্যুত করিল।

তারপর মনোজগতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহাই কার্যজগতে প্রতিফলিত হইল। ভবঘুরে শোভনলাল হঠাৎ ইতিহাসের দুর্গম পথ বাহিয়া প্রণয়-সার্থকতার কুসুমাস্তীর্ণ পথের সন্ধান পাইল। গৃহচ্যুত, প্রতিবেশভ্রষ্ট অতীতের গৃহরচনা করিতে করিতে সে নিজ ঘরছাড়া পথিক-মনের চিরন্তন আশ্রয়স্থল পাইয়া গেল। যে দ্বার একদিন নির্মমভাবে তাহার মুখের উপর বন্ধ হইয়াছিল, অমিতের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে লব্ধপ্রবেশ প্রেম স্বহস্তে সেই দ্বারের অর্গল মোচন করিয়া দিল। অমিত যাহা করিয়াছিল শোভনলাল তাহা কোনও দিন করিতে

পারিত না—লাবণ্যের সংকোচ-মুদিত হৃদয়কে বিকশিত করিবার মত উত্তাপ তাহার কখনও ছিল না। কিন্তু তাহার যাহা দিবার আছে, অমিতের তাহার একান্ত অভাব—ধ্রুবতারার অচঞ্চল জ্যোতি, কাল-ও-প্রত্যাখ্যানজয়ী প্রেমের একনিষ্ঠতা সেই কেবল প্রিয়ার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছে। যাহা হউক, প্রেমের এই লুকোচুরি খেলা, এই অনিশ্চয়তার সুড়ঙ্গ-পথে আনা-গোনার শীঘ্রই অবসান হইয়াছে, অন্ধকারের অভিসারযাত্রা প্রচুরালোকিত বিবাহ-সভার প্রকাশ্যতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যুগ্ম বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বর-কন্যা বদল হইয়াছে। লাবণ্য-অমিতের পরস্পর-লিখিত চিঠি দুইখানি তাহাদের মনোবৃত্তির শেষ পরিণতির সুন্দর বিশ্লেষণ। অমিত লাবণ্যের ভিতর দিয়া প্রেমের অসীমতার মানস সন্ধান পাইয়া তাহার প্রেমকে সীমাবদ্ধ, প্রাত্যহিক ভালবাসার সংকীর্ণতা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করাইয়াছে; তাহার ভালবাসা অমৃত-নির্ঝরে রসনা ডুবাইয়া সাংসারিকতার অন্ন-ব্যঞ্জনের ভোজে তৃপ্তিপূর্বক বসিয়া গিয়াছে। লাবণ্য তাহার খোঁজার নেশা ছুটাইয়া দিয়া তাহাকে প্রাপ্তির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। আবার, অমিতের প্রভাব লাবণ্যের রুদ্ধমুখ প্রেম-নির্ঝরের পথ খুলিয়া দিয়া তাহার জীবনে সর্বপ্রথম প্রেমের অপূর্ব বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। এই নব-প্রজ্বলিত প্রেমের আলোতেই সে তাহার আসল প্রণয়ীকে চিনিয়াছে। যে অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য সে মুগ্ধ-বিস্মিত শোভনলালের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, তাহার সমস্তই অমিতের ভাণ্ডার হইতে আহরিত। সে স্বভাব-দরিদ্রা ছিল, অমিতের প্রেমের প্লাবনই তাহার দারিদ্র্য ঘুচাইয়া তাহাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়াছে। সে অমিতকে যাহা দিয়াছিল, তাহা অমিতেরই এবং তাহাই সে শতগুণে ফিরিয়া পাইয়াছে। সুতরাং অমিতের প্রতি তাহার শেষ সম্ভাষণ—ঋণীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার। লাবণ্যের দান হইতেছে প্রেমের অসীমতার উপলব্ধি; অমিতের দান—উষর ভূমিতে প্রেমের প্রথম প্রবাহ। তাই লাবণ্য বলিতেছে—'তোমারে যে দিয়েছিনু সে তোমারি দান; 'গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়'—ইংরাজ কবি কোলরিজের উক্তির প্রতিধ্বনি—'We receive but what we give'. আর অমিত বলিতেছে—'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি—কিন্তু আমার আকাশও রইলো—আমি রোমান্সের পরমহংস। ভালবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলেস্থলে উপলব্ধি করবো, আবার আকাশেও……কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ার তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।' প্রেমের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের কি চমৎকার অভিব্যক্তি!

এই বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, শোভনলাল ও কে-টি এই দুই চক্রের উপর ভর করিয়াই উপন্যাসের গতি হঠাৎ মোড় ফিরিয়াছে। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উহাদের উপর যে ভার চাপান হইয়াছে, উহারা সেই গুরুভারবহনে সমর্থ কি না। এই অতর্কিত পরিবর্তন কতটা কলানুমোদিত তাহাও বিবেচ্য বিষয়। উপন্যাস মধ্যে আমরা শোভনলালের সাক্ষাৎ পাই না, তাহার সম্বন্ধে কতকটা বর্ণনা ও বিবরণ শুনিতে পাই। তাহার নম্র, লাজুক স্বভাবটি, তাহার নীরব, একনিষ্ঠ প্রেম, তাহার রূঢ় প্রত্যাখ্যানে উদ্বেগহীন ধৈর্য

—এ সমস্তেরই আমরা পরোক্ষ পরিচয় পাই। তথাপি তাহার চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য ও আকর্ষণী শক্তি আছে যে, দীর্ঘ আদর্শনের পর লাবণ্যের ন্যায়বিচারশক্তি যে তাহাকে তাহার প্রার্থিত পুরস্কার দিবার কথা মনে করিবে, ইহা আমাদের কল্পনা মানিয়া লইতে পারে। লাবণ্যের নূতন বরফ-গলা প্রেমধারা অমিতের দিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া যে একটা স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণের বলে শোভনলালের অভিমুখে ছুটিয়া যাইবে, তাহা সংগত ও যুক্তিসহ। এই পরিবর্তনের আমরা কোন চিত্র পাই না, কিন্তু ইহা মানিয়া লইতেও আমাদের বাধে না। কে-টির সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য খাটে না। তাহার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহা তাহার শেষ পরিণতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। তাহার তীব্র, উগ্র বিলাতী ঝাঁজ যে কিরূপে কেতকী-কুসুমের মৃদু, আর্দ্র সৌরভে পরিণত হইল, তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা পাই না। যদি বলা যায় যে, এই অভাবনীয় পরিবর্তন প্রেমের অসাধ্য-সাধনের, তাহার সোনার কাঠির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের একটা নিদর্শন, তবে তাহা কবি-কল্পনা বা অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয় হইতে পারে, উপন্যাসের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের বিষয় কখনই নয়। 'রাম' নামের প্রভাবে দস্যু রত্নাকরের মুহূর্ত-মধ্যে ঋষি বাল্মীকিতে পরিবর্তন ভক্তি-রস-প্রধান মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হইতে পারে, কোন আধুনিক উপন্যাসে ইহা অচল। তারপর, প্রেম-মহামন্ত্রে কে-টির অলৌকিক পরিবর্তন যদিও-বা মানিয়া লওয়া যায়, তাহার প্রতি অমিতের আকর্ষণের সঙ্গত ব্যাখ্যা কোথায়? অমিত তাহার পূর্ব-পরিচয়ের ফলে কে-টিকে কেবল চটুল প্রেমাভিনয়ের (flirtation) উপযুক্ত পাত্রী মনে করিয়াছিল, তাহার মধ্যে গভীর প্রেমের কোন যোগ্যতা দেখিতে পায় নাই; সুতরাং শেষ পর্যন্ত কে-টিকে তাহার প্রেমের শেষ-আশ্রয়-স্থল-হিসাবে নির্বাচন খুবই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রজাপতি-বৃত্তি, চঞ্চল প্রেম, সে কে-টির বিলাতী এসেন্স ও পাউডারের মধ্যে তাহার পক্ষসংবরণের স্থান পাইল—ইহা বিশ্বাস করা পাঠকের পক্ষে একটু দুরূহ। কে-টিকে প্রেমের ঘড়ায় তোলা জলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; তাহার সেই জ্বালাময়, ব্যর্থ প্রেমের এক ফোঁটা অশ্রু যে কেমন করিয়া ঘড়া ভর্তি করিল, তাহার কোন আভাসই আমরা পাই না। ইহা খুবই আশ্চর্য যে, দিগ্‌বিজয়ী, দিগন্তরেখার ন্যায়ই স্পর্শাতীত 'অমিট্ রে' শেষে অভিমান-গলানো এক ফোঁটা অশ্রুর ফাঁদে ধরা পড়িল! তাহার প্রেমের বিজয়-রথ কি একেবারে অশ্রুলেশশূন্য সাহারা মরুভূমির ভিতর দিয়াই চালিত হইয়াছিল?

আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলেও লাবণ্যের পরিবর্তন অপেক্ষা অমিতের পরিবর্তন আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতার উপর অধিকতর ভার চাপায়। লাবণ্যের ছিল শোভনলালের প্রতি উপেক্ষা; আর এই উপেক্ষার কারণ প্রেমের সহিত অপরিচয়। অমিতের ছিল কে-টির প্রতি বিতৃষ্ণা; আর এই বিতৃষ্ণার কারণ প্রেমের ছলনার সহিত অতি-পরিচয়। অপরিচয়ের উপেক্ষা পরিচয়ের আকর্ষণে রূপান্তরিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু অতি-পরিচয়ের বিতৃষ্ণার প্রতিষেধক এত সহজ-প্রাপ্য নহে। অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করা অপেক্ষা পরিচিত ভূমিখণ্ডে রত্নের সন্ধান পাওয়া আরও দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমিত ও কে-টির ব্যাপারটিই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা, ইহার নিখুঁত সমন্বয়-কৌশলের একমাত্র

ক্রটি। 'শেষের কবিতা' নামক শেষ অধ্যায়ে ইহার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা কবি-কল্পনাত্মক, মনস্তত্ত্বমূলক নহে।

এই উপন্যাসে উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য ও epigram-সমৃদ্ধি—উভয়ই তুল্যরূপ বিস্ময়কর। ইহার প্রথম দিকের কতকটা পরিচয় এই সমালোচনার মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার epigram-এর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা ও অর্থ-গৌরব-ভূয়িষ্ঠ সংক্ষিপ্ততা আরও অদ্ভুত। প্রতি পৃষ্ঠাতেই এই সমস্ত চোখ-ধাঁধানো রত্নের ছড়াছড়ি। 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত' (পৃঃ ২৭); 'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা'হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তেই প্রতিবিম্ব পড়তো না।' 'সময় যাদের বিস্তর তাদেরই punctual হওয়া শোভা পায়' (পৃঃ ৭৮); 'আপনার রুচির জন্য আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে' (পৃঃ ৮১); 'নাম যার বড়ো, তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যতো সময় যায় নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্প-বিবাহ, বহু-বিবাহের মতোই গর্হিত' (পৃঃ ৮৫); 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে' (পৃঃ ৮৬); 'যে ছুটি নিয়মিত তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়' (পৃঃ ৯০); 'মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা, (পৃঃ ১১০); 'আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলে যাকে আমরা পাওয়া বলি, সে আর কিছু নয়, হাত-কড়া হাতকে যে রকম পায় সেই রকম আর কি' (পৃঃ ১১০); 'ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবী ক'রতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ' (পৃঃ ১২৮); 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুই-এ যে তফাৎ আছে' (পৃঃ ১৪৪); 'দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তা'র আলোটাকে ময়লা ক'রে ফেলে' (পৃঃ ১৫৪); 'আমার নেবার অঞ্জলি হবে দু'জনের মনকে মিলিয়ে' (পৃঃ ১৫৬); 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না' (পৃঃ ১৭০)।

(৮)

'দুই বোন' (ফাল্গুন, ১৩৩৯; মার্চ, ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইহার অবয়ব যে পরিমাণে ক্ষুদ্র, ঔপন্যাসিক সংঘাত ও সাধারণ আলোচনা-প্রণালী তদনুরূপ নীচু সুরের। পুরুষের উপর মাতৃজাতীয় ও প্রিয়াজাতীয় স্ত্রীলোকের প্রভাবের পার্থক্য-প্রদর্শন উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্ত উপন্যাস এই প্রতিপাদনের সংকীর্ণ ও একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই অতি-সুপরিস্ফুট, সদা-জাগ্রত উদ্দেশ্যের সরু প্রণালী বাহিয়াই গল্পের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইয়াছে। শর্মিলা ও উর্মিমালা—এই দুই সহোদরাকে লেখক যে দুই বিপরীত জীবনাদর্শের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষীণ জীবন-স্পন্দন দিয়াছেন, তাহারা সেই মাপকরা প্রাণধারা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে—ব্যক্তিগত জীবনের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদিগকে পূর্ণতর সত্তার দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তাহাদের

রক্ত-মাংসের অতি সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া উদ্দেশ্যমূলক জীবনের কঙ্কাল সুস্পষ্টভাবেই উঁকি মারিয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, ব্যবহার—সমস্তই অন্তরালস্থিত লেখকের হস্তধৃত অদৃশ্য রজ্জুর আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে,• নিজ স্বাধীন প্রাণবেগের পরিচয় তাহারা কোথাও দেয় নাই।

শর্মিলাকে লেখক স্ত্রীলোকের মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়াছেন সে-ও অতিরিক্ত বাধ্যতার সহিত লেখকের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছে, মাতৃত্বের আসন ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হয় নাই। সে চিরজীবন শশাঙ্ককে স্নেহমণ্ডিত সেবা-যত্নের রন্ধ্রহীন আতিশয্যে বিব্রত করিয়াছে। চাকরি-জীবনের সুপ্রচুর অবসর ও সংকীর্ণ লক্ষ্যের যুগে শশাঙ্ক এই স্নেহের শাসন অভ্রান্ত ব্যবস্থা-বিধি বলিয়াই মানিয়া লইয়াছে, আরামের শীতলতায় বিরক্তির অন্তঃরুদ্ধ উত্তাপ জুড়াইতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। স্বাধীন ব্যবসায়ের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিনে শাসন-বিধির ও শাসকেব পবিবর্তন হইয়াছে—শর্মিলার আগ্রহপূর্ণ সশঙ্ক সেবা, অনবসর ও সীমাহীন উন্নতি-স্পৃহার লৌহ-বমে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু শর্মিলার অক্ষয় ধৈর্য-ভাণ্ডার তেমনই পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া, অনতিক্রমণীয় কার্যগণ্ডির বাহিরে, সে তেমনই সশ্রদ্ধ, প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। স্বামীর প্রত্যাখ্যাত অর্ঘ্য সে স্বামী-রচিত বাড়ি, তাহার দ্রুত ধাবমান কর্মরথের ধ্বজা ও তাহার মোহলেশহীন অভ্রান্ত পুরুষকারকে অর্পণ করিয়াছে।

কিন্তু লেখক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার জন্য কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মাতৃত্ব অবহেলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্বামীর অন্যাসক্তি তাহার চির-সহিষ্ণু প্রসন্নতার মধ্যে কোন বিকার আনিতে পারে কি না, তাহাই যাচাই করিবার জন্য তাহার ভগিনী ঊর্মিমালাকে প্রতিনায়িকা-হিসাবে গল্প-মধ্যে অবতারণা করা হইয়াছে। লেখকের এই পরীক্ষাগারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাকে রোগশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। স্বামীর সেবাকার্যে তাহার শূন্যস্থান পূরণের জন্য ঊর্মিমালাকে আনা হইয়াছে। ঊর্মিমালা তাহার যৌবনোচ্ছল, ক্রীড়াশীল প্রকৃতি লইয়া শশাঙ্কের কঠোর নিয়মবদ্ধ, অনবসর কর্মজীবনে একটা বিপ্লবকারী বিশৃঙ্খলা ও উন্মাদনা আনিয়াছে। ঊর্মির সংসর্গে শশাঙ্ক জীবনে প্রথম সরসতার ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার রুদ্ধদ্বার জীবন-কক্ষে সর্বপ্রথম বসন্ত-পবনপ্রবাহের জন্য একটা গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ পরীক্ষাতেও শর্মিলার মাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—সে সনাতন নিয়মানুসারে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে ও কখনও কখনও উদ্গত অশ্রুও গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু পাঠকের মন দ্রবীভূত করে না। ইহাদের মধ্যে করুণরসের আর্দ্রতা নাই; ইহারা যেন কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের যান্ত্রিক শব্দ মাত্র, কতকটা বাষ্প-নিষ্কাশন বা দ্রবীকরণের ন্যায়। রোগশয্যায় পড়িয়া শর্মিলা একদিকে অশ্রু মুছিয়াছে, অপর দিকে স্বামীকে ভগিনীর হাতে সমর্পণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা-প্রণালীর পূর্বনির্দিষ্ট ক্রমপর্যায়-অনুসারে সে হঠাৎ রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া স্বামীর সহিত ভগিনীর বিবাহে বরণ-ডালা সাজাইতে বসিয়া গিয়াছে। আত্মাহুতি

মাতৃজাতীয়ত্বের চরম নিদর্শন বলিয়া সে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ইত্যবসরে ঊর্মিমালার মনে তাহার প্রকৃতিগত প্রেয়সীত্বের আবেশ কাটিয়া যাওয়ার পর অকস্মাৎ মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—সে প্রেমের খেলা ত্যাগ করিয়া বিলাত উধাও হইয়াছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বই জয়ী হইয়াছে। শর্মিলার এই রাহুগ্রাসমুক্ত মাতৃত্বের চন্দ্রলেখা পরিণামে প্রেয়সীত্বের পূর্ণচন্দ্রে বিকশিত হইয়াছে কি না, তাহা ইতিহাসে লেখে না, তবে সে শেষ মুহূর্তে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া তাহার কর্ম-সাহচর্যের অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। কর্ম-সাহচর্য নর্ম-সাহচর্যে পরিণত হইবে কি না, তাহার কোন আভাস নাই।

শর্মিলা যেমন মাতৃজাতীয়ত্বের প্রতীক, ঊর্মি তেমনি চিরন্তন প্রিয়া। কিন্তু তাহার নাম ঊর্মিমালা হই:লও কাজে তাহার তরঙ্গভঙ্গে প্রেমের অতলস্পর্শ, অধীর উচ্ছলতা নাই। লাবণ্য বা কুমুদিনীর চারিদিকে যেমন একটা পুষ্পসুরভি, কলগুঞ্জনমুখরিত মদিরতা ঘনাইয়া আছে, ইহার সেরূপ কিছুই নাই। প্রণয়ের মোহময় আবেশ ইহার চারিদিকে কোন জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে নাই। ইহার আকর্ষণ লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখা, প্রভৃতি ছেলেমানুষীতেই সীমাবদ্ধ। ঊর্মিকে কোন মতেই প্রণয়িনীর উপযুক্ত পরিকল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। নীরদের সঙ্গে তাহার পূর্বসম্বন্ধের মধ্যে এমন কোন ভাবগভীরতা নাই, যাহাতে সম্বন্ধচ্ছেদের মধ্যে মুক্তির আনন্দ একফোঁটা বিষাদ-বাষ্পেও কলুষিত হইতে পারে। এই সম্বন্ধের বাঁধন কল্পিত হইয়াছে কেবল তাহার মুক্তির চাপল্য-উচ্ছ্বাসের গতিবেগ বাড়াইবার জন্য। তাহার বিদায়পত্রগুলির মধ্যেও কোনরূপ ভাব-গভীরতার ছাপ নাই, দিদির প্রতি যে অবিচার সে করিয়াছে তাহার একটা সামান্য উল্লেখ-মাত্র আছে, কোন অনুতাপের গভীর আলোড়ন নাই। শিশু যেমন এক খেলা ছাড়িয়া অন্য খেলায় রত হয়, ঊর্মিও সেইরূপ চিন্তালেশহীন লঘু পাদক্ষেপের সহিত শশাঙ্ককে ছাড়িয়া বিলাত রওনা হইয়াছে; এই ছাড়াছাড়িতে তাহার হৃদয়ে কোনখানে সত্যকার টান পড়ে নাই। তাহার বিদায় মুহূর্ত 'শেষের কবিতা'র বিদায়ের মত কোন কবিতার ভার সহিবে না, ইহা নিশ্চিত। উপন্যাসটি পড়িয়া মনে হয় যে, গভীর আলোচনা কোথাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না, শশাঙ্ক, শর্মিলা ও ঊর্মি—তিনজনের পরস্পর সম্পর্কে যে একটা সামান্যরূপ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে তিনি অবিমিশ্র ছেলেমানুষী মনে করিয়া তাহার দিকে একটু লঘুতরল, সকৌতুক ব্যঙ্গ-কটাক্ষ মাত্র করিয়াছেন। যে সমস্ত উপন্যাসে হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতা আছে, 'দুই বোন' তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত নহে এবং প্রথমোক্তদের বিচারের মানদণ্ড উহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গী ও ভাষার বিশেষত্বও এই আলোচনাগত লঘুত্বেরই সমর্থন করে। উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত আখ্যানগুলির বিবৃতিভঙ্গী সারসংকলনের ন্যায়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন। ঘটনাগুলি যে চোখের সামনে ঘটিতেছে, এরূপ ধারণা আমাদের একেবারেই হয় না—সেগুলি যেন বহুপূর্বে ঘটিয়াছে, লেখক তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সারাংশ তাঁহার পরীক্ষা-গারের জন্য বোতলে পুরিয়াছেন, ও প্রত্যেকটির উপর মন্তব্যের লেবেল মারিয়া পাঠকের সামনে ধরিয়াছেন। ইহার রস যেন পূর্ব হইতেই উপভুক্ত হইয়াছে ও আমরা পরের জিহ্বাতে যেন তাহার আস্বাদন করি। গাছের টাটকা ফল হইতে রস নিঃসারণ করিয়া, তাহা হইতে

সিরাপের বোতল পূর্ণ করার ন্যায় এই উপন্যাসে বর্তমানের তাজা সরসতা যেন অতীতের অর্ধ-শুষ্ক পশ্চাৎ-আলোচনার (retrospect) মধ্যে তাহার স্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ঘটনা-বলীর মধ্যে যেখানে গভীর বা করুণরসের সম্ভাবনা মাত্র আছে, লেখক epigram-এর তীক্ষ্ণাগ্রে তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া লঘু পরিহাসের বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছেন। শশাঙ্কের জন্ম-তিথি-উৎসব, শর্মিলার কঠিন রোগ ও মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার গভীর মনঃপীড়া—কিছুতেই এই পরিহাস-চাপল্যের নৃত্যশীল গতি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। ভাষা ভাবগভীরতার চাপে একটুও মন্থরগতি হয় নাই। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, লেখক এই উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস রচনা করিতে চাহেন নাই, দুই এক শ্রেণীর মানুষের আংশিক, অসম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে দুই-একটি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সর্বশুদ্ধ মিলাইয়া একটা লঘু পরিহাসপ্রধান খণ্ড-উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তাঁহার পূর্ব উপন্যাসগুলির সহিত ইহার একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র না থাকিত, তবে মনে করা অসংগত হইত না যে, তিনি এখানে একটা স্বেচ্ছাকৃত শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

'ঘরে-বাইরে' হইতে আরম্ভ করিয়া লেখক যে উপন্যাসের সাধারণ পথ পরিত্যাগপূর্বক epigram-এর ঢালু তট বাহিয়া অবরোহণ শুরু করিয়াছেন, সেই অবতরণের সর্বনিম্ন ধাপ পৌঁছিয়াছে 'দুই বোন'-এ। ইহার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে অন্যান্য গুণের প্রাচুর্যে এই নিম্নগমন-প্রবণতা কতকটা ঢাকা ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ, ধাবাল, গভীর অর্থপূর্ণ, উজ্জ্বল-বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যগুলি, তাঁহার অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাঠককে এত মুগ্ধ ও অভিভূত করে যে, সমগ্র উপন্যাস হিসাবে তাহারা কিরূপ দাঁড়াইল, খাটি উপন্যাসোচিত গুণে তাহারা কতখানি সমৃদ্ধ, এই প্রশ্ন সহসা আমাদের মনে মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। আর উপন্যাসের গঠন-প্রণালী এত মিশ্র ও বিচিত্র ধরণের যে অন্যান্য শ্রেণীর রচনা হইতে ইহাতে নূতন পরীক্ষার স্বাধীনতা বেশি ও অসাফল্যের লজ্জা কম। ভিতরে মণি থাকিলে মণি-মঞ্জুষার বাহ্য গঠন ঠিক নিখুঁত হইল কি না, সে বিষয়ে আমাদের দাবি খুব উচ্চ নহে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলি গঠনহিসাবে নিখুঁত না হইলেও এবং উপন্যাসের চিরপ্রথাগত প্রণালীর ঠিক অনুসরণ না করিলেও প্রশংসনীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে তাঁহার অনুসৃত প্রণালীর রিক্ততা ও অনুপযোগিতা একেবারে অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্বের মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) 'ঘরে বাইরে'-র মত রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা—বিপ্লববাদ—আলোচিত হইয়াছে। ঘর ও বাহিরের যে চিরন্তন বিরোধ তাহারই এক অধ্যায় ইহার আলোচ্য সমস্যা। বাহিরের তীব্র মোহ ও সর্বনাশী প্রলয় যে ঘরের স্নিগ্ধ ও স্থিরজ্যোতি প্রেম-প্রদীপকে নিবাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এই শোচনীয় সত্যই রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে বার বার অভিভূত করিয়াছে। 'ঘরে বাইরে'-র উপন্যাসে বাহিরের বিপ্লব

...পরিয়াছে; 'চার অধ্যায়'-এ ইহার বিরুদ্ধ শক্তি প্রেমকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার সিংহাসনস্থাপনেই বাধা দিয়াছে।

বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে উপন্যাসের নায়ক অতীনের অভিযোগ ত্রিবিধ—তাহার সনাতন নীতিজ্ঞান, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও প্রেম এই তিনেরই ন্যায্য অধিকার ইহার পীড়নে সংকুচিত হইয়াছে। বিপ্লববাদ তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে, তাহার প্রকৃতির স্বাধীন প্রসারকে রুদ্ধ ও প্রতিহত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কবিপ্রতিভার যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে নির্বিচার নিয়মানুবর্তিতার চক্রপেষণে উন্মূলিত করিতে চাহিয়াছে। তাই অতীনের অনুযোগের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর একটা নিষ্ফল ক্ষোভ ও তীব্র আত্মগ্লানির সুর বার বার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে অনেক তরুণ কবি নিজ স্ফুটনোন্মুখ কবি-প্রতিভার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনায় যুদ্ধের পাশবিক নৃশংসতার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্ষেপোক্তি উচ্চারণ করিয়াছে, অতীনের মুখে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সৈনিকের খাকি পোশাকের তলে যে সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, বৈচিত্র্যপিয়াসী কবি-হৃদয়ের জীবন্ত সমাধি হয় সেই অপমৃত্যুর কাহিনীই যুদ্ধের ক্ষতির হিসাবে সর্বাপেক্ষা মোটা অঙ্ক। দলের কথার প্রতিধ্বনি কখনই কবি-হৃদয়ের নিজস্ব বাণীর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে না, এই বেনামী কথার পুনরাবৃত্তি শেষ পর্যন্ত কবির নিজ ভাষাকে মূক করিয়া দেয়। বিপ্লবপন্থী অতীন নিজ নৈসর্গিক কবিপ্রতিভার অপমান করিয়া আত্মবিকাশের সর্বপ্রধান পথকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এই ব্যর্থতার বেদনা তাহার অনুযোগকে এত অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর নীতিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে, তাহা সার্বভৌমিক। বিপ্লববাদের নৈতিক ভিত্তি হইতেছে মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে যদি এই মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধিরই বলিদান হয়, তবে ইহার নৈতিক আশ্রয় যে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণার মধ্যে একটা বীরত্বের গৌরব আছে; কিন্তু বিপ্লববাদের মুখোশ-পরা, গুপ্ত নৈশ অভিযানের মধ্যে যে অপরিসীম হীনতা ও নৃশংসতা আছে তাহা একেবারে পৌরুষ-সংস্পর্শ-বর্জিত। প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধে যেখানে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সেখানে কেবলমাত্র অবিচলিত মনুষ্যত্বের উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াই দুর্বল প্রবলের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে। এই উচ্চ মঞ্চ হইতে একবার অবতরণ করিলে রসাতলের পঙ্কনিমগ্ন হইয়া যাওয়া অনিবার্য। দেশপ্রীতির মোহে ধর্ম ভুলিলে একটা ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজনের জন্য সনাতনকে বিসর্জন দেওয়া হয় ও দেশের স্থায়ী কল্যাণের ভিত্তি অপসারিত হয়। বিপ্লববাদের প্রতি এই তীব্র বিরাগ সত্ত্বেও অতীন যে তাহাদের সংস্পর্শ হইতে নিজকে বিচ্যুত করে নাই, তাহা কেবলমাত্র সঙ্গীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য; যে বিপথে সে পা বাড়াইয়াছে, কেবল মনুষ্যত্বের খাতিরেই তাহাকে শেষ পর্যন্ত সেই পথের চরম দুর্দশার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে—প্রত্যাবর্তনে বিপদ্ হইতে অব্যাহতির আশা আছে বলিয়াই প্রলোভনবৎ তাহাকে বর্জন করিতে হইবে।

বিপ্লববাদের নৈতিক সমর্থনের পক্ষে যাহা বলা যায় তাহা বিপ্লবপন্থীদের নেতা ইন্দ্রনাথের মুখে দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের প্রধান অনুপ্রেরণা আসিয়াছে শক্তিপরীক্ষার দিক্ হইতে। তাঁহার ফললাভের মোহ নাই, কোন মিথ্যা আশা তাঁহার অকুণ্ঠিত সত্যদৃষ্টিকে মলিন করিয়া

দেয় নাই। পরাজয় অনিবার্য জানিয়াও তিনি তাঁহার দলভুক্ত যোদ্ধাদের অসাধ্যসাধনের দুঃসাহসে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন ও কেবলমাত্র বীর্যপরীক্ষার অবসর দিবার জন্যই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এ দিকে যেমন দেশের প্রতি তাঁহার কোন মোহ নাই, সেইরূপ বৈদেশিক শাসনের প্রতি তাঁহার কোন তীব্র বিরাগ নাই; ডাক্তারের যেমন রোগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, সেইরূপ তিনি বৈজ্ঞানিকের অপ্রমত্ত চিত্ত লইয়া পরাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ বিপ্লববাদকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞানের সীমা-বহির্ভূত করিয়া উহাকে গৌরীশঙ্কর-অভিযান বা সমুদ্র-সন্তরণের মত দুঃসাহসিক কাজের পর্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা আর যাহা হউক, বিপ্লববাদের নৈতিক বিচার-হিসাবে মোটেই পর্যাপ্ত নহে।

বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা-নিয়ন্ত্রণে তিনি যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য। এলা ও কানাই গুপ্তের কথোপকথনে তাঁহাব উদ্দেশ্য ও অনুসৃত প্রণালীর যে ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় তাহাতে বিষয়টি মোটেই পরিষ্কার হয় না। প্রথমতঃ, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত একটু অদ্ভুত ও পরস্পর-বিরোধী। উমা সুকুমারকে ভালবাসে; কিন্তু সুকুমার কাজেব লোক বলিয়া প্রণয়ের আবেশ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; আর উমার ব্যর্থ প্রেম যাহাতে চারিদিকের আবেষ্টনে একটা উৎপাতের সৃষ্টি না করে, সেইজন্য ভোগীলালের অভিমুখে তাহার জন্য কৃত্রিম প্রণালী কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেন না, "জঞ্জাল ফেলার সবচেয়ে ভাল ঝুড়ি বিবাহ।" পক্ষান্তরে ভালোবাসাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, যদি তাহা বিবাহ-পিঞ্জরে চিরবদ্ধ না হয়। যে পর্যন্ত ব্রতভঙ্গ না হয়, সে পর্যন্ত তিনি এলাকে ভালোবাসিতে অবাধ ছাড়পত্র দিয়াছেন, অথচ আবার সেই মুহূর্তে আদেশ করিতেছেন যে, এলা তাহার প্রণয়াস্পদের প্রাণ লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। বিপ্লবপন্থীদের চণ্ডীমণ্ডপে এলা মোহাবেশের দেবী-প্রতিমা—তাহার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা তাহাদের সমস্ত দেহ-মনকে রাঙ্গাইয়া মৃত্যুবিভীষিকার উপর প্রেমের দীপ্ত অরুণিমা ফলাইয়া তোলে; তাহারা মরণের ভ্রূকুটিকে প্রেমের ইঙ্গিত মনে করিয়া সর্বনাশের পথে ছুটিয়া চলে। যেখানে প্রেমের সহিত দেশহিতব্রতের সংঘর্ষ অনিবার্য, সেখানে তরুণ-তরুণীর সহযোগিতা কেন নিষিদ্ধ নহে, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার অগ্নিপ্রলয়ের জন্য এমন লোক চাই যাহার ভিতরে আগুন আছে, অথচ নিজে সে আগুনে ভস্ম না হয় এমন আত্মসংযম ও দৃঢ়সংকল্প আছে। মোট কথা, এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিধি-নিষে, ও সীমা-নির্দেশের বেড়াজালে যে আবেষ্টনটি রচিত হইয়াছে তাহাকে বুদ্ধি দিয়া অনুভব করা হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের বাস্তব পটভূমি-হিসাবে গ্রহণ করা মোটেই সহজ নহে।

কিন্তু অতীনের সর্বাপেক্ষা গভীর বেদনাবোধ তাহার ব্যর্থ-প্রেমবিষয়ক। তাহার বিপ্লব-বাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছে প্রেমের দিক্ হইতে। মতানুবর্তিতা প্রেমের আনুগত্য-প্রকাশের একটা খুব সাধারণ উপায়—এলার সহিত সহজ পথে মিলনে অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে বলিয়াই, অতীন এলার নির্দিষ্ট কর্মধারায় প্রেমের সার্থকতার একটা জটিল, কৃত্রিম পথ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই গোপন সুড়ঙ্গপথে চলিতে গিয়া তাহার মনে যে অনপনেয় কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে তাহাই তাহার প্রেমের যাত্রাপথে একটা দুরতিক্রম্য অন্ত-

রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এই প্রতিহত প্রেমের ক্ষুব্ধ অভিযোগের মধ্যে একটা অসংবরণীয় আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এলার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনের যে ছবিটি তাহার মনে অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত আছে তাহাই একদিকে তাহার ব্যর্থতার ব্যথাকে উদ্বেলিত করিতেছে ও অপরদিকে দেশপ্রীতির মধ্যে যে অন্তঃসারশূন্য ভাববিলাস আছে তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টিকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ ও প্রতিবাদকে জ্বালাময় করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাসেই দেখা যায় যে, তিনি বারবার দেশপ্রীতির সহিত তুলনায় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। গোরা ও বিমলা উভয়েই জীবনের অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে প্রেমের স্নিগ্ধ, অনাবিল সম্পূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করাইয়াছে, প্রেমকে অস্বীকার করিয়া দেশসেবার ভারগ্রহণ যে একটা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ আত্মবিকাশ এই সত্য তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতীন ও এলার প্রতিজ্ঞা-প্রত্যাহার সেই বহু-প্রতিপন্ন সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

অবশ্য এই তুলনামূলক বিচারে প্রেমের প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত হেতু আছে। পরাধীন দেশে দেশপ্রীতির পথ যে কণ্টকাকীর্ণ তাহাই শুধু নয়—ইহা সুস্থ ও সম্পূর্ণ আত্মবিকাশেরও পরিপন্থী। যে মনোভাবে ইহার জন্ম তাহার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ও বিরাগের প্রচুর উপাদান বর্তমান। ইহার মধ্যে কঠোর আত্মদমন, কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দয় আত্মপীড়ন আছে—প্রেমের অপার আনন্দ ও স্বতোবিকশিত মাধুর্যের অবসর নাই। সুতরাং লেখক যে পরিমাণে কবি, যে পরিমাণে পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষপাতী, সেই পরিমাণে দেশানুরাগের নীরস, কঠোর সাধনা ও সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মসংকোচনের প্রতি সহানুভূতিহীন। বাস্তবিক দেশপ্রীতির প্রসন্ন, স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল মুখকান্তির সহিত আমাদের পরিচয় নাই—যে মুখ আমাদের চোখে পড়ে তাহা ভ্রূকুটি-কুটিল, হিংস্রভাবাপন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় কুঞ্চিতাধর। সুতরাং তাহা প্রেমের সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারিবে কেন?

এইবার উপন্যাসটির কেন্দ্রগত দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসের আসল নায়ক-নায়িকা অতীন বা এলা নহে, বিপ্লববাদের যে প্রতিবেশ উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মনোভাবকে বিশেষ আকার ও গতিবেগ দিয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্মানের দাবি করিতে পারে। অতীন ও এলা এই প্রতিবেশের দুরন্ত-বেগোৎক্ষিপ্ত দুইটি ধূলিকণা মাত্র। তাহাদের মনোভাবের যে কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহাদের আবেগের যে কিছু তীব্রতা, সমস্তই প্রতিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। সুতরাং প্রতিবেশপ্রভাব ভাল করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে নায়ক-নায়িকার মনোরহস্য আমাদের কাছে অর্ধস্ফুট থাকিয়া যাইবে। লেখক আভাসে-ইঙ্গিতে প্রতিবেশের যে ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া ফুটাইয়াছেন তাহা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সহায়তাকল্পে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। লিখিত ক্ষুদ্র চারি অধ্যায়ের পিছনে যে বহুসংখ্যক অলিখিত অধ্যায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাদের অভাবে উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস যেন খণ্ডিত ও ভারকেন্দ্রচ্যুত বলিয়া মনে হয়। গোরার দেশপ্রীতির উৎকট সর্বব্যাপিতা অনুভব না করিলে সুচরিতার প্রেমের নিকট তাহার আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। এখানেও তেমনি অতীনের আত্মঘাতী বিদ্রোহ ও এলার ব্যাকুল অনুশোচনা বুঝিতে হইলে যে

শক্তি তাহাদিগকে নিজ দুশ্ছেদ্য নাগপাশে বাঁধিয়াছিল তাহার আনুমানিক নহে, প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। এই পরিচয়ের অভাবই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।

তারপর আর একদিক্ দিয়াও এ প্রেমচিত্রটি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই—তাহা হইতেছে নায়িকার চরিত্র। এলার চরিত্রে রক্ত-মাংসের বাহুল্য নাই—তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative)। সে অতীনের তীক্ষ্ণ আক্রমণ প্রায় বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদচেষ্টা ওষ্ঠে আসিয়াই বিলীন হইয়াছে। অতীন ও এলার মধ্যে প্রেমের চিত্রটি যে নিবিড় বর্ণে ফুটে নাই, তাহার কারণ হইতেছে এলার এই অসহায় নিষ্ক্রিয়তা। যে স্বদেশপ্রীতির নেশা তাহাকে প্রেমের দিকে অচেতন করিয়াছিল তাহার প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি না। যে প্রতিবেশ তাহার প্রেমকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে তাহা এতই অস্পষ্ট ও অশরীরী যে, প্রেমের গতি-নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত কারণ তাহা হইতে মেলে না। অতীনের ক্ষুব্ধ অভিযোগের মধ্যে বিপ্লববাদের মাদকতার এক-আধটু ইঙ্গিত-আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক্ হইতে 'ঘরে-বাইরে'র চিত্রের সহিত ইহা মোটেই তুলনীয় নহে। এলার পূর্বজীবনের ইতিহাস তাহার পথ-নির্বাচনের উপর কোন আলোকপাত করে না—খেয়ালী ও পরমত-অসহিষ্ণু মা বা সহানুভূতি-হীন খুড়ীমা বৈপ্লবিক পথে পদার্পণের যথেষ্ট কারণ যোগায় না। ইন্দ্রনাথের সহিত তাহার সহযোগিতার কাহিনী আরও অসংলগ্ন ও গ্রন্থিশূন্য—ইন্দ্রনাথের যে শক্তি অতীনের মত ব্যাকুল, সর্বত্যাগী প্রণয়কে ঠেকাইয়া বাখিয়াছিল, উপন্যাসমধ্যে তাহার কোনই পরিচয় পাই না। ইন্দ্রনাথকে কোন মতেই অতীনের যোগ্য প্রতিযোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না। যে আন্দোলনে ইন্দ্রনাথ নায়ক এবং বটু ও কানাই প্রধান কর্মী, তাহার জালে জড়াইয়া পড়ার প্রবণতা এলার চরিত্রে ছিল কি না তাহার ইতিহাস অলিখিত। বিমলার মোহ আমরা বুঝিতে পারি, এবং তাহার তীব্র আকর্ষণ লেখক উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়াছেন, কিন্তু এলার মোহ বুঝি না, ইহাকে মানিয়া লইতে হয়।

ইন্দ্রনাথ লোকটি যেমন ব্যবহারে দুর্বোধ্য, সেইরূপ পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য—তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন তার্কিকতার অন্তরালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব-রহস্যটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার দলপতিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; তিনি অপরকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এতই ব্যস্ত যে, নিজের জীবনের মূলনীতি-সম্বন্ধে কোনরূপ ধরা-ছোঁয়া দেন নাই। ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি উপন্যাসের পটভূমি-হিসাবেও ভাল ফুটিয়া উঠে নাই—অতীন-এলার প্রেমের পরিপন্থি-রূপেও তাঁহার ভূমিকা মোটেই স্পষ্ট নহে।

মানুষ-হিসাবে বটু ও কানাই বরং ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা সুস্পষ্ট হইয়াছে। বটুর ঈর্ষ্যাকষায়িত স্থূল লালসা ও কানাই-এর অনাবৃত সুবিধাবাদ ও সহানুভূতি-স্নিগ্ধ cynicism তাহাদিগকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগকে আমরা চিনিতে ও বুঝিতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রনাথের উচ্চ ভাবধারা ও নীচ কার্যপ্রণালীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আমরা খুঁজিয়া পাই না।

উপন্যাসটির সম্বন্ধে একটি যে প্রধান অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা বিপ্লববাদের চিত্রের ঐতিহাসিকতা ও সত্যানুবর্তিতা-বিষয়ক। অনেকেই অভিযোগ করিয়াছেন যে, লেখক বিপ্লব-

বাদের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা কাল্পনিক, বাস্তবানুগামী নহে। ইহার কৈফিয়ত হিসাবে লেখক 'প্রবাসী'তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার আত্মপক্ষসমর্থন ইহাই যে, লেখক ইতিহাস অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন—যে প্রতিবেশ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক না হইলেও উপন্যাসবর্ণিত প্রেমের বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট কারণ কি না ইহাই সমালোচকের প্রধান বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি মূলতঃ সত্য হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। বিপ্লববাদের চিত্র সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু যেখানে প্রেমেব সহিত ইহার প্রতিযোগিতা, সেখানে অন্ততঃ ইহার চিত্রটি এমন চিত্তাকর্ষক, এমনই উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত হওয়া চাই, যাহাতে অতীন ও এলার অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাভাব স্বাভাবিকতার দাবি করিতে পারে।. বর্তমান উপন্যাসে বিপ্লববাদের এমন একটা বীভৎস, কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রেমের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত ইন্দ্রনাথের কোন বাস্তবিক সাদৃশ্য আছে কি না তাহাতে সমালোচকের কিছু যায় আসে না; ব্রহ্মবান্ধবের অনুরাগী ভক্তেরা এই সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু আর্টের দিক্ হইতে এই আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু সমালোচকের প্রকৃত অভিযোগ এই যে, বিপ্লববাদেব সাধারণ চিত্রটি উপন্যাসবর্ণিত প্রেমের রূপ-নির্ধারণের কারণরূপে যথেষ্ট নহে। ববীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে এই অভিযোগের কোন সদুত্তর মিলে না। এমন কি বিপ্লববাদীদের সাধারণ জীবনযাত্রার যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিপদের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাও মনেব মধ্যে যথেষ্ট শঙ্কিত উদ্বেগ জাগায় না। মাঝে মাঝে হুইস্‌লের শব্দ পাই বটে, কিন্তু ইহা রঙ্গালয়েব মেকি হুইস্‌ল, ইহা আসন্ন বিপদের তীক্ষ্ণ সূচনা, রহস্যপূর্ণ অগ্রদূত-হিসাবে মনকে স্পর্শ করে না। এলার জীবনে এমন কি শঙ্কাময় সম্ভাবনা আসন্ন যাহাতে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে তাহাকে চেতনাব দ্বার রুদ্ধ কবিতে হইবে, সেই ভয়াবহ পরিণতির সুরটি উপন্যাস-মধ্যে বাজিয়া উঠে না। যে প্রতিবেশেব মধ্যে সে এতদিন নিঃশব্দ আত্মপ্রসাদের সহিত বিচরণ করিতেছিল তাহা কেন হঠাৎ এরূপ অসহনীয় ও শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিল তাহার পূর্বসূচনা উপন্যাসের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। বটুর ক্লেদাক্ত স্পর্শ, ইন্দ্রনাথের অনিশ্চিত শাসন ও পুলিশের নিগ্রহ—এ সমস্ত বিপদই ত তাহার পরিচিত। যাহাকে নূতন আবির্ভাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে তাহা অতীনের বিপদ্, কিন্তু এই বিপদের আশঙ্কাতেই যে এলা কেন আত্মহত্যার জন্য উন্মুখ হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট নহে। মোট কথা, প্রতিবেশের চারি-দিকের বেষ্টনী-রেখাটি ছেদহীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই—সমগ্র অবস্থাটি আমাদের মানস-নেত্রে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে প্রতিভাত হয় না।

হয়ত এরূপ বিস্তৃত সমালোচনা লেখকের স্বচ্ছন্দবিকশিত, অনায়াসস্ফূর্ত, বিরল-রেখার স্বল্পাভাসে গঠিত-দেহ ক্ষুদ্র চিত্রের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নহে। বিপ্লবপন্থার মোটামুটি চিত্রটি হয়ত তিনি আমাদের কল্পনাসাহায্যে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে বলিয়াছেন—পূর্ণকায় চিত্র দেওয়া হয়ত তাঁহার উদ্দেশ্যবহির্ভূত। এই বর্ণবিরল বেষ্টনীরেখার মধ্যে একটিমাত্র অংশে তিনি তাঁহার চিত্রতুলিকার সমস্ত উজ্জ্বল বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছেন—তাহা অতীনের তীব্র, আত্মগ্লানিময় প্রণয়াবেগ। উপন্যাসের অন্যান্য অংশ অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা ধরনের, তাহাতে

তর্ক আছে, epigram আছে, বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু উপন্যাসের যে আসল প্রাণস্পন্দন সেই রসপূর্ণ অনুভূতি নাই। এমন কি এলার সাড়াব (response) মধ্যেও প্রাণবেগ নাই—ইহার নিজের কোন চাঞ্চল্য, কোন তরঙ্গভঙ্গ নাই, ইহা কেবল নিশ্চল তটভূমির ন্যায় অতীতের অপ্রতিরোধনীয় প্রণয়ধারাকে আশ্রয় দিয়াছে মাত্র। ঔপন্যাসিক হিসাবে লেখককে কেবল এই একটিমাত্র খণ্ডাংশ (episode) দিয়া বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চিত্রগুলি প্রায় সমস্তই উচ্চাঙ্গের; তাঁহার কবি-কল্পনার সহজ অনুভূতির বলেই তিনি প্রেমের নিগূঢ় মর্মস্পন্দন ও ইহার অতীন্দ্রিয় আভাস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। অতীনের প্রেম-নিবেদনের মধ্যেও প্রেমের এই স্বরূপ-অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে, ইহার নিজস্ব রাগিণীটি ধ্বনিত হয়। গ্রন্থমধ্যে বৈপ্লবিক প্রতিবেশ যদি আর কিছু নাও করিয়া থাকে, তথাপি ইহা অতীনের প্রেমের প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গী নির্ধারণ করিয়াছে—প্রেমের স্রোতস্বতী বিপ্লববাদের চড়ায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এক ক্ষুব্ধ, আত্মগ্লানিময়, অথচ করুণ বিষণ্ণ সুরে বহিয়া চলিয়াছে। দৈবাহত প্রেমের ক্ষুব্ধ অভিযোগ ও বেদনাময় পূর্বস্মৃতি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার দীপ্ত, জ্বালাময় বিকাশের সহিত তুলনায় গ্রন্থের অন্যান্য চিত্র—বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র, ইন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব, বটুর নীচ ঈর্ষ্যা ও কানাই-এর গ্লানিকর সহানুভূতি, এলার নিষ্ক্রিয় প্রতিনিবেদন—এই সমস্তই ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। চারিদিকের পিঙ্গল ভস্মাবরণমধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ যেমন অকস্মাৎ অগ্নিদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ উপন্যাসটির ধূসর ও অস্পষ্ট বেষ্টনী-রেখার মধ্যে একমাত্র অতীনের প্রেমই উজ্জ্বল ও প্রাণধর্মী হইয়াছে—উপন্যাসের রত্ন-ভাণ্ডারে 'চার-অধ্যায়'-এর ইহাই একমাত্র বিশিষ্ট দান।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। উপন্যাসটির ক্ষুদ্রাবয়বের সহিত সংগতি রাখিয়াই ইহাতে যে সমস্যাটি আলোচিত হইয়াছে তাহাও ক্ষুদ্র। মৃত্যুশয্যাশায়িনী নীরজার ঈর্ষ্যা-বিকার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বিরুদ্ধে স্বামিপ্রেম ও ফুলবাগানের উপর তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচণ্ড চেষ্টাই উপন্যাসের বিষয়। নীরজার দশবৎসরের সার্থক প্রেম রোগজীর্ণ মনের ছোঁয়াচে হঠাৎ নীচ, সন্দেহাত্মক ঈর্ষ্যায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার স্বামী আদিত্য এই ঈর্ষ্যার অতর্কিত ধাক্কায় আবিষ্কার করিয়াছে যে, সে তাহার বাল্য-সঙ্গিনী ও কর্ম-সহযোগিনী সরলাকে ভালবাসে এবং এই ভালবাসা তাহার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকে ছাপাইয়া দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। সরলা নীরব কর্মনিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসংযমের অন্তরালে বহুদিন যাবৎ আদিত্যের প্রতি ভালবাসা অজ্ঞাতসারে পোষণ করিয়া আসিতেছে; তাহার বিবাহে অসম্মতিই এই ভালবাসার অস্বীকৃত লক্ষণ। নীরজার ঈর্ষ্যাই তাহাকে এই অস্বীকৃত প্রেম-সম্বন্ধে প্রথম সচেতন করিয়াছে। সরলার আত্মসংযম কিন্তু বৈরাগ্যপ্রিয়তার চরম রিক্ততায় পৌঁছায় নাই; যখন সে বুঝিয়াছে যে, এ প্রেম উভয়ের জীবনের সার্থকতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তখন সে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। তাহার কারাবরণ আত্মবলিদান বা সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস নহে; ইহা একদিকে আত্মপরীক্ষার অবসর-সৃষ্টি, অন্যদিকে আদিত্যকে মরণোন্মুখ পত্নীর প্রতি অবিকৃত চিত্তে শেষ কর্তব্য পালন করিবার জন্য সুযোগ-প্রদান। উপন্যাসের মধ্যে রমেন হইল সকলের friend, philosopher ও guide—সে এই ক্ষুদ্র সংঘাতে আলোড়িত জীবন-নাট্যের

সহানুভূতিপূর্ণ দর্শক। তাহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে সে এই সংঘাতের পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলি-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছে—প্রত্যেকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-প্রণালী সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। নীরজার ব্যর্থ, অভিমান-ক্ষুব্ধ প্রেমই যে তাহার সমস্ত অসহিষ্ণুতা, নির্মম আঘাত ও অনুদার কার্পণ্যের কারণ সেই গোপন রহস্য তাহার নিকট জলবৎ স্বচ্ছ। সরলার প্রতি তাহার সংকুচিত প্রেমনিবেদনে কোথাও যে একটা অজ্ঞাত অথচ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তাহা সে সহজ সংস্কারবলেই বুঝিয়াছে, সেইজন্যই তাহার প্রেম কখনও অশান্ত, উদ্‌বেল হইয়া উঠে নাই। কেবল আদিত্য সম্বন্ধে তাহার গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টির সেরূপ কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ আমরা পাই না—কেননা এই রহস্য সে পূর্ব হইতে জানিলে সরলার প্রতি তাহার অনুরাগকে ফুটিতে দিত না। এই চারিজনে মিলিয়া উপন্যাসটির ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ ভরিয়া তুলিয়াছে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে ধারণা হইবে যে, উপন্যাসটি অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায়, একটি সাধারণ প্রেমের বিরোধ-কাহিনী; কিন্তু ইহার আসল বিশেষত্বের ইঙ্গিত ইহার নামকরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মালঞ্চই ইহার প্রচ্ছদপট রচনা করিয়াছে; সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাস পুষ্পোদ্যানের গন্ধে সুরভিত হইয়াছে। আদিত্য ও নীরজার প্রেমের অনুপম সুষমার রহস্য এইখানেই যে, এই প্রেম পুষ্প-সাহচর্যে ঠিক ফুলের মতই বর্ণে গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার গতিবিধি, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি সমস্তই ফুলের বক্ষঃ-স্পন্দনের সহিত সমতালে নিয়মিত হইয়াছে। পুষ্পের মদির আবেশে ইহার নিবিড়তা ঘনীভূত হইয়াছে; ইহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসাদ ও অবসরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরাগ-সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া ইহার নবীন মাধুর্য ও সরসতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নীরজার প্রেমের সহিত তাহার স্বহস্তরচিত পুষ্পোদ্যানটির এক আশ্চর্য একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্পোদ্যানটি যেন এই প্রেমের একটি জীবন্ত নিদর্শন ও প্রতীক। সেইজন্য নীরজার ঈর্ষ্যা প্রধানতঃ এই ফুলবাগানের উপর স্বত্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার পথ ধরিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে, বাগানের ফুল ও তাহার স্বামীর হৃদয়ে প্রেম ঠিক একই নিয়মে বিকশিত হয়; এক বিষয়ের অধিকার লোপ অপর বিষয়ে অধিকার লোপের অভ্রান্ত পূর্বসূচনা। ফুলবাগানই তাহার প্রেম-বিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধক্ষেত্র; এইখানেই তাহার প্রেমিক জীবনের জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নির্ণয় হইবে। তাই সে এত ব্যাকুল, সর্বগ্রাসী আগ্রহের সহিত বাগানটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; তাই সে সরলাকে স্বামীর হৃদয় হইতে পারুক বা না পারুক বাগান হইতে নির্বাসন করিবার জন্য এত প্রবল জেদ দেখাইয়াছে। আবার তাহার ঈর্ষ্যাক্ষত হৃদয়ের সহিত কীটদষ্ট ফুলের যে তুলনা বাঞ্জিত হয়, তাহা কেবল কাব্যালংকারের দিক্ দিয়া নহে। তাহার মনোবিকারের মধ্য দিয়া যাহা অনতিকাল পূর্বে ফুলের মত সুকুমার ও মনোজ্ঞ ছিল তাহারই বিকৃতি অনুভব করা যায়। শেলির The Sensitive Plant নামক বিখ্যাত কবিতাটি মানুষের সহিত ফুলের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় আশ্চর্যরকম ভরপুর; উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী মহিলাটির জীবন ফুলের মতই কোমল, ফুলের মতই ক্ষণস্থায়ী ও সূক্ষ্মানুভূতিময়; ফুলগুলিও রমণীর মত ব্রীড়াসংকুচিত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অনেকটা সেইরূপ ভাব-

সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এই সাদৃশ্যই উপন্যাসটিকে সাধারণ ঈর্ষ্যা-বিরোধের কাহিনী হইতে উচ্চতর কবিত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছে।

নীরজার শেষ দৃশ্যের কার্যকলাপ কিন্তু এই ভাবগত সুসংগতির বিরোধিতা করে। হয়ত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া তাহার শেষ মুহূর্তের তীব্র বিরাগ মানব-মনের যথাযথ চিত্র হইতে পারে। নিঃস্বত্ব হইয়া অন্যের হাতে স্বামি-সমর্পণের জন্য মনকে ত্যাগের উচ্চসুরে বাঁধা বাস্তব জীবনে খুব বেশি সম্ভবপর হয় না—বৈরাগ্যের প্রলেপ ভেদ করিয়া আদিম মনের তীব্র আসক্তি ও ভোগ-লিপ্সা ফুটিয়া বাহির হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নীরজার ব্যবহার খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যাসটির উৎকর্ষের প্রধান কারণ ইহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নহে, ইহার ভাবগত সুষমা ও সামঞ্জস্য; এবং নীরজার অন্তিম মুহূর্তের ব্যবহারে এই ঐক্যের হানি হইয়াছে। উপন্যাসটির পটভূমি পুষ্পোদ্যান হইতে রুক্ষ-কর্কশ, পুষ্প-সৌরভহীন বাস্তব জগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 'পারিব না, পারিব না, পারিব না',—নীরজার এই শেষ-উচ্চারিত বাক্যে ঈর্ষ্যার যে তীব্র, ঝাঁজালো সুর ফুটিয়াছে, তাহাতে ভাব-সংগতি ও বর্ণ-সুষমার মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—মানবপ্রকৃতির এক অদম্য উচ্ছ্বাসের দমকা হাওয়া তাহাকে ইভের ন্যায় স্বর্গচ্যুত করিয়া পুষ্পোদ্যানের ক্ষীণ সুরভিটিকে নিঃশেষে উড়াইয়াছে। কলাকৌশলের দিক দিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে একটা ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ত্রুটি-সম্পর্কে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র উপন্যাসে সুরগত ঐক্যের এত বেশি প্রয়োজনীয়তা যে, অনাবশ্যক অংশ নির্মমভাবে বর্জন করিতে হইবে। বাস্তবতার প্রয়োজনেও তাহাদের স্থান দেওয়া উচিত হইবে না। এই বিচার-নীতি-অনুসারে হলধর মালী ও রোশনী আয়ার প্রবর্তনের যৌক্তিকতা বিচার-সাপেক্ষ। রোশনীর একটা বিশেষ কর্তব্য আছে—সে নীরজার স্বগতোক্তির বাহন; নীরজার মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা-জ্বালা সমস্তই তাহাকে আশ্রয় করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, সুতরাং নীরজার চরিত্র-বিকাশের সহায়-হিসাবে তাহার একটা সার্থকতা আছে। তবে তাহার বাংলাভাষায় এতটা অধিকার জন্মিয়াছে যে, তাহার হিন্দুস্থানিত্বের শেষনিদর্শন-স্বরূপ 'গোখী' উচ্চারণটি অনেকটা anachronism বা কাল-বৈষম্যের লক্ষণের মতই ঠেকে। হলধরের উপন্যাসমধ্যে সেরূপ কোন অপরিহার্য কর্তব্য নাই—সে কেবল নীরজার ঈর্ষ্যা-জর্জর মনের একটা দিকের উপব আলোকপাত করিয়াছে। সরলার বিরুদ্ধে তাহার ঈর্ষ্যা এতই অশোভনরূপে তীব্র হইয়াছে যে, বাগানের মালীদিগের মধ্যেও সে অবাধ্যতার প্রশয় দিয়া সরলার কর্তব্যপালন কঠোরতর করিয়া তুলিয়াছে। হলার এইটুকু পরিচয় যথেষ্ট হইত; কিন্তু ইহার বেশি পরিচয় দিতে গিয়া তাহার যেটুকু স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে, তাহাতে উপন্যাসের ভাবসামঞ্জস্য বা সূক্ষ্ম সুরগত ঐক্যের হানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে ক্ষুদ্র উপন্যাসের স্থান-সংকীর্ণতা এত অধিক যে, রমেন, সরলা ও আদিত্যের মত প্রধান চরিত্রগুলিরও কেবল পার্শ্ব-ছবিতেই (profile) আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সেখানে হলার প্রতি মনোযোগের আধিক্য অনেকটা অপব্যয় বলিয়াই ঠেকে। আসল কথা, সময়বিশেষে বাস্তবপ্রিয়তাও একটা প্রলোভনের ফাঁদ হইয়া দাঁড়ায়; এবং এই প্রলোভন অতিক্রম করিতে খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও সামঞ্জস্যবোধের

প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলাবিদ্‌ও সম্পূর্ণরূপে এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে 'মালঞ্চ' রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ক্ষুদ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসাবলী সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে উপন্যাস-জগতে তাঁহার স্থান-সম্বন্ধে আমরা একটা ব্যাপক ধারণা করিতে পারি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে। আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি যেন মনে হয় উপন্যাস তাঁহার বিধি-নিয়োজিত কর্মক্ষেত্র নহে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ কবিপ্রতিভাই তাঁহাকে এই বিদেশ-পর্যটনে অবাধ ছাড়পত্র দিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসাবলী জীবনের জনতাকীর্ণ, গ্রন্থিবহুল কেন্দ্রভাগের ভিতর দিয়া নিজেদের পথ করিয়া লয় নাই; তাহারা অধিকার করিয়াছে মানবজীবনের অপেক্ষাকৃত নির্জন সীমান্ত-প্রদেশ। আমাদের জনবহুল পল্লীগ্রাম, দ্বন্দ্ববহুল সংসার ও পরিবার, দারিদ্র্য ও ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের খরতাপ-ক্লিষ্ট জীবনযাত্রা—ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রখর বাস্তবতা হইতে তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয় কবি-প্রকৃতি সংকুচিত হইয়াছে। শিলং-এর বর্ষাধৌত পার্বত্য প্রকৃতি, ইহার প্রেমের দীপ্ত অরুণিমার বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ সূর্যাস্তরাগ, কলিকাতার নক্ষত্রদীপ্ত, শান্তিস্নিগ্ধ নীরব অন্ধকার, নদীতীরের শ্যামল তরু-শ্রেণীর অন্তরালমুক্ত সূর্যোদয়—ইহারাই তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কর্মক্ষেত্রের প্রতিবেশ রচনা করিয়াছে। অসাধারণত্বের প্রতি কবিপ্রতিভার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বিষয়-নির্বাচন, চরিত্র-পরিকল্পনা, অন্তর্নিহিত সমস্যার বিশেষত্ব—সর্বত্রই এই অসাধারণত্বের ছাপ আছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ঠিক আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সাধারণ জীবনের সমসুখদুঃখভাগী বলিয়া মনে করা যায় না—'চোখের বালি'র পর হইতেই তিনি এই স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বন করিয়াছেন—'চোখের বালি'ই তাঁহার শেষ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। গোরা, আনন্দময়ী, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, লাবণ্য, কুমুদিনী—ইহাদিগকে হঠাৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহুপদ চিহ্নাঙ্কিত রাস্তাঘাটে দেখিবার উপায় নাই। ইহাদের সমস্যা, ইহাদের জীবনযাত্রা, ইহাদের আদর্শ—সমস্তের মধ্যেই একটা অসাধারণত্বের স্পর্শ আছে। ইহারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, অনেকে বাঙালী পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করে, বঙ্গসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে ইহাদের একটা শিথিল সম্বন্ধ আছে, বাঙালী জীবনের মধুর রসধারা ইহারা আকণ্ঠ পান করিয়াছে—কিন্তু ইহাদের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ও-পরিবার-নিরপেক্ষ। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিলেই ইহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস-ক্ষেত্রে প্রকৃত শিষ্য কেহ নাই—তিনি কোন নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন নাই। তাঁহার প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব অননুকরণীয়। তাই রবীন্দ্রনাথের

উপন্যাসাবলী বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য স্থায়ী সম্পদ্ হইলেও উপন্যাসের অগ্রগতির প্রধান ধারার সহিত ইহারা যোগরহিত। ঔপন্যাসিক উপাদানের সহিত অসাধারণ কবিপ্রতিভার পুনরায় সমন্বয় না হইলে ভবিষ্যৎ যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুবর্তী মিলিবে না।

(৯)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেইজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয়-নিবাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ পবিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি বা চরিত্র-বিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেগুলিকে সুনির্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যাসমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। উপন্যাসের ঐক্য অনেকটা আল্গা ধরণের; ইহার তন্তুগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে, এই ফাঁকগুলি ঔপন্যাসিক অনেক সময়ে গল্পবহির্ভূত প্রসঙ্গ বা মন্তব্যের দ্বারা পূরণ করিতে পারেন। ছোট গল্প-লেখকের ভাগ্যে এই সমস্ত সুযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের আপেক্ষিক মূল্য অনেক বেশি। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা যেরূপ সংকীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতোবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোট গল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সংগতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকাপ্রোথিত, শীর্ণকলেবর জলধারার মতই দেখায়। এই স্বাভাবিক রসদৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই আমাদের উপন্যাসের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা বিরাট ফাঁকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বক্তব্য বিষয়ের গুরুতর অভাব যেন লেখককে একটা শূন্যগর্ভ, অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বক্তব্যের অভাব মন্তব্যের প্রাচুর্য বা অনাবশ্যক দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ফল কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোট গল্পের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে, যতটুকু মাধুর্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সুতরাং আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার পক্ষে ছোট গল্পের একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় ছোট গল্পের সহিত আমাদের একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশে জীবনধারার এমন একটি সহজ ও প্রচুর প্রবাহ, এমন একটি দুর্দমনীয় গতিবেগ আছে যে, ইহা উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিকেও ছাড়াইয়া যাইতে চাহে। পাশ্চাত্ত্য জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলি এত সুদূরপ্রসারী, তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত এতই বিচিত্র ও জটিল, তাহাদের কার্যক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, ছোট গল্পের মধ্যে সেগুলির স্থানসংকুলান হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ ছোট গল্পের মধ্যে স্থানলাভ করে তাহা প্রায়ই গৌণ ও অপ্রধান। জীবনের কেন্দ্রস্থ গভীর ভাব ও অনুভূতিগুলিকে ছাড়িয়া, তাহার লঘুতর বিকাশগুলি, তাহার সীমাপ্রদেশের গৌণ বৈচিত্র্য-গুলিকে লইয়াই তাহার কারবার। চটুল সরসতা, জীবনের বিস্ময়কর, আশ্চর্য সংঘটনসমূহ, তাহার হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংগতিগুলিই সাধারণতঃ ইউরোপীয় ছোট গল্পের বিষয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতে ইহার বিপরীত ব্যাপার। তাঁহ দুই-একটি গল্পে হাস্যরসের প্রাচুর্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা, সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও রহস্যময় সূত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে। আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে মরুভূমির বিশাল, ধূসর বালুকা-বিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি সেখানেও সেই সর্বদেশসাধারণ ভাব-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া বাহ্য বিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তব জগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাবসম্পদ্ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে যে, আমাদের বিষয়দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই; আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির।

আমাদের সামাজিক জীবনের বদ্ধ গলির মধ্যে রবী .থ যে উপায়ে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বহাইয়াছেন, তাহা যেমনি সহজ তেমনি ফলপ্রদ। তাঁহ.. গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা .ই রিটি উপ...য়র বৈধতা ও কার্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গ..ণ্ডলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রেম। একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, Love is the solar passion of the race—প্রেমই মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রেমই সাধারণ জীবনে একটা বিপুল শক্তিবেগ, প্রবল, ধ্বংসকারী উন্মত্ততা ও দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সঞ্চার করিয়া ইহাকে রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করিয়া তোলে, তুচ্ছতম জীবনের উপরে একটা বৃহৎ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আনিয়া দেয়। প্রেমের উন্মাদনা জীবনকে তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে টানিয়া আনিয়া বাহিরের বিশ্বজগতের সহিত একটি নিগূঢ় সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ করে, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল আবেগকে, সুপ্ত কল্পনাবৃত্তিগুলিকে মুক্তি দিয়া, ও মানবমনে অতর্কিত, অলক্ষিত পরিবর্তন সংসাধন করিয়া এক অনির্বচনীয় রমণীয়তার সৃষ্টি করে। কবিরা প্রেমের এই দুর্বার শক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার স্তবগান করিয়াছেন, ঔপন্যাসিকেরাও ইহার গূঢ় প্রভাব ও প্রক্রিয়া মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে নিতান্ত দুর্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটি বৃহৎ দুঃখ অভিষিক্ত করে ও মর্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধানতঃ কবিত্বময় গীতিকাব্যের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। ঔপন্যাসিকের যে প্রধান কর্তব্য মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, তাহা ইহাদের মধ্যে সেরূপ পরিস্ফুট নহে। 'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতেও প্রধান আকর্ষণ—গিরিবালার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য ও তাহার অতৃপ্ত-যৌবন-চঞ্চল রক্তলহরীর উপর রঙ্গমঞ্চের যাদুময় প্রভাব-বর্ণনাতে—উহার গল্পাংশে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। 'দুরাশা' গল্পটিতেও সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। কেশরলালের ব্রাহ্মণ্যধর্ম একটি সনাতন, অপরিবর্তনীয় মনোভাব বা কেবল একটা অভ্যাসের সংস্কার মাত্র, এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রশ্নটি লেখক কেবল উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'অধ্যাপক' গল্পটির অনেকগুলি দিক্ আছে—একটি ব্যঙ্গবিদ্রূপের দিক্। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটি প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ় প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবি-প্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে কবির সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণপটুতার আশ্চর্যরূপ মিলন সাধিত হইয়াছে। 'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত বন্য মৃন্ময়ীর অভাবনীয় আমূল পরিবর্তন, যে অদৃশ্য প্রভাবে তাহার বালসুলভ চপলতা নিমেষমধ্যে রমণী-প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সজল গাম্ভীর্যে

পরিণত হইয়াছে, তাহার চিত্রটি যেমন কবিত্বপূর্ণ তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অনবদ্য। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের অনুপম সংযত মাধুর্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও একটু পরুষ, বুদ্ধি-কঠোর স্পর্শ বা পুরুষোচিত উগ্র ঝাঁঝাল সমালোচনার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। কি পল্লীপ্রকৃতি-বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে—সর্বত্রই এই অনির্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তদৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যবোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—"অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।" এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বোধ হয় অন্ধ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুমান্ প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিস্তার সংকুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ, যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে, তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। জীবনের নিতান্ত বাঁধা-ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হরসুন্দরী প্রৌঢ়বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক-কর্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয় ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকাল-মৃত্যুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রেমমূলক অন্যান্য গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনার সময় নাই। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্তিনী'র সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত সম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। কিন্তু এগুলিতেও, কোথাও বা একটু চরিত্র-সৃষ্টি, কোথাও বা একটু অপরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা, কোথাও বা মানব-জীবন সম্বন্ধে একটু গভীর মন্তব্য তাহাদের উপর একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজঃপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই চরিত্রটি কেবল সাধারণ বর্ণনার দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে, কার্যে বা ব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয় নাই। ইহার মধ্যে দুইটি প্রকৃতি-

বর্ণনা, মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিগূঢ় ভাবগত ঐক্যের দুইটি মুহূর্ত, সমস্ত গল্পটিকে কল্পনালোকের উচ্চ প্রদেশে লইয়া গিয়াছে। একটির উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া রহিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লীর শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লী-ধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

'মাল্যদান' গল্পটিতে হরিণ-শিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক-বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জা-কুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা-উপলক্ষ্যে লেখক বেদনা-রহস্য-মণ্ডিত মানব-হৃদয়ের সহিত স্বতঃ-উৎসারিত-আনন্দ-নির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন! "যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল! জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃতি কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে!" 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে প্রেমের আর এক নূতন দিক্ দেখান হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাকুল আত্মপ্রতারণা, স্খলিতপ্রায়, অপসরণোন্মুখ প্রেমকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা সমস্ত গল্পটিকে একটি ব্যথিত করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, ও তাহার মধ্যে একটা রোগতপ্ত মনের বিকার আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করিয়াছে।

(২) এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা করিব। আমাদের এই অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক জীবনে,—যেখানে সকলেরই একটা বিশেষ সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, ও যেখানে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ,—সেখানে মাঝে মাঝে একটি বিচিত্র অপ্রত্যাশিত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া রোমান্সের সূত্রপাত করে; পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্যয়, একটা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্নেহ, প্রেম, প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজনির্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট গল্পে পূর্ণমাত্রায় এই সংকীর্ণ অবসরের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অত্যন্ত পাকা প্রস্তর-দুর্গের মধ্যে যে দুই একটা গোপন, অলক্ষিত রন্ধ্রপথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া

বৈচিত্র্যের প্রবেশমার্গ রচনা করিয়াছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতে নির্জন পল্লীজীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারাপাতের মধ্যে প্রবাসী পোস্টমাস্টারের সহিত অনাথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহ-সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, পারিবারিক জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই তাহার এত করুণ, শঙ্কিত আবেদন। 'ব্যবধান' গল্পটিতে বনমালী-হিমাংশুমালীর মধ্যে ভালবাসাটি পারিবারিক বিরোধ ও প্রতিকূলতার প্রতিবেশে একটি শীর্ণ-কুণ্ঠিত বেদনার মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'তে এই স্নেহ-বন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী-ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। 'দানপ্রতিদান'-এ শশিভূষণ-রাধামুকুন্দের নিঃসম্পর্ক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে একটা নীরব অনুযোগ ও রুদ্ধ অভিমানের স্পর্শ একটি ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সহোদর ভ্রাতার সহজ সম্পর্ক-প্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'মাস্টারমশায়'-এ মাস্টার হরলাল ও ছাত্র বেণুগোপালের মধ্যে এরূপ একটা নিবিড় কুণ্ঠাবেদনাজড়িত, বাধাপ্রতিহত স্নেহপাশই হতভাগ্য হরলালের জীবনটিকে ট্র্যাজিডির দুশ্ছেদ্য, জটিল জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণের সহিত গিরিবালার সম্পর্কটিও এই মধুর অনিশ্চয়ের ম্লান-ছায়া-মণ্ডিত; গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি শেষের গানটিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর গল্পটি শশিভূষণের জীবনকাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।

সময় সময় একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই স্নেহসম্পর্ক ঠিক সহজ, স্বাভাবিক বিকাশের দিকে না গিয়া একটা বক্র, বঙ্কিম গতি ও অস্বাভাবিক তীব্রতা লাভ করিয়া থাকে। 'পণরক্ষা'য় বংশীবদন ও রসিকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঠিক ভ্রাতৃপ্রেম নহে—তাহার মধ্যে মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস ও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র, জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ 'রাসমণির ছেলে'র মধ্যেও মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ পরস্পর রূপান্তরিত হইয়া একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। পুত্রের প্রতি ভবানীচরণের স্নেহ মাতৃস্নেহের মতই অজস্র প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে; রাসমণির ভালবাসার মধ্যে পিতৃশাসনের দৃঢ়তা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'কর্মফল' গল্পটিতে একদিকে পিতার কঠোর শাসন ও অন্যদিকে মাসীর অস্বাভাবিক ও অচিরস্থায়ী স্নেহাতিশয্য সতীশের জীবনের সমস্ত দুর্দৈব সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই গল্পটি ঠিক বাস্তব অবস্থার অনুগামী বলিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য তত্টা ফুটিয়া উঠে নাই; আর ইহার শেষ ফল ও চরম পরিণতিও ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তী।

এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'দিদি'ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ছোট ভাইটিকে লইয়া শশিমুখীর স্বামীর সহিত যে 'নীরব দ্বন্দ্বের গোপন ঘাত-প্রতিঘাত' চলিয়াছে তাহা ঘটনাচক্রে একেবারে বিরোধের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়া অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। আবার এই বিরোধ তাহার নবজাগ্রত প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে অদৃষ্টের ক্রূর পরি-

হাসের মতই আসিয়া তাহার শান্ত, নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে একটি দারুণ দুর্বিষহতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের সমাজ ও পরিবারের আর একটা দিক্ আছে যাহা ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যসৃষ্টির কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে—তাহা সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ। 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পটিতে এই ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। বনোয়ারীলালের বৃহৎ ব্যক্তিত্ব তাহার পারিবারিক গণ্ডি ছাড়াইয়া অত্যন্ত অসংগতরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাহার সহিত তাহার পরিবারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রেমের নিগূঢ় দাবিই বনোয়ারীলালের বিদ্রোহাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। সে জমিদার-বংশের বড় ছেলে বলিয়া নহে, তাহার পুরুষকারের স্বাধীন অধিকারের দ্বারাই নিজ স্ত্রী কিরণলেখার চিত্ত জয় করিয়া লইতে চাহে—তাহার বাড়ির অতি-নিয়মিত ব্যবস্থা তাহার প্রেমিক হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট খোলা ও উদার নহে বলিয়াই বংশপরম্পরাগত প্রথার সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত। আর তাহার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, কিরণও তাহার এই বিশাল প্রেমিক হৃদয়ের কোন সম্মান না রাখিয়া তাহার শত্রুদলে যোগ দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচারী পরিবারবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—প্রেমের স্নিগ্ধরশ্মি-পরিবৃতা কিরণলেখা হালদারগোষ্ঠীর বড়বৌ-এর মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়াছে। এই গূঢ় বিরোধ ও অসংগতির কাহিনীটি যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, বনোয়ারীর চরিত্রবিশ্লেষণও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে।

এই বংশগৌরবের নির্দোষ, নিরীহ দিকের চিত্র 'ঠাকুরদা' গল্পে দেওয়া হইয়াছে। নয়নজোড়ের বাবু-বংশের শেষ প্রতিনিধি ঠাকুরদাদার বংশাভিমানে এমন একটি করুণ আত্ম-প্রতারণা, মধুর সুষমা ও সহজ ভদ্রতা আছে যে, ইহা আমাদের বিরোধভাবকে মাথা তুলিতে দেয় না। 'ঠাকুরদা' গল্পটি কোন সত্যান্বেষী, বাস্তবতাপ্রবণ লেখকের হাতে পড়িলে Thackerayর "Book of Snobs"-এর একতম অধ্যায়ে পরিণত হইতে পারিত—রবীন্দ্র-নাথের গভীর সহানুভূতি ইহাকে একটি করুণ হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া সুন্দর ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের সমাজের প্রধান কলঙ্ক—বিবাহের অত্যাচার—আলোচিত হইয়াছে, যথা, 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', ইত্যাদি। এই বিষয়ের আলোচনা বাংলা উপন্যাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্যের খুব সাধারণ পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে লেখক কেবল অবিমিশ্র করুণ রসেরই উদ্রেক করিয়াছেন, কেবল 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রাঙ্কনে একটু বিশেষত্ব আছে। মোট কথা, এই শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক রোমান্স-সৃষ্টির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তির বলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-গুলির কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া

অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্যরূপ রূপান্তর-সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অনায়াসে, সামান্য দুই-একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিও প্রকৃতির সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার আভাস-ইঙ্গিত-আহ্বান-বিজড়িত রহস্যময় আকাশ-বাতাসের মধ্যে, এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্বেই কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি গল্প একেবারে আদ্যোপান্ত প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট্ প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয়ে আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'অতিথি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষমতার চূড়ান্ত উদাহরণ। 'তারাপদ' লেখকের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সঞ্চরণশীল, প্রবহমান, চিরচঞ্চল পৃথিবীর প্রাণের সহিত তাহার এক আশ্চর্য সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা আছে। মানুষের এই অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নাই বলিয়াই তাহার ভালবাসার মধ্যে এমন একটা প্রবল মোহ ও সংকীর্ণ আসক্তি দেখা যায়। তারাপদর স্নেহবন্ধনের মধ্যে ধরিত্রীমাতার সেই উদার, অনাসক্ত ভাব, সেই শিথিলতা ও পক্ষপাতহীনতা আছে। মানুষ নিজের জন্য যে ছোট-ছোট ঘর রচনা করে, তাহার চারিদিকের স্নেহের বেষ্টনের মধ্যে এক গাঢ়তর মোহাবেশ আছে—প্রকৃতির স্নেহে কোন মোহাবেশ, কোন ব্যাকুল বাষ্পসজলতা নাই। তারাপদ প্রকৃতির এই উদার অনাসক্তি, এই মোহমুক্ত চির-চঞ্চলতার মনুষ্য-প্রতিরূপ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার লুসি, রুথ ও অন্যান্য গ্রাম্য নরনারীর চিত্রে প্রকৃতির কল্যাণী মূর্তির একটা বিশেষ দিক্‌কে আকার দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই মূর্তি-কল্পনা মূলতঃ তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক দার্শনিক মতবাদের কবিত্বময় রূপান্তর। যাহার সেই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস নাই, সে এই চিত্রগুলির বৈধতায় ও নৈতিক উৎকর্ষ-বিষয়ে সন্দিহান হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তারাপদর চরিত্রে প্রকৃতির সহিত যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না, সর্বসাধারণের স্বাধীন অনুভূতিই তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারে।

তারাপদর সহিত 'আপদ' গল্পের নীলকণ্ঠের কতকটা অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে, এবং এই দুই চরিত্রের তুলনা করিলে তারাপদ-চরিত্রের গূঢ় মাধুর্য ও পবিত্রতা বিশেষরূপে বুঝা যাইবে। তারাপদ তাহার অবারিত সহজ প্রাণের বলেই মতিবাবুদের পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছে; নীলকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া দৈববশে কিরণদের বাগানবাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। একের অবাধ, অসংকোচ আতিথ্যগ্রহণ, অপরের কুণ্ঠিত অনুগৃহীত ভাব। তারপর পরস্পরের চরিত্রানুরূপ উভয়ের মনোরঞ্জনের উপায়ও বিভিন্ন—তারাপদ সাঁতার দিয়া, কাজকর্মে সাহায্য করিয়া, নিজ সহজ শক্তির অবলীলাক্রম বিকাশে ও দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিয়া কর্তা-গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝিমাল্লাদের পর্যন্ত মনোহরণ করিয়াছে। নীলকণ্ঠ যাত্রার দলের গানের দ্বারা, কতকটা অভিনয়ের কৃত্রিম উপায়ে কেবল কিরণবালার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তাহার প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের জন্য বাড়ির অপর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছে। তারপর তারাপদর উদার হৃদয়ে ঈর্ষা, অভিমান প্রভৃতির লেশমাত্র নাই; সে প্রকৃতিমাতার স্তন্যপানে লালিত, তাহার অন্তঃকরণে কোন সংকীর্ণতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকণ্ঠ কিরণের স্নেহের ভাগ লইয়া

সতীশের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছে ও চৌর্যরূপ হেয় কর্মে পর্যন্ত নামিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকেও কতকটা ঔদার্য ও স্নেহশীলতা হইতে বঞ্চিত করে নাই; তাহার ঈর্ষ্যাপরায়ণতা তাহার বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র, ইহাতে নীচতার কোন স্পর্শ নাই। আবার দুইজনের মধ্যে আবির্ভাবের যেমন, তিরোধানেরও তেমনই একটা বিভিন্নতা আছে—তারাপদ তাহার সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহাকে বশীকরণের সমস্ত আয়োজন পায়ে ঠেলিয়া দিয়া, উদাস অনাসক্ত প্রকৃতিমাতার বক্ষে লুকাইয়াছে; নীলকণ্ঠ সকলের বিরাগ লইয়া ও একের ক্ষুব্ধ স্নেহমাত্র সম্বল করিয়া নিতান্ত অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারাপদ যে প্রকৃতির সহিত একাত্ম, নীলকণ্ঠ তাহার প্রসাদের কণামাত্র পাইয়াছে।

নীলকণ্ঠের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব স্নেহের মায়াদণ্ডস্পর্শে তাহার সুপ্ত পুরুষোচিত আত্ম-সম্মানবোধের উদ্‌বোধন। লেখক অতি নিপুণতার সহিত তাহার এই গূঢ় পরিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর ন্যায় নীলকণ্ঠও অতি অল্পকালের মধ্যে ভালবাসার স্পর্শে আত্মবিস্মৃত বাল্যকাল হইতে পরিণত যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভালবাসার প্রভাবে এই মানসিক গূঢ় পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে মৌলিকতার পরিচয় দেয়, এবং ইহা আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত বেশ সহজভাবেই মিলিয়াছে।

(৪) এইবার চতুর্থ পর্যায়ের গল্পগুলি আলোচনা করিব। সাধারণ বাঙালী জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংযোগসাধন একদিক্ দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিকে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সহজ এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীবভাবে বর্তমান আছে, যাহাদের অতিপ্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-বিরল যে, ইহার মধ্যে মনো-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'গুপ্তধন', প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কলাকুশলতার পরিচয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের যে প্রতিবন্ধক তাহা তিনি আশ্চর্য কল্পনা সমৃদ্ধির সহায়তায় অতিক্রম করিয়াছেন। 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মণিহারা' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত, বাস্তব জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়-সাধনের দুরূহতার বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইংরেজ কবি কোলরিজ এ বিষয়ে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। কিন্তু তাঁহাকেও অতি-প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। তাঁহার Ancient Mariner ও Christabel উভয় কবিতাতেই তাঁহাকে নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। আবার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত, অপরিচিত সুদূরের রহস্য মাখানো। 'Ancient Mariner'-এ মেরুপ্রদেশের নিঃসঙ্গ, ধবল তুষারস্তূপ, রৌদ্রদগ্ধ, নিবাতনিষ্কম্প অনন্ত মহাসাগরের নিবিড় নীরবতা, চঞ্চলশিখা, বিচিত্রাভ বাড়বানলের মধ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের আসন রচনা করিতে হইয়াছে। পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়াতরী ডুবাইতে হইয়াছে। 'Christabel'-এও নিশীথ-স্তব্ধ অরণ্যানী ও মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত দুর্গাভ্যন্তরেই প্রেতলোককে আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা—"the spot in the brain that will show itself out", মস্তিষ্কবিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি—তাহা তিনি তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

'নিশীথে' গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত, প্রথম স্ত্রীর প্রতি অপরাধ হেতু গুরুভারগ্রস্ত স্বামীর সাময়িক মনোবিকার হইতে উদ্ভূত। মৃত্যুশয্যাশায়িনী প্রথমা স্ত্রীর ত্রস্ত, ব্যাকুল প্রশ্ন 'ওকে, ওকে, ওকে গো' অনুতপ্ত স্বামীর মস্তিষ্কে এমন গভীর, অনপনেয় রেখাতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই কয়েকটি সামান্য আর্তবাণীর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস আপন গভীর, অতলস্পর্শ স্তরে উহার শঙ্কিত শিহরণটুকু, উহার ব্যথিত রেশটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে। আর মনোবিকারটুকু ঘটাইতে লেখকের বিশেষ আয়োজন-বাহুল্য করিতে হয় নাই—একটা উপনগরস্থ বাগানবাড়ির ম্লান, জ্যোৎস্নালোকিত বকুলবেদী বা পদ্মার তটে কাশবন-পরিপ্লুত, নির্জন বালুতটের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ সমস্ত গল্পটির মধ্যে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে এমন একটি রেখাও নাই। এই অতিপ্রাকৃতের অসীম সাংকেতিকতা আরব্য-উপন্যাস-বর্ণিত বোতলের মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যদেহের ন্যায় সংকীর্ণপরিধি বাঙালী জীবনের মধ্যে সহজেই স্থান লাভ করিয়াছে।

'মণিহারা'ও অনেকটা 'নিশীথে'র ন্যায় সদ্যঃ-পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই তুষারশীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই; বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চকচক করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে বুদ্ধি-তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই realistic setting বা বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অপরূপতা আরও রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল, সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়তার মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে। এই সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান পাঠকের মন বলিতে থাকে "Did I dream or wake?"

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বাদশাহী যুগের সমস্ত ঐশ্বর্য দীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তরসঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস তাহাদের ইন্দ্রজাল বর্ষণ করিয়াছে। বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম উহার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ ও রহস্যময় সংকেত ছড়াইয়া রাখিয়াছে। কবি যেন এই পঙ্কিল উচ্ছ্বসিত কামনাপ্রবাহের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত "বস্তু-অংশ বর্জন করিয়া রস অংশ ছাঁকিয়া লইয়াছেন।" তাবার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা-সাংকেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions

ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর অনুরূপ কিছু ইংরাজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সংগীতপ্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে ট্রেন-প্রতীক্ষার অবসরে। এখানেও 'realistic setting'টি লেখককে গল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সুযোগ দিয়াছে—তাঁহাকে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিবার অসুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। এই তিনটি অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—পৃথিবীর যে-কোন ঔপন্যাসিক এই শক্তিতে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন। ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি গল্প আছে যাহাতে অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশে বস্তুতঃ প্রকৃত বিষয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে কথাগুলি দেওয়া হইতেছে মৃতা রমণীর মুখে, কিন্তু মৃতের এই আত্মজীবন-কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতের তুষারশীতল স্পর্শটি আনিবার কোন চেষ্টা নাই। যে প্রগল্‌ভা, রূপযৌবনমোহাবিষ্টা রমণী গল্পটি বলিতেছে, সে দুই চারিটি মর্ত্যলোকসুলভ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছাড়া প্রেতলোকের বিশেষত্ব কিছু অর্জন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতে একটি অসাধারণ মনোভাবের বিশ্লেষণ-চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে লেখক কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। জীবিতা শ্মশান-প্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেকে সত্য সত্যই মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, এবং লেখক তাহার চিন্তায় ও ব্যবহারে একপ্রকার সুদূর নির্লিপ্ততার ভাব মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহার মধ্যে সেরূপ অনুভূতির গভীরতা নাই। সুতরাং গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটি কল্পনারসে ভরপুর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার প্রধান যুগটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ে তিনি যে গল্পসাহিত্যের নূতন অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাতন গল্পগুলির এখানে ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা যাইতে পারে। আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। এই প্রভেদ প্রথমতঃ বিষয়-নির্বাচনেই দেখা যায়। পূর্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবনযাত্রার গভীর মর্মস্থল হইতে উদ্ভূত; এক একটি গল্প যেন ইহার হৃদ্-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীররসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা কেবলমাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে, পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প সুতরাং আমাদের পুরাতন সমাজের চারিদিকে যে নবীন উন্মাদনা ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, যে অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ পুরাতন উপকূলের আশে-পাশে মুখরিত হইতেছে, তাহারই বিদ্রোহ-বেগটি জীবনের ছন্দে তালে গাথিয়া তুলিতে তিনি যত্নবান্ হইয়াছেন। এই নূতন যুগের সমস্যাগুলি পুরাতনদের ন্যায় এত গভীর ও ব্যাপক নহে; ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই ইহাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ। ইহারা প্রায়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য, তীক্ষ্ণতর্ক কণ্টকিত; বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া এখনও হৃদয়তাবের

গভীরতর স্তরে অবতরণ করে নাই। ইহাদের প্রভাব হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, চোখা-চোখা বুলি, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, অশ্রুর গভীর প্রবাহ উৎসারিত হয় না। তথাপি ইহাদের নূতনত্ব বিশেষ উপভোগ্য। আমাদের জীবনে যে তিল তিল করিয়া নবমেঘের সঞ্চার হইতেছে, তাহার বিদ্যুচ্ছটা ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূচনাকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ববর্তী গল্পগুলির সমসাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক্‌ হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্প-গুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার সমস্তটি যে আধুনিক তাহা নহে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ একটা নূতন ব্যাপার। প্রেম বস্তুটিকে আমরা এতদিন রোমান্সের বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত্‌ ছিলাম, ইহার বিচ্ছেদব্যথা, ইহার গোপন মাধুর্য, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ, ইহার মুক্তি ও বিস্তারের দিকেই আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। যাহাকে বাহিরের জগতে বড় করিয়া দেখিয়াছি, নিজ গৃহকোণে, পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে, বিধি নিষেধের অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাহার যে কুৎসিত, লজ্জাকর অভিব্যক্তি তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিষয়ের বৈধতা লইয়াও বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নাই। মোটের উপর এই বিষয়ে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কলাসৌন্দর্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজবিগর্হিত বিকাশও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ্‌ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিত আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছ-সলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নষ্টনীড়'-এ পূর্বলিখিত শর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম একটা দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধনীয় হৃদয়াবেগমাত্র, ইহা চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া পাপের পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করে নাই। তারপর লেখক কি সুকৌশলে, পুঞ্জীভূত বেদনার কারণ দেখাইয়া এই প্রেমের উদ্ভবটিকে সম্ভব করিয়াছেন—ভূপতির ঔদাসীন্য অমল, ও চারুর পরস্পর স্নেহসম্পর্কের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ, তাহাদের সাহিত্যচর্চার নিবিড় নেশা ও নিভৃত গোপনতা, মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যাতে তাহার গূঢ় পরিণতি, সর্বোপরি অমলের বিবাহ-সংবাদে তাহার অনিবার্য, অনাবৃত প্রকাশ—এই সমস্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলিই লেখক যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া কার্যকারণ-শৃঙ্খলাটি অতি নিপুণভাবে গাথিয়া তুলিয়াছেন; এই কাহিনীর অন্তরতলস্থ গভীর ভাবগুলি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। বর্তমান বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা নিতান্ত অকারণে প্রেমের উদ্ভব ঘটাইয়া বাস্তবতার মূল ভিত্তির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেন। যেখানে সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেখানে এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের যথেষ্ট ও সংগত কারণ না দেখাইলে, আমাদের বিচারবুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে চাহে না।

'স্ত্রীর পত্র' বর্তমানের নারীর অধিকারঘটিত আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তিস্থল। লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর যে বিদ্রোহবাণী আজ প্রতি মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। অবশ্য এখানে গল্পের উপযুক্ত ঘাত-প্রতিঘাত নাই, কেন না কথাগুলি সমস্তই একতরফা। এইরূপ তীব্রশ্লেষাত্মক একতরফা কথার Propagandism হিসাবে মূল্য আছে, কিন্তু আর্টের অপক্ষপাত ও সমদর্শিতা তাহাতে নাই। বিশেষতঃ, মৃণালের ক্রোধের ঝাঁজটা একটু অতিরিক্ত তীব্র বলিয়া মনে হয়, কেন না যে হতভাগ্য পুরুষ এই বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে, তাহার নিজের ততটা অপরাধ নাই, সে সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি-স্বরূপেই এই অগ্নিবাণ হজম করিতে বাধ্য হইয়াছে।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটিও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ, কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের কাপুরুষোচিত আস্ফালন, সমাজচ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মন্তব্যগুলি ভাবগভীরতার অভাব পূরণ করে—যেখানে তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেন না, সেখানেও তাঁহার বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতায় চমৎকৃত করিয়া থাকেন।

'পয়লা নম্বর' প্রধানতঃ অদ্বৈতচরণের individuality বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি—তাঁহার নিশ্চিন্ত ও একাগ্র জ্ঞানানুশীলনের পশ্চাতে যে একটি ক্ষুব্ধ নারী-হৃদয় নীরব বিদ্রোহে প্রধূমিত হইতেছিল, তিনি সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ ও উদাসীন। অনিলা বরাবরই অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে—তাহার পক্ষের কথা ভাল করিয়া বোঝান হয় নাই। অদ্বৈতচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি সিতাংশুমৌলির; সে নিজ সহজ ক্ষমতা-বলে পরকে নিজের কাছে টানিতে পারে, ঐশ্বর্যপ্রাচুর্যই তাহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। এই সহজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের বলে সে অনিলারও চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনিলার নিকট কোন সাড়া পায় নাই, কিন্তু তাহার নিশ্চল শান্তিকে বিচলিত করিয়া তাহাকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এই গল্পটিতে দাম্পত্য-সম্পর্কের বিশ্লেষণ-চেষ্টা থাকিলেও মোটের উপর ইহা বিপরীতপ্রকৃতি ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্রচিত্রণ।

'নামঞ্জুর' গল্পে 'ঘরে বাইরে'র ন্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদের ফাঁকা দিক্‌টা দেখান হইয়াছে; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার মধ্যে যে খ্যাতির লোভ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তাহাদিগকে সাংসারিক ছোটখাট স্নেহযত্নমণ্ডিত কাজের প্রতি বিমনা করিয়া তাহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও মাধুর্যের হানি করিয়া থাকে। মিটিং করিয়া ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ও গৃহে রুগ্‌ণ ভ্রাতার সেবায় অবহেলা—এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট্ ফাঁকির ব্যবধান আছে তাহা আমাদের সাধারণ আন্দোলনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

এই শেষের কয়েকটি গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে যে সমস্ত সমস্যার নবীন উদ্ভব হইতেছে, তাহারা এখন পর্যন্ত হৃদয়ের গভীর স্তরে কাটিয়া বসিবার সময় পায় নাই, এখনও অন্তরের মাধুর্যরসে অভিষিক্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের বর্তমান আলোচনায় হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিরই প্রাধান্য। কালে ইহারাই আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহাদিগকে

ঘিরিয়াই আমাদের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বিকশিত হইয়া উঠিবে; ইহারাই মানুষের হৃদয়গত যোগসূত্র হইয়া নূতন সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবেশ রচনা করিবে। সুতরাং ইহারাই যে নূতন যুগের সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করিবে তাহ একরূপ নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লেখা 'তিন সঙ্গী' গ্রন্থে (১৯৪০) যে তিনটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে—'রবিবার', 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি'—তাহারা তাঁহার অতি-আধুনিক যুগের জীবন-পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের সমাজনিরপেক্ষ অসাধারণত্বের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণের পরিচয় বহন করে। 'রবিবার'-গল্পে অভীক ও বিভার প্রতিহত প্রণয়সম্পর্ক বিশ্লেষিত হইয়াছে। অভীক কুলাচারত্যাগী নাস্তিক আর বিভা ব্রাহ্মসমাজের আস্তিক্যবোধের মধ্যে লালিত মেয়ে। অভীক বিভার প্রণয়ভিক্ষু; বিভার অনুরাগ ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য প্রতিদান-বিমুখ। পরস্পরের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্ক বিনিময় হইয়াছে, অনেক তীক্ষ্ণ মননের ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে, কিন্তু বিভা নিজের উদ্দেশ্যে অটল রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অভীক বিভার অলঙ্কার চুরি করিয়া শিল্পসাধনায় সমঝদারের স্বীকৃতিলাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছে ও জাহাজ হইতে বিভাকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ও নাস্তিকতা-পরিহারের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছে। অভীকের চরিত্র যে পরোয়া একরোখা ও একান্তভাবে আত্ম-নির্ভরশীল; শিল্পীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা তাহাকে নারীসঙ্গাতুর করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত প্রেমের নিবিড়তা নাই। মোট কথা, অভীকের চরিত্র তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যবোধের সূচ্যগ্র ইঙ্গিতে কণ্টকাকীর্ণ হইলেও পরিণত সমগ্রতা লাভ করে নাই। আত্মপ্রচারের উষ্ণ বাষ্পমণ্ডলে তাহার মুখাবয়ব অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে।

'শেষ কথা' অনেকটা রোমান্সধর্মী; উহার নায়ক যুগ-প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিজ্ঞানসাধনারত থাকিলেও বনান্তরালবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতি তাহার আকর্ষণ একান্ত অ-বৈজ্ঞানিক প্রেমিকের ন্যায়ই নিবিড় ও আবেশময়। পূর্ব প্রণয়ীর দ্বারা পরিত্যক্ত অচিরা যে নূতন প্রেমের প্রতি বিমুখ তাহা তাহার আচরণে বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটে নাই। ইহার কারণ নায়িকার পূর্ব প্রেমের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নহে, বিজ্ঞানসাধক প্রেমিকের আদর্শচ্যুতির আশংকা। শেষ পর্যন্ত লাবণ্য-অমিতের অতি সূক্ষ্মভাব-বিড়ম্বিত প্রেমের সুরে এই প্রেমেরও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। নায়িকা অধ্যাপক দাদুকে লইয়া নির্জনবাস হইতে লোকালয়ে ফিরিয়াছে ও নায়ক বিস্মিত বিজ্ঞান-চর্চায় আবার মনোনিবেশ করিয়াছে। এখানেও গল্পটির প্রধান উৎকর্ষ কোন চরিত্রসৃষ্টি বা ভাবপরিস্থিতির শ্রেষ্ঠত্বে নহে, নর-নারীর সাধারণ প্রণয়াকর্ষণের মননদীপ্ত বিশ্লেষণে।

তৃতীয় গল্পটি—'ল্যাবরেটরি'—আরও উৎকট চরিত্রস্বাতন্ত্র্য ও আচরণের অদ্ভুত খেয়াল-চারিতার নিদর্শন। আধুনিক যুগে ব্যক্তিত্ব কত নূতন নূতন রূপে ধারাল হইয়া উঠিতেছে ও পূর্বতন লৌকিক সংস্কার ও নীতিবোধকে হেলায় লঙ্ঘন করিতেছে এই গল্পে তাহারই প্রমাণ মিলে। নন্দকিশোর মোহিনীর পূর্ব ইতিহাস নিষ্কলঙ্ক নয় জানিয়াও তাহার চরিত্রের স্বকীয়তা-গুণে তাহাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়াছে—ইহাই তাহার মতে সগোত্রে বিবাহ। বৈধব্যের পর মোহিনী তাহার স্বামীর অক্ষয়কীর্তি বিজ্ঞানমন্দিরের ভার যোগ্য পাত্রে অর্পণ তাহার জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এক মেরুদণ্ডহীন তরুণ বিজ্ঞানসাধক রেবতী

ভারগ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। রেবতীকে আকর্ষণ করিতে একদিকে তাহার ভূতপূর্ব বিজ্ঞান-শিক্ষক মন্মথ চৌধুরীর উৎসাহ-দান ও অপর দিকে তাহার তরুণী কন্যা নীলার লোভনীয় সৌন্দর্যের চার ফেলা হইয়াছে। মন্মথর কার্যের পুরস্কার মিলিয়াছে মোহিনীর প্রৌঢ় প্রেমনিবেদনে ও পৌনঃপুনিক চুম্বনদানের অকৃপণ বদান্যতায়। কিন্তু নীলা তাহার মাতার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়াছে। সে রেবতীর প্রতি ছলাকলাবিস্তারের দ্বারা তাহাকে তপোভ্রষ্ট করিয়াছে ও তাহাকে চটুল প্রণয়বিলাস ও অসার খ্যাতির মোহে মাতাইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য তাহার পিতার ত্যক্ত সম্পদের কিছু অংশ বিজ্ঞানসাধনার গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া তাহার ভোগলালসার চরিতার্থতাসাধন। মোহিনী রেবতীকে অপসারণ ও নীলাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহার জীবনসাধনাকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। নীলার ধনলোভ-নিবারণের জন্য সে অসঙ্কোচে নিজ অসতীত্ব ঘোষণা ও নীলার পিতৃ-পরিচয়ে সন্দেহ আরোপ করিয়াছে। এত কাণ্ডের পর সমস্ত সমস্যার অতি আকস্মিক ও হাস্যকর সমাধান হইয়াছে—রেবতী পিসিমার ডাকে তাহার অঞ্চলতলে আশ্রয় লইয়াছে।

এই গল্পের প্রধান উৎকর্ষ মোহিনীর চরিত্র ও উহার মাধ্যমে নারীর সতীত্বের এক নূতন আদর্শ-প্রতিষ্ঠা। পাতিব্রত্য দৈহিক শুচিতায় নহে, স্বামীর জীবনব্রত-উদ্‌যাপনে অবিচলিত নিষ্ঠায়। ইহার জন্য অপর পুরুষের নিকট আত্মদান, এমন কি মন্মথ চৌধুরীর সহিত দাম্পত্য সম্পর্কের অভিনয়ও উপেক্ষণীয়। মোহিনীর এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে কোন অসমসাহসিক কার্যে নহে, মন্মথের সহিত আলাপ-আলোচনার দৃপ্ত, দুঃসাহসী মনোভঙ্গীর প্রকাশে। ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে মনের যুক্তিবাদ-নির্ভর পরিচয় পাই, দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া আমাদের চোখের উপর অনুষ্ঠিত, আবেগ-প্রেরণায় গতিবেগসম্পন্ন, কর্মসিদ্ধান্তের সজীব স্পর্শ পাই না। মোহিনী ভবিষ্যৎ নারীর পাশ হইতে দেখা মুখের চিত্র, কতকগুলি ইঙ্গিত-সংকেতের রেখায় ঈষৎ-আভাসিত। সম্পূর্ণমণ্ডল ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত মুখাবয়ব এখানে ফুটিয়া উঠে নাই। মন্মথর সহিত সংলাপে তাহার যে মানস উত্তেজনা ও গতিভঙ্গীর ছন্দটি পরিস্ফুট তাহারই আলোকে আমরা তাহাকে আংশিকভাবে দেখি। নীলার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, আছে কেবল মাতার শাসন-অসহিষ্ণু, তরল উচ্ছৃঙ্খলতা। তাহার পারদধর্মী মন কোন স্থির সঙ্কল্পের আধারে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। এই অন্তিম পর্যায়ের গল্প কয়টিতে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাক্তন চিত্রশালার অনবদ্য, শিল্পসুন্দর মূর্তিগুলিকে এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া কতকগুলি অসম্পূর্ণ টুকরা টুকরা রেখাচিত্রের মধ্যে নিজ প্রতিভার নব নব পরীক্ষায় অনিশ্চিত, অস্থির, আলো-আঁধারি স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াই যুগের অনিবার্য তাগিদ যথাসম্ভব মিটাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প পর্যালোচনা করিয়া আমরা তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের শেষ শস্যগুচ্ছ ঘরে তুলিয়া তিনি ভবিষ্যতের

ক্রমসঙ্কীয়মান ভাবসম্পদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে; কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান্ আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষ নয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রভাতকুমারের উপন্যাস (১৮৭৩-১৯৩২)

(১)

বঙ্গসাহিত্যে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বোধ হয় জনপ্রিয়তার দিক দিয়া তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক নহেন। তাঁহার কোন উপন্যাসে গভীর আবেগের চিত্র বা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় নাই। তিনি হৃদয়ের গভীর স্তরে, তীব্র চিত্তবিক্ষোভের ঘূর্ণীর মধ্যে কদাচিৎ অবতরণ করেন। তাঁহার কারবার জীবনের উপরিভাগের ক্ষুদ্র চাঞ্চল্য, লঘু হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গিন বৈচিত্র্য লইয়া। কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। আমাদের বাঙালীর স্বল্প-পরিসর জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য ও অসংগতি, যে অলীক আশা ও কল্পনা, যে অতর্কিত দৈব-সংঘটন ও ভুলভ্রান্তি হাস্যরসের উপাদান সৃষ্টি করে, সেগুলির উপর তাঁহার অধিকার অকুণ্ঠিত। তাঁহার উপন্যাসে কোন তীক্ষ্ণ-কণ্টকিত সমস্যা মনকে বিদ্ধ করে না, কোন হৃদয়-গত প্রহেলিকা বিভীষিকাময় ছায়া বিস্তার করে না, শোক-মৃত্যুর অসহনীয় তীব্রতা চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে না। তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে জীবনযাত্রার আমরা সন্ধান পাই, তাহার লঘু, তরল প্রবাহ, সরল, নির্দোষ হাস্য-পরিহাস, সমস্যাভারমুক্ত স্বচ্ছন্দগতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে ও জীবনের যে আর একটা দুর্ভেদ্য সমস্যাসংকুল দিক্ আছে তাহা আমরা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হই।

প্রভাতকুমার উপন্যাস ও ছোট গল্প এই দুই রকমই লিখিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার কৃতিত্ব উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই বেশি। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, কেন না, একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে যতটা বিশ্লেষণকৌশল ও গভীর সমস্যা আলোচনার ক্ষমতা থাকা দরকার তাহা তাঁহার নাই। তাঁহার উপন্যাসগুলি অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের উপরই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত রস প্রায়ই গভীরতা হারাইয়া ফিকে হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে উপন্যাসোচিত বিস্তার ও গভীরতার একান্ত অভাব। তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িলে মনে হয়, যেন ছোট গল্পের উপযুক্ত স্বল্পপরিমাণ আখ্যানবস্তুকে কেবল ঘটনাসমাবেশের দ্বারা অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রগুলির প্রাণস্পন্দন নিতান্ত ক্ষীণ। সংকল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রগৌরব, বাহ্য-ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের শক্তি তাহাদের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাহারা প্রায়ই ঘটনাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনুকূল দৈববলেই সৌভাগ্যের তীরে ভিড়িয়া থাকে তাঁহার প্রণয়চিত্রের মধ্যে আবেগগভীরতা ও আবিলতা উভয়েরই অভাব। প্রেম তাঁহার নায়ক-নায়িকার মনে একটা ক্ষীণ ঔৎসুক্য, একটা অতি মৃদু রকমের অশান্তি জাগাইয়া থাকে। তাঁহার আত্মবিস্মৃত মত্ততা ও প্রলয়ংকর আবেগের কোন

চিত্রই তাঁহার উপন্যাসে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের গভীর তলদেশ মন্থন করিয়া সুধা বা হলাহল কোনটাই তিনি আহরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম, সুকুমার পরিমিতি-বোধ, তাঁহার অতন্দ্র সুরুচি-জ্ঞান, সকল প্রকারের আতিশয্যের সম্ভাবনা হইতে সভয়ে পিছাইয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার উপন্যাসের দুষ্ট লোকেরাও (villain) তাঁহার স্নিগ্ধ ক্ষমাশীল সহানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে—তিনি কাহাকেও সম্পূর্ণ মন্দরূপে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 'রত্নদীপ'-এ খগেন, 'নবীন সন্ন্যাসী'তে গদাধর—ইহারাও লেখকের স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই; ইহাদের দুরন্তপনাকে তিনি অনেকটা ক্ষমার চক্ষে, অনেকটা কৌতুকমিশ্রিত অসমর্থনের ভাবে দেখিয়াছেন। ইহাদের ভিতরে যে সুবিধাবাদ অপরের অজ্ঞতা বা অমনোযোগিতার সুযোগ লইয়া নিজের অবস্থা ফিরাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে, তাহাকে তিনি নীতিবাদের কঠোর আদর্শে বিচার করেন নাই, তাহার লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা ও উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল তাঁহার প্রশংসাকেও জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি, কঠোর নীতিবিচারের অভাব, এই পাপ-পুণ্যের প্রতি অপক্ষপাত সমদর্শিতা ও পাপের প্রতি মৃদু, সস্নেহ তিরস্কার তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণের একটি প্রধান হেতু।

এই সমস্ত সাধারণ মন্তব্যের উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী' বঙ্গাব্দ ১৩০৯ হইতে ১৩১০-এর মধ্যে মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; ১৩১৪ সালে উহা প্রথম গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয়। এই উপন্যাসে প্রথম প্রথম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কতকটা প্রাধান্য লক্ষিত হয়। নায়িকা রমাসুন্দরীর বাল্য-জীবনে তাহার দুর্দান্ত পৌরুষ ও নারীসুলভ লজ্জা-সংকোচের অভাব তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদিগকে কতকটা আশান্বিত করিয়া তোলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবিষ্যৎ পরিণতি এই আশা পূর্ণ করে না। বিবাহের পরই রমাসুন্দরী তাহার সমস্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সাধারণ স্নেহশীলা পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছে; ঘটনা-বৈচিত্র্য চরিত্রস্বাতন্ত্র্যকে অভিভূত করিয়াছে। কুটিল-চক্রান্ত-কুশল সীতানাথ ও তাহার মাতা তাহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাস হইতে চির-নির্বাসিত হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের কঠোরতাও উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতার সৃষ্টি না করিয়াই পুত্র-স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে—নবগোপালের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনচিত্ততাও বিবাহের পর কোন নূতন কৃতিত্ব-প্রদর্শনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিষ্ক্রিয়ত্বের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। মোট কথা, বিবাহের পর উপন্যাসটি নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ভ্রমণকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে—কাশ্মীরভ্রমণের সৌন্দর্যবর্ণনার মধ্যে উপন্যাসের নিজস্ব রস তলাইয়া গিয়াছে।

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে (১৩১৯) সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র গদাই পালের—অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাহার সহিত তুলনায় নির্জীব ও রক্তহীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জটিল ব্যবস্থার মধ্যে নায়েব-গোমস্তা-জাতীয় একপ্রকার জীবের উদ্ভব হইয়াছে—ঔপন্যাসিক ইহাদের মধ্যে নিজ আর্টের যথেষ্ট মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় কোন ঔপন্যাসিক এই জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে সেরূপ সচেতন না হইয়া কেবল মামুলী নায়ক-নায়িকার চরিত্রের চর্বিত-চর্বণ

করিতেছেন। এক দীনেন্দ্রকুমার রায় নীলকুঠীর নায়েবের কার্যকলাপ ও নৈতিক বিশেষত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া উপন্যাসের মধ্যে কতকটা নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাদের অদ্ভুত ষড়যন্ত্রকৌশল, ক্ষুরধার বুদ্ধি, জালজুয়াচুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি সর্বপ্রকার পাপাচরণের প্রতি অতিশয় প্রবণতা, অথচ একপ্রকারের বিকৃত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা, মিথ্যাচারে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত ভক্তি, স্বাভাবিক নেতৃত্বশক্তি ও লোকবশীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা—এই সমস্ত ভাল-মন্দ মিশাইয়া ইহাদের চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা আনিয়া দিয়াছে যাহা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অত্যন্ত স্পৃহণীয়। আমাদের পল্লীজীবনে ইহাদেরই প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল—ইহারাই পল্লীজীবনের কাপুরুষতা, নৈতিক জড়তা, হেয় দাসত্বপ্রবণতা ও কপট মিথ্যাচারের জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী। পল্লীজীবনের বিবর্জর ও লাঞ্ছনা-মূর্ছিত যে মূর্তি আমাদের অতি-পরিচিত, ইহারাই তাহার শিল্পী ও স্রষ্টা। মোট কথা, আমাদের মৃতপ্রায় নিষ্ক্রিয় সমাজে এই জাতীয় লোকের মধ্যেই কিছু প্রাণস্পন্দন, কিছু বিপথগামী উদ্যমশীলতা ও কর্মশক্তি, কিয়ৎ-পরিমাণে বিকৃত রাজনীতি ও কূটকৌশল, স্রোতোহীন শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে দূষিত জলের মত সঞ্চিত ছিল।

গদাই পাল এই শ্রেণীর লোকের অতি চমৎকার প্রতিনিধি। তাহার চরিত্রটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-কৌশলের নিদর্শন। সাধারণতঃ প্রভাতকুমারের চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত অগভীর, কিন্তু গদাই-এর চরিত্রের সমস্ত অলিগলি, তাহার মনের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অতি স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাহার প্রতিভা বহুমুখী, তাহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, তাহার কর্মশক্তি নব নব প্রণালীতে প্রবহমান। হরিদাসীর সহিত তাহার প্রেমাভিনয়, জমিদার গোপীকান্ত-বাবুর রহস্যোদ্ভেদ, রমণ ঘোষের প্রতি বৈর-নির্যাতনের জন্য তাহার কৌশল-জাল-বিস্তার—সমস্তই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। গদাই পাল মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে প্রাণের তড়িৎ-শক্তিতে পূর্ণ—তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গী হইতে প্রাণের উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার প্রখর ঔজ্জ্বল্যে অন্যান্য সমস্ত চরিত্র নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের নায়ক মোহিত ও নায়িকা চিনির ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। মোহিতের সন্ন্যাস-গ্রহণে আন্তরিকতার অভাব নাই, অভাব আছে আত্মজ্ঞানের, নিজ শক্তির সীমা-নির্ধারণের—লেখক তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধনের উপর একপ্রকার স্নিগ্ধ, কৌতুকমণ্ডিত বিদ্রূপ-কটাক্ষপাত করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ উহার গঠনগত ঐক্যের অভাব প্রচার করিতেছে। মোটের উপর 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক—গদাই পালের চরিত্র ইহাকে উৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে লইয়া গিয়াছে।

প্রভাতকুমারের বৃহৎ উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপ' ও 'সিন্দুরকৌটা' এই দুইটিকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি যদিও ঘটনাবৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি মোটের উপর চরিত্রমাধুর্য আমাদের মনে গভীরতর রেখাপাত করে। রাখালের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে ছাড়াইয়া তাহার চরিত্রসংযম ও আত্মবিসর্জনকারী প্রণয়সঞ্চারই আমাদিগকে অধিকতর অভিভূত করে। বৌরাণীর চরিত্রে কোমল, বিষাদমণ্ডিত মাধুর্যের সহিত অবিচলিত পাতিব্রত্যের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রভাতকুমার নিজ

স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাবকে অতিক্রম করিয়াছেন—বৌরাণীর জীবনের করুণ ব্যর্থতার সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও সুন্দর চিত্র আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নিজ স্বামি-জ্ঞানে রাখালের প্রতি তাঁহার যে ভাবপ্রবাহ তরঙ্গিত হইয়াছিল, ভুল-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংহরণ করা মনস্তত্ত্বসম্ভব কি না, আলোচনার দিক্ দিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের অশান্ত প্রবৃত্তি চিরজীবনব্যাপী কঠোর আত্মদমন দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এক মুহূর্তের মধ্যে চিরাভ্যস্ত সংযম-শাসন মানিয়া লওয়ার মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতাও যেমন মৌলিক সত্য, সংযমের অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনও সেইরূপ আর একটি অবিসংবাদিত সত্য। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে খগেন খুব জীবন্ত হইয়াছে—তাহার বুদ্ধিকৌশল ও রহস্যভেদে অসীম নিপুণতা আমাদিগকে গদাই পালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অথচ খগেনকে একেবারে অবিমিশ্র পাষণ্ডরূপে দেখান হয় নাই—তাহার চরিত্রের প্রতিও লেখকের সহানুভূতি অনুভব করা যায়; কনক ও সুরবালার চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে, ঘটনার চাপে প্রাণস্পন্দন মন্দীভূত হয় নাই। মোট কথা 'রত্নদীপ' প্রভাতকুমারের সৃষ্টিশক্তির মধ্যে যে একটা উচ্চতর সম্ভাবনা ছিল তাহার পরিচয় দেয়।

'সিন্দুরকৌটা' উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণকাহিনী। ইহার একমাত্র ঔপন্যাসিক অংশ সুশীর সহিত বিজয়ের প্রণয়সঞ্চার-কাহিনী। স্বামী-পরিত্যক্তা সুশীর প্রতি বিজয়ের মনোভাব, সহানুভূতি, আশ্রয়দান, প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়া কিরূপে প্রণয়ে পৌঁছিল তাহার বর্ণনাটি বেশ মনোজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া খুব গভীর না হইলেও নিখুঁত। তবে এই দ্বিতীয়-স্ত্রী-পরিগ্রহের পূর্বে বিজয়ের মনে দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে সেরূপ কোন প্রবলতা নাই। প্রথম স্ত্রীর চিন্তায় সে অল্প একটু ইতস্ততঃ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু মন স্থির করিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। বকুরাণীর শান্ত নির্বিকারত্ব ও স্বামীর সুখের জন্য আত্মবিসর্জন-তৎপরতা তাহাকে আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে সত্য, কিন্তু উপন্যাসটির প্রাণস্পন্দনকে অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্দীভূত করিয়া দিয়াছে। একমাত্র পল সাহেবের চরিত্র-বিশ্লেষণই উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে—তাহার নির্লজ্জতা, আত্মসম্মানবোধের একান্ত অভাব, স্ত্রীকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বেচাকেনার সামগ্রী মনে করার প্রবৃত্তি, প্রভৃতি গুণের সমাবেশে তাহারই চরিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল।

প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও পূর্বোক্ত রকমের দোষ-গুণ বর্তমান আছে, তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক। 'জীবনের মূল্য' (১৩২৩) উপন্যাসে তিনি একটি অবিমিশ্র ট্রাজিডি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগ-গভীরতা না থাকাতে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে উপর্যুপরি যে কয়েকটি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহারা একেবারে আকস্মিক—কোনরূপ মনস্তত্ত্বমূলক কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত নয়। সুতরাং এই সম্পূর্ণ দৈবাধীন বিপদ্‌পরম্পরা আমাদের মনে কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারে না, একপ্রকার বিস্ময়-বিমূঢ় হতবুদ্ধিভাব ছাড়া কোন গভীরতর চিন্তাধারা বা সহানুভূতির উদ্রেক করে না। বিয়ে-পাগলা বুড়ো গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের অভিশাপ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বৈধ বা পর্যাপ্ত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেননা, এই অভিশাপ-বর্ণনায়, বা অভিশপ্ত ব্যক্তিদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণে কোনও রূপ সূক্ষ্ম

বিশ্লেষণের, মনোরাজ্যের গভীর তলদেশে অবতরণের নিদর্শন নাই। এই মুখোপাধ্যায়ও অবিমিশ্র কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয় নাই—তাহার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আন্তরিক; তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা অপেক্ষা সহানুভূতিরই প্রাধান্য অনুভূত হয়। উপন্যাসমধ্যে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা জীবন্ত, সে উপন্যাসের কার্যকলাপের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত, সে একেবারে অনাবশ্যক, বাহিরের লোক, সে সতীশ দত্ত—তাহার সংস্কৃত শ্লোকোদ্ধারে নিপুণতা, তাহার চাটুকারবৃত্তির সূক্ষ্ম কারুকার্য, মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ-বাসনায় ইন্ধন যোগাইবার কৌশল, অথচ তাহার প্রতি এক প্রকারের আন্তরিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি তাঁহাকে আমাদের অন্তর-জগতের প্রতিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

'মনের মানুষ'-এ কুঞ্জের ছেলেমানুষী ও কুসংস্কারপ্রবণতা, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও দৈবক্রিয়ায় তাহার অগাধ বিশ্বাস, ইন্দুবালার প্রতি তাহার প্রণয়াভিলাষের কৌতুককর অসংগতি ও অবশেষে কিরণের সহিত আদর্শবাদের উচ্চ শিখর হইতে বহুনিম্নে সাংসারিকতার সমতল-ভূমিতে, তাহার যোগ্য মিলন—বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। সমস্ত চিত্রটির মধ্যে সস্নেহ কৌতুকরসের অবিরত প্রবাহ ইহাকে যোগেন্দ্র-ইন্দুবালার নাটকোচিত মিলন-কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। 'আরতি', 'সত্যবালা' ও 'গরীব স্বামী' উপন্যাস-গুলিতে চরিত্রাঙ্কনের বিশেষ চেষ্টা নাই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে আখ্যানবৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত —তাহারা প্রভাতকুমারেব ঔপন্যাসিক খ্যাতি-বর্ধনে আদৌ সহায়তা করে না।

(২)

ছোট-গল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের সিদ্ধহস্ততা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের সংকীর্ণ বাঙালীজীবনে বৃহৎ উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পের স্বাভাবিকতা ও উপযোগিতা সহজেই লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমাদের জীবনে সমস্যা এত সুদূরপ্রসারী হয় না, যাহাতে তাহাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন লাগে, যে ছোটখাট সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলাষ ও কর্মশক্তি যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে—তাহার সমস্ত বুদ্‌বুদ ও উত্তেজনা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুশোভনভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোট গল্পের আর্টের প্রভাত-কুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর। তাঁহার অগভীর আলোচনাপ্রবণতাও ছোট গল্পের উৎকর্ষবিধানে সহায়তা করিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশনির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্য-অসংগতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনার লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে, সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি-কৌশলে—এই সমস্ত দিক্ দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় অনুভূতি, তাঁহার বিদ্যুৎশিখার ন্যায় তীব্র ও মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার অতিপ্রাকৃতের রোমাঞ্চ-উদ্‌বোধন, তাঁহার মানব চিত্তের অসীম রহস্যের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির আবাহন—ইত্যাদি উচ্চতর গুণের কিছুই প্রভাত-কুমারের মধ্যে নাই। তথাপি তিনি তাঁহার ছোট গল্পের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যে রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন তাহাকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য বলা যাইতে পারে। এখানে আমাদের

চিরপরিচিত সাধারণ জীবন আছে সত্য, কিন্তু তাহার দুর্বিষহ সমস্যাভার, তাহার দুর্ভেদ্য জটিলতা ও নিদারুণ অপ্রতিবিধেয়তা নাই। এখানে দুঃখ, দারিদ্র্য, জীবন-সংগ্রামের দুঃসহ কঠোরতার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল দৈবের সুপ্রচুর প্রসাদও আছে। এখানে ট্রেনে লোকে লক্ষ টাকা কুড়াইয়া পায়, আবার বিশেষ গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা সহ্য না করিয়া প্রলোভন দমন করিয়া প্রকৃত মালিককে তাহা ফিরাইয়াও দেয়। এখানে গাড়িতে গহনার বাক্স হারাইয়া গেলে তাহা ভাবী পুত্রবধূর অঙ্গে গিয়া উঠে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা লোভ জয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাধুতার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এখানে অকালপক্ব বালক প্রেমে পড়িলে পিতার চপেটাঘাত ছাড়া আর কোনও দুষ্পাচ্যতর শাস্তি উপভোগ করে না এবং এই ঈষৎকষায় টনিকের সাহায্যে প্রণয়িনীর বিবাহে লুচি-সন্দেশ বেশ সহজেই হজম করিয়া থাকে। এখানে দারিদ্র্য বিশেষ মারাত্মক নহে, কেননা ইহা সঙ্গে সঙ্গে ইহার উদ্ধারকর্তাকেও আবাহন করিয়া আনে; এ রাজ্যে মুশকিল ও মুশকিল্-আসান পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া প্রীতি-নৃত্য করে। এখানে পৌরাণিক যুগের ন্যায় বিদেশ-ভ্রমণ-কালে প্রেয়সী-লাভও ঘটিয়া থাকে, এবং বর্তমান যুগের যে কঠোর সমাজ-ব্যবস্থার লৌহজাল প্রেমের পথে অন্তরায়, তাহারা মায়াবলে অপসারিত হয়। অথচ ইহারা আমাদের বাস্তবজীবনেরই নিখুঁত ছবি, দৈবানুকূল্য ও লেখকের স্নেহপ্রীতিপূর্ণ ব্যবস্থার দক্ষিণা-বাতাসে এই ঊষর ভূমিখণ্ডই এরূপ শ্যামশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনা অল্প পরিসরের মধ্যে অসম্ভব। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই হাস্যরসপ্রধান। এই হাস্যরস কেবলমাত্র ঘটনামূলক অসংগতির সহিত নহে চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সহিতও সম্পর্কান্বিত। সুপ্রসিদ্ধ 'বলবান্ জামাতা' গল্পটির আকর্ষণ কেবল যে শ্বশুরবাড়ি-বিষয়ক হাস্যকর ভ্রান্তির জন্য তাহা নহে, নলিনীর নিজ রমণীসুলভ কমনীয়তার কলঙ্কক্ষালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও তাহার অন্যতম কারণ। প্রায় সমস্ত গল্পেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সুনিপুণ বিন্যাস হাস্যরসকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে এক রণরঙ্গিণী স্ত্রীর মৃত্যুর পর পর্যন্ত স্বামী বেচারার উপর নিজ দাম্পত্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার কৌশল-উদ্ভাবন বড়ই কৌতুককর পরিণতির হেতু হইয়াছে। অভ্রান্ত পূর্ব-অনুমান বলে সে স্বামীর সম্ভাবিত দ্বিতীয় বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপযোগী এক একখানি পত্র নিজ বর্ণাশুদ্ধি-চিহ্নিত, সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া মৃত্যুর পরে তাহাদের স্বামীর নিকটে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ভৌতিক পত্রাবলী লইয়া থিওজফিষ্ট মহলে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা গল্পের উপভোগ্যতাকে আরও বাড়াইয়াছে। 'বায়ুপরিবর্তন' গল্পে সামান্য দু'-একটি রেখাপাতের দ্বারাই হরিধনের পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপ্রবণতা ও নীচাশয়তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা প্রতারিত তাহার ভাবী শ্বশুর যে ঔদার্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকে গাড়িভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন ঔপন্যাসিকেরই স্নেহাভিষিক্ত ও প্রতিনিধির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

এই জাতীয় কতকগুলি গল্পে parody বা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের দ্বারা হাস্যরস উদ্রিক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর ঘনপত্রান্তরালে যে একটি হাস্যকর সম্ভাবনার ফুল আত্ম-গোপন করিয়াছিল, প্রভাতকুমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে তাহা অতিক্রম করে নাই। যে বৈষ্ণবীর

ছদ্মবেশ নগেন্দ্রনাথের সংসারে সর্বনাশের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা কয়েকটি নাটক-নভেল-পড়া, উত্তেজিত-মস্তিষ্ক, তরলমতি যুবকের মনে একটা উদ্ভট খেয়ালের সৃষ্টি করিয়া নির্দোষ প্রাণখোলা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের ঐ নামের গল্পের ঠিক বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ না হইলেও উভয়ের রীতি-পার্থক্যের সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার বর্ষাঘন নির্জন সন্ধ্যায় এক অনাথা বালিকার সহিত নিজের একটা অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসম্পর্ক রচনা করিয়াছিল; প্রভাতকুমারের পোস্টমাস্টার অপরের প্রেমপত্র চুরি করিয়া পড়িয়া বিকৃত রোমান্সপ্রবণতার চরিতার্থতা সম্পাদন করে; চোরাই পত্রের সংকেতানুযায়ী প্রেমাভিসার তাহার পক্ষে কতকটা হাস্যকর, কতকটা শোকাবহ পরিণতির সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখকের স্নিগ্ধ সহানুভূতি তাহার কৃতকর্মের পুরস্কাররূপে তাহার পদোন্নতি-বিধানই করিয়াছে; অপরের চিঠি ও সরকারী টাকা চুরি করিয়াও স্বদেশী ডাকাতির অজুহাতে সে ইন্‌স্পেক্টর-পদে উন্নীত হইয়াছে।

কয়েকটি গল্পে মানুষের অসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও উদ্ভট কল্পনা বাস্তবতার সংঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। 'প্রতিজ্ঞা-পূরণ' গল্পে কলেজের নব্য যুবক ভবতোষ হঠাৎ আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কুৎসিত স্ত্রী বিবাহ করিবে বলিয়া দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এবং কন্যা-নির্বাচন পর্যন্ত তাহার এই দারুণ সংকল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু বিবাহের দিন যতই নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, ততই তাহার সংকল্প শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—শেষে যখন সে জানিতে পারিয়াছে যে, জুয়াচুরি করিয়া তাহাকে সুন্দরীর পরিবর্তে কুদর্শনা মেয়ে দেখান হইয়াছিল তখন সে কয়েক-দিবসব্যাপী দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। সেইরূপ 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পে সমাজ-সংস্কারক পিতা যোল বৎসরের পূর্বে পুত্রবধূর সহিত পুত্রের মিলন কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষা শতগুণ বলবান্—শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে; এবং প্রকৃতির ছন্দে মিল রাখিয়া তাঁহাকে তাঁহার বই সংশোধন করিয়া 'যোলোর' স্থানে 'চৌদ্দ' লিখিতে হইয়াছে। 'বউচুরি' গল্পেও এইরূপেই প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধচেষ্টা ব্যর্থ কৃচ্ছ্রসাধনের উপহাস্যতা লাভ করিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাস হাস্যকর অবস্থাসংকটের হেতু হইয়াছে। 'খোকার কাণ্ড'-এ গোঁড়া ব্রাহ্ম হরসুন্দরবাবুর হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন পত্নী স্বামীর আরোগ্যার্থ শিবপূজা করিতে গিয়াছেন—ইতিমধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার আকস্মিক সাক্ষাৎ। খোকার পিতৃসম্বোধন পত্নীর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপনচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। 'যজ্ঞ-ভঙ্গ'-এ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রাণনাশের জন্য এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর সাহায্যে মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে; কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন আত্মীয়-প্রমুখাৎ এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া দাদার তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় অন্ধবিশ্বাস ভাঙ্গিবার জন্য নির্দোষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এখানে কৌতুকরসের অবতারণা খুব স্বাভাবিক হয় নাই, তবে কনিষ্ঠের সৌকুমার্য ও উদারতার চিত্রটি দুই-এক কথায় বেশ ফুটিয়াছে। 'সরদার কীর্তি'তে পূর্বজন্মের মাতার পাদোদক-প্রার্থী পুত্রের তস্করবৃত্তি বেশ স্বাভাবিক হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছে। 'খুড়া মহাশয়'-এ খুড়ার ভূতের ভয়ের সুযোগে একটা ঘোর সাংসারিক অবিচারের প্রতিকার হইয়াছে।

দুই-একটি গল্পে অবৈধ-প্রণয়মূলক জটিলতার অবতারণা হইয়াছে, তবে প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক সংযম ও সুরুচি এই প্রণয়-বর্ণনাকে পঙ্কের মধ্যে অবতরণ করিতে দেয় নাই। 'লেডী ডাক্তার'-এ এক ইতর-প্রকৃতি স্ত্রীলোক একজন তরুণ-বয়স্ক ডেপুটীকে অবাধ মেলা-মেশায় প্রশ্রয় দিয়া জালে জড়াইবার চেষ্টা ক'রয়াছে। ডেপুটীবাবু এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, হিতৈষীদের সতর্কবাণীতেও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। ইতিমধ্যে খুব স্বাভাবিক উপায়েই স্ত্রীলোকটির স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া যাওয়ায় ব্যাপারটির কল্যাণকর উপসংহার হইয়াছে। 'সচ্চরিত্র' গল্পে প্রভাতকুমারের সহিত আধুনিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের ব্যবধান সুপরিস্ফুট হইয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক যে অবস্থায় উচ্চাঙ্গের আর্টের ও সমাজনীতি-সমালোচনার অবসর পাইতেন, প্রভাতকুমার সেই অবস্থায় তাঁহার নায়ককে সমস্ত নায়কোচিত বীরত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা বিসর্জন দিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়নতৎপর করিয়াছেন। পতিতার কন্যার সহিত প্রেমে পড়িয়া সুরেন মোটেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন সতীশের অনুকরণ করে নাই, কলিকাতার বার্ষিক বসন্ত-মহামারীর কল্যাণে সে নৈতিক আত্মরক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। এই রূপ ছোট গল্প প্রভাতকুমারের সংগ্রহে খুব বেশি নাই—অবৈধ-প্রণয়-মূলক জটিলতাকে যতদূর সম্ভব তিনি পরিহার করিয়াছেন।

(৩)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রভাতকুমারের রচনায় ভাবগভীরতার অভাব। কিন্তু কতকগুলি ছোট গল্পের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা যায় না। 'বাল্য-বন্ধু' গল্পে নলিনীর কঠোর জীবন-পরীক্ষা তাহার মনে বেশ একটু গভীর বিক্ষোভ ও আলোড়নই জাগাইয়াছে। 'কাশীবাসিনী' গল্পে বিপথগামিনী মাতার দুহিতৃস্নেহ গোপনতার অন্তরাল হইতে তীব্রবেগেই প্রবাহিত হইয়াছে। 'ভুল শিক্ষার বিপদ'-এ বক্তার শিশুসুলভ সরলতা, যাহা বাহ্য শিষ্টাচারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহার উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও আপাত-রুক্ষ ব্যবহারই গল্পটির অন্তর্নিহিত করুণরসের আবেদনটিকে আরও মর্মস্পর্শী করিয়াছে। তাহার কমলালেবু-বর্জনের উদ্ভট খেয়াল হঠাৎ রূপান্তরিত হইয়া এক স্নেহ-কোমল, উদার হৃদয়ের করুণ শোকস্মৃতি-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 'আদরিণী' গল্পে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌরুষদৃপ্ত অথচ স্নেহবিগলিত চরিত্রটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি-প্রতিভার নিদর্শন। জয়রাম আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের নয়নজোড়ের বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু কুসুমের ঠাকুরদাদার যে মনোবৃত্তি করুণ আত্মপ্রতারণা ও অতীতের কল্পনাবিলাসমাত্র, তাহা জয়রামের দৃপ্ত পুরুষকারের নিকট অর্জিত ঐশ্বর্যের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হাতীটি বিক্রয় করিবার সম্ভাবনায় যখন সে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে, তখন ইহা নিছক ভাবালুতা (sentimentality) মাত্র নহে, আত্মপৌরুষের পরাজয়-ক্ষোভ এই অশ্রুপ্রবাহকে লবণাক্ত করিয়াছে। ছোট জিনিসের সহিত বড়র তুলনা করিতে গেলে নেপোলিয়নের সিংহাসন-বর্জনের তীব্র গ্লানি ইহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর গল্পে ইংরাজ-সমাজের সম্পর্কে বঙ্গ তরুণদের মনে যে বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হয়, যে মদির উত্তেজনা সংক্রামিত হয় নানা দিক্ দিয়া তাহার আলোচনা হইয়াছে। দুই-একটি গল্পে—যথা, 'মুক্তি' ও 'পুনর্মূষিক'-এ—বঙ্গযুবকের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দায়িত্ববোধহীন

আমোদপ্রিয়তার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত গল্পে মিস্ টেম্পলের হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মূঢ় অনুরাগ একজন হিন্দু-সন্তানের জীবনে কিরূপে ক্ষণস্থায়ী জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে। 'বিলাত-ফেরতের বিপদ'-এ আমাদের বাঙালী সমাজে বিলাতী আদব-কায়দার অজ্ঞতা এক বিবাহার্থী যুবকের পথ কিরূপে বিঘ্নসংকুল করিয়াছিল তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।

আর কয়েকটি গল্পে বাহ্য বিক্ষোভ ছাড়িয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। নিজ দেশ ও পরিচিত সমাজ-আবেষ্টনের মধ্যে যে ভাবধারা মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, তাহাই অপরিচয়ের বন্ধুর পথে গতিবেগ সংগ্রহ করিয়া ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। প্রভাতকুমার ইংরেজ জীবনের যে দিক আঁকিয়াছেন তাহা আমাদেরই মত স্নেহ-প্রেমে কমনীয়, আশংকা-দুর্বল, বিরহ-মিলন-ব্যাকুল এখানে রাজনৈতিক হিংসা-দ্বেষের চিহ্ন নাই, বিজেতা-বিজিতের অহংকার-আত্মগ্লানি নাই—এখানে সমস্ত বৈষম্য, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া সর্বদেশসাধারণ মানবহৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। 'কুকুর-ছানা' গল্পে মানুষের সঙ্গে কুকুরের মধুর প্রীতি-সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে। 'কুঁদের বন্ধু' গল্পটি এক হতভাগ্য বঙ্গযুবকের প্রতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন কুলোদ্ভবা দাসী-জাতীয়া স্ত্রীলোকের নিঃস্বার্থ প্রেমের অতর্কিত উচ্ছ্বাসে গৌরবান্বিত হইয়াছে। 'ফুলের মূল্য' গল্পে একটি শ্রমজীবী ইংরেজ পরিবারের পারিবারিক স্নেহপ্রীতি ও বিয়োগ-ব্যথার কি মধুর চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে; শঙ্কা-কম্পিত, স্নেহ-দুর্বল মাতৃহৃদয়ের অতিপ্রাকৃতের প্রতি স্বভাব-প্রবণতার কি মনোহর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে! 'মাতৃহারা' গল্পে এক বর্ষীয়সী ইংরেজ রমণী এক ইংলণ্ড-প্রবাসী বঙ্গ যুবকের প্রতি ব্যর্থ প্রেম কিরূপে সারাজীবন ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহার অতি মর্মস্পর্শী বিবরণ; 'সতী' গল্পে এক বাগ্দত্তা ইংরেজ তরুণী তাহার প্রেমাস্পদ বসন্ত-রোগাক্রান্ত বাঙালী যুবকের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। 'প্রবাসিনী' গল্পে বার্নস্-এর প্রেম-কবিতার মাধুর্যের ভিতর দিয়া এইরূপ একটি প্রণয়-কাহিনী বিবাহের সফলতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মোট কথা ইংরেজী-বাঙালীর মিলন-বিরহ-বিষয়ক গল্পগুলি প্রভাতকুমারের গভীর ও করুণরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দেয়।

ইহার বিপরীত চিত্র পাই 'প্রত্যাবর্তন' নামক গল্পে। এখানে লেখক ধর্মগত কুসংস্কারের অনুদার সংকীর্ণতা হিন্দু ও খ্রীষ্টান এই উভয়বিধ প্রচলিত ধর্মের ভিতর দিয়াই দেখাইয়াছেন। রামনিধি নীচ-জাতীয় বলিয়া তাহার হিন্দু সহপাঠীদের দ্বারা নির্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে—খ্রীষ্টধর্মের উদার বিশ্বজনীন সত্য বাইবেলে পাঠ করিয়া সে অনিবার্যভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রকৃত জীবনের কাছাকাছি অগ্রসর হইয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সেখানে বর্ণ-বৈষম্যের উৎকটতা ও জাত্যভিমানের তীব্রতা আরও অসহনীয়। রামনিধির গভীর অন্তর্জ্বালা ও তীব্র মনোক্ষোভ তাহার বিসদৃশ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে গল্পগুলি—স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লইয়া লিখিত। ভাবিলে বিস্মিত

হইতে হয়, যে আন্দোলন একদিকে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রোহপ্রবণতার বিষ উদ্‌গিরণ করিয়াছে ও অপরদিকে নানাবিধ দমনমূলক আইনের প্রণয়নে প্রণোদিত করিয়াছে, যাহাতে শাসক-শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষজর্জরিত হইয়াছে, প্রভাতকুমার সেই হলাহল সমুদ্রের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সুধা আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের উত্তেজনায় ও কোলাহলে আত্মবিস্মৃত, তখন এই উগ্র রণোন্মাদনার মধ্যে প্রত্যেকের ব্যবহারে এমন বিসদৃশ অসংগতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা নিরপেক্ষ, স্থিরমস্তিষ্ক humorist-এর প্রচুর হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়াছে। 'উকীলের বুদ্ধি' গল্পে লেখক দেখাইয়াছেন যে, দুই পক্ষের এই সাময়িক মত্ততার সুবিধা লইয়া একজন চতুর উকীল কিরূপে নিজের চাকরির সুবিধা করিয়া লইয়াছে—এক পক্ষের উৎপীড়ন অপর পক্ষের সহানুভূতি জাগাইয়াছে। 'হাতে হাতে ফল' গল্পে রাজনৈতিক ব্যাপারে পুলিসের অনুসন্ধান-প্রণালীর দক্ষতা ও ন্যায়-পরতার উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—কিন্তু দারোগার পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তাহার মূল হইতেছে তাহার সুরার প্রতি অত্যাসক্তি, ইহার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন চালাইতে হয় নাই। 'খালাস' গল্পে স্বদেশী মোকদ্দমায় বিচারকের অবস্থাসংকটের কথা বর্ণিত হইয়াছে—একদিকে তাঁহার উপরিওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যদিকে তাঁহার দেশবাসী, এমন কি গৃহিণীর প্রবল সহানুভূতি, এই উভয়বিধ টানের মধ্যে পড়িয়া বেচারা হাকিম হাবুডুবু খাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর টানই প্রবলতর হইয়া তাঁহাকে কর্মত্যাগে প্রণোদিত করিয়াছে। 'মাদুলি' গল্পে লেখক বিপরীত দিকের চিত্র আঁকিয়াছেন—স্বদেশী প্রচারকের কূটবুদ্ধি ও চাণক্যনীতি অপেক্ষা এক নিরক্ষর তাঁতির সরল ধর্মজ্ঞানই তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। মোটকথা, যে আন্দোলন দেশে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই দুই-একটা ছোটখাট ঢেউকে তিনি সুকৌশলে নিজের ক্ষুদ্র প্রয়োজনে লাগাইয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত উদাহরণের দ্বারা প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের প্রসার ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেকটা পর্যাপ্ত ধারণা করা যাইবে। ছোট গল্পের লেখকদের মধ্যে তাঁহার স্থান এক রবীন্দ্র-নাথের নিম্নে। তাঁহার গভীরতার অভাব হাস্যরসের স্বাভাবিক প্রাচুর্যে খণ্ডিত ও ক্ষালিত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্ট ও রচনা-কৌশল, ইহার পরিমাণবোধ ও সমাপ্তি-বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ। দুই-একজন নবীন লেখক কল্পনাপ্রসারে ও ভাবগভীরতায় প্রভাতকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের রচনায় স্থায়িত্ব-গুণের (sustained power) অভাব; দুই-একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গল্পের সঙ্গে অনেক নিকৃষ্ট পর্যায়ের গল্প গ্রথিত আছে। এ বিষয়ে প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত; তিনি কল্পনার উচ্চগগনে বিহার করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনায় পক্ষ-ক্লান্তির নিদর্শনও বিশেষ মিলে না। গভীর আলো-চনায় ও আন্তরিক দুঃখবাদচর্চায় ক্লান্ত বঙ্গসাহিত্য তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকরস ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক রচনাকে সাদরে নিজ স্থায়ী সম্পদরূপে বরণ করিয়া লইবে।

নবম অধ্যায়

শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮)

(১)

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্য বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য কতখানি প্রস্তুত ছিল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেমন স্বাভাবিক, তাহার উত্তর দেওয়া সেইরূপ দুরূহ। তিনি বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সমস্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার এই বিশেষত্ব-গুলির কতটা পূর্বসূচনা পাওয়া যায়? শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা তাঁহার অনন্যসুলভ মৌলিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ-তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙালীর মনের সংকীর্ণ গণ্ডি বহুদূর ছাড়াইয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতোহীন, শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস-মন্থর গতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নহে। তাঁহার উপন্যাসের আর একটি দিক আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন সুরেরই প্রাধান্য। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আদৌ ছায়াপাত হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার এই নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে। তাঁহার অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশধারার বহির্ভূত নহেন।

প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধ-চিত্র

'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ' ছাড়া বাকী উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র পুরাতন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বৌ', 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি', প্রভৃতি সমস্ত গল্প বাঙালী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতেরই কাহিনী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে প্রেম-বর্জিত—একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে প্রেমের যে স্বল্প-অবসর ও অপ্রধান অংশ তাহাই ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর কতকগুলিতে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সাধারণ ও সামাজিক বিধি-নিষেধের অনুবর্তী। প্রেমের যে দুর্দমনীয় প্রভাব, সমাজ-বিধ্বংসী শক্তির মূর্তি শরৎচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া

পড়িয়াছে, তাহার দর্শন ইহাদের মধ্যে মিলে না। এইগুলির জন্যই শরৎচন্দ্র উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব ইতিহাসের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়াছেন।

এই গল্পগুলির কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা সকলেই ক্ষুদ্রাবয়ব, ছোট গল্পের অপেক্ষা আয়তন বেশি নয়, অথচ ইহারা ঠিক ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্তও নয়। ছোট গল্পের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে একটা সাংকেতিকতা, একটা অতর্কিত ভাব থাকে, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে সমস্যার অবতারণা হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা ও মীমাংসা সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমরা উপলব্ধি করি। বাংলা-সাহিত্যের উপন্যাসের আয়তন সাধারণতঃ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন আদর্শ নির্ধারিত হয় নাই। তবে ইউরোপীয় তিন-ভলুমে-সম্পূর্ণ উপন্যাসের বিস্তার যে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবসর নাই। আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনে যে সমস্ত বিরোধ-সংঘাত জাগিয়া ওঠে তাহাদের গ্রন্থি বিশেষ জটিল ও দীর্ঘ নহে, সুতরাং তাহাদের আলোচনার ক্ষেত্রও অতি-বিস্তৃত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও সহজ কলানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের স্বাভাবিক আয়তন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই গল্পগুলিতে পারিবারিক বিরোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে মেলে। আমাদের পারিবারিক জীবনে স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ যে খাতে প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম দেখানতেই ইহাদের বৈচিত্র্য। যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া আমাদের পারিবারিক ঐক্য গঠিত হয়, যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘাত একান্নবর্তী পরিবারের ছায়াতলে একটা ক্ষণস্থায়ী মিলনে বাধা পড়ে, তাহাদের মধ্যে একটা চিরপ্রথাগত সন্ধিবিগ্রহের, ভেদ-মিলনের সূত্র ঠিক হইয়াই থাকে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে যখনই সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, যখনই ভাঙ্গন শুরু হয়, তখন এই পূর্ব-নির্দিষ্ট ভেদরেখা ধরিয়াই ফাটল দৃষ্টিগোচর হয়। যখনই এই পারিবারিক কলহ আত্মপ্রকাশ করে, তখনই আমরা বিচ্ছেদ-রেখার গতিটি পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি—বুঝিতে পারি যে, কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে। কিন্তু সময় সময় মানুষের স্বাধীন প্রকৃতি এই সমাজ-রচিত বাঁধা রাস্তায় চলিতে চাহে না, এই সনাতন শ্রেণীবিভাগের সরলরেখা অতিক্রম করিয়া একটা বক্র, তির্যক গতি অবলম্বন করে। তখনই পারিবারিক বিরোধটি নূতন রকমের জটিলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে।

আবার পারিবারিক জীবনে এমন লোকও থাকে যাহারা এই দ্বিধাবিভক্ত পরিবারের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া একটা ব্যাকুল অনিশ্চয়ের সহিত উভয় দিকেই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিতে থাকে, যাহারা রক্ত-সম্পর্ক ও স্নেহের দাবি এই উভয় বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়া একটা উৎকট, বিসদৃশ অসংগতির সৃষ্টি করে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ-প্রেমের বক্রগতির চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা', 'ব্যবধান', 'রাসমণির ছেলে', প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট গল্পে পাওয়া যায়, সুতরাং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন—তাঁহার

গল্পগুলিতে তথ্য সন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও কল্পনা সমৃদ্ধি উভয় দিক্ দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি আরও তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাবপ্রকাশের গভীরতাতেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথায়ও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্যসৌন্দর্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক বিরোধ-চিত্রগুলির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত পূর্বতন ঔপন্যাসিক ভ্রাতৃবিরোধ বা সংসার-বিচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই সমস্ত দোষ এক পক্ষের উপর চাপাইয়া নীতি এবং কলাকৌশল উভয় দিক্ হইতেই একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেখানে এক পক্ষ প্রবল অত্যাচারী ও অন্য পক্ষ নিরীহ ও অসহায়, বিনা প্রতিবাদে অপর পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, সেখানে একপ্রকার সুলভ করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা ও জটিলতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। 'স্বর্ণলতা'য় ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি আলোচনা করিয়া পাঠকের সহানুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত বা অনিশ্চিত থাকে না—প্রমদা ও সরলার মধ্যে পক্ষাবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা বিলম্ব করে না। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কিছু গভীরতা থাকে না—কলাকৌশলের দিক্ দিয়া এ সমস্ত চিত্র প্রায়ই অক্ষম ও ব্যর্থ হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি এত সহজ ও প্রাথমিক রকমের নহে—তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা তাঁহাকে শিখাইয়াছে যে, এরূপ দায়িত্ব-বিভাগ ঠিক প্রকৃতির অনুগামী নহে। ন্যায় ও ধর্ম যে পক্ষে, যাহার হৃদয় সরল ও অবিকৃত, তাহার মধ্যে একটা বাহ্য কর্কশতা বা তীব্র অসহিষ্ণুতা আরোপ করিয়া তিনি বিরোধটিকে জটিলতর করিয়া তোলেন।

এই বিশেষত্বের উদাহরণ শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গল্পেই মেলে। 'বিন্দুর ছেলে'-তে (১৯১৪) অমূল্যধনের প্রতি বিন্দুর তীব্র উৎকট স্নেহ পারিবারিক জীবনের সাধারণ মাত্রাকে বহু দূর অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার দারুণ অভিমান, পরমত-অসহিষ্ণুতা ও ধনগর্ব, তাহার অনুক্ষণ সন্দেহপরায়ণ, অতিসতর্ক, অপরিমিত স্নেহের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, তাহার চরিত্রটিতে দোষে-গুণে এমন মাখামাখি হইয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ খুব সহজ নহে। ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ যে পারিবারিক শান্তিভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহা নয়; অনেক সময় স্নেহের আতিশয্য বা বিভাগ-বৈষম্য যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে তাহা আরও মর্মান্তিক। এখানে বাহির হইতে যে বিরোধের কারণটি আসিয়াছে—এলোকেশী ও নরেনের আবির্ভাব—তাহার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই, এবং গল্পের সহিত তাহাদের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে।

'রামের সুমতি'-তে (১৯১৪) একই সমস্যার একটা বিভিন্ন দিক্ দেখান হইয়াছে। এখানে বিরোধের মূল কারণ নারায়ণীর স্নেহাতিশয্য নহে; একদিকে রামের উৎকট দুরন্তপনা অপরদিকে নারায়ণীর মাতার ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ জটিলতার সূত্রে পাক দিয়াছে। দুরন্ত রামের মধ্যে যে স্নেহশীল হৃদয় আছে তাহা কেবল নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শে জাগিয়া উঠে—যাহার

স্নেহ নাই সে এই গোপন মাধুর্যের সন্ধান পায় না। নারায়ণীর মাতা কেবল তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে এবং নিজ ঈর্ষ্যাদিগ্ধ স্পর্শের দ্বারা তাহার দুরন্তপনাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। তবে রামের চরিত্রের মধ্যে যেন একটু অসংগতি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে দুষ্টামিতে এতদূর অগ্রসর, যে লোকের ঘরে আগুন লাগানতেও পশ্চাৎপদ নয় তাহার দুঃশীলতাকে একেবারে শৈশব-চাপল্যের পর্যায় ফেলা যায় না। এই উপদ্রবে চরম সিদ্ধহস্ততা ও বাগ্‌দী সৈন্যের অধিনায়কত্বের সহিত নারায়ণীর নিকট তাহার নিতান্ত নিরীহ, অসহায় ভাবের ঠিক সংগতি করা যায় না। এখানে যেন লেখক রামের চরিত্রকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন।

'মেজদিদি' গল্পে (১৯১৫) বড়বধূর ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কেষ্টর প্রতি মেজবধূ হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতি-মিশ্র ভালবাসাই মুখ্য বিষয়। নিজের দিদি অপেক্ষা এই নিঃসম্পর্কীয় দিদির বেশি ভালবাসাই তাহাদের সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর এই অহেতুক ভালবাসা চারদিক্ হইতে বাধাপ্রাপ্ত ও প্রতিহত হইয়া বেশ স্বাভাবিক, অক্ষুন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এই রুদ্ধমুখ স্নেহ কখনও বা কেষ্টর প্রতি তীব্র বিরক্তির আকারে, কখনও বা তাহার স্বামী বিপিনের বিরুদ্ধে একটা মর্মান্তিক অভিমানের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে পর্যন্ত না পরিবারের মধ্যে ইহা একটি স্বাভাবিক, চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, সে পর্যন্ত ইহার অশান্ত বিক্ষোভ শান্তিলাভ করিতে পারে নাই।

'মামলার ফল' (১৯২০) গল্পটিতেও স্নেহের এই তির্যক্ গতির একটি নূতন রকমের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন পরিবারের মধ্যে ছোট ভাই-এর ছেলে, কিন্তু বড় ভাই-এর স্ত্রীর দ্বারা লালিত-পালিত, গয়ারাম একটা অভগ্ন সংযোগ সেতু রহিয়া গিয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী'-তে (১৯১৮) মানব-মনের একটি বিস্ময়কর অসংগতির চিত্র দেখান হইয়াছে। একাদশী একেবারে চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর, প্রসন্নমনে একটা পয়সা সুদ ছাড়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব। চারি আনা চাঁদা দেওয়া তাহার পক্ষে দানশীলতার চরম সীমা। কিন্তু এই পাষাণের মধ্যেও দুইটি শীতল নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে—এক, তাহার পদস্খলিত ভগিনীর প্রতি একান্ত অনুযোগহীন স্নেহ, আর একটি তাহার অর্থ-সম্বন্ধে অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মজ্ঞান। যাহার মন একদিকে এত নীচ, অন্যদিকে তাহা প্রায় মহত্বের শিখর স্পর্শ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে, নীচের মধ্যে মহত্বের বীজ কখনও তাঁহার চক্ষু এড়ায় না।

'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) গল্পে ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এখানে যদিও হরিশ ও তাহার স্ত্রী নয়নতারার কুটিলতাই বিরোধের প্রধান কারণ, তথাপি সিদ্ধেশ্বরীর তোষামোদপ্রিয়তা ও অস্থিরমতিত্ব এবং শৈলর অনমনীয় তেজস্বিতা ও মতদার্ঢ্য সংঘর্ষের তীব্রতা বাড়াইয়া দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচজনকে লইয়া চলিতে হইলে যতটা কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও আত্মসংকোচের প্রয়োজন, শৈলর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও অকুণ্ঠিত স্পষ্টবাদিতা কোনরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে

নারাজ; সুতরাং সাংসারের রাধা-ঢাকা, ভাগ-বন্টনের কাজে ইহা একেবারেই অনুপযুক্ত। আবার সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ-দুর্বল হৃদয়টাও সর্বদা দ্বিধা-সন্দেহে দোলায়িত; শৈলর প্রকৃত মনোভাব যে তিনি না বুঝেন তাহা নয়, তথাপি তাহার নিকট নীরব, অক্লান্ত সেবার অতিরিক্ত একটা মনরাখা কথা না পাইয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিরূপ হইয়া বসে, এবং নয়নতারার চক্রান্ত বুঝিয়াও অনিচ্ছায় তাহার পোষকতা করে। আবার অতুলচন্দ্রের বয়কটের কথা স্মরণ করিলে নয়নতারার সপক্ষেও যে কিছু বলিবার আছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করি। সকলের সহযোগিতাই এই পারিবারিক বিরোধের চিত্রটিকে বেশ জটিল ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে—দোষ কেবল এক পক্ষের হইলে সংঘর্ষের তীব্রতা এত ঘনীভূত হইতে পারিত না। কেবল বড় ভাই গিরিশের চরিত্রটিই একটু অসঙ্গত হইয়াছে, তাহার উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতি যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের হইয়া উঠিয়াছে।

'হরিলক্ষ্মী' (১৯২৬) গল্পাংশে অনেকটা 'মেজদিদি'র মত; ভ্রাতৃবিরোধ কেমন করিয়া দুই ভাই-এর ও উহাদের স্ত্রীদের মধ্যে সম্পর্কটিকে দ্বন্দ্ব-জটিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্মম করিয়া তোলে তাহারই একটি মনোজ্ঞ ক্ষুদ্র চিত্র ইহাতে আছে। বড়বৌ হরিলক্ষ্মীর স্বামী শিবচরণের চরিত্র চক্রান্ত-কুশলতায় ও প্রচণ্ড জিদে বিশিষ্ট; স্ত্রীর নিকট নিজ বাহাদুরি জাহির করিবার ইচ্ছাই তাহাকে অসম্ভব রকম নীচ ও নির্যাতনপ্রবণ করিয়াছে। ছোট ভাই বিপিনের বৌ যেমন আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন, তেমনি বড়লোকের তোষামোদে বিমুখ। তাহার সহজ শিষ্টাচার কখনই অনুচিত ঘনিষ্ঠতায় আত্মমর্যাদা হারায় না। শিবচরণ তাহাকে দারিদ্র্যের চরম দুর্গতিতে আনিয়া ও পাচিকা-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিয়া ইতর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে। হরিলক্ষ্মী গোড়াতে তাহার স্বামীর ক্রোধানলে ইন্ধন যোগাইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার সমবেদনাশীল করুণ হৃদয় বিপিনের বৌ-এর চরম অপমানে দুঃখ পাইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছে। হরিলক্ষ্মী বা তাহার জা কেহই আদর্শচরিত্র নহে, সাধারণ ভাল-মন্দে মেশা মানুষ; অত্যাচার-পীড়িতা ছোট বৌ হরিলক্ষ্মীর স্নেহস্পর্শে তাহার মানবিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' (১৯২৬) শরৎচন্দ্রের সমবেদনা-স্নিগ্ধ সমাজচেতনা-প্রসূত দুইটি গল্প। প্রথমটিতে বাউড়ির মেয়ে কাঙালীর মা ব্রাহ্মণ জমিদার-গৃহিণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমারোহে মুগ্ধ হইয়া নিজের জন্যও ঐরূপ চিতা-সজ্জা কামনা করিয়াছে। এই ইচ্ছাই করুণ দিবাস্বপ্নরূপে তাহার মনে বারবার আবর্তিত হইয়াছে ও মৃত্যুকালে সে তাহার পুত্রকে তাহার জন্য উচ্চবর্ণসুলভ সৎকার-বিধি-পালনের নির্দেশ দিয়াছে। কিন্তু দরিদ্রের এই ইচ্ছা সমাজের প্রতিকূলতায় ও জমিদারী ব্যবস্থার হৃদয়হীন যান্ত্রিকতায় সার্থক হইতে পারে নাই—প্রজ্বলিত চিতার ধূমকুণ্ডলী তাহার কল্পনাজগৎ ছাড়িয়া বাস্তবে রূপ পায় নাই। 'মহেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্রের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনা। হিন্দুর গোজাতি-বাৎসল্য ও মুসলমানের গোখাদক-বৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে বদ্ধমূল ধারণা আছে শরৎচন্দ্র তাহারই বিরুদ্ধে প্রচারের আতিশয্যহীন, কলাবোধসম্মত একটি অতি-সূক্ষ্ম প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তর্করত্নের শাস্ত্রবিধিসমর্থিত গোপ্রশস্তি যে নিছক ভণ্ডামি ও গফুরের অযত্ন যে নিরুপায়ের গভীর বেদনাময় অক্ষমতার ফল তাহা বুঝিতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। গফুরের

নিজের সাংসারিক জীবন যে মহেশের অপেক্ষা কিছুমাত্র সচ্ছলতর নয় তাহার করুণ ইঙ্গিতও গল্পের স্বল্পপরিসরে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। অভাবের তাড়নায় সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগে উদ্যত মুসলমান কৃষকের দীর্ঘশ্বাসের সহিত পাঠকেরও ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া লেখকের করুণরস-সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি অভিনন্দন জানায়।

'পরেশ' (১৯৩৪) গল্পে পুরাতন বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু লেখকের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা হইলেও ইহা রসোত্তীর্ণ হয় নাই। আদর্শচরিত্র গুরুচরণ তাঁহার ভাইপো পরেশকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন ও নিজ আচরিত আদর্শবাদে দীক্ষিত করিয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহার এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু যখন তাঁহাদের পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিল, তখন গুরুচরণও তাঁহার আদর্শে স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরেশও কোন উচ্চতর নীতিবোধের পরিচয় দিল না। গুরুচরণ গুরুতর আশাভঙ্গে ভাবসাম্যচ্যুত হইয়া বারোয়ারী আমোদ ও খেমটা নাচে রুচিবান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই নৈতিক অধঃপতনে পরেশের বিবেকবুদ্ধি কিছুটা জাগ্রত হইল ও সে জ্যেঠাকে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসে প্রণোদিত করিল। এই পরিণতিতে জ্যেঠা-ভাইপো কাহারও মর্যাদা বাড়ে নাই ও সংঘর্ষের চিত্রও আশানুরূপ তীব্রতা লাভ করে নাই।

'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ (১৯১৬) ভ্রাতৃবিরোধের একটা অনন্যসাধারণ দিক্ দেখান হইয়াছে। "বি. এ. অনার পাস" ভাই বিনোদের প্রতি গোকুলের মনোভাব ঠিক সাধারণ অগ্রজের মত নহে—তাহার স্নেহের সহিত একটা সশঙ্ক সশ্রদ্ধ কুণ্ঠার ভাব জড়াইয়া আছে। তাহার অশিক্ষিত, অসভ্যোচিত, বাহ্যতঃ কর্কশ ভাবের অন্তরালে যে মাধুর্য ও কোমল স্নেহশীলতা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মৌলিকতা উপভোগ্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, যেখানে লেখক নীচজাতীয় ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় ভাবের আরোপ করেন সেখানে শেষ পর্যন্ত তাহাদের সহজ ইতরতাটুকু বিস্মৃত হইয়া যান, অতিরিক্ত পালিশের ফলে তাহাদের বাস্তব স্তরটি ঢাকা পড়িয়া যায়। এই দোষ শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কুসুম ও বৃন্দাবন বৈরাগীর চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের প্রবল শিক্ষানুরাগ ও চরিত্রগৌরব, তাহার কঠোর আত্মসংযম ও সূক্ষ্ম বিচারকৌশল তাহাকে এমন একটা আদর্শ স্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছে, যেখানে তাহার সামাজিক পদবীর কোন স্থান নাই। কুসুম ও বৃন্দাবনের মাতা সম্বন্ধে ঠিক এই মন্তব্য প্রযোজ্য। কুঞ্জনাথ ও তাহার শাশুড়ী তাহাদের স্বজাতীয় হইয়াও যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জীব—তাহাদের আলাপ-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ যেন একেবারে ভিন্নজাতীয়। এই দুই জাতীয় লোকের মধ্যে ব্যবধান যেন দুস্তর। অবশ্য ইহা বলিতেছি না যে, বৈরাগী হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ কর্তব্যবোধ সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার জাতির ও শিক্ষা-সংস্কারের প্রভাব না থাকিলে, চরিত্রটি অবাস্তবতাদুষ্ট হইয়া পড়ে। বর্তমান ক্ষেত্রে পাঠকের ধারণা হয় যে, বৃন্দাবন ও কুসুমকে বৈরাগী বলিয়া দেখাইবার একমাত্র কারণ তাহাদের পুনর্বিবাহের একটা স্বাভাবিক অবসর গড়িয়া তোলা; তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া দেখাইলেও এই উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারিত, সুতরাং তাহাদের বৈরাগী হওয়াব বিশেষ সার্থকতা নাই। 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ গোকুলের চরিত্রে লেখক পূর্বোল্লিখিত ভুল করেন নাই,

তাহার সহজ ও বাহ্য ইতরতা কোন আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে গোকুলের বাক্যে ও ব্যবহারে অসংযম, অস্থিরমতিত্ব যেন চরম মাত্রায় উঠিয়াছে—এইরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ব্যবসায় বা পরিবারের কর্তৃত্ব এই দুই-ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী ও পিতার অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার পরবর্তী খামখেয়ালী ব্যবহারের যেন একটা অসংগতি থাকিয়াই যায়।

'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪) গল্পে বৃন্দাবন ও কুসুমের চরিত্রের অসংগতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গোড়ার দোষ বাদ দিলে অন্যান্য দিক্ দিয়া উপন্যাসের প্রথমার্ধ অন্ততঃ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বৃন্দাবন ও কুসুমের পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাদের পুনর্মিলনের পথে নূতন নূতন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি লেখকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তাহার ভদ্র, উচ্চবর্ণোচিত প্রবল সংস্কার; বৃন্দাবনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কুসুম কর্তৃক তাহার মাতার অপমান। বিবাহের পরে মস্ত বড় শ্বশুরবাড়ির প্রভাবে কুঞ্জনাথের অতর্কিত আমূল পরিবর্তন, অথচ এই পরিবর্তনের মধ্যে তাহার লুপ্তপ্রায় ভগিনীস্নেহের ধ্বংসাবশেষের গোপন সংরক্ষণ বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। শেষের দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছে—যে নীতিপ্রাধান্য শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিজের উপন্যাসকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

(২)

সমাজবিধির প্রাধান্যচিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ কাহিনী

এই শ্রেণীর বাকী গল্পগুলির মধ্যে প্রেমের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। এই প্রেম ঠিক নিষিদ্ধ নহে, ও সামাজিক বিধি-নিষেধকে একেবারে তুচ্ছ করে নাই; এবং 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর উপন্যাসের ন্যায় এগুলিতে প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতের খুব দীর্ঘ ও নিপুণ বিশ্লেষণও নাই। তথাপি পরবর্তী উপন্যাসগুলির পূর্বসূচনা কতকটা ইহাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রেম-সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপমারা না থাকিলেও, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস-বর্জিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেশ আছে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন।

'শুভদা' (মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত, রচনাকাল ২০শে জুন—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলীর অন্যতম হইলেও ইহাতে তাঁহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতির পূর্বাভাস মিলে। এই পূর্বাভাস প্রথম রচনার সময় হইতেই বর্তমান ছিল, না পরবর্তী সংশোধনের ফল তাহা অনিশ্চিত। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার বক্র তির্যক্ গতি, ঈর্ষ্যা-ক্রোধ-ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন ও পতিতা স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার শান্ত, ক্রোধঘৃণাবর্জিত, নিরপেক্ষ মনোভাব তাঁহার এই প্রথম বয়সের উপন্যাসেও উদাহৃত হইয়াছে। নেশাখোর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাই-এর প্রতি অভিশাপের ভিতর দিয়া

রাসমণির উদ্বেলিত ভ্রাতৃস্নেহ ব্যথিত অনুশোচনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গণিকা কাত্যায়নীর চরিত্র এখনও আদর্শবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে নাই, তবে ইহার বিচারে লেখকের অনুচ্চারিত সমর্থন ও সহানুভূতিই অনুমান করা যায়। ইহা ছাড়া, মাঝে মধ্যে বর্ণনা ও চিন্তাশীল মন্তব্যের মধ্যেও আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ রীতি-পদ্ধতির পূর্বাভাস দেখিতে পাই। তবে ইহা যে কাঁচা হাতের রচনা তাহার প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। চরিত্র-পরিকল্পনায় গভীরতা ও সুসংগতি এখনও লেখকের অনায়ত্ত। শুভদার অটল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তাহাকে পুরাণ-মহাকাব্য-বর্ণিতা সতী স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। হরেন মুখুজ্যের দুঃশীলতার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যে একটু দুর্বল সহানুভূতি ও কিছু নিষ্ফল আত্মগ্লানি দেখা যায়, তাহার সঙ্গে নেশাখোরের সুলভ আশাবাদ ও উদ্ভট আত্মপ্রত্যয় মিশিয়া তাহাকে কতকটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত করিয়াছে। তাহার অনির্দেশ্য অতৃপ্তিবোধ তাহার বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন ছিল, কিন্তু বিবাহের পর ইতর ভোগবিলাসে উহার নিবৃত্তি সেই বৈশিষ্ট্যটুকু লুপ্ত করিয়াছে। সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশ শিথিল ও আকস্মিক। মুখুজ্যে পরিবারের ইতিহাস-বিবৃতিতে কোন ভাব-সংহতি ফুটিয়া উঠে নাই। কেবল শুভদার মূক, শত অপমানে অভিযোগহীন পাতিব্রত্য জড়শক্তির ভয়াবহ অপরিবর্তনীয়তার মত আমাদিগকে অভিভূত করে। পরের অনুগ্রহের অনিয়মিত তৈলনিষেকে যে পরিবারের সংসার-রথ গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, সেখানে একটানা দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতা জীবনযাত্রাকে বর্ণে ম্লান ও পরিধিতে সংকীর্ণ করে, সেখানে এক ভাবার্দ্র করুণরস ছাড়া আর কোনও আকর্ষণীয় বিকাশের প্রত্যাশা করা যায় না।

'মন্দির' শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামে প্রকাশিত ও কুন্তলীন পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রথম রচনা। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-সন্তান শক্তিনাথ কুম্ভকার-পরিবারে আশ্রয় পাইয়া মৃত্তিকার পুতুল গড়া অভ্যাস করে। আর কায়স্থ-জমিদার-কন্যা বালিকা অপর্ণা মন্দিরের দেবপ্রতিমা-পূজায় সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া উহাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে। বিবাহের পর মন্দির ছাড়িয়া স্বামিগৃহে যাইতে অপর্ণার দারুণ অনিচ্ছা, তাহার বৈরাগ্য-ধূসর মন যৌবনাবেশে রাঙিয়া উঠিল না। দেববিগ্রহের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ তাহাকে স্বামি-বিষয়ে অনেকটা উদাসীন রাখিল। উভয়ের মধ্যে সামান্য মান অভিমানের পালাও অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু অভিমানের প্রেমবর্ধক প্রভাব অপর্ণার নির্লিপ্ত চিত্তে অনুভূত হইল না। ইতিমধ্যে স্বামী অমরনাথের অকালমৃত্যু অপর্ণাকে লৌকিক প্রেমাভিনয়ের দায় হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে আবার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির-পরিচর্যায় সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করার অবসর দিল।

এই সময় শক্তিনাথ মন্দিরে পূজার কার্যে ব্রতী হইয়া অপর্ণার কঠোর দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহার পূজাবিধির সমস্ত ভুলভ্রান্তি অপর্ণার সদা-সতর্ক তত্ত্বাবধানের নিকট ধরা পড়িয়া উহাকে তীব্র ভর্ৎসনার বিষয়ীভূত করিল। এই তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটি স্নেহশীল প্রশ্রয়ের ফল্গুধারাও অপর্ণার মনে প্রবাহিত হইল—সে শক্তিনাথের সমস্ত অনভিজ্ঞতার ত্রুটি মার্জনা করিয়া তাহাকেই স্থায়িভাবে পূজার অধিকার দিল। প্রশ্রয়পুষ্ট শক্তিনাথ একটা মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিল—সে অপর্ণার প্রসন্নতালাভের জন্য না জানিয়া তাহাকে দুই শিশি গন্ধসার উপহার দিতে গেল। ইহাতে অপর্ণা তাহার মনে পাপ অভিসন্ধির অঙ্কুর আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল ও ইহার

পরেই শক্তিনাথ জ্বরে ভুগিয়া মারা গেল। শক্তিনাথের মৃত্যু-সংবাদে অপর্ণার মন অনুতাপে বিগলিত হইল ও সে প্রত্যাখ্যাত উপহার দেবচরণে নিবেদন করিয়া শক্তিনাথের সমস্ত অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিল।

এই গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার কিছু কিছু পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। শক্তিনাথ ও অপর্ণার বাল্যজীবনের প্রতিবেশ-রচনায়, উহাদের মনোভাব ও চরিত্রের অসাধারণত্ব-নির্দেশে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মোটেই গতানুগতিক নহে। অপর্ণার দাম্পত্য জীবনের অসামঞ্জস্য, স্বামীর সঙ্গে তাহার প্রণয়োন্মেষের পথে সূক্ষ্ম বাধা-অন্তরায়গুলি মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ-কৌশল-চিহ্নিত। শক্তিনাথের প্রতি তাহার কঠোরে-কোমলে মেশা, তর্জন-প্রশ্রয়মিশ্র মনোভাবটিও সুচিত্রিত। গল্পের পরিণতির করুণরস সংযত মিতভাষিতার সহিত সার্থকভাবে প্রকাশিত। সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় এই যে, এই গল্পে শরৎচন্দ্র নিরুপমা-অনুরূপা দেবীর ঔপন্যাসিক বিষয়-নির্বাচন ও চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছেন। গল্পের নামকরণই ইহার প্রমাণ।

'বোঝা' গল্পটি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহা শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা। ইহাতে এক অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ, খেয়ালী স্বামী কর্তৃক নিরপরাধা তরুণী পত্নীর পরিত্যাগ একটি অবিমিশ্র করুণরসের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। সত্যেনের প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায় সে দ্বিতীয়া স্ত্রী নলিনীকে বিবাহ করিয়াছে কিন্তু মৃতা পূর্বস্ত্রীর স্মৃতি উভয়ের প্রণয়কে গাঢ় হইতে দেয় নাই। নিতান্ত অকারণেই সত্যেন অভিমান করিয়া নলিনীকে ত্যাগ করিয়াছে ও তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ করিয়াছে। হতভাগিনী নলিনী স্বামীর বিবাহের ফুলশয্যার রাত্রে বহুমূল্য উপহার-দ্রব্য পাঠাইয়াছে ও ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুর পূর্বে সত্যেন-দত্ত আংটিটি সপত্নীকে উপহার দিয়াছে। রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমানুসারী ও শরৎচন্দ্রের স্বকীয়তাবর্জিত। কাহিনীর মধ্যে কোথাও চরিত্রসৃষ্টি বা গভীররস-স্ফুরণের পরিচয় নাই।

'অনুপমার প্রেম' (১৯১৭)—গল্পেও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রীতির চিহ্ন নাই। গল্পের প্রথম অংশে অনুপমার রোমান্টিক প্রেমের ব্যঙ্গাতিরঞ্জনমূলক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সে বাপ-মায়ের আদরিণী মেয়ে, গ্রামের একটি ছেলেকে মনে মনে প্রেমার্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়াছে। তাহার পিতামাতার ব্যবস্থাপনা-কৌশলে সেই দুর্লভ মানস প্রণয়ীর সহিতই বিবাহ স্থির হইল—অনুপমা হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ পাইল। কিন্তু বিবাহ-রাত্রিতে এই চাঁদ কোথায় অদৃশ্য হইল ও জাতিকুলরক্ষার প্রয়োজনে অনুপমাকে জোর করিয়া বৃদ্ধ পাত্রের হাতে সম্প্রদান করা হইল—তাহার কৈশোর স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে একেবারে ধূলিশায়ী হইল। ইতিমধ্যে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক—ললিতমোহন—অনুপমার প্রেমলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া জেলে গিয়া তাহার দুরাশার প্রায়শ্চিত্ত করিল। পিতামাতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাইএর সংসারে দাসীবৃত্তি করিতে বাধ্য হইল। বিন্দুমাত্র মায়া-মমতাও তাহার হৃদয়ের মরুভূমি-শুষ্কতার উপর স্নিগ্ধ স্পর্শ সঞ্চার করিল না। অবশেষে সে আত্মহত্যা করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী ললিতমোহনের শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিল ও তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার নূতন জীবন গড়িয়া উঠিল এই ইঙ্গিত লেখক আমাদের দিয়াছেন। গল্পটির প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে একটি ভাবগত অসঙ্গতি লক্ষিত হয়—মৃদু মধুর ব্যঙ্গে যাহার আরম্ভ, নির্মম অত্যাচার-

উৎপীড়নে তাহার পরিসমাপ্তি। অথচ এই বিপরীত পরিণতি কেবল যে অনুপমার অবাস্তব প্রেমস্বপ্নাতুরতারই প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফল তাহা বলা যায় না। তাহার স্বয়ংবৃত প্রণয়ী বিবাহ সম্পন্ন করিয়া বিলাত গেলে এরূপ নিদারুণ পরিস্থিতি ঘটিত না। তাহার পিতামাতা তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী বিষয়-সম্পত্তি দিয়া গেল ও তাহার দাদা-বৌদিদি খানিকটা স্নেহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে লেখক যে অসহনীয় দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্ভব হইত না। সুতরাং ঘটনার পরিণতির জন্য দায়ী শুধু অনুপমার অতি-উচ্ছ্বসিত প্রণয়াকুলতা নহে, তাহার প্রেমের সহিত নিঃসম্পর্ক আকস্মিক দুর্ঘটনা-পরম্পরা। ইহাই গল্পটির ত্রুটি।

'আলো ও ছায়া' (১৯১৭)—এই ছোট উপন্যাসটিতে বস্তুবিন্যাসের অপরিপক্কতা ও মানবিক সম্পর্কের সমস্ত অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির কিছুটা পরিণত রূপ দেখা যায়। গল্পারম্ভেই লেখক কাহিনীর অবিশ্বাস্যতার সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়া নিজ রীতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার প্রমাণ দিয়াছেন। মনে হয় যে, লেখকের যে বিশিষ্ট জীবনবোধ, মানব সম্পর্কের অভাবনীয় বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা, তাহা কোন সুসংবদ্ধ বাস্তব আখ্যানে বিন্যস্ত হইবার পূর্বেই, কল্পনাপ্রধান, কিয়ৎ পরিমাণে অসম্ভব বিষয়-বস্তুর শিথিল বেষ্টনীর মধ্যেই আপনার একটি ক্ষণস্থায়ী রূপাশ্রয় খুঁজিতেছিল। তাঁহার শিল্পী-আত্মা শিল্পদেহ-নির্মিতির পূর্বেই যে-কোনপ্রকার অবলম্বন-অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। এখানে যজ্ঞদত্ত ও সুরমা আলো ও ছায়ার ন্যায় অমূর্ত, বিদেহী ভাবের বাহন, দুই নাড়ান্বেষী মানবাত্মার প্রতীক, এক পরস্পর-নির্ভর যুগ্ম সত্তার লীলাবিলাস। উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমস্ত পরিচিত, সমাজ-ব্যবস্থাবহির্ভূত। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নূতন বৌএর অভ্যাগম যেন উহাদের সম্পর্ককে আরও ঘোরাল ও অনির্দেশ্য করিবার উপায়-স্বরূপ এক ঘূর্ণিশক্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা কোন দিন ঘটিতে পারে না—যে-কোন সমাজের মাধ্যাকর্ষণ এ কল্পনাবিহারকে অসম্ভব করিত। যজ্ঞদত্ত সুরমাকে আঘাত করিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়াছে, নববধূ জ্বর-বিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও যজ্ঞদত্ত নিরুদ্দেশ-যাত্রায় উধাও হইয়াছে—এ সবই যেন রূপকথা-রাজ্যের সংঘটন। কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে নিগূঢ় অর্থপূর্ণ মন্তব্য ও জীবনসমীক্ষার পরিচয় মিলে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্র অবাস্তব ঘটনা-কুহেলির ফাঁক দিয়া সত্য জীবনকে দেখিতে ও বুঝিতে শিখিতেছেন ইহাতে তাহারই প্রমাণ। আলো ও ছায়ার চঞ্চল নৃত্যের ভিতর দিয়া বাস্তবজীবনের গভীর সত্য ও স্থির অর্থবোধ যে লেখকের নিকট নিজ রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। সামান্য কাহিনীর মধ্যে অসামান্য অর্থগৌরব নিহিত থাকাই এ গল্পটির বিশেষত্ব।

'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', প্রভৃতি গল্পে প্রেম-সম্বন্ধে এই স্বাধীন মতবাদ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পূর্বসূচনা অল্পাধিক পরিমাণে মিলে। 'দেবদাস'-এ (১৯১৭) দেবদাস ও পার্বতীর বাল্যপ্রণয় বিশেষ সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সামাজিক প্রতিবন্ধক ও দেবদাসের ভীরুতার জন্য এই প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু দেবদাস ও পার্বতীর উপর ইহার প্রভাব চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। পার্বতী ভুবন চৌধুরীর গৃহিণী হইয়াও এবং নিজ স্বামী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করিয়াও তাহার বাল্যপ্রণয় বিসর্জন দেয় নাই, পরন্তু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের ন্যায় ইহাকে সযত্নে রক্ষা

করিয়াছে। দেবদাস নিরাশ প্রেমের তাড়নায় নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতা-স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছে ও পরিণামে ঘৃণিত ও শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে, কিন্তু সে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই। শরৎচন্দ্র এই গল্পে পাপ ও চরিত্রহীনতার কোনরূপ পোষকতা না করিয়াও পাঠকের মনে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেবদাসের পাপটাই তাহার সম্বন্ধে বড় কথা নয়; ইহা তাহার গভীর মনস্তাপের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। পার্বতীর সতীধর্ম-পালনকে তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, তবে দেবদাসের প্রতি অনুরাগকেও সাধারণ কর্তব্যপালন অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান দিয়াছেন। এইরূপে তিনি সামাজিক ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া প্রেমের মহত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রমুখীর চরিত্রে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতির পূর্বসূচনা পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিশেষ পরিচয় নাই, ইহা যেন একটা শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে 'দেবদাস' তাঁহাব প্রথম বয়সের ও অপরিপক্ক রচনা বলিয়া নায়কের চরিত্র ও তাহার পদস্খলনের চিত্রে গভীরতার অভাব অনুভূত হয়।

'বড়দিদি' গল্পেও (১৯১৩) অপরিপক্কতার চিহ্ন প্রস্ফুট। মাধবীর সঙ্গে সুরেনের যে সম্পর্ক তাহাকে ঠিক প্রেমের পর্যায়ে ফেলা যায় না—অসহায় শিশুর মাতার উপর যেরূপ একান্ত নির্ভর-ভাব ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। এই সম্পর্ক লৌকিক ব্যবহারে প্রেমের মাধুর্য বা গৌরব লাভ করে নাই; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, সুরেনের মৃত্যুকালে মাধবী ইহার পবিত্রতা ও ব্যাকুল আহ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহার আজন্ম বৈধব্যের সংস্কার অতিক্রম করিয়া এই সম্বন্ধ তাহার উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গল্পের মধ্যে কিন্তু এই সম্বন্ধটি ও সুরেনের উদাসীন, আত্মবিস্মৃত ভাবটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

'চন্দ্রনাথ'-এ (১৯১৬) যে ভালবাসার আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আধুনিক বিদ্রোহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ সরযূকে সামাজিক কলঙ্ক ও অপবাদের জন্য ত্যাগ করিয়া খুড়া মণিশঙ্করের অনুরোধে ও নিজ দুর্নিবার প্রেমের আকর্ষণে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছে। এই গল্পের সারাংশ ঠিক আমাদের সনাতন আদর্শে সংকলিত। ইহার মধ্যে যেটুকু নূতন ও মৌলিক তাহা মণিশঙ্করের সহানুভূতি—পরিত্যক্তার প্রতি সমাজের দয়া ও সমবেদনা। সরযূর কুণ্ঠিত, অপরাধী প্রেমের চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু গল্পের প্রধান চরিত্র হইতেছে কৈলাস খুড়া—একদিকে তাহার সরল, অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন পৌরুষ, অপর দিকে শিশু বিশ্বনাথের প্রতি তাহার করুণ, মর্মান্তিক আসক্তি—তাহার চরিত্রের এই উভয় দিক্ই অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কৈলাস খুড়া অতি সাধারণ গল্পের মধ্যে প্রতিভার দীপ্ত স্পর্শ।

'পরিণীতা' গল্পটিতে (১৯১৪) প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমা একটু নূতনভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ললিতা শেখরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া সেই সম্পর্ককে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অব্যাহত রাখিয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শেখরের অন্যায় ঈর্ষ্যা ও কাপুরুষোচিত ঔদাসীন্যও গণনীয়। বস্তুতঃ, শেখরের মধ্যে এক অর্থসম্বন্ধে উদারতা ছাড়া আর কোনও বরণীয় গুণ দেখা যায় না। শেখর-ললিতার মধ্যে এই অব্যক্ত মধুর সম্পর্কটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য লেখককে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কল্পনা করিতে হইয়াছে তাহা

আমাদের পারিবারিক জীবনের পক্ষে অনেকটা অসাধারণ। ললিতার উপর শেখরের প্রভাব ও শেখরের অর্থে ললিতার অবাধ অধিকার—কেবল প্রতিবেশসূত্র পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পর্যাপ্ত কারণ কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। অথচ এরূপ অবস্থা কল্পনা করিয়া না লইলেও প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবস্থার এই বিশেষত্বটুকু নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া লইলে গল্পটির উৎকর্ষ স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না।

'স্বামী' গল্পটি (১৯১৮) শেষের দিকের রচনা হইলেও ভাবের দিক্ দিয়া ইহার প্রথম বয়সের গল্পগুলির সহিত মিল আছে। ইহাতে অবৈধ প্রণয়ের উপর দাম্পত্য প্রেমের জয় ঘোষণা হইয়াছে। এখানে স্বামী নিজ ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অন্যাসক্ত স্ত্রীর চিত্ত জয় করিয়াছে। গল্পটি অনুতপ্ত স্ত্রীর মুখে দেওয়া হইয়াছে ও ইহার মধ্যে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির সুরটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বিশ্লেষণ ও ভাবের দিক্ দিয়া ইহাতে বিশেষ গভীরতা নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের কোন কোন গল্পের ছায়াপাত ইহার উপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর গল্পের বিষয়-নির্বাচন ঠিক শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট চিন্তাধারার সমধর্মী নহে।

'কাশীনাথ' (১৯১৭), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৫), 'নববিধান', 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) ও 'সতী' (১৯৩৭)—সবই দাম্পত্য বিরোধ ও মনোমালিন্যের কাহিনী। এই ছোট উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্রের জীবনবীক্ষণের বিশিষ্ট ভঙ্গীটি ক্রমশঃ স্পষ্টতরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কাশীনাথ'-এর পরিধি কেবল দাম্পত্য সংঘর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে কাশীনাথের উদাসীন, সংসার-বিমুখ প্রকৃতি-বিশ্লেষণ দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছে। কমলা-চরিত্রেও নানা পরিবর্তন-স্তর দেখান হইয়াছে। কাশীনাথের চরিত্র-রহস্য পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় নাই। কমলার প্রতি তাহার বিমুখতার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কমলা প্রথম দিকে প্রাণপণে স্বামীর চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত আত্মনিবেদন কাশীনাথের ঔদাসীন্যের লৌহবর্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যখন অভিমান করিয়াও সে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন সেও উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কাশীনাথের আচরণের অসঙ্গতি এই যে, যে স্ত্রীকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে, নিজ প্রয়োজনে তাহার অর্থগ্রহণ করিতে সে তাহার অনুমতি লওয়াও আবশ্যক মনে করে নাই। কাজেই অন্তরের বিরুদ্ধতা বাহিরের প্রকাশ্য সংঘর্ষে, নীরব অবজ্ঞা অপমানকর আচরণে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দুইটি বাহিরের চরিত্র, একজন ভেদ-সৃষ্টিতে ও অপরজন পুনর্মিলন-সাধনে সহায়তা করিয়াছে। নূতন ম্যানেজার ও বিন্দু যথাক্রমে এই দুই উদ্দেশ্যের সহায়ক হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য-সম্পর্কের সহজ সুস্থতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিরোধের কারণ ও ক্রমপরিণতিটি পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয় না। এ যেন ফাঁস খুলিবার জন্যই উহাকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করা হইয়াছে।

'দর্পচূর্ণ' গল্পটিতে দাম্পত্য বিরোধের সর্বাপেক্ষা সাধারণ ক্ষেত্র—সাংসারিক অভাব-অনটন—বিষয়রূপে নির্বাচিত হইয়াছে। শান্তপ্রকৃতি অথচ দৃঢ়মনা গ্রন্থকার নরেনের সঙ্গে বড়লোকের মেয়ে, পিতৃগৃহের সৌভাগ্যগর্বিতা, বায়সংকোচে অনভ্যস্তা ও অসহিষ্ণু মেজাজের ইন্দুর বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দুর উগ্র, ঝাঁঝালো আচরণ ও উঁচু চাল চলন এই অভাবক্লিষ্ট সংসারটিকে আরও নিরানন্দ ও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইনু সর্বদাই তাহার মুখচোরা স্বামীকে

উঠিতে-বসিতে দারিদ্র্যের জন্য খোচা দিয়াছে ও অবজ্ঞা-অবমাননায় তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছে; শেষ পর্যন্ত নরেন স্ত্রীর দিক্ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া লইয়াছে। সে ঋণের দায়ে জেলে গিয়াছে তথাপি পিতৃগৃহগতা পত্নীর কোন অর্থসাহায্য গ্রহণ করে নাই। স্ত্রী ইন্দুর আচরণের সহিত স্নেহকোমলা, সেবাপরায়ণা ভগ্নী বিমলার ব্যবহারের পার্থক্য এই বিসদৃশতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ইন্দুর চৈতন্য হইয়াছে ও সে স্বামীর দুঃখের অংশ লইবার জন্য তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গল্পে চরিত্রের কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু ইহা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও মানস পরিবর্তন-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে প্রাণবান হইয়াছে।

'নববিধান'—দাম্পত্য অসামঞ্জস্যের আর একটি উপভোগ্য উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তি ও মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা একই বিষয়ের কত বিচিত্র রূপবিন্যাস করিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সাহেবী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, খানসামা-বাবুর্চির বৈদেশিক পরিচর্যায় লালিত অধ্যাপক শৈলেশের সঙ্গে এক প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে উষার বিবাহ হয়। উভয়ের পিতৃদ্বয়ের জীবদ্দশাতেই সাংসারিক অনৈক্যের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তারপর দীর্ঘ আট বৎসর পরে শৈলেশের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন তাহার তৃতীয়বার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, তখন অকস্মাৎ পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রীর কথা শৈলেশের মনে পড়ে ও লোক পাঠাইয়া তাহাকে স্বামিগৃহে আনান হয়। শৈলেশের আত্মীয়-স্বজন, বিশেষতঃ তাহার ভগ্নী বিভার এই ব্যাপারে প্রবল অসম্মতি ছিল। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামিগৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উষা এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণশক্তির পরিচয় দিল ও শৈলেশের পুত্র সোমেনকে এতই সহজে নিজ স্নেহক্রোড়ে আকর্ষণ করিল যে, শৈলেশ আশ্চর্য হইয়া গেল ও তাহার ভগ্নীপতি ক্ষেত্রমোহন এই নূতন বৌ-ঠাকুরাণীর শ্রদ্ধাবান ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। সে মুসলমান বাবুর্চিকে বাকী বেতন শোধ করিয়া ছুটিতে পাঠাইয়া দিল ও সনাতন হিন্দুমতে খাদ্য প্রস্তুতের ভার নিজেই গ্রহণ করিল। শৈলেশ এই পরিবর্তনে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেও বাহিরে ভগ্নী বিভার মন রক্ষা করিবার জন্য উহাদের চিরাভ্যস্ত চাল-চলনের পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানাইল। উষা আবার মুসলমান পাচক নিযুক্ত করিল, কিন্তু নিজ হিন্দুয়ানী ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভাইয়ের বাড়িতে চলিয়া গেল। তাহার অনুপস্থিতিতে ছিদ্রবহুল সংসার-তরণী আবার আবর্তে পাক খাইতে লাগিল। শৈলেশ ঘর ছাড়িয়া এলাহাবাদে চলিয়া গেল ও সেখানে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গুরুবাদ ও কৃচ্ছ্রসাধনের চরম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। এই সংকটকালে উষা আবার ফিরিয়া সংসারের হাল ধরিল ও নানা দুর্দশা ও অবস্থান্তরে অভিজ্ঞ শৈলেশ এবার তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবেই মানিয়া লইল।

এই ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যে কোন গভীর জীবন-সত্য, মানব-চরিত্রের কোন স্মরণীয় বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। শৈলেশের দুর্বল প্রথানুগত্য ও আচরণের দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যে দোলায়িত অস্থিরতা সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। বিভা ও ক্ষেত্রমোহনের একবিন্দুসংলগ্ন প্রকৃতি ও তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বাহ্য নিস্তরঙ্গতার মধ্যে গভীর আন্তর বৈষম্যটি সুষ্ঠু বর্ণনা ও ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু উষার অন্তর-রহস্যটি তাহার গৃহিণীপনা ও নীরব আত্ম

দমনের অন্তরালে অপ্রকাশিতই রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শৈলেশের সহিত তাহার বিরোধের মূল কারণ, তাহার জীবননীতি ও পরধর্মসহিষ্ণুতার সীমা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্টই থাকে। সোমেনের প্রতি তাহার ভালবাসা কতটা তাহ'র স্নেহের আন্তরিকতা ও চিত্তজয়-নিপুণতার দ্বারা স্ফুরিত, কতটাই বা মাতৃহীন বালকের স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের সহজ প্রবণতার আকর্ষণের ফল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি না। ম্লেচ্ছ আচারের অপবিত্রতায় যে ঘর ছাড়িয়াছিল, বৈষ্ণব আচারের সুপবিত্র আতিশয্যে সে কেন ঘরে ফিরিল সে রহস্য ভেদ হয় নাই। প্রথম প্রকারের আবর্জনা দূর করিতে সে স্বামীর চিরাচরিত সংস্কারের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার জঞ্জাল সাফ করিতে সে স্বামীর সহযোগিতাই পাইবে ইহা সে যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, উষা সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত অভিমত-প্রকাশে আমরা ক্ষেত্রমোহনের ন্যায়ই সংশয়-পীড়িত হই। প্রাচীন প্রথার অবগুণ্ঠনে শুধু তাহার মুখ নয়, অন্তঃপ্রকৃতিও অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছে।

'বিরাজবৌ'—এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহাতে দাম্পত্য প্রেমের নিবিড় একাত্ম মিলন হইতে উহার দারুণ বিপর্যয় অগাধ প্রীতি হইতে ঈর্ষ্যা ও অভিমানজাত সন্দেহ-বিকার, আকস্মিক সংঘটনের সহিত চারিত্রিক প্রতিক্রিয়ার জটিল যোগাযোগ এক ট্র্যাজেডি-করুণ পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও দাম্পত্য সম্পর্কের অনাবিল প্রীতির দৈবাহত উচ্ছেদ ও উন্মুলন লেখকের কবি-কল্পনা ও জীবনের রহস্যবোধকে জাগ্রত করিয়াছে। বঙ্কিমের যুগে পতি-পত্নীর সুখময় মিলনই ছিল সাধারণ নিয়ম; বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যই ছিল ব্যতিক্রম। আধুনিক যুগে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের বীজ ওতপ্রোতভাবেই উপ্ত দেখান হয়; দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই যেন উহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। স্থায়ী বন্ধন মাত্রেই আনে অতৃপ্তি ও বন্ধনচ্ছেদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—দাম্পত্য শান্তি ঝটিকার ক্ষণ-বিরতি মাত্র, এক অনিশ্চিত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ভারসাম্যের উপরই নির্ভরশীল। শরৎচন্দ্র নীলাম্বর ও বিরাজের আদর্শ ও ঐকান্তিক প্রণয়মূলক দাম্পত্য জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বঙ্কিমের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। দারিদ্র্যের অনির্বাণ জ্বালা তাহাদের সম্পর্ক-মাধুর্যকে ঝলসাইয়া দিয়া উহার মধ্যে তিক্ততা মিশাইয়াছে। কিন্তু এই তিক্ত বাগ্‌বিতণ্ডা ও সংঘর্ষের মধ্যেও এক অতি-সতর্ক, প্রণয়াস্পদের দুঃখ-কষ্টে সদা-বিক্ষুব্ধ হিতৈষণার অস্বস্তি অনুভব করা যায়। বিরাজ স্বামীর খাওয়া-পরার কষ্টেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাহাকে কটুকথা শুনাইয়াছে; নীলাম্বরও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনের অক্ষমতাজনিত মনোবেদনাতেই বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া তাহার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। প্রেমের আতিশয্য বিকারই তাহাদের সংঘর্ষের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহাই এই কাহিনীর অসাধারণত্ব।

কিন্তু দারিদ্র্যের ঘর্ষণ অন্তরে যে সুখশান্তিধ্বংসী আগুন জ্বালাইয়াছে তাহা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রবল ফুৎকারেই পুষ্ট ও ঊর্ধ্বশিখ হইয়াছে। বিরাজের ভালবাসা সাধারণ দাম্পত্য প্রেমের পর্যায়ভুক্ত নহে, ইহার মধ্যে অসপত্ন অধিকারবোধ ও প্রবল আত্মাভিমান প্রধান উপাদান। প্রেমের দাবিতে সে স্বামীকে নিজ ক্রীড়াপুত্তলির মত ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত—তাহার ভালবাসা মাতৃজাতীয়, প্রিয়াজাতীয় নহে। তাহার অক্লান্ত স্বামিসেবায় তপশ্চর্যা যেন তাহাকে এক অধ্যাত্ম তেজে অধৃষ্য, মহিমান্বিত করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে

কুৎসিত সং-পোষণ শুধু দাম্পত্য প্রেমের অবমাননা নহে, ঐকান্তিক সাধনার নির্মল পবিত্রতায় কলঙ্ক-লেপন। কাজেই বিরাজের রোগজীর্ণ, পরিচর্যাক্লান্ত, আত্মনিপীড়নে বিপর্যস্ত মনে একটা অস্বাভাবিক, অকল্পনীয় সংকল্প মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া খুবই সম্ভব। এক মুহূর্তের রোষান্ধতায় আত্মহত্যার প্রেরণা অতর্কিতভাবে অকৃতজ্ঞ স্বামীর প্রতি সমস্ত দণ্ডবিধানের সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজীবন পুণ্যাচরণকারী ব্যক্তি যেমন ভগবানের অন্যায় অবিচারের আঘাতে হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া তাঁহার প্রতি দারুণ অভিমানে পাপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিরাজের আচরণও যেন সেইরূপ। ইহার সঙ্গীত ও স্বাভাবিকতা কেবল বিরাজের অতীত দাম্পত্য জীবনের পটভূমিকায়ই বোধগম্য হইতে পারে। নীলাম্বর পত্নীগতপ্রাণ হইলেও নেশাখোর ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিল—দীর্ঘ অভাব-ভোগের নিদারুণ প্রতিক্রিয়া তাহারও সাময়িক মস্তিষ্কবিকার ঘটাইয়াছিল। কাজেই তাহার দিক হইতেও কোন সংযত, বিচার-বিবেচনা-পরিশুদ্ধ ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনিবার্যভাবেই ঘটিয়াছে। বিরাজের অম্লান সতীত্ব মুহূর্তের চিত্তবিভ্রমে এক বিন্দু কলঙ্কলাঞ্ছনা চিহ্নিত হইয়া মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও ভগবানের অন্তর্যামিত্বের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মানবচরিত্রজ্ঞান ও কাহিনী গ্রন্থন-কৌশল এক অতি নাটকীয় পরিস্থিতিকে নাটকীয় সুসঙ্গতি ও চরিত্রানুবর্তিতা দান করিয়াছে। এখানে ক্ষণিক পদস্খলনের উপর সনাতন দাম্পত্য নীতিরই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

পথনির্দেশ' (১৯১৪)—ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য দুই তরুণ, প্রণয়োন্মুখ হৃদয়ের আত্ম-দমনের নিবিড় দুঃখের বর্ণনা। হেমনলিনীর দরিদ্র মাতা সুলোচনা উদার-হৃদয় ব্রাহ্মযুবক গুণিনের গৃহে আশ্রিতা। কিন্তু পরনির্ভরতার হীনত্ববোধের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গুণী ও হেমের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ স্নেহসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্ক এক অনিবার্য প্রণয়-আকর্ষণের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু সুলোচনার হিন্দুত্ব-সংস্কার এই মিলনের পথে অন্তরায় হইয়াছে। সংযত-হৃদয় গুণী সুলোচনার ইচ্ছানুসারে হেমের অন্যত্র বিবাহ দিয়াছে, কিন্তু হেমের পরবশ চিত্ত স্বামীর অনুরাগী হইতে পারে নাই। অল্পদিনের মধ্যে সে বিধবা হইয়া গুণীর সংসারে ফিরিয়াছে। সুলোচনার মৃত্যুর পর এই দুইটি তরুণ-তরুণী অহরহঃ এক আত্মদমনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। গুণী আত্মনিরোধে অটল আছে, কিন্তু হেমনলিনী একবার গুণীকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, আর একবার তাহার আকর্ষণ গভীরভাবে অনুভব করিয়া চূড়ান্ত অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গুণিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে হেমনলিনী দ্বিধাহীন আত্মনিবেদনের আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী গুণী হেমের আবেগতপ্ত ললাটে একটি স্নিগ্ধ চুম্বন দ্বারা এই পরম উপহারটিকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। উপন্যাসটিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নূতন ঘন উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবার কৌশল ও করুণরসের সার্থক উদ্বোধন-শক্তি সুন্দর-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ঘটনাপরিস্থিতির সহিত একদিকে 'আলো ও ছায়া'-র অন্যদিকে 'পরিণীতা'-য় ললিতা-শেখরের অদ্ভুত-অধিকারবোধমূলক বিচিত্র সম্পর্কের সাদৃশ্য আছে

'ছবি' (১৯২০)—ব্রহ্মদেশের পরিবার পরিবেশে স্থানান্তরিত 'দত্তা'-উপন্যাসের পরিস্থিতির প্রতিরূপ। অবশ্য গল্পটি কথাশিল্পের দিক্ দিয়া খুব উন্নত নহে। বা-থিন ও মা-শোয়ের মধ্যে একটা বাগ্‌দানমূলক বিবাহসম্পর্কের লঘু পূর্ববন্ধন ছিল। বা-থিন শিল্পী ও মা-শোয়ের প্রেমনিবেদনের প্রতি উদাসীন। সে মা-শোয়ের পিতার নিকট নিজ পিতৃঋণ পরিশোধোপযোগী অর্থসংগ্রহের জন্য ছবি আঁকিতে নিবিষ্টচিত্ত; প্রেমের কথা তাহার অন্তর্মধ্যে হৃদয়ে স্থান পায় না। এই ক্রমাগত উপেক্ষার জন্য মা-শোয়ে তাহার প্রতি বিরক্ত ও বিমুখ; অপর প্রণয়ীর স্তাবকতা তাহার মনকে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত করে। সে ঋণশোধের চাপ দিয়া উদাসীন প্রেমিককে করতলগত করার ফন্দি করিল। বা-থিন সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ-পরিশোধের অর্থ সংগ্রহ করিল। যে ছবির উপর সে তাহার অর্থ-সংগ্রহের আশা ন্যস্ত করিয়াছিল তাহা গৌতম-বধূ গোপার ছবি না হইয়া তাহার প্রণয়িনী মা-শোয়ের প্রতিকৃতি হওয়ায় খরিদ্দার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতেই তাহার ঔদাসীন্য যে প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী প্রণয়বিভোরতা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক এই চরম মুহূর্তে মা-শোয়ে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নায়িকার ন্যায় দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও স্নেহপূর্ণ সেবাপরায়ণতার পরিচয় দিয়া পলাতক প্রেমিককে নিজ জীবনসঙ্গী করিয়া লইয়াছে। সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রণয়-প্রকাশ-পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশের রমণী যে বাঙালিনীর সহোদরা, প্রেমরহস্যের এই সার্বভৌম পরিচয়টিই কাহিনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

'অনুরাধা' (১৯৩৪)—একটি অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। গল্পটি বিবাহান্তিক হইলেও প্রেমনির্ভর নহে। ইহাতে পূর্বরাগের বা হৃদয়াবেশের গাঢ় রং কোথাও নাই—আগাগোড়া সাংসারিক হিসাবী মনোভাব, সেব্য-সেবকের একদিকে অধিকার-প্রয়োগে ঋজু ও অপরদিকে শ্রদ্ধাকুণ্ঠিত সম্পর্ক ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহার মধ্যে হৃদয়াবেগের যে ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হয় তাহা মাতৃহীন, স্নেহবুভুক্ষু বালক কুমারের প্রতি মমতা ও তজ্জনিত কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে জড়িত। বিলাতফেরৎ, নিজ পদমর্যাদা সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন, কেতাদুরস্ত চালচলনে অভ্যস্ত, যৌবনের প্রান্তসীমায় উপনীত জমিদারপুত্র ও তাহারই ফেরারী কর্মচারীর সহায়সম্পদহীনা, রূপলাবণ্যবঞ্চিতা, অধিকবয়স্কা ভগ্নীর মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়াবেশের কোনই অবসর নাই। অবস্থা-বিপর্যয়ে অনুরাধা নিজের বিবাহের ঘটকালী করিতে বাধ্য হইয়াছে—ইহাতেই সে নায়িকার চির-ঐতিহ্য-নির্ধারিত মর্যাদা হারাইয়াছে। এই বিবাহে প্রকৃত দৌত্যকার্য করিয়াছে বিজয়ের বালক পুত্র কুমার—ইহা বিজয়ের পত্নীনির্বাচন নহে, বালকের মাতৃনির্বাচন। অবশ্য বিজয়ের বাড়ির মেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক জীবন-নীতি, শিক্ষিতা মহিলার সংসারধর্মে ঔদাসীন্য ও স্নেহমায়ামমতার বিরল প্রকাশ তাহাকে গরীবের মেয়ে বিবাহ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। অনুরাধার চরিত্রে স্বাভাবিক বিনয় ও অনুগ্রহপ্রার্থনায় কুণ্ঠার সহিত উগ্রতাহীন আত্মমর্যাদাবোধের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। তাহার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে একটি শালীনতা, সংযম, অন্তঃপুরচারিণীর মৃদু ও সংবৃত আত্মপ্রকাশ অভ্রান্ত সঙ্গতির সহিত রক্ষিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের নারীসমাজের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, সেবা করার প্রচণ্ড জিদ, স্বাধীনচিত্ততার আতিশয্যে পুরুষের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা, সত্যভাষণের দৃপ্ত সাহসিকতা—অনুরাধার চরিত্রে সম্পূর্ণ

অনুপস্থিত। কোন তীক্ষ্ণ-বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত না হইয়াও যে সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে পারে এই উপন্যাসটিতে তাহারই প্রমাণ মিলে।

'সতী'-তে (১৯৩৪) হিন্দুসমাজে অতি-প্রচলিত 'সতী' প্রশস্তির বিপরীত দিক্‌টা দেখান হইয়াছে। সতী যে কেবল নিজেই মৃত স্বামীর চিতায় আপনাকে পোড়াইত তাহা নহে সময় সময় জীবন্ত স্বামীরও জীবনব্যাপী চিতানল প্রজ্বলিত করিত। অর্থাৎ সতীদাহ কথাটা ব্যাকরণের উভয় বাচ্যেই লওয়া যাইতে পারে। এখানে হরিশের স্ত্রী নির্মলা যেমন নিজ সতীত্ব-মহিমায় অকুণ্ঠিত আস্থার ফলে স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সেইরূপ স্বামীর প্রতি অবিরত সন্দেহপরায়ণতায়, তাহার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া ও নিশ্ছিদ্র খবরদারী করিয়া, তাহার প্রতিটি আচরণের ইতর, কদর্যতাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাকে অনবরত কটু শ্লেষে বিদ্ধ করিয়া, তাহার জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে সতীত্ব-চন্দ্রের জ্যোৎস্নাময় ও কলঙ্কলাঞ্ছিত উভয় দিক্‌কেই উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। লেখকের কৃতিত্ব এইখানেই যে, এই দুই বিপরীতমুখী আচরণই নির্মলা-চরিত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। বিরহিণীর পক্ষে চন্দ্রকিরণের ন্যায় উহার সতীত্ব-স্নিগ্ধতা বেচারা স্বামীর ক্ষেত্রে দাহ জ্বালাময় হইয়াছে। আরও মুশ্‌কিলের কথা এই যে, সমাজের সহানুভূতি সমস্ত নির্মলার পক্ষে। সতীত্বের চোখ-ঝলসানো জ্যোতিতে তাহার সব ক্ষুদ্রতা, নীচতা, নূতন নূতন যন্ত্রণার উদ্ভাবনে অসাধারণ দক্ষতা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই অদ্ভুত নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় স্বামী রাধার মাথুর বিরহের এক নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনীর নির্বন্ধাতিশয্যপূর্ণ, অতন্দ্র প্রেমানুসরণ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যই মথুরায় পলায়ন করিয়া বাঁচিয়াছেন। মনে হয় যেন এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল—স্নেহের কঠিন বন্ধন যে কখনও কখনও শ্বাসরোধী হইয়া উঠে তাহার প্রমাণ তিনি রাজলক্ষ্মী-কমললতার ভিন্নধর্মী প্রেমের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত গল্পের আলোচনা হইল, তাহাতে সামাজিক বিদ্রোহের সুর সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। সুতরাং তাঁহার যে বিশেষত্বের জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, যে নূতন সমাজনীতি ও প্রেমের আদর্শ তিনি প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার উদাহরণ ইহাদের মধ্যে ততটা মেলে না। তথাপি ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইহাদের মধ্যে অঙ্কিত নারীচরিত্র। প্রেমের বিশ্লেষণের ন্যায় নারীচরিত্র-সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে নারীজাতির যে একটা অখ্যাত, লজ্জা-সংকোচ-আত্মগোপনের অন্তরালস্থিত স্থান আছে, তাহাই উপন্যাস-ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল হইয়াছে। সমাজেও যেমন, উপন্যাসেও তেমনি, নারীর কর্মক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ; কয়েকটি অতি সুনির্দিষ্ট, অল্প-পরিসর কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যে তাহাদের গতিবিধি, কার্যকলাপ, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত আবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ স্ত্রী চরিত্রের সামান্য কয়েকটি দিক্ মাত্র আমাদের উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। অতি-অভিমান বা প্রেমের অন্ধ আতিশয্যের জন্য স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ বা নীচ স্বার্থপরতার জন্য গৃহবিরোধের সৃষ্টি—মুখ্যতঃ নারী বাংলা-উপন্যাসে এই দুইটি উদ্দেশ্য-সাধনের হেতুরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর অবরোধ-প্রথার জন্য হিন্দুসমাজে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ও

পরিচয়ের পথ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ ছিল; সুতরাং স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব বাংলা উপন্যাসে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি। স্ত্রী-চরিত্রেও যে একটা জটিলতা বা পরস্পরবিরোধী ভাবের একত্রাবস্থান সম্ভব ঔপন্যাসিক তাহা মুখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ ফুটাইতে পারেন নাই। সেইজন্য বঙ্গসাহিত্যে নারীচরিত্রগুলি সাধারণতঃ কতকগুলি সুপরিচিত শ্রেণীর মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক গুণের অপেক্ষা শ্রেণীর বিশেষ গুণগুলিই তাহাদের মধ্যে স্ফুটতর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রগুলির নাম স্মরণ করিলেই এই মন্তব্যের যথার্থতার উপলব্ধি হইবে। তাঁহার ভ্রমর, সূর্যমুখী, প্রফুল্ল, প্রভৃতি মূলতঃ শ্রেণীবিশেষেরই প্রতিনিধি, অবস্থাভেদে স্বামীর প্রতি পতিব্রতা স্ত্রীর মনোভাবের যে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হইতে পারে তাহারই উদাহরণ। ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে সমস্যা তাহা শ্রেণীর সমস্যা হইতে অভিন্ন, কেন-না বাঙালী পরিবারে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবসর নাই বা কিছুদিন পর্যন্ত ছিল না। সমাজ তাহাকে পারিবারিক জীবনে যে বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাই তাহার জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চ; সেই আসনচ্যুত হইলে তাহার আর কিছু বলিবার থাকে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি'তে কমলা, এমন কি বিনোদিনীরও যে সমস্যা তাহা এই সমাজ-দত্ত আসন-খানি আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা হইতেই প্রসূত। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে সুচরিতা, ললিতা ও 'ঘরে বাইরে'র বিমলা-চরিত্রে নারীজীবনে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের প্রথম চেষ্টা হইয়াছে; ইহারা এক নূতন জগতের অধিবাসী, সমাজের সনাতন আসনখানি অধিকার করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ইহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নূতন উদ্দেশ্যের ও আদর্শের প্রেরণা ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে; ইহারা প্রথম আপনাদিগকে সামাজিক কর্তব্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে শিখিতেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্রে এই সমাজনিরপেক্ষ, স্বাধীন জীবনের আরও সুস্পষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে। এমন কি তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতেও, যেখানে সমাজ-বিদ্রোহের সুর সেরূপ তীব্র নয় ও পারিবারিক কর্তব্যপালনই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য, সেখানেও, তাহাদের দৈনিক সমাজনির্দিষ্ট কার্য-গণ্ডির অভ্যন্তরেও তাহাদেরও মধ্যে একটা নূতন সতেজ প্রকাশ-ভঙ্গী, একটা দৃপ্ত, মহিমান্বিত তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে নারীর প্রভাব খুব activ·, এমন কি, aggressive ধরনের। ইহা অন্তরালবর্তিনীর নীরব কর্মনিষ্ঠা নহে—ইহা কেবল পিছনে থাকিয়া সনাতন আদর্শের পথে সংসার-রথকে ঠেলা দেয় না। ইহা নূতন আদর্শের প্রবর্তনের দ্বারা সংসার-যাত্রাকে অভিনব পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে; স্নেহ-প্রেম-ধারাকে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া পারিবারিক জীবনের ভারকেন্দ্রটি সরাইয়া দেয়। বিন্দু, নারায়ণী, বিরাজ-বৌ, শৈলজা, পার্বতী, ললিতা—ইহাদের মধ্যে নারীসুলভ কোমলতা ও স্নেহশীলতার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল বিদ্যুৎরেখার মত একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ দীপ্তি আছে। ইহারা কেবল ঘর সাজাইবার উপকরণ বা মোমের পুতুল নহে, এমন কি নিশ্চেষ্ট নিয়মানুবর্তিতা বা নীরব সহিষ্ণুতাও ইহাদের চরম প্রশংসা নহে। ইহারা যেখানে সমাজের অনুবর্তন করে, সেখানে চোখ বুজিয়া নহে, সেখানেও স্বাধীনচিন্তা ইহাদিগকে অন্ধ গতানুগতিকতা হইতে রক্ষা করে। পার্বতী তাহার বাল্যপ্রেমকে অস্বীকার না করিয়া, ললিতা-শেখরের সঙ্গে তাহার

বরণ করিয়া এই স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছে; তাহাদের সামাজিক আদর্শের অনুবর্তনে কতকটা স্বাধীনতা আছে। বিন্দু, শৈলজা প্রভৃতি একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারের বধূ; কিন্তু পারিবারিক কর্তব্যের নিষ্পেষণে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত হইতে দেয় নাই। নারী-চরিত্রের দৃপ্ত মহিমা তাহাদের প্রত্যেক বাক্য ও কার্য হইতে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের বিদ্রোহ সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নহে, তাহাদের স্নেহ-প্রেমের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে। এইরূপে শরৎসাহিত্যে আমাদের গৃহস্থ পরিবারের নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে।

(৩)

সমাজ-সমালোচনামূলক উপন্যাস

'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ' এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য রকমের প্রণয়-চিত্র আছে, সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের অবতারণা হইয়াছে। সুতরাং এইগুলিকে প্রধানতঃ সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা-হিসাবে বিচার করিতে হইবে। এই সমাজ-সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে নূতন নহে, বরং ইহার সহিত উপন্যাসের উৎপত্তির নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারপ্রবণতার বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ইঙ্গিত বিদ্যমান। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ঔপন্যাসিকদের ইহাই প্রধান উপজীব্য বিষয়। তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমালোচনার বিশেষত্ব কি? রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এই বিষয়ের খুব ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ করেন না, প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক দুর্নীতিগুলির প্রতি কটাক্ষপাত বা অঙ্গুলিসংকেত করেন—ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যালোচনাই তাঁহার প্রধান বিষয়। 'গোরা'তে তিনি সমস্ত সমাজ-ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁহার সমালোচনা যুক্তি-তর্কের স্তর অতিক্রম করিয়া ভাবগভীরতার দিকে অগ্রসর হয় নাই। বিশেষতঃ 'গোরা'তে যে সমস্ত সমাজ-ও-ধর্ম-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, যথা—সাকার-নিরাকার উপাসনা, বা জাতিভেদ, বা আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত শুচিতা-সংরক্ষণ—সেগুলি বিচার-বিতর্কের কথা, ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক নয়। পক্ষান্তরে, শরৎচন্দ্র, যে সমস্ত দুষ্ট-ব্রণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজদেহে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের বিষ সমাজের অস্থিমজ্জায় ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে, সেই সমস্ত দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্নের প্রতি স্বীয় সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাজ-বিধির এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও প্রতিকূলতা আমাদের আধিব্যাধিজর্জর, অভাবদৈন্যপীড়িত সংসারযাত্রাকে কত নিরর্থক দুর্বিষহ করিয়া তোলে, এই সমস্ত সমাজরচিত, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বাধার চারিদিকে কত অশ্রুজল উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পারিবারিক সুখ-শান্তিকে যে ইহারা কিরূপ দুশ্চ্ছেদ্য নাগপাশের বন্ধনে বাঁধিয়াছে—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের সামাজিক জীবনের এই করুণ, গভীর ব্যথাভরা দিক্‌টার প্রতিই সর্বাপেক্ষা বেশি ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের বিবাহ-বিধিগুলি যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি-তর্ক তোলা

যাইতে পারে তাহা লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই; কিন্তু এই বিবাহ-বিধিগুলি বর্তমান অবস্থার কত অনুপযোগী, আমাদের প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনে যে ইহারা কত অস্বাচ্ছন্দ্য, নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক হীনতার হেতু হয় ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। 'পল্লীসমাজ'-এ আচার-নিষ্ঠা ও সমাজ-রক্ষার অজুহাতে যে কতটা ক্রূরতা, নীচ স্বার্থপরতা ও হেয় কাপুরুষতা আমাদের সমর্থন লাভ করিয়াছে, আমাদের জীবন যে কি পরিমাণ পঙ্গু ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছে—ইহাই তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

অন্যান্য লেখকের সহিত তুলনায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই অত্যাচার-কাহিনী আরও করুণরসপ্রধান ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। তাঁহার বিশ্লেষণ যেমন তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্তলক্ষ্য, তাঁহার করুণরস সঞ্চার করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে অসাধারণ। সাধারণ ঔপন্যাসিক এই অত্যাচার কেবল একটা বহিঃশক্তির পীড়নরূপেই চিত্রিত করিয়া থাকেন—তাহাদের অত্যাচার-বর্ণনাতে প্রায়ই একটা আতিশয্য-দোষ, অতিরঞ্জন-প্রবর্তনা লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে সর্বত্রই একটা মিতভাষিতা ও কলাসংযম পরিস্ফুট। তিনি জানেন যে, সামাজিক উৎপীড়নের তীক্ষ্ণতম খোঁচা আসে বাহির হইতে নয়, নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তি বা সাধারণতঃ স্নেহশীল অভিভাবকের নিকট হইতে। 'অরক্ষণীয়া'তে' (১৯১৬) জ্ঞানদার অপমান অসহনীয়তার চরম সীমায় পৌঁছায় তখনই, যখন তাহার স্নেহশীল মাতা পর্যন্ত ভ্রান্ত ধর্মসংস্কারের নিকট নিজ স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ বিসর্জন দিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎপীড়নের কেন্দ্রস্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সমাজের ক্রূরতম নির্যাতন সেইখানে যেখানে তাহার বিষাক্ত প্রভাবে মাতৃস্নেহ পর্যন্ত নিষ্ঠুর জিঘাংসাতে রূপান্তরিত হয়। স্বর্ণমঞ্জরীর অবিশ্রান্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সে কোনও রকমে সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু নরকভয়-ভীত দুর্গামণির কঠিন অনুযোগ ও কঠিন-তর পদাঘাত ধৈর্যের বন্ধনকে নিঃশেষে ছিন্ন করে। সর্বাপেক্ষা সহনাতীত অপমান আসিয়াছে জ্ঞানদার নিজের হাত হইতে—বিবাহের পণ্যশালায় নিজেকে বিকাইবার জন্য তাহার স্বহস্ত-রচিত ব্যর্থ সজ্জানুষ্ঠানই তাহার নারীত্বের হীনতম লাঞ্ছনা। এই চরম লজ্জার সহিত তুলনায় অতুলের প্রত্যাখ্যান ও কৃতঘ্নতা একটা অতিসাধারণ, উপেক্ষণীয় অপমান বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার শেষ পরিচ্ছেদে জ্ঞানদার মাতৃশ্মশানে তাহার সহিত অতুলের একটা পুনর্মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু এই নিতান্ত ব্যর্থ প্রয়াস অপমানেরই একটা প্রকারভেদ বলিয়া আমাদের বুকে গিয়া আঘাত করে। এই দুর্ভাগিনী মেয়েটার এমনই অদৃষ্ট যে, তাহার সৃষ্টিকর্তাও সহানুভূতির ছদ্মবেশে তাহার বক্ষে আর একটা সুদুঃসহ অপমানের শেলাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) গল্পে এই অসহনীয় তীব্রতা নাই। কৌলীন্য-প্রথার কুফল ও কৌলীন্য-গর্বের অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতা ইহার আলোচ্য বিষয়। এই ব্যাধির জীবাণু আমাদের সমাজদেহে আর সেরূপ সজীব ও ক্রিয়াশীল নাই, ইহা এখন একটা অতীতের স্মৃতি মাত্র। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-নিবারণ-বিষয়ক পুস্তিকা-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই মুমূর্ষু রাক্ষসের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র লেখককে ডন্ কুইক্সোটের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তখন যে মুমূর্ষু ছিল, এখন সে নিশ্চয়ই মৃত। সুতরাং কৌলীন্য-প্রথার উপর শরৎচন্দ্রের আক্রমণকে নিতান্তই মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। অতএব এই উপন্যাসে আলোচিত সমস্যা আমা-

দিগকে সেরূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে না। অরুণ ও সন্ধ্যার প্রেমও ম্লান ও বর্ণবিরল হইয়াছে। তবে উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলি—রাসু বামনী, গোলক চাটুয্যে, জগদ্ধাত্রী ও প্রিয় মুখুজ্যে—বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমাজ-সমালোচনার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ'-এরই (১৯১৬) নিঃসন্দেহ প্রাধান্য। এই উপন্যাসে কোন একটি বিশেষ সামাজিক কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষপাত হয় নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রকৃত আদর্শ ও মনোভাবের, ইহার সমগ্র জীবনযাত্রার একটা নিখুঁত প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কনের বাস্তবতায়, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় ও সহানুভূতির গাঢ়তায় ইহা অনুরূপ বিষয়ের সমস্ত উপন্যাস হইতে বহু উচ্চে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলির সনাতনত্বের ও উৎকর্ষের বড়াই করি; শরৎচন্দ্র নির্মম বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, আমাদের গর্বের এই প্রথাগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কোন্ সর্বনাশের রসাতলে লইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিদেশী সমালোচকের অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিদ্রূপ বা সস্তা মুরুব্বিয়ানা নাই, আছে অভ্রান্ত বিশ্লেষণ ও গভীর আত্মগ্লানি। সামাজিক দলাদলির চিত্র-গুলিতে লেখক যে অপরিসীম নীচতা, কাপুরুষতা ও কৃতঘ্নতার দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সমাজ-জীবনের মূল নৈতিক আদর্শগুলি-সম্বন্ধেই গভীর সন্দেহ জাগিয়া উঠে। এই সমস্ত মূলগত আদর্শও নিন্দনীয় ছিল না—ইহারা পশ্চিমের ব্যক্তিসর্বস্ব আত্মস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা উচ্চতর-পর্যায়ভুক্ত; সমস্ত গ্রামের সুখ দুঃখ, আচার-ব্যবহার, কর্ম-অবসরকে একটা সাধারণ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া কেবল অর্থমর্যাদার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া মদোদ্ধত ধনগর্বের উপর সমাজ-শাসনের প্রভুত্ব জারি করা, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যেই একটা স্নেহ-ভক্তি-আত্মীয়তার স্বর্ণসূত্র রচনা কবা,—বোধ হয় ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক আদর্শ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই অত্যন্ত সুচিন্তিত পাকা ব্যবস্থার মধ্যে একটা ছিদ্র রহিয়া গিয়াছিল—ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুচিত সংকোচ ও উচ্চবর্ণের উপর নিম্নবর্ণের একান্ত দ্বিধালেশহীন নির্ভর। যখন কালক্রমে আমাদের সুস্থ, সতেজ ধর্মজ্ঞান ও সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি বিকৃত ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, তখন এই রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়া আমাদের সমস্ত সামাজিক জীবনকে ক্লিষ্ট ও ব্যাধিজর্জর করিয়া তুলিল। তখন সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রত্যেক অনুষ্ঠানটিই অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার, নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি ও হৃদয়হীন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, এই গ্লানিকর পরাধীনতার বিষ আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া আমাদের বিচারবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞানকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারই ফলে আমরা আমাদের উপচিকীর্ষার পর্যন্ত গুণগ্রহণ করিতে ভুলিয়া গেলাম, আমাদের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি গিয়া পড়িল সেই সনাতন অত্যাচারীদের চরণপ্রান্তে, আর উপকারের প্রতিদান হইল চরম কৃতঘ্নতা। এই হেয়তম মনোবৃত্তির ফলে বেণী ও গোবিন্দ সমাজপতি আর রমেশ একঘরে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর কৃতিত্ব এই যে, তিনি কয়েকটিমাত্র সুনির্বাচিত দৃশ্যের সাহায্যে এই জঘন্য মনোবৃত্তির উচিত প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একটা প্রবল ঘৃণা ও ধিক্কারবোধ জাগাইয়া দিয়াছেন। বিদেশী ও বিধর্মীর অবিশ্রান্ত আক্রমণ যে পুঞ্জীভূত ঔদাসীন্য ও

জড়তার গণ্ডারচর্ম স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে-নাই, এই প্রতিভাশালী স্বজাতীয় লেখকের হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটিমাত্র তীর তাহার ঠিক মর্মস্থলে ভেদ করিয়াছে।

'পল্লীসমাজ'-এ (১৯১৬) খাঁটি সমাজ-সমালোচনা ছাড়া আর যে বিষয় আছে তাহার কেন্দ্র বিশ্বেশ্বরী জ্যাঠাইমা ও রমা। নিছক বিশ্লেষণ ও সমালোচনা দ্বারা একটা তীব্রতা আসে বটে কিন্তু প্রকৃত ভাবগভীরতা লাভ করা যায় না। 'পল্লীসমাজ'-এ যে সামাজিক আদর্শের বিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহার সুস্থ সতেজ ভাবের প্রতীক বিশ্বেশ্বরী। তিনি একদিকে রমেশ ও এই পঙ্গু, নির্জীব ও ব্যাধিগ্রস্ত পল্লীসমাজের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে, রমেশের উচ্চভাবপ্রধান আদর্শের সঙ্গে পল্লীজীবনের বাস্তব অবস্থার একটা সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজের লোকদের দীন অসহায় ভাব ও আত্মঘাতী মূঢ়তার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া জ্যাঠাইমা রমেশের মনে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবর্তে একটা অনুকম্পার ভাব জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই এবং এই মধ্যস্থতার জন্য তাঁহার চরিত্রটি অনেকটা অবাস্তবতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে অনেক গভীর সহানুভূতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহাদের উৎসমুখ যে কোথায় তাহার সন্ধান পাই না। পল্লীজীবনে তাঁহার উদারতা ও স্নেহশীল, ক্ষমাপরায়ণ হৃদয়ের কোন প্রভাবও লক্ষ্য হয় না। নিজের ছেলে বেণীকে ত তিনি একটুও প্রভাবিত করিতে পারেন নাই, এমন কি যাহার সঙ্গে তাঁহার একটু সত্যকার স্নেহের সম্পর্ক ছিল ও যাহার শ্রদ্ধাভক্তির উপর তাঁহার একটু সত্যকার দাবি ছিল সেই রমাকে পর্যন্ত প্রকৃত কার্য-ক্ষেত্রে তিনি একটুমাত্রও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। রমেশের গৃহে শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার অতর্কিত প্রকাশ্য আবির্ভাবের পরই তিনি আবার গৃহকোণের নীরবতার মধ্যে আত্মগোপন করিলেন; কেবল রমেশ ও রমার সহিত মাঝে মাঝে কথোপকথন ও সস্নেহ উপদেশদান ছাড়া আর তাঁহার কর্মজীবনের কোন নিদর্শন রহিল না। তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি ও তীক্ষ্ম অন্ত-র্দৃষ্টির সহিত এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টতার ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে 'গোরা'র আনন্দময়ীর সাদৃশ্য খুব সুস্পষ্ট। কিন্তু আনন্দময়ীর উদারতার ও লৌকিক আচারলঙ্ঘনের যেমন সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ হইয়াছে বিশ্বেশ্বরীর ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু মিলে না।

কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুরধিগম্য তাহা রমেশ ও রমার পরস্পর সম্পর্ক লইয়া। তাহাদের মধ্যে যে প্রকাশ্য সামাজিক ও বৈষয়িক দ্বন্দ্ব, তাহাকে অতিক্রম করিয়া একটি অন্তর্গূঢ়, প্রাণপণ চেষ্টায় নিরুদ্ধগতি, প্রেমের আকর্ষণলীলা বিপরীত স্রোতে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ খুব অভিনব। ইহা প্রেমাস্পদকে কঠিন আঘাত করিতে এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জেলে পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের পরই একটা প্রবলতর প্রতিঘাত, একটা তীব্র অনুশোচনা ইহার গোপন অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। যাহা হয়ত মূলতঃ বিবেকের দংশন বা চরিত্রগৌরবের প্রাপ্য মুগ্ধ প্রশংসা, তাহারই ভিতর দিয়া প্রেম নিজ তীব্রতর গরল ও প্রবলতর জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিয়াছে। রমেশের বিপক্ষতাচরণ করিতে রমার ইতস্ততঃ ভাব, তাহার প্রতি সস্নেহ অনুযোগ বা হিতকামনার সতর্কবাণী—ইহাদের পশ্চাতে ছদ্মবেশী প্রেমের ত্রস্ত, গোপন পদক্ষেপ শুনা যায়। কেবল একবার মাত্র তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে একটি রাত্রির সেবা-যত্নের মধ্য দিয়া অর্ধচেতন প্রেম নিজের সহজ

নিক্রমণপথ রচনা করিয়া লইয়াছিল। অপ্রকাশিত প্রেমের ক্ষীণ আভাস স্থূল স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে সূক্ষ্ম রসানুভূতির সঞ্চার করিয়াছে, বহির্দ্বন্দ্বের কাহিনীর উপর আন্তর্বিক্ষোভের করুণ অর্থ-গৌরব আনিয়া দিয়াছে। বিষয়টির এই রূপান্তর-সাধনই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

(৪)

পূর্বরাগপুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম

'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অনেকটা ভিন্নজাতীয়। নিজ বিবাহিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর সংস্পর্শে, অত্যাচারী, লম্পট, পাপপুণ্যজ্ঞানহীন জমিদার জীবানন্দের অভূতপূর্ব পরিবর্তন এই উপন্যাসটির মূল বিষয়। দারুণ কুক্রিয়াসক্ত, পাপপঙ্কে আকণ্ঠ-নিমগ্ন জীবানন্দের অন্তরে যে প্রণয়প্রবৃত্তি ও ভদ্রজীবন-যাপনের স্পৃহা সুপ্ত ছিল তাহা ষোড়শী-সংসর্গের মায়াদণ্ডস্পর্শে অকস্মাৎ নবজীবন লাভ করিয়া ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর চরিত্রগৌরবের অসাধারণত্ব বুঝাইবার জন্য লেখক দেবীমন্দিরের ভৈরবীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বিশেষ ধর্মসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই ভৈরবীদের বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মনিগ্রহের অন্তরালে একটা কুৎসিত ভোগলালসার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় প্রকাশ্য-ভাবেই অভিনীত, ইহা, ভৈরবী-জীবনের একটা বিশেষত্ব। এই কদাচার শাস্ত্রবিধি অনুসারে গর্হিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকে—ইহাদের চরিত্রভ্রংশ একটা অবশ্যম্ভাবী অপরাধের ন্যায় একটু বিদ্রূপ-মিশ্রিত উপেক্ষার চক্ষেই সকলে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই উপেক্ষিত অপরাধ হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত গুরুত্ব লাভ করে ও আমাদের সামাজিক দলাদলির আগুন জ্বালাইতে ইন্ধনের কাজ করে। এখানে ষোড়শী সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তাহার কল্পিত অপরাধের দণ্ড প্রদান করিতে আমাদের সমাজপতিরা হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহার দেবীর সেবাইত-পদের জন্য অযোগ্যতার বিষয়ে তাঁহাদের সুপ্ত বিবেকবুদ্ধি হঠাৎ অতিমাত্রায় জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ যখন এই ধর্মানুষ্ঠানের পুরস্কার, মন্দিরের সম্পত্তি ও দেবীর বহুকাল-সঞ্চিত অলংকারাদির সদ্যঃ-লাভ। ধর্মজ্ঞানের পশ্চাতে যখন বিষয়স্পৃহা ঠেলা দেয় তখন তাহার বেগ অনিবার্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই ধর্মপ্রাণ সমাজের সমস্ত সম্মিলিত শক্তি যে অতি নির্মমভাবে একটি অসহায়া রমণীর উপর গিয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ষোড়শীর চরিত্রের প্রকৃত গৌরব এই যে, পাপপথে পদার্পণের জন্য পূর্ববর্তিনীদের নজির ও সমাজের প্রায় অবাধ সনন্দ দেওয়া থাকিলেও তাহার সহজ ধর্মবুদ্ধি তাহাকে সেই সনাতন পথে পা বাড়াইতে দেয় নাই।

তাহার পর মন্দিরের সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া ও পূজাসংক্রান্ত কার্যে সর্বদা পুরুষের সহিত সংস্রবের প্রয়োজন থাকায় ষোড়শীর চরিত্রে অনেক পুরুষোচিত গুণের বিকাশ হইয়াছে—বিপদে স্থিরবুদ্ধি, অচঞ্চল সাহস ও একান্ত আত্মনির্ভরশীল একটা দুর্ভেদ্য নিঃসঙ্গতার সহিত রমণীসুলভ কোমলতা মিশিয়া তাহার চরিত্রকে অপূর্ব মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অপূর্ব চরিত্রই জীবানন্দকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিয়া তাহার পাষাণ প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে ও তাহাকে প্রথম প্রণয়ের স্বাদ দিয়াছে। জীবানন্দের অসংকোচ পাপানুষ্ঠানের মধ্যে অন্ততঃ লুকোচুরির হীন কাপুরুষতা ছিল না, এবং এই সত্যভাষণের

পৌরুষ ও কপটাচারের প্রতি অবজ্ঞাই তাহার চরিত্রে মহত্ত্বের বীজ; প্রেমের স্পর্শে ইহা একটি অকপট অনুতাপ ও সংশোধনের দৃঢ় সংকল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। তাহার মনে প্রেমের অলক্ষিত সঞ্চার, তাহার পক্ষে একান্ত অভিনব দ্বিধা-সঙ্কোচ-জড়িত অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজপতিদের চরিত্রও অল্প কয়েকটি কথায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে নির্মল-হৈমবতীর আখ্যান মূল গল্পের সহিত নিবিড় ঐক্য লাভ করে নাই। ফকির সাহেবেরও উপন্যাসে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। তিনি বাস্তবতাপ্রধান যুগে আদর্শবাদপ্রিয়তার শেষ চিহ্নস্বরূপই প্রতীয়মান হন। ভৈরবী-জীবনের লৌকিক আচার-ব্যবহারগত বিশেষত্বই এই উপন্যাসের বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে এবং এই ভিত্তির উপরই শরৎচন্দ্র ষোড়শী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নির্মল ও হৈমর দাম্পত্য জীবনের দৃষ্টান্ত ষোড়শীর মনে সংসার বাঁধিবার বাসনাকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির হেতুস্বরূপ হইয়াছে এবং উপন্যাসমধ্যে এই খণ্ড-কাহিনীর প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই—এইরূপ অভিমত অনেক সমালোচক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। হয়ত ষোড়শী যখন নবোন্মেষিত স্বামিপ্রেমে কিছুটা উন্মনা ও চলচ্চিত্ত হইয়া পড়িয়াছে, যখন তাহার ভৈরবী জীবনের আদর্শ ও সংস্কার এই প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে কতকটা শিথিল হইয়াছে মনের সেই দোদুল অবস্থায় হৈমর দাম্পত্য জীবনের নিরুদ্বেগ সুখ-শান্তি তাহাকে খানিকটা স্পর্শ করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ সমাজের সম্মিলিত বিরুদ্ধতার মধ্যে একমাত্র হৈমর হিতৈষণা ও সমবেদনা তাহাকে হৈমর জীবনাদর্শের প্রতি কতকটা আকৃষ্ট করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সমস্ত বিষয়টি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে এই অভিমতকে যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, ষোড়শীর চিত্তে স্বামিপ্রেম-সঞ্চার হৈমর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ষোড়শীর স্বচ্ছদৃষ্টির ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির নিকট হৈমর তথাকথিত দাম্পত্য-প্রেম-সৌভাগ্যের অন্তঃসারশূন্যতা গোপন থাকে নাই। যে নির্মল তাহার প্রণয়ের লোভে ঘন ঘন তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর খোঁজে, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রচুর আশ্বাসের বারিসেকে তাহার মনে প্রণয়ের বীজটি অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে চাহে, হৈমকে ফাঁকি দিয়া যে রঙীন আবেশটিকে ঘনীভূত করার স্বপ্ন দেখে সেই নির্মলকে অংশীদাররূপে লইয়া যে প্রেমের কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বাহিরের বিজ্ঞাপনের চটক সত্ত্বেও অন্তরে যে তাহা দেউলিয়া এ সত্য ষোড়শীর নিকট নিশ্চয় দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং হৈম-নির্মলের দাম্পত্য-জীবনে যে ষোড়শীর লোভ করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তৃতীয়তঃ, ষোড়শীর আত্ম-নির্ভরশীল, বলিষ্ঠ প্রকৃতির উপর অপরের জীবনের প্রভাব যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে ইহাও সম্ভব মনে হয় না। বহুকালবিস্মৃত প্রথম কৈশোরের মুগ্ধ প্রণয়াবেশের স্মারক অলকা নামটি যে তাহার দীর্ঘদিনরুদ্ধ প্রেমের কপাটটিকে যেন মন্ত্রবলে উন্মুক্ত করিয়াছে ইহাও তাহার অনন্য-নির্ভর স্বাধীনচিত্ততারই নিদর্শন। এই নামমাধুর্যের অসাধ্যসাধনের কৃতিত্ব পরের নিকট ধারকরা প্রভাবের সাহায্য গ্রহণের দ্বারা নিশ্চয়ই খণ্ডিত ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাছাড়া, উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস আলোচনা করিলেও ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হৈমর প্রতি এতটা গুরুত্ব-আরোপ লেখকের অভিপ্রেত ছিল না—উহাকে উপন্যাসের একটি প্রধান নিয়ামক-

শক্তিরূপে লেখক কল্পনা করেন নাই। হৈমর দৃষ্টান্তে যদি ষোড়শীর সংসার পাতিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে ফকির সাহেবের প্রভাবে তাহার মনে বৈরাগ্যের প্রেরণা প্রবলতর হইয়াছে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহার ভৈরবীত্বই তাহার বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষার মূল উৎস। আসল কথা, হৈমর দাম্পত্য-প্রেম ও ফকির সাহেবের সেবাধর্ম ও সংসার-বন্ধন-হীন নির্লিপ্ততা এই দুই একই পর্যায়ের প্রভাব; ইহা হয়ত বাহির হইতে ষোড়শীর অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত জীবনের দুই বিপরীতমুখী আবেগকে কতকটা সমর্থন করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রেরণার মূল রহস্যের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। যাহার অন্তরে ধ্রুবতারার অনির্বাণ জ্যোতি, তাহাকে পথিপার্শ্বস্থ গৃহপ্রদীপ যাত্রাপথে খানিকটা আলোক বিকিরণ করিতে পারে, কিন্তু ইহা তাহার পথনির্দেশের গৌরব দাবি করিতে পারে না।

'দত্তা' উপন্যাসখানি (১৯১৮) সহজ ও নির্দোষ প্রেমের সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র। ইহার মধ্যে খুব জটিল বিশ্লেষণ বা কোনরূপ কলুষ-আবিলতার স্পর্শ নাই অথচ নরেন-বিজয়ার ভালবাসাটি খুব স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, একদিকে সরল হাস্য-কৌতুক ও অন্যদিকে শিশু-সুলভ ক্রোধ, অভিমান ও বিস্ময়বিমূঢ়তার অন্তরালে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসে স্বতঃস্ফূর্ত, অপ্রতিরোধনীয় প্রেম ও অঙ্গীকার-বদ্ধ কর্তব্য-পালন বা প্রতিশ্রুতিরক্ষার পার্থক্য-প্রদর্শনই প্রধান বিষয়। বিলাস ও বিজয়ার মধ্যে যে বিশেষ বন্ধন তাহার মূলসূত্র অনুসন্ধান করিতে গেলে উপন্যাসের পূর্ববর্তী উপাখ্যান আলোচনা করিতে হইবে। জগদীশ, রাসবিহারী ও বনমালীর বাল্যপ্রণয়ই বিলাসের বিশেষ দাবি-দাওয়ার মূল কারণ। বনমালী রাসবিহারীর পুত্র বিলাসের সহিত তাঁহার কন্যা বিজয়ার বিবাহ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস রাসবিহারী বিজয়ার মনে বদ্ধমূল করিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছে, এবং বিজয়াও পিতার এই প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহাই বনমালীর মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগদীশের পুত্র নরেনের জন্মদিনে তাহার সহিত নিজ অজাতা কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব করেন, নরেনকে নিজ খরচে বিলাত পাঠান ও তাহাকেই যে শেষ পর্যন্ত জামাতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন তাহার অকাট্য লিখিত প্রমাণ নরেন নিজ বিক্রীত বাড়ির কাগজপত্রের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে। রাসবিহারী তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততার সহিত সর্বপ্রথমে বিজয়া ও নরেনকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, ও নরেনের সম্বন্ধে তাহার বন্ধুর আন্তরিক ইচ্ছাকে বিজয়ার নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বিজয়ার সম্পত্তির উপর একটা কড়া অভিভাবকত্বের অধিকার দখল করিয়া বসিয়াছে। নরেনের বিরুদ্ধে বিজয়ার মনে একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বিজয়া ধীরে ধীরে তাহার উদার, ক্ষমাশীল, শিশুর ন্যায় সরল ও অসহায় প্রকৃতির প্রতি অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিতাপুত্রের নরেনের প্রতি অন্যায় ও ক্ষমালেশহীন বিরুদ্ধাচরণের দ্বারাই বিজয়ার সমবেদনা নিবিড়তা লাভ করিয়া প্রণয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ঘোরফের লইয়া প্রেম অনেকটা পরিণতি লাভ করিয়াছে—ইহার দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাতে প্রণয়ের বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরেনের প্রতি ব্যবহারের জন্যই বিজয়া তাহার ভবিষ্যৎ শ্বশুর ও স্বামীর প্রকৃত চরিত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, ও তাহাদের

অত্যাচার ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তাহার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি কেবল লোকলজ্জার খাতিরে ও অনুক্ষণ সংঘাতে পরিশ্রান্ত হইয়াই সে মনের ইচ্ছার অপেক্ষা মুখের কথাটাকেই প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত ছিল—শেষ মুহূর্তে নলিনীর আগ্রহাতিশয্যে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া অস্বীকৃত প্রেমেরই জয় হইল।

এই গ্রন্থমধ্যে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর চরিত্র-সৃষ্টি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। ভণ্ডামির চিত্রে রাসবিহারীর স্থান সহজেই শীর্ষস্থানীয়। ধর্মপরায়ণতার আবরণে প্রচণ্ড স্বার্থপরতা, শান্ত, স্নেহশীল কথাবার্তার অন্তরালে ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ও অবিচলিত সংকল্প তাহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ সজীবতা আনিয়াছে। বিলাসের ক্রোধোন্মত্ত অধৈর্য ও ইতর আস্ফালনকে সে বরাবরই প্রণয়ীসুলভ অভিমান বলিয়া লুকাইতে, পুত্রের সমস্ত অপরাধকে অনুকূল ব্যাখ্যা দ্বারা লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার ধৈর্য, আত্মসংযম, কার্যসিদ্ধির জন্য নূতন নূতন উদ্ভাবন-কৌশল—বিজয়ার বিদ্রোহকে ব্যর্থ করিবার জন্য অব্যর্থ পাকা চাল—সমস্তই আমাদের ভূয়সী প্রশংসার উদ্রেক করে। বিলাসের ইতর অসহিষ্ণুতা, ক্রোধদমনে একান্ত অক্ষমতা—তাহার সমস্ত বাহ্য ভদ্রতা ও চাকচিক্যের আবরণ ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। বিজয়ার ইচ্ছার উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া সে তাহার বাবার সুকল্পিত উদ্দেশ্য সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল। হিতৈষী পিতার সতর্কবাণী ও নিজের ঠাণ্ডা মেজাজের উপদেশ কিছুই তাহার অসংযমকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তথাপি পিতা অপেক্ষা পুত্রের নৈতিক আদর্শ অধিকতর উচ্চ—বিজয়ার ধনের প্রতি তাহার লোভ থাকিতে পারে, কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রণয়ের অঙ্কুরও তাহার মধ্যে ছিল। বিজয়ার প্রত্যাখ্যানের আসন্ন সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত চরিত্র-গৌরব বাহির হইয়া আসিয়াছে, একটা স্তব্ধ-গম্ভীর, বিষণ্ণ পৌরুষ তাহার চরিত্রের ইতরতাকে আচ্ছাদন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য শেষ পরাজয়ের দৃশ্যে তাহার জন্য আমাদের একটা সহানুভূতি-মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস পড়ে; পরাজয়ের গ্লানি পিতার মত তাহার সর্বশরীরে এত গাঢ় কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া দেয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার অনুমোদিত, আমাদের সহজ নীতিজ্ঞান-সমর্থিত প্রেমের চিত্র শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পাওয়া যায়—ইহাদের মধ্যে 'দত্তা'র স্থান নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৫)

নিষিদ্ধ সমাজ-বিরোধী প্রেম

এইবার নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের চিত্র যে উপন্যাসগুলিতে বেশ বিস্তৃত ও ব্যাপক-ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের রচনার সহিত যে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহার 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', ও 'শ্রীকান্ত'ই মুখ্যত: দায়ী। এই তিনটি উপন্যাসে অবৈধ প্রেমের প্রতি লেখকের মনোভাব প্রায় একরূপই। সাধারণত: এই শ্রেণীর ভালবাসার উপর যেরূপ নির্বিচারে নিন্দা-গঞ্জনা বর্ষিত হয় সেই কঠোর ধর্মনীতিমূলক মনোভাবের সহিত লেখকের কোন সহানুভূতি নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সহজ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়ান্যায়বোধের আমরা কোন ব্যবহারই করি না—এই সমাজবিধি-উল্লঙ্ঘনের মূলে কোন্ মনোবৃত্তি আছে তাহা গণনার মধ্যেই আনি

না—কেবল চক্ষু মুদিয়া সনাতন, চিরপ্রথাগত দণ্ডবিধির ধারা প্রয়োগ করি মাত্র। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এই মূঢ় অন্ধতা ও জড়, অচেতন সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের সংসারযাত্রার পথে অপ্রতিবিধেয় কারণে নরনারীর মধ্যে এমন বিচিত্র জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যাহার বিচার করিতে আমাদের সমস্ত তীক্ষ্ণ, অকুণ্ঠিত ধর্মবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়—যাহাকে সোজাসুজি ব্যভিচারের পর্যায়ে ফেলিয়া মনুসংহিতার বিধির মধ্যে বিধান খুঁজিলে চলে না। এই প্রকার যান্ত্রিক বিচারে ধর্মের প্রকৃত মর্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। ধর্মরক্ষা ও অধর্মের প্রতিকারই শাস্ত্রনির্দিষ্ট দণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, সুতরাং দণ্ডবিধানের দ্বারা যদি আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, সমাজ-নৈতিক উন্নতির পথে না গিয়া অধোগতির দিকেই যদি অগ্রসব হয়, সমাজনেতারা অপরাধীর প্রকৃত সংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত না হইয়া যদি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি বা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার উপায় খোঁজেন, তবে দণ্ডবিধির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। যদি এই দণ্ডবিধানের দ্বাবা আমাদের উচ্চতর গুণগুলি—মনুষ্যত্ব, ন্যায়পরতা, দয়া, সমবেদনা প্রভৃতি—নিষ্পেষিত হয় ও ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি-গুলি মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্ত দণ্ডবিধির ও বিচারনীতির আমূল সংস্কারই অবশ্যকর্তব্য। শরৎচন্দ্র, কি বিশেষ অবস্থার মধ্যে তাঁহার পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহা খুব নিপুণভাবে বিবৃত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঠকের স্বাধীন বিচারের প্রার্থনা করেন। তাহাদেব অপরাধটাই তাহাদের সম্বন্ধে একমাত্র আলোচ্য বিষয় মনে না করিয়া তাহাদের চরিত্রের অন্যান্য দিক্ দেখাইয়া মোটের উপর তাহারা নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয়, এই বিষয়ে পাঠকের অভিমত স্থির করিতে বলেন। তাঁহার অচলা, সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী এবং বোধহয় কিরণময়ীও জন্ম-অপরাধী নহে, পাপের প্রতি একটা প্রবল ও অনিবার্য প্রবণতা তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া নাই। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী সতীত্ব-ধর্মের মূল্য সম্বন্ধে এত সচেতন যে, তাহারা প্রথম বয়সের পদস্খলনের জন্য আজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখিয়াছে। অচলা অবস্থার প্রতিকূলতা ও বাহ্য আত্মসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য সুরেশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু সুরেশের প্রতি তাহার মন কোন দিনই অনুরাগরঞ্জিত হয় নাই। অভয়া নির্ভীকচিত্তে সতীত্বকে একটা আপেক্ষিক ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ও অবস্থা-বিশেষে তাহা যে অত্যাজ্য নহে তাহা নিজ ব্যবহারে প্রমাণ করিয়াছে; কিন্তু তাহারও সতীত্বের প্রতি নিষ্ঠার অভাব ছিল না, এবং সে যতদিন সম্ভব সতীত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। একমাত্র কিরণময়ীরই সতীত্বের প্রতি একটা প্রকৃত, নৈসর্গিক-আকর্ষণ ছিল না বলিয়া মনে হয়—প্রেমবর্জিত নিষ্ঠাকে সে বিশেষ মূল্য দিতে কখনই রাজি হয় নাই। সুতরাং প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত যে কেবল অসতীত্বের সমর্থনের সাধারণ উদ্দেশ্যে অবতারিত হইয়াছে তাহা নহে; প্রত্যেকটিরই একটা অবস্থাঘটিত বিশেষত্ব আছে এবং ইহারই উপর লেখক জোর দিয়া পাঠকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই তিনটি উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই জাতীয় কয়েকটি ছোট গল্পে শরৎচন্দ্র তাঁহার ক্ষেত্র কিভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব।

'আঁধারে আলো' গল্পটিতে লেখক একজন সংসারানভিজ্ঞ তরুণ যুবক কেমন করিয়া এক পতিতা নারীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিজলী এই তরুণকে লইয়া কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি ছলাকলা বিস্তার করে ও শেষে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া তাহার নির্বুদ্ধিতার প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ করে। বিজলীর মনে কোন কঠিন আঘাত দিবার ইচ্ছা ছিল না; সত্যেনের প্রতি তাহার সমস্ত আচরণই স্নেহকৌতুকমণ্ডিত। কিন্তু সত্যেনের সুপ্ত চরিত্রগৌরব এই আঘাতে জাগিয়া উঠিল ও সে এক অকপট মর্যাদাময় স্বীকারোক্তির পরে তাহার ভ্রম সংশোধন করিল। সে বাড়ি ফিরিয়া বিবাহ করিল এবং বিজলীকে পাল্টা আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশনে তাহাকে নাচ-গানের বায়না দিল। কিন্তু একই আঘাতে সত্যেন্দ্র ও বিজলী উভয়েরই পুনর্জন্ম হইয়াছে। বিজলী সত্যেনের দৃঢ় চরিত্রগৌরবে মুগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া নিজ ঘৃণিত বৃত্তিকে পরিহার করিয়াছে ও সত্যেনের ধ্যানে আত্মমগ্ন হইয়াছে। সত্যেনের বাড়িতে তাহার স্ত্রীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে ও সে তাহাকে দিদি সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছে। সত্যেনের নির্মল দাম্পত্য প্রেম এই কলুষিত উৎস হইতে সঞ্জাত। বিষ হইতেই অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে; বিষের জ্বালা বিজলী ভোগ করিয়াছে, কিন্তু অমৃতের আস্বাদনে সত্যেন্দ্র-পত্নীর জীবন ধন্য হইয়াছে। এইরূপে জীবনে যে কত অভাবিত সংযোগ ঘটে, কার্যকারণের কত বিচিত্র শৃঙ্খল রচিত হয়, পাপ-পুণ্যের কত আশ্চর্য মিলন সাধিত হয়, শরৎচন্দ্র এই ছোট গল্পে তাহার রহস্যের উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

'বিলাসী' (১৯২০) অসামাজিক প্রেমের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের আর একটি প্রচেষ্টা। ইহাতে যে অসবর্ণ বিবাহের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা নিছক পল্লীজীবনের প্রতিবেশ-উদ্ভূত। ব্রাহ্মণ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয় বেদের মেয়ে বিলাসীর সহিত দাম্পত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে। এই মিলনে কোন রোমান্সের অসাধারণত্ব বা হৃদয়াবেগের অসংবরণীয়তা নাই। ইহা সাংসারিক প্রয়োজনের পরিণতি, রোগশয্যার পার্শ্বে অনুষ্ঠিত সেবাধর্মের স্থায়ী মিলনে রূপান্তর। পল্লীসমাজের ক্ষুদ্র দম্ভ ও আত্যভিমানের পটভূমিকায় লেখক ইহার আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের সাংঘাতিক অসুখের সময় এই অন্ত্যজজাতীয়া নারী নিরলস সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাহার অন্তর জয় করে ও উহার উপর একটা স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথাবিড়ম্বিত হিন্দু-সমাজ এই স্বোপার্জিত প্রণয়াধিকারের কোন মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত নহে। কেননা উহার প্রণয়োন্মেষ কোন দুরূহ সাধনার উপর নির্ভর করে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে অভিভাবক-দত্ত, বিবাহ-বাজারে কেনা উপহার ও দৈবলব্ধ সম্পদ। কাজেই বিলাসীর অন্তরজয়ের ইতিহাস সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও মূল্যহীন। সমাজ বাড়ি চড়াও করিয়া একটা অসহায়া মেয়েকে মারিতে পারে—অবশ্য এই আক্রমণের পূর্বে তাহার রক্ষকের দরজায় শিকলি আঁটিয়া দিয়া নিজের শৌর্যপ্রকাশের অবাধ লীলাক্ষেত্র রচনা করিতে তাহার সতর্কতার ত্রুটি নাই। আর মৃত্যুঞ্জয় যখন সাপের কামড়ে মারা গেল ও এই হীনবর্ণের স্ত্রীলোকটা সপ্তাহ মধ্যে তাহার অনুসমন করিল, তখন সমাজনেতারা ইহার মধ্যে পাপের অবশ্যম্ভাবী দণ্ডবিধানের নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া সমাজনীতির জয়গানে

মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পটির মধ্যে লেখকের সূক্ষ্ম সমাজ-সমালোচনা ও ব্যঙ্গরস, অথচ করুণার্দ্র মন্তব্য প্রকাশের উপভোগ্য পরিচয় মিলে। এই সমালোচনার বিশেষ উৎকর্ষ এই যে, ইহা কোন বহিরাগতের উচ্চতর জীবনদর্শন-প্রসূত নহে, পল্লীগ্রামেরই আবহে লালিত একজন সাধারণ মানুষের আত্মসমীক্ষা ও নূতন অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চিত সংকোচময় নবমূল্যায়ন-প্রয়াস। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারশীলতার সম্প্রসারিত, পরিণত রূপ আমরা শরৎচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত উপন্যাসগুলিতে পাই।

'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসের নামকরণে শরৎচন্দ্র যেন আমাদের প্রচলিত সমাজ-নীতির আদর্শকে প্রকাশ্যভাবেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন—সমাজ-বিচারের মানদণ্ডকে যেন স্পর্ধিত বিদ্রোহের সহিতই অতিক্রম করিয়াছেন। সতীশ-সাবিত্রীর অপরূপ প্রেমলীলাই গ্রন্থের প্রধান বিষয়—ইহারই চতুঃপার্শ্বে উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী আপন আপন দুশ্ছেদ্য জাল বয়ন করিয়া প্রেমের রহস্যময় জটিলতাকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সতীশ ও সাবিত্রীর মধ্যে সম্পর্কটি সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবস্থার বিসদৃশতা অতিক্রম করিয়া, লঘু তরল হাস্যপরিহাস ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানের মধ্যে যে, কিরূপে একেবারে অনিবার্য, অসংবরণীয় প্রেমের পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইল, প্রণয়-ইতিহাসের সেই চিরপুরাতন অথচ চিররহস্যমণ্ডিত কাহিনীটি এখানে অদ্ভুত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই সম্পর্কটি প্রভু-ভৃত্যের সাধারণ ব্যবহারের মাত্রা অনুসরণ করে নাই। সতীশের পরিহাস, উদ্দেশ্যে নির্দোষ হইলেও, সুরুচি-সংগত ছিল না; সাবিত্রীও সতীশের কল্যাণ-কামনায় তীব্র শ্লেষ ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্বের দ্বারা প্রণয়িনীরই মর্যাদা দাবি করিত। সতীশের প্রণয়জ্ঞাপক পরিহাসগুলি সে উপভোগই করিত; তাহাকে গোড়া হইতে সংযত করিবার কোনই চেষ্টা সে করে নাই। মোটের উপর ব্যাপারটা একটা সাধারণ ইতর, কলঙ্কিত রূপমোহের মতই দাঁড়াইতেছিল; ঠিক সেই সময়ে সাবিত্রীর অদ্ভুত আত্মসংযম ও প্রণয়াস্পদের আন্তরিক হিতৈষণা তাহাকে খুব উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দিল। যেমন অস্পষ্ট ও শ্বাসরোধকারী ধূম্র-যবনিকার অন্তরাল হইতে কাঞ্চনবর্ণ অগ্নি ধীরে ধীরে নিজ জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত হাস্য-পরিহাস, মান-অভিমান ও নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের আবরণ ভেদ করিয়া প্রেমের দীপ্ত সৌন্দর্য বাহির হইয়া পড়িল। এই প্রেমের সুস্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীর ব্যবহারের আশ্চর্য পরিবর্তন হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল, ও সতীশের উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন লালসাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। আপনার সম্বন্ধে একটা হীন কলঙ্ক প্রচার করিয়া নিজেকে সর্বপ্রযত্নে সতীশের সান্নিধ্য হইতে অপসারিত করিল, এবং রিক্ততা ও অপমানের সমস্ত বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়া সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

সাবিত্রীর লাঞ্ছিত, মিথ্যা-কলঙ্ক-দুর্বহ জীবনের চরম সার্থকতা আসিল, যখন তাহার কঠোর-তম বিচারক উপেন্দ্র তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল, ও তাহাকে নিজ রোগজর্জর শোক-জীর্ণ শেষ জীবনের সঙ্গী করিয়া লইল। উপেন্দ্রের এই স্নেহাকর্ষণই তাহার প্রতি সমাজের নির্মম অত্যাচারের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সাবিত্রীর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহার এই অমানুষিক আত্মসংযম ও চরিত্র-গৌরবের মধ্যে সর্বত্রই একটা বাস্তবতার সুর অসন্দিগ্ধভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কোন দিনই একজন পৌরাণিক শাপভ্রষ্টা দেবী বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়

না। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কেবল একস্থানেই একটু অবাস্তবতার স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার মেসে যখন তাহাদের প্রণয়সম্পর্কটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন লেখক এই ক্রমবর্ধমান প্রেমের যৌবন-পরিণতির জন্য যে অনুকূল, বাধাবন্ধহীন অবসর রচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তব জীবনে মেলে না। বেহারী ও বামুনঠাকুর উভয়েই এই নবীন আবির্ভাবটিকে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে, তাহার চারিদিকে ভক্তি অর্ঘ্য রচনা করিয়া ও আরতি-দীপ জ্বালাইয়া ইহার দেবত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রাখালবাবুর ঈর্ষ্যার কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায় বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ঈর্ষ্যা-কলুষিত বাষ্প প্রেমের নির্মলতার উপর কোন কলঙ্কের দাগ বসাইতে পারে নাই। সতীশ-সাবিত্রীর অনুপম প্রেমকাহিনীর কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের কেবলই মনে হয়, ইহার মাধুর্য ও বিশুদ্ধি কত সূক্ষ্ম সূত্রের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। একটি কুৎসিত ইঙ্গিত, একটি ইতর বিদ্রূপ ইহার সমস্ত মাধুর্যকে নিঃশেষে শুকাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত কদর্যতাকে অনাবৃত করিয়া দিতে পারিত। সমস্ত মেস যেন তাহার সংকীর্ণ সন্দেহ ও বিদ্বেষ-কলুষিত মনোবৃত্তি সংহরণ করিয়া নীরব সম্ভ্রমে এই প্রেম-মাধুরীকে নিরীক্ষণ করিয়াছে ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অনুকূল অবসর আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে—মনে হয় যেন বাস্তবতার ঠিক মর্মস্থলে অবাস্তবতার একটা সূক্ষ্মতর স্পর্শ দানা বাঁধিয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসমধ্যে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, সে কিরণময়ী। কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। আমাদের বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবারে, বা উপন্যাসের পাতায় যত বিভিন্ন প্রকৃতির রমণীর দর্শন মিলে, তাহাদের সহিত কিরণময়ীর একেবারে কোন মিল নাই। তাহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও বিচারবুদ্ধির সহিত একেবারে কুণ্ঠাহীন, সংস্কারপ্রভাবমুক্ত, ধর্মজ্ঞানবর্জিত সুবিধাবাদের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ হইয়াছে।

কিরণময়ীর সহিত প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যই আমাদের মনে গভীর দাগ কাটিয়া বসে। জীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ গৃহে মুমূর্ষু স্বামীর সান্নিধ্যে তাহার দীপ্ত অশোভন, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় রূপ, যত্নরচিত প্রসাধন ও সন্দেহের তীব্রজ্বালাময় বিষোদ্গার এক মুহূর্তেই একটা শ্বাসরোধকারী, অসহনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। তারপর অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত তাহার প্রায় প্রকাশ্য প্রেমাভিনয়, তাহার শাশুড়ীর এই বীভৎস আচরণে প্রশ্রয়-দান ও স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্য—সকলে মিলিয়া আমাদের বিতৃষ্ণাকে বিজাতীয়ভাবে তীব্র করিয়া তোলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই দৃশ্যপটের অভাবনীয় পরিবর্তন। কিরণময়ী অত্যল্পকালের মধ্যেই উপেন্দ্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, স্বীয় নীচ সন্দেহের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে ও নব-জাগ্রত নিষ্ঠার সহিত স্বামি-সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ, সতীশের সহিত তাহার সম্বন্ধটি নিতান্ত সহজ মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, ও সতীশের মুখে উপেন্দ্রের অতুলনীয় পত্নী-প্রেমের কাহিনী শুনিয়াই তাহার নিজের পুনর্জন্ম হইয়াছে। এই নবীন প্রেমানুভূতির প্রথম ফল অনঙ্গ ডাক্তারকে প্রত্যাখ্যান ও ঐকান্তিক, অক্লান্ত স্বামি-সেবা। তারপর দিবাকরের সহিত শাস্ত্রালোচনার সময়ে তাহার চরিত্রের আর একটা অপ্রত্যাশিত দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—তাহার বিচারশক্তির আশ্চর্য স্বাধীনতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রানুশাসনের যুক্তিহীন জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ তাহার চরিত্রভিত্তির উপর বিস্ময়কর আলোকপাত করে। এই অসামান্য শক্তির

পরিচয় দিবার পরেই আবার একটা সাধারণ রমণীসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস আসিয়া এই আশ্চর্য নারীর চরিত্র-জটিলতার সাক্ষ্য দান করে। সুরবালার নিঃসংশয় বিশ্বাসপ্রবণতার ইতিহাসে তাহার মনে ঈর্ষ্যার এক অদম্য উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ও এই অতিপ্রশংসিতা রমণীকে যাচাই করিয়া লইবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে সুরবালার সহিত পরিচিত হইবার দিকে অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিয়াছে। এখানেও সুরবালার যুক্তিহীন বিশ্বাসের নিকট কিরণময়ীর সমস্ত তর্কশক্তি পরাজিত হইয়া নীরব হইয়াছে। সুরবালার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্তনের পর উপেন্দ্রের সহিত তাহার যে বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহার অসংকোচ, অনাবৃত প্রকাশ্যতার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। নারীর মুখে এরূপ স্বচ্ছ-সরল স্বীকারোক্তি, এরূপ অনবগুণ্ঠিত আত্মপরিচয়, এরূপ নির্ভীক, অকুণ্ঠিত প্রেম-নিবেদন বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাস-ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব। নারীর প্রেম-রহস্য-উদ্‌ঘাটনের একটি নিখুঁত অনবদ্য চিত্রহিসাবে এই দৃশ্যটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুরবালার প্রতি অসংবরণীয় ঈর্ষ্যার বাষ্পই যেন তাহার সম্ভ্রম-সংকোচের সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া দিয়া তাহার অন্তরের উষ্ণ গৈরিকস্রাবকে বাহিরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। উপেন্দ্র তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ পবিত্রতা-সত্ত্বেও এই মহিমময় প্রেম-নিবেদনের অর্ঘ্য মাথায় উঠাইয়া লইয়াছে, ও তাহাদের অস্বীকৃত সম্বন্ধের প্রতিভূস্বরূপ দিবাকরকে কিরণময়ীর স্নেহ-হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপাততঃ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

তারপর দিবাকরের সস্নেহ অভিভাবকত্বের ভার লইয়া কিরণময়ীর জীবনের আর একটি ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় খুলিয়াছে। দিবাকরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, হাস্য-পরিহাস করিয়া, তাহার অনভিজ্ঞ সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সরস বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। দিবাকরের সহিত সাহিত্য-আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক কিরণময়ীর মুখে রোমান্টিক উপন্যাসে বর্ণিত প্রণয়চিত্রেব উপর নিজেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রণয়ের মূলে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা নিবিড় উপলব্ধি নাই, কেবল অন্তঃসারশূন্য কথার কারুকার্য—বৃশ্চিক ও বজ্রমাত্র সম্বল করিয়া এই ব্যবসায়ে নামার কোন বাধা নাই। মন্তব্যগুলি অধিকাংশ স্থলেই সত্য এবং কঠোর সত্য—যদিও রোমান্টিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে বলা যায় যে, প্রেমকাহিনী তাঁহাদের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু নহে, বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক আখ্যায়িকাগুলিকে গ্রথিত করিবার ঐক্যসূত্র হিসাবেই ইহার ব্যবহার বেশি। দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর কথোপকথনে লেখকের যে উচ্চ মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অতুলনীয়—প্রেমের প্রকৃতি ও দুর্বার শক্তি, চিত্তজয়ের দুরূহতা ও পদস্খলনের বিচার-বিষয়ে যে সূক্ষ্মচিন্তাপূর্ণ গভীর আলোচনা কিরণময়ীর মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, সর্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।

কিরণময়ীর চরিত্র-আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা দেখি যে, প্রেমতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের সহিত তাহার এমন একটা লঘু-তরল হাস্য-পরিহাসের পালা চলিতেছে, যাহার মধ্যে গোপন আসক্তির বীজ নিহিত থাকার খুবই সম্ভাবনা। এই রসালাপের মধ্যে কিরণময়ীর নিজের চিত্তবিকার থাকুক বা নাই থাকুক দিবাকরের মনে যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন উপেন হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া দিবাকর ও

কিরণময়ীর সম্পর্কের অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া ফেলিল এবং কিরণময়ীকে কঠোর তিরস্কার করিয়া দিবাকরকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিবার কড়া হুকুম জারি করিয়া গেল। এই অন্যায় ও অসহনীয় আঘাতে কিরণময়ীর ভিতরের পিশাচী তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার তীক্ষ্ণ ও মার্জিত বুদ্ধিকে ঠেলিয়া দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্রোধোন্মত্তা রমণী উপেনের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার পরম স্নেহের পাত্র দিবাকরকে কুক্ষিগত করিয়া আরাকান-যাত্রার জন্য পা বাড়াইল।

সমুদ্রযাত্রার মধ্যে দিবাকর ও কিরণময়ীর সম্পর্কটা অনেক ক্ষণস্থায়ী, সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্যে পাক খাইয়া আবার প্রায় পূর্ব স্থানটিতেই স্থির হইল। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের তরঙ্গগুলি শরৎচন্দ্র আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত লক্ষ্য ও প্রকাশ করিয়াছেন। উপেন্দ্রের অননুমেয় প্রবল প্রভাবই এই দুইটি হৃদয়ের বেগবান্ বীচিবিক্ষেপগুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিরণময়ী উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করিবার উদ্দেশ্যেই দিবাকরের অধঃপতনের জন্য সমস্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; উপেন্দ্রের স্মৃতিতে মুহ্যমান দিবাকর তাহার বেদনাতুর চিত্তের বিহ্বলতার জন্যই অজ্ঞাতসারে এই মায়াবন্ধন উপেক্ষা করিয়াছে। তারপর উপেন্দ্রের আলোচনায় উভয়েরই চিত্তমালিন্য কাটিয়া গিয়া মন আবার কতকটা প্রসন্ন-নির্মল হইয়া উঠিয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিয়া লইয়া তাহার মায়াজাল সংবরণ করিয়াছে ও পুনরায়, স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আসন অধিকার করিয়াছে। দিবাকর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে ততটা নিঃসংশয় না হইয়াও কিরণময়ীর এই পরিবর্তনে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে—কিন্তু রূপমোহ তাহার মনের একটা কোণে বাসা লইয়া ভবিষ্যতের জন্য উষ্ণ, উগ্র কামনার নিঃশ্বাস-সঞ্চয় শুরু করিয়াছে। জাহাজের মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাও লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।

সর্বশেষে আরাকানে কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে দিবাকর-কিরণময়ীর সম্পর্ক উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়া চরম অধঃপতনের মধ্যে ধুলিশায়ী হইয়াছে। কিরণময়ীর মধ্যে এখনও কতকটা সংযম ও শালীনতা অবশিষ্ট আছে; বিশেষতঃ, দিবাকরের প্রতি তাহার প্রেম না থাকায় সে সেদিকে আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির ও অবিচলিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দিবাকর প্রচণ্ড লালসার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ইতরতা ও নির্লজ্জতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অধঃপতনের কদর্য শ্রীহীন চিত্রটি নির্মম বাস্তবতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে—ইহা শরৎচন্দ্রের বাস্তবাঙ্কন-ক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই চরম দুর্দশার মাঝে পূর্বজীবনের গৌরবময় স্মৃতি ও মুক্তির আশ্বাস লইয়া আসিয়া পড়িল সতীশ। সতীশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিরণময়ীর মুখ হইতে জীর্ণ ও কদর্য মুখোশ খসিয়া পড়িল, আত্মসম্ভ্রম ও গৌরবের আলোক আবার তাহাকে বেষ্টন করিল। উপেন্দ্রের মৃতপ্রায় অবস্থার কথা শুনিয়া তাহার মূর্ছাই তাহার মনোভাবের প্রকৃত সংবাদ সকলের গোচর করিয়া দিল। সে ও দিবাকর সতীশের ক্ষমাশীল অভিভাবকত্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে চড়িয়া বসিল।

এইখানেই কিরণময়ীর বিচিত্র ও বুদ্ধিপ্রদীপ্ত চরিত্রটি একটা মূঢ় বিহ্বলতা ও মনোবিকারের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে তলাইয়া দিল। যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি অসংকোচে বেদ-উপনিষদের

সমালোচনা করিয়াছিল, প্রেম ও সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে অদ্ভুত মৌলিকতাপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রেমাস্পদের আসন্ন মৃত্যুর দুঃসহ আঘাতে একেবারে অসংলগ্ন পাগলামির দুই-একটা সূত্রহীন, ভাঙ্গা-চোরা উক্তিতে পর্যবসিত হইল। ধর্মবোধহীন, হৃদয়-সম্পর্করহিত বুদ্ধির কি অভাবনীয় পরিণতি!

কিরণময়ীর চরিত্রটি আগাগোড়া পর্যালোচনা করিলে উহার স্বাভাবিকতা ও সংগতি-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। উহার ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বিপরীতমুখী বিন্দুগুলির একই জীবনে সামঞ্জস্য করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দুরূহ। তাহার ক্রুদ্ধ ও ইতর সংশয় ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, তাহার অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত প্রেমাভিনয় ও অক্লান্ত স্বামি-সেবা, উপেন্দ্রের প্রতি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও দিবাকরের সহিত পলায়ন, তাহার বেদ-বেদান্তের আলোচনা ও অসংলগ্ন প্রলাপ—এ সমস্তের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অসংগতি এতই গভীর যে, একই জীবনবৃন্তে এতগুলি বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনীয়তা-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস পীড়িত হইতে থাকে। এই অবিশ্বাস সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিকাশগুলির মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন যতটা দূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের যতটা সংগত ও সন্তোষজনক কারণ দেওয়া যায়, তাহার অভাব হয় নাই। কিরণময়ীর জীবনের মুখবন্ধটা—তাহার প্রথম যৌবনের প্রেমহীন নীরস স্বামিসাহচর্য ও ধর্মসংস্কারের একান্ত অভাব—ধরিয়া লইলে পরবর্তী পরিণতিগুলি অচ্ছেদ্য কারণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিতান্ত অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়ে। এক একবার মনে হয়, যাহার বিচার-বুদ্ধি এত গভীর ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল তাহার ব্যবহারিক জীবনে এরূপ কদর্য অভিব্যক্তি সম্ভব কি না,—স্বচ্ছ ও উদার বুদ্ধি উদগ্র কামনার ধূমে এমন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে পারে কি না। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে গভীর অনৈক্য—তাহাই মানব-জীবনের একটা অমীমাংসিত রহস্য; এবং এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কিরণময়ী-চরিত্রের অসংগতিগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। কেবল সর্বশেষে তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া দিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই। মোটের উপর কিরণময়ী-চরিত্রের অসাধারণ জটিলতা ও দিগন্তব্যাপী প্রসার উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয় এবং ইহার আলোচনা আমাদের মনকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত-জটিল, প্রতিরুদ্ধ কামনার গোপন-ক্লেদ-পিচ্ছিল, উত্তাপক্লিষ্ট দৃশ্য হইতে সতীশ-সরোজিনীর প্রেম-কাহিনীর মুক্ত ও শীতল বাতাসে পলায়ন করিয়া আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। সাবিত্রীতে প্রেমের যে দীন, চৌরপরিহিত ভিক্ষুকমূর্তি ও কিরণময়ীতে তাহার যে ভ্রূকুটি-কুটিল, নরকাগ্নিবেষ্টিত, ঈর্ষ্যাবিকৃত ছদ্মবেশ আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিতেছিল, সরোজিনী-চরিত্রে এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই প্রেমের চিরপরিচিত, প্রসন্ন-নির্মল রাজবেশ আমাদের চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহার কোন বিকৃতি নাই, কোন বহ্নিজ্বালাময় অস্বাভাবিক উত্তাপ নাই, অবিরাম সংঘর্ষের ও কণ্ঠরোধের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস নাই। সতীশ-সরোজিনীর প্রেম অনেকটা স্বাভাবিক

পথে, মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; তাহার প্রবাহমধ্যে দুই-একটি যে বাধা দেখা গিয়াছে, তাহারা যাত্রাপথে একটু করুণ উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে মাত্র, আর কোন ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করে নাই। এই সরল ও স্বাভাবিক ভালবাসার অবতারণা শরৎচন্দ্রের প্রেম-কল্পনার বৈচিত্র্য ও প্রসারের নিদর্শন।

সুরবালা ও কিরণময়ী প্রেম-জগতের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। আমাদের সনাতন পাতিব্রত্য, তাহার সমস্ত অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচলিত ধর্মসংস্কার লইয়া, যুগ-যুগব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের ফল লইয়া, সুরবালাতে মূর্তিমান্ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে তাহার আবির্ভাব স্বল্পসংখ্যক স্থলে; কিন্তু তাহার প্রভাব একদিকে উপেন্দ্রের ও অপরদিকে কিরণময়ীর উপর স্থায়িভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সে উপেন্দ্রের হৃদয় এমন অবিসংবাদিতভাবে অধিকার করিয়াছে যে, কিরণময়ীর জন্য সেখানে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানও নাই—কোন ছলে, দয়া-সমবেদনার ছদ্মবেশেও পরস্ত্রী-প্রেম সেখানে উঁকিঝুঁকি মারিতে সাহস করে নাই। আবার সে-ই কিরণময়ীকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছে—কিরণময়ীর হৃদয়ের যে দ্বারটা চিররুদ্ধ ছিল, তাহা তাহারই ইন্দ্রজালস্পর্শে মুক্ত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির রমণী দুই উপগ্রহের মত এক উপেন্দ্রেরই কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে। সুরবালা-চরিত্রের অধিক বিশ্লেষণ নাই; কিন্তু সে ও তাহার মনোরাজ্য আমাদের এত পরিচিত যে, তাহাকে চিনাইতে পরিচয়-পত্র অনাবশ্যক। 'চরিত্রহীন'-এ সুরবালা ও 'গৃহদাহ'-এ মৃণাল প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি বা সহানুভূতি কেবল নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—পুরাতনের রসও তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে পুরুষ-চরিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্র, সতীশ, দিবাকর সকলেই খুব সূক্ষ্ম ও জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই কথাবার্তা, চিত্ত-বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির তারতম্য নিপুণভাবে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, গ্রন্থের নায়ক সতীশের চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। তাহার সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে যে উদারতা ও মহত্ত্ব, যে স্নেহশীল, ক্ষমাপরায়ণ হৃদয় আছে তাহার মাধুর্য আমাদিগকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। সাবিত্রীর প্রতি তাহার দুর্জয় আকর্ষণ ও সরোজিনীর প্রতি ধীর, লজ্জা-কুণ্ঠিত ভালবাসা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ইহার পাতায় পাতায় জীবন-সমস্যার যে আলোচনা, যে গভীর অভিজ্ঞতা, যে স্নিগ্ধ, উদার সহানুভূতি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক বিচারবুদ্ধির একটা চিরন্তন পরিবর্তন সাধন করে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসটির নামকরণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর ন্যায় মহিমের পারিবারিক সুখ-শান্তি-ধ্বংসেরই প্রতি ইঙ্গিত করে। নতুবা কেবল বাহ্য ঘটনা-হিসাবে ইহাকে উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ সংঘটন বলিয়া মনে করা যায় না। এই গৃহদাহের জন্য সুরেশের দায়িত্ব সত্যসত্যই আছে কি না তাহা লেখক স্পষ্টতঃ নির্দেশ করেন নাই। একবার মাত্র অচলা সুরেশকে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন সে সর্বনাশের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সুতরাং ইহাই যে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস তাহা ঠিক বলা যায় না। সুরেশকে এই ব্যাপারে দোষী মনে করিতে গেলে তাহার চরিত্রে একটা অপরিসীম নীচতার

আরোপ করা হয়। বোধ হয় লেখকের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না—সুরেশকে একটা হীনবর্ণে চিত্রিত করিতে গেলে তাহার সমস্ত অধঃপতনের মধ্যেও তাহার যে একটা চরিত্রগত উদারতা ও মহত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহার হানি করা হয়। গৃহদাহটা যে মহিমের গ্রামবাসীদের তীব্র সমাজ-সংরক্ষণ-প্রীতি ও ধর্মজ্ঞানের ফল, সেরূপ ইঙ্গিতও গ্রন্থমধ্যে দুর্লভ নহে—সুতরাং যে কেন্দ্রস্থ ব্যাপারটির জন্য উপন্যাসের নামকরণ তাহার সম্বন্ধে পাঠকের সংশয় দূর হয় না।

সে যাহাই হউক, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক দিয়া গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্তবৃত্তি। দিগ্দর্শন-যন্ত্রের কাঁটার মত স্ত্রীর মন সর্বদা অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ইহা আমরা পুরাণ-কাহিনী বা রোমান্সে পাইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে যে এই নিষ্ঠার এতটুকু নড়-চড় হয় না, চিত্ত মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত হয় না, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আকর্ষণে অচলার মনে এইরূপ একটা দ্বিধা অনিশ্চয়ের ভাব যে জাগিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এক দিকে মহিমের শান্ত, একান্ত ভাবাবেগহীন, প্রস্তর-কঠিন আবেদন—অপরদিকে সুরেশের ব্যগ্র-ব্যাকুল, উন্মত্ত আবেগ—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝে অচলার হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। পিতার সুরেশের প্রতি প্রকাশ্য পক্ষপাত ও মহিমের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা বোধ হয় তাহার দৃঢ়-সংকল্পকে কতকটা নাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই অপমানকর দোটানার হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই। সে সুরেশের প্রেম-নিবেদনকে জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া মহিমের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিল—তাহার প্রেম প্রলোভনকে জয় করিল। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাহার প্রেমের প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রামের নির্বাসন-দুঃখ, পল্লীসমাজের নিরানন্দ প্রতিবেশ, মৃণাল ও তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তাহার কদর্য সন্দেহ, সর্বোপরি মহিমের নিঃস্নেহ, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতামূলক ব্যবহার তাহার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিল এবং সে মহিমকে ভালবাসে না, এইরূপ একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতীতি তাহাকে অধিকার করিল। মহিমের পল্লীভবনে সুরেশের অনাহূত আগমনে স্বামী-স্ত্রীর এই বিরোধ সাংঘাতিক তীব্রতা লাভ করিল—তাহার অবস্থানের কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের অহোরাত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সুরেশের ধারণা জন্মিল যে, অচলা বাস্তবিকই মহিমের প্রতি অনুরক্ত নহে। এই প্রতীতিই তাহার মনকে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত করিল—ইহারই বলে সে রুগ্ন, অসহায় মহিমের নিকট হইতে অচলাকে ছিনাইয়া লইবার দুঃসাহস সঙ্কল্প করিল। কিন্তু ইহার পূর্বে মহিমের সাংঘাতিক পীড়ার সময় সে আর একবার কঠোর চিত্তদমনের পরিচয় দিয়াছিল—শেষ মুহূর্তে অচলার একটা সস্নেহ উদ্বেগ-প্রকাশ ও প্রবাসে তাহার সঙ্গী হইবার নিমন্ত্রণ তাহার সুপ্ত প্রবৃত্তিকে আবার দুর্জয় বেগে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এ কাজ করিয়াই সুরেশ তাহার ভুল বুঝিতে পারিল। অচলাকে সে হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মন তাহার অধিকারসীমার শত যোজন বাহিরে। ডিহরী প্রবাসের দিন কয়েকটির উপর সমস্ত ভোগ-বিলাসের আয়োজন, সতৃষ্ণ প্রেমের সমস্ত উন্মুখতার উপর একটা গুরুভার অবসাদ, একটা সর্বরিক্ত বৈরাগ্যের বর্ণলেশহীন ধূসরতা চাপিয়া বসিয়াছে। মাঝে মাঝে এই জমাট তুষারের মত কঠিন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনের মধ্য দিয়া দুই-একটি অসতর্ক স্নেহের উচ্ছ্বাস, দুই-একটা অদম্য, অশ্রুজল-প্রতিরুদ্ধ নির্ঝরের বাণী এই গভীর নিঃসঙ্গতাকে, এই সুদূর

নির্লিপ্ততাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমের এই মূর্ছাহত, জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থার সহিত তুলনায় সুরেশের মৃত্যুও বোধ হয় তত ভয়াবহ নহে—এই চিত্রটিই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে কলাকৌশলের দিক্‌ দিয়া উচ্চতম স্থান অধিকার করে।

উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটি যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ও তাহার উত্তরটিও খুব পরিষ্কার ও উচ্চাঙ্গের মননশক্তির পরিচায়ক। এই অবস্থা-সংকটে পতিত ও দৈহিক পবিত্রতাবিচ্যুত অচলা সতী কি না? তাহার সম্বন্ধে পাঠকের অভিমত কি রামবাবুর সহিত অভিন্ন? কুলটা বলিলেই কি তাহাব সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হইয়া যায়? তাহার সতীত্ব-নির্ণয় সম্বন্ধে অন্তরের অনির্বাণ জ্বালা ও শান্তিহীন বিক্ষোভ দৈহিক বিচ্যুতি অপেক্ষা কি অধিকতর মূল্যবান্‌ সাক্ষ্য নহে? সুরেশেব যে প্রবল আকর্ষণে সে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নিজ সহজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা একেবাবে বহিঃশক্তির অভিভব নহে—সেই বিপুল শক্তির প্রচণ্ড গতিবেগ কতকটা তাহার নিজ গোপন অনুরাগেব বৈদ্যুতী হইতেই সংগৃহীত হই-য়াছে। কিন্তু ইহাও তাহার সতীত্বের বিরোধী নহে। আমাদেব মগ্নচৈতন্যের কতকটা অংশ আমাদের নিজেব কাছেও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়—সেই ছায়াময়, সুপ্তিগহন রাজ্যে সুরেশের ও মহিমের প্রতি তাহার গোপন অনুরাগ এক শয্যায়ই শুইয়াছিল। কিন্তু যখনই এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভালবাসার মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাচনের প্রযোজন হইয়াছে, তখনই তাহাব সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির বিচারে মহিমই জয়ী হইয়াছে। সতীত্বের লৌকিক আদর্শ ইহা অপেক্ষা বেশি আর কি দাবি করিতে পারে? অবশ্য মৃণালের আদর্শ ইহা অপেক্ষা উচ্চতব—তাহাব পাতিব্রত্য যুক্তিতর্কের অতীত একটা আধ্যাত্মিক সহজ-সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে আমরা মৃণালের যে চিত্র পাই তাহা তাহার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে নহে। তাহার শান্ত, আত্মসমাহিত, নিস্তরঙ্গ জীবন প্রেমের নহে, সেবাধর্মের প্রতীক। বাস্তবিক আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে যে প্রেমের আদর্শ গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে তাহা একটা জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতারই নামান্তর মাত্র। আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় হৃদয়-বাহিত বিদ্যুৎও তুলসী-প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ দীপা-লোকে রূপান্তরিত হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত মৃণালকেও আমরা চিকিৎসালয়েই দেখি, প্রমোদকুঞ্জে প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিতে পারি না। উপন্যাসে ঘোষাল মহাশয়ের সহিত মৃণালের জীবনের ছবিব একটা সামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাই, কিন্তু পূর্ণতর বিবরণ থাকিলে হয়ত দেখিতে পাইতাম যে, উহা কেদারবাবুর সম্পর্কের সহিত মূলতঃ অভিন্ন—চা এবং গরম মুড়ির সহিত একটা স্নেহশীতল প্রলেপের পরিবেশনই উহার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ হইত। লেখক মৃণালের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব একদিক দিয়া অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন—যে লৌকিক সম্ভ্রমের দুর্বল মোহ অচলাকে এক রাত্রির জন্য সুরেশের শয্যা-সঙ্গিনী করিয়াছিল তাহা মৃণালের সতীত্বকে এক মুহূর্তের জন্যও অভিভূত করিতে পারিত না; সে কখনই সম্ভ্রমের খোলসের জন্য তাহার শাঁসকে বিসর্জন দিত না। কিন্তু মোটের উপর মৃণালের আদর্শ যুক্তিতর্কের সাহায্যে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা অচলার মত প্রত্যক্ষ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিষয় হয় নাই, সুতরাং উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না।

উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই চমৎকার ফুটিয়াছে। সুরেশের উত্তেজনাপ্রবণ, সহজেই উচ্ছ্বসিত প্রকৃতি ব্যবহারের এক চরম সীমা হইতে অপর চরম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

তাহার ব্যবহারের একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত ভালবাসা ও উদার আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তি, তেমনি কোন বাধায় প্রতিহত হইলেই তাহা একটা হিংস্র তীব্রতা ও অসংযত ইতরতার নিম্নতম সোপানে নামিয়া যায়। কেদারবাবুর চরিত্রেও এইরূপ একটা বিপরীত ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একদিকে প্রবল অর্থলোভ ও অর্থের লোভে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে তাহার কোন দ্বিধা নাই—অপরদিকে অচলার বিবাহের পর অচলা ও সুরেশের পরস্পর সম্পর্কের প্রতি তাহার সন্দেহের অন্ত নাই, এবং সুরেশের ঋণ-মুক্তির প্রস্তাবে তাহার অন্তঃসঞ্চিত ক্রোধ একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের শেষ দিকে মৃণালের স্নেহশীতল স্পর্শে তাহার অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ জ্বালা ও অনুদার সংকীর্ণতা আশ্চর্যরূপে প্রশমিত হইয়াছে, ও যে কাল্পনিক অপ-রাধের জন্য অচলার কোন মার্জনা ছিল না, তাহার সেই চরম দুষ্কৃতিও সে স্নেহমণ্ডিত ক্ষমার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। কেবল মহিমের চরিত্রসম্পর্কেই একটু সংশয় থাকিয়া যায়। তাহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত ত সমস্ত উপন্যাসজোড়া; কিন্তু অন্তরের সম্পদ্ হৃদয় জয় করিবার জন্য যেটুকু বহিঃপ্রকাশের অপেক্ষা রাখে তাহাও তাহার ক্ষেত্রে একান্ত দুর্লভ। সুরেশের বন্ধুত্ব ও অচলার প্রেম সে যে কি গুণে অর্জন করিল তাহার ভবিষ্যৎ ব্যবহারে আমরা তাহার কোন ইঙ্গিত পাই না। সুরেশের উচ্ছ্বসিত বন্ধুপ্রীতি বার বার তাহার মৌন, প্রতিদানহীন হৃদয়তট হই" প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অচলার চিত্ত জয় করিতে তাহার শান্ত, নির্বাক সহিষ্ণুতা ও অবিচলিত আত্মনির্ভরতা ছাড়া অন্য কোমলতর গুণেরও নিশ্চয় দরকার হইয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসে তাহার চরিত্রের মাধুর্যের দিকটা একেবারে অপ্রকাশিত—মহিম আমাদের নিকট কতকটা প্রহেলিকাই থাকিয়া যায়। মোটের উপর 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম—মহৎ-চিত্তে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ানক তাহা ইহাতে সুনিপুণ বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর লেখকের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—যে তিনি পাপের চিত্র খুব চিত্তাকর্ষক করিয়া আঁকেন—তাহা এই উপন্যাসে কোন মতেই প্রযোজ্য নহে।

(৫)

একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব—১৯১৭; ২য় পর্ব—১৯১৮; ৩য় পর্ব—১৯২৭; ৪র্থ পর্ব—১৯৩৩) শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কি না, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থন-সূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলি এক-একটি মহামূল্য রত্ন। যাহাদের জীবন চিরদিন একটা অভ্যস্ত গণ্ডির মধ্যে কাটিয়াছে, যাহারা জীবিকার্জনের ও সংসার-প্রতিপালনের প্রচণ্ড নেশায় অনেকটা অর্ধচেতনভাবে জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছে, তাহারা 'শ্রীকান্ত'-এর দৃশ্যগুলির অসাধারণ বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আমাদের স্কুল-কলেজ-অফিসের লৌহ-নিগড়-বদ্ধ, রোগ-শোক-জর্জরিত, দলাদলি-বিরোধ-কন্যাদায়-বিড়ম্বিত বাঙালী জীবনের প্রান্তসীমায় যে বিচিত্র রসভোগের এত প্রচুর অবসর আছে, দুঃসাহসিকতার এত ব্যাকুল, প্রবল আকর্ষণ আছে, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার এরূপ বিশাল, অব্যবহৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, চক্ষুর ও হৃদয়ের এত অপর্যাপ্ত রসদ মজুত আছে তাহা

আমাদের কল্পনাতেও আসে না। এই কল্পনাতীত বিচিত্র সৌন্দর্য 'শ্রীকান্ত' আমাদের মুগ্ধ নয়নের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে ও মুক্তহস্তে আমাদের পাতে পরিবেশন করিয়াছে। শ্রীকান্তের ভাগ্যে যে সমস্ত বিচিত্র, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে মানসিক উদারতা ও সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের মূল; যে আলোক তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 'শ্রীকান্ত'-এই তাহার আদি উৎস।

শ্রীকান্তের বাল্য-জীবনে যে পথ দিয়া তাহার জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতার উন্মত্ত স্রোতোবেগ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে তাহা ইন্দ্রনাথের সাহচর্য। বর্ণ-পরিচয়ের রাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দুষ্ট, লেখা-পড়ায় অমনোযোগী বালকের কাহিনী সাহিত্যে বা ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমস্ত বাংলা-সাহিত্য-ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইন্দ্রনাথের জোড়া মিলে না। তাহার নিশীথ অভিযান সমস্ত দিক্‌ দিয়া একেবারে অনন্য-সাধারণ। আমাদের সাহিত্যে নৌযাত্রা-বর্ণনার অভাব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে এই বিষয়ে অনেক কবিত্বপূর্ণ, সূক্ষ্ম অনুভূতিময় বিবরণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। ইহার মধ্যে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু কবিত্ব ইহার সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। ইহার মধ্যে যে অকুণ্ঠিত বাস্তবতা, যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর পাওয়া যায় তাহা কবিত্বকে অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহার বর্ণনায় যে তীব্রতা আছে তাহা দুইটি দুঃসাহসিক বালকের উত্তেজিত কল্পনায় আবির্ভূত হইয়া ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তারপর তাহার দ্বিতীয় সৌভাগ্য অন্নদাদিদির সহিত পরিচয়। ইংরাজী সাহিত্যিক একজন লিখিয়াছিলেন: "To know her was itself a liberal education" এই বাক্যটি সম্পূর্ণরূপেই অন্নদাদিদি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাল্যকালে যখন সংস্কারের সংকীর্ণতা অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া যায় নাই, বিধি-নিষেধের ফাঁস নিঃশ্বাস-বায়ুকে রোধ করে নাই, সেই নব-আহরণের যুগে মুসলমান বেদে পরিবারের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র আবিষ্কার করার যে সৌভাগ্য তাহার মূল্য নির্ণয় কে করিবে? এই এক পরিচয়ে সমস্ত জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। এক একজন লোক আছে যাহারা সর্বদা রাস্তায় জিনিস কুড়াইয় পায়। শ্রীকান্ত তাহার জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই অতি অবজ্ঞাত আবেষ্টনের মধ্যে যে রত্ন কুড়াইয়া পাইযাছে তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইযাছে। বেদের জীবন ও সাপুড়ের ঘরকন্নার যে চিত্র গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় তাহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের বাঙালী জীবনে রোমান্সের একান্ত অভাবসম্পর্কে যে সাধারণ অভিযোগ তাহা কতই নিরর্থক। 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' ও 'নূতন দা'র দুইটি দৃশ্য শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসপ্রাচুর্যের সুন্দর পরিচয়।

এই পর্যন্ত শ্রীকান্তের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত। তারপর কয়েক বৎসর পরে পুনরায় যবনিকা তোলা হইয়াছে। এই সময়ে একটা কুমারের শিকার-পার্টিতে যোগ দেওয়ার মধ্যে অত্যন্ত অতর্কিতভাবে তাহার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপনীত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের কাছে সে যে মন্ত্র শিক্ষা পাইয়াছিল, পিয়ারী বাইজীর ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার পরীক্ষার সুযোগ মিলিয়াছে। বাইজীর ওড়না ও পেশোয়াজের অন্তরালে তাহার প্রণয়িনী বাল্যসখীর দর্শন মিলিয়াছে। এই নূতন সম্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টায় তাহার বাকী জীবন কাটিয়াছে। এই

সম্বন্ধের অশেষ রকম ঘোর-ফের, প্রবল অনুরাগের সহিত কঠোর কর্তব্য ও সমাজনিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামে শ্রীকান্তের ভাবী জীবন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত'-এর এই অংশে নিশীথ শ্মশানের ভয়াবহ বর্ণনা ও ভাঙ্গা বাঁধাঘাটে বসিয়া মানব-জীবন সম্বন্ধে পর্যালোচনা শরৎচন্দ্রের বর্ণনাশক্তি ও মননশক্তির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। রাজলক্ষ্মীর সহিত প্রথম পরিচয়ের পর সামাজিক সম্মানের বাধা উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করিল। শ্রীকান্ত তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসীর চেলাগিরিতে ভর্তি হইয়া যাযাবর জীবনের সুখ ও নিরক্ষর লোকের ভক্তি উপভোগ করিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ তাহার রত্ন-আবিষ্কারক চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারিল না। গৌরী তেওয়ারীর প্রবাসী কন্যার অসীম নিঃসঙ্গ ব্যথা এবং রামবাবু ও তৎপত্নীর কল্পনাতীত কৃতঘ্নতা যুগপৎ তাহার চোখের সম্মুখে পড়িয়া গেল। এই কৃতঘ্নতার ফলে শ্রীকান্তকে প্রথমবার রাজলক্ষ্মীর প্রণয়কে পরীক্ষা করিতে হইল। প্রণয়ের ত পরীক্ষা হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে তাহাদের নিজেরই মন সূক্ষ্মতন্তু নির্মিত বাধা রচনা করিল। বাস্তবিক তাহাদের অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ, আত্মসম্মানজ্ঞান এত সতর্ক, ব্যবহারের বিচারবোধ এত অভ্রান্ত যে, সাধারণ লোক যেখানে পরিপূর্ণ মিলনের নিবিড় আনন্দ উপভোগ করিত, সেখানে তাহারা একটি দ্বিধাসংকোচজড়িত সূক্ষ্ম অতৃপ্তির অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রথম উপলক্ষে বাধা আসিয়াছে শ্রীকান্তের দিক্ হইতে—রাজলক্ষ্মীর মিলনোৎসুক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের উপর সে নৈতিক সতর্কতা ও সাংসারিক বুদ্ধির শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর সূক্ষ্ম অনুভূতি এই সতর্কতার ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া নিজ উৎসুক মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, এবং বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা স্তব্ধ-গম্ভীর বিষাদের মধ্যে তাহাদের এই প্রথম মিলন-চেষ্টা আপন ব্যর্থতা নীরবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এইবার 'শ্রীকান্ত'-এর দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ। বাড়ি আসিয়া কিছুদিন বাসের পর অপরের কন্যাদায় ও নিজের বিবাহদায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শ্রীকান্ত দ্বিতীয়বার রাজলক্ষ্মীর নিকট যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই দ্বিতীয় দফায় ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশে মান-অভিমান প্রণয়ের পালাকে ঘোরাল করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী আবার বাইজী-জীবনে অবতরণ করিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ শ্রীকান্তের আবির্ভাব। ক্ষণস্থায়ী অভিমানের পর পূর্বের বাধাটা যেন মুহূর্তের জন্য সরিয়া গেল। প্রতিরোধপীড়িত প্রেম সহজ উচ্ছ্বাস ও স্বীকারোক্তিতে মুক্তি পাইল : রাজলক্ষ্মী আবার শ্রীকান্তের সহিত বর্মায় যাইতে চাহিল, শ্রীকান্ত পূর্বের ন্যায় এবারও সে প্রস্তাবে অস্বীকার জ্ঞাপন করিল। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটি সহজ ও পরিষ্কার হইয়া গেল। এবার বিদায়ের পালা স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে নহে, অপ্রতিরোধনীয় অশ্রুজলের মধ্যে সারা হইল।

তারপর বর্মা-যাত্রা। এই যাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির নূতন বিজয়-অভিযান। সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় একাধারে কবিত্ব, জীবন-সমালোচনা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানসিক শক্তিরই সার্থকতা হইয়াছে। জাহাজের উপরে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ও পরিচয়ের স্বল্প অবসরেও শরৎচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি আবার নূতন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে। সমাজের পাকা বাঁধনে যেখানেই একটু ছিন্নসূত্র পাকাইয়া থাকে লেখকের শ্যেনচক্ষু ঠিক তাহার উপরেই গিয়া পড়ে। নন্দ-টগরের বিংশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যসম্বন্ধের

মধ্যেও টগরের জাত্যভিমান হাস্যকর অসংগতির সহিত নিজ স্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় একটা গৌরব অনুভব করিয়াছে—আচারের শাঁস বর্জন করিয়া তাহার খোলসটি সযত্নে অঞ্চলাগ্রে বাঁধিয়াছে। আবার পক্ষান্তরে এমন একটি স্ত্রীলোকের দর্শন মিলিয়াছে যে, অন্ততঃ লজ্জা-সংকোচের জড়-পিণ্ড নয়, ও যাহার সম্বন্ধে 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই প্রবাদবাক্য কোনমতেই সুপ্রযুক্ত নহে। এই অভয়া নিতান্ত অসংকোচেই যেমন রোহিণীকে ঠিক তেমনই শ্রীকান্তকে নিজের কাজে জড়াইয়া লইল এবং উহাদিগকে মাঝে রাখিয়া প্রায় সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টাতেই কোয়ারাণ্টাইনের নরককুণ্ড অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইল।

রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া শ্রীকান্ত আপাততঃ রোহিণী-অভয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন দেশের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজ চিন্তাশীলতা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির অনুশীলন করিতে লাগিয়া গেল। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা, দা-ঠাকুরের হোটেলে জাতিভেদ-সংস্কারের অনিত্যতা, অভয়ার স্বামীর পত্নী-বাৎসল্য ও সমগ্র বাঙালী সমাজের কলঙ্ক, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক স্বামী কর্তৃক নিরপরাধা ব্রহ্মস্ত্রীর পরিত্যাগ—ইহার প্রত্যেকটি দৃশ্য তাহার পূর্ব-সংস্কারের বন্ধনের উপর তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতের ন্যায়ই পড়িল, এবং তাহার যে মন ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির প্রভাবে ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমে অসাধারণ উদারতা ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাকে চির-স্বাধীনতার সনদ দান করিল।

কিন্তু যে বন্ধন এই সমস্ত অভিনব অভিজ্ঞতার বিন্দু বিন্দু এসিড-পাতে ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতেছিল তাহা অভয়ার বিদ্রোহরূপ বিস্ফোরকে একেবারে জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। অভয়ার পাতিব্রত্য-ব্যাখ্যা অকাট্য ন্যায়নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠিত স্বাধীনচিন্তার জয়পতাকা। ইহার নৈতিক আদর্শ সাধারণের জন্য নহে—মূঢ় বিদ্রোহ অপেক্ষা অন্ধ অনুবর্তিতা বোধ হয় সমাজের পক্ষে কম অনিষ্টকর। কিন্তু সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়—ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের সহিত সমাজ-ব্যবস্থার যত অধিক ব্যবধান, ততই তাহা অসুবিধা ও অত্যাচারের হেতু হইয়া থাকে। এই আদর্শে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও ধর্মসংস্কারগুলির পুনর্বিচারের প্রয়োজন। অভয়ার বিচারের বিষয় এই যে, সতীত্বের মূল কথাটা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিভালবাসা, না কঠোর আত্মসংযম ও আত্মনিগ্রহ? হিন্দুসমাজ সব সময়েই এই আত্মনিগ্রহকেই উচ্চতর নৈতিক জীবন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—ইহার জন্য গভীর লাঞ্ছনা, পরমুখাপেক্ষিতা, আত্মাবমাননা, জীবনের একান্ত রিক্ততা সমস্তই নিঃসংকোচে স্বীকার করিয়াছে। শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে এই আত্মবলিদান একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি ও নিতান্ত ব্যর্থ অপব্যয়। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে সংযমের ইচ্ছা পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে দুরন্ত প্রবৃত্তির দমনে আমরা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহা সমস্তই নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের কর্তব্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন-অনুসারে ব্যবস্থা নিয়মিত করা। যে সমাজ কেবল সাধারণ অবস্থার জন্যই ব্যবস্থা প্রণয়ন করে অসাধারণ ব্যতিক্রমের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না, তাহা আত্মঘাতী; সে তাহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ উপাদানগুলিকেই পিষ্ট, দলিত করিয়া তাহার নৈতিক জীবনকে সংকুচিত, অবনত করিয়া আনে। যে সমাজে পীড়নের নিষ্ঠুর অধিকার আছে, কিন্তু রক্ষণের

দায়িত্ব নাই, তাহার অভিভাবকত্বের দাবি অনিষ্টকর ও অপমানজনক। শরৎচন্দ্রের সমাজ-বিশ্লেষণ এইরূপ গভীর ও বহুমুখী চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থমধ্যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের হীন দাসত্বের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ চলিয়াছে অভয়া তাহার নেতৃবৃন্দের মধ্যে পুরোবর্তিনী। যে মুক্তিকামনা, যে অসন্তোষ-অতৃপ্তি অনেকের মনে ধূমায়িত হইয়াছে তাহা অভয়ার নির্ভীক বিদ্রোহে, সুস্পষ্ট স্বাধীনতা-ঘোষণায় একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় জলিয়া উঠিয়াছে। যে কুন্ঠিত লজ্জা, যে অপ্রসুপ্ত সংস্কার রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর ভালবাসার ধারাকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া তাহাদের মনে একটা ক্ষুব্ধ আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, অভয়া সবলে, নিঃসংকোচে তাহার গ্লানিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কিরণময়ীর তীক্ষ্ণাগ্র, ক্ষুরধার বুদ্ধিও যেখানে মালিন্যগ্রস্ত, সেখানেও অভয়ার প্রবল, অকুণ্ঠিত ন্যায়বোধ জয়ী হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবস্থাভেদে কর্তব্যনির্ধারণের তারতম্য ঘটিয়াছে। রাজলক্ষ্মী-কিরণময়ীর সমস্যা অভয়ার সহিত এক নহে। রাজলক্ষ্মী তাহার ভালবাসাকে সার্থক করিতে একাগ্রভাবে চাহে না—সে ইহাকে তাহার ঘৃণিত ভূতপূর্ব গণিকা-জীবন হইতে উদ্ধারের ও ধর্মজীবনে উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহে। অভয়া যে নির্মল জল আকণ্ঠ পান করিবার জন্য উন্মুখ, রাজলক্ষ্মী প্রধানতঃ তাহাকেই পূর্বজীবনের কালিমা ধুইবার কাজে লাগাইতে চাহে, সুতরাং অভয়ার ইচ্ছার একাগ্র প্রবলতা তাহার নাই। আর কিরণময়ী তাহা তাহার পক্ষে অপেয় জানিয়া তাহাতে প্রতিহিংসার এসিড ঢালিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে চাহে—সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ থাকিবেই। এক সাবিত্রীর সহিত তাহার অবস্থার কতকটা সাম্য আছে—কিন্তু সাবিত্রীর প্রবল ধর্মসংস্কার ও নিজ হীনতা-সম্বন্ধে কুণ্ঠিত ধারণা তাহার প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে অন্তরায় হইয়াছে।

অভয়ার বিদ্রোহ যে ভোগাসক্তিমূলক নয় তাহা সে প্লেগ-মহামারীর মধ্যে শ্রীকান্তকে নিজ নূতন-পাতা সংসারে আশ্রয় দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। প্লেগ হইতে উঠিয়া এই তৃতীয়বার শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে প্রয়োজন হইয়াছে। অভয়ার দৃষ্টান্ত রাজলক্ষ্মীর মনে খুব গভীর আলোড়ন জাগাইয়াছে; কিন্তু আর একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়া তাহার ভালবাসার উপর বৈরাগ্যের রং ফলাইয়া দিয়াছে। তাহা সপত্নী-পুত্র বঙ্কুর উপস্থিতি তাহার মনে মাতৃত্বের মর্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে; তাহার উপর আবার ধর্মের নেশা নূতন করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তথাপি সে অভয়ার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত তর্কসংশয়জাল ছিন্ন করিয়া শ্রীকান্তের সহিত অবাধ মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে; কিন্তু আবার শ্রীকান্তের সম্ভ্রমবোধ পিছাইয়া আসিয়াছে। এবার যে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে তাহার মধ্যে মোহভঙ্গের বিষাদ ও একটা শেষ সংকল্পের সুর বাজিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে পুনরায় শ্রীকান্তের পল্লীগৃহে তাহার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে রাজলক্ষ্মীর ডাক পড়িয়াছে। এবার যেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকটা ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া শ্রীকান্ত তাহার চিরন্তন সমাজ ও পরিবার-সমক্ষে রাজলক্ষ্মীর সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছে, এবং আপাততঃ এই সুদীর্ঘ, সূক্ষ্ম আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলার উপর যবনিকা-পাত হইয়াছে।

কিন্তু যে কুণ্ঠা বাহিরের সমাজের নিকট প্রকাশ্যভাবে বিসর্জিত হইয়াছে তাহাই রাজলক্ষ্মীর মনের ভিতর নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া আবার তাহাদের মিলনকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

এবার সমস্ত বাধা আসিয়াছে রাজলক্ষ্মীর দিক্‌ হইতে। কিছুদিন হইতেই রাজলক্ষ্মীর যে একটা কঠোর আচারনিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ঝোঁক পড়িয়াছিল তাহা গঙ্গামাটির নির্জনতার ও সুনন্দার প্রভাবে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ভালবাসাকে অতিক্রম করিয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর প্রত্যেক কথাতে, প্রত্যেক ব্যবহারে একটা সুদূর ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার ভাব তাহার মনের সাবলীল বিচিত্র আন্দোলনকে একেবারে নিশ্চল করিয়া দিয়াছে। গঙ্গামাটির সমস্ত জীবনটার উপরেই একটা গুরুভার অবসাদ, একটা চির-বিচ্ছেদের বিষাদ-করুণ ছায়া সর্বব্যাপী হইয়া চাপিয়া আছে। এতদিন ধরিয়া রহস্যময় প্রেমের যে লুকোচুরি-খেলা চলিতেছিল, যে শীর্ণ প্রবাহে লজ্জা-সংকোচ-আত্মসম্মানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধার মধ্যে কোন রকমে পথ করিয়া চলিতেছিল, সাময়িক উচ্ছ্বাসের আবেগে যাহা বর্ষাস্ফীত স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্বার হইয়া উঠিতেছিল, সে আজ ধর্ম ও আচারের বালুকারাশির মধ্যে একেবারে শুকাইয়া গেল। এই পরিণামে রাজলক্ষ্মীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শান্তি কতটা বাড়িল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না, কিন্তু শ্রীকান্তের পুরোবর্তী জীবন দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতে লাগিল। ধর্ম স্বহস্তে যে প্রেমের সমাধি দিয়াছে, তাহার পুনর্জীবনের আর কোনই আশা রহিল না, শুধু স্মৃতির শুকতারাটি তাহার উপর সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল।

'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বে চিন্তাশীলতা, জীবন সমালোচনার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই; কিন্তু খাঁটি সৃষ্টিশক্তির দীপ্তি যেন কতকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। গঙ্গামাটির ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে যে কয়টি মানুষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা তাহাদের সমস্যাই বড়। সুনন্দার দৃপ্ত তেজস্বিতার কাহিনী শুনি বটে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী বা অভয়ার মত তাহার প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই না। ধীরে ধীরে সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ ততটা মানুষ নহেন, যতটা দেশপ্রীতির নিবিড় বেদনাবোধের মূর্ত প্রকাশ। কেবল কুশারী-গৃহিণী ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ চক্রবর্তি-গৃহিণী এই দুইজনের মধ্যেই স্বল্প-পরিমাণ প্রাণের ঝলক দেখা যায়; কিন্তু এই তৃতীয় পর্বে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা লাভবান্‌ হইয়াছে সে রতন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সে মাত্র রাজলক্ষ্মীর বিশ্বস্ত, কর্মঠ ভৃত্য ছিল; কিন্তু এই গঙ্গামাটির জলহাওয়া, যাহা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধের নিবিড় মাধুর্য শুকাইয়া তুলিয়াছে, রতনের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে খুব অনুকূল হইয়াছে। এই হাওয়ায় সে যেন অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্তের একান্ত অসহায়ত্বের ও কুণ্ঠিত অধীনতার ছবিটি তাহার চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—শ্রীকান্তের প্রতি সে একটা সমবেদনার টান অনুভব করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত'-এর চতুর্থ খণ্ডে বন্ধু-প্রীতি ও প্রেম—এই দুই পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে—এবং পুরাতন পুনরাবৃত্তিতে নবীনতার যে অবশ্যম্ভাবী অপচয় হয়, এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে। গহরের আত্ম-প্রতারণায় করুণ সাহিত্য-চর্চার সূত্র ধরিয়া শ্রীকান্তের সহিত তাহার বন্ধুত্বের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা মোহের নিবিড়তায় ও দুঃসাহসের উদ্দীপনায় ইন্দ্রনাথের সহিত প্রীতি-সম্পর্কের কাছাকাছিও যাইতে পারে নাই। ইহা প্রৌঢ়ত্বের বন্ধুত্ব, যাহাতে পূর্বস্মৃতি ও মোহভঙ্গই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিলে গহরের সহিত শ্রীকান্তের কোন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পরিচয় মিলে না—গ্রামের যে রুক্ষ,

বিশীর্ণ, ঝরা পাতার জঞ্জাল-আবর্জনায় হতশ্রী চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা যেন তাহাদের রিক্ত, মন্দবেগ বন্ধুত্বের যোগ্য পটভূমি ও প্রতীক। গহরের লাঞ্ছিত সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার প্রতি একটা করুণ সহানুভূতির উদ্রেক করে, কিন্তু শ্রীকান্তের জীবনের সহিত তাহার যোগ-সূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, অলক্ষিত-প্রায়; এই নূতন সম্পর্ক তাহার জীবনের কোন অনাবিষ্কৃত রহস্যের উপর আলোকপাত করে না। এই সমস্ত মন্তব্য কমললতার সহিত প্রেমাভিনয়ের দৃশ্যগুলি-সম্বন্ধে আরও অধিকরূপে প্রযোজ্য। প্রেমের অকারণ আকস্মিকতা হয়ত ইহার একটা প্রধান উপাদান; কিন্তু জীবনে যাহা আকস্মিক, সাহিত্যে একটা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভব ও পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা দেখিতে চাই; প্রেমের বনফুল যে পর্যন্ত আমাদের হৃদয়-রসে পুষ্ট ও পূর্ণবিকশিত না হয়, সে পর্যন্ত তাহার সহিত আমাদের রক্তের আত্মীয়তা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে যে প্রেম আমাদের চোখের উপর নিগূঢ় জীবনীরসে পূর্ণ ও শতদলের অম্লান সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কমললতার প্রেম সেরূপ কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ লইয়া নিজ জন্মস্বত্ব সাব্যস্ত করে না। এই সদ্যোজাত প্রেমের কোন গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত মূল নাই, ইহা জলজ উদ্ভিদের ন্যায় একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর প্রাচুর্যে হৃদয়ের উপরিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; ইহার প্রণয়-নিবেদনের অতিপল্লবিত বাহুল্য ইহার আন্তরিকতাকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রৌঢ় বয়সের বন্ধুত্বের ন্যায় প্রৌঢ় বয়সের প্রেমেও একপ্রকার মলিন, বিবর্ণ তেজোহীনতা আছে, এবং কমললতার প্রেমে এই পাণ্ডুর রক্তাল্পতাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। যে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের উদ্দাম আবেগের স্মৃতি এই প্রৌঢ় প্রেমের একমাত্র অবলম্বন, যাহার বিচ্ছুরিত আলোকে ইহার মুখমণ্ডলের উপব মধ্যে মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী রক্তিম দীপ্তি খেলিয়া যায়, এখানে সেই জীবনী-উৎসেরও একান্ত অভাব। সুতরাং এই প্রণয়-কাহিনী-সুলভ ভাববিলাস অপেক্ষা আন্তরিকতার কোন উচ্চতর দাবি করিতে পারে না। রাজলক্ষ্মীকে যে শেষ পর্যন্ত কমললতার সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাহার গ্রাস হইতে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য অনভ্যস্ত, অশোভন লোলুপতার অভিনয় করিতে হইয়াছে, ইহাতে তাহার ও শ্রীকান্তের উভয়েরই প্রেমের অবমাননা করা হইয়াছে। শ্রীকান্তের চরিত্রের যে অসাধারণত্ব তাহার প্রধান আকর্ষণের হেতু ছিল, তাহা এই চতুর্থ ভাগে একটা ধূসর বর্ণহীনতার মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে যে দুর্বলতার সূচনা দেখা দিয়াছিল, চতুর্থ ভাগে তাহা নিঃসংশয়িতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৬)

মতবাদপ্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস

'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—উহার সৌন্দর্যের সহিত অপরাহ্ণের ম্লান ছায়া মিশিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। যে রস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাক খাইয়া জমিয়া উঠে তাহার প্রবাহ অফুরন্ত হইতে পারে না। বরং আশ্চর্য ইহাই যে, এতদিন ধরিয়া এত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে আমাদের বাঙালী জীবনের মরুভূমে এই রসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্ভব হইল কি করিয়া? নিছক সমস্যাপ্রিয়তার যে ইঙ্গিত 'শ্রীকান্ত'-এর তৃতীয় পর্বে পাই তাহা তাঁহার

পরবর্তী রচনায় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার 'শেষপ্রশ্ন'-এ (১৯৩১) তত্ত্বপ্রিয়তার দিক্ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া কলাকৌশলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়াছে। বিদ্রোহের যে সুর অভয়া-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রীর মধ্যে জীবনের রসধারায় সিক্ত ও তাহার বিচিত্র জটিল অভিব্যক্তির সহিত জড়িত হইয়া আমাদের বাঙালী সমাজ ও ধর্মসংস্কারের গূঢ় অপরিহার্য প্রতিকূলতার মধ্যে নিবিড়তা লাভ করিয়াছে, তাহা কমলের চরিত্রে একটা বাধাবন্ধহীন, হৃদয়-সম্পর্ক-রহিত তর্কের আতশবাজির মত জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়াছে। সে সাবিত্রী-অভয়া-রাজলক্ষ্মীর সহোদরা বা স্বজাতীয়া নহে—ইহারা বাঙালী, ইহাদের বিদ্রোহ যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিতেছে তাহা সমস্ত সমাজ ও যুগ-যুগান্তরব্যাপী ধর্মবিধির সম্মিলিত শক্তি। কমলের জন্ম যেন সোভিয়েট রুশদেশে—তাহার বিদ্রোহ কোন বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিঘাত অনুভব না করিয়া, নিতান্ত অবলীলাক্রমে একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার যেন কোথাও কোন নাড়ীর সম্পর্ক নাই, ছোট-বড় কোন টানই ইহাকে বেদনায় ব্যথিত করে না, কোন পূর্বসংস্কারই ইহার বাচালতার মুখ চাপিয়া ধরে না। কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে ; একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয়-স্পন্দন নহে।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি প্রধানতঃ বিতর্কমূলক মতবাদ-আলোচনার ক্ষেত্র, ইহাকে ঔপন্যাসিক-গুণ-সমৃদ্ধ বলা যায় না। ইহার একমাত্র চরিত্র কমল ; অন্যান্য চরিত্র কমল-কেন্দ্রের চারদিকে বিন্যস্ত, কমলের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের ও দৃঢ় জীবননীতির বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়ার বাহন মাত্র। কমলের যুক্তিপ্রয়োগ ও স্বীয় মতবাদ-প্রতিষ্ঠার নৈপুণ্য অসাধারণ। কিন্তু তাহার জীবনে এই ব্যতিক্রমধর্মী ও নেতিমূলক নীতি সত্যই মূর্ত হইয়াছে কি না সেখানেই সন্দেহ। হিন্দুসমাজে প্রচলিত ও বদ্ধমূল সংস্কাররূপে গৃহীত আদর্শবাদ—সংযম, ব্রহ্মচর্য, দাম্পত্য সম্পর্কের অবিচল নিষ্ঠা ও স্মৃতির মর্যাদা এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা—কমলকে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানে উত্তেজিত করিয়াছে। তাহার মতে ইহা কেবলমাত্র জীবনের উপর দুর্ভর বোঝা মাত্র। কোনরূপ সম্পর্কের স্থায়িত্বে আবদ্ধ না হইয়া, সম্পর্কচ্ছেদে কোনও মনোবেদনাকে প্রশ্রয় না দিয়া, কেবল মুক্তপ্রাণে, নিরাসক্ত চিত্তে তাৎক্ষণিক আনন্দকে অন্তরের সমস্ত বলিষ্ঠ গ্রহণশীলতা দিয়া উপভোগ করা—ইহাই তাহার মতে জীবনের পরম সার্থকতা। ক্ষণিক আনন্দ-মুহূর্তসমূহের উদ্বর্তিত ও ঘনীভূত রূপই যে আদর্শনিষ্ঠ জীবনদর্শন, ক্ষণিকতার অতৃপ্তি ও দুঃখান্তিকতা প্রতিরোধ করার জন্যই যে আদর্শবাদ-মূলক স্থায়ী আনন্দের প্রয়োজন ও এই রূপান্তরের পিছনে যে সমস্ত সভ্য ও সংস্কৃতিবান সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন আছে তাহা বুঝিবার মত ধৈর্য ও শিক্ষা কমলের নাই। অবশ্য এই আদর্শের যে বিকৃতি ঘটিয়াছে, সংযম ও অতীত-নিষ্ঠা যে অযথা কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মপীড়নের রূপ পরিগ্রহ করিয়া মৌলিক জীবনানন্দের ভিত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। কিন্তু ইহার প্রতিকার বিচ্ছিন্ন ও বন্ধনহীন আনন্দে প্রত্যাবর্তন নহে, আনন্দকেন্দ্রিক জীবনাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

উপন্যাসের তাত্ত্বিক বিচারফল যাহাই হউক, তাহার দ্বারা উহার উৎকর্ষ নিরূপিত হইবে না। ঔপন্যাসিক এক বিশেষ মেজাজের মানুষের সম্পূর্ণ একপেশে মতও উপস্থাপিত

করিতে পারেন, যদি এই উপস্থাপনা কেবল তত্ত্বালোচনা না হইয়া জীবননিষ্ঠ হয়। কমলের মত যাহাই হউক, এই মত তাহার জীবনসম্পর্কিত হইয়া কতটা প্রাণময় হইয়াছে তাহাই আসল বিচার্য বিষয়। আমরা উপন্যাসে কমলের যে পরিচয় পাই, তাহা তাহার তিনজন পুরুষের সহিত হৃদয়-সম্পর্কের ইতিহাসমূলক। শিবনাথের সহিত তাহার শৈব বিবাহের ও তাহার প্রণয়ীদত্ত শিবানী নাম-গ্রহণের পিছনের প্রেরণাটি অমুক্ত রহিয়া গিয়াছে, এই সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনীও হেতুবাদ-সাহায্যে স্পষ্টীকৃত হয় নাই। অবশ্য কমলের অসামান্য রূপবহ্নিই যে পুরুষ-পতঙ্গকে নির্বিচারে উহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহা বুঝাইতে ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন—মানবের আদিম মোহ উর্বশীর ন্যায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বিশ্লেষণ-নিরপেক্ষ। শিবনাথের প্রকৃতির ইতর অর্থলোলুপতার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, ইহাই তাহাকে ধনীদুহিতা মনোরমার প্রতি প্রেমনিবেদনে উন্মুখ করিয়াছে। কিন্তু কমলের স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যজীবনে শিবনাথের মোহভঙ্গের কোন বর্ণনাই পাই না। তবে শিবনাথের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবার পর কমলের বলিষ্ঠ, অনুশোচনাহীন, সম্পূর্ণ ভাববিলাসমুক্ত আত্মনির্ভরশীলতার চিত্রটিই উপন্যাসমধ্যে তাহার একমাত্র ভাবাত্মক (positive) পরিচয়। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তর্কনিপুণতা, তাহার অনলস সেবাকুশলতা ও সময় সময় বিশেষতঃ, আশুবাবুর ক্ষেত্রে রমণীয় স্নিগ্ধ আচরণ ও তাহার সংযত আত্মমর্যাদাবোধ তাহাকে মোটামুটি চিনাইয়া দিলেও তাহার বিশিষ্ট অন্তর-রহস্যের উপর কোন আলোকপাত করে না। আগ্নেয়গিরির পারিপার্শ্বিকে যে শ্যামশষ্পশোভিত উপত্যকা বিরাজিত তাহার সৌন্দর্যময় বর্ণনায় ত অগ্ন্যুৎপাতের অন্তর জ্বালার কোন পরিচয় মিলে না। শিবনাথের প্রতি সে কেন আকর্ষণ অনুভব করিল, কেনই বা তাহার জীবন হইতে সে সরিয়া গেল তাহার সম্বন্ধে এই অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

আর যে দুইজন পুরুষের দিকে সে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন রাজেন। রাজেনের সঙ্গে তাহার সংযোগ সেবাকার্যের মাধ্যমে। এই উপলক্ষ্যে তাহাদের যে ঘনিষ্ঠতা হয় তাহা উভয়ের এক কক্ষে শয়ন পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজেনের একান্ত ভাববিকারহীন ঔদাসীন্য, তাহার অপ্রলুব্ধ পুরুষপ্রকৃতির বলিষ্ঠতাই কমলের মনে আকর্ষণের হেতু হইয়াছিল। রাজেন ও সে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শানুসারী—তাহার মতবাদের প্রতি রাজেনের সুস্পষ্ট অবজ্ঞা। এক্ষেত্রে কমলের মনে তাহার প্রতি প্রেমানুভূতি কেবল চরিত্রদৃঢ়তার প্রতি শ্রদ্ধারই নামান্তর। ইহার কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা দ্বন্দ্বমূলক পরিচয় নাই বলিয়াই ইহা উপন্যাসে গৌণ। এমন কি কমলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রজাপতিধর্মিত্ব ও আকস্মিকতা ছাড়া ইহা তাহারও কোন নিগূঢ় ব্যক্তিপরিচয় বহন করে না।

উপন্যাসমধ্যে কমলের প্রণয়চর্চার সুস্পষ্টতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে অজিতকে অবলম্বন করিয়া। অজিতের চরিত্রও অত্যন্ত অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহার কমলের প্রতি মনোভাব গ্রহণ-বর্জনের, উন্মুখতা-বিমুখতার বিপরীত বিন্দুর মধ্যে অসহায়ভাবে আবর্তিত হইয়াছে। কমল গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইতে চেষ্টা করিয়াছে, অনুরাগ-নির্ভরতার নানামুখী প্রকাশে তাহার প্রতি প্রেম-নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু অজিতের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচে নাই। কমলের সঙ্গে তাহার মতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য; কমলের

সমস্ত গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা তাহার এই পার্থক্যবোধকে সম্মোহিত করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত সে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্ভার, তাহার নবক্রীত মোটরগাড়ি ও আরাম-সচ্ছলতার অপর্যাপ্ত আয়োজন, কিন্তু সংশয়ক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া, কমলের সহিত ধর্মানুষ্ঠানহীন, একান্তভাবে হৃদয়-নির্ভর মিলনে যুক্ত হইয়াছে। এই মিলনে তাহার অনুসৃত ক্ষণিকতাবাদ কতটুকু উদাহৃত হইবে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। কমলের অশ্রান্ত নব-নব-পুরুষ-সম্পর্কিত প্রেমাভিসার অজিতে আসিয়া চিরনিবৃত্তি লাভ করিবে এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। অজিতের দ্বিধাদোদুল চরিত্রে না আছে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্রয়, না আছে কমলের ক্ষুধা মিটাইবার উপযোগী মানস বৈচিত্র্য। উপন্যাসের এক জায়গাতে শেষ হইবেই কিন্তু এই উপসংহার চরিত্র-পরিণতির কোন সুস্পষ্ট পর্যায়ের চিহ্নাঙ্কিত নহে।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রও সবই আকস্মিকতাধর্মী ও যদৃচ্ছ-সংগৃহীত, কোন কার্য-কারণের অমোঘ শৃঙ্খলে একত্রিত নহে। ইহাদের মধ্যে আশুবাবুই তাঁহার বিরাট দেহ, সরস অন্তর ও উদার, সমন্বয়শীল হৃদয় লইয়া কেন্দ্রস্থ পুরুষের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কেন্দ্রিকতা কেবল স্থানমূলক, চরিত্রাশ্রয়ী নহে। তিনি কমলকে সবচেয়ে বেশি বুঝিয়াছিলেন ও তাহার প্রতি সর্বাধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিতই কমলের নীতিগত পার্থক্য সর্বাপেক্ষা বেশি। তাঁহার পরলোকগত স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য কমলের চক্ষে একটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সংস্কার। তাঁহার একমাত্র কন্যা মনোরমাও তাঁহাকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়া শিবনাথের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে। এবং সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়জনক ব্যাপার হইল তাঁহার প্রতি নীলিমার অনুরাগ-পোষণ। এ সমস্ত ব্যাপারেই আশুবাবু বিহ্বলতার পরিচয় দিয়াছেন, কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার মত মানস শক্তির তাঁহার একান্ত অভাব। উপন্যাসে কমলকে লইয়া যে বিপুল আলোড়ন জাগিয়াছে, যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক উদ্দাম হইয়াছে, আশুবাবুই তাঁহার সহৃদয় আতিথেয়তার জন্য তাহার একটি গার্হস্থ্য পটভূমিকা, বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির মিলনভূমি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অংশ কেবল সামঞ্জস্য-স্থাপনের, আঘাত-প্রত্যাঘাতের তীব্রতা-হ্রাসের, গৌণ প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

অবিনাশ বাবু, অক্ষয় বাবু, হরেন ইহারা বাদবিতণ্ডার উদ্দাম ঝড়ে আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ঝটিকাতাড়িত ধূলিকণা অপেক্ষা ইহাদের ব্যক্তিপরিচয় সুস্পষ্টতর নহে। অবিনাশের সঙ্গে নীলিমার সম্পর্কের বিচিত্র রসটুকু একেবারেই অপচিত হইয়াছে। অক্ষয় শেষের দিকে বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াই খানিকটা নৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ দেখাইয়াছে; তাহার অনমনীয় প্রতিরোধ ঈষৎ কোমল হইয়া কমলের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাবে পরিণত হইয়াছে। হরেন গ্রন্থমধ্যে কথা বলিয়াছে সব চেয়ে বেশি ও কাজ করিয়াছে সব চেয়ে কম। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য-আশ্রম উঠাইয়া দিয়া সে কমলের মতবাদের মর্যাদা রাখিয়াছে ও সর্বাশ্রয়-চ্যুতা নীলিমাকে আশ্রয় দিয়া উপন্যাসে তাহার কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

নারীচরিত্রগুলিও প্রায় একইরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় ও দৈবাগত বলিয়া মনে হয়। মনোরমা প্রধান চরিত্র হইতে একেবারে নিষ্ক্রিয় ও অনুপস্থিত চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। সে কমলের মুখ্য প্রতিযোগী ও বিপরীত ভাবাদর্শের প্রতীক ছিল। কিন্তু শিবনাথের সহিত অকস্মাৎ

উন্মেষিত প্রণয়ের সূত্র ধরিয়া সে উপন্যাসের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মধ্যে তাহার নাম শুনা গেলেও তাহার পিতার মনোবেদনা ও অপরের আলোচনার বিষয়ীভূত হইলেও সে চিরতরে যবনিকার অন্তরালবর্তিনী হইয়াছে।

নীলিমা আর একটি অবসিত-মহিমা নারিচরিত্র। সে কতকটা কমলের জীবনবাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা ছিল, কিন্তু আচরণের দিক দিয়া কমলের অনুবর্তিনী হইবার তাহার কোন প্রবণতা দেখা যায় নাই। অবিনাশবাবুর সহিত তাহার সম্পর্ক গৃহিণীপনার স্তর অতিক্রম করিয়া কোন কোমলতর হৃদয়-সংবেদনে পৌঁছিয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে তাহার মনে সঞ্চিত ক্ষোভের অতর্কিত বহিঃপ্রকাশ ও অবিনাশ সম্বন্ধে তাহার গূঢ় অভিমান সেইরূপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। আশুবাবুর সহিত তাহার হৃদয়াবেগঘটিত, অশ্রু-উদ্বেল সম্পর্ক-জটিলতা শুধু আশুবাবুর নয়, পাঠকের মনেও বিস্ময়াপ্লুত অবিশ্বাস জাগায়। লেখক এই অপ্রত্যাশিত প্রণয়োন্মেষের উদ্ভবরহস্য উন্মোচন করিতে কোন চেষ্টাই করেন নাই, সম্পূর্ণ আকস্মিক পরিণতিরূপেই আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। বেলার সম্বন্ধে তাহার আক্রমণাত্মক রূঢ়ভাষণ তাহার প্রধূমিত অন্তর্দাহের কিছুটা পরিচয় দেয়। মোট কথা, নীলিমা-চরিত্রে যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও প্রেমরহস্য-স্ফুরণের সম্ভাবনা ছিল, লেখক তাহাকে পরিস্ফুট করেন নাই। সে উপগ্রহরূপেই কমলসম্বন্ধীয় বাগ্‌বিতণ্ডার কক্ষাবর্তন করিয়াছে, প্রেমের আভিজাত্য-গৌরবে স্বাধীন সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। লেখকের নিকট চরিত্রৌৎসুক্য যে গৌণ ও মতবাদ-আলোচনাই যে প্রধান তাহা নীলিমার অর্ধস্ফুট ব্যক্তিত্বেই প্রমাণিত। হরেনের গৃহে আশ্রয় লওয়াতে তাহার বাসস্থান পরিবর্তন অপেক্ষা আর কোন নিগূঢ় আন্তর পরিবর্তন সূচিত হয় নাই।

বেলা একেবারেই গৌণ; সে নীতির দিক দিয়া কমলের সহধর্মী। কিন্তু তাহার মনোলোকে কমলের সূক্ষ্ম সুরুচি ও সৌকুমার্যবঞ্চিত। সে বৈপরীত্যের দ্বারা কমলের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ করিয়াছে।

'বিপ্রদাস' (মাঘ, ১৩৪১) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পূর্ব-গৌরবের অনেকটা পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অতি কঠোর আচার-অনুষ্ঠাননিষ্ঠ মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে স্বল্পকালস্থায়ী সংস্রবে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্তা বন্দনার চিত্ত-জগতে যে গুরুতর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই ইতিহাস ইহার বিষয়বস্তু। বন্দনা এই আচার-বিচারের অতি-সতর্ক শুচিতার দ্বারা একই সময়ে আকৃষ্ট ও প্রত্যাহত হইয়াছে; ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা অনুমোদন করিতে পারে নাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই আচারনিষ্ঠতার প্রভাবে তাহার সমস্ত পূর্বসংস্কার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী জীর্ণ পত্রের মত নিঃশব্দে, অথচ অনিবার্যভাবে খসিয়া পড়িয়াছে। নিজ সমাজের ঐশ্বর্যোপাসনা ও অসরলতা, বাহ্য চাকচিক্য ও ভদ্রতার অন্তরালে ইতর মনোবৃত্তি, তাহার মনে প্রবল বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তাহাকে এই নূতন জীবনাদর্শের দিকে আরও প্রবলভাবে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নূতন প্রভাবের ফলে তাহার প্রেমের ধারণা ও প্রেমাস্পদের ব্যক্তিত্ব বিস্ময়করভাবে ছায়াচিত্রের দৃশ্যাবলীর ন্যায় পরিবর্তিত হইয়াছে—সুধীর, অশোক, বিপ্রদাস এবং একবার মত-পরিবর্তনের পর দ্বিজদাস পর্যায়ক্রমে তাহার প্রণয়স্পৃহা জাগাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাসকে সে গ্রহণ করিয়াছে ঠিক প্রণয়ী হিসাবে নহে, মুখুজ্যে-পরিবারের চিরপ্রথা-

গত কর্তব্যের কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায়স্বরূপ। দ্বিজদাসের পত্নীত্ব-স্বীকার শেষ পর্যন্ত তাহার সনাতন আদর্শের নিকট আত্মসমর্পণ। তাহার মনের কোণে দ্বিজদাসের প্রতি যে একটু মোহ ছিল, কর্তব্য-পালনের ব্যগ্রতাই উহাকে বিবাহের চিরন্তন বন্ধনে স্থায়িত্ব দিয়াছে।

বিপ্রদাসের চরিত্রে তাহার নিঃসঙ্গ এককীত্বই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। যে কেহ তাহার সহিত সংস্রবে আসিয়াছে সেই ইহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। তাহার চরিত্র-বল বন্দনার প্রণয়জ্ঞাপনকে আমল না দেওয়ার ব্যাপারেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে; ইহার মুখ্য পরিচয় পাই দ্বিজদাসের সসম্ভ্রম আজ্ঞানুবর্তিতায় ও উচ্ছ্বসিত স্তুতিতে। তাহার মাতৃভক্তির উপরও খুব জোর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার ভিত্তি অতি দুর্বল ও ইহা অতি ক্ষণভঙ্গুর। তাহার স্ত্রীর প্রতি কোন ভালবাসা আছে কি না, এই সংশয়পূর্ণ অনুযোগ একাধিকবার ধ্বনিত হইয়াছে ও ইহার কোন সদুত্তর মেলে নাই। মোটকথা এই নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল-বেষ্টিত মানুষটির নিগূঢ় পরিচয়টি আমাদের নিকট পৌঁছে কি না সন্দেহ—অন্যের স্তুতিভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আরতির প্রজ্বলিত দীপ হাতে লইয়া তাহার রহস্যাবৃত মুখমণ্ডলের উপর আলোক-পাত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। দেবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা তাহার মানব-পরিচয়ের পথ বন্ধ করিয়াছে।

নিজের ছেলের চেয়ে সপত্নী-পুত্রের প্রতি অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া দয়াময়ী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু মনে হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও আচারনিষ্ঠতার সংকীর্ণতীকারী প্রভাবে এই পরকে আপন করিবার শক্তি তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজদাসের মত সেও স্ব-প্রকাশ নহে, পরের মনোভাবের আলোকে তাহার মুখের রেখাগুলি পড়িয়া লইতে হয়। বিপ্রদাসের ভক্তি তাহাকে যে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার নিজ কার্যাবলী সেই উন্নত আসন হইতে বারবার তাহাকে নামাইতে চাহিয়াছে। উপন্যাস-মধ্যে তাহার এমন কোন পরিচয় পাই না, যাহাতে বিপ্রদাসের উচ্ছ্বসিত ভক্তির সমর্থন মিলিতে পারে। পুত্রের সহিত চিরবিচ্ছেদই তাহার চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টিহীন, অন্ধ যান্ত্রিকতার অভ্রান্ত নিদর্শন।

দ্বিজদাসই উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। সে সাধারণ স্তরের মানুষ বলিয়া পাঠকের অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করে। বন্দনা তাহার প্রতি সুস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করার পরেও তাহার ঔদাসীন্য প্রমাণ করে যে, তাহার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক আবেষ্টনের চাপে নিজ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মুখুজ্যে পরিবারের আদর্শ ও জীবনধারা সর্বাপেক্ষা তাহাকেই পীড়ন করিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। এই জড় নিয়মানুবর্তিতা কতটা তাহার স্বাধীনচিত্ততার অভাবের জন্য, ও কতটাই বা দাদা ও বৌদিদির প্রতি ভক্তিমূলক, তাহার সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। এই অতি দৃঢ়সংকল্প পরিবারের মধ্যে তাহার আপেক্ষিক দুর্বলতাই তাহার বিশেষত্ব ও জনপ্রিয়তার হেতু। বন্দনার আহ্বানও আসিয়াছে তাহার কঠোর-দায়িত্বপালনে সহযোগি-নির্বাচনের তাগিদে, প্রেমের নিগূঢ় অনন্বী-কার্য প্রয়োজনে নহে।

চরিত্র-পরিকল্পনার দিক দিয়া উৎকর্ষ-অপকর্ষের কতকটা ধারণা এই আলোচনা হইতেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে আর কতকগুলি সমস্যা আছে যাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, দয়াময়ী ও বিপ্রদাস যে আদর্শের অনুসরণ তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য কতটুকু? দয়াময়ী এই ছোঁয়া-খাওয়ার ব্যাপার লইয়া একাধিকবার অতিথির প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে ও আতিথেয়তার আদর্শচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু আবার মনের প্রসন্ন অবস্থায় বন্দনাকে রান্নাঘরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছে। বিপ্রদাস নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ও প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প মনে মনে রাখিয়া বন্দনার হাতে খাইতে রাজি হইয়াছে, কিন্তু অসুখের সময়ে তাহার সেবা-পরিচর্যা গ্রহণ করিতে, এমন কি তাহার দ্বারা পূজা-আহ্নিকের আয়োজন করাইয়া লইতেও দ্বিধা করে নাই। এই পরস্পর-বিরোধী ব্যবহারের জন্য তাহারা যে কৈফিয়ত দিয়াছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। দয়াময়ীর তরফে বিপ্রদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, দয়াময়ী মাতা হিসাবে আদর্শস্থানীয়া ও বাহিরের লোকের পক্ষে তাহাকে বোঝা ও তাহার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নহে। আদর্শ গৃহিণী ও স্নেহশীলা মাতা হইলে আতিথেয়তার কর্তব্যচ্যুতির কিরূপে ক্ষালন হয় তাহা বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য। বিপ্রদাসের নিজের কৈফিয়ত আরও গাত্রজালার সৃষ্টি করে; বন্দনা তাহার প্রতি অনুরাগিণী ও শ্রদ্ধাসম্পন্না এই জ্ঞানই তাহার মতের উদারতা বিধান করিয়া তাহাকে বন্দনার সেবাগ্রহণেচ্ছু করিয়াছে। তাহা হইলে মোটের উপর এই আচারনিষ্ঠা একটা মনের খেয়াল মাত্র, মনের প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতা-অনুরাগ-বিরাগ, ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে, ইহা অপরিবর্তনীয় সনাতনত্বের দাবি করিতে পারে না। সুতরাং বন্দনার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ইহার ভিতরকার জুয়াচুরিটুকু ধরিতে না পারিয়া এই আদর্শ অনুসরণের মোহগ্রস্ত হইয়াছে ইহা বিস্ময়ের বিষয়। হয়ত যাহা তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা এই খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত গোঁড়ামি নহে, মুখুজ্যে-পরিবারের বহুবিস্তৃত কর্তব্য-পরিধি ও রাজোচিত উদার আশ্রয়-বিস্তার। ইহাই তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন ও প্রেমকে জাগ্রত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লেখক কিন্তু এই প্রশ্নের আসল সমাধানের পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে মুখুজ্যে-পরিবারের পারিবারিক আদর্শ লইয়া। এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি, পরের জন্য স্বেচ্ছায় নিজ স্বাধীনতা-সংকোচ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা, সুপ্রচুর দানশীলতা, ইত্যাদি নানাবিধ সদ্গুণের কথা আমরা বারবার শুনি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অতি সামান্য মাত্রায়ও আঘাতসহ নহে। যদি এই পরিবারের কোন সত্যকারের বন্ধন থাকিত, এই আদর্শের কোন প্রকৃত ধর্মমূলক অক্ষয়ত্ব থাকিত, তবে তুচ্ছ একটা ঘটনায় ইহা একেবারে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যাইত না, মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ইহার ঐক্য ও সংহতিকে বিধ্বস্ত করিতে পারিত না। শশধরের সহিত বিরোধে বিপ্রদাসের পক্ষে যে একটা সমর্থনযোগ্য হেতু আছে ইহা আবিষ্কার করা দয়াময়ীর কষ্টসাধ্য হইত না; পক্ষান্তরে বিপ্রদাসেরও, একটা ধর্মানুষ্ঠানের মাঝখানে ও নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সম্মুখে, দীর্ঘকালপ্রধূমিত গৃহ-বিবাদে বারুদ-সংযোগ না করার উপযুক্ত ধৈর্য ও মাতৃভক্তি থাকা উচিত ছিল। যেখানে প্রকৃত সংযম ও সহানুভূতির এত শোচনীয় অভাব, সে পরিবারের

আদর্শের খোলস লইয়া বড়াই চলিতে পারে, কিন্তু শাঁস যে নাই তাহা নিশ্চিত। অনেক পারিবারিক বিচ্ছেদ আদর্শবৈষম্যের কঠোর প্রয়োজনে সংঘটিত হইয়াছে; উচ্চতর কর্তব্যের নিকট প্রীতি-স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের কারণ কোন আদর্শনিষ্ঠা নহে, ইহা নিছক একগুঁয়েমি। সুতরাং এই পরিবারের উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃই একটু সন্দিহান হইয়া পড়ি।

ইহা ছাড়া তৃতীয় এক প্রশ্নেরও অবসর আছে—তাহা বন্দনার প্রেম-বিষয়ক। বন্দনা-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি তাহার প্রধান উপাদান হইতেছে তাহার তেজস্বী স্বাধীনচিত্ততা ও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা। ইহারই জন্য একদিকে সে মুখুজ্যে পরিবারের সংকীর্ণতা ও বিপ্রদাসের অটল আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অসংকোচে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে, অপরদিকে যাহাকে সে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে তাহার জন্য আপনার সমস্ত পূর্বতন সংস্কার ও অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা পরিহার করিয়াছে। কিন্তু এই ধারণার সহিত তাহার ব্যবহার সব সময়ে খাপ খায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুখুজ্যে-পরিবারের আদর্শে যে ফাঁকিটুকু আছে তাহা তাহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই, তথাপি এই ত্রুটিসংকুল আদর্শকেই সে প্রাণপণ বলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য প্রেমের আকর্ষণ; দ্বিতীয় কারণ তাহার মাসিমার প্রতিবেশ-মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাহার অতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহ, যদিও এই বিদ্রোহের উদ্ভব একটু অতিরিক্ত রকম উগ্র ও আকস্মিক। কিন্তু তাহার প্রণয়-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিবর্তনগুলির মধ্যে এমন একটা অস্থিরমতিত্ব, আত্মপ্রকৃতি-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাকে আমরা চরিত্রদৃঢ়তার সহিত একেবারেই মিলাইতে পারি না। তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামী সুধীরের প্রতি তাহার ভালবাসা "দিগন্তের ইন্দ্রধনুপ্রায়" মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—এই অতর্কিত পরিবর্তন বিপ্রদাসের ন্যায় আমাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। অবশ্য জীবনযাত্রার আদর্শের সঙ্গে প্রণয়াস্পদের পরিবর্তন মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া একেবারে যে সমর্থনের অযোগ্য তাহা নহে; তবুও মনে হয় বন্দনা প্রেম ও পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে কোন প্রভেদের ধারণা করিতেই পারে নাই। প্রেমের সঙ্গে একনিষ্ঠতার যে কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই তাহা শরৎচন্দ্রই একাধিক উপন্যাসে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তথাপি সুধীরকে পাঁচ-মিনিটের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা আমাদিগকে বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করাইতে যেটুকু আয়োজন দরকার লেখক তাহাও করেন নাই। তারপর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইতেছে বিপ্রদাসের প্রতি প্রেম-নিবেদন।—এই অভাবনীয় ব্যাপারের ধাক্কা বিপ্রদাসকেই বেশি করিয়া বাজিয়াছে। তাহার মেজদিদির সর্বনাশ, মুখুজ্যে-পরিবার-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস—এ সব চিন্তাই প্রেমের অতর্কিত বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বন্দনার দিক্ হইতে ইহার একমাত্র কৈফিয়ত যে, বিপ্রদাস তাহার দিদিকে ভালবাসে না। এই উন্মত্তপ্রায় ব্যবহারের যে ব্যাখ্যা বিপ্রদাস দিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা সমীচন মনে হয়—যে বন্দনা ভালবাসার একরকম চেহারাই জানে, তাহা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-মিশ্রিত, নিষ্কলুষ প্রীতির মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে তাহা তাহার অজ্ঞাত। দ্বিজদাসের প্রতি তাহার প্রণয়-জ্ঞাপন সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, এবং দ্বিজদাসের তৃতীয়-পক্ষোচিত নিষ্ক্রিয়ত্ব তাহার আত্মমর্যাদাবোধে যে আঘাত দিয়াছে তাহাও বেশ সুসংগত। তাহার চতুর্থ প্রণয়ী অশোকের প্রতি তাহার সত্যকার কোন আকর্ষণ ছিল না—তাহার

প্রণয়-স্বীকার হৃদয় বৃত্তি অপেক্ষা গীতোক্ত নিষ্কামধর্মেরই অনুশীলন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে বন্দনাকে স্পর্শ করে না। মোটের উপর এই দ্রুত পরিবর্তন-পরম্পরা বন্দনার চরিত্র-পরিকল্পনার সহিত ঠিক সামঞ্জস্য রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বন্দনার চরিত্রে সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও নিগূঢ় আকর্ষণ বুঝিবার পক্ষে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মৈত্রেয়ী অনেকটা সহায়তা করে। মৈত্রেয়ীও বন্দনার মত সেবানিপুণা, কিন্তু তাহার সেবার মধ্যে কূটবুদ্ধির ইঙ্গিত ও লোক-দেখান আড়ম্বরের ভাব পাওয়া যায়। বন্দনার সেবা ব্যঙ্গ-কৌতুকে সরস ও উপভোগ্য এবং সরল আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ; মৈত্রেয়ীর পরিচর্যায় মিষ্টরসপরিবেশন অত্যধিক। যে গৃহবিবাদের সাংঘাতিক পরিণতিতে বন্দনার সুরুচিবোধ ও সংযমজ্ঞান অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, সেখানে মৈত্রেয়ী সমস্ত গোপনীয়তার গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া অসংকোচে তাহার সেবাসম্ভার পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বিরোধের মধ্যে যেখানে বন্দনা নিরপেক্ষ সেখানে মৈত্রেয়ী বিনা দ্বিধায় পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মৈত্রেয়ীব আত্মীয়তা নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনীয় গণ্ডির বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই, পরের ছেলেকে মানুষ করার দায় সে অস্বীকার করিয়াছে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়া, লেখক বন্দনার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকৌশলের নিদর্শন, এবং ইহা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ব-গৌরব প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের অন্তিম অসম্পূর্ণ রচনা 'শেষের পরিচয়' আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার একমাত্র দেশপ্রেমমূলক রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' (১৯২৬) সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ প্রয়োজন। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু ও পটভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস হইতেও আমরা তাঁহার অকৃত্রিম ও গভীর দেশপ্রীতির নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারক; সমাজের সুস্থ চেতনা উদ্দীপন করাতেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটির প্রতিই নিবদ্ধ। পরাধীনতার গ্লানি ও দুর্ভাগ্যবোধ তাঁহার অন্তশ্চেতনায় অনুস্যূত ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লববাদ লইয়া ইতিপূর্বে তিনি কোন উপন্যাস লেখেন নাই। সুতরাং বইখানি তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার একটা নূতন বিকাশ।

বিপ্লববাদের রূপায়ণে ঘটনা-রোমাঞ্চই মুখ্য; চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষাকৃত গৌণ হইতে বাধ্য। বিপ্লবী নেতাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস রহস্যাবৃত; আন্দোলনের বিস্তৃতি ও সংগঠন-দৃঢ়তা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ যে ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপান পর্যন্ত জাল বিস্তার করিয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সাহিত্যিক প্রতীতি এক নয়—ইতিহাসের প্রাণসূত্র যে অলক্ষ্য গভীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ঔপন্যাসিকের পক্ষে তথ্যগত বিবৃতি অপেক্ষা সেই প্রাণসূত্রের পুনরুদ্ধার বেশি প্রয়োজন। কাজেই নিছক সন্ত্রাসবাদের বর্ণনা আমরা উপন্যাসে যাহা পাই তাহার চিত্রসৌন্দর্য ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবিন্যাসে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু উহার অতিরিক্ত আর কোন সূক্ষ্মতর জীবন-সত্যের সন্ধান পাই না। সব্যসাচীর মত এমন একজন

অদ্ভুতকর্মা, নির্বিকার লৌহমানব কোন্ বিশ্বকর্মার শিল্পশালায় নির্মিত হইয়াছিল, কি তাহার মানবিক পরিচয় তাহা আমরা জানি না। উপন্যাসে আমরা তাহার কার্যকলাপের সঙ্গে যতটুকু পরিচিত হই, তাহাতে তাহার অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব ও রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তা সম্বন্ধে লেখকের যে পরিকল্পনা তাহা সমর্থিত হয়। কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক-রহস্য দুর্বোধ্যই থাকিয়া যায়। পথের দাবীর সঙ্গে তাহার কতটুকু যোগাযোগ, নেতৃত্বের দায়িত্ব সুমিত্রা ও তাহার মধ্যে কি পরিমাণে বিভক্ত সে সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। সুমিত্রা আর একটি রহস্যময়ী নারী, যাহার পূর্ব-ইতিহাস আমাদের নিকট অজ্ঞাত। শরৎচন্দ্র তাহার যে সংক্ষিপ্ত পূর্ব-বিবরণ দিয়াছেন তাহা তাহার চরিত্রের উপর কোন আলোকপাতই করে না। সে সমস্ত জগতের উপর নির্মমভাবে নিজ সমিতির দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিতে সদাই উদ্যত, কেবল সব্যসাচীর ঔদাসীন্যের প্রতি তাহার একটি গূঢ় অভিযোগ ও বেদনাপ্লুত আবেদন আছে। এই গুপ্ত সমিতির দুর্জয় সংকল্পের কথা অনেক শুনি, তাহাদের পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া নির্জন, দুর্গম পথে দুঃসাহসিক যাতায়াতের অনেক বর্ণনা আছে, কিন্তু এই সাড়ম্বর আয়োজন-বাহুল্যের পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কর্মপদ্ধতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। মোটের উপর অতিমানব চরিত্র ও উহাদের অলৌকিকপ্রায় ক্রিয়াকলাপ ঠিক ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলের সুসংবদ্ধতার দাবি পূর্ণ করে না। তবে সন্ত্রাসবাদের উপযোগী রহস্যময়, আলো-আঁধারি, ও অনিশ্চিত বিপদ-সম্ভাবনায় আতঙ্ক-কণ্টকিত প্রতিবেশ-রচনায় লেখকের কৃতিত্ব যে প্রশংসনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের আসল কৃতিত্ব অন্যত্র। তিনি ব্রহ্মদেশের অনভ্যস্ত পরিবেশে, বিপ্লব-বাদের গোপন চক্রান্তজাল ও দুঃসাহসিক কর্মপ্রেরণার প্রচণ্ড সংঘাতের পটভূমিকায় তাঁহার চিরপ্রিয় বিষয়-বিন্যাসের—মানবচিত্তে প্রেমের অলক্ষ্য সঞ্চার ও উহার লীলারহস্যময় ছন্দটির—অবসর রচনা করিয়াছেন। এই সংকল্প-কঠোর, ষড়যন্ত্র-জটিল, মৃত্যুগহন জগতেও প্রেম নিজ রাজসিংহাসন পাতিয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর বহুবাধা-বিড়ম্বিত, নানাসংঘর্ষক্লিষ্ট অনুরাগ এই হিংস্র অরণ্যভূমিতে নিজ বিরলবর্ণ ফুলটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সেই সনাতন কৌশল—সেবাধর্মের রন্ধ্রপথে প্রেমের অনুপ্রবেশ—এখানেও পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এখানে প্রেমের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথমতঃ, অপূর্বর দুর্বল, আরামপ্রিয়, একান্তরূপে পরনির্ভর ও অতিমাত্রায় ভীতিপ্রবণ চরিত্রই সর্বপ্রধান বাধা। তাহার মধ্যে নায়কোচিত আদর্শ বা শ্রদ্ধা আকর্ষণের উপযোগী গুণ একেবারেই নাই। সে নিজের শক্তি না বুঝিয়া পথের দাবীর সভ্য হইয়াছে ও আত্মরক্ষার হেয় দুর্বলতায় উহার গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই ঘোর অপরাধের যে শাস্তি—প্রাণদণ্ড—তাহা হইতে সব্যসাচীর ক্ষমাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। ভারতীর প্রতি তাহার আচরণও মোটেই প্রশংসনীয় নহে—তাহার সেবাকে সে স্বার্থপরের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছে, প্রতি-দানের কথা ভাবে নাই। তথাপি তাহার ছেলেমানুষিরই শেষ পর্যন্ত জয় হইয়াছে ও সে ভারতীর প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছে। এই দুর্বল, ভীরু মানুষটিকে শরৎচন্দ্র খুব জীবন্ত করিয়া ও সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন। ভারতী-চরিত্রও উহার সমস্ত জটিল সমস্যা ও প্রতিকূল

পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিজ জীবনকে দাঁড় করানোর দৃঢ় অধ্যবসায় লইয়া বেশ সুচিত্রিত হইয়াছে। তবে অপূর্ব ও ভারতীকে পথের দাবীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার কোন কারণ দেখা যায় না—অপূর্বর মনোবৃত্তি ত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, ভারতীর জীবনেও বৈপ্লবিকতার কোন প্রভাব পড়ে নাই। স্বাধীনতা-অর্জনের দুর্জয় সংকল্প ও অকুণ্ঠ ত্যাগ-স্বীকার হয়ত আমাদের বর্তমান জীবনে শিথিল হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ দেশাত্মবোধ স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গদেশে অনেকটা বেমানান ও অশোভনরূপে উচ্চকণ্ঠ অতিভাষণ বলিয়াই মনে হয়। পরাধীন জাতির মর্মবেদনা আমরা জীবনে অনেকটা ভুলিয়াছি, সাহিত্যেও ইহার অভিব্যক্তি মৃদুতর হইতে বাধ্য। যে যুগে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে বাপ-মা রোদনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ও যে ভাবাতিশয্যের প্রভাব আমাদের আগমনী ও বিজয়াগানে মুদ্রিত হইয়াছে সেই যুগচেতনা ও ভাবালুতার স্থায়িত্ব কি আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে আশা করা যায়? সুতরাং সব্যসাচী, সুমিত্রা, ব্রজেন, তলোয়ারকর প্রভৃতি চরিত্র ও বৈপ্লবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ একদিন আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু অপূর্ব, ভারতী, শশী, নবতারা প্রভৃতি নর-নারী তাহাদের অন্তর-রহস্যের চিরন্তনতায় প্রেমের অক্ষয় জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া পাঠকের মনে স্মরণীয়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে।

(৭)

'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্রের অন্তিম অসম্পূর্ণ রচনা—শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ভাষা, ভাব ও আখ্যায়িকার পরিণতির ইঙ্গিতগুলি রাধারাণী দেবী এমন নিপুণতার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন যে, উভয়ের রচনার মধ্যে ভেদ-রেখা লক্ষ্যগোচর হয় না। উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রিয় ও বহুধা পুনরাবৃত্ত বিষয়ের আলোচনা—চরিত্রস্খলনের পর নারীর সহজ মহিমা ও অন্তরের সুকুমার বৃত্তিসমূহ যে অক্ষুণ্ণ থাকে ও নিবিড় বেদনার পুটপাকে আরও নিগূঢ় করুণরস-ও-মাধুর্যপূর্ণ হইয়া উঠে তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ধনী গৃহের গৃহিণী, ও উদার, ধর্মপরায়ণ, স্নেহশীল স্বামীর পত্নী সবিতা কোন অনির্দেশ্য কারণে কুলত্যাগিনী হইয়াছেন। যে পরপুরুষের আকর্ষণে তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কক্ষচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেই রমণীবাবুর মধ্যে কোন আকর্ষণীয় গুণের সন্ধান মিলে না। রুক্ষ, পরুষ-প্রকৃতি, স্থূল ভোগ-লালসায় ইতর এই লোকটি কি যাদুমন্ত্র-প্রভাবে সবিতার মত মহীয়সী রমণীর প্রণয়ভাজন হইল তাহা শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়। সবিতা অনেকবার তাঁহার আদর্শচ্যুতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের উপরই দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। গ্রন্থের ৩০০ পৃষ্ঠায় লেখক ব্রজবাবুর সহিত তাঁহার যৌবন-কাঙ্ক্ষিত উচ্ছ্বসিত প্রণয়-মিলনের অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করিয়া একটা কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবিতার আচরণকে একটা আকস্মিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত করিয়া নিজ বিশ্লেষণ-প্রয়াস অর্ধ-সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। পদস্খলনের পর সবিতার চরিত্রে মহিমার আরোপ যেন সীতাবর্জনের পর রামের চরিত্র-মাহাত্ম্যজ্ঞাপন। এ যেন নাটকীয় climax বা চরম সংঘাতের মুহূর্তের পর নাট্যারম্ভ। যে দুর্বার শক্তি সবিতাকে গৃহকর্ত্রীর সম্ভ্রম, স্বামী ও সন্তানের স্নেহবন্ধন ও যুগযুগান্তব্যাপী, অস্থি-মজ্জাগত ধর্মসংস্কারের সুদৃঢ় বেষ্টনী হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে তাহাই তাহার অন্তর-

লোকের প্রধান পরিচয়। তাহার মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব-রহস্য নিহিত আছে। ইহাকে একটা দুর্বোধ্য খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দিলে ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্রদের সম্বন্ধে তাঁহার সর্বজ্ঞতার যে প্রত্যাশা আমরা করি তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অনুযোগের একটা প্রধান কারণ এই যে, সবিতার চরিত্র-রহস্য-উন্মোচনে তিনি তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন নাই।

এই প্রাথমিক ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে ইহা স্বীকার করা যায় যে, লেখক সবিতার চরিত্রে যে মহনীয়তা ও অন্তঃরুদ্ধ বেদনার ও আত্মগ্লানির অবিরাম জ্বালা দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি উদ্দেশ্যানুরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। সবিতার প্রণয়োন্মেষের যে কাহিনী আমাদের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছে তাহার বিষয়, বিমলবাবুর সহিত তাঁহার নূতন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠা। ইহাই তাঁহার শেষের পরিচয় এবং ইহার অনুসারেই উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে। ব্রজবাবুর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, স্বামীর শুভানুধ্যায়িনী, যাঁহার দাম্পত্য-সম্পর্ক নিছক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কল্যাণ-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণরূপে প্রেমের বৈদ্যুতী-আকর্ষণ-বর্জিত—ইহাই তাঁহার প্রথম পরিচয়। রমণীবাবুর ইতর, ভোগলিপ্সা-কলঙ্কিত সাহচর্যের মধ্যে নিজ কৃতকর্মের চরম তিক্ততা-আস্বাদনের দৃঢ় সংকল্প এবং সমস্ত অনুশোচনা সূক্ষ্ম মানস অতৃপ্তি ও প্রতিবাদের আত্মসংবৃতি সবিতার চরিত্রের বিশেষ অভিব্যক্তি। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী আত্ম-বিলোপের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রৌঢ় জীবনে বঞ্চিত হৃদয়াবেগ, কন্যা ও স্বামীর দ্বারা প্রতিহত হইয়া, বিমলবাবুর সহজ ভদ্রতা, সুরুচি-সংযম ও অকৃত্রিম হিতৈষণার চারিদিকে নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে এবং ইহার মধ্যেই তাঁহার শেষ ও সত্য পরিচয়ের স্বাক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। এই দেহলালসাহীন, সূক্ষ্ম ভাববিনিময়ের তন্তুজালরচিত অভিনব সম্পর্কের মধ্যে অতিক্রান্ত-যৌবন, অপগত-মোহ, দুঃখ-বেদনার অভিঘাতে বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নর-নারীর এক নূতন মিলনের আদর্শ মূর্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ অনেকটা দ্রুতগতিতে সহজ শিষ্টাচার হইতে নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কামনার ভিতর দিয়া প্রেমের অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছিয়াছে; সবিতার দিক দিয়া ইহা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান; বিমলবাবুর দিক্ দিয়া তাঁহার রমণী-প্রভাবশূন্য শুষ্ক অন্তরে দুঃখমথিত নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধ অমৃত-নির্যাস-নিষেকের জন্য ব্যগ্রতা।

এই সম্বন্ধের অঙ্কুরোদ্গম হইতে পরিপক্কতা পর্যন্ত ক্রমবিকাশের সমস্ত স্তরগুলি আলোচনা করিলে মনের মধ্যে ইহার অনিবার্যতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জাগে। এই উপলক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-বিনিময়, প্রীতি-শ্রদ্ধার আদান-প্রদান ও আদর্শবাদমণ্ডিত হৃদয়াবেগের নিবেদন হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্তের মধ্য দিয়া প্রেমের বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে আমরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মন্থনের ভিতর দিয়া, চাপিয়া রাখা প্রেমের উত্তাপ ও দাহ, ইহার আনন্দ-বেদনা-মিশ্র, লাঞ্ছনা-গৌরব-জড়িত মনোভাবের প্রত্যক্ষ স্পর্শ অনুভব করি। কমললতা ও সবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেমের আবির্ভাবকে অনেকটা সুলভ ভাবাতিশয্যের অতি আর্দ্র জলাভূমি হইতে অনায়াস-ক্ষরিত বলিয়া ঠেকে। ইহারা যেন অতি সহজেই প্রেমের মাধ্যাকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—সাধনা ব্যতিরেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমাদের সামাজিক আবেষ্টন, ধর্মসংস্কার ও মানস

বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবেচনা করিলে প্রেমের এই অতর্কিত পরিণতিকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। রাখাল ও সারদার সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের নির্মম নিষ্পেষণ, মর্মগ্রন্থিচ্ছেদী তীক্ষ্ণতা অনুভূত হয়—যদিও পুনরাবৃত্তির জন্য এই প্রকার চিত্রণের অভিনবত্ব অনেকটা ম্লান হইয়াছে। ইহার সহিত সবিতা-বিমলবাবুর শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, নিরুত্তাপ সম্বন্ধের যথেষ্ট পার্থক্য। হয়ত বা এই শেষোক্ত সম্পর্ক প্রেমই নহে, ইহা প্রেমের ছদ্মবেশী সহৃদয় বন্ধুতা মাত্র। প্রৌঢ় জীবনের প্রেমে রক্তিমাভা অনেকটা ধূসরায়িত হইয়াই থাকে। এই সম্বন্ধের পরিণতি হইয়াছে মিলনে নহে, সম্ভাবিত মিলনের প্রতীক্ষায়। সে যাহা হউক, সবিতার এই নূতন প্রেমিক-বরণের ব্যাপারে আমরা রাখালের মত কতকটা অনাস্থাশীলই থাকিয়া যাই। প্রণয়িনী অপেক্ষা জননীরূপেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রাখাল ও তারকের বন্ধুত্বের ঈর্ষ্যাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসান লেখকের প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। অন্ততঃ গ্রন্থারম্ভে, যখন দুই বন্ধুর সৌহার্দ্য ও সম-প্রাণতার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তখন এরূপ পরিণতির কোন ইঙ্গিতের—তারকের চরিত্রে স্বার্থের জন্য বড়মানুষের আনুগত্য ও আত্মসম্মানজ্ঞানহীন উচ্চাভিলাষের—কোন গোপন বীজের চিহ্ন চোখে পড়ে না। মনে হয় যেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী বন্ধুত্বের সরল-প্রবাহিত ধারাটির এই নূতন দিকে মোড় ফিরাইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এই পরিবর্তনটি কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়া বেশ সমীচীনই হইয়াছে; ঈর্ষ্যার বেগবান্ জীবনীশক্তিতে রাখাল ও তারক উভয়েই প্রাণধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, ইহাতে রাখালের চরিত্রগৌরব বাড়িয়াছে ও সারদার প্রতি তাহার মনোভাব কল্পিত বাধার প্রেরণায়, মান-অভিমানের লীলায় স্ফুটতর ও গভীরতর হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ব্রজবাবু, রেণু ও সারদা উল্লেখযোগ্য। সারদার বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই—সে কেমন করিয়া জানি না সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির মত কলঙ্কিত ইতি-হাসের বহিরাবরণের মধ্যে প্রেমের অম্লান সুরভি ও দীপ্ত মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নারী-চরিত্রের যে রহস্য শরৎচন্দ্রের দ্বারা বার ব'র উদাহৃত হইয়াছে, সারদা তাহারই শেষ অনুবৃত্তি। ব্রজবাবু আত্মভোলা ধর্মবিহ্বলতার পরিমণ্ডল হইতে নিজ ব্যক্তিত্বকে ঠিক উদ্ধার করিতে পারেন নাই—অপরাধিনী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুযোগহীন ক্ষমার সহিত তাহার পুনর্গ্রহণ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাবের সামঞ্জস্যের উৎসটি অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়। মনে হয় যেন স্ত্রীর সহিত চিরবিচ্ছেদের সংকল্প তাঁহার নিজের নয়, তাঁহার কন্যার বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি হইতে সংক্রামিত। রেণুর মৃত্যুর পর ব্রজবাবু পত্নীকে সেবা-শুশ্রূষার অধিকার-সম্পর্কে কোন বাধা দেন নাই। কাজেই তাঁহার অনিচ্ছাকে কোন অলঙ্ঘনীয় আদর্শের অনুশাসনরূপে গ্রহণ করা যায় না। রেণুর শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস মিতভাষিতার পিছনে যে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ-শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা চেতনাহীন জড়শক্তির বিরোধিতার ন্যায়ই অক্ষয় ও পরিবর্তন-হীন। তাহার অভিমানপুষ্ট, অবিচারের বেদনায় মোহগ্রস্থ বিবেক ও নীতিবোধ তাহার অন্তরে যে পাষাণ প্রাচীর তুলিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্রতম ফাটল দিয়াও মাতৃস্নেহের একবিন্দু শীকরকণা, পূর্বস্মৃতির এক ঝলক উড়ো হাওয়াও প্রবেশাধিকার পায় নাই। মোটের উপর শরৎচন্দ্রের এই শেষ উপন্যাসটিতে তাঁহার পূর্বতন শক্তির আংশিক পুনরুদ্ধার লক্ষিত হয়; এবং যদিও সম্পূর্ণ

উপন্যাসটির কৃতিত্ব তাঁহার একা প্রাপ্য নহে, তথাপি ইহার পরিকল্পনা ও আলোচনাভঙ্গীর চমৎকারিত্ব, ঘটনাবিন্যাস ও হৃদয়বিশ্লেষণের উৎকর্ষ ইহাকে শরৎচন্দ্রের অন্তিম রচনার উপযুক্ত গৌরব ও মর্যাদা অর্পণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের শেষ অবদান যে তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির রশ্মিজালমণ্ডিত—এই সিদ্ধান্ত শরৎ-সাহিত্যের নিকট বিদায়গ্রহণের প্রাক্‌কালে আমাদের মনে পুলকিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

বঙ্গ-উপন্যাস ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যে কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, কিরূপ বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করিয়াছেন তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। বঙ্কিম উপন্যাসের জন্য যে নূতন পথ প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই পথ অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস ত একেবারেই লোপ পাইয়াছিল, সামাজিক উপন্যাসও তাঁহার গৌরব ও অর্থগভীরতা হারাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অবরুদ্ধ পথ কতকটা মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করিতে তিনি যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনি অননুকরণীয়। তাহার কবি-কল্পনার মুক্ত পক্ষ আশ্রয় করিয়াই তিনি উপন্যাসের পথের এই পাষাণ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। যে কবিত্বশক্তি সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সন্ধান পায়, প্রকৃতির মধ্যে মানবমনের উপর নিগূঢ় প্রভাবের রহস্য খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার দ্বারাই তিনি উপন্যাসের বিষয়গত অকিঞ্চিৎকরত্ব অতিক্রম ও রূপান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত পথে তাঁহার পরবর্তীদের পদচিহ্ন নিতান্তই বিরল, তাঁহার কবি-প্রতিভা না থাকিলে তাহার অনুসরণ অসম্ভব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রতিভার ছাপ মারিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পরিধি ও প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি করেন নাই। এই অবসরে শরৎচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধির নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী না হইয়াও কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা ও করুণরসসৃজনে সিদ্ধহস্ততার গুণে বঙ্গ-সমাজের কঠিন, অনুর্বর মৃত্তিকা হইতে নূতন রসের উৎস বাহির করিয়াছেন ও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতির পথরেখা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের পারিবারিক জীবনে অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার মধ্যে গূঢ় ভাবের লীলা দেখাইয়াছেন; আমাদের নারী-চরিত্রের জড়তা ও নির্জীবতা ঘুচাইয়া তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া একসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও করুণরসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, এই আত্মপীড়ননিরত জাতির ভগবদ্দত্ত দুঃখ যে নিজ মূঢ়তায় কত বাড়িয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। সর্বশেষে তিনি প্রেম-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়-দানের পর তাঁহার প্রতিভাতে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছে; এবং উপন্যাস-সাহিত্যের আকাশে আবার অনিশ্চয়তার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এ অনিশ্চয়তার কুহেলিকা যখন কাটিয়া যাইবে ও অগ্রগতির প্রেরণা যখন আবার গতিবেগ আহরণ করিবে তখন ইহা শরৎচন্দ্রের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া যাইবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন।

দশম অধ্যায়

স্ত্রী-ঔপন্যাসিক

(১)

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহিলা-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়—প্রেম, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ-রহস্য; ইহারই অফুরন্ত বিচিত্রতা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পল্লবিত হইয়াছে। এই প্রেম-চিত্রণের ভার যদি সম্পূর্ণরূপে পুরুষেরই একচেটিয়া হয়, তাহা হইলে ইহা যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইবে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। সাধারণতঃ পুরুষ ঔপন্যাসিকের চিত্রে আমরা প্রেমের যে বিবৃতি পাই, তাহাতে পুরুষেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য, স্ত্রী-চরিত্র গৌণ অংশ অধিকার করিয়া থাকে। এই হৃদয়াভিযানের কাহিনীতে প্রথম পদক্ষেপ পুরুষের দিক্ হইতেই আসিয়া থাকে; নারী নিজ স্থানে নিশ্চল হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই যাত্রার ফল প্রতীক্ষা করে। পুরুষের মনোভাব-বিশ্লেষণেই লেখকের প্রধান প্রচেষ্টা; নারীচিত্ত-বিশ্লেষণের চেষ্টা যেখানে হইয়া থাকে, সেখানেও মূলতঃ পুরুষের আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ারূপেই ইহার আলোচনা।

অবশ্য মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-প্রথার দিক্ দিয়াও বঙ্গ-সাহিত্যে এই পুরুষ-প্রাধান্যই স্বাভাবিক ও অতি অল্পদিন পূর্বেও অপরিহার্য ছিল। একে ত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রণয়ের অবসর খুব সংকীর্ণ; তার উপর যে সব স্থলে কোন অলক্ষিত রন্ধ্রপথ দিয়া প্রেম জীবনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানেও নারীর কোন বিশেষ দাবি বা অধিকারের মর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। সে পুরুষের প্রেমনিবেদন হয় গ্রহণ না হয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; তাহার মধ্যে কোন সুরের বৈশিষ্ট্য, কোন প্রকার-ভেদ আনে নাই। প্রেমে যে পুরুষ ও নারী উভয়েরই পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন, এই তথ্য আমাদের ঔপন্যাসিকেরা সত্য-হিসাবে স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেন নাই।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্যেরও প্রথম যুগে নারীর বাণী মূক ও নীরব ছিল—পুরুষের ইচ্ছার অনুবর্তন বা প্রতিরোধই তাহার একমাত্র কার্য ছিল। **Jane Austen** ও **Bronte** ভগিনীরাই প্রথম উপন্যাসের মধ্যে নারীত্বের সুরের প্রবর্তন করেন। সমস্ত জগৎ-ব্যাপারটা নারীর চক্ষে কিরূপ ঠেকে, নারীত্বের রঙিন চশমার মধ্য দিয়া কিরূপ বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়, পুরুষের সগর্ব প্রাধান্যাধিকার নারীর বিদ্রূপমণ্ডিত সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া কিরূপ বিসদৃশ ও হাস্যজনক দেখায়, **Jane Austen**-এর উপন্যাসে ইংরেজ পাঠক তাহার প্রথম পরিচয় পান। আবার অন্য দিক্ দিয়া নারীর চরিত্র স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের হাতে বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। পুরুষের আবেশময় দৃষ্টির মধ্য দিয়া নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও অন্তর-সুষমা প্রায় আদর্শলোকের মহিমমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; নারীর স্বজাতি-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও কঠোর সত্যপ্রিয়তা এই আদর্শ জ্যোতিকে অনেকটা ম্লান করিয়া উপন্যাসের নায়িকাকে বাস্তবতার মৃত্তিকা স্পর্শ করাইয়াছে। স্ত্রী-

ঔপন্যাসিকের বর্ণিত নারী-চরিত্রের দেহ-সৌন্দর্যের আধিক্য বা স্তব-স্তুতির অতিরঞ্জনের সুর নাই; আছে গভীর বিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজ অধিকার সম্বন্ধে একটা ক্ষুব্ধ, ধূমায়িত বিদ্রোহোন্মুখতা। এই বিদ্রোহের সুর, সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অনুযোগের তীব্রতা ইংরেজী উপন্যাসে সর্বপ্রথম Bronte ভগিনীদের উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহাদের নায়িকারা প্রায়ই সৌন্দর্যহীন, সাধারণ অবস্থার স্ত্রীলোক, শিক্ষয়িত্রী বা সহচরী ইত্যাদিরূপ বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। ব্যবহারে তাহারা সংকুচিতা, লজ্জা-শীলা ও স্বল্পভাষিণী; কিন্তু এই বাহ্য শান্ত সংযত ভাবের অন্তরালে তীব্র অন্তর্বিদ্রোহের অগ্নি সর্বদাই প্রধুমিত। একটা গূঢ় অভিমান ও প্রচ্ছন্ন আত্মমর্যাদাবোধ সর্বদাই তাহাদের অনুভূতিকে তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারকে অসাধারণরূপে তীক্ষ্ণ ও বিদ্রোহ-কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসা পাইবার যে সনাতন, রাজকীয় অধিকার নারীজাতির আছে, সেই অধিকারবোধ তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রবলভাবে জাগ্রত। এই দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাহাদের প্রতিমুহূর্তের রক্ত-সঞ্চরণের, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গতিবেগ বর্ধিত করিতেছে, এই প্রেমা-কাঙ্ক্ষার অকুণ্ঠিত, লজ্জাসংকোচহীন অভিব্যক্তিই তাহাদের ভাষাতে তীব্র আবেগ ও উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছে। নারী-চরিত্রের এই একটা অপ্রকাশিত দিক Bronte-ভগিনীদের উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

জর্জ এলিয়টের উপন্যাসে রমণীসুলভ আর একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ বয়সের উপন্যাসগুলি পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিশ্লেষণাধিক্যের দ্বারা ভারগ্রস্ত অভিভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমদিকের উপন্যাসগুলিতে আমরা নারী-হস্তের লঘু কোমল স্পর্শ, শিশুর চিত্রাঙ্কনে মাতৃ-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করি। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে লেখকের নাম-পরিচয় ছিল না; সুতরাং তাহাদের আবির্ভাব-কালে সমালোচক-মহলে অনুমান-শক্তির বেশ একটা পরীক্ষা চলিয়াছিল। অনেকেই তাহার পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিল। কেবল ডিকেন্স-প্রভৃতি দুই-একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাঁহার আসল স্বরূপটিকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। জর্জ এলিয়টের ব্যক্তিত্ব লইয়া জল্পনা-কল্পনা এবং দুই-একজন পাঠকের অনুমানের সত্যতা অন্ততঃ ইহাই প্রমাণ করে যে, নারীর রচনায় একটা বিশিষ্ট সুর আছে, ও উপন্যাসে নারীর অবদান কেবল পুরুষের প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

অবশ্য ইহাও সত্য যে, সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ড স্ত্রী-পুরুষ-নিরপেক্ষ-ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে—পুরুষ ও নারীর রচিত-সাহিত্য-বিচারের কোন বিভিন্ন আদর্শ নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ ও জীবন-সমস্যার গভীরতা-প্রতিপাদন সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসেরই সাধারণধর্ম। আধুনিক ইউ-রোপীয় সাহিত্যে যে উপন্যাস রচিত হইতেছে তাহাতে স্ত্রী-পুরুষের সুর-বৈশিষ্ট্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। ইহার মুখ্য কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, সাধারণ প্রতিযোগিতা ও সহকর্মিতার ফলে উভয়ের প্রকৃতি ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে—নারীর মনে উপেক্ষা ও অবহেলার জন্য যে গূঢ় অভিমান ও অনুযোগ ছিল, তাহার তীব্রতা এখন অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজে নারী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত তুল্যা-ধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—পুরুষের একাধিপত্যের দুর্গে সে তাহার বিজয়-নিশান উড়াইয়াছে।

হীনতা ও অপকর্ষের গ্লানি আর তাহার দেহ-মনে লাগিয়া নাই; সুতরাং পূর্বে তাহার রচনায় ও ব্যবহারে যে একটা বিদ্রোহোন্মুখ অভিযোগের সুর লাগিয়া থাকিত, এখন তাহা ঘুচিয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে সমকক্ষতার প্রসন্ন গাম্ভীর্য অধিষ্ঠিত হইয়াছে। নারীর এখন আর জাতিগত বিশেষ সমস্যা, বিশেষ দাবি-অভিযোগও নাই—এখন পুরুষের যে সমস্যা, নারীরও প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ব্যবহারে, ভাব-প্রকাশে, প্রণয়নিবেদনে, এক কথায় হৃদয়ঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বার-মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাতের যে প্রবল প্রচেষ্টা তাহার সাহিত্যে একটা অশান্ত প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছিল, তাহা নীরবতায় বিলীন হইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থা ও প্রতিবেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে নারী-সাহিত্যে একটা গভীর ভাবগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ও নারীত্বের বিশেষ সুর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে মহিলা-রচিত উপন্যাসের বিচার করিতে এই দুইটি মূলসূত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।—প্রথমতঃ, তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কতখানি ও দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে নারীর সুর-বৈশিষ্ট্যের কতখানি পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাংলা উপন্যাসে নারী-বৈশিষ্ট্য ঠিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত অভিন্ন নহে। সামাজিক রীতিনীতি ও অবস্থা-বৈষম্যের জন্য উভয়ক্ষেত্রে সুরেরও পার্থক্য হইবে। যে তীব্র, ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত মৃদু অভিযোগের আকারে বঙ্গ-উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বাংলার নারী এ পর্যন্ত পুরুষের সহিত সমকক্ষতার ও তুল্য প্রতিযোগিতার কোন ব্যাপক দাবি উপস্থিত করে নাই, কেবল কতকগুলি অন্যায় অত্যাচার ও বৈষম্যের হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে। আমাদের বিবাহ-প্রথার অন্তর্নিহিত নির্লজ্জ বণিকবৃত্তি, জীবন-সংগ্রামে অভিভাবকহীন নারীর শোচনীয় অসহায় অবস্থা, পুরুষের হৃদয়হীন স্বেচ্ছাচারিতার নির্মম অবিচার নারীর আত্মমর্যাদায় প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়া তাহাকে যুগযুগান্তরের নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য ও নিশ্চল জড়তা হইতে জাগাইয়াছে; তবে তাহার অভিযোগের মধ্যে বিদ্রোহ অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য। অবশ্য সত্যের খাতিরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলনে পুরুষই অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক হইয়া নারীর গূঢ় অনুযোগকে সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়াছে; এবং শুধু করুণরসের দিক্ দিয়াও কোন স্ত্রী-লেখক শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী চিত্রণের সমকক্ষতা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত ব্যাপারে পুরুষ নারীর জন্য যতটা সমবেদনা অনুভব করে ও যেরূপ তীব্র আবেগের সহিত তাহার পক্ষ সমর্থন করে, নারীও বোধ হয় ততটা পারে না। সুতরাং এই বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন লক্ষণীয় প্রভেদ আবিষ্কার করা দুরূহ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও অনুধাবন করা উচিত। স্ত্রী-জাতির নিজস্ব বাণী ও জীবন-বিশ্লেষণের দাবি করিবার পূর্বে আমাদের ভাবা উচিত যে, আমাদের বাংলাদেশের বিশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে নারীর কোন নূতন আলোকপাত করিবার সুযোগ ও সুবিধা আছে কি না। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর অভিযোগ অনেকটা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অসহায় আক্ষেপ; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন নূতন মত-গঠনের ইঙ্গিত, কোন নূতন সামঞ্জস্যের অঙ্কুর পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অভিযোগই নারীর

বিশিষ্ট বাণী, ইহা বলিলে বিশেষত্বের কোন মূল্য থাকে না। সাধারণতঃ পুরুষের দৃষ্টি হইতে জীবনযাত্রার যে অংশ অপসারিত থাকে, স্ত্রীলোক যদি সেই অপ্রকাশিত অংশের উপর আলোকপাত করিতে পারিত, তাহাকে নূতন অর্থগৌরব ও রসসমৃদ্ধিতে ভরিয়া তুলিতে পারিত, সমাজ-জীবনের বর্তমান শ্রেণীবিভাগ ও দায়িত্ব-বণ্টনকে নব-বিন্যস্ত সামঞ্জস্যের মধ্যে বিধিবদ্ধ করিতে পারিত, তবে নারীর সমালোচনা-বৈশিষ্ট্যের একটা অর্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন আমরা যাহাকে নারীর বাণী বলি, তাহা মুখ্যতঃ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবি, এই সমাজ-ব্যবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন নহে। বিশেষতঃ, আমাদের সমাজে নারী এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতেছে, তাহার হৃদয়ের যে গভীর-গোপন স্তরে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত হইবার কথা তাহা পুরুষ-রচিত কৃত্রিম বিধি-ব্যবস্থার চাপে এরূপ পিষ্ট, দলিত হইয়াছে যে, তাহার নব-অঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। সে নিজেকে সমাজ-যন্ত্রের একটা অঙ্গমাত্র বিবেচনা করিয়াছে, তাহার পৃথক সত্তা পুরুষের ব্যবস্থাপিত আদর্শ ও কর্তব্য-পালনে বিলীন হইয়াছে। অতি আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য সমাজের অনুকরণে ভারতীয় নারী সাহিত্যের দরবারে যে নূতন দাবি পেশ করিতেছে, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জনের সুর অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তাহা তাহার সনাতন জীবন-ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ভ্রম করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরের ধার করা কথায় নিজ হৃদয়-ভাব কতটুকু প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে। অবশ্য কিছুদিন হইতে আমাদের সামাজিক গঠন-রহস্য ও আদর্শ লইয়া নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, সমাজছন্দটিকে নূতন তালে, নব গতিভঙ্গীতে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে; সমাজ-স্থিতির ভার-কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন হইতেছে। একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নারী বিস্তৃততর মুক্তির আস্বাদন, তাহার সংকুচিত ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণের নূতন অবসর পাইয়াছে। আবার পুরুষের অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করিলে যে অবস্থান্তর সংঘটিত হইবে, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর আত্মপ্রকাশের সুর গভীরভাবে রূপান্তরিত হইবে তাহা অনুমান করা চলে। যে পর্যন্ত এই প্রত্যাশিত পরিবর্তন সংঘটিত না হয়, সেই পর্যন্ত নারীর সুর হয় বিদ্রোহাত্মক না হয় পুরুষের প্রতিধ্বনিমূলক হইবে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আর একদিক দিয়া নারীর অবদানের বৈশিষ্ট্য আশা করিতে পারি। সাধারণতঃ পুরুষ-ঔপন্যাসিকের পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নিতান্ত অল্প, আমাদের সমাজ-প্রথা শুধু যে নারীর মুখের উপরই অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয় তাহা নহে, তাহার মনের উপরও ঘনতর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রচনা করে। আমাদের নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদেরও ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কতই সামান্য! সুতরাং পুরুষ ঔপন্যাসিক নারী-চিত্র-অঙ্কনের সময় একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা-দত্ত সহজজ্ঞানের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে মহিলা-ঔপন্যাসিকের সুযোগ ও অবসর অনেক অধিক। তাঁহার নিকট নারীর অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন স্বতঃই খসিয়া পড়ে; সুতরাং পরিবার-যন্ত্রের নিগূঢ় প্রাণ-স্পন্দন যে তাঁহার নিকট আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রতিভার দিক দিয়া

সমান হইলে, সুযোগের দিক্ দিয়া নারীর চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যিক উৎকর্ষের দাবি করিতে পারিবে। আবার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার চিত্রগুলিও নারী-হৃদয়ের বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া আরও কোমল ও মর্মস্পর্শী হইবে—এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। নারীর যে বিশেষত্ব তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার বলার ভঙ্গীতে, তাহার আবেগ-কম্পিত ভাবপ্রকাশে, তাহার স্নেহ-ব্যাকুল, অশ্রু-সজল আশীর্বাদ-ধারায় ফুটিয়া উঠে, তাহার রচিত সাহিত্যে তাহাই লালিত্য ও কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে। তাহার জীবন-সমস্যা-বিশ্লেষণে, তাহার মন্তব্য ও চিন্তা-ধারার মধ্যেও এই ললিতগুণের আধিক্য ও তীক্ষ্ণ পরুষতার অভাব সমালোচকের চক্ষে ধরা পড়িতে পারে। মোট কথা, জর্জ এলিয়টের প্রথম বয়সের উপন্যাসে যে সমস্ত লক্ষণ নারীর কল্যাণ-হস্তের সুকোমল স্পর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাসেও সেই সমস্ত গুণের বিকাশ নারীর বিশিষ্ট অবদানরূপে প্রত্যাশিত হইতে পারে।

(২)

এইবার কয়েকটি বিশিষ্ট নারী-ঔপন্যাসিকের রচনা আলোচনা করা যাইতে পারে। মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম পথ-নির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক্ দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান:—(১) দীপনির্বাণ, (২) ফুলের মালা, (৩) মিবার-রাজ, (৪) বিদ্রোহ। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ লেখকের ইতিহাস-জ্ঞান ও কল্পনামূলক পুনর্গঠন-শক্তির উপর নির্ভর করে—এখানে নারীর বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠার বিশেষ অবসর নাই। মোটের উপর স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই—এই ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিকতার দাবিও খুব বেশি নহে। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই যেন তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমের ন্যায় কল্পনার প্রসার ও তীব্র উচ্ছ্বাস তাঁহার নাই—সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয়। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের দিক্ দিয়া বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) স্বর্ণকুমারী দেবীর অতি অল্প বয়সের রচনা; এবং ইহার সর্বত্রই কাঁচা হাতের নিদর্শন প্রচুরভাবে বিদ্যমান। চিতোর-রাজের পারিবারিক ইতিহাস ও মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণ—এই দুই ঐতিহাসিক ধারা উপন্যাসের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রটি বাস্তব রস-সমৃদ্ধ নহে—মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে হিন্দুরাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় না। একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজের রাজনীতি-বিরুদ্ধ উদারতা—এই দুইটি হিন্দু-পরাজয়ের মুখ্য কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিক সংঘটনের ফাঁকে প্রাত্যহিক জীবনের গতিবিধির কোন ক্ষীণ পরিচয়ও পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে অপক্ষপাত সুবিচার করিবারও

কোন চেষ্টা নাই—মুসলমানেরা যেন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ও হিন্দুদের সরল বিশ্বাসপ্রবণতার জন্যই যুদ্ধ জয় করিয়াছে। ইতিহাস কিন্তু এই পক্ষপাতমূলক সাক্ষ্যে সায় দিতে পারে না।

উপন্যাসের অধিকাংশই দুইটি মামুলি ও বৈচিত্র্যহীন প্রেমকাহিনী-বর্ণনাতে পূর্ণ হইয়াছে। প্রভাবতী ও শৈলবালার সখিত্বই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনাবিন্যাসও প্রশংসনীয় নহে—ইহার মধ্যে আকস্মিকতার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। চরিত্রগুলিও সাধারণতঃ নির্জীব ও রসহীন। কেবল এক থানেশ্বরের যুদ্ধবর্ণনাতেই লেখিকার বর্ণনাকৌশল কতকটা জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ-রচনায় তথ্যজ্ঞানের অভাব ও প্রণয়চিত্রাঙ্কনে নারীর বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিহীনতাই উপন্যাসটির উৎকর্ষের পথে প্রধান অন্তরায়।

'ফুলের মালা' উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার দাবি ও মর্যাদা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রতিবেশ-কাল বাংলাদেশে পাঠান রাজত্বের সময়, যখন সেকেন্দার সাহ্ দিল্লীর অধীনতা কার্যতঃ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে স্বাধীন-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একদিকে দিনাজপুরের রাজ-বংশের সহিত বঙ্গেশ্বরের, অন্যদিকে বঙ্গরাজ-পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্রের বিরোধ উপন্যাসটির প্রধান বিষয়-বস্তু। এই যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনা একেবারে শূন্যগর্ভ নহে, ইহার মধ্যে কতকটা তথ্য-সন্নিবেশের চেষ্টা হইয়াছে। বিশেষতঃ, যুদ্ধের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব, তাহাদের মনে স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা ও দেশ-প্রীতির সংঘর্ষের কতকটা ইঙ্গিত উপন্যাসমধ্যে পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি প্রায়ই মামুলি ও বিশেষত্ব-বর্জিত। শক্তির দৃপ্ত অভিমান ও তেজস্বিতা, কতকটা অতিনাটকীয় হইলেও, অস্বাভাবিক হয় নাই। গণেশদেব, কতকটা রোমান্সের নায়কের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও একেবারে অবাস্তব নহে; তবে তাঁহার রাণী নিরুপমা নিতান্ত অস্ফুট ও প্রাণহীন। সেইরূপ যোগিনী অতি-মানব-রাজ্য হইতে আমদানি হইয়াছে। গিয়াসুদ্দিনের পার্শ্বচর ও বিশ্বস্ত সচিব কুতব সাধারণ stage villain অপেক্ষা একটু উন্নততর পর্যায়ভুক্ত। লেখিকার মন্তব্যগুলির মধ্যে অর্থগৌরব ও উপযোগিতার লক্ষণ পাওয়া যায়। মোটের উপর ঐতিহাসিক উপন্যাসহিসাবে 'ফুলের মালা' 'দীপনির্বাণ' অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

'মিবার-রাজ' ও 'বিদ্রোহ'—রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী—ভীল ও রাজপুতের জাতিগত বিরোধের বিবরণ। 'মিবার-রাজ' উপন্যাসে পার্বত্য ভীলজাতির একদিকে রাজভক্তি ও সরল বিশ্বাসপ্রবণতা, অপরদিকে চিরাচরিত প্রথার প্রতি অবিচল আনুগত্য ও বংশগত বৈর-নির্যাতনপ্রবণতার চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসটি আয়তনে ক্ষুদ্র ও উহার বর্ণিত ঘটনা-বিন্যাসও স্বল্পাবয়ব। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি দুইশত বৎসরের পরবর্তী ঘটনার বিবৃতি। ইহাতে ভীল ও রাজপুতের পরস্পর-সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা খুব সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইশত বৎসরের মধ্যে ভীলের জন্মভূমি রাজপুতের অধিকারে আসিয়াছে। ভীল রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কৃষিকর্ম, মেষপালন প্রভৃতি নীচজনোচিত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে প্রায়ই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ও বিজেতা রাজপুতের প্রতি অনুরক্ত, তবে কোথাও কোথাও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অসন্তোষের ভস্মমধ্যে সুপ্ত আছে। রাজপুত

ভীলের প্রতি মনে মনে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে তবে সে পূর্ব উপকারের কথা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। এই জাতিবিরোধের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবটি উপন্যাসের মূল প্রতিবেশ। সভাসদ্‌গণের হাস্য-পরিহাস-মুখর রাজসভার চিত্রটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। অস্থিরমতি, উদ্ধতপ্রকৃতি রাজার চরিত্রের মধ্যেই যে বিপদের বীজ নিহিত আছে, অনুকূল প্রতিবেশ-প্রভাবে ও দৈবপ্রতিকূলতায় তাহাই পল্লবিত হইয়া উঠিয়া সমগ্র জাতির ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রাজা ও রাণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্যের চিত্রটি খুব সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভীল যুবক জুমিয়ার প্রতি রাজার সৌহার্দ্য ও জুমিয়ার পালিত কন্যা সুহারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ তাঁহার রাজ্য ও পারিবারিক জীবনে অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছে।

সুহারের প্রতি আকর্ষণে প্রথম প্রথম দূষণীয় কিছু ছিল না; কিন্তু জনাপবাদের পঙ্কিল স্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে ক্লেদাক্ত করিয়া দিল। চারিদিকের বিরুদ্ধতায় এই নির্দোষ আকর্ষণে ক্রমশঃ প্রেমের আবেশময় রাগ সঞ্চারিত হইল। অন্যদিকে এই দৈবাহত সম্বন্ধের ফলে আরও গুরুতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সুহারের পাণিপ্রার্থী ভীল যুবক ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় ও প্রতিহিংসার তাড়নায় একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং ভীলদের মধ্যে যে রাজবিদ্রোহমূলক একটা প্রচ্ছন্ন আন্দোলন অর্ধসুপ্ত ছিল তাহা এই উত্তেজনায় প্রবল হইয়া উঠিল। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ভীলেরা রাজপুতরাজ্য ধ্বংস করিল। জুমিয়া এই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া তাহা নিবাইবার বৃথা চেষ্টায় আত্মবলিদান দিল। রাজপুত ও রাজপুতবংশের ভবিষ্যৎ আশা শিশু বাপ্পারাও সুহারের মাতৃস্নেহশীতল বক্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া পিতৃরাজ্য-উদ্ধারের শুভদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উপন্যাসের ট্রাজেডি এইরূপ অনিবার্য ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসভা, ভীল ও রাজপুতের পরস্পর সম্বন্ধ, ভীলদের সরল গ্রাম্য জীবন, কুসংস্কারপরায়ণতা ও অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থার চিত্র বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রাজা ও রাণীর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব-পরিবর্তনের ধারাটি ও ট্রাজেডির অনিবার্য, অবিসর্পিত গতিটি বিশেষ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের মধ্যে খুব মৌলিকতা না থাকিলেও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মিলে। দশম অধ্যায়ে বনভূমির বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বময় সূক্ষ্ম অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায়—বন্যপ্রকৃতির অযত্ন-বর্ধিত অজস্রতা লেখিকার কল্পনাসমৃদ্ধিকে জাগাইয়াছে। মোট কথা 'বিদ্রোহ' উপন্যাসটি রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত সর্বথা তুলনীয়, এমন কি কোন কোন বিষয়ে—ভাষা, কবিত্ব-শক্তি, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের দিক্ দিয়া—রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবি করিতে পারে।

(৩)

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে 'ছিন্ন মুকুল', 'হুগলীর ইমামবাড়ী', 'স্নেহলতা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ও 'কাহাকে' এই চারিখানির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত উপন্যাস ছাড়া বাকীগুলি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। সমাজ ও ধর্মসংস্কারের প্রবল উত্তেজনা তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুফান তুলিয়া তাহার

গঠন-সৌষ্ঠব নষ্ট করিতেছিল। সামাজিক বিচার-বিতর্ক ও প্রশ্নসংকুলতা লেখকের মনে এমন একটা অশান্ত ধূমকুণ্ডলী পাকাইত যে, উপন্যাসের বস্তুতন্ত্রতা এই ধূমাবরণের মধ্যে ধূসর অস্পষ্টতায় হারাইয়া যাইত। উপন্যাসের প্রকৃত গঠন ও উপযোগিতা-সম্বন্ধে লেখকদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না; চমৎকার পারিবারিক চিত্র আঁকিতে আঁকিতে হঠাৎ তার্কিকতার ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া গল্পের প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অধিকাংশ পারিবারিক উপন্যাসই এই সমাজ ও ধর্মবিপ্লবগত বিক্ষোভ হইতে মূল প্রেরণা পাইত। সুতরাং জন্মস্থানগত এই তত্ত্বমূলক বিচার-বিতর্কের প্রলোভন হইতে অব্যাহতিলাভ ইহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের বাস্তবজীবনে এই তত্ত্বান্বেষণপ্রবৃত্তি ফুটাইয়া তোলার মত বাস্তব-রসসমৃদ্ধি ও নিরপেক্ষতা (detachment) খুব অল্প ঔপন্যাসিকেরই ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা যুগান্তরের ঢেউয়ে এরূপ হাবুডুবু খাইয়া উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি তত্ত্বালোচনার বাষ্পে ফাঁপাইয়া তুলিতেছিলেন। গর্ভস্থ ভ্রূণদেহের ন্যায় উপন্যাসের দেহও এই যুগে অস্ফুট ও অপরিণত ছিল। এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সে যুগের প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিকই এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অর্ধনিষ্ফল প্রয়াস করিতেছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভাই এই যুগান্তরের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ব্যক্তিগত জীবনের সৌন্দর্য-পরিপূর্ণতা ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল, বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন পরমাণু হইতে তিনি কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর মূর্তি গঠন করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসের অধিকাংশের মধ্যে এই দোষ প্রচুরভাবে বিদ্যমান। তাঁহার 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ধর্মতত্ত্বালোচনা গল্পের সরস বাস্তবতাকে গ্রাস করিয়াছে। সন্ন্যাসী তাঁহার অতিমানবীয় শক্তি লইয়া বারবার উপন্যাসে আবির্ভূত হইয়াছেন ও গল্পের স্রোতকে আকস্মিক পরিবর্তনের খাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনার অতি-প্রাদুর্ভাব ও অতি-মানবীয় শক্তির একাধিকবার প্রবর্তন—এই দুইটিই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি। মহম্মদ ও মুন্না—ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে অতি মধুর স্নেহসম্পর্কের চিত্রই উপন্যাসের প্রধান স্থান অধিকার করে। স্বামিপরিত্যক্তা মুন্নার শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে করুণরসের প্রাধান্য অনুভব করা যায়। নবাব খাঁজাহান খাঁর অস্থিরমতিত্ব, যথেচ্ছাচারপ্রিয়তা ও পাপের প্রলোভনে অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রও কতকটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়, কিন্তু খাঁজাহান-কাহিনীর সহিত মূল গল্পের যোগসূত্র খুব সামান্য; কেবল বাহ্য অভিভবের সম্পর্ক মাত্র। মোটের উপর উপন্যাসটির গ্রন্থন-প্রণালী অত্যন্ত শিথিল,—ইহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে বন্ধন খুব আল্‌গা রকমের। এক মহম্মদ মহসীনের উন্নত, উদার চরিত্রই উপন্যাসের খণ্ডাংশগুলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঐক্যবন্ধনের হেতু হইয়াছে।

'স্নেহলতা' উপন্যাসটিও (১৮৯২) এইরূপ সমাজ-ও-ধর্মসংস্কারমূলক তর্কবিতর্কের মধ্যে নিজ প্রধান উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। জগৎবাবুর পারিবারিক জীবনের যে চমৎকার চিত্র গ্রন্থারম্ভে আমাদের আশার উদ্রেক করে, দুই-এক অধ্যায় পরেই তার্কিকতার একটা ঢেউ আসিয়া তাহার উজ্জ্বলতাকে মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। জগৎবাবুর রুক্ষভাষিণী, প্রভুত্বপ্রিয়া, ধন গর্বিতা গৃহিণী, তাঁহার আদরের মেয়ে অভিমানিনী টগর, উদার কিন্তু দুর্বলচেতা গৃহস্বামী ও শান্তস্বভাবা, সেবাকুশলা স্নেহলতা—সকলে মিলিয়া এক চমৎকার পারিবারিক চিত্র রচনা করিয়াছে। ইহার

অব্যবহিত পরেই সমাজ-সমালোচনা ও মতবাদপ্রচারের তীব্র চীৎকার উপন্যাসের সুরটি ডুবাইয়া দিয়াছে। হেম, কিশোরী, জীবন, নবীন, মোহন প্রভৃতি প্রকাণ্ড একদল যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই, যাহারা কেবল তর্কের বল-লোফালুফির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহারা দেশোন্নতি ও সমাজ সংস্কারের জন্য সভাসমিতি স্থাপন করিয়াছে; শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তাও ইহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই; বিপ্লব-পন্থীর গোপন ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ইহারা নিতান্ত নিরীহ কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রযোগ করিয়াছে। যাহা হউক, এই ব্যক্তিত্ববিহীন যুবকদের মধ্যে মোহন স্নেহলতাকে ও জীবন টগরকে বিবাহ করিয়া উপন্যাসমধ্যে একটু আইনসঙ্গত স্থান অর্জন করিয়াছে। কিশোরী ও জগৎবাবুর পুত্র চারু পরস্পর-প্রশংসা ও পানাসক্তির দ্বারা সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপন্যাসমধ্যে একটি বিরুদ্ধ স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে। স্নেহলতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ মোহন পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিবা বিদেশে গিযাছে ও সেখানে প্রাণ হারাইয়া স্নেহলতাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ও অসহায়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। এইখানে প্রথম খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রথম খণ্ডের মধ্যে দশ বৎসরের ব্যবধান। এখানে চারুই উপন্যাসের নায়কের অংশ অধিকার করিয়াছে। চারুর স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার দুঃখ খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রেরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ হইয়াছে। চারুর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কিন্তু চঞ্চল, তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব প্রবল নহে বলিয়া অন্যের প্রভাবে সে সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়; তাহার কবিত্বশক্তির ধারা উচ্ছ্বসিত কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। চারু ও বিধবা স্নেহলতার পরস্পরের প্রতি প্রেম-সঞ্চারই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কিন্তু তাহাদের প্রণয়-বর্ণনা অপেক্ষা বিধবা বিবাহের ঔচিত্য-সম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচনাই উপন্যাসমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চারুর মাতার ও টগরের প্রতিকূলতায় এই প্রণয় অগ্রসর হইতে পায় নাই। চারুও তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিস্মৃত হইয়া আবার নূতন বিবাহ করিয়া তাহার চরিত্রের অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছে। এইরূপ চারিদিকের অত্যাচারে জর্জরিত-হৃদয় হইয়া স্নেহলতা আত্মহত্যার দ্বারা সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। উপন্যাসমধ্যে কেবল জগৎবাবু ও জীবনই তাহার প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, কিন্তু সমাজের সমবেত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষীণ সহযোগিতা নিতান্ত অক্ষম ও দুর্বল প্রতিপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসে ঘটনা-পারম্পর্যের সহিত কোন চরিত্র-পরিণতির সংযোগ হয় নাই—উপন্যাসের প্রকৃত রস কোথাও জমাট বাঁধে নাই।

'কাহাকে' (১৮৯৮) লেখিকার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। এক আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা ইহাতে তাহার প্রণয়ের ভাগ্যবিপর্যয়-কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। শৈশবকালে তাহার ভাল-বাসার পাত্র ছিলেন তাহার পিতা—তাহার সমস্ত ব্যাকুল ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠুর নিষ্ঠা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একাধিপত্য পিতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। আরও কিছুদিন পরে এক সহপাঠী আসিয়া পিতার অংশীদার হইয়া বসিল তাহার ভালবাসা উভয়ের মধ্যে নির্বাচনে অসমর্থ হইয়া চঞ্চল ও দোলায়িত হইয়া উঠিল। সহপাঠীর একটা অসম্পূর্ণ গানের কয়েকটা চরণ তাহার স্মৃতিতে একটা অজ্ঞাত প্রেমের রাগিণীর ন্যায় বাজিতে লাগিল। তারপর অনেক বৎসর পরে সুশিক্ষিতা ও পূর্ণযুবতী নায়িকা তাহার ব্যারিস্টার ভগিনীপতি ও দিদির গৃহে আবার নূতন করিয়া প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে। এক নবীন ব্যারিস্টার রমানাথ—সেই পূর্ব-পরিচিত

গান গাহিয়া তাহার প্রেমের পূর্বস্মৃতি জাগাইয়াছে, এবং তাহার হৃদয়ে প্রথম গভীর অনুরাগের উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহার সন্দেহ জাগিয়াছে যে, রমানাথের প্রতি তাহার মনোভাব প্রকৃত প্রেম কি না। সংগীতের সুরের সহিত এই ভাবের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইহা এরূপ একপ্রকার বিবশ আত্মবিস্মৃতিতে ভরপুর, যে, ইহা সম্মোহনশক্তির সহিত তুলনীয়। রমানাথের ব্যবহারেও খটকা লাগিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আশাভঙ্গের দারুণ আঘাতে নায়িকার মূর্ছা হইয়াছে, ও এই অসুখের সময় তাহার ভগিনীপতির বন্ধু এক ডাক্তারের আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহার তাহার প্রতি এমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে, যাহা প্রেমের অগ্রদূত। ইহার পর রমানাথের ব্যবহারে আত্মপক্ষসমর্থনের একটা ব্যাকুল, আন্তরিক চেষ্টা থাকিলেও, ইহার মধ্যে নায়িকার সূক্ষ্ম অনুভূতি স্বার্থপরতার গন্ধ পাইয়াছে। অজ্ঞাতসারে নায়িকার মন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, ডাক্তারের চিত্র তাহার হৃদয়পট হইতে রমানাথের চিত্রকে অপসারিত করিয়াছে। এই সময় নায়িকার পিতা আসিয়া তাহাকে কলিকাতা হইতে লইয়া গিয়াছেন ও স্ত্রীলোকের স্বাধীন নির্বাচনের প্রতি আর আস্থা না দেখাইয় তাহার বাল্য-সহচর ছোট্টুর সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির কারয়াছেন। ইহাতে নায়িকা বিষম অবস্থাসংকটে পড়িয়াছে—কিন্তু অবশেষে তাহার সমস্ত সন্দেহ নিরসন হইয়াছে ডাক্তার ও ছোট্টুর অভিন্নতার আবিষ্কারে। এইরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই শেষ পর্যন্ত না য়কা প্রকৃত প্রেমের পরিচয় লাভ করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা আছে, কিন্তু সকলের উপর দিয়া একটি স্ত্রী-হস্তের লঘু-কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই বিশিষ্ট সুরটি কি তাহা বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন, তবে ইহা অনুভব করা সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে ও রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসে নারীর উক্তি ও মন্তব্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, নারীর মুখ দিয়া উপন্যাসের বিশেষ সমস্যা আলোচিত হইযাছে। কিন্তু সেখানে কথাবার্তার ভঙ্গী ও মন্তব্যের সুর যেন পুরুষের সহানুভূতিমূলক কল্পনার দ্বারা নারীর উপর আরোপিত হইয়াছে; ইহার খাঁটি সুরের সঙ্গে যেন একটু কবিত্বপূর্ণ উচ্চগ্রাম, একটু অতিরঞ্জনের খাদ মিশানো রহিয়াছে। ইন্দিরা ও রজনীর মধ্যে যে সপ্রতিভতা, যে পরিহাসনিপুণতা ও বিদ্রূপপ্রবণতা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যেন একটু পুরুষ-কল্পনার আতিশয্য আছে। পুরুষের চোখে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য যেমন, সেইরূপ তাহার মনোভাবও একটু আদর্শবাদ দ্বারা রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে নায়িকার প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক মন্তব্যে একটা মৃদু সুগন্ধ পুষ্পসারের মত নারীর অবর্ণনীয় মাধুর্য ও কোমলতা অনুভব করি। প্রারম্ভেই নারীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব, তাহার সন-তারিখ মনে করিয়া রাখার অক্ষমতার বর্ণনাতে একটা বিশিষ্ট নারীর সুর বাজিয়া উঠে। পিতার প্রতি আদরিণী কন্যার মনোভাব-বর্ণনে ও এই মনোভাবে প্রেমের সমস্ত লক্ষণ আবিষ্কার করার মধ্যে, রমানাথের প্রতি নবজাগ্রত প্রেমবিকাশের বিশ্লেষণে, প্রেমভঙ্গের দুঃসহ বেদনা ও ক্লিষ্ট নৈরাশ্যে, ও তাহার প্রকৃত প্রণয়ীর সহিত শঙ্কা-ব্যাকুল অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া মিলনের গভীর তৃপ্তিতে—মোটকথা উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারেই নারীসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা ও

ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরুষ-ঔপন্যাসিক আধুনিক শিক্ষিত নারীর মধ্যে যে প্রগল্‌ভতা ও পুরুষবুদ্ধি-প্রাধান্যের আরোপ করিয়া থাকেন, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই—শিক্ষা তাহাকে বাক্‌-সংযম দিয়াছে, তাহার রুচি মার্জিত করিয়া তাহার চরিত্র-সৌকুমার্যকে বাড়াইয়াছে। এই স্ত্রী-মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব-হিসাবে উপন্যাসটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই একটি ছোট গল্পের—বিশেষতঃ, 'পেনে প্রীতি' নামক গল্পের মধ্যেও এই গুণসমৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসে চিরস্থায়িত্বের কোন লক্ষণ নাই; কিন্তু 'কাহাকে' তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান ও অন্যান্য মহিলা-ঔপন্যাসিক হইতে তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

(৪)

স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা-ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাস সাধারণতঃ দুইটি বিপরীতমুখী ধারার অনুবর্তন করিয়াছে। এক শ্রেণীর লেখিকা হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইহার সনাতন বিধি-নিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষসমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রধান প্রতিনিধি নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী। ইহাদের, বিশেষতঃ অনুরূপা দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসে যে স্বার্থত্যাগ, ভগবৎ-প্রেম ও লোক হিতৈষণা হিন্দু-সমাজের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা, তাহাই গভীর অনুরাগ ও সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবের পঙ্কিল প্রবাহে সেই আদর্শের বিশুদ্ধি মলিন হইতেছে, শান্তি ও আত্মবিসর্জনমূলক সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের পারিবারিক জীবন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই তাঁহাদের নবীন শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। অনুরূপা দেবীর একাধিক উপন্যাসেই একজন আদর্শ সমাজনেতা ও ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চিত্র আছে, যিনি সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়নের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অটল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অক্ষুণ্ণ মহিমায় দণ্ডায়মান থাকেন। এই জাতীয় চরিত্রেরা প্রায়ই শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি, ব্যক্তিত্বসূচক গুণ তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অস্পষ্ট থাকে; কেবল প্রতিবেশের বিভিন্নতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তাঁহাদের কতকটা চরিত্র-পার্থক্য লক্ষিত হয়। আর একপ্রকারের চিত্র এই উপন্যাসগুলিতে প্রায় পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে—স্বধর্মনিষ্ঠ, কন্যাস্নেহপরায়ণ জমিদার। ধর্মানুষ্ঠান প্রাচীনপ্রথানুরক্ত বাঙালী পরিবারে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এই সমস্ত উপন্যাসে আমরা তাহার পরিচয় পাই। শঙ্খ-ঘণ্টার আরতি-রোল, ধূপ-ধূনার সুরভি, মন্ত্রোচ্চারণের মধুর-গম্ভীর শব্দ যেন ইহাদের পাতাগুলির সঙ্গে মিশিয়া আছে। এই ধর্মানুষ্ঠান কেবল যে একটা দৃশ্য-সৌন্দর্য বা বাহ্যাড়ম্বরের দিক্‌ হইতে বর্ণিত হয় তাহা নহে, অন্তরের উপর গভীর প্রভাবই ইহার বিশেষত্ব। সংসারসুখহীনা রমণী তাহার হৃদয়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য দেবমন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, দেবতার সহিত একটা মধুর স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সাংসারিকতার অতৃপ্ত বাসনাগুলি পুরাইবার একটা উপায় আবিষ্কার করে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ও অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' এই বিষয়ের সুন্দর উদাহরণস্থল। দাম্পত্য মনোমালিন্য ও পিতা-পুত্রীর মধুর স্নেহসম্পর্ক এই উপন্যাসগুলির আলোচনার প্রধান বিষয়। স্বামি-স্ত্রীর গূঢ় অভিমানমূলক বিচ্ছেদ বা

প্রকৃতি-বৈষম্যের জন্য মনোমালিন্যের নানারূপ সূক্ষ্ম পরিবর্তন এই উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আবার স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা কেমন ব্যাকুল আগ্রহের সহিত পিতৃস্নেহের শীতল অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে, পিতা কতটা গভীর ও ব্যথিত করুণার সহিত অভাগিনী দুহিতার উপর নিজ স্নেহাঞ্চল বিস্তার করেন ও উভয়ের পরস্পর-সম্পর্ক কতটা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, অক্লান্ত সেবা ও নীরব আত্মবিসর্জনের দ্বারা মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, উপন্যাসের পর উপন্যাসে সেই নিবিড় একাত্মতার ছবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গপরিবারের দুইটি প্রধান ভাবধারা এই উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে এক শ্যামল-সরস সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে সীতা ও শান্তা দেবীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপন্যাসে বিশেষ করিয়া নারী-সমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারীহৃদয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, নারীর ভাবগভীরতার মধ্যে এই পরিবর্তনের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য কতখানি স্থির-সংহত হইয়াছে—এই কাহিনীর ইতিহাসই ইঁহাদের উপন্যাসের প্রধান বিষয়। নারী-মনের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কতকগুলি বিভিন্ন স্তর পৃথক করা যায়। সর্বপ্রথমে আধুনিকতার ঢেউ বৈঠকখানা ভাসাইয়া লইয়া গেলেও ইহা অন্দরমহলের প্রাচীর-বেষ্টনী হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে। পুরুষ যখন আধুনিকতার উগ্র সুরা পান করিয়া মাতাল হইয়াছে, তখন নারী নিজ অন্তঃপুরের অর্গল দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া এই দুর্ভেদ্য অন্তরালের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু অন্তঃপুর-দ্বার এই প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে বেশি দিন রুদ্ধ থাকে নাই; স্বামি-পুত্রের যুগ্ম আকর্ষণে নারীর যুগযুগান্তরের ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হইয়াছে। নারী এই নূতন আবির্ভাবকে প্রথম ঘরে, ও পরে মনের কোণে ঠাঁই দিতে বাধ্য হইয়াছে কিন্তু এই বাধ্যতা-মূলক আত্মসমর্পণ আন্তরিক আবাহন নহে। ভিতরের নীরব প্রতিবাদ তাহার ক্ষুব্ধ গুঞ্জরণ সংবরণ করে নাই। তারপর আসিয়াছে নারীর নিজের আকর্ষণের পালা। পরিচয়ের দ্বারা প্রথম সংকোচ কাটিয়া গেলে নারীর বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ ধীরে ধীরে এই নবীন আবির্ভাবের আকর্ষণে উন্মেষিত হইয়াছে। অবশ্য সর্বপ্রথম যাহা নারীর চোখে নেশা লাগাইয়াছে তাহা আধুনিকতার বাহ্যসৌন্দর্য ও বহির্মুখী স্বাধীনতা—জুতা-সেমিজ গাউনের রঙিন, লীলা-চঞ্চল ঢেউ ও অবাধ সঞ্চরণের উন্মাদনা। এখনও অনেক নারী এই বাহ্য আকর্ষণের স্তর অতি ক্রম করিতে পারেন নাই। তারপর পাশ্চাত্ত্য হাব-ভাব-বিলাসের সীমা ছাড়াইয়া পশ্চিমের মনোরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ, তাহার সাহিত্য ও চিন্তাধারার সহিত প্রথম পরিচয়। এই পরিচয়ের ফল পুরুষের মধ্যে যেমন, নারীর মধ্যে তেমন ব্যাপক হয় নাই—অনেকে ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন; কেহ কেহ বা স্বর্গীয় তরু দত্ত বা সরোজিনী নাইডুর মত উচ্চাঙ্গের ইংরেজী কবিতাও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর এই শিক্ষার ফলে নারী-সমাজে কোন ব্যাপক বা ভাবগত গভীর পরিবর্তন হয় নাই; যাহা হইয়াছে তাহাকে মুষ্টিমেয়ের ভাববিলাস বলা যাইতে পারে। সর্বশেষে চতুর্থ স্তরে ব্যাপক পরিচয়ের ও গভীর সমন্বয়-সমাধানের যুগ আসিয়াছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ভাববিলাসের উপাদানভূত না হইয়া কার্যকরী বিদ্যার পর্যায়ভুক্ত হইতেছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতায় নারী

আজ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহচর ও প্রতিদ্বন্দ্বী ; অভাবের প্রবল তাড়না আজ তাহার সুকুমার লালিত্যের অপচয় করিয়া তাহার কার্যকরী শক্তিবিকাশের সহায়তা করিতেছে। তাহার মনোরাজ্যে আজ প্রণয়ের আবেশ ও মদির বিলাসস্বপ্নকে টুটাইয়া সাংসারিকতার কঠোর কর্তব্যচিন্তা বর্ণলেশহীন ধূসরতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। কতকগুলি আধুনিক রীতিনীতি ও প্রথা তাহার প্রাত্যহিক জীবনে স্থায়িভাবে স্থান পাইয়াছে। সেমিজ-ব্লাউজ তাহার বিজাতীয় বিলাস হারাইয়া সুরুচিসম্মত অঙ্গাবরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; চায়ের টেবিলে নারীর আসন এখন অনেকটা রান্নাঘরের পিঁড়ির পর্যায়ে নামিয়াছে। এখন ইংরেজী শিক্ষাকে সে আবেশহীন সমালোচনার চক্ষে দেখিয়া তাহাকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের একাঙ্গীভূত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।

এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত-হৃদয়, পুরুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত, মনের নূতন অভাব ও নূতন দাবি-সম্বন্ধে সচেতন নারী নবরূপে প্রণয়কে আহ্বান করিতেছে। প্রণয় তাহার নিকট মদির আবেশ নহে, সংসার-যুদ্ধে ক্ষত হৃদয়ের শীতল প্রলেপ, প্রাত্যহিক কর্তব্যের চাপে গুরুভারগ্রস্ত, অবনমিত মনকে খাড়া, সজীব রাখিবার একটা অবলম্বন মাত্র। এই প্রেমের কোন বাহ্য ঐশ্বর্যসম্ভার, কোন সমারোহ-প্রাচুর্য নাই, আছে কুণ্ঠিত, সংকুচিত আবির্ভাব, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার একটা অন্তর্গূঢ় আবেগ। এই রিক্ত, দীন, জীবন-সংগ্রামে ধূলিধূসর প্রণয়ের চিত্রই সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাদের নায়িকারা প্রায়ই গরিবের মেয়ে, স্কুলের ছাত্রী বা বড়-লোকের গৃহে শিক্ষয়িত্রী ; অভাবের আঁচ ইহাদের শরীর-মনের সরসতাকে অনেকখানি ঝল-সাইয়া দিয়াছে, তাহাদের দেহসৌন্দর্যের কোন অহংকার নাই, স্বভাবমাধুর্য ও ব্যবহারের সুরুচিপূর্ণ ভদ্রতাই তাহাদের একমাত্র আকর্ষণ। তাহারা পুরুষের প্রণয়াভিব্যক্তির জন্ত অপেক্ষা করে না, প্রণয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুরুষের দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া, ব্যর্থ ক্ষোভে হৃদয় মধ্যে গুমরিয়া মরে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের প্রেমস্বপ্ন সফলতা লাভ করে, তখন তাহাদের আত্মসমর্পণে কোন উচ্ছ্বাস থাকে না, একটা শান্ত-সংযত আনন্দের পূর্ণতা তাহাদিগকে নিশ্চল, আত্মসমাহিত রাখে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনায় তাহারা পুরুষের সহিত সমকক্ষ-হিসাবে সমান আসন দাবি করে ; তাহাদের আলোচনার বিশেষ ভঙ্গী, তাহাদের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য এই তর্কযুদ্ধে প্রতিফলিত হয়, ও ইহাকে নূতন খাতে সঞ্চালিত করে। মোট কথা, ইহাদের উপন্যাসে স্ত্রী-পুরুষের জন্ত আমাদের সামাজিক জীবনে যে একটা নূতন সমন্বয়-ক্ষেত্র রচিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ; তাহাদের কথোপকথন, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে একটা নূতন ভদ্রতা, সুরুচি, হাস্য-পরিহাস ও শ্রদ্ধার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে তাহা অনুভব করা যায়। এই সামাজিক ইতিহাস-পরিবর্তনের বিবৃতি বলিয়া ইহাদের উপন্যাসগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

(৫)

এইবার নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর কতকগুলি উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহারা একই পর্যায়ভুক্ত, ইহাদের আদর্শ, মনোভাব, জীবন-সমালোচনার ধারা ও বিশ্লেষণ-প্রণালী অনেকটা এক রকমের। ইহাদের মধ্যে তুলনায়

আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। অনুরূপা দেবীর অধিকার-ক্ষেত্র বিস্তৃততর; তাঁহার উপন্যাসের সংখ্যা ও বিষয়-বৈচিত্র্য নিরুপমা দেবী অপেক্ষা অনেক বেশি; নিরুপমা দেবীর কলাকৌশল অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। অনুরূপার মন্তব্য অনেক সময় পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত ও গুরুপাক; নিরুপমার মন্তব্যের মধ্যে এই দোষের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; অত্যুক্তিপ্রবণতা ও অসংযত উচ্ছ্বাস তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তির দিক্ দিয়া অনুরূপার শ্রেষ্ঠত্ব; কলাকুশলতা ও চিত্তবিশ্লেষণে নিরুপমাই বোধ হয় প্রাধান্যের দাবি করিতে পারেন। নিরুপমার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'দিদি' বোধ হয় অনুরূপার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' হইতে উচ্চতর সৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত, আবেগময় দৃশ্য-চিত্রণে নিরুপমা অনুরূপার সমকক্ষ নহেন; 'মন্ত্রশক্তি', 'পথ-হারা', 'বাগ্‌দত্তা' ও 'মহানিশা' হইতে এইরূপ তীব্র, অগ্নিজ্বালাময়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলোড়নের অনেক দৃষ্টান্ত সংকলিত হইতে পারে। নিরুপমার চিত্তবিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত ধীর, সংযত ও বাহ্য বিক্ষোভ অপেক্ষা অন্তরগভীরতার লক্ষণাক্রান্ত।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোট গল্প সংখ্যায় অল্প; তাহাদের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যেরও অভাব আছে; কিন্তু সব কয়টিই কলাকৌশলে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য-জীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসেরই বিষয়; এবং ইহা লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন যে, এই সংঘর্ষের উপাদান আমাদের সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবন হইতেই আহরিত হইয়াছে। কচিৎ কখনও তাঁহাকে রোমান্সের অসাধারণত্বের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত স্থলেও রোমান্সের বৈচিত্র্য খুব স্বাভাবিকভাবেই অবতারিত হইয়াছে, কোন উদ্ভট অস্বাভাবিকত্ব ইহার উপর ছায়াপাত করে নাই। বিরোধের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও উপশমের চিত্রটি খুব নিপুণভাবে ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। ভাষা-সংযম ও উচ্ছ্বাস-বর্জন লেখিকার চরিত্রাঙ্কন ও বিশ্লেষণের বিশেষত্ব; এই মিতভাষিতার গুণে যেখানে সত্যসত্যই তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগ, ভাবগভীরতার মুহূর্তগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে বর্ণনা উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন-সমালোচনার অন্তর্নিহিত একটা কোমল-করুণভাব তাঁহার নারী-হস্তের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়। তিনি মোটের উপর আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না; কোথাও তিনি বিদ্রোহের নিশান ওড়ান নাই, তীব্র উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বহু শতাব্দীর নির্মম কণ্ঠরোধের প্রতিশোধ লন নাই; অথচ এই স্বাভাবিক মৃদু ও কোমল কণ্ঠ, এই সূক্ষ্ম অথচ মর্মভেদী সমালোচনা যে নারীর সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নিরুপমার সর্বপ্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল' অপরিণত বয়সের রচনা। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত রসটি ইহাতে জমিয়া উঠে নাই—ঘটনাগুলি যেন বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, ভাবগত ঐক্যে গ্রথিত হয় নাই। উপন্যাসটির মধ্যে এক ভাষায় ও বিশ্লেষণে সংযম ছাড়া লেখিকার ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশেষ কোন পূর্বসূচনা মিলে না।

'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ লেখিকার প্রকৃত শক্তির প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। উপন্যাসখানি একটি দরিদ্র পরিবারের করুণ ইতিহাস; ইহার মধ্যে দারিদ্র্যের দুঃসহ ব্যথা ও অপমানের একটা তীব্র, জ্বালাময় অভিব্যক্তি হইয়াছে। সতীর চরিত্রটির দৃপ্ত তেজস্বিতা, নীরব সহিষ্ণুতা ও

অনমনীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের সমন্বয়ে অপূর্ব হইয়াছে। অথচ এই প্রস্তর-কঠিন দৃঢ়তার অন্তরালে একটা কোমল আর্দ্র প্রণয়োন্মুখতার আভাস ইহাকে আরও রমণীয় ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বেশ্বরকে লিখিত তাহার বিদায়-লিপির মধ্যে বজ্রকঠোর প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে এই দ্রবীভূত প্রেম-প্রবাহের গোপন অস্তিত্বের পরিচয় মিলে—যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে স্বচ্ছ শীতল নির্ঝর। সতীর পত্রখানি তাহার হৃদয়-রক্ত দিয়া লেখা—ভাবের এরূপ উচ্ছ্বসিত জ্বালাময় প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। মৃত্যুশয্যাশায়িত রামশঙ্করের সতীর প্রতি অন্তিম আশীর্বাদের মধ্যেও এই দুঃসহ অগ্নিজ্বালা বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য চরিত্রের সেরূপ লক্ষণীয় কোন বিশেষত্ব নাই। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও জাহ্নবী অনেকটা typical, শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি মাত্র, ব্যক্তিত্বসূচক গুণ তাহাদের মধ্যে সেরূপ প্রকটিত হয় নাই। গৌণ চরিত্রের মধ্যে এক সাবিত্রীই অকুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের দাবি করিতে পারে। তাহার বিবাহে প্রেম-সার্থকতার আনন্দ অনেকটা শঙ্কা-কুণ্ঠিত ও সংকোচ-শীর্ণ হইয়াছে। তাহার প্রেমের মধ্যে অনেকখানি কৃতজ্ঞতার ভাব জড়িত হইয়াছে—কুণ্ঠার তুষারস্পর্শ প্রেমের শতদলপদ্মকে পূর্ণবিকশিত হইতে দেয় নাই। আত্মবিসর্জনকারিণী সতীর ম্লান, বিষাদময় স্মৃতি যেন মধ্যবর্তিনী হইয়া তাহাদের দাম্পত্যমিলনের নিবিড় একাত্মতায় বাধা দিয়াছে। স্বামীর প্রতি এই কুণ্ঠাজড়িত ভাবটি সাবিত্রীর মনে প্রশংসনীয় অন্তর্দৃষ্টি ও সুসংগতির সহিত স্থায়ী করা হইয়াছে।' সতীর প্রভাব জীবনে-মরণে উপন্যাস-মধ্যে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিযাছে।

'বিধিলিপি' (১৯১৭) লেখিকার আর একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যধিক বিশ্বাস জীবনে কিরূপে tragedyর সৃষ্টি করে, বিপদের প্রতিষেধক উপায়গুলিই কিরূপে বিপদ্‌কে আবাহন করিয়া আনিয়া জ্যোতিষ-গণনার সার্থকতা সম্পাদন করে, উপন্যাসটি সেই বিষয়ে রচিত।

চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে মহেন্দ্র ও কাত্যায়নীর স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে সম্পর্কের জটিল বিরোধের চিত্র আশ্চর্য সুসংগতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কাত্যায়নী-সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া মহেন্দ্রের মন নিদারুণ অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত সে আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। কাত্যায়নীর পিতৃভক্তি কিন্তু তাহার প্রেমকে সম্পূর্ণরূপেই জয় করিয়াছে। কোন দুর্বলতা, কোন মানসিক বিক্ষোভ তাহার অবিচলিত দৃঢ়সংকল্পকে আন্দোলিত করে নাই। মহেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ হয়ত তাহার মগ্ন-চৈতন্যে সুপ্ত ছিল, কিন্তু তাহার অণুমাত্র আভাসও সে চেতনার ঊর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় নাই। মহেন্দ্রের সহিত তাহার প্রতি কথাবার্তায়, প্রত্যেকটি ব্যবহারে লেশমাত্র স্নেহ, করুণ সমবেদনার আভাস পর্যন্ত সযত্নে বর্জিত হইয়াছে, পাছে তাহাদের মধ্যে কোথাও প্রেমের ক্ষুদ্রতম বীজ লুক্কায়িত থাকে, পাছে মহেন্দ্র কোমলতাকে ছদ্মবেশী প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া কোনরূপ মোহ হৃদয়ে পোষণ করে। তাহার এই স্নেহাভাসশূন্য নির্মমতাই মহেন্দ্রকে জগতের প্রতি একটা সন্দেহপূর্ণ বিদ্বেষে জর্জর করিয়া তুলিয়া তাহার অধঃপতনের সোপান নির্মাণ করিয়াছে।

কাত্যায়নীর উপেক্ষা মহেন্দ্র কোনও মতে সহ্য করিয়া কর্মস্রোতে আপনাকে ডুবাইতে

চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু জমিদারের সঙ্গে তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গে তাহার বিদ্বেষ বিজাতীয় তীব্রতা লাভ করিয়া তাহাকে অধঃপতনের পথে আরও নামাইয়া দিল। এখন হইতে কাত্যায়নীর প্রতি তাহার ব্যবহার একটা তীব্রজ্বালাময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁজে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; এবং কামাখ্যানাথের সমস্ত উদার মহানুভবতা তাহার অসংগত বিদ্বেষের মাত্রাধিক্যই ঘটাইতে লাগিল। মহেন্দ্র একটা রীতিমত Byronic hero হইয়া উঠিল। এই সময় কমলার ব্যাপারের উপলক্ষ্য লইয়া জমিদারের প্রতি তাহার বিদ্বেষ মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া ব্যবহারিক জগতে আত্মপ্রকাশ করিল; জমিদারের ক্ষমাতে তাহার বিকৃত বুদ্ধি কামাখ্যানাথের চক্ষে নিজ অকিঞ্চিৎকরত্বেরই প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া তাহার বিদ্বেষের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিল। শেষে কমলার উদ্ধারের ব্যাপারে নিরঞ্জনের হস্তক্ষেপে তাহার অসহিষ্ণুতা চরম সীমায় পৌঁছিয়া tragedyর সৃষ্টি করিল। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে কাত্যায়নী ও মহেন্দ্রের বিদায়দৃশ্য উপন্যাস-সাহিত্যে হতাশ-প্রেমিকের অগ্নিজ্বালাময় ভাবোদ্গিরণের চমৎকার দৃষ্টান্ত। সাধারণতঃ এইরূপ দৃশ্য ভাবাতিরেকপ্রবণতার (sentimentality) জন্য অতি-নাটকীয় (melodramatic) ও অলংকারবহুল ভাষা-প্রয়োগে গুরুভার হইয়া থাকে। কিন্তু মহেন্দ্রের সরল, বাহুল্যবর্জিত কথার মধ্যে আগ্নেয়গিরির জলন্ত নিঃস্রাবের মত একটা অন্তররুদ্ধ, গভীর জ্বালার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায়। ব্যর্থ প্রেমের রুদ্ধ আক্রোশ প্রতি শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াও ইহা মহেন্দ্রের ব্যবহার ও কার্যকলাপের খুব সংযত ও সন্তোজনক ব্যাখ্যা জোগায়।

কাত্যায়নীর চরিত্রের বহুমুখী জটিলতা আরও উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের পরিচয় দেয়। মহেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা মহেন্দ্রের চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কামাখ্যানাথের সহিত তাহার সম্বন্ধের রেখাগুলি যেমন অসাধারণ জটিল, তেমনই আশ্চর্যরূপ সুস্পষ্ট—প্রত্যেকটি রেখা সুচিন্তিত ও দৃঢ়হস্তে অঙ্কনের সাক্ষ্য প্রদান করে—কোথাও অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণ ধারণার চিহ্ন নাই। মহেন্দ্রের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে তাহার কোথাও অনুশোচনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস মাত্র নাই, পিতার আদেশ তাহার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়াছে। কামাখ্যানাথের সহিত সম্বন্ধ-স্বীকারেও সেই অলঙ্ঘনীয় পিত্রাদেশের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সপ্তম পরিচ্ছেদে কামাখ্যানাথ ও কাত্যায়নীর পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে একদিকে যেমন কাত্যায়নীর অনমনীয় দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে সেইরূপ তাহার সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ ও অভ্রান্ত সংগতিবিচারের নিদর্শন মিলে। কামাখ্যানাথের প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে ভালবাসার কোন গন্ধ নাই—স্থির, অচঞ্চল আত্মসমর্পণ আছে, কোন দাবি-দাওয়া নাই; বিবাহের বন্ধন-স্বীকার আছে, কিন্তু মানস-স্বামীর প্রতি কোন দায়িত্ব-অর্পণ নাই। লেখিকার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার যে সূক্ষ্ম রেখার অনুবর্তন করিয়াছে তাহা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটিতে তিনি দেন নাই; শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতার বর্ণবিরল ধূসরতার উপর কোথাও প্রেমের গাঢ় রক্তিমা সঞ্চারিত হইতে দেন নাই। শেষ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের প্রতি চির-অস্বীকৃত অনুরাগের অনিবার্য স্ফুরণের দৃশ্যে কাত্যায়নীর প্রস্তর-কঠিন হৃদয় প্রথম ও শেষ বার দ্রবীভূত হইয়াছে; এই অপ্রত্যাশিত অভিভবে শ্রদ্ধাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করিবার একটা ব্যাকুলতা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু আসিয়া তাহার এই নবজাগ্রত সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। রমার সহিত তুলনায়

তাহার চরিত্রের এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ভগবদ্ভক্তি ও ভালবাসার অভাবের দিকটা খুব সুন্দর-ভাবে ফুটিয়াছে—রমার চক্ষে তাহার চরিত্রে দুর্বলতার আসল কেন্দ্রস্থলটি ধরা পড়িয়াছে কাত্যায়নী-চরিত্রের পরিকল্পনা ও পরিণতি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কামাখ্যানাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কামাখ্যানাথ-জাতীয় চরিত্রেরা অতিরিক্ত আদর্শমূলক হওয়ার জন্য বাস্তবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে—পৌরাণিক যুগের আদর্শ, প্রজারঞ্জক, কর্তব্যপরায়ণ রাজার স্মৃতি আসিয়া উহাদের সীমারেখাগুলিকে ম্লান ও অস্পষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু কামাখ্যানাথ-সম্বন্ধে এ সমালোচনা প্রযোজ্য নহে। তাঁহার সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের চেষ্টার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে তাঁহার বাস্তবতার তীক্ষ্ণতা অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। আদর্শবাদের মধ্যে এই বস্তুতন্ত্রতার সংরক্ষণ লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে ও ভাবগভীরতায় উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেও খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়—ইহার প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের বর্ণনা নৈপুণ্য ছাড়া গ্রন্থবর্ণিত ঘটনার সহিত একটা গভীর ভাবগত সংগতি আছে। নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল ও ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ-বজ্রাঘাতে আলোড়িত মেঘান্ধকার নৈশ আকাশ ইহার পটভূমিকা (background)—ইহার অন্তর-বাহির উভয়ই একইরূপ রহস্যের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। এই ব্যঞ্জনাশক্তি উপন্যাসটির বিচিত্র আকর্ষণ বাড়াইবার হেতু হইযাছে। উপন্যাসের আরও একটি উৎকর্ষ লক্ষিতব্য। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে স্বাভাবিক উপাযে রোমান্সের অবতারণা যে কত দুঃসাধ্য ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। বর্তমান উপন্যাসে কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই রোমান্স নিতান্ত সহজ উপায়েই পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবর্তিত হইযাছে।

'বিধিলিপি'তে রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, 'শ্যামলী'তে (১৯১৮) তাহা ক্ষুণ্ণ হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহার আদর্শবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া বস্তুতন্ত্রতার সীমা অতিক্রম করিযাছে। অনিলের বিরাট্ আত্মোৎসর্গ ও রেবার নীরব, অবিচলিত ধৈর্য—এই দুই-এর মধ্যেই অতিরেকের অস্বাভাবিকতা আছে। বিশেষতঃ, রেবা উপন্যাসের মধ্যে একটি অতর্কিত আবির্ভাব—রাস্তায় কুড়ান মেয়ে না অনিলদের সংসারে না উপন্যাস-মধ্যে—কোথাও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। অনিলের প্রতি তাহার ভালবাসা কিরূপে এত দৃঢ়মূল হইল তাহার কোন ব্যাখ্যা উপন্যাস মধ্যে মিলে না। রেবার চরিত্রও ভাল করিয়া ফুটে নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব, তাহার নীরব সহিষ্ণুতা ও জীবনব্যাপী আত্মোৎসর্গের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আসল কথা অনিল ও রেবা আদর্শ-জগতের জীব; আমাদের সাধারণ পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তাহারা ঠিক জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। উপন্যাস-মধ্যে যাহা ফুটিয়াছে তাহা প্রেমের প্রভাবে অর্ধজড় শ্যামলীর মধ্যে মায়ামমতা-ও-সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ নারী হৃদয়ের অপ্রত্যাশিত স্ফুরণ। মূক হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার, প্রকাশের পথ খুঁজিবার একটা ব্যাকুল প্রয়াস, শব্দময় জগৎকে চক্ষু দিয়া অনুভব করিবার একটা প্রচণ্ড. ক্লান্তিকর চেষ্টা, তাহার অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত, দুর্দমনীয় মনোবিপ্লব—অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি-বিড়ম্বিত জীবনের সমস্ত ক্ষুণ্ণ অভাববোধের একটি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ, অথচ মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া নিখুঁত চিত্র উপন্যাসটির গৌরব বর্ধন করিয়াছে। প্রকৃতির অসংখ্য বাণী, মানব-হৃদয়ের অগণ্য ভাবপ্রবাহ, সমাজ জীবনের সমস্ত জটিল ব্যবস্থা ও কঠোর অনুশাসন কিরূপ বক্রপথে, কিরূপ খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ অর্ধোক্তির আকারে ভাষাহীনতার অতলস্পর্শ গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয়, এই অন্ধকারময় আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়া কিরূপে প্রেমের সর্বজয়ী আলোক বিচ্ছুরিত হয়, প্রেমের মায়াস্পর্শে কিরূপে সমস্ত সুপ্ত, জড়িমাগ্রস্ত প্রবৃত্তি ও অনুভূতিগুলি দুঃস্বপ্নাভিভূত নিদ্রা হইতে জাগিয়া ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠে এই চিত্ত-বিকাশের একটা পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ বিবরণ আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উপন্যাস-মধ্যে এক শ্যামলী-চরিত্রই বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, অথচ তাহার অবস্থাবৈশিষ্ট্যই তাহাকে কতকটা রোমান্সের অসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছে।

'দিদি' (১৯১৫) নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার বিষয় গার্হস্থ্য উপন্যাসের খুব সাধারণ, চিরপরিচিত ব্যাপার—দাম্পত্য মনোমালিন্য। কিন্তু এই সাধারণ বিরোধের চিত্রটি এরূপ ব্যাপকভাবে, এরূপ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে, উপন্যাস-সাহিত্যে ইহা একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য অমরের সহিত চারুর বিবাহ-ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিকভাবে ও অবিশ্বাস্যভাবে সংঘটিত হইয়াছে। দেবেনের নিকট বিবাহ-ব্যাপার অপ্রকাশ, সুরমার সহিত অপরিচয়, চারুকে একাকিনী কলিকাতার বাসায় রাখিয়া তাহার মনে প্রণয় সঞ্চারের অবসর প্রদান, চারু সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার বাড়ি হইতে গোপন রাখা—এই সমস্ত ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে যে একটু কষ্টকল্পনা, একটু সম্ভাবনীয়তার অভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এইটুকু ত্রুটি মানিয়া না লইলে উপন্যাসটির ভিত্তিভূমিই রচিত হয় না। এই সূচনার পর হইতে অমর, সুরমা ও চারু এই তিনজনের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে যে জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ একেবারে অতুলনীয়, সকল দিক দিয়াই অনবদ্য। এই বিরোধের পরিবর্তন-স্তরগুলি যেমন সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত লক্ষিত হইয়াছে, তেমন দৃঢ়, অকম্পিত রেখা-বিন্যাসের দ্বারা পৃথকীকৃত হইয়াছে।

অমরের সহিত সুরমার প্রথম পরিচয়ের উপরই কেমন একটা বক্র শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুরমার মধ্যে অন্য সদ্‌গুণ যাহাই থাকুক, নববধূ-সুলভ লজ্জা-সংকোচের একান্ত অভাব ছিল। প্রথম হইতেই তাহার ব্যবহারে একটা কর্তৃত্বাভিমানের সুর, একটা অসংকোচ বৈষয়িক আলোচনার ভাব মাথা উঁচু করিয়া প্রেমের মধুর রঙ্গিন স্বপ্নাবেশকে টুটাইয়া দিয়াছে। অমরও নিজ ব্যবহারের মধ্যে অপরাধীর লজ্জিত—অনুতপ্ত ভাব ফুটাইতে পারে নাই; একটা স্পর্ধিত উপেক্ষার সুর তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে প্রকট হইয়া স্বামি স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর করিয়াছে।

তারপর পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আমন্ত্রিত হইয়া অমর ও চারু দীর্ঘ নির্বাসনের পর পিতৃগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। অমর পিতার প্রতি ব্যবহারের জন্য অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিতে পূর্ণ; কিন্তু পত্নীর সম্বন্ধে সে যে দারুণ অবিচার করিয়াছে সে বিষয়ে সে একেবারেই উদাসীন। হরনাথবাবু চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পুত্র পুত্রবধূর মধ্যে কোন একটা আপস-নিষ্পত্তি করিবার আশু প্রয়াস করেন নাই। তিনি ভবিষ্যৎ কালের উপর এই নিদারুণ হৃদয়ক্ষত উপশমের ভার দিয়াই চলিয়া গেলেন; তিনি তাঁহার মানব চরিত্রাভিজ্ঞতা

হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, এই গভীর মালিন্যরেখা মৃত্যু-পথ-যাত্রীর একটা ইচ্ছাপ্রকাশে মাত্র মুছিবার নহে। সেইজন্য অপরাধী পুত্র-সম্বন্ধে তিনি বধূকে কোন অনুরোধ করেন নাই। সুরমা চারুকে নিজ স্নেহময় ক্রোড়ে টানিয়া লইল, কিন্তু অমরের সহিত তাহার আলাপ কেবল পিতার চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রহিল।

হরনাথবাবুর মৃত্যুর পরে সুরমার ব্যবহার আবার পরিবর্তিত হইল। সে অমর ও চারুর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল ও সংসারের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য অমর তাহাকে অনুরোধ করিতে গিয়া উপেক্ষা ও অবহেলা লাভ করিল। কেবল চারু তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও নির্ভরশীলতার গুণে সুরমার ঔদাসীন্যের মর্ম ভেদ করিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইল, সুরমা তাহার স্নেহময়ী দিদিতে রূপান্তরিত হইল। ইতিমধ্যে অমরের সাংসারিক অব্যবস্থার প্রতিষেধ জন্য সুরমা আবার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল এবং অমর ও চারুর হিতৈষী বন্ধু হিসাবে তাহাদের সাহচর্য করিতে লাগিল। এইবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল যে, সে অমরের সহিত ব্যবহারে কোন সংকোচ দেখাইয়া তাহাদের পূর্বসম্বন্ধের বেদনাময় স্মৃতি আর জাগাইয়া রাখিবে না।

এইবার অমরের পরিবর্তনের পালা শুরু হইল। সে সুরমার স্বার্থলেশশূন্য ব্যবহারে তাহার প্রতি একটা বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল, এবং এই শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অনুতাপব্যথার বিদ্যুৎ-চমক প্রেমের গোপন সঞ্চারের সাক্ষ্য দিল। অতুলের গুরুতর অসুখে সুরমার অক্লান্ত সেবা অমরকে তাহার দিকে আরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিল। অমরের অন্যমনা চিন্তিত ভাব তাহার প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিতে লাগিল। শেষে সে আত্মদমনশক্তি হারাইয়া পলায়নে বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি খুঁজিল। মুঙ্গেরে রোগ-শয্যায় অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের বিকারের মধ্য দিয়া তাহার এই অস্থিমজ্জাগত, দৃঢ়মূল অনুরাগ অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত ফুটিয়া বাহির হইল। শেষে একদিন তাহার ব্যাকুল প্রেমনিবেদনের উত্তরে সুরমা তাহাকে কঠোর আঘাত দিতে বাধ্য হইল—সে অমরের সহিত ক্ষীণতম সম্পর্কও অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র চারুর সহিত সম্পর্কের জন্যই তাহার সহিত মেলামেশা করে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিল। আরও কয়েকদিন পরে সুরমা অমরের নিকট চিরবিদায় লইল।

ইহার পর উপন্যাসের দ্বিতীয়ভাগে গল্পের ঘটনাস্থল ও পাত্র-পাত্রীর পরিবর্তন হইল। সুরমার পিত্রালয়ে, নূতন আবেষ্টন ও লোকজনের মধ্যে সুরমার সমস্যাসংকুল জীবনের ধারা শীর্ণ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চারুর পত্রে, তাহার স্নেহপূর্ণ, দুঃখিত অনুযোগে, অতুলের অপরিবর্তিত ভালবাসায় ও একবার চারুর অপ্রত্যাশিত আগমনে পুরাতন জীবনের সহিত যোগসূত্র কোনও রকমে বজায় রহিল বটে, কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় খণ্ডে একটা নূতন জীবন ধারার প্রবর্তন হইল। প্রকাশ ও উমা এখন সুরমার প্রধান স্নেহপাত্র ও ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ইহারাও তাহার চিরন্তন সমস্যার জালে জড়িত হইয়া পড়িল। বাল-বিধবা, সরলতার প্রতিমূর্তি উমার প্রতি প্রকাশের স্ফুটনোন্মুখ অনুরাগ সুরমা নির্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া নষ্ট করিয়া দিল বটে, কিন্তু এই নিষ্ঠুর উন্মূলন তাহার মনকে বেদনাসিক্ত ও অশ্রুসিঞ্চিত করিয়া প্রেমের বিকাশের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। প্রকাশও বাল্যবন্ধুর অধিকারে সুরমার কার্যের অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা তাহার কোমলতাহীন,

শুষ্ক বিচার করিবার প্রবৃত্তি, প্রবল আত্মাভিমান, ইত্যাদি দোষ-ত্রুটির প্রতি তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। মন্দাকিনীর একান্ত কুণ্ঠিত, আত্মসুখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রতিদান-অনপেক্ষী স্বামিসেবাও সুরমার মোহভঙ্গে সহায়তা করিয়াছে। তথাপি সুরমা প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। এই অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বিরাট্ বিশ্বজোড়া শ্রান্তি তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছে; উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের বোঝা তাহার পক্ষে দুর্বহ হইয়াছে, তাহার সবল, আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতি একটা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে নদীস্রোতে খাতমূল তীরতরুর ন্যায় তাহার প্রবল আত্মাভিমানের উচ্চমন্দির ধূলিসাৎ হইযাছে। কাশীতে চারুর সহিত বার কয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া সে নিজ দুর্বলতা বুঝিযা অমরের সান্নিধ্য হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু শেষবারে প্রকাশ ও মন্দার সহিত শ্বশুরবাড়ি গিয়া বিদায়মুহূর্তে সে তাহার পূর্বকৃত অস্বীকার প্রত্যাহার করিয়া অভিমানে জলাঞ্জলি দিল। অভিমান যে স্বীকারোক্তির কণ্ঠরোধ করিয়া সত্যসম্বন্ধকে মানিতে চাহে নাই, নবাঙ্কুরিত প্রেম ও নবজাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধি সেই মিথ্যাদম্ভপ্রসূত বাধা ঘুচাইয়া আজ স্বামি-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইল। প্রথম বিদায় দিনের অসমাপ্ত ও অপ্রকৃত উত্তর আজ সংশোধিত হইয়া সমাপ্ত হইল। অশ্রুজলসিক্ত পুনর্মিলনের মধ্যে দীর্ঘবিচ্ছেদের অবসান হইল।

এই উপন্যাসটির বিশ্লেষণ-কুশলতা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অমর ও সুরমার ভাব-বিপর্যয়ের স্তরগুলি অতি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার অতি নিপুণভাবে তাহাদের পরিবর্তনশীল সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চরিত্রগুলি সমস্তই বেশ সজীব হইযাছে—অমর, চারু, উমা, মন্দা প্রভৃতি সকলেই যেন আমাদের চিরপরিচিত প্রতিবেশীর মত। সুরমার মত এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে জীবন্ত, প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে লীলায়িত চরিত্র বোধ হয় বঙ্গ-উপন্যাসে নারী-জগতে দুর্লভ। তাহার মনের প্রত্যেক অলি-গলি, তাহার ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতম স্ফুরণ পর্যন্ত আমাদের অনুভূতির নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত তুলনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যে-কোন নায়িকা যেন বাহির হইতে দেখা স্বল্প-পরিচিত জীব বা কবি-কল্পনার কল্পলোকের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা অবশ্য খুব গভীর উপলব্ধির ও পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু অবস্থার অসাধারণত্বই প্রধানতঃ তাহাদের সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের হেতু বলিয়াই যেন তাহারা যে বায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাহাতে oxygen-এর একটু মাত্রাধিক্য মনে হয়। ব্যায়াম বা দৈহিক কসরতের সময় অবশ্য পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিয়া স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রার ধীর, স্বল্পোত্তেজিত গতিবিধিতে যে অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফুটিয়া উঠে তাহা সহজ বলিয়াই আরও মনোহর। সুরমা-চরিত্র এই সহজ, সাবলীল অঙ্গ-সৌষ্ঠবে মনোজ্ঞ, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতিতে প্রাণময়।

(৬)

অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮) উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্ততঃ তিনখানি—'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯) ও 'পথহারা' প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে। 'গরীবের

মেয়ে'-র স্থান ইহাদের কিছু নিম্নে। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'মা' ও 'বাগ্‌দত্তা' মন্তব্যের অতি প্রাচুর্যে কতকটা অযথা ভারাক্রান্ত হইলেও মোটের উপর উচ্চশ্রেণীর। 'চক্র' ও 'হারানো খাতা'তে ঘটনা বিন্যাসের জটিলতা চরিত্র বিশ্লেষণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'পোষ্যপুত্র' ও 'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসোচিত বিশিষ্ট গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না—ঘটনার চাপে চরিত্র-বিকাশের স্বতন্ত্র স্ফূর্তি প্রতিহত হইয়াছে। 'রামগড' ও 'ত্রিবেণী'—অনুরূপা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়—সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইবার উপন্যাসগুলির উল্লেখের বিপরীতক্রমে উহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি লেখিকার ঠিক স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাহা বলা যায় না—সামাজিক উপন্যাসই তাঁহার শক্তির প্রকৃত ক্ষেত্র। সুতরাং 'রামগড' উপন্যাসে তিনি অনেকটা জোর করিয়াই অপরিচিত রাজ্যে পদক্ষেপ করিযাছেন। ভারতের ইতিহাসকে কল্পনা-সাহায্যে পুনর্গঠন করা ও তাহার বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন রন্ধ্র পূরণ করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা যে নিতান্ত কঠিন কার্য তাহা সমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন যুগের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকিলে তাহার সাধারণ জীবনযাত্রার মৃদু স্পন্দন ও অসাধারণ উচ্ছ্বাসের চঞ্চল গতিবেগ অনুভব করা যায়, বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও সেরূপ পরিচয়ের একান্ত অভাব। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধযুগ অবলম্বনে উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের শুষ্কপঞ্জরে প্রাণ-সংযোগ হয় নাই, অনিপুণ-বিন্যস্ত তথ্যের পাষাণ স্তূপ ভেদ করিয়া উপন্যাসোচিত রসধারা প্রবাহিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় অনুরূপা দেবীও যে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করেন নাই তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। তথাপি এই উপন্যাসে প্রাচীন যুগের অসাধারণ উত্তেজনা ও সংঘর্ষের তরঙ্গভঙ্গ অনেকটা পাঠকের অনুভবগম্য হয়।

'রামগড়' উপন্যাসটি বৌদ্ধযুগে প্রবল সার্বভৌম সম্রাট্ কোশলপতির সহিত ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-মূলক রাজ্যের নায়ক লিচ্ছবি ও শাক্য-রাজবংশীয়দের বিরোধের ইতিহাস। এই বিরোধ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, অপাত্রন্যস্ত ও ব্যর্থকাম প্রণয়জ্বালা হইতে ধূমায়িত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ, পুষ্পমিত্র, বসন্ত-শ্রী, শুক্লা, অমিতা, স্বর্দাক্ষণা—সকলেই এই ব্যর্থ প্রণয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হইয়াছে ও রাজনৈতিক বিপ্লব প্রজ্বলিত করিতে নিজ জ্বালাময় হৃদয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে এই উভয় মহাদেশেই, বিবাহ ও বংশাভিমান রাজনৈতিক সমস্যাকে ঘনাইয়া তুলিবার একটা মুখ্য কারণ ছিল। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, বর্তমান উপন্যাসে প্রণয়ের রাজনৈতিক মর্যাদা একটু অযথা-রকম বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। মোট কথা ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদান এই অল্প্যৎক্ষেপে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়াছে। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ের সহযোগিতায় ইহা প্রজ্বলিত হইয়াছে। সুরজিতের শুক্লা সম্বন্ধে স্বার্থান্ধ ঔদাসীন্য, ইন্দ্রজিতের দানবোচিত জিঘাংসাবৃত্তি, পুষ্পমিত্রের রূপোন্মাদনা, বিরূঢ়কের মদোদ্ধত সাম্রাজ্য-গর্ব, বসন্ত-শ্রীর ঈর্ষ্যাকলুষিত দৃষ্টিহীনতা—এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিই মহাকালের রুদ্রনৃত্যে নিজ নিজ গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে।

চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বিন্যাসের দিক্ দিয়া উপন্যাসটির মধ্যে অনেক ত্রুটি, অপূর্ণতা আবিষ্কার করা যায়। ইন্দ্রজিতের চরিত্রে দানবোচিত নৃশংসতা ছাড়া আর কোনও উচ্চতর

মনোবৃত্তির পরিচয় মিলে না। শুক্লার চরিত্রও মোটেই ফোটে নাই— পুষ্পমিত্রেরও অতর্কিত পরিবর্তন ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মোট কথা, এই সমস্ত চরিত্রই রোমান্স রাজ্যের অধিবাসী, কতকগুলি চির-প্রথাগত নির্দিষ্ট ধারার অনুবর্তনকারী; তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক কোন গুণের বিশ্লেষণ-চেষ্টা নাই। বরং বসন্ত-শ্রীর ঈর্ষ্যাবিকৃত চিত্তদাহ ও অমিতার কোমল, আত্মসমর্থনে অপটু সলজ্জতার মধ্যে কতকটা বাস্তবতার পরিচয় মিলে। সুদক্ষিণার তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহও অমানুষিক, বিশ্লেষণের মানদণ্ড দিয়া তাহার বিচার চলে না। উপন্যাসের প্রকৃত-বর্ণনাগুলিও অত্যন্ত উচ্ছ্বাসময় ও কাব্যগন্ধী; বাস্তব প্রতিবেশ হিসাবে তাহাদের কোন মূল্য নাই; উপন্যাস-মধ্যে একমাত্র বাস্তব চিত্র কোশল-রাজের রাজসভার বর্ণনা—সেখানে সভাসদদের মধ্যে স্তাবকতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার চিত্রটি বাস্তবরসে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও নব নব উদ্ভাবন-শক্তিই তাহাকে মামুলি চাটুকারদের সহিত তুলনায় রাজপ্রসাদের পথে অগ্রবর্তী করিয়াছে। যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাদৃপ্ত রাজার সংসর্গ যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহার অনুগ্রহ-নিগ্রহ যে কতই পরিবর্তনশীল, সভাসদদের প্রাণ ও মান কত সূক্ষ্ম সূত্রের উপর ঝুলিয়া থাকে, এই দৃশ্যগুলিতে তাহার চমৎকার বিবরণ মিলে।

এই উপন্যাসের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৌদ্ধ জগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্য-মণি গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস-মধ্যে তাঁহার প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উদাসীন দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম বীরত্বের ও আত্মনির্ভরশীল পৌরুষের পরিপন্থী বলিয়া ইহা রাজনৈতিক জগতে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পার পাত্র হইয়াছে—তবে মোটের উপর সামাজিক জীবনে ইহা একটা সংকুচিত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। রাজরোষানলের নির্মম নির্যাতন ইহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। রাজসভাসদ্‌ ও সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে অনেকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন—ইহা লইয়া রাজা মাঝে মাঝে তাঁহাদের উপর বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজশক্তির ও প্রজাসাধারণের এই বিশেষ মনোভাব ঠিক ইতিহাসসম্মত কি না তাহা ঐতিহাসিকের বিচারের বিষয়।

'ত্রিবেণী' (১৯২৮) উপন্যাসে বাঙলা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় লেখিকার আলোচনার বিষয় হইয়াছে। পালবংশীয় মহীপাল দেবের অত্যাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ও তাহাদেরই প্রতিনিধি দিব্যোক ও ভীম কৈবর্তরাজের সিংহাসনাধিরোহণ—বাঙলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিহাসের পিছনে প্রজাসাধারণের যে মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাজনৈতিক পরিবেশের আসল প্রেরণা যোগায়, একবার মাত্র তাহা যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের এই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ফুটাইয়া তোলাই এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্মকথা। লেখিকা এই দুরূহ কার্যে বিশেষ সফল হইয়াছেন বলা যায় না। দাম্পত্য প্রেমের গোলাপ জল দিয়া বিপ্লবের বিস্ফোরক উপাদান গঠিত হয় না। উপন্যাসে ভীমের পারিবারিক জীবনের উপরই অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—প্রজাশক্তির সংঘবদ্ধতা ও তাহাদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবল ইচ্ছার স্ফুরণের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতিহিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ

করিয়াছে—সেই আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ কেমন ছিলেন তাহা অনুমান করিবার কল্পনাশক্তিও আমাদের নাই। অন্ততঃ তাঁহারা যে আমাদের মত কর্মবিমুখ, বাক্‌সর্বস্ব ও গার্হস্থ্য জীবনের সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ ছিলেন না ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। যে দিব্যোক ও ভীম রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রবল রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন ও অবলীলাক্রমে নূতন শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন যে শুধু জাল বাহিয়া ও পারিবারিক ক্ষুদ্র সংঘর্ষের মৃদু উত্তেজনার মধ্যেই অতিবাহিত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা চলে। কৈবর্তরাজদ্বয়ের সাংসারিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ অনুভূত হয়, লেখিকা তাহা পূরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বাঙালী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সতেজ রাষ্ট্রচেতনা না থাকিলে তাহাদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ গণ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া সম্ভবপর হইত না, উপন্যাসে তাহারও কোন আভাস মিলে না। প্রতিবেশ-রচনায় অসাফল্যই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি।

অবশ্য লেখিকা যে সেই সুদূর অতীতের যুগোচিত বৈশিষ্ট্য ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই তাহা নয়। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পাশাপাশি অবস্থান, সমাজজীবনে বিলাসের আধিক্য ও নটীর প্রাধান্য, রাজপ্রাসাদে ভ্রাতৃ-বিরোধ ও মূলতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত বিবাহে দাম্পত্য সহৃদয়তার অভাব, রাজশক্তির অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার, এমন কি রাজনর্তকীর মুখে প্রাকৃতভাষায় রচিত গানের আরোপ এই সমস্তই অতীত যুগের প্রতিচ্ছবি পাঠকের মনে মুদ্রিত করার প্রয়াস। তথাপি বোধ হয় যেন ইহারা অতীতের ইতিহাস-সৌধের গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র—ইহাদের মধ্যে চিত্রসৌন্দর্য আছে, জীবনস্পন্দন নাই। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাণশক্তির মূল যে গভীর স্তরে প্রোথিত থাকে, লেখিকা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়কেই তুল্যরূপে শূন্যগর্ভ বলিয়া মনে হয়—একটি যেন বিলাসস্ফীত বুদ্‌বুদ্ মাত্র, অপরটি যেন ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট অমূল তরু। একের পতন ও অপরের প্রতিষ্ঠা উভয়েই যেন ভোজবাজির আকস্মিকতার লক্ষণাক্রান্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় প্রাণহীন গতানুগতিকতাও আদর্শগত কোন স্পষ্টধারণা না থাকার স্বাভাবিক ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র 'যবন-বিপ্লব' শীর্ষক অধ্যায়ের অগ্নিজ্বালাময় অনুভূতির অনুরূপ কিছু এ-উপন্যাসে নাই।

এই প্রতিবেশগত অস্পষ্টতা বাদ দিলে কতকগুলি দৃশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপযুক্ত উন্মাদনার, বীরত্বপূর্ণ, উচ্চআদর্শ-প্রভাবের পরিচয় দেয়। উজ্জ্বলার আত্মহত্যায় মহীপালের উন্মনা, অনুতাপ-ক্লিষ্ট মনোভাব, দিব্যোকের সনাতন রাজভক্তির প্রত্যাখ্যান-মুহূর্তে অগ্নিজ্বালাময় অন্তর্বেদনা, পট্টমহাদেবীর দুষ্কৃতকারী স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিনিষ্ঠা, ভীমের বৈরাগ্যধূসর চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা ও রামপালদেবের প্রগাঢ়, অতুলনীয় মহানুভবতার দৃশ্যগুলি স্মৃতির উপর স্থায়ী রেখায় অঙ্কিত হয়। চরিত্র-পরিকল্পনাও মোটের উপর সুষ্ঠু হইয়াছে। রাজপরিবারের চরিত্রচিত্রণ সনাতন আদর্শেরই অনুবর্তন করিয়াছে—তবে রামপালের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার গোষ্ঠীপরিচয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্ফুটতর করিয়াছে। দিব্যোক ও ভীমের চরিত্রবিকাশ ও পরিণতি অনেকটা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে—মৎস্যজীবীর সাম্রাজ্যস্রষ্টায় পরিবর্তনের ঘটনামূলক বিবৃতি ছাড়া অন্তর্লোকের রহস্য-উদঘাটনের

কোন চেষ্টা হয় নাই। প্রকৃতি-বর্ণনা ও ভাবগভীর অন্তর্বিক্ষোভের আলোচনা বাগাড়ম্বর ও পরিমিতিহীন মন্তব্য-বিশ্লেষণের গুরুভারে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হইয়াছে।

(৬)

অনুরূপা দেবীর সামাজিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১) কাঁচা হাতের রচনা। জমিদার-পুত্র বিনোদকুমারের স্নেহবুভুক্ষু অভিমানপ্রবণতা উপন্যাসটির সমস্ত ক্রিয়ার মৌলিক শক্তি (motive force)। সে পিতার উপর তুচ্ছ কারণে অভিমান করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে; কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা বলিয়া ভ্রম করিয়া শিবানীকে বিবাহ করিয়াছে। তারপর সে যাহা করিয়াছে তাহা ভদ্রসন্তানের সম্পূর্ণ অযোগ্য—একটা অমানুষিক হৃদয়হীনতার নিদর্শন। সে পত্রদ্বারা নিজ আসন্ন মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়াছে, আরোগ্যলাভের পর একটা আশ্বাসসূচক সংবাদ পর্যন্ত দেয় নাই। তাহার খামখেয়ালী চরিত্র প্রত্যেক ধাক্কায় এক একটা অতর্কিত পরিবর্তনের মোড় ফিরিয়াছে। দারুণ অভিমানপ্রবণতা ও দুর্ভেদ্য আত্মগোপনশীলতা তাহার চরিত্রের প্রধান উপাদান; মোটের উপর তাহার চরিত্রে কোন বিশ্লেষণ-গভীরতা নাই ও উহা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও এই বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাব দেখা যায়। স্নেহদুর্বল শ্যামাকান্ত, দৃঢ়চেতা রজনীনাথ, ব্রীড়াসংকুচিতা শান্তি, উদ্ধতপ্রকৃতি পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র—সকলের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য খাটে। কেবল শিবানীর প্রস্তর-কঠিন, প্রকাশ-বিমুখ চরিত্রটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌণ চরিত্রদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত সজীব হইয়াছে, তাহার কর্কশ কলহপ্রিয়তা তাহার মেয়েজামাই-এর প্রতি স্বাভাবিক স্নেহকেও একটা বক্র, বিরুদ্ধ গতি দিয়াছে।

উপন্যাসের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও একটা সংশয় জাগে। উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক বিনোদ—হেমেন্দ্র নহে।

'জ্যোতিঃহারা' (১৯১৫) উপন্যাসটির পরিণাম লেখিকার কোন এক শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধে, বিয়োগান্ত হইতে মিলনান্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনাগুলির কোন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নাই, লেখিকার ইচ্ছানুসারে তাহাদের মোড় ফিরান যাইতে পারে। এই যদৃচ্ছা-প্রবর্তিত পরিবর্তন উপন্যাস বা নাটকের পক্ষে একটা অপকর্ষের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিকই, ইহার বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক গুণ খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয় না। যামিনী ও অনিমার মিলনে যে কোন স্বাভাবিক অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে তাহা লেখিকা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

অণিমা যামিনীকে প্রত্যাখ্যান করার পর হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত রুচি ও স্বাদ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার গ্রন্থ-পাঠ, নাস্তিক্যবাদের আলোচনা, তাহার পরহিতব্রত কিছুই যেন তাহার অবলম্বনহীন জীবনকে খাড়া রাখিতে পারে না। সে তাহার অত্যন্ত পরিমিত জীবনযাত্রার গণ্ডি হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছে। এই সময় যখন তাহার জীবন এক দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন গ্রন্থিচ্ছেদন করিবার জন্য এক দীর্ঘকাল অনুপস্থিত, ভক্তিপ্রবণ দাদামহাশয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি নিজ স্বাভাবিক সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে সহজেই অণিমার হৃদয়-সমস্যা বুঝিয়া লইয়াছেন ও তাহার

সমাধানও করিয়া দিয়াছেন। দাদামহাশয় যখন ভ্রান্তি-নিরসন করিয়া দিলেন, তখন অণিমার মনে আর কোন বিরোধের গ্লানি রহিল না—নিষ্ফল আত্মপীড়নের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে তাহার নিজের ও তাহার ধৈর্যশীল, চিরসহিষ্ণু প্রণয়াস্পদের বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার বিরোধ ও মিলন উভয়ই তর্কমূলক, ধর্মবিষয়ক মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যামিনী ও অণিমার মধ্যে যেমন কোন সত্যকার হৃদয়-গত অনৈক্য ছিল না, সেইরূপ তাহাদের আকর্ষণও অনেকটা আদর্শ সাম্য ও চরিত্র সংগতি হইতে উদ্ভূত; প্রেমের দুর্নিবার শক্তি তাহাদের মনের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহাদের মিলনও একটা বহিঃশক্তির মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হইয়াছে—কৃত্রিম বাধা একটা অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ের দ্বারাই অপসারিত হইযাছে। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে হৃদয় বৃত্তির খুব যথেষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যামিনী, অণিমা উভয়েরই জীবনের উপর একটা রিক্ত ধূসরতার ছায়া সঞ্চারিত হইয়াছে। বঞ্চিত প্রেমের ফাঁক পূরণের জন্য তাহারা যে শিক্ষা বিস্তার, পরোপকার-ব্রতের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের জীবনী-শক্তি যেন মন্দীভূত হইয়া শীর্ণধারায় সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের বাঁধা খাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। আদর্শবিষয়ক তর্ক ও সৎকর্মের পরিকল্পনা তাহাদের জীবনের উচ্ছ্বাস-চাপল্যের উপর পাষাণ-ভারের ন্যায় চাপিয়া বসিযাছে। বরং দুইটি অপ্রধান চরিত্রের হৃদযে—বরেন্দ্রকৃষ্ণ ও জ্যোৎস্নার অন্তঃকরণে—প্রেমের তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিযা তাহাদিগকে প্রেমিকের প্রাপ্য অসামান্যতা আনিয়া দিয়াছে। তবে বরেন্দ্রকৃষ্ণের চিত্ত-বিশুদ্ধি ও জ্যোৎস্নার আত্মবিসর্জন—এ উভয়ই অনেকটা melodramatic, অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। যামিনীর প্রতি আক্রমণও কতকটা অস্বাভাবিক—আমাদের পারিবারিক জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপ হইয়া থাকে, বন্দুকের গুলিকে তাহাদের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। মোট কথা, উপন্যাসটিতে যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ নয়। ইহার মধ্যে এমন কোন দৃশ্য নাই যাহা উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দিতে পারে।

(৭)

'চক্র' উপন্যাসটি প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র-কাহিনীর সংমিশ্রণ। সিভিলিয়ান তরুণ লাহা তাহার প্রণয়িনী কৃষ্ণা মল্লিকের চিত্তজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইযা প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয় শীলকে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া নিজ প্রণয়-সাধনার পথ হইতে সরাইতে চাহিয়াছেন। *কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত ভেদ হইয়া আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।* তরুণের প্রণয় সাধনায় একনিষ্ঠতা, প্রেমিক হৃদয়ের চরম ক্ষমাশীলতা ও প্রেমের আত্মলোপী আতিশয্যই বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্রের হেয়ত্বকে অনেকটা ক্ষালিত ও ক্ষমার্হ করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষ্ণার পিতা ডাঃ মল্লিকের আভিজাত্য-গর্বের একটা করুণ দিক্ আছে; ইহাকে নিছক স্বার্থপ্রিয়তা ও বিলাসাসক্তি বলিয়া মনে করিতে আমাদের অন্তঃকরণ সায় দেয না। দারিদ্র্য ও

অসহায় অন্তরের মধ্যেও তিনি তাঁহার পূর্বজীবনের ঐশ্বর্য-গরিমার স্মৃতি ও ব্যবহারিক আদর্শকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন ও তাঁহার এই চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীর দোহাই, দিয়া তিনি কন্যার সহসা পরিবর্তিত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। কৃষ্ণার জীবনে যাহা কিছু সংশয়-জড়িমা, তাহা আসিয়াছে তাহার পিতার প্রবল প্রতিকূলতার দিক্ দিয়া; তরুণের প্রতি কর্তব্যবোধ সে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করিয়াছে। মৃতপ্রেমের সিংহাসনে কৃতজ্ঞতার প্রেতমূর্তিকে বসাইয়াও নিজ ঋণভার লঘু করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নাই। কৃষ্ণার এই অকুণ্ঠিত নির্মমতাই পাঠকের মনে তরুণের প্রতি একটু করুণার উদ্রেক করে ও উভয়ের মধ্যে সহানুভূতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

গ্রন্থমধ্যে বিনয়-উর্মিলার শৈশব-চাপল্য-প্রখর, দুরন্তপনার অন্তরাল-প্রচ্ছন্ন প্রণয়লীলার চিত্রটি সর্বাপেক্ষা মধুর ও উপভোগ্য হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রণয়ের চিরপ্রথাগত সনাতন চিত্রের সহিত ইহার কোন মিল নাই, অথচ ইহার সমস্ত দুর্বর্ষতা ও তীব্র বিরোধের মধ্যেও আকর্ষণের গোপন গতিবিধি লক্ষ্যগোচর হয়। নিদারুণ অভিজ্ঞতার চাপে উর্মিলার চপলমতি বালিকা হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর যৌবনে পরিণতির চিত্রটি বেশ সুন্দর ও সুসংগত হইয়াছে।

বিনয় ও কৃষ্ণার সহকর্মিতা হইতে প্রণয়-আকর্ষণের পরিণতি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে বিনয়ের চরিত্রটি কতকটা খর্ব করা হইয়াছে। কৃষ্ণার দিকে আকৃষ্ট হইবার সময় উর্মিলার স্মৃতি যে তাহাকে পিছন দিকে টানে নাই বা তাহার মনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নাই, ইহা তাহার লঘুচিত্ততার পরিচয়। মোট কথা, ইহারা উভয়েই রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হইয়া তাহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কতকটা হারাইয়াছে। সমগ্র উপন্যাসটিও অনেকটা এই দোষযুক্ত হইয়াছে—ইহাতে চরিত্রস্ফুরণ অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাস সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ইহা খুব উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে না।

'হারানো খাতা'কে অনেকটা পূর্বোক্ত পর্যায়ে ফেলা যায়। এখানেও সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হইয়াছে নিরঞ্জনের আত্মগোপনের রহস্যভেদে। নিরঞ্জনের ডায়েরী হইতে তাহার মস্তিষ্কবিকার ও বিপর্যস্ত স্মৃতিশক্তির বিশ্লেষণের কতকটা চেষ্টা থাকিলেও ইহার প্রধান প্রয়োজনীয়তা হইতেছে তাহার পূর্ব-জীবনের ইতিহাস সংকলনে; অর্থাৎ ইহার প্রকৃত কার্য মনস্তত্ত্বমূলক নহে, ঘটনা স্মৃতিমূলক। নরেশচন্দ্রের সহিত পরিমলের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত ও অসম্পূর্ণ সহানুভূতির চিত্র পাওয়া যায়, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া গভীর না হইলেও নিখুঁত। এই দাম্পত্য বিরোধের বর্ণনা ও রাজবাড়ির পরিজনবর্গের কুৎসা ও পরনিন্দা-পূর্ণ, মুখরোচক আলাপের বিবরণটিও বাস্তবতার দিক্ দিয়া বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। নরেশচন্দ্র ও সুষমা উভয়েরই ব্যক্তিত্বস্ফুরণ আদর্শবাদ ও সমাজনীতি-প্রভাবের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুষমা ও 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী—উভয়ের সমস্যা ও মনোভাব প্রায় একই প্রকারের; কিন্তু সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বটি আমাদের নিকট যেরূপ স্বচ্ছ ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, সুষমার ছায়াময় অস্পষ্টতার সহিত তাহার কোনই তুলনা চলে না। আদর্শ চরিত্রমাত্রই যে অবাস্তব হইবে তাহা নহে, তবে তাহার বিশ্লেষণেও বাস্তবরীতির প্রাধান্য থাকা চাই। সুষমার চরিত্র-বিশ্লেষণে এরূপ কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মুদ্রাঙ্কিত বাস্তবতার পরিচয় মিলে না।

(৮)

বোধ হয় 'মা'ই (১৯২০) অনুরূপা দেবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। এক দিক্ দিয়া ইহার জনপ্রিয়তা খুবই যুক্তিসংগত। পৌরাণিক যুগ হইতে আমাদের মনে যে ভাবের ঝংকার বাজিতেছে, লেখিকা এই উপন্যাসে আমাদের সেই চিরপরিচিত সুরটিই জাগাইয়াছেন, যুগ-যুগান্তের প্রবণতাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন। কঠোর কর্তব্যপালনের জন্য নিরপরাধা সাধ্বী স্ত্রী-পরিত্যাগের কাহিনী আমাদের সমবেদনাকে যেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, সেই প্রবল আকর্ষণের মূলে আছে বাল্মীকি কৃত্তিবাসের করুণা-সিক্ত অপরূপ কবি-কল্পনা। কাজে কাজেই যে কেহ বিষয়-নির্বাচনে এই কবি-গুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারসূত্রে অতি সহজে আমাদের হৃদয় জয় করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের মত ভাবাতিরেকপ্রবণ জাতিকে অতীতের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে প্রবহমান ভাবধারা সহজেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। বিশেষতঃ, 'মা' নামে এমন একটা মন্ত্র-শক্তি নিহিত আছে, যাহার প্রভাব কেবলমাত্র আমাদের সাহিত্যরসবোধের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। মা যে কেবল আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্র, কেবল যে উহার সমস্ত স্নেহ-মমতা-ভক্তিধারার উৎস ও প্রতীক তাহা নহে, আমাদের ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরারাধনার সমস্ত অতীন্দ্রিয় মহিমা তাহাকে নিজ জ্যোতির্মণ্ডল-বেষ্টিত করিয়াছে। এই নামের ডাকে আমাদের সমস্ত সুকুমার অনুভবশক্তি, সমস্ত অন্তর্নিহিত করুণা সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই থাকে।

অবশ্য জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ ঠিক এক বস্তু নহে। বিষয়-বস্তুর অনাদি প্রাচীনত্বই ইহার ঔপন্যাসিক মৌলিকতার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। যাহাকে আমরা কাব্যের অমৃত-নিষ্যন্দ-নিষিক্তরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, উপন্যাসের তীক্ষ্ণ, মোহাবেশহীন বিশ্লেষণ যেন তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কাব্যের অনুকরণ-প্রবৃত্তি ঔপন্যাসিকের উচ্ছ্বাসকে সর্বদাই ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে। Sentimentalityর অজস্র অবিরল ধারা উপন্যাসের প্রান্তরভূমিকে সিক্ত কর্দমাক্ত করিয়া তোলে। এই উপন্যাসে লেখিকার মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনা এই ভাবাতিরেক দোষে দুষ্ট হইয়াছে। অজিতের পিতার জন্য ব্যাকুল, মোহান্ধ প্রতীক্ষায় এই আতিশয্যপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। পিতার প্রতি আকর্ষণ, মত্ততার মত তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, তাহার আত্মহিতজ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছে, তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া বাহির করিয়াছে। অরবিন্দের পিতৃ-আজ্ঞা-পালনের উৎকট, নির্মম আতিশয্যেও ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ মিলে। সে যেন একটা সুকঠোর ব্রতের মত পিতার নৃশংস আদেশ অক্ষরে অক্ষরে, কায়মনোবাক্যে পালন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মনোরমার স্মৃতিকে পর্যন্ত তাহার মনের গভীর তলদেশ হইতে উৎপাটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। মনোরমাও গভীর প্রেমের সহজ অন্তর্দৃষ্টিবলে স্বামীর অবস্থাসংকটের বিষয় অবগত হইয়াছে—নিজেকে স্বামী-প্রেমের পূর্ণাধিকারিণী জানিয়া এই অনিচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অজিত যখনই পিতার অবিচার ও নিঃস্নেহতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিযোগ আনিয়াছে, মনোরমা তখনই তাহাকে পিতার অমানুষিক আত্মোৎসর্গের কথা বুঝাইয়া পিতার প্রতি তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অভিমানী, পিতৃস্নেহের কাঙাল বালক মাতার

উচ্চ মনোভাবের সহিত একসুরে মন বাঁধিতে পারে নাই; তাহার মন বিদ্রোহ করিয়াছে, ব্যর্থ অভিমানে গুমরাইয়া মরিয়াছে, নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এদিকে আবার পিতৃস্নেহের নিগূঢ় আকর্ষণও সে রোধ করিতে পারে নাই; অশরীরী প্রেতাত্মার মত অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া পিতার অনুসরণ করিযাছে, নিজ সুনাম ও ভবিষ্যতের আশা সমস্তই রক্তশোষণকারী আকাঙ্ক্ষার নিকট বলি দিয়াছে। শেষে মাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বিমাতা ব্রজরাণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহার সকল বিদ্রোহ-বিক্ষোভ শান্তিতে বিলীন হইয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ অরবিন্দ ও ব্রজরাণীর দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা। অরবিন্দের ব্যবহারে নিখুঁত নিশ্ছিদ্র লৌকিক কর্তব্যপালনের সঙ্গে অবিচলিত উদাসীনতার সমন্বয় হইয়াছে। মনোরমার প্রতি বাক্যে বা ব্যবহারে সে কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করে নাই —যৌবনের সেই প্রথম-প্রেমরাগরঞ্জিত অধ্যায় সে একেবারে জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিযাছে। অথচ তাহার ক্ষুদ্রতম কার্যে, তাহার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতে ব্রজরাণী নিঃসংশয়ে বুঝিযাছে যে, তাহার সবটুকু প্রেম, সবটুকু উৎসাহ তাহার সপত্নী নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে; প্রেমের পাত্রে তাহার জন্য এতটুকু উদ্‌বৃত্ত পড়িয়া নাই। সমস্ত লৌকিক কর্তব্য-পালনের মধ্যে অরবিন্দের নিঃসঙ্গ অনাসক্ত মনের চিত্রটি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের সহজ সমৃদ্ধি, প্রাণরসের নিগূঢ় সঞ্চরণ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে—প্রতিজ্ঞা-পালনের শুষ্কবৃন্তে সে কোনরূপে নিজেকে ধরিয়া রাখিযাছে মাত্র। স্নেহ-প্রবৃত্তির এই নির্মম নিপীড়নে, এই কঠোর আত্মনিগ্রহে তাহার জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতে চলিয়াছে। অবশেষে যে পক্ষাঘাত আসিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিযাছে তাহা এই জীবনব্যাপী আত্মনিরোধের চরম, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। আবার অজিতের কাঙ্গাল স্নেহবুভুক্ষা তাহার ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দ, অবিরাম পিতৃ-অনুবর্তন, এই পরিণতির গতিবেগ বর্ধিত করিয়াছে। অরবিন্দের এই অমানুষিক আত্মবলিদানের প্রত্যেক স্তরটি আমাদের নিকট জীবন্ত, উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিযা উঠিয়াছে।

ব্রজরাণীর চরিত্রটিও খুব সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। তাহার বঞ্চিত অশান্ত চিত্ত তাহার চারি-দিকে সর্বদাই একটা ক্ষুদ্র ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করিযাছে। অরবিন্দের পরিবারে তাহার অনধিকার-প্রবেশ যেন তাহার সমস্ত জীবনকে একটা সন্দিগ্ধ অনিশ্চয়তার বিষ-বায়ুতে দূষিত করিয়াছে—কোথাও যেন সে তাহার সহজ, স্বাভাবিক স্থানটি পায় নাই। সে তাহার নিজের গৃহে আপনাকে শত্রুদুর্গে বন্দিনী বলিয়া অনুভব করিয়াছে। তাহার অভিমানপ্রবণ মন সর্বত্রই একটা গোপন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে, একটা কষ্টনিরুদ্ধ অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ক্রূর হাস্য যেন তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ইহার উপর তাহার সন্তানহীনতা তাহার জীবন-সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। যে স্বর্ণ-সেতু বাহিয়া সে বিচ্ছেদের লবণ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের কেন্দ্রস্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত, তাহা তাহার ভাগ্যদোষে অরচিতই রহিযা গিয়াছে। শাশুড়ীর ঔদাসীন্য ও ননদ শরৎশশীর প্রকাশ্য প্রতিকূলতা তাহাকে নিজ দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন রাখিয়াছে। সুতরাং ফল দাঁড়াইয়াছে যে, ব্রজরাণী পরিবার-মধ্যে একটি সজীব আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাহার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

ছড়াইয়াছে। এই অগ্নিবৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক বর্ষিত হইয়াছে বেচারা অরবিন্দের উপরে। স্বামীর প্রতি অসংগত অভিমান ও ক্রোধের দ্বারা সে তাহার দুঃখের পাত্র পূর্ণ করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত স্বামী হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাহার সমস্ত অগ্ন্যুৎপাতের কেন্দ্রস্থলে এক স্নেহ-শীতল, সন্তান-বৎসল মাতৃহৃদয় লুক্কায়িত ছিল সেই মাতৃহৃদয় অবশেষে তাহার ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-সংকীর্ণতার উপর জয়ী হইয়াছে। অজিতের মাতৃসম্বোধন তাহার জীবনে এক নূতন অধ্যায় উন্মীলিত করিয়াছে—সে অবশেষে নিজ চির-ঈপ্সিত মাতৃত্বের গৌরবময় সিংহাসনে নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য গৌণ চরিত্রের মধ্যে শরৎশশী খুব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক তুলা-দণ্ডের সাম্যরক্ষার জন্য ছোট ননদ উষাকে ব্রজরাণীর পক্ষপাতিনীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে—কিন্তু তাহার জীবন তাহার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয়তাকে ছাড়াইয়া যায় নাই। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অতলস্পর্শী নীচতার প্রতিরূপ আমাদের বাস্তব সমাজে বিরল নহে—তথাপি উহার চরিত্রের মধ্যেও একটু আতিশয্যপ্রিয়তা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মনোরমার সহিত রাবেয়ার সখিত্বের চিত্র মনোরমার সর্বরিক্ত জীবনে সন্তান-বাৎসল্য ছাড়া আরও একটা দিকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মনোরমা-চরিত্রের শোক-স্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে কোন বৈচিত্র্যের ক্ষীণতম আভাসও সঞ্চারিত হয় নাই। মোটের উপর, মন্তব্যের অসংযত বিস্তার ও অতিরঞ্জন-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও 'মা' উপন্যাসটির স্থান উপন্যাস-জগতে বেশ উচ্চে।

'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের অত্যধিক জটিলতা কৃত্রিমতার হেতু হইয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও অপ্রত্যাশিত দৈব-সংঘটনের অবশ্য অবসর আছে; কিন্তু কমলা ও গৌরীকে লইয়া দৈবের যে নিত্য-পরিবর্তনশীল খেলা চলিয়াছে, তাহাকে বাস্তব জীবনের আবেষ্টনে স্থান দেওয়া কঠিন। এই অপ্রত্যাশিতের বারংবার আবির্ভাবে উপন্যাসটির স্বাভাবিক অগ্রগতি পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়াছে। বিশেষতঃ গৌরীর জন্মরহস্য ও পিতৃনিরূপণ লইয়া যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে তাহাকে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। দৈব যেন মানুষের যত্নরচিত ব্যবস্থা ও প্রত্যাশিত পরিণতিকে লণ্ডভণ্ড, বিপর্যস্ত করিয়া একপ্রকার হিংস্র, ক্রূর আনন্দ লাভ করিয়াছে। দৈবপ্রভাব যেখানে এরূপ তীক্ষ্ণভাবে প্রবল, সেখানে মানুষের স্বাধীন ঘাত-প্রতিঘাতের রসধারা জমাট বাঁধিবার অবসর পায় না। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলিও দৈবের ক্রীড়নকস্বরূপ হওয়ায় তাহাদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগ পায় নাই। উমাকান্ত ভট্টাচার্য ও মণীশ একেবারে আদর্শলোকের অধিবাসী, মর্ত্য-জীবনের সহিত তাঁহাদের সংযোগ নিতান্ত আলগা ধরনের। পৃথিবীর সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র স্থান গত, হৃদয় গত নহে। যাঁহারা মরজগতের সংঘর্ষ-বিরোধের মধ্যে ঊর্ধ্ব-নিহিত-দৃষ্টি হইয়া ধ্যানমগ্নভাবে বিচরণ করেন, যাঁহারা নিষ্কাম ধর্মের বর্ম-পরিহিত হইয়া সংসার-রণক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অক্ষত-শরীর থাকেন, তাঁহাদের স্থান আর যেখানেই হউক, মানুষের অসংখ্য-বিচিত্র আশা-তৃষা-হর্ষ-বিষাদ-উদ্বেল জীবন-কাহিনী যে উপন্যাস সেখানে তাঁহাদের স্থান নাই। কাব্যে আমরা অতি-মানবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি; উপন্যাসে আমাদের সমশ্রেণীস্থ,—কোথাও

গৌরবোজ্জ্বল, কোথাও পরাভব-ম্লান, কিন্তু সর্বত্র যুদ্ধচিহ্নিত—মিশ্র জীব দেখিতে চাই। উমাকান্তের মনে কখন কোন বাহ্য ঘটনা ছায়াপাত করে বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার নির্বিকার চিত্ত কোন আঘাতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। মণীশ অবশ্য ঔদাসীন্যের এতটা চরমোৎকর্ষে এখনও পৌছিতে পারে নাই—কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরে কোন বিক্ষোভের চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হয় না, সমস্ত ব্যথা-বেদনা, সমস্ত আশাভঙ্গ সে নীরবে সহ্য করে। কমলার শোকে পিষ্ট জীবনে উচ্ছ্বাসের বাহ্যচাঞ্চল্য সমস্তই অন্তর্লীন হইয়াছে; মণীশের সহিত বিবাহের সম্ভাবনায় তাহার মন হর্ষোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম এই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্ফীতির দুই-একটি মাত্র তরঙ্গকে বাহিরে আসিতে দিয়াছে। শচীকান্তের সহিত অবাঞ্ছিত বিবাহের পরই তাহার চরিত্রের প্রস্তর-কঠিন দৃঢ়তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। সে শচীকান্তের অগ্নিস্রাবের ন্যায় জ্বালাময় প্রেমে দারুণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার শীতল বারি ঢালিয়াছে; এক মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতি তাহার অটল সংকল্পের তীব্র দ্যুতিকে ঝাপ্‌সা করিয়া দেয় নাই। তথাপি যেন মনে হয় যে, তাহার অজ্ঞাতসারে শচীকান্তের সর্বত্যাগী প্রণয় তাহার মনের অবচেতন প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শচীকান্তকে যে সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা দয়া অপেক্ষা আরও কোন গূঢ়তর, গভীরতর মূল হইতে সমুদ্ভূত। যে স্বত্বে সে শচীকান্তকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমই দিতে পারে। কমলার চরিত্রটি খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তিরই নিদর্শন।

গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও প্রাণবেগ-চঞ্চল চরিত্র শচীকান্তের। তাহার স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসুখপরায়ণ প্রকৃতি পিতার আদর্শকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করিযাছে। তাহার প্রেম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধ-রহিত। এই প্রেমের জন্য সে বন্ধুত্ব, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্ভ্রম, পারিবারিক শান্তি, শেষ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। নৈহাটি স্টেশনের প্লাটফর্মে সেই বিনিদ্র রজনীতে তাহার মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব, দেবাসুর-সংগ্রামের চিত্রটি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কমলা যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন যেরূপ দৃঢ়তা ও অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সে তাহার দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রগৌরবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে হতাশ প্রেমিক প্রণয়লেশহীনা প্রেমপাত্রীর অঙ্গুলিসংকেতে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করিয়া লইতে পারে, তাহার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে কতকটা স্বর্গীয় উপাদান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপথ-চালিত হইলেও তাহার মহত্ত্ব অবিসংবাদিত; সে উমাকান্ত বাচস্পতির প্রকৃত বংশধর; তবে আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিবর্তে প্রেমই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। পিতার মতই তাহার তন্ময়তা ও একনিষ্ঠ সাধনা; লক্ষ্যের প্রভেদই তাহার জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালনা করিয়াছে।

'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে কতকগুলি প্রবল অনুভূতিময় দৃশ্য পাওয়া যায়। নৈহাটি স্টেশনে শচীকান্তের দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা-বিকারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শচীকান্ত ও কমলার মধ্যে তাহাদের বিবাহের পরবর্তী সম্পর্কের চিত্রটিও খুব চমৎকার হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য, শচীকান্তের উন্মত্ত আবেগ ও কমলার অর্ধচেতন বিমূঢ়ভাবের বর্ণনার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিচয় মিলে।

(৯)

অনুরূপা দেবীর প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার পরবর্তী কয়েকখানি রচনার সংক্ষিপ্ত বিচার করাই সুবিধাজনক। 'জোয়ার-ভাঁটা', 'উত্তরায়ণ' ও পথের সাথী' তাঁহার বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে। এই তিনখানি উপন্যাসেই তাঁহার শক্তি যে অপরাহ্ণের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোনখানিতেই গভীর জীবন-সমস্যার গভীর আলোচনার চিহ্ন নাই; চরিত্র-সৃষ্টিরও কোন বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। 'জোয়ার-ভাঁটা' উপন্যাস, নব্যতন্ত্রের সিভিলিয়ান স্বামীর সহিত খাঁটি হিন্দুমতাবলম্বিনী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কাহিনী। কিন্তু এই উপাখ্যানের বিবৃতিতে লেখিকার পক্ষপাত এতই প্রকট হইয়াছে যে, ইহা নিরপেক্ষ আর্ট-সৃষ্টি হইতে অসংবৃত মতবাদ-প্রচারের পর্যায়ে অবনমিত হইয়াছে। পঙ্কজিনীর চরিত্র আমাদিগকে মোটেই গভীরভাবে স্পর্শ করে না; তাহার কার্যের মধ্যে একটা প্রখর পরমত-অসহিষ্ণুতা লক্ষিত হয়; ইহা একগুঁয়েমিরই নামান্তর। অবশ্য লেখিকার পক্ষ-সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, পঙ্কজিনীকে এই প্রকার সংকীর্ণ-মতবাদ-চালিত ও পরমত-অসহিষ্ণুরূপে চিত্রিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহা হইলে হঠাৎ তাহাকে আদর্শ ক্ষমাশীল হিন্দু রমণীতে রূপান্তরিত করারও কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সুধীন্দ্র ও পঙ্কজিনীর মধ্যে সুধীন্দ্রই আমাদের অধিকতর সহানুভূতি আকর্ষণ করে। সে স্ত্রীর জন্য যতটা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার স্ত্রী তাহার শতাংশের একাংশও দেয় নাই। অন্ধ স্বামীর সেবা অপেক্ষা আচারভ্রষ্ট স্বামীর সংশোধন-চেষ্টা অধিকতর সহজসাধ্য ছিল; এবং যাহার মধ্যে দ্বিতীয় কার্যের উপযোগী ধৈর্য ও সহানুভূতির একান্ত অভাব সে যে প্রথম কার্যে সাফল্যলাভ করিবে ইহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি সলিল ও আরতির প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকের কাহিনী। এই প্রতিবন্ধক আসিয়াছে দুইটি মূল হইতে— প্রথমতঃ, সলিলের মাতা মহামায়ার অটল, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা-পালন; দ্বিতীয়তঃ, আরতির অত্যধিক তীব্র আত্মসম্মানবোধ। আরতির পিতার শোচনীয় আত্মহত্যার পর তাহাদের নিঃসহায় দুরবস্থা করুণার শাখাপথ বাহিয়া সলিলের প্রেমের নদীকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—সে উচ্ছ্বসিত প্রেমের বেগে মাতার অসম্মতিরূপ প্রথম বাধা ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অসম্মতির বীজ আরতির অতি তীব্র আত্মসম্মানবোধের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া দ্বিতীয় বাধাকে অলঙ্ঘ্য করিয়া তুলিল। সে বারংবার সলিলের অক্লান্ত সেবা ও ব্যাকুল প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সলিলের জীবন-পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। লেখিকা দেখাইয়াছেন যে, সলিলকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ সম্পূর্ণরূপে আদর্শবাদমূলক নহে। আরতি অনেকটা রোগবিকৃত মস্তিষ্কের জন্যই সলিলের বিরুদ্ধে কুৎসিত সন্দেহের দ্বারা বিচলিত হইয়াছে। এই সন্দেহপ্রবণতা ও অবিচার আরতির ব্যবহারকে নিছক আদর্শবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া কতকটা বাস্তবগুণান্বিত করিয়াছে, কিন্তু লেখিকা আরতির চরিত্রের এই দিকটার উপর তত ঝোঁক দেন নাই; পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তিনি তাহার আদর্শ আত্মবিসর্জনের ছবিটিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। এই

উভয় দিকের চাপে সলিলের সংকল্পের দৃঢ়তা অভিভূত হইয়াছে—সে শেষ পর্যন্ত মাতার অনুবর্তী হইয়া মাতৃ-নির্বাচিত কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছে।

সলিলের অনিচ্ছাকৃত বিবাহের ফল বড় সুখময় হইল না। স্বর্ণলতার স্বামিপ্রেমলাভের ব্যগ্রতার চিত্রটি বেশ চমৎকার আঁকা হইয়াছে; তাহার অপরিণত মনের প্রণয়বিষয়ক অকাল-পক্বতার বিবৃতিটি বেশ বাস্তবানুগামী। লেখিকা স্বর্ণলতাকে গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ সেই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও সূক্ষ্মোপলব্ধিমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগশয্যায় তাহার অসহিষ্ণুতা ও অভিমানপ্রবণতা, তাহার রুক্ষ মেজাজ ও অসংগত আবদার, শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি অবহেলার অনুযোগ—এ সমস্তই তাহার চরিত্রের সজীবতার উপাদান। প্রণয়-বিষয়ে তাহার একটি স্বাভাবিক অশিক্ষিত পটুত্ব আছে; যে কৌশলে সে আরতির প্রতি তাহার স্বামীর আকর্ষণের রহস্যভেদ করিয়াছে তাহাতে প্রমাণ করে যে, স্বামিবিষয়ক ঈর্ষ্যা তাহার বুদ্ধিকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

এই স্বর্ণলতা-চরিত্র ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য অংশ খুব উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আরতি ও সলিলের প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের মধ্যে কোন তীব্রতা বা গভীর উপলব্ধি নাই—একটা picnic বা বনভোজনের লঘু-তরল মনোবৃত্তিই ইহার মূল। আরতির চরিত্রে অসাধারণ দার্ঢ্য অনেকটা অপ্রত্যাশিত—সুখের দিনে এই গভীর সুরের কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই।

'পথের সাথী' উপন্যাসটির গঠন ও ঘটনা বিন্যাস নির্দোষ বলিয়া মনে হয় না। * রুবি ও মলয়ার পরস্পর সখিত্ব ও চরিত্র-পার্থক্যের বর্ণনা লইয়া ইহার আরম্ভ; সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয়, ইহাই ইহার কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু উপন্যাসটির অগ্রগতির সময় দেখা গেল যে, ইহার ভারকেন্দ্র হঠাৎ স্থানচ্যুত হইয়া বসন্তবাবুর পারিবারিক জটিলতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চরিত্র সৃজন ও জীবন-সমস্যার আলোচনার মধ্যে উপন্যাসটিতে গভীরতার একান্ত অভাব। উপন্যাসের দিক্ হইতে একা শশাঙ্ক ও শোভার সম্পর্কটাই কতকটা উচ্চ পর্যায়ে উঠিয়াছে, যদিও ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে হাস্য-পরিহাসের আধিক্য একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিন্দুবাসিনীর চরিত্রে দৃঢ়তা ও গৌরব শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের ম্লান পরাভবে পর্যবসিত হইয়াছে। রুবির চরিত্রও শেষ পর্যন্ত তাহার বিশেষত্ব ও ঝাঁজালো বিদ্রোহের সুর বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহার বাক্যের তীব্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বাধীনতা-ঘোষণার সহিত তাহার ব্যবহারের বিশেষ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে তাহার ঝাঁজ কমিয়া গিয়া সে অনেকটা শিষ্ট-শান্তভাবে সনাতন পথেরই অনুবর্তী হইয়াছে—তাহার Bohemianism কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। যে বাক্যে পর্যায়ক্রমে তিনজন স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইয়া জীবনে ত্রিবিধ রসাস্বাদনের কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে সে মাত্র দুইটি প্রেমিকের আকর্ষণেই তাহার চিত্তসাম্য হারাইয়াছে—সনাতন নীতির আদর্শেই তাহার নির্বাচনকে একনিষ্ঠ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বর্ষণ গর্জনের অনুরূপ হয় নাই। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র নিতান্ত মামুলি ও উপন্যাসের প্রয়োজনের দিক্ দিয়া তাহাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। মোট কথা, অনুরূপা দেবীর শেষ উপন্যাসগুলি তাঁহার শক্তির ক্রমিক হ্রাসেরই সাক্ষ্য দান করে।

(১০)

এইবার অনুরূপা দেবীর চারিখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। এই উপন্যাস-চতুষ্টয়ে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসটি 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'পথহারা'র সহিত তুলনায় একটু নিম্নশ্রেণীর। ইহার মধ্যে ভুবনবাবুর পরিবার-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ—সুশীল, ভুবনবাবু নিজে, সুলেখা, বিনতা প্রভৃতি—অনেকটা মামুলি ধরনের, তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব প্রোজ্জ্বল নহে। সুশীলের সহিত সুলেখার প্রথম পরিচয়-কাহিনী ও তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রণয় সঞ্চারের বিবৃতি অনেকটা melodramatic বা অতিনাটকীয়। ইহা আমাদের সহানুভূতিকে সেরূপ নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে না। সুশীলের প্রতি ভুবনবাবুর অযথা সন্দেহ ও সুলেখার প্রত্যাখ্যান অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে। উহা কেবল সুশীলের সমস্যাটিকে জটিলতর করিবার জন্য লেখিকার একটা চেষ্টাকৃত উপায়-অবলম্বন মাত্র। সুলেখার হঠাৎ ভীষ্মের মত কঠোর প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা আমাদের একটা অতর্কিত চমক উৎপাদন করে—তাহার সুশীতল করুণা-প্রবাহের মধ্যে যে একটা বজ্রকঠোর অনমনীয়তা লুকান ছিল, তাহার কোন পূর্বাভাস আমরা পাই নাই। ভুবনবাবুর পিতৃত্ব-গৌরব খুব উঁচুসুরে বাঁধা। কিন্তু কার্যত তিনি সন্তানদের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই ; সুতরাং পুত্র-কন্যার আদর্শচ্যুতিতে তাঁহার এতটা অবসন্ন হইবার কোন সংগত কারণ নাই। উপন্যাসটির প্রথমার্ধ বিশেষ উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে না।

কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে লেখিকা ইহার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। নীলিমার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার যে ছবিটি তিনি দিয়াছেন, তাহার মর্মস্পর্শিতা অতুলনীয় ; তাহার প্রত্যেক ছত্র যেন এই চির-নিপীড়িতার বক্ষঃশোণিতক্ষরণে সিক্ত হইয়াছে। তাহার সর্বাপেক্ষা অসহনীয় উৎপীড়ন আসিয়াছে তাহার নিজ পরিবারের মধ্য হইতে তাহার পিতার ব্যবহারে। সংসারে দারিদ্র্য-অপমান-পীড়িত হতভাগ্যদের জন্য যেখানে কোমল স্নেহ-নীড় রচিত থাকে, সেই শান্তিময় আশ্রয়ই তাহার অদৃষ্টক্রমে দুঃসহ কণ্টকশয্যায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে হিন্দু পরিবারে অনুকূল চক্রবর্তীর মত গৃহস্বামী খুব বেশি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কিন্তু এরূপ উদাহরণ যে একেবারে অপ্রাপ্য তাহাও জোর-গলায় বলা যায় না। বাস্তবিক অনুকূল চক্রবর্তীর চরিত্র উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। অনেক সময়ে ঔপন্যাসিকেরা মানুষকে পিশাচ করিতে গিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলেন। কিন্তু অনুকূল কার্যে বা ব্যবহারে পৈশাচিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বিশ্বাস্যতার সীমা একপদও অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

এ হেন পরিবারে লালিতা-পালিতা অথবা তর্জিতা-ভর্ৎসিতা নীলিমা যখন সুশীলের সাক্ষাৎ লাভ করিল, তখন সুশীলের সস্নেহ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আজীবন-অভ্যস্ত বৈপরীত্যের জন্য তাহার চক্ষে অপরূপ-মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল—সহজ-সরল আত্মীয়তা প্রণয়ের বেশে তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। সুশীলের প্রতি তাহার সহজ আকর্ষণ ও সেবার ইচ্ছা কিরূপে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল, তাহার চিত্রটি অতীব মনোজ্ঞ ও সুন্দর হইয়াছে। তারপর একমুহূর্তে তাহার পিতার কদর্য-ইতর ষড়যন্ত্র তাহার অম্লান তরুণ-হৃদয়ের প্রণয়-সুধাকে তীব্র হলাহলে পরিবর্তিত করিয়া দিল।

অভাগিনী অতি অল্পক্ষণের জন্য যে অসম্ভব সুখের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল পিতার লজ্জাজনক ব্যবহার ও সুশীলের বিরক্তি কুঞ্চিত মুখ সে আশাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। অনিচ্ছার বন্ধনে সে প্রেমের অপমান করিতে স্বীকৃত হইল না; সুশীলকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর তাহার মাতার মৃত্যু তাহার পিতৃগৃহের শেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে ও ঘৃণায়, আত্মধিক্কারে অভিভূত হইয়া সে তাহার চিরন্তন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। নীলিমার জীবনে খ্রীষ্টধর্মের অত্যাচার একটা বাহ্যশক্তির অভিভব। সুতরাং পিতৃকৃত লাঞ্ছনার মত ইহা এত মর্মভেদকারী নহে। বিশেষতঃ, আখ্যায়িকার এই অংশে কতকটা অতিরঞ্জন-প্রবণতা লক্ষিত হয়, কতকটা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় মিলে। লেখিকা অবশ্য আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই বিবরণ সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু যে সর্বজনীন সত্য আর্টের প্রাণ, কেবল লৌকিক সত্যের অনুবর্তন তাহা দিতে পারে না। খ্রীষ্টানদের হাতে নীলিমার দুর্দশা তাহার অনেকটা আত্মকৃত ব্যাধি, সুতরাং এ ব্যাপারে সে আমাদের সহানুভূতি পূর্বের ন্যায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। পরিশেষে যে দৃশ্যে সে সুশীলের সহিত অসম্পূর্ণ বিবাহ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তাহা ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া এতই উচ্চশ্রেণীর যে, ইহা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান উজ্জ্বলতার সহিত জাগরূক থাকে। নীলিমা-চরিত্রের পরিকল্পনা ও পরিণতি উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তির পরিচয় দেয়; উপন্যাসের যে কয়েকটি নর-নারী বিস্মৃতির কুহেলিকা অতিক্রম করিয়া আপনাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখে, নীলিমা তাহাদের মধ্যে অন্যতম—সমধর্মীদের ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা নাই।

সুশীলের চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। তাহার দুর্বল চরিত্র ও কৃত্রিম বিধি-নিষেধের গণ্ডির মধ্যে বর্ধিত, নিরীহ শিষ্টতাই তাহার স্বাতন্ত্র্যের হেতু হইয়াছে। সে সহজেই পরমুখাপেক্ষী ও পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শান্ত-শিষ্ট, বাল-চাপল্য-বর্জিত শৈশবের মূলে ছিল তাহার পিতার সস্নেহ অনুশাসন, নিজ স্বাধীন উপলব্ধি নহে। তাই সে শুভেন্দুর বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ দুঃসাহসিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ্‌জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সুলেখার সহিত তাহার বাগদত্ত সম্বন্ধ প্রকৃত প্রেম নহে, পিতার আজ্ঞানুবর্তিতা মাত্র। এই তরুণ-তরুণী ষ্টিমারেও বেড়াইতে গিয়াছে, পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের ভাষাও প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আসল প্রেমের তেজোগর্ভ বিদ্যুৎ-শিখাটি জ্বলিয়া উঠে নাই। সুতরাং যখন সে নীলিমার সংস্পর্শে, অভিভাবকের অনুমোদন পোষমানান নয় এইরূপ বন্য, দুর্দান্ত প্রেমের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছে, তখন সে ইহাকে চিনিতে না পারিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিয়াছে। নীলিমার ব্যাপারেই তাহার শিষ্ট-শান্ত ভাব যে হেয় কাপুরুষতারই নামান্তর মাত্র তাহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। লেখিকা নীলিমার ক্ষণোত্তেজিত বিরক্তির মুহূর্ত স্থায়ী অগ্নিশিখায় তাহার এই হীনতার চিত্রটির উপর অবিস্মরণীয় আলোকপাত করিয়াছেন। সুশীলের পরবর্তী ব্যবহারও ঠিক এই মেরুদণ্ড-হীন দুর্বলতার সহিত সংগতিবিশিষ্ট। চিরজীবন ধরিয়া অপরের উপগ্রহত্ব করাই তাহার বিধিনির্দিষ্ট ভাগ্য-লিপি। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া সুশীলের চরিত্রও খুব সুন্দর হইয়াছে।

জীবন-সমালোচনার গভীরতা ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রতার জন্য 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাস-জগতে উচ্চ স্থান দাবি করিতে পারে।

'মহানিশা' উপন্যাসটি (১৯১৯) দুইটি পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে আবর্তিত হইয়াছে। ইহার একদিকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর ও অন্যদিকে এক দারিদ্র্য-পীড়িত, ভাগ্যহত ব্রাহ্মণ বিধবার সুখ-দুঃখের কাহিনী একই সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। নির্মলই এই অবস্থা-বৈষম্যের দ্বারা অপসারিত, অথচ দৈবের দ্বারা একত্রীকৃত উভয় পরিবারের মধ্যে সংযোগ-সেতু রচনা করিয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে দুইটি সম্পর্কের জটিলতাই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ধীরার সহিত নির্মলের ও অপর্ণার সহিত বিহারীর সম্পর্ক। ধীরার সহিত নির্মলের সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম অনুভূতিময় সুর-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধীরার অন্ধত্ব, মাতৃহীনতা ও অবিরত পিতৃ-সাহচর্য তাহার চারিদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া সাংসারিক প্রণয়বিষয়ক জ্ঞান প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং বিবাহের পর নির্মলের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত সে বিষয়ে সে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাহার দাসীর নিজ-অভিজ্ঞতালব্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের দুই-একটি আখ্যায়িকা ও নারীসুলভ সহজ সংস্কার তাহাকে অতি অল্পদিনেই প্রেমের স্বরূপটি চিনাইয়া দিয়াছে। নির্মলের অত্যধিক আদর-যত্ন ও সেবা-পরিচর্যার নিখুঁত ব্যবস্থা যে ঠিক প্রেম নহে, ইহাদের মধ্যে যে প্রেমের নিবিড় একাত্মতা নাই, তাহা সে সহজেই অনুভব করিয়াছে। এই প্রণয়হীন সেবা-যত্ন তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকার জাগাইয়াছে। তারপর তাহার সংশয়োত্তেজিত তীক্ষ্ণ অনুভূতি নির্মলের অন্তরতম প্রদেশে প্রেরণ করিয়া সে নির্মলের ঔদাসীন্যের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে। ঠিক এই অবস্থায় তাহাদের পরস্পর মনোবৃত্তির একটা ঠিক বিপরীত পরিবর্তন হইয়াছে। নির্মলের সুপ্ত প্রেম এতদিনে জাগ্রত হইয়া ধীরার প্রতি তাহার স্নেহের মধ্যে সেই চিরপ্রতীক্ষিত উত্তাপ ও আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ধীরার আর সে তীব্র অভাব-বোধ, সে ব্যাকুল ঈপ্সা নাই। নির্মলের হৃদয় অন্যাসক্ত বুঝিয়া সে প্রেমের উদ্যত আলিঙ্গন হইতে সংকুচিতভাবে সরিয়া গিয়াছে—তাহার অকাল-রুদ্ধ প্রেমনির্ঝর হৃদয়ের সূর্যালোকহীন গহন কন্দরে মাথা লুকাইয়াছে। নির্মল যে অসুখী, এই বোধ তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে প্রেমের স্পর্শে অসাড় করিয়াছে। প্রেম তাহার অন্ধত্বের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া আলোকের যে একটি মাত্র সংকীর্ণ রন্ধ্র-পথ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্ধত্বের সেই অর্ধতরল আবরণ, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অশান্ত হৃদয়স্পন্দনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—তাহাকে মৃত্যুর সর্বগ্রাসী অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া ধীরা চরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিহারী ও অপর্ণার সম্বন্ধের মধ্যে একটা হাস্যজনক অসংগতি প্রায় tragedy-র অস্বাভাবিক তীব্রতার পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যতদিন বিহারী অপর্ণা ও তাহার মাতার বিশ্বস্ত কর্মচারী ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবক মাত্র ছিল, ততদিন তাহাদের সম্পর্ক বেশ সরল-সহজ রেখা ধরিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যেদিন মৃত্যুশয্যায় সৌদামিনী বিহারীকে কন্যার স্বামিত্বের অধিকার দিয়া গেলেন, সেই দিনই উহাদের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর, নিঃশ্বাসরোধকারী জটিলতার উদ্ভব হইল।

ইহাদের জীবনস্রোতের মধ্যে ক্রমশঃ একটা প্রতিরোধকারী বালুচর গড়িয়া উঠিল। অপর্ণার রুক্ষ, তীব্র মেজাজ, তাহার অবিশ্রান্ত খোঁচা অহর্নিশ বিহারীকে বিঁধিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহাদের সেই পূর্বের সহৃদয় হাস্য-পরিহাসের মধ্যে একটা ভয়ংকর নীরবতা পাষাণভারের মত চাপিয়া বসিল। ভাগ্যক্রমে নির্মল আসিয়া পড়িয়া এই অস্বাভাবিক অবস্থাসংকটের অবসান করিয়া দিল। নির্মলের সহিত বিবাহে অপর্ণার অসম্ভব-প্রায় কৈশোর-স্বপ্ন সফলতা লাভ করিল বটে, কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব-জীবনের তিক্ত, বিস্বাদ অভিজ্ঞতার পরে তাহার কতটুকু যৌবন-সরসতা, কতটুকু সহজ হৃদয়মাধুর্য অবশিষ্ট ছিল। আমাদের ভয় হয় যে, যে হৃদয় সে নির্মলকে উপহার দিয়াছে তাহা তাহার ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার আঁচে ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। কিশোরীর মুগ্ধ, সলজ্জ প্রেম, নিদারুণ অভিজ্ঞতার কঠোর পেষণে, অনাবৃত আলোচনার রূঢ় আন্দোলনে, তাহার কোমল, মধুর সৌরভটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, অপর্ণা মোটেই রোমান্সের নায়িকার মত নহে। তাহার তীক্ষ্ণ, ঝাঁজালো ব্যক্তিত্ব, তাহার তীব্র আত্মসম্মান-বোধ তাহার বৈশিষ্ট্যের হেতু। রাধিকাপ্রসন্নের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালির সে সমান ওজনে প্রত্যুত্তর দিয়াছে, অপমানকে কোথাও সে দীনভাবে স্বীকার করে নাই। এক বিহারীর প্রতি সে কতকটা উপদ্রব-অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু এই ব্যবহারের ব্যাখ্যা তাহাদের সম্পর্কের জটিলতার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাহার সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার ঝাঁজালো ব্যক্তিত্বই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাধিকাপ্রসন্নের বাহ্য কর্কশতা ও অন্তরের যত্ন-প্রতিরুদ্ধ স্নেহশীলতার চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। বিহারীর ভর্ৎসনা-অপমানে অবিচলিত কর্তব্যপরায়ণতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—অপর্ণাকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনায় যে নিদারুণ বিপন্ন ভাব ও বিমূঢ়তা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাই তাহার চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রাধিকাপ্রসন্নের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারীর পারিবারিক চিত্রটিও ইহার ব্যঙ্গকুশলতায় Jane Austen-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইরাবতীবক্ষে নৌকাযাত্রা লেখিকার বর্ণনা-শক্তি ও ধীরার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের স্তর-বিন্যাস তাঁহার বিশ্লেষণ-চাতুর্যের পরিচয় দেয়। উপন্যাস-সাহিত্যে 'মহানিশা'র উচ্চস্থান অবিসংবাদিত।

(১১)

'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫) এক দিক্ দিয়া লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 'মহানিশা' ও 'গরীবের মেয়ে'র ভাবগভীরতা ইহার নাই, কিন্তু ইহার আর কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ এই অভাবের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। অনুরূপা দেবীর মন্তব্য ও বিশ্লেষণে আতিশয্যপ্রিয়তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু 'মন্ত্রশক্তি'তে এই আতিশয্যের একান্ত অভাব। মন্তব্যের সংযম ও পরিমিতি কোথাও ঘটনার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করে না—উপন্যাসের গতিবেগ সর্বত্র সরল, স্বচ্ছন্দ ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। আরও একটি বিশেষত্ব ইহার উৎকর্ষের হেতু হইয়াছে।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস আমাদের অস্থিমজ্জাগত ; ইহা বায়ুমণ্ডলের মত অদৃশ্য, অথচ

সর্বব্যাপীরূপে আমাদের বাস্তব প্রাত্যহিক জীবনকে ঘিরিয়া আছে। এই ধর্মবিশ্বাসই আমাদের জীবনে রোমান্সের সঞ্চরণের রন্ধ্রপথ হইয়াছে—ইউরোপের মত কোন বহির্মুখী দুঃসাহসিকতার অবসর আমাদের বিশেষ নাই। বর্তমান উপন্যাসে লেখিকা জীবনের উপর বেদমন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বাস্তবজীবনের সহিত রোমান্সের এক অভিনব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহাই 'মন্ত্রশক্তি'তে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।

এই উপন্যাসে ঘটনাবিষয়ক কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। যেমন মধ্যযুগের সামন্ত-রাজগণের পরিবারে কতকগুলি বিশেষ প্রথার প্রচলন ছিল, সেইরূপ এই জমিদার-পরিবারের মধ্যেও এমন কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা ছিল যাহা তাহাদের সাধারণ জীবনযাত্রাপথে অনেক জটিলতার প্রবর্তন করিয়াছে। প্রথম—পুরোহিত নিয়োগ-বিষয়ক ব্যবস্থা, যাহার ফলে জমিদারের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অম্বরনাথের মন্দির-প্রবেশ ও বাণীর সহিত তাহার সংঘর্ষ। দ্বিতীয়—বিবাহ-সম্বন্ধীয় অনুশাসন, যাহা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বাণী সেই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত অম্বরনাথকে পতিত্বে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।' এই বিশেষত্বগুলিই উপন্যাসের আখ্যায়িকাতে কতকটা অসাধারণত্বের সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া এক বাণীই পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার কঠোর, ক্ষমাহীন দেব-নিষ্ঠা অম্বরনাথের প্রতি তাহার নিষ্ঠুর অবজ্ঞা, পিতামাতার প্রতি তাহার অভিমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ—খুব স্বাভাবিক অথচ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহ-কালে অম্বরের ধীর সংযত ব্যবহার ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানবোধ তাহার বদ্ধমূল অবজ্ঞাকে ঈষৎ বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত গুণও সে অম্বরের অবস্থা-দৈন্যের স্বাভাবিক সংকোচ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। তারপর অম্বরের দীর্ঘ প্রবাস ও একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনবৎ ব্যবহার তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, নিজ অনিবার্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আর সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই সময় তাহার মাতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাহার মনের গভীর-শোকাচ্ছন্ন, নিঃসঙ্গ অন্ধকারে প্রধূমিত শ্রদ্ধা প্রেমের দীপ্তশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমশঃ প্রোজ্জ্বল অনুরাগশিখায় মন্ত্রশক্তি ঘৃতাহুতি দিয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান অনুরাগের সহিত জ্বালাময় অনুতাপ যোগ দিয়া তাহার সর্ব দেহমনকে কিরূপে অগ্নিময় বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়াছে, কিরূপে তাহার অভিমান ও অহংকারকে গলাইয়া তাহাকে দীনহীনা কাঙ্গালিনীতে পরিণত করিয়াছে, তাহার বর্ণনায় তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও কাব্যের মনোজ্ঞতা সম্মিলিত হইয়াছে। বাণীর চরিত্রের বিশেষত্ব, তাহার গভীর ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতা স্মরণ করিলে মন্ত্রশক্তির প্রভাব তাহার মনোভাব-পরিবর্তনের পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়; কেননা, কেবলমাত্র অম্বরনাথের চরিত্রগৌরব তাহার অনম্য দৃঢ়তাকে গলাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই উদাত্ত, যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিবিজড়িত মহামন্ত্র অনুক্ষণ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে তীব্র অনুশোচনাপূর্ণ করিয়া তুলিল ও তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া তাহাকে স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটাইল। এই মন্ত্রশক্তির উপর অবিচলিত বিশ্বাসে সে মৃতকল্প স্বামীর দেহ লইয়া বসিয়াছে এবং তাহার একাগ্র সাধনা যে পতিকে পুনর্জীবন-দানে কৃতকার্য হইয়াছে, উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শেষ পরিচ্ছেদটির জ্বলন্ত আবেগময় ভাষা বাণীর বাহ্যজ্ঞানরহিত ধ্যানাবিষ্ট একাগ্রতার সহিত সুন্দর সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। এই পরম তন্ময়তার মুহূর্তে সে সাধারণ রমণীর সমতলভূমি হইতে এক অতিমানব আদর্শলোকে উন্নীত হইয়া পৌরাণিক সতীদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ অল্প কথায়, অথচ খুব জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত আখ্যানটির পরিকল্পনায় তাহারা খুব স্বাভাবিকভাবেই আপন স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রমাবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়া—বাণীর পিতামাতা, উভয়েই কন্যাগতপ্রাণ এবং এই অপত্যস্নেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা; কিন্তু তথাপি এই সাম্যের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের মনোভাবের পার্থক্য খুব সূক্ষ্মভাবে সূচিত হইয়াছে। পুরোহিত আশুনাথের দৃপ্ত, অভ্রভেদী অহংকার ও পাণ্ডিত্যাভিমান, অম্বরের প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ তাহাকে বাণীর পুরুষ-সহযোগীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উপন্যাসের আর একটি খণ্ডচিত্র আশ্চর্য কলাকৌশলের সহিত বৃহত্তর চিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মৃগাঙ্ক ও অজার বিচ্ছেদমিলনের চিত্রটির ক্ষীণতর গতিবেগ ও ম্লানতর বর্ণবিন্যাস বৈপরীত্যমূলক তুলনার দ্বারা বাণী-অম্বরের গভীরতর, প্রবলতর সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মৃগাঙ্কের পত্নীর প্রতি ঔদাসীন্য একটা নিষ্কারণ খেয়াল মাত্র, এবং এই খেয়ালের অবসান ঘটিল অপেক্ষাকৃত সামান্য কারণে, অজার নীরব সহিষ্ণুতা ও সেবা-কুশলতায়। বাণীর স্বামিবিদ্বেষ তাহার জীবনব্যাপী আদর্শ ও সাধনার অনিবার্য ফল, এই মনোভাবের গতিবেগ অতি তীব্র, ইহার স্থায়িত্বও অতি দীর্ঘ; এবং ইহার পরিবর্তন ঘটিল সুদীর্ঘ অনুশোচনায়, মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন রহস্যান্ধকারের মধ্যে দৈবশক্তির চিরদীপ্ত অনির্বাণ আলোকে। মৃগাঙ্ক-অজার ক্ষুদ্র চিত্র মাপকাঠির ন্যায় বাণী-অম্বরের কাহিনীর সুদূর-প্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করে।

উপন্যাসের অন্যান্য মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজিউকে একটি চরিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক সকলের অপেক্ষা ইনিই অধিক ক্রিয়াশীল, উপন্যাসোক্ত ঘটনার ঠিক কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত। দেব-মন্দিরের ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন-সম্ভার—ইহারই বর্ণনা উপন্যাসের অধিকাংশ স্থল অধিকার করিয়া আছে। দেব-বিগ্রহই বাণীর প্রথম প্রীতিভাজন—তাহার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-অর্ঘ্য ইনি প্রথম হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারই প্রসাদ-লাভে অসমর্থ বলিয়া বেচারা অম্বর বাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসের সমস্ত জটিল সূত্র ইঁহার করতলধৃত—যেমন সূর্যমণ্ডল হইতে কিরণরাশি ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই ইঁহারই মন্দিরতল হইতে উপন্যাসের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতমূলক শক্তি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক উপন্যাসে দেব-চরিত্রের এই প্রাধান্য হিন্দু ধর্মজীবনে মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আমাদের ধর্মজীবনের এই বিশেষত্ব—বাস্তব জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার অনন্যসাধারণ গৌরব ও কৃতিত্ব।

'পথ-হারা' উপন্যাসটি ভিন্ন দিকে লেখিকার উপন্যাসসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা বঙ্গদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত বিপ্লববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ রাজ-নৈতিক বা সমাজনৈতিক আন্দোলনমূলক উপন্যাস আর্টের দিক্ দিয়া খুব উৎকর্ষ লাভ করে না;

কেননা, ইহার চরিত্রসমূহের ব্যক্তিত্ব সমগ্র আন্দোলনটির বিশালতার ছায়ায় জীবনীশক্তিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। লেখকের প্রধান লক্ষ্য থাকে ব্যাপক আন্দোলনটিকে ফুটাইয়া তোলাতে, আন্দোলনের সহানুভূতিমূলক বা অসমর্থনসূচক বিশ্লেষণে, ইহার পিছনে যে বিপুল ভাবাবেগ বা যুক্তিযুক্ত বিচারসহ জাতীয় দাবি থাকে তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায়। কাজে কাজেই লেখক প্রতিবেশ-রচনায় এতই নিবিষ্টচিত্ত থাকেন যে, মনুষ্য-চরিত্রগুলি নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান হইয়া পড়ে—তাহাদের ভাব ও ভাষা রাজনৈতিক চিন্তাধারারই প্রতিধ্বনি মাত্র হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়'-এর পাত্রপাত্রীদের বিরুদ্ধে এই সুরের সমালোচনা কম-বেশি প্রযোজ্য। 'চার অধ্যায়'-এর অন্ত বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের নিষ্ফল, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক মাত্র—তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে এই নির্মম আন্দোলনের রথচক্রে পিষ্ট ও দলিত হইয়াছে ইহাই তাহার চিরন্তন অভিযোগ। দল বা জাতির সম্মিলিত দাবি ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ, অথচ বিচিত্র-লীলায়িত সুরকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হয়—ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হইয়া দশের ভিড়ের মধ্যে নিজ স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনমূলক উপন্যাসের এই একটা প্রধান বিপদ্, এবং আন্দোলনটি যত আধুনিক হইবে, বিপদের মাত্রা ততই বাড়িবে।

অনুরূপা দেবী তাঁহার 'পথ হারা' উপন্যাসে এই বিপদ্ সম্পূর্ণরূপেই কাটাইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রগুলির স্বাধীন স্ফুরণ তিনি কোন বিরুদ্ধশক্তির দ্বারা ব্যাহত হইতে দেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লববাদের কোন সাধারণ চিত্র দেওয়া হয় নাই, কেবলমাত্র কয়েকটি তরুণ-জীবন ক্রীড়াচ্ছলে কেমন করিয়া ইহার সাংঘাতিক জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বিমলেন্দু, অসমঞ্জ, উৎপলা—ইহাদেরই ভাগ্য-বিবর্তনে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—বিপ্লববাদের প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কোনই কৌতূহল নাই। ছেলেরা খেলা করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে পড়িলে তাহাদের মুখে-চোখে যেরূপ কাতর ভাব ফুটিয়া উঠে, যেরূপ করুণ, নিষ্ফল প্রচেষ্টার সহিত তাহারা হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহাদের কিশোরকণ্ঠে যেরূপ ব্যাকুল অসহায় কান্নার স্বর ফুকারিয়া উঠে, হঠাৎ এই বিপ্লববাদরূপে রাক্ষসের কুক্ষিগত হইয়া উপন্যাসের এই কয়েকটি দুরন্ত ছেলের বাস্তবের সহিত অপরিচিত তরুণ জীবনে তেমনই একটা মর্মস্পর্শী বিলাপের কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যখন হাস্যকর গাম্ভীর্যের সহিত বিপ্লববাদের অভিনয় করিতে বসিয়াছে, রক্তলিপিতে প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছে, আজীবন শপথ পালন ও শপথ-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে বড় বড় কথা বলিয়াছে, তখন বিধাতা পুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হাসিয়াছেন। মৌখিক প্রতিজ্ঞা ও তাহার অক্ষরে অক্ষরে পালন—এই দুই-এর মধ্যে যে মারাত্মক ব্যবধান তাহা কি এই ভ্রান্ত, অন্ধ তরুণের দল উপলব্ধি করিয়াছিল? যে খড়্গ তাহারা অপরকে বলি দিবার জন্য শান দিতেছিল তাহাতে তাহাদের প্রিয়তম সহকর্মীই প্রথম উৎসর্গীকৃত হইবে, যে জাল পরের জন্য বিস্তার করিতেছিল তাহাতে তাহাদের নিজেরই গলায় ফাঁস পড়িতে পারে—এই ভয়াবহ চিত্র নিশ্চয়ই তাহাদের কল্পনানেত্রে যথেষ্ট উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই যখন সেই সম্ভাবিত বিপদ্ সত্য সত্যই ঘটিয়া গেল, যখন উৎপলা দলপতি হিসাবে নিজ প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করিয়া বসিল, যখন বিমলেন্দু তাহার অন্তরতম বন্ধুর বিরুদ্ধে সেই নৃশংস আদেশ কার্যে পরিণত করার ভার প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা যে স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাদের

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাহাদের যত্নরচিত কৃত্রিম ব্যবস্থাকে ভাগীরথী-প্রবাহে ঐরাবতের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই প্রচণ্ড প্লাবনের আঘাতে উৎপলা তাহার পৌরুষের ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তাহার চিরসুপ্ত, অন্তর্নিরুদ্ধ নারীপ্রকৃতির পরিচয় পাইয়া গেল—তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ বৈপ্লবিকতার প্রস্তরতট ভেদ করিয়া ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যুগ্মস্রোত ভোগবতী-ধারার ন্যায় নির্ঝরবেগে প্রবাহিত হইল। উৎপলার এই অতর্কিত পরিবর্তন ও তাহার মর্মভেদী যন্ত্রণার চিত্র মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও তীব্র ভাবাবেগ-বর্ণনার দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিক আর্টের খুব উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছেন। বিমলেন্দুর আবিষ্কার ততোধিক চমকপ্রদ ও তাহার পক্ষে সত্যসত্যই সাংঘাতিক হইয়াছে। অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌কে বলি দিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, সে ইতিমধ্যে তাহার উপর আরও একটা প্রবলতর দাবির সৃষ্টি করিয়াছে, সে কেবলমাত্র বন্ধু নহে, তাহার সংসারের একমাত্র স্নেহপাত্রী ভগিনী তারার স্বামী, তখন তাহার প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া রাখা স্থিরসংকল্প ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উদ্যত রক্তলোলুপ অস্ত্র তখন আর বলি না লইয়া ফিরিবে না সুতরাং হতভাগ্য বিমলেন্দু আত্মপ্রাণ বলি দিয়াই নিজ জীবনব্যাপী ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

বিমলেন্দুর পূর্বজীবন বিপ্লববাদের এই ঘূর্ণাবর্তের দিকে তাহার প্রবণতাকে খুব স্বাভাবিক করিয়াছে। অবশ্য তাহার বিপ্লববাদের সহিত জড়িত হইয়া পড়া অনেকটা আকস্মিক ঘটনার ফল কিন্তু তাহার সমস্ত প্রকৃতিটি এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, চুম্বক যেমন লৌহখণ্ডকে টানে, এই বিপদ্‌সংকুল দুঃসাহসিকতার আহ্বান তাহাকে তেমনি অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়া লইল। অমৃত সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও স্বার্থপরবশতা হেতু, বিমলেন্দুকে সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতের মুঠায় রাখিবার জন্য তাহার এই দুর্নিবার পতন-বেগকে বিন্দুমাত্র বাধা দেয় নাই। যে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্যের সহিত সে অমৃতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহাই তাহার পতন-বেগকে বাড়াইয়া তাহাকে একেবারে বৈপ্লবিকতার ঘূর্ণাবর্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার আত্মঘাতী মত্ততার যেটুকু বাকী ছিল, তাহা প্রণয়ের মোহাবেশ সম্পূর্ণ করিয়াছে—উৎপলার অঙ্গুলি-সঞ্চালন তাহাকে ইন্দ্রজালের সম্মোহন শক্তিতে অভিভূত করিয়া বৈপ্লবিকতার চোরাবালিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে। এইরূপে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়তির অদৃশ্যশক্তি-চালিত হইয়াই যেন তাহার সর্বনাশ-সাধনের কার্যে সহযোগিতা করিয়াছে।

উপন্যাসটির সমস্ত চরিত্র অতি সুনিপুণ হস্তে চিত্রিত হইয়াছে। অসমঞ্জের নীতি-পরিবর্তনের কারণ দেওয়া হইয়াছে রামদয়ালের প্রভাব—কিন্তু তাহার বিপ্লববাদ-পরিহারের প্রধান কৃতিত্ব রামদয়ালের তর্ককুশলতা অথবা তারার মোহকর সৌন্দর্যের প্রাপ্য তাহা সন্দেহের বিষয়। যাহাই হউক এই মত-পরিবর্তনের ব্যাপার লইয়া লুকোচুরি খেলা অসমঞ্জ চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা ও দলপতি-হিসাবে ইহা তাহার অনপনেয় কলঙ্ক। এতগুলি তরুণ জীবনকে মরণের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশ্য ঘোষণা না করিয়া গোপনে সরিয়া পড়া—এই নিতান্ত হেয়, কাপুরুষোচিত ব্যবহার বিমলেন্দুর মনে যে তিক্ত, ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের ঝলক জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অসমঞ্জের সকলের চেয়ে ভয় ছিল উৎপলার তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপাত্মক, অবজ্ঞাসূচক উচ্চহাস্য এবং প্রধানতঃ ইহা এড়াইবার জন্যই তাহার গোপনতা-আশ্রয়। যুক্তিতর্কে সহচরদিগকে ফেরান অসম্ভব বলিয়াই হয়ত সে ভাবিয়া-

ছিল যে, দলপতির পৃষ্ঠভঙ্গে দল যদি আপনি ভাঙিয়া পড়ে পড়ুক। নিছক আত্মপ্রাণরক্ষা ও সুখ-লালসা তাহার উদ্দেশ্য ভাবিলে তাহার চরিত্রকে অত্যন্ত নীচ করিয়া দেওয়া হয়।

রামদয়াল ও ইন্দ্রাণীর চরিত্র আদর্শবাদমূলক হইলেও কোনরূপ অবাস্তবতাগ্রস্ত হয় নাই। ইন্দ্রাণীর প্রশান্ত কর্তব্যনিষ্ঠা, যাহার জন্য সে নিজ দাম্পত্য জীবনকেও পূর্ণবিকশিত হইবার অবসর দেয় নাই, তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। অমৃতের চরিত্রটিও তাহার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার চরিত্রে একটা অদম্য দৃঢ়সংকল্প বা একগুঁয়েমির ধারা ছিল যাহা তাহাকে বিমলেন্দুর অভিভাবকত্বের যোগ্যতা দিয়াছিল। হিংস্র-প্রকৃতিকে কিরূপে বশে রাখিতে হয় সে রহস্য অমৃতের ভালই জানা ছিল, এবং হিংস্র-জন্তুর পালক যেমন শেষ পর্যন্ত তাহার পালিত পশুর হাতেই প্রাণ দেয়, অমৃতেরও শেষ পরিণাম ঠিক তদ্রূপই হইয়াছিল।

মঙ্গলার চরিত্র-সৃষ্টি বিশেষভাবে নারী-হস্তের রচনার সাক্ষ্য প্রদান করে। উপন্যাস-সাহিত্যে মুখরা, কলহবিদ্যায় বিশেষ নিপুণা বৃদ্ধার চিত্র মোটেই অপরিচিত নহে—ইহা আমাদের হাস্যরস উদ্রেক করিবার একটা খুব সুলভ, চিরপ্রথাগত উপায়। কিন্তু মঙ্গলার চরিত্রে কতকটা বিশেষত্ব আছে—সে ঠিক সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধি নহে। প্রথমতঃ, উপন্যাসের মধ্যে সে অন্যতম প্রধান চরিত্র বিমলেন্দুর ভবিষ্যৎ পরিণামের জন্য এক দৈবের পরেই সে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী। তাহারই অনুচিত প্রশ্রয়ে, তাহারই বিদ্বেষ-উদ্‌গিরণের জন্য বিমলের শিক্ষা-দীক্ষা প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্র যেমন কেবল হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়া থাকে, মঙ্গলার কর্তব্য তদপেক্ষা গুরুতর। দ্বিতীয়তঃ, বিমলের প্রতি তাহার একটা প্রকৃত, হউক না তাহা স্বার্থবুদ্ধিজড়িত ভালবাসা ছিল। ইন্দ্রাণীর বিষয়ের কর্তৃত্ব ও বিমলের অভিভাবকত্ব গ্রহণে সে যেরূপ বাধা দিয়াছে তাহাতে তাহার দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কি তাহার জামাতাও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিমলের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। পুরাণ-বর্ণিত রাক্ষস যেরূপ অতন্দ্র সতর্কতার সহিত স্বর্গোদ্যানের ফল জোগাইত, সে বিমলের উপর তাহার একাধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সেইরূপ সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহার এই ঈর্ষ্যাপরবশ অতি-সতর্কতাই তাহার অধিকারস্খলনের হেতু হইয়াছে। অমৃতকে সেই আমদানি করিয়া খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিমল তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে এমন কি তাহার খাওয়া-পরারও একটা ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়াছে। মঙ্গলার যতই দোষ থাকুক, তাহার অন্তিম দৃশ্য তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

উপন্যাস-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস সাহিত্যে চিরস্মরণীয়তা লাভের উপযুক্ত। তাঁহার রচনার মধ্যে নারী-হস্তের স্পর্শ নির্ভুলভাবে নির্দেশ করা কঠিন—সাধারণতঃ তাঁহার মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য পরুষ আলোচনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাপি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য রচয়িত্রীর নারীসুলভ কমনীয়তার নিদর্শন। 'মা' উপন্যাসে ব্রজরাণীর নিদারুণ অভিমান ও ঈর্ষ্যা; 'গরীবের মেয়ে'তে নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের প্রেম-বুভুক্ষা, 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর নিগূঢ় মর্মোদ্ঘাটন, 'পথ-হারা'তে

উৎপলার অতর্কিত নারীত্ব-বিকাশ—এই সমস্ত দৃশ্যকে নারীর স্বজাতিসম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহজ ও সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ দাখিল করা যাইতে পারে।

নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে অন্যান্য মহিলা ঔপন্যাসিকও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের রচনার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব; বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন নূতনত্ব বা মৌলিকতা নাই, যাহা বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণযোগ্য। এই সমস্ত লেখিকার মধ্যে ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি' দাম্পত্য মনোমালিন্যের পুরাতন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনি মোটের উপর নিরুপমা-অনুরূপারই ধারার অনুবর্তন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখিকার মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শৈলবালা ঘোষজায়া অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে নূতন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর ইঁহারা সকলেই কম-বেশি পুরাতন আদর্শ ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না ও এই আদর্শ সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন। এই পর্যন্ত উপন্যাস-ক্ষেত্রে স্ত্রী-জাতির অবদান, বিশেষত্বের দিক্ দিয়া, আশানুরূপ পর্যাপ্ত হয় নাই। পুরাতন জীবনযাত্রায় নারীর স্থান ও সমস্যা ইঁহাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সমস্যার আলোচনা অনেকটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও ভাব-গভীরতা সঞ্চারিত হয় নাই। ইহা হয়ত বিষয়-বস্তুর দৈন্য ও সংকীর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু বঙ্গ-উপন্যাসে Jane Austen ও George Eliot-এর আবির্ভাব এখনও প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

(১২)

সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসাবলীর সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। মহিলা-রচিত উপন্যাস-সাহিত্যের একটি নূতন স্তর ইঁহাদিগের মধ্যে সূচিত হইয়াছে। ইঁহাদের বিষয়-বস্তু, ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্তব্য এতই অভিন্ন যে, ইঁহাদের পরস্পরের সহিত তুলনায় বিশেষত্ব নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। ইঁহারা যেন সাহিত্যাকাশের যুগ্ম-তারা, যাহাদের রশ্মির পার্থক্য অনুভবগম্য নহে।

সীতা দেবীর রচনার মধ্যে অনেকগুলি ছোটগল্পের সমষ্টি ও কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আছে। 'বজ্রমণি', 'ছায়াবীথি' ও 'আলোর আড়াল'—এইগুলি ছোটগল্প; 'পথিক-বন্ধু' (১৩২৭), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮), 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭), 'বন্যা' এই কয়টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ছোটগল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই সামাজিক বৈষম্য ও অসংগতিমূলক—আলোচনা বিশেষত্ব-বর্জিত। কতকগুলির বিষয় রোমান্টিক ও ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আলোর আড়াল' ও 'ভ্রষ্টতারা' নামক দুইটি গল্প এই সমষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লিখিত গল্পে অন্ধ স্বামীর সহিত বিবাহিত অতি কুৎসিত-দর্শনা স্ত্রীর খেদোচ্ছ্বাসের মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ভাষা-গৌরব আছে।

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে 'পরভৃতিকা' উৎকর্ষের দিক্ দিয়া সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করে। ইহার গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে। মেয়ে স্কুল ও বোর্ডিং-এর

স্নেহহীন আবেষ্টনের রুক্ষ-কঠোর প্রতিবেশ কৃষ্ণার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্যটিকে আরও বিকশিত করিয়াছে। তাহার সহপাঠিনীগণ ও যে পরিবারে সে শিক্ষয়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিয়াছে সেই পরিবারের সহিত তাহার বিচিত্র সম্পর্কের বিষয় সুচিত্রিত হইয়াছে, তবে এই বর্ণনাতে চরিত্রোন্মেষ অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্যের উপরই অধিক ঝোঁক পড়িয়াছে। তাহার বর্মাপ্রবাসের বিবরণের আকর্ষণ উপন্যাস হিসাবে নয়, ভ্রমণকাহিনী হিসাবে। সুধীরের সহিত কৃষ্ণার পরিচয় ও ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রণয়োন্মেষ-বর্ণনার মধ্যে অপটু হস্তের নিদর্শন মিলে। তারপর উহাদের জন্মরহস্যভেদের ফলে উহাদের আপেক্ষিক অবস্থার পরিবর্তন,—সুধীরের অভিমানদৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুরণ ও কৃষ্ণার অতর্কিত সৌভাগ্যে বিস্ময়বিমূঢ় ভাবের চিত্র—আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। বিশেষতঃ যে দৃশ্যে সুধীর মাতার নিকট কৃষ্ণার প্রতি নিজ অনুরাগের রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে একটা অশোভন ব্যস্ততা ও অভব্যতা প্রকটিত হইয়াছে, মোট কথা, চরিত্রসৃষ্টি ও উপন্যাসোচিত ঘাত-প্রতিঘাতের দিক্ দিয়া উপন্যাসটির স্থান তাদৃশ উচ্চ নহে।

'পথিক-বন্ধু' উপন্যাসটি রচনা-কালের দিক্ দিয়া অগ্রবর্তী হইলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়া 'পরভৃতিকা' অপেক্ষা প্রশংসনীয়। 'পরভৃতিকা'তে ঘটনাবৈচিত্র্যের আধিক্য উপন্যাসোচিত রস-বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'পথিক-বন্ধু'তেও ভ্রমণকাহিনীর উপভোগ্য রসের অভাব নাই, কিন্তু এই ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির ভাবপরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। ঠাকুরপাড়ার ঘনশ্যাম, বর্ষাস্নিগ্ধ, বন্য প্রকৃতি, সাঁওতাল পরগণার ঊষর প্রতিবেশের মধ্যে শিমূলফুলের দীপ্ত রক্তরাগ ও বসন্তের বর্ণসমারোহ, পুরীর সমুদ্রতরঙ্গের অশান্ত, চিরমুখর রোদনোচ্ছ্বাস ও সৃষ্টিলোপকারী মহাঝটিকা—এ সমস্তই কেবল যে উচ্চাঙ্গের বর্ণনাশক্তির পরিচয় তাহা নহে, দেবপ্রিয় ও অনিন্দিতার সম্পর্কটি মাধুর্যরসে ও ব্যাকুল হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার সহায়-স্বরূপ ইহাদের একটা বিশেষ মনস্তত্ত্বমূলক প্রয়োজনীতা আছে।

উপন্যাসটির আখ্যান-বস্তুর মধ্যেও কতকটা নূতনত্ব আছে। দেবপ্রিয় তাহার শিক্ষা-সমাপ্তির পর দেশের বালক-বালিকার মধ্যে আনন্দপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—বায়োস্কোপের ছবি, গ্রামোফোনের গান, নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক দেখাইয়া শীর্ণদেহ, শুষ্কমন শিশুদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলাই তাহার জীবনের কাজ। এই প্রচারকার্যের মধ্যে সে প্রণয়ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাতা ও বিষাদমগ্না অনিন্দিতার সহিত পরিচিত হইয়াছে। ঠাকুরপাড়ার স্নিগ্ধ-শ্যাম প্রকৃতির প্রতিবেশের মধ্যে তাহাদের প্রথম পরিচয়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাহাদের প্রথম আলাপ সৌজন্য, সরস, অথচ নির্দোষ আনন্দ-বিনিময় ও শিষ্ট, বিনীত প্রশংসাবাদের জন্য উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু অনিন্দিতার সদ্যতিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার চিত্ত-প্রবাহের মুখে পাষাণভারের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে—সে তাহার মনের রশ্মিকে টানিয়া ধরিয়া সবলে তাহার মুখ ফিরাইয়াছে। তাহাদের দ্বিতীয় আলাপে অপরিচয়ের বাধা-সংকোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে—অনিন্দিতা দেবপ্রিয়কে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্বকে যে সে কোন ক্রমেই প্রণয়ের পর্যায়ে উন্নীত হইতে দিবে না তাহাও স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছে। অনিন্দিতার সমস্ত ব্যবহারের উপর একটা ম্লান বিষাদ ও শোকস্তব্ধ গাম্ভীর্যের ছায়াপাত সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। তাহার প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম প্রণয়ীর

সহিত অতর্কিত সাক্ষাতে তাহার হৃদয়ে যে জ্বালাময় নৈরাশ্যের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সে দেবপ্রিয়ের প্রথম প্রণয়নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের পরেই তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মানদণ্ড আবার সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে—প্রেম তাহার স্বাভাবিক ক্ষুধা ও ব্যাকুলতা লইয়া তাহার হৃদয়ে নবজাগ্রত হইয়াছে ও সে অনুতপ্তহৃদয়ে দেবপ্রিয়ের সন্ধান করিতে চলিয়াছে। কলিকাতায় তাহার অশান্ত মন পারিবারিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে একটা বিক্ষোভ জাগাইয়া, আঘাত করিয়া ও কঠোরতর প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, অতিরিক্ত অভিমানপ্রবণতা ও অশ্রুপাতের দ্বারা আপন দুঃসহ বেদনাকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছে। ঠাকুরপাড়াতে দেবপ্রিয়ের মাতার তিরস্কার-বাক্যে সে দেবপ্রিয়ের যে কতটা ক্ষতি করিয়াছে তাহা সে অনুভব করিয়াছে। এই অনুভব তাহার অনুতাপ ও হৃদয়াবেগের মাত্রা অসংবরণীয়-রূপে বাড়াইয়াছে। শেষে সে তীর্থযাত্রার অছিলায় নিজ প্রণয়াস্পদের মানস অভিসারে বাহির হইয়াছে। এই নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হইয়াছে পুরীতে সমুদ্রতীরে—সেখানে তাহার অভিসার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, সে তাহার প্রণয়াস্পদের সাক্ষাৎলাভ করিয়া ও তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া প্রেমের প্রতি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদে তাহাদের বিবাহিত জীবনের চিত্র কিন্তু অনিন্দিতার ধ্যানাবিষ্ট, আত্মসমাহিত প্রণয়াভিসারের উপযুক্ত হয় নাই—আনন্দ-পরিবেশনে স্বামীর সহযোগিতায় প্রণয়ের নিজস্ব আনন্দ-নিবিড়তা ফিকে হইয়া গিয়াছে। দেবপ্রিয়ের চরিত্রের এতটা গভীর আলোচনা নাই, তথাপি তাহার আনন্দপ্রচার-ব্রত তাহার ব্যক্তিত্বকে কতকটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র, অনিন্দিতার পারিবারিক আবেষ্টনের চিত্র প্রভৃতি লঘুবিরল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।

'বন্যা' উপন্যাসটি একটি সামাজিক অসংগতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপর্ণা বা সুবর্ণার মাতা তাহার পিতা প্রতুলচন্দ্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও তাঁহার সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ক্রূর-প্রকৃতি পরিবারে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। এই বিবাহের ফল মোটেই শুভ হয় নাই—শেষ পর্যন্ত মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাতাকে দেখিতে আসার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুপর্ণার লজ্জাকুণ্ঠিত, অশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ হইতে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল মহিলাতে পরিবর্তনই উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। এই পরিবর্তনের চিত্র খুব সাধারণ, ইহার মধ্যে কোনও গভীর মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুদর্শনের প্রণয়-নিবেদনে সুপর্ণার তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ তাহার মন অপেক্ষা দেহকে অধিক চিহ্নিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ hysteria-গ্রস্ত, স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক এরূপ অবস্থায় যাহা করে, সে ঠিক তাহাই করিয়াছে; তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার স্বাধীনতালাভের প্রয়াস যে তাহার বিশেষ কোন সাহায্য করিয়াছে তাহা বোঝা যায় না। শ্রীবিলাসের চরিত্রও বেশ সুচিত্রিত হইয়াছে তবে তাহার মধ্যে কোনও **redeeming feature** এর আভাস মাত্র নাই। তাহার কথা-বার্তার মধ্যে কোথাও এতটুকু আবেগের কম্পন বা আত্মগ্লানির আন্তরিকতা নাই—যখন সে সুপর্ণাকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, তখনও তাহার সমস্ত অনুরোধ-উপরোধের মধ্য দিয়া শুষ্ক-নীরস স্নেহহীনতার কর্কশ কণ্ঠ আত্মগোপন করিতে পারে নাই। সুপর্ণা তাহার মুঠার মধ্যে আসা মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভদ্রতা-সুরুচির বাহ্যাবরণ বিসর্জন দিয়াছে—তীব্র

স্নেহ ও ইতর প্রভুত্বপ্রিয়তা তাহার কথায় ও ব্যবহারে অসংকোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীবিলাসকে কতকটা হীন বর্ণে চিত্রিত করিয়া লেখিকা তত্ত্বালোচনার নিকট human interest-এর বলি দিয়াছেন। শ্রীবিলাসের ইতর ও পাশবিক ব্যবহারের জন্য তাহার দিকে সুপর্ণার মন অণুমাত্রও আকৃষ্ট হইতে পারে নাই—তাহার ও সুদর্শনের মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয় নাই। যদি সে যথার্থ অনুতপ্ত হইত, পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সত্যসত্যই ব্যাকুল হইত, তাহা হইলে সুপর্ণার জীবন-সমস্যা ঘনীভূত হইত ও উপন্যাসের রস জমাট বাঁধিত। কিন্তু লেখিকা সেই কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হন নাই। শ্রীবিলাস, সুদর্শন ও সুপর্ণার প্রণয়ের পথে কেবল একটা বহির্জগতের আকস্মিক বাধা মাত্র—যখন বন্যার জলে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন সকলেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। কাহারও স্মৃতির উপর সে ক্ষীণমাত্র ছায়াও ফেলে নাই, প্রেমিক মনের অন্ধকারতম কোণেও তাহার অশরীরী ছায়ামূর্তি উঁকি-ঝুঁকি মারে নাই। শ্রীবিলাসের মত স্বামী রূপকথার রাক্ষস-দৈত্যেরই আধুনিক সংস্করণ মাত্র।

(১৩)

'রজনীগন্ধা' (ফাল্গুন, ১৩২৮) লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করিবার জন্য, উপন্যাস লিখিলে কিরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে, 'রজনীগন্ধা' তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ক্ষণিকাদের পরিবার ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর ও স্ত্রীজাতিসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করে। ক্ষণিকা, মেনকা, লালু তিনটি ভাই-ভগিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পরিবারের পুরুষ-কর্তৃত্ব নিতান্ত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হইয়াছে—ক্ষণিকার বাবা চিররুগ্ন ও অকর্মণ্য, তাহার দাদা প্রবোধ স্বার্থপর ও কর্তব্যজ্ঞানহীন। নারীর হাতে চিত্রতুলিকা থাকিলে পুরুষের ভাগ্যে এইরূপ বিরল বর্ণবিন্যাস খুব স্বাভাবিক। ক্ষণিকার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন কৈশোর হইতেই সংসারের গুরুভারে অভিভূত—বোর্ডিং-এ সঙ্গিনীদের আমোদ-প্রমোদ ও চটুল হাস্যপরিহাস তাহার মনে কোন তারুণ্যের হিল্লোল জাগাইতে পারে নাই। একজন তরুণী শিক্ষয়িত্রী মনোজার অর্থসাহায্যে তাহার শিক্ষা চলিতেছে—তাহার অভিমানপ্রবণতা ও সংকুচিত ভাব যেন ভাগ্যদেবীর কৃপণতার বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুব্ধ অভিযোগ। ইতিমধ্যে পিতার গুরুতর অসুখে শিক্ষার উচ্চাভিলাষ বিসর্জন দিয়া তাহাকে চাকরি খুঁজিতে হইয়াছে ও স্বভাবভোলা, উদাসীনচিত্ত অধ্যাপক অনাদিনাথের গৃহে তাহার গৃহস্থালীর অভিভাবকরূপে চাকরি মিলিয়াছে। এই চাকরিই তাহার চিরবঞ্চিত জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রণয়-দেবতার মুগ্ধ আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। প্রথম দর্শনেই সে অনাদিনাথের প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনাদিনাথের একান্ত ঔদাসীন্য ও আত্মসমাহিত অনাসক্তি তাহার প্রণয়ের মাধুর্যের মধ্যে দুঃসহ বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। তাহার এই ব্যর্থ প্রণয়-বেদনার গভীর আত্মজিজ্ঞাসা, ক্ষুব্ধ-করুণ দীর্ঘশ্বাস, ভাগ্যের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিদ্রোহ, এ সমস্তেরই যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয়। ক্ষণিকার এই অন্তস্তাপদুঃসহ প্রেম, শান্ত মৌনতার অন্তরালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবিকেপী দাহ আমাদিগকে Charlotte Bronte-এর উপন্যাসে Rochester-এর

প্রতি Jane Eyre-এর জ্বালাময় প্রণয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Jane Eyre-এর মত কণিকার বহিঃসৌন্দর্যের কোন আভাস নাই—তাহারই মত তাহার অতৃপ্ত বুভুক্ষা ও অসংকোচ অধিকার-প্রার্থনা। সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির যে লজ্জা-সংকোচ-শালীনতা তাহার প্রণয়-নিবেদনের কণ্ঠরোধ করে, কণিকা বা Jane Eyre-এর নিভৃত চিন্তায় তাহারা কোনরূপ ছায়াপাত করে নাই; তাহাদের কামনার উলঙ্গ সত্য সূর্যালোকে শাণিত তরবারির ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যর্থতার সম্ভাবনা তাহার চিত্তকে শান্ত না করিয়া আরও অসংবরণীয়রূপে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। অনাদিনাথের সাধারণ সৌজন্য ও শিষ্টাচার, তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য উদ্বেগ-প্রকাশ ও ক্ষমা-প্রার্থনা, তাহার বঞ্চিত জীবনে প্রেমের অভাব সম্বন্ধে বেদনা-বোধকে আরও তীব্রতর করিয়াছে। অনাদিনাথের ঔদাসীন্য বরং সহনীয়, কিন্তু তাঁহার মৌখিক ভদ্রতা, মনিব হিসাবে তাঁহার অনিন্দনীয় ব্যবহার অশ্রুপ্লাবনে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ছুটাইতে চাহিয়াছে। গিরিডি-প্রবাসকালে শীতের এক নির্জন, নক্ষত্রালোকিত সন্ধ্যায় একত্র ভ্রমণ তাহার প্রণয়ের পাত্রকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে; রহস্যলোকের অদৃশ্য প্রভাব যেন এই সান্ধ্যভ্রমণের অখণ্ডিত অবসর, নিগূঢ় আত্মোপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নবজন্মস্পন্দনের ভিতর দিয়া, তাহার প্রেমকে বিশ্বজগতের নিঃশব্দ সুরপ্রবাহের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিবার পর তাহার এই অশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে যে, মাতার অসুখের সুযোগ লইয়া সে রণক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। ইতিমধ্যে অনাদিনাথের সহিত মনোজার বিবাহ-সংবাদ তাহাকে বজ্রাঘাতের মত অভিভূত করিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাময় অনুভূতি তাহার পূর্বকৃতজ্ঞতাকে এমন কি চিরসংস্কারলব্ধ ধর্মজ্ঞানকেও হঠাইয়াছে—মনোজার পূর্বহিতৈষিতা ও সতীত্ব-ধর্মের সনাতন ধারণা তাহার ঈর্ষ্যাকলুষিত মনোবিকারের প্রবলতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থার এই স্তরের বিশ্লেষণ বাস্তবতার দিক্ দিয়া খুব চমৎকার হইয়াছে। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সে মনোজার প্রতি তাহার মনোভাব সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখিতে পারে নাই—মনোজার অনায়াস-লব্ধ, অবহেলায় উপভুক্ত বিজয় গৌরব নিজ লজ্জাকর পরাভবকে ধিক্কার দিয়াছে। শেষে মনোজা অসাধ্য-রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সে পূর্বোপকারের ঋণ-পরিশোধের ছদ্মবেশে নিজ ব্যর্থ, অন্তর্দাহকারী প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে বহিঃনিক্রমণের পথ দিয়াছে। তাহার এই চাতুরী মনোজার অন্তর্দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়াছে—একই প্রণয়াস্পদের প্রতি অনুরাগ দুইটি নারীর গোপন কথাটি পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। মনোজার মৃত্যুর পর অনাদিনাথ দুঃসহ শোকের কুহেলিকাবৃত হইয়া কণিকার নিকট আরও দুরধিগম্য হইয়াছেন—স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতির মধ্যে তিনি এমন নিশ্চিহ্নভাবে মগ্ন হইয়াছেন যে, সমস্ত বাহ্যজগতের সহিত কণিকাও তাঁহার ধ্যানসমাহিত চক্ষুর সম্মুখে ছায়াবাজির ন্যায় বিলীন হইয়াছে। ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া কণিকা রোগের উত্তপ্ত ছায়াবাজির মধ্য দিয়া নিজ চিরনিরুদ্ধ বিদ্রোহের তপ্ত বাষ্প নিঃসরণ করিয়া দিয়াছে—চিরসহিষ্ণু তাহার মুখে অনভ্যস্ত বিদ্রোহবাণী তাহার মাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। শেষে একবার প্রত্যাখ্যানের পর সে তাহার আবাল্য

সুহৃৎ ও চির-উপকারক চিন্ময়ের প্রেমনিবেদন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার অন্তরের রহস্য মনোজ্ঞা ও চিন্ময়ের নিকট অজ্ঞাত ছিল না—উভয়েই প্রেমের স্বচ্ছ অনাবিল দৃষ্টিশক্তির বলে এই গোপন রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিল। চিন্ময়ের নিকট কণিকা যাহা নিবেদন করিয়া দিল, তাহার মধ্যে প্রথম প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ ছিল না, আশাভঙ্গের তিক্ত স্বাদ তাহার মাধুর্যকে কতকটা নীরস করিয়াছিল; কিন্তু ইহার শান্ত, শীতল, স্বচ্ছ প্রবাহ যে তাহাদের জীবনকে চিরসরস ও শ্যামল রাখিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। নারীর দিক্ হইতে প্রেমের তীব্র, অপ্রতিবোধনীয় প্রভাবের এরূপ বিবরণ বাংলা উপন্যাসে বিরল এবং ইহাই উপন্যাসটির গৌরবময় বিশেষত্ব।

(১৪)

'উদ্যানলতা' উপন্যাসটি সীতা ও শান্তা দেবীর যুগ্ম রচনা—ইহাদের লিখনভঙ্গীর অভিন্নতার চমৎকার সাক্ষ্য দেয়। ইহার মধ্যে কোন্ অংশ কাহার রচনা তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম আলোচনার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না। ইহাদের বর্ণনাভঙ্গী, জীবন-সমালোচনার ধারা, চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব আশ্চর্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। উপন্যাসটির মধ্যে কিন্তু গভীরতার একান্ত অভাব। মুক্তির জীবনের যে বিস্তৃত, দিনলিপিমূলক কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার উপরিভাগের ঔজ্জ্বল্য—লঘু, চটুল, হাস্যপরিহাস-চঞ্চল প্রবাহ, ঠাকুরমার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ ও পিতার অপরিমিত স্নেহাদরে অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ—এই সমস্ত দিক্ই চমৎকার ফুটিয়াছে। জ্যোতি ও ধীরেনের সহিত সংস্পর্শ মুক্তির জীবনে যে অতি ক্ষীণ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে ইহার সাধারণ লঘুপ্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই উভয় প্রণয়ীর বিরুদ্ধ আকর্ষণে তাহার চিত্ত যে সামান্য দোল খাইয়াছে তাহার মধ্যে কোন আবেগগভীরতা নাই। মোট কথা, মুক্তির জীবনের লঘুচপল আবর্তন তাহার মনে কোন গভীর পরিণতি মুদ্রিত করিয়া দেয় নাই—সে তাহার বোর্ডিং-জীবনের ক্ষুদ্র মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা-কলহ, সখিত্ব, প্রভৃতির সীমারেখা ছাড়াইয়া কখনই জীবনের সমস্যাসংকুল পথে পদক্ষেপ করে নাই। সে চিরকিশোরী রহিয়া গিয়াছে। শিবেশ্বরের সংস্কারকত্ব অনাবশ্যকরূপে উৎকট আতিশয্যের পর্দায় উঠিয়াছে। মোক্ষদার চরিত্রে সহজ স্নেহপ্রবণতার সহিত অন্ধ গোঁড়ামির সংমিশ্রণ খুব ভাল ফোটে নাই; শিবেশ্বর ও মুক্তির সঙ্গে তাহার কোথাও একটা সহজ মিলনের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই। মোট কথা, উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হইলেও গভীরতার দিক্ দিয়া মোটেই সমৃদ্ধ নহে।

(১৫)

শান্তা দেবীর ছোট-গল্পসমষ্টির মধ্যে 'ঊষসী', 'সিঁথির সিঁদুর' ও 'বধূবরণ' উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি গল্প ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। 'সুনন্দা', 'সিঁথির সিঁদুর' ও 'আঁধারের যাত্রী'—এই তিনটি গল্পে কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। 'সুনন্দা' একটি পতিতার গর্ভজাতা কুমারীর নিষ্ফল প্রণয়ের উচ্ছ্বসিত খেদোক্তি; 'সিঁথির সিঁদুর' এক নবোঢ়া

পত্নীর দাম্পত্যসমস্যামূলক। স্বামীর সহিত পরিপূর্ণ মিলনে বাধা পাইয়া সে জানিতে পারিল যে, স্বামী তাহার রূপসী উপপত্নীকে সংসারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে মনে হয় যে, স্বামী সম্বন্ধে তাহার গভীর খেদোক্তি বা সুদীর্ঘ চিত্তবিশ্লেষণ একেবারেই অপ্রযুক্ত, কেননা এরূপ স্বামীর সম্বন্ধে যে স্ত্রী খেদ প্রকাশ করিতে পারে সে একেবারেই আত্মসম্মানবর্জিত ও পাঠকের সহানুভূতির অযোগ্য। 'আঁধারের যাত্রী' প্রেমাস্পদের দ্বারা প্রতারিত এক অন্ধ কিশোরীর সংসারের প্রতি তীব্র অভিমান-প্রকাশ। কতকগুলি গল্পের প্রেরণা আসিয়াছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার উৎকট বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের দিক্ হইতে। 'পৌষ-পার্বন'-এ এক যুবতী বিধবার তাহার শিশু দেবরের প্রতি পুত্রবাৎসল্য ও ভালবাসার অন্ধ অতিশয্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—এই গল্পটি স্পষ্টতঃ শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের করুণ-রস-সৃজনের সিদ্ধহস্ততা ইহার মধ্যে নাই। 'পিতৃদায়' গল্পে অপরিমিত অর্থলোভ আমাদের সামাজিক জীবনের সর্বপ্রধান মাঙ্গল্য-কর্ম বিবাহের যে দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই আলোচনা আছে; কিন্তু এই অতি পুরাতন বিষয়ের আলোচনায় লেখিকা পুত্রবধূ অলকার চরিত্রের মধ্য দিয়া একটু নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। অলকার অতি কঠোর আত্মসম্মানবোধ ও অনমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা, তাহার প্রস্তরকঠিন দৃঢ়সংকল্প তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'ময়ূর-পুচ্ছ' পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত আবেষ্টনের মধ্যে শিক্ষিতা বধূর দুরবস্থার কাহিনী। ইহার বিষয়-বস্তু মামুলি ও আলোচনা বিশেষত্ববর্জিত। 'শিক্ষার পরীক্ষা'য় একটু হাস্য-রসের প্রবর্তন হইয়াছে তবে ইহা কেবলমাত্র ঘটনামূলক, আলোচনামূলক নহে। 'বধূবরণ' সমষ্টিতে 'মানের দায়' ও 'রাজলক্ষ্মী' এই দুইটি গল্পে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে বংশগৌরব ও অর্থপ্রাচুর্যের তারতম্য লইয়া যে নিষ্ঠুর-করুণ অসামঞ্জস্য ও ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় তাহারই আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পে রাজলক্ষ্মীর পিতামহ ধরণীমোহনের চরিত্রে তাহার ঐশ্বর্যের জাঁকজমকের জুয়াখেলা গল্পটিকে আর্টের উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে। এই চরিত্র-গৌরবই সমস্ত বাহিরের বিপদ্‌জালকে আবাহন করিয়া আনিয়াছে, ও চারিদিকের দুঃখ কুহেলিকার মধ্যে উন্নত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইটি গল্পেরই পরিশেষ অনেকটা আকস্মিক ও অসমঞ্জস হইয়াছে। 'ফুটকী', 'ভুটকি' ও 'সৃষ্টিছাড়া' এই তিনটি গল্পে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার তির্যক গতি, আঁকা-বাঁকা গলিপথে সঞ্চরণপ্রবণতার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। 'ফুটকী' গল্পে মাণিক ও ফুটকীর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' গল্পে শেখর ও ললিতার সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি—তবে শরৎচন্দ্রের গল্পের করুণ, উচ্চসুরে বাঁধা মূর্ছনার পরিবর্তে এখানে একটা ছেলেমানুষী হাসির সরল ঝংকার শোনা যায়। 'ভুটকী' একটা সাঁওতাল মেয়ের নানারূপ বিচিত্র মনোভাবের মধ্যে মনিবের শিশুপুত্রের প্রতি ভালবাসার প্রাধান্যের কাহিনী—গল্পটির রস কিন্তু মোটেই জমাট বাঁধে নাই, ঐক্যহীন বৈচিত্র্যের নানা প্রণালীর মধ্যে বহুধা বিভক্ত হইয়া অতি শীর্ণধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। 'সৃষ্টিছাড়া' গল্পে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় চিরাভ্যস্ত একটি তরুণী ও পাশের বাড়ির এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অতি সংকীর্ণ, যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে বর্ধিত এক খেয়ালী, চঞ্চলপ্রকৃতি যুবক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইজন যেন দুই বিভিন্ন কৃত্রিম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই বিদ্রোহের উতলা বায়ুতে পরস্পরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের

পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ তাহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (negative) ও বিদ্রোহমূলক। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের একান্ত অভাব। 'মধুমালতী' গল্পে ভগিনী-স্নেহের একটি মৌলিক চিত্র পাওয়া যায়—এই স্নেহের আতিশয্যই কিন্তু ভগিনীদের মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে। 'পথহারা' গল্পটিতে করুণরস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে—তীর্থ-পথযাত্রিণী, আত্মীয়সঙ্গচ্যুতা, চিরস্নেহবুভুক্ষিতা মন্দার জীবনে মৃত্যুশয্যায় প্রণয়-দেবতার অতর্কিত আবির্ভাবের কাহিনীর করুণ বেদনা পাঠককে অভিভূত করে। কুম্ভমেলায় স্নানার্থী পুণ্যালোভোন্মত্ত জন-সমুদ্র, পথহারা আশ্রয়প্রার্থী নারীর প্রতি গার্হস্থ্যজীবনের নিরাপদ বেষ্টনে সুরক্ষিতা সমজাতীয়াদের নির্মম ঔদাসীন্য ও কুৎসিৎ সন্দেহ, মন্দার প্রতি সোমনাথের করুণ সমবেদনার প্রণয়ে পরিণতি, সোমনাথের প্রণয় প্রস্তাবে মন্দার প্রথম বিরক্তিবোধ ও আত্ম-হত্যা-সংকল্প, তারপর এই প্রণয়নিবেদনের মাধুর্য ও পবিত্রতার নিকট ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ, হাসপাতালের মৃত্যু-শয্যায় তাহাদের বিবাহবাসর-রচনা, ইহলোকের পাথেয় ফুরাইবার মুহূর্তে পরজন্ম সম্বন্ধে ব্যাকুল আলোচনা—এই সমস্তই অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'রুদ্ধ গৃহ' গল্পটি রোমান্সের রহস্যময়, নিবিড় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। ভাষা ও ভাবের মন্থর ঐশ্বর্যে ইহা রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং-এ ক্যালকাটা রোডের ধারে আসীনা-বদ্রাওন-নবাবপুত্রীর অপরূপ কাহিনীটি স্মরণ করাইয়া দেয়। বঞ্চিত প্রেমের করুণ প্রতারণার মায়াজাল সমস্ত গল্পটির আকাশ-বাতাসকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দীর্ঘদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় অতি-ক্রান্তযৌবনা প্রণয়িনীকে মানস মূর্তির ধ্যানে তন্ময়, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত প্রেমিক কাছে পাইয়া চিনিতে পারিল না। তাই অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া যামিনী অভিলাষের নিকট অভিসারিণী হইয়াছে; আলোকের প্রথম অরুণরেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। যে প্রণয়-দেবতার মন্দিরে অভিলাষ পূজার সযত্ন-সংগৃহীত ঐশ্বর্যসম্ভার পুঞ্জীভূত করিয়াছে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই শূন্য সিংহাসনে একদিনের জন্যও অধিষ্ঠিত হন নাই; যাহাকে বাঁধিবার জন্য সে প্রাচীর অভ্রভেদী এবং কক্ষের প্রতি দ্বার ও গবাক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়াছে, সে তাহার সমস্ত ব্যাকুল চেষ্টাকে উপহাস করিয়া দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতায় মিলাইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মানস-সুন্দরী দিবালোকে লোল-চর্মা স্খলিত-দশনা বৃদ্ধা দাসীতে পরিণত হইয়াছে। অথচ অভিলাষ প্রতিদিনই আশা করে যে, তাহার আবেশময় নিশিস্বপ্ন দিবালোকের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে—এই অশ্রান্ত আকুলতা তিল তিল করিয়া তাহার জীবনশক্তিকে ক্ষয় করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। এই গল্পটি বাস্তব আবেষ্টনের মধ্যে রোমান্স-সৃষ্টির কুশলতায় অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমস্ত ছোট গল্পের মধ্যে চিত্ত-বিশ্লেষণ ও মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতের দিক্ দিয়া 'পরাজয়' গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে মহালক্ষ্মী ও রজনী—এই দুই বাল্যসখীর মধ্যে একপ্রকার বিশেষ ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষ হইয়াছে। রূপসী মহালক্ষ্মীর মনে আশ্রিতা দরিদ্র-কন্যা রজনী সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা ও দর্পের মধ্যবর্তী একপ্রকার মিশ্র মনোবৃত্তি বিরাজ করিত। এই সদর্প আত্মগৌরব চরম সীমায় উঠিল যখন তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থী শিবসুন্দরের সহিত রজনীর বিবাহ হইল। রজনী তাহার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট পাইয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছে এইরূপ একটা মনোভাব মহালক্ষ্মীকে আত্মপ্রসাদে স্ফীত করিয়া তুলিল।

কিন্তু এইবার দর্পচূর্ণ হইয়া ঈর্ষ্যানুভবের পালা আসিল। মহালক্ষ্মী বিবাহের অল্পদিন পরে বিধবা হইল; পক্ষান্তরে রজনীর স্বামি-সৌভাগ্য আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিল ও মহালক্ষ্মীকে চক্ষুঃশূলের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রজনীকে অচির-বৈধব্যের অভিশাপ দিয়াছে; কিন্তু এই অভিশাপ ফলিয়া যাইবার পর সে আতঙ্কিতচিত্তে আবিষ্কার করিয়াছে যে, যে আঘাত সে তাহার বাল্য-সহচরীর বুকে হানিয়াছে তাহা সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া তাহার বুকে বাজিয়াছে—প্রতিদ্বন্দ্বিনীর স্বামী তাহার নিজেরই অবিস্মৃত দয়িত ছিল। মোটের উপর ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে সীতা দেবীর সহিত তুলনায় শান্তা দেবীর ছোট গল্পগুলিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যাইতে পারে।

(১৬)

'জীবন-দোলা'—শৈশব হইতেই বিধবা এক নারীর, বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের মধ্য দিয়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির ইতিহাস। সমস্যামূলক উপন্যাসের সমস্যার প্রাধান্য যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে অভিভূত করে, এখানেও সেইরূপ গৌরীর সমস্যা তাহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়াছে। গৌরীর জীবন স্বাধীন, সাবলীল ভাবে স্ফূর্তি পায় নাই, ইহা তাহার কেন্দ্রগত সমস্যার চারি-দিকে দানা বাঁধিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ ইউরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্য সমস্যামূলক; সেখানে সমালোচনার প্রয়োজনের নিকট অবাধ, স্বাধীন ব্যক্তিত্বস্ফুরণ, চিরন্তন মানব-প্রকৃতির অকুণ্ঠিত উন্মেষকে খর্ব করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধিগত আলো-চনারই প্রাধান্য; তৎসত্ত্বেও ইহারা সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'জীবন-দোলা'ও এই শ্রেণীর উপন্যাস এবং এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ইহা মধ্যম রকমের উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে। এই উপন্যাসের প্রধান দোষ হইতেছে যে, এক গৌরী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই; ইহারা কেবল গৌরীর চরিত্র বিকাশের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; গৌরীকে প্রভাবিত করা, বিচিত্র সংস্পর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উদ্বোধিত করা ব্যতিরেকে তাহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাহার পিতা হৃষিকেশব, মাতা তরঙ্গিণী, ভাই শঙ্কর, তাহার সহকর্মী ও সম্ভাবিত প্রেমিকদ্বয়—সঞ্জয় ও অপূর্ব—সকলেরই জীবন যেন একটা উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিকতার প্রতি-চ্ছবি মাত্র। এমন কি তাহার প্রেমোন্মেষও একটা স্বতঃস্ফূর্ত, বেগবান্ মনোবৃত্তি নয়, ইহা সমাজসেবার যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যের নীরস ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা রসায়ন মাত্র। প্রেমের অফুরন্ত উৎস হইতে সমাজকর্তব্যপালনের জন্য গতিবেগ ও শক্তিসঞ্চয় করাই যেন জীবনে প্রেমের আবাহনের উদ্দেশ্য। এই পরাধীন প্রেম জনহিতৈষণার সংকীর্ণ খাতে অতি শীর্ণ, সংকুচিতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, ঐরাবতকে ভাসাইবার দুর্জয়, কূলপ্লাবী শক্তি ইহার নাই। যে সঞ্জয় তাহার কর্তব্যভারক্লিষ্ট মনে প্রেমের বর্ণ-সমারোহ সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের কোন স্পন্দন অনুভব করা যায় না। নিছক সমস্যার দিক দিয়াও আলোচনা যে খুব গভীর ও সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। বিবাহের পরেই তাহাদের জীবন-নাট্যে যবনিকাপাত হইয়াছে, যেন বিবাহই তাহার জীবন-সমস্যার চরম সমাধান। বিবাহিত জীবনে তাহাদের সমাজ-সেবার আদর্শ কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিল, তাহাদের কর্মনিষ্ঠা কিরূপ নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিল তাহার কোনই আলোচনা নাই। প্রেম যেখানে স্বাধীনভাবে কাম্য,

সেখানে বিবাহে পরিসমাপ্তি স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু সে যেখানে কর্তব্যের অনুচর মাত্র, সেখানে তাহার জয়গানকেই সমাপ্তি-সংগীতে পরিণত করা সমীচীন নহে।

মোটের উপর গৌরীর জীবনেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গৌরীর স্বপ্নময় কৈশোর-জীবনের চিত্র মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া অতি চমৎকার হইয়াছে। অন্যান্য বালিকারা এই কৈশোরের সহিত প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে— তাহাদের বাল্য ও যৌবনের মধ্যে কোন কল্পনাজড়িত, স্বপ্নবিহ্বল মধ্যবর্তী অবস্থা প্রসারিত থাকে না। তাহাদের জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিবার আগেই বিবাহের বন্ধন ও মাতৃত্বের দায়িত্ব তাহার সুকোমল বৃন্তকে ভারাক্রান্ত করে। বস্তুতন্ত্রতার প্রচণ্ড অভিঘাত তাহাদের মদির স্বপ্ন-জড়িমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া টুটাইয়া দেয়। গৌরী এই নবার্জিত কল্পনাবিলাস লইয়া আর তাহার পুরাতন সংসারের সংকীর্ণ খাঁচাতে নিজেকে কুলাইতে পারে নাই, বৃহত্তর আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছে। বোর্ডিং হাউসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জনসেবাব্রতের মধ্যে সে নবজন্ম লাভ করিয়াছে ও জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রেমের পরম সার্থকতার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে। প্রেম তাহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে নবোন্মেষিত চিন্তাশক্তির স্বল্পালোকিত, সংকীর্ণ পথ দিয়া, কোন প্রবল, অনিবার্য অনুভূতির রাজপথ দিয়া নহে। তাহার কর্মজীবনের সহচরদের মধ্যে একজন, কেবলমাত্র কর্মপ্রেরণার উত্তেজনার মধ্য দিয়াই, তাহার মধ্যে প্রেমের উদ্বোধন করিয়াছে। কিন্তু এই প্রেম নিতান্ত ক্ষীণ ও রক্তহীন বলিয়াই মনে হয়।

(১৭)

শান্তা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিরন্তনী' সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা'র সহিত আশ্চর্যরূপ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। উভয়েরই নায়িকা, তাহাদের জীবনের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা, ও তাহাদের পরিবার-প্রতিবেশ প্রায় অভিন্ন। করুণা ও ক্ষণিকার জীবন প্রায় পরস্পরের প্রতিচ্ছবি বলিলেও চলে। ক্ষণিকার ন্যায় করুণার পরিবারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী ও একজন উদাসীন অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি লইয়া গঠিত। মেনকা ও লালু, অরুণা ও রেণুতে যেন তাহাদের দ্বিতীয় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কৈশোর-চাপল্য ও আমোদ-প্রিয়তার সহিত তুলনায় ক্ষণিকা ও করুণার অকাল-গাম্ভীর্য ও অবসরহীন, অনলস কর্মপরায়ণতা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে মোটের উপর করুণার জীবনে ভাগ্যদেবীর বিরূপতার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। তাহার জীবনসমস্যার তীব্রতা তুলনায় মৃদুতর। ক্ষণিকার জীবনসংগ্রামের অসহনীয়তা অপ্রাপণীয় প্রেম বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। করুণার জীবন অবাঞ্ছিত প্রেমের অভিভব হইতে আত্মরক্ষার একটা সুচিরব্যাপী চেষ্টা; ক্ষণিকার জীবন অলভ্য প্রেমের দিকে ক্ষুব্ধ-ব্যাকুল, নিষ্ফল কর-প্রসারণ। ক্ষণিকার হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনার হাহাকার যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে, করুণার জীবনে তাহা গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়াছে, অন্তর্গূঢ় নীরব বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ক্ষণিকার প্রেম উগ্র বহ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত বাধা-সংকোচ ভস্মসাৎ করিতে ছুটিয়াছে—কৃতজ্ঞতাবোধ, ধর্মের অনুশাসন তাহার মনকে সংযমের বন্ধনে বাঁধিতে পারে নাই। করুণা প্রথমতঃ অবিনাশের অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশের ন্যায় প্রচণ্ড প্রেমনিবেদনের স্পর্শ হইতে সংকুচিত হইয়া আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু শান্তির আশা ও ঋণশোধের পবিত্র কর্তব্য

উভয়েই একযোগে তাহাকে অবিনাশের নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রেম অবশ্য সাংসারিকতার দিক্ হইতে অনিন্দনীয় এই ব্যবস্থায় রাজি হয় নাই, কিন্তু প্রেমের এই ভীরু অসম্মতিকে প্রাধান্য দেওয়ার মত অবস্থা করুণার ছিল না। তাই অবিনাশের প্রস্তাবকে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার জন্য অবিনাশের উগ্র, অসহিষ্ণু সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া পল্লীজীবনের নিভৃত অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে।

এই পল্লীজীবনের সহিত পরিচয় তাহার প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও শতদলের মুগ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহার কল্পনাশক্তির সহিত ইহার একটা নিবিড়, ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আবার এই পল্লীশ্রীর কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার শান্ত জীবনযাত্রায় যে প্রাণস্পন্দনের সংযোগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার মনের একটা স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিল। করুণার হৃদয়ের উপর সুপ্রকাশ যে এত সহজে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ এই যে, সে করুণার কল্পনানেত্রের সম্মুখে পল্লী-সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, প্রতীকরূপে বহুদিন ধরিয়া জাজ্বল্যমান ছিল—সুতরাং যখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পল্লীপ্রবাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দর্শন মিলিল, তখন করুণা তাহার চিত্তের সমস্ত ব্যাকুল আবেগ দিয়া উভয়কেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল। তারপর সহজ আলাপ ও সৌজন্যের মধ্য দিয়া তাহাদের পরিচয় অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে নিবিড় প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছিল। করুণা ও সুপ্রকাশের প্রণয়-কাহিনীটি কবিত্বময় অনুভূতি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ যোগ ও একপ্রকার মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত তন্ময়তার জন্য উপন্যাস-সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

করুণার মন যদিও অধিকাংশ সময় আকাশকুসুমের গন্ধে সুরভিত ও কল্পলোকের বাতাসে হিল্লোলিত হইয়াছে, তথাপি তাহার চরিত্রে বাস্তব উপাদানের অভাব নাই। তাহার মনোবীণা রোমান্সের নায়িকার মত একটা অস্বাভাবিক আদর্শের উঁচু সুরে বাঁধা নাই। তাই অবিনাশের প্রেমকে সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। অবিনাশের পরুষ, প্রভুত্ব-সূচক প্রেমনিবেদন তাহাকে প্রচণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলিয়াছে—এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য সে শতদলের উপদেশপ্রার্থী হইয়াছে। শতদলের সংস্পর্শে তাহার জীবনে এক নূতন প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শতদলের নিজের অতীতসুখস্মৃতিবিভোর, শান্ত, করুণ সহিষ্ণুতা তাহার জ্বালাময় বিদ্রোহোন্মুখতাকে অনেকটা প্রশমিত করিয়াছে। উপরন্তু পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ শ্যামলতা তাহার হৃদয়ক্ষতের উপর শীতল প্রলেপ বিছাইয়া দিয়াছে। এই কল্পনায় উদ্ভাসিত, বিচিত্রসুখদুঃখমণ্ডিত পল্লীজীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়াই তাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজগঞ্জের প'ড়োবাড়ির মধ্যে তাহার পূর্ব বন্ধন তাহার অজ্ঞাতসারে জীর্ণ, শিথিল হইয়া খসিয়া গিয়াছে। এই নূতন আবেষ্টনের মধ্যে তাহার হৃদয়-মন্দিরে নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রকাশের সঙ্গে তাহার যে প্রণয়লীলা তাহাতে বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আত্মবিহ্বল ভাবসম্পদের প্রসার অপরিমিত। তাহাদের অতি সাধারণ কথাবার্তার রন্ধ্রপথগুলি, বসন্তের আকাশ-বাতাস যেমন পুষ্পপরাগের দ্বারা সুরভিত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম, নিবিড়, মাধুর্যপূর্ণ অনুভূতির দ্বারা একান্তভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

তারপর তাহাদের বিচ্ছেদের কাহিনী, সুপ্রকাশের পক্ষে অশান্ত ভ্রাম্যমাণতা ও করুণার পক্ষে নীরব, ধ্যানমগ্ন নিশ্চলতা—এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। শেষে তাহাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হইয়াছে প্রণয়ীর যে ডাকে করুণা সাড়া দিয়াছে, তাহা যেন স্বপ্নের কুহেলিকাজাল ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনিরুদ্ধ কামনার অতর্কিত বহিঃপ্রকাশ।

করুণার পরেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র শতদল। শতদল নিজে খুব ক্রিয়াশীল নহে, কিন্তু অপরের উপর তাহার প্রভাব যথেষ্ট। তাহারই সাহচর্যে ও প্রভাবে করুণার জীবনধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। জীবনকে সমস্ত চঞ্চল, অশান্ত বিক্ষেপ হইতে সংযত করিয়া কিরূপে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিতে হয় একনিষ্ঠ অতন্দ্র সাধনায় কি করিয়া মগ্ন করিতে হয়, সে শিক্ষা সে শতদলের নিকট লাভ করিয়াছে। তারপর অবিনাশের চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার রুক্ষ, পরুষ আচরণ, তাহার স্পর্ধিত প্রণয়ভিক্ষা, তাহার উগ্র, অসহিষ্ণু প্রকৃতির অন্তরালে সুপ্রকাশের প্রতি স্নেহ-কোমল, ক্ষমা-স্নিগ্ধ ব্যবহার মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া খুব চমৎকার হইয়াছে। অরুণা 'রজনীগন্ধা'র মেনকা অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মেনকার মধ্যে একটা যে স্থূল লোলুপতা ও ঈর্ষ্যার সুর আছে, তাহা অরুণার মধ্যে নাই। সে দিদির প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন, ও দিদির প্রণয়ের ভাগ্যবিপর্যয় সে করুণ সমবেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে রেণু অপেক্ষা লালু অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে। এক সুপ্রকাশের চরিত্রই আশানুরূপ খোলে নাই। শতদলের সস্নেহ বর্ণনার মধ্য দিয়া সে প্রথম আমাদের কল্পনার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের পূর্বোদ্রিক্ত আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। শতদলের সহিত তাহার যে স্নেহ-মধুর সম্পর্কটি আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাস্তব ব্যবহারে সে মাধুর্য প্রতিফলিত হয় নাই। প্রণয়-ব্যাপারেও করুণার সহিত তুলনায় তাহার অন্তর্বিক্ষোভ সেরূপ তীব্র ও মর্মস্পর্শী হয় নাই, সে অনেকটা ম্লান ও বর্ণহীন রহিয়া গিয়াছে। পুরুষের হাতে নায়িকার চিত্র যেমন অস্পষ্ট ও অগভীর হয়, বোধ হয় নারীর হাতে নায়কচরিত্রও ঠিক সেইরূপ দোষে দুষ্ট হইয়াছে। এই মন্তব্য 'রজনীগন্ধা'য় অনাদিনাথ ও 'চিরন্তনী'তে সুপ্রকাশ —উভয়সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উভয়েই কতকটা কুহেলিকাবৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের জীবনের মর্মকথাটি যেন অপ্রকাশিত আছে। এই সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে, 'চিরন্তনী' উপন্যাস-জগতে খুব উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইয়াছে—নারীর অবদানের বিশেষত্ব ইহার মধ্যে খুব চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্যাস-রচনা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। সীতা দেবীর 'মাতৃঋণ' ও 'জন্মস্বত্ব' এই দুইখানি উপন্যাস কিছুদিন পূর্বে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর পূর্বে যে সমস্ত উপন্যাস আলোচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেই তাঁহাদের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা লইয়া অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা আছে, কিন্তু তথাপি 'রজনীগন্ধা' ও 'চিরন্তনী'র মধ্যে প্রেমবিহ্বল নারীচিত্তের বর্ণনা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার অনুরূপ কিছু দেখিতে পাই না। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার দিক্ দিয়া আলোচনার পরিধি-বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

একাদশ অধ্যায়

সাম্প্রতিক স্ত্রী-ঔপন্যাসিক

(১)

সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসে স্ত্রী ও পুরুষ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য যে অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার অভিন্নতা, অবাধ সামাজিক মেলা-মেশার সুযোগ ও পূর্বতন জীবনযাত্রা পদ্ধতির রূপান্তর এই পরিণতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ বাস্তব অবস্থার প্রভাব, জীবনে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব, নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কোমল বৃত্তির নিরোধ ও দৃঢ় আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন, জীবনের প্রতি মোহনির্মুক্ত, রোমান্সবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতর প্রয়োগ আধুনিক উপন্যাসে নারীর দানকে বিশিষ্টচিহ্নাঙ্কিত হইবার পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। তথাপি বিষয় নির্বাচনে ও আলোচনা ভঙ্গীতে নারীর জীবন-পর্যালোচনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পরিবার-জীবনে যে নূতন-ধরনের সমস্যা দেখা দিয়াছে, পারিবারিক আদর্শবাদের ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ও পরিবারভুক্ত নরনারীর মধ্যে দারুণ স্বার্থসংঘাত, ঈর্ষ্যা-অসহযোগ ক্ষোভ-ঔদাসীন্য প্রভৃতি হেয় বৃত্তিগুলি অস্বস্তিজনকভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে নারীর উপন্যাসে তাহারই চিত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। যৌথ পরিবারের প্রেতাত্মা এখনও কোন কোন নারীরচিত উপন্যাসে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া ও নানারূপ অশান্তি-বিক্ষোভ ঘটাইয়া বাসা বাঁধিয়াছে। এখনও মাতৃকেন্দ্রিক, বহুগোষ্ঠীসমন্বিত পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট ও ভারসাম্যচ্যুত জীবনাভিনয়ের কাহিনী উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও ন' খুড়ী, মেজ বৌ, সেজ দাদা প্রভৃতি লুপ্তাবশেষ পরিবার-জীবনের নিদর্শনবাহী চরিত্রসমূহ পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে কেহ বা সদর্প, কেহ বা কুণ্ঠিত পদক্ষেপে, আত্মপ্রতিষ্ঠার আস্ফালন ও আত্মবিলুপ্তি-নিস্ক্রিয়তার মধ্যবর্তী নানা স্তর অধিকার করিয়া, ঘটনার জটিলতার উপর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিলতর জাল সংযোজনা করিয়া, আপন আপন সরব ও নীরব অংশ অভিনয় করিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, বাঙলার জীবনযাত্রা হইতে একান্নবর্তী পরিবারের পুতুলনাচের খেলা চিরবিলুপ্তির পথেই অগ্রসর হইতেছে।

এখন জীবন-রহস্য বহুকোষবিশিষ্ট যৌথ পরিবার হইতে সরিয়া গিয়া এককোষনির্মিত ক্ষুদ্রতর, আঁটসাঁট সংস্থার মধ্যেই আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র রচনা করিতেছে। বর্তমানকালে শাশুড়ী-বৌ-এর মতবিরোধ বা জায়ে জায়ে মনোমালিন্য একটা গৌণ সংঘর্ষের পর্যায়েই পড়িয়াছে। এই সংঘর্ষে কোন অভাবনীয়তার স্পর্শ নাই যাহা ঘটিবে তাহা সম্পূর্ণ-রূপে প্রত্যাশিত ও পূর্বনিয়ন্ত্রিত। ভ্রাতৃবিরোধের মামলার মত ভ্রাতৃবিরোধের উপন্যাস-

কাহিনীও গতানুগতিকতার বাঁধাধরা ছকে বিন্যস্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পরে যৌথ বাঙালী পরিবার রসসাহিত্যের উপাদানের মর্যাদা হারাইয়া প্রায় আধা-সরকারী সমাজ-তত্ত্বালোচনার পরিমাণ বাড়াইয়াছে। এখন একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী বা পিতামাতার সহিত সন্তানের মানস দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও সূক্ষ্মতর অসামঞ্জস্যের কৌতূহল-কর কাহিনী রচিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য ভ্রাতৃবিরোধের সুলভ চিত্র আঁকেন নাই— তাঁহার 'রজনী'তে শচীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ সহোদর হইয়াও জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে সমর্থনই পাইয়াছেন। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ একক পুরুষ, গোবিন্দলাল যৌথ পরিবারে লালিত হইয়াও তাঁহার অন্তরের সমস্যায় নিঃসঙ্গ ও পারিবারিক পার্শ্বপ্রভাবমুক্ত। বঙ্কিমযুগে দাম্পত্য কলহ এক পক্ষের অভিমান-প্রণোদিত স্থানত্যাগের দ্বারা সহনীয় ও ভাবের উচ্চলোকে অধিষ্ঠিত। বর্তমানকালে এই কলহ একত্রবাসের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ও নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে অসহনীয়রূপে ক্ষুব্ধ ও শ্বাসরোধী। প্রতিদিনকার ছোট-খাট ঘটনার পুঞ্জীভূত চাপে যে তিক্ত ও গ্লানিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাই সাম্প্রতিক স্ত্রী-রচিত উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য এবং এই-খানেই বঙ্কিমের উদারতর, তুচ্ছতার মালিন্যমুক্ত, উন্নত আদর্শবাদের স্পর্শে গরিমামণ্ডিত ভাব-পরিবেশের সহিত উহার পার্থক্য।

অতি-আধুনিক মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় রোমান্সের রঙীন মোহ, ভাববিলাসের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা অভিনব বিষয়ের ঘটনা-রোমাঞ্চ একেবারে অনুপস্থিত নহে। তাঁহারা মাঝে মধ্যে বাস্তব জটিলতার সমাধান খোঁজেন রোমান্সের আকস্মিক অবতারণায় অথবা সুলভ ভাবালুতার অতর্কিত উৎক্ষেপে। অতীত মনোভাব ও জীবনদর্শনের উত্তরাধিকার তাঁহারা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রমণীসুলভ কোমলতা বাস্তবের নির্মম, নিরাসক্ত মনোবিজ্ঞানের নিয়মজালে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ জীবনবীক্ষণে ক্লান্ত হইয়া সময় সময় হৃদয়াবেগের হঠাৎ-প্লাবনে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে ভাসাইয়া দেয়। তাঁহাদের অনেক উপন্যাসের উপসংহার তাঁহার অনুসৃত রীতির বিপরীতমুখী পরিণতির প্রমাণ দেয় ও আমাদিগকে যেন যুদ্ধপূর্ব-যুগের আদর্শশাসিত জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যায়। এই স্ব-বিরোধের মূল হয়ত আমাদের জীবনের মধ্যেই নিহিত আছে। আমাদের সমস্ত প্রথাবন্ধনমুক্ত, ভাবালুতাবর্জিত, সুস্থ-বিচারবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত জীবনবোধের মধ্যেই সঙ্গোত্যক্ত আবেগমুগ্ধতা ও আদর্শানুস্মৃতির প্রভাব সুপ্ত আছে ও উপন্যাসের ভাবঘন সংকট মুহূর্তগুলিতে এই অস্বীকৃত প্রেরণাই অকস্মাৎ আত্ম-প্রকাশ করে। তাই আমাদের স্ত্রী-ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রগতিশীলতার সহিত অতীতমুখীন-তার, বাস্তবানুসরণের সহিত বস্ত্ব-অতীত ভাবপ্রেরণার এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। যুগমনের বাস্তব চিত্রে ঐতিহ্যস্মৃতিপ্রসূত উদ্‌ভ্রান্তি ও শূন্যতাবোধের দীর্ঘশ্বাস মুহুর্মুহুঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমাদের সমস্ত জীবন যে অস্থির ও বেগবান পরিবর্তনচক্রে পাক খাইয়া মরিতেছে তাহা যেন এক নূতন স্থিরতার বৃত্তে সংহত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। অগ্রগতির উন্মত্ত বেগ যেন প্রত্যাশিত সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া, আশাভঙ্গের অদৃশ্য বাধায় প্রতিহত হইয়া, আত্মসমীক্ষার বিপরীত আকর্ষণের আবর্তচক্রে বিঘূর্ণিত হইযাছে ও অর্জিত নূতন সম্পদ ও বর্জিত উত্তরাধিকারের হিসাব-নিকাশ মিলাইয়া একটা সামঞ্জস্য-প্রয়াসের দিকে ঝোঁক দিয়াছে। এই তরঙ্গরেখা স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সমস্ত আধুনিক ঔপন্যাসিকেই লক্ষণীয়। তবে নারীজাতির

অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও অন্তর্মুখী প্রকৃতির জন্য ইহা তাঁহাদের রচনাতেই অধিকতর পরিস্ফুট। উপন্যাস-সাহিত্য আজ এই পরিবর্তনের তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়াইয়াই আপনার ভবিষ্যৎ গতিপথ-নির্ধারণে প্রতীক্ষমান।

(২)

আশালতা সিংহের উপন্যাস সমর্পণ' ও ছোট গল্পের সমষ্টি 'অন্তর্যামী'র মধ্যে সাহিত্যিক স্থায়িত্বের উপাদান আছে। তাঁহার উপন্যাসের প্রধান গুণ—একটা সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি-প্রাধান্য। প্রকৃতির শান্ত, প্রাণহিল্লোলে ঈষৎ কম্পমান সৌন্দর্য তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র-দিগকে নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আধুনিক যুগের অতি-বাস্তবতার নগ্ন বীভৎসতা তাঁহার সৌন্দর্য ও পরিমিতিবোধকে পীড়িত করিয়াছে, এবং এই সংযম ও সুরুচির দিক্ দিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের এই নব পরিণতির বিরুদ্ধে নিজ প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। 'সমর্পণ' উপন্যাসে তাহার নায়িকা সুরমা এই প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্র। তাহার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচিজ্ঞান সনাতন ও আধুনিক এই উভয়বিধ জীবনাদর্শনের আতিশয্যের বিরুদ্ধে নীরব দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়াছে। "একান্নবর্তী পরিবারের একান্ন খোঁপে" যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা পারাবতকূজনের ন্যায় অহর্নিশি মুখরিত হইয়া উঠে তাহা, আর অতি-আধুনিকার অশান্ত চিত্তবিক্ষেপ, স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচার ও প্রেমের নামে ঐশ্বর্যতৃষ্ণা, এই উভয়ই তাহাকে তুল্যরূপে পীড়িত করিয়াছে। তাহার বাল্যজীবনের সংকুচিত, সর্ববিধ ইতরতার সংস্পর্শ-বিমুখ সৌকুমার্য, তাহার কৈশোরের আত্মসমাহিত, শুদ্ধ তন্ময়তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জীবনের রূঢ় কলকোলাহল ও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার চরিত্রের সূক্ষ্ম, সুকুমার সৌন্দর্য যেন অনেকটা ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম প্রণয়ী হরলালকেও আধুনিক বাস্তবতার খুব চিত্তাকর্ষক প্রতীক বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। সুরমার মত মেয়ের চিত্ত জয় করিতে তাহার বিশেষ কোন যোগ্যতা নাই। তাহার সহিত সুরমার কথোপকথন নিছক তার্কিকতায় পরিণত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক দুই বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ মাত্র। হরলালের প্রত্যাখ্যানের পর সে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, প্রেমিক হিসাবে তাহারও যে খুব একটা উচ্চ অঙ্গের উপযোগিতা আছে তাহা মনে হয় না। হরলালের অতিরিক্ত আগ্রহও যেমন, সুপ্রকাশের ঔদাসীন্য ও অনাগ্রহও তেমনি, ঠিক প্রেমিকের আদর্শের সঙ্গে মিলে না। সুপ্রকাশের সহিত বিবাহের মধ্যে এমন কোন গভীর মিলন ও নিগূঢ় ভাববিনিময়ের পরিচয় নাই, যাহা সুরমার মত এরূপ সূক্ষ্ম-সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট, সুকুমার-অনুভূতিশীল নারীর উপযুক্ত। মোট কথা, গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইহার পরিকল্পনার উপযোগী হয় নাই।

'অন্তর্যামী' গল্পসমষ্টির মধ্যে 'রমা' গল্পটি বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া মৌলিকতার দাবি করিতে পারে। ইহাতে সস্নেহ অনুযোগের দ্বারা একটি কিশোরীর মনের উপর হইতে জড়বুদ্ধি ও কুশ্রীতার স্থূল যবনিকা সরিয়া গিয়া উহার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় কিরূপে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার চমৎকার বর্ণনা। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে পরিকল্পনার

মৌলিকতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় থাকিলেও মোটের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত আখ্যায়িকা রসটি বেশ ভাল জমাট বাঁধে নাই।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। ইহার বিষয়ে অসাধারণত্ব কিছু নাই—প্রথম প্রণয়ীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নারীর পুরুষজাতির প্রতি বিমুখতা ও স্বাধীনতা-সংকল্পই ইহার আলোচ্য বিষয়। এই প্রত্যাখ্যানকারী প্রণয়ী অজিতের প্রেম সম্বন্ধে মৌলিক মতবাদ একেবারে শূন্যগর্ভ ভাববিলাস—বাস্তবজীবনের প্রথম অভিঘাতেই ইহার অসারতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসের আসল সমস্যা হইল সুপ্রিয়ার বিবাহবিমুখ চিত্তে ধীরে ধীরে প্রণয়ের মোহসঞ্চার—বিভাসের প্রতি তাহার আকর্ষণের কাহিনী। পুরুষের প্রতি সুপ্রিয়ার নিগূঢ় অভিমানে কোন উদ্ধত বিদ্রোহ, জ্বালাময় চিত্তদাহ বা উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা নাই, আছে একদিকে নীরব দৃঢ়সংকল্প ও কুণ্ঠিত অনাগ্রহ, অন্যদিকে নারীর অর্ধজড়, পুরুষের তীক্ষ্ণপ্রভাবে অভিভূত, রাহুগ্রস্ত জীবনের স্বাধীন স্ফুরণের সাধনা। তাহার ধূসর মনে প্রেমের শান্ত রশ্মিচ্ছটার বিকিরণ, ও ইহার অপরূপত্বের আবিষ্কার সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সমস্যার অবসান হয় নাই—সুপ্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যবাদ বিবাহোত্তর জীবনেও সংক্রামিত হইয়া দাম্পত্য জীবনে একটা বিপরীতগামী আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই জটিলতা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। রজতোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ যেমন তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী লঘু-শুভ্র মেঘখণ্ডগুলিকে ধীরে ধীরে গলাইয়া আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি প্রেমের ক্রমবর্ধমান মোহ এক গন্ধ-বিধুর শ্রাবণ-রজনীর ছায়াঘন, পরিপূর্ণ মিলনের আভাস-সংকেতে রহস্যময় অঞ্চলতলে. তাহাদের সমস্ত ছোট-খাট অতৃপ্তি, ক্ষোভ ও আদর্শ-বিরোধকে আবরণ করিয়া তাহাদিগকে নিবিড়, রন্ধ্রহীন একাত্মতায় যুক্ত করিয়া দিয়াছে। আরাবল্লী পার্বত্য প্রকৃতির রুক্ষ ধূসরতার মধ্যে বর্ষা-স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর অবরুদ্ধ বিস্তার এই রিক্ত, ঊষর জীবনে প্রেমরাগসঞ্চারের সর্বথা উপযোগী, সুসংগত পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সত্য সম্বন্ধ-নির্ণয়, পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহাভিমানমিশ্র মনোভাব, অধিকার-লোপের ক্ষোভের সহিত মুক্তিদানের উদার আনন্দের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ, বর্তমান দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নারীর হীন অগৌরব ও তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শের অর্ধস্ফুট অনুভূতি, অনাগত কালে তাহার জয়-যাত্রার "ছায়াপথের" চকিত উপলব্ধি—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় লেখিকার চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। লেখিকার উক্তি ও বিচারপদ্ধতির মধ্যে মৃদু শ্লেষের ব্যঞ্জনা রচনার উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। এখানে চরিত্র-পরিকল্পনা গৌণ, সমস্যা-বিশ্লেষণই মুখ্য—সুপ্রিয়ার ব্যক্তিত্বস্ফুরণ তাহার সমস্যা-পরিবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তথাপি উপন্যাসটি নারী-চিত্তের সূক্ষ্ম মননশক্তি ও সুকুমার অনুভূতির একটি সুন্দর উদাহরণ।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর আর একখানি উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (জুলাই, ১৯৪৮) কলিকাতার একান্নবর্তী, হৃদয়হীন এক অভিজাত পরিবারের ইতিহাস। এই পরিবারের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃমাতৃহীন ছেলে নীতীশ তাহার জ্যেঠতুত ভাই-বোনদের সঙ্গে একত্র মানুষ হইতে হইতে উহার স্বার্থপর, নিষ্করুণ ঐশ্বর্যদম্ভস্ফীত জীবননীতির

অসহনীয় আঘাত অন্তরে অনুভব করিয়াছিল। তাহার পিতা পিতামহের পূর্বেই পরলোকগত হইয়াছিল এই আইনের কূটতর্কে সে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। শেষ পর্যন্ত সে পরিজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ছোট-খাট কাজ লইয়া স্বাধীন জীবনযাত্রা অবলম্বন করিল। পরিশেষে সে মহাত্মা গান্ধীর লবণান্দোলনে যোগ দিয়া রাজবন্দীরূপে ধৃত হইল ও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে প্রাণ বিসর্জন করিল। এই আখ্যানের কাঠামোর মধ্যে নীতীশের অখণ্ড বেদনা ও জীবনসমীক্ষার যে পরিচয় আছে তাহাতে লেখিকার প্রশংসনীয় বর্ণনাশক্তি ও মননশীলতার ছাপ দেখা যায়। টুলুর বিবাহিত জীবনের শান্ত, নিরাসক্ত, আত্মনিরোধমূলক, সেবাধর্মের উৎসর্গীকৃত ছবিটিও বর্ণবিরল রেখায় ভালই ফুটিয়াছে। তবে নীতীশের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া মৃত্যুবরণ অত্যন্ত আকস্মিক, পূর্বপ্রস্তুতিহীন বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের প্রতি সহানুভূতি মানসিক প্রসারের পরিচয় বহন করে ও তাহার জীবন-পরিণতি এই পথ দিয়াই আসিবে এইরূপই প্রত্যাশিত ছিল। এখানে লেখিকার সুলভ সমাধানের প্রতি দুর্বলতা শিল্পগত ত্রুটির কারণ হইয়াছে। আসল কথা, উপন্যাসটি ব্যক্তি-জীবনের গভীরতা অপেক্ষা একটি বিশেষ নীতিনিয়ন্ত্রিত পরিবার জীবনের উপরিভাগের সাধারণ লক্ষণের প্রতি অধিকতর মনোযোগী এবং উহার উৎকর্ষও এই সংকীর্ণতর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'সুধার প্রেম' (১৯৩০) ও 'সরোজিনী' (১৯৪২) উপন্যাসদ্বয় অমলা দেবীর* লিখিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই পরিচয় সত্য হইলে উপন্যাস-ক্ষেত্রে আর একজন শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই পরিচয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। উপন্যাস দুইটির মধ্যে স্ত্রীসুলভ স্পর্শ বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। ইহাদের শান্ত, আবেগহীন জীবন-সমালোচনা, মন্তব্যের হ্রস্ব, সংযত পরিমিতি, ঈষৎ ব্যঙ্গপ্রধান, সরস মনোভাব, ভাবার্দ্রতার একান্ত অভাব ও পর্যবেক্ষণের পরিধি-বিস্তার—সমস্তই পুরুষোচিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের মনোবৃত্তি অর্জন করা অসম্ভব নয়, সম্ভবতঃ বর্তমান শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অধিকার-সাম্যের যুগে স্ত্রীপুরুষের মানস প্রবণতার প্রভেদ বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। তথাপি মনে হয় 'সুধার প্রেম'-এ সুধার করুণ ভয়াবহ সমস্যা ও 'সরোজিনী'তে নায়িকার ক্রিয়া-কলাপ যেন পুরুষের দৃষ্টি-কোণ হইতে আলোচিত হইয়াছে। সুধার মর্মান্তিক বেদনা নারীর সমবেদনার বৈদ্যুতী-স্পৃষ্ট হইলে আরও অসহনীয় তীব্রতা লাভ করিত। সরোজিনী চরিত্রে অভিনয়কুশলতার সহিত আন্তরিকতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, হাব-ভাব-লীলার হাস্যকর অসংগতির সহিত সত্যিকার ঔদার্য ও মহানুভবতার একত্র অবস্থিতি পুরুষের বিস্ময় বিমূঢ়, দ্বিধাগ্রস্ত উপলব্ধির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে বক্তা পুরুষ স্কুলমাস্টার বলিয়া লেখিকার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে তাহারই দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুকরণ কলা-কৌশলের চরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এই আত্মবিলোপের সম্পূর্ণতা, কোন অসতর্ক মুহূর্তেও নিজ সত্য পরিচয়ের আভাস-ইঙ্গিতের একান্ত অভাব সন্দেহের উদ্রেক করে। সে যাহা হউক, এই অনুমানের যাথার্থ্য বা ভ্রান্তি উপন্যাস দুইটির উৎকর্ষের কোন

*এ সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই—'অমলা দেবী'র পুরুষ-পরিচয় এখন নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

তারতম্যের হেতু নয়। লেখক পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই হউন না কেন, তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য।

'সুধার প্রেম'-এ ব্যঙ্গ ও করুণরসের সম্পূর্ণ সমন্বয় হয় নাই। মনোজের প্রেম-চর্চা নিতান্তই অসার ভাব বিলাস মাত্র। সুধার প্রতি তাহার আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক ও তরুণসুলভ রূপমোহ মাত্র। সুধার দিক্ হইতেও যে সাড়া আসিয়াছে তাহাতেও কোন গভীর আবেগের লক্ষণ নাই। অভিভাবকশূন্য গৃহে অনুকূল অবসরের সুযোগেই এই প্রেমের অভিনয় চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তারপর পারিবারিক শাসনে ও প্রতিদ্বন্দ্বী আকর্ষণের প্রভাবে মনোজের পক্ষে বিস্মৃতি সহজ হইয়াছে। দেহতত্ত্বঘটিত অনিবার্য কারণেই সুধার পক্ষে মনোজের ন্যায় এই অসুবিধাজনক অভিজ্ঞতাকে ঝাড়িয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। সুধার আত্মহত্যা উপন্যাসের কৌতুক-সরসতার মধ্যে অতর্কিত বজ্রপাতের ন্যায় ইহার সুষমা-সংগতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে। এই আত্মহত্যাকেও আমরা প্রেমের গভীরতম অখণ্ডনীয় প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে পারি না—ইহার পিছনে আছে কতকটা আশাভঙ্গের অভিমান ও কতকটা উপায়হীনের মর্মান্তিক দুঃসাহসিকতা।

সুতরাং এই ট্রাজেডি উপন্যাসের মধ্যে অনেকটা অবান্তর ও অবাঞ্ছিত আবির্ভাব। ইহার আসল আকর্ষণ সরস, ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন। মনোজের প্রেমের আবিষ্কারে তাহার পিতা-মাতার ভাব-বিপর্যয় ও উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল, বিশুর নির্লজ্জ, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কার্যকলাপ; বিপত্নীক ভূষণবাবুর তৃতীয়-পত্নী-লাভে লোলুপতা; মনোজের মামা শৈলজার প্রশংসনীয় ঘটনা-নিয়ন্ত্রণ—সমস্তই এই পরিহাস-স্নিগ্ধ অতিরঞ্জনের প্রতিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে যাহা সর্বাপেক্ষা মৌলিক তাহা মাধুরীর প্রতি মনোজের কোর্টশিপের অভিনবত্ব। শৈলজার সুদক্ষ পরিচালনায় মনোজ নানা হাস্যকর অবস্থায় পড়িয়া হতাশ-প্রেমিকোচিত কৃত্রিম গৌরব হারাইয়াছে। ইহারই প্রতিষেধক প্রভাবে তাহার অনুতাপ ও আত্মগ্লানি দূর হইয়া সে আবার নূতন প্রেমের স্বাদ উপভোগ করিবার শক্তি পাইয়াছে। মাধুরীর স্বভাবের নম্র কমনীয়তাও এই পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। মনোজের আদর্শ প্রেমিকের উচ্চ আসন হইতে সাধারণ দুর্বল, সুবিধাবাদী মানুষের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ—ইহাই উপন্যাসের প্রধান বিষয়; এবং ইহারই হাস্যকর অসংগতির প্রতি স্নিগ্ধ বিদ্রূপকটাক্ষপাত ইহার অংশান্তরের নিদারুণ বিষাদময় পরিণতিকে আড়াল করিয়া পাঠকের মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে।

'সরোজিনী' (১৯৪২) পাকা হাতের পরিচয় দেয়। ইহাতে হাস্য ও করুণরসের কোন বিসদৃশ সম্মিলন হয় নাই—কৌতুকপূর্ণ, সরস বাস্তবচিত্রেরই একাধিপত্য। উপন্যাসে গ্রাম্য-সমাজের চিত্রটি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এরই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেদনা-বিদ্ধ আদর্শ-বাদের পরিবর্তে আছে মৃদুবিদ্রূপমণ্ডিত, উচ্ছ্বাসহীন জীবন-সমালোচনা। বিধবা, ধনশালিনী, রূপসী সরোজিনীর অতর্কিত আবির্ভাব গ্রাম্যসমাজে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে পুরুষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার অভিভাবকত্ব লইয়া এক মহা প্রতিযোগিতা; অপরদিকে মেয়েমহলে ঈর্ষ্যা-সন্দেহের আরও তীব্রতর উত্তেজনা—এই উভয়ে মিলিয়া নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবনে এক জটিল আবর্ত রচনা করিয়াছে। ইহার উপর এই সামাজিক আলোড়নের

মাঝে একদিকে দারোগা-হাকিম প্রভৃতি রাজকর্মচারিবর্গের হস্তক্ষেপ ও অপরদিকে হিন্দুর সমস্যায় আজিজ, সত্তর প্রমুখ ভিন্নধর্মীদের মধ্যবর্তিতা সমস্যার জটিলতা বাড়াইয়াছে। অবশ্য পল্লীসমাজের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, সরোজিনী ইহাকে যে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, ইহার আদর্শের বিরুদ্ধে যে স্পর্ধিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে ইহার বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সমাজের উদার সহনশীলতা নাই, কিন্তু আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা যে সর্বথা নিন্দার্হ তাহাও বলা যায় না। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের সহানুভূতি যুধ্যমান উভয় পক্ষের মধ্যেই সমভাবে বিভক্ত হইয়াছে।

সরোজিনীকে লইয়া গ্রাম্যসমাজে যে মুখরতার উদ্ভব তাহাতে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান। বিশেষতঃ এই নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্ত্রীজাতি অধিকতর সক্রিয়তার পরিচয় দিয়াছে। অন্তরালবর্তিনী অবগুণ্ঠিতাদের প্রভাব যে পল্লীসমাজে কত প্রখর, তাঁহাদের ক্ষুরধার রসনা ও স্বামিশাসনের প্রশ্রয়লেশহীন কঠোরতা ও অতন্দ্র সতর্কতাই তাহার প্রমাণ। হারাণের উৎকট প্রায়শ্চিত্ত, গাঙ্গুলী মহাশয় ও রাধানাথের বাধ্যতামূলক ম্লেচ্ছসাহচর্যে ভোজন, যুদ্ধের জন্য চাঁদা-আদায়ের সভায় গ্রাম্য নেতাদের মারীচের মত উভয়সংকট, সরোজিনীর ছলাকলাকৌশলের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনশীলতা, ফুন্টির ও মিণ্টার প্রেম সম্বন্ধে অকালপক্কতা ও অশিক্ষিত পটুত্ব, তিনকড়ির স্বদেশ-উদ্ধারের সংকল্প-প্রত্যাহার—এই সমস্তই বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করে। মণীন্দ্রের হঠাৎ বড়মানুষির জন্য গরম মেজাজ, প্রভুত্বগর্ব ও আত্মাভিমান-স্ফীতির সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলতার সংমিশ্রণ বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। সমস্ত মিলিয়া গ্রাম্য জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ ও প্রাণবেগচঞ্চল চিত্র পাওয়া যায়।

সরোজিনীর চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। আমরা সরোজিনীকে পরের চোখে দেখি—বিভিন্ন গ্রামবাসীর ঈর্ষ্যা, সন্দেহ, কৌতূহল ও সহানুভূতির ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। লেখক নিজ মন্তব্য ও সরোজিনীর আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা এই সমস্ত খণ্ড চিত্রগুলির মধ্যে ঐক্য আনিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাহার অন্তর-রহস্য অর্ধাবৃতই থাকে। তাহার অতর্কিতভাবে গ্রাম্যসমাজে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রহিয়াছে। গ্রামে আসিবার পূর্বেই তাহার বিবাহ যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার বৈধব্যের অভিনয় গ্রাম্যসমাজের উপর একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত হইতে পারে না। সমাজের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া সে যে সমস্ত সমাজ-বিদ্রোহী হৃদয়াবেগের প্রশ্রয় ও অবসর দিয়াছে, তাহাতে সমাজের চিরপ্রথাগত নৈতিক আদর্শকে উপহাস ও আঘাত করাই যে তাহার আসল উদ্দেশ্য তাহা নিঃসংশয়। দারোগা, হাকিম, আজিজ, প্রভৃতি গ্রাম্য-সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব তাহার চরিত্রের স্পর্ধিত দুঃসাহসিকতার প্রমাণ। তাহার ব্যবহারে সুরুচি ও শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘনেরও নিদর্শন সুপ্রকট। পক্ষান্তরে মিণ্টা ও প্রকাশের প্রণয়-ব্যাপারে সে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প ও অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়াছে তাহা তাহার চরিত্রগৌরবের পরিচয় দেয়। তাহার সম্বন্ধে আমাদের শেষ অভিমত মাস্টারের দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়-জড়িত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। লেখক (?) সরোজিনী-চরিত্রের হাস্যাস্পদ দিক্‌টাই ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর-বিরোধী বিকাশগুলিই পৃথক্‌ভাবে আমাদের নিকট ধরিয়াছেন—তাহার মর্মরহস্য,

ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। হাস্যরস-উদ্রেকের নিকট চরিত্রসৃষ্টি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি উপন্যাসটির সরস মৌলিকতা বিশেষভাবে উপভোগ্য।

(৩)

সাম্প্রতিক কালের স্ত্রী-ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু ও মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, বাণী রায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। উপরে নির্দেশিত সাধারণ লক্ষণগুলি তাঁহাদের উপন্যাসাবলীতে কম-বেশি প্রতিফলিত। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাঁহার অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিষয়ের অভিনবত্ব, বিশেষতঃ সৌন্দর্যের কল্পলোকসৃষ্টিতে তাঁহার অসাধারণ নিপুণতার জন্য কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবি করেন। আশাপূর্ণা দেবী ও প্রতিভা বসু বাঙালী জীবনের এই নব-প্রতিষ্ঠিত সাংসারিকতার চিত্রকররূপে প্রতিনিধিত্বমূলক আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। নূতন যুগের গার্হস্থ্য রূপবিন্যাসের সমস্ত বিক্ষুব্ধ অস্থিরতা, সমস্ত ছন্দবিপর্যয় তাঁহাদের রচনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাধিক্যে ও জীবন-পর্যালোচনার বিশিষ্টতায় আশাপূর্ণা দেবীই অগ্রবর্তিনী। তাঁহার ক্রমবর্ধমান উপন্যাসাবলীর মধ্যে অধিকাংশই পরিবার-জীবনের ভারসাম্যচ্যুতি ও অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধীয়। 'মিত্তির বাড়ী' (মার্চ, ১৯৪৭), 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা' (১৯৫২), 'কল্যাণী' (১৯৫৪), 'নির্জন পৃথিবী', 'শশীবাবুর সংসার' (১৯৫৬), 'অতিক্রান্ত', উন্মোচন' (১৯৫৭), 'জনম জনম কি সাথী' (১৯৫৮), 'নেপথ্যনায়িকা' (১৯৫৮), 'আংশিক', 'ছাড়-পত্র', 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল' (১৯৬০), 'যোগবিয়োগ' (১৯৬০), 'নবজন্ম' (১৯৬০), উপন্যাসগুলি বিষয়ের সামান্য সামান্য পরিবর্তনসত্ত্বেও মূলতঃ পরিবার-জীবনের প্রায় অভিন্ন সমস্যারই ছবি। কোন কোন উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের আকর্ষণ কিছুটা বিসদৃশভাবে মিশিযাছে; কোথাও বা রোমান্সের সুলভ বর্ণ-প্রক্ষেপ এই ধূসর, সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনিযাছে। কিন্তু লেখিকার জীবন-নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে।

'মিত্তির বাড়ী' বহু-পরিজন-সমবায়ে গঠিত একটি যৌথ পরিবারের চিত্র। গৃহকর্ত্রী হেমলতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ জা-এরা, 'অনেকগুলি ভ্রাতা ও তাঁহাদের স্ত্রী-সন্তান, কয়েকজন পিতৃগৃহাশ্রিতা বিধবা কন্যা ও এক সদ্যোবিবাহিতা তরুণ পুত্রবধূ—এইগুলি মিলিয়া এক বৃহৎ, জটিল শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত সংসার। বাহিরের এই শিথিল ঐক্য ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-কলহ-তীক্ষ্ণ বাক্যবিনিময় ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার অভিঘাতে সর্বদা বিড়ম্বিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র নর-নারী ব্যক্তিত্ব-চিহ্নাঙ্কিত, বাকী সকলে একান্নবর্তী পরিবারের আসবাব-পত্রের সামিল। উহাদের ভিড়ে পদে পদে হোঁচট লাগে, স্বচ্ছন্দবিচরণের স্থান সংকুচিত হয়। ব্যক্তিত্ববিকাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত-সংঘাতে বাঁকা-চোরা হইয়া উঠে। এক সংসারকে জানিলেই সব সংসারকে জানা হয়; উহাদের বহির্বিন্যাস এক আধটু ভিন্ন, অন্তঃপ্রকৃতি হুবহু এক। কখনও কখনও বাহিরের আগন্তুক আসিয়া পরিবারের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও তীব্র ও জটিল করিয়া তোলে। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের যে রূপ দেখা দেয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিকৃত। এমন কি উদার, আদর্শবাদী মনও এই গ্লানিময় পরিবেশে বৃথা সংগ্রামে আত্মক্ষয় করে ও সহজ,

প্রসার সার্থকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক চিত্তদাহকারী দাবানলে সমস্ত সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ঝলসাইয়া ফেলে।

'মিত্তির বাড়ী' উপন্যাসে যাহাদের কাহিনী খানিকটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে তাহারা অরুণেন্দু পাশের বাড়ীর ভাড়াটে শিক্ষয়িত্রী মীনা, অরুণেন্দুর স্ত্রী অলকা, গৃহকর্ত্রী হেমলতা ও আধুনিকতম দম্পতি মনোজ ও সুরেখা। বাকী সকলে ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ধূম্র-যবনিকার অন্তরালে তাহাদের ব্যক্তিসত্তা আত্মগোপন করিয়াছে। অরুণেন্দু মানব-প্রকৃতির যৌন আকর্ষণের রহস্যানুসন্ধানে রত। মীনা ও তাহার স্ত্রীর প্রতি তাহার আচরণ স্বাভাবিক নহে, গবেষণা-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কাজেই ইহার খেয়ালী মূল্য ছাড়া অপর কোন গভীরতর তাৎপর্য নাই। হেমলতা নিজ কর্তৃত্বাভিমানে সকলকেই কঠোরভাবে শাসন করেন, কাহারও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি কিছুমাত্র মর্যাদা আরোপ করেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার নাতবৌ সুরেখার প্রতি এই অনমনীয় শাসনব্যবস্থা প্রযোগ করিতে গিয়া যে অপ্রত্যাশিত দৃঢ় প্রতিরোধ পাইলেন তাহাতেই তিনি সংসার ছাড়িয়া গুরুদেবের আশ্রম-আশ্রয়ী হইলেন। সেখানে তিনি নানা উপেক্ষা-অবহেলা-অপমানের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ঘটনাচক্রে সুরেখার পিতৃগৃহে কযেকদিন আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন ও সেখানে নাতবৌ-এর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। সুরেখা শ্বশুরঘরে ফিরিয়া উহার সাবেক চাল-চলন বদলাইয়া দিল ও অবদমিত বাসনা-কামনার রুদ্ধদ্বার গৃহে আবার স্বচ্ছন্দবায়ুপ্রবাহের বাধাহীন পথ উন্মুক্ত করিল। মনে হয় মিত্তির বাড়ী এই নৈর্ব্যক্তিক সংস্কার আবরণ ভেদ করিয়া উহার অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর ব্যক্তিজীবনগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদালাভের পথ খুঁজিয়া পাইল।

'অগ্নিপরীক্ষা'—কতকটা পূর্ববর্তী যুগের নিরুপমা-অনুরূপা দেবীর দৃষ্টান্ত-প্রভাবিত। এখানে প্রাচীন অভিজাত পরিবারের জীবনাদর্শ ও উহাদের ভগবৎ-ভক্তির নিদর্শনরূপ দেবমন্দির-মহিমা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিযাছে. এই মন্দিরেরই ছায়াতলে, এক প্রাচীনপন্থী জমিদারের ভক্তহৃদযের একান্ত আবেগে বুলু ও তাপসী এই দুই কিশোর-কিশোরীর এক সম্পূর্ণ আকস্মিক পরিণয় সংঘটিত হইয়াছে। আধুনিককালের সম্পূর্ণ বিপরীত এই ঘটনা-পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী উহার বাধা-বিড়ম্বিত যাত্রাপথে পদক্ষেপ করিয়াছে। হেমপ্রভা চিত্রলেখার বিভিন্ন জীবনাদর্শপ্রসূত সংঘাত তাপসীর অদৃষ্টে দুশ্ছেদ্য জটিলতার পাশ জড়াইয়াছে। এ সমস্তই গতানুগতিক ধারার অনুবর্তন। কিন্তু মিঃ মুখার্জির ছদ্মবেশ-ধারী বুলুর সহিত তাপসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ হৃদয় সম্পর্কের উপস্থাপনায় লেখিকা প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। বুলু আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া ও অপরের ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার কৈশোর জীবনের বধূটির দাম্পত্য নিষ্ঠার যে পরীক্ষার আযোজন করিয়াছিল, তাহাই তাপসীর আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত হানিয়া তাহাকে মিলনের প্রতি বিমুখ করিয়াছে। যাচাই করিতে গিযা বুলু নিজেই ঠকিয়াছে। তাপসী নিজ মনকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে চাহিযাছে যে, তাহার স্বামীর প্রতি আকর্ষণে প্রণয়ীর প্রতি মোহ কতখানি জড়িত হইয়াছে, দাম্পত্য সম্পর্কের বৈধ আত্মনিবেদনের মধ্যে সে অজ্ঞাতসারে ব্যভিচারিণী-বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়াছে কিনা। শেষ পর্যন্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে যে অনিশ্চিত, দ্বিধা-

কণ্টকিত সম্পর্কের সূচনা হইয়াছিল, সেই দেবতার দৃষ্টির সম্মুখেই তাহাদের অসম্পূর্ণ মিলন পূর্ণ হইয়াছে।

'শশীবাবুর সংসার' (১৯৫৬) লেখিকার নিজস্ব জীবনবোধের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস। এখানে বহুপরিজনাকীর্ণ সংসারের পরিবর্তে আছে একটি এককেন্দ্রিক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। শশীবাবুর সংসারে বাইরের ভিড় নাই। একাধিক ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও আশ্রিত পোষ্যবর্গের একটি বিরাট, বেসামাল জনতা নাই। স্বামী, স্ত্রী, দুইটি পুত্র, একটি বিবাহিত ও আর একটি অবিবাহিত কন্যা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পরিবার গঠিত। কিন্তু এই কয়টি স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। বরং পরিধির সংকোচের জন্য সংঘর্ষের তীব্রতা ও মর্মজ্বালা আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যে বিরোধের বীজ মানুষের মনেই উপ্ত আছে শুধু আদর্শনিষ্ঠাহীন রক্ত-সম্পর্কের নৈকট্যের জন্যই তাহার কণ্টক উৎপাটিত করা যায় না।

আজ বাঙালী পরিবারের ইহাই একটি সাধারণ, মর্মান্তিকরূপে সত্য চিত্র। বিশেষতঃ আধুনিক যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্র আতিশয্য ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতি অসহিষ্ণুতার ফলে এই মতানৈক্য তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া সাংসারিক শান্তিকে বিধ্বস্ত করিতেছে। শশীবাবু, মন্দাকিনী, পরেশ, সুমিত্রা, রেখা, সীতেশ সকলেই ভাল-মন্দে মেশান, সাধারণ মানুষ। কেহই আচরণের দিক্ দিয়া একেবারে নিন্দনীয় নহে। অতি সামান্য কারণেই সংঘর্ষ বাধিতেছে, ক্ষোভ ও অসন্তোষের মাত্রা বাড়িতেছে পরস্পরের প্রতি অনুযোগ-অভিযোগ মুখর হইয়া উঠিতেছে। শশীবাবুর সহিত মন্দাকিনীর সংঘর্ষ সংসার-পরিচালনার খুঁটি-নাটি ও জীবনযাত্রার মান লইয়া, শশীবাবুর সহিত পুত্রবধূ সুমিত্রার বিরোধ আরও গভীর-কারণ-সঞ্জাত—জীবনাদর্শের পার্থক্য ও স্বাধীনতার অধিকার লইয়া। পরেশ ভীরু মানুষ, এই উভয় দিকের দ্বন্দ্বে খানিকটা বিব্রত ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই সে স্ত্রীর প্রভাবেই চালিত হয়। ছোট দুইটি ছেলে মেয়ের সমস্যা তত জটিল নহে—তাহারা নিজ নিজ জীবন-পরিচালনার স্বাধীনতা দাবি করে। মোট কথা, এই কয়টি মানুষের একত্রাবস্থানের ফলে যে ক্ষোভ, অতৃপ্তি ও সময় সময় গভীরতর বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে বাঙালী পরিবারের আদর্শগত ভিত্তিটারই সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগে। লেখিকার সমষ্টি-চিত্র সুনিপুণ, কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় আংশিক ও পরিবার-জীবনে উহাদের বিশিষ্ট স্থানের দ্বারা সীমাবিত। শশীবাবু, মন্দাকিনী চিরন্তন কর্তা ও গিন্নীর প্রতীক। তদতিরিক্ত তাঁহাদের আর কোন পরিচয় আছে কি না সন্দেহ। মুকুন্দবাবুই একমাত্র সজীব চরিত্র ও সংসার-বন্ধনের অতীত ব্যক্তি-পরিচয়ে উজ্জ্বল। মন্দাকিনীর স্থিরবুদ্ধির অভাব ও অহেতুক অভিমান-প্রবণতা, তাহার কতকটা আত্মকেন্দ্রিক, অপরের উপর প্রভাবহীন চরিত্রই যে সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্য অনেক অংশে দায়ী লেখিকা তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রীর অনুভূতির স্থূলতা ও নিয়ন্ত্রণশক্তির অপ্রাচুর্য সম্বন্ধে প্রৌঢ়া লেখিকা তীক্ষ্ণভাবে সচেতন—তাঁহার স্বজাতি-পক্ষপাত একেবারেই নাই। শেষ মুহূর্তে কাশীযাত্রায়

উদ্যোগী বৃদ্ধ দম্পতি আত্মীয়-পরিজনের অযাচিত স্নেহে সংসারের প্রতি আস্থা কিছুটা ফিরিয়া পাইয়াছেন।

'অতিক্রান্ত' ও 'উন্মোচন'-এ গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিকায় ব্যক্তি-হৃদয়-সমস্যাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রথমটিতে বন্ধুর গৃহে অতিথিরূপে স্থানপ্রাপ্ত এক সাহিত্যিক তরুণের সহিত গৃহস্বামিনী বন্ধু-পত্নীর প্রণয়োন্মেষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই তরুণী নিজস্ব ঘর বাঁধিবার লোভে শ্বশুর-শাশুড়ীর আপত্তি উপেক্ষা করিয়া, এমন কি একমাত্র ছেলেকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কলিকাতায় সংসার পাতিয়াছে। এই পূর্বকাহিনীর মধ্যে তাহার দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও আত্মসুখান্বেষী প্রকৃতির ইঙ্গিত মিলে। স্বামীর বন্ধুর প্রতি তাহার আকর্ষণ ও এই আকর্ষণের অপ্রতিরোধের তাগিদে গৃহত্যাগের সংকল্প ঠিক মনস্তত্ত্ব-মূলক বিশ্বাস্যতা লাভ করে নাই। সে যেন একটা হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগের জোয়ারে নিজ সংসারের নিরাপদ আশ্রয় ও পাতিব্রত্য-ধর্ম হইতে স্খলিত হইয়া এক লক্ষ্যহীন যাত্রায় জীবন-তরণীকে ভাসাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রণয়ীর অক্ষুন্ন আত্মসংযম ও কর্তব্যবোধের কল্যাণে সে দাম্পত্য জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লেখিকার বিশ্লেষণ-শক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা প্রশংসনীয়, কিন্তু মূলতঃ একটি অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির উপরই এই শক্তির প্রয়োগ অনেকটা অপব্যয়ের মতই মনে হয়।

'উন্মোচন এই ত্রুটি হইতে মুক্ত ও উচ্চতর রচনা কৌশলের পরিচায়বাহী। সদানন্দ উদার-হৃদয় স্বামী সুখময়, প্রৌঢ়া গৃহকার্যনিপুণা স্ত্রী মানসী, একমাত্র পুত্র উদাসীন ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন, কুটিল রাজনীতি-চক্রে বিভ্রান্ত পুত্র ফুলটুশ ও একটি স্নেহমমতাপূর্ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ বালক ভৃত্য কেষ্ট—এই চারিজনে মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র, দৃশ্যতঃ সুখী ও সমস্যাহীন পরিবার গঠিত। প্রৌঢ় দম্পতির ছুটি উপভোগের জন্য পুরী-প্রবাস-কালে এই শান্ত, প্রীতিপূর্ণ নিরুদ্বেগ পরিবারে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। মানসীর গার্হস্থ্য কর্তব্যে উৎসর্গিত জীবনে প্রফেসার সেনের প্রবাসমিত্ররূপে অনুপ্রবেশ প্রথম অস্বস্তিকর প্রেমানুভূতি জাগাইল। প্রৌঢ়া মহিলার সাংসারিক কর্তব্যের স্তূপীকৃত বোঝার তলে কোথায় যে প্রণয়-বিধুর, জীবন-রস-আস্বাদনে উন্মুখ, স্বপ্নবিভোর তরুণী-হৃদয় হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ আপনার বিস্মৃত পরিচয় খুঁজিয়া পাইল। অবশ্য আত্মসংযমে অভ্যস্তা, আত্মগোপনদক্ষা গৃহিণীর এই নবজাগ্রত প্রেম নিজ হৃদয় মধ্যে কঠোরভাবে নিরুদ্ধই রহিল। একটু নীরব আত্মজিজ্ঞাসা, একটু অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ও অন্যমনস্কতা, আচরণে একটু খামখেয়ালী দুর্বোধ্যতা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-কণারূপে অন্তরস্থ বহ্নিদাহের বার্তা বহন করিয়া আনিল। মানসীর চলচ্চিত্ততা ও উদ্‌ভ্রান্তির মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় চমৎকার হইয়াছে।

মানসীর পারিবারিক জীবনে সংঘাতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা তাহার স্বামীর সহিত নহে, তাহার পুত্রের সহিত। বরং তাহার স্বামী প্রফেসার সেনকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া ও তাঁহাকে নিয়মিত অভ্যাগতের আসন দিয়া তাহার এই যত্ননিরুদ্ধ হৃদয়-সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। সুখময়ের সরল, উদার মন মানসী বা তাহার প্রণয়ী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে নাই। তাহার মৃত্যুতে মানসীর বা প্রফেসার সেনের সম্পর্কের কোন নূতন পরিণতি ঘটিত না, যদি তাহার পুত্র ফুলটুশ ইহাকে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া ও

অবজ্ঞাপূর্ণ সন্দেহের চক্ষে না দেখিত। যখন মানসীর বৈধব্যের শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য একজন সমপ্রাণ সাথীর একান্ত প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময়েই রুক্ষপ্রকৃতি পুত্রের কুৎসিত ইঙ্গিত সাহচর্যকে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে রূপান্তরিত করিতে সহায়তা করিল। মানসী বারবার পুত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে প্রণয়ীকে বিদায় দিয়াছে, বারবার হিন্দু বিধবার কঠোর সংযমনিষ্ঠ জীবন-যাপনের চেষ্টা করিয়াছে। বারবারই পুত্রের অশালীন রূঢ় আচরণ তাহার এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে ও হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য প্রণয়ের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়াছে। পুত্রের সহিত সংঘাত, মানসীর দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার সংগ্রামক্লিষ্ট চিত্তের আত্মসমীক্ষা ও কর্তব্য-নির্ধারণ অতি সুন্দরভাবে, ত্রুটিহীন সত্যনিষ্ঠার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ পর্যায়ে মানসী দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটাইয়া অধ্যাপককে তাহার জীবন-সঙ্গী হইবার আহ্বান জানাইয়াছে ও আত্মীয়বর্গের সমস্ত ধিক্কারকে উপেক্ষা করিয়া তীর্থভ্রমণে তাঁহার সহচরী হইয়াছে। এই তীর্থযাত্রার মধ্যে তাহার নীতিবোধ আবার নূতন করিয়া মাথা তুলিয়াছে। সে চাহিয়াছে রাত্রিহীন দিন, নিবিড় মিলনের পরিপন্থী নানা মানুষের ভিড়। এই অস্বাভাবিক আচরণে সে নিজেকে যতটা ক্লিষ্ট করিয়াছে, ততোধিক তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সুহৃদকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত উভয়ে পূর্বস্মৃতিসমাকুল পুরীতে গিয়া মানসীর সদ্যোবিবাহিত পুত্র-পুত্রবধূর সাক্ষাৎ পাইয়াছে ও ইহাদের নিকট সুনাম রক্ষার জন্য পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহার পুত্রবধূর বাধাবন্ধনহীন খেয়ালী আবেগ কোন নিগূঢ় প্রভাবে মানসীর লোকাচার-সংযমিত, সতর্ক মনোভাবের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে ও সমুদ্রতটে তাহার বিনিদ্র, প্রবৃত্তিনিরোধজর্জর প্রণয়ীর দর্শন তাহার বরফ-জমা রক্তস্রোতকে উন্মত্ত, কূলভাঙ্গা বেগে প্রবাহিত করিয়াছে। বাঁধের প্রতিরোধে নদীবেগ আরও দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে ও মানসীর নানা বাধাবিড়ম্বিত সংশয়াকুল মনোভাব প্রণয়ের স্পর্ধিত ঘোষণায় সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়াছে।

প্রৌঢ়ার জীবন-পিপাসা ও প্রেম উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে হয় না। এখানে না আছে কিশোরীর ভাবমুগ্ধতা, না আছে তরুণীর উদ্দাম আবেগ। প্রৌঢ়ত্বের যে নিস্তরঙ্গ জীবন-নদীটি লৌকিক কর্তব্যের বালুকাতটে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া শীর্ণ প্রবাহে বহিয়া যায়, তাহার মধ্যে জোয়ারের উচ্ছ্বাস কেবল অদৃশ্য ঘূর্ণীচক্র রচনা করে, বাহির হইতে দৃশ্যমান কোন বর্ধিত স্রোতোবেগের অস্তিত্ব ঘোষণা করে না। বাঙলা সমাজে বিরল এইরূপ ঘটনার বর্ণনা করিতে হইলে, উহার বাহিরের রূপ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া কোন পূর্বনির্ধারিত আদর্শের অনুবর্তন করে না। প্রৌঢ়ার আত্মমর্যাদা ও পাঠকের সহানুভূতি বাঁচাইয়া ইহার কাহিনী লিখিতে গেলে খুব সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ ও কলাকৌশলের প্রয়োজন। লেখিকার উপন্যাস এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মানসীর প্রেমযাত্রার মধ্যে কোন কাঙালপনা নাই, কোন আত্মহারা আতিশয্য নাই, আছে কঠোর অবদমন-প্রয়াসের মধ্যে একটা মৃদু অন্তরজ্বালার অবিরাম দহন, একজীবনব্যাপী অভাব ও শূন্যতাবোধ। বর্ণবিরল গোধূলি-ছায়ায় লেখনী ডুবাইয়া, চাপা কণ্ঠস্বরের ফিসফিসানি সংকেতে এই হৃদয়-বিপর্যয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

সুখময়বাবুর উদার, আতিথেয়তাপরায়ণ চরিত্রটি উহার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও সরল জীবন-বোধ লইয়া চমৎকার ফুটিয়াছে। প্রফেসার সেন মানসীর ব্যক্তিত্বে অভিভূত ও খেয়ালে বিভ্রান্ত; তাঁহার ব্যক্তিত্ব নিষ্ক্রিয়। ফুলটুশ খানিকটা হেঁয়ালিই থাকিয়া যায়। তাহার পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা-বিদ্বেষ অনেকটা অকারণ বলিয়াই ঠেকে। লেখিকা যে তাহাকে ঠিক মত বুঝেন নাই তাহার প্রমাণ যে, তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাকে শিখার সহিত পরিণয়-বন্ধন স্বীকার করাইয়াছেন, তাহার বিশ্ববিদ্বেষ প্রেমের মায়া-স্পর্শে প্রশমিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে উপসংহারের পবিবর্তন লেখিকার কলাসঙ্গতিবোধের পরিচয় বহন করে। প্রথম সংস্করণে মানসী কাশীর স্নানাগার হইতে পলাইয়া গিয়া সমাজ-প্রচলিত নীতিবোধের দাবী মিটাইয়াছে। কিন্তু প্রৌঢ়া নায়িকার নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাদিগকে লেখিকার ভীরুতা ও অপ্রত্যাশিত পরিণতির প্রতি পক্ষপাতের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় সংস্করণে সমুদ্র-সৈকতে প্রণয়ীযুগলের মিলন চরিত্র-সঙ্গতি ও ঘটনার স্বাভাবিকতা উভয় দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'নির্জন পৃথিবী'-তে একান্নবর্তী পরিবারের পটভূমিকায় স্বরূপার জীবন-সমস্যা প্রধানভাবে আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য স্বরূপার জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা অহেতুক ও খেয়াল-প্রসূত মনে হয়। পরিবারের বিরোধিতা ও হিন্দুর ধর্মসংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া স্বরূপা ও অনিমেষের বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহের পরেই স্বরূপার মন অনিমেষের প্রতি বিমুখ হইল। ইহার পর দুর্ঘটনায় মৃত যে যুবকটির সহিত তাহার বাবা তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহার অশরীরী ভৌতিক প্রভাব তাহাকে আরও উন্মনা ও বহির্জগৎ-বিমুখ করিয়া তুলিল। শেষ পর্যন্ত সে অনিমেষের সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিয়া জ্ঞানচর্চায়, পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত রহস্য-উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করিল।

স্বরূপার পরিবর্তনে আকস্মিক ও খানিকটা দৈবপ্রভাবেরই প্রাধান্য—উপন্যাসের কার্য-কারণ শৃঙ্খলিত জীবনবোধের সহিত ইহা নিঃসম্পর্ক। যৌথ পরিবারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এখানে প্রধান কাহিনীর সহিত অতি শিথিলভাবে সংশ্লিষ্ট। নিরূপার ঠাকুরমা ও কাকা উহার কঠোর কর্তৃত্বাভিমানের প্রতীক। ইন্দুভূষণ ও অনুরূপার সুস্থ, সহৃদয় দাম্পত্য সম্পর্ক এই পরিবারের অনুচিত দাবির পেষণে সংকুচিত ও ম্লান—লেখিকা এই সম্পর্ক বিকারটি সুষ্ঠুভাবে, অথচ অসম্পূর্ণ পরিধির মধ্যে ফুটাইয়াছেন। ইহার সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক ও মনোবিকার-চিহ্নিত খণ্ডাংশটি ঘরজামাই বিধুশেখর ও পিতৃগৃহে স্থায়িভাবে আশ্রিতা মধুমতীর সহাবস্থানমূলক জীবনযাত্রা-সম্বন্ধীয়। এই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা পোষণ করে, অথচ একে অপরকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহার করে। উহাদের মধ্যে বিধুশেখরের আচরণের মধ্যে একটি বিকৃত আভিজাত্যবোধ ও দুর্বল ভাববিলাসের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অনুরূপার অলক্ষিত প্রভাব পরিবারের মধ্যে যে একটি শোভন শ্রী ও শিষ্টাচারের আবরণ টানিয়া দিয়াছিল তাহা অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার অন্তর্নিহিত ইতরতা ও স্বার্থ-সংঘাত বীভৎস নগ্নতার সহিত প্রকটিত হইল। এই অংশের বর্ণনায় লেখিকা অবিমিশ্র মানবচরিত্রজ্ঞানের ও পরিবারের সামগ্রিক সত্তা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

উপন্যাসের উপসংহারের জীবন-মন্তব্যে পারিপার্শ্বিকের সীমা-অতিক্রমকারী অসাধারণ মানবাত্মার আভাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

'নেপথ্যনায়িকা'-তে (১৯৫৮) পরিবার-প্রভাব একটু অল্পমাত্রায় সক্রিয়। রুগ্ন পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবী স্বামিসঙ্গ হইতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইয়াছে ও কনিষ্ঠা কন্যা পূরবী পরিবার-শাসনের তোয়াক্কা না রাখিয়া রাজনৈতিক প্রভাবের আকর্ষণে খেয়ালখুশি-মত জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। মাধবীর স্নেহ-প্রশ্রয়েই তাহার নিয়ম-না-মানা স্বেচ্ছা-চারিতা বাড়িয়াছে ও সে তাহার রুগ্ন পিতার প্রতি কর্তব্য পালনকেও অবহেলা করিয়াছে। পিতা ব্রজমোহন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া এক প্রকার আত্মকেন্দ্রিকতা ও অপরের প্রতি অবিবেচনার মেজাজই জীবননীতি-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই পটভূমিকায় পূরবীর সহিত বাসুদেবের পরিচয় হইয়াছে ও তর্কযুদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক অস্ত্রক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের মধ্য দিয়া এই পরিচয় প্রেমের অন্তরঙ্গতায় পৌঁছিয়াছে। পূরবীর মৌলিক ও নির্ভীক আচরণের চমকপ্রদ পরিচয় মিলে তাহার ভাবী শাশুড়ীর বাড়ী বহিয়া তাহার বিমুখতা জয় ও অনুমোদন-লাভের চেষ্টাতে। তাহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট হইলেও এই প্রথা-লঙ্ঘনের স্পর্ধিত দুঃসাহসকে খানিকটা অতিনাটকীয় বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্যন্ত সে জোর করিয়াই শাশুড়ীর সম্মতি আদায় করিয়াছে ও বিবাহের পথকে বাধামুক্ত করিয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসের জটিলতম সমস্যা হইল মাধবীকে লইয়া। সে বরাবর নেপথ্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে বলিয়া 'নেপথ্যনায়িকা' অভিধাটি তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্তের প্রতি তাহার মনোভাব রহস্যাবৃত্তি ও লেখিকা এই রহস্য-উন্মোচনে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বাসুদেবের প্রতি তাহার অবচেতন মনে যে গোপন অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে তাহাই হয়ত স্বামীর প্রতি তাহার দুর্বোধ্য আচরণের হেতু। মাঝে মধ্যে, এমন কি পূরবীর বিবাহ-বাসরে এই অন্ধ আকর্ষণ ঈর্ষ্যার আকস্মিক ঝলকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরেও শ্রীমন্তের সহিত পুনর্মিলনে সে যেন এক অদৃশ্য বাধা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু লেখিকা মাধবীর এই মনোবিকারের মূল আবিষ্কার করিতে ও তাহার মানস প্রতিক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হইয়াছেন—তাহার চরিত্ররহস্য নীরবতার দুর্ভেদ্য আবরণে অনধিগম্যই রহিয়া গিয়াছে। নার্সের সঙ্গে ব্রজমোহনের প্রণয়-সিঞ্চিত সম্পর্কটি অতিরঞ্জনের পর্যায় অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক হয় নাই। মোটের উপর এই উপন্যাসটি চরিত্র সৃষ্টি ও সমস্যাবিশ্লেষণে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই।

'যোগবিয়োগ'-এ (১৯৬০) পারিবারিক চিত্রের গঠন একই রূপ—পেনসন-প্রাপ্ত বাবা ও সংসারভার হইতে শিথিল-মুষ্টি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিহীন রূঢ়তা, ভাইদের মধ্যে খানিকটা চাপা প্রতিযোগিতা ও বধূদের মধ্যে খোলাখুলি ঈর্ষ্যা ও মন-কষাকষি, আর আত্মীয়-আশ্রিতের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা ও গলাধাক্কা দিবার ব্যস্ততা। এই পরিবেশে আশ্রিত ভাগিনেয় গোবিন্দের চরিত্রই একটা অসাধারণ ব্যতিক্রম। মামা-মামীর প্রতি ভক্তি-মমতায়, তাহাদের সেবা-যত্নের আন্তরিকতায় সে তাহার মামাতো ভাইদের সঙ্গে সমকক্ষতার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন অপমানকেই গায়ে মাখে নাই, এমন কি গৃহ হইতে বহিষ্কারের

আদেশকেও অবহেলায় উপেক্ষা করিয়াছে। পরিবেশ-চিত্রের একঘেয়ে ধূসরতার মধ্যে গোবিন্দ-চরিত্রই একটু রং-এর স্পর্শ ও অদম্য প্রাণ-শক্তির ঝলক।

'নবজন্ম'-এ (১৩৬০) পরিবার-প্রতিবেশের মধ্যে একটু বৈচিত্র্যের স্পর্শ দেখা যায়। শশধর ঘোষালের ঈর্ষ্যা-বিকৃত মনোভাব কতকটা তার স্ত্রীর প্রভাবে, কতকটা অবস্থাচক্রে কেমন করিয়া নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা তাহারই কাহিনী। ইহার নূতনত্ব হইল গৌরাঙ্গ ও বাসন্তীর (বৌদিদি-ঠাকুরজামাই-এর) সৌহার্দ্যস্নিগ্ধ নির্দোষ প্রীতি-সম্পর্ক-বর্ণনায়। এখানে পরিবারগণ্ডী-বহির্ভূত যাত্রার পালা-রচয়িতা ভাবময় ষ্টেশনমাষ্টারের চরিত্রটি মনে একটি নূতন স্বাদুতার সঞ্চার করে। অবশ্য গৌরাঙ্গের মিথ্যা খুনের অভিযোগে ফেরার হওয়ার কাহিনী ও তাহার প্রতি ধনী বিধবার প্রণয়-সঞ্চার রোমান্স-কাহিনীর অবিশ্বাস্যতা-স্পৃষ্ট। মাঝে মধ্যে মন্তব্যের ভিতর মননশীলতার নিদর্শন মিলে। কিন্তু কাহিনী-উপস্থাপনায় অনুভূতির নিবিড়তা নাই; ইহা যেন অনেকটা রোমান্সধর্মী ভ্রমণকাহিনী-জাতীয় আখ্যান।

'সমুদ্র নীল আকাশ নীল' (১৯৬১) কিছুটা নূতন ধরণের উপন্যাস। এখানে বাস্তব পরিবার-চিত্রের সঙ্গে একটা অসাধারণ পরিস্থিতির সংযোগে স্বাদবৈচিত্র্য-সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও আপনার মতে অনমনীয়রূপে দৃঢ় লোকমোহন তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ শ্রাবণীর পুনর্বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহার কারণ যে, তিনি পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য নিজেকে কতকটা দায়ী মনে করেন ও পুত্রবধূকে সংসার-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তাঁহার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বিবেচনা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়া চন্দ্রাপীড় নামে একটি শিল্পবিশারদ জাপান-প্রত্যাগত তরুণকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন ও শ্রাবণীকে তাহার সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রাবণীর অসহযোগিতায় এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে—বয়ঃকনিষ্ঠ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি তাহার প্রণয়ের পরিবর্তে ভ্রাতৃস্নেহ স্ফুরিত হইয়াছে। শ্রাবণী লোকমোহনের সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার্জনে ব্রতী হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অনেক বোঝাপড়ার পর শ্রাবণী নির্জন ডাক্তারের প্রেমনিবেদনে সাড়া দিয়াছে। এই উপন্যাসে গার্হস্থ্য প্রথার বজ্রমুষ্টি অনেকটা শিথিল হইয়াছে—কেননা ইহার প্রতিনিধি চিররুগ্না গৃহিণী অনসূয়া ও আশ্রিত ভাগিনেয় অনাদি তাহাদের সমস্ত ঈর্ষ্যা-সন্দেহ ও ক্ষোভ-অনুযোগ সত্ত্বেও গৃহকর্তা দৃঢ়চেতা লোকমোহনকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। এখানে উপন্যাসের প্রকৃত প্রাণকেন্দ্র সংসারযন্ত্রের বৃথা চক্রাবর্তনে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় নাই। লোকমোহন তাহার একজিদে প্রকৃতি ও অটল সংকল্পের জন্য তাহার উদ্ভট অসাধারণত্ব সত্ত্বেও প্রাণবন্ত হইয়াছে। সে শ্রাবণীর উপর তাহার বজ্রকঠিন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত উহার শ্রেষ্ঠতর মনোবল ও নীতিনিষ্ঠার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। শ্রাবণী চরিত্রও খুব গভীরভাবে পরিকল্পিত না হইলেও মোটামুটি তাহার স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্মরণীয় হইয়াছে।

আশাপূর্ণা দেবীর পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে 'আংশিক' ও 'ছাড়পত্র' 'উন্মোচন'-এর সহিত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 'আংশিক'-এ সংসারজীবনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য একান্তভাবে আগ্রহশীল, মুক্তিকামী নারীর খাঁচার লৌহশলাকার বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম ও উহাতে আংশিক বিজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন,

গলস্‌ওয়ার্দির ফরসাইট পরিবারের ইতিহাসে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিপরিচয়ের অতিরিক্ত একটা সাংকেতিক সত্তা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, এখানেও তেমনি ক্ষুদ্রতর পরিধিতে সুবর্ণলতার আমৃত্যু সংগ্রামে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ সাংকেতিক তাৎপর্যমহিমা আভাসিত। লেখিকার সমস্ত রচনার মধ্যে যে পুঞ্জীভূত তথ্য-সন্নিবেশ হইয়াছে, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত-সংঘাত শ্বাস-রোধী ধূম্রজাল বিকীর্ণ করিয়াছে তাহা এই উপন্যাসে একটি কেন্দ্রসংহত ব্যঞ্জনায়, মানবাত্মার এক সার্বভৌম প্রকাশে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ নারী-বিহঙ্গীর সমস্ত অশান্ত ডানার ঝটপটানি, সমস্ত রক্তস্রাবী মুক্তিব্যাকুলতা সুবর্ণলতার ক্ষুদ্র, ঘটনা-বিরল জীবনে যেন একটি অধ্যাত্ম সাধনার মহিমা অর্জন করিয়াছে। পটভূমিকা-বিন্যাস চিরপ্রথা-গত ধারারই অনুবর্তন করিয়াছে। সেই একই যান্ত্রিক মূঢ়তায় নির্মম গৃহকর্ত্রী মুক্তকেশী, সেই মাতার অতিবাধ্য সুবোধ ছয় সহোদর, সেই পাঁচ বধূর অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গোপন ঈর্ষ্যা ও হিংসাপ্রবাহ, ছেলেপিলের সেই স্থূল, বিরক্তিকর জনতা। এই পরিচিত পরিবেশে অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় রুদ্ধ রোষে কম্পিত, অন্ধ আবেগে দুর্বোধ্য, অবিচলিত সংকল্পে সমস্ত পৃথিবীর বিরোধিতার সম্মুখীন সুবর্ণলতা শুধু কলিকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের এক অখ্যাত গৃহস্থবধূ নহে, সে এক শাশ্বত মানব আকৃতির প্রতিনিধি। তাহার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ স্ফুরিত, প্রতিবাক্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ। শাশুড়ী, স্বামী, ভাশুর, পিতা-মাতা যাহারই নিকট হইতে নিজ সত্তার স্বচ্ছন্দবিকাশবিরোধী, আত্মমর্যাদাহানিকর কোন আচরণ আসিয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে সে আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়াছে। সে সমস্ত সেকেলে প্রথাকে লঙ্ঘন করিয়া বই পড়িয়াছে, এমন কি আত্মজীবনীও লিখিয়াছে। দর্জিপাড়ার সঙ্কীর্ণ, নিরানন্দ গলিতে, যৌথ পরিবারের লৌহ নিয়মের পেষণের মধ্যে, প্রচলিত সামাজিক প্রথার মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাহার মুক্তিসাধনায় একাগ্র আত্মা আপনার অদম্য প্রাণশক্তিকে আরও তেজস্ক্রিয় করিয়াছে।

কিন্তু তথাপি একটা করুণ ব্যর্থতাবোধ এই উপন্যাসের চরম ফলশ্রুতি। যে আত্মা চির-কাল সংগ্রাম করিয়াই কাটাইল, সে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। এই অবিরত ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার দেহ-মনের লাবণ্য অপচিত হইয়াছে; জীবনে সৌন্দর্য-প্রতিষ্ঠার আগ্রহাতিশয্যে সে নিজেরই সুষমাবোধ হারাইয়াছে। তাই যখন সুবর্ণ নিজের স্বাধীন সংসার পাতিল তখন সে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিল না। অসুরদলনী কালী কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিতে রূপান্তরিত হইল না। তাহার রণক্লান্ত, আগুনের আঁচে ঝলসান মন সমস্ত সংসারের প্রতি আস্থা হারাইল। উহার মাধুর্য-আস্বাদন ও সৃষ্টির শক্তি তাহার বিলুপ্ত হইল। স্বামীর সহিত একপ্রাণতা, সন্তানের প্রতি অনাবিল স্নেহ, সংসার-চক্রের কর্কশ আবর্তন-নির্ঘোষকে সঙ্গীত-মাধুর্যে পরিণত করার সাধনা সহজ স্ফূর্তির অবসর পাইল না। তাহার মরণের শোভাযাত্রা-সমারোহ, সংসার-যুদ্ধে বিজয়িনী নারীর প্রতি আত্মীয়-বান্ধবের উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা-নিবেদন, তাহার আশাতীত সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষ্যামিশ্রিত প্রশস্তি-জ্ঞাপন—সব কিছু ঐশ্বর্যাড়ম্বরের আড়ালে এক রিক্ত, শূন্যতাপীড়িত মানব-হৃদয়ের নিঃসঙ্গ বেদনা চিরবিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এইখানেই জীবনের ট্রাজেডি; যে জীবনে সর্বার্থসাধিকা অন্নপূর্ণা হইতে পারিত সে জীবনলক্ষ্মীর নিকট কেবল মুষ্টিভিক্ষা পাইয়াছে। তাহার

সফলতা সর্বাঙ্গীণ হইতে আংশিকে পর্যবসিত হইয়াছে। এই সামান্য আখ্যানটি লেখিকার উপস্থাপনা-কৌশলে, সার্থক মন্তব্য-সংযোগে ও অদ্ভুত ব্যঞ্জনা-আরোপ-দক্ষতায় এক অসামান্য মর্যাদালাভ করিয়াছে।

'ছাড়পত্র' উপন্যাসটি সাম্প্রতিক যুগে আইনসিদ্ধ বিবাহ-বিচ্ছেদের কাহিনী। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, যে সমস্যা বাঙালী জীবনে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অভাবনীয় ছিল, তাহা কিরূপ অবলীলাক্রমে উহার দৈনন্দিন জীবনপরিক্রমা ও ভাবপরিমণ্ডলের স্বাভাবিক ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। এখানেও একান্নবর্তী পরিবারের স্থূল রুচি ও অনুদার বিচারবুদ্ধি এক অসাধারণ সমস্যাকে জটিলতর ও উহার সমাধানকে দুরূহতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এখানে সমস্যাটি পরিবার-জীবনোদ্ভূত নহে, বাহির হইতে সংসার-মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। সৌরেশ ও সুচেতার দাম্পত্য-জীবন কিরূপ সামান্য কারণে ভাঙিয়া গেল, মতভেদ কিরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আদালতের গ্লানিকর পরিবেশে, আইনবিশারদদের কূটকৌশল-পরিচালিত তথ্যবিকৃতি ও হীন উদ্দেশ্য-আরোপের জাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া বে-আব্রু বিবাহবিচ্ছেদে পরিণতি লাভ করিল, তাহাই উপন্যাসে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সুচেতার বাপের বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ, সেখানে তাহার কুমারী-জীবনের পূর্বস্থানটিতে ফিরিয়া যাওয়ার অক্ষমতা, তাহার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে অন্যান্য পরিজনবর্গের বক্রকটাক্ষ ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা অশালীন জল্পনা-কল্পনা প্রভৃতি দাম্পত্যসম্পর্কচ্ছেদের পারিবারিক প্রতিক্রিয়াসমূহের বর্ণনা বিশেষ সরস ও উপভোগ্য। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান ব্যাপার হইল বিচ্ছিন্ন দম্পতির পারস্পরিক মনোভাব ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পর্কিত। সৌরেশ গোড়া হইতে সুচেতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র ও লোলুপ। সে যখন তখন তাহার বাপের বাড়ী গিয়া তাহার প্রসন্নতা অর্জন করিতে চাহিয়াছে। এই স্বয়ংদৌত্য-কার্যে সে নিজ ব্যক্তিগত অপমানকে স্বচ্ছন্দে বরণ করিয়াছে। সুচেতার প্রতিক্রিয়া আরও জটিল ও পরস্পরবিরোধী-উপাদান-গঠিত। বাপের বাড়ীর জীবন তাহার পক্ষে যতই অসহনীয় হইয়াছে, অবলম্বনহীন শূন্যতাবোধ যতই তাহাকে গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করিয়াছে, ততই সে তাহার বিধ্বস্ত দাম্পত্য জীবনের মর্যাদা ও নিশ্চিন্ত নির্ভরতার প্রতি সচেতন হইয়াছে। সে সৌরেশকে চাহিয়াছে, দুর্বার হৃদয়াবেগের প্রেরণায় নহে, তাহার দুঃসহ ক্লান্তি ও লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তির প্রতিষেধকরূপে। আকর্ষণ আসিয়াছে সৌরেশের দিক হইতে, আর সুচেতা বিপরীতদিকের আশ্রয়ের অভাবে ধীরে ধীরে, দ্বিধাগ্রস্ত, কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সেই আকর্ষণের অভিমুখে আগাইয়া গিয়াছে। এইভাবে আদালত যাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, মানব মনের স্বাভাবিক গতি ও বিরুদ্ধ মনোভাবের ক্রমিক শক্তি-হ্রাস তাহাদের পুনর্মিলন ঘটাইয়াছে। লেখিকার কৃতিত্ব কোন গভীর, দুর্দম আবেগের চিত্রণে নহে, বাঙালী-সমাজে স্বল্প পরিচিত একটি পরিস্থিতির, উহার জটিল মানস ঘাত-প্রতিঘাতের একটি সুস্থ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও যথাযথ-মন্তব্য-সমর্থিত উপস্থাপনায়।

'বলয়-গ্রাস' ও 'জনম জনমকে সাথী' আশাপূর্ণা দেবীর দুইখানি অনভ্যস্ত বিষয়-সম্বন্ধীয় উপন্যাস। প্রথমটি ত তিনি অভিজাত জীবনের একটি রোমাঞ্চকর, গোপন কলঙ্ক-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। উপন্যাসের ঘটনাগুলি একটি আত্মপরিচয়হীন, মাতৃস্নেহবঞ্চিত বালিকা শিশুর রুদ্ধ-অভিমান-আবিল, অবোধ-বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির মাধ্যমে এক অর্ধস্পষ্ট

রহস্যময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব অনুমান ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির দ্বারা পূরণ করিলে ঘটনার ধারণা যে আলো-আঁধারি সংশয়-কুহেলিকার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, লেখিকা সুকৌশলে টুনির মনোলোকে সেইভাবে সত্যোপলব্ধির উন্মেষ ঘটাইয়াছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব ও কল্পনার একটি চমৎকার রূপ এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। টুনি নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া যৌবন-পরিণতিতে পৌছিয়াছে, কিন্তু তাহার শৈশব জীবনের মনোবিকার ও আত্মনিরোধ-প্রবণতা তাহার সুস্থ জীবনবোধ বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। শৈশবের তীব্র স্নেহবুভুক্ষার সময় যে মাতা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে, পরবর্তী কালে তাহার ব্যাকুল আলিঙ্গনপাশে সে ধরা দেয় নাই। মহালক্ষ্মী তাঁহার দাম্ভিক কর্তৃত্ব ও অধিকারবোধ লইয়া হঠাৎ উপন্যাস হইতে বিলীন হইয়াছেন। জ্যোতিপ্রকাশ ও মণির মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসমধ্যে তাঁহার কাজ ফুরাইয়াছে। যে দুর্দম জেদের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তানেব সুখ বিসর্জন দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সেই জেদের যখন মর্যাদা রক্ষা হইল না, তখন কোন স্নেহ-বন্ধন তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মণির বিবাহোত্তর জীবনের সহিত তাহার রোগজীর্ণ, শয্যাতলশায়ী জীবনের একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। তাহার অসুখ সারিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি চিরদিনের জন্য দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

টুনির চরিত্রে শৈশবের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার ছাপ বরাবর রহিয়া গিয়াছে। একটা অবদমিত আতঙ্ক, একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর তাহার পরবর্তী জীবনের নানা বিচিত্র পর্যায়ে একটি দুরারোগ্য অন্তরক্ষতের বেদনাভূতি অঙ্কিত করিয়াছে। উপন্যাসমধ্যে যে অতিনাটকীয় ছায়াচিত্র-সুলভ উপাদান আছে তাহা টুনির চরিত্র-সূত্র-বিধৃত হইয়া স্বাভাবিকতা ও কলা-বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে।

'জনম জনমকে সাথী' যেমন কাহিনীর দিক দিয়া ছায়াচিত্র-লোকনিবাসী, তেমনি উপন্যাস-কলার দিক দিয়াও সিনেমাধর্মী। যাঁহার রচনা গার্হস্থ্য জীবনের অতিবাস্তব ভূমিকায় কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, তিনিও যে কখনও কখনও শুধু সিনেমার বিষয় অবলম্বন করেন তাহাই নয়, সিনেমার তরল আকস্মিকতা ও অতিনাটকীয়তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এখানে লেখিকা সুলভ ভাববিলাস ও গণরুচিকে তাঁহার উপন্যাসের প্রেরণা-শক্তির মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

'মুখর রাত্রি' (জুলাই, ১৯৬১) আশাপূর্ণা দেবীর ঔপন্যাসিক শিল্পসাধনায় গভীরতর স্তরপরিবর্তনের নিদর্শন। যাঁহার কাহিনী গার্হস্থ জীবনের স্বল্পবন্ধুর সমতলভূমির বা উৎক্রমণশীল অতিনাটকীয় ভাবোচ্ছ্বাসের হঠাৎ চড়াই পথের অনুসারী ছিল, তাহা এই উপন্যাসে এক ভয়াবহ সম্ভাবনার চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া নিয়তির এক অলঙ্ঘ্য বিধানে তীব্র নাটকীয় সংঘাতে আপনাকে উদ্‌ঘাটিত ও নিঃশেষিত করিয়াছে। এক জীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত অভিজাত পরিবারের জীবননীতিবিপর্যয়ের বিষদিগ্ধ কাহিনী উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। এই বিষবাষ্পজর্জর কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির জবানীতে, আশ্চর্য-তীক্ষ্ণ নাটকীয় ভঙ্গীতে। মাতা সুখলতা- তাহার অকর্মণ্য মোমের পুতুল স্বামী শচীপতি, বাড়ীর মালিক শচীপতি মামাতো ভাই ও সুখলতার অবৈধ প্রণয়পাত্ররূপে পরিবারমণ্ডলে

পরিচিত রোগে পঙ্গু মণ্টু দেবরায়, সুখলতার তিন কন্যা বিরজা, নীরজা ও সরোজা ও দুই পুত্র দেবেশ ও অনিলেশ, বৈকুণ্ঠ চাকর ও চারুদাসী ঝি, এমন কি পুরান বাড়ীর জরাজীর্ণ দেওয়ালটা পর্যন্ত এই মনোবিকারপুষ্ট পারিবারিক নাটকের দ্রষ্টা ও অংশগ্রহণকারী। এই পরিবারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্বন্ধে নিবিড় ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে, কিন্তু ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর সকলেই সুখলতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষে কানায় কানায় পূর্ণ। সুখলতাকে তাহারা সকলেই ব্যভিচারিণী মনে করে, মণ্টুর প্রতি অবৈধ আসক্তির মূল্যস্বরূপ সে তাহার সিন্দুকের চাবিকাঠিটি হাত করিয়াছে ও সংসারের অসপত্ন গৃহিণীত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সংসার চালাইবার জন্য অপদার্থ স্বামী ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের মানুষ করিবার জন্যই সে এই অমর্যাদা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অথচ তাহার সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুঃখ এই যে, যাহাদের জন্য সে হীনতার নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে তাহাদের কাহারও ভালবাসা এমন কি কৃতজ্ঞতার কণামাত্রও পায় নাই।

প্রত্যেক চরিত্রই এই নাটকের বিভিন্ন অংশের উপর নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুমানজাত আলোকপাত করিয়াছে। তিন মেয়ের চরিত্র আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। বিরজা শান্ত, বিষণ্ণ, নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ ও নিজ অদৃষ্টের নিকট অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণকারী। মেজ মেয়ে নীরজা যেন জলন্ত অগ্নিশলাকার ন্যায়, সকলেরই সুখের ঘরে আগুন দেওয়াই তাহার প্রবলতম প্রবৃত্তি। তাহার মা ও বোনদের বিষয়ে তাহার ঈর্ষ্যা ও হিংসা চরম পর্যায়ে উঠিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া তাহার তীব্র অসহিষ্ণু মেজাজ চাপা গর্জনে ফুটিয়াছে। সরোজার প্রণয়-সৌভাগ্যে তাহার ঈর্ষ্যা সমস্ত শালীনতার সীমা ছাড়াইয়াছে। অভিশপ্ত বংশের সমস্ত বিষ যেন তাহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছে। ছোট মেয়ে সরোজা বংশের অভিশাপ এড়াইবার জন্য একজন অনভিজাত তরুণের সহজ আনন্দময় সুস্থ প্রণয়কে প্রতিষেধকরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত এই প্রাকৃতবংশোদ্ভব প্রণয়ীর হাত ধরিয়াই সে পূর্বজীবনের গ্লানিময় পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া নূতন সংসারপথে পা বাড়াইয়াছে। মেয়েদের সহিত তুলনায় ছেলেদের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য অপরিস্ফুটই আছে ও কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের সংযোগও খুব স্বাভাবিক হয় নাই।

সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আলোকপাত হইয়াছে শচীপতি ও মণ্টুর আত্মকথায়। ইহারা বঞ্চিত হইলেও কেহই প্রবঞ্চিত নয়। শচীপতি নীরব ও নিষ্ক্রিয় হইলেও নির্বোধ নয়। তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার যে মনোভাব তাহা সম্পূর্ণভাবে সপ্রশংসস্বীকৃতিমূলক, অনুযোগাত্মক বা অভিমানক্ষুব্ধ নহে। বাড়ীর দেওয়ালের যতটা উত্তাপ-অনুভূতি আছে, এই প্রস্তরীভূত মানুষটার বোধ হয় তাহাও নাই। সে নিশ্চিন্ত আরামের জন্য সর্ববিধ মানবিক উৎসাহ-কৌতূহল-কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত। তাহার ছোট মেয়ের পলায়ন তাহার নিকট কেবল অনুমানের ব্যাপার, কোন ভাব বা কর্মপ্রেরণার উৎস নহে। তাহার স্ত্রীর আত্মহত্যা তাহার এই পাষাণোপম জড় নির্বিকারতাকে কিছুটা যে বিচলিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ তাহার স্ত্রীর হত্যাকারী বলিয়া পুলিশের নিকট মিথ্যা স্বীকৃতি। সুখলতার আত্মহত্যার পূর্বে মানস প্রতিক্রিয়া ও আত্মহত্যার পর পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির আচরণ-বিমূঢ়তা একমাত্র

দেওয়ালের সাক্ষ্যেই জানা যায়। সুখলতার মৃত্যুর পর শচীপতির প্রথম সক্রিয়তার নিদর্শন রোগপঙ্গু মণ্টুর অসহায়তায় তাহার উদ্বেগপ্রকাশ ও তাহার প্রতি কিছুটা সস্নেহ নির্দেশ।

মণ্টুর আত্ম-উদ্ঘাটন আরও অভাবনীয় ও সুখলতার স্বরূপনির্ণয়ে সহায়ক। আশ্চর্য স্বচ্ছদৃষ্টির সাহায্যে সে তাহার প্রতি সুখলতার প্রণয় যে সম্পূর্ণ অভিনয় ও তাহার সত্যিকার ভালবাসা যে স্বামীর প্রতি নিবদ্ধ তাহা অনুভব করিয়াছে। এমন কি তাহার ছদ্মপ্রেমের অভিনয়ের আড়ালে সে যে বিষপ্রয়োগে তাহার জীবনান্ত করিতে পারে এ সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। তথাপি প্রণয়াভিনয়ও তাহার বঞ্চিত, বুভুক্ষু জীবনের পক্ষে উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং সব জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে মেকীকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। মণ্টু চরিত্রের এই অপ্রত্যাশিত বিকাশই উপন্যাসের নাটকীয়তা ঘনীভূত করিয়াছে।

বৈকুণ্ঠ ও চারুদাসীর নিকট আমরা যতটা ভিতরের খবর প্রত্যাশা করিতে পারিতাম তাহা পূর্ণ হয় নাই। ইহারা সাবেকী জমিদারবাড়ীর গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র, উপন্যাসের সম্পর্ক-রহস্য উন্মোচনের বাহন নয়। বৈকুণ্ঠ মণ্টুর বাল্যজীবনের ঘটনা কিছুটা জানাইয়াছে কিন্তু চারুদাসী একেবারে অপ্রয়োজনীয়। মনে হয় লেখিকা পরিচারকসম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ব ও সংলাপ বিষয়ে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির দাবী করিতে পারেন না।

দেওয়াল অপ্রত্যাশিতভাবে সজীব চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মাধ্যমে আমরা সুখলতা ও মণ্টুর সম্পর্কের আসল রূপটি জানিতে পারি। এই সম্পর্কের সেই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, অপরের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা সীমিত ও বিদ্বেষের দ্বারা বিকৃত। সুখলতার অন্তিম মুহূর্তের চিন্তা ও কার্যগুলি, আত্মহত্যার পূর্বে তাহার ক্ষীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার মৃত্যুর আবিষ্কারের পর পরিবারস্থ সকলের ঔদাসীন্য—ইহাদের প্রত্যক্ষ বিবরণ আমরা দেওয়াল ছাড়া আর কাহারও নিকট পাইতাম না। জীর্ণ, পুরুষানুক্রমিক ভোগলিপ্সা ও অপরাধ-বোধে গুরুভারপিষ্ট অট্টালিকায় যে জুগুপ্সিত সমস্যার অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল, তাহারই একটি অংশ সেই অঙ্কুরের বিষবৃক্ষে পরিণতি-প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষক ও বিবৃতিকার।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই উপন্যাসে লেখিকা নূতন শক্তি ও শিল্পচেতনার পরিচয় দিয়াছেন। একটি পরিবারের নিঃস্নেহ, বিদ্বেষকলুষিত, নীতিভ্রষ্ট জীবনকাহিনী উপস্থাপিত হইয়াছে সরলরেখ বিবৃতির মাধ্যমের পরিবর্তে, আভাস-ইঙ্গিতময়, তীব্র নাটকীয় সংঘাতে চঞ্চল, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসমবায়ে দৃশ্যমান ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে। প্রতি পাত্র-পাত্রীর উক্তির ভিতর দিয়া উহাদের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য ও মনোভাবের পার্থক্য ক্ষুরধার অভিব্যক্তি পাইয়াছে ও প্রাণস্পর্শে উত্তপ্ত ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ কাহিনীতে অতিনাটকীয়তার বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না। আখ্যানটির ভিত্তিভূমি স্বীকার করিলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা উহার অবশ্যম্ভাবী নাটকীয় পরিণামরূপেই প্রতিভাত হয়। উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে উত্তপ্ত বিষরাশির ন্যায় মনোবিকারের বীজাণুপূর্ণ পরিবারজীবন হইতে এইরূপ উত্তেজনাময়, নাট্যগুণসমৃদ্ধ সংঘাতই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইবে।

'উত্তরণ' (১৩৭০) একখানি সমস্যাধর্মী গার্হস্থ্য জীবনের উপন্যাস। এখানে লেখিকা কুসংসর্গের প্রভাবে চৌর্যকার্যে ধৃতা এক তরুণীর জীবন-ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। বাড়ীর গৃহিণী তাহার পূর্ব কাহিনী শুনিয়া তাহাকে যে শুধু ক্ষমা করিয়াছেন তাহা নহে, তাহাকে

গৃহস্থালীতে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়াছেন ও কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে পালিত কন্যার স্নেহ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা এরূপ অপাত্রন্যস্ত বিশ্বাস-স্থাপনের সমর্থন করিতে পারে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা মাতার মতেই মত দিয়াছে। এদিকে চৈতালিকে লইয়া দুই ভাই কৌস্তভ ও কৌশিকের এক নীরব প্রতিযোগিতা জাগিয়াছে ও বড ভাই-এর স্ত্রী চিররুগ্না অপর্ণা এক অদ্ভুত ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত গহনাচুরির অপবাদে চৈতালি আশ্রয়ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। লেখিকা এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার একটি সন্তোষজনক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। চৈতালির সমস্যা ঠিক সহজভাবে তাহার জীবন হইতে উদ্ভূত নয়, তাহার উপর কৃত্রিমভাবে আরোপিত। তাহার নিজের সমস্ত আচরণ ও তাহার প্রতি অনুষ্ঠিত পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির আচণের মধ্যে কোথাও স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দ অনুভূত হয় না, সবই তাহার উপর কৃত্রিমভাবে আরোপিত পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনে হয়। তাহার পূর্বজীবনের গ্লানি ও পরবর্তী জীবনের অনিশ্চয়তা—কোনটাই বাস্তবতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই। লেখিকা লিপিকৌশল ও মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যের দ্বারা একটা মূলতঃ অবিশ্বাস্য ঘটনাকে যতদূর সম্ভব বাস্তব প্রতিচ্ছবি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রয়াস যতটা প্রশংসার উদ্রেক করে ততটা বিশ্বাসের উদ্রেক করে না।

'প্রেম যুগে যুগে' (আশ্বিন, ১৩৭১)—স্বাধীন প্রেমের প্রকরণ এবং জীবনে উহার স্থান যুগে যুগে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে, তিন পুরুষের জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে তাহারই একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লেখিকা এই উপন্যাসে দিয়াছেন। স্নলতা—আধুনিকার ঠাকুরমা সুখলতা ও সুখলতার মেয়ে চারুলতাও কুমারী-বয়সে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু ইহাদের ক্ষেত্রে সমাজবিধির একান্ত বাধ্য অভিভাবকগোষ্ঠীর কডা শাসনে এই কৈশোর প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছিল ও হবু-প্রেমিকারা অভিভাবকদের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া সংসারজীবনের দায়িত্বকে বেশ শান্ত-প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছিল। বরং দেখা গেল যে, এক যুগের রোগিণী পর যুগে ওঝার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মেয়ের এই চিত্তচাঞ্চল্যকে কঠোর হস্তে দমন করিযাছে। অবশ্য এই অতীত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অতি-আধুনিক যুগে নিরঙ্কুশ প্রণয়লীলার বৈপরীত্য-স্চনার জন্য ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উগন্যাসের আসল উপজীব্য হইল সাম্প্রতিক প্রণয়ের বে-পরোয়া গতি ও সম্ভাব্য পরিণতি।

তাই স্নলতা কাহারও সম্মতি অপেক্ষা না রাখিয়া তাহার প্রেমাস্পদ শশাঙ্ককে অর্জিত সম্পত্তিরূপে নিজ পরিবারের সম্মুখে দাখিল করিল ও পরিবারও একটা কন্যাসম্প্রদানের অভিনয় করিয়া যথোপযুক্ত যৌতুক ও অলঙ্কার সমেত স্নলতার শাস্ত্রীয় বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। এককালে প্রেমরোগের ভুক্তভোগী ও অধুনা সেকেলে ঠাকুরমা সুখলতা মাত্র এই অভাবনীয় কাণ্ডে কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিল। তাহার পর শ্বশুরালয়ে স্নলতার নব-বিবাহিত জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখানেও নববধূরই একাধিপত্য ও সমগ্র পরিবারের উপর তাহার স্বাধীন রুচি ও ইচ্ছার নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগ। স্বামীকে ত সে পারিবারিক সমাজ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজের চারিদিকে কক্ষাবর্তনকারী উপগ্রহে পরিণত করিল। এমন কি বেচারী শশাঙ্ক স্নলতার আকর্ষণে দাম্পত্যকক্ষের উষ্ণ নিবিড়তা ত্যাগ

করিয়া পথচারী হইতে বাধ্য হইয়াছে। সমস্ত একান্নবর্তী পরিবারস্থ শ্বশুর-শাশুড়ীর তরফ হইতে প্রতিবাদের টু শব্দও উঠে নাই।

শেষ পর্যন্ত সুলতার ননদ শকুন্তলার বিবাহ-দিন-নির্ধারণ লইয়া এক প্রতিকারহীন সঙ্কটের সৃষ্টি হইল। বিবাহের নিরূপিত দিনেই সুলতার পিতা-মাতার বিবাহের ত্রিংশবার্ষিক জয়ন্তী উৎসবের দিন পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে উৎসবসূচী প্রণয়ন ও পরিচালনা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব সুলতার। কাজেই নব বিবাহ ও পুরাতন বিবাহের পুনরুদ্‌যাপন—এই দুই-এর মধ্যে বিষম সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। সুলতা শশাঙ্ককে বিবাহের দিন পরিবর্তন করাইবার হুকুম জারি করিল। শশাঙ্ক অত্যন্ত বিব্রত হইয়া ও গুরুজনেরা তাহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন এই ভয়ে এই অসঙ্গত আবদার তাঁহাদের সম্মুখে সময়মত উপস্থাপিত করিতে পারিল না। ফল হইল, দম্পতির মধ্যে মর্মান্তিক চিরজীবনব্যাপী বিচ্ছেদ। সুলতা ননদের বিবাহকে বয়কট করিয়া ও পরিবারের সকলের অনুনয়-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া শ্বশুরালয় ও স্বামীর সম্পর্ক চিরকালের মত পরিত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

ইহার পর লেখিকা অত্যন্ত নির্মমভাবে ও পুনর্মিলনের সম্ভাবনার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করিয়া ঘটনার অমোঘ গতি নিয়মিত করিয়াছেন। সুলতার মা মনীষা ও তাহার দুই দিদি, ঠাকুরমা সুলতার মৃদু আপত্তি উপেক্ষা করিয়া মেয়ের জিদ বজায় রাখার নিকট তাহার ভবিষ্যৎ সংসারসুখকে বলি দিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। সুলতার অভিমান-শিখায় ক্রমাগত ফুৎকার দিয়া উহাকে অনির্বাণ ও স্বামীর প্রতি কোমল মনোভাবকে অনমনীয়রূপে কঠিন করিয়া তুলিলেন। এমন কি লেখিকা তাঁহাদের দ্বারা সুলতার গর্ভস্থ সন্তানকেও বিনষ্ট করিবার মতলব জোর করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত আচরণকে অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য রূপ দিয়াছেন। মনে হয় যেন লেখিকা একটা পূর্বনিরূপিত জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন, মানুষের স্বভাবধর্মেরও মর্যাদা রাখেন নাই। ইহাই উপন্যাসটির দুর্বলতা-রূপে প্রতীয়মান হয়।

আশাপূর্ণা দেবী সাম্প্রতিক যুগের পারিবারিক জীবন বিপর্যয়ের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শক্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি পটভূমিকার চিত্রণেই মনোনিবেশ করিয়াছেন, কদাচিৎ ব্যক্তিসত্তার গভীর রহস্যে অবতরণ করিয়াছেন। হয়ত তাঁহার জীবদ্দশাতেই পারিবারিক ভারকেন্দ্র স্থান পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন বিন্যাসরীতি গ্রহণ করিবে। তখন এই চিত্র অতীত জীবনের কাহিনীরূপে উহার তাৎপর্য-গৌরব অন্ততঃ কিছুটা হারাইবে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে মানব-জীবনের মূল্যায়ন কোন্ মুদ্রামানকে অবলম্বন করিবে যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা দুঃসাহসিক। তথাপি শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর জন্য উপন্যাস-জগতে যে একটি সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৪)

প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২), 'বিবাহিতা স্ত্রী' (মে, ১৯৫৪), 'মধ্য রাতের তারা' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮), 'মেঘের পরে মেঘ' (আগষ্ট, ১৯৫৮), 'সমুদ্র-হৃদয়' (আগষ্ট, ১৯৫৯),

'বনে যদি ফুটল কুসুম' (১৯৬১) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহাকে ঔপন্যাসিকরূপে পরিচিত করিয়াছে। প্রথম তিনখানি উপন্যাসে সাংসারিকতার সহিত প্রেমের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। 'মনের ময়ূর'-এ রুচিবান মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণের মেয়ে অনসূয়া ও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন অবস্থার উচ্চশিক্ষিত কায়স্থের ছেলে বিনয়ের দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত ও শেষ পর্যন্ত মিলনান্তিক প্রেমের খুব গভীর উপলব্ধিমূলক বর্ণনা মিলে। অনসূয়ার পিতা-মাতা কতকটা রক্ষণশীল মতবাদের জন্য, কিন্তু প্রধানতঃ তাহার কাকার উগ্র-জাত্যভিমান ও নির্মম নীতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, এই অসামাজিক প্রেমকে অসবর্ণ বিবাহে পরিণত হইতে দিলেন না। ফলে বিনয় ও অনসূয়া উদ্দাম-প্রবৃত্তি-তাড়িত হইয়া ঘর ছাড়িয়া গেল ও বিবাহ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক মিলনে আবদ্ধ হইল। অনসূয়া-বিনয়ের জীবনের এই অংশটুকু কেবল ঘটনাবিবৃতির মাধ্যমে রূপায়িত হইয়াছে। এই দুঃসাহসিক সংকল্প-গ্রহণের পূর্বে তাহারা কোন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচলিত হইয়াছিল কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু উভয়ের চরিত্রের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, উহাদের পারিবারিক জীবন ও স্বভাব কোমলতার যে চিত্রটুকু পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাতে এরূপ বে-পরোয়া পরিণতির কোন সুসঙ্গত পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্যে এই পলাতক প্রণয়ীযুগল ধরা পড়িল ও জোর করিয়া অনসূয়ার মুখ হইতে একটি নাবালিকা-হরণ-কাহিনীর অভিযোগ খাড়া করিয়া বিনয়ের তিন বৎসর জেলের ব্যবস্থা করা হইল। অনসূয়ার এই চরিত্র-দৌর্বল্য বিনয়ের সহিত তাহার গৃহপরিত্যাগের বিবরণটিকে খানিকটা অবিশ্বাস্যই করে। হয়ত বাস্তব জীবনে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তথাপি যেখানে আমরা আচরণের পূর্বাপর সঙ্গতি প্রত্যাশা করি সেই উপন্যাসে এই অসঙ্গতিটুকু পরিকল্পনার ত্রুটি বলিয়াই অনুভূত হয়। লেখিকা এই আকস্মিক গ্রন্থিগুলি বিশ্লেষণ-সাহায্যে উন্মোচনের বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অনসূয়া ও তাহার পিতা-মাতার উত্তর জীবনের নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ, মূঢ় অসহায়তার চিত্রে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া এককালের এই রুচিস্মিত, প্রাণদীপ্ত, আনন্দময় পরিবারটি যেন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়া-যাওয়া জড় ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। শব্দপ্রয়োগের ব্যঞ্জনায়, ভাবাবহের ধূসরতার, আচরণের প্রস্তরীভূত অসাড়তার দ্যোতনায়, জীবনীশক্তির ক্ষীণতার সমস্ত বর্ণনার মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের এক নৈরাশ্যকরুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনসূয়ার পিতা-মাতার হতবুদ্ধি, বিমূঢ় ভাব বিবাহবাসরের সমস্ত প্রত্যাশা-স্পন্দনকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। বিনয়ের সমস্ত ব্যাকুল আগ্রহ অনসূয়ার অবোধ, ভোঁতা অনুভূতিতে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছে। একেবারে শেষের কয়েকটি পংক্তিতে তাহার দীর্ঘকাল-অবরুদ্ধ যৌবনের আবেগ যেন সুপ্তিভঙ্গের লক্ষণ দেখাইয়াছে। 'মনের ময়ূর' আবার নবপ্রবুদ্ধ আবেশের বর্ষা-সিঞ্চনে বহুদিন বিস্মৃত পেখম মেলার ক্ষীণ শিহরণ অনুভব করিয়াছে। উপন্যাসটি আবহ-রচনায়, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও যথাযথ ইঙ্গিত-বিন্যাসে ও আলোচিত হৃদয়-সমস্যার গভীরতায় উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

'বিবাহিতা স্ত্রী'তে দাম্পত্য জীবনের কুৎসিত ও গ্লানিকর ইতরতা উহার সমস্ত বীভৎসতা

লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদ্বাহ বন্ধন যে উদ্বন্ধন-রজ্জু হইয়া শ্বাসরোধ করিতে পারে তাহা এই উপন্যাসে ভয়াবহরূপে প্রকটিত হইয়াছে। প্রমীলা ও যজ্ঞেশ্বরের চরিত্র হেয়তার চরম স্তরে নামিয়াছে। সুধাময়ী স্বামী ও কন্যার রূঢ় চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু উহাদের বাস্তবতা আশ্চর্যরূপ তীক্ষ্ণ। হিরণ্ময়ী ও সুনির্মল তাহাদের ভদ্রতা ও সুরুচির জন্যই এই নীচতার অভিভবকে প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। বিশেষতঃ, হিরণ্ময়ী তাহার দ্বিধাদুর্বল চিত্ত ও গার্হস্থ্য আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্য প্রমীলার অবাঞ্ছিত প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে ও পুত্র সুনির্মলের জীবনে সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তিনি শক্ত হাতে হাল ধরিলে সংসারের নৌকা বানচাল হইত না। এই ধিক্কারজনক পটভূমিকায় সুনির্মল-শকুন্তলার ব্যথা-করুণ, শঙ্কিত-ব্যাকুল, মরুভূমিতে জলকণার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান প্রণয়লীলা বিরলবর্ণ শীর্ণ রেখার বেষ্টনীতে ম্লান গোধূলি-তারকার ন্যায় শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসে সেরূপ গভীর সমস্যার অবতারণা না হওয়ায় উহার সাহিত্যিক মূল্য বাস্তবরসস্বাদুতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

'মধ্য রাতের তারা' অপরের গোপন অপরাধের ভারে নষ্ট একটি জীবনের করুণ কাহিনী। উপন্যাসের দুই বাল্য সুহৃদের পরিবারের মধ্যে অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার ফলে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বীরেশ্বর নিজের মেয়ে নয়নের সঙ্গে বন্ধু ডাঃ ব্যানার্জির পুত্র অমরেশ্বরের বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে নিজ পুত্রের বিবাহে ব্যানার্জি-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু অমরেশ্বর তাহার জন্য মনোনীত পাত্রীর পরিবর্তে বীরেশ্বরের পরিবারে আশ্রিত তাহার ভাইঝি সুজাতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিবাহ-রাত্রিতে অকস্মাৎ যৌবন-কামনা-পীড়িত অমরেশ্বর সুজাতার শয়নকক্ষে প্রবেশের সুযোগ লইয়া নিদ্রিতা সুজাতার সহিত দৈহিক মিলন স্থাপন করে। সুপ্তোত্থিতা সুজাতা অমরেশ্বরকে চিনিতে পারিয়া তাহার সম্মানরক্ষার জন্য কোনরূপ সোরগোল না তুলিয়া নীরবে এই দেহ-মিলন স্বীকার করিয়া লয়। ইতিমধ্যে অমরেশ্বর বিলাত চলিয়া যায়। এই মিলনের ফলে যখন তাহার গর্ভলক্ষণ দেখা গেল, তখন সে কলঙ্কিনী অপবাদে বীরেশ্বরের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ডাঃ ব্যানার্জির গৃহে আশ্রয় লইল। সেখানে ডাঃ ব্যানার্জি ও হিরণ্ময়ী তাহাকে কন্যার ন্যায় আদরে স্থান দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কন্যা-জামাতাগোষ্ঠীর সংকীর্ণমনা বিরোধিতায় তাঁহাদের পারিবারিক শান্তি বিধ্বস্ত হইল। সন্তান-প্রসবের সময় সুজাতার মৃত্যু হইলে নবজাত পুত্রটিকে ব্যানার্জি-দম্পতি কোলে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু আবার কন্যাদের প্রবল আপত্তিতে হিরণ্ময়ীর সঙ্কল্প বিচলিত হওয়ায় ডাঃ ব্যানার্জি শিশুটিকে অনাথ আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। অমরেশ্বর বিলাত হইতে ফিরিয়া এই অজ্ঞাত-পরিচয় শিশুটির পিতৃত্ব স্বীকার করায় সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল।

উপন্যাসটির উৎকর্ষ কোথাও মাঝামাঝি স্তরকে অতিক্রম করে নাই। কাহিনীর মধ্যে ডাঃ ব্যানার্জি ও সুজাতা এই দুইজন মাত্র চরিত্রগৌরবের অধিকারী। হিরণ্ময়ী স্নেহপরায়ণা ও উদারচিত্ত হইলেও দুর্বল; নিজের ইচ্ছাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তি তাঁহার নাই। বীরেশ্বর-পরিবারের কাহারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই। এক নয়নের প্রণয়-বিষয়ে অকাল-পরিপক্কতা তাহাকে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। তাহার হবু বরের নিকট নিজ আকর্ষণীয়তা

সৃষ্টি করার ও তাহার উপর নিজ অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করার যে বিকৃত, কলানুশীলনপুষ্ট মনোভঙ্গী তাহার মধ্যে প্রকট হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সে 'বিবাহিতা স্ত্রী'র প্রমীলার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা মেরুদণ্ডহীন ও অস্বাভাবিক চরিত্র অমরেশ্বর। সুজাতার প্রতি তাহার আচরণ একেবারে জুগুপ্সাজনক, উহার মধ্যে সূক্ষ্ম রুচি, উদার প্রেমিক মনোভাব, এমন কি নিজ ঘোরতর দুষ্কর্মের সত্যস্বীকৃতি ও দায়িত্বগ্রহণের সৎসাহসের একান্ত অভাব। সুজাতার চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধ ও নিজের স্কন্ধে কলঙ্কের সমস্ত বোঝা লইয়া তাহার প্রণয়াস্পদ অপদার্থ পুরুষ সম্বন্ধে অভিযোগহীন নীরবতা তাহার মহনীয়তার পরিচয়। কিন্তু যে প্রতিবেশে তাহাদের প্রেমসঞ্চার ঘটিয়াছে ও ইহা যেরূপ ঘৃণ্য, পাশবিক রূপ লইয়াছে তাহা এইরূপ মহান আত্মোৎসর্গের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

'মেঘের পর মেঘ' উপন্যাসটি গভীররসাত্মক ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিস্পন্দিত। পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ পটভূমিকায়, সেবা ও হিতৈষণার প্রীতিনিবিড় পরিবেশে টুনি ও নির্মলের কৈশোর প্রেমস্ফুরণ অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মাতা ননীবালার প্রখর-স্বার্থ-বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, টুনির প্রকাশকুণ্ঠ, অন্তর্গূঢ়, মধুর প্রণয়াবেশের কাহিনীটি ভাবচ্ছন্দে ও বর্ণসুষমায় অসাধারণত্বের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। গ্রাম্য হিংসাদ্বেষ পরনিন্দার প্রতিকূল বাতাবরণে ও অবস্থাবিপর্যয়ে এই প্রণয় কীটদষ্ট ফুলের ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে। টুনি ও ননী-বালা গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছে ও সেখানে তাহাদের জীবনের একটি নূতন তৃপ্তিপূর্ণ ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদধন্য অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাম্য বালিকা টুনি কলিকাতার সঙ্গীতজগতের মধ্যমণি মানসীরূপে এক নবপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ননীবালার কূটবুদ্ধি ও সুযোগসন্ধানী প্রকৃতি নিজ ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব গৌরবের পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র পাইয়াছে। তথাপি মানসীর মনে একটা অস্থির অভাববোধ একটা উদাসীন অন্যমনস্কতা রহিয়া গিয়াছে। জীবনের সুধাপরিপূর্ণ পানপাত্র যেন তাহার ওষ্ঠে অনাস্বাদিত রহিয়াছে। তাহার এই মানস উদ্‌ভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা, তাহার অনাসক্ত জীবন-শিথিলতা তাহার প্রতিটি বাক্যে ও আচরণে চমৎকার ফুটিয়াছে। তাহার মাতার অশালীন ভোগ-লোলুপতার সহিত সংঘর্ষে তাহার বৈরাগী চিত্তের নির্লিপ্ত ভাবটি আরও প্রকট হইয়াছে। টুনির পল্লীজীবনের কৃচ্ছ্রসাধন ও কুণ্ঠাজড়িত আত্মনিরোধও যেমন, তেমনই তাহার কলিকাতা-জীবনের স্বপ্নসঞ্চরণবৎ লক্ষ্যহীন গতিবিধি ও মানস রোমন্থন—উভয়ই চমৎকার ভাবব্যঞ্জনার সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ননীবালা-চরিত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি; তথাপি উহার ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনা-কৌশলে ও বিস্তারিত মনোভাব বর্ণনার গুণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-সমাজে সুপরিচিত অভিসন্ধি-কুটিল মাতা যেন আধুনিক যুগধর্মের শানে পালিশ হইয়া প্রখর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে।

উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি উহার ভাববিলাসদুষ্ট উপসংহারে। মানসীর মনে নির্মলের স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। নূতন পরিবেশে অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা ও জীবনযাপনের অনভ্যস্ত আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য মানসীর মন হইতে তাহার পূর্ব প্রেমের অরুণিমা-রাগকে প্রখর সূর্যালোকে বিলুপ্তপ্রায় করিয়া দিয়াছিল। সোমেশ্বরের সহিত তাহার বিবাহের দুই এক রাত্রি পূর্বে

বাস-কণ্ডাকটরের কর্মরত নির্মলের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ তাহার সমস্ত জীবনস্রোতকে পূর্বখাতে ফিরাইয়া দিয়া সাম্প্রতিক কষ্টার্জিত সামঞ্জস্য-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছে। এই ব্যাপারটি অতি নাটকীয় বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু সোমেশ্বরের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক পাকাপাকিভাবে স্থির হইবার পরেও গভীর রাত্রে মানসীর সেই সরকারী বাসের অনুসরণ, নির্মলের সঙ্গে সুদীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে মনবোঝাবুঝির পালাভিনয় ও শেষ পর্যন্ত পূর্ব প্রণয়ের জয়—এ সমস্তই যেন কলিকাতা মহানগরীর গদ্যময় পরিবেশকে আরব্যরজনীর রোমাঞ্চকর স্বপ্নলোকে পরিণত করিয়াছে। বিশেষতঃ টুনি ও নির্মলের কথাবার্তার মধ্যেও কোন গভীর আবেগময় অনুভূতির সুর বাজিয়া উঠে নাই—ইহা অনেকটা তাৎপর্যহীন কথাকাটাকাটির অতিভাষণে পল্লবিত হইয়াছে। আমাদের বাস্তবধর্মী লেখকেরাও যে চমকপ্রদ রোমান্টিক সংঘটনের আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এখানে তাহারই প্রমাণ মিলে।

'সমুদ্র-হৃদয়'-এ একটি পারিবারিক কাহিনীর সঙ্গে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংঘটন—ঢাকা সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সুলেখার পিতার মৃত্যুর পর, সে তাহার মা ও দুইটি ভাই তাহার জ্যেঠার পরিবারে অসহনীয় উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মধ্যে মানুষ হইয়াছে। সুলেখার পিতা সম্পত্তির অর্ধাংশের অধিকারী হইলেও ও তাহার মা-এর জীবনবীমার টাকা ও গায়ের অলঙ্কার জ্যেঠার নিকট গচ্ছিত থাকিলেও তাহারা যেন দয়ার পাত্র ও জ্যেঠার অনুগ্রহজীবী এইরূপ ধারণাতেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের জ্যেঠতুত ভাই-বোনের সঙ্গে তাহাদের সব বিষয়ে একটা পার্থক্য তাহাদের হীনম্মন্যতাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। সুলেখার প্রথম বিদ্রোহ এই পারিবারিক অবিচার ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও তাহার মাতার একান্ত কুণ্ঠিত, নির্বিচার আজ্ঞানুবর্তিতার প্রতিবাদ-স্বরূপ। সুলেখা-চরিত্রের এই দৃপ্ত তেজস্বিতা ও অন্যায়ের নির্ভীক বিরোধিতার চিত্রটি চমৎকার হইয়াছে। বোধ হয় পারিবারিক জীবনের এই ধূমায়িত বিদ্রোহই তাহাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিবার প্রথম প্রেরণা দিয়াছে, কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে কোন যোগসূত্র দেখান হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সে ঢাকার নবাবজাদা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রধান প্ররোচক, হিন্দুবিদ্বেষী সুলতান আহমদের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণার জ্বালা পোষণ করিয়াছে। তাহাকে বন্দুকের গুলিতে খুন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সে তাহার সহিত নির্জনে দেখা করিয়াছে, কিন্তু নবাবজাদার দক্ষতর কৌশলের নিকট বন্দী হইয়া তাহার অন্দর-মহলে নীত হইয়াছে। মুসলমান নবাবের অন্দর-মহলের আদব-কায়দা, রীতি-ব্যবস্থা, বিভ্রম-বিলাসের সুপ্রচুর আয়োজন, এমন কি বাঁদীদের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ও মানবিক পরিচয়ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রমেশ-বঙ্কিম-বর্ণিত মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরের সঙ্গে বাঙালী নবাবের হারেম-ব্যবস্থার যে পার্থক্যটুকু দেখা যায় তাহা বাস্তবানুগত ক্ষুদ্রতর ভূম্যধিকারীর প্রাসাদে রূপকথা-রাজ্যের মণিমাণিক্যের এতটা ছড়াছড়ি দেখা যায় না। এই অংশটুকু উপন্যাসের স্বাদবৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।

এখানেও শেষ পরিণতিটি অতিনাটকীয় ও ভাবাতিরেক স্ফীত হইয়াছে। সুলতান আহমদ বন্দিনী সুলেখার চিত্ত জয় করিতে যে অতিমানবিক ধৈর্য, সংযম ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জাতিগতভাবে সত্য হইলে ভারত-ইতিহাসের নূতন রূপ উদ্ঘাটিত

হইত। যাহা হউক সুলতান আহমদের আচরণকে ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লইতে কলাসংগতির দিক হইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু একেবারে উপসংহারের দিকে নবাবজাদা যে অমানুষিক আত্মোৎসর্গ ও বিরল মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুপরিচিত-তথ্যবিরোধী ও পূর্ব প্রস্তুতিহীন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনে অসমর্থ হয়। তিনি সুলেখাকে আপনার স্ত্রী-পরিচয়ে ঢাকার বিমানঘাঁটিতে নিরাপদে পৌঁছাইয়াছেন ও তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি তাহার রক্ষক-হিসাবে কলিকাতায় তাঁহার পক্ষে বিপদসঙ্কুল অঞ্চলেও পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শেষে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আততায়ীবৃন্দের হাতে তিনি প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ দিবার পূর্বে সুলেখা কর্তৃক তাঁহার স্বামীসম্বন্ধস্বীকৃতির প্রকাশ্য ঘোষণা তিনি শুনিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রোমাঞ্চকর, করুণরসাপ্লুত রোমান্সের সৃষ্টি হইয়াছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু উহা কতদূর ঔপন্যাসিক ধর্মানুকূল সে বিষয়েই যে সংশয় জাগে তাহা সহজে অপনোদন করা যায় না।

'বনে যদি ফুটলো কুসুম' বোধ হয় প্রতিভা বসুর সাম্প্রতিকতম রচনা। কিন্তু ইহার ঔপন্যাসিক মূল্যমান অনেকটা নৈরাশ্যই জাগাইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে মোটামুটি গভীর সমস্যার আলোচনাই হইয়াছে ও উহাদের ঘটনাবিন্যাসের দক্ষতা ও সামগ্রিক আবেদন বিশেষ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই উপন্যাসটিতে একটা খেয়ালীপনার বৃত্তান্তই উপন্যাসের বস্তুদেহ গঠন করিয়াছে ও উহার বিন্যাসকৌশলেও যথেষ্ট ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। দারুকেশ্বরের পূর্বপুরুষের বিবরণ ও তাঁহার বর্তমান পারিবারিক জীবন, তাঁহার ছেলেদের পরিচয় ও তাহাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক-বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের অর্ধেকের বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে ও ভূমিকার পরিধি ৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এই প্রাক্-বিবরণ যতই কৌতূহলোদ্দীপক হউক না কেন, উপন্যাসের আসল বস্তুর সহিত উহার সম্বন্ধ অত্যন্ত শিথিল।

দারুকেশ্বরের চরিত্রটি অনেকটা ব্যঙ্গাতিরঞ্জনমূলক; উহার অদ্ভুত খামখেয়ালী আচরণ ও জীবননীতি কৌতুককর অসঙ্গতি-চিহ্নিত। তাঁহার তিন পুত্রও সম্পূর্ণরূপে পিতার আজ্ঞাবহ পরিচারক মাত্র; তাহাদের ব্যক্তিসত্তা নিতান্ত ক্ষীণ ও অবিকশিত। কনিষ্ঠ পুত্র সর্বেশ্বর পিতৃ-আশ্রিত থাকার পরিবর্তে পত্নী-আশ্রিত হইয়া উঠায় কিছুটা সাংসারিক নিয়ম-বিপর্যয়ের হেতু হইয়াছে। পিতা সর্বেশ্বর তাহাকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার মাসোহারা বন্ধ করিয়াছে। সে অস্বাভাবিক কঠোরতার সহিত তাহার নিকট বসত-বাড়ীর জন্য নিয়মিত ভাড়ার দাবী জানাইয়াছে। এমন কি পুত্রের সাংঘাতিক অসুখের সময়ও তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা বা অর্থসাহায্য করে নাই। পুত্রের মৃত্যুও বাহ্যতঃ তাহার নির্বিকারতার গায়ে কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। এক দিন, অতি বিলম্বে, তাহার নিজের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এই রুদ্ধ পুত্রস্নেহ একটি আর্ত চীৎকারে মর্মান্তিক অভিব্যক্তি পাইয়াছে। তাহার উইলে দেখা গেল যে, সে তাহার পরিত্যক্ত কনিষ্ঠ পুত্রকে ও সংসারে অশান্তির মূল কারণ প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদায় দৃঢ় কনিষ্ঠা বধূ মাধবীকে তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই অপ্রত্যাশিত বিকাশ তাহার সুপ্ত ন্যায়নিষ্ঠা ও মহত্ত্ববোধের পরিচয় দেয়। এক দারুকেশ্বর ও মাধবী ছাড়া আর

কোন চরিত্রই জীবনস্পন্দনের চিহ্ন বহন করে না, ঘটনাবিন্যাসও কোন গভীর জীবনসত্যের সন্ধান দেয় না।

(৫)

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য উপন্যাস-ক্ষেত্রে নবাগতা হইয়াও নারী রচিত উপন্যাসের পরিধি ও বিষয়-বৈচিত্র্যকে আশ্চর্যরূপে বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্রপথগামী, তাঁহার রূপায়ণ দক্ষতাও সেইরূপ বিস্ময়কর। সাধারণতঃ নারীর জীবনবীক্ষণে যে একটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিত ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি একান্ত ও অব্যবহিত মনোযোগ লক্ষিত হয়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাহাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া নানা নূতন পথে, অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছেন ও নানা অপরিচিত জীবনযাত্রার ধারা আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি জীবনদর্শনের একটি অভিনব সংজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি লইয়া আমাদের জীবনবোধকে যেমন উচ্চকিত, তেমনি পরিতৃপ্তও করিয়াছেন।

তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'নটী' (মে, ১৯৫৭), 'মধুরে মধুর' (জুলাই, ১৯৫৮ , 'প্রেমতারা' (এপ্রিল, ১৯৫৯), 'এতটুকু আশা' (জুন, ১৯৫৯), 'তিমির লগন' (ডিসেম্বর, '৯৫৯), 'তারার আঁধার' (এপ্রিল, ১৯৬০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'নটী' ও 'মধুরে মধুর' তাঁহার আশ্চর্য রূপ চমকসৃষ্টির প্রথম দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়াছে। সঙ্গীত, নৃত্য, চারুশিল্পের মোহময় সৌন্দর্য পরিবেশের প্রতি লেখিকার অনুভূতি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও সংবেদনশীল। এই মায়াপুরী নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইহারই সন্ধানে তিনি অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ও আধুনিক মণিপুরের ভাবমুগ্ধ নৃত্যকলার আবেশ কুহকময় প্রতিষ্ঠা ভূমিতে স্বচ্ছন্দবিচরণ করিয়াছেন। রেখার পর রেখা ও রং এর পর রং সংযোজনা করিয়া এই রূপস্বপ্নে তিনি চিত্রের স্থির বেষ্টনী ও প্রাণলীলার উল্লসিত গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। শুধু ভাষার ইন্দ্রজাল নহে, অনুভূতির গূঢ়সঞ্চারী অনুপ্রবেশই তাঁহার এই কল্পনা-সুষমাকে অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ ভাবসত্যে পরিণত করিয়াছে। সঙ্গীতের মধুর প্রাণস্পর্শী আবেদন, নৃত্যকলার মধ্যে বিশ্বছন্দের অনুভূতি দ্যোতনা, প্রেমের অতলস্পর্শ মায়া-রহস্য উদ্বোধন—সর্বত্রই তাঁহার কল্পনা ও প্রকাশশক্তি স্থির-প্রত্যয়-দীপ্ত—ইহাদের নিবিড় আবেগ তাঁহার অন্তরের আশ্রয়ে ও অভ্রান্ত কলাকৌশলে এক মদির আবহে বিধৃত। তাঁহার আখ্যান-বিবৃতি চরিত্র-উপস্থাপনা, জীবনবোধ সবই এই মুখ্য চেতনার অনুগামী—এই ভাবসুরভিত কল্প-সুষমার রূপরোমাঞ্চিত আশ্রয়।

ইতিহাসে লেখিকার সত্যিকার কোন আগ্রহ নাই। সিপাহী বিদ্রোহের বাস্তব বিক্ষোভ ও কারণনির্দেশে তিনি উদাসীন। এই বহির্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রেমের যে মৃত্যুঞ্জয় মহিমা, যে সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠতা, যে দিব্য দীপ্তি স্ফুরিত হইয়াছে তিনি সমস্ত বস্তুর বাধা ঠেলিয়া তাহাকেই একনিষ্ঠ লক্ষ্যে অনুসরণ করিয়াছেন। রাজারাজড়ার জীবন যাত্রা-সমারোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হইল প্রাচীন অভিজাত-

গোষ্ঠীর সঙ্গীতরসিকতা। ইতিহাসের রুক্ষ, কঙ্করময় পথে প্রেমের মণিখণ্ড যে দ্যুতি-বিকিরণ করে, ইহাই তাঁহার ইতিহাস-আশ্রয়ের প্রধান কারণ। ইহার ফল হইয়াছে যে, সিপাহী বিপ্লবের একজন প্রধানা নায়িকা—ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ—উপন্যাসে একটি অপ্রধান চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। লেখিকার উদ্দেশ্য ততটা ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বর্ণনা নহে, যতটা প্রেমের অসাধ্য-সাধন-শক্তির প্রতিপাদন। রাজনৈতিক পরাজয়ের পিছনে প্রেমের বিজয়-গৌরব, বিধ্বস্ত কেল্লার পটভূমিকায় প্রেমের চিন্ময় মন্দির নির্মাণই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মতি-খুদাবক্সের অমর, অজেয়, বহিঃপ্রকৃতির দাক্ষিণ্য-ধন্য প্রেম সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যে এক অশ্রুস্নিগ্ধ শান্তির সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

এই প্রেম-কাহিনী ছাড়া লেখিকা সেকালের উত্তরপ্রদেশের পল্লীজীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। এই অদূর অতীত যুগে হিন্দু-মুসলমানের সহৃদয় সম্পর্ক, গ্রাম-সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি, রাস্তায়-ঘাটে চোর-ডাকাতের উপদ্রব, সমাজপ্রথার নির্মমতা—সমস্ত যুগচিত্রটিই লেখিকার নিপুণ স্পর্শে সজীব হইয়াছে। তবে এই সমস্ত খণ্ডচিত্র বিচ্ছিন্ন, নিছক কৌতূহলের প্রেরণায় লেখা, কেন্দ্রীয় ঘটনার সহিত এক সূত্রে গ্রথিত নহে। পড়িতে পড়িতে Charles Reade-এর The Cloister and the Hearth নামক বিখ্যাত উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। খুদাবক্স-পরন্তপ যেন Gerard-Dennis-এর ভারতীয় সংস্করণ।

লেখিকা সিপাহী বিপ্লবের যে কারণ দিয়াছেন তাহা দেশপ্রেমমূলক আদর্শবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট। তাঁহার মতে ইহার মূল কারণ ইংরেজদের সহানুভূতিহীন, উদ্ধত আচরণ ও সুখ-সুবিধা-সম্মানের দিক দিয়া ইংরেজ কর্মচারী ও ভারতীয় সিপাহীর মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। ভূপৃষ্ঠের অসমতাই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। লেখিকা ইতিহাসকে ব্যক্তি ও শ্রেণীগত দিক হইতে দেখিয়া হয়ত সিপাহীর মর্মবেদনাটি যথার্থতরভাবেই অনুভব করিয়াছেন। যে রুটি বিপ্লবের সঙ্কেতরূপে অদৃশ্য হস্তের দ্বারা ছাউনিতে ছাউনিতে বাহিত হইত, তাহা হয়ত এই খাদ্যবুভুক্ষারই সার্থক প্রতীক।

'মধুরে মধুর' উপন্যাসে নিবিড়তর রূপলোক সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসের গতিবেগ ও বর্ণাঢ্যতা যেমন একদিকে এই রূপসৃষ্টির সহায়তা করে, তেমনি অপর দিকে ইহার বস্তুপ্রক্ষেপ ও আকস্মিকতা ইহার মায়াবেশকে অনেকটা টুটাইয়াও দেয়। কিন্তু ধর্মপ্রেরণাসঞ্জাত ও ভক্তি-কল্পনা-প্রভাবিত নৃত্যগীত অভিনয় যে কল্পসৌন্দর্য জগৎ দর্শকের অনুভূতিগোচর করে তাহা ইতিহাসের অনাবশ্যক বস্তুভারমুক্ত ও ভাবমুগ্ধ অন্তরের সমর্থন-প্রাপ্ত বলিয়াই একটি চিরন্তন মন্ময় সত্যের মর্যাদা লাভ করে। 'মধুরে মধুর' এই শিল্প প্রতিভাসৃষ্ট রূপজগতের শুধু দ্বার-উন্মোচন নহে, উহার অন্তিম মর্মরহস্যও ভেদ করিয়াছে। শিল্পসত্তার সাধনা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অতীত ঐতিহ্যের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকণিকা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন, অপরূপ-প্রাণোজ্জ্বল রূপছন্দের আবিষ্কার, নিম্নতর জৈব প্রয়োজনের সহিত ঊর্ধ্বতন সৌন্দর্যসার আত্মার দারুণ সংগ্রাম ও প্রেমে উভয়বিধ তাগিদের ক্ষণিক সমতা, উহার চিরন্তন অতৃপ্তি

ও অশ্রান্ত উদ্‌বর্তন-প্রয়াস প্রভৃতি শিল্পী-জীবনের নিগূঢ় রহস্য এই উপন্যাসে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সাধন এই শিল্পী-প্রাণের প্রতীক। সে নৃত্যশিল্পী, নূতন নূতন নৃত্যচ্ছন্দের আবিষ্কারে জগৎ ও জীবনের পরমসত্য প্রকাশে একনিষ্ঠভাবে উৎসুক। মণিপুরী নাচ, রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা ও কীর্তনের হৃদয়দ্রবকারী, অতীন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতবাহী সুর, রাজস্থানের যাযাবর নট-নটীর গ্রাম্য লাস্যছন্দ মালাবারের সমুদ্র-উপকূলবাহী নৌকায় ঢেউ-এ-নাচার কাঁপন, পুতুলনাচ, বাংলার চাষীর ধান-কাটার মৃদুচ্ছন্দে আন্দোলিত দেহভঙ্গী, বাস্তব জীবনের চলাফেরার অলক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পন্দনতরঙ্গ,—সবই তাহার সৃষ্টিকল্পনায় এক হইয়া মিশিয়া গিয়া বিশ্বছন্দের সহিত একসুরে বাঁধা, সৌন্দর্যরহস্যের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট এক বিরাট নৃত্য-সমবায়ে সংহত হইয়াছে। সাধনের জীবনে কতই না বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের রূঢ় আঘাত, জৈব কামনার দুর্বার উচ্ছ্বাস বার বার তাহার স্বপ্ন-কল্পনার সুকুমার সুষমাকে ছিন্নভিন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে. কিন্তু কি এক অদ্ভুত শক্তিবলে এই আঘাত ও উন্মত্ত জান্তব সংস্কার এই সর্বগ্রাসী সৌন্দর্য সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া ইহাকে আরও জীবন্ত ও রূপময় করিযাছে। নারীর প্রেম ও দেহকামনা বারবার তাহার দিব্য চেতনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। রাধা, রুক্মিণী, বৃন্দা যশবন্ত, নারায়ণ প্রভৃতি নর-নারী, প্রেমনিবেদন, সহানুভূতি ও তীব্র ঈর্ষ্যার উপঢৌকন লইয়া শিল্প-সাধকের জীবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ভাল-মন্দ, দাক্ষিণ্য-বামাচারিতা যাহা কিছু ঘটিয়াছে সবই সেই পরম উদ্দেশ্যের পোষকতা করিয়াছে। কলাতীর্থম ও কৃষ্ণলীলা সাধন ও তাহার শিল্পী-আত্মার যুগল প্রেয়সী বৃন্দা ও রাধার মিলিত কল্পনাস্বপ্ন ও রূপনির্মিতির বৃন্তে বিকশিত দুই সুরভি পুষ্প। রাধাকে সাধন কণ্ঠমণির আশ্রমে ত্যাগ করিয়া আসিযাছে; তাহার অন্তিম প্রয়াসকে রূপ দিবার কাজে ও তাহার শেষ মুহূর্তের উপর বিদায়-চুম্বন অঙ্কিত করিতে তাহার ঠিক সময়ে পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। বৃন্দার সহিত তাহার সম্পর্ক আরও জটিল, আত্মিক ও দৈহিক মিলনের অপূর্ব সমাবেশ। জীবনের প্রতিটি সন্ধিস্থলে সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা শিল্পীজনোচিত, প্রেমিকের ভাবাবেশতৃপ্তির প্রয়োজনে নহে।

বৃন্দাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিযাছে, নৃত্য সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য; তাহার ব্যক্তিগত আবেগ এখানে গৌণ। সাধনের সম্পর্কে ইংরাজ কবি কীট্‌সের অমর উক্তি মনে পড়ে—শিল্পীর কোন ব্যক্তিসত্তা নাই। রবীন্দ্র-নাথের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার কবিমনের নিখিলবিশ্ব প্রসারিত, সর্বজীবনের প্রাণরসের সহিত একাত্ম, আভাসে-ইঙ্গিতে-মর্মরে-স্পন্দনে-পুলকচ্ছটায় বিস্ফুরিত লীলাবিহারের বর্ণনার মধ্যেও সেই একই সত্য ব্যঞ্জিত। সাধনও তাই শিল্পমুক্তির নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে তাহার ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাকে অবহেলে বিসর্জন দিয়াছে। নারায়ণের ঈর্ষ্যার বিষধারা সে শিল্পী-নীলকণ্ঠের উদার, আত্মভাবনাহীন নির্লিপ্ততার সহিত গলাধঃকরণ করিয়াছে। প্রেমের আনন্দ-বেদনা, নারীহৃদয়ের নিঃশেষে নিবেদিত মাধুর্য তাহাকে মুহূর্তের জন্য উন্মনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ত্রিকালদর্শী স্থির-দৃষ্টিকে আবেশরঞ্জিত করিতে পারে নাই। তাহার জীবনের অন্তিম দৃশ্য একসঙ্গে এক মানস বিভ্রান্তির করুণ, স্বপ্নমধুর মরীচিকা ও এক মহান সঙ্কল্পের স্থির-দীপ্তি-উদ্ভাসিত আত্মদর্শন।

জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য প্রেরণা, রূপসৃষ্টির সমস্ত বিচিত্র কল্পনা, এই সৃষ্টিক্রিয়ার তাহার সমস্ত সহযোগিবৃন্দের নিঃশব্দ, আত্মিক উপস্থিতি, জীবন সাধনার অভাবনীয় সাফল্যে এক মৃত্যুঞ্জয়ী, সমস্ত জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণকরা আনন্দ প্লাবন, মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে ছায়াচিত্রের ন্যায় রূপদৃশ্যের একের পর এক বর্ণোজ্জ্বল শোভাযাত্রা—শেষ অধ্যায়টিকে এক অসাধারণ অতীন্দ্রিয় মহিমা-লোকে উন্নীত করিয়াছে। অধ্যাত্মরহস্যবিদ্ ধ্যানাবিষ্ট মুনিঋষির পরলোকযাত্রার ন্যায়, মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের জ্ঞান-সাধনার মর্যাদারক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় বিষপানের ন্যায়, সৌন্দর্য স্রষ্টার এই মৃত্যু দৃশ্য মানব মনের এক ঊর্ধ্বগগনবিহারী ভাবানুভূতিকে অপার্থিব জ্যোতির্ময়তায় অভিস্নাত করিয়াছে।

'যমুনা-কী-তীর' (জুলাই, ১৯৪৮) সঙ্গীতচর্চার আদর্শ পরিমণ্ডল ও সঙ্গীতসাধনায় একান্তভাবে আবিষ্ট নর-নারীর জীবনচিত্র। আনন্দ কাশীর পথে পথে ঘুরে-বেড়ান, অনাথ বালক, সঙ্গীতবিষয়ে শ্রুতিধর। সেই আনন্দ দৈবযোগে বাঙলা দেশের শ্রীনটপুরের সঙ্গীতপ্রেমিক রাজা যোগীশ্বর রায়ের প্রাসাদে আশ্রয় পাইল—ওস্তাদ জমির খাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ ও রাজকন্যা ইন্দুমতীর স্নেহমধুর সাহচর্যলাভে ধন্য হইল। এই স্নেহময়, নিশ্চিন্ত আবেষ্টনেও কিন্তু আনন্দের ভবঘুরে মন মাঝে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিত। বসন্ত জ্যোৎস্নারজনীতে আনন্দ ও ইন্দুর এই কৈশোর সরল ভালবাসা অতর্কিতে মুগ্ধ আবেশ ও রক্তিম প্রণয়োন্মেষে পরিণত হয় এবং ফাগুয়ার গানে এই নবোন্মেষিত রঙীন অনুভূতি প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্যদ্যোতনায় আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল লেখিকার বর্ণনায় আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান ও প্রেম আনন্দের মনে মাখামাখি হইয়া অপরূপত্ব লাভ করে। আনন্দ ও ইন্দুর প্রেম সচেতন হইয়া উঠিয়া নিজ ব্যর্থতার পূর্বাভাসে করুণ ও উন্মনা হইয়াছে।

ইন্দুর বিবাহ-বাসরে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রূপসী বাইজি বাহারের সঙ্গে আনন্দের যে পরিচয় হইল তাহাই ঔদাসীন্য ও বিমুখতার পর্যায় অতিক্রম করিয়া এক সময় এক বে-পরোয়া, অশান্ত আকর্ষণে পরিণতি লাভ করিল। ইন্দুর বিবাহে আনন্দের শূন্যতাবোধ, ভাববিপর্যয় ও উদভ্রান্তি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। ইহার পর আনন্দ বাহারের সমস্ত সেবা-যত্ন ও আকুল প্রেমার্তিকে উপেক্ষা করিয়া এক মাতাল, ছন্নছাড়া জীবন-স্রোতে গা ভাসাইল। এই খেয়ালী, উচ্ছৃঙ্খল জীবনচর্চার মধ্যে আনন্দের সাধনালালিত শিল্পী-জীবনের অবসান ঘটিয়াছে—তাহার মহৎ প্রতিশ্রুতি ব্যর্থতা-বিলীন হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে বাহারের সর্বত্যাগী প্রেমের নিকট ধরা দিয়াছে, কিন্তু এই বেদনা-মথিত মিলনে তাহার মনের অস্বস্তি, তাহার অশান্ত যাযাবরত্ব কাটে নাই।

আবার একবার কলিকাতায় ফিরিয়া আনন্দ ইন্দুর দাম্পত্যসুখহীন, অশ্রু-উজ্জ্বল, নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই পুনর্মিলনে উভয়ের মধ্যে অনেক পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন, অনেক অনুতাপ-অনুশোচনা, ব্যর্থ জীবনের জন্য অনেক খেদোচ্ছ্বাসের ভাব বিনিময় ঘটিয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিচ্ছেদ যে অপরিহার্য, আপন আপন বেদনাকে যে উভয়কেই নিঃসঙ্গ অন্তর-মন্থনের মধ্যে পরিপাক করিতে হইবে এই উপলব্ধি উভয়েই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। অতঃপর আনন্দ ও বাহার পরস্পরকে সমগ্র উত্তর-ভারতের তীর্থসমূহে খুঁজিয়া

বেড়াইয়াছে আনন্দ তাহার সঙ্গীত-সুধাকুম্ভের অনাদৃত সঞ্চয় হইতে সুরের জলধারা ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার উপস্থিতির ম্লান পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অন্তিম দৃশ্যে যমুনাতীরবর্তী এক গণ্ডগ্রামের জরাজীর্ণ দেবমন্দিরে নদীর সর্বগ্রাসী প্রলয়প্লাবনের কল্লোল-ধ্বনির সহিত নিজ ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্য চেতনাহীন সুরলহরী মিশাইয়া আনন্দ বাহারকে আপনার শেষ আশ্রয়ভূমিতে আকর্ষণ করিয়াছে ও এই দুই ক্ষুদ্র সুর ও প্রেমের মিলিত স্রোতস্বতী জলবিম্বের মত এই মহাজলোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে। সঙ্গীতানুরাগে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও প্রণয়-বেদনা-বিধুর, সমস্ত স্থির অবলম্বন হইতে উৎক্ষিপ্ত সুরের মধ্যে অসীমের ধ্বনির প্রতি উৎসুক ও উৎকর্ণ প্রেমিকযুগলের ইহার অপেক্ষা আর কোন যোগ্যতর উপসংহার কল্পনা করা যায় না।

'প্রেমতারা' (মে, ১৯৫৯) সার্কাসের দলভুক্ত মেয়ে-পুরুষের জীবন-কাহিনী; ইহা লেখিকার নূতন ধরনের অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। মনোহর ও প্রেমতারার প্রণয়-সঞ্চার, কলহ-বিবাদ ও প্রৌঢ় জীবনের গার্হস্থ্য অবসরভোগ উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ ঘটনা। কিন্তু এই কেন্দ্রের চারিদিকে দলের সমস্ত ব্যক্তির সাধারণ জীবনধারা, তাহাদের ছোটখাট আশা, ঈর্ষ্যা, প্রীতি, সৌহার্দ্য ও কখনও প্রকাশ্য, কখনও প্রচ্ছন্ন বিরোধের ইতিহাস পটভূমিকা-রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। সার্কাসের খেলোয়াড়দের জীবন সর্বদা অস্থির ও অনিশ্চিত—মৃত্যু-সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই উহাকে স্পর্শ করিয়া আছে। যাহারা বাঘ সিংহের খেলা দেখায় তাহারা ত সর্বদাই বিপদের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ। ক্লাউনের ভাঁড়ামো ও হাস্যকর অঙ্গভঙ্গীর তলায় অন্তঃসলিলা অশ্রুস্রোত বহে, ট্রাপিজে দোল-খাওয়া মেয়েগুলোর মধ্যে কেহ কেহ হঠাৎ মন দেওয়া-নেওয়ার প্রবলতর দোলে ঝুলন-বাজি দেখায়।

স্বত্বাধিকারী, কার্যাধ্যক্ষ উপর হইতে কল টিপিয়া উহাদের অধীন চাকুরীজীবীদের মধ্যে কত জটিলতার সৃষ্টি করে' ভালবাসার কোথাও বা বিবাহ ও গার্হস্থ্য নিরাপত্তায় পরিণতি; কোথাও বা বন্য আকর্ষণ অন্ধকারে খাঁচার বাঘের চোখের মত জ্বলে, কখনও বা হিংস্র আক্রমণে, তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে-কামড়ে দংষ্ট্রা ব্যাদান করে। সর্বশুদ্ধ সার্কাসের জীবনটাই একটা ঘূর্ণিপাকের মত দ্রুত গতিতে আবর্তিত; একটা অদৃশ্য বারুদখানার উপর নির্মিত পারিবারিক সম্পর্কের খেলাঘর। ইহার কখন কোন্ অজ্ঞাত টানে ঘনিষ্ঠতায় ভাঙ্গন ধরে, প্রেম জিঘাংসায় ভীষণ হইয়া উঠে, অতর্কিত দুর্ঘটনা সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবককে অসহায়, পরনির্ভর পঙ্গুতে পরিণত করে তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। এই সুখী পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতার জ্বালা, দলের সেরা খেলোয়াড় হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মাষ্টারের নেকনজরে পড়িয়া শ্রেষ্ঠত্ব-অর্জনের স্পৃহা অতি উগ্রভাবে প্রকট হইয়া একটা অস্বস্তি-কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। খেলার পশুসমাজ—সিংহ বাঘ, ভালুক, হাতী ইহারাও—মানুষের পরিবারভুক্ত হইয়া তাহাদের ভাগ্যপরিবর্তনে দৈবশক্তির দূতরূপে প্রতিভাত হয়। সবশুদ্ধ মিলিয়া একটি জীবন্ত, দেহ ও মনে বৃত্তির দুরন্ত প্রকাশে উদ্দাম, বে-পরোয়া ও বে-হিসাবী, সংঘ-সংস্থিতির বর্ণাঢ্য চিত্র উপন্যাসটির পাতাগুলিতে চমকপ্রদ উজ্জ্বলতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে গভীর বিশ্লেষণ নাই, জীবনের ধীর-মন্থর বিবর্তন নাই, আছে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠা দীপ্তি, প্রাণ-বন্যার দুর্ধর্ষ বেগ, রংএর চোখ-ধাঁধান ও মনে চমক-দেওয়া অজস্রতা।

লেখিকার বর্ণনা কৌশলে ও উত্তেজিত পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশভঙ্গীতে এই জুয়াড়ী-জীবন-যাত্রার সবটুকু বিস্ফোরক শক্তি আমাদের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়।

এই পুতুলবাজির মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মনোহর ও প্রেমতারা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও প্রবল জীবন-পিপাসার আকর্ষণে পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রেমতারার প্রতি প্রণয় নিবেদনে মনোহরের নিকট তাহার একান্ত-বশীভূত বাঘ বাদশার নিকট হইতে ঈর্ষ্যার ঝলক-দগ্ধ সতর্কবাণী উচ্চারিত হইল। বাঘ ভালবাসার নারীর প্রতিযোগীরূপে দেখা দিল। এই সতর্কবাণী আবেশমুগ্ধ মনোহরের কানে প্রবেশ করিল না, সে পশুর খেয়াল বলিয়া উহাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু একদিন পশুর রুষ্ট গর্জনে আভাসিত বিধিলিপির এই লেখন আশ্চর্যভাবে ফলিয়া গেল। সেদিনও কামমত্ত মনোহর বাদশার জলপিপাসা মিটাইতে বিস্মৃত হইয়াছিল। প্রেমতারা বাঘের সহিত খেলা দেখাইতে দেখাইতে তাহার প্রতিই তাহার রক্তসঞ্চারী রোষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাকে শাসন করিতে গিয়া মনোহর বাঘের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত ও পঙ্গু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে গোপী মাষ্টার প্রেমতারার দিকে লালসাময় চক্ষু দেওয়ায় একদিকে মনোহর দারুণ অভিমানে প্রেমতারাকে অকথ্য অপমানে বিদ্ধ করিল; অন্যদিকে প্রেমতারাও গোপীর ক্লেদাক্ত আলিঙ্গন হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাদশাকে তাহার উপর লেলাইয়া দিল। অবশেষে গোপীনাথের গুলি খাইয়া বাঘ মানব-সংসর্গজনিত মানস দ্বন্দ্বের হাত হইতে চিরমুক্তি পাইল। সার্কাসের মানবজীবন নাট্যে ব্যাঘ্রের এই অদ্ভুত অভিনয়-লীলার এইরূপে অবসান ঘটিল।

প্রেমতারা-মনোহরের দাম্পত্য জীবনের শেষ পর্যায়ে সার্কাস-অধ্যায়ের একটি চমৎকার উপযোগী পরিণতি ঘটিয়াছে। শক্তির দুঃসাহসিক অগ্নিশিখা স্তিমিত হইয়া আইন-ভাঙ্গা, জুয়াখেলার কূটবুদ্ধির মৃদু স্ফুলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই প্রৌঢ় যুগল আর বাঘ-ভালুকের খেলা দেখায় না, কিন্তু অসামাজিক গুণ্ডা ও জুয়াড়ী-সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহাদের সার্কাস-খেলার প্রসার ও প্রকৃতি বদলাইয়াছে, কিন্তু উহার পিছনের মনোবৃত্তি প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। প্রেমতারা নিজের মনুষ্যচরিত্রজ্ঞান, উপায়-উদ্ভাবন-কৌশল ও নেতৃত্বশক্তি লইয়া বস্তিসমাজের রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে লেখিকার চমৎকার সঙ্গতিবোধের পরিচয় মিলে।

'এতটুকু আশা' (জুলাই, ১৯৫৯) মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের বিশিষ্টলক্ষণহীন উপন্যাস। ইহা মোটর-মিস্ত্রী বলাই ও মোটর-কারখানার মালিক সুধীরের ঈর্ষ্যাবিড়ম্বিত বন্ধুত্বের কাহিনী। বলাই সাংসারিক উন্নতি ও সচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। সুধীরের গার্হস্থ্য জীবনে অশান্তি ও দাম্পত্য মনোমালিন্য উহার স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। সুধীর তাহার পূর্ব স্ত্রী শান্তিলতার স্মৃতিতে সর্বদা আবিষ্ট থাকার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিজলী তাহার প্রতি অভিমান পোষণ করে ও পিতৃগৃহে আশ্রয় লয়। শেষে মোটর-কারখানা পুড়িয়া যাওয়ায় সুধীর ও বলাই-এর অবস্থা-বৈষম্য দূরীভূত হইয়াছে। বলাই ও সুধীরের দাম্পত্য জীবনের ছন্দোপার্থক্য প্রদর্শনই উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রমিকশ্রেণীর

চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া লেখিকা তাঁহার শক্তির প্রধান উৎস ও জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন—জীবন-আলোচনার কোন গভীরতার লক্ষণ এখানে দেখা যায় না।

'তিমির লগন' (নভেম্বর, ১৯৫৯) লেখিকার বিষয়-বৈচিত্র্য-উদ্ভাবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে রোমান্সের বর্ণময় অসাধারণত্বের পরিবর্তে একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনধারার বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অসিত মৈত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসবীর মৃত্যুর পরে পনের বৎসরের ব্যবধানে পূর্ব জামাতা প্রৌঢ় নিশীথ তালুকদারের সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মাধবীর বিবাহ-সম্পর্ক স্থির হইয়াছে। বিবাহের পূর্বরাত্রে নিশীথকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার মৃত বলিয়া গৃহীত স্ত্রী বাসবী। বাসবী আরও দুই এক দিন তাহার পিতা-মাতার সামনে আবির্ভূত হইয়াছে এই বিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রতিবারেই তাহাকে উত্তেজিত কল্পনার সৃষ্টি প্রেতচ্ছায়া অনুমানে তাহার বাস্তব সত্তাকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এইটি ঘটনাগ্রন্থিতে একটি দুর্বল সংযোজন। বাসবী প্রকাশ্যভাবে তাহার পিতা-মাতার সম্মুখে আসিয়া তাহার মর্মবিদারী অভিজ্ঞতা কেন বিবৃত করে নাই তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কেবল রহস্যকে অনাবশ্যকভাবে ঘনীভূত করিবার জন্যই সে ভূতের মত আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে, সামনে আসে নাই। এই উপন্যাসের মৌলিকভাবে পরিকল্পিত চরিত্র নিশীথ। সে মেয়েদের গোপন কুৎসা রটাইবার ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করে ও এই হেয় উপায়ে উপার্জিত অর্থেই সে বড় মানুষ হইয়াছে। তাহার আশ্চর্য অভিনয়দক্ষতা ও আপনার সত্য পরিচয় গোপন রাখার কৌশলেই সে অভিজাত-সমাজে একজন আদর্শচরিত্র, আত্মনির্ভরশীল, ব্যবসায়নিপুণ যুবক বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। বাসবী ও মাধবীর উপর তাহার প্রভাব প্রায় সম্মোহন শক্তির পর্যায়ভুক্ত। বহু হিতৈষীর সতর্ক বাণী ও সংশয়-প্রকাশ, সন্দেহের নানা প্রমাণ-সূত্র, প্রবঞ্চিতা বান্ধবীদের ক্ষুব্ধ অনুযোগ কিছুতেই তাহাদের একান্ত বিশ্বাসের গায়ে চিড় ধরাইতে পারে নাই। বাসবী বুঝিয়াছিল অতি বিলম্বে; এবং নিশীথ ট্রেণ হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বাসবীর সংগৃহীত তথ্যকে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু সে অত্যন্ত অসম্ভবভাবে বাঁচিল ও দীর্ঘ পনের বৎসর পরে ফিরিয়া রোমান্সের নায়িকার প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল। আসল কথা, এই ত্রুটিগুলি রোমান্স-জগতের উপাদান, বাস্তব জীবনে কিছুটা অপ্রযুক্ত।

নিশীথ তালুকদারের চরিত্রই এই উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি ও মুখ্য অবলম্বন। সে বাসবীকে কি মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই মাধবীকে যে অদ্ভুত কৌশলে সে বশীভূত করিল তাহাতে তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাই। বাসবীর সহিত ঘনিষ্ঠতার পূর্বে তাহার যে পরিচয় আমরা পাই তাহাকে সমাজের উচ্চ স্তরের নানা নর-নারীর অন্তরঙ্গ হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে তাহার অদ্ভুত গোপন-তথ্য-নির্ণয়ের কৌশলের প্রমাণে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু পরের রহস্যভেদের মধ্যে তাহার নিজের অন্তর-রহস্যের উপর বিশেষ আলোকপাত হয় না। সাধারণ অতিনাটকীয় দুঃশীল চরিত্রের (melodramatic villain) মত সে অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। কিন্তু মাধবীর চিত্তজয়ের যে দুরূহ সাধনা তাহাই তাহার গভীর চক্রান্তকুশলতা ও প্রতারণার অভিনয়ে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে

অবহিত করে। দীর্ঘ পনের বৎসর ধরিয়া সে পত্নীগতপ্রাণ, মৃতা স্ত্রীর ধ্যানে আবিষ্ট, জীবনবিমুখ স্বামীর অংশ অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তাহার পাকা, সুচিন্তিত চালে কোথাও ভুল হয় নাই। সে উদ্ভিন্ন যৌবনা শ্যালিকার মধ্যে তাহার দিদিকেই নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে, সে স্ত্রীর বেনামিতেই তাহার কনিষ্ঠা সহোদরা ও পিতার বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর প্রতি যেন স্মৃতিবিভ্রমবশতঃই প্রেম নিবেদন করিয়াছে। হঠাৎ ভুল ভাঙিয়া সে যেন স্মৃতির অতল হইতে জাগিয়া উঠিয়া অনুতাপ-দীর্ণ হৃদয়ে এই অনিচ্ছাকৃত প্রেমনিবেদনকে প্রত্যাহার করিয়াছে। তাহার আচরণ মাধবীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিয়াছে যে, তাহার দিদির স্মৃতিভিবিক্তারূপেই ও দিদির প্রতি ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করার জন্যই সে তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে। নিজ রূপাসক্তি ও বিষয়লোলুপতার উপর এরূপ একটি আদর্শবাদের আবরণ টানিয়া দেওয়ার মধ্যে যে অসাধারণ কৌশলময়তা ও আত্মনিরোধশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে পনর বৎসর ধরিয়া এরূপ একটি মানস পাপ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখা যায় কি না সে সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। যে এরূপ সুদীর্ঘকাল নিজ স্বভাবকে প্রতিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল তাহার অভিনয়ই সত্যকার জীবন কি না কে বলিতে পারে?

'তারার আঁধার' (এপ্রিল, ১৯৬০) আর একটি নূতন অনুসন্ধানের পরিচয়বাহী উপন্যাস। যে নিজেকে প্রতিভাবান বলিয়া মনে করিয়া সাধারণ মানুষের দায়িত্ব অস্বীকার করে সেই প্রতিভার বিশেষ-অধিকার-লোলুপ মানুষের মনস্তত্ত্ব এখানে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বিজয় দাশ শৈশব হইতেই প্রতিভার স্বীকৃতি পাইয়াছে। তাহার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহাধ্যায়ীবৃন্দ সকলেই তাহাকে এক নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বেদীতে বসাইয়া তাহার জন্য অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, এই দেবতা মেকী, উহার প্রতিশ্রুতি কোনও দিন ফলপ্রসূ হইল না। শিক্ষা শেষ করার পর সে কয়েকটি উন্নাসিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎকেন্দ্রিক ফ্যাশান-নারি কা নারী কর্তৃক পুতুল-রাজপুত্রের ছদ্মগৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফ্যাশান বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও উন্নাসিক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা খাপছাড়া ব্যতিক্রম-কেই প্রতিভা বলিয়া ভুল করিতে অভ্যস্ত ও এই ভুল ভাঙিলে কালকের দেবতাকে আজকের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিতে উহাদের কিছুই বাধে না। হতভাগ্য বিজয় এই নিষ্ঠুর খেলার বলি হইয়াছে, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য-রচনায় তাহারই দায়িত্ব সর্বাধিক। এই প্রতিভার নেশায় মশগুল হইয়া সে অত্যন্ত স্বার্থপরের ন্যায় পরিবারের সেবা গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিদানে কিছুই করে নাই; সে আত্মনিবেদনে উৎসুক প্রেমের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছে; হিতৈষী ও অনুগত বন্ধুবর্গের স্তাবকতার কড়া মদ পান করিয়া আত্মম্ভরিতার আতিশয্যে বাস্তববোধ হারাইয়াছে; এমন কি যে জ্ঞান-সাধনার নিষ্ঠা প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ তাহাতেও ফাঁকির ফেনস্ফীতি, অস্থিরমতিত্বের মারামৃগবিভ্রান্তি ও মরীচিকা-অনুসরণ আরোপ করিয়া প্রতিভার প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে স্খলিত হইয়াছে। তাহার সব উজ্জ্বল স্বপ্ন একে একে ধূলিসাৎ হইয়াছে, মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিয়াছে ও প্রতিভাবান ও উন্মাদের মধ্যে যে ক্ষীণ সীমারেখা বর্তমান তাহাকে অতিক্রম করিয়া সে আত্মহত্যায় নিজ বিড়ম্বিত

জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে। আত্মপ্রতারিত প্রতিভার জীবন-রহস্যের কি মর্মভেদী ব্যথাই না এখানে উদাহৃত হইয়াছে।

এই উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা বিশেষ প্রশংসার্হ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর একটি উজ্জ্বল বাস্তবচিত্র এখানে অঙ্কিত হইয়াছে। কোন কোন লেখকের হাতে এই চিত্র ব্যঙ্গ-বিকৃত ও শ্লেষ-তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের আচরণে সরস্বতীর পূজাপীঠ যে পঞ্চশরের কেলিকুঞ্জে পরিণত হয় সে সম্বন্ধে অনেক চোখা-চোখা শব্দ ও তির্যক কটাক্ষ বর্ষিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু যে ছবিটি পাই তাহা সুস্থমনা তরুণ-তরুণীর প্রীতি ও সমবেদনায় স্নিগ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার চর্চা হউক বা না হউক, কোন কুৎসিত প্রবৃত্তিরও বিকৃত বিকাশ হয় নাই। এই উপন্যাসে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রেমের ও উহার প্রতিযোগিতার কথাও আছে। কিন্তু হতাশ প্রেম মনে একটি সুকুমার বেদনার ছাপ রাখিয়া যায়, ঈর্ষ্যাকুটিল, কুৎসামুখর, অশালীন পরিণতি লাভ করে না। ইহার আবহাওয়ায় একটা সহজ, উদার মানবিক প্রীতি, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ভুলের প্রতি ক্ষমা, দুর্ভাগ্যের প্রতি করুণা প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তির দক্ষিণবায়ু প্রবাহিত। বিজয়ের ভ্রান্ত আত্মপ্রসাদ এই অনুকূল পরিবেশে বর্ধিতই হইয়াছে, রূঢ় সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণবিদ্ধ হইলে হয়ত এই আত্মকেন্দ্রিকতার বায়ুযানযন্ত্র চুপসাইয়াই যাইত। Snobbery-র প্রতি স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ই ট্রাজিক পরিণতির ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়াছে।

লেখিকার শ্লেষনৈপুণ্যের যে কিছুমাত্র অভাব নাই তাহা তাঁহার উন্নাসিক সংস্কৃতি-সংস্থাগুলির বর্ণনাতেই বোঝা যায়। রেইনি পার্কে 'সিলেক্ট', উহার সদস্য-সদস্যা-পৃষ্ঠপোষকদের লইয়া অতি তীক্ষ্ণ, শানিত রেখায়, অবজ্ঞা ও ফাঁকি ধরার অকৃপণ ব্যঞ্জনায়, লক্ষ্যভেদনৈপুণ্যের উল্লাস-উত্তেজনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিবলি-বুলা-পিকপিক প্রভৃতি নামের মধ্য দিয়া ন্যাকামি ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অবজ্ঞামিশ্রিত পরিহাস বিচ্ছুরিত হইয়াছে। অথচ ইহাদের চরিত্রে বা আচরণে ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের পরিবর্তে এক অনায়াস-লব্ধ স্বভাবচিত্রণই দেখা যায়। প্রতিভার ভাব-পরিমণ্ডলে যে সমস্ত দুষ্টগ্রহ বিচরণশীল তাহাদের স্বরূপ লেখিকা সহজেই আবিষ্কার করিয়াছেন ও পাঠকবর্গকে উহার অম্ল-রস আস্বাদন করাইয়াছেন। পরিহাসের সীমা ও ওজনরক্ষায় লেখিকার মাত্রাজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য এখনও পরিণত বয়স প্রাপ্ত হন নাই—তিনি উপন্যাসক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগতা। তাঁহার প্রভাব-প্রতিশ্রুতি যে উজ্জ্বল মধ্যাহ্নদীপ্তির পূর্বাভাস ইহা সঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

(৬)

বাণী রায়ের বহুমুখী সাহিত্যসাধনায় উপন্যাসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের নিদর্শন মিলে না ও তাঁহার উগ্র ও ঝাঁজালো মানসিকতার মধ্যে মানব-চরিত্রের প্রতি নিরাসক্ত কৌতূহলও বিশেষ লক্ষণীয় নহে। মনে হয় যেন ব্যঙ্গরসিকসুলভ ত্রুটি-আবিষ্কার বা বিশেষ মনোভঙ্গীর উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত সমীক্ষাই তাঁহার উপন্যাসের মুখ্য প্রেরণা। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার তীক্ষ্ণ

মনীষা ও পরিবার-জীবনের একটি বিশেষ রূপরেখার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁহার স্বল্প-সংখ্যক উপন্যাসাবলীকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে।

'প্রেম' (১৩৪৬), 'শ্রীলতা ও সম্পা' (১৩৪৮-১৩৫৯), 'কনে-দেখা আলো' (১৩৫৭), 'আরও কথা বলো' (১৩৬০), 'সুন্দরী মঞ্জুলেখা' (১৩৬১) তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'প্রেম' এ প্রেমানুভূতির নানা স্বরূপ-বৈচিত্র্য, বিবিধ উপাদান ও আশ্রয়-গঠিত সত্তা-সাঙ্কর্য রূপালীর জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা-পর্যায় অবলম্বনে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হইয়াছে। রূপালীর মধ্যে ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা একটা সার্বভৌম রূপক-তাৎপর্যই বেশী করিয়া অনুভূত হয়। তাহার স্কুলের প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীদ্বয়, নানা বয়সের ও নানা প্রকৃতির পুরুষ বন্ধু, আত্মীয়স্বজন-মণ্ডলীর অন্তর্গত বিভিন্ন তরুণ, অনাত্মীয় যুবকের শোভাযাত্রা, কলেজের অধ্যাপক, গানের ওস্তাদ, চিত্রশিল্পী, মোটর-চালক, শিলং-এর পাঞ্জাবী ঠিকাদার, আমেরিকান অতিথি, সহাধ্যায়ী সঞ্জীব, ব্যারিষ্টার ইন্দ্রজিৎ—সবই একের পর এক রূপালীর প্রেমবহিস্ফুরণে কেহ বা কণামাত্র, কেহ বা অঞ্জলি ভরিয়া উপাদান-অর্ঘ্য যোগাইয়াছে। প্রেমাস্পদদের এই সুদীর্ঘ তালিকা ছাড়াও তাহার আর একজন অস্বীকৃত প্রেমিক, তাহাদেরই বাড়ীতে প্রতি-পালিত কর্মচারী-পুত্র নীরবে এই প্রেমলীলার সুদীর্ঘ অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও রূপালীর চরিত্রে তাহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে তাহার সমস্ত খামখেয়ালী, দৃশ্যতঃ অসঙ্গত আচরণ ও আত্মদোষক্ষালন-প্রয়াসকে এক চরিত্রানুযায়ী শৃঙ্খলাসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকার মধ্যে লেখিকার মন্তব্যের সমীচীনতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। তবে মনে হয় যে, উদাহরণের অজস্র প্রাচুর্যে প্রেমানুভূতির বিশিষ্টতা ও ক্রম-বিবর্তনধারা অনেকটা অস্পষ্ট হইয়াছে। দীর্ঘকাল-প্রসারিত হৃদয়চর্চার মধ্যে দেহকামনা কখনও স্ফুরিত, কখনও বা ভাবরোমন্থনে স্তিমিত হইয়াছে। প্রেম-পিপাসার অপরিমিত ব্যাপ্তি ও প্রেমপাত্রের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন হৃদয়াবেগকে কোন আশ্রয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে দেয় নাই ও উহার সুস্পষ্ট উপলব্ধিকে ব্যাহত করিয়াছে। বিবাহ পরিণতি কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগায় নাই; উহা আসিয়াছে জীবনব্যাপী-পরীক্ষাক্লান্ত মনের উপর স্তিমিতশিখ বহ্নিকণার ভস্মাবরণের ন্যায়—ইহা অভিসারী আত্মার তুষারসমাধি রচনা করিয়াছে।

'শ্রীলতা ও সম্পা' পরিকল্পিত একটি বৃহৎ উপন্যাসের দুইটি খণ্ড। এই অংশদ্বয়ে লেখিকার অভিপ্রায় ছিল এক বনিয়াদী জমিদার-পরিবারের কতকগুলি বদ্ধমূল আচার সংস্কারে গঠিত, অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধে অসাধারণ, একটি ভাবসত্তার পটভূমিকায় পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের বিশেষতঃ দুইটি তরুণী নারীর জীবন-ইতিহাসের পর্যালোচনা। শ্রীলতা ও সম্পার স্বচ্ছন্দ জীবনবিকাশ কখনও প্রতিরুদ্ধ, কখনও তির্যকপথাবলম্বী হইয়াছে, কোন বাহিরের প্রতিবন্ধকে নয়, নিজ পরিবারের রুচি ও জীবননীতির সর্বতোব্যাপ্ত প্রভাবে। এই আধুনিক আদর্শে শিক্ষিতা ভগ্নীদ্বয় পারিবারিক প্রভাবসঞ্চারিত এক সূক্ষ্ম আন্তর সঙ্কোচের জন্য নিজ নিজ জীবনকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা ও উপভোগ করিতে পারে নাই। শ্রীলতা নিজ কিশোরী-হৃদয়ের প্রেমচর্চার নানা পরীক্ষার পর হঠাৎ বড়লোক প্রতিবেশী দীপঙ্করের প্রণয়নিবেদনের পাত্রী হইয়াছে। কিন্তু এক অত্যুগ্র স্বাধীনতাস্পৃহা তাহাকে প্রেমানুভূতির রমণীয় আবেগ হইতে প্রতিহত করিয়া কেরাণীগিরির অরুচিকর জীবিকার্জনে প্রণোদিত করিয়াছে।

দীপঙ্কর তাহার প্রণয়পাত্রীর দাসত্বলাঞ্ছিত আত্মাবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ও শ্রীলতার বাকী জীবন তাহারই প্রতীক্ষায়, ব্যর্থ প্রেমস্বপ্নের রোমন্থনে, সমাজবিবিক্ত নিঃসঙ্গতায় কাটিয়াছে।

সম্পা শ্রীলতার কনিষ্ঠা ভগ্নী, সাধারণ জীবনের পথে, মধ্যবিত্ত সংসারের সহিত সমপ্রাণতায় আরও অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রতিবেশী ফ্লাটের বাসিন্দা সাহিত্যিক গৌতমের সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু রায়বাড়ীর প্রতিবন্ধকতায়, উহার সম্মিলিত বিবেকবুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধের প্রভাবে এই প্রেম মধ্যপথেই পরিত্যক্ত হইয়াছে ও সম্পাও এই পরিস্থিতিকে বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইয়াছে। এই উপন্যাসে রায়বাড়ীর বিভিন্ন ছেলে ও পুত্রবধূদের যে চরিত্র আঁকা হইয়াছে ও জীবিকার্জনে বাধ্য সাহিত্যসেবীর যে মানস পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক।

কিন্তু উপন্যাস দুইটির কেন্দ্রস্থ চরিত্র হইতেছে রায়বাড়ী পরিবারের আত্মিক সত্তা ও উহার একপ্রকার স্থূল, ভোগসর্বস্ব, আভিজাত্য-স্থবির জীবনবোধ। লেখিকা সমগ্র উপন্যাসে ইহারই প্রাধান্য, চরিত্র ও আচরণ-নিয়ন্ত্রণে ইহার সর্বাতিশায়ী প্রভাব পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রায়বাড়ীর সত্তার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি না। অন্যান্য বুনিয়াদি পরিবারের সহিত তুলনায় ইহার কোন অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ ইহা নিজের আদর্শে নিজেই স্থির নয়। ইহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহ, অবারিত মেলামেশা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্রয়, অবাঞ্ছিত অতিথির আবির্ভাব ও আভিজাত্যহীন ঐশ্বর্যের সহিত আপোষ সবই স্বচ্ছন্দে নিজ জীবনধারার অঙ্গীভূত করিয়াছে। ইহার ক্ষয়জীর্ণতার মধ্যে কোন দৃঢ় নৈতিক ভূমি, কোন নিজস্ব জীবনরীতির অস্খলিত ছন্দ আবিষ্কার করা যায় না। কেন্দ্রীয় সত্তার এই অস্পষ্টতা আনুষঙ্গিক চরিত্রাবলীর উপরও সংক্রামিত হইয়াছে।

'কনে-দেখা আলো'—উহার অভিধার মধ্যেই রূপকতাৎপর্য বহন করে। যেমন অস্ত-গোধূলির মায়া-রক্তিমা কুরূপাকেও সুন্দরীর ক্ষণিক বিভ্রমে সজ্জিত করে, তেমনি মন বা পারিপার্শ্বিকের অভাবনীয় দাক্ষিণ্য নীরস, গদ্যময় জীবনযাত্রাকে প্রেমের কল্পলোক-দ্যুতিতে রঙীন ও মোহময় করিয়া তোলে। উৎপলার খানিকটা প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় আছে। কিন্তু উহা তাহার ব্যক্তিপরিচয়কে আচ্ছন্ন করে নাই। সে রূপালীর মত প্রজা-পতিধর্মী নহে; তাহার একনিষ্ঠ চিত্ত একবার আবেগের আতিশয্যে সংযম হারাইয়া, প্রেমাস্পদের প্রতি মানস প্রতিক্রিয়ায় ও সংসারের গ্লানিকর পরিবেশপ্রভাবে প্রেমের প্রতিই বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। এই বিমুখতার কাহিনী কিছুটা অতিরঞ্জিত হইলেও সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার মামাতো বোন মিত্রার আন্তরিক ভালবাসা ও হিতৈষণা ও তাহার দেওর বরুণের অক্ষম, কিন্তু করুণ প্রীতি-প্রকাশ উৎপলার দুর্জয় অভিমান ও বিরক্তিকে গলাইয়া তাহাকে সংসারের মনোহর রূপ দেখাইয়াছে। অনন্ত-চরিত্রের স্বল্পভাষী, আত্মমর্যাদাপূর্ণ দৃঢ়তা, তাহার দাম্পত্য সমস্যায় অস্বস্তি তাহার আচরণে যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হরিমতির স্নেহে কোমল, সঙ্কোচে নিরুদ্ধ ও দারিদ্র্যকুণ্ঠিত

প্রকৃতিটি তাহার কন্যা-জামাতার প্রতি মনোভাবের প্রকাশে ভালই ফুটিয়াছে। বিশেষতঃ অনন্তর সংসার-চিত্রটির অভাব-কর্কশ, রুচিহীনতায় পীড়াদায়ক, ক্ষুদ্রস্বার্থে অস্বস্তিজনক ও উহার প্রীতিপ্রসন্ন, সহানুভূতি-স্নিগ্ধ, অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ—এই উভয় দিকের চিত্রই লেখিকার বাস্তববোধ ও অঙ্কনশক্তির উপাদেয় দৃষ্টান্ত। কনে-দেখা-আলোরই ইন্দ্রজাল-শক্তিতে শুধু বিমুখী উৎপলার নয়, সমস্ত সংসার-প্রতিবেশেরই এই অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই আলো যেমন একদিকে মোহাবিষ্ট করিয়া সংযম টুটায়, তেমনি অপর দিকে বস্তুর কঙ্কালে প্রাণের লাবণ্য সঞ্চার করে। এই উপন্যাসটি শুধু দক্ষ বাস্তব-চিত্রণে নয়, বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবানুরঞ্জনের সুষ্ঠু প্রকাশে উন্নত রচনার পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে।

'আরও কথা বলো' (১৯৬০) একখানি রহস্য-রোমান্স-জাতীয় উপন্যাস। কেয়া সোম নামে একজন আধুনিক গানরচয়িত্রী তরুণী একটা সাবেক কালের জীর্ণ বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতির অস্পষ্ট উদ্বোধনে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। শুধু স্মৃতি নহে, পূর্বজীবনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের দিনলিপি পর্যন্ত কোন অদৃশ্য শক্তি তাহার চোখের সামনে মেলিয়া ধরে। সেই পূর্বস্মৃতিজড়িত বাড়ীতে পা দিলেই তাহার সত্তা অতীত-স্বপ্ন-রোমন্থন ও বর্তমান জীবনের বাস্তব গতিবিধির মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব দুই জন্মের কাহিনী-স্মৃতি তাহার মনে জড়াজড়ি করিয়া জট পাকাইয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে, কলিকাতার নাগরিক রূপ পূর্ণবিকশিত হইবার পূর্বে সে তাহার সন্ত্যোবিবাহিত বরের সহিত শিবিকায় যাইতে যাইতে কলি-কাতার সম্ভ্রান্ত আদিম বংশের তৎকালীন কর্তা শেঠবাবুর ভাড়াটে দস্যুদল কর্তৃক অপহৃত হইয়া এক চীন-যাত্রী সাহেবের বজরায় নীত হয়। তাহার ঠিক পরজন্মে সে এক অভিজাতবংশীয়, প্রাচীন-প্রথা-শাসিত পরিবারের ইংরাজী শিক্ষার্থী তরুণ যুবকের সঙ্গে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শ্বশুর-গৃহের এক দুর্বোধ্য বিধি-নিষেধবিড়ম্বিত সংসার-জীবনের অঙ্গীভূত হয়। সেই পরিবারের বীভৎস প্রথা-অনুসারে স্বামীর সহিত প্রথম মিলনের পূর্বে তাহাকে কুলগুরুর উপভোগ্যা করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। সেই কালরাত্রিতে তাহার শ্বশুরের অবৈধ বাণিজ্যের সহকারী এক চীনের সাহায্যে সে উদ্ধার লাভ করে, কিন্তু তাহার উদ্ধারকর্তা তাহার স্বামী ও গুরু উভয়কেই হত্যা করিয়া নববধূর জীবনকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এ জন্মে কেয়া সোমের সত্তা তাহার এবং তাহার ভগ্নী চম্পার যুগল জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে, ও তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের দুর্ভাগ্যপরিবেশ ও নিয়তি-নির্দিষ্ট শত্রুবৃন্দ পুনরাবির্ভূত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে দুর্ভাগ্যের চরম পরিণতি প্রতিরুদ্ধ হইল। অপহরণ-প্রয়াস কেয়াকে বাদ দিয়া চম্পার উপর জাল ফেলিল; চম্পা তাহার পূর্বজন্মে অবিকশিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে আপনাকে বিপন্মুক্ত করিল ও জন্ম-জন্মান্তরের অভিশপ্ত উত্তরাধিকার হইতে চির-অব্যাহতি পাইল। পূর্ব-স্মৃতির অস্পষ্ট ইঙ্গিত, অতীত জীবনের আতঙ্কিত ছায়া, জন্ম-পরম্পরার মধ্যে আভাসিত গ্রন্থি-বন্ধন প্রভৃতি রহস্য-সঙ্কেতগুলি সুবিন্যস্ত হইলেও সমস্ত কাহিনীর অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে ও অতিপ্রাকৃতের সুদূর আভাস আমাদের মনে

বিচ্ছিন্ন শিহরণ জাগাইলেও সুসংহত শক্তিতে আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।

'সুন্দরী মঞ্জুলেখা' (১৯৬১) একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের রুচিসম্পন্ন মেয়ের বিবাহিত জীবনে নিজ শোভন রুচি ও সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠার দুরন্ত অধ্যবসায়ের কাহিনী। মঞ্জুর স্বামী উপার্জনে নিবিষ্টচিত্ত ও সংসার-সাজানোর চেষ্টার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন অধ্যাপক। মঞ্জুর স্বামীর সহিত সম্পর্ক অন্তরঙ্গ হয় নাই—সে স্বামী, এমনকি পুত্রকন্যা অপেক্ষা সংসারকে ঢের বেশী ভালবাসিত। তাহার সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করিয়াছিল সংসারের সুশৃঙ্খল পরিচালনায় ও জীবনে রুচি ও স্বচ্ছন্দতার মান-উন্নয়নে। কাজেই তাহার চরিত্রের মানবিক দিক অপেক্ষা তাহার সুগৃহিণীত্বই অধিক পরিস্ফুট। শেষে তাহার স্বামীর মারাত্মক অসুখের সময় তাহার বাহ্য চাকচিক্যের মোহ টুটিয়া সহজ, সুন্দর, উপকরণভারহীন জীবনের আকর্ষণ প্রধান কাম্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কনে-দেখা-আলোর রূপক এখানে দুর্যোগরাত্রির অবসানে সদ্য-উদিত শুকতারার মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। উপন্যাসটি সুলিখিত, কিন্তু মঞ্জুর সাধারণ সাংসারিকতার সাধনার মধ্যে কোন উন্নত জীবনসত্যের সাক্ষাৎ মিলে না।

বাণী রায়ের উপন্যাসক্ষেত্রে চক্রাবর্তন কোন সুস্পষ্ট অগ্রগতির রূপ লইবে কি না তাহা অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ শক্তি কোন স্থির সাধনায় মহৎ প্রকাশের প্রেরণা লাভ করিবে কি না তাহা অনুমানের পর্যায়ভুক্তই রহিল।

(৭)

লীলা মজুমদারের 'চীনে লণ্ঠন' (১৯৫৮), 'শ্রীমতী' (১৯৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ), 'জোনাকি' (১৯৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলার ইঙ্গ-বঙ্গ, মহিলা-শাসিত সমাজের উপভোগ্য চিত্রে উপন্যাসের ক্ষেত্র-পরিধি বর্ধিত করিয়াছে। ইহাদের সমাজ-পরিবেশ প্রায় অভিন্ন। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেও একরূপ পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সব কয়টি উপন্যাসেই নারী-প্রাধান্য; এই সমস্ত নারীর অধিকাংশই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া, নিঃসঙ্গতায় করুণ, স্মৃতিভারে অবসন্ন, জীবনের শূন্যতাবোধে নৈরাশ্যক্লিষ্ট। ইহারা সবই পাশ্চাত্ত্য জীবন-চর্চায় অভ্যস্ত, চা-এর আসর, ক্লাব, সভা-সমিতিতে বিচরণশীল, আপন ঐশ্বর্য ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন, শ্রেণী-চেতনায় সাধারণ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বন্ধে ছোট-খাট ঈর্ষ্যা-নিন্দা-দ্বেষ-তাচ্ছিল্যের তীক্ষ্ণ প্রকাশে মুখর ও জীবনরসোচ্ছল। প্রায় শত বৎসরের বিলাতী রুচি, আদব-কায়দা ও জীবননীতির অনুশীলনের ফলে এই নূতন সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের ধার-করা বিজাতীয়তা কলিকাতার উন্নাসিক পরিবেশে ও কালচার-বিলাসী বাঙালী মানস প্রবণতার আন্তরিক সমর্থনে যেন এই মুষ্টিমেয় সমাজে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রমীলার রাজ্যে পুরুষের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত—পুরুষ আসে কেবল অনূঢ়া মেয়েদের প্রণয়গত প্রয়োজনে। মনে হয় স্বাধীন ভারতে কলিকাতার অভিজাত-মহলে উপনিবিষ্ট Paris ও Picadillyর এই খণ্ডাংশ নিতান্তই বাঙালী সমাজে পরগাছার ন্যায় মূলহীন ও ক্ষণিক পরমায়ুর অধিকারী। বিদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর মর্যাদালোপের পর, উহার রুচিগত আদর্শ ও ফ্যাসনের চটুলতা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অভাবে দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। লেখিকা ইহার ক্ষণিক জীবনকালকে

সাহিত্যে ধরিয়া রাখিয়া বাঙালী জীবন-স্রোতের একটি দ্রুতবিলীয়মান রঙীন বুদ্‌বুদ্‌বিলাসের স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছেন।

এই বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার দল ছাড়া কয়েকটি তরুণ-তরুণীর প্রাণলীলা ও প্রণয়াকৃতিও উপন্যাসসমূহে গতিবেগচাঞ্চল্য ও রং-এর মেলার সঞ্চার করিয়াছে। এক নায়িকা ছাড়া বাকী সকলেই গৌণ-চিত্র—তাহাদের যাহা কিছু আকর্ষণীয় তাহা ব্যক্তিগত নহে, সমষ্টিগত। ইহারা প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে আলাপে-ইঙ্গিতে-গুঞ্জনে জীবনপ্রীতির পরিচয় দেয়, মেলায় জড়-হওয়া অগণ্য নর-নারীর মত এক অখণ্ড প্রাণপ্রবাহের অংশরূপে তাৎপর্য আহরণ করে। ইহারা কেহ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্লেষণযন্ত্রের সম্মুখে নিজ ব্যক্তিরহস্য ব্যক্ত করে না। দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাদিগকে চেনা যায় না। এক ঝাঁক পাখীর মত ইহাদিগকে একগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিতে হয়। মিনিদি, মিনা মাসী, মেমো, অনুরাধা, রিনি, সুকোমল, টিলি, লেডি চক্রবর্তী, বিপাশা প্রভৃতি ('চীনে লণ্ঠন') এই দ্রুত ঘূর্ণ্যমান মানবচক্রের এক একটি কণা। রাঙাদিদিমণি তাঁহার অতি-বার্ধক্যের ছেলেমানুষী ও খেয়ালীপনার জন্য, তাঁহার দীর্ঘ জীবনসঞ্চিত স্মৃতিপুঞ্জের অকস্মাৎ উৎক্ষেপের জন্য ও তাঁহার জীবনদর্শনের সুস্পষ্টতার জন্য অনেকটা সজীব হইয়াছেন। মিনা মাসী ও রুমা রাঙাদিদিমণির সহিত সংস্রব ও উহার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্যই খানিকটা এই সজীবতার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

পলাশ ও মল্লিকা তাহাদের উপন্যাসব্যাপী সক্রিয়তা সত্ত্বেও ঠিক প্রাণবন্ত হয় নাই। মল্লিকার জীবনানুভূতি কোন বিশিষ্ট রূপ পায় নাই ও পলাশও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে উপন্যাসের ঘটনাবলীর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিয়াছে। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও শেষ পর্যন্ত মিলনমধুর পরিণতি লাভ করিলেও, অনির্দেশ্যতার কুয়াশাকে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্যামলী-মোহনের গৌণ আখ্যানটিও মূল আখ্যানের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট হয় নাই ও উহাদের প্রণয়-চিত্রও অস্পষ্টতায় তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

'শ্রীমতী' উপন্যাসটি অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রতিবেশের অনুচিত প্রাধান্যমুক্ত। ইহার কারণ এই যে, শ্রীমতী এলামাসী, বেলামাসী, মিলিমাসী, লকেট, বকেট, চারুশীলা মাসী, রিনিমাসী, মিনিদি প্রভৃতি ফ্যাশানদুরন্ত, ইংরাজীসভ্যতাপুষ্ট দলের সান্নিধ্যে আসিলেও ইহাদের দ্বারা অভিভূত হয় নাই। তাহার সময় কাটিয়াছে অধিকাংশ চাঁপাডাঙার স্কুল-প্রতিবেশে ও তাহার মাতা ভূতপূর্ব অভিনেত্রী পদ্মাসনার রোগশয্যার পার্শ্বে ও স্নেহামন্ত্রণের ঈষৎ-কুণ্ঠিত স্বীকৃতির মধ্যে। তাহার জীবনে দুইটি প্রভাব তাহাকে ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রে স্থির রাখিতে সহায়তা করিয়াছে—প্রথম, রমেশ চৌধুরীর আত্মনির্ভরশীলতার পোষক শিক্ষা-দীক্ষা, দ্বিতীয়, তাহার মাতার প্রতি সমাজের বাধা-ডিঙানো সেবাশুশ্রূষা। শ্রীমতীর নিজের পরানুগ্রহনির্ভর দারিদ্র্য ও তজ্জনিত কুণ্ঠা তাহাকে সমাজের অন্য সকলের সহিত সমকক্ষ মর্যাদায় মিশিতে বাধা দিয়াছে। স্কুলের নির্জন পরিবেশে সে নিভৃত আত্মচিন্তা ও আত্মোপলব্ধির প্রচুর অবসর পাইয়াছে। শ্রীমতীর শান্ত, নির্লোভ, কৃতজ্ঞ, কর্তব্যনিষ্ঠ মনটি সংসারের দুর্গম পথে চলিতে সব সময়েই প্রস্তুত ছিল। সে জীবনের নিকট কোন সুখ প্রত্যাশা করে নাই বলিয়াই কৃচ্ছ্রসাধন তাহার পক্ষে দুরূহ ছিল না। শুভেন্দুর প্রতি তাহার

মনোভাব কৃতজ্ঞতা ও প্রণয়োন্মেষের সীমারেখার অনিশ্চিত নিশ্চলতায় স্তব্ধ হইয়াছিল। এই কর্তব্যের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে দুইটি আঘাতের অঙ্কুশ উহার অন্তর্নিহিত হৃদয়াবেগকে আলোড়িত করিল—প্রথম, তাহার মায়ের আহ্বান ও তাহার সুপ্ত স্নেহের উদ্বোধন; দ্বিতীয়, তাহার অভিনেত্রী হইবার সংকল্পের প্রতি শুভেন্দুর কঠোর ভর্ৎসনা। চাঁপাডাঙার শিক্ষিকাদের জীবনধারা-পর্যবেক্ষণে, ললিতার বিবাহিত জীবনের তৃপ্তির সহিত সহানুভূতিতে, মিস্ বিশ্বাসের স্নেহকোমল কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়ে তাহার আত্মানুভূতি দৃঢ়তর হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। শুভেন্দুর প্রণয়স্বীকৃতি ও বিবাহপ্রস্তাব আত্মোন্মেষের এই পটভূমিকায় যথাযথ ও সঙ্গত মনে হয়। শুধু রমেশবাবু যে কেন তাহাকে সমস্ত গ্রন্থাগারটি দান করিয়া গেলেন, তাহার রুচি ও অভ্যাসের মধ্যে তাহার কোন যৌক্তিকতা দেখা গেল না। যাহাকে জীবনগ্রন্থ-অধ্যয়নে এত বেশী সময় দিতে হয়, তাহার ছাপান বই পড়ার বেশী সময় না থাকারই কথা।

'জোনাকি' উপন্যাসে প্রতিবেশ-প্রভাব ও ব্যক্তিজীবনের পরিণতি—উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা হইয়াছে। এখানে প্রতিবেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নয়, দুই একটি পরিবারে ও উহার নিয়মিত অতিথিগোষ্ঠীতে কেন্দ্রীভূত। হেমনলিনী ও মণিকা এক পরিবারের ও নয়নতারা আর একটি পরিবারের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছে। এই বয়স্কাদের রচিত পরিবেশে মন্দিরা ও অনিলা এই দুই তরুণী ও ব্রজসুন্দর, প্রৌঢ় যুবক, আপন আপন জীবন-নাট্য অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। মন্দিরার পূর্ব ইতিহাসে প্রণয়-প্রত্যাখ্যাতার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। ব্রজসুন্দর বিপত্নীক, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নয়নতারার কড়া অভিভাবকত্বে তাহার সমস্ত চপল মনোবৃত্তি সংহরণ করিয়া নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতেছে। হেমনলিনী ও মণিকা নিজ নিজ দৃঢ় সংস্কারে সুরক্ষিত, অতীত জীবন-অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে স্থির ও নূতনের অভ্যাগমে আতঙ্কিত মনোভাব লইয়া তাঁহাদের বাকী দিনগুলি কাটাইতেছেন। ইহাদের একমাত্র অবলম্বন পূর্বজীবন-রোমন্থন, অতীত সুখ ও বর্তমান অতৃপ্তির খেদক্লিষ্ট পর্যালোচনা ও তরুণী আত্মীয়াদের জীবনে নানা বিধি-নিষেধের আরোপে নিজেদের অভিভাবকত্বের নীরস কর্তব্যপালন। তথাপি ইঁহারা নিঃস্নেহ নহেন ও ইঁহাদের জীবনদর্শনের মধ্যে একটা করুণ শূন্যতাবোধের প্রগাঢ় ছাপ আছে। নিঃসঙ্গ, জীবনবিমুখ, বৃদ্ধমহিলাসুলভ মেজাজ ইঁহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট—ইঁহারা সামান্য কারণে বিচলিত হন, ও চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেন। মন্দিরার ব্যর্থ প্রণয় তাহার জীবনের কোমল দিকটা অনেকটা অসাড় করিয়াছে ও জীবনের নিষ্ফল যান্ত্রিকতার প্রতি তাহাকে ধ্রুববিশ্বাসী করিয়াছে। তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনিলার তীব্র, নির্লজ্জ জীবনভোগস্পৃহা, তাহার বহির্মুখী সঙ্গলোলুপ মনোবৃত্তি, তাহার প্রণয়োন্মুখ যৌবনচাঞ্চল্য—এ সমস্তই মন্দিরার চরিত্রের বৈপরীত্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। মন্দিরা ও শ্রীমতীর মধ্যে তুলনায় মন্দিরা আরও সজীব ও অন্তরানুভূতিসম্পন্ন। ব্রজসুন্দরের জীবনে যে আকস্মিক ঘটনায় বৈচিত্র্যের অবতারণা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য তাহার প্রতি মন্দিরার একটা প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করিয়া উহাদের মিলনকে বিলম্বিত করা। ব্রজসুন্দর উপন্যাসের প্রয়োজনে পরিকল্পিত, নিজস্ব অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। শেষ পর্যন্ত মন্দিরা-প্রত্যাখ্যানকারী

পূর্বপ্রণয়ী শঙ্করের সহিত অনিলার ও ব্রজসুন্দরের সহিত মন্দিরার মিলন ঘটিয়াছে এবং হেমনলিনী তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার ও হিন্দুবিবাহবিরোধিতা সত্ত্বেও এই মিলনকে তাঁহার আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছেন।

লীলা মজুমদার একটি বিশেষ সমাজের ও বিশেষ-সম্প্রদায়ভুক্ত বর্ষীয়সী নারীগোষ্ঠীর মনের চিত্র আঁকিয়া উপন্যাসক্ষেত্রে কিছুটা নূতনত্বের প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহার ঔপন্যাসিক মূল্য ছাড়াও একটা সমাজপরিচয়গত মূল্য আছে। এই নারীগোষ্ঠীর মনের সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা, একইরূপ ভাব ও চিন্তার পৌনঃপুনিক আবর্তন, জীবনকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার চিরাভ্যস্ত প্রবণতা সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার তিনখানি উপন্যাসে একই সমাজ-পরিবেশ ও প্রায় একই রকম চরিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ইহাতে কিছুদিনের মধ্যেই এক ক্লান্তিকর একঘেয়েমি আসার সম্ভাবনা আছে। লেখিকার ঔপন্যাসিক দৃষ্টি এই অভ্যস্ত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মানব-জীবনের কোন নূতন খণ্ডাংশে নিবদ্ধ হইতে পারিবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই তাঁহার পূর্ণতর বিকাশ নির্ভর করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস

(১)

ইংরেজী সাহিত্যে রসিকতার প্রকার-ভেদ লইয়া বিতর্কের অন্ত নাই। বিশেষতঃ Humour ও Wit—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যবিচারে সমালোচকেরা যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিচার-বিতর্কের ফলে যাহা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা মোটামুটি এই—Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি-খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য-আবিষ্কার। Humour-এ বুদ্ধির তীব্র দীপ্তির সহিত সহানুভূতির করুণ শীতল স্পর্শের একপ্রকার অপরূপ সম্মিলন—মুখের হাসি ও চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যসৃষ্টি। Wit-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ লীলা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু ইহার কথা-লোফালুফির ও অদ্ভুত ব্যায়াম-কৌশলের মধ্যে কোন হৃদয়গত গভীর আলোড়নের স্পন্দন অনুভূত হয় না। ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকটা দ্বৈরথ-যুদ্ধের নির্মম শক্তিবিকাশের পরিচয় মিলে—ইহার আক্রমণে একপ্রকারের নিষ্ঠুরতা, মানুষের সুকুমার ভাবপ্রবণতার প্রতি একটা উদ্ধত ঔদাসীন্যের সুর ধ্বনিত হয়। Humour-এর গভীর সহানুভূতি বুদ্ধির তীক্ষ্ণ, চোখ-ঝলসান চাক্‌চিক্যের উপর একটা স্নিগ্ধ-শ্যাম আবরণ পরাইয়া দেয়। ইহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ইহার সমালোচনা হৃদয়ের গোপন অশ্রু-প্রবাহের শীকরসিক্ত হইয়া উহাদের সমস্ত উগ্র ঝাঁজ হারাইয়া ফেলে ও একপ্রকার স্নেহমণ্ডিত অনুযোগে রূপান্তরিত হয়। Wit-এর প্রধান দৃষ্টান্ত Shakespeare-এর প্রথম যুগের নাটক ও সপ্তদশ শতাব্দীর (Restoration যুগের) নাটকাবলী। Humour-এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত Shakespeare-এর শেষ বয়সের রচিত নাটক ও উনবিংশ শতাব্দীতে Lamb-এর রচনা।

Wit ও Humour-এর মধ্যে আর একপ্রকারের প্রভেদ অনুভূত হয়, যাহা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। Wit একটা মুহূর্তস্থায়ী আতসবাজির সহিত তুলনীয়—ইহাতে লেখকের জীবনের প্রতি একটা সমগ্র ব্যাপক দৃষ্টির কোন পরিচয় মিলে না। ইহা কোনরূপ চরিত্রগত অভিব্যক্তি নহে—ইহার ক্ষণিক বিদ্যুৎ আলোকে লেখকের চরিত্র ও সাধারণ মনোভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। Humour-এর গভীর আবেদনের (appeal) একটা কারণ এই যে, ইহার পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন-সমালোচনার একটা মৌলিক, গতানুগতিকতা-বর্জনকারী ভঙ্গীর পরিচয় মিলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসংগতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড়, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত মতবাদ অখণ্ডনীয় সত্যের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, humorist-এর হাসির খোঁচা এক ঝলক অতর্কিত আলোকের মত সেই সমস্ত ভ্রান্তি ও অসংগতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আমাদের জীবনের বিচারধারাকে, শোভন-অশোভন-নির্ধারণের মানদণ্ডকে আমূল

পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাহার হাসির মধ্যে এই স্বচ্ছ, ভ্রান্তিনিরসনকারী আলোক-প্রাচুর্য আছে বলিয়াই ইহা আমাদিগকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। Humorist তাঁহার হাসির সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যেখানে আমরা গম্ভীর সেখানে আমরা হাস্যাস্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহাস্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতির অধিকারী। তিনি জীবনের প্রতি একটা বক্র, বঙ্কিম দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রচলিত, ব্যবহারিক সত্যের অভ্যন্তরে অলক্ষিত, বিস্মৃত সত্যের আবিষ্কার করেন, এবং এই আবিষ্কারের অতর্কিতত্ব ও আবিষ্কার-প্রণালীর মৌলিকতা আমাদের চমক ভাঙাইয়া আমাদিগকে অসংবরণীয় হাস্যোচ্ছ্বাসে স্ফীত করিয়া তোলে। এই হিসাবে humorist দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী—বৈদান্তিক যেমন এই স্থূল, বাস্তব জগৎকে মায়া ও তৎপ্রতি আমাদের আসক্তিকে আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, হাস্যরসিকও সেইরূপ আমাদের সহজ গতিবিধির মধ্যে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, আমাদের সাধারণ বিচারপ্রণালীর মধ্যে উপলব্ধির অতীত ভ্রমসংকুলতা দেখাইয়া জীবনকে সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরাইতে চাহেন। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ যাহা কিছু তাহা প্রণালীর। বৈদান্তিক গম্ভীরভাবে, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁহার তত্ত্ব প্রচার করিতে চাহেন, হাস্যরসিক একটিমাত্র বক্রোক্তি, একটিমাত্র অনায়াসোচ্চারিত, হাস্য-তরল মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনের উপর হইতে বদ্ধমূল সংস্কারের ঘন যবনিকা অপসারিত করেন।

অবশ্য রসিকতার এই উচ্চ আদর্শ ও সূক্ষ্ম সংস্করণ উপন্যাস অপেক্ষা সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ-(essay) জাতীয় রচনাতেই অধিকতর প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইংরেজী সাহিত্যে Lamb-এর প্রবন্ধাবলী ও Shakespeare-এর পরিণত বয়সের নাটকের কোন কোন চরিত্র-চিত্রণ ইহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঔপন্যাসিকেরা সাধারণতঃ এরূপ ব্যাপক জীবন-সমালোচনার ভিতর দিয়া নিজ রসিকতার পরিচয় দিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদের অন্যান্য কর্তব্যের চাপ তাঁহা-দিগকে এইদিকে অখণ্ড মনোযোগ দিবার অবসর দেয় না। ইংরেজী উপন্যাসে এইরূপ humorist-এর নাম অঙ্গুলিতে গণনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Fie'ding ও Sterne, ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে Dickens—এই কয়েকটি ঔপন্যাসিক মাত্র উপন্যাসক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে humour প্রবর্তনের গৌরব দাবী করিতে পারেন। আবার ইহাদের মধ্যেও একমাত্র Sterne প্রকৃত humorist-পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী—তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র Uncle Toby এই উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম রসিকতার একজন পূর্ণপরিণত, নিখুঁত প্রতীক। তাহার ব্যবহারের উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও মন্তব্যের বাহ্যতঃ অযৌক্তিক একদেশদর্শিতার মধ্যে একটা স্বচ্ছ, গভীর সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। তাহার হাসি অপরিমেয় করুণায় ভরা, তাহার পিছনে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অবিচারে বঞ্চিত হতভাগ্যদের প্রতি অকৃত্রিম কারুণ্য ও সমবেদনা, পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দুর ন্যায় টলটল্ করিতেছে। ইহার সহিত তুলনায় Fielding ও Dickens-এর রসিকতা অনেকটা স্থূল, অগভীর ও আতিশয্যদুষ্ট। Fielding তাঁহার চরিত্রদিগকে সর্বদাই মারামারি, ছুটাছুটি, প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অথচ হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রকারের লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। Dickens-এর রসিকতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ও

জটিল প্রকৃতির। তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর মধ্যে সমবেদনা-গভীর, অশ্রুসজল হাস্যরসের অভাব নাই—তথাপি তিনি মোটের উপর চেহারার বিকৃতি, কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গীর অশ্রান্ত পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি সুলভ উপায়ে—অর্থাৎ এক কথায় ব্যঙ্গমূলক অতিরঞ্জন প্রবণতার দ্বারা হাস্য উদ্দীপন করেন। তাঁহার অমর সৃষ্টি পিক্‌উইক-চরিত্রে এই উভয় প্রকারের রসিকতার সমন্বয় হইয়াছে। পিক্‌উইক একদিকে জীবনের সাধারণ ব্যবহার ও কর্মক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধিহীনতা. সাংসারিক জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন—অন্যদিকে তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা এবং আন্তরিক, অথচ কার্যতঃ নিষ্ফল হিতৈষণা, তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্যের সহিত কৌতুকপ্রিয়তার সম্মিলন, তাঁহার সমস্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের মধ্যে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় করিয়াছে। অন্যান্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকের humour দুই একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য, বা দুই একটি অপ্রধান চরিত্র সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ -তাঁহারা ব্যাপক ও সমগ্রভাবে সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়া কৌতুকরসের প্লাবন বহাইতে চেষ্টা করেন নাই।

বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই প্রকার রসিকতা-প্রবর্তনে অগ্রণী হইয়াছেন। প্যারীচাঁদের প্রায় সমস্ত মুখ্য চরিত্রই বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর, ঠকচাচা প্রভৃতি—এই কৌতুককর হাস্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। লেখকের চরিত্র সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রেরণা আসিয়াছে এই হাস্যরস প্রবর্তনের চেষ্টা হইতে। দীনবন্ধুর রচনায় Verbal wit বা কথাকাটাকাটির যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার নিমচাঁদ-চরিত্র উচ্চাঙ্গের humour-এর অভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নিমচাঁদের রসিকতাপূর্ণ উক্তিগুলি কেবল তাহার বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত নহে, কেবল উত্তর-প্রত্যুত্তরের মল্লযুদ্ধ নহে—ইহা তাহার অন্তরের গভীরতর প্রদেশের সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহার সমগ্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। তাহার মদ্যাসক্তি কেবল এক প্রকারের বাহ্য উচ্ছৃঙ্খলতা বা নীচ ভোগ-ব্যসন মাত্র নহে, ইহা তাহার অন্তঃপ্রবাহিত ইংরেজি শিক্ষার উগ্র উন্মাদনা ও ভাবঘন নেশার বহিঃপ্রকাশ। নিমচাঁদ একজন সাধারণ শৌণ্ডিকালয় বিহারী, নর্দমাশায়ী মাতাল নহে, তাহা হইলে তাহার চরিত্রে কোন প্রকার মহত্ত্ব বা গৌরব থাকিত না। তাহার বাহিরের নেশা তাহার মানস মত্ততার ফেনিল বিচ্ছুরণ হিসাবে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহার রসিকতা ইংরেজি কাব্য সাহিত্যবিলাসের গন্ধসারের উগ্র সৌরভে পরিব্যাপ্ত, বাঙালীর মানসক্ষেত্রে নবোদ্ভিন্ন ইংরেজি-অনুশীলন-বৃক্ষের মুকুল-গন্ধ-ভারাক্রান্ত। এই হিসাবে নিমচাঁদ Shakespeare-এর Falstaff-এর সহিত তুলনীয়—উভয়েরই রসিকতা তাহাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের সহিত নিগূঢ় সম্পর্কান্বিত, তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সুপরিণতির (ripeness) বহির্বিকাশ।

(২)

বাঙালার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—তাঁহাদের উপন্যাসে humour-এর প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখান নাই। অবশ্য তাঁহাদের সৃষ্ট দুই একটি চরিত্রে, তাহাদের কথোপকথনে ও লেখকদের বিশ্লেষণ-মন্তব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে উপভোগ্য রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে humorist-রূপে পরিগণিত

হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ্‌ প্রভৃতির চরিত্র অবিমিশ্র ভাঁড়ামির উদাহরণ। তাঁহার আসমানি, দিগ্‌বিজয়, গিরিজায়া, প্রভৃতি পরিচারক-শ্রেণীর পাত্রপাত্রীর মধ্যে চালাকি ও বোকামিতে মেশামেশি একপ্রকারের রসিকতা আছে। তাঁহার মানিকলালের (রাজসিংহ) সরস বাক্‌চাতুর্য, উদ্ভাবন-কৌশল ও অফুরন্ত স্ফূর্তি তাহাকে humorous চরিত্রের অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ে স্থান দিয়াছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে দৃশ্য-বিশেষে রসিকতার প্রাচুর্য ছাড়াও 'ইন্দিরা' গল্পটি আগাগোড়া humorous strain বা রসিকতার সুরে বাঁধা। কিন্তু এ সমস্তের জন্য humorist-মহলে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানের দাবী করিতে পারেন না। যে গ্রন্থের উপর তাঁহার এই দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা মোটেই উপন্যাস নহে, তাহা তাঁহার রস সন্দর্ভ 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ১২৮০ হইতে ১২৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে পূর্বে humour-এর যে সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। এই প্রবন্ধগুলিতে জীবনের তীক্ষ্ণ, মৌলিক বিশ্লেষণ, সমালোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী কল্পনাসমৃদ্ধিযোগে অপরূপ ও বিশুদ্ধ হাস্য-কিরণ-সম্পাতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, গভীর চিন্তাশীলতা, জীবনের করুণ রিক্ততা ও বঞ্চনার আবেগ-কম্পিত উপলব্ধির সহিত হাস্যোদ্দীপক, লীলায়িত অথচ সূক্ষ্ম সংযমবোধনিয়ন্ত্রিত কল্পনা বিলাসের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আবার এই কল্পনা বিলাস ও হাস্যরসেরও নানাপ্রকারের সূক্ষ্ম স্তর-বিভেদ অনুভব করা যায়। কল্পনা কোথাও শান্ত, মৃদু, গভীর চিন্তার ভারে আত্ম-সংবৃত ও মন্থরগতি; কোথাযও বা তীব্র-আবেগ-কম্পিত, কোথাযও বা বাধাবন্ধহীন, পূর্ণোচ্ছ্বাসিত। তেমনি হাস্যরসও কোথাযও অতি-সংযত, অলক্ষিত-প্রায়, একটু বক্র কটাক্ষ ও ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম আন্দোলনে মাত্র প্রকাশিত, কোথায়ও farce-এর মত উতবোল, উচ্চকণ্ঠ; কোথাযও বা comedy-র উদার প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস, কোথায়ও বা tragedy-র গম্ভীর-বিষণ্ণ আভাসে স্নিগ্ধ-সজল। ভাব-রাজ্যের সুরগ্রামের সমস্ত উচ্চ-নীচ পর্দা ও তাহাদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম মীড়-মূর্ছনার উপর লেখকের সমান অধিকার—'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি তান-লয়-শুদ্ধ সংগীতের মত আমাদের রসবোধকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, humour-এর লক্ষণ হইতেছে—একটি অসাধারণ দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে জীবনের পর্যবেক্ষণ ও তাহার প্রচলিত গতির মধ্যে নানা বক্ররেখা ও সূক্ষ্ম অসংগতির কৌতুককর আবিষ্কার। অনেকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে একটা প্রবল, সর্বব্যাপী, হাস্যকর অথচ গভীর-অর্থপূর্ণ কল্পনার ভিতর দিয়া দেখিয়াছেন, সেই কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 'মনুষ্য-ফল', 'পতঙ্গ', 'বড়-বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', 'পলিটিক্‌স', 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধগুলি এই প্রণালীর উদাহরণ। এই সমস্ত প্রবন্ধেই জীবনক্ষেত্রে কল্পনার প্রয়োগ খুব স্বাভাবিক হইয়াছে ও উপমাগুলির নির্বাচন সাদৃশ্য-আবিষ্কারের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। হয়ত স্থানে স্থানে তুলনার মধ্যে একটু কষ্টকল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, হয়ত কোথাও কোথাও

জীবন-সমালোচনা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনাবিলাসী (far-fetched) বলিয়া আমাদের মৃদু প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়। কিন্তু লেখকের অনুভূতির প্রখরতায়, কল্পনা-স্রোতে প্রবল প্রবাহে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ কোথায় ভাসিয়া যায়। এই সমস্ত প্রবন্ধে ভাবের নৌকা কল্পনার প্রবাহ-বিস্তারে এরূপ অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া যায় যে, কোথাও বাস্তবের অর্ধমগ্ন চড়ায় ঠেকিয়া বা বিরক্তিকর পৌনঃপুনিক আবর্তনের ঘূর্ণিচক্রে পাক খাইয়া ইহার অগ্রগতি প্রতিহত হয় না। আকাশে মেঘে স্তরবিন্যাসের মধ্যে যেমন একটি সূক্ষ্ম, অথচ সুস্পষ্ট পর্যায়-রেখা অনুভব করা যায়, এক বর্ণ যেমন প্রায় অলক্ষিতভাবে, অথচ সুষমার সহিত বর্ণান্তরে মিলিয়া যায়, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সন্দর্ভগুলিতেও প্রসঙ্গপরিবর্তন-রীতির মধ্যে (methods of transition) সেইরূপ একটি স্বচ্ছন্দ, ক্ষিপ্র লঘুগতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাধারা নদীর বাঁকের মত অত্যন্ত অনায়াসগতিতে, সাবলীল ভঙ্গীতে অথচ অনিবার্য-নিয়মাধীন হইয়া মোড় ফিরিয়াছে—যেখানে লেখক তরল রঙ্গরস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ হইতে হঠাৎ উচ্চনীতিবাদের অচপল গাম্ভীর্যে আসীন হইয়াছেন, সেখানেও প্রায়ই সুরের ঐকতান ছিন্ন বা খণ্ডিত হয় নাই, অশোভন ব্যস্ততা বা আয়াস-সাধ্য লম্ফ-প্রদানের কোন চিহ্ন নাই—এই অবিচ্ছিন্ন সুর সন্দর্ভগুলিকে গীতিকাব্যের ঐক্য দান করিয়াছে।

কতকগুলি প্রবন্ধে প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গ, যৌবনের রঙীন নেশার অবসানের তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। ভাষার ঐশ্বর্য, উপমার অজস্র প্রাচুর্য ও অপরূপ সুসংগতি, ও গভীর ভাবের সুর-ঝংকারের সমন্বয়ে ইহারা পূর্বস্মৃতির আলোচনামূলক সাহিত্যের (retrospective literature) শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। 'একা', 'আমার মন', ও 'বুড়া বয়সের কথা' এই জাতীয় সন্দর্ভ। প্রৌঢ় বয়সের শেষ সীমায় পা দিবার পর যে রহস্যময় পরিবর্তন মানুষকে জীবনের পরপারে ঠেলিয়া দিবে তাহার প্রথম অনুভূতি তাহার মনের আকাশকে এক বিষাদময় কুহেলিকায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই কুহেলিকা তাহাকে জীবনের আনন্দোৎসব হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সে আপনার নিঃসঙ্গত্ব অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ হয়। জীবনের রসমাধুর্য বিস্বাদ হয়, তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় বিলীন হয়, হৃদয় একটা নামহীন, অকারণ অনুশোচনা ও আত্মধিক্কারে পূর্ণ হয়; জীবনের সমস্ত সফলতা, কৃতিত্ব ও সঞ্চয় এক গৌরবহীন ধূলিশয্যায় অবলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। জীবনের এই খেদময়, অবসাদগ্রস্ত খণ্ডাংশের যে চিত্র আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে পাই তাহা অতুলনীয়। Byron, Shelley, Keats প্রভৃতি রোমান্টিক যুগের তরুণ কবিদের মুখে যে খেদের বাণী ধ্বনিত হয়, তাহার মধ্যে আদর্শবাদের আতিশয্য ও বিদ্রোহের উদ্ধত উচ্চ সুর অসাধারণত্বের সাক্ষ্য দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ, চিন্তাশীল মানুষের অভিজ্ঞতাকেই কাব্য-প্রকাশের সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন। এই অরুচির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন—মানব-প্রীতি, পরহিতসাধন, ভগবদ্ভক্তি—তাহা সমস্তই নীতিবিদের সনাতন ব্যবস্থা-পত্র হইতে সংগৃহীত। কিন্তু এই নৈতিক অনুশাসনের মধ্যে কোনরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মশ্রেষ্ঠত্বাভিমানের ছায়া নাই। কমলাকান্ত যেখানে নীতি-প্রচারকের উচ্চ-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, সেখানেও সে তাহার

স্বাভাবিক বিনয় ও সরস বচনভঙ্গী হারায় নাই। নীতির তিক্ত বটিকা রসিকতার শর্করাবৃত হইয়া সুখসেব্য হইয়াছে।

বাকী প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন' বেন্থামের দার্শনিক তত্ত্ব ও সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্যের রচনা-প্রণালীর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ। 'বসন্তের কোকিল' ও 'ফুলের বিবাহ' কল্পনার ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস—ইংরাজীতে যাহাকে fantasy বলে সেই জাতীয় রচনা। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধে কোকিলের প্রতিকূল সমালোচনা হঠাৎ সহানুভূতির ও সম-ব্যবসায়ীর প্রীতি-বন্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত'-এ সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরসচর্চার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, দীর্ঘকালরুদ্ধ আবেগের আকস্মিক নিষ্ক্রমণের ন্যায়, তীব্র হাহাকারে, বুক-ফাটা কান্নার সুরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'একটি গীত'-এ সুপরিচিত বৈষ্ণব কবিতার ব্যথা-প্রসঙ্গ সেই চির-রুদ্ধ, হৃদয়ের গোপনগুহাশায়ী আশার পথ খুলিয়া দিয়াছে- বৈষ্ণব কবির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে লেখকের স্বদেশঘটিত বেদনাকে উদ্বেল করিয়াছে। মুসলমান কর্তৃক নবদ্বীপ-জয়ের চিত্র একটি prose lyric, বা গদ্যরচিত গীতি-কাব্যের উন্মাদনা ও ঝংকার লাভ করিয়াছে। 'আনন্দমঠ এ বাঙালীর হৃদয়ে যে আধুনিক স্বদেশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এই প্রবন্ধগুলিতে তাহা পুষ্ট ও পত্র-পুষ্প-শোভিত হইয়াছে। আমাদের দেশপ্রীতির বিশেষ সুর, ইহার বিশিষ্ট আকার ও ধারা, ইহার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ ও বাস্তববিমুখতা ইহার বর্তমানের প্রতি উপেক্ষা ও ভবিষ্যতের প্রতি স্বপ্নময়, আবেশবিভোর দৃষ্টিক্ষেপ, ইহার পূজোপচার রীতি ও মন্ত্ররচনা—এ সমস্তেরই উৎস বঙ্কিমচন্দ্র।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ রচনা নহে। 'চন্দ্রলোক'-এর রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'স্ত্রীলোকের রূপ'-এর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এই দুইটি প্রবন্ধের রচনা ভঙ্গী ও ভাবগত সুর একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অভিন্ন—একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে তাঁহার রচনাধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার চতুর্দিকে এমন এক প্রতিবেশ-মণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন, এমন একটি লেখক-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ও রচনারীতি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অথচ এই অনুকরণের মধ্যে কোন অক্ষমতার চিহ্ন নাই, ইহা মৌলিক গুণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এইটুকু মাত্র প্রভেদ ধরা পড়ে যে, বঙ্কিমের শিষ্যদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু অসংযম ও আতিশয্যের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়; বঙ্কিমের ন্যায় নিখুঁত ভাবসংযম ও সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ হয়ত ইঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। 'চন্দ্রলোক'-এ কমলাকান্তের বিবাহবাতিকের যেন একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—ফুটনোটে সন্নিবিষ্ট ভীষ্মদেব খোসনবীশের মন্তব্যে এই সূক্ষ্মদর্শিতাটুকু আছে। হয়ত বঙ্কিম নিজে কমলাকান্তের বৈবাহিক স্পৃহাকে এতটা প্রাধান্য দিতেন না, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন। তার পরে মন্তব্যগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র চিন্তাশীলতার ছাপ থাকিলেও মোটের উপর চন্দ্রের প্রতি উপদেশদানের মধ্যে কতকটা স্থূলতর হস্তাবলেপের

চিহ্ন মিলে। 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে অসাধারণ ভাষা নৈপুণ্য ও শব্দ সমৃদ্ধি থাকিলেও মোটের উপর বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরস হইতে নারীর গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্তনের সুর-পরিবর্তনের মধ্যে যেন একটু ওস্তাদির অভাব—এই উভয় সুরের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা বেমালুম ঢাকা পড়িয়া যায় নাই।

এই বিষয়ে ও অন্যান্য দিক দিয়াও 'কমলাকান্তের দপ্তর' Addison ও Steele-এর Spectator-এর সহিত সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। Addison-এর রচনার বিশিষ্ট সুর ও ভঙ্গীটিও তাঁহার সহযোগীরা এরূপ চমৎকারভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণে কাহার কোন্‌টি রচনা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। মোটের উপর সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন যে, Addison-এর রচনার সূক্ষ্ম রসিকতা, মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ঈষৎ নীতিপ্রচার-চেষ্টা প্রধান লক্ষণ। Steele-এর রচনায় আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। Addison বুদ্ধিপ্রধান ও Steele ভাবপ্রধান লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদের মনোবৃত্তির এই বৈশিষ্ট্য স্ব স্ব রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগীদের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের প্রতিভার এমন একটি বিকিরণ-শক্তি ছিল, যাহাতে ইহা নিজে ভাস্বর হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রতিবেশভূমিকেও জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল।

এ পর্যন্ত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা ইহার প্রবন্ধ হিসাবে উৎকর্ষবিষয়ক—উপন্যাসের সহিত ইহার যোগসূত্রের কথা মোটেই আলোচিত হয় নাই। কিন্তু উপন্যাসের ইতিহাসে ইহাই 'দপ্তর'-এর প্রধান পরিচয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের রসিকতার নিদর্শন, বা তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি শুধু তাহা নহে। ইহার সন্দর্ভগুলির মধ্যে কেবল যে একটা ভাবগত ঐক্য আছে তাহাও নহে, বক্তার চরিত্রগত ঐক্যও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। রচনাগুলির মধ্য দিয়া কমলাকান্তের একটা অতি উজ্জ্বল ছবি বর্ণ ও রেখায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—কমলাকান্ত Dickens-এর Pickwick-এর ন্যায় আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত, প্রিয় বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছে। তাহার মন্তব্যগুলিকে আমরা লেখকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিতগুলি লেখকের কলা-কৌশলে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া একটা পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত সৃষ্টির রূপ ধরিয়াছে। তাহার অহিফেনাসক্তি ও ঔদরিকতা, সাংসারিক নির্লিপ্ততা, নসীবাবুর পরিবারে প্রতিপাল্যের ন্যায় আশ্রয়-গ্রহণ, তাহার কল্পনাপ্রবণতা, তাহার লৌকিক ব্যবহারে ও বৈষয়িক চিন্তাধারায় হাস্যকর অসংগতি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রতি তাহার গব্যরস ও কাব্যরসে মিশ্রিত অর্ধ-প্রণয়ীর সরস মনোভাব, তাহার গ্রাম্যজীবনের প্রতিবেশ হইতে দার্শনিক চিন্তার খোরাক সংগ্রহ, সর্বোপরি আদালতের বিসদৃশ ক্ষেত্রে তাহার দার্শনিক ও তার্কিক প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ—এই সমস্তই কমলাকান্তকে জীবনের বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ রক্ত-মাংসের মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে। শুধু সে নহে, তাহার সংসর্গে যে সমস্ত ব্যক্তি আসিয়াছে—যথা নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী—তাহারাও কমলাকান্তের পূর্ণ জীবনী শক্তির কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দার্শনিকতার মধ্যে সমসাময়িক রাজনীতি-তত্ত্বের ইঙ্গিত

তাহার ব্যক্তিত্বকে আরও বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, আরও পূর্ণ বিকশিত করিয়াছে। এই জীবন্ত চরিত্র-সৃষ্টির জন্য, একটা গতিশীল জীবন-নাট্যের সূত্র ঘাত-প্রতিঘাতের আভাস-ব্যঞ্জনার জন্য, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর উপন্যাসের ইতিহাসে একটা প্রকৃত স্থান আছে—বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রমালার মধ্যে কমলাকান্ত-কুসুমও গ্রথিত হইবার যোগ্য।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হাস্যরসমূলক উপন্যাসের প্রধান স্রষ্টা 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও এই সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক 'পঞ্চানন্দ'—ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোধ হয় ইন্দ্রনাথের রচনারীতিবৈশিষ্ট্যের প্রভাবই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস-রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ ঠিক ঔপন্যাসিক ছিলেন না, মজলিসী রসিকতা ও হাস্যরস-উদ্রেককারী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও টিপ্পনীর দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। 'ভারত-উদ্ধার' প্রভৃতি প্রহসনাত্মক ব্যঙ্গ-কাব্যে তাঁহার হাস্যরসসৃজনের প্রতিভার নিদর্শন মিলে। এই কাব্যে তিনি মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে (parody) ও বাঙালী রাজনীতির হাস্যকর অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়া মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ কৌতুকরসের প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের মধ্যে দুইটি—'কল্পতরু' (১৮৭৪) ও 'ক্ষুদিরাম' উল্লেখযোগ্য। 'কল্পতরু' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এ সুবিস্তৃত ও সপ্রশংস সমালোচনার গৌরব অর্জন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের 'আলাল'-এর সহিত তুলনায় ইহার রসিকতার ও চরিত্রসমষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পাঠক ঠিক এই তুলনামূলক সমালোচনায় সায় দিতে পারে না। 'আলাল' উহার সমস্ত রুচিবিকার ও অন্যান্য ত্রুটিসত্ত্বেও একখানি সত্যকার উপন্যাস। 'কল্পতরু'র যে রসিকতা তাহা ঔপন্যাসিক উৎস হইতে প্রবাহিত নহে, তাহা উপন্যাসের সহিত নিঃসম্পর্ক, উপন্যাসের অগ্রগতি-রোধকারী, অবান্তর মন্তব্যের সন্নিবেশ। আমরা যখন লেখকের রসিকতায় হাসি, তখন উপন্যাসের কথা আমাদের মনে থাকে না। লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রিকতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার রসিকতাকে প্রতি মুহূর্তে বৃত্তোৎক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র সরলরেখার (tangentiality) অনুবর্তন করাইয়াছেন। রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যের সহিত আখ্যায়িকার সংযোগস্থাপনে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। নরেন্দ্রনাথ, নরেশচন্দ্র, রামদাস, প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠকচাচা, মতিলাল ও 'আলাল'-এর অন্যান্য চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা ও জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে নাই। 'কল্পতরু'র রসিকতার অসংলগ্নতা ও আখ্যায়িকার ধারাবাহিকতার অভাব অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক Sterne-এর রচনার সহিত একজাতীয়।

'ক্ষুদিরাম' উপন্যাসটির রচনাভঙ্গীতে পরিণত মানসশক্তির পরিচয় মিলে। ইহার মন্তব্য-সমূহ চিন্তাশীলতায়, মার্জিত রসিকতায় ও উপন্যাসের আখ্যানের সহিত নিবিড়তর সংযোগে 'কল্পতরু' অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর। তথাপি খাঁটি ঔপন্যাসিক গুণের দিক দিয়া ইহাতে বেশি উন্নতির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। ব্রাহ্মধর্মের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে

প্লেষোদগার, গল্পের শ্রোত্রী হিসাবে আধুনিক-রুচিসম্পন্না ও প্রাচীন-সংস্কার-বিরোধী কমলিনীর নামোল্লেখ, ও ক্ষুদিরাম ও ভুসীভোজনের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রাঙ্কন—এই সমস্ত উপাদানই যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেলভগিনী' ও 'চিনিবাস-চরিতামৃত' গ্রন্থে অধিকতর কলাকৌশল ও গঠন-সংহতির সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘটনা সন্নিবেশের আকস্মিকতা ও তরল রসিকতার অতিপ্রাধান্যের জন্য গভীর, একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের অভাব গ্রন্থখানির ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী হইয়াছে। লেখক ইহাকে 'গাল-গল্প' নামে অভিহিত করিয়া ইহা যে উপন্যাসের মর্যাদার অধিকারী নহে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচিত উপন্যাসগুলিতে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস ও বীভৎসরস (grotesque) সৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহার 'মডেলভগিনী', 'কালাচাঁদ', 'চিনিবাস-চরিতামৃত', 'নেড়া হরিদাস' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি উপন্যাসের বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহারা ঠিক উপন্যাসের গঠন বা আকৃতির অনুবর্তন করে না মন্তব্য, ধর্মব্যাখ্যা, নীতিপ্রচার, অতিপ্রাকৃতের অবতারণা প্রভৃতি নানা উপাদানের মধ্যে উপন্যাসের বাস্তবচিত্রণ ও চরিত্রবিশ্লেষণ সসংকোচে একটু স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মিশ্র ধরণের গঠন-প্রণালীর জন্য ইহারা Fielding-এর 'Tom Jones' ও Sterne-এর 'The Sentimental Journey' ও 'Tristram Shandy'র সহিত তুলনীয়। ইংলণ্ডে পরবর্তী যুগে উপন্যাস এই সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গ সযত্নে বর্জন করিয়া গঠন-সামঞ্জস্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, তথাপি Thackeray বা George Eliot-এর উপন্যাসে মন্তব্যের আতিশয্য ও অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর উপন্যাসের আসল অংশটুকুকে গুরুভার-প্রপীড়িত করিয়াছে। আবার নিতান্ত আধুনিক যুগে Aldous Huxley ও James Joyce প্রভৃতির রচনায় এই কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত-প্রবৃত্তি (centrifugal tendency) অত্যন্ত প্রবল হইয়া উপন্যাসের ঐক্যকে বহুধা-বিভক্ত, খণ্ডিত করিয়াছে—সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যের এক হিসাবে প্রাথমিক যুগের বিশৃঙ্খলা ও আকারহীনতার দিকে প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাকে উপন্যাসের সংজ্ঞা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার সমস্ত বিশৃঙ্খল, সুদূর-বিক্ষিপ্ত মন্তব্য-আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ঔপন্যাসিক বীজ সুস্পষ্টভাবেই নিহিত আছে। মোট কথা, আমরা উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার আদর্শের খাতিরে যতই বিধি-নিষেধের গণ্ডি রচনা করি না কেন, উপন্যাস কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-পত্র অবজ্ঞার সহিত লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিস্ময়কর, অফুরন্ত রূপ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতেছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুইখানি উপন্যাসের আলোচনা করিলেই তাঁহার সাধারণ রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্টীকৃত হইবে। তাঁহার 'মডেলভগিনী' উপন্যাসটি (১৮৮৫) প্রথম প্রকাশকালে একটি তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকেই ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিশেষ কোন ব্রাহ্মপরিবারের নৈতিক জীবনের প্রতি সুরুচি-বিগর্হিত কটাক্ষপাত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ইহার চারিদিকে একটা সাম্প্রদায়িক কল-কোলাহল মুখরিত হইয়া ইহার সাহিত্যিক বিচার ও রসগ্রহণকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এখন সে উত্তেজনা শান্ত হইয়াছে; ব্যক্তিগত ইঙ্গিতগুলি কালের যবনিকা-অন্তরালে

প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শের দিক্ দিয়া ইহার বিচার চলিতে পারে।

এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'মডেলভগিনী'র উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। লেখকের বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস সৃজনে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় সর্বত্রই বিদ্যমান। অবশ্য এই প্রণালীতে হাস্যরস সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সম্পূর্ণ ইতরতাবর্জিত নহে। স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি mock-heroic প্রণালী—অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। Byron-এর Don Juan বা Beppo'র রসিকতা এমন কি Dickens-এর হাস্যরসসৃষ্টি Lamb-এর মত এত সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হইতে পারে না—ইহাদের মধ্যে কতকটা ভাঁড়ামি, কতকটা সভ্যরুচিবিগর্হিত উচ্চহাস্যধ্বনির, অশোভন তীব্রতা ও অসংযমের প্রাধান্য থাকিবেই। শুচিবায়ুগ্রস্ত, রুচি-বাগীশ পাঠকের পক্ষে এরূপ গ্রন্থের রসাস্বাদন অসম্ভব। রসিকতার শ্রেণী-পর্যায়-বিভাগে ইহাদের স্থান খুব উচ্চ হইতে না পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

কমলিনীর সমস্ত প্রেমাভিনয় ব্যাপারটি আগাগোড়া এই বিদ্রূপমণ্ডিত আতিশয্যের সুরে বাঁধা—ইহার উপহাসের দিক্‌টা প্রায় বরাবর প্রাধান্য লাভ করিয়া ইহার উৎকট বীভৎসতা ও পাপাচরণকে চাপা দিয়াছে। কমলিনীর coquetry বা ছলনা-কৌশল, রঙ্গ-ভঙ্গ, বিলাস-ব্যসনই তাহার অসতীত্বকে অতিক্রম করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে আমাদের নৈতিক ক্রোধ অপেক্ষা সংগতি বোধকেই তীব্রতর আঘাত করে—সে আমাদের ঘৃণা অপেক্ষা উপহাসেরই অধিক উদ্রেক করে। লেখকের বিদ্রূপ প্রায় কোথাও মেজাজ চড়াইয়া ঘৃণা ও ক্রোধের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। কিন্তু একেবারে গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে এই ব্যঙ্গের রঙীন আবরণ ছিন্ন হইয়া পাপের নগ্ন বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও উপন্যাসের রসভঙ্গ করিয়াছে। কমলিনীর যে পূতিগন্ধময়, শেষ-প্রায়শ্চিত্ত-দৃশ্য দেখান হইয়াছে তাহাতে লেখক নিজ ঔপন্যাসিক কর্তব্য ও তাঁহার রসিকতার বিশেষ মনোভাব বিস্মৃত হইয়াছেন; ব্যঙ্গরসিকের তীক্ষ্ণ 'মিছরির ছুরি' নীতিপ্রাধান্যের ভোঁতা কাটারিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি উৎপীড়নের বীভৎস দৃশ্য ব্যঙ্গচিত্রের সুকুমার বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া আমাদের বিদ্রূপ-উপহাসের কৌতুকরসপুষ্ট মনোবৃত্তিকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়াছে। ড্রইংরুমের পুষ্পসারভারাক্রান্ত, পাপের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের অদৃশ্য বীজাণুপূর্ণ আবহাওয়া হইতে একেবারে নরকের গভীরতম অন্তস্তরে অবতরণ আর্টের ভাবগত ঐক্য হইতে বিচ্যুতির নিদর্শন।

গ্রন্থের অন্যান্য দৃশ্যে কৌতুকরস এরূপ বিকৃত হয় নাই। ডেপুটি রামচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও ধর্ম-পরিবর্তন, কৈলাসচন্দ্রের হেডমাষ্টার কর্তৃক বিচার, হাওড়া ষ্টেশনে ইংরেজী পোশাকের ময়ূরপুচ্ছধারী কৈলাসের বীরত্বাভিনয়,—পুলিসের আসামী-গ্রেপ্তার, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার-প্রহসন—এই সমস্ত দৃশ্যে নির্দোষ কৌতুকরস অতিরঞ্জনের মৃদুমন্দ বায়ুতে স্ফীত হইয়া প্রায় কূল ছাপাইবার উপক্রম করিয়াছে। এই সমস্ত দৃশ্যই mock-heroic রচনাভঙ্গীর অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জন সত্যের রেখা অনুবর্তন করিয়াছে, কেবল তাহার উপর উজ্জ্বলতর বর্ণ আরোপ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে আরও স্ফুটতর করিয়াছে

মাত্র। অতিরঞ্জন সকল সময় সত্যের বিরোধী নহে, সময় সময় ইহা সত্যের বিনয়াবনত মস্তকের উপর পদমর্যাদাজ্ঞাপক ভাস্বর মুকুট।

এই হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসটির আর একটি সুর আছে, যাহা মোটেই হাস্যরসের সমপর্যায়-ভুক্ত নহে ও হাস্যের সহিত যাহার সম্প্রীতির কোন কালেই খ্যাতি নাই। ইহা হইতেছে উচ্চ-ভাবপূর্ণ হিন্দু-ধর্ম-ব্যাখ্যা ও হিন্দু আদর্শের মাহাত্ম্য-প্রচার। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা চলিতেছে—পাতার পর পাতা ভরিয়া সুললিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—অবশেষে পাঠকের মনের ধারণা হইতেছে যে, দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থের পত্রাবলী মুদ্রাকরের অনুগ্রহে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই উভয় অংশের মধ্যে অসংগতি তাদৃশ মারাত্মক নহে। হাসির সাগরের মধ্য হইতেই এই ধর্মতত্ত্বদ্বীপ অনিবার্য না হউক, অনেকটা স্বাভাবিক কারণে উত্থিত হইয়াছে। কমলিনীর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক কৈলাসচন্দ্রই এই উভয় অংশের মধ্যে সংযোগ-সেতু। তাহার হতবুদ্ধি, বিস্ময়বিমূঢ় মনোভাবই চুম্বকের মত এই ধর্মব্যাখ্যাকে ব্রাহ্মণের মন হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়াছে; কৈলাসের বোধের জন্যই, তাহার শক্তি ও প্রবৃত্তির উপযোগী করিয়াই ইহা নিতান্ত সরল, সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মূল উপাখ্যানের সহিত ইহার খুব বেশি অসামঞ্জস্য নাই। আর কৈলাসের মনে যে মহত্ত্বের বীজ সুপ্ত ছিল—যাহার প্রমাণ স্কুলের বিচার-দৃশ্যে ও কমলিনীর মায়াজালচ্ছেদে পাওয়া গিয়াছে—তাহাই এই ধর্মোপদেশের ফলে তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিকভাবে আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। এই সময় কিন্তু বেহারী রাজা অনাবশ্যকভাবে প্রবর্তিত হইয়া ধর্মব্যাখ্যার স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে—উপন্যাসের বিশেষ উদ্দেশ্য ছাপাইয়া ইহা নিজ স্বাধীন প্রয়োজনে প্রবাহিত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বের এই অযথা প্রসার উপন্যাসের দিক্ হইতে নিন্দনীয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ধর্মতত্ত্বের যিনি কেন্দ্রস্থল সেই কমলিনীর স্বামী রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত হইলেও মোটেই অতি-মানবের ন্যায় আমাদের অনধিগম্য হন নাই,—তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য, সদানন্দময়তা, ঘোরতর উৎপীড়নের মধ্যে তাঁহার সহায়হীন, বিহ্বল ভাব এই সমস্তই তাঁহাকে আমাদের স্নেহ ও সহানুভূতির অধিকারী করিয়াছে।

ধর্মের আর একটা দিক্ আছে, যাহা সহজেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইতে পারে—ইহা তাহার ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাসের দিক্। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসে ধর্মের উচ্চতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই উপহাস্য দিক্ও যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসিবেশ ও কমলিনীর অনুরোধে ব্রত-বিসর্জন কৌতুকরসের উপাদান যোগাইয়াছে। পরবর্তী 'রাজলক্ষ্মী' উপন্যাসে ধর্ম-প্রহসনের ব্যাপারটা আরও ঘোরাল করিয়া, বিদ্রূপের সুর আরও উচ্চগ্রামে বাঁধিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর 'মডেল ভগিনী'-জাতীয় পুস্তক বাংলা সাহিত্যে খুব কম—স্থানে স্থানে মার্জিত রুচির অভাব ও সুক্ষ্ম আতিশয্য-প্রয়োগ থাকিলেও বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ প্রয়োজন ইহা পূর্ণ করিয়াছে।

'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২) উপন্যাসে খাঁটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অংশের তীব্রতা, অন্যান্য উপাদানের সমাবেশ ও সংমিশ্রণের জন্য অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ইহার আখ্যায়িকা-ভাগ অতি বিস্তৃত এবং ঘটনা বৈচিত্র্য এবং নানাবিধ রস সঞ্চারের জন্য চিত্তাকর্ষক। ইহার

মধ্যে, Victor Hugo'র Les Miserables-এর মত একটা মহাকাব্যোচিত বিশালতা আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রুত বিলীয়মান হিন্দুধর্মভাব ও আদর্শের ইহা একটা মহাকাব্য বিশেষ। হিন্দুধর্মের যাহা সার অংশ, হিন্দু জীবনযাত্রার যাহা শ্রেষ্ঠ সুষমা তাহাই লেখক সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীব্র আবেগ এই উভয়বিধ অনুভূতির সাহায্যে, এক বিস্তৃত পটভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত ইহার খাঁটি উপন্যাসোচিত গুণের কতকটা লাঘব হইয়াছে। অতিপ্রাকৃতের ঘনসন্নিবেশ ও অতর্কিত ভাগ্যপরিবর্তনের উদাহরণ-বাহুল্য ইহাকে কতকটা অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত (melodramatic) করিয়াছে। ইহার চরিত্রদের মধ্যে অধিকাংশই খুনী আসামী বলিয়া অভিযুক্ত, অথচ প্রকৃতপক্ষে নিষ্পাপ শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ; অধিকাংশই নিজ বুদ্ধিবলে বা সৌভাগ্যবলে ভিক্ষুক হইতে লক্ষপতিতে রূপান্তরিত; নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিরাও পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ উপকার বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ; সকলেই ভাগ্যের ক্রীড়নক। সকলের ক্ষেত্রেই ভাগ্যচক্র উহার ভ্রমণপথের চরম সীমা পর্যন্ত আবর্তিত। এই অনৈসর্গিক দ্রুত আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে রঘুদয়াল—তাহার প্রভাব সর্বব্যাপী, ভারতের সুদূর প্রান্তদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। কোটিপতি দীনদয়াল, দস্যু-প্রবঞ্চক সনাতনদাস, শিয়ালমারা, এমন কি ইংরেজ বিচারক রাইট সাহেব পর্যন্ত তাহার চরাচরব্যাপী প্রভাবের অধীন। এই দৈবলীলার অতিপ্রাদুর্ভাব ঠিক উপন্যাসোচিত গুণ-বিকাশের পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়াও এই আদর্শবাদের আতিশয্য আমাদের সামঞ্জস্য বোধকে পীড়িত করিবার উপক্রম করে। এ সম্বন্ধেও রঘুদয়ালই প্রধান অপরাধী। সে একজন অশিক্ষিত লাঠিয়াল ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী পুরুষ—তাহার মধ্যে আমরা স্বভাবতঃ কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি, এমন কি প্রভুর মঙ্গলার্থ প্রাণবিসর্জনে উন্মুখতা প্রভৃতি সদ্গুণের প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু সে ধর্মসাধনা ও দার্শনিক আদর্শবাদের যে অতি তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আমরা ঠিক প্রস্তুত নহি। তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের নিকট তাহার শারীরিক শক্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ সে আদর্শ পুরুষ বলিয়া যে তাহার চরিত্র-পরিকল্পনা অবাস্তব হইয়াছে তাহাও ঠিক নয়। যে ভাববাদের উচ্চ আকাশে সে স্বভাবত.ই বিচরণ করে, তাহা অস্পষ্টতার কুহেলিকায় ম্লান হয় নাই, দীপ্ত সূর্যকিরণে উজ্জ্বল। তাহার চরিত্রের বাস্তবতা উপন্যাস-অবলম্বিত বিশ্লেষণ-প্রণালীর দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ যে আদর্শলোককে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতি-সন্নিহিত করিয়াছে ও আমাদের সহজ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, তাহার কল্যাণে রঘু-দয়ালকে আমাদের একবারে অপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনার দিক্ দিয়া ঠিক অনুরূপ অভিযোগ Les Miserable.-এর বিরুদ্ধেও আনা যায়; Jean Valjean-এর চরিত্র রঘুদয়ালের মত আদর্শবাদের চরম সীমায় নীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও Les Miserables পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই অভিযোগের বলে 'রাজলক্ষ্মী'কে ঔপন্যাসিক-মর্যাদাচ্যুত করা যায় না—ইহার বিচার করিবার সম অন্যান্য গুণে ইহা কিরূপ সমৃদ্ধ তাহাও নির্ধারণ করিতে হইবে।

চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়া কয়েকটি চরিত্র উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাশীবাসীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন—উভয়ই খুব চমৎকার হইয়াছে। তাহার বাক্য, ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গী সমস্তই এত বাস্তবানুগামী হইয়াছে যে, তাহাকে আমাদের চির পরিচিত প্রতিবেশী বলিয়া মনে হয়। তাহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত নির্লজ্জ আত্মপ্রচার, ভক্তিগদ্গদ ভাবুকতার সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সংসারবৈরাগ্যাভিনয়ের সহিত মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানে নিপুণতার অতি সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। অথচ তাহার মধ্যে সদ্গুণের অভাব নাই, তাহাকে নিতান্ত ঘৃণ্যরূপে দেখান হয় নাই। লেখক তাহার প্রতি জ্বলন্ত ক্রোধের অগ্নিময় কটাক্ষপাত করেন নাই, তাহাকে তীব্র বিদ্রূপের তীক্ষ্ণাস্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ (satire) humour-এর স্নিগ্ধরসে অভিষিক্ত হইলে কিরূপে তাহার হিংস্রতা পরিহার করে, অথচ তাহার বোধশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, কাশীবাসীর চরিত্র-পরিকল্পনা তাহার সুন্দর উদাহরণ। সনাতনদাস ও শিয়ালমারার চরিত্রও খুব চমৎকার খুলিয়াছে ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়াগী পাণ্ডা কেশবরামের চরিত্রে ক্ষুদ্রাশয়তার সহিত উপকারকের সূক্ষ্ম অভিমানবোধ চমৎকার মিশিয়াছে—ইহাতে ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও মোটের উপর বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দীনদয়ালের চরিত্রে উচ্চ আদর্শবাদ ও ধর্মভাবের সহিত ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধির সম্মিলন ঘটিয়াছে—অমরসিংহের প্রতি তাঁহার উপদেশগুলিতে এই উভয় উপাদানের সমপরিমাণ মিশ্রণের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি আদর্শ বিষয়ী হইলেও আমাদের প্রতিবেশী, কল্পলোকবিহারী নহেন। সেইরূপ কাত্যায়নী, যশোদা ও লক্ষ্মী এই নারীত্রয়ের চরিত্রের সাধারণ আকৃতি একজাতীয় হইলেও বয়স ও অভিজ্ঞতার তারতম্য-ভেদে এই ঐক্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর বিশেষত্বগুলি আশ্চর্যরূপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। রাজা অমরসিংহ ও রামপ্রসাদের চরিত্র খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত না হইলেও জীবন্ত ও সহজবোধ্য হইয়াছে। মোট কথা, গ্রন্থের চরিত্রগুলি সমস্তই সজীব ও অতিরঞ্জনজনিত বিকৃতি তাহাদের মধ্যে সেরূপ লক্ষ্যগোচর নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান উপন্যাসে হাস্যরস অনেকটা মৃদু ও সংযত হইয়াছে। কাশীবাসী, সনাতনদাস, শিয়ালমারা, প্রভৃতির চরিত্র-বিশ্লেষণে, মোহর ভাঙাইবার পূর্বে রামপ্রসাদের উপযুক্ত সজ্জাবিধানের প্রয়াসে, লক্ষ্মীর অনুরাগ-সঞ্চারের চিত্রে, হিন্দুসমাজের ধর্ম-বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণতার বর্ণনায় এইরূপ কতকগুলি বিষয়ে লেখকের হাস্যরস-অবতারণার নিদর্শন মিলে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে 'মডেল ভগিনী'র প্রহসনমূলক আতিশয্য নাই। ইহার আর একটি কারণ করুণরসের প্রাধান্য। উচ্চাঙ্গের রসিকতায় হাসি ও অশ্রু যেমন নিগূঢ় ঐক্যে আবদ্ধ হইয়া আমাদের মনকে গভীরভাবে অভিভূত করে, এখানে সেরূপ কিছু নাই বটে—তবে করুণরসের সান্নিধ্য হাসির উচ্ছ্বাসকে যে অধিকতর সংযত ও সুরুচিসম্মত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের প্রথম অংশে কাত্যায়নী-পরিবারের শোচনীয় দারিদ্র্যের ও তাহাদের পরবর্তী জীবনের সমস্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের চিত্রে, রাজা অমরসিংহের নিরুদ্ধপ্রকাশ, নিগূঢ় মর্মব্যথার ইঙ্গিতে, রঘুদয়ালের বিচারালয়ে আত্মসমর্পণের দৃশ্যে এই করুণরস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অবশ্য মন্তব্যবাহুল্য এই রসের ঘনীভূত হওয়ার

পক্ষে বাধাস্বরূপ অনুভূত হয় তথাপি লেখকের সহানুভূতির প্রগাঢ় আবেগ, মিতভাষিতার স্বল্পপরিসরে আবদ্ধ না হইলেও, আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

লেখকের ভাষা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণের, ব্যঙ্গাত্মক বক্রোক্তি ও কটাক্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও, কথোপকথনের পক্ষে একটু অনুপযোগী হইয়াছে। ইহার কারণ সাধুভাষার আপেক্ষিক আড়ম্বর। স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ভাষার মধ্যেও সুমার্জিত, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত ভাষার আধিক্য দেখা যায়। ইংরেজী সভ্যতা ও আদর্শের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া ও স্বদেশপ্রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠামূলক যে সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পরিধির মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটা শ্রেষ্ঠ আসন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাঁহার ছিল না; তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রও ভিন্নজাতীয়, খুব সুমার্জিত ও সুরুচি সংগত নহে, কিন্তু তথাপি এই মহৎ ব্রত-উদ্‌যাপনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মিতার গৌরব-লাভে অধিকারী।

(৪)

'বঙ্গবাসী'-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পর হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের এক দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদ —তাহার পর প্রমথ চৌধুরী পরিত্যক্ত সূত্র আবার কুড়াইয়া লইয়াছেন। প্রমথবাবুর হাস্যরসসৃষ্টির প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার প্রধান ভঙ্গী হইতেছে সৃজনশক্তির আবেশময়তার সহিত সমালোচনাশক্তির অতন্দ্রিত বিচারবুদ্ধির এক প্রকারের অদ্ভুত হাস্যকর সমাবেশ। লেখক যখন কাব্যই হউক বা উপন্যাসই হউক সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সুষমা ও সংগতিরক্ষার জন্য নগ্ন বাস্তবতার সহিত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা আপোষ করেন। সেই আপোষের মোটামুটি শর্ত এই যে, সৃষ্টিপ্রতিভা বাস্তবজীবনের যে খণ্ডাংশ লইয়া আলোচনা করে, তাহার উপর নিজ উচ্চতর বা সুন্দরতর সত্যের এক জ্যোতির্ময় আবরণ রচনা করে, সাধারণ বাস্তবতার প্রতিনিধি পাঠককে কাব্যরস-উপভোগের জন্য এই ভাস্বর ভাবমূলক আবরণটিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তথ্যমূলক ব্যবহারিক সত্যের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিলে চলিবে না। বাস্তবতার অসংযত ও নিষ্প্রয়োজন তাগিদ হইতে মনকে রক্ষা করিতে না পারিলে কাব্য সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না—কাব্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্য স্তবগানের সময় তাঁহার বাহনটিকে মানসদৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে হইবে। চিত্রকর রং-এর যথাযথ বিন্যাসে যে সুন্দর প্রতিমাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, কেহ যদি তথ্যানুসন্ধানের অতিরিক্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার পিছনে যে খড় ও মাটির সমষ্টি আছে, তাহাকে অন্তরাল হইতে অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনেন, তবে প্রতিমার সৌন্দর্যোপভোগের অকালমৃত্যু ঘটে। উপন্যাসের রথ যখন পূর্ণবেগে চলিতেছে, তখন কেহ যদি তাহার কল-কব্জা পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন, তবে রথের অগ্রগতি তৎক্ষণাৎ প্রতিরুদ্ধ হয়। মোট কথা, সমস্ত কার্যেরই একটা ccnvention বা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-স্বীকৃতি আছে। ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া, ইহার নির্ধারিত সীমা ও মনোভাবের মধ্যে সৃষ্টির নূতন বিকাশ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

গল্পের এই সুপরিচিত আকৃতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ গল্প-উপন্যাসে

একটা ব্যাপক অভিযান চালাইয়াছেন। গল্পলেখকের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও মনোবৃত্তিকে তিনি পদে পদে ব্যঙ্গ-উপহাস করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ফরমায়েসী গল্প'-এ (চৈত্র, ১৩২৪) অতিমাত্রায় বাস্তব মনোভাবসম্পন্ন এবং সমাজ ও ধর্মজ্ঞানের দিক্ দিয়া সংকীর্ণ সংস্কারাবিষ্ট পাঠকের হাতে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীর রচয়িতার কিরূপ দুর্দশা হইত তাহারই একটা সম্ভাব্য চিত্রে তিনি আমাদিগকে কৌতুকরস অনুভব করাইয়াছেন। রুচি-ঘটিত, সমাজনীতিঘটিত ও ধর্মনীতিঘটিত আপত্তির বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে গল্পের অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়—ইহার উপর আবার বক্তা ও শ্রোতৃবর্গের পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষ-জনিত ক্ষুদ্র সংঘর্ষ মূল গল্পের অগ্রগতিকে আরও সংকুচিত করিয়াছে। যেমন, চসারের Canterbury Tales-এ মূলগল্প অপেক্ষা শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ অধিকতর চিত্তাকর্ষক, সেইরূপ এখানেও শ্রোতৃমণ্ডলীর সংঘর্ষজনিত ঘাত-প্রতিঘাত মূল প্রণয়কাহিনীকে গৌণ পর্যায়ে ফেলিয়া নিজ প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মূল গল্প অপেক্ষা মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনার উপরই তাঁহার ঝোঁক বেশি—গল্পের সর্বাঙ্গসুন্দর বৃত্তাকারের পিছনে তিনি ধূমকেতুর ন্যায় এক দীর্ঘ ভূমিকার পুচ্ছ জুড়িয়া দিয়া তাহাকে একটা বক্র-কুটিল রূপ দিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গল্পেরই তর্কমূলক, বাগ্‌বিতণ্ডা জড়িত উৎপত্তি-ক্ষেত্র আছে—এই উষর ক্ষেত্রেই তাহারা কণ্টক-কুসুমের ন্যায় ফুটিয়াছে। বিশেষতঃ যে ভাবাবেশমূলক প্রতিবেশের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর গল্প-উপন্যাসের উদ্ভব, তাহাকে তিনি নানা অবান্তর আলোচনা, কূটতর্ক, অতর্কিত ও হাস্যকর পরিণতি এবং সর্বোপরি একটা শুষ্ক, ভাববিমুখ, ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবের দ্বারা খণ্ডিত ও প্রতিহত করিয়া তাহার ভাবগত ঐক্যকে রেণু পরমাণুর আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার লেখায় epigram বা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের ছড়াছড়ি—ইহারা কোথাও না সুপ্রযুক্ত, কোথাও না নিতান্ত অনধিকারপ্রবিষ্ট কষ্টকল্পনা। এই epigram-রচনাই তাঁহার আসল সাধনা—গল্পাংশ কেবল এই epigram-পরম্পরাকে একটা যেমন-তেমন যোগসূত্রে গাঁথিবার অনাদৃত উপায় মাত্র। গল্পের মোড়কে epigram-এর চানাচুর তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন।

তাঁহার গল্পের শ্রেণী-বিভাগের প্রয়াস অনেকটা পণ্ডশ্রম, কেন না তাঁহার সর্বদা ক্রিয়াশীল বিদ্রূপ-কুটিল মনোভাব সমস্ত শ্রেণীকে ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। তথাপি তাঁহার দুঃসাহস ও প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানদণ্ড হিসাবে শ্রেণীবিভাগের কতকটা সার্থকতা আছে। প্রণয়মূলক আখ্যানকে তিনি সর্বদাই tragedy হইতে tragi-comedyতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 'ট্র্যাজেডির সূত্রপাত' গল্পে এক প্রৌঢ়বয়স্ক অধ্যাপক পিতা নিজ পুত্রের শিক্ষাজীবনের কৃতিত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবৃত্তিদমন-বিষয়ে শিক্ষার নিষ্ফলতার কথায় আসিয়া পড়িলেন ও ইহারই উদাহরণস্বরূপ নিজ সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেও একটা দুরন্ত প্রণয়োচ্ছ্বাসের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করিলেন। এই অভাবনীয় প্রণয়োন্মেষের বর্ণনায় অধ্যাপকের সুরে একটু মোহাবেশের স্পর্শ লাগিয়াছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী ভূমিকায় তর্ক-বাহুল্য ও পরবর্তী মন্তব্যে বিদ্রূপের ছিটা ইহাকে কবিত্ব হইতে পরিহাসের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। 'সহযাত্রী' গল্পে সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাহার প্রণয়জীবনের বিড়ম্বনাকে চাপা দিয়াছে। বিশেষতঃ নিজ লাঞ্ছনা-বর্ণনায় তাহার অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ ভাব ও

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর অনুসন্ধানে বন্দুক হাতে ট্রেনে ট্রেনে ভ্রমণের উৎকট খেয়াল ইহার প্রচ্ছন্ন বেদনার দিক্‌টা একেবারে আমাদের অনুভূতির অনধিগম্য করিয়াছে। 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পে বড়বাবুর প্রণয়-বিহ্বলতার আতিশয্য একটা হাস্যাস্পদ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাতে অবশ্য বড়বাবুর চরিত্রের ও স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাবের খুব বিস্তৃত ও শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণই প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। থিয়েটারে তাঁহার দুর্গতি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা গল্পটিকে প্রহসনপর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। 'ছোটগল্প'-এ প্রথমতঃ ছোটগল্পের বিশেষত্ব ও লক্ষণ লইয়া চুল-চেরা সূক্ষ্ম তর্ক, এই মুখবন্ধের পর যে গল্পটি উদাহরণস্বরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে প্রণয়ের আশাভঙ্গের ঈষৎ বেদনা ভ্রমধারণার হাস্যকর অসংগতির সহিত মিশিয়া একটা মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি করিযাছে—এই মিশ্রভাবের অনিশ্চিত আলোকে নায়কের আত্মোৎসর্গও তাহার নিজস্ব গৌরব হারাইয়া বীরত্বের অভিনয়ের মত হাস্যাস্পদ দেখাইয়াছে এবং গল্পশেষে পুরাতন আলোচনার পুনরাবির্ভাব আবার ইহাকে আর্টের স্বর্গলোকচ্যুত করিয়া তর্কের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে নামাইযাছে। এই সমস্ত গল্পে লেখকের ভঙ্গীর চমকপ্রদ অভিনবত্ব, আমাদের চিরাগত প্রত্যাশার রূঢ় বৈপরীত্যসাধনই ইহাদের মৌলিক আকর্ষণের হেতু হইয়াছে।

কতকগুলি গল্প নিছক ব্যঙ্গচিত্র-হিসাবেই পরিকল্পিত হইয়াছে। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব-সংঘর্ষের তীব্র বিদ্রূপাত্মক, সরস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে গল্পাংশ বিশেষ কিছুই নাই। কেননা গল্পের প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস ব্যঙ্গপ্রধান উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রাম ও শ্যামের তুলনামূলক চরিত্রা-লোচনার চেষ্টা সফল হয় নাই। এখানে epigram সত্যবিশ্লেষণকে অতিক্রম করিযাছে। শেষের মন্তব্যটুকু এই ব্যঙ্গচিত্রকে একটু গভীরতার স্পর্শ দিয়াছে। 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার স্থলে ও জলে' গল্পে দুঃসাহসিকতার অংশ নিতান্তই অপ্রধান, ইহা লেখকের হাস্যরসিকতাকে নূতন অবসর দিয়াছে মাত্র। গল্প দুইটির শেষে সংযোজিত দুইটি নীতি-উপদেশ ইহাদের হাস্যকরতাকে সুস্পষ্টতর রূপ দিয়াছে। বিপদ কাটিয়া গেলে আমাদের বিপৎকালের বিভ্রান্তভাবে যে comic অবস্থার সৃষ্টি করে তাহাই লেখকের প্রধান উপজীব্য। 'ভাববার কথা'র আগাগোড়া নিছক তর্কসংকুলতা—গল্প বলিবার ছদ্মপ্রয়াসটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। '৺অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' নামক গল্পে অবনীর চরিত্রে পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে কোনরূপ সংগত কারণ-সংযোগ নাই, কেবলমাত্র খেয়ালের বশেই সেইগুলি সংঘটিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে অবনীভূষণের যে দৃঢ়সংকল্প ও দেশহিতৈষণা তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তাহা সৌন্দর্যোপাসনার পিচ্ছিল পথ বাহিয়া কিরূপে বনিতাবিলাস, ধর্মাশ্রয়, বেশ্যাসক্তি ও তপঃ-সাধনার স্তর দিয়া আধ্যাত্মিক সিদ্ধির চরম সার্থকতায় পৌঁছিল তাহারই অতি জটিল ইতিহাস এই গল্পে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের যে একমাত্র কারণ দেখান হইয়াছে তাহা প্যারীলালের প্রভাব। এই প্রভাববিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে বিশেষ কোন সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। প্যারীলাল একদিকে অবনীভূষণের মধ্যে সৌন্দর্যস্পৃহার বীজ বপন করিয়া তাহার অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, অপরদিকে তাহাকে নিষ্কাম কর্তব্যনিষ্ঠায় প্রণোদিত ও শেষ পর্যন্ত তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত করিয়াছে—এই সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে যেমন কোন সামঞ্জস্য

নাই, সেইরূপ তাহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে এক paradox-প্রিয়তা ছাড়া আর কোনও যোগসূত্র নাই। লেখকের ধরণ দেখিয়া মনে হয় যে, এই গল্পে তিনি মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ-প্রণালীতে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

নীল লোহিত পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলিতে অসম্ভব অতিরঞ্জনের সাহায্যে অম্লানবদনে আত্ম-গৌরবপ্রচারের কৌতুকপ্রদ প্রয়াস বিবৃত হইয়াছে। লেখকের মতে নীল লোহিত একজন আদর্শ গল্পরচয়িতা; তাঁহার সজীব বর্ণনাভঙ্গীতে যে অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয় ফুটিয়া উঠিত, তাহা ব্যবহারিক সত্যের বিরোধী হইলেও, গল্প-উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার গল্পে অবিশ্বাস করা পাঠকেরই রুচির দোষ, কেননা কল্পলোকের সহিত ব্যবহারিক জগতের সত্যের মিল হইতে পারে না, এবং সত্য-মিথ্যার ভেদজ্ঞানকে নৈতিক জগৎ হইতে কল্পনার রাজ্যে প্রবর্তন করা অবিধেয়। 'নীল লোহিত', 'নীল লোহিতের আদি প্রেম', 'নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা' ও 'নীল লোহিতের স্বয়ংবর' এই চারিটি গল্পের ভিতর দিয়া নীল লোহিতের মনোভাব বৈশিষ্ট্য ও গল্প বলিবার বিশেষ ভঙ্গী উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই সমস্ত চমৎকার parody, অসম্ভবের কৌতুককর ও অসংকোচ সমাবেশের মধ্যে যে যোগসূত্র তাহা নীল লোহিতের ব্যক্তিত্ব। যে সম্ভাবনীয়তা গল্পাংশ হইতে বর্জিত হইয়াছে তাহা নীল লোহিতের চরিত্র পরিকল্পনায় ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষায় কথঞ্চিৎ স্থান লাভ করিয়াছে—আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি স্বল্পসংখ্যক comic figure আছে সে তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী হইয়াছে।

কতকগুলি শোকাবহ ও গভীর-রসপ্রধান গল্পে লেখকের বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'দিদিমার গল্প', 'আহুতি' ও 'ভূতের গল্প'—এই তিনটি গল্পে তাঁহার কৌতুক-প্রিয়তা ও ব্যঙ্গ-প্রবৃত্তি বিষয়গৌরবের জন্য অনেকটা সংযত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার বুদ্ধিপ্রধান ভাবুকতাবিমুখ মনোবৃত্তি এখানেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথম দুইটি গল্পে যে অত্যাচার ও প্রতিহিংসার ভীষণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা romantic temper-এর লেখকের হাতে রোমাঞ্চকর ভীতি-শিহরণের সৃষ্টি করিত; এবং লেখকও যে এই romantic প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন তাহা নহে। বিশেষতঃ 'আহুতি'তে গল্প-বিবৃত traged র অভিশপ্ত লীলাভূমির বর্ণনায় তাঁহার উত্তেজিত কল্পনার আরক্ত উত্তাপ কতকটা অনুভব করা যায়। কিন্তু আসল ঘটনাতে আসিয়া এই কল্পনা—অগ্নি শ্লেষাত্মক ও উত্তেজনাহীন বিবৃতির ভস্মাচ্ছাদনের তলে নিজ দীপ্তি ও দাহ গোপন করিয়াছে। যক্ষের ধন রক্ষার জন্য শিশুবলি রবীন্দ্রনাথেরও একটি গল্পের বিষয়; কিন্তু তাঁহার বর্ণনা যে কল্পনা সমৃদ্ধিতে ভয়াবহ ও শিশুর কাতর আবেদনে করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর নৃশংসতা, কিরীটচন্দের ব্যাকুল ছটফটানি ও রত্নময়ীর ভীষণ প্রতিহিংসার কাহিনী আমরা পাঠ করি বটে, কিন্তু লেখকের শান্ত, নিরুদ্বেগ, ঈষৎ-ব্যঙ্গ-সংশ্লিষ্ট বর্ণনাভঙ্গী আমাদের মনে কোনরূপ উত্তেজনা সঞ্চারের সহায়তা করে না। বিশেষতঃ লেখকের পাল্‌কী-যাত্রার সুদীর্ঘ মুখবন্ধ যে ব্যঙ্গপ্রধান প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা tragedyর রসবিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দিদিমার গল্প'-এ দিদিমার বেনামী নিছক জুয়াচুরি, কেননা দিদিমা স্ত্রীলোক হইয়াও চৌধুরী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর ও বর্ণনাভঙ্গী

বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন; বক্তা-পরিবর্তনে বক্তৃতারীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্ত্রীলোক বক্তা হইলেও বর্ণনার মধ্যে কোন কোমল ভাবপ্রবণতা বা রমণীসুলভ মাধুর্য সঞ্চারিত হয় নাই। 'ভূতের গল্প'-এ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'নিশীথে'র হিমশীতল অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শলেশমাত্র নাই - Contracto.-এর বর্ণিত ও Engineer-এর অনুভূত ভৌতিক কাহিনী কেবল কৌতুককর অসংগতির ভাব জাগাইয়াছে। অতিপ্রাকৃত বর্ণনার অন্তর্গূঢ় মনোবৃত্তি অর্জন করিতে লেখক বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই - সাদা চোখে ও বিদ্রূপকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে তিনি যে ভূতকে আবাহন করিয়াছেন তাহা সংসারের আর পাঁচটা বিসদৃশ আবির্ভাবের মত আমাদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে মাত্র।

চৌধুরী মহাশয়ের 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬ যদিও চারিটি বিচ্ছিন্ন গল্পের সমষ্টি, তথাপি ইহাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র ইহাদিগকে উপন্যাসের পরিণতি ও গৌরব দিয়াছে। এক মেঘ-মূর্ছিত জ্যোৎস্নারাত্রে আসন্ন দুর্যোগের স্তব্ধতার মধ্যে, ক্লাবে সমবেত চারিটি বন্ধু ঘরে ফিরিতে না পারিয়া আপন আপন প্রণয়ঘটিত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে। এই গল্পগুলি কেবল যে সময়ক্ষেপের জন্যই বিবৃত হইয়াছিল তাহা নয়—লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সেই ম্লান, মেঘ-ভারাতুর চন্দ্রিকাই তাহাদের মনোরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন রহস্যকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই 'শনির দৃষ্টি'র মত আলোকের বর্ণনায় লেখক অপ্রত্যাশিত কল্পনাসমৃদ্ধি ও ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এক প্রথম গল্প ছাড়া অন্য-গুলিতে এই অদৃশ্য প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সেনের গল্পে এই বিকৃত, কলুষিত আলোকের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর একটি প্রাণবেগচঞ্চল, জড়িমালেশশূন্য, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রির বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহার প্রভাবে বক্তার চিরঅতৃপ্ত প্রেমিক-কল্পনা এক মুহূর্তের জন্য ফুলের ন্যায় সৌন্দর্যে ও সৌরভে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষণলব্ধ স্বর্গ উন্মাদের অট্টহাস্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও এই অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাত বক্তার মনকে চিরদিনের জন্য প্রণয়মোহ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রাত্যহিক বাস্তবতার সুদৃঢ় আবেষ্টনের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মোটের উপর প্রথম গল্পটির সুর কবিকল্পনার উচ্চ-গ্রামে বাঁধা ও লেখকের অতর্কিত স্বপ্নভঙ্গ, আদর্শলোক হইতে এক ধাক্কায় ভূতলে অবতরণই গল্প-মধ্যে comedy-র একমাত্র লক্ষণ। গল্পের শেষ পরিণতির সহিত বক্তার ভূমিকা-সন্নিবিষ্ট আত্মচরিত্র-বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট সুসংগতি আছে।

দ্বিতীয় গল্প—'সীতেশের কথা'র পরিহাসের রসটি আরও জমাট বাঁধিয়াছে। সীতেশের কোমল, মেরুদণ্ডহীন, নারীজাতির আকর্ষণে সদাচঞ্চল মন, লণ্ডনের নিরানন্দময়, অবসাদপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে বর্ষা, সস্তা-উপন্যাস-বর্ণিত অভিজাতবর্গের তরল প্রণয়কাহিনী—এই সমস্ত উপাদানে গঠিত প্রতিবেশের সহিত কেন্দ্রস্থ প্রণয়কাহিনীর হাস্যকর পরিণতি ঠিক একসুরে বাঁধা। স্থান-কাল-পাত্র এই তিনের রাসায়নিক সংযোগে প্রণয়িনীর ব্যবসাদার প্রতারিকাতে পরিবর্তন বেশ সুসংগতির সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তৃতীয় গল্প —'সোমনাথের কথা' সোমনাথের অনন্যসাধারণ চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয়ের দ্বারা অবতারিত হইয়াছে। সোমনাথ তীক্ষ্ণধী দার্শনিক, রূপযৌবনসম্পন্ন সুপুরুষ ও প্রণয়-দ্বেষী। তাহার জীবনে রিনির আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, তাহাদের প্রণয়কাহিনীও সেইরূপ

প্রজাপতির ন্যায় চঞ্চল ও সঞ্চরণশীল। ইহাদের মধ্যে প্রথম দর্শনেই যে প্রণয়লীলা শুরু হইল তাহা বাহ্যতঃ flirtation হইতে অভিন্ন মনে হয়। কিন্তু এই লঘু-তরল ভাবের মধ্যে মাঝে মাঝে গভীরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রিনির কৃতিত্ব এই যে, সে নিজে ধরা না দিয়া সোমনাথের চির-অনাসক্ত মনকে বাসনার পাশে বাঁধিয়াছিল। অবশেষে একদিন সমান আকস্মিকতার সহিত এই প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটিল—রিনির পত্র প্রমাণ করিল যে, সে সোমনাথকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রণয়াবেগকে তীব্রতর করিবার উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতেছিল। George-এর বিবাহ-প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রিনির পক্ষে সোমনাথের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইল। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরে ভাগ্যচক্রের আর একটা আকস্মিক আবর্তনে প্রমাণ হইল যে, রিনি প্রতারণা করিতে গিয়া নিজে প্রতারিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারটার উপর সোমনাথের মন্তব্য এই যে, ইহা প্রেমের স্বরূপের একটা যথার্থ অভিব্যক্তি, কেন না প্রেমের সমস্ত রহস্যলীলার অভ্যন্তরে একটা প্রকাণ্ড হাস্যকর ফাঁকি লুকান আছে। এই ভিতরকার ফাঁকিটাই অকস্মাৎ সশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়া প্রেমের উপহাস্যতা ঘোষণা করে। এই গল্পে রিনির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল, অস্থির মনোভাবের বড় সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে সোমনাথের চরিত্র রিনির সহিত তুলনায় একেবারে ম্লান, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; তাহার দার্শনিক স্পর্ধা হৃতগৌরব হইয়া একেবারে প্রতিকারহীন অক্ষমতার ধূলিশয্যায় লুটাইয়াছে। সোমনাথের এই লজ্জাকর পরাজয় প্রেমের স্বর্গগৌরবকে আরও পরিহাসার্হ করিয়াছে।

চতুর্থ গল্পে প্রেমের paradox চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। দাসীর গোপন অন্তঃনিরুদ্ধ প্রেম-কাহিনী, প্রেমিকার সহিত মিলনের জন্য তাহার আজীবন সাধনা আমাদের হৃদয়কে করুণরসে অভিষিক্ত করে। এমন সময় হঠাৎ তাহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ ও সেই ডাকবিভাগের সীমাবহির্ভূত প্রদেশ হইতে টেলিফোন-যোগে প্রণয়ীর সহিত ভাববিনিময়-প্রয়াস আমাদের মনের পৃষ্ঠে এমন একটা তীব্র অসংগতিবোধের চাবুক মারে যাহাতে আমাদের পূর্বভাব একেবারে শূন্যে মিলাইয়া যায়। মোট কথা, এই চারিটি গল্পে প্রেমের হাস্যকর অসংগতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে—উন্মাদের অট্টহাস্য, ছদ্মবেশিনী প্রেমিকার হেয় চৌর্যবৃত্তি, অস্থিরমতি প্রণয়িনীর অতর্কিতভাবে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান, পরলোকবাসিনীর লৌকিক উপায়ে প্রণয়াস্পদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন-প্রয়াস—এই সমস্তই প্রেমের আদর্শভাবমূলক আবেশের বিরুদ্ধে হাস্যরসের অভিযান, প্রেমের অমৃতকুণ্ডে বিদ্রূপের অম্লরসনিক্ষেপ। এই বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন দ্রব্যের সংযোগে যে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা খুব উপাদেয় না হইলেও অভিনবত্বের জন্য উপভোগ্য। তবে এই ব্যঙ্গরস প্রেমের অস্থি-মজ্জার সহিত মিশায় নাই, যখন প্রণয়-রস পাক খাইয়া নিবিড় ও আবেশবিহ্বল হইয়া আসিতেছে, তখন আকস্মিকভাবে ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বিস্ফোরক দ্রব্যের মত প্রেমের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করিয়াছে, ইহার নেশাকে উড়াইয়া দিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ঠিক তাঁহার রচনার উপর নির্ভর করে না—তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁহার প্রভাব লিখিত পুস্তককে অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। Paradox-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক

উত্তেজনাসঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে ভাববিহ্বলতার মোহ হইতে সচেতন করিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্বক অতিরঞ্জন-বিকৃত করিয়া আমাদের প্রতিবাদস্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, এবং এই উপায়ে বাদপ্রতিবাদমূলক এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন যেখা.ন আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি মুক্তবায়ুর ন্যায় অবাধে বিচরণ করিতে পারে। আমাদের ভক্তিরস মদির ও আনুগত্য মন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসী-দেশসুলভ লঘু-চপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাবিমুখ, অথচ মার্জিতরুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানি করিয়াছেন। অনেক নব্যতন্ত্রী লেখকের চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গী তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে এক বিশিষ্ট রচনারীতির প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার নিজ নাম অপেক্ষা সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবলের দ্বারাই অধিক সুপরিচিত। সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রবর্তনে তিনি পথপ্রদর্শক না হইলেও একজন উৎসাহশীল সমর্থক, এবং এই বিষয়ে যে তুমুল বাদানুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল সেই তর্কযুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়া সাহিত্য-রাজ্যে কথিত ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই পক্ষসমর্থনের জন্য আজ কথিত ভাষা সাহিত্যের দ্বারে কেবল প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভিখারী নহে, পরন্তু সমবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় সাধুভাষার সিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার যুক্তি ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের পরবর্তী রচনায় কথিত ভাষার প্রচলন করিয়াছেন। সুতরাং ঔপন্যাসিক-হিসাবে তাঁর স্থান সেরূপ উচ্চ না হইলেও আমাদের মন্দীভূত চিন্তাধারায় নূতন স্রোতোবেগ-যোজনা ও বুদ্ধিপ্রাধান্যমূলক মনোবৃত্তি-প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য। এবিষয়ে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Chesterton-কে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। Chesterton-এর বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চোখ-ধাঁধানো বুদ্ধির অসি-ক্রীড়া তাঁহার নাই। তাঁহার মননশক্তির গুণাবলীর মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিস্তার ও মৌলিক গভীরতার অপেক্ষা ক্রীড়াশীল চাপল্যই অধিকতর লক্ষ্যণীয়। অনেক সময় বক্তব্য বিষয়ে গভীরতার অভাবের জন্য তাঁহার রচনাকে কেবল কথার মারপেঁচ বলিয়া মনে হয়; কখন কখন তাঁহার রচনাভঙ্গী বিকৃত মুখভঙ্গীর মতই দেখায়। এই সমস্ত অপকর্ষ সত্ত্বেও সাহিত্যের মজলিসে তাঁহার বিশিষ্ট স্থানকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। আপাততঃ তিনি নদীর বালি ভাঙিয়া যে কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ফসল অপেক্ষা কাঁটারই প্রাধান্য কিন্তু এই ক্ষেত্র যথেষ্ট-উর্বরতা লাভ করিলে ভাবী কাল ইহাতে যে শস্য উৎপাদন করিবে তাহা সাহিত্যভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম উদ্ভট কল্পনাসংবলিত ও ভৌতিক ও মানবিক ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনী-প্রবর্তনের কৃতিত্ব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯)। তাঁহার রচনার মধ্যে 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২), 'মুক্তামালা' (১৯০১) ও 'ডমরুচরিত' (১৯২৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃত ঘটনার মেশামেশিতে তিনি যে বেপরোয়া, অকুতোভয় মনোভাব দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার বিশেষত্ব নিহিত। অনৈসর্গিক বিষয়ের অবতারণায় তিনি যেরূপ অজস্র উদ্ভাবনশক্তি ও অকুণ্ঠিত কল্পনাক্রীড়ার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই মনস্তত্ত্ব-সমর্থিত বিশ্বাস-উৎপাদনের যুগে অনন্যসাধারণ। ভূত, প্রেত, যক্ষ, পিশাচ,

জীন, পরী প্রভৃতি অলৌকিক জীবের কল্পনায় তাঁহার মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল ও তিনি যে কোনও উপলক্ষ্যে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইহাদিগকে গাঁথিয়া দিয়াছেন। যদিও সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন লইয়া তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নাই, তথাপি তাঁহার এই অলৌকিক জগতের কেন্দ্রস্থলে একপ্রকার নিগূঢ় নিয়মশৃঙ্খলার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তাঁহার ভূত ঠিক ভূতের মতই ব্যবহার করে, এমন কি মানবের সম্পর্কে আসিলেও উহার ভৌতিক প্রকৃতি ক্ষুণ্ন হয় না। তা ছাড়া, বাঙালীর সাধারণ জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস-সংস্কারের সহিত এই ভৌতিক আবির্ভাবসমূহের এক সহজ ছন্দের মিল আছে। সময় সময় ইহাদের পিছনে বাঙালী সমাজের কুসংস্কার ও উদ্ভট ভাবকল্পনার বিরুদ্ধে একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমনোভাবের পরিচয় মিলে। ব্যঙ্গের সূচিমুখে বিদ্ধ হইয়া উদ্ভট কল্পনার বুদ্বুদ্ খানিকটা রূপক-তাৎপর্যের অন্তঃসঙ্গতি লাভ করিয়াছে। যে মানস প্রতিবেশে রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত উহার সহজ সহ-অবস্থান, তাহা প্রচুর পরিমাণে ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে রক্ষিত আছে। এই রূপকথার কল্পনাকে তিনি বাস্তব জীবনের সহিত নূতন সংশ্লেষে মিলাইযাছেন।

এই দিক দিয়া তিনি রাজশেখর বসুর অগ্রবর্তী ও পথপ্রদর্শক। তবে রাজশেখর বসুর পরিমিতিবোধ আরও সূক্ষ্ম ও তাঁহার অলৌকিক জগতে পদক্ষেপ যদৃচ্ছ নহে, বিশেষ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। যে অসঙ্গতির মধ্যে মৌলিক চিন্তা-চমকের উপাদান আছে তিনি কেবল তাহারই সার্থক প্রয়োগ করিযাছেন। ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে ভৌতিক জগতের আকাশ-বাতাসে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ, স্বচ্ছন্দ বিহার-বিলাস অনুভব করিযাছেন, রাজশেখর সেখানে কযেকটি সুনির্বাচিত ও বিশেষভাবে চমকপ্রদ খণ্ডাংশে স্বীয় অভিযান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে ভরপেট ভৌতিক খানা খাইযা উদ্গার তুলিয়াছেন, রাজশেখর সেখানে ছুরিকাঁটা দিয়া কয়েকখণ্ড রসাল ভোজ্যদ্রব্য আস্বাদন করিয়া সুরুচি ও আধুনিক যুগোচিত সঙ্গতিবোধের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ভৌতিক কাহিনীর আর একটি উৎকর্ষ এই যে, ইহা চরিত্রবৈশিষ্ট্য স্ফুরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। 'কঙ্কাবতী'-তে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ গার্হস্থ্যজীবনমূলক, দ্বিতীয খণ্ড, একেবারে অবাস্তব কল্পনাশ্রিত। তবে শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতীর জ্বর বিকারের সঙ্গে তাহার অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে সংপৃক্ত করিয়া বাস্তব মনস্তত্ত্বের মর্যাদা কোনভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। 'মুক্তামালা'-য় সুবল গড়গড়ির অদ্ভুত অনুভূতিসমূহেরও সেইরূপ জ্বরবিকারগত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যা সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিষযে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নাই —অলীক জ্বরতপ্ত কল্পনাগুলিই উহাদের রূপবৈচিত্র্যে ও ভাবকৌতূহলে আমাদিগকে সত্যের মত অভিভূত করে।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সৃষ্টি ডমরুধর চরিত্র। তাহার উদ্ভট গল্পের ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের যেরূপ অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করে। গল্পরসের সহিত চারিত্রিক পরিচয় মিশ্রিত হইয়া পরস্পরের উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। এই সমস্ত অসম্ভব-কল্পনা-প্রসূত আখ্যানের মুকুরে ডমরু-চরিত্র উহার সমস্ত বীভৎসতা, আত্ম-প্রসাদ, কূটবুদ্ধি ও ভক্তি-অভিনয় লইয়া আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ডমরুধর পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্তি ও ঘোরতর

নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচ সত্যভাষণের জন্য সে আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না। ফলস্টাফের দৈহিক স্থূলতা তাহার সমস্ত ফাঁকি-জুয়াচুরি, মিথ্যা আত্মশ্লাঘা ও নিরঙ্কুশ রসিকতার নির্ভরযোগ্য আধার রচনা করিয়াছে। সেইরূপ ডমরুধরের ঘোর কৃষ্ণকান্তি দেহ ও আত্মগর্বস্ফীত, ইতর মন তাহার সমুদয় কৌতুককর দুরবস্থা ও কল্পনার অনিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ বিলাসকে এক স্বাভাবিক আশ্রয়ের বৃন্তে ধরিয়া রাখিয়াছে।

(৬)

প্রমথ চৌধুরীর পরে হাস্যরসপ্রধান কথা-সাহিত্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের স্থান। তাঁহার 'গড্ডালিকা' ও 'কজ্জলী' নামে দুইখানি ব্যঙ্গচিত্রসমষ্টি তাহাদের প্রথম আবির্ভাবের সময় পাঠক ও রসগ্রাহী সমাজে একটা হুলস্থুলের সৃষ্টি করে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিক দেখা দিয়াছেন। ইঁহার হাস্যরসের প্রকৃতিটি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বা প্রমথ চৌধুরী হইতে ভিন্ন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অতিরঞ্জন ও প্রমথ চৌধুরী নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা হাস্যকর সূক্ষ্মতর্ক ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ আলোচনা ও অতর্কিতভাবে বিপরীত রসের প্রবর্তন ইত্যাদি উপায়ে comedy সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক নীল লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলি ছাড়া অন্যগুলিতে হাস্যরসের উৎস .র গভীর নহে। বুদ্ধির কসরতের দ্বারাই হাস্য উদ্রিক্ত হইয়াছে। রাজশেখরবাবুর হাস্য-রসের মধ্যে একটা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বপ্র-ক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে। হাস্যরসিকের প্রধান লক্ষণ হাস্যরসপ্রধান মৌলিক পরিকল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি। গম্ভীরের জমিতে যাহারা হাসির সূক্ষ্ম পাড় বুনিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের কারুকার্য প্রশংসনীয় হইলেও মৌলিকতার অভাব আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। রাজশেখরবাবু অপরের পরিকল্পনার উপর সূক্ষ্ম জাল বয়ন করেন নাই। তাঁহার রসিকতা কেবল derivative বা আহরণমূলক নহে; অপরের ভাব-ভঙ্গীর বিকৃতিমূলক অনুকরণের (parody) উপর তাঁহার খ্যাতি নির্ভর করে না। অবশ্য এই সমস্ত উপাদান তাঁহার মধ্যেও অল্প পরিমাণে আছে, কিন্তু এগুলি তাঁহার সমস্ত রচনায় গৌণ স্থান অধিকার করে।

তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনার উদাহরণস্বরূপ 'গড্ডালিকা'তে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা-সঙ্কট' ও 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ও 'কজ্জলী'তে 'বিরিঞ্চি বাবা' ও 'উলট-পুরাণ'-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'বিরিঞ্চি বাবা' আমাদের ধর্মের নামে জুয়াচুরি প্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত। প্রথমোক্ত গল্পে যৌথকারবার-প্রণালীর অভিনব প্রয়োগ, ধর্মক্ষেত্রে ব্যবসাদারী বুদ্ধির প্রবর্তনের মধ্যে যে তীব্র অসংগতি আছে তাহাই হাস্য-রসের উপাদান। আবার এই হাস্যরসের অবিরল প্রবাহের মধ্যে চরিত্রের পরিকল্পনায় হাসির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণিপাক আছে। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর উদাস, নিস্পৃহ ধর্মসাধনা, গণ্ডেরীরামের ধর্ম-তত্ত্বের সূক্ষ্মজ্ঞান, রায় সাহেব তিনকড়ির জমাখরচের হিসাবমূলক ব্যবসায়-বুদ্ধি—এ সমস্তই

অতি নিপুণ হস্তে, দুই একটি রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কৃপণ, সন্দিগ্ধমনা রায় সাহেবই বোকা বনিয়াছেন, তাঁহার উপর হাসির পিচকারি নিঃশেষে বর্ষিত হইয়াছে। 'বিরিঞ্চি বাবা'র পরিকল্পনা বিশেষ মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না, কেননা ধর্মান্ধতা ও বিচারবিহীন গুরুবাদ আমাদের সনাতন লক্ষণ ও বহুদিন হইতেই ইহা সাহিত্যিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়ীভূত। কিন্তু বিষয় পুরাতন হ লেও বিরিঞ্চি বাবা যে বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির দাবী করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার যে বিশেষ ক্ষমতার সম্মোহনে অভিভূত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কৌতুককর অভিনবত্ব আছে। কালের আবর্তন তিনি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকত্ববাদ তিনি বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে সরাইয়া ধনাগমের স্থূল প্রয়োজনে লাগাইতে পারেন—এই বিশ্বাসই ভক্তবর্গের উপর তাঁহার প্রভাবের হেতু। সত্যব্রত, গণেশ-মামা, গুরুপদবাবুর ভূতপূর্ব মুহুরী তুর্কবংশসম্ভূত ফরিদপুরী মুসলমান বছিরুদ্দি প্রভৃতি, হাসির এই বৃহৎ আবেষ্টনের মধ্যে নিজ নিজ চরিত্রানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাসির কলধ্বনি তুলিয়াছে। 'চিকিৎসা-সঙ্কট'-এ নন্দদুলালের রোগের উৎপত্তি, চিকিৎসার বিচিত্র প্রণালী ও উপশম—সমস্তই একটা চমৎকার প্রহসন-সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। বন্ধুবর্গের স্নেহাতিশয্যে যে রোগের উদ্ভব ও তাহাদের মন্ত্রণাবিভেদে যাহার বিস্তৃতি, নিবিড়তর সম্পর্কের অভ্যাগমেই তাহার নিবৃত্তি ও শান্তি ; সান্ধ্য মজলিসটির বিলোপ এই জগতে প্রচলিত অমোঘ ন্যায়নীতির (poetic justice) জয়লাভ। চিকিৎসক-গোষ্ঠীর রোগনির্ণয়প্রণালী ও ব্যবস্থাপত্র-নির্ধারণে যে সুস্পষ্ট অতিরঞ্জন আছে তাহাতে সত্যের সূক্ষ্মরেখা একেবারে অদৃশ্য হয় নাই, সত্যের শক্ত মেরুদণ্ডই এই অতিরঞ্জনস্ফীতিকে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে।

'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পে ভৌতিক জগতের এমন একটা দিক্ চিত্রিত হইয়াছে, যাহার হাস্যকর অসংগতি আমাদিগের কৌতুকবোধকে প্রবলভাবে উদ্রিক্ত করে। মৃত্যুর পরেও যে সমস্ত প্রবৃত্তি জীবিত ও সক্রিয় থাকে, তাহাদের মধ্যে আড্ডা জমাইবার ও প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিবার প্রবৃত্তিও অন্তর্ভুক্ত। এই সনাতন, অবিনশ্বর প্রবৃত্তিগুলি লৌকিক জীবনেও যেমন, সেইরূপ ভৌতিক জীবনেও নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে—বরং ভৌতিক জীবনে স্বাধীনতা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতারও বৃদ্ধি হয়। যেখানে পার্থিব জীবনে এক স্বামী ও এক স্ত্রীর পক্ষে পারিবারিক শান্তিরক্ষা দুরূহ, সে অবস্থায় ভৌতিক জীবনে তিন জন্মের দম্পতির একত্র সমাবেশ যে একটা অগ্ন্যুৎপাতের মত অবস্থার সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? আবার ইহার মধ্যে irony বা শ্লেষাত্মক বৈপরীত্যের অসদ্ভাব নাই। যে অবাঞ্ছিত সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিয়া শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি, মৃত্যুর পর নূতন সংসার পাতিবার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বজীবনের সেই অভিশাপ যদি পরজীবনেও আমাদের অনুসরণ করে, তবে ব্যাপারটা কি অসম্ভব রকম ঘোরাল হইয়া উঠে না ? তার উপর জীবনত্রয় ব্যাপী পরস্পর-বিরোধী স্বত্বাধিকারের মীমাংসা বোধ হয় মানুষের বিচারশক্তির অতীত। এই দুরূহ, মীমাংসাতীত সমস্যা ভৌতিক জীবনের নিশ্চিন্ত, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষচ্ছেদ, ইহার নির্মেঘ, সূর্যালোকিত দিবসের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। এই প্রেত-জীবন মনুষ্য-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি—কেবল মনুষ্য-জীবনের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবমুক্ত। এই প্রেতলোক রোমাঞ্চকর বিভীষিকাবর্জিত, মানুষ-লোকের প্রতিবাসী ও তাহার রঙ্গ-ভঙ্গ ও কৌতুকলীলার

সহচর। চিত্রকরের রেখা এখানে লেখনীর সহায়তা করিয়াছে, ও এই প্রেত-রাজ্যের সরল ও কৌতুককর বীভৎসতা এই দ্বিবিধ উপায়ে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

'উলট পুরাণ' গল্পটি পরিকল্পনার মৌলিকতায় উজ্জ্বল—topsy-turvydom বা বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যমূলক চিত্রের জন্য উপভোগ্য। যদি কোন রাজনৈতিক ভূমিকম্পে ইংরেজ ও ভারতবাসীর আপেক্ষিক অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে যে বিসদৃশ ব্যাপারের সংঘটন হইবে এই গল্পটি তাহারই একটা কৌতুককর আভাস। ভারতবাসীর ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন, তাহার মনের কান্না ও অভিমানের উচ্ছ্বাস এই সমস্তই ইংরেজে আরোপিত হইয়া এক অভূতপূর্ব comedy সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য চিত্র হইয়াছে উড়িয়া পুলিশের দ্বারা ইংরেজ সার্জেণ্টের স্থানাধিকার—তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে উৎপীড়িত ইংরেজ নাগরিকের সক্রন্দন অভিযোগ। এই রসিকতার দো-নলা বন্দুক ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়কেই আঘাত করিয়াছে—কিন্তু এই আঘাতের মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষজ্বালা নাই, আছে কৌতুকমণ্ডিত বিদ্রূপ।

অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে হাস্যরস যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহার কেন্দ্রস্থ ভাব-ঐক্য খুব সুপরিস্ফুট নহে। 'লম্বকর্ণ' গল্পে মৌলিক ভাব অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সরস বর্ণনাই অধিকতর কৌতুকোদ্দীপক। রায় বাহাদুর বংশলোচনের দাম্পত্য কলহ, তাঁহার পারিষদবর্গের ছোটখাট রেষারেষি, বেলিয়াঘাটা কেরোসিন ব্যাঙের সানুনাসিক-শব্দবর্জনমূলক কথোপকথন ও তাহাদের লম্বকর্ণ কর্তৃক সংঘটিত দুরবস্থা, কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে রায় বাহাদুরের প্রাণসংশয় ও লম্বকর্ণের সাহায্যে তাঁহার উদ্ধার-লাভ—এই সমস্তই বিমল হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে। তবে চাটুয্যে মহাশয়ের পাঁঠার ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হওয়ার গল্পটার মধ্যে একটু মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে। ঝড়ের বর্ণনায় ও 'কচি সংসদ'-এ রেলগাড়ির দ্রুতগতির বর্ণনায় সাধারণতঃ নির্জীব ও মন্থরগতি বাংলা ভাষার মধ্যে চমৎকার গতিবেগ সঞ্চার হইয়াছে, ও ইহার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক ঈষৎ অতিরঞ্জনের ব্যঞ্জনা-সংযোগ বর্ণনাকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে। তবে লম্বকর্ণের ক্ষুদ্র স্কন্ধের উপর গল্পের সমস্ত ভারকেন্দ্র চাপাইয়া দেওয়া ঠিক সামঞ্জস্যবোধের অনুযায়ী হয় নাই—অবশ্য যদি তাহার তিন অধ্যায় গীতা উদরস্থ করার অদ্ভুত কীর্তি তাহার নিষ্কাম ভারবহন ক্ষমতা অভূতপূর্বরূপে বাড়াইয়া না থাকে। 'মহাবিদ্যা' গল্পটিতে মৌলিক ভাবের অস্পষ্টতার জন্য তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতিতে রসিকতা ভাল খোলে নাই—মহাবিদ্যালাভের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ আশানুরূপ বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। 'কচি-সংসদ' গল্পে কচি-সংসদের সভ্যদের নামকরণে যে সময়োপযোগী ব্যঙ্গ শক্তির পরিচয় মিলে, সমস্ত গল্পটির কতকটা খাপছাড়া ভাবে ও শিথিল গঠন প্রণালীতে তাহার মর্যাদা ঠিক রক্ষিত হয় নাই। কচি-সংসদের সঙ্গে ক্ষেন্তর বৈবাহিক আদর্শের কোনও মিল নাই, এবং তাহার কচি-সংসদ ত্যাগ করিয়া হৈহয় সংঘে যোগদান এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অভাবই সূচিত করে। বিশেষতঃ ক্ষেন্তর 'হাইকোর্টশিপে' যে অভিনবত্ব আছে তাহার মধ্যে কষ্ট কল্পনার আতিশয্য আবিষ্কার করা মোটেই কঠিন নহে। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটি, যে সম্ভাব্যতার গণ্ডির

মধ্যে আমাদের হাস্যরস তরঙ্গায়িত হয় তাহা অতিক্রম করার জন্য, শীর্ণ ও নির্জীব হইয়া নিষ্ফলতার বালুকারাশির মধ্যে নিজ স্রোতোবেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'স্বয়ংবরা' গল্পটি প্রহসনের মাত্রাধিক্যের জন্য সূক্ষ্ম রসিকতার মর্যাদা হারাইয়াছে—উদ্ভট খেয়াল বাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে নিছক কল্পনারাজ্যে উধাও হইয়াছে। 'জাবালি' গল্পটির রসিকতা derivative; ইহা তপস্বী-জীবনের সাধারণ গতি ও আদর্শের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা, বর্তমান যুগাদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিয়া ইহার মধ্যে হাস্যজনক অসংগতির আবিষ্কার-চেষ্টা এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গপ্রয়াস কোন একটি ব্যাপক সমালোচনার ঐক্য-সূত্র-গ্রথিত না হওয়ায় রসিকতার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে রহিয়া গিয়াছে।

রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য। Verbal wit বা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক রসিকতার প্রাধান্য তাঁহার রচনায় নাই। তিনি হাস্য-রসিকের দৃষ্টি লইয়া জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ খণ্ডাংশগুলি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যপ্রবাহ ছুটাইয়াছেন। তিনি জানেন যে, রসিকতার প্রকৃত উৎস শাণিত, তীক্ষ্ণাগ্র বাক্য-পরম্পরা সংযোগে নহে। সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তিই unconscious humorist, অজ্ঞাতসারে হাস্যরস সৃষ্টি করে। তাহারা খুব গম্ভীরভাবে, একনিষ্ঠ একাগ্রতার সহিত নিজ নিজ জীবননীতি ব্যাখ্যা করে, অপরে তাহার মধ্যে উপহাস্যতার সন্ধান পাইয়া তাহাকে হাসির খোরাকে পরিণত করে। রাজশেখরবাবুর পাত্র-পাত্রীরা এইরূপ unconscious humorist—রসিকতা করিবার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নাই। পরিস্থিতির প্রভাবই তাহাদের মধ্যে হাস্যরস নিষ্কাশন করিয়াছে। হাসির বিন্দু যতই স্বচ্ছ হইবে, ততই তাহার মধ্যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য, জীবন-সমালোচনার বিশেষ ধারা প্রতিফলিত হইবে। নিজ অন্তর্নিহিত প্রবণতা অপেক্ষা বাহ্য প্রতিবেশের প্রভাব প্রবলতর হওয়ার জন্য ইহাদের রসিকতা খুব উচ্চাঙ্গের বা গভীররসাত্মক হয় নাই। কিন্তু তথাপি স্বতঃ উৎসারিত স্বচ্ছতার জন্য এই হাস্যরস বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সম্পর্কে হাস্যরসসৃষ্টির কার্যে চিত্রের সহায়তার কথাও উল্লেখযোগ্য। এসম্বন্ধে 'গড্ডালিকা'র উপর রবীন্দ্রনাথের অভিমত হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিলেই চিত্রকলার সহযোগিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। "ইহাতে আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নয়। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে, ডাহিনে ও বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।" দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী গ্রন্থ 'কজ্জলী'তে রেখাচিত্রের এই উজ্জ্বল প্রকাশ-ক্ষমতা, উহার তীক্ষ্ণ ভাব ব্যঞ্জনাশক্তি অনেকটা ম্লান ও মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। চিত্র ব্যঞ্জনার এই ম্লানিমা মৌলিক পরিকল্পনার আপেক্ষিক অনুৎকর্ষের সত্য প্রতিচ্ছবি।

(৭)

রূপকথার রাজকন্যার নাকি হাসিতে মাণিক আর কান্নায় মুক্তা ঝরিয়া পড়িত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভাবরূপে হাসি ও কান্নার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য,

মূল্যের দিক দিয়া তাহাদের সেরূপ কোন দুস্তর ব্যবধান ছিল না। সেইরূপ আধুনিক জীবনের জটিলতা একদিকে যেমন গভীর নৈরাশ্যবাদ জাগায়, অপরদিকে এই জটিলতার ভাঁজে ভাঁজে যে সুরবদ্ধ অসংগতি আছে তাহা হাস্যরসের প্রচুর উপাদান যোগায়। সোজা দৃষ্টিতে যাহা মারণাস্ত্র, তির্যক কটাক্ষে তাহাই সুড়সুড়ি দেওয়ার যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহারিক জগতে যে বজ্রগর্ভ নিবিড় মেঘ দুঃখের ধারাবর্ষণে উন্মুখ, হাস্যরসিকের ফুৎকারে তাহাই ফিকে হইয়া রামধনুর বিচিত্র বর্ণাভা প্রকাশ করে। জাল যখন শক্ত ফাঁসে পরিণত হইয়া শ্বাসরোধ ঘটায় তখন তাহা করুণ রসের উৎস—কিন্তু যখন লঘু হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ইহা পাশে আবদ্ধ প্রাণীর মনে একটা লক্ষ্যহীন, অবোধ হাঁকু-পাকুর সৃষ্টি করে তখন ইহার প্রচেষ্টার উপহাস্য দিক্‌টাই বড় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং আধুনিক জগৎ যেমন আমাদের জীবনযাত্রাকে দুঃসহ ও দুঃখভার মন্থর করিয়াছে তেমনি নানা কৌতুককর অসামঞ্জস্যের হেতু হইয়া হাস্যরস-বিলাসের নূতন নূতন বীজ বপন করিয়াছে।

আবার আধুনিকতার চেহারা সকল দেশে সমান নহে। ইহা বাঙালীর ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট মনোধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার মনোজগতে যে নাগরদোলার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অন্য দেশের প্রতিক্রিয়ার সহিত ঠিক মিলিবে না। অন্যান্য মননধর্মী জাতির মধ্যে আধুনিকতা বহু শতাব্দীর সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি, পূর্বতন যুগের অঙ্কুরিত প্রবণতার ক্রমাভিব্যক্তির ফল। আমাদের দেশে ইহা অনেকটা অতর্কিত আগন্তুক, আমাদের সনাতন আদর্শ ও মানস অভ্যাসের মাঝখানে বোমার মত পড়িয়া ইহার সহজ সুষমাকে বিধ্বস্ত ও ইহার উপাদান-সমূহকে নানা উদ্ভট সংমিশ্রণে সংযুক্ত করিয়াছে। আমাদের মনঃসংস্থানের যদি এক্সরে করা সম্ভব হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে, উহার মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কার, অন্ধতম বিশ্বাস, মধ্যযুগসুলভ গুরুবাদ অসম্ভবের প্রতি ঝোঁক প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সহিত নিতান্ত এলোমেলোভাবে সংসক্ত হইয়া আছে। আমরা একই সময়ে বহুযুগে বাস করিয়া থাকি—বিভিন্ন কালের মিশ্রবাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি। পুরাণোক্ত বামনদেবের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্য-রসাতলে ত্রিলোকে একই সঙ্গে পদবিন্যাস করি। আমাদের অস্থি-মজ্জায় বহুপুরুষব্যাপী পিতামহদের যে লিপিসংঘ অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে, তাহা কোন অতর্কিত প্রেরণায় একই সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠে ও দৃষ্টিবিভ্রম জন্মায়। একটি বোতাম টিপিবামাত্রই আমরা বর্তমান যান্ত্রিক যুগ হইতে একেবারে ব্যাস-বাল্মীকির যুগে কালান্তরিত হই। আমাদের আধুনিক উপকরণে সজ্জিত ড্রইংরুমে হঠাৎ শুভ্রশ্মশ্রু বীণাহস্ত নারদ ঋষির আবির্ভাব হয়। ভৃগু-সংহিতার নির্দেশ মানিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করি। এগুলিকে উদ্ভট খেয়াল বা লেখকের কল্পনার অবাধ ভ্রমণরূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু ইহাদের পিছনে আমাদের নিগূঢ় ইচ্ছার সমর্থন আছে। আমাদের অন্তরে এই বায়ুভ্রমণের প্রবণতা আছে বলিয়াই লেখক এত সহজেই আমাদের এই ধূম্রলোকে লইয়া যান। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের গভীরতা আমাদের শিথিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ষাশেষে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় অলৌকিকত্বের বিচ্ছিন্ন বাষ্পরাশি আমাদের মনোলোকে বিচরণ করে, এবং বাস্তববোধের সূর্যালোককে ঝাপ্‌সা করিয়া কর্মজগতের মধ্যে স্বপ্নজড়িমার আবরণ টানে। কাজেই আমাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, মোহমুক্ত প্রগতিশীলতা অন্যান্য দেশের সহিত

তুলনায় একটু অদ্ভুত রকমের বিশৃঙ্খলার প্রবর্তন করিয়াছে—তীক্ষ্ণাগ্র বর্শাফলকে খোঁচা খাইয়া আমাদের অন্তরের প্রাচীন সংস্কারের ভূতের দল পুলিশী বেটনের কাছে আন্দোলনকারী জনতার মত চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়া আরও চীৎকার ও গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়।

এই আধুনিকতার রসপুষ্ট, নবযৌবন-প্রাপ্ত হাস্যরসের স্রষ্টা ও ইহার বিজয়-অভিযানের ঐতিহাসিক রাজশেখর বসু। গড্ডলিকা (১৩৩২), কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন (১৩৫০), গল্প-কল্প (১৩৫৭) ও ধুস্তুরী মায়া (১৩৫৯)—এই গল্পসংগ্রহ-গ্রন্থাবলী যে উদ্ভট কল্পনা ও অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছে বাঙালী পাঠক তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার নানা-সমস্যা-বিড়ম্বিত জীবনে চিত্তবিনোদনের একটা আশাতীত উপায় লাভ করিয়াছে। এই গল্পগুলিতে লেখকের অসামান্য উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনা-প্রাচুর্যের অজস্রতা ও বিসদৃশের সমাবেশ-কৌশলে হাস্যরস-সৃষ্টির সাবলীল নিপুণতা আমাদিগকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া তোলে। আমাদের এই প্রথাবদ্ধ, নিয়মশাসিত, অভাব-দৈন্য-পিষ্ট জীবনে যে এত সুপ্রচুর হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত আছে ইহা লেখক আমাদিগকে দেখাইয়া না দিলে আমরা কোনদিনই অনুভব করিতে পারিতাম না। পৌরাণিক সাহিত্যে ও প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার অসঙ্গতিবোধকে অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ করিয়াছে ও পরিহাসরসিকতার অনেক নূতন উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছে। অবশ্য কোন কোন গল্পে খেয়ালী কল্পনার নিরঙ্কুশ আতিশয্য মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে; লেখক আমাদিগকে নিছক মৃত্তিকাসম্পর্কহীন ধূম্রলোকের অলিতে-গলিতে, রূপকথার আধুনিক-সংস্করণ-জাতীয় ভূসংস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছেন, বাস্তবজীবনের রন্ধ্র-পথে অলৌকিক জগতের হিমেল বাতাস হঠাৎ আসিয়া পরিচিত দৃশ্যপটকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। আমরা যেন আবার নূতন করিয়া শৈশবকল্পনার স্বপ্ন-বাস্তব-মেশানো, অথচ মাধ্যাকর্ষণের পিছন টানে নিয়ন্ত্রিত, এক মায়া-জগতের অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছি। তথাপি এই উদ্দাম কল্পনাবিলাসের কেন্দ্রস্থলে মানব প্রকৃতির চিরন্তন সত্য স্থিরভাবে বিরাজমান,—খেয়ালের ঘুড়ি নানা বিচিত্র প্যাঁচ কসিয়া আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু লাটাইটি মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের দৃঢ় মুষ্টিতে বিধৃত।

(৮)

পৌরাণিক গল্পগুলিতে সাধারণতঃ দুইটি রীতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঋষি বা দেব-সমাজে আধুনিক সমস্যা প্রবর্তিত হইয়াছে বা বর্তমানের দৃঢ় নিয়মবদ্ধতার উপর পৌরাণিক অতীতের অলৌকিক শক্তি ক্ষণস্থায়ী অধিকার বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর একজাতীয় খোসার মধ্যে অপরজাতীয় শাঁস ঢোকানোর ফলে, আধার ও আধেয়ের মধ্যে উৎকট অসামঞ্জস্যের জন্য, এক কৌতুকজনক অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি স্বর্গের পারিজাতকে মর্ত্যজীবনের কটু তৈলে ভাজিয়া ও মরজীবনের বাসি ভাতে অমরলোকের যজ্ঞ-হবি মাখিয়া যে নূতন ধরণের খাদ্য তৈয়ারী করিয়াছেন তাহাতে আমাদের রসনা নূতন আস্বাদের পরিতৃপ্তি পায়। কোথাও তিনি স্বর্গীয় ব্যাপারকে মানবিক মানদণ্ডে, কোথাও বা মানবিক ঘটনাকে স্বর্গীয় মানদণ্ডে মাপিয়া উভয়ত্রই অসঙ্গতির হাস্যকরতা

আবিষ্কার করিয়াছেন। 'ভুশণ্ডীর মাঠ'-এ হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ ও পাতিব্রত্যের আদর্শ প্রেতলোকে এক তুমুল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, ভৌতিক জগতে মানবের অধিকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এক বীভৎস পরিণতি ঘটাইয়া চিরন্তন আদর্শেরই ফাঁকিটা ধরাইয়া দিয়াছে। 'হনুমানের স্বপ্ন' ও 'ভারতের ঝুমঝুমি'তে পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা আধুনিক সমস্যার জালে জড়াইয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। হনুমানের বীরত্ব তাহাকে বিবাহ-বিভ্রাট হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, ও দুর্বাসার অগ্নিভাস্বর ব্রহ্মতেজ আধুনিক অর্বাচীনতার কাছে নিতান্ত খেলো প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতিমানবকে বামনের চক্ষে দেখিলে যাহা হয় এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। 'প্রেমচক্র'-এ ঋষিকুমারেরা মানব প্রেমের কুখ্যাত ত্রিভুজে আবদ্ধ হইয়া যে চড়কিনাচ নাচিয়াছিল তাহা তাহাদের সত্ত্বগুণ প্রধান আর্য প্রকৃতির সহিত বেমানান বলিয়া আরও উপভোগ্য হইয়াছে। রেবতী ও বলদেবের মিলনে সত্য ও দ্বাপরের মাপকাঠির বৈষম্য যে কৌতুকাবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, বলদেবের হলাকর্ষণের ফলে তাহার সমাধান হইয়া বর-কন্যার মধ্যে উচ্চতা-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। 'দশকরণের বানপ্রস্থ'-এ দেবতার বরে মানুষের অতিরিক্ত শক্তিলাভ কেমন করিয়া তাহার সুখের পরিবর্তে অস্বস্তির কারণ হয় তাহার কৌতুকাবহ উদাহরণ।

'তৃতীয় দ্যূত-সভা' ও 'ভীমগীতা' মহাভারতের আখ্যান ও ভাষার ব্যঙ্গানুকৃতি (parody)। এইগুলিতে ভাষার ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত ভাবের লঘুতার অসঙ্গতি হাস্যরসের উপভোগ্যতা ও সাহিত্যমূল্য আরও বাড়াইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে ও শকুনির শাঠ্যের বিরুদ্ধে চতুরতর ও উন্নততর শাঠ্যের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধটির পরিকল্পনা, পরিচলনা, সুষ্ঠুভাবে চরিত্র-বিকাশের আয়োজন, ক্ষুদ্র নাটকীয় ইঙ্গিত-প্রয়োগ ও পরিসমাপ্তি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কলারচনার সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। 'ভীমগীতা'য় ভগবদগীতার আদর্শ ভীমের বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত হইয়া যুগোপযোগী হইয়াছে।

মাঝে মধ্যে অমরবৃন্দ আধুনিক জগতের অসহনীয় ক্লেশ নিবারণের জন্য মর্ত্য-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সমাধানের উপায় চিন্তা করিতে মিলিত হইয়াছেন। 'রামরাজ্য', 'তিনবিধাতা' ও 'গন্ধমাদন-বৈঠক' এ বিষয়েরই আলোচনা। এগুলির মধ্যে হাস্যরস খুব সার্থকভাবে বিকশিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ যে রসিকতার ক্ষীণ প্রলেপের নীচে গম্ভীর মননশীলতাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্যা এত উষ্ণ ও মর্মভেদী যে ইহা এখনও হাস্যরসিকের এলাকায় পৌছিবার মত ভাবমুক্তি ও সুখস্পর্শতা লাভ করে নাই। কাঁটা গলা হইতে বাহির না হইলে তাহাকে ক্রীড়াচ্ছলে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখা যায় না। রসিকতা কাল-ও-ভাব-গত ব্যবধানের অপেক্ষা রাখে। ব্যাস, বাল্মীকি, নারদ আমাদের বর্তমান জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া না গেলে তাহাদিগকে লইয়া মস্করা করা চলিত না। সুতরাং হাস্যরসিকের নিরপেক্ষ বুদ্ধি এইরূপ অতি-আধুনিক জলন্ত জিজ্ঞাসা হইতে প্রতিহত হইয়া যুক্তিপ্রধান আলোচনার মত ভোঁতা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব দর্শনে যাহাকে তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণের সহিত উপমিত করা হয়, এখানে আমরা লেখকের সেই জাতীয় মনোভাবেরই পরিচয় পাই—রসিকতার মাধুর্য বিষয়ের দাহ-জ্বালার সহিত মিশিয়া একরকম অস্বস্তিই জন্মায়। আর

বিশেষতঃ দেববুদ্ধি এখানে মানববুদ্ধি অপেক্ষা স্বচ্ছতর বা অধিকতর রহস্যভেদী বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আল্লা, সেণ্ট নিজেদের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যতই সচেতন থাকুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে মানব যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেন ও মানব বুদ্ধির অসহায়তাই তাঁহাদের আলোচনায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই জীবন-মরণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আপাতত দেবতা ও হাস্যরসিক উভয়েরই অধিকার মুলতুবি রাখিলে রসের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। উভয়কেই আপাতত সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতে পারে। 'গামানুষ জাতীয় কথা'য় পুরাতন পৃথিবীর ধ্বংসের পর উদ্ভূত যে নূতন মানবজাতির কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত বর্তমান মানুষের কালের দিক্ দিয়া যতই ব্যবধান থাক, বুদ্ধির দিক দিয়া খুব যে পর্যায়ের পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না গামানুষের প্রতিনিধি—স্থানীয় ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছে তাহা রোজই আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করি। আমরা যাহাকে ভণ্ডামি বলিয়া জানি, গামানুষেরা সেই ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া দেখাইবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে মাত্র।

আবার মানব যেখানে দেবতার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে বা পারলৌকিক রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে সেখানেও সে হাসির লহর ছুটাইয়াছে। বিরিঞ্চিবাবা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োগ করিয়া শেয়ারের দর তাজা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈবশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের নিকটে হার মানিয়াছে। 'ধুস্তরী মায়া' বৃদ্ধকে যুবাতে পরিণত করা-রূপ নানা ভেল্কি খেলা সত্ত্বেও শেষে নিছক hallucination বা মতিভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'বদন চৌধুরীর শোকসভায়' অপদেবতার আবির্ভাব বক্তাদের রসনায় দুষ্ট সরস্বতীর ভর করাইয়া শোকসভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে, বক্তাদের মিথ্যা অভিনয়ের ভিতরকার সত্যটি নগ্নভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছে। 'যদু ডাক্তারের পেসেণ্ট, ডাক্তারী বিদ্যাকে যোগবলের সহিত সহযোগিতার বন্ধনে বাঁধিয়া আমাদের কল্পনাকে খুব প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে দৈবশক্তিতে যদি মস্তকচ্যুত ধড়ে প্রাণ রাখা সম্ভব হইল, তখন আর শুধু সেলাইয়ের জন্য ডাক্তারের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন কি? যোগবল কি সমুদ্র পার হইয়া শেষে গোষ্পদে গিয়া ঠেকিল? 'ষষ্ঠীর কৃপায়' ষষ্ঠীর বেড়ালের মাতৃমূর্তি-গ্রহণ ঠিক আমাদের ঔচিত্যবোধকে তৃপ্তি দিতে পারিল না—কল্পনা যতই আজগুবি হউক তাহার একটা অন্তঃসংগতি ও পরিণতির স্বাভাবিকতা প্রয়োজন। যাহা হউক এই দেবলোক ও মর্ত্যলোকের সংমিশ্রণ যে রাজশেখরবাবুর হাতে নানা বিচিত্র রসসৃষ্টির হেতু হইয়াছে ও আমাদের কল্পনার পরিধিকে নানাদিকে প্রসারিত করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৯)

অবশ্য লেখক যে সর্বদা কল্পনার উদ্ভট ধূম্রলোকে বিচরণ করিয়াছেন তাহা নহে—বহু স্থলে তিনি অতিপ্রাকৃতস্পর্শহীন বস্তুর জীবনে অবতরণ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত উপহাস্য অসঙ্গতিগুলি আবিষ্কার ও উপভোগ করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের মধ্যে এমন একটা চমকপ্রদ মৌলিকতা আছে ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি সরস কৌতুকাবহ রূপ আছে যে, ইহাদের ফলে পাঠকের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত হাসির রসধারা প্রবাহিত হয়।

সমাজ বা ব্যক্তিমানসের বাস্তবপ্রবণতা ব্যঙ্গমধুর অতিরঞ্জন ও সমাবেশকৌশলের মাধ্যমে হাসির উপাদানে রূপান্তরিত হয়—চেনা জিনিস আমাদের সম্মুখে এক অপরিচিতপ্রায়, অভিনব মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া পরিচিতের প্রতি উপেক্ষাকে নূতনের প্রতি বিস্মিত কৌতূহলে পরিণত করে। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' আমাদের অতিবাস্তব ব্যবসায়-পরিচালনা-প্রথারই একটা নিখুঁত চিত্র। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়-ফন্দির সঙ্গে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণ ইহাকে অভিনব রসরূপ দিয়াছে। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর গেরুয়া-কাপড়-পরা জুয়াচুরি, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়ার দালালীর কমিশনের হিসাবে পুণ্যের পরিমাণ-নির্দেশ, রায়সাহেব তিনকড়ির বজ্র-আঁটন-ফস্কা-গেরো-নীতির ফলে ভরাডুবি—এ সমস্তই এই হাস্যসমুদ্রের উচ্ছল তরঙ্গরূপে আমাদিগকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়। সর্বোপরি পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা, আমাদের পুণ্যলোভাতুরতার সুযোগ লইয়া তীর্থক্ষেত্রে যে ছোটখাট জুয়াচুরি চলিযা থাকে তাহার মধ্যে এক বিরাট যৌথকারবারের অতিকায়ত্ব-আরোপের উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের হাস্যপ্রবণতার শীর্ণ ধারার মধ্যে এক প্রচণ্ড জলপ্রপাতের অসংবরণীয় বেগ সঞ্চার করে—আমরা বাস্তব জগতে থাকিযাও যেন স্রোতোবেগে এক নূতন রাজ্যে ভাসিয়া যাই।

'চিকিৎসা-সঙ্কট'-এও চিকিৎসাক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা লেখকের হাস্যরসসৃষ্টির কৌশলে, একটু অতিরঞ্জনের দ্বারা স্ফীত-কলেবর হইয়া, মেদস্ফীতা, বিজযগর্বে স্মিতাননা মিসেস বিপুলামিত্রের ব্যঙ্গচিত্রের মতই আমাদিগকে হাস্যোচ্ছ্বাসে বেসামাল করিযা ফেলে। বাস্তব জগতের দুর্ভোগ হাস্যরসিকের হাতে বিশুদ্ধ আনন্দরসের উপাদানে পরিণত হইযাছে। কবিরাজ মহাশযের খুলনা অঞ্চলের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাংলা বর্ণমালার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রসনার উৎকট-অনুশীলন-জাত ইংরাজী শব্দধ্বনির ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যে স্থিতিলাভ করিয়াছে, ইংরাজী ব্যঞ্জন ও বাংলা স্বরধ্বনির মধ্যে যেন একটা হরগৌরী-মিলন ঘটাইয়াছে। 'গড্ডলিকা'র লম্বকর্ণ 'হনুমানের স্বপ্ন'-এ গুরু-বিদাযের হেতু হইযা তাহার প্রতিপালকের আশ্রিত-বাৎসল্যের ঋণ শোধ করিযাছে—খল্বিদং স্বামীর সাত্ত্বিক-আহার-পুষ্ট উদরে রাজসিক শক্তির বাহন শৃঙ্গ প্রযোগ করিযা উদর-নিরুদ্ধ তমোগুণকে মুক্তি দিযাছে ও পশু হইযাও সহজসংস্কারবলে একটা ঘনাযমান দাম্পত্য সমস্যার সুমীমাংসা করিয়াছে। সে দধীচির মত তাহার নশ্বর-কান্তি দেহ বিসর্জন দেয নাই, কিন্তু দধীচির মতই তাহার শৃঙ্গাস্থি হইতে বজ্র নির্মাণ করিযা প্রভুর দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গরাজ্যকে অসুরের অভিভব হইতে উদ্ধার করিযাছে। মানবিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায হইয়াই তাহার পশু-জীবন সার্থক হইযাছে। 'কজ্জলী'র 'কচি-সংসদ আমাদের তারুণ্যের তুরীয ভাববিহ্বলতা-প্রাপ্তির জন্য উৎকটসাধনারত যুব-সমাজের উজ্জ্বল চিত্র—সর্বসাধারণের মনে ইহাদের প্রতি যে একটা স্নিগ্ধ কৌতুকপ্রবণতার অর্ধস্পষ্ট রেশ আছে লেখক তাহাকে স্মরণীয় হাস্যোজ্জ্বল সুস্পষ্টতায় ফুটাইযাছেন। 'হনুমানের স্বপ্ন'-এর রসরচনার নিবিড়তা 'রাতারাতি'তে কাহিনীর দৈর্ঘ্য ও অস্থির বাষ্পোচ্ছ্বাসের জন্য অনেকটা ফিকে হইয়াছে—এখানেও যুব-সমাজের আর একটা নূতন দিকের পরিচয পাই। 'কচি-সংসদ' এ যাহা বিশুদ্ধ ভাবপ্রবণতা ছিল এখানে তাহা যুগধর্মে উদ্ধত যুযুৎসায পরিণত হইযাছে—লম্বকর্ণের কচি মাথায় গুঁতাইবার শিং

গজাইয়াছে। যে তারুণ্যরসসিক্ত বৃদ্ধ এই তরুণসংঘের অভিযানের সহযাত্রী হইয়াছেন তাঁহার দশা অনেকটা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত—তাঁহার নেতৃত্ব তীক্ষ্ণশরকণ্টকিত। শেষে তারুণ্যের এই তপ্ত কটাহ প্রেমের কূপে নিমজ্জনের ফলে শীতল হইয়াছে। কিন্তু এই কূপ পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহাকে গলদেশে রজ্জুবন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'রাজভোগ'-এ একদিকে অজীর্ণরোগগ্রস্ত রাজাবাহাদুরের ভোজ্য সম্বন্ধে উদগ্র কৌতূহল ও শেষ পর্যন্ত একবাটি বার্লী পানে তাহার বাস্তব নিবৃত্তি, অপর দিকে হোটেল-কর্তার সরস, উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ও অতিমাত্রায় উত্তেজিত প্রত্যাশার হঠাৎ ভূমিসাৎ হওয়া একটি চমৎকার বৈপরীত্যরসের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যযুগে চরিতকারেরা ভোজনরসের মধ্য দিয়া ভক্তিরসকে ঘনীভূত করিতেন, পরশুরাম ইহার মধ্যে হাস্যরসের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। রাজাবাহাদুরের সঙ্গিনীটির নীরব ও নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে যে একটি অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎচমক মুহূর্তের জন্য ঝলক দিয়া গিয়াছে তাহা তাহার চরিত্রকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর মত ধর্ম ও ব্যবসায়বুদ্ধির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব রসকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এখানে সাধারণ পরিকল্পনা অপেক্ষা মুচুকুন্দের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। মুচুকুন্দের অতি-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার চিত্রটি ও ইহার মধ্যে সাংসারিক ও পারমার্থিক এই উভয়দিকের দাবীর যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে তাহার মৌলিকতা খুবই উপভোগ্য। লক্ষ্মীর বাহনের আকস্মিক আবির্ভাব ও তাহাকে লইয়া ব্যবসায়ী-মহলে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি হাঙ্গামা, আফিং খাওয়াইয়া তাহাকে বশ করিবার অদ্ভুত ফন্দি ও শেষ পর্যন্ত তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই মুচুকুন্দের ভাগ্যবিপর্যয়—এই সমস্ত ঘটনাবলী অনাবিল কৌতুকরসে অভিষিক্ত। এই হাসি কোথাও উতরোল বা অত্যুচ্চ নয়, লেখকের বর্ণনার ছদ্মগাম্ভীর্য ও মন্তব্যের বঙ্কিম কটাক্ষের ভিতর দিয়া ইহা চূর্ণরশ্মির মত ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। মুচুকুন্দের স্ত্রী মাতঙ্গী উপযুক্ত সহধর্মিণী—তিনি বৈষয়িক স্বামীর পরিপূরকরূপে অধ্যাত্মশৃঙ্খলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে চিরতরে বন্দিনী করিবার মতলব আঁটেন, শেষ পর্যন্ত পেঁচা ফাঁকি দিলে স্বামীর হাত ধরিয়া কাশী যাত্রা করিয়া স্বর্গ-মর্ত্যের ভারসাম্য বজায় রাখেন।

'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' ও 'অক্রূর-সংবাদ' গল্পের সূক্ষ্ম তারে ঝোলানো মূলতঃ মননধর্মী আলোচনা। এই দুইটি গল্পে দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে চমকপ্রদ মৌলিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য বক্তার চরিত্রের সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের সংগতিবিধানের দ্বারা গল্পসাহিত্যের রীতি ও মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান আকর্ষণ, মন্তব্য-আলোচনার তীক্ষ্ণ উপভোগ্য মৌলিকতা। সিদ্ধিনাথ রমণীর প্রসাধনকলার আদিম স্তরের উদ্ভব-কাহিনীকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আজ যাহা আদর-সোহাগের নিদর্শন এককালে তাহাই বন্ধন-নির্যাতনের স্মৃতিচিহ্নরূপে দেহলগ্ন ছিল। তখন স্বামীর পশুবলের স্বর্ণকার-বিপণিতে এই সমস্ত আভরণরাশির প্রথম সূচনা নির্মিত হইত। এমন কি যে অলক্তক, সিন্দূররাগ আজ সধবা-সৌভাগ্যের জলজ্বলে প্রমাণরূপে অভিনন্দিত হয় তাহা নারীদেহে বর্বর পুরুষের অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তপাতের পরিণত সংস্করণ মাত্র। সিদ্ধিনাথ তাঁহার এই অসাধারণ মৌলিক গবেষণার দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত

জীবনে কিন্তু নারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—যুক্তিবলে যাহাকে তিনি নস্যাৎ করেন, সংস্কারবশে তাহারই নিকট ধূলিসাৎ হইতে তাঁহার বাধে না। এই বৈপরীত্য-সমাবেশই জীবন-জটিলতার বন্ধন-গ্রন্থি। 'অক্রুর-সংবাদ'-এও দাম্পত্য-নীতির অভিনয় বিশ্লেষণ আমাদিগকে চমৎকৃত করে। দাম্পত্য সম্পর্কের তিনটি প্রকারভেদ—স্বামী-প্রধান, স্ত্রী-প্রধান ও স্ব-স্ব-প্রধান—এই গল্পে খুব সরস ও চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচিত হইয়াছে। অক্রুরবাবু এই তিন রকম সম্বন্ধই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নাই। মোট কথা, তাঁহার খেয়ালী মনে আত্মপ্রাধান্য ভাবটি এতই প্রবল ও বদ্ধমূল যে প্রথমোক্ত সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসে অতিরিক্ত টানাটানিতে বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকরণ তাঁহার মেজাজ কোন দিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই ও তৃতীয় পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর অন্যান্য-নিরপেক্ষতার কবি-নির্দিষ্ট আদর্শ স্ত্রীর স্থূল ও বাস্তব অধিকারবোধের কাছে কৌতুককর-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্নপত্রে 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং' এই বাক্যটি সংশোধন করিতে দিয়াছিলেন। আমাদের সামান্য সংস্কৃতজ্ঞানে ইহার মধ্যে কোন ভুল ধরিতে না পারিয়া প্রশ্নটির উত্তরের চেষ্টাই করি নাই। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, মূর্খ, বুঝিতে পারিতেছ না যে ঘোড়ায় চাপিলে আর একাকী হইল কি করিয়া? এই বেদান্ততত্ত্বগহন ব্যাকরণরহস্য ঠিক এখনও বুঝিতে পারি নাই, তখন যে বুঝি নাই তাহা বলা বাহুল্য। অনুরূপ যুক্তির প্রতিধ্বনি বাগেশ্রী দত্তের মুখে শুনিতে পাই। সে পৃথক গৃহে বাস, আলোকের বর্ণসঙ্কেতে পূর্ণিমা-তিথিতে আমন্ত্রণ, আবশ্যিক বিচ্ছেদের সাহায্যে প্রেমের নবীন-আকর্ষণ-রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত শর্তই মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যার সময় একটু মানস ফাঁকি রাখিয়াছে। যে ঘরখানি তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইবে তাহাতে সে তাহার বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন—অর্থাৎ তাহার স্থূল সম্প্রসারিত সত্তাকে আশ্রয় দিবে। আর তাহার স্বামীর মহলে সে নিজে বাস করিবে, তাহার সূক্ষ্ম, অর্বাঙ্গিক সত্তাকে সেখানে রাখিবে। এই চমৎকার সুবিধাজনক ব্যবস্থাতেও তাহাদের কাহারও একাকিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না। 'অক্রুর-সংবাদ'-এ কৌতুকরস এই ন্যায়ের ফাঁকিটুকুকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হইয়াছে। আর প্রবন্ধের নামের পৌরাণিক ব্যঞ্জনাটিও সার্থক হইয়াছে—ভাগবত-বর্ণিত অক্রুরের আগমন ব্রজধামে বিরহ ঘোষণা করিয়াছিল। আধুনিক অক্রুরও নানারূপ কূট-বিধি-নিষেধের বেড়াজালে জড়াইয়া নিজের মিলন-প্রয়াসী আত্মার জন্য চিরবিরহের ব্যবস্থা করিয়াছে। 'রটন্তীকুমার' গল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তব ও প্রাত্যহিক ঘটনার সরস বিবৃতি, এবং ইহার হাস্যরস অতিরঞ্জন-উৎসারিত না হইয়া আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ও কন্যাদায়-উদ্ধারের সুপ্রচলিত কলাকৌশল হইতে উদ্ভূত।

(১০)

দীর্ঘকালের রক্ষণশীল সমাজ যখন ভাঙে তখন তাহার চেহারা অনেকটা নদীর বহু শাখায়-প্রশাখায় অনুপ্রবিষ্ট স্রোতোধারার দ্বারা বিধ্বস্ত ও বহুধা-বিদীর্ণ তটভূমির মত দেখায়। নদী-জলপ্রবাহের দ্বারা ইহার চৌকস সুষমা নানারূপে ভাঙিয়া চুরিয়া, শক্ত-মাটি-জলাভূমিতে মিশিয়া, উঁচু-নীচু, আব্ড়া-খাব্ড়ার যদৃচ্ছ সম্মিলনে, মূলধারা সরিয়া গেলে শীর্ণাবশেষ বিচ্ছিন্ন

পল্বলসমূহের ইতস্তত বিক্ষেপে,—সমস্ত ভূসংস্থিতির একটা বিকৃত, কিম্ভূত-কিমাকার রূপ চোখে পড়ে। এই বহুধা-বিকীর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তির্যক রেখার বলিজালে সমাবৃত ভূমিখণ্ডের সামগ্রিক আকৃতিটি হয়ত অনেকের চোখে পড়ে না। অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহার বিষাদ-উদ্দীপক দিকটাই লক্ষ্য করে। কবি অতীতের নষ্ট সুষমার জন্য শোক করেন; সমাজতাত্ত্বিক লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া, ধূলা-বালি সরাইয়া কাদা ঘাঁটিয়া এক নূতন সমাজের ভিত্তি-স্থাপনের আয়োজন করেন; প্রগতিবাদীর দল জীর্ণ ফাটল ধরা সমাজ কবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বৈপ্লবিক নবীকরণের জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে তাহার দিন গণনা করেন। সাধারণ মানুষ অনেকটা উদ্‌ভ্রান্ত-বিমূঢ় হইয়া বিলীয়মান অতীত ও আগন্তুক ভবিষ্যতের মধ্যে দোলায়মান চিত্তে অসহায়ভাবে প্রতীক্ষা করে। শুধু হাস্যরসিক এই বিকৃতির মধ্যে একটি রসতাৎপর্যের সন্ধান পান—ভাঙা-গড়ার নানা এলোমেলো উদ্ভট সমাবেশের মধ্যে এক কৌতুক-কর অসঙ্গতি, কলাসুষমার একটা বক্র ইঙ্গিতের আবিষ্কার করেন। বাঙালীর মানসজগতে যে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, যে ওলট-পালট সংঘটিত হইয়াছে 'তাহার গভীর দিক্‌টা আমাদের কাব্য-সাহিত্য-ইতিহাস-সমাজনীতির মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার লোকহাস্যকর, পাঁচ-মিশেলী দিকটাই হাস্যরসিকের রসসৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বহু হাস্যরসিকই এই সমাজ-বিপর্যয়ের আলোড়নকে পরাবৃত্ত গতি দ্বারা হাস্য-রস-বৈপরীত্যের চাকা ঘুরাইবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। যে বায়ুতরঙ্গে এরোপ্লেন চলে, তাহাতে ঘুড়ি বা ফানুষও উড়ে। এই পরিহাসদক্ষ সংঘে সর্বশেষ যাঁহারা যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রথম সংঘর্ষ হইতে যে ধারা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাকে ইহারা আধুনিকতার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

অবশ্য ইহাদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে আধুনিক যুগের হাস্যরসিকদের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত লেখকেরা যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পিছনে সকলেরই একটা সংস্কারক মনোবৃত্তি ও প্রতিবাদের তীব্র জ্বালা প্রকট হইয়াছে। তাঁহারা মধু নহে, যে অম্লমধুর রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহার পিছনে ব্যঙ্গের হুল ও উদ্দেশ্যের রোষগুঞ্জন ছিল। তাঁহারা জাতীয় চরিত্রের অসংগতিকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারেন নাই, মনে করিয়াছিলেন যে, হাসির চাবুকে ইহাকে সংশোধন করা যাইতে পারে—অর্থাৎ অসংগতিকে তাঁহারা অপরাধের পর্যায়ে ফেলিয়া হাসির অন্তরালে বিচারকের কঠোরতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহাদের হাস্যরসের উপ-ভোগের মধ্যে একটা আত্মগ্লানির বেদনা রহিয়া যায়—আমরা সম্পূর্ণভাবে এই হাসির আনন্দে যোগ দিতে পারি না। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'হনুমৎ-বাবু-সংবাদ'-এ বাবুর গলদেশে হনুমানের দীর্ঘ-প্রলম্বিত পুচ্ছের প্যাঁচ কষিয়াছেন, তখন আমরা হাসিতে হাসিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া নিজের গলায় হাত দিয়া দেখি যে, সেখানে পুচ্ছবেষ্টনীর চাপ অনুভব করা যায় কিনা। কিন্তু কেদারনাথ ও রাজশেখরের মধ্যে সংস্কারক মনোবৃত্তির শেষ চিহ্নটিও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা বাঙালীর মনে যে উদ্ভট বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহাকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন,

উহার কোন পরিবর্তন তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না। বরং এই উৎকেন্দ্রিকতা, এই গদগদ ভাববিলাস, এই উপাদান-সাঙ্কর্য যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে তবে তাঁহাদের হাসির ধারা শুষ্ক হইয়া যাইবে এই মনোভাবই তাঁহাদের মধ্যে প্রকট। তাঁহাদের পরিহাসের মধ্যে কোথাও বিরাগের তীব্রতা নাই, অস্বীকৃতির ক্ষীণতম রেশও শোনা যায় না, চিত্তের প্রসন্ন গ্রহণশীলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কেদারনাথ বাঙালীর জীবনসমস্যা হইতে উদ্ভূত বেদনাকে হাসির রূপ দিয়াছেন—এই হাসির পিছনে অশ্রুবিন্দু টলমল করে, ইহা যেন কান্নারই একটা তির্যক রূপান্তর। তাঁহার 'ধেমো শালিকের' (Domicile) ছন্নছাড়া জীবন কাঁদিতে লজ্জাবোধ করে বলিয়া হাসির পিচকারী-মুখে অন্তঃনিরুদ্ধ অশ্রুকে উড়াইয়া-ছড়াইয়া দেয়। বহুসন্তান-বিব্রত ভদ্রলোক তাঁহার সাতটি ছেলে-মেয়ের অবিশ্রান্ত চীৎকার-কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীতের সপ্তস্বর শুনিয়া তাঁহার দুর্ভর সমস্যার বোঝাকে লঘু করেন। কিন্তু তিনি বিহারে বাঙালী-সমস্যার সমাধান করিতেও চাহেন না, পরিবারবৃদ্ধি-নিবারণের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রথারও পক্ষপাতী নন। রাজশেখরবাবুও সেইরূপ পাগলা-গারদের একটা ভদ্রসংস্করণ—এই জীবনকে—আনন্দপ্রস্রবণ ও হাসির নির্ঝররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর ফোঁটাতিলক মুছিয়া ও নামাবলী কাড়িয়া তাহাকে শ্রীঘরে পাঠাইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। বরং ইহার বংশ চিরস্থায়ী হইলে আমরা ব্রহ্মানন্দকল্প হাস্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকিব। কচি সংসদকে সংস্কার করিয়া কচি ডাবকে ঝুনোনারিকেলে পরিণত করার কোন ইচ্ছা তাঁহার নাই, তাহাদের অনভিজ্ঞ বাষ্পোচ্ছ্বাস হইতে সাংসারিক রেলগাড়ি টানিবার সুনিয়ন্ত্রিত বাষ্পশক্তি তৈয়ারি করিবার অভিলাষও তিনি পোষণ করেন না। সংসারের মধ্যে দুই চারিটা 'ভুশণ্ডীর মাঠ' না থাকিলে ইহার কেজো উর্বরতা রস-মরুভূমিরই নামান্তর হইবে। বংশলোচন বাবু, তাঁহার গৃহিণী, শ্যালক, ভাগিনেয় প্রভৃতি পরিবারবর্গবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার বৈঠকখানার আড্ডাধারী পরিষদ-মণ্ডলীর মধ্যমণিরূপে, সর্বোপরি তাঁহার হঠাৎ-পাওয়া রত্ন লম্বকর্ণের সঙ্গে নিজ উষ্ণীষের সমোচ্চতা রক্ষা করিয়া কৌতুকরসের আধাররূপে বিরাজ করিতে থাকুন—সংস্কারের সম্মার্জনী যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। যেখানে যত খেয়ালের উনপঞ্চাশ পবন বহিতেছে, যেখানে যত উদ্দাম কল্পনা ও নিরঙ্কুশ উচ্ছ্বাস বিজ্ঞতার অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া আপন আপন নেশায় মশগুল, যেখানে যত ভূত-প্রেত-দানা মানবজীবনের উর্ধ্বে প্রলম্বিত হইয়াও মানুষের কামনার মধ্যে বীজরূপে আসীন, সে সবই লেখকের রসসৃষ্টির উপাদানস্বরূপ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে একত্র সমাবেশে মিলিত হই[illegible] পাঠকের রসপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে থাকুক। না পাঠক না লেখক—কেহই এই বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত দৃশ্যাবলীর পরিবর্তে একঘেয়ে যুক্তিবাদ ও ধূসর সুস্থ-মস্তিষ্কত্বের প্রতিষ্ঠা দেখি[illegible]হেন না। এবং সংসার-নাট্যের এই লীলা-বৈচিত্র্যের আবিষ্কারক ও রূপকার রূপে রাজশেখর বসুও মুগ্ধ পাঠকের আনন্দ-পরিতৃপ্ত রুচিবোধের উপর স্বীয় অবিচল আসনটি চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

(১১)

উপন্যাসক্ষেত্রে হাস্যরসিকদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানই বোধ হয় সর্বোচ্চ। হাস্যরসের অজস্র প্রাচুর্য প্রকাশভঙ্গীর দ্যুতিমান্ ও অর্থগৌরবপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা

তাঁহার সমস্ত রচনায় ঝলমল করিতেছে। রাজশেখর বসুর সহিত তুলনায় তাঁহার হাস্যরসের কতকগুলি প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য সহজেই অনুভূত হয়। রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের প্রাণ হইতেছে তাঁহার পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি এই পরিকল্পনার প্রতিবেশ-লীন, সুতরাং ইহা কখনই প্রধান হইয়া উঠে নাই। তাঁহার কোন চরিত্রই প্রতিবেশের আবছায়া হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে সুস্পষ্ট হয় নাই। তাহাদের কথাবার্তাও এই হাস্যকর পরিকল্পনার অসংগতি-স্পর্শে হাস্যোদ্দীপক হইযাছে—ইহাদের মধ্যে wit বা বুদ্ধির তরবারি-দীপ্তির প্রাধান্য নাই। তাঁহার কোন বিশেষ উক্তিই পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ প্রকাশ-ভঙ্গীর তীক্ষ্ণাগ্রতায় আমাদের স্মৃতিমূলে বিদ্ধ হয় না। আর হাস্যকর প্রতিবেশ-প্রভাবের জন্য তাঁহার রসিকতার মধ্যে করুণরস-সঞ্চারের কোন চেষ্টা পাওয়া যায় না। সুতরাং উচ্চাঙ্গের humour-এর যে প্রধান লক্ষণ—হাস্যরসের সহিত করুণ-রসের সমাবেশ,—তাহা তাঁহার রচনাতে মিলে না। রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা খুব সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ ও সংযমজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার হাসি মার্জিত সুরুচির সীমা কখনই লঙ্ঘন করে না, গ্রাম্য রসিকতা ও প্রহসনোচিত উচ্চহাস্যকে সর্বদা দূরে পরিহার করে।

এই সমস্ত বিষয়েই তাঁহার সহিত কেদারবাবুর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেদারবাবুর হাস্যরসের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার সহিত করুণরসের সমাবেশ ও কোথাও কোথাও চমৎকার সমন্বয়; কি ছোট গল্প, কি বড় উপন্যাস—সর্বত্রই এই কারুণ্যপ্রবাহ তাঁহার হাসির মধ্যে বিষাদ-গাম্ভীর্যের একটা গাঢ়তর সুর ধ্বনিত করিয়াছে। তাঁহার হাসি উদাস, বৈরাগ্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের যমজ সহোদর, বেদনায় ও সহানুভূতির গূঢ় মর্মস্থান উদ্ভিন্ন করিয়া ইহার ভোগ-বতী-ধারা ছুটিযাছে। নির্মমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হৃদয়-বৃত্তি ইহার উৎস-মুখ, নিরুদ্ধ, পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা। তারপর তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে wit-এর চাকচিক্য ও সংক্ষিপ্ত অর্থগৌরব প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। Wit-এর চমকপ্রদ আকস্মিকতা, ইহার ইঙ্গিত-ও-ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশভঙ্গী ও অনুপ্রাসের সমাবেশ-কৌশল, ইহার বাক্য-বিন্যাসের বাহুল্য বর্জিত, গতিবেগ চঞ্চল তীক্ষ্ণাগ্রতা—এ সমস্তেরই উপর তাঁহার অকুণ্ঠিত অধিকার।

হাসির প্রতিবেশে চরিত্র-সৃষ্টি-কুশলতা তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবল হাসির বাহন নহে, হাস্যরসের স্রোতে তাহারা গা ভাসাইযা দিয়া ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করে নাই। হাস্যরস তাহাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব হইতে উৎসারিত। তাঁহার ছোট গল্পের অল্প-পরিসরের মধ্যে ও তাঁহার বৃহত্তম উপন্যাস 'কোষ্ঠীর ফলাফল'-এ হাসির অফুরন্ত নির্ঝর চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াই বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়াছে—রসিকতার আতস বাজীর মধ্যে কোন একটি বিশেষ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনা-পদ্ধতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত পরিমিতি বোধের দিক্ দিয়া কেদারবাবুর রচনা অবিমিশ্র প্রশংসার দাবি করিতে পারে না। পরিকল্পনার সুরুচি ও মৌলিকতায় বোধ হয় রাজশেখরবাবুরই শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। হাস্যরসের প্রাচুর্য আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের

সহিত অনেকটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রাণখোলা উচ্চহাসি ইতর-জনসাধারণের সহিত একত্র উপভোগের বস্তু—মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী ও বুদ্ধিপ্রধান অভিজাতবর্গের আনন্দবিধান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হাসির ধারা যত বচ্ছ, ততই ক্ষীণ হইবে। যাঁহারা বিশুদ্ধির বিষয়ে অত্যন্ত রুচিবাগীশ তাঁহাদের উপভোগ-স্পৃহাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। হাস্যরসের মধ্যে যে সার্বজনীন ইতরতা ও প্রাকৃত গুণের সমৃদ্ধি আছে, তাহাকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টায় ইহারা হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লবণ-ছিটা বা Irony-র দ্রাবকরস মিশাইয়া ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলেন। হাসির মধ্যে বুদ্ধিপ্রাধান্য সঞ্চারিত করার ফলে ইহার তীব্রতা ও আঘাত-শক্তি যে পরিমাণে বাড়ে, ইহার নির্দোষ উপভোগ্যতাও সেই পরিমাণে কমে। সুতরাং হাস্যরসসৃষ্টি ও উপভোগের মধ্যে একটা নির্বিচার উদারতা ও স্থূল বাস্তবতা না থাকিলে তাহার আবেদন খুব সংকীর্ণ হয়; হাসির মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কলা-কুশলতা ও সুরুচি-সংযম তাহার প্রাণরসকে শীর্ণ করে। Dickens-এর হাস্যরস ইতর ও স্থূল উপাদানে পুষ্ট বলিয়াই তাহা সর্বজনপ্রিয়; যাঁহারা তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম মীড়মূর্ছনায় অধিকতর সিদ্ধহস্ত তাঁহাদের পাঠকের গণ্ডি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অবশ্য কেদারবাবুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের অভাব আছে, তাহা নয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার রসিকতা Dickens-জাতীয় বলিয়াই তাহার আবেদনের ব্যাপকতা এত অধিক। তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সময় এই সত্য আমাদের মনে রাখা উচিত।

কেদারবাবুর হাস্যরসপ্রবণতা তাঁহার প্রথম রচনা 'চীন-যাত্রী'তে (১৯১৮) আত্মপ্রকাশ করে। ইহা যদিও ভ্রমণকাহিনীর পর্যায়ভুক্ত, তথাপি ইহাতে আখ্যান-বৈচিত্র্য অপেক্ষা হাস্যোচ্ছ্বাসেরই আধিক্য। এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার হাস্যরসিকতার ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে ফলের ব্যাপার, বিপত্নীক সবজজ মহাশয়ের কাহিনী, ঝড়ের সময়ে আতংকিত কম্পের বর্ণনা, সকলের কৌতুক-উপহাসের পাত্র চাটুর্যের কীর্তিকলাপ, যুদ্ধাবস্থায় সামরিক বিধিব্যবস্থার প্রয়োগে কেরাণীকুলের দুরবস্থা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়াই উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে—হাসি প্রহসনের ধার ঘেঁষিয়া যাইতে সংকুচিত হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'শেষ খেয়া' (১৯২৫) উপন্যাসটিতে হাস্যরস করুণরসের নিকট প্রাধান্য হারাইয়াছে। এইটিই কেদারবাবুর একমাত্র অবিমিশ্র গম্ভীর ভাবের রচনা। কেবল মাত্র নিমাই নন্দীর চরিত্রে ও কথাবার্তায় হাসিমেশানো বিদ্রূপের একটু চাপা, সংযত সুর শোনা যায়—আর পাত্রের পিতা বিরূপাক্ষ ও তৎপত্নীর বৈবাহিক-সম্ভাষণে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার চিত্র উপহাসের ব্যঞ্জনায় কথঞ্চিৎ সহনীয় হইয়াছে। বাকী সর্বত্রই করুণরসের একাধিপত্য। উপন্যাসটির গঠনকৌশল নিখুঁত নহে—ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে এক নবীনের উপস্থিতি ছাড়া আর কোন যোগসূত্র নাই। নবীন ও ব্রজবাবুর পারিবারিক সমস্যা বিভিন্ন প্রকারের এবং উহাদের দুঃসহতাও এক স্তরের নহে। এই সমস্যার আলোচনা ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণও আশানুরূপ গভীরতা লাভ করে নাই। গণেশ ও চণ্ডিকার যে চরিত্র-চিত্র আমরা পাই তাহা অস্পষ্ট ও ছায়াময়—চণ্ডিকার এক তালবৃক্ষক্ষেপনৈপুণ্য ছাড়া আর অন্য পরিচয় বড় একটা আমরা পাই না। তাহার মনে অনুতাপ-সঞ্চারও নিতান্ত আকস্মিকতার সহিতই সম্পন্ন

হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের চরিত্রাবলীর মধ্যেও বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য-লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় না। মোট কথা, এক করুণ-রস-সৃজনের দক্ষতা ছাড়া আর কোনও ঔপন্যাসিক গুণের পরিচয় এই উপন্যাসে পাওযা যায় না। কেদারবাবু তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক গতির বিপরীত পথ অনুসরণ করিযা এখানে ব্যর্থতা বরণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

ইহার পরই কেদারবাবুর হাস্যরসের উৎস সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত হইযা প্রবাহিত হইয়াছে। 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭), কবলুতি (১৯২৮), পাথেয (১৯৩০) ও দুঃখের দেওয়ালী (১৯৩২) দ্রুত পর্যায়ে প্রকাশিত হইযা তাঁহার রসিকতার অফুরন্ত বৈচিত্র্যের বিস্ময়কর সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের শুষ্ক, নীরস, কেবলমাত্র প্রাণধারণের প্রয়াসে গলদ্‌ঘর্ম ও রুদ্ধশ্বাস জীবনে যে এত সুপ্রচুর হাস্যরসের ফল্গুধারা ধূসর বালুকাবরণের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। এমনকি, আমাদের জীবনের সমস্ত বিফলতা, সমস্ত অসংগতি, সমস্ত বৃহৎ সংকল্পের অসদ্ভাব ও শীর্ণ রিক্ততা তাঁহার রসিকতার অপর্যাপ্ত উপাদান যোগাইযাছে—জীবনের শুষ্কতা রসিকতার প্রবল বন্যা বহাইযাছে।

এই রসিকতার বিচিত্র ধারা যে নানা শাখা-প্রশাখা বাহিয়া বহিযাছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) কতকগুলির বিষয় হইতেছে বঙ্গসমাজ ও পরিবারব্যবস্থার অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এগুলিতে করুণ ও হাস্যরসের আশ্চর্য সমন্বয় হইযাছে। 'আমরা কি ও কে'তে বাঙালীর বংশাভিমান ও আধ্যাত্মিক গৌরব-গর্ব, 'দেবী-মাহাত্ম্যে' আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি দুর্বিষহ ঔদাসীন্য, 'পেন্‌সনের পরে' শান্তি-প্রয়াসী অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধের নির্যাতন ও দুরবস্থা, 'ছাতু'তে আমাদের ভোজন বিলাসিতা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য উৎকট ব্যাকুলতা, 'শান্তি-জল'-এ একান্নবর্তী পরিবারের বহু-বিস্তৃত লৌকিক কর্তব্যের চাপে অবশ্যম্ভাবী দারিদ্র্যবরণ—আমাদের সমাজ-জীবনের এই সমস্ত ফাঁকিত্রুটি সমবেদনাস্নিগ্ধ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণাগ্রে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে। এই সমালোচনায় নীতিবিদের নিষ্ফল-গম্ভীর বাগাড়ম্বর ও ধর্মমূলক বক্তৃতাবাহুল্য নাই—প্রত্যেকটি আঘাত বেদনা-ব্যথিত হাসির আবরণে একেবারে পাঠকের মর্মস্থলে গিয়া পৌঁছে। (২) কতকগুলিতে আমাদের তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ও হিন্দুধর্মের আদর্শমূলক জীবনযাত্রার আশ্চর্যরূপ সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হাস্যরস বিষয়-গাম্ভীর্যের ছায়াতলে কতকটা শান্ত-সংযত হইযাছে—কিন্তু তাহার এই বিষাদ-ম্লানিমার মধ্যে যথেষ্ট সুষমা ও গভীরার্থব্যঞ্জনার পরিচয় মিলে। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গল্প 'থাকো' ও 'কালী ফরাসী'। এই দুইটি গল্পের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কি গভীর, আত্মবিস্মৃত ধর্মভাব বদ্ধমূল ছিল, তাহাদের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে কি আশ্চর্য বিনয়-নম্রতা ও মধুর দাস্যভাবের সেবাপরায়ণতা ফুটিয়া উঠিত তাহার চমৎকার বর্ণনা মিলে। 'থাকো' গল্পটি হাস্যরসের ক্ষীণ আভাসের মধ্য দিয়া sublime-এর উন্নতশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে। এই শ্রেণীর 'হারু' নামক করুণরসপ্রধান গল্পটি লেখকের প্রথম রচনার গৌরব দাবি করে। 'ব্যথার ব্যথা' ও 'সঞ্জীফল' এই দুইটি গল্পে পৈতৃক দুর্গোৎসবক্রিয়া-বর্জনকারী আধুনিক বড়মানুষদের খেয়ালের ফল যে কতদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়, সমাজ-দেহের কত সন্ধিস্থলে নিদারুণ আঘাত করে, কত দরিদ্র শ্রমিক-পরিবারকে অন্নহীন সর্বনাশের মধ্যে ঠেলিযা দেয় তাহার করুণ কাহিনী আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর গল্পের মধ্যে সমাজ-সমালোচনার উদ্দেশ্য প্রকট হয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-কাহিনী বা ঘটনা-বিশেষের সরস বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখকের সমস্ত wit ও humour-এর অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। 'আনন্দময়ী-দর্শন' গল্পে সতীশ, সুলতান, গার্ড, স্টেশন-মাষ্টার, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই যেন একটা মহত্ত্বের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে—ফলে গল্পটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় আর্দ্র হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই ভাবার্দ্রতা সত্ত্বেও ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও বৈচিত্র স্টেশন-মাষ্টারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধুরতা ও হাস্য-রস তুল্যরূপে উপভোগ্য। 'কবলুতি', 'বিচিত্রা', 'ফুলদান', প্রভৃতি গল্পে wit-এর ফুলঝুরি চরিত্র-বিকাশের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া উচ্চতর আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কেদারবাবুর গল্পসমষ্টির মধ্যে ইহাদেরই স্থান সর্বোচ্চ বলা যায়—কেননা জীবন বা সমাজ-সমালোচনা অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টি বা বিশিষ্ট মনোভাব-দ্যোতনা উচ্চতর কলাকুশলতার নিদর্শন। হাস্যরস-প্রধান ঘটনা বিন্যাসমূলক গল্পের মধ্যে 'দিল্লীর লাড্ডু', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', 'রেল-দুর্ঘটনা', 'ভগবতীর পলায়ন', প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি'র প্রমথ-চৌধুরীর একটি গল্পের সহিত বিষয়-সাদৃশ্য আছে—বিষয়-সাদৃশ্য উভয়ের পদ্ধতির পার্থক্য স্ফুটতর করিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীর plot-এর ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা উভয়েই লক্ষ্য; চৌধুরী মহাশয় সে উদ্দেশ্য নানারূপ কূটতর্কের উত্থাপন ও অবান্তর-প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেদারবাবুর মৌলিকতা এখানে কতকটা চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাবে ক্ষুণ্ণ তথাপি তিনি গল্পের মুখবন্ধ ও সমাপ্তিতে ও নিছক তার্কিকতার সংক্ষেপ-করণে নিজস্ব পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের পরিধি বৃহত্তর, কিন্তু রসিকতার ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ; কেদারবাবু পরিধি-সংকোচনের দ্বারা রসের গাঢ়তা লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'ভগবতীর পলায়ন' গল্পে fantasy বা উদ্ভট-কল্পনার উপস্থিতি বৈশিষ্ট্য-সৃজনের হেতু হইয়াছে—দিগ্বিজয় গাঙ্গুলির বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল অভিনয়-রঙ্গ বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভটের ধূম্রলোকে পদক্ষেপ করিয়াছে।

(৪) Fantasy জাতীয় গল্পে কেদারবাবুর কৃতিত্ব খুব বেশি খোলে নাই—খেয়ালের বাষ্পকে তিনি সুসংগত রূপ ও নিখুঁত ভাবগত ঐক্য দিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে ইহার ঘোরাল, জমাট ভাব ফিকে হইয়া যাওয়ায় চির-পরিচিত মাটির জগতের কংকালমূর্তিটি উঁকি মারিয়াছে। 'পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ', 'পূজার প্রসাদ', 'আমাদের সানডে সভা ২)', 'মুক্তি', 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে,' 'জাগৃহি' (উপদেশাত্মক গল্প), প্রভৃতি গল্প-সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য ইহাদের স্থানে স্থানে তাঁহার নিজস্ব রসিকতা ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচনা ছড়ান আছে; কিন্তু মোটের উপর ফল খুব সন্তোষজনক হয় নাই। পরিকল্পনার সমগ্রতা ও ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়। এইখানে পরশুরামের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

কেদারবাবুর গল্প সংগ্রহগুলির কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে; স্থানে স্থানে কষ্টকল্পনার ও 'টানা-বোনার' লক্ষণ থাকিলেও মোটের উপর তাঁহার রসিকতার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে, যদিও ক্রমপরিণতির চিহ্ন সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থে তাঁহার রসিকতা টাট্‌কা, সতেজ; মৌলিক নবীনতায় উজ্জ্বল। 'কবলুতি'তে এই ধারা মুখ্যতঃ বজায় আছে, তবে উদ্ভট খেয়ালের গল্পগুলির আপেক্ষিক অপকর্ষ ইহার পর্যায়কে একটু

নিম্নগামী করিয়াছে। 'পাথের' গল্প-সমষ্টি প্রধানতঃ করুণরসবহুল ও স্থানে স্থানে কাঁচা হাতের লেখা—ইহাতে লেখকের হাস্যরস নিঃশেষিতপ্রায় হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। করুণরস-উদ্রেকের মধ্যেও মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে না। গুণমূলক ক্রমপর্যায়ের তালিকায় ইহারই স্থান সর্বনিম্নে। 'দুঃখের দেওয়ালী'তে আবার লেখক তাঁহার পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে হাস্যরসের পূর্বতন তীক্ষ্ণোজ্জ্বলতা বর্তমান, কিন্তু করুণরসের সহিত আশ্চর্য সমন্বয় ইহাকে গভীর আবেদন মণ্ডিত করিযাছে। এই শেষ গ্রন্থে তিনি যে কারুণ্যের ঘৃতসিক্ত দীপমালা প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহাদের অম্লান উজ্জ্বলতাই তাঁহার রসিকতার অনির্বাণ দীপ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কেদারবাবুর সর্বশেষ গল্পসমষ্টি 'নমস্কারী' (১৯৪৪) আশী বৎসর বয়সেও যে তাঁহার রসিকতার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন। ইহার মধ্যে একটি গল্প 'মাথুর' যুদ্ধপ্রতিবেশে কৃপণের বর্তমান কিংকর্তব্যমূঢ়তার মধ্যে হাস্যরসের উপাদান আবিষ্কার করিয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে পূর্বতন ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। 'অপরূপ কথা সমাজ-শাসনের মূঢ় অযৌক্তিকতাকে কিরূপ কৌশলে ব্যর্থ করা হইয়াছিল তাহার উপভোগ্য বিবরণ। সবিনয় বশ্যতাস্বীকারের অভিনয়ের অন্তরালে সমাজপতিদের উগ্র দণ্ড বিধানকে পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্রটি চমৎকার কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে—মাতব্বরেরা নিজেদের ফাঁদে নিজেরা পড়িয়া নাকাল হইয়াছেন ও উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করিয়া পিছু হটিয়াছেন। আবার গল্পের বিষয়-নির্বাচনে ও বিবৃতি ভঙ্গীতে প্রাচীনপন্থী দাদামহাশয় ও আধুনিকা নাতিনীদের ভিতর যে মতভেদ ও রুচিবৈষম্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাও গল্পটির রসিকতাকে আরও উপভোগ্য করিয়াছে। 'খুড়ার পরলোক-দর্শন'-এ খুড়োর জীবন-দর্শন কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ও কষ্ট-কল্পনা-বিড়ম্বিত। তথাপি ইহাতে রেল-ভ্রমণে সুখস্বপ্ন বাঙালী আরোহীর আচরণে যে অভদ্রতা ও অবিবেচনা প্রকটিত হয় তাহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অনুযোগ সার্থকভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। স্বদেশী যুগে ভ্রাতৃপ্রীতির মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালীর এই আদর্শচ্যুতিতে লেখক শ্লেষাত্মক আক্রমণের সহিত খেদের দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশাইয়া আঘাতের তীব্রতাকে মোলায়েম করিয়াছেন। 'নামঞ্জুর' গল্পে লেখকের করুণ ও হাস্যরস সংমিশ্রণের সুপরিচিত রীতিটি উদাহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি রস বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত। বিদ্যাসাগর জয়ন্তী উৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ কার্যসূচী ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সহৃদয়তার অভাব ও 'ভালো দেখান' নীতির উপাসনার বিরুদ্ধে ঈষৎ অথচ ওস্তাদি হাতের মর্মভেদী খোঁচা; আর কান্তর আত্মবিলোপী পতিভক্তির মহান্, করুণ অভিব্যক্তি—এই দুইটি আখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখকের সাধারণ উপস্থিতির দ্বারাই ইহারা এক বাধ্যতামূলক একত্রাবস্থানের রজ্জুবদ্ধ হইয়াছে। 'বিদ্যুৎবরণ', 'নিতাই লাহিড়ী' ও 'বেয়ান-বিভীষিকা' গল্পত্রয়ে আত্মীয়-প্রতিবেশিবর্গের অনুদার আচরণ ও প্রকৃত সমবেদনার অভাব যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উপাদান যোগাইয়াছে। হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত ফুটাইতে কেদারবাবু যে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন, এই গল্পগুলিতে সেই উচ্চতর নৈপুণ্যেরও অভাব নাই। সমস্ত গল্পসংগ্রহে ভাষার সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্রতা, সাবলীল গতিভঙ্গী, তুলির একটি আঁচড়ে একটা সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বল আভাস দিবার শক্তি—প্রভৃতি লেখকের রচনায় উৎকর্ষ-লক্ষণগুলি—পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

অশীতিবর্ষোত্তীর্ণ লেখকের রচনায় এই সরসতার চেষ্টাহীন প্রাচুর্য সত্য সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

(১২)

কেদারবাবুর বড় উপন্যাসের মধ্যে 'ভাদুড়ী মশাই' ও 'কোষ্ঠীর ফলাফল' এই দুইখানিই তাঁহার প্রতিভার প্রতিনিধি হিসাবে বিচার্য। এক হিসাবে বলতে গেলে বড় উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ তাঁহার রচনায় নাই—আকারে বড় হইলেও ইহারা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত – episodic, বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ-সমষ্টি। 'ভাদুড়ী মশাই'-এ তাঁহার হাস্যরসের প্রফুল্লতা ও মৌলিকতা কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। আচার্য মশাই-এর রসিকতায় স্বাভাবিকতার অভাব ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে যেন কৃচ্ছ্রসাধনের হাঁপানি শোনা যায়। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কিংশুকের ব্যক্তিত্বই কতকটা ফুটিয়াছে, তাহাও যেন তাহার উপর শুক্রগ্রহের অনুগ্রহ-নিবন্ধন। অক্ষয়বাবুর গুরু-গম্ভীর ভাষা ক্ষয়িষ্ণুতার সমস্ত চিহ্ন বহন করিয়াই কালজীর্ণ স্তম্ভের ন্যায় কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে। এই গ্রন্থে কেদারবাবু প্রথম প্রেমের অবতারণা করিয়াছেন—তবে রসিকতার আবহাওয়ায় প্রেমের সলজ্জ রক্তিমা ও নিগূঢ় মাধুর্য ফোটে নাই। মীরা সর্বদাই অন্তরালবর্তিনী রহিয়াছে, উহার বাক্‌চাতুর্য প্রণয় অপেক্ষা পিতামাতার সহিত দৈনন্দিন সম্পর্কেই বেশি ফুটিয়াছে। ঢোঁড়া বাবার স্বরূপ-আবিষ্কার-কাহিনীর উপর বিরিঞ্চি-বাবার সাদৃশ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। মাতঙ্গিনী-মন্দাকিনীর চরিত্রও অপরিস্ফুট ও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর জীবনে এক ভর্তৃশাসন ছাড়া আর কোনও গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু মাতঙ্গিনীর জীবন-সমস্যা যে সংকটময় অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয় তাহার ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা আমাদের কৌতূহলকে অতৃপ্ত রাখিয়া দেয়। ভাদুড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ-সংকল্প গ্রন্থমধ্যে এক ক্ষীণ সম্ভাবনার অর্ধস্ফুটতা ছাড়াইয়া পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে নাই। একদিকে ইহার হাস্যকর অসঙ্গতি অপর দিকে মাতঙ্গিনীর মনের উপর tragic প্রতিঘাত—এই উভয়দিকের মধ্যে একটা প্রতিকারহীন অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে। মাতঙ্গিনীর এই অগ্নিপরীক্ষার চিত্রের অপরিস্ফুটতা গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা। নবীন অতিরিক্ত মননশীলতার জন্য সার্থকনামা হইয়াছে—তাহার চরিত্রে গোড়ার দিকে যেটুকু প্রখরতা ছিল, তাহা প্রণয় সঞ্চারের উত্তাপে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের নামকরণেও অপপ্রয়োগের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মশাই-এর মত দেহে ও মনে জড় মাংসপিণ্ড নায়কের গৌরবের অনুপযুক্ত। আচার্য মশাই অনধিকারপ্রবেশের অভিযোগ সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রধান নায়ক—তাঁহার নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণই শোভনতর হইত।

'কোষ্ঠীর ফলাফল'ই কেদারবাবুর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাতে তাঁহার হাস্যরস-সৃজনের যে ক্ষমতার পরিচয় প ওয়া যায়, তাহা বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতায় অতুলনীয়। রসিকতার স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা-দোষ হয়ত আছে, কিন্তু হাস্যরসের প্রবল প্রবাহে এই সমস্ত ক্ষুদ্র আপত্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের সর্বপ্রধান গুণ হইতেছে হাস্যরসের সহিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সুসঙ্গতি—চরিত্রের তট বাহিয়া হাসির ধারার প্রবাহ ও হাসির সহিত করুণরসের আশ্চর্য

সমন্বয়। এই হাসির দক্ষিণা বাতাসে প্রত্যেকটি চরিত্র আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছে। এক একটি ঘটনা, চিত্রশালায় সুসজ্জিত, বর্ণে সমুজ্জ্বল, আলোতে ঝলমল চিত্রের ন্যায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। প্রথমতঃ, 'domiciled' বা ধেমোশালিকের তীব্র আত্মগ্লানি-তিক্ত জীবনেতিহাস; তারপর দেওঘরে গৃহস্বামীর অদ্ভুত ভৃত্য-প্রীতির ও চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে অতি-সতর্কতার খেয়াল; মাতুলের বংশাভিমান, আরামপ্রিয়তা ও অর্থাভাবজনিত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এই ত্র্যহস্পর্শঘটিত রসিকতা: অমরের নিঃসঙ্কোচ আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ঐশ্বর্যোপাসনা; 'করুণ-রসের কৌশল্যা' পিণু ঠাকুরের অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবন্ত পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা; দয়াল পণ্ডিতের শিক্ষিতা-পত্নী-লাভরূপ দুরন্ত-সৌভাগ্যোদ্ভূত, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ স্মিতহাস্য; জয়হরির ঔদরিকতার একনিষ্ঠ সাধনার সহিত শিশুসুলভ সরলতা ও অকৃত্রিম পরদুঃখকাতরতার অপরূপ সংমিশ্রণ ও আশাভঙ্গ বা অন্য কোনরূপ মানসিক উত্তেজনার ঝোঁকে তাহার মধ্যে রসিকতার জোগারের আবির্ভাব, সর্বোপরি, লেখকের নিজের সুকুমার-ভাবপ্রবণ, বৈরাগ্যধূসর চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিমূলক হাস্যরস—এই সর্বপ্রকারের হাস্যধারার একত্র সমাবেশ গ্রন্থখানির উপর হাস্যরসের মহাসঙ্গমস্থলের মাহাত্ম্য আরোপ করিয়া ছ।

এই হাসির সহিত মিলিয়াছে করুণরসপ্রবাহ, পরস্পর পরস্পরকে বৈপরীত্যমূলক সম্বন্ধের দ্বারা তীব্রতর ও বিশুদ্ধতর করিয়াছে। করুণরসপ্রধান দৃশ্যগুলির মধ্যে আজিজ ও মানবের অপরূপ বন্ধুত্বের চিত্র শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মানবের চরিত্রের উপর শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের অসংশয়িত ছায়াপাত হইয়াছে—উভয়েরই দুঃসাহসিকতার প্রতি আকর্ষণ, গভীর ভগবদ্ভক্তি ও পরোপকার-প্রবৃত্তি একেবারে অভিন্ন-জাতীয়। লেখক নিজে (লোকেন) শ্রীকান্তের স্থলাভিষিক্ত। আফগান আজিজের সহিত মানবের বন্ধুত্ব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র সুদূর স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় কেদার-নাথের চিত্র আরও তথ্যবহুল ও কঠোরতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বন্ধুত্ব অপেক্ষা স্নেহ সুলভতর হৃদয়বৃত্তি, ইহার আকর্ষণ ও ব্যবধান-নিরসনশক্তিও প্রবলতর। কাবুলি রহমৎ মিনির প্রতি অপত্যস্নেহ অনুভব করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের কথা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের উপাদান খুব বেশি নাই। আর এই স্নেহের উদ্ভব—ইহাতেও বেশি কিছু আয়োজনের প্রয়োজন নাই। একদিকে একটি বিরহব্যথিত, স্নেহবুভুক্ষু পিতৃহৃদয়, অপরদিকে একটি সুন্দর, ফুটফুটে, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র বালিকা—এই দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব-সত্ত্বেও আকর্ষণের বৈদ্যুতিক শক্তি মিলন রচনা করিয়াছে। কিন্তু বন্ধুত্বের দাবি এত সহজ নহে—ক্ষণিকের আকর্ষণ ইহার ভিত্তি হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সমপ্রাণতা, একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার অসংশয় উপলব্ধি। এই উপলব্ধি প্রেমের মত, প্রথম দৃষ্টিক্ষেপেই জন্মিতে পারে; ইহা সব সময় সুদীর্ঘ পরিচয়ের প্রতীক্ষা করে না; কিন্তু ইহার উপস্থিতি বন্ধুত্বের অপরিহার্য বুনিয়াদ। কেদারবাবু দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বর্ধিত, ধর্মসংস্কার ও ভাষার ভেদে অপসারিত দুই তরুণ হৃদয়কে কেবলমাত্র এক মনুষ্যত্বের মহামিলন ক্ষেত্রে অমর প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই বন্ধুত্বের চিত্রে হয়ত স্থানে স্থানে ভাবাতিরেকের (sentimentality) ভিজে দাগ ধরিয়াছে; হয়ত আকস্মিকতার

একটু সন্দেহ সর্বত্র বর্জন করা যায় না। তথাপি মোটের উপর ইহা আমাদের মনে যে মোহ বিস্তার করে তাহার প্রভাব সমালোচকের সমস্ত সংশয়োত্তেজিত সচেষ্টতা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আমাদের প্রশংসার বেগ একটু মন্দীভূত হয়, যখন আমরা স্মরণ করি যে, এমন চমৎকার গল্পটির উপন্যাস-মধ্যে কোন বৈধ স্থান নাই, ইহাকে episodo-এর খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষিত বেকার গণেনবাবুর আখ্যানে যে করুণরস সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা সংযত, বিশুদ্ধ ও সর্বপ্রকার আতিশয্যবর্জিত; এবং ইহার প্রধান উপযোগিতা এই যে, ইহা জয়হরির চরিত্রের রূপান্তর-সাধনে সহায়তা করিয়াছে। এই দৃষ্টে আমরা আবিষ্কার করি যে. জয়হরির ক্ষুধা ও পরোপকার প্রবৃত্তি তুল্যরূপেই প্রবল, সে ভোজ্য-দ্রব্যের শেষকণিকা ও সমবেদনার শেষবিন্দু পর্যন্ত নিজ ক্রিয়াশীলতা প্রসারিত করিতে সমভাবেই প্রস্তুত। গ্রন্থমধ্যে আমরা যে কয়টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই তাহারা সকলেই সজীব, সকলেরই একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। কর্তার যেখানে একটু caricature বা ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের লক্ষণ মিলে, কিন্তু মাতুল, অমর, ও লেখক নিজে বেশ নিপুণভাবে অঙ্কিত, গৃহিণীরাও অন্তরালবর্তিনী থাকিয়া দুই একটি অম্লমধুর মন্তব্যে, কেহ বা স্বপ্নাবির্ভাবের মধ্যেও আত্ম-পরিচয় দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু এই চরিত্রাবলীর মধ্যমণি হইতেছে জয়হরি, সেই লেখকের রসোদ্ভাবনেরও যেমন. তেমনি সৃজনী-শক্তিরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১৩)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ' (এপ্রিল ১৯৩৭), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮), 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' জুলাই, ১৯৪০), 'বসন্তে' (আগষ্ট, ১৯৪১) ও 'রাণুর কথামালা'। জানুয়ারী, ১৯৪২)—এই গল্পসংগ্রহগুলি একজন নূতন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব সূচিত করে। গল্পগুলি প্রধানতঃ হাস্যরসমূলক, শেষের গ্রন্থগুলিতে লেখক হাস্যরসের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া গভীর বিষয়ের আলোচনায় ক্রমপরিণত কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্য-বোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যে নহে। তাঁহার রচনায় কাব্যধর্মে উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোট গল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

সাধারণতঃ তাঁহার হাস্যরসপ্রধান গল্পগুলিতে অকৃত্রিম হাসির নির্ঝর প্রবাহিত হইযাছে। তবে শেষের দিকে কষ্ট কল্পনা ও উদ্ভট, অবিশ্বাস্য অবস্থা-সৃষ্টির প্রচেষ্টাও মাথা তুলিয়াছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পটি শিশুমনের হাস্যকর অসংগতি ও অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণতার বিষয় লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে তাহাদের মূল উৎস। ইহাতে শিশু রাণুর অকালপক্ব গৃহিণী-পনার অভিনয়, প্রথম ভাগের সহিত তাহার আপোষহীন বৈরিতা, না পড়িবার অসংখ্য ছল ও অজুহাতের আবিষ্কার যে হাসির অবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে মেজকাকার সহিত বিদায়বেলায় শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়দ্রবকারী করুণরসের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হইয়াছে। হাসির হালকা হাওয়ায় অশ্রুর আর্দ্রতা মর্মমূলে তীরের মত বিঁধিয়াছে। ইহার পর অন্যান্য অনেক গল্পে রাণুর অবতারণা যেমন তাহার জীবন চরিতকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে, সেইরূপ তাহার

পরিকল্পনার সংগতিরও হানি করিয়াছে। 'দাঁতের আলো', 'স্বয়ংবরা', প্রভৃতি গল্পে রাণুর প্রথম পরিচয়ের বৈচিত্র্য-চমক অনেকটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে; তাহার আসল মাতৃত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের অভিনয় আরও কৌতূহলোদ্দীপক। 'বাদল' গল্পে রাণুর আবির্ভাব নাই, তবে পরিবারের অন্যান্য ছেলেপিলে বাদলের দুরন্তপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্বারা একটি চমৎকার শিশু-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; মেজকাকার শিশু-মনস্তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ-পাঠের দ্বারা শিশুর নিরঙ্কুশ, নব নব দৌরাত্ম্য-উদ্ভাবনশীল মনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কৌতুকাবহ হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শিশুচিত্তের নানা বিস্ময়কর খেয়াল ও কল্পনার বর্ণনা আছে, কিন্তু আর্ট ও ভাবগভীরতার দিক দিয়া কোনটিই 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর সমকক্ষ হয় নাই।

আর এক শ্রেণীর গল্পে অতিক্রান্ত-শৈশব কৈশোরের চিন্তা ও উদ্ভট কল্পনা-বিলাস হাস্যরসের উপাদান হইয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ' ও 'কাব্যের মূলতত্ত্ব'-এ বিদ্যালয়ের গুরু-গম্ভীর আবেষ্টনে শিক্ষাদান পদ্ধতির অসংগতির, ছাত্রের বিকৃত অর্থবোধ ও শিক্ষকের শাসন-ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিবার নানা অপকৌশল, ছাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে নানারূপ ঈর্ষ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বক্র প্রভাব উপভোগ্য হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ'-এ ঘটনাসমাবেশ সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে; কিন্তু ইহার হাস্যরসটি চমৎকার হইয়াছে। স্কুল হইতে একেবারে বিবাহ-মণ্ডপে উত্তীর্ণ হইলে কিশোর ছাত্রের মনে যে নানা অদ্ভুত আশা-কল্পনা ভিড় করে, কাল্পনিক বীররস ও অকালপক্ক মধুররসের সংমিশ্রণে যে ফেন-বুদ্‌বুদ্‌ গাঁজিয়া উঠে, তাহার কৌতুকাবহ প্রকৃতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আর দুইটি গল্পে—'বিয়ের ফুল' ও 'মোটর দুর্ঘটনা'র 'বিবাহ-বিপত্তি'—একটিতে দীর্ঘপোষিত আশাভঙ্গ, অপরটিতে কৌমার্যপালনের প্রতিজ্ঞাচ্যুতি—হাসির প্রবাহ বহাইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পটির বিজ্ঞাপন-বিভ্রাটের পরিকল্পনাটি বড়ই সরস হইয়াছে। 'বরযাত্রী' নামক গল্পসমষ্টি বিবাহার্থী যুবক ও তাহার বন্ধুদের বিবিধ সম্ভব-অসম্ভব দুরবস্থা-বর্ণনায় প্রহসনের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

কয়েকটি গল্প—যথা, 'মেঘদূত', 'বিপন্ন', 'বসন্তে' প্রভৃতি—নব বিবাহিতের বাধা-খণ্ডিত, বাস্তব-বিড়ম্বিত প্রণয়াবেশের কাহিনী। 'মেঘদূত'-এ প্রাণি-দম্পতির হাব-ভাব-পর্যবেক্ষণের দ্বারা মানুষের প্রেমের গতিচ্ছন্দ-নির্ণয়-চেষ্টা একটু উদ্ভট রকমের মৌলিক; আর জিমি কুকুরকে প্রেমের দৌত্যকার্যে নিয়োগ মহাকবি কালিদাসের কল্পনার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ হিসাবে উপভোগ্য হইলেও বাস্তবতার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়াই ঠেকে। 'বিপন্ন' গল্পের মৌলিকতা প্রশংসনীয়—বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ ও প্রসাধন-রুচিতে আস্থাশীল নব-পরিণীত বিহারী ছাত্র নবাগত বাঙালী অধ্যাপকের নিকট বেনামীতে নিজ দাম্পত্য সমস্যার ইঙ্গিত দিয়া নাকাল হইয়াছে। 'বসন্ত'-এ দাস-দাসীর দ্বারা তরুণ মুনিবদম্পতির প্রণয়লীলা পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ একটু অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু গল্পটিতে বসন্তের মদির বিহ্বলতা, ইহার উচিত-অনুচিত, সম্ভব-অসম্ভব-সীমা-বিলোপী ভাব-প্লাবন, ইহার আত্মভোলা আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সূক্ষ্ম অতৃপ্তির বেদনাবোধ অতি চমৎকার, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার হাস্যরস ফিকে ও অস্বাভাবিক; ইহার প্রতিবেশরচনাতেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। 'যুগান্তর'-এ আধুনিক যুগের সহিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বিবাহের আনন্দোৎসব-প্রতিবেশের সুন্দর তুলনা করা হইয়াছে। অতীতের কনেবউ-বরণ, আনন্দের মদির আবহাওয়ায় সমস্ত পরিবারের মধ্যে

নিবিড় ঐক্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান-পালনের সতর্ক নিষ্ঠার মধ্যে শঙ্কিত শুভকামনা, বরবধূর মনে প্রথম প্রণয়ের আবেশ, ফুলশয্যার রাত্রির আশা-আশঙ্কা-মধুর প্রতীক্ষা—এই সমস্তই যেন আধুনিক যুগের কাজের হাওয়ায়, অতিতীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতার মধ্যে, প্রখর সূর্যালোকে গোধূলির স্নিগ্ধতার ন্যায় উবিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি সজ্জা-প্রসাধন, চলাফেরার ভঙ্গী রীতি ও রুচির পার্থক্যের মধ্যে তরুণ-তরুণীর অন্তরের কোন পরিবর্তন হয় নাই—প্রেমপ্রকাশভঙ্গীর বিভেদের অন্তরালে সেই সনাতন রহস্যটি-ই যুগে যুগে অভিন্ন সত্তায় বিরাজ করিতেছে।

আর কয়েকটি গল্পে—'নোংরা', 'হোমিওপ্যাথি', 'অব্যবহিতা', 'কস্মৈ হবিষা বিধেম', 'মধুলিড়', 'তীর্থফেরত', 'পূর্ণচাঁদের নষ্টামি', 'সবজান্তা', 'মাথা না থাকিলেও', প্রভৃতিতে হাস্য-কৌতুকের মধ্যে একটু গভীরতর সুরসঞ্চার অনুভূত হয়। এগুলিতে হাস্যরস আসিয়াছে ঠিক অবস্থা সংকট হইতে নয়, অনেকটা চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও তর্কালোচনা হইতে। 'নোংরা'তে পরিচ্ছন্নতার শুচিবায়ুগ্রস্ত যুবক এক ধূলা-কাদামাখা বালিকার প্রেমে পড়িয়াছে—অবশ্য তাহার এই পরিবর্তন নিতান্ত একটা অকারণ খেয়াল মাত্র। 'হোমিওপ্যাথি'তে খুড়ার সর্বদা অসুখের ভান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নীতি অনুসারে খুড়ীর উগ্রতর অভিনয়ের প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। এই কপট রোগ-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উভয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'অব্যবহিতা'য় প্রতিবেশসূত্রে প্রণয় সঞ্চার মামুলি ঘটনা, কিন্তু ঠাকুরদাদার স্নেহদুর্বল আশীর্বাদ ও প্রণয়ীর আত্মগোপন ইহার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করিয়াছে। 'কস্মৈ হবিষা বিধেম' গল্পে তর্কমূলক ভূমিকা ও প্রতিপাদ্য সত্যটি সাধারণ, কিন্তু বৃন্দাবনের মন্দিরে কপটভক্তিপরায়ণ দর্শনার্থীর অবস্থাসংকটবর্ণনা মৌলিক। 'তীর্থফেরত'-এ সদ্যতীর্থপ্রত্যাগতা বৃদ্ধা ধূলাপায়েই পাড়াতে কোন্দল বাধাইবার অভ্যস্ত অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন সে কয়েকদিনের নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

'মধুলিড়'-এ গৌরীকান্তবাবুর পুষ্প-প্রিয়তার রহস্যোদ্‌ঘাটন সত্যই চমকপ্রদ—ফুলের যে আবেদন, সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাষঙ্গমূলক, গৌরীকান্তবাবু তাহাকে স্থূল ঔদরিকতার আকর্ষণে রূপান্তরিত করিয়াছেন—বিরহাগ্নির সূক্ষ্ম বৈদ্যুতীশক্তি জঠরাগ্নির ইন্ধনে পরিণত হইয়াছে। ফুলের সৌন্দর্য লোকচ্যুতির এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'-এ উদাহৃত প্রয়োজন-বাদের নিকট আত্মবিক্রয়ের জন্য কৌলীন্যভ্রষ্ট সজনে ফুলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'পূর্ণ-চন্দ্রের নষ্টামি', 'বসন্তের' ন্যায় প্রতিবেশ রচনায় সিদ্ধহ[illegible]র নিদর্শন। তবে এখানে জ্যোৎস্না-প্রবাহ প্রণয়াবেশ না জাগাইয়া পুরুষের আত্মাভিমানকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। দিবালোকে বাস্তব অবস্থার শত তুচ্ছ প্রয়োজনের ব্যঙ্গভ্রূকুটিতে এই স্বপ্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছে ও নানা হাস্যকর অভিজ্ঞতায় মধ্য দিয়া আবার পক্ষ সংকোচ করিয়াছে। 'সবজান্তা'য় একজন অপরিচিতের ঘনিষ্ঠতার দাবী ও অতন্দ্র অভিভাবকত্ব নিমন্ত্রিতের ভোজ্য-তালিকা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার ভোজনের তৃপ্তিকে কৌতুকজনকভাবে নষ্ট করিয়াছে। 'মাথা না থাকিলেও' গল্পে মেস-প্রবাসী রামদার স্ত্রীর সেবাযত্নের কাহিনী ও মেসের বন্ধুবর্গের মধ্যে

তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিতরণের কাল্পনিকতা হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় এক করুণ-রসাত্মক প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই নির্দোষ, প্রীতিমধুর প্রতারণার মৌলিক প্রেরণাটুকু অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে। রাস্থর বঞ্চিত জীবনের অপূর্ণ সাধ, স্নেহশীতল পরিচর্যার জন্য অতৃপ্ত লোলুপতা, কেন এই তির্যক্ সুড়ঙ্গ-পথ বাহিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—লেখক এই স্বাভাবিক কৌতূহলের কোন সমাধান-চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত গল্পের ভিতরে লেখকের হাস্যরস প্রহসনের অমার্জিত আতিশয্য ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম, মার্জিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে ও জীবনের গভীরতর বিকাশের সহিত সম্পর্কিত হইয়া খাঁটি humour-এর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

গভীর সুরে লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'ননীচোরা', 'প্রশ্ন', 'মাতৃপূজা' ও 'আশা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে লেখকের কাব্য-সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'ননীচোরা' গল্পে বৈষ্ণব ভক্তিবিহ্বলতা, ভগবানকে শিশুরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে মাতৃস্নেহের অজস্রধারায় অভিষিক্ত, ও উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল সেবা-পরিচর্যার নিবিড় বাহুবেষ্টনীতে বক্ষোলগ্ন করার একাগ্র সাধনার সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সময় সময় ঘরের দুরন্ত শিশু ভগবানের প্রতি উৎসর্গিত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মধুর লীলা, চপল ক্রীড়াভিনয় প্রকটিত করে ও মুহূর্তের জন্য উভয়ের অভিন্নত্ব বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অনুভূতিতে প্রতিভাত হয়। 'প্রশ্ন' গল্পে যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা অধ্যাত্মসাধনার জগতে সুপরিচিত। স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তির নিরোধ মোক্ষলাভের প্রকৃত পন্থা কি না এই প্রশ্ন চিরকাল ধরিয়া মুক্তিপ্রয়াসী চিত্তকে মথিত করিয়া আসিতেছে এবং অভিজ্ঞতা বরাবরই এই ধারণার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। সুতরাং গল্পটির উৎকর্ষ প্রশ্নের মৌলিকতায় নহে; তপোবনের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ রচনা, বৌদ্ধযুগের চিন্তাধারার সার্থক রূপায়ণ ও সর্বোপরি চারুদত্তার গিরিনির্ঝরের মত মুক্ত, আনন্দচঞ্চল প্রকৃতির পরিকল্পনায়। ভাষা ও ভাবের কাব্যসমৃদ্ধির দিক দিয়া গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। 'মাতৃপূজা' বাঙালীর কুখ্যাত দলাদলিপ্রিয়তা তাহার সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজাকেও কেমন করিয়া দক্ষযজ্ঞে পরিণত করিতে পারে তাহার মর্মান্তিক উদাহরণ। এই পুণ্য উৎসবের প্রহসনান্ত পরিণতি মরণপথযাত্রী সান্ন্যাল মহাশয়ের বুকে যে নিদারুণ শেলাঘাত হানিয়াছে তাহার বেদনা পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়।

ভাবাবেগের দিক্ দিয়া যেমন 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনি কলাকৌশলের দিক্ দিয়া 'আশা' গল্পটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই গল্পে লেখক বিচিত্র দক্ষতার সহিত, অভিনব আবেষ্টনে ভৌতিক শিহরণ জাগাইয়াছেন। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে জনহীন সহরতলী, সদ্যরোগমুক্ত তরুণ কবির শিরায় শিরায় প্রাণচঞ্চলতার প্রবল উচ্ছ্বাস, ধরণীর পরিচিত রূপের উপর মায়াময় স্বপ্নসৌন্দর্যের আরোপ, প্রতিবেশীর রুদ্ধদ্বার, প্রতীক্ষাস্তব্ধ গৃহ, হানা বাড়ির জনশ্রুতি, প্রণয়োন্মুখ চিত্তে অপ্রাকৃত কল্পনার ভ্রান্তি—এই সমস্ত মিলিয়া অতিপ্রাকৃতের এক আদর্শ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই সুকৌশলে রচিত প্রতিবেশে অব্যবহৃত পালঙ্কে আলো-ছায়ার খেলা স্বপ্নপ্রবণ চিত্তে দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া এক অলক্তকরঞ্জিতচরণা, সুখশায়িতা সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার উপর, যেমন এক দীপশিখা হইতে আর এক প্রদীপ জ্বালাইয়া লওয়া হয়, তেমনি মৃত দুহিতার প্রত্যাবর্তনের আশা-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত, উৎকট অস্বাভাবিক প্রতীক্ষায়

একাগ্রচিত্ত, বৃদ্ধ দম্পতির মনোবিকার এই মোহগ্রস্ত তরুণের মনে সঞ্চারিত হইয়া তাহার সংশয়ান্দোলিত প্রত্যাশাকে স্থির প্রতীতিতে পরিণত করিয়াছে। এই গল্পগুলি হাস্যরসিকতার সংকীর্ণ সীমার বহির্ভূত বৃহত্তর ক্ষেত্রে লেখকের শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় দেয়।

বিভূতিভূষণের সদ্যপ্রকাশিত দুইটি গল্প-সংগ্রহ 'হৈমন্তী' (জুলাই, ১৯৪৪) ও 'কায়কল্প' (অক্টোবর, ১৯৪৪) তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থে কয়েকটি নূতন হাস্য-প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে। 'আবু হোসেন'-এ দরিদ্র লেখকের লক্ষপতি হইবার স্বপ্ন ক্ষণিক বাস্তবরূপ পরিগ্রহের মধ্য দিয়া নানা কৌতুকাবহ বৈপরীত্য-সৃষ্টির উপায় হইয়াছে—অফিসের বড়বাবু হইতে অবজ্ঞাশীল সম্পাদক পর্যন্ত যে সমস্ত উৎপীড়কের দল লেখকের আত্মসম্মানবোধের অমর্যাদা ঘটাইয়াছে, লেখক এই স্বপ্নের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন আক্রোশ মিটাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। 'চ্যারিটী-শো', 'ফুটবল লীগ' ও 'ভক্ত' এই তিনটি গল্পে ফুটবল ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি অতিরিক্ত নেশা তরুণ-সমাজে যে কৌতুকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে তাহারই হাস্যরসাত্মক আলোচনা। 'ভক্ত' গল্পটির মৌলিকতা সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য—এক চিত্র-তারকার (film-star) অতর্কিত উপস্থিতিতে কলিকাতার অদূরবর্তী পল্লীগ্রামের কিশোর-সম্প্রদায়ে যে কিরূপ হুলস্থুল ও চাঞ্চল্য জাগিয়াছে তাহাই সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্বে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দেবীর সশরীরে আবির্ভাবে যেরূপ সোৎকণ্ঠ ভক্তিবিহ্বলতায় ও অসম্ভব সংঘটনের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, বর্তমান ক্ষেত্রে ছেলেদের ভাবগদ্‌গদ্ বিমূঢ়তা যেন তাহারই আধুনিক সংস্করণ। হৃদয়-বৃত্তি সনাতন, ইহার পাত্র যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। 'কালস্য গতি' গল্পে বোমা-বিভীষিকা শিশুর খেয়ালী মনে এক নূতন-ধরনের খেলার কৌতুকমণ্ডিত হইয়া হাস্যরসের বিষয় হইয়াছে—ধ্বংসলীলার অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ডতা নিজ আতিশয্যের জন্যই যেন শিশুর খেলাঘরের যথেচ্ছ, দায়িত্বহীন ভাঙ্গা-চোরার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। প্রলয়ের সহিত মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যের উপমা এই একই সম্বন্ধের দ্যোতক। ভয়াবহ সম্ভাবনার মধ্যে হাস্যরসের এই উপাদানের আবিষ্কার বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতার নিদর্শন। 'কায়কল্প'-এ ঘটনার অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়া মানবমনের এক চিরন্তন প্রবণতা হাস্য ও করুণরসে মাখামাখি হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাতিনীর বিবাহ উপলক্ষে বৃদ্ধা পিতামহীর অর্ধশতাব্দীসুপ্ত যৌবনাবেশ সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত আত্মসচেতন হইয়াছে। 'কালিকা' গল্পে 'গেছো মেয়ের' পরিকল্পনা ঠিক নূতন নহে, কিন্তু তাহার দুঃসাহসিকতার সহিত সরল ধর্মবিশ্বাস মিশিয়া তাহাকে ডাকাতি-প্রতিরোধ-ব্যাপারে প্রধানা নায়িকার গৌরব অর্পণ করিয়াছে। ঘটনার অবিশ্বাস্যতা ঢাকা দিবার জন্য লেখককে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ সুদূর অতীতে পটভূমিকা রচনা করিতে হইয়াছে। অন্ধকারে কালিকামূর্তি প্রত্যক্ষকারী ডাকাত-সর্দারের ভক্তিবিমূঢ় ভাবটি চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে।

এই গল্পসংগ্রহ-গ্রন্থদ্বয়ে 'আর্ট', 'মানুষ' ও 'হৈমন্তী' এই তিনটি গল্প শ্রেষ্ঠ। প্রথম গল্পটিতে প্রৌঢ় বয়সে মোহভঙ্গের ফলে মানুষ কিরূপ পর সম্বন্ধে উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। নায়কের অপাত্রন্যস্ত বদান্যতা প্রতিহত ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় তাহার আত্মপ্রসাদে মর্মান্তিক আঘাত হানিয়া এক উপহাস্য অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ যত রকমে ঠকিতে পারে দান করিয়া

লাঞ্ছিত হওয়া তাহার সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর প্রকারভেদ। সিংহাসনপ্রার্থীর ধূলিসাৎ হওয়ার মত এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি আমাদের মনে একটা প্রবল হাসির হিল্লোল বহাইয়া দেয়। 'মানুষ' গল্পে অন্ধভিখারী ও ফেরিওয়ালা অনাথ বালকের পরস্পরের প্রতি স্নিগ্ধ সম্পর্ক অতি সহজে অথচ অনিবার্যভাবে নায়কের মনে মানুষের প্রতি লুপ্ত বিশ্বাসকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। 'বসন্তে' যেমন প্রেমের মদির বিহ্বলতার সার্থক প্রতিবেশ রচিত হইয়াছিল, 'হৈমন্তী' গল্পে তেমনি হেমন্ত-অপরাহ্নের দ্রুত-বিলীয়মান অস্তরাগের মধ্যে প্রৌঢ়জীবনে চরম ব্যর্থতার আকস্মিক অনুভূতি এক উদাস-করুণ আবহাওয়া বিস্তার করিয়াছে। এই সোনালী বর্ণপ্লাবন পরিচিত জগতের উপর যে মায়াময় প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে তাহাতে স্মৃতির বহুদিন রুদ্ধ দ্বার-গুলি যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, জীবনবিচারের এক নূতন মানদণ্ড সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ, সার্থক দাম্পত্যজীবনের প্রতীকস্বরূপ এক সাঁওতাল-দম্পতি নায়কের কাজের নেশায় অভিভূত, ভাবাবেশবর্জিত জীবনযাত্রার এক প্রকাণ্ড ফাঁক ও অভাববোধকে উন্মেষিত করিয়াছে। ধনেমানে, সফলতার আত্মপ্রসাদে নিরেট করিয়া গাঁথা জীবনের এই ফাঁক হইতে উদ্ভূত করুণ দীর্ঘশ্বাস সমস্ত জীবনের রং বদলাইয়া দিয়াছে। প্রথম যৌবনের উপেক্ষিত, স্বল্পায়ু প্রণয়াবেশের স্মৃতি নায়কের মানস আকাশকে হেমন্ত-অপরাহ্নের আকাশের মতই গোধূলি-চ্ছায়ার পূর্বগামী ক্ষণিক বর্ণসমারোহে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে।

বিভূতিভূষণ হাস্যরসিক লেখকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্পে পরিকল্পনার সরসতার সহিত আলোচনার শুচিতা ও সংযম মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য ও গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে একটি সহজ, আতিশয্যবর্জিত রসিকতার সুর সর্বত্র পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া, তাঁহার সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম পরিমিত-জ্ঞান তাঁহার রচনাগুলিকে অনবদ্য শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। হাসির গল্প ছাড়াও গভীর-রসাত্মক গল্প-রচনাতেও তিনি প্রশংসার্হ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রতিবেশ-রচনা ও বিশেষ রকমের ভাব ফুটাইয়া তোলা বিষয়েও তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ।

(১৪)

বিভূতিভূষণের হাস্যরসাত্মক উপন্যাস বা বড় গল্পের মধ্যে 'পোনুর চিঠি' (নবেম্বর, ১৯৫৪) ও 'কাঞ্চনমূল্য' (এপ্রিল, ১৯৫৬) উল্লেখযোগ্য। 'পোনুর চিঠি' উপন্যাস নহে, পত্রাবলী-মাধ্যমে বিবৃত কয়েকটি ঘটনার দিক্ হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বক্তার অভিজ্ঞতা-সূত্রে বিধৃত, হাস্যকর ব্যাপারের সমষ্টি। একটি বালক নিজ জীবনের কয়েকটি সমস্যা পুরীর মন্দিরস্থ জগন্নাথদেবের নিকটে নিবেদন করিবার আগ্রহে তাঁহার নামে পত্র প্রেরণ করিয়া স্থানীয় ডাকবিভাগের কর্মচারিবৃন্দকে বড়ই ধাঁধায় ফেলিয়াছে। এই পত্রাবলীর মধ্যে বালকপত্রলেখকের সরল ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভক্তিসংস্কার যতটা না প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অপেক্ষা তাহার অকালপক্কতা ও কৈশোর অভিজ্ঞতার অতীত নানা নিষিদ্ধ বিচরণ-ভূমিতে মানসবিহারপ্রবণতা আরও বেশি মাত্রায় পরিস্ফুট। বালকটির দাম্পত্য প্রণয়-লীলার প্রতি বয়সের অনুচিত খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাহার নব-পরিণীতা বৌদিদি যখন বাড়ির সকলের অনুপস্থিতিতে তাহার দাদার ভীমের অংশ অভিনয়ের সহিত

সমতা-রক্ষা উদ্দেশ্যে নিজে অর্জুনের অংশ অভিনয় অভ্যাস করে ও চরিত্রোপযোগী অঙ্গসজ্জার জন্ম এক জোড়া গোঁপ নিজ কোমল কেশরেখাহীন ওষ্ঠে লাগাইয়া দেয়, তখন এই অকালপক্ক ছেলের মনে একটা অদ্ভুত চিন্তা জাগ্রত হয়। সে মনে করে যে, তাহার ভীম-অভিনয়-বিভোর দাদা যেমন মাঝে মধ্যে ঘুমের ঘোরেও দুঃশাসনের রক্তপান-লোলুপ হইয়া পার্শ্বশায়িতা পত্নীকে শত্রুভ্রমে শ্বাসরোধ চেষ্টা করে সেইরূপ তাহার বৌদিদিরও এই অর্জুনাভিনয় আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। বিবাহের নিমন্ত্রণে তাহার ভোজ খাইবার জন্মও যেমন ছেলেমানুষী আগ্রহ, তেমনি নিমন্ত্রণ-গৃহে সমবেত বৌ-ঝিদের প্রকাশ্যে পরস্পরের নাসিকা-প্রশস্তি ও ছাড়াছাড়ি হইলে সেই একই নাসিকার নিন্দাসূচক আলাপের রসোপভোগস্পৃহা ও খালি বাড়িতে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমার তরুণবয়সের প্রণয়স্মৃতিরোমন্থনের প্রতি শ্রবণোৎসুক্য সমানভাবে প্রকটিত। এই বালখিল্য ব্যাসদেব 'লব' ও বিবাহ-ব্যাপারেও বেশ অগ্রণী ও সপ্রতিভ ও মেয়ে দেখার সমস্ত রহস্য ও পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সমস্ত ছলাকলাতে বিশেষ পারদর্শী। তাহার প্রথম ভাইপো ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্ম তাহার কাকার শ্লাঘ্য পদবীতে উন্নয়নের আত্ম-প্রসাদ ও সদ্যোজাত খোকাকে রাঙ্গী গাই-এর বাছুরের সঙ্গে তুলনা সত্যই যথাযথ ও চরিত্রানুযায়ী হইয়াছে—এখানে অকালপক্কতার কোন ভেজাল নাই। ছেলে আগে কাকা বা বাবা কোন্‌টা উচ্চারণ করিতে শিখিবে এই লইয়াই তাহার দুশ্চিন্তার আর অন্ত নাই। তুতির ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায় রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ও বৈকুণ্ঠে কেবল নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা থাকায়, বৈকুণ্ঠবাস তাহার পক্ষে স্পৃহনীয় হইবে কি না এ বিষয়ে পোনা ও তুতির মধ্যে একটি সূক্ষ্মতত্ত্বঘটিত আলোচনা হইল ও শেষ পর্যন্ত তাহার কৈলাসবাসমঞ্জুরির জন্ম ভগবানের কাছে আবেদন গেল। পাঁঠা বলিদান লইয়া পাড়ার দলাদলি ও পূজা-কমিটির প্রেসিডেণ্ট পদের জন্ম প্রতিযোগিতা-বিষয়েও বালকের যথেষ্ট রুচি ও ঔৎসুক্য আছে। সর্বোপরি শৈলদিদির মনোনীত বরের নিকট পৌরাণিক দময়ন্তীর নজীরে হংসদূতপ্রেরণের ব্যাপারে যে কূটবুদ্ধি ও আয়োজন দক্ষতার পরিচয় মিলে তাহাতে জগন্নাথ-চরণে একান্ত আত্মনিবেদিত এই বালক ভক্তটির মেধার তীক্ষ্ণতা ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তার সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মোট কথা, এখানে বালকের ছদ্মবেশে যেমন বর্ণাশুদ্ধি প্রবণতার একটা সহজ ব্যাখ্যা মিলে তেমনি সাংসারিক অভিজ্ঞতার একটু তির্যক -রূপই একটা সুসঙ্গত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। ছেলেমানুষের বাচনভঙ্গীর ও সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার অন্তরালে পরিণত ব্যঙ্গনিপুণ মনেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে।

'কাঞ্চনমূল্য'-এ বক্তার মনোভঙ্গী ও রসিকতার প্রকরণ প্রায়ই একই জাতীয়, তবে ঘটনা-পরিবেশের পার্থক্য আছে। পোনা শহরের ছেলে ও এক ভগবানে বিশ্বাস ছাড়া অন্য দিক দিয়া আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। কল্প মণ্ডল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ছেলে ও যে ঘটনার সহিত সে সংশ্লিষ্ট তাহা প্রায় একশত বৎসরের পুরাতন কাহিনী। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ও অকালপক্কতায় সে শহরের আধুনিক ছেলের পূর্ণমাত্রায় সমকক্ষ। 'কাঞ্চনমূল্য' অধিকতর উপন্যাসধর্মী, কেননা ইহা

একটি ধারাবাহিক ও ক্রমপ্রসারশীল কাহিনীর বিবরণ। মসনে গ্রামে বিধবা-বিবাহ লইয়া উহার সপক্ষ ও বিপক্ষ দলের মধ্যে যে দীর্ঘদিনব্যাপী দারুণ আলোড়ন গ্রাম্যজীবনকে উচ্চকিত করিয়াছিল তাহাই এক রাখাল বালকের স্বভাবতঃ কৌতুকপ্রবণ ও মোড়লীতে অভ্যস্ত অথচ অনভিজ্ঞ মনে আলো-আঁধারি অনুমান ও তির্যক সঞ্চরণশীলতার মাধ্যমে এক হাস্যকর ও অতিরঞ্জিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন ব্যাপারই সহজভাবে ঘটে নাই—রসিকতার সাঁড়াশীতে উহাদিগকে টানিয়া ও ঘুরাইয়া বাঁকা করা হইয়াছে। সমস্ত কিছু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার কৌতুককর দৃষ্টান্ত। স্থূলবুদ্ধি, অনধিকার হস্তক্ষেপ ও অতিরঞ্জনপ্রবণতা বস্তুর সহজ রূপকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে। বিধবাবিবাহের উত্তেজনা ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া অনাদি ভট্টাচার্যের পরিবারে ঘনীভূত আকার গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখানেও আসল সমস্যা তাহার কন্যা নৃত্যকালীর সঙ্গে গ্রাম্য মহাজন রাজীব ঘোষালের পুত্র নেশাখোর হীরু ঘোষালের বিবাহ-সম্বন্ধীয়। তা ছাড়া, অনাদি ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা ব্রজঠাকুরাণী তাহার বিপত্নীক ভগ্নীপতিকে আপনার সহিত বিধবাবিবাহের ভয় দেখাইয়া অনাদির পক্ষে এক মর্মান্তিক ও পাঠক ও গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রের পক্ষে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নানা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন এড়াইয়া, অতিরঞ্জনের ঝঞ্ঝাবাতে উত্তাল ঘটনা-প্রবাহের প্রতিকূল তরঙ্গ-পরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া বর্ণনা, বাহুল্যস্ফীত কাহিনী-রিক্ততার অনাবশ্যক দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উপন্যাস আনন্দময় পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। হীরু ঘোষাল বরাসনে বৃথা প্রতীক্ষা করিয়াছে ও ব্রজঠাকুরাণীর উপদেশে কন্যার পরিবর্তে কাঞ্চনমূল্য-বিকল্প খুঁজিয়াছে ও নৃত্য ছ-আনি জমিদারের সহিত দাম্পত্য মিলনের নিরাপদ ও সম্মানজনক আশ্রয়ে জীবনব্যাপী উদ্বেগের উপশম লাভ করিয়াছে।

স্বরূপ মণ্ডলের মুখে যে জীবননীতি উদ্‌গাত হইয়াছে তাহা পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতার সারাংশ-সংকলন। উহাতে পর্যবেক্ষণের যাথার্থ্য ও মন্তব্যের সূক্ষ্মদর্শিতা উভয়ই মিলিত হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রামীণ প্রাজ্ঞতা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, কেননা এখন পল্লীগ্রামও শহরের অসম্পূর্ণ ও অপরিণত সংস্করণ ও জীবননীতির ভিত্তির দিক দিয়া শহরের অনুবর্তী। তবে বিভূতিভূষণের সমস্ত বাল চরিত্রের অকালপক্বতা ও ডেঁপোমি সাধারণ লক্ষণ। যাত্রা পাঁচালি-কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে পল্লীর সর্বশ্রেণীর ও সব বয়সের লোকেরাই প্রণয়রস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে ও সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিতে উহার প্রয়োগনৈপুণ্যও ইহাদের সহজায়ত্ত হইয়াছে। অবশ্য অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ স্বরূপ তাহার প্রথম কৈশোরের কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তী সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের দ্বারা অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থমধ্যে আমরা যে স্বরূপের পরিচয় পাই সে কিশোর বালক ও পরিণতবয়স্ক, বাক্‌পটু ও তাম্রকূটাসক্ত স্থবিরের একটা সমন্বয়।

গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও সবিস্তারে রূপায়িত চরিত্র স্বরূপের নৃত্য-দিদিমণি। তাহার জীবনের প্রতিটি সমস্যার বিরুদ্ধে অন্তর-প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার অদ্ভুত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও মনোবল, অবিরল অশ্রুধারা ও উতরোল হাসির মিশ্রণে এক অফুরন্ত প্রাণশক্তির অস্তিত্ব-ঘোষণা, তাহার পিতা ও মাসীর প্রতি আচরণে সঙ্গতি-রক্ষা, ও ইহাদের সঙ্গে ব্যবহারে নারীসুলভ লজ্জা,

আত্মসংযম ও অক্ষুণ্ণ সম্মানবোধ তাহাকে একটি অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করিয়াছে। তাহার চিত্তের বেগবান সক্রিয়তার জন্য সে প্রতিটি পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত শেষ হাস্যরসবিন্দুকে নিষ্কাশন করিয়া লইয়াছে। তাহার অন্তরচক্রের অবিরাম ঘূর্ণনে, যে কিছু দুর্দৈবের আঘাত সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা বস্তুভার হারাইয়া সূক্ষ্ম ও দীপ্ত ভাবস্ফুলিঙ্গের আকারে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। এই প্রাণময়তা ও ভাবময়তাই তাহার চরিত্রের মুখ্য পরিচয়। বালকভৃত্যের উচ্ছ্বসিত ভক্তি-আবেগের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হওয়ায় তাহার চরিত্রমহিমা যেমন অতিরঞ্জিত তেমনি আকর্ষণীয় হইয়াছে। অনাদি ও ব্রজঠাকুরাণী স্পষ্টতঃই ব্যঙ্গাতিরঞ্জন, তথাপি উহাদের বাস্তবভিত্তিকতার অভাব নাই। অনাদির নিষ্ক্রিয়তা ও ভীতিত্রস্ততা ব্রজঠাকুরাণীর দুর্দান্ত প্রভাবটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হীরু ঘোষাল ও তাহার নেশা-সহচরগুলি, কখনও বীররসের আস্ফালনে কখনও শান্তিরসের ঝিমাইয়া-পড়া মৃদুতায়, একটি সদাপ্রবহমান হাস্যরসনির্ঝর উৎসারিত করিয়াছে। স্বরূপ মণ্ডল তাহার বর্ণনাভঙ্গীর কৌতুকময়তায় ও নিজ আচরণের অসঙ্গতিতে আখ্যায়িকার উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। গ্রাম্য পরিবেশে ও পল্লীচরিত্রের বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যবর্তিতায় বিধবাবিবাহের ক্ষণস্থায়ী মত্ততা এক ঘোরালো প্রহসনের রসোজ্জ্বলতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে।

(১৫)

'নীলাঙ্গুরীয়' (আগষ্ট, ১৯৪৫) বিভূতিভূষণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রেমের ঘৃণা-ও-আকর্ষণ-মিশ্রিত রহস্যময় দ্বৈতভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। উপন্যাসের সর্বত্র মননশীলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, ও ঘটনাবিন্যাস ও কথোপকথনের সযত্ন নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন পরিস্ফুট। লেখক কোথাও হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, কোথাও শিথিলতা বা আকস্মিকতার প্রশ্রয় দেন নাই—এক অতন্দ্র, সদাসক্রিয় সচেতনতা চিত্রের প্রত্যেকটি রেখাকে, মন্তব্যের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে অভ্রান্তভাবে গভীর ভাবগত ঐক্যের কেন্দ্রাভিমুখী করিয়াছে। বাংলা উপন্যাসের অনিয়ন্ত্রিত অজস্রতার মধ্যে এই কঠোর পরিমিতিবোধ ও অস্খলিত লক্ষ্যানুবর্তন উচ্চাঙ্গের মননশক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয় দেয়।

গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—আভিজাত্য-গৌরবশীলা ব্যারিস্টার-দুহিতা মীরার মনে দরিদ্র গৃহশিক্ষক শৈলেনের প্রতি অনিবার্য প্রণয়োন্মেষ, প্রেম ও বংশাভিমানের মধ্যে প্রবল বিরোধ। মীরার আচরণের অসংগতি, উহার খামখেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, আত্মসমর্পণ ও বিদ্রোহ, ও শেষ পর্যন্ত মর্যাদার মিথ্যা মোহের নিকট প্রেমের অস্বীকৃতি এই বিরোধের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে। অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইলেও বিষয়টি মৌলিকতার দাবি করিতে পারে না, কিন্তু এত সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী আলোচনা সত্ত্বেও মীরার প্রকৃতি-রহস্যটি পাঠকের নিকট অনবগুণ্ঠিত হয় না। তাহার মাতা অনতিক্রম্য বংশপ্রভাবমূলক যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা আমাদের কৌতূহল-চরিতার্থতার পক্ষে অপ্রচুর। বোধ হয় ইহার একটা কারণ এই যে, সমস্ত ব্যাপারটি শৈলেনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচিত হইয়াছে—মীরার মানসচিত্রটি আত্মবিশ্লেষণের পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হয় নাই। কাজেই শৈলেনের নিকট যেমন, পাঠকের নিকটেও ঠিক

সেইরূপ, সে শেষ পর্যন্ত দুরধিগম্য প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। লেখক নিজে তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণের দুরূহ ভার গ্রহণ করেন নাই; শৈলেনের অর্ধবিমূঢ় উপলব্ধি ও বিহ্বল মানস প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহার অসম্পূর্ণ পরিচয় অস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে বলিয়া আমাদের একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়।

মীরার সহিত তুলনায় সৌদামিনীর সহিত শৈলেনের সম্পর্কটি সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। এক হিসাবে মীরার প্রতি শৈলেনের আকর্ষণ অমূল তরুর ন্যায়; ইহার অতর্কিত আবির্ভাবের পিছনে কোন পূর্বসূচনার অঙ্কুর নাই; ইহা কোন মধুর-স্মৃতি-বিজড়িত লীলাভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে নাই। শৈলেনের ও সদুর পরস্পরের প্রতি মনোভাব বাল্য সাহচর্যের গভীর স্তরে মূল বিস্তার করিয়াছে, কৈশোর স্মৃতির সমস্ত মাধুর্য, জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণার নিবিড় মোহ ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। বঞ্চিত জীবনের প্রতি সহানুভূতি, বন্ধুর অনুযোগ-পূর্ণ আবেদন, প্রীতি-সেবা-আনন্দে গঠিত এক আদর্শ পরিবারের নীরব আকৃতি, পল্লী-মাতার সস্নেহ আমন্ত্রণ—এই সমস্তই এই সম্বন্ধের চারিদিকে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, সদু নিজেও আপনার সহজ, সরল দাবি লইয়া, আমাদের নিতান্ত পরিচিত ও সহজবোধ্য; তাহার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত জীবনপ্রবাহ মীরার ন্যায় কোন অদৃশ্য জোয়ার-ভাঁটার নিয়ন্ত্রণাধীন নহে. কোন দুর্বোধ্য বাধার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত নহে। নৈরাশ্যের অভিঘাতে তাহার অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া, তুলসী মঞ্চের স্নিগ্ধ দীপটির জালাময়ী উল্কা-শিখায় পরিবর্তন তাহার বলিষ্ঠ, বেগবান্ প্রকৃতির স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য স্ফুরণ। তথাপি এই সম্বন্ধে প্রেমের রহস্যময় জটিলতার পূর্ণবিকাশ হয় নাই, কেননা অন্ততঃ এক পক্ষে ইহা স্নিগ্ধ সমবেদনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পর্যায় ছাড়াইয়া যায় নাই।

উপন্যাসমধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর উপলব্ধির বিষয়, অর্পণা দেবীর চরিত্র। পুত্র সম্বন্ধে তাঁহার নিদারুণ আশাভঙ্গ ও স্বামীর সহিত আদর্শবৈষম্য তাঁহাকে এক শোকাচ্ছন্ন, স্বল্পভাষী মহিমায় আবৃত করিয়াছে, তাঁহার চারিদিকে এক সম্ভ্রমপূর্ণ. অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরাল সৃজন করিয়াছে। পুত্রহারা বৃদ্ধা ভুটানীর প্রতি উদ্বেলিত সমবেদনার আতিশয্য, তাঁহার নিজের জীবনে অপরিতৃপ্ত পুত্রস্নেহের অসুস্থ মনোবিকারের পরিণতির কাহিনী ভয়াবহরূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাঁহার আত্মসমাহিত নির্লিপ্ততা পরিবারের প্রত্যেকের সহিত সম্পর্কে—স্বামীর প্রতি ঔদাসীন্যে, মীরার বৈতভাবের শিথিল প্রশ্রয়দানে ও তরুর শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যিত্ততায়—অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক পুত্রের বাগ্‌দত্তা বধূ সরমার প্রতি একটা অস্বস্তিপূর্ণ মমত্ববোধ তাঁহার জীবনের সর্বব্যাপী রিক্ততার মধ্যে একবিন্দু শ্যামলতার স্পর্শ। কিন্তু এই সবুজের ছোপটুকু অন্তরের অশ্রুসজলতারই বহিঃপ্রকাশ। উপন্যাসটি প্রেমের রহস্যোদ্ভেদ অপেক্ষা পূর্বস্মৃতিমন্থনের তন্ময়তায় অধিকতর সিক্তিলাভ করিয়াছে। মীরার বৈতভাবের ঘটনামূলক বিবৃতি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। গ্রন্থের আসল আকর্ষণ পল্লীজীবনের স্মৃতিসৌরভাকুল আবেদনের চমৎকার কাব্যাভিব্যক্তি। কলিকাতার যান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল প্রেরণা কি তাহা ধরা পড়ে না; কিন্তু অনিলের পরিবারে তাহার স্ত্রী অমুরীর প্রভাব যে কেন্দ্রশক্তি তাহা নিঃসংশয় অনুভবের বিষয়। গৌণ চরিত্রের মধ্যে অমুরীর আদর্শ পতিপরায়ণতার মধ্যে একমাত্র ছিদ্র—সদুকে ঘরে স্থান দিতে মৌখিক সম্মতির পিছনে নীরব বিদ্রোহ—তাহার বাস্তবতারই নিদর্শন। ইমাসুলের

হাস্যকর, অথচ করুণ আত্মবঞ্চনা ব্যর্থ প্রেমের একটা প্রকারভেদ হিসাবে গ্রন্থের ভাবগত ঐক্যকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র মামুলি ও বাহির হইতে আঁকা। কিন্তু ইহার চটুল সরসতা ও কৃত্রিম শিষ্টাচারের সহিত বৈপরীত্যে শৈলেনের বলিষ্ঠতর প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণতর ব্যক্তিত্ব আরও ফুটিয়াছে। 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, ইহার মধ্যে লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট উপাদান আছে।

বিভূতিভূষণের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর রচনার ধারা 'রিক্সার গান' (১৯৫৯), 'মিলনান্তক' (ডিসেম্বর, ১৯৫৯), 'নয়ান বৌ' ও 'রূপ হল অভিশাপ' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১) প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হইয়াছে। হাস্যরসিক যখন গম্ভীররসাত্মক উপন্যাস-রচনায় ব্যাপৃত হন, তখন হাস্যরচনার কিছুটা বৈশিষ্ট্য তাঁহার নূতন ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হয়। প্রথমতঃ, ঘটনা-সন্নিবেশে কতকটা উদ্দেশ্যানুসারী কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণপ্রবণতা তাঁহার একটা স্থায়ী লক্ষণে দাঁড়াইবার মত হয়। হাসির ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি প্রায় স্বাভাবিক, যে অতিরঞ্জন প্রায় শিল্পসম্মতরূপে প্রতিভাত হয়, গম্ভীর জীবনভাষ্যেও সেই অভ্যস্ত প্রবণতা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, লেখকের পরিহাসরসিকতা তাঁহার জীবন-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে, ছোটখাট উদ্ভট-উদ্দেশ্য-আরোপে, মনোভঙ্গীর অতর্কিত পরিবর্তনশীলতায় ও কিছু হাস্যরসপ্রধান চরিত্রের প্রবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে। অপেক্ষাকৃত গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বচিত্রণে, মনের বোঝাপড়ার ইতিহাসেও যেন একটা সূক্ষ্মতর হাসির ঈষৎ-ঝলক, লঘু, খেয়ালী ভাবের বিসর্পিত প্রতিরেখা বিষয়ের গুরুত্বকে কতকটা হাল্কা করিয়া দেয়। ট্রাজেডির আসন্ন ও অপ্রতিবিধেয় দুর্যোগের মধ্যেও এই হাস্যপরিহাসের তরলতা, এই তুচ্ছতার, প্রাত্যহিকতার স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি যেন মনকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেয় না। নয়ান বৌ ও শোভার করুণ জীবন-পরিণতিও যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রারই একটু ত্বরান্বিত পদক্ষেপ পাঠকের মনে এই ধারণাই জন্মে। নদীর আবর্ত যেমন প্রবহমান স্রোতেরই একটা ক্রীড়া-আবিষ্ট রূপ, জলপ্রপাত যেরূপ সমতলভূমির স্বচ্ছন্দ গতির একটা আনন্দাতিশয্যপ্রসূত নৃত্যভঙ্গী মাত্র, ট্রাজেডিও তেমনি জীবনের সহজ লুকোচুরি-খেলার একটা আপেক্ষিক রহস্যময় অধ্যায়, আত্মগোপনের একটা আঁধারতম কোণ। ইহাতে অতিরিক্ত উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাসের কোন কারণ নাই, জীবন-প্রহেলিকার কোন ভয়াবহরূপে জটিল কূটতত্ত্বও এখানে মানব মনকে বিস্ময়-স্তম্ভিত করিবার আয়োজন করে নাই। সূর্যকিরণ যদি শেষ পর্যন্ত মেঘে ঢাকা পড়েই, তাহা হইলেও মেঘকে বৃহত্তর শক্তিরূপে ও সূর্যকিরণকে উহার অসহায় প্রসাদ-ভিখারী-রূপে অনুভব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। হাস্যরসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে ট্রাজেডির এই প্রসন্ন, সমগ্র জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-সম্পর্কান্বিত রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ভারতীয় ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন মৃত্যুর এই স্মিতহাস্যময়, ক্রীড়াশীল রূপটিই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাই ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডির আপেক্ষিক অভাব।

'রিক্সার গান'—একজন উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের শ্রমের মর্যাদাবোধের নিদর্শনরূপে রিক্সা-চালকের ব্যবসায়-অবলম্বনের কাহিনী। তড়িৎ আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়াই এই কাজে নামিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ রাঁচির বাঙালী সমাজে তাঁহার পরিচয়টা প্রকাশিত হইয়া

গেল ও সে প্রণয়ীরের মর্যাদায় ভূষিত হইল। তাহার অন্তর-জীবনের ইতিহাস প্রেম-সমস্যামূলক। সে নিজে সঙ্গীতে পারদর্শিনী মল্লীর প্রতি আকৃষ্ট; কিন্তু তাহার আশ্রয়-দাতা ও পৃষ্ঠপোষক অখিল ঘোষের ভগ্নী রতি তাহার প্রতি অনুরক্ত। কিছুদিন দো-মনা থাকার পর মল্লীর সহিত নলিনাক্ষের বিবাহে মল্লী সম্বন্ধে তড়িতের ভ্রান্তি নিরসন হইয়া গেল। সে এম. এ. ডিগ্রীর মানপত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ও অধ্যাপকের ভদ্ররুচিসম্মত জীবনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অখিলবাবুর ব্যবসায়ে সহযোগিতায় ও রতির কুণ্ঠিত প্রেমবন্ধনেই আপনাকে চিরকালের জন্ম বাঁধিয়া ফেলিল। উপন্যাসটি খুব গভীররসাত্মক নহে—তবে রাঁচির বাঙালী সমাজ, সেখানকার আদিম অধিবাসীদের বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল, স্বচ্ছন্দ প্রেমকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, তড়িতের পারিবারিক জীবন, ও পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনার মধ্যে সাবলীল শক্তির পরিচয় মিলে। তড়িতের মনে বিরোধী আকর্ষণের কাহিনীও খুব গভীর না হইলেও সুচিত্রিত।

'মিলনান্তক' উপন্যাসের নামকরণ শ্লেষ-বৈপরীত্যসূচক—বিয়োগান্ত কাহিনীকেই এই বিপরীত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনাবলী আকস্মিকতার মালা-গাঁথা। মনীশ, অরুণা ও মালা সকলের আচরণই দুর্বোধ্য, খেয়ালের ঘূর্ণীবায়ুতে আবর্তিত মনে হয়। মনীশ দীর্ঘ এগার বৎসর প্রবাস-যাপনের পর হঠাৎ কেন অরুণাদের বাড়িতে মালার সান্নিধ্যে ফিরিয়া আসিল তাহার কারণ অজ্ঞাত। এই এগার বৎসর যে সে একনিষ্ঠ প্রেমের ধ্যানতন্ময়তায় কাটায় নাই তাহা তাহার বিভিন্ন প্রেমচর্চার ইতিহাসেই স্ব-প্রকাশ। সুতরাং এই বিস্মৃতি ও চলচ্চিত্ততার আবরণ ভেদ করিয়া মালার ডাক তাহার কানে পৌছানর কারণ-বীজ অন্ততঃ তাহার চরিত্রে নিহিত নাই। মহাপ্লাবনের কালরাত্রিতে মালার যে ভৌতিক আহ্বান তাহাকে সলিল-সমাধির মধ্যে প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হওয়ার দুরতিক্রম্য প্রেরণা দিয়াছিল তাহার কোন চরিত্রগত সঙ্গত ব্যাখ্যা মিলে না। অরুণার আচরণও সেইরূপ খামখেয়ালী। তাহার পুরুষোচিত ঝাঁজালো ও কর্তৃত্বা-ভিমান-প্রয়াসী চরিত্রে কেমন করিয়া প্রেমের সঞ্চার হইল, কেনই বা সে এক অস্বাভাবিক খেয়ালে মনীশের উপর নিজ প্রণয়াধিকার প্রত্যাখ্যান করিয়া মালার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিল তাহা কোন সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ-শৃঙ্খলার সহিত নিঃসম্পর্ক। মালারও কোন ব্যক্তিসত্তা ফুটে নাই—জ্যোৎস্নার সহিত ছায়া মিশিয়া গোধূলি অন্ধকারে যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে তাহাই তাহার প্রেতায়িত সত্তার অনির্দেশ্য আকৃতিটুকুর মায়া-বরণ রচনা করিয়াছে। তাহার মানসিক সত্তা অপেক্ষা প্রেতসত্তাই উপন্যাসমধ্যে তীক্ষ্ণতরভাবে ফুটিয়াছে—তাহার অতিপ্রাকৃত আকর্ষণ তাহার মানবিক আকর্ষণকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বন্যার বর্ণনা বেশ জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মনোবিকারের ইঙ্গিতসমূহ চরিত্রানুবর্তিতার অভাবের জন্ম খুব সুপ্রযুক্ত মনে হয় না। এখানে ট্রাজেডি আসিয়াছে ঠিক প্লাবনের মত নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ও পূর্বপ্রস্তুতিহীনভাবে।

'নয়ান বৌ' উপন্যাসটি একদিক দিয়া বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকারী। ইহাতে একটি বৈষ্ণব আবেষ্টনের মধ্যে অতিবাহিত, বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনার

ছন্দানুসারী এক তরুণীর জীবনকাহিনী তথ্যনিষ্ঠ ও ভাবসঙ্গতিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রভাব যে বাঙালী নর-নারীর বাস্তব জীবনে কিরূপ নিগূঢ় ও ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, উপন্যাসটি তাহার সুন্দর নিদর্শন। বৈষ্ণবপদাবলীতে চির কিশোর-কিশোরীর অপরূপ প্রণয়-মাধুর্য প্রকৃত জীবনের আবেশমুগ্ধতা, রূপোল্লাস, মান-অভিমান-মিলন-বিরহ ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের বহির্লক্ষণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত রূপরস একত্রিত করিয়া, এক অপরূপ লীলা-চমৎকৃতিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পদাবলীর কাব্যসুষমাময়, ভাবের ঊর্ধ্বলোকবিহারী রাজ্যে ইহা সম্ভব হইয়াছে বস্তুর পরিমিত প্রয়োগে, জীবনের বস্তুভারহীন, অথচ ইঙ্গিতরোমাঞ্চময় পটভূমিকায়। কিন্তু প্রকৃত জীবনের প্রাত্যহিক পর্যালোচনায়, নানা খুঁটিনাটি তথ্য-সম্ভাররচিত জীবনযাত্রাবর্ণনায়, রক্তমাংসের মানুষের নানা সংঘাতক্ষুব্ধ, আদর্শের সীমাতিসারী জীবন-বিস্তারের মধ্যে এই ভাবতন্ময়তার উচ্চ সুর অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই দুরূহ। বিভূতিভূষণ তাঁহার এই উপন্যাসে এই দুঃসাধ্য-সাধন-প্রয়াসই করিয়াছেন। তাঁহার নয়ান-বৌ রাধা-ভাবে ভাবিত, চোখে স্বপ্নের ঘোর-মাখান কিশোরী। সে বিবাহ করিয়াছে ভাবমুগ্ধতার আবেশে, যাত্রার দলে কৃষ্ণের অভিনয়কারী, বাঁশী-বাজানো কিশোর অনঙ্গকে। তাহার নারী-জীবনের এই প্রধান ঘটনায় সে শ্রীমতীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই আধুনিক যুগ ও সমাজ-ব্যবস্থা রাধিকার সহিত তাহার মানস ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়াছে। শ্রীমতীর শাশুড়ী-ননদীর সঙ্গে বিরোধ রূপক-পর্যায়ের সূক্ষ্মতাতেই সীমাবদ্ধ; আধুনিক রাধিকার সংসার-সম্পর্ক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও সারাজীবনব্যাপী দ্বন্দ্বেরই সূচনা করে। সংসারের দাবি, পরিজন-প্রতিবেশীর প্রভাব, নানা লোকের ভিড়, নানা কর্মের বিক্ষেপ, বিশেষতঃ স্বামীর সহিত সহজসম্বন্ধরক্ষার কর্তব্য লৌকিক নায়িকাকে মহাভাবস্বরূপিণীর একনিষ্ঠ সাধনায় স্থির থাকিতে দেয় না। রাধিকার মান-অভিমান, প্রণয়-কলহ, প্রত্যা-খ্যানের রূঢ়তা, ক্ষোভ ও অনুতাপের বেদনা সবই অধ্যাত্ম সাধনার সীমানিরূপিত, দিব্য চেতনার করস্পর্শ-সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ ও আশ্বাসিত। নয়ান-বৌ-এর প্রবৃত্তির তরঙ্গমালা এত সহজে শান্ত হয় না—দৈব তটরেখা ছাড়াইয়া মানব সম্বন্ধের তীরসন্নিহিত প্রদেশ পর্যন্ত প্লাবিত করে। নৌকাবিলাসের হঠাৎ ঝড়ে ভাঙ্গা তরী টলমল করে, কিন্তু ডোবে না—পরন্তু দয়িতের প্রেমালিঙ্গনকেই প্ররোচিত করে। লৌকিক নায়িকার নৌকায় ভরাডুবি হইয়াছে—সে দয়িতমিলনের আশায় আস্থা না রাখিয়া বারুণীগর্তে ঝাঁপ দিয়া নিজ অভিমানক্লিষ্ট হৃদয়বেদনাকে চিরশান্তি দিয়াছে।

আদর্শস্বপ্নাচ্ছন্না কিশোরী আদর্শনিষ্ঠার জন্যই বাস্তব জীবনে এক সূক্ষ্ম অতৃপ্তি ও তীব্র মানস প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। নয়ানের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। মনে হয় যেন একপ্রকারের খেয়ালী মেজাজ ও দারুণ অভিমানপ্রবণতা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই বদ্ধমূল ছিল। বৈষ্ণব ভাবসাধনার প্রভাবে তাহাই রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার সাদৃশ্য ও প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। দাম্পত্য প্রেম যেন দূরাভিসারের অস্থির আবেগ লইয়া তাহার মনকে স্থিতি অপেক্ষা গতির প্রতিই অধিকতর উৎসুক করিয়াছিল। মুহুর্মুহুঃ সে নিজের অন্তরের গভীরে ডুবিয়া বৃন্দাবনলীলার আদর্শের সহিত তাহার জীবন

নাট্যকে মিলাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। অনঙ্গের বাঁশীতে যেমন সে শ্রীকৃষ্ণের ঘর-ছাড়ান মুরলীর প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিল, তেমনি তাহার সহিত আচরণেও ঐশী-প্রেমিক-যুগলের সমস্ত প্রেমরহস্য প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছিল। স্বামীর প্রতি আসক্তি রাধারমণের সর্বাভিশায়ী দাবিকে কতটুকু আড়াল করিল ইহা লইয়া তাহার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। গোঁসাইঠাকুরের সঙ্গে তাহার তত্ত্বালোচনা প্রমাণ করে যে, বৈষ্ণব উপাসনার নিগূঢ় রহস্য জীবনের অঙ্গীভূত করার জন্য তাহার কি গভীর নিষ্ঠা ও আগ্রহ। বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলে—ঠাকুরসেবায়, আখড়ার স্নিগ্ধশান্তিময় ছায়াভরা কুঞ্জের ক্ষুদ্র পরিধিতে, বৈষ্ণব পরিবারবর্গের নিবিড় সান্নিধ্যে ও পদাবলী-সঙ্গীতের কলিগুঞ্জরিত, সরস-মধুর আলাপের অন্তরঙ্গতায়—সমস্যাসংকটময় জীবনকে সম্পূর্ণরূপ অতিবাহিত, সেই ছন্দে জীবনকে নিয়মিত করার যে সহজ, আনন্দময় সাধনা তাহাই নয়ানের ক্ষেত্রে উদাহৃত হইয়াছে।

কিন্তু এত করিয়াও শান্তি মিলিল না। বৃন্দাবন কোন ভৌগোলিক পরিস্থিতি ন , এক ভাবাদর্শের প্রতীক। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্যকে দূর হইতে পূজা করা চলে, অত্যন্ত নিকটে আনিয়া মর্ত্যজীবনের অঙ্গীভূত করা চলে না। যাহাকে মনে হয় স্নিগ্ধ, অবিচ্ছিন্ন শান্তি, আগাগোড়া মধুররসের অনুশীলন, তাহার মধ্যে নিয়তির দুর্বার নিষেধ, অগ্নিপরীক্ষার কৃচ্ছ্রসাধন, আশাভঙ্গের নিদারুণ তিক্ততা, অশ্রুসাগরের অশান্ত-উৎক্ষেপ প্রচ্ছন্ন আছে। দেবতার সুধা মানুষের ওষ্ঠাধরে গরল হইয়া উঠে। বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলে বাসও নয়ানের পক্ষে জতুগৃহে বাসের মত অস্বস্তিকর হইয়াছে।

পার্বত্য নদীতে যেমন হঠাৎ ঢল নামে, নয়ান-বৌ-এর মনেও সেইরূপ অশান্ত খেয়ালের একটা দুর্দম ঘূর্ণীপাক আবর্তিত হয়। প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কার ধর্মের ভাবসূত্রে বাঁধা পড়িয়া দুশ্ছেদ্য জট পাকায়। ইহার প্রথম নিদর্শন পাই শ্বশুরবাড়িতে তাহার ঘোমটা-বর্জনের একগুঁয়েমিতে। সেই সন্ধ্যাতেই স্বামী সমভিব্যাহারে পিত্রালয়-যাত্রায় তাহার খেয়ালী মন যেন নব মুক্তির আস্বাদ-আনন্দে নানা কল্পনায় তরঙ্গায়িত হইয়াছে। পিত্রালয়ে পৌঁছিয়াই পরিত্যক্ত আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে এবং এই কর্তব্যের চাপে উদাসীন অনঙ্গের সঙ্গে তাহার ব্যবধান যেন বাড়িয়াছে। এই সময়ে স্বামি-সম্বন্ধে একটা ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের ভাব তাহার সখিদের সহিত আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সন্দেহও বৈষ্ণব রসভাণ্ডার হইতে ধার করা—দূতী যেমন কখনও কখনও দৌত্যব্যপদেশে নায়কের নিকট নায়িকার স্থান অধিকার করিয়াছে ইহা অনেকটা সেই জাতীয়। স্বামি-বিষয়েও তাহার মনোভাব আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিপরীত দোলায় আন্দোলিত হইয়াছে, কিন্তু দাম্পত্য প্রেমে অভিমান যে একটা প্রধান উপাদান ইহাই সে সহজ সংস্কারবশে মানিয়া লইয়াছে।

ইহার পর অনঙ্গের কুমার বাহাদুরের আমন্ত্রণে অকস্মাৎ অন্তর্ধান তাহার অভিমান-পালাকে ঘনীভূত করিয়াছে। কুমার বাহাদুরের অযাচিত বদান্যতায় আশ্রমে যে উৎসবের জোয়ার বহিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট বিমুখতায় পৌঁছিয়াছে। আবার ইহারই মধ্যে শ্বশুরের আগমনে ও উৎসবের আনন্দের ছোঁয়াচে এই অভিমান ও

বিমুখতা গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরের সেবা-পরিচর্যার মধ্য দিয়া শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু শ্বশুরের ভুল বোঝার ফলে আশ্রম-ত্যাগে এই ইচ্ছা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনই অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহার পর কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য প্রণয়ের উপভোগ ও সন্তান-সম্ভাবনা তাহার মনকে পুলকের উচ্ছ্বাসে রঙ্গীন করিয়াছে। তাহার পর কঠিন অসুখ ও গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণহানি আবার তাহার মনকে উতলা ও বৈরাগ্যধূসর করিয়াছে। তাহার যাযাবর মন আশ্রয়ের সমস্ত মায়া কাটাইয়া তাহার পিতামাতার পদাঙ্ক-অনুসরণে তীর্থযাত্রায় বাহির হইতে ব্যাকুল হইয়াছে। সাংসারিকতার ক্ষীণ বর্ণপ্রলেপের নীচে সংসারবিমুখ চিত্তের উদাস বৈরাগ্যপ্রবণতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই তীর্থযাত্রার বন্ধনহীন আনন্দের সুন্দর বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করে। কিন্তু হঠাৎ ভূষণের আগমনে তাহার মনের মোড় আবার ফিরিয়াছে এবং সে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইয়াছে। এই ব্যাপারে তাহার স্বামীর মনে যে অমূলক সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে তাহারই কৃষ্ণ ছায়া তাহার জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে ও এই মেঘ-বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-শিখাই তাহাকে মৃত্যুর অতল গহ্বরের পথ দেখাইয়াছে। এই সন্দেহের আত্যন্তিকারই সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনা ও স্থির বিশ্বাসের অবলম্বন ছিন্ন করিয়া তাহাকে প্রাকৃত-প্রাণিসুলভ মরণে বিলীন করিয়াছে।

ভূষণই তাহার ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহের ন্যায় উদিত হইয়াছে। সে নিজে ভাল মানুষ, ও নয়ান-বৌ-এরও তাহার প্রতি কোন কু-আকর্ষণ ছিল না। সে কেবল ননদী টগরের প্রণয়ী ও ভবিষ্যৎ স্বামী হিসাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রীতির ভাব পোষণ করিত। অথচ সেই ভূষণই বারে বারে তাহার অদৃষ্টকে দুর্ভাগ্যের জালে জড়াইয়াছে। তাহার জন্যই নয়ান-বৌ শাশুড়ীর বিষ-নয়নে পড়িয়া শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়াছে। সেই কুমার বাহাদুরের সহিত অনঙ্গের সখ্য ঘটাইয়া নয়ানের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরাইয়াছে ও নয়ানের কিছুটা চিত্তবিভ্রমের হেতু হইয়াছে। তাহারই আবির্ভাব শ্বশুরের সঙ্গে তাহার নবোন্মেষিত ভক্তিসম্পর্ককে ব্যাহত করিয়াছে ও শ্বশুর তাহার সহিত নয়ান-বৌর অনুচিত ঘনিষ্ঠতা সন্দেহ করিয়া বৌ-এর প্রতি উপচীয়মান স্নেহকে প্রত্যাহার করিয়াছে। সর্বশেষে যখন স্বামীর মনেও সেই একই সন্দেহ বাসা বাঁধিল, তখন অভাগিনী নয়ানের আর জীবনে কোন আকর্ষণই রহিল না। অবশ্য লেখক তাঁহার প্রসন্ন, ভাবরসসিক্ত জীবনদর্শন লইয়া উপন্যাসের এই অশুভ সম্ভাবনার প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য দেন নাই—দুর্জ্ঞেয় নিয়তি-রহস্য তাঁহার মনকে কোন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার অঙ্কুশে ক্ষত-বিক্ষত করে নাই। নয়ান-বৌ একটি অত্যন্ত গভীরভাবে পরিকল্পিত, প্রাণময় চরিত্র। তাহার প্রাণকেন্দ্রে ধর্মবোধের ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর-সঞ্চারী হইলেও, তাহার ব্যক্তিজীবনের গতি-পরিণতিকে অতি নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলেও, তাহার সত্তার স্বচ্ছন্দ বিকাশের কোন হানি করে নাই।

অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ সজীব ও স্বাভাবিক ও পরিমণ্ডল মধ্যে বেশ সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। ভিখারী মণ্ডল তাহার আত্মশ্লাঘার জন্যই হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছে—উত্তরাধিকারের ঊর্ধ্বক্রমসূত্রে সে তাহার পুত্রের বংশীবাদননৈপুণ্যও প্রায় দাবি করিয়া

বলিয়াছে। বিন্দু, সোনা, প্রসাদ, লক্ষ্মণ, পদ্মমণি প্রভৃতি-পরিষদ-সখীবৃন্দ নয়ানের রাইরাণীগিরির উপযুক্ত পোষকতা করিয়াছে ও সকলে মিলিয়া একটি চমৎকার বৈষ্ণব লীলামণ্ডলী গঠন করিয়াছে।

'রূপ হল অভিশাপ' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১) লেখকের সদ্যপ্রকাশিত রচনা। এখানে লেখক মুনিববাড়িতে মুনিবের ছেলে-মেয়ের মতই লালিতা এক অসামান্য-সুন্দরী ঝি-এর মেয়ের দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত জীবন-ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। শোভারাণী তাহার মুনিব-গোষ্ঠীর সন্তান-সন্ততির সঙ্গে সখ্য-কলহ-সমতাবোধের এক অভিন্ন পরিমণ্ডলে মানুষ হইয়া বড় লোকের মত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অর্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ নিঃসন্তানা মেজ-গিন্নীর স্নেহে পুষ্ট হইয়া সে বাড়ীর মেয়ের মত আদর-আবদার করিতে শিখিয়াছে। সবশুদ্ধ সে নিজের জাতি ও অবস্থার অতি-উর্ধ্বে, এক শৌখিন, খুঁতখুঁতে রুচির সমুন্নত ভাবস্তরে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইযাছে। ইহারই জীবনে অপরূপ সৌন্দর্য কেমন করিয়া অভিশাপের কারণ হইযাছে লেখক তাঁহার উপন্যাসে এই প্রতিপাদ্য সত্যকে প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ করিবার সময় কোন স্বজাতীয়, সম-অবস্থাপন্ন পাত্রকেই মেয়ে বা মেয়ের মা-বাপের যতটা না হউক, তাহাদের মুরুব্বি মুনিবগোষ্ঠীরই কোন মতেই পছন্দ হয় না। শোভার বাল্যসহচর মুনিবপুত্র সতুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ এমন খোলাখুলিভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, সতুর আত্মীয়স্বজন ইহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারে নাই। সতুর সহপাঠী বাবুলের সঙ্গে শোভার বাগ্‌দত্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল ও তাহার বিবাহ প্রায় ঠিক হইতে হইতে এক অবিশ্বাস্য বাধার সম্মুখীন হইল। শেষ পর্যন্ত নানা পাকচক্রে, একদিকে কুটিল ষড়যন্ত্র ও অন্যদিকে অদ্ভুত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের ফলে, যে বিবাহ শেষ পর্যন্ত স্থির হইল তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে গিয়া শোভাকে আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইল, তাহার তরুণ, সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে অকালে আহুতি দিয়াই তাহার সমস্ত মুকুলিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে. তাহার সমস্ত সৌন্দর্যস্বপ্নকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে হইল।

বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় মিলে। বিশেষতঃ রায়বাড়ির পারিবারিকমণ্ডলী-চিত্রণে, তিন গিন্নী, বড়বৌ, অনেকগুলি ছেলেমেয়ের সমবায়-গঠিত গার্হস্থ্য সংস্থার স্বরূপ-নির্ধারণে ও ইহার মধ্যে শোভার স্থাননির্দেশে তিনি তাঁহার অভ্যস্ত রসিকতার ও মানবচরিত্রাঙ্কনের প্রশংসনীয় নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়াছেন। আশ্চর্য এই যে, এই পরিবারমণ্ডলীতে পুরুষ কর্তৃপক্ষ একেবারেই নিষ্ক্রিয়—এখানে গিন্নীদেরই বিশেষ করিয়া বড় ও মেজ গিন্নীরই একাধিপত্য। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে মতবিরোধ ও মনান্তরের কোন চিহ্নই দুর্লক্ষ্য। জা-এরা যখন পরামর্শ করেন, তখন আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাবই তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত—তীক্ষ্ণ বাক্যবিনিময়, উগ্র স্বাতন্ত্র্যঘোষণা, শ্লেষব্যঙ্গ-প্রয়োগ এই আদর্শ পরিবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মেজগিন্নীর শোভার প্রতি অনুচিত স্নেহ-প্রদর্শন এখানে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। শোভার উপর কাহারও কোন ঈর্ষ্যাবিকৃত, শাসন-পরুষ মনোভাব নাই। যেখানে অন্য সকলে, বিষেষতঃ স্ত্রী-ঔপন্যাসিকগোষ্ঠী, পরিবার-জীবনের

ভেদবুদ্ধিকলুষিত, এমন কি সৌজন্যবর্জিত স্বার্থসংঘাতেরই চি আঁকেন, সেখানে বিভূতিভূষণের এই আদর্শায়িত চিত্র একটি অসাধারণ ব্যতিক্রমরূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। শোভার জীবন হইতে ভিতরের কাঁটা তুলিয়া ফেলিয়া বাহিরের দুর্ভাগ্যের অস্ত্রে উহাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করিবার ভূমিকাই লেখক প্রস্তুত করিয়াছেন।

কিন্তু উপন্যাস ঠিক তত্ত্বপ্রতিপাদনের পূর্বনির্ধারিত আয়োজন মাত্র নয়। ইহাতে ঘটনা ও চরিত্রের স্বচ্ছন্দ বিকাশ না ঘটিলে ইহা পাঠকের মানস সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। এখানে লেখক জোর করিয়া ঘটনার কৃত্রিম বিন্যাস সাধন করিয়া অনুচিত উদ্দেশ্যানুবর্তিতার অভিযোগ-পাত্র হইয়াছেন। শোভার চরিত্র ও জীবন-ইতিহাসের মধ্যে ট্রাজেডির বীজ অনিবার্য নহে। লেখক এই বীজ বাহির হইতে আমদানি করিয়া ইহাকে অঙ্কুরিত হইবার অবাধ সুযোগ দিয়াছেন। শোভার দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধান দায়ী বসন্ত ঝি; সে একটা বাহিরের আগন্তুক মাত্র। লেখক তাহাকে উপন্যাসমধ্যে একটা অস্বাভাবিক প্রাধান্য দিয়াছেন। সে সৌরভীর ভগ্নী-পরিচয়ে তাহাকে সম্মোহিত করিয়াছে, এমন কি তাহার কুৎসিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন শোভাও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে তাহার কৌশল-বিস্তারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার অসাধারণ কূটনীতি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু ইহা অনেকাংশে অপ্রযুক্ত। তাহার পর রায়-গিন্নীরা শোভা-সম্বন্ধে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ, শোভাকে জয়ার সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠান সম্পূর্ণ অবিবেচনা ও দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার কাজ। কোন সাধারণবুদ্ধিসম্পন্না গৃহিণী এক তরুণীকে আর এক সদ্যোবিবা-হিতা তরুণীর সহচরীরূপে নির্বাচন করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, শোভার মা-এর মৃত্যুর পর তাহাকে তীর্থে লইয়া যাওয়া ও সেখান হইতে তাহাকে ফেরৎ পাঠান আর এক কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয়। মেজগিন্নীর অতিরিক্ত বাৎসল্যের অভিনয়ের পর বিবাহ-সম্বন্ধে উদাসীনতা বড়মানুষের খামখেয়ালীরই অভিব্যক্তি। সর্বশেষে হাবুল শোভার উপর বিবাহিত স্বামীর অধিকারপ্রয়োগের পর তুচ্ছ অভিমানের বশে নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভুলিয়া কোন অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করিয়াছে—ইহাতে সে হেয়তার নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছে। শ্রীমান সতুও তাহার অবিরত খবরদারীর মধ্যে চরম সংকটমুহূর্তে কোথায় সরিয়া পড়িল তাহার সন্ধান মিলিল না। সর্বশেষে শোভাও নিজ উন্নত সাহচর্যের প্রভাব ও চরিত্রের দৃঢ়তা হারাইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেই আপন দুর্ভাগ্যের অসহায় বলি হইয়াছে। সুতরাং লেখক একটা জ্যামিতিক তত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, একটা সার্বভৌম মানবিক সত্য প্রতিপাদনে অসমর্থ হইয়াছেন। আকস্মিকতার ফাঁকে বোনা জালকে নিয়তির অপ্রতিবিধেয় বন্ধনরজ্জুরূপে স্বীকার করা যায় না।

পংকপদ্ম (বৈশাখ, ১৩৭১)—উদ্বাস্তুসমস্যা লইয়া লেখা এই উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের সাম্প্রতিকতম রচনা। শিয়ালদহ স্টেশনে ছিন্নমূল শরণার্থী মানুষের যে শোচনীয় নৈতিক বিপর্যয় তাহাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অকৃত্রিম সহানুভূতি ও যে অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ এই জাতীয় অবক্ষয়ের জন্য দায়ী তাহাদের প্রতি সংযত, অথচ অভিমানক্ষুব্ধ ভর্ৎসনা উপন্যাসের প্রথম

দিকে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, উপন্যাসটি এই জাতীয় রচনার প্রথানুবর্তীই হইবে। কিন্তু এই প্রথানুগত্যের মধ্যেও দুইটি উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়ে—বিধু ও বিনোদ—খানিকটা নূতনত্বের স্বাদ আনিয়াছে। এই বীভৎস কদর্য জীবনযাত্রার গ্লানিকর অভিজ্ঞতা তাহাদের তরুণ মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু কলঙ্কিত করে নাই। তাহারা দেহবিক্রয়ের পঙ্কিলতার মর্মকথা জানে, চুরি ও পকেটমারিতে কোন দ্বিধাবোধ করে না, কিন্তু তথাপি এই পাপের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই। পরদুঃখে সহানুভূতির একটা বীজ তাহাদের মধ্যে সক্রিয় আছে, তাহাদের মানস পবিত্রতা পাপের নিত্যসাহচর্যেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এই কুৎসিত আবেষ্টনে তাহাদের যে মানস প্রতিক্রিয়া, এই কর্দমের মধ্যে তাহাদের যে সতর্ক পদক্ষেপ তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের কিছুটা সত্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখক নিরবচ্ছিন্ন ভাববিলাসের স্রোতে সমস্ত বাস্তববোধকে বিসর্জন দিয়াছেন। চন্দ্রমুখীর নৃশংস হত্যাও তাঁহার চক্ষু হইতে ভাবস্বপ্নের ঘোর কাটাইয়া দেয় নাই। শ্যামাচরণ, মুরারি ও মাতাদেবী—উৎকট ভাবালুতার এই ত্রিধারা-সমন্বয় উদ্বাস্তু জীবনকে একটা প্রেম ও মানবকল্যাণের আদর্শ স্বপ্নলোকে রূপান্তরিত করিয়াছে। মনে হয় নন্দনবনে পারিজাত ফুটাইবার উদ্দেশ্যেই মর্ত্য-নরকে এত পুরীষ-সারের সঞ্চয় হইয়াছিল। লেখক শুধু ফুল ফুটাইয়া ক্ষান্ত হন নাই ফুলের বিবাহও দিয়াছেন এবং এই মিলন হইতেই যে পূর্ণতর জীবন-বিকাশ হইবে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। লেখকের যে আশাবাদী, কল্যাণপরিণতিকামী কল্পনা এইরূপ স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহাকে সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না। অসহনীয় লাঞ্ছনার অমানিশায় উদয়দিগন্তে উষার স্বর্ণচ্ছটা প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে হয়ত জীবনকে অতল নৈরাশ্যের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ঔপন্যাসিক সময় সময় বাস্তব বর্ণনা ছাড়িয়া প্রবক্তার দৃষ্টিতে অনাগত ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করেন।

বিভূতিভূষণের শক্তির উৎস ও জীবনপর্যবেক্ষণের পরিধি সাধারণ ঔপন্যাসিক হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। ইহাদের অভিনব প্রকাশের সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল আছে। বাংলা উপন্যাসে নূতন অধ্যায়সংযোজনার জন্য পাঠক ইহার নিকট আরও প্রত্যাশা করে।

— —

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রবর্তনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্রের উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশক্তি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে—তাঁহার রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বোধ হয় গণনায় প্রথম স্থান অধিকার করে। তাঁহা প্রথমরচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি যৌন ও অপরাধতত্ত্ববিশ্লেষণকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের যে অপরিহার্য দুর্বলতা তাহা এই সমস্ত উপন্যাসে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। পাপ বা যৌন আকর্ষণের তথ্য-আবিষ্কার সম্বন্ধে লেখক এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, চরিত্রসৃষ্টি তাঁহার নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট নর-নারী কেবল মাত্র তত্ত্বের বাহন হইয়াছে, রক্তমাংসের সজীব মূর্তি হইয়া উঠে নাই। ইহার উপর অতর্কিত ঘটনা-সমাবেশ ও অসম্ভব রকমের দ্রুত চরিত্র-পরিবর্তন ইহাদের বাস্তবতাকে আরও ম্লান করিয়া দিয়াছে। সামাজিক উপন্যাসের সূক্ষ্ম ও তথ্য-বহুল বিশ্লেষণের সঙ্গে রোমান্সসুলভ অতর্কিত পরিবর্তনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণই এই উপন্যাস-গুলির প্রধান ত্রুটি। তাঁহার 'শুভা' উপন্যাসে (১৯২০) নায়িকার জীবনকাহিনী ইহার সুন্দর উদাহরণ। তাহার জীবনে যত প্রকারের অভাবিত ঘটনাপরম্পরা কল্পনা করা সম্ভব সমস্তই পুঞ্জীভূত হইয়াছে। তাহার স্বামি-গৃহত্যাগ, স্বাধীন জীবনস্পৃহা, নাট্যব্যবসা-অবলম্বন, প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, সমাজসেবার ব্রতগ্রহণ—এ সমস্তই যেন অতর্কিত বন্যাপ্রবাহের মত তাহার জীবনে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে; তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব এই ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া পরিবর্তনের তট হইতে তটান্তরে মুহূর্তের জন্য লগ্ন হইয়াছে। তাহার জীবনে সার্থকতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু ইহার সহিত জীবনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই—এই চিন্তাধারা জীবন-স্রোতের উপরিভাগে শৈবালপুঞ্জের মতই অসংসক্ত রহিয়াছে। তাঁহার আর একটি উপন্যাসের নায়িকা গোপার স্বামিত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ এই প্রকারের লঘু ক্ষণস্থায়ী খেয়ালের তাগিদেই সম্পাদিত হইয়াছে। মোহ ও মোহভঙ্গ উভয়ই তুল্যরূপ অতর্কিততার লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার 'মেঘনাদ' উপন্যাসে মনোরমার চরিত্রে জন্ম-অপরাধীর স্বাভাবিক পাপপ্রবণতার চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা হইয়াছে। এই চিত্রে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মৌলিকতা আছে, কিন্তু তদনুরূপ অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা নাই।

যে সমস্ত উপন্যাসে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ অনুসৃত হয় নাই, সেগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্যের দাবি করিতে পারে। পাঠকসমাজে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই খুব সুপরিচিত নয়;

কিন্তু তথাপি উদ্দেশ্যরূপ নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া তাহাদের উপন্যাসোচিত গুণ অধিকতর স্ফূর্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। 'লুপ্তশিখা' উপন্যাসে পতিতা নারী মালতীর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আদর্শবাদের খাতিরে বাস্তবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। অনাথ বালক বটুর প্রতি তাহার সহানুভূতি ও ভ্রাতৃস্নেহ তাহার চরিত্রের সুকুমার দিকের অভিব্যক্তি; আবার তাহার গণিকাবৃত্তি ও মদ্যাসক্তির দিকটাও উপেক্ষিত হয় নাই। বটুর সম্মুখে তাহার পাপাচরণের কোন উল্লেখ তাহার সলজ্জ সংকোচ, বটুর সহিত কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাহার জীবনের ঘৃণিত দিকটার সম্পূর্ণ বিলোপ-চেষ্টা—ইহার চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। তাহার চরিত্রের ক্রমিক অবনতি, তাহার সুকুমার সংকোচ ও শালীনতার অল্পে অল্পে তিরোভাব, একটা অসংকোচ ইতরতার প্রবলতর প্রকাশ, আর এই দ্রুত অধঃপতনশীলতার মধ্যে উদাস দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া লুপ্তপ্রায় চরিত্রগৌরবের ক্ষণিক আভাস—এই পরিবর্তন-কাহিনীর স্তরগুলি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মালতীর শেষ জীবনের কদর্য বীভৎস আত্মপ্রকাশ এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলির স্বাভাবিক পরিণতি।

'অভয়ের বিয়ে' ও 'তারপর' (১৯৩১) একটি যুগ্ম উপন্যাস। ইহাতে সাংসারিকজ্ঞানহীন, আত্মভোলা অথচ প্রগাঢ় পণ্ডিত অভয়ের সহিত মায়া ও সরমা দুই বোনের সম্পর্ক-জটিলতার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সরমা শেষ পর্যন্ত মায়ার জন্য অভয়ের উপর দাবি প্রত্যাহার করিয়াছে, ও নানারূপ অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মায়ার পরিত্যক্ত প্রণয়ী অজয়কে পতিরূপে বরণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কতকটা আছে কিন্তু ঘটনার অভাবনীয়তা বিশ্লেষণ-রেখাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

'মিলন-পূর্ণিমা'র সৌরীন ও রেখার মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন সমস্তই তুল্যরূপে আকস্মিক। 'নিষ্কণ্টক'-এ অলক ও অঞ্জলির দাম্পত্যবিরোধের কাহিনী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য হইলেও ঔপন্যাসিক রসের দিক্ দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অঞ্জলির বালিকাসুলভ সারল্য পরিজনের স্তাবকতায় বিকৃত হইয়া কিরূপে কঠিন ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত হইয়াছে; অলকের নির্দোষ প্রেম দীর্ঘ প্রতিকূলতায় ও প্রতিদানের অভাবে কিরূপে কলুষিত হইয়াছে—ইহার মনস্তত্ত্বমূলক পরিকল্পনা সুদক্ষ, কিন্তু রসসৃষ্টির দিক্ দিয়া চিত্রটি অক্ষমতার পরিচয় দেয়। কুন্তলার সহিত অলকের সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপেই অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে।

'সর্বহারা' (১৯২৯) উপন্যাসে অসীমের বেপরোয়া নাস্তিকতার চিত্রটি সজীব হইয়াছে। লতিকার প্রতি প্রেমসঞ্চারও লেখকের অভ্যস্ত অতর্কিততাদুষ্ট নহে। শিল্পী-জীবনের সমস্যা-বর্ণনাতেও কতকটা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হরিচরণের প্রণয়-কাহিনী একেবারেই ফোটে নাই। তাহার বঞ্চিত জীবন সহানুভূতি ও করুণ রসের উদ্রেক করে, কিন্তু প্রেমিক হিসাবে সে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

মোটের উপর নরেশচন্দ্রের 'অগ্নি-সংস্কার' ও 'বিপর্যয়' এই দুই উপন্যাসকেই তাঁহার রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের তথ্যসমাবেশ ও মনোভাব-বিশ্লেষণের মধ্যে সাধারণতঃ যে কল্পনা-দৈন্য ও ভাবগভীরতার অভাব অনুভব করা যায়, এই দুইটি উপন্যাসে তাহার আংশিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। 'বিপর্যয়'-এ বিরোধের চিত্রটি অতি-বিস্তৃতির জন্য

কতকটা তীব্রতা হারাইয়াছে—মনোরমার কঠোর বৈধব্য-ব্রত-পালন, আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়া যৌবন-চঞ্চলতার অনুভব ও এই নবজাত আকাঙ্ক্ষার বিবাহে পরিতৃপ্তি-সাধন ; আর অনীতার ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ জীবনের কঠোর বৈরাগ্য ও কোমল বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব-উপলব্ধির মধ্যে পরিসমাপ্তি—এই দুইটি চিত্র পরিবর্তন-সম্ভাবনীয়তার দুই বিপরীত সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে মনোরমার পরিবর্তন-কাহিনীটি পূর্ণতর। অনীতার জীবন একটা আকস্মিক আঘাতে তাহার পূর্বপ্রণালী ত্যাগ করিয়া এক অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহার রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার মধ্যে নিজ জীবনাদর্শ খুঁজিয়া পাওয়ার ব্যাপারটি খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় নাই। তা ছাড়া, ঘাত-প্রতিঘাতের বাহুল্যের জন্ত মনোরমা ও অনীতার ব্যক্তিত্ব অনেকটা অভিভূত হইয়াছে—তাহাদের সমস্যা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কাহিনী যেন যে-কোন দুইটি তরুণীর মানসিক ইতিহাস। নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই নারীর ধর্মসাধনার ইতিহাস, ধর্মজীবনে শান্তিলাভের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার 'তৃপ্তি' উপন্যাসে মিনতির জীবনসমস্যা ধর্মমুখীনতার মধ্যে সমাধান খুঁজিয়াছে। কিন্তু এই ধর্মজীবনের ব্যাকুল তন্ময়তা আঁকিবার জন্ত যে পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকারের আয়ত্তাতীত। এখানে শুধু শুষ্ক বিশ্লেষণ ও তথ্যসমাবেশ দ্বারা পাঠকের প্রতীতি জন্মান যায় না। ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া, অন্তরের গভীর বিক্ষোভ ও তুমুল আলোড়নকে প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। যে গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণের সাহায্য না লইয়া নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, সেই কল্পনার ইন্দ্রজাল ও কবিত্বের আবেশ এরূপ ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবের জন্তই চিত্রগুলি ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে।

যেখানে এরূপ ঐশ্বর্যময়ী কল্পনার প্রয়োজন নাই—যেমন ইন্দ্রনাথ ও সরযূর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায়—সেখানে লেখক অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। 'অগ্নিসংস্কার' উপন্যাসটি ঠিক এই কারণেই আপেক্ষিক উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহার সমস্যাটি কেবলমাত্র বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। সত্যেশ ও ইলার মধ্যে যে একটি শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারগত ব্যবধান ছিল তাহা বিবাহের প্রথম মোহ কাটিয়া যাইবার পর গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইলা তাহার কুমারীহৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রণয়ের আকর্ষণের ও কতকটা পিতার ইচ্ছানুবর্তনের জন্ত সত্যেশকে বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের চটুল বিলাসপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারমূলক আদর্শের প্রভাব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। সেইজন্ত লোকলজ্জার ভয়ে, নিজ পারিবারিক আবেষ্টনের বিরোধিতা করিবার সৎসাহসের অভাবে সে স্বামীর প্রতি ভালবাসার উচ্ছ্বসিত প্রকাশকে নিরোধ করিয়াছে, স্বামীর নৈতিক আদর্শের অনুবর্তনে অবহেলা দেখাইয়াছে। সত্যেশের অভিমানী অথচ নিজ আদর্শে অটল-স্থির মন ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রমশঃ বিরাগের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই বিরোধের বিবৃতি ও ক্রমপরিণতির আলোচনা বেশ সুলিখিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত হইয়াছে। ইলা ও সত্যেশ এই দুয়ের মধ্যে কেহই আমাদের সহানুভূতি হারায় নাই। অবশ্য ইলার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সহজেই সম্পাদিত হইয়াছে। কেননা স্বামীর সহিত তাহার বিরোধ আন্তরিক

নহে, কতকগুলি বহিঃপ্রভাবের ফল মাত্র। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত ও সজীব। মোটের উপর এই উপন্যাসখানি গঠন-কৌশল ও সংগতি-জ্ঞানের দিক্ দিয়া ও ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যার সরস আলোচনার জন্য উচ্চ স্থান দাবি করিতে পারে।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান অভাব হইতেছে রসানুভূতি ও ভাব-সঞ্চারের তীব্রতার। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ জটিলতা আছে তদনুরূপ ভাবগভীরতা নাই। বিশেষতঃ বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গী ও সরস বিস্তার তাঁহার উপন্যাসে অতি দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার ঘটনাসমাবেশ যেন শুষ্ক সার-সংকলন বলিয়া মনে হয়; যেন ইহা অতীতের প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি, চোখের সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহার সুস্পষ্ট উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি নহে। তাঁহার অগণিত উপন্যাস হইতে এমন কোন দৃশ্যের উল্লেখ করা যায় না, যাহা স্মৃতির উপর উজ্জ্বলবর্ণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অবিসংবাদিত চিন্তাশীলতার সহিত যদি অনুরূপ ভাবগভীরতা ও কল্পনা-শক্তির সংযোগ হইত, তবে এই সমন্বয় উপন্যাস-ক্ষেত্রে নব-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করিতে পারিত। বর্তমানে তিনি কেবল কতকগুলি নূতন ইঙ্গিত ও পথনির্দেশের কৃতিত্ব দাবি করিতে পারিবেন তথাপি এই নূতন-ধারা-প্রবর্তনের দ্বারা তিনি যে উপন্যাসের সীমা প্রসারিত করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

(২)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার 'চোর কাঁটা', 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী', 'দোটানা' প্রভৃতি উপন্যাসকে ঠিক মৌলিক বলা চলে না. তাহাদের উপর বৈদেশিক উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে। এই সমস্ত উপন্যাসে তাঁহার অনুবাদে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় মিলে। তাঁহার অনুবাদ ঠিক ছত্র ধরিয়া ভাষান্তর নহে, গ্রন্থের পরিবেষ্টনী, চরিত্র, ঘটনা-বিন্যাস সমস্তকেই অতি সুকৌশলে বাঙালী-জীবনের সহিত প্রায় নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক গন্ধ যতদূর সম্ভব লুপ্ত হইয়াছে। জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য ও সমালোচনার মধ্যেও ঋণ সহজে অনুভূত হয় না, ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নহে। দুই একটা ঘটনার অস্বাভাবিকতা স্বীকার করিয়া লইলে পাঠকের আর বড় বেশি আপত্তি বা অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। 'চোর-কাঁটা'র সাধু মল্লিকের বাল্যজীবন বৈদেশিক প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—গাঁটকাটার দলের মধ্যেও যে অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কলিকাতার মাটিতে গজাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহার পলাতক জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিবাহের রোমান্সও বাঙালী জীবনের পরিধি অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু মমতা ও পশুপতির গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, মমতার উদার স্নেহশীলতা ও ক্ষমাপরায়ণতা ঠিক যেন আমাদের নিজের সমাজের কথা। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে যাহার প্রধান অভাব, সেই আবেগপূর্ণ সরস বর্ণনা ও রসানুভূতি চারুচন্দ্রের উপন্যাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী'তেও বিদেশী কাহিনীকে সুকৌশলে স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশ পরান হইয়াছে। মুহূর্ত-দৃষ্ট সুন্দরীর খোঁজে ভবঘুরে জীবন-যাপন—সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে আমদানি;

বাঙলাদেশের মাটিতে ইহা এখনও শিকড় গাড়ে নাই। কণীও একজন দুর্দান্ত ইউরোপীয় অভিজাতবংশীয়ের বাঙালী সংস্করণ, তাহার দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর যে লাঞ্ছনা ও অপমান চিত্রিত হইয়াছে, তাহার রং দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় অপ্রাপ্য। গ্রন্থের যমুনা নদীর সহিত আমাদের দেশের ভাবাসঙ্গ (association) কিছুই নাই; ইহাতে জীবনের যে ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার জন্ম কোন পাশ্চাত্ত্য দেশের আকাশ-তলে। এই উপন্যাসে বিদেশী রূপান্তরসাধন অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে। ছদ্মবেশের সমস্ত কারুকার্য আমাদের চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে না।

'দোটানা' উপন্যাসের সমস্যাটিও বৈদেশিক—হৈমবতীর পদস্খলন ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য অশিক্ষিত চিত্রকর গোবর্ধনের সহিত তাহার এক অদ্ভুত শর্তে বিবাহ, সোজা পাশ্চাত্ত্য প্রতিবেশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ার এই স্বীকার্য বিষয়টি বাদ দিলে অবশিষ্টাংশের রূপান্তর-সাধন-নৈপুণ্য আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ করে। হয়ত গোবর্ধনের চরিত্রটি লেখক এই নূতন আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই—তাহার মধ্যে আমরা যে সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ ও রুচিসংযমের পরিচয় পাই তাহা আমাদের সমাজে ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিরল। তাহার অসাধারণ চরিত্র-গৌরব যে অশিক্ষিত শ্রেণীর অনায়ত্ত তাহাই ঠিক অবিশ্বাসের কারণ নহে—অনেক নিরক্ষর, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথাবার্তায় ও সাধারণ ব্যবহারে কোন রুক্ষ কর্কশতা বা স্থূল অপটুতার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। তাহার ভাষা ও ব্যবহারের শোভন পরিমিতিই তাহার অবাস্তবতা ধরাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই দুইটি বিষয় ছাড়া বাকী সমস্তই প্রায় নিখুঁত হইয়াছে। বংশলোচন একেবারে সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের লোক, আমাদের সনাতন সাধনার পক্বতম ফল। তাহার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতটুকুও এদেশের আকাশ-বাতাসে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তাহার ব্যথার বুক-ভাঙ্গা, শ্বাসরোধকারী হাসি, তাহার হতাশাপুষ্ট দুঃসাহস আমাদের নিজের জিনিস বলিয়াই আমরা চিনি। হৈমবতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র উপলব্ধির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহার উপাসনার দেবতা তরল গোবর্ধনের সঙ্গে তুলনায় কেমন করিয়া ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে, তাহার লঘু-চপল ইতরতা কিরূপে গোবর্ধনের অটল সত্যনিষ্ঠার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অবশ্য তরল ও গোবর্ধনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব আবার উপন্যাসটির বৈদেশিক উদ্ভবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত হৈমবতীর আত্মহত্যা এই অশ্রান্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া দিয়াছে। উপন্যাসটির আর যে ত্রুটি থাকুক না কেন, তীব্র উপলব্ধি ইহার সে দোষের আংশিক ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

'হের-ফের' উপন্যাসটির গল্পাংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান বলিয়া লেখক স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে উপন্যাসটিকে অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তাহারও প্লটের জন্য তিনি অপরের নিকট ঋণী। সে যাহা হউক, এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ বৈদেশিক-প্রভাব-মুক্ত ও ইহাতে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রজত ও শিশিরের মধ্যে বন্ধুত্ব কি করিয়া নিবিড় হইল ও কেমন করিয়া সাহিত্যিক প্রতিযোগিতার জন্য ইহা এক পক্ষে বিষাক্ত ও বিদ্বেষ-কলুষিত হইয়া উঠিল তাহার বিবৃতি খুব সুন্দর হইয়াছে। রজতের চরিত্রে উদারতার মধ্যে যে একটু আত্মপ্রচার ও গর্ব ছিল তাহাই অনুকূল অবস্থার সাহায্যে অতিমাত্রায় পুষ্ট হইয়া তাহাকে অধঃপতনের দিকে টানিয়াছে। সাহিত্যিক খ্যাতির বিষয়ে তাহার যে সূক্ষ্ম অভিমান ও যশঃস্পৃহা

ছিল সেইখানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাহার বন্ধুবাৎসল্যের বহিরাবরণ খসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য রজতের অধঃপতনের চিত্রটি একটু বেশি ঘোরাল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে—তাহার মদ খাওয়া ও বেশ্যাসক্তির যে পরিণতি দেখান হইয়াছে তাহার আকস্মিকত্ব কোন পূর্ব-সূচনার দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। শিশিরের দারিদ্র্যাভিমান ও অটল সংকল্প কেমন করিয়া রজতের উচ্ছ্বসিত বন্ধুপ্রীতি এবং সন্ধ্যা ও সুনয়নীর স্নেহাভিষেকে কোমল ও নমনীয় হইয়াছে তাহার চিত্রটি বেশ চমৎকার। শিশিরের বাল্যজীবনের আত্মকাহিনীর মধ্যে যে সংযত ও ঈষৎ-ব্যঙ্গপূর্ণ বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহার সুগভীর আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু এই উপন্যাসে বাস্তব স্তরের সহিত অতিনাটকীয় (melodramatic) স্তরের একটা অশোভন সম্মিলন হইয়াছে। রজত, শিশির, সন্ধ্যা ও সুনয়নী—ইহারা বাস্তব স্তরের অধিবাসী। বিদ্যুৎ ও তাহার মাতা ক্ষণপ্রভার মধ্যে এই অতিনাটকীয় ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বিদ্যুতের আবির্ভাব ও শিশিরের প্রতি তাহার প্রণয়-সঞ্চার ঠিক বাস্তব শৃঙ্খলার অধীন নয়; ইহারা প্রতিবেশী রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানি। বিদ্যুৎ কৌতুকময় দৈবের অনুগ্রহ-দান; কৃতিত্বের ন্যায্য পুরস্কার নহে। কাজেই সন্ধ্যা ও সুনয়নীর মত তাহাকে এত জীবন্ত বলিয়া বোধ হয় না। ক্ষণপ্রভার কাহিনীটি একেবারে শূন্যগর্ভ ও অবান্তর—তাহার সংস্পর্শে বিদ্যুতের বাস্তবতা আরও ক্ষীণ হইয়াছে। বিদ্যুতের জন্মকাহিনীতে এই কলঙ্কারোপ গল্পের দিক্ দিয়া একেবারে নিরর্থক। ইহা শিশিরের ভালবাসার একটা অগ্নিপরীক্ষা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু শিশিরের পক্ষে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহার প্রেমের উপর এমন কোন বিপরীত, বিরুদ্ধ প্রভাব ছিল না যাহার উপর জয়ী হওয়ায় উহার মর্যাদা এক বিন্দুও বাড়িয়াছে। সুলভ রোমান্সের প্রতি আমাদের বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকদেরও যে একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে ইহা তাহারই একটা উদাহরণ মাত্র—বাস্তবের সহিত রোমান্সের একটু খাদ না মিশাইলে আমাদের সাধারণ রুচির বাজারে উপন্যাস যে অচল হইবে এই পরাভবশীল মনোবৃত্তি হইতে এইরূপ প্রথার উদ্ভব।

'হাইফেন' উপন্যাসটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি বর্ধন করে নাই। মলয় ও মৃদুলার প্রণয়কাহিনী পূর্ব-বাগ্‌দানের রোমান্টিক আবেষ্টনে ইহার গাঢ়তা হারাইয়াছে—এই বাগ্-দানের অবাঞ্ছিত সহায়তায় ইহার স্বাভাবিক শক্তি স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই পূর্ব-নির্দেশের আশ্রয় না লইলে তাহাদের প্রেম স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আরও গৌরবান্বিত হইত। পিতৃআজ্ঞাপালনের কর্তব্যভার মাথায় লইয়া এই ভালবাসা যেন নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বিলোপের 'নামধেয়-সদৃশ' আত্মবিলোপও বিশেষ লক্ষণীয় হয় নাই; মৃদুলার প্রতি তাহার মৃদু আকর্ষণ বন্ধু-প্রীতির প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনন্ত ও আহুতির ব্যভিচারস্পৃহা তাহাদের চরিত্রের দিক্ দিয়া যেমন নিন্দনীয়, লেখকের রুচি ও কলাকৌশলের দিক দিয়া ততোধিক গর্হিত। এমন একটা উৎকট কারণহীন অস্বাভাবিকতার চিত্র আঁকিয়া লেখক উপন্যাসটির অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন। মলয়-মৃদুলার দাম্পত্য প্রেম এই একান্ত দুর্বল ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধককে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া নিজেরই পাণ্ডুর রক্তাল্পতার পরিচয় দিয়াছে। মৃদুলার অভিমানে পতিগৃহ-ত্যাগ তাহার স্বাভাবিক স্থির-দুর্বল চিত্তের সহিত খাপ খায় না। বিলোপের 'হাইফেন' উপাধি একদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে—

উপন্যাসটির মধ্যে তাহার নিজস্ব কোন স্থান নাই; সে কেবল প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা সংযোগচিহ্ন মাত্র। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ মৌলিকতার দাবি করিতে পারে তাহাতে তাঁহার অন্যান্য রচনার প্রধান গুণ—তীব্র অনুভবশীলতা—প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে।

'মন না মতি' উপন্যাসে ব্রততী ও পলাশের নিবিড় দাম্পত্য মিলনে যে অন্তরায় উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত ও যথেষ্ট কারণহীন। উল্কা নিজ নামের মতই রহস্যময়ী—পলাশকে লইয়া তাহার কৌতুক-ক্রীড়ার কোন সঙ্গত হেতু নাই। পলাশেরও অন্যাসক্তি-প্রবণতা তাহার পত্নীপ্রেমের নিবিড়তার বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান করে। অবশ্য লেখক পলাশের এই অতর্কিত চিত্ত-চাঞ্চল্যের একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ব্রততীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণই পলাশকে নিজ গোপন লালসা সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া ইহাকে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ দিয়াছে—কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমাদের মনে ধরে না। পলাশ মোহের স্বাভাবিক পিচ্ছিল পথ ধরিয়াই চলিয়াছে, মোহাবিষ্ট অপর লোকের সহিত তাহার কোনই প্রভেদ নাই। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা কৌতুককর, ক্ষণস্থায়ী চিত্ত-বিভ্রম বলিয়াই আমাদের কাছে ঠেকে, ইহার মধ্যে কোনরূপ গাম্ভীর্য বা ভাব-গৌরবের লক্ষণ পাওয়া যায় না।

উপন্যাস ছাড়া ছোট গল্প রচনাতেও লেখক সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'পঞ্চদশী', 'বরণ-ডালা' প্রভৃতি গল্পসংগ্রহে কয়েকটি গল্প খুব উচ্চ উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে।

(৩)

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট কলাসংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মন্তব্য-বিশ্লেষণে গভীরার্থক চিন্তাশীলতা ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-ক্ষমতা যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার স্থির, সংযত বুদ্ধি-বৃত্তিসুলভ উচ্ছ্বাসও ভাবপ্রবণতার দ্বারা সহজে বিচলিত হয় না। কথোপকথনের ধারার মধ্যে সহজ ভদ্রতা, সাবলীল উত্তর-প্রত্যুত্তর-নিপুণতা ও লঘু সরসতা প্রভৃতি গুণ সুপরিস্ফুট—তবে মার্জিত বুদ্ধি ও রুচির প্রাধান্যের জন্য ভাব-গভীরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার সমস্ত উপন্যাসেই এই ভাবগভীরতার অভাব ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান দিয়াছে—emotional crisis বা গভীরভাবমূলক চরম পরিণতি বিশেষ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

'শশিনাথ' উপন্যাসেই উপেন্দ্রনাথ প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। শশিনাথ, লীলা, সরযূ, বরেন ইহাদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাত বেশ একটি উপভোগ্য জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে উহাদের পরস্পরের সম্পর্কের যে জটিলতার আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ লীলা ও শশিনাথের সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটি চমৎকার নাটকীয় পরিণতির প্রত্যাশা করা যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটনাবিন্যাসের ভিতর দিয়া একটা উৎকট আকস্মিকতার ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত সূক্ষ্মতর তন্তুজালকে বিপর্যস্ত করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

যাহা হৃদয়ের মৃদু ঘাত-প্রতিঘাতমূলক মনস্তত্ত্বকাহিনী হইতে পারিত তাহাকে দৈবের পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছে। উপন্যাসটিতে উৎকর্ষের নিদর্শন আছে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতের অতি-প্রাদুর্ভাব এই উৎকর্ষের স্বাভাবিক স্ফুরণ ব্যাহত করিয়াছে।

'রাজপথ' উপন্যাসটি অসহযোগ আন্দোলনের সহিত জড়িত। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব শুধু যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু মনোজগতেও একটা বিপর্যয় ঘটায়, এই তথ্যই এই উপন্যাসে প্রমাণিত হইয়াছে। অসহযোগের ভাব-প্লাবন দুইটি সন্নিহিত হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আবার দুইটি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় অথচ আকস্মিক-পরিচয়-সূত্রে গ্রথিত হৃদয়কে নিবিড় মিলনে বাঁধিয়াছে। সুরেশ্বর ও সুমিত্রার মধ্যে অনুরাগ-সঞ্চার ঠিক সাধারণ সমতল রাজপথের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করে নাই, একটু আঁকা-বাঁকা বিঘ্নবন্ধুর, বিরোধবিষম পথেই উহার প্রবাহ মিলনের সাগরসঙ্গমে পৌঁছিয়াছে। সুমিত্রার উদ্ধারকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার মধ্যে তাহার স্বদেশীয়ানার আতিশয্যের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশ ও বিরুদ্ধতা মিশ্রিত ছিল—বোধ হয় এই বিরুদ্ধতার বেগসৃজনকারী বাধা না থাকিলে কৃতজ্ঞতা শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন প্রবাহে, প্রাত্যহিক শিষ্টাচারের বালুভূমিতে আপনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিত। জন্মদিনের উপহার ও উৎসব উপলক্ষে সুমিত্রার জীবনে সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দুইদিনের মধ্যেই তাহার জীবনধারা ও অদৃষ্টলিপি অতীতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন পথ ধরিয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহার মন বিচিত্র প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আঘাতে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা আবর্তিত হইয়াছে। সুরেশ্বরের প্রতি তাহার মনোবৃত্তি বিরাগ ও উন্মুখতার চরম-প্রান্তসীমার মধ্যে প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়াছে—এবং এক মুহূর্তে ইংরেজী সুট হইতে খদ্দরের শাড়ীতে পরিবর্তন এই আন্দোলনের প্রবলতার মানদণ্ড-স্বরূপ হইয়াছে। এইবার সুরেশ্বরের প্রতি বিমানের সহজ হৃদ্যতা একটু ঈর্ষ্যা-বিকৃত হইয়া বক্র কটাক্ষ ও প্রতিকূল সমালোচনার রূপ ধরিয়াছে—এবং তাহার ব্যাকুল, সংকুচিত প্রেমনিবেদন সুমিত্রার হৃদয়কে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করিয়াছে। তারপর দুই মাস ধরিয়া এই দুই বিপরীত আকর্ষণ সুমিত্রার মনের উপর অধিকার-বিস্তারের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে; এবং এই দ্বৈরথ যুদ্ধে বিমান সুমিত্রার সন্তোষবিধান ও মতানুবর্তিতার অতিরিক্ত আগ্রহে নিজ দাবিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি যুদ্ধের ফল অনিশ্চিতই থাকিত; কিন্তু জয়ন্তীর অপটু এবং অশুভ সহযোগিতা, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সৃজন করিয়া, বিমানের আশার একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। সুরেশ্বরের জয়ের যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহা মাধবীর দৌত্য ও তাহার নিজের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্ধান সম্পূর্ণ করিয়া দিল। কোনও দিন প্রেমের আচরণ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার না করিয়াও সুরেশ্বর প্রেমের বিজয়-মাল্য লাভ করিল। তাহার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে কোন অলক্ষিত অবসরে তাহার প্রণয়ের ভারকেন্দ্র সুমিত্রা হইতে মাধবীতে স্থানান্তরিত করিয়াছে—সুতরাং তাহারও স্বার্থত্যাগ একেবারে অপুরস্কৃত থাকে নাই।

উপন্যাসে সমস্ত কথোপকথনের ও যুক্তিতর্কের বিনিময়ের মধ্যে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ ভাষানৈপুণ্য ও শোভনতাবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রধান দুর্বলতা

হইতেছে ভাব-গভীরতার অভাব। সুমিত্রার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রের রেখাগুলি স্পষ্ট বটে, কিন্তু গভীর ও উজ্জ্বল নহে। তাহার ভিতর কোথাও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হয় নাই। সুরেশ্বরের জীবনেতিহাসে তাহার স্বদেশপ্রীতির সহিত তুলনায় তাহার প্রেম ম্লান ও নিষ্প্রভ—অথচ উপন্যাসের মধ্যে তাহার সমস্ত মর্যাদা দেশসেবক হিসাবে নহে, প্রণয়ী হিসাবে। সুরেশ্বরের ক্ষেত্রে তাহার প্রণয়-সঞ্চারের দিক্‌টা একেবারে অস্পষ্ট ও অকথিত রহিয়া গিয়াছে। আবার মাধবী-বিমানের মিলন সম্পূর্ণরূপে ঘটনামূলক, মনস্তত্ত্বমূলক নহে; তাহাদের বন্ধন-ব্যাপারে চরকার মিহি-সূতা কিরূপে প্রণয়ের স্বর্ণসূত্রে রূপান্তরিত হইল তাহার কোনও আভাস মিলে না। বিমানবিহারীর পক্ষে ইহা গুণার্জিত নহে, কেবল সান্ত্বনাবিধায়ক পুরস্কার (consolation prize)। বলা বাহুল্য উপন্যাসের আদর্শ এরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

'অমূল তরু' উপন্যাসটিতে এক কৌতুককর প্রেমের অভিনয় কিরূপে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বমূলক পরিণতি ও বাহ্য ঘটনার সহযোগিতায় গভীর অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার একটি উপভোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। ষড়যন্ত্রে অনিচ্ছুকভাবে যোগ দেওয়ার পর হইতে সুনীতির মনের পরিবর্তন-স্তরগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে—প্রতারণাপাত্র সুবোধের প্রতি সমবেদনায়, তাহার শিশুসুলভ সারল্য ও বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতি সহানুভূতিতে, তাহার পত্রের গভীর, অসন্দিগ্ধ প্রেম-নিবেদনের স্পর্শে, তাহার মোহভঙ্গের দুঃসহ বেদনার প্রতি করুণায়, তাহার সাংঘাতিক রোগের জন্য দায়িত্ববোধের অনুশোচনায়, ও রোগশয্যায় তাহার ব্যাকুল উদ্বেগমণ্ডিত পরিচর্যার ভিতর দিয়া কিরূপে প্রেমের রক্তিমরাগ বিকশিত হইয়াছে তাহার বিবরণ খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শেষের দিকে ভুল ভাঙ্গার পর সুবোধ ও সুনীতি উভয়েরই সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ মিলনের পথে একটা ক্ষণস্থায়ী অন্তরায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য ও উভয়েরই প্রবল আকর্ষণ এই বাধাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অবিমিশ্র আনন্দের মধ্যেই গল্পের যবনিকাপাত হইয়াছে।

'অমলা' উপন্যাসে একটা কুৎসিত, গ্লানিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অমলার চরিত্র-দার্ঢ্য ও অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমলার শ্বশুরের অসহনীয় বর্বরতা ও দুর্ব্যবহার, স্বামী বিজয়নাথের কাপুরুষোচিত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য, তাহার পিতা-মাতার দ্বারা প্রমথর হীন চক্রান্তের পোষকতা—এ সমস্তই গ্রন্থখানির বাতাসকে একটা অস্বাস্থ্যকর পীড়াজনক গন্ধে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। ইহাদের অপেক্ষা ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক প্রমথ অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র—সে অর্থসাহায্য দ্বারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে জয় করিতে চাহিয়াছে; অমলাকে লাভ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ, দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও ধৈর্যপূর্ণ সংযমের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। তথাপি মনে হয় যে, অমলার প্রতি তাহার কৌশলজালবিস্তার অত্যন্ত অনাবৃত ও সুপ্রকাশ্য হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে—তাহার ফাঁদ পাতার চেষ্টা এতই সহজবোধ্য যে, ইহা অমলার সমস্ত সন্দেহ ও বিরুদ্ধতাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বাধাপ্রদানে উদ্রিক্ত করিয়াছে। অমলা কর্তৃক শেষ প্রত্যাখ্যানের পর তাহার নিরাশাপীড়িত মন ত্যাগস্বীকারের মহিমা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ও তাহার বিদায়বাণী গভীর ভাবের উত্তেজনায় আবেগ-কম্পিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়া হইতে অমলার প্রতি ব্যবহারে তাহার কোথাও সুগভীর

প্রেম বা সহানুভূতির সুর ধ্বনিত হয় নাই। ইহার মধ্যে কেবল অতি চতুর লোকের সুচিন্তিত চালের পরিচয় মিলে। অমলার মত দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প নারীকে লাভ করার ইহা যে প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, প্রমথর চতুরতা তাহাকে এতখানি অন্তর্দৃষ্টি দেয় নাই। প্রমথর সহিত পরিচয়ের প্রথম দিকে অমলার মনে কৃতজ্ঞতা ও অভিমানসঞ্চারের উল্লেখের দ্বারা তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষীণ সংকেত দিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু শেষ দিক্ দিয়া এই ক্ষীণ ইঙ্গিতগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে ও অমলার হৃদয় প্রমথর বিরুদ্ধে একটা অপরিবর্তনীয়, নিস্তরঙ্গ বিমুখতায় জমাট বাঁধিয়াছে। অমলার অন্তরের শেষ সংঘাতের বিবরণটি নাটকোচিত তীব্রতা (dramatic intensity) লাভ করিয়াছে - তাহার স্বামী ও প্রমথ উভয়কেই আমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়া দিয়া স্বর্গ-নরকের সন্ধিস্থলে দ্বিধাকম্পিতচরণে দাঁড়াইয়া থাকার চিত্রটি উপন্যাসটিকে একটি নাটকীয় পরিণতির (dramatic climax) উচ্চ শিখরে উঠাইয়া দিয়াছে।

'অন্তরাগ' উপন্যাসটি ঘটনাচক্রের অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর আবর্তনের জন্য অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। বিনয় কমলার বাগ্‌দত্ত স্বামী হইতে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতায় রূপান্তরিত হইয়া গল্পের উপসংহারের মধ্যে একটা অতর্কিত আকস্মিকতা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বিপর্যয়কারী সংঘটনের ভাবমূলক প্রতিক্রিয়া (emotional reaction) নিতান্তই সাধারণ ও বিশেষত্বহীনরূপে চিত্রিত হইয়াছে—ইহা বিনয়ের মনে একটা করুণ, উদাসভাব আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু অন্তরে কোন তুমুল আলোড়ন জাগায় নাই। গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বিনয় ও কমলার মধ্যে প্রণয়সঞ্চার ও বিনয়ের ভালবাসা লইয়া কমলা ও শোভার মধ্যে একটা নীরব প্রতিযোগিতা—কিন্তু এই উভয় চিত্রের মধ্যেই বেগবান্ আবেগ বা প্রচুর রসধারা সঞ্চারিত হয় নাই। কমলা ও বিনয়ের সম্পর্কটিতে অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র বিজয়া ও নরেনের ভ্রান্তি-জটিল, অভিমানগূঢ় সম্পর্কের সাদৃশ্য-ছায়াপাত হইয়াছে, কিন্তু আর্টের উৎকর্ষের দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে তুলনা হয় না। মোট কথা 'অন্তরাগ' উপন্যাসটিতে শক্তির আপেক্ষিক অভাবই লক্ষিত হয়।

'দিক্‌শূল' উপন্যাসটিতে মুখ্য বিষয় হইতেছে—বড়লোক শ্যালী কর্তৃক দরিদ্র রমাপদর শিশু-পুত্রকে পোষ্যপুত্রগ্রহণের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে তাহার স্ত্রীর আংশিক সম্মতিতে তাহার মনে দুর্জয় অভিমানসঞ্চার ও এই অভিমানের বশে স্ত্রীর সহিত তাহার সাময়িক বিচ্ছেদ। এই উপন্যাসেও আকস্মিক সংঘটনের আতিশয্য আমাদের বিশ্বাসকে পীড়িত করে। রমাপদর হঠাৎ উচ্চপদলাভ, মুরলীধরের আকস্মিক মৃত্যু, ইত্যাদি ঠিক উপন্যাসের বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করে না। সরযূর সহিত রমাপদর সম্বন্ধটি স্বাভাবিক করিতে গেলে যতটা বিশ্লেষণনিপুণতা ও বর্ণনাকৌশলের প্রয়োজন তাহা লেখকের নাই। তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব তাহাকে যথার্থভাবে অভিহিত করা কঠিন—ইহা কৃতজ্ঞতাও নহে, প্রেমও নহে, এক প্রকারের যৌন-আকর্ষণহীন, একত্র-বাস-জাত সৌহার্দ্য। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই অভূতপূর্ব বিচিত্র সম্পর্ক ফুটাইয়া তুলিবার উপযোগী গুণের কোন পরিচয় মিলে না—বাহিরের লোকের মত পাঠকও ইহাকে ভুল বুঝিতে থাকে। কিন্তু উপন্যাসের যে অংশটুকু সর্বাপেক্ষা কাঁচা, তাহা হইতেছে রমাপদ ও সরমার মধ্যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদের কাহিনী। রমাপদ বারবারই

স্নেহশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামীরূপে চিত্রিত হইয়াছে; দারুণ অভিমানপ্রবণতার কোন যথেষ্ট পূর্বসংকেত তাহার অতীত জীবনে পাওয়া যায় না। তাহার আত্মমর্যাদাবোধ যে তাহাকে পোষ্যপুত্রদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইয়াছে ইহা বেশ স্বাভাবিক, এবং এই বিষয়ে স্ত্রীর সহিত তাহার সামান্য মতানৈক্য যে তাহার মনে কতকটা অভিমান সঞ্চার করিবে ইহার মধ্যেও কিছু অসংগতি নাই। কিন্তু রুগ্ন ছেলের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে স্থান-পরিবর্তনের প্রস্তাব যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনতিক্রম্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন ভয়াবহ পরিণতির জন্য রমাপদর পূর্বজীবনের সহিত পরিচয় আমাদিগকে প্রস্তুত করে নাই। স্থানপরিবর্তন-প্রস্তাবের পিছনে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের অপরিত্যক্ত উদ্দেশ্য যে উঁকি মারিতেছে এই দৃঢ় প্রতীতিই রমাপদর ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা সংগত ব্যাখ্যা। কিন্তু ইহাও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ স্নেহবিলোপের অস্বাভাবিকত্ব অপনোদন করে না।

উপেন্দ্রনাথের 'নবগ্রহ' ও 'গিরিকা' নামে দুইটি ছোট গল্পের সমষ্টি ছোটগল্প-সাহিত্যের পর্যায়ে উচ্চস্থান অধিকার করে। ইহাদের কয়েকটি গল্প করুণরসপ্রধান—'প্রতিক্রিয়া' নামক গল্পটি এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হাস্যরসপ্রধান গল্পের মধ্যে 'কলি ও কুসুম' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'শুভ যোগ' ও 'সোনা ও লোহা' নামক দুইটি গল্পে আখ্যানের অভিনবত্ব, বর্ণনার সরস ভঙ্গী ও বিশ্লেষণকুশলতা লক্ষণীয়। মোটের উপর ঔপন্যাসিক সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপেন্দ্রনাথের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

অতি-আধুনিক উপন্যাস

(১)

অতি-আধুনিক উপন্যাস সমালোচকের নিকট অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্ন উপস্থাপিত করে। প্রথমতঃ, ইহার প্রসার ও সংখ্যা এত বেশি যে, ইহাকে অনেকটা দুর্ভেদ্য, পথরেখাহীন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইহার ঘনবিন্যস্ত ব্যূহ শ্রেণীবিভাগের চেষ্টাকে প্রতিহত করে ও দৃষ্টিবিভ্রম জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা পরীক্ষামূলক অনিশ্চয়তা লক্ষিত হয়; ইহার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নানা যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা ও অবান্তর মন্তব্য-সমাবেশের জন্য পূর্বতন সুষমা ও সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে ও একটা নূতন রূপ গড়িয়া উঠে নাই। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইহার মন সর্বথা দ্বিধাশূন্য নহে—এই অনিশ্চিত উদ্দেশ্যও লেখক ও পাঠক উভয়েরই মনঃস্থির করার পক্ষে ঠিক অনুকূল হয় না। তৃতীয়তঃ, ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-সমালোচনার বিশেষত্বটুকুও পূর্বতন উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে না—অথচ ইহার মৌলিকতা এখনও সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং ইহার বিচারে প্রচলিত রুচির বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া রসগ্রাহিতার পরিচয় দিতে হয়। চতুর্থতঃ ইহার লেখকেরা অনেকেই এখনও স্ব স্ব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ করেন নাই—ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া নিজ নিজ বিশেষ প্রবণতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচকের পথ যে নিতান্ত বিঘ্নবহুল তাহা উপলব্ধি করা মোটেই দুরূহ নয়। সুতরাং বর্তমান আলোচনা আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি মূল সূত্র ও প্রবণতার বিশ্লেষণেই ও কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় উৎকৃষ্ট উপন্যাসের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকিবে—কোনও লেখকের চূড়ান্ত স্থান-নির্ণয় ইহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত।

এই উপন্যাসের জন্ম-মুহূর্তে ইহার সূতিকাগারের দ্বারদেশে যে প্রবল কোলাহল উঠিয়াছিল, তাহাকে ঠিক নবজাত শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শুভ-শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ইহার দুর্নীতিপরায়ণতা ও যৌন আকর্ষণের অসংকোচ, নির্লজ্জ স্তুতিগান, তীব্র বিরোধিতা ও তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই উত্তপ্ত বাদ-প্রতিবাদে সাহিত্যবিচারের নিরপেক্ষ আদর্শ যে সর্বদা রক্ষিত হইয়াছিল, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। সুখের বিষয় এই অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে ও সমস্ত প্রশ্নটির ধীর সাহিত্যিক-আদর্শানুযায়ী পর্যালোচনার সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত লেখক এই কুৎসিত, অরুচিকর সাহিত্যসৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক অথবা বিরুদ্ধ সমালোচনায় অঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়াই হউক, এই গ্লানিকর আতিশয্য বর্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ও সুস্থ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যৌন আকর্ষণজনিত চিত্তবিকার এখন তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা অধিকার করিয়া নাই।

তাঁহাদের সৃষ্টি যতই নূতন প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, ততই ইহা পরিষ্কার হইতেছে যে, দুর্নীতিমূলক যৌন প্রেমচিত্রণই আধুনিক উপন্যাসের সম্বন্ধে প্রধান কথা নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তাও ঠিক এই অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে।

তথাপি এ বিষয়ে কতকগুলি মূলসূত্রের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে, সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনেকটা বিষয়-নিরপেক্ষ। সমাজবিগর্হিত প্রেম লইয়া যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহা কেবল গোঁড়া রুচিবাগীশেরাই অস্বীকার করিবেন। ইহার সপক্ষে প্রমাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে ভূরি ভূরি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, সমাজের অনুমোদন আমাদের নীতিবোধের অভ্রান্ত মানদণ্ড বা পথপ্রদর্শক নয়। সমাজের বিধি-নিষেধে যে নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনেকটা সুবিধাবাদ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নীতিজ্ঞান বা স্বার্থসংরক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এমন অনেক অসাধারণ ব্যতিক্রম থাকিতে পারে যাহা সমাজের সাধারণ নীতিবোধ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের দাবি করিয়া থাকে এবং এই জন্যই সমাজের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে। আমাদের যে নীতিবোধ সমাজবিধির অন্ধ অনুসরণে কুণ্ঠিতাগ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে, তাহা এই ব্যতিক্রমের বিদ্রোহে আবার তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসই এই জড়তাগ্রস্ত নীতিবোধকে সচেতন করিবার চেষ্টা। তারপর উপন্যাস প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়াবেগের কাহিনী; এবং হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ যে সকল সময় সমাজনির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না তাহা সমাজবিধির দিক্ দিয়া অসুবিধাজনক হইলেও অনস্বীকার্য সত্য। সুতরাং নিন্দিত প্রেমের বর্ণনা অন্ততঃ দুই দিক্ দিয়া সমর্থনের দাবী করিতে পারে—(১) উচ্চতর নৈতিক আদর্শ; ২) অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ।

(২)

কিন্তু ইহা ছাড়া বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই যৌন আকর্ষণের চিত্র আরও একটা সমর্থনের দাবি করিতে পারে। এই আকর্ষণের পিছনে যদি উচ্চতর নীতি ও হৃদয়াবেগ নাও থাকে, যদি চোখের দেখা ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ইহার একমাত্র উত্তেজক হেতু হয়, তথাপি জীবনে ইহা ঘটে বলিয়াই উপন্যাসে ইহার অবতারণা সমর্থনযোগ্য। এই যুক্তির অনুকূলেও ইউরোপীয় নজিরের দোহাই পাড়া চলে। Flaubert-এর Madame Bovary ও Zola-র অনেকগুলি উপন্যাস হৃদয়াবেগ একেবারে বর্জন করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার ভাবে নরনারীর যৌন-আকর্ষণ-বিষয়ক সমস্ত গ্লানিকর অথচ অবিসংবাদিত তথ্যগুলি পুঞ্জীভূত করিয়াছে। ইহাদের পিছনে যে মনোবৃত্তি তাহাতে বিদ্রোহের উত্তাপ ও উত্তেজনা নাই; আছে শুষ্ক, আবেগহীন সত্য-স্বীকার, বৈজ্ঞানিকের কঠোর সত্যপ্রিয়তা। মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা আছে, তাহাকে কল্পনার রঙিন ছদ্মবেশ না পরাইয়া, তাহার নগ্ন স্বরূপকে মানিয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাঙলাদেশের এই শ্রেণীর অধিকাংশ লেখকই আত্মসমর্থনের জন্য এই শেষোক্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের যথাযোগ্য বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণ ও তাহারা বর্তমান ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহার নির্ধারণ করিতে হইবে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যৌন-সাহিত্যের যে-অংশ প্রথম দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের লইয়া তীব্র মতভেদ আজকাল আর নাই; প্রথম পরিচয়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কাটিয়া গিয়া তাহাদের চিরন্তন সৌন্দর্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, বিরাজ বৌ প্রভৃতি নায়িকা আমাদের শাশ্বত নীতিজ্ঞানের অনুমোদন ও সহানুভূতি পাইয়া উচ্চতর সাহিত্য-রাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে—যেমন 'গৃহদাহ'-এ অচলা সম্বন্ধে একরূপ নিঃসংশয় নৈতিক অনুমোদনের অভাব—সেখানেও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাবল্য ও আবেগগভীরতা সমাজ-নীতি-উল্লঙ্ঘনের চিত্রকে বরণীয় না করিলেও ক্ষমাই করিয়াছে। দুর্দম আবেগ ঠিক আদর্শস্থানীয় না হইলেও, আমরা ইহাকে অনেকটা ক্ষমা-মিশ্রিত সমবেদনার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির প্রতিকূলতায় মানুষের জীবন যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপদ আশ্রয় হইতে স্খলিত হইয়া উন্মার্গগামী হইতে পারে তাহা ক্রোধ ও অভিশাপ-বর্ষণ অপেক্ষা অশ্রুজলস্নিগ্ধ সহানুভূতিরই অধিক দাবি করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারে সমাজের বিচারক-সুলভ রক্তচক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় কোমল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আসল সমস্যা হইতেছে তৃতীয় যুক্তি লইয়া—কেবল বাস্তবানুগামিতা ও তথ্যানুসন্ধান আমাদের দেশে কুৎসিত যৌন-সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমর্থনযোগ্য করিতে পারে কি না।

এই তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের সমর্থনে ইউরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও ফ্রয়েডের যুগান্তর-কারী মনস্তত্ত্বমূলক আবিষ্কার (psychc-analysis) উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের অনেক প্রচেষ্টাই মগ্ন-চৈতন্য-নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাবশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে যৌন-আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া বা কাম-প্রবৃত্তির দুর্বার সঙ্কেতকে স্ফুট-তর করিয়া তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। ইহাতে ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়া যিনি আপত্তি করিবেন, তাঁহার আপত্তি সত্যেরই বিরুদ্ধাচারী, সত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা। আমাদের দেশে কোন কোন লেখকের মধ্যে যে নির্লজ্জ, নিরাবরণ যৌন আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের চিত্র পাওয়া যায় এই যুক্তিতে তাহাকে সমর্থন করা যায় কি না সন্দেহ। ফ্রয়েডের তথাকথিত আবিষ্কার অনেকটা অনুমানসিদ্ধ ও এখনও পরীক্ষাধীন; ইহা সর্বদেশের সর্বপ্রকৃতির লোকের জীবন-রহস্যের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ইহার সার্ব-জনীন প্রযোজ্যতা মানিয়া লইলেও ইহা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যপ্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিতে পারে কি না তাহাও সন্দেহজনক। নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তি যদি সত্য সত্যই আমাদের অধিকাংশ মানস প্রচেষ্টার গোপন-শক্তি-উৎস হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য এই অদৃশ্য, অলক্ষিত প্রভাবের জন্য কেন ক্ষুণ্ণ হইবে? হৃদয়ের অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহস্য-গুহায় অবতরণ করিয়া মনের গূঢ় মূলগুলিকে টানিয়া বাহির করায় ঔপন্যাসিক রস কিরূপে সমৃদ্ধি লাভ করিবে? যেখান হইতে সূর্যালোকের আরম্ভ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ, সেখান পর্যন্তই ঔপন্যাসিকের রাজ্যের শেষ-সীমা। যে দার্শনিক মতবাদ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী, যাহা ভগবান, নিয়তি বা কোন অন্ধ

সহজ প্রবৃত্তি (instinct) ইহাদের মধ্যে যে কোনটিকে মানবের ভাগ্য-নিয়ামক বলিয়া নির্দেশ করে তাহার ছায়াতল উপন্যাসের প্রফুল্ল পাপড়িগুলি শীর্ণ-বিশুষ্ক হইয়া যায়। তথ্যানুসন্ধানের সব কয়টা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অনুমানের অতল, সূর্যালোকহীন গহ্বর পর্যন্ত ঔপন্যাসিককে যে বৈজ্ঞানিকের সহযাত্রী হইতে হইবে এরূপ কোন বিধান এখনও তাহার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় হয় নাই। মানব প্রকৃতির যে মূল অন্ধকারে আত্মগোপন করে, আর যে ফুল আলোক-বাতাসের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য ও সুরভি মেলিয়া ধরে—ইহাদের কোন্‌টি যে ঔপন্যাসিকের নিকট অধিক প্রার্থনীয়, এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ বিলম্ব হয় না।

(৩)

এখন ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইউরোপীয় সমাজে, আমাদের সহিত তুলনায়, নর-নারীর মধ্যে যৌন-মিলন সম্বন্ধে যে অধিকতর শিথিলতা ও প্রচুরতর অবসর আছে তাহা তথাকার সমাজ ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। নর-নারীর সম্বন্ধ সামাজিক মিলন ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া কত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতম আকর্ষণে রূপান্তরিত হয় ও কিছুদিন পরে কিরূপে আবার পূর্বতন ঔদাসীন্যে বিলীন হয় ইউরোপীয় উপন্যাস তাহার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহা যেন ভাবের তাপমানে সামান্য কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ উঠা নামার মতই সাধারণ ঘটনা। আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তরের সংস্কার, ধর্ম-বিশ্বাস ও লোক-মত দৈহিক মিলনের পথে যেরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃজন করে, সেখানে সেরূপ কোন প্রবল অন্তরায়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ইউরোপীয় উপন্যাসে যৌন-মিলন দেশের সাধারণ মেলামেশার সঙ্গে ছন্দের সমতা রাখিয়াই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যাহারা অসংবরণীয় আবেগের জন্যই হউক বা চিন্তাধারার সহানুভূতির জন্যই হউক, ক্ষণস্থায়ী অবৈধ বন্ধনে সংযুক্ত হয়, তাহাদের সমস্যা আমাদের দেশের মত এত জটিল ও সমাধানহীন নহে। সমাজের উদারতা ও নূতন জীবন-যাত্রার সম্ভাবনীয়তা সকল সময়েই তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথটি খোলা রাখে—সুতরাং এ জাতীয় সংকল্প-গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থায় তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা আমাদের সহিত তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া, সমাজের চক্ষে এই নৈতিক পদস্খলন খুব একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ার জন্য বহুচারিণী নারীও সমাজে তাহার সম্ভ্রম-মর্যাদা হারায় না। সুরুচি ও সৌন্দর্যের আবেষ্টনে, সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি ও আলোচনার মধ্যে সে তাহার জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। কলঙ্ক-কালিমা তাহার দেহে ও আত্মায় চিরকালের মত লিপ্ত হইয়া থাকে না। আরও একটা দিক্‌ দিয়াও ইউরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের সুলভতা বিচার্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, রোমাঁ রোলাঁর নায়ক জাঁ্যাক্রিস্তফের ন্যায় উচ্চাঙ্গের প্রতিভাসম্পন্ন ও আদর্শবাদপরায়ণ ব্যক্তিও যেন নিতান্ত অনায়াসে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন—অনেকটা আমাদের বেদপুরাণবর্ণিত মুনি-ঋষির ন্যায়। ইহাদের পক্ষে এই অভিজ্ঞতাটুকু তাঁহাদের শিল্পী-জীবনের মধ্যে উষ্ণ ভাবপ্রবাহ, উত্তেজিত রক্তধারা সঞ্চারিত করিয়া তাহার উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয়। তারপর ইহাদের জীবনের প্রসার এত অধিক ও বহুমুখী, ইহার গতিবেগ এত প্রবল যে, এক-আধটু কলঙ্কস্পর্শ এই প্রবল জীবনপ্রবাহে নিশ্চিহ্ন হইয়া ধুইয়া মুছিয়া যায়।

ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গারখণ্ডের উপর বায়ুপ্রবাহের ন্যায় অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্য ও গভীর আলোড়ন ইহাদের সৃষ্টিশক্তিকে দীপ্ততর করিয়া থাকে। যেখানে স্রোত নাই, সেখানে তলদেশের পঙ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করিলে জল সমল ও কলুষিত হইয়া উঠে মাত্র—স্রোতহীন জীবনে পাশবিক প্রবৃত্তির অতিপ্রাধান্য সমস্ত আকাশ-বাতাসকে পূতিগন্ধময় করিয়া তোলে। এই কয়েক বৎসরে বাঙালী সমাজও যৌন বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের নির্বিচার ঔদাসীন্যের স্তরে প্রায় পৌঁছিয়াছে। অধুনা এখানেও অবৈধ প্রেম সম্বন্ধে দারুণ উত্তেজনা প্রায় স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

এই আলোচনা হইতে ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ আমাদের দেশে কতখানি প্রযোজ্য তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। এখানে দীর্ঘদিনের সংস্কারকে ছিন্ন করিতে যে পরিমাণ দুর্দমনীয় আবেগ ও প্রবল অন্তর্বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ঔপন্যাসিক তাহা নিজ উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিতে বাধ্য। সুতরাং এক শ্রেণীর আধুনিক উপন্যাসে পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, কর্জন পার্কে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, এমন কি শিক্ষামন্দিরের দ্বারদেশে যে নির্লজ্জ ও অহেতুক প্রণয়লীলা পথিপার্শ্বস্থ তৃণ-গুল্মের জঙ্গলের মতই গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা নীতি-হিসাবে যাহাই হউক, বাস্তবতা-হিসাবেই সমর্থনযোগ্য নহে। তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎ মাত্রই যে দৈহিক সম্পর্কের জন্য লোলুপতা জাগিয়া উঠিবে ইহা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও আর্টের দিক্ দিয়া স্বাভাবিকতার দাবি করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তথাপি জীবনে যাহা কেবলমাত্র আকস্মিক বা সহজপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত তাহা উচ্চাঙ্গের আর্টের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এরূপ মিলনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি ফুটাইয়া না তুলিলে, আকর্ষণের সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ না করিলে তাহা আর্ট হিসাবে অসার্থক থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'কে আধুনিক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের অতিপ্রচলনের উৎস-মূল বলা যাইতে পারে। বৌদিদির প্রতি প্রেমাকর্ষণ, যাহা আধুনিক ঔপন্যাসিকের অতি মুখরোচক বিষয় এবং যাহার উপর 'শনিবারের চিঠি'র তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হইয়াছিল, ইহার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানবসুলভ সহজ প্রবৃত্তিকেই এই আকর্ষণের একমাত্র হেতু বলিয়া ধরিয়া লন নাই। তিনি অমল ও চারুর সম্পর্কে কিরূপে ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যরূপে কলুষিত আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তাহা সবিস্তারে চিত্রিত করিয়াছেন—ভূপতির নির্বিকার ঔদাসীন্য এবং অমল ও চারুর সাহিত্য-চর্চার ভিতর দিয়া ক্রমবর্ধমান নিবিড় মোহবর্ণনার দ্বারা চিত্রটি স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আত্মসমর্পণের শেষ পিচ্ছিল সোপানে পদক্ষেপ করিয়া অমলের হঠাৎ বিবেকসঞ্চার ও তাহার অটল, কঠোর সংযম মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া গল্পটির উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা উদাহরণটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করিতে যে পরিমাণ নিপুণতা, সুরুচিজ্ঞান ও কলাসংযমের প্রয়োজন তাহার অনুশীলন করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

অবশ্য ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, কোন বিষয় যে স্বতঃই বর্জনীয় তাহা নহে। অবৈধ প্রেমের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রবল আবেগ সঞ্চিত হইয়া উঠে তাহা ঔপন্যাসিকের পরম প্রার্থনীয়। এই সমস্ত বিষয়-বিচারে যদি আমরা খুব গোঁড়া ও সংকীর্ণ নীতিবাদের মধ্যে

আবদ্ধ থাকি, তবে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রসাস্বাদন হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিব ও আমাদের রসোপলব্ধির শক্তি শীর্ণ ও দুর্বল হইবে। জীবনে প্রেম একটা জলন্ত সত্য। সংস্কারগত নীতিবোধের খাতিরে তাহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জীবনে যাহা উচিত কেবল তাহাই যদি ঘটিত তবে তাহার বৈচিত্র্য ও দুর্জ্ঞেয়তা, তাহার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর বিকাশগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুখের বিষয়, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা যৌন-আকর্ষণ সম্বন্ধে খুব খোলাখুলি আলোচনার দ্বারা আমাদের সত্যাসহিষ্ণুতা ও দুর্বল নীতিসংকোচ অনেকখানি অপসারিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ শোনা যাইত—যথা, মন্দির-মধ্যে প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব, বা কোন ক্ষেত্রেই পতিব্রতা নারীর পতিগৃহত্যাগ অবিধেয়—তাহা এখন চিরতরে স্তব্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা নীতিভয়গ্রস্ত শৈশব অতিক্রম করিয়া স্বাধীন-চিন্তার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, এইরূপ দাবি নিতান্ত অসংগত মনে হইবে না। তবে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে যেন আমাদের এই নবার্জিত দৃপ্ত যৌবন অতি শীঘ্র অক্ষম লোলুপতায় ঘৃণাস্পদ, কুৎসিত স্মৃতির রোমন্থনে নিস্তেজ অকালবার্ধক্যে পর্যবসিত না হয়। আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া যেন আমাদের দেহ-মনকে কেবল ভস্মকালিমালিপ্ত না করিয়া বসি। সামাজিক আবেষ্টন অনুকূল না হইলে নর-নারীর মধ্যে স্বাধীন, অবাধ প্রেম জন্মিবার অবসর পায় না—এবং যদিও ধীরে ধীরে সমাজরীতি এই আদর্শের দিকে পরিবর্তিত হইতেছে, তথাপি সাহিত্যের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রামিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে বলিযা মনে হয়। কেবল রীতির অনুবর্তনের জন্য, ইতর রুচির পরিপোষণার্থ, কেবল গতানুগতিকভাবে এ সাহিত্য সৃষ্ট হইবার নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর ধ্বনিত না হইলে ইহা ইহার প্রধান সমর্থন হইতেই বঞ্চিত হয়। বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার যোগ্যতা সকলের নাই, এই সত্যটি মনে জাগ্রত থাকিলে সাহিত্য ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাব্যধর্মী উপন্যাস—বুদ্ধদেব বসু ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১)

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য। রচনার অজস্রতা ও অভিনব লিখনভঙ্গী—এই দুই দিক্ দিয়াই তাঁহারা খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের অধিকারী। পুরাতনের সীমা-রেখা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উপন্যাসকে নূতন আকার দেওয়া ও নূতন পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব ইঁহারা দাবি করিতে পারেন। পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গীর মৌলিকতা ইঁহাদিগকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-সাহিত্য-বিবর্তনের যে প্রধান ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ইঁহারা সেই স্রোতের সহিত না মিশিয়া শাখাপথে পাড়ি জমাইয়াছেন। অবশ্য এই শাখাপথে স্রোতোবেগ স্থায়ী হইবে অথবা মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ইহার রসপ্রবাহ অল্প দিনেই শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ইঁহারা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নূতন সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

ইঁহাদের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা খুব ব্যাপক ও গভীরভাবে গীতি-কাব্য-ধর্মী। অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে গীতিকাব্যের উন্মাদনা ও ঝংকার মোটেই নূতন উপস্থিতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা কেবল যে কবিতার অফুরন্ত নির্ঝরে উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে, গদ্যের কারুকার্যখচিত পাত্রকেও ভরিয়া তুলিয়াছে ; তিনি এক ছত্র কবিতা না লিখিলেও তাঁহার উপন্যাসের প্রকৃতিবর্ণনা ও চিত্তবিশ্লেষণ তাঁহার কবিত্বশক্তির অবিসংবাদিত প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করান যাইত। শরৎচন্দ্র সাধ্যমত কবিত্ব-উচ্ছ্বাস বর্জন করিলেও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্লীন কাব্যবীণায় ঝংকার দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী ; তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপ্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালী কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড, কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।

জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখিবার ভঙ্গী, জীবন-সমালোচনার প্রণালী ইঁহাদের সম্পূর্ণ কাব্যানুপ্রেরিত। জীবনের উপরিভাগের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্রবৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ কোণ ও অতর্কিত পরিবর্তন ছাড়াইয়া যে নিঃসঙ্গ, গভীর, শব্দহীন তলদেশে আত্মার নৈর্ব্যক্তিক রহস্য অবগুণ্ঠিত থাকে সেখানে অবতরণ করিয়া ইঁহারা সেই আত্মবিস্মৃত আত্মার অবগুণ্ঠন-মোচনে প্রয়াসী হইয়াছেন। সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা শতধা-খণ্ডিত, ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছদ্মবেশাবৃত আত্মার নগ্ন, জ্যোতির্ময়, নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ইঁহারা ভাষার স্বচ্ছ দর্পণে ধরিতে চাহেন। কোন

বিশেষ মানসিক অবস্থা বা কোন বিশেষ ঋতু বা সময়ের নিগূঢ় সাংকেতিকতা ফুটাইয়া তোলাতে ইঁহাদের প্রবণতা ও কৃতিত্ব দেখা যায়। ইঁহাদের প্রকৃতিবর্ণনা এমন কি বেশভূষা বা গৃহসজ্জা-বর্ণনার চারিধারে একটা সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডলের পরিবেষ্টনী অনুভব করা যায়। ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই এই বিশেষত্বের উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের 'যেদিন ফুটলো কমল'-এর 'বর্ষা' অধ্যায়ে বর্ষার ও 'দুখানি চিঠি'তে রাত্রির অন্ধকারময় সত্তার mystic উপলব্ধি; 'একদা তুমি প্রিয়ে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে পলাশের অন্তর্দ্বন্দ্ববর্ণনার মধ্যে অন্ধকার ও স্তব্ধতার পটভূমিতে মানবাত্মার নগ্ন নিঃসহায়তার অনুভূতি—"তার থেকে জেগে উঠছে অন্তরের চিরন্তন নিঃসঙ্গতা, চিরন্তন বিরহ, যখন আমরা উন্মোচিত, উদ্‌ঘাটিত, উন্মথিত, চেতনার তীরে পড়ে—নগ্ন, আক্রমণীয়, নিঃসহায়"; ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মেঘ-সাগরের সুদূর নিঃস্পন্দতায় রচিত ঐন্দ্রজালিক স্তব্ধতা, ও বনের সান্ধ্য অন্ধকারে বৃষ্টির মর্মরশব্দের মধ্যে নূতন প্রেমের উদ্ভব-কাহিনী; 'অসূর্য্যম্পশ্যা'য় দার্জিলিঙের কুয়াশাঘেরা, পর্বত-প্রাচীর-প্রতিহত নির্জনতার মধ্যে, অন্ধকার মন্দিরগৃহে দেবতার মত, সরমার হৃদয়ে প্রথম প্রণয়ের ভয়াবহ, রহস্যময় আবির্ভাব; 'বাসর-ঘরে' 'কালপুরুষ' অধ্যায়ে মধ্যরাত্রে নববিবাহিত দম্পতির অতীন্দ্রিয় অনুভবশীলতা—'চেতনার শক্ত শ্বেত দীপ্তি থেকে সে মুক্তি পেয়েছে দুজনের মধ্যে জন্ম নিলো বিশ্বাস, রহস্যময় নদী, রাত্রের হৃদয়ে এই দ্বৈত নিঃসঙ্গতা', অচিন্ত্যকুমারের 'আসমুদ্র'-এ নবম পরিচ্ছেদে বনানীর বিলীয়মান সত্তা ও তাহার নিগূঢ় চেতনার অন্ধকার হইতে মুক্তি; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সন্ধ্যার অন্ধকারে সৌম্যের অতৃপ্ত আত্মার নিজ সত্য, গভীর পরিচয়লাভের ব্যাকুল কামনায় অশান্ত আর্তনাদ; ষোড়শ পরিচ্ছেদে বনানীর জাগরণ—'তার রশ্মিবিদ্ধ প্রখর উন্মোচন তার উন্মেষের সৌগন্ধ্য, তার জীবন্ময় আরণ্য বৈকল্য'—এই সমস্তই তাঁহাদের উপন্যাসের, সূর্যালোকিত, সহজ পরিচয়ের পথ ছাড়াইয়া মানবাত্মার নিগূঢ়-গোপন সত্তার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ-লাভের প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে।

মানবমনের কোন বিশেষ ভাব বা প্রকৃতি র্ণনার মধ্যেও এই সাংকেতিকতার তীব্র, তীক্ষ্ণ, গীতিকাব্যোচিত অনুভূতির পরিচয় মিলে। বুদ্ধদেবের 'বাসর-ঘর'-এ ব্যারাকপুরে কুন্তলা-পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্তগুলির—দিন, জ্যোৎস্নারাত্রি ও অন্ধকার রাত্রির—কবিত্বপূর্ণ, অতীন্দ্রিয় আভাসে ভরপুর বর্ণনা, চাঁদের ডাইনি-প্রভাবের রহস্যময় শিহরণ ভাষার ইন্দ্রজালে ফুটাইয়া তোলার অপূর্ব চেষ্টা, তাহাদের অভিমান-দুর্বিষহ বিচ্ছেদ-রাত্রির আশ্চর্য স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন—"শব্দহীন, স্পর্শহীন, প্রেতে পাওয়া"; অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'তে 'বাতাসী' পরিচ্ছেদে নদীতীরবর্তী বিস্তৃত প্রান্তরের অস্ফুট ইঙ্গিত-আভাসগুলির কবিত্বপূর্ণ, অর্থব্যঞ্জনা-সমন্বিত বর্ণনা, 'আসমুদ্র'-এ নববধূর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে রহস্যময় সাংকেতিকতার সুর আবিষ্কার—'একটি শঙ্খের মধ্যে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিঃশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হ'য়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত অপরিমেয়তা'; নবীন প্রেমের বিহ্বল মাদকতা ও সহজ-স্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত—'শিপ্রার হাত লেগে ছোট ছোট খুঁটি-নাটি কাজগুলো পর্যন্ত গানের টুকরোর মত বেজে উঠেছে। কাজগুলির দাম একমাত্র তাদের চপল অনাবশ্যকতায়, শিপ্রার সশরীর আত্মবিকিরণে। কাজগুলিই তার আকাশের দিকে প্রসারিত জীবনের ছোট ছোট জানালা—তার ছুটি, তার উদ্বৃত্তি'; কলিকাতার সন্ধ্যার ধূসর শ্রান্তি,

কুহেলিকাচ্ছন্ন শীত প্রভাতের সাংকেতিক অস্পষ্টতা, বৃষ্টিপ্লাবিত অপরাহ্নের অপরিচয়ের রহস্য, শিপ্রার রোগকক্ষের মৃত্যু-ব্যঞ্জনা—"মৃত্যু দিয়ে মাথান, প্রতীক্ষায় নিমজ্জিত—সমস্ত বাড়ির উপর বিশাল একটা ছায়া যেন পাখা মেলে আছে, মৃত্যুর ছায়া, বনানীর প্রত্যাসন্ন আবির্ভাবের ছায়া—এই সমস্ত দৃষ্টান্তই লেখকদ্বয়ের ব্যঞ্জনাশক্তির উপর অসাধারণ অধিকার সূচিত করে।

ইঁহাদের উপন্যাসে যে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের অভাব আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহার আলোচনা কবিত্বপূর্ণ মনোভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 'যেদিন ফুটলো কমল'-এ শ্রীলতা-পার্থ-প্রতিমের সম্পর্কটি যেরূপ সহপাঠিত্ব, রুচি-সাম্য ও চরিত্রগত বাধা-সংকোচের ভিতর দিয়া প্রেমের পর্যায়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা; কিন্তু কতকটা পুস্তকটির কাব্যময় প্রতিবেশের জন্য ও তাহাদের ভালবাসা আত্মঅচেতনভাবে বাড়িয়া উঠায় সমস্ত ব্যাপারটি যেন কাব্যেরই একটা অধ্যায়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যানের পর পার্থের ভালবাসা প্রথম আত্মসচেতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে—বাস্তবের এই রূঢ় অভিঘাতে সে শ্রীলতাকে সাহিত্য হইতে নারীত্বের আবেষ্টনে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে প্রথম প্রিয়ারূপে অনুভব করিয়াছে। উপন্যাসের শেষে যে রেশ আমাদের অনুভূতিতে স্থায়ী হয় তাহা গীতিকাব্যের।

'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসেও বিশ্লেষণের কাব্যাভিষেক আরও সুপ্রকট। পলাশ ও রেবার মধ্যে অধুনা-অন্তর্হিত প্রেমের পূর্বস্মৃতি এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। স্মৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যুদূত হইলেও জীবনের নিবিড়তম অনুভূতির সহিত তাহার একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে বলিয়া জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ইহা স্বর্ণময় যোগসূত্র। রেবা এই স্বর্ণ-সূত্র ধরিয়া আবার তাহাদের প্রেমের নবযৌবন জাগাইতে চাহে, পলাশ কিন্তু জানে যে অতীতের স্মৃতি মৃত প্রেমের জীবন দান করিতে পারে না। তাহাদের পুনর্মিলন এক অদ্ভুত সংকোচ-জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে। পলাশের মনে পূর্বস্মৃতির প্রেত প্রতিধ্বনি, ও কর্তব্যবোধ বা করুণার মোহে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় না করার দৃঢ়সংকল্প, রেবার মনে একটা অশুভ, অস্পষ্ট আবেগ ও মোহভঙ্গের মধ্যেও সহানুভূতিলাভের একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। এই নিদ্রাহীন, পূর্বস্মৃতির গুরুভারে অসহনীয় রাত্রে রেবার প্রতি পলাশের সেই নিষ্ঠুর, সর্বধ্বংসী, আকর্ষণ, এক বন্য দুর্বার অন্ধশক্তির ন্যায় সান্ত্বনাহীন হাহাকারে জাগিয়া উঠিয়াছে—অন্ধকারে বহুক্ষণব্যাপী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের পর সে এই প্রজ্বলিত কামনার শিখাকে নির্বাপিত করিতে পারিয়াছে। শেষে পলাশ ও রেবা উভয়েই এই স্মৃতির অসহ্য ভার ঝাড়িয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইয়াছে, উভয়েই বুঝিয়াছে যে, স্মৃতির আবর্জনাস্তূপ জীবনের নবীন, নিষ্ঠুর বিকাশের পক্ষে অন্তরায় মাত্র, অতীতের ভগ্নাবশেষ নবীনজীবনরচনার ভিত্তি হইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রেবা প্রণয়িনী হইতে বন্ধুতে অবতরণ করিয়া পূর্বস্মৃতির তীব্র, জ্বালাময় অস্বস্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। প্রেমের দুঃসহ উত্তাপের পরিবর্তে একটা শীতল, শিশিরসিক্ত অনুভূতি তাহার হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়াছে।

কিন্তু এদিকে ভগ্ন মন্দিরের ফাটলে ফুলের ন্যায়, পূর্বস্মৃতিসমাকুল, বহির্জগৎ হইতে প্রতিহত মনের কোন নিভৃত অবকাশে নূতন প্রেম রক্তিম সৌন্দর্যে অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিমা রেবার কিশোরী ছাত্রী, উচ্ছ্বসিত কৌতূহল ও কৈশোরের স্বতঃস্ফূর্ত লীলাময়তা চঞ্চল। সে

রেবা ও পলাশের সম্বন্ধের মধুর রহস্যটির কস্তুরী-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে, ও সেই রহস্যের পূর্ণ পরিচয়-লাভের জন্য ব্যগ্র ও উন্মুখ হইয়াছে। এই নবোদ্ভিন্নপ্রেম কিশোরী,—রেবার সহিত পলাশের সম্পর্ক-রহস্য-উন্মোচনের জন্য রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষমানা—ক্রমশঃ রেবার উপগ্রহ হইতে স্বাধীন সত্তায় পরিণতি লাভ করিয়াছে—'সে যেন কল্পনার জ্যোতিশ্চক্র থেকে বেরিয়ে আস্‌তে চায়, তার চোখে যুদ্ধ-ঘোষণার দুঃসাহস।' অবশেষে মেঘ-সাগরের নির্জন তীরে, বৃষ্টিধারা ও বনমর্মরের মধ্যে পলাশ ও প্রতিমা নূতন প্রেমের জন্ম অনুভব করিল—শুক্লপক্ষের প্রথম চাঁদ, মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে-আসা, তাদের এই নবজাত প্রেমের উপর জ্যোতির তিলক পরাইয়া দিল। নানারূপ সাংকেতিক পূর্বসূচনা আমাদিগকে এই প্রেমের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করে—তীব্র গোলাপের গন্ধ, প্রতিমার তাম্বূল-রক্ত অধর—ইহারা যেন প্রতিমার আরক্ত প্রেমের symbol বা রূপক, রেবার মধ্যবর্তিতার ছদ্মবেশ-বর্জন ও পলাশের জন্য গোলাপ ফুলের উপহার এই প্রেমের স্পর্ধিত প্রকাশ্যতায় আত্মপরিচয়ঘোষণা। কিন্তু পলাশের পূর্বস্মৃতিজর্জর, অতীত অভিজ্ঞতায় জীর্ণ হৃদয় এই তীব্রদ্যুতিময়, তরুণ আবির্ভাবকে সহ্য করিতে পারিল না—সে এই 'হঠাৎ ঝল্‌সে ওঠা জীবনের ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল কোণ থেকে' পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। যে গোলাপের উপহার সে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই, তাহার সৌরভ তাহার স্মৃতিসমাকুল চিত্ত-জগৎকে নূতন গন্ধে ভারাক্রান্ত করিয়াছে।

'বাসর-ঘর'-এ মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট—এখানে কবিতারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য। কুন্তলা ও পরাশরের পূর্বরাগের মধ্যে এই সমস্যার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু মোটের উপর উপন্যাসটি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের বিশেষ কোন সহায়তা না করিয়া নিছক কাব্যচর্চায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাদের প্রেম যেন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে আরও নিবিড় হইয়া উঠিত। জন-সমাকীর্ণ আবেষ্টনেই তাহারা যেন "পরস্পরের স্পর্শ-উপস্থিতি" সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করিত। "তাদের কথা হ'তো থেমে থেমে, আশ্বিনের বৃষ্টির ছোট ছোট পশলার মত, ভরা হৃদয়ের অস্ফুট ছলছলানি, পাখির ঝরে' পড়া ছোট পালক যেন হাওয়ায় অনেকক্ষণ ভেসে বেড়ায়।" বিবাহে তাহাদের আপত্তি ছিল। সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের প্রেমের অবমাননা, ভালোবাসার উপর সমাজের নাম-সই ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কিন্তু এই ব্যাপারে কুন্তলা সমাজ-সমর্থনকে দেখিত উদাসীনতার চক্ষে, পরাশর দেখিত প্রবল বিরুদ্ধতার চক্ষে; সমাজের দাবির বিরুদ্ধে অতিসতর্কতার জন্য পরাশরের উপর কুন্তলার ছিল অভিমান। এই অভিমানই পরে প্রবল মতভেদের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পরবর্তী জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও সুষমার উপর ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষের রূঢ় অভিঘাত আনিয়া দিয়াছে। তাহাদের প্রেমের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা সাহিত্যচর্চার সহযোগিতা চাহে না—'সাহিত্যের বালুচরে যাহাতে প্রেমের অবসান না ঘটে' সে বিষয়ে অন্ততঃ পরাশরের তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি। আবার ভালোবাসার নামে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিসর্জন, ভালবাসার মোহ দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিলোপ—ইহাও তাহাদের অনভিপ্রেত। এমন কি এই প্রেম "পারস্পরিক বোধগম্যতার" দৃঢ় ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত হইবার দাবি রাখে না। যে প্রেম রহস্যের মায়া ছিন্ন করিয়া অতিপরিচয়ের সাহায্যে নিজ স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহার মহিমা তাহাদের মতে প্রাত্যহিকতার ধূলিতে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

তারপর বাড়ি-খোঁজার ব্যাপারে এই প্রেম "ধূসর মধ্যবিত্ততার" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে ও রঙিন কল্পনার স্বপ্নজালে নিজ বিচিত্র আবরণ রচনা করিয়াছে। অথচ যে প্রেম বাড়ি-খোঁজার ব্যাপারে কল্পনার লীলা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার চরম আদর্শে পৌঁছিয়াছে, তাহাই আবার গৃহসজ্জা ও উপকরণবাহুল্যকে শ্বাসরোধকারী পাষাণভারের ন্যায় তীব্র বিতৃষ্ণায় বর্জন করিতে চাহিয়াছে ও এই আসবাব-কেনা লইয়াই পরাশর ও কুন্তলার প্রেমে বিচ্ছেদের ফাটল দেখা দিয়াছে।

এই প্রেমের বিশেষত্বের যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসে এই বিশেষত্বের তীক্ষ্ণ কোণগুলি স্ফুট হইয়া উঠিত. চরিত্রের বঙ্কিম রেখা পূর্বাভাসের অনুবর্তনে আপনাকে প্রখরতর করিত, সংঘর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া বিশাল উর্মির তীব্র অবিচ্ছিন্নতা লাভ করিত। কিন্তু কবি-মনোবৃত্তির সংস্পর্শে আলোচনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে. প্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত হয় নাই। কবিত্বের প্লাবন আসিয়া মনস্তত্ত্বঘটিত এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, ঘাত-প্রতিঘাতের সুস্পষ্টতা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্টতা সবই যেন কবিত্বের দিগন্তপ্রসারী ঘন-শ্যাম রেখায় বিলীন হইয়াছে। কুন্তলা-পরাশর এই প্রেমের বিহ্বল মাদকতায় তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহারা যেন বসন্ত-পবন-হিল্লোলে উড়ন্ত দুইটি রঙিন প্রজাপতির মত ভারমুক্ত ও লঘুগতি, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবাতীত। এ কবিত্বের আবহাওয়ায় সৌন্দর্য বিকশিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব শীর্ণ ও খর্ব হয় তাহা সুনিশ্চিত। পরাশর-কুন্তলা সনাতন প্রেমিক-প্রেমিকা, আধুনিক যুগের রীতি-নীতি ও ভাষা তাহাদের আত্মার বহিরাবরণ মাত্র; কিন্তু আধুনিক যুগের উপযোগী তাহাদের অন্য কোনও নূতন পরিচয় নাই। তাহাদের চরিত্রের যে বিশেষত্ব, সংঘর্ষের যে শক্তি মাঝে মধ্য মাথা তুলিয়াছে, তাহা যেন প্রেমের সম্মোহন ইন্দ্রজালে অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অচিন্ত্যকুমারের 'আসমুদ্র' উপন্যাসেও কবিত্বের এই অতিপ্রাধান্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সৌম্য ও বনানীর মধ্যে যে নিবিড়রহস্যময় সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, নগ্ন মানবাত্মার যে ব্যাকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে তাহার মূল্যনির্দেশ চলে না। ইহা গীতিকাব্যেরই বিষয়। সৌম্যের সহিত বনানীর সহজ আলাপ ও বনানীর গৃহস্থজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতকে অতিক্রম করিয়া উদ্বেলিত মানবাত্মার সমুদ্র-কল্লোল বা স্তব্ধতার অতলস্পর্শ গহনতা তরঙ্গিত হইয়াছে। গৃহস্থালীর তুচ্ছ কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে, সহজ ভদ্রতার আদান-প্রদানের মধ্যে মধ্যে আত্মপরিচয়লাভ, পূর্ণ আত্মানুভূতির জন্য ব্যাকুল অশান্ত ক্ষোভ গুঞ্জরিত হইয়াছে। বনানীর ব্যক্তিত্ব যেন সম্পূর্ণরূপে সাংকেতিকতার দুর্গম অরণ্যানীতে অদৃশ্য হইয়াছে; সে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন, ব্যক্তিত্বের বর্ণলেশহীন, আত্মার বিচ্ছুরিত শ্বেত দীপ্তিমাত্র। মানবের চিত্ততলে অর্ধ-চেতন আত্মার কারাগৃহে যে অন্ধকার, গহন বন আছে, সে যেন তাহারই প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি। সৌম্যের চরিত্রে শিপ্রা ও বনানীর সাহচর্যে দুইটি দিক বিকশিত হইয়াছে; তাহার ব্যক্তিত্ব যেন স্বপ্নবিধুর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতির তটহীন তরলতায় বিগলিত হইয়াছে। বনানীর অন্তর্ধানের পর তাহার চরম

বিকলতার মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলিয়া রাখার জন্য তুচ্ছ সাংসারিক ভাবনা তাহার ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈততাই সূচনা করে। এক শিপ্রার মধ্যেই তীক্ষ্ণ বাস্তবতা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার চরিত্রটিই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের মানদণ্ডে বিচারণীয়। শিপ্রার বধূজীবনের অপরিমেয় সাংকেতিকতা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে গৃহিণীপণার সুনির্দিষ্ট কর্তব্যপরিধির মধ্যে সংকুচিত, সাংসারিকতার স্থূল আবেষ্টনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে—সে "এখন সমর্পণের সমতলতা থেকে অভিজ্ঞতার চূড়ায় উঠে এসেছে। তার সেই প্রথম ক্ষণিক চিরন্তনতা থেকে নেমে এসেছে প্রত্যহের প্রয়োজনে; তাকে অতিক্রম করে নেই যেন আর সেই অশরীরী সুর"—; তার আটপৌরে শাড়ী কেমন করিয়া অভ্যাসের ধূলি-মলিন হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, তাহার বর্ণনা মনস্তত্ত্বঘটিত পরিবর্তনের সামিল। তাহার গৃহিণীপনার তীক্ষ্ণ আত্মপ্রচারই সৌম্যের সঙ্গে তাহার ব্যবধানের প্রথম স্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর বনানীর আবির্ভাবে তাহার দাম্পত্যজীবনের সৌভাগ্যগর্বে ঈর্ষ্যার বিদ্যুৎঝলক সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন হইতে বনানীর প্রতি একটা তীব্র, অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তাহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সন্তানের জন্ম তাহাকে পরিবর্তনের আর এক স্তরে লইয়া গিয়াছে—অবশ্য এই পরিবর্তন ঠিক ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র নারীজাতির পক্ষে সাধারণ। তাহার শিশুপুত্র তাহাকে স্বামীর প্রতি উদাসীন করিয়া তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের ব্যবধান বিস্তৃততর করিয়াছে, আবার এই ঔদাসীন্যের প্রতি সৌম্যের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাহার সন্দিগ্ধতাকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য করিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইয়া সে সৌম্যকে অকুণ্ঠিত, নির্লজ্জ বিদ্রোহ-ঘোষণায় উত্তেজিত করিয়াছে। একদিন মাত্র তার এই ঈর্ষ্যা-বিকল, সন্দেহ-ধূমাকুল চিত্তে উপলব্ধির আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে; আত্মবিসর্জনের একটা প্রবল ঢেউ আসিয়া তাহার ইতর মনোবৃত্তি, স্বার্থরক্ষার প্রবল প্রচেষ্টা ও ক্ষয়কারী দুশ্চিন্তাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাব্য-কুহেলিকার মধ্যে শিপ্রাই সুস্পষ্ট চরিত্রাঙ্কনের একমাত্র নিদর্শন; কবিতা-প্লাবনের মধ্যে একমাত্র সেই পরিচিত মৃত্তিকা-স্পর্শ।

(২)

বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার জন্য গ্রন্থ-মধ্যে স্থানাভাব; বিশেষতঃ সেরূপ আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের যে কয়টি উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহাদের সাধারণ প্রবণতা ও ভঙ্গীবৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হইবে। তাঁহাদের ক্রমপরিণতির ধারা-অনুসরণও সংক্ষেপে সারা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা 'অকর্মণ্য' (জানুয়ারী, ১৯৩১), 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' (নভেম্বর, ১৯৩২), 'সানন্দা' (মে, ১৯৩৩), 'যেদিন ফুটলো কমল' (আগষ্ট, ১৯৩৩), 'অসূর্যম্পশ্যা' (ডিসেম্বর ১৯৩৩), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (মে, ১৯৩৪) ও 'বাসর-ঘর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) হইতে তাঁহার পরিণতির ধারা মোটামুটি বুঝা যাইবে। তাঁহার প্রথম তিনটি উপন্যাসে চরিত্রগুলি যেন reflections-এর স্রোতোবেগে ভাসমান তৃণগুচ্ছের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। 'সানন্দা'র সানন্দার চরিত্র-পরিকল্পনায় কতকটা মৌলিকতা থাকিলেও ইহাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা অপেক্ষা খামখেয়ালিরই প্রাধান্য। রবীন্দ্র-ভক্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক অনুযোগ, অনুকরণাত্মক সাহিত্য

বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, ধীরাজ, প্রসন্ন, পুরন্দর, চন্দ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কবি-যশঃপ্রার্থীদের অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ-চিত্র—ইহাদের মধ্যে ঝাঁজালো অথচ ছেলেমানুষি ব্যঙ্গ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'যেদিন ফুটলো কমল'-এই প্রথম কতকটা পাকা হাতের পরিচয় মিলে, উপন্যাসের গঠনও বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল চিন্তাধারায় কেন্দ্র-সংহতির পরিচয় দেয়। লেখক এলোমেলো চরিত্রসৃষ্টি ও reflections বর্জন করিয়া একটি নিবিড় অনুভূতিপূর্ণ প্রেমকাহিনীর পরিণতির দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন—নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও কাব্য-প্রতিবেশ হইতে স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিত্ব আছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' ও 'বাসর-ঘর'-এ এই কেন্দ্র-সংহতি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, যদিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যপ্রবণতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

'ধূসর গোধূলি' (নবেম্বর, ১৯৩৩) বুদ্ধদেবের প্রথম বয়সের রচনা হইলেও উহার মধ্যে পরিণত চরিত্র-ও-আবহ-পরিকল্পনার আশ্চর্য নিদর্শন আছে। অপর্ণার অপার্থিব ব্যঞ্জনাময়, আত্মা-সুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তাহা কল্পনার দিক দিয়া বাস্তবিকই অপূর্ব। এইরূপ দেহস্থূলতাহীন, ইঙ্গিত-ভাস্বর, স্বল্পতম প্রচেষ্টার আধারে বিধৃত সৌন্দর্যসার নিখুঁত পরিমিতিবোধ ও যথাযোগ্য বর্ণনাকুশলতার সাহায্যে আমাদের অনুভব-সংবেদ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই অপূর্ব রূপপরিকল্পনা তাহার আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করে নাই। কল্পনা-জগৎ হইতে কর্ম-জগতে আসিতে আসিতে উহার দীপ্তি অনিশ্চয়তার কুহেলিকাস্পর্শে ম্লান হইয়া গিয়াছে। উপক্রমণিকার প্রতিশ্রুতি মূল গ্রন্থে বিপর্যস্ত হইয়াছে। দাম্পত্য সম্পর্কে ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত ব্যবহারে সে প্রায় ছায়ার ন্যায় ধূসর ও অনির্দেশ্য। এই স্পর্শভীরু, রমণীয় ফুলটি ঔপন্যাসিক কল্পনার সুদূর উচ্চশাখায় চিত্তাকর্ষক লাগিয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতের সংঘাতময় পরিবেশে তাহার সৌন্দর্য অপেক্ষা অসহায় নিষ্ক্রিয়তাই অধিক ফুটিয়াছে। এই সুকুমার কল্পনা-স্বপ্ন বস্তু-অবয়বের সংহতি লাভ করে নাই।

নীলকণ্ঠ ভূমিকায় যেরূপ প্রগাঢ় প্রজ্ঞাঘন জীবন-সমীক্ষার পরিচয় দিয়াছে, উপন্যাসমধ্যে সেরূপ সক্রিয়তা দেখায় নাই। সে অপর্ণার মায়াময় সৌন্দর্যের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছে, জীবন-নৈকট্যে তাহার কোন আভাস দেয় নাই। সে বরাবর অপরিণতবুদ্ধি বালকই রহিয়া গিয়াছে। অর্পণা ও কল্যাণের প্রেমের উন্মেষ ও নিবিড়তা যে তাহার গ্রন্থ-জগতে সীমাবদ্ধ, বাস্তববোধহীন মনে কোন গভীর রেখাপাত করিয়াছে বা উহার রহস্য তাহার বোধগম্য হইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই। মায়ার সহিত তাহার সদ্যোবিকশিত প্রণয়মোহে অন্ততঃ তাহার দিক হইতে কোন সক্রিয় সাড়া মেলে না; এই কিশোর-প্রেমের কোন বিশেষত্বও লক্ষ্যগোচর হয় না। হয়ত অপর্ণার অপার্থিবমোহময় প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যের প্রতি নিমগ্নচিত্ত হওয়ার জন্য মায়ার কিশোরী-সুলভ সাধারণ আকর্ষণ তাহার মানস চেতনায় উদাসীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মোট কথা, নীলকণ্ঠ আখ্যায়িকার বক্তারূপে যে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আখ্যানমধ্যে তাহার আচরণ ও অনুভূতির কোন তীক্ষ্ণ গ্রহণশীলতা তাহার পোষকতা করে না। উপন্যাসে সে উপেক্ষিত, আত্মসত্তাহীন ছেলেমানুষ—এমন কি ব্যর্থ প্রেমিক রূপেও তাহার ব্যক্তিত্ব দীপ্ত হইয়া উঠে নাই। ভূমিকায় উপন্যাসের সমস্ত

ঘটনার যে তাৎপর্য তাহার গভীর অনুভূতি ও মূল্যায়ন-শক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়াছে, উপন্যাসে তাহার সক্রিয় অংশের মধ্যে তাহার এই ভাষ্যকারবৃত্তির কোন ক্ষীণ পূর্বাভাসও লক্ষিত হয় না।

কল্যাণকুমারই গ্রন্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও সক্রিয় চরিত্র। উপন্যাসের সমস্ত কিছু আলোড়ন তাহারই ব্যক্তিসত্তার অতি-সম্প্রসারণ-সঞ্জাত। তাহার খামখেয়ালি মেজাজ ও অশান্ত, আত্মপ্রসারণশীল প্রকৃতি যে দ্রুত পরিবর্তন-পরম্পরার সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র কেন্দ্রাশ্রয়ীরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহার প্রেম, বিলাত-যাত্রা, আচরণের উৎকেন্দ্রিকতা, স্ত্রীর প্রতি অসুস্থ সন্দেহপরায়ণতা ও শেষ পর্যন্ত উন্মাদরোগে পরিণতি—এই সমস্ত বিপর্যয়-স্তরগুলি যেন আকস্মিক ও কারণশৃঙ্খলাহীন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, অপর্ণার প্রতি তাহার প্রণয়োন্মেষ যেন তাহার সাধারণ খেয়ালি মনোভাব ও অশান্ত কামনার অব্যবস্থিতচিত্ততার আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সে অপর্ণাকে চাহিয়াছে যেন একটা নূতন ব্যঞ্জন-আস্বাদন বা নূতন বই বা আসবাব বা পোশাক কেনার মত—ইহার মধ্যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য আছে কিন্তু আকর্ষণের গভীরতা নাই। হয়ত এই উপন্যাসের জীবনব্যাখ্যাতা বালক নীলুর চোখে ইহার বেশী আর কিছু ধরা পড়ে নাই। লেখকও তাঁহার পরিণত জীবনবোধ দিয়া এই কাঁচা মনের অনুভবশক্তির অপূর্ণতার সংশোধন করেন নাই। বন্ধু বিনয়েন্দ্র, এমন কি বালক নীলু সম্বন্ধেও কল্যাণের যে ঈর্ষ্যা ও সংশয় জাগ্রত হইয়াছে তাহার বিসদৃশতার লেখক কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। কল্যাণকুমার তাহার সমস্ত দুরন্তপনা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি লইয়া উপন্যাসমধ্যে একটি দুর্বোধ্য প্রহেলিকাই রহিয়া গিয়াছে—অপর্ণার মত সম্পূর্ণ বিপরীত-চরিত্র মেয়ে যে কেমন করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এই মৌলিক প্রশ্নেরও কোন আলোচনা হয় নাই। যে বৃহৎকায় তিমিমৎস্যের পুচ্ছপ্রহারে এই ছোট সংসার-সরোবরটি মথিত হইয়া উঠিয়াছে সে অপরিচয়ের অতলজলনিমগ্ন থাকিয়াই আমাদের সমস্ত কৌতূহলকে অতৃপ্ত রাখিয়াছে।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—অধ্যাপক, তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি—ব্যক্তিসত্তাহীন; তাঁহারা জট পাকাইতে সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু উহার উন্মোচনের ব্যাপারে তাঁহারা কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

'পরিক্রমা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) একখানি বিশেষত্ববর্জিত, বিবৃতিপ্রধান উপন্যাস – কয়েকটি তাৎপর্যহীন প্রেমকাহিনী ও ব্যক্তিত্বহীন নর নারীর নিষ্প্রাণ সমাবেশ মাত্র। বরুণা ও প্রশান্ত, স্মিতা ও বিজন, কুঙ্কুম ও মল্লিকা—এই কয়েকটি দম্পতির, জীবন-পথে শুধু বহির্ঘটনানিয়ন্ত্রিত সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক মনোভাবের একটু সামান্য বিবরণ। ব্যর্থ প্রণয়ী ও বরুণা-ও-প্রশান্ত-পরিবারের বন্ধু সোমনাথের নিঃসঙ্গ, পূর্বস্মৃতিরোমন্থনে করুণ ও নূতন করিয়া বাঁচিবার সংকল্পে ক্ষণিক-উৎসাহ-দীপ্ত জীবনটির মধ্যেই সামান্য কিছু বিশ্লেষণ-প্রয়াস আছে। এই ঘটনাচক্রের অর্থহীন আবর্তনের মধ্যে যে জীবনসত্যটি ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই বাস্তব জীবনের মূর্ত প্রতীক।

জুলাই ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'কালো হাওয়া'য় বুদ্ধদেবের বাস্তবপ্রবণতা ও কাব্যাবেশবর্জন

যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। মনে হয় বুদ্ধদেব এতদিনে কাব্য হইতে উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন ও খাঁটি ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত আলোচনা-পদ্ধতি ও জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ভাষার আতিশয্যবর্জিত সংযম, মানস ঘাত-প্রতিঘাতের দৃঢ়, সুস্পষ্ট উপলব্ধি, বিশ্লেষণের সাবলীল নৈপুণ্য, ঘটনাপ্রবাহের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ—এই সমস্ত দিক্ দিয়াই পরিণতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অরিন্দম, হৈমন্তী, মিনি, বুলু, অরুণ, উজ্জ্বলা—অরিন্দমের পরিবার-বৃত্তের আদর্শবিরোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি-বিমুখতা-মিশ্র মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। সমগ্র পরিবারের জীবনযাত্রার উপর মা মহামায়ার সর্বনাশী প্রভাব ছায়াপাত করিয়াছে—তীব্র এসিডের মত ইহা পারিবারিক সংহতির স্নেহ-সূত্রকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া একটা নির্লিপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের এই নিবিড় শূন্যতা ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিয়া সমস্ত বাড়ির আকাশ-বাতাসে পক্ষবিস্তার করিয়াছে। হৈমন্তীর ধর্মোন্মাদে অভিভূত, অর্ধজড় ইচ্ছাশক্তি অতর্কিত উত্তেজনার বশে স্বামীর বুকে পিস্তল চালাইয়া এই আসন্ন বিপদের ছায়াকে বাস্তব রূপ দিয়াছে। এই সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে হৈমন্তীর চিত্তবিকার তাহার অস্বাভাবিক আত্মনিরোধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মননক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে—বাড়ির লোকের নিদারুণ বিক্ষোভ ও শশব্যস্ত ছুটাছুটি অর্থহীন খণ্ডদৃশ্যের ছায়াবাজির ন্যায় তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মনে প্রতিফলিত হইয়াছে। হৈমন্তীর এই অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া-পড়ার বর্ণনা কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বের অনুবর্তন—উভয় দিক্ দিয়াই প্রশংসনীয় হইয়াছে। বুদ্ধদেব-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা ও বাস্তব-বোধের অভাবের জন্য যে একটা অভিযোগ প্রচলিত আছে, বর্তমান উপন্যাস তাহার আংশিক খণ্ডন।

(৩)

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'তিথিডোর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯), 'নির্জন স্বাক্ষর' (জুলাই, ১৯৫১), 'শেষ পাণ্ডুলিপি' (অক্টোবর, ১৯৫৬), 'দুই ঢেউ এক নদী' (মে, ১৯৫৮), 'শোনপাংশু' (অক্টোবর, ১৯৫৯), 'হৃদয়ের জাগরণ' (জানুয়ারি, ১৯৬১) এই নূতন জীবনসমীক্ষারীতির পরিচয়বাহী। 'নির্জন স্বাক্ষর' ও 'শেষ পাণ্ডুলিপি' কবি-সাহিত্যিকের প্রেরণারহস্যবিষয়ক। ইহাদের মধ্যে গভীর অনুভূতি আছে, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-পরিণতি বিষয়ে উচ্চাঙ্গের শিল্পদক্ষতার পরিচয় নাই। প্রথমোক্ত উপন্যাসে সোমেন দত্ত একজন দুর্বল প্রকৃতির সাহিত্যিক—প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে নিজ আদর্শরক্ষার চারিত্রিক বল তাহার নাই। সে ব্যবসাদারের প্রচার-বিভাগে সস্তা বিজ্ঞাপন লিখিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তির অপচয় ঘটাইতেছে। পারিবারিক জীবনে সে তাহার প্রখরচরিত্রা স্ত্রী মীরার প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার রুচি ও হৃদয়াবেগের অবরুদ্ধ বিকাশের একমাত্র নিষ্ক্রমণপথ হইল মালতী সেনের প্রতি তাহার ভীরু বিহ্বল, অর্ধস্ফোটার প্রেমনিবেদনে। উপন্যাসের অধিকাংশ ব্যাপিয়া এই ধূসর, স্তিমিত, অবচেতন মনের অসংলগ্নতায় অস্পষ্ট, চাপা কণ্ঠের ফিস্‌ফিসানিতে আত্মপ্রত্যয়হীন প্রেমের বর্ণনা। ইহাতে যেন হৃদয় হইতে উপচাইয়া-পড়া আবেগের

ভাঙা-চোরা ঢেউগুলির মৃদু শিহরণ গাঁথা পড়িয়াছে ; অসংবরণীয় ভাবের এক একটি বুদ্‌বুদ্ যেন কণ্ঠের বাধা ছাড়াইয়া ঈষৎ উঁকি মারিয়াছে। এই সলজ্জ, কবিমনের দ্বিধা-জড়ান, প্রকাশ-অবদমনের সীমারেখায় অস্থিরভাবে কম্পমান প্রেমের চিত্রটি বেশ সুন্দর ও চরিত্রোপযোগী হইয়াছে। ইহার সহিত তুলনায় গ্রন্থের অন্যান্য অংশ বাহ্য বিবৃতি-পর্যায়ের। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার দ্বারা এই মনোবিকারপীড়িত সাহিত্যিক নিজ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়াছে। আত্মহত্যার পূর্বকালীন মানস উদ্‌ভ্রান্তির বর্ণনাও বেশ মনস্তত্ত্বসম্মত হইয়াছে। মীরার সহিত তাহার দাম্পত্য সম্পর্কের কাম-সম্মোহিত, অন্তরমিলনবঞ্চিত, স্ত্রীর প্রখরতর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিভূত, অস্বস্তিকর রূপটি খুব গভীরভাবে না হউক, সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়াছে।

'শেষ পাণ্ডুলিপি' সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যিকের জীবনীবিষয়ক। বীরেশ্বর গুপ্ত ছেলেবেলা হইতেই দুর্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের মানুষ। সে নীতিবন্ধনহীন আত্মরতির একনিষ্ঠ সাধক। বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার প্রতি তাহার রক্তগত প্রবণতা। অবশ্য তাহার বাল্যজীবনে পিতার নির্মম অত্যাচারমূলক শাসন ও তাহার মাতার অসহায় বশ্যতা-স্বীকার তাহার রক্তে এই বিদ্রোহের জ্বালা সঞ্চার করে। তাহার বাল্য প্রণয়িনী ও অধুনা তাহার বিমাতা বিধবা গৌরীর প্রতি তাহার লালসাময় দেহাকর্ষণ (অবশ্য এখানে প্ররোচনা গৌরীর দিক হইতেই আসিয়াছে) তাহার অসামাজিক দুঃসাহসের চরম নিদর্শন। এই চির-পবিত্র পারিবারিক সম্পর্কের স্পর্ধিত মর্যাদালঙ্ঘনই তাহার ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রস্তুতি রচনা করিয়াছে। তাহার স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি হৃদয়হীন অবজ্ঞা ও দায়িত্বের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি তাহার শ্রদ্ধাহীন প্রথম যৌবনের যথাযোগ্য পরিণতি। তাহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে সে যে তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে তাহাই তাহার স্বাভাবিক স্নেহহীন, সর্বপ্রকার সংযম ও কর্তব্যবোধ-অসহিষ্ণু, নিছক খুশী-খেয়ালে কাটানো মানস প্রবণতার চূড়ান্ত পরিচয়। অবশ্য সাহিত্যসাধনার অনিবার্য প্রয়োজনেই যে সে এইরূপ অস্বাভাবিক জীবননীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ থাকিলেও, তাহা পাঠকের গ্রহণযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থিত নয়। অপরিমিত ও সর্বগ্রাসী আত্মকেন্দ্রিকতাই এইরূপ আচরণের মূল উৎস।

উপন্যাসে যে বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহা তাহার কলেজ জীবনের বন্ধু, অধুনা অফিসে তাহার উপরিওয়ালা প্রফুল্ল ও তাহার স্ত্রী অর্চনার সহিত তাহার জীবন জড়াইয়া যাওয়ার কাহিনী। এই অস্থিরগতি সাহিত্যিক ধূমকেতু এই বন্ধুত্বের অক্ষরেখার চারিদিকেই উহার জ্বলন্ত পুচ্ছটিকে আবর্তিত করিয়াছে। এই সম্পর্কটি খুব আশ্চর্য ও অসাধারণ। প্রফুল্ল হয়ত তাহার বন্ধু মেজাজকে শান্ত, তাহার প্রজ্বলন্ত বিদ্রোহকে স্থির শিখায় দীপ্ত করার জন্য, সুস্থ, প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে তাহার বিদ্বেষতিক্ত সাহিত্যসাধনার পথকে মসৃণ ও মধুর করিবার উদ্দেশ্যেই, উহাকে নিজ পরিবার-ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল। সহৃদয় আলাপ-আলোচনা, সাহিত্য-বিচার প্রভৃতি রুচিকর, চিত্তবিনোদনকারী আয়োজনের সাহায্যে সে বন্ধুর সৃষ্টির মধ্যে একটি সহজ, কোমল, জ্বালাহীন সৌন্দর্যের সুর প্রবর্তন করিতে খুঁজিয়াছিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বীরেশ্বরের

মনে মানবের প্রতি অনাস্থা এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সে বন্ধুর সহৃদয়তাকে অনুগ্রহপ্রকাশের চেষ্টা মনে করিয়া উহার প্রতি বিরূপ ভাবই পোষণ করিল, এবং অর্চনার প্রতি তাহার আকর্ষণ একটা সর্বধ্বংসী, নির্লজ্জ দেহকামনার শিখায় জলিয়া উঠিল। একদিন অসংযত প্রবৃত্তির বিস্ফোরক শক্তিতে এই যত্নরচিত ব্যবস্থা-প্রাসাদ ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি প্রফুল্ল অবার বীরেশ্বরকে তাহার অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। শেষে এক রাত্রিতে পাতাল-পানে-ধাওয়া, মাতাল মনের বে-পরোয়া মোটর-চালনার ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটিল তাহার পরিণতিতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু ও বীরেশ্বরের মস্তিষ্কবিকৃতি এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের উপর যবনিকা পাত করিল। ইহার কিছুদিন পরে উন্মাদ চিকিৎসাগারে আশ্রয়-প্রাপ্ত বীরেশ্বরও আত্মহত্যার দ্বারা তাহার মনোবিকারজর্জর জীবনের অবসান ঘটাইল।

এই অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ বীরেশ্বরের আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লেখা। তাহার চিন্তা-ভাবনা, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার বাসনা কামনার নির্লজ্জ স্ফুরণ ও কুণ্ঠাহীন পরিতৃপ্তির বিলাসের কাহিনী এখানে বিবৃত। প্রফুল্ল ও অর্চনা তাহার আত্মরতির উপাদান, তাহার ভোগেচ্ছার ইন্ধনমাত্র—তাহাদের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নাই। যে তীব্র আলোক বীরেশ্বরের মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহারই ছায়ায় ইহারা অবগুণ্ঠিত। তাহাদের অদ্ভুত আচরণের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই—এমন কি তাহাদের আচরণ যে অস্বাভাবিক সে-সম্বন্ধেও বীরেশ্বর বিশেষ সচেতন নহে। কিন্তু বীরেশ্বরের চরিত্র-উদ্‌ঘাটন করার জন্যই প্রফুল্ল-অর্চনার মনোভাব পরিস্ফুট করার প্রয়োজন ছিল। প্রফুল্ল কেন তাহাকে এত অনুচিত প্রশ্রয় দিয়াছিল, অর্চনা কেন তাহার উগ্যত আলিঙ্গনকে প্রতিরোধের চেষ্টামাত্র করে নাই এবং সর্বোপরি প্রফুল্ল-অর্চনার দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি কি ছিল এই সমস্ত একান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে নাই। সুতরাং সমস্ত ঘটনাটি যেন পাগলের সঙ্গে পাগলামির অভিনয় বলিয়াই ঠেকে। অন্ততঃ সাহিত্যিক হিসাবেও বীরেশ্বরের বন্ধুদম্পতির মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণবিষয়ে কিছু কৌতূহল দেখান উচিত ছিল। কিন্তু তাহার আত্মকেন্দ্রিকতার আতিশয্যই তাহার মানবিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অগত্যা পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে যে, প্রফুল্ল-অর্চনার দাম্পত্য সম্পর্কে কোথায়ও একটা দুশ্চিকিৎস্য বিকার ছিল। তাহাদের দুইটি ছেলেমেয়ে থাকার সংবাদ পাই, সুতরাং তাহাদের দৈহিক মিলনে কোন বাধা ছিল না এ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। কিন্তু এই সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, সর্বপ্রকার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে বেষ্টিত ও পরস্পরের প্রতি অন্ততঃ প্রীতি-সৌজন্য-সূত্রে আবদ্ধ দম্পতির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা কেন এই প্রশ্ন আমাদের চিত্তকে মথিত করে। উপন্যাস হিসাবে ইহাই গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

এক বিশেষ ধরনের উৎকেন্দ্রিক সাহিত্যিকের জীবনবাদের সুন্দর পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। জীবনসমীক্ষায় মনীষার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাণে মিলে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ইহাতে সাহিত্যিকের মনোজীবনের একটি সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায়।

'দুই ঢেউ এক নদী' (মে, ১৯৫৮) একই পরিবারের দুই ভাই-বোনের প্রণয়ের কাহিনী। অরুণা ও অশোক পিতামাতার অমতে বিবাহ করিয়াছে। পিতা ক্রোধোন্মত্ত,

মাতা রোরুদ্যমানা। সংঘর্ষের পটভূমিকা মামুলি ধরনের—ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অভিভাবকত্বের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুপরিচিত কথাকাটাকাটি, যুক্তি-তর্কের ঘাত-প্রতিঘাত। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, শব্দপারিপাট্য ও ভাষাপ্রয়োগনৈপুণ্য ছাড়া। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী মেয়ের নিকট মায়ের পাঠান অর্থ-সাহায্য ক্ষমার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসমধ্যে আসল আকর্ষণ হইল সুমন্ত্র ও মায়ার পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে তাহাদের হৃদয়-রহস্য উন্মোচন। শিলং ও ঢাকার মধ্যে চিঠির যাতায়াতে দুইটি তরুণ প্রাণের একটি মোহময় প্রীতি-ব্যাকুলতা ও সান্নিধ্য-আকূতি ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করিয়াছে। এই পত্রগুলি উভয় দিক হইতেই একটি সরল, নির্দোষ, প্রায় অজ্ঞাতসারে উন্মেষিত হৃদয়াবেগকে পরিস্ফুট করিয়াছে। এই অলক্ষিত প্রীতিসঞ্চার আবেগের আতিশয্যে আবিল বা সচেতন কামনার উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত নহে, সংসারের আর পাঁচটা ছোট খবর দিবার মধ্যে মনের সুকুমার রুচি ও ভাবনার পরিচয়-ব্যপদেশে যেন একটা গভীর অনুভূতি ক্রমোদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই অকালপক্বতা ও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের যুগে এই পত্রগুলি অন্তর-কৌমার্যে শুচিশুভ্র চন্দনপ্রলেপের ন্যায়, সদ্যোবিকশিত ফুলের তাজা গন্ধের ন্যায় সমস্ত আবহাওয়াকে সুরভিত করিতেছে। এই কিশোর প্রেমের পূর্ণ-বিকশিত পরিণতি দেখান হয় নাই, কিন্তু ইহার মধুর সম্ভাবনাই উপন্যাসটির উপর একটি নির্মল শরৎ-রৌদ্রের আভা বিছাইয়া দিয়াছে।

'শোনপাংশু' (অক্টোবর, ১৯৫৯) একটি কৃত্রিম-আদর্শ-ভিত্তিক, নানা জটিল বিধি-নিষেধের জালে অবরুদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাহিনী। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা তাঁহাদের অতিনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার জন্য ও কর্তৃপক্ষের অনমনীয় নিয়ম-কানুনের চাপে অল্পবিস্তর বিকৃত মনোবৃত্তি অর্জন করিয়াছে। গুজবের অবাধ বিস্তার ও পরস্পরের জীবন সম্বন্ধে অ-শালীন কৌতূহল এখানকার আকাশ-বাতাসে এক দূষিত চক্র রচনা করিয়াছে। কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে নারীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুভদ্রাদেবী ও সম্পাদক নিত্যানন্দ মজুমদার একপ্রকার সন্দেহপরায়ণ, বক্রকুটিল, যন্ত্রমনোভাবের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে বেণীমাধব ও লোকেন, দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী হইয়াও, মনোবিকার ও জীবনে আস্থাহীনতার দিক্ দিয়া একই ভিত্তিভূমিতে দণ্ডায়মান। অপর দিকে বন্ধন-অসহিষ্ণু, খোলামেলা মেজাজের মানুষ নবেন্দু গুপ্ত তাঁহার অসতর্ক কথাবার্তা ও বে-পরোয়া আচরণের জন্য সেখানকার সমাজের নিন্দাভাজন হইয়াছেন ও ভিন্নদলের অধ্যাপকের প্ররোচনায় ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হইয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুস্থ জীবনবোধ, তরুণসুলভ প্রণয়াকর্ষণ ও মানবিক স্নেহমমতা এই নিয়মতান্ত্রিক মরুভূমির মধ্যে একমাত্র মরূদ্যান, ডঃ মুখার্জির পরিবারে বিকশিত হইয়াছে। এই পরিবারটি অন্তসকলের সমবেত আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে। অভিজিৎ ও মালতীর নিষিদ্ধ প্রেমই এই ছকবাঁধা বিদ্যায়তনে এক তুমুল বিস্ফোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। এই আখ্যায়িকার যে প্রবক্তা সে একজন তরুণ অধ্যাপক—তাহার বিস্ময়ক্ষুব্ধ, ঘৃণাস্তম্ভিত মনোভাবই এই অকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বিকৃতি-উদ্ঘাটনে সহায়তা করিয়াছে। সবশুদ্ধ উপন্যাসটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়—ইহার ঘটনাগুলি যেন আকস্মিকতার সূত্রে গ্রথিত। মোটের উপর জীবনের যে

রূপ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও কোন গভীর-তাৎপর্যবাহী নয়। খণ্ডদৃশ্যচিত্রণে কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইহার চরিত্রায়ন ঘটনানিয়ন্ত্রিত ও বহিরঙ্গমূলক।

'হৃদয়ের জাগরণ' (মার্চ, ১৯৬১) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রচিত তিনটি ক্ষুদ্র আখ্যানের সংকলন। 'আদর্শ' গল্পে অনিমেষের দাম্পত্যজীবনের প্রতি অদ্ভুত ও অকারণ বিতৃষ্ণা বর্ণনীয় বিষয়। স্ত্রী রমলা—ছায়াচিত্রের একজন উজ্জ্বল তারকা—তাহাকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিতে ব্যগ্র। কিন্তু অনিমেষ তাহার উদ্যত আলিঙ্গনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে ফিরিয়াছে। তাহার সৃজ্যমান মহা-উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে তাহার জীবনাদর্শের কিছুটা অনুমান করা যায়। সে পৃথিবীর কলুষক্লিন্ন, পাপচক্রে অনিবার্যভাবে ঘূর্ণিত, অশুভ পরিণতির আকর্ষণে অধোগামী জীবনযাত্রার মধ্যে এক নির্মল, নির্লিপ্ত জীবন-প্রতিষ্ঠার অভিলাষী; বৃষ্টিতে ঝাপসা সমস্ত স্থূল-উপাদানহীন প্রতিবেশের মধ্যে শুদ্ধ অস্তিত্বের আনন্দ-আস্বাদন-প্রয়াসী, ও নিজ ব্যক্তিজীবনে প্রেমের আদিম, বিশ্বরহস্যের অন্তর্লীন অনুভবের পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প। তাহার এই আদর্শের সঙ্গে রমলার আদর্শের মিল নাই বলিয়াই তাহাদের মিলন অবাঞ্ছিত ও অসম্ভব। ইহা চমৎকার কাব্যানুভূতি, কিন্তু উপন্যাসের বস্তুনির্ভর আধারে এই ভাবমুক্তা যেন যথাযোগ্য আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই।

'সার্থকতা'-র সিতাংশু ও অমলার প্রীতি-স্নিগ্ধ সম্পর্কটি মনোজ্ঞ হইলেও মৌলিকতাহীন। এই হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত প্রণয়কাহিনীটি মামুলি কাঠামোতেই রক্ষিত। সিতাংশুর অবদমিত মনের আকস্মিক জাগরণ ও অমলার গণিকাবৃত্তি-অবলম্বনের মধ্যেও নিষ্পাপ সরলতার সংরক্ষণ গতানুগতিকতার মধ্যে কিছুটা নূতনত্বের স্বাদ আনে। কাঠের গোলার কেরাণী কুঞ্জর চরিত্রে কতকটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু নায়ক-নায়িকা যেন বাতিল-হইয়া-যাওয়া অতীতের স্মারকরূপেই প্রতিভাত হয়।

'হৃদয়ের জাগরণ'—একটি মেয়েলি সংসারের কাহিনী। এই পরিবারে তিন ভগ্নী ও এক ভাই বাস করে, কিন্তু ভাইটি লুপ্ত-অকারের ন্যায় প্রায় উহ্যই রহিয়াছে। এই পরিবার-মণ্ডলীতে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশ-সূত্রে আগন্তুক একটি মহিলা ও একটি চোদ্দ বৎসরের বালক গল্প মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। অমিতা ও রমেনের পূর্বনির্ধারিত, বাগ্‌দত্ত সম্পর্কের বিবাহে পরিণতির অনিশ্চয়তা গল্পটির বস্তু-সংস্থান ও ভাবস্পন্দনের মূলীভূত কারণ। রমেন একটি দুর্বলচরিত্র, শিথিলসংকল্প ও নানা বিরুদ্ধ প্রভাবের বশীভূত পুরুষরূপে পরিকল্পিত। অমিতার প্রতি তাহার আকর্ষণ কৃতজ্ঞতার, হৃদয়াবেগের নয়। সে বারবার অমিতার প্রতি নিজ বিশ্বস্ততার ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু বারবার তাহার মন পাত্রান্তরন্যস্ত হইয়াছে। প্রথম সে মালিনীর সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত কলিকাতার বড় ব্যারিস্টারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার চরিত্রের অসারতার প্রমাণ দিয়াছে। অমিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুরমা খানিকটা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। চরিত্র ও কাহিনীর অস্পষ্টতার প্রধান কারণ এক প্রণয়রহস্যানভিজ্ঞ বালকের মধ্যবর্তিতায় উহাদের উপস্থাপনা। সত্যই বারীনের পক্ষে এই অন্তরনাটকের পরিবর্তনশীল দৃশ্যগুলি অনুসরণ করা ও উহাদের তাৎপর্য অনুভব করা অসম্ভব। সে অনেকটা বিমূঢ়ভাবে, ভিতরের কথা না বুঝিয়াই ঘটনাপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়াছে

ও তাহার এই উপলব্ধিহীন তথ্যবিবৃতিকেই পাঠককে মানিয়া লইতে হইয়াছে। সুতরাং অমিতার নীরব নিষ্ক্রিয়তা ও শুষ্ক বিষণ্ণতা যেমন তাহার, তেমনি পাঠকের নিকট দুর্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। রমেন ও মালিনীর আচরণের বাহ্য চটুলতার অস্বাভাবিক ভাবস্ফীতি তাহার চোখে পড়িয়াছে কিন্তু তাহার অনভিজ্ঞতার জন্য ইহার পূর্ণ অর্থ তাহার বোধগম্য হয় নাই। মাঝে মধ্যে তাহার অকালপক্বতার নিদর্শন পাওয়া গেলেও সে মোটের উপর অন্তঃসলিলা প্রেমকাহিনীর প্রবক্তাহিসাবে ঠিক উপযোগী পাত্র নয়। বালকের উপর এই দুর্নিরীক্ষ্য হৃদয়-সংঘাতের ছন্দ-নিরূপণের ভার দিয়া লেখক নিজের ভার লঘু করিয়াছেন ও পাঠককে একটা অর্ধপক্ব ভোজ্য-বস্তু উপহার দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'তিথিডোর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)—কলিকাতার মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের অপূর্বরসসমৃদ্ধ আলেখ্য। আধুনিক যুগে পারিবারিক জীবনযাত্রার ছন্দটি সূক্ষ্ম অথচ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের ও ভাইবোনের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবারস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তির রুচি-আদর্শ ও ব্যক্তিত্ববিকাশের স্পৃহা, ঘরের মধ্যে বাহিরের আনাগোনা, শৈশবকল্পনা ও কৈশোরস্বপ্নের বিচিত্র রূপ, সবশুদ্ধ মিলিয়া পরিবারজীবনের সামগ্রিক সত্তা ও পরিবারভুক্ত মানুষগুলির উপর উহার প্রভাব এ-যুগে এক বিশিষ্ট ছাঁচের অনুবর্তন করিতেছে। মানুষের আদিম বৃত্তিগুলি, স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা-বন্ধুত্ব-বিরাগ প্রকৃতিধর্মে অক্ষুণ্ণ কিন্তু প্রয়োগে নূতন রং রেখাচিহ্নিত। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এই নূতন ছন্দের পরিবারজীবন উহার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ও ভাবপ্রবাহ লইয়া চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গৃহকর্তা রাজেনবাবু উদার, স্নেহশীল, আত্মবিলুপ্তি-প্রবণ চরিত্রটি সমস্ত পরিবারজীবনের ভাবরূপ নির্মাণ করিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী শিশিরকণার অকালমৃত্যুর পর রাজেনবাবু পিতার কর্তব্য ও মাতার প্রশ্রয় একসঙ্গে মিশাইয়া তাঁহার অবিবাহিতা দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলের মানুষ করার দায়িত্ব লইলেন। অবশ্য স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বেই তিনটি বড় মেয়ে শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও সরস্বতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে ও তাহারা শ্বশুরবাড়িতে বাস করিতেছে। শাশ্বতীর সঙ্গে উগ্র কমিউনিস্ট হারীতের বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু এই অত্যন্ত কেজো ও নিঃসংকোচ জামাতাটিকে রাজেনবাবু ঠিক অনুমোদনের চক্ষে দেখিলেন না। এই প্রেমের দ্রুত, মানসউত্তেজনাহীন পরিণতিতে কিন্তু পূর্বরাগের রং সেরূপ ফুটিয়া উঠিল না।

এই পরিবারের পঞ্চভগ্নীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট স্বাতীই উপন্যাসের নায়িকা—অন্যান্য ভগ্নী যেন পার্শ্বচরিত্রের ন্যায় তাহাকেই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিবার কাজে সহায়তা করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ আকাশ-পটভূমিকায় স্বাতী-নক্ষত্রই যেন নারীত্ব-বিকাশের পূর্ণ দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্বেতা তাহার কোমল, স্নেহপূর্ণ অন্তঃকরণ, পরিচর্যাপটুতা ও একদা-সুখী ও পরে বিয়োগাতুর দাম্পত্যজীবন লইয়া একটি শান্ত, বিষণ্ণ শ্রীমণ্ডিত। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যা—মহাশ্বেতা ও সরস্বতী—অনেকটা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে—তাহাদের পারিবারিক স্থান-পূরণের অতিরিক্ত ব্যক্তিসত্তা অবিকশিতই রহিয়াছে। শাশ্বতী ও হারীতের বিবাহিত জীবনের সবিস্তার বর্ণনা আমরা পাই, কিন্তু ইহাতে দাম্পত্য প্রণয়াবেগের চিহ্নমাত্র নাই—ইহা উগ্র রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন স্বামীর

প্রখর নিয়ন্ত্রণের নিকট অসহায়া স্ত্রীর অবদমিত সত্তার ক্ষুণ্ণ আত্মসমর্পণ। শাশ্বতী বাহ্য তৃপ্তির অন্তরালে অন্তরের চাপা বেদনার বোঝা নিঃশব্দে বহন করিয়াছে—মাঝে মধ্যে কোন সম্ভাবিত প্রেমের আবির্ভাবের জন্য সে যেন সচকিত ও অনির্দেশ্য প্রতীক্ষা-কণ্টকিত। মজুমদার কর্তৃক স্বাতীর চিত্তজয়-প্রয়াসের মধ্যে সে যেন দৌত্যকার্য ছাড়াও আরও অন্তরঙ্গ সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত—প্রেমনিবেদনটা তাহার ভগ্নীর প্রতি প্রযুক্ত না হইয়া তাহার নিজের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও সে যেন খুব আশ্চর্য হইত না।

এই গার্হস্থ্য পটভূমিকার মধ্যে স্বাতীর শৈশব হইতে পূর্ণনারীত্বের বিকাশ পর্যন্ত বিবর্তনের সমস্ত স্তরগুলি আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত সুবিন্যস্ত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের মাতৃহীন শিশু তাহার ভবিষ্যৎ জামাইবাবু অরুণকে বিবাহ করিবার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করিয়া তাহার সদ্য-উন্মেষিত মনের প্রথম অবোধ কামনার পরিচয় দিয়াছে। বাবার আদর, পিঠাপিঠি ভাই ও বোনের সহিত ঝগড়া, নিজের স্বতন্ত্র রুচি ও ইচ্ছার একরোখা প্রকাশ, বাড়ির ছোটখাট অতিথি-সম্মেলনে স্বাধীন মন্তব্যের ঔদ্ধত্য এই-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোড়নের ভিতর দিয়া তাহার শৈশবপর্ব কৈশোর-সন্ধিক্ষণের প্রাথমিক আত্মস্থতায় পৌঁছিয়াছে। এই স্তরে তাহার মধ্যে একটা আত্মনির্ভর নিঃসঙ্গতা-প্রীতির আভাস দেখা দিয়াছে। তাহার চতুর্দশ জন্মতিথি-উৎসব-পালনের সহিত তাহার শৈশবজীবনের পরিসমাপ্তি।

শাশ্বতীর বিবাহ স্বাতীর মনকে ততটা নাড়া দেয় নাই—কিন্তু এই বিবাহ উপলক্ষ্যে পারিবারিক সম্মিলন, তাহার দিদিদের সান্নিধ্য ও শাশ্বতীর শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা তাহার অনুভূতিকে আনন্দ-বেদনার অজ্ঞাতপূর্ব উচ্ছ্বাসে কিছুটা প্রসারিত করিয়াছে। এইবার সে গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডি পার হইয়া কলেজ-জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু কলেজ-জীবনের সঙ্গিনীরা, উহাদের চটুল সংলাপ ও যৌন আকর্ষণের বক্র ইঙ্গিত তাহার কুমারী-মনকে স্পর্শ করে নাই।

এই কলেজ-জীবনেই সাহিত্যরস-আস্বাদনের প্রণালী বাহিয়া তাহার মনে প্রথম প্রেমের চেতনা জাগিয়াছে। কাব্য-উপভোগের মৃণাল-মূল যে রস আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতেই তাহার কুমারী অন্তরে প্রেমের পদ্ম বিকশিত হইয়াছে। একই ব্যক্তি—অধ্যাপক সত্যেন—তাহার মনে উভয়বিধ রস সঞ্চার করিয়াছে। স্বাতীর অন্তরে এই প্রেমোন্মেষের ক্রমবিকাশ খুব সহজ ও স্বাভাবিক পথেই ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন তীব্র সংঘাত, কোন অতিরিক্ত মানস উত্তেজনা, নাটকীয় পরিণতি বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিহ্নমাত্র নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক তরুণ মনের কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস বা দেহ-লালসার উত্তপ্ত জরবিকার হইতে মুক্ত। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, সাহিত্যচিন্তার বিনিময়, পরস্পরের সান্নিধ্যের জন্য মৃদু আকর্ষণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবসে বিষাদভারাবনত মন লইয়া উভয়ের রবীন্দ্র-ভবনে তীর্থযাত্রা প্রভৃতি অতি ঘরোয়া মেলামেশার ফলে এই প্রেম ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ফুল যেমন পাতার আড়ালে, আকাশ ও মৃত্তিকার নীরব দাক্ষিণ্যে, কোমল ও নমনীয় বৃন্তের আশ্রয়ে রক্তিম লাবণ্যে ভরিয়া উঠে, এই সরল, শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ, আত্ম-অবিশ্বাসে কম্পিতবক্ষ প্রণয়ীযুগল সেইরূপে নিজ নিজ হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌমার্য-সুরভিত, শুভ্র-শুচি অন্তর-নির্যাসে যে দিব্যরূপটি উপন্যাসে

ফুটিয়াছে তাহা সমস্ত প্রণয়-সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। ইহার মুগ্ধ ভাবরোমন্থন, ইহার আত্মগত ভাবনার মৃদু কলধ্বনি, ইহার শান্ত, বহির্বিক্ষেপহীন আবেষ্টনীর স্নিগ্ধ স্পর্শ ইহাকে এক অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। দক্ষিণা বাতাস যেমন নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলে সূক্ষ্ম কম্পনরেখা জাগাইয়া উহার শান্তিকে গাঢ়তর করে, তেমনি বাহিরের অভিজ্ঞতার অভিঘাত প্রণয়ীযুগলের অন্তরের ভাবঘন অনুভূতিকে আরও আত্মসমাহিত নিশ্চয়তার স্থিরত্ব দিয়াছে।

যে ঘটনা-পরিবেশ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবের আধার রচনা করিয়াছে তাহা গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলের একটি নিখুঁত, নিচ্ছিদ্র রূপায়ণ। যে-যুগে রাজনীতি সামাজিক আদর্শের মতবিরোধ পরিবার-জীবনকে প্রায় গ্রাস করিতে চলিয়াছে, সে-যুগে এরূপ একটি গার্হস্থ্যরস-সর্বস্ব জীবনচিত্রণ এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। এমন কি হারীতের কমিউনিস্ট মতবাদ এই জীবনপরিবেশে কোন আশ্রয় না পাইয়া প্রক্ষিপ্ত একক্ভাষণের (Soliloquy) মত শোনাইয়াছে পরিবারের সুখমিলন, আত্মীয়বর্গের হাস্য-পরিহাস, ছেলেপিলের দৌরাত্ম্য, ভাই-বোনের অর্ধকৃত্রিম, স্নেহের ফাঁকে উৎসারিত কলহ, অতীত পারিবারিক ঘটনার স্মৃতি-রোমন্থন, খাওয়া ও খাওয়ানর তৃপ্তি, উৎসবের অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস—এই সব ঘরোয়া কথাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিবাহের অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের সুবিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বাসরঘরের সরস মুখরতা, কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উৎসাহাধিক্য, এমন কি বিবাহের ভাড়াটে বাড়ি হইতে নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় টুকরা টুকরা কথা ও বাক্যহীন অনুভূতিসমূহের অসংলগ্ন খণ্ডাংশ—সবে মিলিয়া গৃহদেবতার যে আরতি-অর্ঘ্য রচিত হইয়াছে তাহা এই ঘরছাড়া, পথচলা যুগে এক বিস্মৃতপ্রায় অনুষ্ঠানের বিস্ময়কর পুনরুদ্বোধন।

(৪)

অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির ধারা 'বেদে', 'ঊর্ণনাভ' (জুলাই, ১৯৩৩) ও 'আসমুদ্র' (জুন, ১৯৩৪) এই উপন্যাস কয়েকটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 'বেদে' ও 'টুটা-ফুটা' নামক একটি ছোট গল্পের সমষ্টিতে লেখক জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্য-পিষ্ট, বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ, পাপ-পিচ্ছিল দিকের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা দেখাইয়াছেন। ইংরেজী রোমান্টিক যুগে Byronism-এর মত আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ইহা একটা pose বা বাহ্যাড়ম্বর। দারিদ্র্য ও জীবনের অবিচারের বিরুদ্ধে একটা তিক্ত, নৈরাশ্যমূলক ক্ষোভ ও উদ্ধত নৈতিক বিদ্রোহ—আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিকদের অন্তঃরুদ্ধ বাষ্পনিষ্কাশনের একটা পথ ও সুলভ উপায় মাত্র। কিন্তু এই ক্ষোভের মধ্যে সহজ আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপেক্ষা সাড়ম্বর বিদ্রোহ-ঘোষণা ও বাস্তবের সীমাতিক্রমকারী অতিরঞ্জনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর অভাবও এই কুৎসিত-প্রবণতার আর একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও হৃদয়হীন সমাজ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান যে সকল সময়েই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারে না, বিষয়-নির্বাচনের উপরেই যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না, এই সম্ভাবনার প্রতি আমাদের তরুণ সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সজাগ আছেন বলিয়া মনে হয় না। আবার এই কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যসঞ্চার, বীভৎসতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুষমার গোপন প্রবাহ—ইহাও এই প্রকার বিষয়-নির্বাচনের পক্ষে একটা প্রবল

আকর্ষণ। 'বেদে' উপন্যাসে 'বাতাসী' অধ্যায় এইরূপ কাব্য সুষমামণ্ডিত। অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী পরিণতি লক্ষ্য করিলে ইহাই মনে হয় যে, বীভৎসতার প্রতি তাঁহার কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, বরং কুৎসিতের ঊষর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিযা এক দুরধিগম্য সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার প্রকৃত কাম্য।

'আকস্মিক' (১৯৩০) 'বেদের' ঠিক পরবর্তী রচনা বলিযা মনে হয। 'বেদের' বীভৎস অশ্লীলতা ইহার নাই, কিন্তু গণিকাজীবনই ইহার উপজীব্য। চরিত্র-পরিকল্পনা, ঘটনা-সন্নিবেশ ও জীবন-সমালোচনা সর্বত্রই আকস্মিকতার অতি-প্রাদুর্ভাব, কারণ শৃঙ্খলার একান্ত অভাব উপন্যাসটিকে অন্বর্থনামা করিযাছে। গ্রন্থের চরিত্রগুলির জীবনযাত্রা যেন মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। শশী দামিনীকে খুন করিযা বেকসুর উধাও হইল, মাতালেরা তাড়ি খাইযা জীবন্ত মানুষ নিকুঞ্জকে পোড়াইল। এখানে আইন নিষ্ক্রিয, সমাজ নীরব, বিবেক-দংশন মূক। নিকুঞ্জের স্ত্রী কুঞ্জ গণিকা হইতে অকস্মাৎ পাতিব্রত্যধর্মের প্রতীকে রূপান্তরিত হইযাছে। সে পঞ্চুর আশ্রয়ে আসিযাও নিজ সতীত্ব রক্ষা করিযাছে। এদিকে আবার রাখুর প্রতি তাহার সর্বগ্রাসী অপত্যস্নেহ ভাববিলাসের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রাবলীর মধ্যে এক পঞ্চুই জীবন্ত সৃষ্টি—তাহার নীড় বাঁধিবার করুণ আগ্রহ ও নিদারুণ মোহভঙ্গ তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনার উদ্রেক করে। উপন্যাসের মধ্যে নিছক খামখেযালী ছাড়া কোনও গভীরতর উদ্দেশ্যের সন্ধান মিলে না।

'কাকজ্যোৎস্না উপন্যাসে ভাব-সংহতির দিক্ দিযা কিছু উন্নতি দেখা গেলেও, চরিত্র-চিত্রণে, পাত্র-পাত্রীর আচরণে উদ্ভট অস্বাভাবিকতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। প্রদীপ ও অজয় উভযেই বিধবা নমিতার নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধী—অজয়ের তীব্র সমালোচনার সহিত তুলনায প্রদীপ অনেকটা এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের প্রতি ক্ষমাশীল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, একদিন প্রদীপ যে রুদ্ধদ্বার ঘরে নমিতা সাড়ম্বর স্বামীপূজার ব্যর্থ, অতৃপ্তিকর অভিনয়ে নিযুক্ত ছিল সেখানে উন্মত্ত ঝড়ের মত প্রবেশ করিযা তাহার পূজোপকরণসমূহকে পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড করিযাছে ও সমাজবন্ধন প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। তার পরের দিন নমিতা যখন গৃহত্যাগে তাহার সঙ্গী হইবার জন্য প্রদীপকে আমন্ত্রণ পাঠাইযাছে, তখন প্রদীপের সমস্ত বীরত্বের আস্ফালন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে ও নিতান্ত সাধারণ হিসাবী মানুষের ন্যাযই সে ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করিযা দুঃসাহসিকতার এই আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছে। তাহার মনের তাপমানযন্ত্রে পারদের এই উত্থান-পতন সম্পূর্ণ কারণহীন ও আকস্মিক বলিযাই ঠেকে।

'প্রচ্ছদপট (১৯৩৪) উপন্যাসটি মূলতঃ কাব্যধর্মী—শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ, প্রেম ও বিবাহে পরিণতির কাব্যোচ্ছ্বাসময় বিবরণ ইহার প্রথমাংশের আলোচ্য বিষয়। পরবর্তী-স্তরে শ্রীপর্ণার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র আদিত্যের প্রতি তাহার অপত্যস্নেহের অপরিমিত আতিশয্য এই নবজাত দাম্পত্য প্রেমকে অভিভূত করিযাছে। এই উভয়বিধ আকর্ষণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষভাবে বিশ্লেষণকুশলতার দাবি করে—এইখানেই লেখক প্রত্যাশিত পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। প্রেমের প্রবল জোয়ারের মধ্যে যে মতদ্বৈধ ও অনৈক্যের বীজ নিহিত ছিল, উভয়ের চরিত্রের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যের আভাস আত্মগোপন করিযাছিল

লেখক তাহার কোন পূর্বসূচনাই দিতে পারেন নাই। পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে কেহই কোন চেষ্টা করে নাই—আদিত্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমিক-প্রেমিকা যেন পরস্পরের সম্মতিক্রমেই দূরে সরিয়া গিয়াছে। সাংকেতিকতার অতি-প্রাদুর্ভাব শ্রীপর্ণা-মরঞ্জনের ব্যক্তিত্বকে শীর্ণ করিয়াছে—তাহাদের ব্যবহারের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া অপেক্ষা স্বপ্নাভিভূত, যান্ত্রিক আড়ষ্টতাই বেশি প্রকট হইয়াছে। প্রত্যেক বাক্য ও কার্য, প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে আত্মার বিচ্ছুরণ আরোপ করিতে গেলে মানুষ যেন "আত্মদৈত্যের" হাতের অসহায় ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। উপন্যাসটিতে কাব্যধর্মী সাংকেতিকতার প্রভাবে সচেতন বিশ্লেষণ সম্মোহিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

'উর্ণনাভ' উপন্যাসটির পরিকল্পনার মৌলিকতা অচিন্ত্যকুমারের অগ্রগতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ—ইহার মধ্যে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। এক তরুণ কবি দারিদ্র্যের শোষণকারী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্নেহপরায়ণ অভিভাবকত্বের নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কবিজীবনের সমস্যা মেটে নাই। দারিদ্র্যের অভিঘাত ও অভিভাবকের স্নেহাঞ্চল—ইহার মধ্যে কোন্‌টা কবি-প্রতিভা বিকাশের কম অনুকূল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, বিশেষতঃ যখন ইহাদের মধ্যে প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় আবির্ভাব জীবনে ও কবিতায় এক দারুণ অসামঞ্জস্য ও উন্মত্ত বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। কুবেরের কাব্যজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের এই ইতিহাস উপন্যাসের বিষয়-হিসাবে চমৎকার মৌলিকতার দাবি করিতে পারে—তাহার কাব্যবিকাশের ক্রমিক স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেয়। তাহার প্রথম কাব্যপ্রেরণা আসিয়াছে শহর ও তাহার বিচিত্র বৈপরীত্যের উৎস হইতে। তারপর তাহার কবিতার অভিজাত নির্জনতা ভঙ্গ হইল গদ্যের গণতান্ত্রিক কোলাহলে, এবং সাহিত্যিক ব্যবসায়বুদ্ধির নিকট আত্মসমর্পণের ফলে তাহাকে 'নিজের অনুভূতির চূড়া থেকে জন-সাধারণের সহজ-বোধ্যতায়' অবতরণ করিতে হইল। 'বিষুবিয়সের জ্বালা'য় বসে সে প্রকৃতির উদার স্নেহের কথা লিখ্‌তে পারলো না, কাঁটায় যে শুয়ে আছে তার কাছে ফুলের কথা শুনতে চাওয়া পাগলামি'। সুশান্তের আরামপূর্ণ আশ্রয়-লাভের পর তাহার কাব্যজীবনে পরিবর্তনের তৃতীয় স্তর উন্মুক্ত হইল—জীবন হইতে কোনরূপ উত্তেজনা বা চাপ না পাইয়া, কোন অনুভূতির তীব্র তাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার সাহিত্যসাধনার উপর শূন্যতার মৃত্যু-নীরবতা নামিয়া আসিল। বেবির সহিত পরিচয়ে তাহার কাব্য ও ব্যক্তিগত জীবনে এই নিশ্চেষ্টতার অবসান হইয়া প্রবল বিপ্লবের প্লাবন আসিল। 'কুবের আবার তার শিরা-স্নায়ুতে কবিতার কান্না শুনতে পেলো'। আবার বেবি যে নিছক কবিতার বিষয় নয়, সে যে বিশেষ একটি নারী, সে যে কুবেরের মনে কেবল কবিতা জাগায় তাহা নয়, তাহার অমিত, বলদৃপ্ত যৌবনকে উদ্দীপিত করে—এই অতর্কিত উপলব্ধি তাহার মধ্যে এক অননুভূত-পূর্ব বিহ্বলতা আনিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে সুশান্তর নিশ্ছিদ্র অভিভাবকত্ব ও এই অভিভাবকত্ব মানিয়া চলায় তাহার প্রতি বেবির তীব্র ঘৃণা তাহার অন্তর্বিপ্লবকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কুবেরের নূতন প্রেম-কবিতা হইতে একটা তীব্র অগ্নি-দীপ্তি বিস্ফুরিত হইয়াছে—"আগের কবিতা লেখা চোখের জলে, এখনকার কবিতা লেখা গাঢ় মদির রক্তে, আগের কবিতায় ছিলো রেখার অস্পষ্টতা, রঙের কোমলতা,

বিষণ্ণ প্রশান্তি, ভাবের অস্ফুট, কবোষ্ণতা, এখন পূজার স্থানে তীব্র পিপাসা, অভিনন্দনের দূরত্ব অতিক্রম করে অন্তরঙ্গতার বুকফাটা হাহাকার। রেখাগুলি এখন ক্ষুরধার, স্পষ্ট রঙে এসেছে বিহ্বল প্রগল্‌ভতা, ভাবে কামনার উত্তাপ, ভাষায় আর্তনাদের লেলিহান বহ্নিচ্ছটা।" এই তুলনার সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রকাশনিপুণতা উচ্চ প্রশংসার উপযোগী।

কুবের এবার সুশান্তর অভিভাবকত্বের ক্লান্তিকর তীক্ষ্ণতা হইতে অব্যাহতি পাইবার আবেদন জানাইয়াছে। এমন সময় ঝড়ের মত অগ্নিমূর্তি বেবি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে তাহার তীব্র ঘৃণার দ্রাবকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। বেবির অনুযোগ যে, তাহার নাম দিয়ে প্রকাশিত কুবেরের উষ্ণ, আবিল প্রেম-কবিতা তাহার নারীত্বের অপমান করিয়াছে। বিশেষতঃ যখন লেখকের এই উষ্ণ প্রেমধারা জীবনে প্রবাহিত করার সাহস নাই। এই আঘাতে কুবেরের জীবনে পরিবর্তনের শেষ স্তব আসিয়া পৌঁছিয়াছে—'করার চেয়ে হওয়ার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে'—প্রেম-কবিতা রচনা অপেক্ষা জীবনে প্রেমের নিবিড় অনুভূতিলাভ কাম্যতর বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে। এই মুহূর্তে বেবির প্রখর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ও পারিবারিক অনুমোদনের প্রতি তাহার তীব্র অবজ্ঞা কুবেরের নিশ্চেষ্টতাকে অভিভূত করিয়া তাহাকে বেবির নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়াছে এবং বেবি ও কুবেরের অপ্রত্যাশিত মিলনের মধ্যে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়া উপন্যাসটি কোন কৃতিত্বপূর্ণ বিশেষত্বের দাবি করিতে পারে না। কুবেরের নিষ্ক্রিয়তা, তাহার অবিচ্ছিন্ন পরমুখাপেক্ষিতা তাহার চরিত্রকে নির্জীব করিয়াছে—প্রেমের ব্যাপারেও সে করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় বেবির অঙ্গুলি-হেলনে চালিত হইয়াছে। তাহার কাব্য তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করিয়াছে। এমন কি বেবিও পরিকল্পনায় যতটা প্রখরব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ব্যবহারিক জীবনে তদনুরূপ হয় নাই। 'আবির্ভাব' সম্প্রদায়ের চিত্রটিতে তীব্র মর্মভেদী ব্যঙ্গের প্রয়োগ অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছে; ইহার সদস্যদের বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা উপহাসের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হইয়া পাঠকের ব্যঙ্গরসাস্বাদনের স্পৃহাকে তৃপ্তি দিয়াছে। 'তাদের কৌটো-করা তুলোর বিছানায় বিলাসী আঙুরের জীবন, যারা বাস করে জীবন্ত মিউজিয়ামে, জ্ঞানের ল্যাবরেটারিতে'—এই বর্ণনার মধ্যে অভ্রান্ত লক্ষ্য-সন্ধানের সহিত তীব্র শ্লেষের ঝাঁজ মিশিয়াছে। সুশান্তর চরিত্রে সহৃদয়তার সহিত কর্তৃত্বাভিমানের, উদারতার সহিত আত্মরক্ষামূলক সতর্কতার সুন্দর মিলন সংঘটিত হইয়াছে। বোধ হয় চরিত্রসৃষ্টিতে সুশান্তই সকলের চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করিয়াছে। সুশান্তর বড়বৌদিদির ও মেজবৌদিদির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান চরিত্র বলিয়া এই ইঙ্গিতকে বিশেষ পরিস্ফুট করা হয় নাই। মোট কথা উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ চরিত্রসৃষ্টি নহে, কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে গভীর ও চিন্তাশীল মন্তব্য—ইহাই অচিন্ত্যকুমারের আসল কৃতিত্ব।

'আসমুদ্র' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে—ইহাতে অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির একটা নূতন দিক্ দেখা যায়। উপন্যাসটি আগাগোড়া অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার সুরে বাঁধা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, লেখকের অগ্রগতি বাস্তবতার পথ অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত সাংকেতিকতার পথ ধরিয়াই চলিয়াছে। ভাষা, বর্ণনা-ভঙ্গী, জীবন

সমালোচনা এই সমস্ত বিষয়েই বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যের মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখা যায়। এই ঐক্যের একটি চমৎকার উদাহরণ মিলে 'বিসর্পিল' উপন্যাসে (এপ্রিল, ১৯৩৪)—ইহা অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিলিত রচনা বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে বিভিন্ন হাতের রচনার মধ্যে কোন বিচ্ছেদরেখা ধরা যায় না। মোটের উপর ইহাতে কবিত্ব অনেকটা সংকুচিত থাকায় ও বাস্তবতা অনেকটা প্রাধান্য লাভ করায় ইহাতে বুদ্ধদেবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া অনুমান করা যায়। পরিকল্পনার কৃতিত্ব বোধ হয় অচিন্ত্যকুমারের, কেননা ইহার সহিত তাঁহার পূর্বতন উপন্যাস 'ঊর্ণনাভ'-এর বিশেষ বিষয়-সাদৃশ্য আছে। ইহার বাস্তব-প্রবণতা ও একপ্রকার শুষ্ক, সংযত ব্যঙ্গের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের জন্য দায়িত্ব বোধ হয় প্রেমেন্দ্রের। এই অনুমানসিদ্ধ বিভাগ সত্য হউক, আর নাই হউক এই তিন বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নিশ্চিহ্নভাবে এক হইয়া গিয়াছে। সিতিকণ্ঠের আত্মসম্মানলেশহীন ইতরতা ও উদ্দেশ্যহীন ঈর্ষা ও কৃতঘ্নতা একটু যেন অতিরঞ্জনের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে—তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ও চরিত্রগত নীচতার মধ্যে অসামঞ্জস্য যেন অহেতুক বিকৃতির মতই দেখাইয়াছে। মাধুরীর সঙ্গে রথীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সিতিকণ্ঠের প্রাণান্ত চেষ্টা আমাদিগকে Iagoর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার মুহূর্তব্যাপী আন্তরিকতা ও আত্মগ্লানি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ, অতলস্পর্শ কুটিলতার আর একটি ছদ্মবেশমূলক আত্মপ্রকাশ—এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হয়। এই সকল উচ্ছ্বাস তাহার বিষদিগ্ধ মনের কোন নির্মল উৎস হইতে প্রবাহিত, উপন্যাসমধ্যে তাহার কোন ইঙ্গিত মিলে না। সিতিকণ্ঠের চরিত্র-পরিকল্পনায় এই আতিশয্যটুকুই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দুর্বলতা।

রথীর অদৃষ্টে দুর্দৈব-সংঘটনের যে একটা মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রেমেন্দ্রেরই পরিকল্পনা—কেননা ইহার অনুরূপ কিছু বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে পাওয়া যায় না। রথী সাধারণ মানুষ হইয়া অসাধারণত্বের দুরাশায় নিজ জীবনে দুর্দৈবকে ডাকিয়া আনিয়াছে—এই ব্যাখ্যা খুব যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না তথাপি এই প্রয়াসই বুদ্ধ-অচিন্ত্য হইতে প্রেমেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন।

অচিন্ত্যকুমারের দুইটি ছোট গল্পসমষ্টি—'ইতি' (১৯৩২) ও 'অকাল বসন্ত'—তাঁহার ছোটগল্প-রচনা-নৈপুণ্যের নিদর্শন। 'যে কে সে' ও 'দিনের পর দিন' দুইটি গল্পে প্রেমেন্দ্রের রোমান্স-বিমুখ, শ্লেষপ্রধান মনোভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রথমটিতে 'ধূসর মধ্যবিত্ততার' শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণতার তীব্র অনুভূতি, রূঢ় বাস্তবের অভিঘাতে গরিব কেরানীর আদর্শ-স্বপ্নভঙ্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে চির-রুগ্ন স্ত্রীর সেবাক্লান্ত স্বামীর মুক্তি-ব্যাকুলতা, স্ত্রীর কর্কশ সন্দিগ্ধ ব্যবহার ও স্বামীর জড় ঔদাসীন্যে প্রথম প্রণয়াবেশের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'অরণ্যে' গল্পটি একপরিবারভুক্ত বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষের পারিবারিক ঐক্যের অন্তরালে প্রধূমিত ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতাবোধের চিত্র। শেষে একটি বালকের দুর্ঘটনামূলক মৃত্যু এই কেন্দ্রাতিগতার প্রতিরোধ করিয়া প্রত্যেক বিভিন্নমুখী হৃদয়ের উপর শোকের সাম্য-যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। 'বিবাহিতা' গল্পে রাখাল, স্বামী কর্তৃক উৎপীড়িতা তাহার বাল্য-সহচরী বিমলার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া, তাহারই

ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিতা হইয়াছে। রাখালের প্রতিবেশী-সুলভ, ভাবার্দ্র সমবেদনা বিমলার চরম বিদ্রোহে উন্মুখ মনোভাবের সহিত সমতা রাখিতে অক্ষম—তাই সে তাহার নিষ্ফল হিতৈষণাকে কলঙ্কলাঞ্ছিত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণকামী তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়ার, পিঞ্জর হইতে পিঞ্জরান্তরে বদলি করার, প্রস্তাবের মধ্যে যে তীব্র অসংগতি ও উপহাস্যতা আছে নির্দোষ রাখালের অপমানে তাহারই সার্থক পরিণতি।

'নীরব কবি' ও 'উপজীবিকা' গল্পদ্বয়ে কাব্যচর্চার দুই বিপরীত পারিপার্শ্বিকের আলোচনা হইয়াছে। প্রথমটিতে কবিযশঃপ্রার্থী কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগদানের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত প্রয়াস, সদা-জাগ্রত, সতর্ক শ্যেনদৃষ্টি ও কনিষ্ঠের প্রতিষ্ঠা-গৌরবে গৌরবান্বিত, উৎফুল্ল মনোভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অতি-প্রশ্রয়ের উৎকোচ-লব্ধ অবসর প্রায়ই বন্ধ্যাত্বের অভিশাপগ্রস্ত হয় কর্তব্যচ্যুতির অস্বাভাবিক প্রেরণায় বর্ধিত অনুশীলন-বৃক্ষে কাব্যসৃষ্টি মুকুলিত হয় না। দ্বিতীয়টিতে ইহার ঠিক বিপরীত প্রতিবেশ—সাংসারিক প্রয়োজনের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি-রজ্জুতে প্রতিভার উদ্বন্ধন-অপমৃত্যু। 'সদ্য সূর্যোদয়' ও 'যৌবন' গল্পদ্বয়ে তরুণের আদর্শস্বপ্নের প্রতি বৃদ্ধের সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম গল্পে পিতা নিজ পূর্ব প্রণয়-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে নারীজাতির আদর্শনিষ্ঠায় বিশ্বাস হারাইয়াছেন। তাই তাঁহার কন্যার সহিত নির্ধন, তরুণ কবির বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের অতীত মোহভঙ্গের করুণ স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এক অবিরল-বর্ষণ সন্ধ্যায় কন্যার রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই ব্যর্থ প্রণয়ীর আবিষ্কার পিতার চিন্তাধারাকে বিষাদময় ভাবরোমন্থন হইতে বাস্তবের হাস্যকর অসংগতির মধ্যে লইয়া গিয়াছে—তিনি যাহাকে অনাদরে বিদায় করিয়াছিলেন, তাহাকে আবার সাদর অভ্যর্থনায় বরণ করিয়াছেন। 'যৌবন'-এ মৃত পত্নীর ধ্যানবিভোর বৃদ্ধ—করুণার পিসেমশাই—তরুণ প্রেমের তুচ্ছতম খেয়ালের সোৎসাহ সমর্থন করিয়াছেন। তরুণের আনন্দ-যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য বৃদ্ধের আত্মাহুতির কাহিনীটি বড়ই করুণ ও ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ। 'ইতি'-গল্পে এক গণিকা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য আহূত হইয়া ক্ষণিকের জন্য উচ্চতর ভাবানুভূতির আস্বাদ পাইয়াছে ও নিজ শ্রীহীন জীবনের কদর্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বৃহত্তর মুক্তি-রাজ্যে এই ক্ষণিক অভিযান তাহার জীবনে একটি চিরস্থায়ী মাধুর্যের রেশ রাখিয়া গিয়াছে। 'ছায়া' গল্পটি এই সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা প্রেতাবির্ভাবের সূক্ষ্মার্থদ্যোতক, মৌলিক পরিকল্পনা। হিমাদ্রি ব্যর্থপ্রেমের জ্বালায় আত্মঘাতিনী এক তরুণীর ভৌতিক আবির্ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট বাড়ি ভাড়া লইয়া প্রতি রাত্রিতে প্রতীক্ষমান অন্তরে ইহার উপস্থিতি কামনা করিয়াছে। শেষে একদিন লাবণ্যময়ী রমণীর বেশে দীর্ঘ-অপেক্ষিত প্রেতমূর্তি দেখা দিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রেতমূর্তি তাহার এক উপেক্ষিতা প্রণয়িনী উর্মিলার প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু যেদিন সে উর্মিলার সহিত বিবাহে রাজী হইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই ছায়ারূপিণীর অন্তর্ধান। এই ছায়া তাহার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন, যাহা শরীরী উপস্থিতির ভার-অসহিষ্ণু, "মোহে যাহার জন্ম, মুক্তিতে যাহার অবসান।"

এই ছায়ার অনুসরণে সে কায়ার মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াইয়া দূরে দিগন্তমায়ার দিকে পক্ষবিস্তার করিয়াছে।

১৯৫৬, এপ্রিলে প্রকাশিত 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসটি লেখকের রীতি-পরিবর্তনের সূচনা করে। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে কোন বাস্তব ঘটনা নাই, আছে একটা মন-গড়া মানসসমস্যার রূপক-প্রতিচ্ছায়া। একজন যক্ষ্মারোগগ্রস্তা, জীবনে আশাহীনা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমানা তরুণীর চিকিৎসার ভার লইয়াছে একজন তরুণ ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার এই দায়িত্ব লইয়াছে মেয়েটির অভিভাবক পিতার অনভিপ্রেত ভাবে, ও কেবল চিকিৎসকের কর্তব্যপালনের জন্য নয়, একটি অত্যাজ্য জীবনব্রতরূপে। সুতরাং তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে কেবল রোগ ও রোগিণীর পরিবার-প্রতিবেশের বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং রোগিণীর মানস অবসাদ ও প্রবল নৈরাশ্যঘোষণার বিরুদ্ধেও। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের আগ্রহাতিশয্য ও আত্মনিবেদিত দুর্জয় সঙ্কল্পের কাছে রোগিণীর মৃত্যুকামনা হার মানিয়াছে ও সে ডাক্তারের সঙ্গে সমুদ্র-তীরে বায়ুপরিবর্তনে যাইতে রাজি হইয়াছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি ও সমস্ত আবহাওয়া যেন এক জীবনবিমুখ রূপকবিলাসের ছায়াচ্ছন্ন। রোগিণী অনুভা, ডাক্তার হিমাদ্রি, রোগিণীর পিতা বনমালী ও তাহার বন্ধু ও ডাক্তারের ভালবাসার প্রতিযোগিনী বিনীতা—সকলেই যেন এক উদ্দেশ্যের বাহন, স্বাধীন প্রাণশক্তিবর্জিত। লেখকের উদ্দেশ্য হইল নিছক ভালবাসার জোরে, দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে স্বাস্থ্য ও জীবনানন্দে ফিরাইয়া আনা যায় কি না এই সমস্যার পরীক্ষা। সুতরাং সমস্ত চরিত্রই এই উদ্দেশ্যনির্ধারিত অংশই অভিনয় করিয়াছে, উহার সীমা ছাড়াইয়া স্বচ্ছন্দ জীবনাবেগে এক পাও অগ্রসর হয় নাই। বনমালীর উপেক্ষা, ঔদাসীন্য ও শেষ পর্যন্ত প্রবল বিরোধিতা, এমন কি বিনীতার ঈর্ষাপ্রণোদিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা—সবই এই সর্বগ্রাসী সমস্যার অনুবর্তন। এই ঘটনা ও চিত্তবৃত্তি কেবল ডাক্তার হিমাদ্রির সর্ববাধাবিজয়ী আদর্শনিষ্ঠার কৃচ্ছ্রসাধনকে বৈপরীত্য-সংঘাতে আরও পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বর্ণনা ও সংলাপের ভিতর দিয়া অনুভার রুগ্ন মনের বিকার, উহার হতাশাক্লিষ্ট একগুঁয়েমি ও বদ্ধমূল ধারণার বক্রতা সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু সবই যেন উদ্দেশ্যের আলাবরণের অন্তরাল হইতে খানিকটা ঝাপসাভাবে আমাদের বোধশক্তিকে স্পর্শ করিয়াছে—এ যেন আলতো ছোঁয়া, দৃঢ়মুষ্টির পেষণ নয়। হিমাদ্রি বিনীতার গায়ে-পড়া প্রেমনিবেদন যে এত অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এত একনিষ্ঠভাবে রোগশয্যার চতুঃসীমায় আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে তাহাও তাহার অস্খলিত উদ্দেশ্যানুগত্যের ফল। উপন্যাসটিতে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকৃতি ও বর্ণনাকুশলতার নিদর্শন মিলে, কিন্তু ইহার জীবনব্যাখ্যান সমস্যাযন্ত্রের পেষণে নীরস ও আস্বাদহীন।

১৯৫৯ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত "রূপসী রাত্রি" উপন্যাসটিতে অচিন্ত্যকুমার উপন্যাসের এক নূতন আঙ্গিক ও রচনারীতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ কাল-ব্যবধানের মধ্যে তিনি কিছু ছোট গল্প লিখিলেও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা হইতে বিরত ছিলেন। এই সময় তিনি প্রধানতঃ ধর্মগ্রন্থ-রচনা ও ধর্মসাধনার স্বরূপ-উপলব্ধিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সাম্প্রতিক উপন্যাসটি তাঁহার পূর্ব উপন্যাসাবলীর ধারা

অনুসরণ না করিয়া এক অভিনব পথ ও প্রেরণার অনুগামী হইয়াছে। 'রূপসী রাত্রি' ঠিক বাস্তবজীবনানুসৃতি নহে, বাস্তবচিত্রণব্যপদেশে জীবনের এক কাব্যসঙ্কেতময় রূপের দ্যোতনা। বইটির বহিরঙ্গ উপন্যাসের, কিন্তু অন্তর-প্রেরণা জীবনাবেগের কাব্যানুভূতিময়, সূক্ষ্ম আবহ-সঙ্গীতের। এই উপন্যাসে তিনটি পরস্পর-অসংবদ্ধ প্রেম-কাহিনী অপূর্ব বাগ্-বৈদগ্ধ্য ও ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ নিজ রাগরক্তিম হৃদয়টি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। হয়ত ইহারা যে ঘটনার পোশাক পরিয়া স্থূলরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা অনেকটা ঢিলে-ঢালা ও বেমানান। আদর্শকল্পনার দিব্যলোকবাসীদের মধ্যবিত্তসুলভ সাধারণ জীবনপরিবেশ ও মনোভঙ্গীর ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া ইহাদের অলৌকিক দীপ্তিকে যথাসম্ভব আবৃত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের মানবিক পরিচয়ের অপূর্ণতা ও স্থানে স্থানে অসংলগ্নতা ইহাদের আসল স্বরূপটি চিনাইয়া দেয়। লেখক কল্পনা হইতে যাত্রা শুরু করিয়া বাস্তব জীবনের প্রত্যন্তকে লঘুভাবে স্পর্শ করিয়াছেন ও উপসংহারের ঘটনাপর্যায়কে আবার কল্পলোকেই ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

সুপ্রভাতের মোহিনীর প্রতি প্রেম নানা দুরূহ শর্ত পালন করিয়া, লৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা কঠোর অনুশাসন উত্তীর্ণ হইয়া আপাত-সাফল্যে ধন্য হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে এক ক্ষুব্ধ অনুযোগ, প্রতিশোধের এক নীরব সংকল্প ইহাকে অন্তর্জীর্ণ করিয়াছে। মোহিনীর দিকে সোৎসাহ প্রতিদান ত ছিলই না, পরন্তু নীলাদ্রির প্রতি অস্বীকৃত প্রেম তাহাকে অনুতপ্ত ও ঔচিত্যসীমালঙ্ঘনে উন্মুখই করিয়াছিল। নলিনেশ-পরমার প্রেম-কাহিনী ঘটনার দিক হইতে আরও জটিল ও বাধাবিঘ্নবহুল। ইহার উন্মত্ত আবেগ আসিয়াছে সবটা পরমার দিক হইতে; নলিনেশের দিকে আছে প্রৌঢ়সুলভ অনৌৎসুক্য ও নূতন অভিজ্ঞতার প্রতি বিমুখতা। পরমার প্রেমের নদীতরঙ্গ নলিনেশের ঔদাসীন্যের বাঁধে বার বার প্রতিহত হইয়া আরও উদ্দাম হইয়াছে। ছোট মফঃস্বল শহরে ছাত্রী-শিক্ষকের সম্ভ্রান্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্য বৃন্দাবনলীলা অভিনীত হইয়াছে। উভয়ের মিলন হইয়াছে; কিন্তু মিলনের পর নলিনেশের জীবনে আসিয়াছে শূন্যতাবোধ আর পরমার জীবনে আসিয়াছে অনিশ্চয়তার অস্বস্তি। তৃতীয় দাম্পত্য মিলনের দৃষ্টান্ত বাসুদেব ও গীতালি। গীতালির কুমারী জীবনের সন্তান তাহার সমস্ত ভালবাসাকে অধিকার করিয়াছে, বাসুদেবের জন্য অবশিষ্ট আছে ভদ্র জীবনযাত্রার অবলম্বন ও অতীত কলঙ্ক সম্বন্ধে সতর্ক আত্মগোপনপ্রয়াস। অবশ্য এই তৃতীয় দম্পতির প্রাক্-বিবাহ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই।

এই তিনটি ভারসাম্যচ্যুত, অন্তর্বেদনাক্ষুব্ধ পুরুষচিত্তে প্রতিঘাতের অবসর মিলিয়াছে এক দুর্যোগঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তকলুষিত ইতিহাস-সন্ধিক্ষণে। পার্ক সার্কাসে মুসলমান আততায়ীদের হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীহরণের প্রলয়ঝটিকায় তিনটি ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহাদের অন্তরের গোপন রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুপ্রভাত এই পরিস্থিতির সুযোগে মোহিনীকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলাইয়াছে; নলিনেশ পরমা ও মোহিনীকে এক মুসলমান ছাত্রের হাতে সমর্পণ করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছে। আর বাসুদেব গীতালির কানীন পুত্রটিকে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়নে নিরাপত্তা ও অতীত-কলঙ্কক্ষালনের উপায় খুঁজিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈব সকল

বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, সকল সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ঠেকাইয়া, সমস্ত মানস সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া এক নূতন মিলনোৎসবের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। এক মহাপ্রাণ মনুষ্য—নীলাদ্রি—আত্মবলি দিয়া সকলের জীবনের সমস্ত অশুভের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। লেখক উপসংহারে মন্তব্য করিয়াছেন যে, গ্রহণমুক্ত চাঁদ আবার রজত কিরণজালে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে ও ঈষৎ-মলিনতার ছায়ার মধ্য দিয়া নূতন প্রসন্ন দৃষ্টি জগতের উপর ছড়াইয়াছে। রূপসী রাত্রি শেষ পর্যন্ত তাহার রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—দুঃস্বপ্নবিভীষিকা তাহার মোহময় সৌন্দর্যকে গ্রাস করিতে পারে নাই।

এই উপন্যাসে জীবনের যে পরিচয় পাই, তাহা যেন তারার মায়াভরা, রহস্যময় নিশীথ-আকাশের মত। ইহাতে জীবনপর্যালোচনার বস্তুতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্পষ্টতা নাই; আছে ঘটনা হইতে উৎক্ষিপ্ত অন্তর-চেতনার আঁধারে চমক-লাগানো অতর্কিত আলোকচ্ছটা। মানুষের সমগ্র প্রকৃতি দেখিতে পাই না, দেখি তাহার আবেগ-স্ফুরণের চকিত স্ফুলিঙ্গ। সংলাপের অর্থগূঢ় তীক্ষ্ণতায়, উত্তর-প্রত্যুত্তরের শাণিত দীপ্তিতে, হৃদয়-রহস্যের হঠাৎ উৎসারে জীবন একটা সাংকেতিক ভাস্বরতায় উন্মোচিত হইয়াছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা নাই, স্বভাবের নিখুঁত অনুবর্তন নাই, মনোভাবের কোন সুশৃঙ্খল পরিণতি নাই। ইহাদের পরিবর্তে জীবনরহস্য সূক্ষ্মাগ্র বিন্দুতে, আঁধারের মধ্যে সঞ্চরণশীল সন্ধানী-আলোর ক্ষণিক তীব্রতায়, আদর্শ ভাবসত্যের ঈষৎ স্পর্শে আভাসিত হইয়াছে। উপন্যাসের বস্তু-অবয়বকে ভেদ করিয়া উহার কাব্য-আত্মা নিগূঢ় প্রকাশে ক্ষণদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন চরিত্রেরই দৃঢ় ব্যক্তিসত্তা নাই—ইহারা প্রত্যেকেই একক-আবেগকেন্দ্রঘূর্ণিত প্রাণকণাসমষ্টি। উপন্যাস হিসাবে রচনাটি কবন্ধ, কাব্যময় জীবনবর্ণনারূপে ইহা একটি প্রবন্ধ। উপন্যাসের কাব্যরূপে উদ্বর্তনেই উহার প্রকৃত সার্থকতা।

ষোড়শ অধ্যায়

বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রবোধ সান্যাল

(১)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুদ্ধ-অচিন্ত্য (group)-বেষ্টনীতে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিক স্থান, এই সত্যের আভাস লেখকত্রয়ের একই উপন্যাস-রচনায় সহযোগিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি প্রেমেন্দ্রের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার ছোটগল্পের সমষ্টি 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'ধূলিধূসর' ও মহানগর' (জুলাই, ১৯৪৩) তাঁহার বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনাবিলাস বা কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই। এক প্রকার শুষ্ক, আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনা, বাঙালী-সুলভ ভাবার্দ্রতার (sentimentality) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব। যে করুণ-রস-উদ্দীপনার ক্ষমতা বাঙালী ঔপন্যাসিক তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করেন, প্রেমেন্দ্র মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অবশ্যম্ভাবী দুঃখবরণের ঈষৎ-বিষণ্ন মনোভাবের দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে যে কল্পনার একেবারে অভাব তাহা ঠিক নহে; কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে। 'বেনামী-বন্দরে' 'পুন্নাম' গল্পে মানুষের যে হৃদয়বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও স্বার্থলেশশূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই অপত্যস্নেহের ভিতরেও যে হতাশ্বাসপূর্ণ ব্যর্থতা ও প্রকাণ্ড আত্মপ্রতারণা আছে তাহা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 'পুতুল ও প্রতিমা'র 'হয়ত' ও 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রেমেন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ গুণগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল। প্রথম গল্পে মহিম ও লাবণ্যের সন্দেহ-বিষ-জর্জর অথচ আকস্মিক অনুরাগের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত দাম্পত্য জীবনের যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহার অসাধারণত্ব চমকপ্রদ; সমস্ত প্রতিবেশের রহস্যময় বর্ণনা ও ঘটনার অবশ্যম্ভাবী অথচ অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তি পাঠকের মনকে বিস্ময়-চমকে অভিভূত করে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটিতে পতিতা-জীবনের ভাবাবেশ-বর্জিত, অথচ সহানুভূতির রেশে পূর্ণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—ইহার নিরুপায় বীভৎসতার সংযত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে পতিতাকে আদর্শবাদের সাহায্যে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয় না; এবং এই বিষয়ে ইহার অন্যান্য লেখকের পতিতা-কাহিনীর সহিত মৌলিক পার্থক্য। 'দিবা-স্বপ্ন' গল্পটিরও মৌলিকতা সম্পূর্ণ উপভোগ্য—পরস্পরের প্রতি প্রণয়-মুগ্ধ রমেশ ও প্রিসিলার একদিনের সাক্ষাতে মোহভঙ্গ ইহার বিষয়বস্তু। ব্যঙ্গের ক্ষীণসুর, দুঃখবাদের ম্লান কৌতুকপ্রিয়তা গল্পটিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। 'মৃত্তিকা' গল্পটিতে Barrack-life-এর সরস বর্ণনার প্রতিবেশে এক দীর্ঘদিনরুদ্ধ অন্তঃক্ষোভের অগ্নিস্রাব উদ্গীরিত

হইয়াছে এবং অতর্কিত ভূমিকম্পের মধ্য দিয়া প্রকৃতি এই হৃদয়তাণ্ডবের সহিত সপরিহাস সহযোগিতা করিয়াছে। 'বেনামী-বন্দর'-এর 'এই দ্বন্দ্ব' ও 'মৃত্তিকা'র 'পাশাপাশি' ও 'পরাভব'-এ শরৎচন্দ্রের প্রভাবের ছায়াপাত সত্ত্বেও লেখক নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। প্রথমোক্ত গল্পটি ভারকেন্দ্রচ্যুত বলিয়া মনে হয়, কেননা পত্নীর হৃদয়-সমস্যার মূল যেখানে, সেই প্রাক্-বিবাহিত জীবনের পরিবর্তে তাহার বিবাহোত্তর জীবনেরই আলোচনা হইয়াছে—সুতরাং 'অসীম ঘৃণা ও অদম্য প্রেমের' সমাবেশ-রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। 'পাশাপাশি'তে অমলের সরস কৌতুকপ্রিয়তার বর্ণনায় ও 'পরাভব'-এ পিসিমার প্রতি সুষমার আক্রোশের কারণ-বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র শরৎচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। 'লজ্জা' ও 'সুরু ও শেষ' এই দুইটি গল্পের সমাপ্তিসূচক মন্তব্য প্রেমেন্দ্রের মনোভাব-দ্যোতক—"দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মত নিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ"; "মনে হয় বুঝি জীবনের সব কাহিনীর ধারাই এমনি সামান্য ঘটনার উপল-খণ্ডে আহত হইয়া চিরদিনের মত আমাদের আয়ত্তের বাহিরে অভাবিত পথে চলিয়া যায়।" জীবনের বিচিত্র ঐকতান হইতে এই খেদমিশ্রিত ব্যর্থতার সুরটিই যেন তাঁহার কানে বিশেষভাবে ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রেমেন্দ্রের মানস বৈশিষ্ট্য তাঁহার পরবর্তী গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ 'ধূলিধূসর'-এ আরও অসন্দিগ্ধ ও পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'ধূলিধূসর' নামকরণ চমৎকাররূপে সার্থক হইয়াছে। আদর্শ প্রেমের দিব্যোজ্জ্বল আভা প্রাত্যহিকতার ধূলির প্রক্ষেপে, অভ্যাসের জড় পৌনঃপুনিক আবর্তনে, মোহভঙ্গের ধূসর ক্লান্তিতে যে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া আসে এই প্রমাণিত সত্যই সমস্ত গল্পগুলির বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ হইয়াছে। প্রেমের প্রত্যাশিত সরস ও অম্লান সৌন্দর্যের মধ্যে বিকৃতি, পারুষ্য, নির্বিকার ঔদাসীন্য, নিষ্ঠুর আত্মপীড়ন, আঘাত হানিবার দুর্বোধ্য খেয়াল ও পাণ্ডুর রক্তহীনতার বীজাণুসমূহ লেখক অভ্রান্ত দৃষ্টিতে আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমের অমৃত পাত্রে যে প্রচ্ছন্ন অম্ল, লবণাক্ত ও তিক্তস্বাদের আভাস আছে সেইগুলির অনুভূতি তাঁহার অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। আবার অন্যদিকে প্রেমের রহস্যময় সাংকেতিকতার সুরও তাঁহার শান্ত, সংযত, ঈষৎ ব্যঙ্গের আমেজযুক্ত, মননশক্তিসমৃদ্ধ রচনারীতির মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই সংগ্রহের প্রথম গল্প 'একটি রাত্রি' সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-ঝলকে ভাস্বর—পরিকল্পনার মৌলিকতায়, রূপক-ব্যঞ্জনার সুদূরপ্রসারী অর্থগৌরবে ও আলোচনায় নিখুঁত পরিপূর্ণতায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রির মহানগরী যেমন নিজের, তেমনি মানুষেরও, এক নূতন, প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশমুক্ত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। মীরার প্রতি সুব্রতের প্রকৃত মনোভাব এই মায়াঘন, অস্তিত্বের পূর্ণতর আভাসে চমকিত রাত্রির যাদুপ্রভাবে নবগুঞ্জিত হইয়াছে। 'যাত্রাপথ'-এ অজয় ও মলিনার প্রথম প্রেমের আবেশ পরস্পরের চরিত্রের সাধারণতা ও রূঢ় পারুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে সন্দেহ-কণ্টকিত হইয়াছে। 'অমীমাংসিত' গল্পে নবপরিণীতা স্ত্রীর দারুণ অভিমানের ভরে ভীত প্রকাশ তাহার অবিচলিত ঔদাসীন্যের সন্দেহে আরও গুরুতর উদ্বেগ ও অশান্তি অনুভব করিয়াছে—অভিমানের ঘূর্ণিপাক এড়াইতে গিয়া প্রেমের নৌকা অসাড় নির্বিকারতার চড়ায় ঠেকিয়া গিয়াছে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের

যুদ্ধ'-এ প্রেমের ঈর্ষ্যাজনিত দারুণ মনোবিকার ইহার সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিষজর্জর ও বিঘ্নবহুল করিয়াছে—দাম্পত্য সম্পর্ককে একটা অস্থির, সন্দেহপ্রণোদিত পরীক্ষার আবর্তে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাওয়াইয়াছে। এই গল্পের পরিসমাপ্তিসূচক মন্তব্য লেখকের জীবন-সমালোচনার সহজ সুরটির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধার করা যাইতে পারে।—'যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙ-চটা থার্মোফ্লাস্ক, আর একটা বুকচেরা প্রশ্ন।"

'ভস্মশেষ'-এ প্রেমের জলন্ত, বিদ্রোহী আবেগ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিয়া সাহসিকতাহীন, জড় অভ্যাসের ভস্মরাশিতে পরিণত হয় তাহার চমৎকার বিশ্লেষণ। অমরেশ তাহার প্রণয়িনী, অপরের বিবাহিত পত্নী—সুরমাকে সর্বস্বপণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিয়াছে। সুরমা তাহার প্রচণ্ড আকর্ষণে বিচলিত হইয়াছে; কিন্তু সে চরম সিদ্ধান্তের জন্য সময় চাহিয়াছে। অমরেশ এই পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু প্রতীক্ষাকাল একটু বেশি দীর্ঘ হওয়ায় অন্তরের বহ্নিশিখা কখন নির্বাপিত হইয়া অঙ্গারস্তূপের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। আজ বারান্দার এক কোণে তিনখানি চেয়ারে উপবিষ্ট স্বামী, স্ত্রী ও বাতিল প্রণয়ী যেন একই পারিবারিক জীবনযাত্রার কক্ষাবর্তনে নিজ নিজ অভ্যস্ত নিয়মিত স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আজ স্বামীর অসাড় নিদ্রালুতা মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ব্যঙ্গহাস্যে চমকিত হইয়া উঠিতেছে; স্ত্রী সংসারের মোট বহার কাজে স্বামী অপেক্ষা ভূতপূর্ব প্রণয়ীর উপর বেশি নির্ভর করিয়া ও তাহার প্রতি অনুরোধের রেশযুক্ত আদেশ প্রচার করিয়া অতীত অনুরাগের ম্লান সাক্ষ্য দিতেছে। আর পোষমানা ধূমকেতু বা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় ব্যর্থ, হতাশ প্রেমিক সংসারযন্ত্রপরিচালনায় নিজ প্রতিহত শক্তিকে নিয়োজিত করিতেছে—তেজস্বী আরবী ঘোড়া যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ভারবাহী গর্দভে পরিণত হইয়াছে। অপরাহ্নের ম্লান ছায়া কি গভীর অর্থপূর্ণ সাংকেতিকতার সহিত, কি বেদনা-করুণ স্মৃতির বাহন হইয়া ইহাদের শান্ত, ভাবলেশহীন মুখের উপর সঞ্চারিত হইয়াছে। এই চমৎকার গল্পটি ব্রাউনিং-এর "The Statue and the Bust" নামক বিখ্যাত কবিতার সহিত এক সুরে বাঁধা। এই কথায় গাঁথা কাহিনীটি কোন চিত্রকরের বর্ণ-রেখা-বিন্যাসে রূপ পাইবার উপযোগী বিষয় বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সম্ভাবনা রূপ পাইয়াছে "শৃঙ্খল" নামক গল্পটিতে। যখন পতিপত্নীর মধ্যে সম্বন্ধের মাধুর্যটুকু একের বা উভয়ের দোষে নিঃশেষে উবিয়া যায়, তখন অচ্ছেদ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত, জগতের মধ্যে নিকটতম সম্পর্কান্বিত এই দুই প্রাণীর বাধ্যতামূলক একত্র-বাস কি সাংঘাতিক, হিংস্র বিতৃষ্ণা ও বিরাগের হেতু হইয়া উঠে, তাহাই এই গল্পের আলোচ্য বিষয়। ভূপতি ও বিনতির সম্পর্ক 'পুতুল ও প্রতিমা'র 'হয়ত' গল্পে মহিম ও লাবণ্যের অস্বাভাবিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভূপতির উত্তেজনাহীন স্নেহের মধ্যে অস্বাভাবিক-রূপে তীব্র, ক্রূর হিংস্রতা, প্রিয়জনকে আঘাত করিবার অকারণ উল্লাস আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। বিনতির মনে এই দুর্বোধ্য ব্যবহার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্বেষ, মৃত্যুর ন্যায় সীমাহীন, নীরব বিমুখতা—প্রেমের বিকৃত রূপান্তর—উভয়ের মধ্যে আমরণ অবিচ্ছিন্ন সংযোগের হেতু হইয়াছে।

অন্যান্য গল্পগুলিতেও প্রেমের সুস্থ, পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে সমস্ত সাধারণ, অথচ

অনতিক্রম্য বাধা-বিঘ্ন-অন্তরায় আছে সেগুলির আলোচনা হইয়াছে। 'শরতের প্রথম কুয়াসা' গল্পে নিরঞ্জন ও অতসীর একদিনের অন্তরঙ্গতার দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তরুণ নিরঞ্জন অভিজাত-সমাজের উজ্জ্বল তারকা অতসী ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ-করার গৌরবে উৎফুল্ল, নিজের অতর্কিত সৌভাগ্যে বিহ্বল-প্রায়। অকস্মাৎ তাহার এই আত্মপ্রসাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে সংশয় জাগিয়াছে—সে কি নিজ স্পর্ধিত ধৃষ্টতায় আপনাকে অতসীর নিকট উপহাস্য করিয়া তুলিয়াছে? অতসীর মনোভাব আরও মর্মান্তিকভাবে করুণ—তাহার চোখে অতলস্পর্শ ক্লান্তি ও নৈরাশ্য। তাহার ক্ষীয়মান যৌবন কেবল ক্ষণস্থায়ী মোহ সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা প্রথম পরিচয়ের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসকে চিরন্তন সম্বন্ধের তটভূমিতে ধরিয়া রাখিবার শক্তি হারাইয়াছে। তাই সে এই বহুপরিচিত মোহভঙ্গের পুনরনুভূতির আশঙ্কায় কণ্টকিত। 'একটি রাত্রি'তে সুব্রতের মত, অতসীও সেইজন্য এই বিভ্রমকারী অভিজ্ঞতাকে দ্বিতীয়বার আস্বাদন করিতে চাহে না—'তার অস্তমান যৌবনের আকাশে এই শেষ স্মৃতি-তারকা থাক অম্লান হয়ে।" 'ব্যাহত রচনা' গল্পটি প্রণয়ী-যুগল পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে চলিতেও প্রেমের গহন অরণ্য মাঝে কেমন করিয়া পথ হারাইয়া ফেলে তাহার ব্যঞ্জনায় অর্থগূঢ়। "মধুর গল্প রচনা করিবার জন্য যাহাদের ডাকিয়াছিলাম তাহারা আমার কাহিনীকে এ কোন্ নিরর্থক কথার জটিলতায় লইয়া আসিল।" 'পরিত্রাণ'-এ হতাশ প্রেমিক সাময়িক মস্তিষ্কবিকারের ক্লোরোফর্মের সাহায্যে তাহার আশাভঙ্গের তীক্ষ্ণ বেদনাবোধকে কিয়ৎ পরিমাণে অসাড় করিয়াছে। 'নিশাচর' গল্পে দাম্পত্যকলহের পটভূমিকায় একটি নূতন ধরণের অতিপ্রাকৃত কাহিনী রচিত হইয়াছে। লেখক অবশ্য ভৌতিক রোমাঞ্চ অপেক্ষা পারিবারিক বিরোধের সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহশীল। তথাপি এই উভয় অংশের মধ্যে যোগ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে ও প্রেতের আবির্ভাবও আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্যহীন হয় নাই। সমস্ত গল্প-সংগ্রহটিই উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল, ঘটনা ও মন্তব্যের যথাযথ সন্নিবেশ ও সর্বোপরি বাস্তব প্রভাবে প্রেমের বিকার ও রূপান্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য বিশেষ-ভাবে প্রশংসার্হ।

'মহানগর' গল্প-সংগ্রহে (জুলাই, ১৯৪৩, প্রেমেন্দ্রের শিল্পচাতুর্য অক্ষুণ্ণ আছে। 'মহানগর' গল্পটি সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগে অপরূপ অর্থব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ও উষার কুহেলিগুণ্ঠিত তরল যবনিকা মহানগরীর প্রান্তশায়িনী নদীর উপর বিস্তৃত হইয়া তাহার চারিপার্শ্বের দৃশ্য ও বক্ষপ্রসারিত অগণিত নৌযানের জটিল বিশৃঙ্খল সমাবেশের মধ্যে এক অতলস্পর্শ রহস্যের ইঙ্গিত সঞ্চারিত করিয়াছে। এই সর্বব্যাপী রহস্যের এক তীব্র ঝলক ব্যথিত প্রতীক্ষায় উৎসুক, অজ্ঞাত আশা-আশঙ্কায় কম্পিত-বক্ষ, বাস্তবানভিজ্ঞ, দুঃসাহসিক ভালবাসার প্রেরণায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বালকের মনে দুর্বোধ্য, অভিমান-ক্ষুব্ধ বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শহর ও মানব-সম্পর্কের জটিলতার ভিতর দিয়া একই রহস্যের বিদ্যুৎ-শিখা খেলিয়া গিয়াছে। রাজধানীর গহন, ভয়াবহ অতিকায়তা ও পতিতা দিদি কেন বাড়ি ফিরিতে পারে না, কেনই বা রতনের দিদির গৃহে স্থান নাই সমাজনীতির এই দুরধিগম্য সমস্যা বালকের মনের একই তারে ঘা দিয়াছে।

ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপে যে ক্রূর ঔদাসীন্য বিভীষিকার ভ্রূকুটি তুলিয়াছে তাহারই মানবিক সংস্করণ—দিদির ব্যবহার—ভালবাসার ব্যাকুল আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করিয়া সংসারজ্ঞানহীন বালকের হৃদয়ে বিস্ময়বিমূঢ়, আর্ত নৈরাশ্যের অনুভূতি জাগাইয়াছে। 'অরণ্যপথে'ও প্রকৃতি ও মানুষের, সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও মানব-মনের গোপনগুহাশায়ী বন্য, উগ্র বিকারের ছন্দোসমতা দেখান হইয়াছে, কিন্তু এই আবিষ্কারের মধ্যে খানিকটা কষ্টকল্পনা আছে মনে হয়। মানুষ যেমন স্টীমারের সুরক্ষিত আশ্রয়ের মধ্য হইতে পথিপার্শ্বের অরণ্যবিভীষিকাকে ব্যঙ্গ করিতে পারে, সেইরূপ সুন্দরী তরুণীর অপ্রকৃতিস্থতা ও অঙ্গবিকৃতি আকস্মিক চমকের আঘাতে সৃষ্টির অসংগতির প্রতি একপ্রকার শ্লেষাত্মক বিস্ময়বোধ জাগাইয়াছে। 'তুল্যমূল্য' গল্পে অব্যবহিত অতীত ও অতি-আধুনিক যুগের মনোভাবের ও প্রণয়চর্চাবিধির বৈষম্যের মনোজ্ঞ আলোচনায় ক্রেমে প্রণয়িনীর মোহভঙ্গকর পরিবর্তনের ছবিটি আঁটা হইয়াছে। সপ্রতিভা হাস্যলাস্যময়ী কিশোরী ও স্বামি-প্রেমের স্মৃতিবিভোরা সদ্যবিধবা তরুণীর, এক শুচিতাবায়ুগ্রস্তা, দেহে ও মনে নিঃশেষিতলাবণ্যা প্রৌঢ়া নারীতে পরিণতি আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বাদায়ুনের নবাবপুত্রীর প্রেমাস্পদ, একদা ব্রাহ্মণ্যতেজ-ভাস্বর, অধুনা পাহাড়িয়া অনার্য নারীর সহিত সহবাসে মলিন ও মর্যাদাভ্রষ্ট কেশরলালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মুহূর্ত' ও 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্প দুইটি প্রেমের সেই সনাতন অতৃপ্তি ও চলচ্চিত্ততার কাহিনী—'ধূলিধূসর' গল্পসংগ্রহের গল্পগুলির সহিত একসুরে বাঁধা। প্রথমোক্ত গল্পে স্ত্রীর উত্তাপহীন নির্বিকারতায় ব্যাহত স্বামীর অতৃপ্ত মিলোনোৎসুক্য এক ভূমিকম্পের রাত্রিতে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মসৃণ, সুনিয়মিত জীবনযাত্রার মধ্যে সৃষ্টি-প্রারম্ভের যে আদিম আতংক সুপ্ত থাকে, ভূমিকম্পের আলোড়নে তাহারই রুদ্ধ উৎস খুলিয়া গিয়া সেই পথে নিরুদ্ধ প্রেমের এক ঝলক বাহিরে আসিয়াছে ও প্রেমিকের নিবিড় আলিঙ্গনপাশে ধরা দিয়াছে। অতর্কিত বিপদে আত্মরক্ষার সহজ সংস্কারের ভিতর আত্মবিস্মৃত প্রেমের আবেশ মুহূর্তের জন্য সঞ্চারিত হইয়াছে, বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়লাভের ত্বরিত প্রয়োজন ভালবাসার চরম আত্মনিবেদনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভয় ও ভালবাসা, প্রেম ও প্রয়োজনের এই মিলন ক্ষণিকের মাত্র—ইহাই গল্পটির অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি। বিনিদ্র শশাঙ্কের মনে ঘড়ির অশ্রান্ত শব্দ জীবনের ব্যর্থতার প্রতীকে পরিণত হইয়াছে -এই রূপকসৃষ্টি লেখকের সাংকেতিকতার উপর অসাধারণ অধিকারের আর একটি নিদর্শন। দ্বিতীয় গল্পে 'ধূলিধূসর'-এর 'ভস্মশেষ' গল্পের ন্যায় প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা চলিয়াছে। অপরের বিবাহিতা স্ত্রী করুণা খানিকটা অস্থির আত্মদ্বন্দ্ব, ঔদাসীন্যের অভিনয় ও ব্যর্থ আত্মদমন-চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের সহিত গৃহত্যাগের সংকল্প স্থির করিয়াছে, কিন্তু প্রেমিকের দুর্বলচিত্ততার জন্য সেই সংকল্পের উপর একটা ছলনার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। লেখক এই মেরুদণ্ডহীন আচরণকে কাপুরুষতা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। লেখকের আধুনিকতম রচনায় কোন কোন গল্পে পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা লক্ষিত হইলেও মোটের উপর পরিধিবিস্তার ও অগ্রগতির প্রমাণ সুস্পষ্ট।

বড় উপন্যাস-রচনায় প্রেমেন্দ্র তাঁহার শক্তির অনুরূপ সাফল্য এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। লেখক এখনও এ-বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত আছেন মনে হয়—

সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রমের পর সিদ্ধি এখনও তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। তবে তাঁহার উপন্যাস 'কুয়াসা'তে অপেক্ষাকৃত পরিণত শক্তির পরিচয় মিলে। পরিকল্পনার মৌলিকতা—একজন যুবা পুরুষের অকস্মাৎ স্মৃতিলোপ এবং পরিণত মনোবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ লইয়া জীবনের সহিত নূতন সম্পর্ক-স্থাপনের তীব্র ব্যাকুলতা—উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য এই আকস্মিক স্মৃতিবিভ্রমের অসম্ভাব্যতাটুকু উপেক্ষা করিতে হইবে—ইহা মানিয়া লইলে প্রদ্যোতের জীবনসমস্যার বিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। শিশুর অস্পষ্ট স্মৃতি ও ধীরে ধীরে উন্মেষশীল ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার অপরিণত চিন্তাশক্তি ও ভাবাবেগের একটা সহজ সামঞ্জস্য আছে। তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-প্রাচুর্য সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ণব্যক্তিত্ববিশিষ্ট অথচ অতীত স্মৃতির সহিত সম্বন্ধচ্যুত যুবা-পুরুষের সমস্যা অত্যন্ত বিচিত্ররূপে স্বতন্ত্র—সে বিরাট শূন্যতার মধ্যে কুম্ভকর্ণের বুভুক্ষা লইয়া জাগিয়া উঠে। প্রদ্যোতের নব-জাগ্রত চেতনার ভয়াবহ শূন্যতাবোধ, অমলের পরিবারবর্গের সহিত স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনের উদগ্র ব্যগ্রতা, সহজ জীবনযাত্রার নিবিড়, তীব্র রসোপলব্ধি, বিস্মৃত অতীতকে জানিবার ও ভুলিবার তুল্যরূপ প্রবল প্রয়োজনের অনুভব—সমস্তই অতি নিখুঁত মনস্তত্ত্বনিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যসৃষ্টিকুশলতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই বিরলপদচিহ্ন, বস্তুভারমুক্ত জীবনে প্রথম প্রেমের রহস্যানুভূতি ও রোমাঞ্চ-শিহরণ যেন সৃষ্টির আদি-যুগের তরুণ আকাশে প্রথম নক্ষত্রদীপ্তিবিচ্ছুরণের মতই অপরূপবিস্ময়মণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এই প্রেমের আবির্ভাব-বর্ণনাই গ্রন্থের চরম গৌরব। শেষে লেখকের স্বাভাবিক রোমান্স-বিমুখতা নায়কের অবাঞ্ছিত অতীতকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া, তাহার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত জটিলতা আনিয়াছে। সার্থকতার যে উজ্জ্বল ছবি তাহার কল্পনায় রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ মসীলিপ্ত ও অস্পষ্ট হইয়াছে—স্মৃতিবিভ্রমের যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার ভদ্র, শিক্ষিত ও আদর্শবাদপ্রবণ বর্তমানের পিছনে এক কলঙ্কিত অতীতের বিভীষিকা ব্যঙ্গহাস্যে মুখব্যাদান করিয়াছে। এই শেষ অধ্যায়টি, যেমন নায়কের পক্ষে তেমনি উপন্যাসের পক্ষেও, একটু অসুবিধাজনক হইয়াছে—স্মৃতিলোপের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থার উল্লেখে ইহার কারণটি মোটেই সুস্পষ্ট হয় না ও গল্পটি যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত এই ধারণা জন্মে। তথাপি "কুয়াসা" বড় উপন্যাস রচনায় প্রেমেন্দ্রের অগ্রগতির একটা বিশেষ আশাপ্রদ নিদর্শন।

(২)

প্রবোধ সান্যাল

উপন্যাসের অতি-প্রসার ও মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্যাস-ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, যাঁহাদের রুচি ও মনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্মের অনুবর্তী নহে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগে এই জাতীয় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র। আমার মনে হয় যে, প্রবোধকুমার সান্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে H. G. Wells ও G. K. Chesterton-ও এই পর্যায়ে পড়েন। ইহাদের জীবন-কৌতূহলের মধ্যে একটু নির্লিপ্ততা, একটু কল্পনার মায়া-লীলা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (theory) লইয়া, সমাজ-বিন্যাসের একটা অচিন্তিতপূর্ব রূপ কল্পনায়

প্রেরণায় ইহারা জীবন-পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। ইহারা জীবনকে দেখেন হয়ত সত্যানুগ দৃষ্টিতে, কিন্তু একটু তির্যক ভঙ্গীতে। জীবনের ভাল-মন্দ, হাসি-কান্না, নিয়ম-বিশৃঙ্খলা সব লইয়া ইহার সমগ্রতা হইতে ইহারা রস আহরণ করেন না, জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশে ইহাদের পূর্বনির্ধারিত মানস কল্পনা সমর্থিত হয়, ততটুকুর প্রতি ইহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবনকে ইহারা দেখেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ব্যবধানের অন্তরাল হইতে, নানা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে ইহার যে অতর্কিত বিকাশ ঘটে, তাহাতেই তাঁহাদের সত্যিকার আগ্রহ। জীবন-গ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন-নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অবলম্বন করিয়াই ইহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। মানবিক রসের গাঢ়তাকে অন্তরের ভাবকল্পনার সংযোগে কিঞ্চিৎ ফিকে করিয়া, উহার পরিচিত স্বাদে নূতন মশলার সাহায্যে কিছুটা অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়া, ইহারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধিত রসটিই তাঁহাদের উপন্যাসে পরিবেশন করিতে ভালবাসেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' যেমন তাঁহার মনোভঙ্গীর দর্পণ, প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে'-ও তেমনি তাঁহার জীবনরসিকতার বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস। উভয়েই তাঁহাদের উপন্যাসে এই মানসপ্রবণতাই গল্পের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য—ইহার দৃশ্য-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে, ইহার চলিষ্ণুতার গতিচ্ছন্দে ঔপন্যাসিক রস খানিকটা জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের দার্শনিক অনাসক্তি, উদার মননশীলতা, বৈরাগ্যস্পৃষ্ট শিথিল জীবনানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট—ইহার মানবিক আবেগ বিচ্ছিন্ন ও পরিণতিহীন ক্ষণিকতায় পর্যবসিত। লেখক আসক্তির জালে জড়াইয়া পড়েন নাই, জীবনের গভীরে অবগাহন করেন নাই, জীবনস্রোতের কয়েকটি তরঙ্গকে তীরের নিরাপদ দূরত্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এও এই উদাসীন জীবনপর্যবেক্ষণের সুর শোনা যায় কিন্তু আবেগের রহস্যময় গভীরতা যখন তাঁহার বৈরাগী চিত্তকে আহ্বান জানাইয়াছে, তখন তিনি এই ডাকে সম্পূর্ণ সাড়া দেন বা না দেন, গভীরতার পরিমাপ করিতে ভুলেন নাই; ইহার অতল রহস্যকে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। প্রবোধকুমারের গ্রন্থে, এই ক্ষণিক মোহাবেশ নিঃসঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত কুহেলিকাজালের ন্যায় খানিকটা বর্ণমায়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এই কুহক মিলাইতে বেশি সময় লাগে না। মনে ইহা কিছুটা দাগ কাটে বটে, কিন্তু অবি-স্মরণীয় রেখায় অঙ্কিত হয় না। প্রবোধকুমারের রচনায় ভ্রমণের এই মায়া-কাটানো মানস মুক্তি, এই দেখিতে-দেখিতে আগাইয়া-যাওয়ার অশৃঙ্খলিত স্বাধীনতা প্রধান আকর্ষণ, ইহাতে সহস্রবন্ধনে আবদ্ধ ঘন সম্মোহের আবেগ-আবিল বদ্ধ হাওয়া একেবারেই অনুভূত হয় না।

প্রবোধকুমারের মানবজীবনচর্যা অনেকটা পরীক্ষাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক মনোভাব-প্রসূত। কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোন্‌টা অস্বাভাবিক ইহা লইয়া তিনি খুব বেশি মাথা ঘামান না। মানুষকে নানা নূতন অবস্থার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, নূতন আদর্শে তাহার চিত্তের সহজ গতিকে শাসিত করিয়া, মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন-সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া, তিনি নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে নানা বিচিত্র অভাবনীয়-তার ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার মনন-কৌতূহল সময় সময় তাঁহার বাস্তব নিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়াছে। যৌন আকর্ষণের ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়া তিনি নর-নারীর মধ্যে সহজ—

সৌহার্দ্যমূলক, লালসাহীন সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছেন এবং এই অনুমানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সমাজব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। H. G. Wells যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য, বিজ্ঞানপ্রসাদে মানবশক্তির কল্পনাতীত প্রসারের ভিত্তিতে মানবসমাজের এক অভিনব বিন্যাসের চিত্র আঁকিয়াছেন, প্রবোধকুমারও অনেকটা মানবের জৈব প্রবৃত্তি, সমাজবন্ধনের মূল তত্ত্বকে পাল্টাইয়া সমাজের সম্ভাবিত রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদিম প্রবৃত্তির আগ্নেয় উচ্ছ্বাস শান্ত, নিরুত্তাপ হইলে, সৌন্দর্যের লালসাময় মদিরতা সুস্থ দৃষ্টিকে ঘোরাল না করিলে, রক্তধারার বিদ্যুৎকণিকা হিমানীকণিকায় পরিণত হইলে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা যে বদলাইয়া যাইত, মানবের কাব্য-ইতিহাস যে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইত এই আনুমানিক সত্য তাঁহার উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। তাঁহার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসে এই কল্পনাটিই বাস্তব পরিবেশের কাঠামোতে রূপায়িত হইয়াছে।

আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কথঞ্চিৎ তীব্রতর প্রতিবাদ, ও ব্যঙ্গশীলতার তীক্ষ্ণতর প্রকাশ প্রবোধ-কুমার সান্যালের উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাঁহার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটির মৌলিকতা অনেকটা উদ্ভট-রকমের—মনে হয় যেন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া তিনি স্ত্রী-পুরুষের একটি নূতনতর সম্পর্কের পরিকল্পনা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীমতী ও জহরের আকস্মিক মিলনের ফলে তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রেমের তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু তাহার মদির, লোলুপতা-সিক্ত আবেগ, মান-অভিমান ও পরস্পরনির্ভরতা নাই। মনে হয় যেন সমাজ ও কাব্য দীর্ঘ-শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে প্রেমের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, লেখক তাহাকে চূর্ণ করিয়া তাহার ভিতরের মৌলিক আকর্ষণটুকু পৃথক করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রেম হইতে যৌন ও আবেগমূলক এই উভয়বিধ উপাদান বর্জন করিয়া তাহাকে বন্ধুত্বের উত্তেজনাহীন শান্ত-স্নিগ্ধ পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী জহরকে আহ্বান করিয়াছে প্রেমের প্রয়োজনে নয়, জহরের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে, তাহার নিষ্ফল বিদ্রোহের অপচয় বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে নব শক্তি সঞ্চার করিতে। প্রেমের এই অভাবাত্মক সংজ্ঞার মধ্যে নূতনত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের প্রেরণা হিসাবে ইহার অপ্রাচুর্য অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এই উপন্যাসের বিশেষত্ব ইহার পরিকল্পনায় নাই, আছে ইহার ধূসর আশাভঙ্গমূলক মনোবৃত্তির অগণিত তীব্র প্রকাশে। এই প্রকারের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গশীলতার অনেক উদাহরণ ইহা হইতে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। 'সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূলে যেটা থাকে, সেটা দান নয়, শোষণ'; 'সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বর্বরতার মধ্যে'; 'জীবনে যাহারা মনুষ্যত্ব আহরণ করে নাই, ধর্মকে অপহরণ করিবার লোভ তাহাদেরই অধিক', 'যাহারা ধার্মিক নয়, তাহারা ধর্মভীরু'; 'মূল্যদান করিয়া আজকাল দানের মূল্য দিতে হয়', 'মাটি, পাথর ও চিত্রপটই মানুষের অসংখ্য নির্বোধ কামনার সাক্ষ্য'; 'সন্দেহজনক বয়স যার কেটে গেছে, সেই বেশী সন্দেহজনক'; 'ঘুমোনো কবিদের নেশা, আর ঘুম-পাড়ানো তাদের পেশা'; 'সে ক্ষণিক-বাদিনী'—এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়া এক নূতন চিন্তাধারা ও মনোভাবের অভিব্যক্তি সূচিত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'অগ্রগামী' উপন্যাসেও (১৯৩৬) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা নূতন, সমাজ-বিরোধী, পরীক্ষামূলক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এই পূর্ণতর প্রেমের

পরিকল্পনা মোটেই সার্থক হইয়া উঠে নাই। প্রেমের সনাতন আদর্শবাদের উচ্ছ্বাস ও ইহার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল ব্যঙ্গপ্রধান, বিপ্লবাত্মক মনোভাবের একপ্রকার অদ্ভুত, অসংলগ্ন সংমিশ্রণ উপন্যাসের মধ্যে দুই বিপরীত ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। মায়ালতা ও সুরপতি উভয়েই এক দুর্বোধ্য খেয়ালের প্রেরণায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে ও সাক্ষাৎমাত্র তাহাদের সম্বন্ধটি একলম্ফে প্রেমাবেগের উচ্চতম পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে। আবার অমরেশ ও মায়ালতার সম্পর্কের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের নিরুত্তাপ মাধুর্যের সঙ্গে প্রেমের তীব্রতর হৃদয়াবেগ মিশিয়াছে। অমরেশ কবি ও সৌন্দর্যের উপাসক—মায়ালতার সান্নিধ্য তাহার কাব্যসৃষ্টির উৎস, তাহার সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা। শেষ পর্যন্ত অমরেশের সাহচর্যে সে তাহার আদর্শ, অনধিগম্য দয়িতের ধ্যান করিবার জন্য হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছে। সেক্রেটারী সুরেশবাবুর নির্লজ্জ, যৌন অনুসরণ তাহার মনে শান্ত প্রতিরোধ মাত্র জাগাইয়াছে, তাহাকে তীব্র বিরাগ ও চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানে উত্তেজিত করে নাই—এই যৌন আকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞাপন যেন তাহার পক্ষে অবাঞ্ছিত বন্ধুত্ব অপেক্ষা অধিকতর বিরক্তিকর নহে। এই সমস্ত বিরোধী ভাবের যদৃচ্ছ সংমিশ্রণ উপন্যাসের আবহাওয়াকে অসংগতিতে পূর্ণ করিয়াছে। প্রেম সম্বন্ধে কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এই অস্পষ্ট কুহেলিকাজাল হইতে উন্মেষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল মন্তব্যের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু চরিত্র ও সংশ্রবহীনতার জন্য ইহার বিশেষ কোন ঔপন্যাসিক সার্থকতা নাই। এই গভীর-উদ্দেশ্যহীন, খেয়ালী পরীক্ষাপ্রবণতা খানিকটা লঘু কাল্পনিকতার উচ্ছ্বাস মাত্র; ইহার মধ্যে না আছে অন্তঃসংগতি, না আছে মানস পরিণতির পূর্বাভাস।

তাঁহার ছোটগল্পের সমষ্টি 'অবিকল'-এর (১৯৩৩) মধ্যে দুইটি গল্প উল্লেখযোগ্য—'অবৈধ' ও 'অপরাহ্ণে'। প্রথম গল্পে গ্রাম্য বালিকা হরিদাসীর রেলগাড়ীতে মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই শিশুর জন্য সে স্বামী, সংসার সমস্ত পরিত্যাগ ও মিথ্যা কলঙ্ক বরণ করিয়া অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। মাতা কর্তৃক শিশু-পরিত্যাগের বিবরণ নিতান্ত আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য, কিন্তু হরিদাসীর ব্যাকুল, সর্বগ্রাসী স্নেহের চিত্রটি খুব চমৎকার হইয়াছে। 'অপরাহ্ণে' গল্পে স্টেশন মাষ্টারের করুণ, ব্যর্থজীবন, তাহার পূর্ব প্রণয়িনীর সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ও লৌকিক লজ্জায় অভিভূত প্রণয়িনী কর্তৃক পূর্বস্মৃতির রূঢ় প্রত্যাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই ছোটগল্প দুইটির করুণরসের মধ্যে লেখকের ব্যঙ্গশীলতার কিছুমাত্র পরিচয় মিলে না—ইহাদের উপর আমাদের সাহিত্যিক পূর্বধারারই অক্ষুণ্ণ প্রভাব।

প্রবোধকুমারের 'তুচ্ছ' উপন্যাসটিতে তিনি অনেকটা খাঁটি ঔপন্যাসিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াছেন। এখানে অবশ্য তিনি একটি ছোটছেলের জবানীতে একটি সমগ্র কুলীন পরিবারের প্রাচীন-সংস্কার-শাসিত জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিয়াছেন, ও এই পরিবারজীবনের পটভূমিকা-স্বরূপ কলিকাতার গোড়াপত্তনের যুগে নাগরিক জীবনের সহিত পল্লী-সমাজের যে বিস্তৃততর প্রতিবেশ-বন্ধন, প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় মনোভাবের সংমিশ্রণ ছিল তাহাও পরিস্ফুট করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজসত্তাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঘটমান কাহিনীগুলি বালকের অস্ফুট, রহস্যের আঁধার-ঘেরা চেতনার মধ্যে এক দ্রুত ও সঞ্চারী, বোঝা না-বোঝার মিশ্রিত ছায়াছবির অপরূপত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে। কুয়াসার মধ্যে দেখা

দৃশ্যাবলীর ন্যায় ইহার মানবচরিত্রগুলি অতিমানব আয়তন লইয়া অতিরঞ্জিত মহিমায় দেখা দিয়াছে। গৃহকর্ত্রী, বালকের দিদিমা, উহার উত্তরাধিকারবঞ্চিত, অকর্মণ্য বাক্যবীর মাতুল, পাড়াপড়শীর সংসারের নর-নারী, আত্মীয়-কুটুম্বের যাতায়াত, অধিকারবঞ্চিতা মেয়েদের ঈষৎ-অভিব্যক্ত মনোবেদনা, ছোটছেলের লোভ ও কাঙ্গালপনা, ভালবাসার অলক্ষ্য আবির্ভাব এই সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে বিচিত্র রূপ তাহা বালকের মুগ্ধ, বিস্ময়মণ্ডিত অনুভূতির অন্ধকার পটে উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য রেখায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য এই সত্যিকার উপন্যাসগুণসমৃদ্ধ রচনায়ও প্রবোধকুমারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁহার দার্শনিক উদাসীনতা ও জীবনের তীক্ষ্ণ, মর্মান্তিক বিকাশগুলিকে পাশ কাটাইয়া ইহার বিসর্পিত, আকস্মিকের চমকপূর্ণ গতিচ্ছন্দটিকে অনুসরণ করার প্রবণতা এখানে বালকের অনভিজ্ঞ, বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশের অবসর পাইয়াছে। বালক জীবনকে অনুভব করে বিচ্ছিন্ন চিত্রপরম্পরার যোগসূত্রহীন সমষ্টি-হিসাবে; ইহাদের মধ্যে একটি কেন যায়, অপরটি কেন আসে, ইহাদের আলো-আঁধার, আনন্দ-বেদনার বিশৃঙ্খল শোভাযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাহার নিকট অজ্ঞাত; ইহারা তাহার বোধশক্তিকে উদ্রিক্ত না করিয়া তাহার কল্পনা, অনুভূতি, তাহার অফুরন্ত বিস্ময়রসেরই পুষ্টিসাধন করে। প্রবোধকুমারের অন্যান্য উপন্যাসে যেমন গৃহছাড়া পথিক, তেমনি এখানে সংসারবোধহীন বালক দার্শনিকের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে।

প্রবোধকুমারের 'বনহংসী' তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনানুভূতির আর একটি প্রকাশ। সাধারণতঃ যুদ্ধকালীন বিপর্যয় আমাদের সমাজ ও মনোজীবনের যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছে, বাংলা উপন্যাসে তাহার বহির্মুখীন, করুণরসাত্মক পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের অভাবে মানুষের কি নিদারুণ বেদনা, কত রকম ফন্দি-ফিকির করিয়া অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করিতে হয়, চোরাকারবারী মুনাফাখোর সমস্ত জীবনের উপর কিরূপ ভয়াবহ কালোছায়া বিস্তার করিয়াছে, কোন বস্ত্রহীনা নারী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া অসহনীয় লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাংলা উপন্যাস এই বহির্মুখী লাঞ্ছনার, এই বস্তুগত অভাববোধের কাহিনীর অশ্রান্ত, করুণরসসিক্ত পুনরাবৃত্তি। প্রবোধ-কুমার এই বিপর্যয়ের গভীরতর অন্তর্জীবন ও সম্পৃক্ত স্তরে অবতরণ করিয়াছেন—অর্থনৈতিক রিক্ততার সঙ্গে জীবনের মর্যাদার অবলুপ্তি, শাশ্বত নীতিবোধ ও জীবনাদর্শের উন্মূলন, উৎকট আত্মস্বাতন্ত্র্য ও কলুষিত রুচির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের মনস্তত্ত্বপ্রধান রূপায়ণে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দারিদ্র্য অধঃপতনের গতিবেগকে দ্রুততর করিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু ইহার বীজ অন্তরে অঙ্কুরিত না হইলে এরূপ সামগ্রিক ভাঙ্গন ঘটিত কি না সন্দেহ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্নিহিত স্থূল স্বার্থপরতা, রুচির অমার্জিত স্থূলতা, ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও পারিবারিক নিয়মবন্ধন মানিবার অনিচ্ছা, এককথায় উচ্চ আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতাই যাহা ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ। বাড়ির প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এই ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী এক-একটি বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—অন্তরের কুৎসিত প্রবণতা বাহিরে নিরংকুশ বিকটতায় প্রকটিত হইয়াছে। দীপেন উৎকট শোষণনীতি ও হীন প্রতারণার পথে নামিয়াছে, দ্বিজেন সোজাসুজি চুরি ধরিয়াছে। দুই মেয়ের মধ্যে যমুনা যৌনলালসার অপূর্ণ স্বপ্নে ও নিষ্ক্রিয় ভাবরোমন্থনে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছে। ছোট

বরুণা আত্মবিক্রয় করিয়া দুদিনের সখ মিটাইয়াছে। মা তরুবালা দীর্ঘকাল সংসার-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিয়া মুখ-থুবড়াইয়া পড়া ভারবাহী পশুর ন্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও শেষ জীবনে অভাবের অসহনীয় চাপে তাহার চরিত্রের শালীনতা ও গৃহিণীর শাশ্বত আদর্শনিষ্ঠা হইতে স্খলিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিবর্তন, ভাস্বতীর প্রতি তাহার উদার স্নেহশীলতা, কদর্য সন্দেহ ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। এক সংসারের কর্তা মৃগেন্দ্র আদর্শে স্থির থাকিয়া বিনা প্রতিবাদে অভাব ও অক্ষমতার অন্ধতম গহ্বরে নামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বহু পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিবারের উপর সমস্ত প্রভাব হারাইয়া নিষ্ফল আত্মধিক্কারে দগ্ধ হইয়াছেন। একটি পরিবারের জীবনে এই নীতি ও বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী উপন্যাসটিতে প্রশংসনীয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানের, ব্যক্তিপ্রকৃতির সার্থক অনুবর্তনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই নির্মম বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেও প্রবোধকুমার আদর্শের স্বপ্নবিলাস, অভিনব উন্মেষের জন্য প্রতীক্ষা, অপরূপ জীবনানুভূতির জন্য স্পর্শোন্মুখতার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পঙ্ক সকলের দেহে মনে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহারই গ্লানিকর প্রতিবেশে এক অপূর্ব শুচিশুভ্র পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্বতীর চরিত্র ও উহার সহিত অতনুর সম্পর্ক-পরিকল্পনায় লেখক তাঁহার পরীক্ষামূলক মনোভাবের, তাঁহার সর্বদা নূতনের অনুসন্ধিৎসু মানস কৌতূহলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ মৃগেন্দ্রের পরিবারে ভাস্বতীর স্থান পাওয়াটাই এক অসম্ভবের ধার-ঘেঁষিয়া যাওয়া কল্পনাবিলাসের পর্যায়ভুক্ত। ভাস্বতী এই পরিবারে রক্তসম্পর্কহীন, দৈবাগত আগন্তুক না হইলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া ঝটিকার সমস্ত গতিবেগ, বিদ্বেষের পঙ্কিল প্রবাহের সমস্ত তরঙ্গভঙ্গ আবর্তিত হইত না। দীপেন যতই আত্মকেন্দ্রিক হউক, তাহার মায়ের পেটের বোনদের অন্ততঃ পরিবারের আশ্রয়লাভের অধিকার সে অস্বীকার করে নাই। তারপর অতনুর সঙ্গে তাহার বিচিত্র সম্পর্ক, অতনুর অর্থে তাহার অবাধ অধিকার ও সেই অর্থের জোরে ঘরকে উপবাসী রাখিয়া বাহিরের অভাব-মোচনের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা পরগাছার বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপতারই উদ্রেক করিয়াছে। অর্থানুকূল্য হইতে বঞ্চিত পরিবার তাহার স্বভাবমাধুর্য, নিরলস সেবা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার যে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নাই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যদি একটুকরা বরফ রাখা হয়, তবে উহার শৈত্যগুণ ত অনুভূত হইবেই না, বরঞ্চ প্রতিটি শিখা উহার হিংস্র দাহন-শক্তি লইয়া এই ব্যতিক্রমধর্মী পদার্থের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে ঘরে রাখিয়া ও উহাকে ঘরের মেয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়া, এই অজুহাতে অতনুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি মানব চরিত্রের উদ্ভট স্ববিরোধপ্রবণতারই একটি নিদর্শন। প্রবোধকুমার এই উদ্ভট অসঙ্গতির মধ্যেই নিজ আদর্শধর্মী কল্পনাবিলাসের ভাবগত প্রেরণা ও ঘটনাগত আশ্রয় খুঁজিয়া পান।

সে যাহা হউক, ভাস্বতীর মধ্যে লেখক এই নানা-বিরোধ-বিড়ম্বিত, অসংবৃত প্রবৃত্তির তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির আদর্শের আশ্রয়হীন, আধুনিক কালের একটি যুগোচিত জীবনস্বরূপকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা কোন স্থায়ী বন্ধনে বাঁধা না পড়িয়া চিরপথিক হইবে ও যৌন আকর্ষণের পরিবর্তে জনসেবার সূত্রে ইহার সমাজ-পরিমণ্ডল রচনা করিবে। প্রাচীন কোন আদর্শের সহিত ইহা মিলিবে না, কেন না অতীত বাস্তব পরিস্থিতি

ও ভাবপ্রেরণার সঙ্গে বর্তমানের দুরতিক্রম্য ব্যবধান। ইহা সর্বব্যাপী কলঙ্কের মধ্যে শুচি, নিরন্তর নির্যাতনের মধ্যে প্রসন্ন, আসক্তির সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্ত—উদার, নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে অভ্রান্ত অগ্রগতিশীল। কোন বিশেষ আকর্ষণে যদি ইহা ধরা দেয়, সমদর্শিতার সমতলভূমির মধ্যে যদি ইহাকে কোন ভাব-বন্ধুর গিরিশৃঙ্গের দুরারোহ উচ্চতার দিকে পদক্ষেপ করিতে হয়, তখন যে ইহার কেমন রূপ ও ছন্দ হইবে তাহা কিন্তু অনির্দেশ্যই রহিয়া গিয়াছে। অতনু-ভাস্বতীর সমগ্র উপন্যাস-জোড়া বোঝাপড়ার চেষ্টা, তাহাদের ভাববিনিময়ের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর, পুনরাবৃত্তির চক্রাবর্তন-ক্লিষ্ট ইতিহাসও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার অস্পষ্টতাজাল হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই। কথার কুহেলিকা ভেদ করিয়া কোন স্পষ্ট রূপ অনুভূতিগম্য হইয়া উঠে নাই। দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-প্রমাণের প্রয়াসের ন্যায় এই ইঙ্গিত-সংকেতে অভিব্যক্ত নূতন আদর্শও আমাদের ধাঁধায় ফেলিয়াছে। অতনু বেচারাও এই "ভাব হইতে রূপ ও রূপ হইতে ভাবে" অবিরাম যাওয়া-আসার লীলাভিনয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। সে একটা দুর্বোধ্য-অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া মিলনের প্রতীক্ষা করিয়াছে। অতনু নিজে একজন অসহায় দর্শক মাত্র, তাহার সমস্ত গতিবিধি ভাস্বতীর ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ামাত্র, সে নিজে হইতে আগাইয়া কিছু করে নাই। এই পুরুষ-প্রকৃতিলীলায় হরিদাসের প্রবর্তনের দ্বারা ইহাকে খানিক মানবিক রূপ দিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে— ইহার সবটাই অতিমানবিক স্তরের সূক্ষ্ম রসবিলাসের ব্যাপার। হরিদাস-হাইফেনের দ্বারা এই অনাসক্ত নারী ও ব্যাকুল পুরুষদের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত করা অসম্ভব। এই সব-বাঁধন-ছেঁড়া, সর্বাশ্রয়চ্যুত যুগে বাস্তবের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও চিত্তবৈকল্যের উপর ঊর্ধ্বাকাশে যে আদর্শের দীপ্ত রেখা নূতন আশা ও পরম আশ্বাসের ইঙ্গিতে ঝলসিয়া উঠে তাহা এখনও সর্বজনবোধ্য নিবিষ্টতায় স্থির রূপ লাভ করে নাই। তাহার আভাস মিলে আদর্শবাদীর স্বপ্ন—কল্পনায়, দার্শনিকের রহস্যভেদী মননে, পলাতক সৌন্দর্যসুষমার ক্ষণিক চমকে—'বনহংসী'তে সেই অনাগত জীবনের দূরশ্রুত ছন্দই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

প্রবোধ সান্যালের সদ্য-প্রকাশিত শ্রেষ্ঠগল্পসংগ্রহে তাঁহার শুষ্ক, ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও শিল্পোৎকর্ষ-পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বিপর্যয়ের চাপে বিকৃত ও বাঁকাচোরা মানব-প্রকৃতির অসঙ্গতিগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ ও এই অস্বাস্থ্যকর বিকারগুলিকে তিনি সার্থক রসসৃষ্টির প্রয়োজনে লাগাইয়াছেন। 'ক্যামেরাম্যান' গল্পে সিনেমার ছবি তোলার জন্য নির্বাচিত আরণ্য ভূমির প্রতিবেশে অতনুর ব্যক্তিত্ব-রহস্য শিল্পীর অভিনব অনুভূতির প্রতি আগ্রহ ও খেয়ালী মনের অস্থিরতার মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—সিনেমার ছবিতে কেবল দৃশ্যবৈচিত্র্য নহে, মানবিক পরিচয়ের অপূর্বতাও উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ছন্নছাড়া জীবনে পূর্বপ্রণয়িনীর সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ তাহাকে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহলের একটা নূতন উপলক্ষ্য দিয়াছে। পূর্ব প্রেমের করুণ স্মৃতিকে সে আহত আত্মমর্যাদার চিত্তবিকারে রূপান্তরিত করিয়া ক্যামেরাতে ইহাকে চিরকালের মত ধরিয়া রাখিয়াছে। 'ঐতিহাসিক' গল্পে শিমলা পাহাড়ের বনভোজন-উৎসব অতীত যুগের হৃদয়াবেগের কঙ্কালাকীর্ণ পূর্বস্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রেরণায়—ও বৃদ্ধদের ভ্রান্তি যে তরুণদের জীবনে

পুনরাবৃত্ত হইতেছে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে। 'প্রেতিনী' গল্পটি চন্দ্রময়ীর অতৃপ্ত অপত্যস্নেহ কিরূপ বক্র-কুটিল পথে, কিরূপ আত্মমর্যাদাহীন দুর্বোধ্য আচরণের ছদ্মবেশে তাহার ভাড়াটে-পরিবারগুলির জীবনযাত্রার সহিত মিলিতে গিয়া বার বার হীন সন্দেহ ও কঠোর প্রত্যাখ্যানের বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে তাহার করুণ ও খানিকটা অরুচিকর কাহিনী। মানুষের বিশুদ্ধতম আবেগ মাতৃস্নেহের এরূপ বীভৎস, বিরূপ পরিণতি মানবজীবনের প্রতিই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়। 'বিষ' গল্পে টুনির দুরন্তপনাকে গৌণ করিয়া তাহাকে আফিং-এর নেশার মৃত্যুগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার স্বামী কর্তৃক তাহার উপর দৈহিক নিপীড়নের চূড়ান্ত প্রয়োগের বীভৎসতা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে—দাম্পত্য প্রেমের এরূপ উৎকট বহিঃপ্রকাশ লেখকের কল্পনার বিকৃত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। 'মুক্তিস্নান' ও 'গুহায় নিহিত' দুইটি গল্পে পূর্ব প্রেমের দুইটি বিপরীতমুখী বিকার বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম গল্পে এক কিশোরী বাল্যসঙ্গিনী প্রৌঢ় বয়সে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ও বেকার স্বামীকে লইয়া স্টেশনমাস্টার হারাধনের বাড়িতে উঠিয়াছে ও অতিনির্লজ্জ আতিশয্যের সহিত এই পুরানো প্রেমের দোহাই দিয়া নানারূপ অসঙ্গত ও ইতর আবদার জানাইয়াছে—শেষ পর্যন্ত চুরি করিয়া এই স্কুমার মনোবৃত্তির হেয়তম অবমাননা ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পে শিক্ষিতা মহিলা দেবীরাণী তাহার সম্পর্কিতা ভগিনীর স্বামী ও তাহার পূর্ব প্রণয়ী প্রিয়কুমারের ঘরে অতিথিরূপে আসিয়া সেই অবিস্মৃত ভালবাসাকে নানা ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া অনুভব করিতে ও করাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিমার সন্দেহলেশহীন সরলতা, খুড়ীমার সদা-সন্দিগ্ধ সতর্কতা ও প্রিয়কুমারের ল। পরিহাসে সংবৃত, আত্মসংযমে কঠিন, ছদ্ম ঔদাসীন্য এই তির্যক বাসনা-প্রকাশের পরিবেশ রচনা করিয়াছে। মাঝে মধ্যে এই দৃশ্যতঃ শান্ত প্রতিবেশের মধ্যে দুই একটি আপাত-নির্দোষ নিগূঢ়ার্থক সংলাপ অগ্নিগর্ভ কামনার স্ফুলিঙ্গরূপে অন্তঃরুদ্ধ দাহ্য পদার্থ-সমাবেশের ইঙ্গিত দিয়াছে। 'কল্লান্ত' গল্পে যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ের ফলে মানবাত্মার চরম অধোগতির শিহরণকারী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভদ্র গৃহস্থ-বিধবা ও তাহার একমাত্র কন্যা অভাবের অসহ্য তাড়নায় ও কালের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে সৈনিক কর্মচারীদের বিলাসসঙ্গিনীতে পরিণত হইয়াছে—এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিবর্তন নহে, একটা সমগ্র যুগাদর্শের অবসান। এই গল্পগুলির মধ্যে প্রবোধকুমারের জীবনসমালোচনা সমস্ত ভাববিলাস ও আদর্শানুস্মৃতি পরিহার করিয়া কেমন করিয়া অসুস্থ মনোবিকার ও চরম অধোগতি-প্রবণতাকে জীবনের কেন্দ্রিক অভিব্যক্তিরূপে, উহার মুখ্যতম যুগপরিণতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও এই পরিবর্তিত জীবনাদর্শের রেখাচিত্র তিনি কিরূপ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও গভীর অনুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন তাহার বিস্ময়কর ও খানিকটা বিষাদজনক নিদর্শন পাওয়া যায়।

— ——

সপ্তদশ অধ্যায়

সমস্যা-প্রধান উপন্যাস—দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১)

দিলীপকুমার রায়

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। উপন্যাসের একটি বিশেষ ক্ষেত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া লইয়াছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্তরঙ্গ মিলন। প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের প্রথম পরিচয় ও সংঘর্ষ ও উহাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার বিবরণ বাংলা সাহিত্যের ও উপন্যাসের একটা বড় অধ্যায়। পশ্চিমের চিন্তাধারা ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, উহার হৃদয় ও জীবনসমস্যা আমাদের কবি-ঔপন্যাসিকেরা ক্রমশঃ আমাদের ঘরের বিষয়, আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একাঙ্গীভূত করিয়া তুলিতেছিলেন। দিলীপকুমার এই বহু-ব্যবহৃত পথে সর্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বাঙালীর চিত্তকে পাশ্চাত্য মহাদেশের বৈঠকখানা ও বহির্জীবন, সামাজিক মিলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তর অতিক্রম করাইয়া একেবারে তাহার নিভৃত মর্মস্থল, তাহার গভীরতম ভাববিনিময়ের অন্তঃপুরে, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রেম নিজ পরিচিত আবেষ্টনের বাহিরে, নিজ সনাতন সাথী—সহচরের সঙ্গচ্যুত হইয়া, এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। দিলীপকুমারের মন একদিকে যেমন সমাজ ও হৃদয়-সমস্যার আলোচনায়, যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণ নিপুণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, অন্যদিকে কাব্য ও ললিত-কলার রসোপলব্ধির দিক্ দিয়া নিজেকে সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই চিন্তাশীলতা ও নিবিড় রসোপলব্ধির যুগপৎ মিলন তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। বোধ হয় নিছক culture-এর দিক্ দিয়া উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আছেন কি না সন্দেহ এবং এই culture তাঁহার উপন্যাসের কেবল বহিরাবরণ বা বাহ্যসৌষ্ঠব নয়, ইহা ইহার কেন্দ্রীভূত সারাংশ, ইহার আবেদনের মূল সুর।

দিলীপকুমারের প্রথম উপন্যাস 'মনের পরশ'-এ (১৯২৬) নিবিড় ভাবানুভূতি অপেক্ষা তর্কসংকুলতারই অধিক প্রাদুর্ভাব। ইউরোপের বিভিন্ন প্রকৃতির নর-নারীর মতামত ও সহানুভূতির স্পর্শলাভ-আকাঙ্ক্ষাই ইহার বর্ণনীয় বস্তু। গোড়ার দিকে ইহার রসটি প্রণয়ের ব্যঞ্জনায় নিবিড় হয় নাই, শুধু মতামতের আদান-প্রদান, ঔদার্য-সহানুভূতির বিনিময়েই পর্যবসিত হইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষার্থী, কেম্ব্রিজ-প্রবাসী পল্লব মিসেস নর্টন, মিঃ টমাস, মিঃ স্মিথ, প্রভৃতি নানা-প্রকৃতির ব্যক্তির সংস্পর্শে তাহাদের মতামত ও মানসিক প্রবণতার স্বাদ-গ্রহণে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে। ম্যাডাম রিশারের সহিত তাহার পরিচয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সহানুভূতি-স্নিগ্ধ, করুণ-মধুর সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং ম্যাডাম রিশারের নিজ করুণ জীবন-কাহিনী ও সমাজ-বিধি-উল্লঙ্ঘনের বিবরণ সর্বপ্রথম পল্লবের মনে নির্মম নীতি-কাঠিন্যের নাগপাশ হইতে মুক্তির সূচনা করিয়াছে। তারপর ক্রমান্বয়ে কয়েকটি

প্রেমের অভিজ্ঞতা—মিস্ কুপার নামক ল্যাণ্ড-লেডির কন্যার প্রতি আকর্ষণানুভব, নাভালি ভগিনী-চতুষ্টয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সর্বশেষে আইরিনের সঙ্গে নিবিড় সর্বত্যাগী প্রেমের সম্পর্ক-স্থাপন—তাহার হৃদয়কে গভীর, অভিনব অনুভূতির প্লাবনে ভরিয়া দিয়া পূর্বতন বিধি-নিষেধের সীমারেখাকে নিশ্চিহ্নভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত আইরিন পল্লবেরই মুখ চাহিয়া তাহারই হিতার্থে নিজ গভীর অনুরাগ সংযত করিয়াছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দুইখানি পত্র বন্ধুত্ব ও প্রেমের বিদায়-বাণী বহন করিয়া উপসংহার আনিয়াছে—একখানি সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধ সমবেদনায় শীতল, আর একখানি প্রেমের দুঃসহ আত্মদমনের বিক্ষোভে চঞ্চল।

এই উপন্যাসে তর্কসংকুলতা একটু অধিক ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তর্কের বিষয়ের মধ্যে ইউরোপীয় ও প্রাচ্য দেশের নৈতিক নিষ্কলঙ্কতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আদর্শভেদ ও প্রেমের আসল স্বরূপ সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্ম আলোচনা হইয়াছে। পদস্খলনের ফল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজে তুল্যরূপ গুরুতর নহে—নিষ্কলঙ্কতার যে উচ্চ মূল্য আমরা ধার্য করি, তাহা দিতে না পারার জন্ম আমাদিগকে চিরজীবন মিথ্যাভাষণ ও কপটাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তারপর ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করিয়া প্রেমস্বীকার বা বর্জন করা উচ্চতর সার্থকতার দিক্ দিয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, সে সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য এই যে, সাবধানতার খাতিরে প্রেম-প্রত্যাখ্যান মনকে রিক্ত করে ও একটা শূন্যগর্ভ অহমিকার প্রশ্রয় দেয়। প্রেমের প্রকৃতিনিরূপণে দুঃসাধ্যতার বিষয় বিচারকালে লেখক বলেন যে, প্রেমকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামাজিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন করা নিতান্ত দুরূহ—প্রেমের শিখা স্থায়িত্বের জন্য মেলা-মেশা, সন্তানস্নেহ, সামাজিক অনুমোদন প্রভৃতি নানাবিধ অনুকূল ইন্ধনের দাবি করে। এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়াই লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তর্কের সহিত উপন্যাসের রসবস্তুর সংযোগ গভীর ও অন্তরঙ্গ হয় নাই—দিলীপ-কুমারের প্রথম উপন্যাসের আপেক্ষিক দুর্বলতা এইখানে।

'রঙের পরশ' (১৯৩৪) উপন্যাসে দিলীপকুমার তাঁহার প্রথম উপন্যাস হইতে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। অতনু ও দীপা অল্পদিন ছাড়াছাড়ির পর হঠাৎ ইতালীতে পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাদের পূর্ব-প্রণয়-আলোচনায় ও চিত্তবিশ্লেষণে রত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কবিতার সুকুমার আবেগ, প্রেমের পূর্বস্মৃতিরোমন্থন, সুপ্ত মনোভাবের অতর্কিত আত্মপ্রকাশ, বিষাদমিশ্রিত, দীর্ঘশ্বাসক্ষুণ্ণ হাস্য-পরিহাস—এই সকলে মিলিয়া প্রণয়ালোচনার এক অপরূপ প্রতিবেশ রচনা করিয়াছে। দীপার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত—সে অতনু ও রাজা উভয়ের যুগপৎ আকর্ষণে দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিল ও নিজের মন ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অবসর চাহিয়াছিল। সুতরাং অতনুকে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাইতেই তাহার অভিমান ও অন্তর্ধান এবং রাজার সহিত দীপার বিবাহ; আবার অতনুর পুনরাবির্ভাবে তাহার প্রতি দীপার অনুরাগ-সঞ্চার—ইহাই মোটামুটি দীপার প্রণয়েতিহাস। রাজা তাহার প্রতি দীপার প্রণয় অম্লান রাখিবার জন্য প্রেম হইতে সমস্ত বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্যের দাবি সরাইয়া লইয়া দীপাকে একাকিনী প্রণয়াভিসারে পাঠাইয়াছে, দীপা এই উদার বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নাই।

অতনুর কাহিনী আরও জটিলতম ও ঘাত-প্রতিঘাত-সংকুল। রুভা ও লরা এই উভয় প্রণয়িনীর প্রবল, অথচ বিপরীতধর্মী প্রেমের আকর্ষণে তাহার ইতস্ততঃ ভাব ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা চরম সীমায় উঠিয়াছে। রুভার প্রেম অনেকটা সাধারণ, বিশেষত্ববর্জিত, রূপ-গুণের আকর্ষণমূলক। তবে ইহার মধ্যে বেশ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক অন্তর্দৃষ্টির অভাব নাই। তাহার প্রেমের এতই অভ্রান্ত অনুভূতি যে, উদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে ঈষৎ স্পর্শ-সংকোচ উহার নিকট ধরা পড়ে, আদরের পরিবর্তে সহানুভূতি উহার উচ্ছ্বসিত অভিমানের উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়। কিন্তু লরার প্রেমকাহিনী আগাগোড়া অসাধারণত্বের উপাদানে পূর্ণ। লরা বিধবা—তাহার শ্রী ছিল, সৌন্দর্য ছিল না; তাহার কণ্ঠস্বর, আবৃত্তি ও কাব্যানুরাগ অতনুর আকর্ষণের প্রথম হেতু। লরার পূর্ব স্বামীর প্রতি মনোভাবও সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। লরার দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি স্নেহপরায়ণ মাতৃভাব, তাহার নিঃসঙ্গতা, মধ্যযুগসুলভ মনোবৃত্তি, দেহশুদ্ধির প্রতি অতি-মনোযোগ, গভীর ধর্ম-বিশ্বাস—এই সমস্তই তাহার চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছে। লরার মনে যে প্রেমের আদর্শ ভাস্বর ছিল, তাহা দেহাতীত; তাহার স্বামীর লুব্ধ উপভোগ-স্পৃহা এই দেহাতীত প্রেমকে পদে পদে অপমান করিয়াছে। কিন্তু স্বামীর এই ব্যবহার লরার মনে ঘৃণা অপেক্ষা করুণারই অধিক সঞ্চার করিয়াছে। লরার স্বামী যখন অতৃপ্ত রূপমোহের তাগিদে ব্যভিচাররত হইল, তখন লরা অযোগ্য স্বামীর প্রতি ভালবাসা একটা আধ্যাত্মিক সাধনার মত আরও বেশি করিয়া অনুশীলন করিয়াছে।

লরার আগমন রুভার আকর্ষণকে ব্যর্থ করিয়া অতনুর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল; লরাও তাহার স্বভাবসিদ্ধ একনিষ্ঠতা ও কঠোর আত্মসংযমের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অতনুর আকর্ষণ এড়াইতে পারিল না। ইতিমধ্যে গুস্তাভের পত্রে লরার প্রেমবিবশতার বিবরণে লরার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, তাহার প্রেম কাব্যের আদর্শলোক হইতে দেহের চতুঃ-সীমার মধ্যে অবতরণ করিল। অতনুর প্রতি তাহার অনিবার্য প্রেমসঞ্চার সে সমস্ত শক্তি দিয়া রোধ করিতে চেষ্টা করিল—কেবল দৈহিক বিশুদ্ধতার খাতিরে নয়, তার নিজ নিঃশেষিত-প্রায় প্রাণশক্তি, নির্বাপিতপ্রায়, ভস্মাবশেষ যৌবন-শিখার জন্য সংকোচেও। তারপর একদিন সমস্ত বাধা-সংকোচ ঠেলিয়া অনিবার্য মিলনের অপূর্ব কবিত্বময় জয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—পুরোহিতমন্ত্রহীন বিবাহ তাহাদের স্বতঃবিকশিত একাত্মতাকে অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধনে যুক্ত করিয়া দিল।

এদিকে রোগশয্যাশায়িনী রুভার কাতর অনুরোধে লরা অতনুকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নিকট পাঠাইল। রুভার রোগশয্যা খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রণয়-শয্যায় রূপান্তরিত হইল। অতনু লরার প্রেমের প্রতিষেধক সত্ত্বেও এই নবজাগ্রত আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আত্মসমর্পণের পর গভীর অনুতাপ ও আত্মধিক্কার অতনুকে অধিকার করিয়া বসিল—সে নিজ দুর্বলতা স্বীকার করিয়া ও যে-কোন প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজেকে প্রস্তুত জানাইয়া লরার নিকট পত্র লিখিল। লরার উত্তর আসিল—অনেক বিলম্বে। তাহাতে সে অতনুকে এক বৎসরের প্রতীক্ষার জন্য উপদেশ জানাইল। লরা অতনুর মধ্যে দুই বিপরীত ভাবের প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছে—এক যৌবনের ভোগপ্রবণতা ও কর্মশক্তি; আর এক, আধ্যাত্মিক জীবনের একনিষ্ঠ পরম প্রশান্তি। রুভার নিকট আত্মসমর্পণের জন্য এই দ্বৈত সমস্যা প্রবল হইয়া

উঠিয়াছে; সুতরাং কোন্‌দিকে তাহার আসল প্রবণতা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য এই বর্ষব্যাপী প্রতীক্ষা। পত্রের ছত্রে ছত্রে মধুর আন্তরিকতা, অসংশয় আদর্শবাদনিষ্ঠা ও আত্মবিলোপী প্রেমের সুর ঝংকৃত হইয়াছে।

এই উপন্যাসে মন্তব্য ও আলোচনা উপন্যাসের মূল ঘটনার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে—তাহাদিগকে আর বাহিরের আগন্তুক বলিয়া মনে হয় না। উচ্ছ্বাস ও তাহার বহিঃপ্রকাশ, গানের আবেদন, গান ও কবিতার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি-বিষয়ক মন্তব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতা ও সুকুমার রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের, বিশেষতঃ দীপা, রুক্তা ও লরা এই তিন নায়িকার চরিত্রের মধ্যে—পার্থক্য অতি চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রুক্তার চরিত্রে বৈশিষ্ট্যের আপেক্ষিক অভাব, কিন্তু অভিমান ও ঈর্ষ্যাপ্রবণতা তাহাকে সাধারণ নায়িকা হইতে পৃথক্ করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের আকাশে-বাতাসে প্রেমের গন্ধসার অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে—প্রেমের পটভূমিকার এরূপ নিপুণ সমাবেশ বাংলা উপন্যাসে বিরল।

'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা' (১৯৩৫)—এই উপন্যাস দুইটিও দিলীপকুমারের প্রেম-সমস্যা—আলোচনার প্রতি অতি-পক্ষপাতের উদাহরণ। বস্তুতঃ, তাঁহার উপন্যাসে প্রেমের যেরূপ সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও বহুমুখী বিশ্লেষণ হইয়াছে তাহা অন্যত্র দুর্লভ। ইউরোপীয় সমাজে তাঁহার প্রেমের লীলাক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নরনারীর মধ্যে অভিনব প্রণয়-সম্পর্ক গড়িয়া উঠায় তিনি পূর্বতন ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা অনেক বেশি বৈচিত্র্য অবতারণার সুযোগ পাইয়াছেন, ইহা সত্য। তথাপি প্রেম সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভবশীলতা না থাকিলে তিনি ইহার আলোচনায় এতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না। এই দুইটি উপন্যাসে প্রেমের যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা এই যে, প্রেমে একনিষ্ঠতা প্রার্থনীয় কি না, একই সময় সমান আন্তরিকতার সহিত উভয়ের প্রতি আসক্তি সম্ভব কি না বা একনিষ্ঠতা প্রেমের একটা অপরিহার্য অঙ্গ কি না। শেষ পর্যন্ত লেখকের নির্ধারণ এই যে, বহুমুখী প্রেম সমর্থন-যোগ্য, ইহা হৃদয়ের দৈন্য নয়, ঐশ্বর্য। প্রেম ও বিবাহের সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য এই যে, প্রেমের উন্মাদনা ও আবেগ একটা পলাতক, ক্ষণস্থায়ী মনোভাব, বিবাহের পাত্রে উহাকে চিরস্থায়ী করা যায় না। যেখানে কেবল সাময়িক মোহ নয়, আসল প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে সেখানে বিবাহ ব্যতীত দৈহিক মিলনে বিশেষ কিছু হানি আছে কি না, ইহার মীমাংসা হইয়াছে একটু অনিশ্চিত। সংযমের মহিমা, প্রাপ্তির জন্য মূল্যদান, দৈহিক লালসায় প্রেমাস্পদের নিকট হীন না হওয়ার চেষ্টা, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস—ইত্যাদি নানাবিধ উদ্দেশ্য একত্র হইয়া ব্যাপারটির মীমাংসাকে খুব জটিল করিয়াছে। আর একটা প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে, যথা, সতীত্ব একটা নিত্য-সত্য না স্থান-কাল-পাত্র, যুগ-বিবর্তন ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে তাহার মূল্য পরিবর্তনশীল। এ সম্বন্ধে লেখকের নির্দেশ এই যে, সতীত্বের গৌরব আর যে কারণের জন্যই হউক, প্রেমের স্থায়িত্বের মধ্যে তাহা নিহিত নয়। প্রেম স্থায়ী হয় বন্ধুত্ব বা মনের মিলের জন্য, কিন্তু এই বন্ধুত্ব প্রেমের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। প্রেম সর্বদা নূতনত্ব চাহে তাহার মাদকতা সজীব রাখার জন্য। বিশ্লেষণে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্যের যেমন, তেমনি প্রেমেরও মর্মমূল স্পর্শ করা যায় না। এইরূপ দীর্ঘ অথচ প্রাসঙ্গিক তর্কে কাহিনীর

প্রবাহ প্রতিপদে প্রতিহত হইয়াছে. কিন্তু আলোচনার সৌন্দর্য ও সুসংগতি ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দেয় নাই। কিন্তু এই গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনার শেষ প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকে। যে প্রেমের পলাতক প্রবৃত্তি সমাজব্যবস্থা ও বিবাহের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে স্বতঃই বিদ্রোহশীল, যাহা জীবনে একটা সর্বোত্তম সফলতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে, যাহার অনুসরণে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, প্রেমের পূর্বস্মৃতি, দৈহিক পবিত্রতারক্ষা সকলকেই বলি দেওয়া যায়, যাহা মনকে অপরূপ আবেশ ও নিবিড় ব্যথা-কোমলতায় পূর্ণ করে, তাহার প্রকৃত মূল্য কি? মিনা-নিলয়ের প্রেম যদি মিলনে সার্থকতা লাভ করিত, তবে মানুষ হিসাবে তাহারা কি উচ্চতর সফলতার দাবি করিতে পারিত, তাহাদের জীবন কি উন্নততর পর্যায়ে আরূঢ় হইত?—এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর মিলে না।

'বহুবল্লভ' উপন্যাসে শ্রীলা ও ডায়েনার বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে প্রদীপের চলচ্চিত্ততা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীলা স্বভাব-অকৃতজ্ঞা, দারুণ অভিমানিনী ও প্রশ্রয়-বিলাসিনী, ডায়েনার প্রতি তাহার ঈর্ষ্যা অতি সামান্য কারণেই অগ্ন্যুদ্গার করিয়াছে—ডায়েনা ও প্রদীপের কাব্যালোচনায় তাহার বিরক্তি অশোভন রূঢ়তার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ডায়েনা স্থির, শান্ত, আত্মদমনশীলা, প্রদীপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কিন্তু শ্রীলার আগমনের পর হইতে সে উহাদের সান্নিধ্য বর্জন করিতে সচেষ্ট। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেমের শিখাকে কেমন করিয়া উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে ডায়েনা ও প্রদীপের ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রদীপের শ্রীলাকে গ্রাস্‌মিয়ারে আনার আসল, অথচ নিজের কাছেও অজ্ঞাত উদ্দেশ্য, ডায়েনার অনুরাগের উত্তাপে শ্রীলার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে অসংশয়ে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে—ডায়েনার ছোঁয়াচে শ্রীলার কামনা জাগাইতে, তাহার মনের গূঢ়, সুপ্ত, অজ্ঞাত ইচ্ছাকে অনবগুণ্ঠিত করিতে। চার্লসের প্রতি ডায়েনার প্রণয়াভিব্যক্তি প্রদীপের উপর ঠিক একই প্রকারের প্রভাবান্বিত। শ্রীলার মূর্ছা বিভূতি ও প্রদীপের বিপরীতমুখী আকর্ষণের অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রসূত। প্রদীপ ডায়েনা ও শ্রীলার মধ্যে শেষ নির্বাচনে মনঃস্থির করিতে পারে নাই—উভয়ই তুল্যরূপে প্রার্থনীয় ও অবর্জনীয় বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে। এই একনিষ্ঠতার অভাবের জন্যই শেষ পর্যন্ত উভয়েই প্রদীপকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। রূঢ় আঘাতে বিচলিত প্রদীপ সংসারের এই মূঢ় নিষ্ঠুরতার বিষয় চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—তাহার মনোবীণা Shelleyর Epipsychidion-এর সুরেই বাঁধা—

> True love in this differs from gold and clay,
> That to divide is not to take away.

এই তিনটি নর-নারী ছাড়া, ডায়েনার খুড়া সার ফ্রান্সিসের চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। তাঁহার অন্তঃকরণে আভিজাত্যগর্ব ও স্নেহের বিরোধ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্নেহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে কত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী করে, সার ফ্রান্সিস্ তাহার উদাহরণ। ইহা ছাড়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পবিত্র-স্মৃতিজড়িত, সাহিত্যের মহাতীর্থ গ্রাস্‌মিয়ার ও হ্রদপ্রদেশের সুকুমার ও মনোজ্ঞ বর্ণনা, পাতায় পাতায় কবিবরের কাব্য-সুরভির অজস্র বিকিরণ উপন্যাসের আকর্ষণ বহুগুণে বাড়াইয়াছে। A. E.র Outcaste কবিতার চমৎকার ভাষান্তর সমস্ত উপন্যাসের উপর আদর্শলোকের নক্ষত্রদীপ্তি বর্ষণ করিয়াছে।

'হুথারা' গল্পে তার্কিকতার ফাঁকে ফাঁকে যে করুণ হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা তর্কের সীমা ছাড়াইয়া রস-সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তর্কের মধ্য দিয়া ওল্‌গা, রেণে, নিলয় ও পিয়ারের ব্যক্তিত্ব, তাহাদের মত-সংঘর্ষ ও হাস্য-পরিহাস অবাধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পিয়ারের দুর্ভাগ্যপূর্ণ দাম্পত্য অভিজ্ঞতা, নিলয়ের প্রেমকাহিনীর করুণ ব্যর্থতা তর্ককে সংযত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশ-প্রভাব—মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা, নদীর কম্পিত প্রবাহ, গানের সুরের করুণ-ব্যঞ্জনাপূর্ণ রেশ সমস্তই—তর্কের উপর গীতিকাব্যের মাধুর্য ও সুষমা আরোপ করিয়াছে।

আসল গল্পটির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ-কৌশলও চমৎকার। প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি, কঠোর ক্ষত-বিক্ষতকারী, রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব, গূঢ় মান-অভিমান, উন্মুখতা—পরাঙ্মুখতা—এক কথায় প্রেমিক-হৃদয়ের অমৃত-হলাহলমিশ্রিত সমুদ্রমন্থন খুব নিপুণ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিলয়ের সংকোচ ও সংযম, হারমানের অতি-মানব উদারতা, মিনির প্রাণঘাতী সংশয়ান্দোলন—সমস্তই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের নিদর্শন। বিশেষতঃ মিনির ডায়েরীতে উদ্‌ঘাটিত ভূমিকম্পের ন্যায় দুর্বার, সর্বধ্বংসী অন্তর্বিপ্লব যেন আগ্নেয় অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়-ব্যাকুলতা যেন সহস্র ধারে, নির্ঝরের শত উৎসারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রতি হৃদয়-স্পন্দন, প্রত্যেকটি আকর্ষণ-বিকর্ষণের তীব্র গতিবেগের উপর প্রেমের অপরূপ দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে। প্রেমের এই অগ্নিগর্ভ আলোড়নের চিত্র হিসাবে এই ক্ষুদ্র গল্পটি স্মরণীয় হইবে।

উপন্যাস-রচনা ছাড়া আরও দুইটি ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বিস্তৃত হইয়াছে—অনুবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা। মোটের উপর কবিতার অনুবাদে তিনি আশ্চর্যরূপ সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য সমস্ত কবি সম্বন্ধে তিনি তুল্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত যে সমস্ত কবির প্রকাশভঙ্গী সরল ও ঋজু, তাহাদের কবিতার অনুবাদ শব্দবাহুল্যের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। "She was a Phantom of Delight" কবিতার অনুবাদ অলংকারবাহুল্যের জন্য কবিপ্রতিভার বিশিষ্ট ধারাটি রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু যে সমস্ত কবির মধ্যে mysticism বা মর্মপন্থিতার স্পর্শ বা ভাবব্যঞ্জনার প্রাচুর্য আছে তাহাদের ভাষান্তরকরণে দিলীপকুমারের সাফল্য অবিসংবাদিত ও উচ্চ প্রশংসার অধিকারী। ভাবের তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততা, ভাষার ক্ষিপ্র দ্যুতি, চিন্তাধারার দ্রুত পরিবর্তনগুলি আশ্চর্য লঘুতার সহিত ও অবলীলাক্রমে ভাষান্তরের নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। A. E.র Outcaste কবিতাটির অনুবাদ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত অনুবর্তন-নিপুণতার চমৎকার উদাহরণ—ইহা মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব দাবি করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সমালোচনার ক্ষেত্রে দিলীপকুমার একটি বিশিষ্ট মতবাদের পক্ষসমর্থনকারী। উপন্যাসের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যে বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সাহিত্যে রসসর্বস্বতার (art for art's sake) বিরুদ্ধে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক উপন্যাসে সমাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণমূলক অবান্তর প্রসঙ্গের অতি-প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি উপন্যাসের রস-ভাণ্ডার নিছক বুদ্ধিগত উপকরণবাহুল্যে ভারাক্রান্ত করার প্রবণতাকে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। দিলীপকুমারের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, উপন্যাসের পরিধি ও প্রসার ক্রমবর্ধনশীল—ইহার মধ্যে মানবজীবনের সমস্ত প্রশ্নসংকুলতা, সমস্ত উত্তরহীন জিজ্ঞাসা, উহার সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা, আদর্শলোকের অভিমুখে অভিযান-প্রয়াস—এক কথায় বর্তমান যুগে মানব-চিত্তের সমস্ত আলোড়ন ও অনুপ্রেরণা—আশ্রয় লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই সর্বব্যাপী আতিথেয়তা আধুনিক উপন্যাসের ত্রুটি নহে, গৌরব। নিছক রসোপভোগের মানদণ্ডে এই সমস্ত তরঙ্গিত বিক্ষোভকে বর্জন করিলে উপন্যাস মানুষের চিত্ত-স্পন্দনের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া ক্রমশঃ শীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই মতবাদ তিনি সুপ্রযুক্ত যুক্তিতর্ক-সহযোগে ও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন—যুক্তি ও ভাষার প্রয়োগ-কৌশলে তাঁহার নিবন্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অনুপযুক্ত হয় নাই। সমস্ত নিবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে একটা ক্ষুব্ধ স্নেহানুযোগ ধ্বনিত হইয়া উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষবৃদ্ধির হেতু হইয়াছে। Theoryর দিক দিয়া দিলীপের মতবাদ যে সর্বথা সমর্থনযোগ্য তাহা নিঃসন্দেহ—আর্টের সৌন্দর্য জীবনের বিচিত্র-তরঙ্গায়িত, চঞ্চল প্রবাহে নিজ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লইতে বাধ্য, জীবনবিশ্লিষ্ট আর্ট ক্ষণভঙ্গুর ও স্বল্পায়ু। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আর্ট জীবনের অনুগামী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা, আকস্মিকতা ও অর্থহীন বস্তুস্তূপও যে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কথা বলা যায় না। জীবনের যতটুকু অংশ সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করা যায়, ততদূর পর্যন্ত আর্টের বিস্তৃতিসাধনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর্টের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে হইলে বিশৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইতে হইবে। জীবনের অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকার্য, কিন্তু আর্টের সনাতন মর্যাদা-অনুসারে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত মূল্যদানও অপরিহার্য। কোনও বিশেষক্ষেত্রে জীবনের কোন খণ্ডাংশ আর্টের গণ্ডির মধ্যে অনধিকার-প্রবেশের জন্য অপরাধী হইয়াছে কি না, তাহার বিচার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত রসবোধের উপর নির্ভর করে। অনধিকার-প্রবেশের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে উদাহরণ পুঞ্জীভূত করার প্রয়োজন নাই—দিলীপকুমারের রচনা হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। তাঁহার 'মনের পরশ'-এ যে তার্কিকতা সৌন্দর্যে ও সুষমায় অপরিণত রহিয়া গিয়াছে, 'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা'য় তাহাই সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত ও হৃদয়াবেগে সঞ্জীবিত হইয়া উপন্যাসের মূল বিষয়ের একাঙ্গীভূত হইয়াছে।

এই সমস্ত উপন্যাসের একত্র বিচার করিলে, বিষয়ের সংকীর্ণতার জন্য কিছু একঘেয়েমির ভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রেমের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনার ফলে ইহাদের মধ্যে কতকটা বলিষ্ঠ পৌরুষের অভাব ও রমণীসুলভ কোমলতার (effeminacy) আধিক্য অনুভূত হয়। বাঙালীর ছেলের প্রেমে পড়িবার জন্য ইউরোপীয় মেয়েদের মধ্যে একান্ত ব্যাকুলতা ও প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব আমাদের জাত্যভিমানকে যে পরিমাণে পুষ্ট করে, ঠিক সেই পরিমাণে অবিশ্বাসের হাসিরও উদ্রেক করে। তথাপি, এ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দিলীপকুমারের উপন্যাসগুলির যে একটা বৈশিষ্ট্য ও স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা আছে তাহা অকুণ্ঠিত-ভাবে বলা যাইতে পারে।

(২)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রচনা অপেক্ষা সাহিত্যিক আলোচনার জন্যই অধিকতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার গল্পসমষ্টি 'রিয়ালিষ্ট' (১৯৩৩)-এ তিনি প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গল্পরচনার রীতি ঠিক একই রূপ—গল্পের convention-এর প্রতি বিদ্রূপ ও উহার ভিতরকার কল-কব্জার রহস্যোদ্‌ঘাটন। চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধির লঘু ক্ষিপ্রতা ও epigram-রচনায় সিদ্ধহস্ততা ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—বাগাড়ম্বর ও অবান্তর প্রসঙ্গের বাহুল্য তাঁহার রচনাকে অনেকটা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পে লেখক একটি সুপরিচিত গানের মনোভাবমূলক প্রতিবেশ কল্পনা করিবার জন্য একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। 'রিয়ালিষ্ট' গল্পটি সর্বোৎকৃষ্ট; ক-বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রিয়তায় বেশ মুখরোচক হইয়াছে। মনোরমার সহিত ক-বাবুর ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটি প্রারম্ভে উপভোগ্য হইলেও, অযথা বাগাড়ম্বরের চাপে উহার তীক্ষ্ণাগ্রতা হারাইয়াছে।

ধূর্জটিপ্রাসাদের পরবর্তী তিনখানি উপন্যাসে—'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' ও 'মোহানা'য় —তিনি অনুকরণ কাটাইয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাসত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। খগেনবাবুর আত্মসন্ধান ও জীবন-সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার দাম্পত্য বিরোধের যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও হ্রস্ব সংকেত মিলে সেগুলি বর্ণোজ্জ্বল্যে ও নির্বাচন-সার্থকতায় এক সম্পূর্ণ চিত্রে সংহত হইয়াছে। সাবিত্রীর সন্দেহপ্রবণ, অভিমানী, একগুঁয়ে প্রকৃতিটি কয়েকটি ক্ষুদ্র আভাস-ইঙ্গিতে চমৎকার ফুটিয়াছে। একদিকে সাবিত্রীর স্থূল ফ্যাশন-অনুবর্তিতা, অন্যদিকে খগেনবাবুর শ্লেষপ্রবণ, অসহিষ্ণু আদর্শ-বাদ—এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের যে আগুন জ্বলিয়াছে, সাবিত্রীর আত্মহত্যা তাহাতে পূর্ণা-হুতি দিয়াছে। উপন্যাসের আসল বিষয় হইল সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত খগেনবাবুর এক অতি সূক্ষ্ম, জটিল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার বিবরণ। রমলার খগেনবাবুর প্রতি সমবেদনা ও শুশ্রূষা শীঘ্রই প্রবল প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। খগেনবাবুর মননশীলতার আভিজাত্যবোধ তাঁহাকে আত্মানুশীলন ও অন্তর্দৃষ্টিলাভের জন্য নির্জনবাসে প্রণোদিত করিয়াছে। কিন্তু কাশী যাওয়ার পর সামাজিকতার প্রয়োজনবোধ আবার তীব্র হইয়াছে। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া রমলার সাহচর্যলাভের জন্য যে ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়াছে, তাহাকে প্রেমের অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া যায়। গ্রন্থের শেষে সুজনকে লিখিত পত্রে অধিকতর শান্ত ও সংযতভাবে এই সুরই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। মৈত্রী ও উদাসীন নারী-প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রতি সচেতন আগ্রহের প্রথম শিহরণ—এই উভয়ই নায়কের সঙ্গ-পিয়াসী মনের নিকট কাম্য হইয়া উঠিয়াছে। রমলার উত্তরে অকুণ্ঠিত প্রেমনিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে।

খগেনবাবুর দিন-লিপিতে জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র ও বহুমুখী আলোচনা একদিকে সর্বত্রসঞ্চারী তীক্ষ্ণধীর পরিচয়স্থল, অন্যদিকে হৃদয়ান্দোলনের তরঙ্গে হিল্লোলিত ও প্রাণময়। গভীর চিন্তা-শক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি-সীমা

পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কাশীর আকাশ-বাতাসে, ধর্মচর্চায় রুদ্ধসাধনের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ রুদ্ধ বাসনার অঙ্কুরোদ্গমের যে অনিবার্য প্রেরণা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খগেনবাবুর চিত্তে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এই প্রাণধর্মের প্রবল ঝলকে জীবন সম্বন্ধে নূতন সত্যের অনুভূতি ঝলসিয়া উঠিয়াছে। আদর্শবাদের মানদণ্ডে জীবনকে মাপিবার প্রচেষ্টার সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়িয়াছে। জীবনে প্রেম যে সহজ ও সুন্দর সামঞ্জস্য আনিয়া দেয়, ও প্রেমাস্পদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের স্বাধীন, অকুণ্ঠিত স্ফুরণ যে এই সামঞ্জস্যের একটা প্রধান অঙ্গ—এই সত্যের উপলব্ধি আসিয়াছে। প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য একটা ব্যগ্র উন্মুখতা জাগিয়াছে। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে সাধারণ অনুভূতিকে বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিতে কুণ্ঠা—অতিরিক্ত চিন্তাজর্জর জীবনের চিরন্তন অভিশাপ, হ্যামলেটের 'বাঁচি কিংবা মরি'—চলচ্চিত্ততার ছোঁয়াচ। "সাহসের অভাবই হল আমার প্রধান বিপত্তি, ভয়ই আমার প্রধান রিপু"; "প্রেমে যে বিরোধের অবসান সে অবসান আমার নয়"—এই স্বীকারোক্তিই রমলার সহিত তাহার প্রকৃতির পার্থক্যকে স্ফুট করিয়াছে। "রমলার ধর্ম আছে, তার অভিজ্ঞতা উত্তমরূপেই ধৃত, তাই তার পদক্ষেপ লঘু। অধার্মিকেরাই স্থূল হয়।"

প্রেমের দ্বারা বিরোধ-অবসানের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার পর আর্টের পথে সামঞ্জস্য-লাভ কতদূর সম্ভব তাহাই আলোচিত হইয়াছে। প্রধানের সহিত অপ্রধান, সার্থকের সহিত অবান্তরের সমাবেশ-কৌশল আর্টের বিশেষত্ব ইহা কি জীবনে সংক্রামিত হইতে পারে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া অনেকটা অমীমাংসিত রহিয়াছে। এই আলোচনাতে উচ্চাঙ্গের মননশক্তির পরিচয় থাকিলেও, ইহা উপন্যাসের বিশেষ সমস্যার সহিত অপেক্ষাকৃত নিঃসম্পর্ক। তারপর আসিয়াছে আবার এক বিপরীতমুখী দোলা—শুষ্ক বুদ্ধির বিরুদ্ধে বুভুক্ষু হৃদয়াবেগের দাবি-সমর্থন। এবার ফুটিয়াছে রমলার প্রতি প্রেমের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ও সহানুভূতির আবেদন। এই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবার আত্মরতির পরিবর্তে কর্মপ্রেরণা ও সেবাব্রতগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে—এবং এই সংকল্পই অবিরত আত্মবিশ্লেষণে ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় দিয়াছে। ফল হইয়াছে কাশী ছাড়িয়া আরও সুদূর অজ্ঞাতবাস ও পরিব্রাজকের জীবনযাত্রা-অবলম্বন।

'আবর্ত'—'অন্তঃশীলা'র উপসংহার—পূর্বগামী উপন্যাসের ঘটনা ও চিত্তবিশ্লেষণের জের টানিয়া চলিয়াছে। ইহাতে 'অন্তঃশীলা'র কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও তাহাদের সমস্যা ও জীবনাদর্শ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। রমলা এখন সমস্ত সংযম, শালীনতার আবরণ ছিঁড়িয়া নিজ কামনার নগ্ন বাস্তবতা প্রকটিত করিয়াছে। খগেনবাবুর প্রতি তাহার লোলুপতা অন্তর-বাহিরের সমস্ত বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া অনিবার্য বুভুক্ষার মূর্তি ধরিয়াছে। এইবার সুজনের হৃদয়-উন্মোচনের পালা। রমলার সহিত তাহার সম্বন্ধের মধ্যে ছোট ভাই-এর স্নেহবুভুক্ষার সহিত অজ্ঞাতসারে প্রণয়ীর অধিকারমূলক অলক্ষ্য দাবির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। রমলার নিজ ব্যবহারেই এই কামনার বীজ সুজনের মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখন খগেন-বাবুর প্রতি রমলার নিঃসংকোচ প্রেমাভিব্যক্তিতে এই অবচেতন লালসা দুর্নিবার তীব্রতার সহিত অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে। কাশীতে অভয়ের গৃহে তাহাদের একরাত্রির একত্রবাসে এই অন্তঃরুদ্ধ আবেগের সমস্ত অসহনীয় উত্তাপ ও জ্বালার বিকিরণ অনুভব করা যায়—যদিও

ঘটনার দিক্‌ হইতে ইহার স্বাভাবিকতা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার মধ্যে বঞ্চিত প্রেমিকের তিক্ত ক্ষোভ ও খগেনবাবুর প্রতি তাহার উচ্চ ধারণার বিপর্যয়ে আদর্শবাদের মোহভঙ্গ প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। সে বিজনকে আনাইয়া বালির বাঁধের দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গরোধের হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছে; মাসীমার সংস্কারকে উত্তেজিত করিয়া রমলার উদগ্র কামনার এক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পরাশ্রয়ী জীবনের সমস্ত বুকজোড়া ক্লান্তি ও আশালেশহীন ঔদাস্য লইয়া সে রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে বিজনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত। সে সুজন ও খগেনবাবুর বিপরীতধর্মী—সুস্থ, স্বাভাবিক তারুণ্যের প্রতীক। সুজন যেন নরেনের জগৎ হইতে আমদানি, ছোটভাই ও প্রেমিকের সংমিশ্রণ, বিজন খাঁটি ও অবিমিশ্র ছোটভাই। খগেন-বাবুর প্রতি তাহার সুগভীর অবজ্ঞা, সামঞ্জস্যহীন বিরোধ। যে জটিল চি ন্তাধারার আবর্তে খগেনবাবু হাবুডুবু, সুজন যে সাংঘাতিক ঘূর্ণিচক্রের দিকে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, বিজন তীরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া কতকটা অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার সহিত তাহাদের সেই দুর্দশা দেখিতেছে। তাহারও যৌবনসুলভ খেয়াল আছে – সে সাম্যবাদের একটানা স্রোতে নিজ অনভিজ্ঞ ভাববিলাসের চিত্রিত তরণী ভাসাইয়াছে। তথাপি সেও রমাদি ও সুজনের মধ্যে যে স্তব্ধ ঝটিকার পূর্বাভাসপূর্ণ, বিদ্যুদ্‌গর্ভ নীরবতা নামিয়া আসিতেছে তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং এই আসন্ন বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে সে সুজনেরই পাশে দাঁড়াইয়াছে। রমলার সান্নিধ্য হইতে পলায়নের জন্য সে সুজনকে যে সনির্বন্ধ, স্নেহানুযোগযুক্ত অনুরোধ জানাইয়াছে, তাহা যেন সমস্যাপীড়িত প্রৌঢ়জীবনের প্রতি অপরিণতবুদ্ধি যৌবনের আন্তরিক, কিন্তু কার্যতঃ অক্ষম, সতর্কবাণী—সে বিপদের প্রকৃতি না বুঝিয়াও তাহার গুরুত্ব বোঝে।

রমলার একরোখা অগ্রহাতিশয্য প্রতিহত হইয়াছে তাহার প্রেমাস্পদের পারদের ন্যায় চঞ্চল, দানা বাঁধিতে অক্ষম, বিভিন্নমুখী আকর্ষণে আন্দোলিত প্রকৃতির দ্বারা। তাহার মুহূর্ত-পূর্বের বিগলিত হৃদয়ধারা পরমুহূর্তে বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিতেছে—একদিনের আগ্রহ পরদিনের ঔদাসীন্যে সংকুচিত হইতেছে। হিমালয়-ভ্রমণ ও হরিদ্বারে আশ্রমবাসের সময় রমলার উগ্র কামনার স্মৃতি কখনও কখনও খগেনবাবুকে অভিভূত করিয়াছে; এক একদিন নিজেরও আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর রমলা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব আর কোনও নূতন পরিবর্তন-রেখায় দৃঢ়াঙ্কিত হয় নাই। প্রেমের চিন্তা অপেক্ষা আশ্রমের কৃত্রিম ও শূন্যগর্ভ জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্পষ্টতর অভিব্যক্তি পাইয়াছে। "হিমালয়ের বিপুলতায় আশ্রম যেন প্রক্ষিপ্ত, গীতার নিষ্কাম ধর্ম যেমন মহাভারতের স্বাভাবিক ক্ষাত্র-ধর্মে প্রক্ষিপ্ত, যেমন প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরমাত্মা প্রক্ষিপ্ত"—এই মন্তব্যই আশ্রম সম্বন্ধে তাহার মনোভাবদ্যোতক। হিমালয়ের নিজস্ব মহিমা, তাহার বিপুল প্রশান্তি মানুষের বুদ্ধির অহংকার ও হ্যামলেটিয়ানার আত্মসর্বস্বতার প্রতিষেধক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—তথাপি খগেনবাবু সেখানেও নিজ সমস্যার সমাধান পায় নাই। কাশী ফিরিয়া রমলার সহিত মুখোমুখি বোঝাপড়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আবার নায়কের স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা, চরম-নিষ্পত্তি-গ্রহণে অক্ষমতা প্রকটিত হইয়াছে। সে

আবার আত্মপরীক্ষার জন্য অবসর চাহিয়াছে। রমলা এই সমস্ত বিলম্ব ঘটাইবার অজুহাত সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং পরবর্তী দুই দিন কতকটা রমলার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ও কতকটা কাশ্মীর সানাই-এর সম্মোহন, সমন্বয়কারী প্রভাবে খগেনবাবুর সন্দেহ-দোদুল চিত্তে প্রেমের আবেগ ও সহজ মাধুর্য সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু অতি সামান্য কারণে এই হৃদয়াবেগের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভাটার টান ধরিয়াছে। রমলার চাঁপা রঙের শাড়ী ও অনাবৃত বাহু—তাহার অন্তরের বহ্নিজ্বালার রক্তিম প্রতিচ্ছবি—নায়কের ধূসর, চিন্তাক্লিষ্ট মনে বর্ণোচ্ছ্বাসের বিহ্বলতা, সংযম ও আতিশয্যের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। মাসীমার সহিত সাক্ষাতের পর আবার নূতন সংশয়ে তাহার মন দোলায়িত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিজনের দোহাই দিয়া যে উষ্ণ, বেগবান আবেগধারা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহাকে সে রোধ করিতে চাহিয়াছে। সুজন, রমলা ও খগেনবাবু—তিন জনের নিকটই বিজনের বিশেষ মর্যাদা ও মূল্য আছে। সুজন রমলার অসংযত হৃদয়াবেগকে লজ্জা দিবার জন্য তাহাকে হাজির করিয়াছে; রমলা লজ্জা এড়াইবার জন্য তাহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়াছে; খগেনবাবু বিজনের সাম্যবাদমূলক সমাজব্যবস্থায় তাহাদের এই ...ক্তিক প্রেমের কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিক্ষণকে পিছাইতে চাহিয়াছে। রমলা ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে বলি দিতে নারাজ; খগেনবাবু ভবিষ্যৎহীন বর্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, যে মিলনে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ নাই তাহা তাহার নিকট অর্থহীন। কাজেই শেষ পর্যন্ত চালমাত দাঁড়াইয়াছে; অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া আবর্তের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি জীবনে স্থায়ী হইয়াছে। উপন্যাসের শেষ ঘটনা—মাসীমার মৃত্যু-অবস্থাকে কোন পরিবর্তনের ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করা যায় না (যদিও পরবর্তী খণ্ড 'মোহনায়' ইহার উপর এইরূপ গুরুত্বই আরোপিত হইয়াছে)।

মননক্রিয়ার আধিক্য ও বিস্তার সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়াছে। চিন্তার নানামুখী তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও খগেনবাবুর সত্তার কেন্দ্রবিন্দু স্থির আছে। রমলা সাবিত্রী ও সুজনেরও দুর্বিষহ জীবনসমস্যা তাহাদের জীবন্ত হৃদয়স্পন্দনকে চাপা দেয় নাই—সমস্যা জীবনতরুরই কণ্টকিত পল্লব। বিজন ইহাদের মধ্যে অনেকটা যান্ত্রিক ও প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি—তাহার নিজের জীবন অপেক্ষা অপরের উপর তাহার প্রভাবই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মাসীমাও এইরূপ গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে পড়েন—খগেনবাবুর প্রতি তাঁহার স্নেহশীলতা মাঝে মাঝে সন্দেশ খাইবার নিমন্ত্রণেই নিঃশেষিত; তাঁহার মধ্যে ঔদাসীন্য ও শুভানুধ্যায়িতার সমন্বয় স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। 'অন্তঃশীলা'য় নায়ক খগেনবাবু, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা জ্ঞানের পরিধিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 'আবর্ত'-এর নায়ক প্রকৃতপক্ষে সুজন—গ্রন্থে তাহারই প্রকৃতিরহস্য-উন্মোচন; এখানে মননশক্তির আপেক্ষিক সংকোচ। সোশিয়ালিজমের আলোচনা যেন সমাজনীতির রাজ্য হইতে আমদানি, ঔপন্যাসিক চরিত্রের সহিত প্রাণসম্পর্কহীন। মোটের উপর উপন্যাসদ্বয় উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত—নূতন রীতিপদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ও বৈদগ্ধ্যের সহিত বাস্তবসৃষ্টির সুষ্ঠু সমন্বয়।

এই উপন্যাস-ত্রয়ীর শেষ পর্যায় 'মোহানা'য় পূর্ববর্তী অংশগুলির উৎকর্ষের মানদণ্ড অনেকটা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। মাসীমার মৃত্যু খগেনবাবু ও রমলার মিলনের পথের লৌকিক অন্ত-

রায়কে অপসারিত করিয়াছে। কিন্তু কতকটা খগেনবাবুর উদাসীনতা ও অনাসক্তি, কতকটা উভয়ের আদর্শ-বৈষম্যের জন্য এই ক্ষীণজীবী প্রেম সার্থক হয় নাই। উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় খগেনবাবু-রমলার সম্পর্কের মানবিক আবেদন এবং কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘটের কর্মপদ্ধতি ও আদর্শের আলোচনার মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। বিজন একদিকে অতীত ও বর্তমান, অপরদিকে হৃদয়-সম্পর্কের অসুস্থ জটিলতা ও শ্রমিক আন্দোলনের সরল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে তাহার যান্ত্রিক প্রয়োজনের দিকটা আরও অনাবৃতভাবে প্রকট হইয়াছে। সে একদিকে রমলাকে গৃহস্থালী পাতাইতে সাহায্য করিয়াছে, অন্যদিকে খগেনবাবুকে ধর্মঘটের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার দুরারোগ্য চঞ্চচিত্ততাকে সাময়িকভাবে একটা বিশেষ-লক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে। তাহার নিজের যে মানস পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা উপন্যাসের একটা গৌণ বিষয়; এবং সফিকের সঙ্গে মতভেদ তাহাকে আবার এক নূতন কর্তব্যবিমূঢ়তার প্রান্তদেশে পৌঁছাইয়াছে। শ্রমিক ধর্মঘটের আলোচনায় ও এতৎ-সম্পর্কীয় বিরুদ্ধ মতবাদের বিশ্লেষণে লেখক স্থানে স্থানে পূর্বের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন সত্য; আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ, জ্বরাতুর (hectic) আবহাওয়ার দ্রুতস্পন্দনও কতকটা লেখনীমুখে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি মনে হয় যেন দুই বিরোধী পক্ষের শক্তিপরীক্ষার মত্ত আস্ফালন ও বিকারগ্রস্ত যান্ত্রিকতা ইহার খাঁটি মানবিকতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্মঘটের নেতা সফিকের কূটনীতি ও প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি তাহার মানবিক পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই মজুর-বিক্ষোভ খগেনবাবু ও রমলার মধ্যে ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়া উভয়ের সম্বন্ধকে আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলের দিকে লইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি বেশ সুস্পষ্ট নহে—তথাপি মোটামুটি ইহা রমলাকে নিজ অতৃপ্ত হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষান্তরকে কেন্দ্র করিয়া মোহাবেশের রঙিন জাল বুনিবার প্রেরণা দিয়াছে, আর খগেনবাবুকে সফিক-নির্দিষ্ট কর্মপন্থার অনুসরণে ব্রতী করিয়াছে। খগেনবাবুর শেষ পরিণতি কাজের মানুষে; রমলার, রঙিন-পাখা-মেলা, স্বচ্ছন্দবিহার প্রজাপতিতে। কিন্তু এই পরিণতি তাহাদের পূর্বজীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কি যাত্রার শেষ না মধ্যপথে ক্ষণিক বিরতি—এই প্রশ্ন মনকে সন্দেহাকুল করে।

(৩)

অন্নদাশঙ্কর রায়

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যে পৃথিবী-ব্যাপী জটিল চিন্তাধারা ও সমস্যাসংকুলতা মানবমনকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতেছে তাহার আলোচনাতেই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত থাকেন, অন্নদাশঙ্কর রায় বোধ হয় সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মননশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়। অতি সহজ, সরল কথায়, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি দুরূহ আলোচনার মর্মভেদ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে সমস্ত নর-নারী আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও আন্দোলন যাহাদের বক্ষস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করে, পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, বিভ্রান্ত

জগৎকে নূতন পথ-নির্দেশের প্রেরণা যাহাদের ব্যক্তিগত কামনা-ভালবাসার প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্ধারণ করে, অন্নদাশঙ্করের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-এ তাহাদের বহিঃপ্রচেষ্টা ও অন্তরের আকৃতি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের অধিবাসীর একটা বিশিষ্ট অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সর্বদা একটা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করে; আপন আপন দলের মতপ্রতিষ্ঠা ও বিরুদ্ধমতখণ্ডন ইহাদের জীবনের মুখ্যতম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় ইহাদের বক্ষোরক্ত, ইহাদের তীব্রতম অনুভূতি ও কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা আলোড়িত হইয়াছে। ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতাকে ইহারা যথাসাধ্য সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে। প্রেম, বন্ধুতা, সমবেদনা, প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলি এই রণোন্মাদের তালে তালেই স্পন্দিত হইয়াছে; ইহার অনুমতি ব্যতীত এক পা'ও অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। জীবনকে লইয়া অশ্রান্ত পরীক্ষা চলিয়াছে—ইহাকে সর্বদা নূতন নূতন আদর্শে যাচাই করা হইয়াছে, নব নব অনুভূতির স্পর্শে, নব নব সমস্যার প্রভাবে ইহার উদ্দেশ্য ও যাত্রাপথ-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। রাজপথের ধূলিজালের মধ্যে, ইহার চিন্তা ও কর্মজগতের দ্রুতগামী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থলে অন্তরলোকের অভিনয়লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অবশ্য এই নূতন প্রণালীর সুবিধা-অসুবিধা দুই আছে। পটভূমিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সমপরিমাণে উপলব্ধির গভীরতা কমে। বহির্মুখী জীবনের বিক্ষেপ ইহার রসকে তরল করে, বাহ্যবস্তুর পুঞ্জীভূত চাপে অন্তরের স্বচ্ছন্দ বিকাশ কতকটা প্রতিরুদ্ধ হয়। জীবনের যে স্তরে আমরা তর্ক করি, জগতের কল্যাণ চিন্তা করি, দলগত প্রতিপত্তি-বর্ধনে যত্নবান, এমন কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হই; আর যে স্তরে ভালবাসি, আত্মবিস্মৃত যৌবন-স্বপ্ন রচনা করি, সহজ আত্মীয়তার টানে আকৃষ্ট হই, হৃদয়ের প্রত্যক্ষ, যুক্তিতর্ক-নিরপেক্ষ অনুভূতির স্পর্শ পাই—এই দুই স্তর সমান গভীর নহে। কাজেই বাদল, সুধী, প্রভৃতি চরিত্রগণ যখন নানা অভিজ্ঞতার স্তর দিয়া, নানা লোকের সাহচর্যে ও মতবাদের সংঘর্ষে বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে নিজ আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরিভাগের স্তর মননশক্তিতে ভাস্বর ও উত্তেজনায় বেগবান্ হইয়া উঠে, কিন্তু উহার গভীরতম রহস্যটুকু ধরা পড়ে না। যে মন পরিবর্তনের তরঙ্গে সর্বদা দোলা খাইতেছে, তাহার আন্দোলনের অস্থির ঝিকিমিকি বিশ্লেষণশক্তির গভীরতাকে প্রতিহত করে। উজ্জয়িনী যতদিন তাহার একনিষ্ঠ হৃদয়বৃত্তি দিয়া বাদলের সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, ততদিনই তাহার গভীরতম পরিচয় আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। যখন সে বিলাতে আসিয়া তাহার সহস্র চটুল বিক্ষেপ ও উদ্‌ভ্রান্তকারী মাদক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বাদলকে ভুলিতে ও নিজের কেন্দ্রচ্যুত মনের ভার-সাম্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার একটি সাময়িক, সংশয়জড়িত রূপই আমাদের চোখে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, ইহাদের প্রাণবেগচঞ্চলতা এইরূপ মত-সংঘর্ষের উন্মাদনা ও জনাকীর্ণ সমাজের বিচিত্র প্রভাব-আকর্ষণের তির্যক পথ ধরিয়াই স্বাভাবিক বিকাশ খোঁজে। ইহারা আত্মার সমগ্রতাকে আবিষ্কার করে আদর্শ-অনুসরণের প্রেরণায়, তার্কিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে, সপক্ষ-বিপক্ষের সমবেত সহযোগিতায় নিজ মানস অনিশ্চয়তার অপসারণে, পথ-চলার গতিবেগের ছন্দে। কাজেই এই সমস্ত কর্মশীলতার সহিত ইহাদের প্রগাঢ়তম হৃদয়ানুভূতিগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তর্কের উত্তেজনায় ইহাদের

হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত হয়; ইহারই খোড়ো হাওয়ায় ইহাদের অন্তর-যবনিকা অপসারিত হয়; তীক্ষ্ণ শাণিত যুক্তি-প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে ইহাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবেগে ভারী হইয়া উঠে। বাদ-প্রতিবাদের কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহারা অকস্মাৎ হৃদয়ের গভীরস্তরশায়ী কোহিনূরের সন্ধান পায়। তর্ক ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির আস্ফালন মাত্র নহে, ইহাদের সমস্ত প্রকৃতিটির আত্মানুশীলন। সেইজন্য ইহাদের যে চিত্তবিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অগভীর নহে। এই পথেই ইহাদের সত্য পরিচয় মিলে। মানবজাতির উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের পথসন্ধানই বাদলের গভীরতম হৃদয়াকূতিকে গ্রাস করিয়াছে—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার সহিত তুলনায় নিতান্ত গৌণ। সুধীও তাহার আদর্শনিষ্ঠার বেদীমূলে তাহার ভালবাসাকে অবিচলিত-ভাবে বলি দিয়াছে। অবশ্য প্রেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃহত্তর আদর্শের শ্রেষ্ঠতা কেবল তর্কে নহে, চরিত্রদের কর্মে, ব্যবহারের ও অনুভূতির আন্তরিকতার দিক দিয়া নিঃসংশয়িত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। লেখক এই চেষ্টায় মুখ্যতঃ সফল হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উপন্যাসের উৎকর্ষ।

স্থানে স্থানে ঘটনাপ্রবাহের প্রাধান্যের নিকট চরিত্রস্ফুরণ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। বাদলকে পরিবর্তনের এত ক্ষিপ্রগতি ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যে, তাহার চরিত্রের অগ্রগতি ইহার সহিত সমতা রাখিতে পারে নাই। তাহার অবিমিশ্র বুদ্ধিবাদ কি করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী সেবাব্রতনিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইল তাহা অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহার এই নেশাটুকুর কারণও যথেষ্ট মনে হয় না। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদলের গভীর অনুসন্ধিৎসা তাহার অথবা লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়। কিন্তু এই দার্শনিক উপলব্ধি তাহার চরিত্রের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। তাহার শ্বশুরের মৃত্যুতে তাহার নিজের জীবিত থাকার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আবিষ্কার হাস্যকর অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিয়াছে। বাদল যতই আত্মভোলা হউক না কেন, ইহাই যে তাহার মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। উজ্জয়িনীর চরিত্রে ও তাহার বৈষ্ণব ভাববিহ্বলতা গভীর উপলব্ধি অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গানুকরণের (parody) সহিতই অধিকতর সাদৃশ্যান্বিত। বিলাতে আসিয়া বাদলের সহিত পুনর্মিলনের সম্ভাবনা লুপ্ত হইবার পর তাহার অস্থির চিত্তচাঞ্চল্য নানা বিক্ষেপ ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোন স্থির পরিণতিতে সংহত হয় নাই। ঘটনাপ্রধান, তত্ত্বালোচনাবহুল উপন্যাসের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। লেখক তাঁহার সর্বশেষখণ্ডে উপন্যাসটিকে মহাকাব্যরূপে অভিহিত করিবার দাবী প্রত্যাহার করিয়া ইহার রসোপলব্ধিকে সহজ ও বাধাহীন করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মহাকাব্যে বিশৃঙ্খলার সীমাহীন ব্যাপ্তি ও বিস্তার—প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের সহিত ইহার একমাত্র সাদৃশ্য অতিকায়তায়, ইহার মর্মগত ঐক্যবাণীতে নহে।

অন্নদাশঙ্করের প্রাথমিক রচনাগুলি নিষিদ্ধ প্রেম ও বিলাত-প্রবাসীর অভিজ্ঞতা লইয়া লেখা—এগুলি অগভীর ও লঘুচপল—প্রায় প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত। 'সত্যাসত্য'-এর বিরাট ও গভীর তাৎপর্যের কোনও পূর্বসূচনা ইহাদের মধ্যে মিলে না। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা' (১৯৩০) বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-গোষ্ঠীর মনোভাবের চিহ্নাঙ্কিত। সুচারু ও সুরুচির প্রেমের আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতিও সেইরূপ খামখেয়ালী। সুচারু

সুরুচির গর্ভে নিজ মানস কন্যার আগমনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক। যখন সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সুরুচি ইতিপূর্বেই অন্তঃসত্ত্বা তখন তাহার প্রণয়িনীর এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বে তাহার দাম্পত্য সুষমার আদর্শ রূঢ় আঘাত পাইয়াছে ও তাহাদের প্রণয়োচ্ছ্বাস নানারূপ সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অতৃপ্তির প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান চিত্তক্ষোভ তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ও সুরুচি শিশু কন্যাসহ আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়াছে! এই প্রণয়লীলার সমাজতাত্ত্বিক ও পারিবারিক দিকটা লেখক একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। নবজাত শিশু ও লেখকের প্রথম রচনা উভয়ের প্রতিই 'অসমাপ্ত' নামকরণ সমভাবে প্রযোজ্য —গ্রন্থে ভাষার সৌষ্ঠব ছাড়া কোনরূপ মনস্তত্ত্বকুশলতার পরিচয় নাই।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আগুন নিয়ে খেলা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) এক ইংরেজ তরুণীর সহিত বাঙালী যুবক সোমের চটুল প্রেমাভিনয়ের কাহিনী। যুদ্ধোত্তর যুগের কর্মভারক্লান্ত, যান্ত্রিকতা-ক্লিষ্ট জীবনে নর-নারীর মধ্যে নৈতিক সংযম কত সহজে শিথিল হয় ও ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিকশিত হইয়া আবার ঝরিয়া পড়ে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এ যেন গৃহ ছাড়িয়া পথেই বাসর-শয্যা পাতা। এই সম্পর্কের ক্ষণিকতাই ইহাকে একটি করুণ, মধুর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করে—সপ্তাহান্তের সম্বন্ধটি জীবনে স্থায়ী করা যাইবে না বলিয়াই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মাঝে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পলাতক প্রেমচঞ্চল, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির মত চোখের উপর একটা রং-এর হিল্লোল খেলাইয়া অন্তর্হিত হয়। হাস্যপরিহাসপূর্ণ, রসিক কথাবার্তার মধ্য দিয়া সুনিপুণ প্রেমনিবেদন এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ ও চরিত্রসৃষ্টির কোন চেষ্টা নাই—সোম ও পেনি আধুনিক যে-কোন তরুণ-তরুণীর প্রতিনিধি। মাঝে মধ্যে অভিমান ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই আকর্ষণের ক্রমপরিণতির স্তর দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নাই। শেষ পর্যন্ত বিবাহের সম্ভাব্যতার আলোচনার মধ্যে গ্রন্থের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পথের রোমান্স ঘরের ধরাবাঁধা রুটিনে পর্যবসিত হইবার পূর্বেই ধূসর অনিশ্চয়তায় মিলাইয়াছে।

'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩)—'আগুন নিয়ে খেলা'র শেষাংশরূপে গণ্য হইতে পারে। পূর্ববর্তী গ্রন্থের নায়ক সোম দেশে ফিরিয়া পাত্রী-নির্বাচন-উপলক্ষে কয়েকটি প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক মেয়ের নিকট প্রেমনিবেদনের পূর্বে সে নিজ অতীত ইতিহাস জানাইতে চাহিয়াছে—কিন্তু কেহই এ শর্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই। নির্জন সাক্ষাতের অবসর-প্রার্থনা প্রত্যেক পরিবারেই তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়াছে। লজ্জা-সংকোচের জড়পিণ্ড শিবানী, সংগীতপ্রিয়া সুলক্ষণা, হেডমাস্টার-দুহিতা, বি. এ. অনার্স অমিয়া, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ-বিহারিণী প্রতিমা, ও অসহযোগ-আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা মায়া সকলেই কোন-না-কোন ভাবে নিজেদের অন্তর্নিহিত, অনুদার রক্ষণশীলতা ও ইতর সন্দেহপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছে। কেহই ভাবী স্বামীর চরিত্রস্খলনকে উদার সহানুভূতি ও সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেহ বা চিরাচরিত নীতি, কেহ বা ভাবাবেশ, কেহ বা পিতার প্রতি একান্ত আনুগত্য কেহ বা ধর্ম'-জ্ঞান বা সুরুচি আর কেহ বা শ্লীলতার দিক দিয়া সোমের এই খোলাখুলি স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কোথাও কোথাও প্রহসনের আতিশয্যে সম্ভাব্যতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি বইখানির মধ্যে যথেষ্ট

উপভোগ্য সরসতা ও লীলাচঞ্চল প্রাণপ্রবাহের পরিচয় আছে। বিবাহের নামে যে প্রকাণ্ড প্রহসন সমাজে চলিতেছে, যে পুতুলখেলার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইতেছে, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনের মধ্যে সেই নির্জীব প্রথা-দাসত্বের কবন্ধ নৃত্য লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। চরিত্রগুলিও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে।

'সত্যাসত্য' (১৯৩২-১৯৪২) সুবৃহৎ উপন্যাস, ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ইহাতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নূতন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পুরাতন উদারনৈতিক মত—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয়-ঘোষণা, শ্রমিক, কমিউনিষ্ট ও বলশেভিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জন ও শান্তিবাদপ্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তনতা, ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাপীড়িত মানব-মনকে অহরহ আলোড়িত করিতেছে, তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল মননশীলতার মানদণ্ডে উপন্যাসটির স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মতবাদ আলোচনা ঔপন্যাসিকের চরম উৎকর্ষের পরিচয় নহে। বর্তমান উপন্যাসে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী এই তিনটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত সমস্যা আবর্তিত হইয়াছে। ইহারা এই সমস্ত মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে—এই যুক্তি-তর্ক সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে, বুদ্ধিগত আলোচনার স্তর ছাড়াইয়া হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতার রূপ ও রংকে বদলাইয়াছে। তাছাড়া অশোকা তালুকদার, দে সরকার প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্র গৌণ-হিসাবে প্রবর্তিত হইলেও হৃদযাবেগের কৌলীন্য-মর্যাদার দাবীতে গ্রন্থমধ্যে প্রধানত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহারা তর্কে যোগ দেয় নাই, কিন্তু যুক্তি-ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের ঝড়ে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইযাছে তাহারই সুবিধা গ্রহণ করিয়া অন্তরের কামনাকে স্ফুরিত ও আবেগ-তপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক বাদল সেন এই তর্কের ঝড়ে ও পথ-অনুসন্ধানের প্রেরণায় সর্বাপেক্ষা বেশি দোলা খাইয়াছে। সুধী আত্মপ্রতিষ্ঠ, নানা অভিজ্ঞতার আলোড়নেও নিজ অন্তরের প্রজ্ঞানুভূতিতে স্থিরতর হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজের সহিত একাত্মতা-স্থাপন, কলকারখানার বিক্ষেপ হইতে কুটির-শিল্পের অবিক্ষুব্ধ শান্তি ও সন্তোষে প্রত্যাবর্তন, ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-বাদের পুনরুদ্ধার ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার বাস্তব প্রয়োগ—ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সমস্ত বিভ্রান্তকারী মাদকতার মধ্যে তাহার লক্ষ্য এই আদর্শে অবিচলিত রহিয়াছে। অশোকার ব্যাকুল আবেদন, উজ্জয়িনীর পরম নির্ভরশীল আশ্রয়-প্রার্থনা, সুজেতের নীরব, প্রকাশকুণ্ঠ ভালবাসা—সমস্তই তাহার আদর্শবাদের লৌহবর্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসে তাহার পূর্ব সংকল্প দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হইয়াছে—তাহার অবলম্বিত পথ যে মানব-কল্যাণের একমাত্র উপায়, তাহার ইউরোপের নানামুখী চিন্তাধারার ও কর্মপ্রচেষ্টার সহিত পরিচয় তাহার এই প্রতীতিকে আরও অসংশয়িত করিয়াছে। এক হিসাবে, সুধী'র কোন

পরিবর্তন হয় নাই—তাহার অভিজ্ঞতার পরিধিবিস্তার হইয়াছে, কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। লেখক সুধীকে সত্যের রূপক-হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন। মনে হয় যে, তাহার মানবতার প্রীতিস্নেহভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক-প্রতিভাস নৈর্ব্যক্তিক শিখায় জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ; সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে হয়ত মানুষ-হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে। একমাত্র উজ্জয়িনীর ব্যবহারের বিচারেই তাহার অমোঘ আদর্শনিষ্ঠা সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছে—শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সমাজনিয়ন্ত্রণই জয়লাভ করিয়াছে।

এই সমুদ্রমন্থনের সবটুকু ফেনিল আলোড়ন বাদলের জীবনে আবর্তিত হইয়াছে। বাদলকে লেখক অসত্যের প্রতীক করিয়া আঁকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন। পাঠকের সৌভাগ্য-বশতঃ এই পরিকল্পনা কার্যতঃ ফলবতী হয় নাই। ফল দাঁড়াইয়াছে যে, বাদল অসত্যের নহে, মানবাত্মার মুক্তিসন্ধানের প্রতীক। লেখক অনেক স্থলেই তাহার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া তাহার এই রূপকাভাসকে প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাদলের সগর্ব আত্মপ্রত্যয় চিন্তানায়কের অধিকারের ঘোষণা, ইতিহাসের বিবর্তনধারার নিয়ন্ত্রণশক্তির দাবী, তাহার বাদল-'কালের' আবিষ্কার, সর্বোপরি তাহার অপরাজেয় আদর্শবাদ—সমস্তই এই রূপকেরই বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ। কিন্তু তথাপি বাদলের মানবতাই আমাদের নিকট তাহার মুখ্য আবেদন। তাহার দুর্বলতা, ব্যাকুল আবেগ, অনুসন্ধানের দুর্দম আগ্রহ, প্রতি চিন্তাধারা ও মতবাদসংঘর্ষের অভিঘাতে হৃদয়ের স্নায়ু-তন্ত্রীর তীব্র কম্পন—সবই তাহার মানবিকতার পরিচয়। সে বিশুদ্ধ আদর্শ বা রূপক নহে, সুখ-দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ, বেদনা-আনন্দে তরঙ্গায়িত মানবাত্মা। অবশ্য তাহার আবেগের উৎস ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণকামনা ও মুক্তিপিপাসা। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন মূর্ত স্বদেশ-প্রীতি, বাদল সেইরূপ মূর্ত মানব-হিতৈষণা-উভয়েরই আদর্শের বিশালতা তাহাদের উপর কতকটা নৈর্ব্যক্তিকতার অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে।

সমস্ত পরিবর্তনের স্রোত বাদলের উপর দিয়া অবারিত বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট শাসন-প্রণালীতে প্রগাঢ় আস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্র ও সমাজের একাধিপত্যে প্রবল আপত্তি ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ—বিলাত-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ইহাই ছিল বাদলের মানস পরিস্থিতির উপাদান। তাহার সংকল্প যে সে মনে-প্রাণে ইংরেজ হইবে ও ইংলণ্ডের ভাব ও কর্মজীবনকে তাহার জন্মভূমির আবেষ্টন-স্বরূপ অতি সহজভাবে গ্রহণ করিবে; ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের সহিত সমতালে পা ফেলিবে। এই ব্রতসাধনের জন্য সে তাহার পূর্বজীবনকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প। পিতা ও স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অস্বীকার ও ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্য আবাল্য-সুহৃদ সুধী'র সাহচর্য-বর্জন—তাহার বিলাতে পদার্পণের পর প্রথম কার্য।

পুস্তকবিক্রেতা কলিন্সের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুতা ও তাহার দোকানে সমবেত ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনা তাহার ইংরেজ সমাজের সহিত নিবিড় পরিচয়ের প্রথম সোপান। ক্রমশঃ ইংরেজ-সমাজে প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণবাদ (dictatorship) গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ঘোরতর বিপদ সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিল। নেতাবাদী, আত্মার অস্তিত্বে-

সংশয়শীল, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার সম্পূর্ণ বর্জনকারী ওয়েলির সঙ্গে পরিচয় তাহার ভাবকেন্দ্রকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাকে দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসার জন্ত ওয়াইট দ্বীপের নির্জনবাসে পাঠাইল।

দ্বিতীয় খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস'-এ বাদলের নির্জন সাধনার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শারীরিক জড়তা দার্শনিক অগ্রগতির পায়ে শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। অসুস্থ শরীরের পিছুনটানে মন অগ্রগতির ব্যপদেশে কেবল বৃত্তানুবর্তন করিয়াছে। 'অশ্বারোহণ পর্ব'-এ ক্লান্ত বাদল আত্মার অস্তিত্বের সমাধানহীন সমস্যাকে মুলতুবি রাখিয়া স্পেশ ও টাইমের আপেক্ষিক সম্বন্ধের অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই গবেষণা সমুদ্র হইতে আহৃত কৌস্তুভ রত্ন 'বাদল-কাল' বা 'Ego-time'. মদিরার আস্বাদন ও বেগবান্ মননের বাহ্য প্রতিরূপ, অশ্বারোহণ-চেষ্টা হইতে অনেক হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ইহার চিন্তাক্লিষ্ট মানবাত্মার মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের পুলক শিহরণ, নবীন প্রাণহিল্লোল অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন।

'খণ্ডভারতী' অধ্যায়ে গত মহাযুদ্ধে বিকলাঙ্গ মারউড নামক এক যুবকের সহিত আলোচনায় বাদল চরম নৈরাশ্যবাদের হিমশীতল স্পর্শ পাইয়াছে। মহাযুদ্ধের বিষবাষ্প এই খণ্ডের সমস্ত মানস আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিমাত্রায় বক্রদৃষ্টি ও সন্দেহপ্রবণ করিয়াছে। সমস্ত জীবনযাত্রা তাহার চক্ষে এক শোচনীয় অপচয়—জীবনের চিত্রিত ছদ্মবেশের পিছনে নৈরাশ্যের শুষ্ক কঙ্কালের দংষ্ট্রা সর্বদা বিকশিত। বাদলের আদর্শবাদ এই বিষদিগ্ধ নিঃশ্বাসস্পর্শে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে মডলিনের সহিত আলোচনায় মতবাদের সংঘর্ষ তাহার আশাবাদের দীপশিখাকে উজ্জ্বল রাখিয়াছে, সংশয়ের বাষ্পে বিহ্বল হইতে দেয় নাই। তবে এই তার্কিকতার অতিপল্লবিত বিস্তার নিছক মননশীলতার পরিচয়, বাদলের জীবনের উপর ইহার কি স্থায়ী প্রভাব তাহা দুর্বোধ্য।

নির্জনবাস হইতে সমাজে ফিরিয়া বাদল এক বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় লইয়াছে। মোটের উপর বিলাতী সমাজ ও পরিবার-জীবনের পূর্ণতম চিত্র এই অধ্যায়েই পাওয়া যায়। ভিলি, মিসেস ফ্রেজার, ক্রাউ ও মারিয়ান ভাইসমান—ইহাদের সম্মিলিত প্রভাব যে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বাদলের আত্মসর্বস্বতা বিচলিত হইয়াছে। সে কূট-দার্শনিক চিন্তা ও মানব-কল্যাণের উচ্চাভিলাষ ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্ত সামাজিক আমোদ-প্রমোদে গা ভাসাইয়াছে। ভিলি তাহাকে যৌন আকর্ষণের রহস্য শুনাইয়াছে; মারিয়ান তাহাকে নিত্যসঙ্গী করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে উত্তেজনার তাড়িত-প্রবাহ বহাইয়াছে; মিসেস ফ্রেজারের প্রণয়-ইতিহাস তাহাকে বিবর্তন ও অপচয়তত্ত্বের নূতন নূতন সমস্যা ভাবাইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহার আত্মাকে স্পর্শমাত্র করিয়াছে, অভিষিক্ত করে নাই—তাহার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া কোন নূতন পরিণতি ঘটায় নাই।

এইবার বাদলের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতম বিকাশ যাহার আদর্শ, বুদ্ধিপ্রাধান্ত যাহার প্রধান কাম্য হঠাৎ তাহার উপর দিয়া এক ধর্ম-ভাবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। সে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নির্বিচারে আদেশ-পালন, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ও হীনতম সেবাকার্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই

আমূল পরিবর্তনের কোন উপযুক্ত কারণ দেওয়া হয় নাই। তাহার অব্যবহিত পূর্ব অভিজ্ঞতা —জীবন-মদিরার আস্বাদ-গ্রহণ—এরূপ পরিণতির জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না।

এই আশ্রমবাসকালে উজ্জয়িনীর সহিত বাদলের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু উজ্জয়িনী ও পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত এই মিলন-মুহূর্তটি লেখকের কোন বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। তাঁহার বুদ্ধিপ্রধান ও বিশ্লেষণপ্রবণ মনোবৃত্তি নিবিড় হৃদয়াবেগের আলোচনাকে অনেকটা ফিকে ও নিরুচ্ছ্বাস করিয়াছে। তাহাদের আলাপ সাধারণ মত-বিনিময়ের স্তরেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে, গভীর অনুভূতির ধার পর্যন্ত ঘেঁষে নাই। উজ্জয়িনীর শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ আত্মনিবেদন এই ভাবরিক্ততার অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়াছে। তাহাতে তাহার মন যে প্রেমতন্ময়তার উচু সুরে বাঁধা ছিল, প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সময় তাহা অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

এদিকে বাদলের মতবাদ পরিবর্তনের পূর্ণচক্র আবর্তন করিয়া আবার পূর্বস্থানে স্থিতিশীল হইয়াছে। ব্যক্তিত্বলোপের সঙ্গে দুঃখবোধ সম্বন্ধে অসাড়তা, প্রতিকার সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা, দুঃখের উৎকর্ষ-স্বীকার, সভ্যতার অবাঞ্ছিতত্ব, ও বর্বরতার সারল্যের অভিনন্দন—বাদলের মনীষাভিমান ক্রমাবনতির ধাপে ধাপে নামিয়া এই নিম্নতম বিন্দু স্পর্শ করিয়াছে। ইহার পর যখন সে জানিয়াছে যে, আশ্রমের ধনভাণ্ডার অন্নোৎপাদনের বিষ-প্রস্রবণ হইতে পূর্ণ তখন আবার একটা তুমুল প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে। বাদল বুঝিয়াছ যে, মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নহে, সম্ভব আবেষ্টন ও ব্যবস্থার উন্নতি। আত্মবিলোপের দ্বারা মানুষ রাতারাতি দেবতা হইবে না—এক মুহূর্তে পৃথিবীর স্বর্গে পরিণতির আশা সময়সংক্ষেপের প্রতি মানুষের চিরন্তন মোহের আর একটা নিদর্শন। সুতরাং বাদল এই ভাববিলাসের নাগপাশ হইতে আবার মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মুক্তিলাভের পর বাদলের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শোষণক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লভ্যাংশের উদ্বৃত্ত হইতে দরিদ্রের অভাবমোচনচেষ্টা গরু মারিয়া জুতাদানের মতই হাস্যকর ও অসংগতিপূর্ণ। সামাজিক ও ব্যক্তিগত ন্যায়নিষ্ঠাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল। ইহার পর সে তারাপদ কুণ্ডু-পরিচালিত কমিউনিষ্ট আড্ডায় বাসা লইয়াছে। কিন্তু সেখানেও তাহার সূক্ষ্ম নীতিবোধ পরিতৃপ্তি পাইল না। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ দুইটি—রাষ্ট্রের একাধিপত্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতালোপ ও বিপ্লব ঘটাইবার ব্যপদেশে অপরিমিত রক্ত-পাতে উৎসাহ। রুষিয়ার দৃষ্টান্ত তাহার এই উভয়বিধ ভয়কেই সমর্থন করিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনা তাহার মনে অস্বস্তির কণ্টক বিঁধিয়াছে। মার্গারেট, ব্রনস্কি, ব্রাউডার্স, প্রভৃতি সাম্যবাদী নেতাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রম তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজার মত সে এক অসম্ভব আদর্শের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছে। কেমন করিয়া যুদ্ধ ও বিপ্লব ছাড়া উহাদের ফল ভোগ করা সম্ভব এই কূট চিন্তা তাহার সমস্ত চিত্তকে মথিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবের উপহাস, নিজ আদর্শকে স্পষ্ট রূপ দিবার ব্যর্থ চেষ্টা ও উহার সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় তাহাকে অপ্রকৃতিস্থতার সীমান্ত-প্রদেশ পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সময়ের ব্যাকুল, অশান্ত আবেগ, ও তীব্র অস্বস্তি ও বিহ্বলতা, শুধু তর্কে নয়, বাদলের দেহে-মনে পর্যন্ত অভি-

চমৎকারভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। সুধী'র মধ্যবর্তিতায় উজ্জয়িনীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা আবার ব্যর্থ হইয়াছে। এই আলোচনাতেও যুক্তি ও আদর্শবাদ হৃদয়াবেগের কণ্ঠরোধ করিয়াছে।

বাদলের জীবনের শেষ পরিবর্তন আবার এক যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের পথ ধরিয়া আসিয়াছে। শ্রেণীবৈষম্য ঘুচাইবার কোন সার্বভৌম উপায় না পাইয়া সে নিজে মধ্যবিত্তের সমস্ত জাত্যভিমান বিসর্জন দিয়া সর্বহারাদের দলে মিশিয়াছে। সে দেশলাই ফিরি করিয়া ও টেমস্ নদীর বাঁধে শুইয়া জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়াছে। শ্রমিকদের দলে যোগ দেয় নাই, কেননা তাহা হইলে শ্রেণী-সচেতনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ন্যূনতম সঞ্চয় ও নির্দিষ্ট বাসস্থান—এই উভয় প্রাথমিক প্রয়োজনেরও নিম্নতম স্তরে সে অবতরণ করিতে চাহিয়াছে। তাহার আশা যে, মাটির নীচে প্রবেশ করিলে, ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিলে সে একদিন ভূমিকম্পের অনায়াসলব্ধ সমতাকারী শক্তি অর্জন করিবে। এই সংকল্পের মধ্যে যে একটা শূন্যগর্ভ ভাববিলাস আছে, কিছু-না-চাওয়ার অহংকারের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা বর্তমান, নূতন পরীক্ষার উৎসাহাতিশয্যে সে তাহা ভুলিয়াছে। এই পরীক্ষার মধ্যেই তাহার জীবনব্যাপী দ্বন্দ্ব ও পথ-খোঁজার অবসান হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করিয়াছে যে, এ যুগের বাণী তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই, সে বর্তমানের সত্য আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র নহে। আজকাল মানুষ চায় সমান অধিকার, স্বাধীনতা নহে। কাজেই অধিকার-সাম্যের ঘুষ দিয়া তাহার স্বাধীনতা স্পৃহাকে ঘুম পাড়ান যায় না। প্রতিনিধিত্বের যে উচ্চভূমিতে বাদল এতদিন দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচণ্ড বিশ্বাস ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। সে সভয়ে নিজের মধ্যেই ডিক্‌টেটররূপের বীজাণু আবিষ্কার করিয়াছে—পৃথিবীতে ভূত ছাড়াইবার সরিষাই ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার কাজ ফুরাইয়াছে বলিয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাদলের মৃত্যু-সংঘটনে লেখকের রূপক-মোহ আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—যে মরিল সে যেন ব্যক্তি নয়, একটা আদর্শবাদ ও তাহার মৃত্যু আসিয়াছে সাধারণভাবে নয়, অপরিহার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। সেই দ্বিধাবিভক্ত মন লইয়া লেখক বাদলের বিদায়দৃশ্যে করুণরস ফোটাইতে পারেন নাই। Ideaর আত্মসংহরণে ট্র্যাজেডির অবসর কোথায়? উজ্জয়িনীর অশ্রু বৃথাই তাহার যন্ত্রশীতল, স্ফুরক্তহীন দেহকে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহার পিতার শোকার্ত রোদন এই আবেগবিহীন, বুদ্ধিবাদের কৃত্রিম বায়ুসঞ্চালনে সচল আবহাওয়ায় অশোভন চীৎকারের মতই শোনায়। যে রাজ্য হইতে হৃদয়োচ্ছ্বাসকে নির্বাসিত-প্রায় করা হইয়াছে, লেখকের খুশিমত তাহাকে আর সেখানে ফিরাইয়া আনা যায় না। তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব যে অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল হয় এই সত্যই এই শেষ দৃশ্যে মর্মান্তিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে উজ্জয়িনীর চরিত্রই গভীরতম উপলব্ধির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। রূপক-অভিনয়ে উজ্জয়িনীরও একটা নির্দিষ্ট অংশ ছিল—সে নাকি পুণ্যের প্রতিচ্ছবিরূপে কল্পিত। কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে এই রূপকের রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহার প্রণয়াবেশ ও বিরহবেদনা বাদলের সমস্ত অস্থির পক্ষবিক্ষেপ ও সুধী'র স্থির আদর্শনিষ্ঠা অপেক্ষা আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। হৃদয়ানুভূতি বুদ্ধির অনুশীলন অপেক্ষা যে অধিকতর মর্মস্পর্শী উজ্জয়িনী-চরিত্রেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিবাহের আবেশ বাদলকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু উজ্জয়িনীকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া

তাহাকে স্মৃতিরোমন্থনে নিয়োজিত করিয়াছে। উজ্জয়িনীর এই উদাস, বিরহব্যাকুল, প্রতীক্ষমান চিত্রটি বড়ই সুন্দর। এই স্মৃতিবিভোর অবস্থায় বাদলের স্মৃতিপরিপূর্ণ শ্বশুরালয়ে গমন তাহার বিহ্বলতাকে আরও বাড়াইয়াছে। প্রতিবেশিনী বীণার প্রভাব তাহার আকুলতাকে তীব্রতর ও তাহার ধর্মোন্মাদকে অঙ্কুরিত করিয়াছে।

'উপেক্ষিতা' অধ্যায়ে উজ্জয়িনীর ধর্মপ্রবণতা বৈষ্ণব-রস-সাধনার অভিমুখী হইয়াছে। পিতার সহিত বিচ্ছেদ তাহার নিঃসঙ্গতাকে গভীরতর করিয়া তাহার পরিবর্তনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছে। 'কলঙ্কবতী' গ্রন্থে তাহার ধর্মজীবনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতৃপ্ত প্রেম ভক্তিগ্রন্থপাঠ, বৈষ্ণব-সাহচর্য ও শ্বশুরের নির্লিপ্ত ব্যবহারের ফলে, কানুতে আত্মসমর্পণের নিবিড় মোহে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা তাহার কল্পনা ও নিগূঢ়তম আকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত করিয়া তাহার মনে বাস্তববিমুখতা জাগাইয়াছে। কবি ত্রিভঙ্গমুরারিকৃত সৌন্দর্যস্তব তাহাকে উপেক্ষিত দেহসৌন্দর্যের প্রতি সচেতন করিয়াছে। মাতাজীর করুণ, অথচ ভাবান্ধ জীবনকাহিনী, তাহার পিতার অতর্কিত মৃত্যু ও শ্বশুরের সান্ত্বনাদানে হাস্যকর অক্ষমতা এই সমস্তই তাহাকে সংসারত্যাগে প্রণোদিত করিয়াছে। শোকের রূঢ় অভিঘাত ও ভক্তির বাষ্পময় অস্পষ্টতা—এই উভয়ের প্রভাবে একপ্রকার আচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া স্বপ্নসঞ্চারণকারিণীর ন্যায় সে কানুর অভিসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এই পর্যন্ত উজ্জয়িনীর চিত্তবিভ্রমের ইতিহাস মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস্যতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'গৃহত্যাগ' অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহার মদবিহ্বল, আলস্যমন্থর, নবজাগ্রত যৌবনের যে সুন্দর চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা রূপে, রংএ, ও নিগূঢ় সাংকেতিকতায় Forsyte Sagar An Indian Summer অধ্যায়ের সহিত তুলনীয়। কিন্তু পথে বাহির হইবার পর এই স্বপ্নসুষমা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—গৃহের নির্জন ধ্যানতন্ময়তা পথের সহস্র আকস্মিকতায় খণ্ডিত হইয়াছে। ট্রেনে সুশীলাবতীকে কানু-ভ্রম ও সেই একই ভ্রমে ভুমনলালের আলিঙ্গনে ধরা দেওয়ার চরম আত্মপ্রতারণা—বিশ্বাস্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। বৃন্দাবনপ্রবাসকালে এক গোবিন্দজীর মন্দিরে গীততন্ময়তা ছাড়া তাহার অন্য সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকতা ও সংগতি হারাইয়াছে। মোট কথা এইরূপ আবেগবিহ্বল, আত্মবিস্মৃত অবস্থা বর্ণনা করিতে যতটুকু গভীর কল্পনাশক্তি ও অসংশয়িত বিশ্বাসের প্রয়োজন লেখকের ব্যঙ্গপ্রধান মনোবৃত্তিতে তাহার একান্ত অভাব। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত বা 'যোগাযোগ'-এ কুমুদিনীর ধ্যানাবিষ্ট ভাবের সহিত তুলনায় উজ্জয়িনীর এই চরম মোহের বিবরণ কল্পনাসমৃদ্ধি ও গভীর উপলব্ধির দিক্ দিয়া অনেক নিম্নস্তরের। লেখকের গ্রন্থন-শিথিলতার অসংখ্য রন্ধ্রপথ দিয়া অবিশ্বাস ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেছে। কল্পনার এই ঊর্ধ্বলোকে বিচরণচেষ্টায় লেখকের অনভ্যস্ত পদক্ষেপ বারবার স্খলিত হইয়াছে।

মোহভঙ্গের দারুণ আঘাতে যখন উজ্জয়িনী ম্রিয়মাণ, তখন সুধী ও বিভূতির সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছে। সুধী'র সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ায় অনেক গোঁজামিল ও জোড়াতাড়ার চিহ্ন মিলে। শেষ পর্যন্ত সুধী তাহাকে সংসারে ফিরিতে রাজি করিয়াছে ও বাদলের নিকট কোন প্রত্যাশা না করিয়া কোন কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োজনের যৌক্তিকতা দেখাইয়াছে। তাহার পিতার উইলও তাহাকে এই জন-সেবাব্রতে আহ্বান করিয়াছে। বিলাত-প্রবাসিনী

মাতার আমন্ত্রণ তাহাকে এক নূতন জীবনযাত্রার সুযোগ দিয়াছে। সে সুধী'র সঙ্গে বিলাত যাত্রা করিয়াছে।

জাহাজে উজ্জয়িনীর হৃদয় আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে কম্পিত, তাহার অনুতপ্ত মন আত্মনিগ্রহে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উন্মুখ। স্বামীর সহিত মিলনের সম্ভাবনা তাহার হৃদয়ে শঙ্কিত প্রতীক্ষার কম্পন তুলিয়াছে। কিন্তু বিলাতে পা দিয়া তাহার মধুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাদল তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া তাহার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে রূঢ় আঘাত দিয়াছে। তাহাদের বোঝাপড়ার মধ্যে কোন গভীর আবেগের সুর ধ্বনিত হয় নাই। বাদলের দিক হইতে আসিয়াছে যুক্তিতর্কের সাহায্যে আত্মপক্ষসমর্থন, উজ্জয়িনীর দিক হইতে আসিয়াছে, যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে নিষ্ক্রিয়, অসহায়ভাবে গ্রহণ। মাঝে মধ্যে একটু অভিমান, একটু ঈর্ষ্যা, বাদলের মনোভাব বুঝিবার বিশেষ আগ্রহ, ও তাহার নিন্দা প্রশংসায় উৎকর্ণতার বক্র পথে দাম্পত্য সম্পর্কের স্বল্পাবশিষ্ট মাধুর্য নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সুধী'র আশ্বাস ও সমবেদনা কিছুদিন পর্যন্ত সম্বন্ধচ্ছেদের রূঢ় সত্যের উপর একটা স্নিগ্ধ আবরণ টানিয়া দিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে যে, বাদলকে বাদ দিয়াই আবার তাহাকে নূতন করিয়া জীবন পরিকল্পনা করিতে হইবে।

এই বিরাট শূন্যতার প্রথম প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীনভাবে লঘু আমোদ-প্রমোদে বিস্মৃতি ও অন্যমনস্কতার অনুসন্ধান। এই হাল্কা হাস্য-পরিহাস ও সামাজিকতার মধ্য দিয়া উজ্জয়িনীর মনে এক বেপরোয়া, বিদ্রোহী ভাব ক্রমশঃ তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বৈষ্ণবসাধনানুযায়ী ভক্তিবিহ্বলতা, একাগ্র প্রেম ও অন্তর্মুখী গভীরতা প্রতিহত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল আদর্শহীন জীবনযাত্রার অভিমুখী হইয়াছে। সমাজের বিধি-নিষেধ, শালীনতাকে আঘাত করিবার, জীবনের প্রতি মুহূর্তকে নিজ খেয়ালমত উপভোগ করিবার একটা উদ্দাম, নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি তাহার চরিত্রের প্রধান অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানা উদ্ভট কল্পনা তাহার মাথায় কুণ্ডলী পাকাইয়াছে। ভারতে নারী-আন্দোলনের নেতৃত্বগ্রহণ, দেশ-বিদেশে লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভ্রমণ, অসামাজিক নীতি ও আচরণের অকুণ্ঠিত পোষকতা এই সকলের ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের ক্ষোভ-বাষ্প ফাটিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সুধী'র সহিত আলোচনায় জীবনের চরম ব্যর্থতার জন্য এক গভীরতর অনুশোচনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই অশান্ত, অস্থির বিক্ষোভের অন্তরালে তাহার জীবন নূতন উদ্দেশ্য ও কেন্দ্র-সংহতির জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

জীবনকে লইয়া ছিনি-মিনি খেলার মধ্যে দুইটি প্রভাব তাহার উপর কার্যকরী হইয়াছে—সুধী'র অতন্দ্র হিতৈষণা ও দে সরকারের অশ্রান্ত, অথচ কৌশলময় প্রেমনিবেদন। তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া উভয়ের মধ্যে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। সুধী তাহাকে অসংযম ও পদস্খলন হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে—দে সরকার তাহার দিকে প্রসারিত করিয়াছে একাগ্র কামনার ব্যাকুল আলিঙ্গন। দে সরকারের ভালবাসা ক্রমশঃ সাধারণ ভোগ-লিপ্সা হইতে উন্নততর, বিশুদ্ধতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার চটুল, ব্যঙ্গবহুল রসিকতা ও সুলভ প্রেমাভিনয়ের (gallantry) মধ্যে ধীরে ধীরে গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়াছে। তাহার অসংকোচ সুবিধাবাদের চারিদিকে এক ব্যর্থ-করুণ আদর্শবাদের ম্লান জ্যোতি সঞ্চারিত

হইয়াছে। তাহার অক্লান্ত আনুগত্য ও মনোরঞ্জন প্রবৃত্তির সাহায্যে সে শেষ পর্যন্ত মালঞ্চের মালাকর হইতে প্রার্থিত প্রণয়ীর শ্লাঘ্যতর পদে উন্নীত হইয়াছে।

উজ্জয়িনী এ যুগ্ম প্রভাবেই সাড়া দিয়াছে। প্রথম সে সুধী'র প্রতি প্রেম-নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু সুধী'র কঠোর নীতিপরায়ণতার নিকট ইহা কোন প্রশ্রয় পায় নাই। বিবাহের প্রারম্ভ হইতে স্বামীর নিকট যে সস্নেহ ব্যবহার প্রাপ্য ছিল উজ্জয়িনী তাহা সুধী'র নিকটই পাইয়া আসিয়াছে। বাদলের সহিত মীমাংসা-চেষ্টায় সুধী'র আপ্রাণ প্রয়াস ও উহার ব্যর্থতায় তাহার স্নিগ্ধ সহানুভূতি, তাহার স্নেহপূর্ণ অভিভাবকত্ব, ও তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও দৃঢ়তা—সমস্তই উজ্জয়িনীর আকর্ষণের হেতু। সুতরাং সে যে সর্বপ্রথম বাদলের শূন্য সিংহাসনে সুধীকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছে তাহা স্বাভাবিক। সুধী'র অস্বীকৃতির পর দে সরকারের পথ নিষ্কণ্টক হইল। সুধীও এই অনিবার্য পরিণতিতে অনিচ্ছাসহকারে সম্মতি জানাইতে বাধ্য হইয়াছে। উজ্জয়িনীর চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ তাহাকে দে সরকারের সাধারণ, কলঙ্ক-মলিন জীবনের প্রতি পক্ষপাতী করিয়াছে। আদর্শবাদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে কতকটা উদ্ধতভাবে সরল, নিরহংকার, অনিন্দনীয়তার দাবিহীন সুবিধাবাদের অর্ঘ্যোপহার হাত পাতিয়া লইয়াছে। কার্লসবাডের অভিমুখে ট্রেন-যাত্রায় ও সেখানের হোটেলে উজ্জয়িনীর দীর্ঘদিনরুদ্ধ যৌবনকামনা কৈশোরের স্বপ্নময় অবাস্তবতা ও ভাববিলাস ও পরবর্তী জীবনের বিক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তা কাটাইয়া, অনিবার্যবেগে, প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই নগ্ন, তীব্র আবির্ভাবের সহিত কোন লুকোচুরি চলিবে না, কৈশোরের ভাববিহ্বলতায় ইহার স্বরূপ আবৃত হইবে না; এমন কি আদর্শসাম্যের শেষ আচ্ছাদন পর্যন্ত ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে। দে সরকারকে উজ্জয়িনী গ্রহণ করিয়াছে সম্পূর্ণ সাদা চোখে, মোহাবেশ মুক্ত অন্তঃকরণে, বিদ্রোহের ইঙ্গিতরূপে, যৌবনের অনিবার্য তাগিদে। তাহাদের মিলন উজ্জয়িনীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রতীক্ষা করিবে—ইহা দাম্পত্য সম্বন্ধের স্থায়ী বন্ধনে ধরা দিবে কি না তাহা অমীমাংসিত রহিয়াছে। উজ্জয়িনীর কৈশোর স্বপ্নাবেশ ও যৌবনের প্রখর উন্মেষ, তাহার প্রেমের প্রভাত-জাগরণ ও মধ্যাহ্ন-দীপ্তি উভয়ই চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে রূপক-মোহ লেখক সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা না হইলে দে সরকারের অতি-বাস্তব বাহুপাশে তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন না। পুণ্যকে সুবিধাবাদের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা, আর যাহাই হউক, রূপক-সাহিত্যের সনাতন রীতির অনুমোদিত নহে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে দে সরকার কেমন করিয়া উপগ্রহ হইতে অন্যতম প্রধান চরিত্রের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে, তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। অশোকা সুধী'র প্রণয়িনী—তাহার প্রণয়নিবেদনের আন্তরিকতা ও সাহস, দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্ব, ও শেষ পর্যন্ত দুর্বল আত্মসমর্পণ লইয়া খুব জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুজেতের মধুর, ব্রীড়াসংকুচিত চরিত্রটিও স্বল্প কয়েকটি রেখায় ভালই ফুটিয়াছে। অন্য কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে লেখকের সুপরিচিত শ্লেষাত্মক মনোবৃত্তি ও অতিরঞ্জনপ্রবণতা প্রতিফলিত হইয়াছে। সুজাতা গুপ্ত, মায়া তালুকদার, অশোকার পাণিপ্রার্থী স্নেহময় সরস ব্যঙ্গপ্রিয়তার সহিত অঙ্কিত। যোগানন্দের মধ্যে ব্যঙ্গের সহিত সহানুভূতি মিশ্রিত। অতিরঞ্জন প্রহসনোচিত আতিশয্য লাভ করিয়াছে বাদলের পিতা

রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্রের চরিত্রে। তারাপদ কুণ্ডুর চরিত্রাঙ্কনে ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ ও ঝাঁজালো হইয়াছে—ইহার সঙ্গে তাহার অদ্ভুত কার্যকুশলতা ও মানুষের দুর্বলতা ও আদর্শবাদের সুযোগ লইবার ক্ষমতার জন্য কতকটা প্রশংসাও জড়িত হইয়াছে। অন্য সমস্ত চরিত্র প্রায়ই তর্ক-মূলক—তর্কের অন্তরালে কাহারও কাহারও প্রকৃতিটি আকস্মিক হৃদয়াবেগের আলোকে মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী-সন্তান-হারা ললিতা গ্রন্থ মধ্যে নিতান্ত আগন্তুক হইলেও, তাহার করুণ, ভাগ্যবঞ্চিত জীবনকাহিনীটি গভীর, সংযত সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার চরিত্রের উপর এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার প্রভাবও সুসংগত হইয়াছে।

কিন্তু গ্রন্থটির প্রকৃত উৎকর্ষ অন্য কারণে। ইহার জন্য মহাকাব্যের দাবী লেখক নিজেই প্রত্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতা বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য গ্রীস ও ট্রয় কিংবা রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাতে সহস্র প্রকারের বাদ-বিসংবাদ, অসংখ্য মতবৈষম্যের সংঘর্ষ, পথ-অনুসন্ধানের অগণিত, বিচিত্র পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, মানব মনের অশ্রান্ত কর্মশীলতা ও সমস্যা-সমাধানের অসীম আকৃতি, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনিবার জীবনব্যাপী উদ্যম ও সাধনা—সকলে মিলিয়া এক বিরাট, আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দ্রাভিমুখী ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসের পাতাগুলিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি, সমস্ত মতবাদের মুখপাত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সমবেত মানবকণ্ঠের কি বিপুল কোলাহল, শক্তির কি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, আকাঙ্ক্ষার কি অদম্য উর্ধ্বগতি, ভাঙ্গাগড়ার কি দুর্দম ইচ্ছা ও দুর্জয় দুঃসাহসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর কি বিপ্লবকারী অভিনবত্ব। এই বিরাটকায় উপন্যাসের স্বচ্ছ দর্পণে আমরা আধুনিক মানবের অন্তর-রহস্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া চাহে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, সাম্য, সর্ববিধ শোষণের বিলোপ, অনবদ্য সমাজব্যবস্থা, আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপযুক্ত নিখুঁত, ন্যায়নীতি নিয়ন্ত্রিত আবেষ্টন। এই নূতন ইচ্ছা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে—ইহার তীব্র আকর্ষণের নিকট তাহার পূর্বতন আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সংকীর্ণ নীড় রচনা, শুদ্ধ, শান্ত, একনিষ্ঠ প্রেম অভ্যস্ত কর্তব্যের কক্ষাবর্তন, স্নেহপ্রীতির সহজ আদান প্রদান, আত্মকেন্দ্রিক জগতে স্বস্তি-রোমন্থন, বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্রব এড়াইয়া গজদন্তের গম্বুজে (ivory tower) আশ্রয়-গ্রহণ—এই বহু শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার নিবিড় মোহ সে কাটাইয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের যে অগ্নিবেষ্টনে তাহাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইতে তাড়াইয়াছে, তাহার সৃষ্টিধ্বংসী অনলশিখায় সমাজের যে বিভীষিকা-ময় রূপ তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতাই অতীতে প্রত্যাবর্তনের পথকে চিরকালের মত রোধ করিয়াছে। তাই আধুনিক মানুষ আর গৃহী নহে, পথিক; সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী নহে, রিক্ত; সর্বস্বীকৃত আদর্শবাদের দ্বারা সুরক্ষিত নহে, নূতন অবলম্বনের অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত, প্রেমিক নহে, রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রেমের বিশুদ্ধীকরণে ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে বিব্রত। সে আর সমতল ভূমিতে বিচরণ করে না—সর্বদাই সমাজের তলদেশ খুঁড়িয়া পাকা বনিয়াদ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। বোমা-বর্ষণের ভয়ে সে আর ঘর বাঁধে না, তাঁবুতে জীবন কাটায়, তাহার স্থাবরত্ব ঘুরিয়া যাযাবরত্বের পালা শুরু হইয়াছে।

প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পারিবারিক বন্ধন, রাজনৈতিক আনুগত্য -সমস্তই আজ তর্ক-বিতর্ক ও পরীক্ষার বিষয়—অনিশ্চয়তার বাষ্পে আবৃত ও কম্পমান ভিত্তির উপর টলমলভাবে দণ্ডায়মান। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজ সর্বনাশের বংশীরবে কানু-পাগলিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় যেন ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে মহামন্ত্রে আবার পৃথিবী স্থির হইবে, বিচলিত ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে, মানুষ আজ তাহারই অনুধ্যানে বিভোর। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিপ্লবোন্মুখ, ভারকেন্দ্রচ্যুত, নবীন সৃষ্টির স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর সাময়িক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহাই তাঁহার উপন্যাসের সর্বপ্রধান পরিচয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা-রাত্রির কাব্য' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় মিলে। 'দিবা-রাত্রির কাব্য' একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক-কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চরিত্রগুলির অবাস্তবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ'। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ভূমিকা-স্বরূপ যে ক্ষুদ্র কবিতাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গল্পের এই সাংকেতিকতার সার-সংকলনের চেষ্টা দেখা যায়, যদিও কবিতাগুলির দুর্বোধ্যতার জন্য লেখকের উদ্দেশ্য অস্পষ্টই থাকে। বিশ্লেষণের মাঝে মাঝে চরিত্রগুলির উপর এক একটা সাংকেতিক সংজ্ঞাও আরোপিত হইয়াছে। চন্দ্রকলানৃত্যে আনন্দের অসহ্য তীব্র পুলক-অবসাদ ও সেই নৃত্যের চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তিরোভাবও সেই সাংকেতিক রহস্যের সূচনা করে। তথাপি এই সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর আবেষ্টন সত্ত্বেও মানুষগুলিকে রক্ত-মাংসের জীব-হিসাবেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

লেখকের এই রূপক-বিলাস যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে। যেমন কোন কোন স্থূলবস্তুকে হঠাৎ আলোকের দিকে ফিরাইলে তাহার ভিতরটা স্বচ্ছ ও রঙ্গিন বলিয়া মনে হয়, তেমনি এই কয়েকটি নর-নারীর জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে একটা অতর্কিত সংকেতলোকের দ্যুতি ঝলসিয়া উঠে। তাহাদের সমস্যা-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত গভীর মানবপ্রকৃতিরহস্য-মূলক মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া প্রতিনিধিত্বের দিকটাই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত গল্পটির মধ্যে অবাস্তবতার ছায়া এতই ঘনীভূত হইয়াছে যে, মনে হয় লেখক কতকগুলি abstract পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার রচনা আরম্ভ করেন ; এবং পরে ইহার উপর রক্ত-মাংসের একটি অনতিস্থূল আবরণ দিলেও ইহার ভিতর দিয়া abstraction-এর কঙ্কাল উঁকি মারিতে ছাড়ে না।

প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা'য় হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার সম্পর্কটির আভাস দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রিয়া হেরম্বকে ভালবাসে, কিন্তু অভিভাবকের শাসনে পুলিশ-দারোগা অশোককে বিবাহ করিয়াছে। পাঁচ বৎসর বিবাহিত জীবনের পর তাহার ধৈর্য নিঃশেষিত হইয়াছে, এবং সে অকুণ্ঠিতভাবে হেরম্বের সঙ্গে গৃহত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। হেরম্ব তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়নিবেদনে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় নাই এবং ছয় মাসের পরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা দিয়া অতিকষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা'য় হেরম্ব আনন্দের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। অনাথ ও মালতীর সকল দিক দিয়া ব্যর্থ ও কলঙ্কিত প্রণয়েতিহাস ও মালতীর নিদারুণ মনোবিকৃতির অভিব্যক্তি-স্বরূপ তাহার ব্যবহারের অমার্জিত ইতরতা—এই অবাঞ্ছিত প্রতিবেশের মধ্যেই আনন্দের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার ন্যায় ম্লান, অপার্থিব সৌন্দর্য বিকশিত হইয়াছে। আনন্দের হিমসংকুচিত, সংশয়দষ্ট, মুহূর্তের জন্য রক্তিম সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত প্রণয়-বিকাশ এই প্রতিবেশ-প্রভাবেরই ফল। আনন্দ সম্বন্ধে হেরম্বের কৌতূহল, তাহার সহিত প্রেমের অস্থায়িত্বের ও জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় আনন্দের অতর্কিত ঔদ্ধত্য-প্রকাশ, তাহাদের নীরব প্রশ্ন-বিনিময়, নৃত্যের পর আনন্দের পরমনির্ভরশীল আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত তাহাদের প্রেমের অগ্রগতির স্তর।

তৃতীয় ভাগ 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এ সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হেরম্বের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বকে আবার প্রবলভাবে পুনর্জীবিত করিয়াছে। সুপ্রিয়া ও আনন্দের পাশাপাশি দাঁড়ানোতে তাহাদের মধ্যে রূপক-প্রতিভাস স্পষ্টতর হইয়াছে। সুপ্রিয়া তাহার স্নেহ-মমতা-বেদনা ও নীড়রচনার অনিবার্য প্রয়োজন লইয়া সাধারণ, সুস্থ মানব-প্রেমের প্রতীক হইয়াছে; আনন্দের বিহ্বল, স্পর্শভীরু, সাংসারিকতার লেশহীন প্রণয় পৃথিবী অপেক্ষা আদর্শলোকের নীলাকাশে সঞ্চরণের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। হেরম্ব এই দুই প্রণয়ের মাঝে পড়িয়া মন স্থির করিতে পারে নাই। তাহার জীর্ণাবশিষ্ট যৌবন ও অর্ধমৃত প্রেম লইয়া সে আনন্দের মনের প্রথম বসন্তোৎসবের সঙ্গে নিজেকে মিলাইতে অক্ষম হইয়াছে। আবার তাহার অপরাধজটিল, আত্মবিশ্বাসহীন, অসুস্থ জীবন সুপ্রিয়ার নির্ভীক বিদ্রোহের সহিত সমতালে পা ফেলিতে পারে নাই। তাহার জীবন এই চিরন্তন দ্বিধার রাহুগ্রাস কর্তৃক অভিভূত হইয়াছে।

এই শিথিল, মন্থর, আত্মবিশ্লেষণের স্বপ্নাবিষ্ট, অর্ধ-সাংকেতিকতার গোধূলিচ্ছায়াতলে অভিনীত জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে দুই-একটি তীব্র, অমার্জিত পাশবিকতার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ। দুঃস্বপ্নের পিছনে মগ্নচৈতন্যলীন বিভীষিকার ন্যায় এই অন্তরালবর্তী ঈষৎ-প্রকাশিত নৃশংসতা আমাদের সম্মুখে এক ভয়াবহ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। হেরম্বের স্ত্রীর আত্মহত্যা, অশোক ও সুপ্রিয়ার ভীতিব্যঞ্জনাপূর্ণ দাম্পত্য-জীবন, পুরীতে অপ্রকৃতিস্থ উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যে অশোকের সুপ্রিয়াকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলার চেষ্টা—এই সমস্ত দৃশ্যে স্বাস্থ্য ও বিকার, জীবন ও মৃত্যু, প্রণয় ও ঈর্ষা—ইহাদের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধতার চিত্র আমাদের উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। উপন্যাসের গঠন ও উপজীব্য বিষয় (form and content) লইয়া আধুনিক যুগে যে বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে, বর্তমান উপন্যাস সেই পরীক্ষাকার্যেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় বাস্তবতার প্রসার কিছু বেশি কিন্তু অসংলগ্নতা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। গাউদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা এক হিসাবে আমাদের সাধারণ পল্লীসমাজচিত্রেরই একটি খণ্ডাংশ। কিন্তু তথাপি ইহার রেখা ও আলো-ছায়ার বণ্টন এরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যাহাতে অপরিচয়ের একটা সূক্ষ্ম যবনিকা ইহাকে আড়াল করিয়া থাকে। এই অপরিচয় সাংকেতিকতার বা

রূপকের জন্য নহে; লেখকের মন্তব্য ও জীবনসমালোচনার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট-মনোভাব আছে তাহাই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু। উপন্যাসের নায়ক শশীর জীবনে যে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব যেন অনেকটা অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হয়। এই প্রভাবের ফলে তাহার মনে বিশেষ কোন ছাপ পড়ে নাই; রেখাগুলি বিচ্ছিন্নই রহিয়া গিয়াছে, ঐক্যসংহত হয় নাই। শশীর জীবনে প্রধান সমস্যা তাহার এক প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তাহার প্রতি এক প্রকারের অবর্ণনীয়, দুর্বোধ্য আকর্ষণ। শশী দীর্ঘকাল তাহার এই অনুচ্চারিত ভালবাসা লইয়া খেলা করিয়াছে, তাহার ডাকে কোন সাড়া দেয় নাই। যখন প্রতিদান-বঞ্চিত ভালবাসা শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন একদিন বিস্মিত বেদনার সহিত সে ইহার আবেদন উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু অনাদৃত প্রেম অকালসিঞ্চনে বাঁচিয়া উঠে নাই। এই অভিজ্ঞতায় শশীর মনোরাজ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। সংসারে ঔদাসীন্য ও গ্রামত্যাগের ইচ্ছা—ইহারা হতাশ প্রেমের এত সাধারণ প্রতিক্রিয়া যে শশীর বিশেষত্ব তাহাতে কিছুমাত্র সূচিত হয় নাই। তাহার পিতা গোপালের সহিত সংঘর্ষ তাহার জীবনের আর একটি প্রবল ধারা, কিন্তু এখানেও প্রাত্যহিক জীবনে একটু তিক্ততা আস্বাদন ছাড়া আর কোন স্থায়ী ফল লক্ষ্য করা যায় না। শেষ পর্যন্ত গোপালের পিতৃস্নেহসুলভ কৌশল শশীকে পরাজিত করিয়া তাহাকে গ্রামত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। শশীর চরিত্রের যে দুইটি দিক্ গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন নিবিড় সমন্বয় গড়িয়া উঠে নাই।

গ্রন্থমধ্যে আর দুইটি খণ্ডাংশ তাহাদের অসাধারণত্বের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের ভয়াবহ অস্বাভাবিকতা। তাহার স্বামী তাহাকে অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া তাহাকে পরিণীতা পত্নীর মর্যাদা দেয় নাই, তাহাকে গণিকার ন্যায় দূরে রাখিয়াছে ও তাহার গণিকাসুলভ চিত্তবিনোদিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার ফলে বিন্দুর মনে একপ্রকার বিকৃত উত্তেজনার প্রয়োজন স্থায়ী হইয়াছে—সে সাধারণ গৃহস্থকন্যার ধূসর, বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। মদের নেশার জন্য তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোন নৈতিক শাসন বা দুর্নামের ভয়ের দ্বারা রুদ্ধ হয় নাই। অবশ্য তাহার শেষ পরিণতির চিত্র আমাদের দেখান হয় নাই, কিন্তু অস্বাভাবিকতার এই ইঙ্গিত আমাদের মনকে ভয়াবহ সম্ভাবনায় বিচলিত করে।

দ্বিতীয়টি হইতেছে কুমুদ ও মতির পূর্বরাগ ও দাম্পত্য-জীবন। বিবাহিত জীবনে এরূপ Bohemianism বা উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরত্বের চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। কুমুদের প্রণয়ের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা, একটা নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্যের আস্তরণ আছে যাহাতে নব-পরিণীতা বধূর নির্ভর-প্রয়োজনের তৃপ্তি হইতে পারে না। বিবাহের মত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও সে জুয়াখেলার অনিশ্চয়তা ও অদৃষ্টবাদিত্ব আরোপ করিয়াছে। মতিরও চরিত্র তাহার প্রভাবে নিগূঢ়ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। কুমুদের নূতন ভাগ্যপরীক্ষার পথে সেও তাহার সঙ্গী হইয়া তাহার জীবননীতিকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। লেখক ভবিষ্যৎ কোন উপন্যাসে তাহাদের পরবর্তী জীবনের বিবরণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই।

(২)

এই দুইটি উপন্যাসের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জননী', 'অহিংসা', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (আগষ্ট, ১৯৩৮), 'সহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'প্রতিবিম্ব' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩), প্রভৃতি উপন্যাস ও 'অতসী মামী', 'সরীসৃপ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' ও 'ভেজাল' (১৯৪৪) প্রভৃতি ছোট গল্পসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজ প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সুর ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, জীবন-আলোচনার স্বকীয় রীতিটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা তাঁহার 'দিবা-রাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় লক্ষ্যগোচর হয়, সেই উভয় বিশেষত্বই হয় মিশ্রিত না হয় এককভাবে তাঁহার সমস্ত রচনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উপন্যাসের আসরে এই নূতন সুরপ্রবর্তনাই তাঁহার মৌলিকতার নিদর্শন।

'পদ্মানদীর মাঝি' বোধ হয় তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব—পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত কথা ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবর-পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই। এই শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি—মেজবাবুর কথা মাঝে মধ্যে শোনা গেলেও, তিনি কিন্তু বরাবরই যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছেন। ইহার অধিবাসীদের ঈর্ষ্যা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি-সমবেদনা, চক্রান্ত-দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নিজ-প্রকৃতি-নির্ধারিত, সংকীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে। কুবের মাঝি নিষিদ্ধ ভালবাসার অস্বস্তি ও দহনজ্বালা অনুভব করিয়াছে, তাহার মনোভাব ক্ষুব্ধ, নীরব অভিমান ও ঈষৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগের মধ্যে সংকোচ-বিস্ফারণে আন্দোলিত হইয়াছে কিন্তু এই হৃদয়বেদনা লইয়া সে কোথাও কাব্যসুলভ আতিশয্যের অভিনয় করে নাই; নিজ শান্ত, নিয়মিত কর্মধারার মধ্যে এই অশান্ত স্পন্দনকে সংহরণ করিয়া লইয়াছে। কপিলার আদিম, অসংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারীপ্রকৃতির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে। সে দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিয়া ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এক দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণে সেই ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে—সংগতিপন্ন স্বামিগৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এক বিপৎসংকুল, অনিশ্চিত অভিসারযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আবার কুবেরের খোঁড়া মেয়ে গোপীকে বিবাহ করিবার দাবী লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ ও জ্বালা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত কুবেরের ঘর পুড়িয়াছে—এ যেন ছেলেদের জন্য ট্রয়-নগরী-ধ্বংসের এক গ্রাম্য সংস্করণ, মহাকাব্যের ঝুমুরগানে পরিণতি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মহিমের গৃহদাহের সহিত কুবেরের ঘর-পোড়ার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে ভাবস্তরের পার্থক্য অনুভূত হইবে।

কিন্তু এই অতি সংকীর্ণ, জীবিকার্জনের ক্ষুদ্র মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, গ্রাম্য

জীবনের চারিদিকে এক সুদূর অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত পরিবেষ্টনী প্রসারিত হইয়াছে। যে পদ্মানদী এই ধীবর-সমাজের প্রাণবায়ুসঞ্চালনের প্রণালী-স্বরূপ, তাহাই এই রহস্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। হোসেন মিয়ার আবিষ্কৃত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত নির্জন দ্বীপটি, পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে পরলোকের পরিকল্পনার মত, গ্রামবাসীদের কল্পনার সম্মুখে যুগপৎ অপরিচয়ের ভীতি ও সীমাহীন আশার দ্বারা উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহা যেন একাধারে মিলিত স্বর্গ-নরকের ন্যায় গ্রামের সরল অশিক্ষিত লোকগুলিকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। অগ্নিশিখার প্রতি ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট নবনারী ইহার ভয়াবহ রমণীয়তায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র বাহু মেলিয়াছে।

আর হোসেন মিয়ার দ্বীপটি যেমন গ্রামবাসীদের পক্ষে বেহেস্ত-জাহান্নামের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সেইরূপ হোসেন মিয়া নিজে তাহাদের বিধাতা-পুরুষ। এই হোসেন মিয়া লেখকের অভিনব সৃষ্টি। তাহার দুর্ভেদ্য রহস্যাবৃত প্রকৃতি ও গতিবিধি, তাহার মৃদু, সস্নেহ ব্যবহারের মধ্যে এক অনমনীয় দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত, তাহার সমস্ত হিসাব-নিকাশ, লাভ-লোকসানের চিন্তার ঊর্ধ্বে নিশ্চিন্ত, বলিষ্ঠ উদারতার ব্যঞ্জনা,—এই সমস্তই তাহার প্রতিবেশীদের চক্ষে তাহাকে প্রায় দেবলোকের মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। পদ্মার স্রোতোরাশি যেমন সমুদ্রে মিশিয়াছে, সেইরূপ গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহ, তাহাদের স্বতন্ত্র কর্মপ্রচেষ্টা ও আশা-কল্পনা শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মনোগহনের অতল গভীরতায় আশ্রয় ও সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—ক্ষুদ্র কর্মশীলতা, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস-আবেগ—হোসেন মিয়া ও তাহার দ্বীপ যেন তাহারই ঊর্ধ্বতম চূড়া, তাহার শীর্ষদেশে সূর্যালোক-ঝলকিত জ্যোতির্বিন্দু। সমস্ত মিলিয়া এক আশ্চর্য সুসংগতি ও নিখুঁত সম্পূর্ণতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

'জননী' গ্রন্থটিও মোটের উপর সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন' গল্পে যে মাতা ও প্রণয়িনী এই দুই জাতীয় নারীর পার্থক্যের উদাহরণ দিয়াছিলেন, 'জননী'তে তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত জাতির একটি সম্পূর্ণ, তথ্যবহুল চিত্র মিলে। এই উপন্যাসে কোন আদর্শবাদের আতিশয্য নাই—মাতৃত্বকে দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইবার কোন কাব্যসুলভ, কৃত্রিম চেষ্টা নাই। জননী ও গৃহিণী সংসার-বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু; প্রেয়সী ইহার প্রত্যন্তপ্রদেশের একটা বিচিত্র ক্ষণস্থায়ী বর্ণপ্রলেপ। কাজেই বাস্তব জীবনে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই প্রিয়া হইতে জননীর বিকাশ খুব স্বাভাবিক পরিণতি। শ্যামার জীবনে তাহার যৌবনের প্রণয়াবেশ অপেক্ষা তাহার গৃহিণীত্বই সুপরিস্ফুট। তাহার স্বামী খেয়ালী, দুর্বলচিত্ত ও দায়িত্ববোধহীন বলিয়াই প্রণয়ের ঘোর তাহার শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছে ও সুস্থ দাম্পত্যজীবন তাহার কোনও দিন গড়িয়া উঠে নাই। সংসার-পরিচালনার শ্রান্তিহীন পেষণে তাহার সমস্ত সূক্ষ্ম, সুকুমার উন্মেষগুলি উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। হয়ত দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এক অসতর্ক, আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে বসন্তপবনস্পর্শে একটা অতর্কিত যৌবন-উচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে হিল্লোলিত হইয়াছে; বা প্রৌঢ়জীবনের সীমান্তদেশে উপনীত হইয়া পুত্রবধূর তীব্র, বহ্নিজ্বালাময় যৌবনবিকাশ তাহার মনে একটা ঈর্ষ্যার ঝলক জাগাইয়াছে। কোনও দিন বা চোখের সামনে তরুণ-তরুণীর অসংকুচিত প্রেমাভিনয় তাহার নীতিবোধকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে তীব্র বিতৃষ্ণায় পূর্ণ

করিয়াছে। কন্যা বকুলের প্রতি শঙ্করের মোহের দিকে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে; কন্যা-জামাতার মিলন সুখময় না হইবার আশঙ্কায় সে কন্যার প্রতি অসংবরণীয় ক্রোধে জলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষুদ্র, সাময়িক ব্যতিক্রম তাহার শান্ত গৃহিণীত্বের মূল সুরটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে; এবং তাহার সমস্ত চরিত্রকে পূর্ণতা ও সংগতি দিয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর হইতে জননীর জীবনারম্ভ। কাজেই শ্যামার প্রথম দুইটি সন্তানের জন্মে তাহার মানস প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম প্রসবের পর তাহার অদ্ভুত, স্তিমিত-বেদনা-বিদ্ধ অনুভূতি; সূতিকাগৃহে অজ্ঞাত ভয়ের ও থাকিয়া থাকিয়া বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের নিবিড় স্পর্শ-শিহরণ, পিতৃপুরুষের অদৃশ্য জনতার রহস্যময়, অস্পষ্ট উপলব্ধি; শিশুর অকাল মৃত্যুতে তাহার অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি—এই সমস্ত জননীর প্রথম অভিজ্ঞতার চমৎকার বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় শিশুর জন্মকালে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—আনন্দের আতিশয্য ও উত্তেজিত কল্পনার পরিবর্তে শান্ত, বিষণ্ণ বাস্তব-স্বীকৃতি; তীক্ষ্ণ আশঙ্কা-উদ্বেগের স্থলে অদৃষ্টবাদের নিকট উদাসীন আত্মসমর্পণ। এই মনোভাব-বৈপরীত্য নারীজীবনের একটা আমূল পরিবর্তন সূচনা করে। প্রথম সন্তান মাতার নিকট কল্পতরুর পারিজাত-কুসুম, নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়, দ্বিতীয়, সংসার-যন্ত্রের আবর্তনের একটা মধুর পরিণতি, সংসার-বৃক্ষের মিষ্টতম ফলমাত্র। প্রথম সন্তানের উপর প্রসূতি যে মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া ধরে, তাহা তাহার যৌবনের অপরূপ কল্পনার শেষরশ্মিমণ্ডিত, দ্বিতীয় সন্তানকে সে দেখে মাতার বিস্ময়লেশহীন, দায়িত্ববোধের চাপে আনমিত, সংসারজ্ঞানস্তিমিত দৃষ্টিতে।

শ্যামার সুদীর্ঘ জননী-জীবনের পরিবর্তনস্তরগুলি,—স্বচ্ছল অবস্থার আশা-মধুর পরিকল্পনা, দুঃসময়ের প্রারম্ভে কঠোর মিতব্যয়িতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, অতর্কিত আঘাতে ব্যাকুল অসহায়তার সহিত ভাঙ্গিয়া পড়া ও আশ্রয়ান্তরের অন্বেষণ, চরম দুর্দশায় পরের সংসারে আশ্রয়লাভের হীনতাস্বীকার ও ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধা, পুত্রকে অবলম্বন করিয়া নূতন নীড়-রচনার আগ্রহ ও সংকল্প এবং শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর নিকট গৃহিণীত্বের মর্যাদার ত্যাগপত্র-স্বাক্ষর—প্রত্যেক নারীরই সাধারণ অভিজ্ঞতা। শেষের দিকে ক্লান্তি-অবসাদের পাষাণভার ক্রমশঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করিতে থাকে; গৃহিণীর দিকচক্রবালে উদাসীনতার ধূসর বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে; সময় সময় হাল ছাড়িয়া দিয়া শ্রান্ত মন অবসরের স্বপ্ন দেখে। এই সমস্তই শ্যামার জীবনে চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে।

শ্যামার বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রণয়ব্যাপারে ও সংসার-পরিচালনায় স্বামীর সহিত উভয়ত্রই অসহযোগ, সময় সময় প্রবল বিরোধ। শীতলের অযোগ্যতা ও ঔদাসীন্যের জন্য সংসারের ভার-কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে শ্যামার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শীতলের সহিত তাহার সম্পর্কও অভিভাবকত্বের পর্যায়ে উঠিয়াছে। তাহার স্বামী প্রৌঢ়জীবনে বাহিরের বিলাস হইতে প্রতিহত হইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্যামার প্রেয়সীত্বের সমস্ত সরস মাধুর্য শুকাইয়া গৃহিণী-পণার কঠোর, প্রশ্রয়হীন, হিসাবী মনোভাবে পরিণত হইয়াছে। একদিন শীতল তাহার এই মাধুর্যহীন অতিসতর্কতার বিরুদ্ধে জ্বালাময় বিদ্রোহে উত্তেজিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ সে এই অবস্থাকে ক্ষুণ্ণ নৈরাশ্যের সহিত মানিয়া লইয়াছে। যে একদিন সম্পূর্ণভাবে তাহারই ছিল,

সে ক্রমশঃ তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া সংসাররূপ বিরাট যন্ত্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়াছে।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র সংক্ষেপে অথচ স্বাভাবিকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মন্দা গৃহিণীর মর্যাদা পাইয়া সপত্নীকে স্বামীর প্রণয়ের অংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। বিধানের বাল্যজীবনে যে বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। সে যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নিজ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া সংসারের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে, মাতার দুর্বল, কম্পিত হস্ত হইতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শ্যামার ন্যায় তাহার জীবনেও প্রণয় মুকুলিত হইবার অবসর পায় নাই—তাহার বিবাহ সংসার-সেবার অঙ্গ-স্বরূপ। শ্যামার প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের সঙ্গে যে গ্রন্থের আরম্ভ, তাহার পুত্রবধূর প্রথম প্রসবের সহিত তাহার শেষ—এই ঘটনা যেন সংসার-রাজ্যের রাজ্ঞী-পরিবর্তনের ঘোষণা।

'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' গ্রন্থ দুইখানি অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ। প্রথমটিতে আশ্রমের ইতিহাসটি ভণ্ডামি, ধর্মান্ধতা এবং কখনও গোপন, কখনও প্রকাশ্য যৌনলালসার উদ্ভট লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণচেষ্টা ও গ্রন্থকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোরালো আবহাওয়াকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই—ইহারা যেন অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি-সংঘর্ষ বাধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূলহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'-এর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীনতার চিহ্ন আরও সুপরিস্ফুট। এই দুইখানি উপন্যাসে গ্রন্থকারের উদ্ভট কল্পনা-প্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা করিয়াছে।

(৩)

'সহরতলী' উপন্যাসে লেখক বিষয়নির্বাচন ও চরিত্রপরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাসে যে স্তরের নর-নারীর জীবনসমস্যা বর্ণিত হয়, এখানে তদপেক্ষা নিম্ন স্তরের কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রাণহীন, নিস্তেজ, একঘেয়ে জীবন-কাহিনীতে যে সরস নূতনত্বের অভাব, তাহা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে অপেক্ষাকৃত সুপ্রচুর। বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় ইহাদের সর্বদা মুখোস পরিয়া থাকিতে হয় না; সুলভ ভাবপ্রবণতায় ইহাদের জীবন আর্দ্র, স্যাঁতসেঁতে নহে। ইহাদের ব্যবহারে একটা বলিষ্ঠ সরলতা আছে; ইহাদের জীবনকে উপভোগ করিবার অবসর যত কম, উপভোগ-স্পৃহা সেই পরিমাণ তীক্ষ্ণ ও অকুণ্ঠিত। ঈর্ষ্যা, ক্ষোভ, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ইহাদের মধ্যে লজ্জায় আত্মগোপন না করিয়া অনাবৃত তীব্রতার সহিত অভিব্যক্তি লাভ করে। ইহাদের সমস্ত স্থূল, ইতর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রাণশক্তির সতেজ স্ফূর্তি প্রচুর ধারায় প্রবাহিত। 'সহরতলী'তে এই নূতন বিষয়ের অভিনব স্বাদবৈচিত্র্য একটা প্রধান আকর্ষণের হেতু। যতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়, কালো, চাঁপা প্রভৃতি যশোদার ভাড়াটেরা এই শ্রমিক জগতের প্রতিনিধি

—ইহাদের জীবন যতই খণ্ডিত ও বিকৃত হউক, ইহা খাঁটি ও অকৃত্রিম, অন্তর-বাসনার ছদ্ম-বেশহীন, নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। ইহাদের মধ্যে সুধীরের চরিত্রই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে—তাহার ক্রূর ঈর্ষ্যা, যশোদার নিকট প্রণয়যাচ্ঞার স্পর্ধা, খুঁতখুঁতে অসন্তুষ্ট ভাব তাহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

কিন্তু এই শ্রমিকসমাজ ভদ্রসমাজের সংস্পর্শহীন নহে, জীবিকার্জনের সূত্রে ইহাদের কর্ম-ক্ষেত্র এক ও স্বার্থ-ও-আদর্শগত সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘর্ষ সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে ধর্মঘটের রূপ গ্রহণ করিয়াছে—যে ধর্মঘট বুদ্ধিজীবীর অস্ত্রাগারে শাণিত হইয়া অধুনা শ্রমিকের অনভ্যস্ত, অপটু হস্তে ধৃত হইতেছে। যশোদা মজুরদের ব্যক্তিগত হিতৈষিণী হইতে ক্রমশঃ তাহাদের কর্মজীবনের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়া মিলের মালিক সত্যপ্রিয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এই অনভ্যস্ত যুদ্ধ-প্রণালীর বিশেষ রণকৌশল তাহার অনায়ত্ত থাকায় সে সহজেই সত্যপ্রিয়ের কূটবুদ্ধির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। সে সত্যপ্রিয়ের ফাঁদে পা দিয়া শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব, মজুরদের বিশ্বাস ও আনুগত্য হারাইয়াছে।

যশোদা ও সত্যপ্রিয়—এই দুইটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরিপূরকরূপে কল্পিত হইয়াছে। যশোদার পরিকল্পনার অনন্যসাধারণত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। এমন বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর-শীল, দৃপ্ত-আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবপ্রবণতাহীন, অথচ রূঢ় ব্যবহারের অন্তরালে মায়া-মমতায় কোমল, সেবানিপুণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্ত্রীলোক সংসারে, বা সাহিত্যে সুলভ নহে। তাহার সমস্ত ব্যবহার ও কার্যকলাপ একটি সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা অবিচলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত। সর্বপ্রকার ভাবাবেগ, রমণীসুলভ কোমলতা, ন্যাকামি ও দুর্বল গতানুগতিকতার প্রতি সে খড়্গহস্ত। অথচ শ্রমিক শ্রেণীর খেয়ালী ব্যসন-বিলাস, তাহাদের সাময়িক অবসাদ ও শ্রান্তি, ছেলেমানুষী আবদার ও দূরদৃষ্টিহীন অমিতব্যয়িতা, স্বার্থহানিকর আত্মঘাতী প্রবৃত্তির প্রতি তাহার আছে একদিকে তীব্র, কঠোর ভৎর্সনা, অন্যদিকে সস্নেহ ক্ষমার প্রশ্রয়। অপরাধীর শাস্তি দিবার জন্য তাহাদের আহার-বন্ধের আদেশ-প্রচার ও স্বেচ্ছায় অনুপস্থিতির দ্বারা সেই আদেশ-লঙ্ঘনের সুযোগ-প্রদান—এই দুইই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বিপরীতমুখী বিকাশ। তাহার ভাই নন্দর কীর্তনানুরাগ ও ভাবার্দ্রতা, তাহার চাকুরীজীবী ভদ্রলোক হইবার জন্য লোলুপতা ও চরিত্রের মেরুদণ্ডহীন দৌর্বল্য—সমস্তই তাহার অবজ্ঞার উদ্রেক করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নন্দ যখন সুবর্ণের প্রভাবে সবাক্ চিত্রের অভিনেতৃ-জীবন অবলম্বন করিয়াছে, তখনও যশোদার মনে তাহার খ্যাতি ও নূতন পদবীর প্রতি সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা অনুকম্পার ভাব মিশ্রিত হইয়াছে। কুমুদিনীর বিষাক্ত সমালোচনা, পুরুষের সাময়িক চিত্তবিকার, সুধীরের প্রেমনিবেদন ও মাতাল মতির আলিঙ্গন-প্রয়াস—তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতি এই সমস্ত অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতি উদার, ক্ষমাশীল উপেক্ষা দেখাইয়াছে। ভদ্রলোকের জীবনযাত্রায় শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের মিথ্যা অভিমান, সুরুচি সৌজন্যের আবরণে ঐশ্বর্যগর্বের আড়ম্বরপ্রচার মান-মর্যাদার জিদে সহজ স্নেহের অস্বীকার প্রভৃতি বিকারগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। এই মেকী ও ফাঁপা জীবনের সহিত তাহার সন্ধিহীন যুদ্ধ-ঘোষণা।

যশোদার চরিত্রে পুরুষ ও পুরুষোচিত গুণের প্রাধান্য-সত্ত্বেও তাহাকে নারী বলিয়া

চিনিতে আমাদের বাধে না—তাহার কর্তৃত্বাভিমানপূর্ণ, ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্বের মধ্যে নারী-দুর্লভ সহৃদয়তা মেশানো আছে। তাহার অবয়বের বিশালত্ব ও রূপহীনতার জন্য তাহার যে অব্যক্ত ক্ষোভ আছে তাহা মাঝে মধ্যে বাক্যে প্রকাশিত হয়। তাহার 'চাঁদের মা' পরিচয়টি যদিও সাধারণতঃ তাহার পুরুষ ভাড়াটিয়াদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বোধনপ্রয়াসের প্রতি-ষেধক রূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি তাহার পূর্ব-জীবনের শোকস্মৃতিবিজড়িত এই অভিধান তাহার অবরুদ্ধ মাতৃত্বের, তাহার কঠোর প্রকৃতির মধ্যে এক ব্যথাপূর্ণ, কোমল স্তরের দিকে সার্থক ইঙ্গিত করে। তাহার বিবাহিত জীবন ও স্বামী তাহার ইতিহাসে অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু যৌবনের স্বপ্ন, প্রেমের কল্পনা এখনও তাহার বলিষ্ঠ কর্মব্যস্ত জীবন যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে এক অতি সূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী মোহজাল রচনা করে। বিরাটকায়, খঞ্জ, শিশুর ন্যায় অসহায় ও অভিমানী ধনঞ্জয় তাহার এই স্বপ্নপ্রবণতার সাক্ষ্য ও নিদর্শন। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি একটা মধুর অনিশ্চয়তায় রহস্যাবৃত হইয়া আছে। বৈজ্ঞানিকের মনের অন্ধকার কোণে ভূতের ভয়ের মত, যশোদার বস্তুনিষ্ঠ, আবেশ-জড়িমাহীন, স্ফটিক স্বচ্ছ অন্তরের এক সুদূর, প্রত্যন্ত প্রদেশে অস্বীকৃত প্রেমের লঘু বাষ্পপুঞ্জ প্রকৃতির কোন এক খেয়ালী বিধানে সঞ্চিত রহিয়াছে।

সত্যপ্রিয় লেখকের চরিত্রাঙ্কনশক্তির আর একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। জ্যোতির্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ সভায় তাহার যে কৌশলময়, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিটির সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহার প্রত্যেক পরবর্তী আবির্ভাবে এই পরিচয় স্পষ্টতর হইয়া এক ভয়াবহ, অতলস্পর্শ রহস্যের ধারণা জন্মায়। তাহার রাজনৈতিক মতবাদের অসাধারণত্ব, অফিস পরিচালনা ও কর্মচারী পরীক্ষার অভিনব বিধি, বিনয় ও সহাস্য শিষ্টাচারের পিছনে অনমনীয় সংকল্প ও অমোঘ রণনীতি কৌশল—এই সমস্ত মিলিয়া এক দুরবগাহ মনুষ্যচরিত্রের ছবি ফুটাইয়া তোলে। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র রাসবিহারীর সহিত সত্যপ্রিয়ের কতকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রাসবিহারীর সহিত তুলনায় সত্যপ্রিয় অনেক বেশী জটিল ও বহুমুখী, আরও সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত।

'সহরতলী'র দ্বিতীয় পর্বে যশোদা ও সত্যপ্রিয় উভয়েরই পরিচয়ের নূতন স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সত্যপ্রিয়ের ব্যবসায়-জীবনে প্রশান্ত, নির্বিকার নির্মমতা দ্বিতীয় পর্বে তাহার পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার কন্যা-জামাতার সহিত ব্যবহারে আমরা সেই সুপরিচিত ক্রূরতা, সেই অমোঘ কর্মক্রম, সেই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরই পুনরভিনয় লক্ষ্য করি। উভয় ক্ষেত্রেই একই অস্ত্র সমান নির্মমতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অন্দর-মহলের ছবি যেমন একদিকে সত্যপ্রিয়ের পরিচয় সম্পূর্ণ করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটা সংকীর্ণ যান্ত্রিকতার দিক্ আছে তাহার উপরও আলোকপাত করিয়াছে। যে ব্যক্তি মিলের শ্রমিক ও ঘরের কন্যা-জামাতা উভয়ের অবাধ্যতার জন্য একই শাস্তিবিধান করে, তাহার প্রকৃতিতে প্রসার ও নমনীয়তার যে একান্ত অভাব তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় পর্বে যশোদাও এক পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়া তাহার পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ,

তাহার দীর্ঘকালের পুরাতন আবেষ্টন ছাড়িবার সম্ভাবনা তাহাকে কতকটা বিচলিত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অজিত ও সুব্রতার সংস্পর্শে আসিয়া সে এমন একটি ভদ্র পরিবারের সন্ধান পাইয়াছে যাহার সম্বন্ধে তাহার পূর্বের অবজ্ঞাসূচক ধারণা ঠিক প্রযোজ্য নহে। এই তরুণ দম্পতির মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন মোটেই লক্ষ্যগোচর নহে—তাহাদের জীবনে সহজ আনন্দ, সুরুচিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ ও উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, বিশুদ্ধ, সবল, সাহসিক প্রেমের উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যশোদা অনেকটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সহিত ভদ্রজীবনের এই অপ্রত্যাশিত, স্বাস্থ্য-ও-সৌন্দর্যপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছে। এই নব উপলব্ধিটিকে অন্তরে স্থান দিবার ফলে তাহার ব্যবহার ও চাল-চলনে, তাহার জীবনাদর্শে একটু নূতনত্বের স্পর্শ লাগিয়াছে। সুব্রতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিবেশী ভদ্র পরিবারগুলির সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে ও মজুরদের অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার হইতে ভদ্র পরিবারের সংগীতচর্চার ব্যবস্থা পর্যন্ত তাহার কর্মপরিধি বিস্তার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে যশোদার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অটল আত্মপ্রত্যয় কতকটা ম্লান হইয়াছে। নূতন অবস্থার অনিশ্চয়তার মধ্যে তাহার পদক্ষেপ, অভ্যস্ত দৃঢ়তা হারাইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সতর্ক ও সঙ্কোচ-শ্লথ হইয়াছে। অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে সে যে নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবে, তাহা সম্ভবতঃ এই পরিবর্তিত আদর্শের গতিচ্ছন্দেই নিয়মিত হইবে।

(৪)

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি লেখকের যৌনব্যাপারসম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি আঁকিবার যে প্রবল প্রবণতা আছে তাহারই চূড়ান্ত উদাহরণ। এই উপন্যাসে যৌন কল্পনার অবাধ ব্যাপ্তি ও বিচরণের, ইহার সূক্ষ্মতম, অনির্দেশ্যতম খেয়াল-পরিতৃপ্তির, উপযোগী প্রতিবেশ আশ্চর্য কলাকৌশলের সহিত রচিত হইয়াছে। এই প্রতিবেশে সমাজজীবনের সমস্ত নৈতিক অনুশাসন ও নিয়ম-সংযম, ইহার ভাবী ও স্থায়ী উপাদান ও মনোবৃত্তিসমূহ—এক কথায় ইহার মধ্যে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে—সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া এক লঘু স্বপ্নাবেশমন্থর, স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোটা মানুষ ও তাহার মানস সমগ্রতাকে বাদ দিয়া তাহার সাধারণতঃ অবদমিত অংশবিশেষকে, তাহার যৌন আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য অণু-পরমাণুকে, অগণিত বুদ্‌বুদ্‌রাশির ন্যায় দ্রুত উত্থান-বিলয়শীল, যৌন কল্পনার ছায়াছবিগুলিকে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, একটা অখণ্ড জীবনের প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। রোমান্স-লেখক জীবনের জটিল বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া অবিমিশ্র সৌন্দর্য-রোমাঞ্চের জন্য যে কল্পনামূলক স্বৈরাচারের দাবী করেন, এখানে অবরুদ্ধ যৌন কামনার বেপরোয়া পক্ষবিস্তারের জন্য, মনোবিকারের উদ্ভট আতিশয্যের খাতিরে, সেই চরম দাবীই উত্থাপন করা হইয়াছে। কল্পলোক এতদিন বাস্তবতার নিকট যে বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়াছে, অধুনা অবচেতন মনের অন্ধতমসাচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল বীভৎসতা সেই অনুগ্রহের অংশভাক্ হইবার দাবী জানাইতেছে।

এই পূর্বস্বীকৃতিটুকু মানিয়া লইলে উপন্যাসটির প্রতিবেশরচনায় নিখুঁত সামঞ্জস্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যে চিত্রকর সরল, দৃঢ় রেখা বাদ দিয়া, বস্তুগত কাঠিন্য গোধূলির আব্‌ছা অস্পষ্টতায় বিলীন করিয়া কেবল বঙ্কিম, ভাঙ্গা-চোরা বর্ণ-সন্নিবেশে জীবনের ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহার বিষয়বস্তু যাহাই হউক শিল্পচাতুর্য উপেক্ষণীয় নহে। রাজকুমার, রিণী, মালতী, সরসী

ও শেষ পর্যন্ত কালীকে লইয়া যৌন আকর্ষণের সূক্ষ্ম বৈদ্যুতীপূর্ণ ও যৌন কল্পনাবিলাসের লঘু বাষ্পরাশিবেষ্টিত এক ছায়া-জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থূল, বাস্তব জগতের একমাত্র প্রতিনিধি গিরীন্দ্রনন্দিনীর নিকট তাহার এই অসুস্থ মনোবিকার রূঢ় প্রতিঘাত লাভ করিয়া এই যত্নরচিত অনুকূল আবেষ্টনে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে এই রোগস্ফীত, অপরিমিত কল্পনাকে বাধা দিবার কেহ নাই—এই ধূম্রাকৃতি দৈত্য বাস্তবজীবনের সংকীর্ণ বোতল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। সমাজের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি এখানে নিশ্চেষ্ট; অভিভাবকের সতর্ক প্রতিরোধ এখানে সম্মোহিত। যে কয়েকটি প্রাণী এই জগতের অধিবাসী তাহারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে যৌনবোধের অবাধ কারবারের জন্য এক যৌথ-সমবায়-সমিতি গঠন করিয়াছে। ইহার নিয়ম-কানুন সাধারণ জগৎ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; ইহা বাহিরের বা বিবেকের কোন শাসন না মানিয়া কেবল নিজ আভ্যন্তরীণ, অনির্দেশ্য তৃপ্ত অতৃপ্তিবোধের নির্দেশ অনুসরণ করে। এ যেন যৌন-সাধনার একপ্রকার তুরীয় অবস্থা—ইহার ব্রহ্মলোকে উন্নয়ন।

রাজকুমারের যৌন আকর্ষণ অসাধারণ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী—রিণী, মালতী ও সরসী প্রত্যেকেই তাহার সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। রাজকুমার কিন্তু সম্ভোগ অপেক্ষা রোমন্থনেরই পক্ষপাতী, প্রাপ্তি অপেক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনার চারিদিকে কল্পনাবিলাসের সূক্ষ্মতন্তুনির্মিত জাল বুনিতেই অধিক মনোযোগী। রিণীর উষ্ণ চুম্বনের নিকট হইতে সে পিছাইয়া আসে ও এই পশ্চাদপসরণের সমাজনীতিও বিশ্লেষণ করে। মালতীর বিগলিত আত্মসমর্পণের সুযোগ না লইয়া মাত্র কেশ চুম্বনের দ্বারা তাহার অধ্যগ্রহণের স্বীকৃতি জানায়—ভক্ত নিবেদিত নৈবেদ্যে দেবতার দৃষ্টিভোগের ন্যায়। মালতীর সহিত হোটেলে রাত্রি-যাপনের ব্যপদেশে সে তাহাকে সংযম শিখাইতে চাহে—মালতী যেন তাহার পরিবর্তে শ্যামলকে ভালবাসে। একমাত্র সরসীর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক—সরসী তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু অন্ধ মোহজড়িত আবেগের পরিবর্তে সুস্পষ্ট সহানুভূতি ও পরিষ্কার বোধশক্তির সহিত। রাজকুমারের অসুস্থ, জটিল মানস পরিস্থিতি, তাহার মনোগহনের গোলকধাঁধা সেই একমাত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কালীর সহিত তাহার যে সহজ সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহা যেন এই জটিল মনোবিকারের দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। রাজকুমারের যৌন কামনার বাস্তব চরিতার্থতার উপযোগী সতেজ ও সুস্থ জীবনীশক্তি নাই—ইহার ধারা অন্তহীন আত্মবিশ্লেষণে, নানা পরীক্ষামূলক অনুশীলনের বালুকাবহুল শাখাপথে, শীর্ণ কৃশ রেখায় চক্রাবর্তন করিয়াছে।

এই বিকারের বীজাণুপূর্ণ আবহাওয়ায় রাজকুমারের অপ্রকৃতিস্থ মনে নানা উদ্ভট খেয়াল গজাইয়া উঠে। নারীর নগ্ন দেহে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার ইঙ্গিত-আবিষ্কারের অদ্ভুত কল্পনা তাহাকে পাইয়া বসে। এই পরীক্ষার সুযোগ পাইবার জন্য সে তাহার পরিচিত প্রত্যেক নারীর অঙ্গের উপর তীক্ষ্ণ, অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাহার এই খাপছাড়া আচরণ তাহার প্রণয়িনীত্রয়ীর মধ্যে নিজ নিজ চরিত্রানুগত বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সে তাহাদের একজনের—রিণীর নিকট, নিতান্ত নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সহিত, তাহার নিরাবরণ দেহ দেখিবার দাবী জানায়। রিণী এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত

অগ্রাহ্য করে,—কিন্তু তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় প্রস্তাবের অশ্লীলতায় নহে, রাজকুমারের নিরাসক্তির সাড়ম্বর ঘোষণায়। মালতীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপনের অবসর হয় নাই, কিন্তু সরসী স্বেচ্ছায় এই অনুরোধ পালন করিয়া রাজকুমারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগিতার প্রমাণ দিয়াছে।

যৌনানুভূতির এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে দীর্ঘ পদচারণার ফলে রাজকুমার ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। ছদ্মবেশী যৌনকামনার আত্মগোপনপ্রবণতার অনেক কৌতূহলজনক উদাহরণ তাহার গোচর হইয়াছে। মনোরমা যে কালীর মারফত নিজেরই একটা অবরুদ্ধ, হয়ত অজ্ঞাত যৌন লালসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে, কালীর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে এই অস্বীকৃত সত্য তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অভিভাবকত্বের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রিণীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রাজকুমারের মন্থর, দ্বিধাগ্রস্ত গতিতে অসহিষ্ণু হইয়া, তাহার দুর্বোধ্য, আত্মনিরোধী আচরণে পীড়িত হইয়া, অবশেষে পাগলামিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা জটিল, বিস্ময়কর প্রকাশ হইয়াছে, মালতীর ক্ষেত্রে। রাজকুমারকে ভালবাসিবার কোমল, আমোদ আগ্রহে, তাহার নিকট নির্বিচারে আত্মদানপ্রবণতায় সেই সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হইয়াছে। রাজকুমারকে না হারাইবার ব্যাকুল, একনিষ্ঠ সাধনায় সে শ্যামলের প্রতি নিষ্ঠুরতম ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু আত্মসমর্পণের মুহূর্তে সে কোন দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে পিছাইয়া আসিয়াছে। একদিনের হীন গোপন মিলন তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয় ও দুই তিন মাসের অবাধ প্রকাশ্য সহবাসের কমে রাজকুমারের প্রতি তাহার আকর্ষণের পরিতৃপ্তি হইবে না, এই মিথ্যা অজুহাতে সে তাহার অবচেতন মনের বিশৃঙ্খলা ঢাকিতে চাহিয়াছে। তাহার ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই তাহার দারিদ্র্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাজকুমার বুঝিয়াছে যে, মালতীর সহিত তাহার সম্বন্ধ শ্রদ্ধা স্নেহের, ভালবাসার নহে ও ভালবাসার দুরন্ত ইচ্ছাই সব সময় তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। ইহাও সেই মায়াবী মনোভাবের আর একটা নিপুণ ছদ্মবেশ।

এই সূত্রে রাজকুমার নিজের সম্বন্ধেও অনেক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের দ্বারা অন্যথা অপ্রাপ্য আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার আত্মোপলব্ধির এক একটি নূতন স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সে স্বভাবতঃ যৌন বিষয়ে একটু বেশিমাত্রায় কৌতূহলী, যৌন অনুভূতি সম্বন্ধে উগ্ররূপে স্পর্শ সচেতন (sensitive)। কিন্তু বাস্তবজীবনে তাহার এই ইচ্ছা প্রতিহত হয় বলিয়া সে চিন্তাজর্জর, অবসন্ন ও পথসন্ধান-বিমূঢ়। এ দ্বিধাক্লিষ্ট ভাব হইতে সে পরিত্রাণ পাইয়াছে সরসীর সোৎসাহ সমর্থন ও সহযোগিতায়। সরসীর নগ্ন দেহে সে নিজ অদ্ভুত কল্পনা যাচাই করিবার সুযোগ পাইয়া এত উৎফুল্ল হইয়াছে যে, বোধ হয় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া এতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মালতীর অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আবার তাহার মনে সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত রিণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি তাহার মনোবিকারের উপর এক ঝলক তীক্ষ্ণ, চোখ-ধাঁধানো আলোকপাত করিয়া তাহাকে তাহার ব্যাধির ভয়াবহ দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। এই আলোকে সে তাহার চরিত্রের বিকলাঙ্গ অসামঞ্জস্যের প্রকৃতিটি সুস্পষ্টভাবে, খোলা বইএর পাতার মত পড়িয়াছে। অতিরিক্ত থিওরি-বিলাসের ফলে তাহার সুস্থ, স্বাভাবিক পরিণতি—

কৃতজ্ঞতা, প্রেম, অপরের সম্বন্ধে কল্যাণকামনাপ্রণোদিত কৌতূহল—সমস্তই যেন শুষ্ক শীর্ণ হইয়াছে। এই স্বীকারোক্তির তীব্র, আত্মদানিপুণ আন্তরিকতা আমাদিগকে অভিভূত করে, লেখকের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণকুশলতার ইহা একটা চমৎকার পরিচয়। রিণা, মালতী ও সরসীর চরিত্র-পার্থক্যও সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—রিণা খেয়ালী, অভিমানপ্রবণ, আদুরে মেয়ে, যাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোন বাধা বন্ধ মানে না, মালতী—কোমল, ভাবপ্রবণ, আত্মদানোন্মুখ, কিন্তু ভালবাসার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, সরসী—কঠোর, ব্যবহারিক জীবনে সহজ-নিপুণ, অবদমিত যৌন বুভুক্ষার মূলাস্বরূপ স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম সহানুভূতিসম্পন্ন।

যৌনতত্ত্ববিশ্লেষণের দিক দিয়া উপন্যাসটির উৎকর্ষ বিশেষভাবে প্রশংসাহ। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের গভীরতা ফ্রয়েডের অনুমান সিদ্ধান্তের স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। জীবনের যে কোন খাপছাড়া ব্যবহারই মূলতঃ যৌন প্রেরণা হইতে উদ্ভূত এই স্বতঃসিদ্ধটা মানিয়া লইলে যৌন প্রেরণার কারণ দেখান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিকদের প্রথম কারণ (First cause) পর্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় কারণে (Secondary cause) আশ্রয় গ্রহণের অনুরূপ ব্যাপার। বাতাসে বীজাণু আছে ইহাই রোগের কারণ নির্ধারণে যথেষ্ট হইলে বাতাসে বীজাণু কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন অনুত্থাপিত ও অমীমাংসিত থাকে। সেইরূপ উপন্যাসের চরিত্রগুলির নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের মূল খুঁজিতে টান দিলে দেখা যায় যে, ইহা শেষ পর্যন্ত কামপ্রবৃত্তির মূলে সংলগ্ন। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক, কিন্তু কোন অবিশ্বাসী যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, রাজকুমারের সঙ্গে এতগুলি নারীর এইরূপ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল কি উপায়ে, তবে লেখক এই কৌতূহলকে তাঁহার নাম বাহুল্য বলিয়াই নির্দেশ করিবেন। রাজকুমারকে রূপক বা প্রাতিনিধ্য হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে লেখক পাঠককে তাহার আপত্তি জানাইয়াছেন কিন্তু তিনি যে কারণ দেখাইয়াছেন যে, সে অনেকের কামপ্রবৃত্তির সাধারণ ও অসংযত আকর্ষণের মধ্যমণি, তাহাতে তাহার রূপকত্ব না হউক প্রাতিনিধ্যের অনুমান সমর্থিতই হয়। বোধ হয় আর্টের সংগতি ও সম্পূর্ণতার দিক হইতে রাজকুমারকে রূপক-হিসাবে লইলেই পূর্বোল্লিখিত সংশয়ের যথাসম্ভব নিরসন হইতে পারে। কেননা রূপকের ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল সাধারণতঃ সুপ্ত থাকে—যে স্তরে ইহা সাংকেতিকতার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি মিলাইয়া সম্পূর্ণমণ্ডলতা লাভ করে আমরা সেই স্তরেই ইহার সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে অভ্যস্ত। সে যাহাই হউক, রাজকুমারকে রূপক বা ব্যক্তি যে হিসাবেই গ্রহণ করা যাউক, সে যে জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন, অনুদ্‌ঘাটিত দিক হইতে যবনিকা অপসারিত করিয়াছে ইহা সর্বথা স্বীকার্য।

'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে (১৯৪৩, সেপ্টেম্বর) ঔপন্যাসিক তারকেন্দ্র একটু দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কোন অনির্দিষ্টনামা রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা তারকের চরিত্রের ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত করার ইচ্ছা হয়ত লেখকের ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যতঃ পূর্ণ হয় নাই। তারকের ব্যক্তিগত পরিচয় আমরা যেটুকু পাই—তাহার চাকরী করিতে অনিচ্ছা, চাকরীর বন্ধন এড়াইবার জন্য নানা অজুহাত-সৃষ্টি ও কৌশল-প্রয়োগ, দেশসেবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতির দ্বিধাজড়িত অনুসন্ধান—রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া ঠেকে না। আর এই পরিচয়ের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। কলিকাতা কেন্দ্রে তাহার পার্টির জীবনাদর্শ ও

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপ্রণালী তাহার কাছেও দুর্বোধ্য ও খাপছাড়া ঠেকিয়াছে। সদস্যদের সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সংকোচ-বিধানকে সেও ঠিক মানিয়া লইতে পারে নাই। যৌথ ব্যবস্থার রন্ধ্রপথে ব্যক্তিগত ভাববিলাস ও বিশেষ দাবী মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে চমকিত করিয়াছে। কাজেই তারকের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক দলগত মতবাদের প্রতিবিম্ব নহে—ইহা সাধারণ, সুস্থ আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করিয়াছে।

সুতরাং উপন্যাসের প্রধান বিষয় হইতেছে, এই রাজনৈতিক দলের চিন্তা-ও-কর্মধারার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। ইহার মধ্যে যতটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় আছে, ততটা ঔপন্যাসিক রসসৃষ্টির নাই। পার্টির আদর্শ ঠিক আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়, অভাবাত্মক (negative)—কংগ্রেসের পন্থার ভ্রান্তি ঘোষণাই ইহার প্রধান অঙ্গ। গ্রন্থে কোন সত্যিকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া লেখক এক দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এই কৈফিয়ৎ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর কৈফিয়তের মত সৎ হইলেও তাহার কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে যে অংশে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ আছে তাহা মনোজিনীর সহিত সীতানাথের সম্পর্ক ও প্রসঙ্গক্রমে যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে দলের বিশেষ মতবাদ ও আদর্শ-বিষয়ক। অবাধ মেলামেশার সুযোগদান ও ভাবলেশহীন কর্মব্যস্ততার প্রতিবেশ-রচনা—এই দুই ব্যবস্থা যে যৌন সম্পর্কের মোহাবেশমুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় তাহা লেখক মনোজিনীর মুখ দিয়া খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সীতানাথের আদুরে ছেলের মত ক্রমবর্ধমান আবদার ও মনোজিনীর উত্তেজনাহীন, সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছবিটি গ্রন্থের অন্যান্য আলোচনা-প্রধান অংশের সহিত তুলনায় উজ্জ্বলবর্ণে ও মানব প্রকৃতির রহস্যজড়িত হইয়া ফুটিয়াছে।

(৫)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পসংগ্রহের মধ্যে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর গল্প আছে। প্রেম ও দাম্পত্যসম্পর্কমূলক গল্পগুলিই প্রধান, কিন্তু পারিবারিক জীবনের অন্যান্য দিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়ও উপেক্ষিত হয় নাই। 'নেকী', 'শিপ্রার অপমৃত্যু' ও 'সর্পিল' ('অতসী মামী'), 'মহাকালের জটার জট', 'বিষাক্ত প্রেম' ('সরীসৃপ'), 'শৈলজ শিলা', 'খুকী' ('মিহি ও মোটা কাহিনী')—গল্পগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ আলোচিত হইয়াছে। 'নেকী' গল্পটি লেখকের প্রথম রচনার অন্যতম—ইহার উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য হয়, ইহার গঠন বিন্যাসও ঠিক নির্দোষ বলা যায় না। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে পরাশরকে অনিন্দিতার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য অতিক্রান্তপ্রায়-যৌবনা শিক্ষয়িত্রী শিপ্রার স্পর্ধিত ও দুঃসাহসিক কৌশলজালবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত শিপ্রার ডুবিয়া মরার সম্ভাবনায় পরাশরের নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চেষ্টতায় এই অস্বাভাবিকরূপে তীব্র ও বেগবান প্রেমাভিনয়ের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। শিপ্রার অশোভন ও নির্লজ্জ আকর্ষণ-প্রয়াসের বর্ণনা খুব উপভোগ্য হইয়াছে। 'সর্পিল' গল্পটি দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে অসুস্থ মনোবিকার ও ক্রূর, অকারণ হিংসার ভয়াবহ ছবি। গ্রন্থকারের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এর অশোক ও সুপ্রিয়ার অস্বাভাবিক, অপ্রকৃতিস্থ সম্পর্কের মৌলিক বীজটি যেন এই ছোটগল্পটিতে নিহিত আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়ত' ও

'শৃঙ্খল' গল্প দুইটিও এই একই বিকৃতি প্রেরণার অভিব্যক্তি। স্বামী শঙ্করের ধর্মোন্মাদ, তাহার স্ত্রীর আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি, সংগীতপ্রিয়তা ও বন্ধু-সাহচর্যের বিরুদ্ধে উত্তপ্তমস্তিষ্কপ্রসূত বিজাতীয় বিদ্বেষ, কৃত্রিম সারল্য ও সংসারবিরাগের আবরণে পত্নী ও তাহার প্রণয়ীকে চরম শাস্তিপ্রদানের সতর্ক, আট-ঘাট-বাঁধা উদ্যোগ, ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাপূর্ণ গৃহাবেষ্টন ও মানবের ক্রূর, কুটিল জিঘাংসার সহিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৈব-সংঘটিত সহযোগিতা—এই সকলের সমন্বয়ে এক অজ্ঞাতভীতিশিহরণকণ্টকিত প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে। এই সংগতিপূর্ণ পটভূমিকা-বিন্যাসই প্রেমেন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত দুইটি গল্পের সহিত তুলনায় এই গল্পটির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।

'মহাকালের জটার জট' গল্পে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে উদ্ভট, খাপছাড়া, আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব কয়েকটি যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় দুই পাশাপাশি বাড়ির লোকেরা একে অপরের প্রতি যে বেশী পক্ষপাত বা টান-আকর্ষণের যে তারতম্য দেখাইয়া থাকে, লেখক সেই অকারণ প্রীতি-বৈষম্যের একটা যৌন-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিকতা অপেক্ষা ইহার হাস্যকর অসংগতির দিকটাই বেশী ফুটিয়াছে। 'বিষাক্ত প্রেম'-এ লেখক গণিকাসক্ত যুবকের স্বার্থ-কলুষিত প্রেমাভিনয়ের মধ্যে এক উচ্চতর প্রবৃত্তির অতর্কিত স্ফুরণ দেখাইয়াছেন। সত্য সরলার অলংকারচুরির উদ্দেশে একদিন তাহাকে বিষপ্রয়োগে অচেতন করিয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির মুহূর্তে হয় বিবেকের দংশন না হয় সত্য ভালবাসার আকস্মিক উচ্ছ্বাস আত্ম-রক্ষার ছদ্মবেশে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। সে সরলার গহনা চুরি না করিয়া সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছে ও নিজেকে বুঝাইয়াছে যে, ফাঁসি হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার এই আকস্মিক পরিবর্তন। বিষের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক অমৃতধারা উছলিয়া উঠিয়াছে। 'সরীসৃপ' গল্পটিতে ভদ্র পরিবারে বৈষয়িক সুবিধার জন্য দেহ-লালসা-উদ্রেকের কুৎসিত ও গ্লানিকর প্রচেষ্টার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ মিলে। মধ্যবয়স্কা চারু, এককালে ধনশালিনী, অধুনা তাহার শ্বশুরের মেমসাহেব-পুত্র বনমালীর আশ্রিতা—ও তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী, সদ্যোবিধবা ও তরুণী পরী বনমালীর অনুগ্রহলাভের জন্য তাহার মনোরঞ্জনের প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। চারু বনমালীর দুরন্ত লালসাকে বহুকাল ঠেকাইয়া আসিয়া, তাহার প্রভাবকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পরী কিন্তু গায়ে-পড়া আত্মসমর্পণের দ্বারা শীঘ্রই বনমালীর মোহ নিঃশেষ করিয়া তাহার মনে ঔদাসীন্য ও বিমুখতা জাগাইয়াছে, চারু ভগ্নীকে সরাইবার জন্য তাহাকে কলেরার বীজাণুদুষ্ট প্রসাদ খাইতে দিয়া নিজেই কলেরায় মরিয়াছে। মোটের উপর মৃত চারুর প্রভাব জীবিত পরীর আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া জয়ী হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত চারু ও পরী উভয়েরই স্মৃতি বনমালীর স্থূল, নির্বিকার আত্মসর্বস্বতায় বিলীন হইয়াছে। দুই ভগ্নীর অনুসৃত উপায়ের পার্থক্য ও বনমালীর উপর ইহাদের বিভিন্ন প্রভাবের বর্ণনায় নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্বকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'শৈলজ শিলা' গল্পটি পরিণতবয়স্ক নিঃসম্পর্ক অভিভাবকের তরুণী শিলার প্রতি অনিবার্য প্রণয়সঞ্চারের কাহিনী। প্রৌঢ়ের এই অস্বাভাবিক প্রেমনিবেদনে তরুণীর হাসিখুশি এক

বিষাদগম্ভীর মৌন ঔদাসীন্যে পরিবর্তিত হইয়াছে। অভিভাবকের ভাবান্তর নিম্নলিখিত বাক্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া গাঁথা যৌবনের শক্তগারদ ভাঙ্গিয়া চৌচির।" প্রেমের সনাতন, বিচারবিবেকহীন, জৈব প্রেরণা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: "বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল, লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত প্রেম,—পশু, পাখী, মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে।" 'খুকী' গল্পে এক সরল, ভাবাবেগহীন বালিকার নিকট প্রণয়কলা পক্ক যুবার আচরণের সমস্ত জটিল মারপেঁচ ও সূক্ষ্ম অভিনয়কৌশল কেমন করিয়া প্রতিহত হইয়াছে তাহারই বিবরণ। বালিকা কাদম্বিনীর নিকট যুবক সৌম্য নিজ অর্ধ-আন্তরিক আবেগের কথা জানাইয়াছে, ও তাহার মনে হতাশ-প্রণয় ক্লিষ্টা রোমান্সের নায়িকার অশান্ত ছটফটানি জাগাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু কাদম্বিনীর সারল্য ও স্থূল অনুভূতির কঠিন বর্মে ঠেকিয়া এই সমস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সৌম্য কাদম্বিনীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহজ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সৌম্যের প্রেমাভিনয়ের বিভিন্ন স্তরগুলি ও কাদম্বিনীর যথাযথ প্রতিক্রিয়াসমূহের বর্ণনায় লেখক উপভোগ্য মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন। 'কবি ও ভাস্বরের লড়াই'-এ লেখক যে প্রেমের দ্বন্দ্ব-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা আদর্শ ভাবলোকের ঊর্ধ্বাকাশেই বিচরণ করিয়াছে; ইহার মধ্যে বাস্তব সংস্পর্শ অতি গৌণ।

প্রেম ছাড়া সাধারণ সংসার যাত্রার জটিল ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প রচিত হইয়াছে। জীবনের বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের একটা সাধারণ, ভাসা-ভাসা-রকম জ্ঞান থাকে। লেখক এই সাধারণ অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর স্তরগুলি, ভাবের জোয়ার-ভাটার নিখুঁত রেখাচিত্রসমূহ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি পুরাতনের স্নেহাবেষ্টনে যে আনন্দ প্রত্যাশা করে, সেই প্রত্যাশার মধ্যে মোহভঙ্গের একটা ছোট-খাট আঘাত জড়িত থাকে। 'আগন্তুক' ('অতসী মামী') ও 'প্রকৃতি' ('প্রাগৈতিহাসিক') এই দুইটি গল্পে এই পূর্বধারণার ঈষৎ-বেদনা-স্পৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দীর্ঘপ্রবাসের পরে ঘরে ফিরিয়া মুকুল তাহার পরিবারবর্গের সানন্দ অভ্যর্থনার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টভাব, স্বার্থপরতার মুখোস-ছেঁড়া অভিব্যক্তি অনুভব করিয়াছে। তাহার স্ত্রী পর্যন্ত পাখি পড়ার মত প্রাণহীন, যান্ত্রিকভাবে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে। 'প্রকৃতি' গল্পের সমস্যা আরও একটু জটিল। বড়লোক হইতে গরীবে পরিণত অমৃত দশবৎসর পরে আবার ধন অর্জন করিয়া ও তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে একটু বাঁকাচোরা, বিকৃত মনোভাব লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছে। এই মনোভাবের প্রধান উপাদান—ধনীর প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ ও দারিদ্র্যের প্রতি একপ্রকার ভাববিলাসমূলক সহানুভূতি; মধ্যবিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার এই নব মনোভাবের মেরুদণ্ড। কিন্তু পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাহার পূর্ব হিতৈষী এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সহিত পুনর্মিলন তাহার মনে তৃপ্তির পরিবর্তে ক্ষোভই জাগাইল। এই পরিবারের পুরুষদের বিমূঢ়, অনুগ্রহপ্রার্থী-সুলভ, কুণ্ঠিত ভাব, আয়োজনের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অপরিচ্ছন্নতা, গৃহিণীর দারিদ্র্য-

গোপনের সংকুচিত প্রয়াস, বিবাহিতা মেয়ে সুনীতির শ্রীহীন আকৃতি ও অশোভন সাহায্য যাচ্ঞা—সব মিলিয়া তাহার অন্তরকে বিমুখ করিয়া তুলিল। ছোটমেয়ে সুমতি—যাহাকে সে বিবাহ করিবার কল্পনা করিতেছে সেও—এই গ্লানিকর পরিবেষ্টনে, তাহার কুমারী জীবনের মাধুর্য হারাইয়া ফেলিল। এও একদিন সুনীতির মত হইবে এই সম্ভাবিত পরিবর্তনের পূর্বাভাস তাহার সমস্ত আগ্রহকে জুড়াইয়া দিল। "দারিদ্র্য যদি সুনীতির না সহিয়া থাকে টাকা সুমতির সহিবে কেন?"—এই প্রশ্ন বারংবার তাহার চিত্তকে অঙ্কুশ-বিদ্ধ করিল। মোটর-চাপা ভিক্ষুকের রক্তাক্ত দেহ কর্তব্যবোধে সে নিজের মোটরে তুলিয়া লইল, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক রুচির সৌকুমার্য এই অশুচি, ক্লেদাক্ত স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতিহত হইয়া সে আবার নিজ আভিজাত্যের দুর্গে আশ্রয় লইল ও আন্তরিকতাহীন ধনী সমাজের সহিত মৌখিক শিষ্টাচার-বিনিময় দ্বারা চিরাভ্যস্ত কৃত্রিম জীবন-যাত্রার সূত্র পুনর্যোজনা করিল।

'ফাঁসি' ('প্রাগৈতিহাসিক') লেখকের আর একটি চমৎকার গল্প। ফাঁসির আসামী খালাস হইলে তাহার মনে যে এক বিপ্লবকর আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা আমরা সাধারণভাবে জানি। এই গল্পে অনুরূপ অবস্থাপন্ন ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত গণপতির মানস বিপর্যয়ের স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। খালাসের দিনের সন্ধ্যায়, পরিবার-বর্গের সহিত পুনর্মিলনের ক্ষণে তাহার মনোভাব নিছক মুক্তির উল্লাস বা প্রিয়জনমিলনের আনন্দ নহে—নানাবিধ সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। কান্না,—'আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন, স্তব্ধ অন্যমনস্কতায়—", জীবনলাভের আনন্দ যে অন্যান্য তুচ্ছ আনন্দের সহিত তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বা প্রগাঢ় নয় অনুভূতির রাজ্যে যে একপ্রকার গণতান্ত্রিক সাম্য আছে, উপলক্ষ্যের গুরুত্বের সঙ্গে তাল রাখিয়া যে আবেগের তীব্রতা নিয়মিত হয় না এই সত্যের আবিষ্কার, মূর্ছা, আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ আত্মপ্রতারণা; নির্জন কারাকক্ষের প্রতি অতর্কিত লুব্ধতা, স্ত্রী ও পরিবারের মনোভাবের স্বরূপ, ভাবাবেশহীন চকিত উপলব্ধি—তাহার ফাঁসি হইলেই যে তাহার পরিবারবর্গ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত এই গ্লানিকর সত্য সম্বন্ধে সচেতনতা—এতগুলি বিপরীত ভাবের সংঘাত তাহার বাহিরের শান্ত স্তব্ধতার আড়ালে কোলাহল জমাইয়াছে ও মুক্তির আনন্দের মূল সুরের সহিত নানা বিরোধী সুরের সূক্ষ্ম মীড় মূর্ছনা জুড়িয়া দিয়াছে। এই মিলন-মধুর রাত্রিতে গণপতির স্ত্রী রমার উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা এই আনন্দের মগ্ন চৈতন্যে যে বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন নিহিত ছিল তাহার বীভৎস ও অনাবৃত আত্মপ্রকাশ।

'মহাসঙ্গম'-এ ('অতসী মামী') পশুপতির অতিবার্ধক্যের শিথিল অসহায়তা, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংকোচন ও অনুভূতির অসাড় অস্পষ্টতার চমৎকার ছবি আঁকা হইয়াছে। 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে বৃষ্টির জলে জীর্ণ আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ নীলমণির মানসিক অবস্থা—তাহার অভিমানভরা ক্রোধ, স্ত্রী ও কন্যার নীরব ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তীব্র অস্বস্তি, বিধাতা ও মানুষ সকলের বিরুদ্ধে অসহায় আক্রোশ—সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মজার কথা এই যে, অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পীড়নে পিষ্ট এই দরিদ্র

বৃত্তকল্প পরিবারের প্রত্যেকেরই, দুর্বলতরের উপর গায়ের ঝাল মিটাইবার একটা প্রবল প্রেরণা আছে। 'মমতা দি' ('সরীসৃপ') ও উহার শেষাংশ 'বৃহত্তর ও মহত্তর' ('অতসী মামী') গল্প হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু শেষ গল্পটিতে তীরের ন্যায় শাণিত, সংক্ষিপ্ত উক্তি-পরম্পরার ভিতর দিয়া লেখক ভাষা ও যুক্তিতর্কের উপর যে অসাধারণ অধিকার দেখাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। পারিবারিক জীবন বর্জন করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য নারীর যে দাবী সাধারণতঃ সংবাদপত্রে ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় শিথিল, ভাবার্দ্র, চিন্তাসংগতিহীন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়, লেখক সেই অতি-সাধারণ বিতর্কটিকে মানস পরিণতির অনেক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। এই গল্পটির মধ্যে আমরা লেখকের কেবল ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ ছাড়া মানস প্রসার ও চিন্তাশীলতারও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাই।

'ভেজাল' (১৯৪৪) ছোটগল্পসংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই গ্রন্থে সৃষ্টির নবীনতা হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান হইয়াছে, কিন্তু সমালোচনার তীক্ষ্ণ সচেতনতা এই ত্রুটি পূরণ করিয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহার ভূমিকা। এই ভূমিকায় 'প্রকাশকের নিবেদন' নিবন্ধে মানিকবাবুর বৈশিষ্ট্যের যে চমৎকার বিশ্লেষণ আছে তাহা ভাবের সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাষার শাণিত দীপ্তিতে অতুলনীয়। মনে হয় যে, প্রকাশকের নিবেদনের অন্তরালে লেখক তাঁহার দোলায়মান-চিত্ত, সন্দেহাকুল পাঠকবর্গের নিকট আত্মপরিচয় দাখিল করিয়াছেন। বিশ্লেষণের যাথার্থ্য, গভীরতা ও ভাষার তীক্ষ্ণাগ্র, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্তি লেখকের নিজ রচনার সহিত অভিন্ন ঠেকে। সে যাহা হউক, লেখক এই পরিচয়ের দ্বারা সমালোচকের কার্য যে অনেকটা অনাবশ্যক করিয়া দিয়াছেন তাহা জোর করিয়া বলা যায়। সমালোচকের যে কর্তব্যটুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা এই রচনায় উদ্‌ঘাটিত মূলসূত্রটির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ-সাফল্যের নির্ধারণ।

সাহিত্যে যে বাঁ চোখের নজরের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না; এবং এই বাম নয়নের দৃষ্টি যে এতাবৎকাল সাহিত্যে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই তাহাও স্বীকারে বাধা নাই। কিন্তু সাহিত্যের কাজ সত্যরূপের স্ফুরণ। দক্ষিণ ও বাম উভয় চক্ষু হইতে বিচ্ছুরিত, মিলিত রশ্মিরেখাসমষ্টির সাহায্যেই বিষয়ের সত্য সমগ্ররূপে উদ্ভাসিত হয়—দুয়ের মধ্যে কেহই উপেক্ষণীয় নহে। আসল প্রশ্ন এই যে, এই তির্যক দৃষ্টির অতিপ্রয়োগে সৃষ্টির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না। জীবনের বিকৃতিগুলি যদি জীবনের সমগ্র রূপ-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট প্রভাবশালী না হয়, তবে তাহাদিগকে মনের গোপন, অবচেতনস্তর হইতে টানিয়া বাহির করার মজুরি পোষায় না। ঘরের সিঁড়ির বিশেষ খবর লইবার সার্থকতা সেইখানে, যেখানে সিঁড়ির জঞ্জালস্তূপ ও অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ সমস্ত ঘরের উপর সূক্ষ্মভাবে একটা ধূলিমলিন শ্রীহীনতার বায়ুস্তর বিস্তার করে। যেখানে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই সেখানে সাহিত্যের কুলায় ধুলা উড়ান কেবল নাসিকার পীড়া উৎপাদন করে, উচ্চতর আনন্দের হেতু হয় না। এতাবৎকাল সাহিত্যসৃষ্টিতে দক্ষিণ চক্ষুর অবদান অতিপ্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এখন বাম চক্ষুর আবিষ্কারের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া প্রতিক্রিয়া ও বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া সমর্থনীয়, এমন কি আকর্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফল অভিনব একদেশদর্শিতা। যদি সত্যই না পাওয়া গেল, তবে সৌন্দর্য বলি দিবার ক্ষতিপূরণ কোথায়?

গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প 'ভয়ঙ্কর' মানবমনের এক নূতন রকমের প্রতিক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ভয়াবহ ও বীভৎস অভিজ্ঞতার চাপে এক দুর্বলচিত্ত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির মোহ টুটিয়া তাহার মধ্যে কেমন করিয়া অকুণ্ঠিত আত্মনির্ভর ও দৃঢ় উদ্দেশ্যের উন্মেষ হইয়াছে, গল্পটিতে সেই চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। "মনটা প্রসাদের আশ্চর্য রূপ সাফ মনে হয়। ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যুভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মত অন্যের চট্‌চটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়।" এই পরিবর্তনের বিস্ময়করত্বের ভিতর দিয়া মানবজীবনের এক নিগূঢ় সত্যের আভাস অনুভব করা যায়—কাজেই এই গল্পটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি। 'রোমান্স, 'ধনজনযৌবন' ও 'মুখে ভাত' এই তিনটি গল্পে ব্যভিচারের আবেগপ্রধান, রঙ্গিন আদর্শবাদের দিকটার পরিবর্তে ইহার স্থূল, বাস্তব প্রেরণার দিকটার উপরই লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। প্রথম গল্পে সুখময়ীর উৎকট, নির্লজ্জ লালসা ও সুবলের ভাবলেশহীন, ইতর সুবিধাবাদ উভয়ে মিলিয়া যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন কুৎসিত তেমনি সত্যানুগামী। দ্বিতীয় গল্পে নির্মলেন্দুর খামখেয়ালি রুচি ও প্রবৃত্তি পশুবল-প্রণোদিত ধর্ষণের মধ্য দিয়া নিজ ক্ষণিক পরিতৃপ্তির অস্বস্তিকর উপায় আবিষ্কার করিয়াছে—সুমতির শান্ত, প্রসন্ন আত্মসমর্পণ ও রাঘবের নিষ্ফল আত্মগ্লানি উভয়েই ইহার হাস্যকর অসংগতি ও বীভৎসতার দিকটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নির্মলেন্দুর অশেষবিধ যথেচ্ছাচারের মধ্যে পিস্তল হাতে অভিসারযাত্রা আর একটা নূতন খেয়াল মাত্র। তাহার চরিত্রের বিকারগুলি দেখান হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মৌলিক প্রেরণাটি অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। তৃতীয় গল্পে বধূনি বামুনের সহিত মাণিকের মেয়ের গবেন সংসর্গের ফলে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারই অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে পাচকের ব্যর্থ কামনার জ্বালা এক অদ্ভুত উপায়ে—ভোজ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ-প্রক্ষেপের দ্বারা—আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ আর একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি—বিবাহিতা সহচরীদের সহিত তুলনায় নিজ কুমারী জীবনের প্রতি তিক্ত ব্যর্থতাবোধ—আভিজাত্যগর্বিতা নারীকে পাচক ব্রাহ্মণের শয্যাসঙ্গিনী হইবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। এইভাবে এক গ্লানিকর, হৃদয়সম্পর্কহীন দৈহিক মিলনের দুইটি অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার উপর এক এক ঝলক আলোকপাত হইয়াছে।

'মেয়ে' ও 'দিশেহারা হরিণী' গল্প দুইটিতে রস বেশ জমাট বাঁধে নাই। প্রথমটিতে বাপ ও মেয়ের সম্পর্কবৈশিষ্ট্যটি ভাল করিয়া ফুটে নাই—মেয়ের সেবা শুশ্রূষা ও বাপের শুভানুধ্যায়ী স্নেহের পিছনে কোমলতার পরিবর্তে এক প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি ও একগুঁয়েমির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আবার স্বামীর সেবার ভার মেয়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যেও স্ত্রীর দাম্পত্য বিরাগ ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতগুলি উদ্দেশ্যের সূত্রগ্রথিত হইয়া সুসংবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয়টি উদ্ভট ও অসংলগ্ন—পার্টি-হিতৈষণার চোরা-গলিতে প্রেমের কাণামাছি-খেলার কাহিনী। ইহার আকস্মিকতা আর্টের সংগতি লাভ করে নাই। 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' ও 'যে বাঁচায়' এই দুইটি গল্পে অপ্রত্যাশিত পরিণতি বক্রকুটিল ব্যঙ্গের (irony) বাহন হইয়াছে। প্রথম গল্পে কুলটা স্ত্রী ও তাহার প্রেমিকের গৃহে আশ্রয়গ্রহণকারী মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী কেবলমাত্র অপরাধী-যুগলের পারিবারিক শান্তি বিধ্বস্ত করার ক্রূর আনন্দেই মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের

রক্ষাতৎপর, আত্মগৌরবস্ফীত দানশীলতা হঠাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া নিজ প্রসারিত হস্তকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। 'বিলাসমন', 'বাস' ও 'স্বামী-স্ত্রী' গল্পগুলিতে ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা সেরূপ প্রকট নহে। অত্যাচারী সাহেব ম্যানেজারের ব্যক্তিত্ব ও তৎ-কন্যার মদির কটাক্ষের নিকট ভালোমানুষ গ্রাম্য জমিদারের নিরুপায়, বিহ্বল নিষ্ক্রিয়তা; শহর ও মহকুমার মধ্যে যাতায়াতশীল বাসের মাঝ রাস্তায় থামিবার আড্ডা একটি ছোট পল্লীর জীবনে বাস পৌঁছাইবার পূর্বক্ষণে এক প্রতীক্ষা চঞ্চল, আশা আশঙ্কায় দোলায়িত উত্তেজনার সঞ্চার, বাসের গতিবেগ হইতে আহৃত একটি মৃদু ঘূর্ণাবর্তের সৃজন. আকস্মিক অতিথিসমাগমে বাধাপ্রাপ্ত দাম্পত্য মিলনের আত্মচরিতার্থতার নূতন উপায়-উদ্ভাবন—এই বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে বক্র দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচ্ছন্ন বিকারের ব্যঞ্জনা অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই গল্পসংগ্রহে কয়েকটি গল্প মানিকবাবুর অভ্যস্ত বচনারীতির সুন্দর উদাহরণ হইলেও মোটের উপর সমস্ত গ্রন্থটিতে অগ্রগতির অসন্দিগ্ধ প্রমাণ আবিষ্কার করা কঠিন। ছোটগল্প ও উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নানামুখী বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহাই তাহার উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌনবিকারের প্রতি অতি-পক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছে।

— —

ঊনবিংশ অধ্যায়

রোমান্সপ্রধান উপন্যাস—প্রথম পর্যায়

তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

বাস্তবপ্রধান যুগে রোমান্সের প্রতি অনুরাগ অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক রোমান্সের সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসে যে রোমান্স প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ কাব্যধর্মী, প্রকৃতির রহস্যানুভব-মূলক। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ধারাই আধুনিক লেখকেরা অনুসরণ করিয়াছেন—কেহ কেহ ঐতিহাসিকতার অব্যবহৃত রুদ্ধ-দ্বারের চাবি খুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মানিত স্থান অধিকার করেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের সমষ্টি—'জলসাঘর' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩), 'রসকলি' (এপ্রিল, ১৯৩৮) ও 'হারানো সুর'—তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তির সুন্দর পরিচয়স্থল। এই ছোট গল্প-গুলিতে তখন পর্যন্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপেক্ষিত রাঢ় দেশের জীবনযাত্রাধারার কয়েকটি ক্ষুদ্র শাখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'জলসাঘর' গল্পটির দুই খণ্ডে এক অভিজাত বংশের মধ্যাহ্ন-গৌরব ও সায়াহ্ন-ম্লানিমা পাশাপাশি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের সামাজিক ইতিহাস-লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণ রাখেন না যে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই তিন শতাব্দী জমিদারবংশই প্রদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন, অপ্রতিহত-প্রভাব ভূস্বামিকুলের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিতবাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইয়াছে। গত দুই-তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে—তাঁহাদেরই কেন্দ্র-বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জন-সাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণশক্তি ছিল না—জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহ-শক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারের দানশীলতা নদীপ্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্মপ্রকাশের অবসর দিত, তাহার অত্যাচারের বজ্রপাত প্রজার প্রতিকার-শক্তিকে উদ্‌বোধিত ও সংঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রমপ্রসারিত দাবী দাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যে এই শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সুবিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রমথনাথ বিশী 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' নামক উপন্যাসে এই নেতৃশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আর তারাশঙ্কর দুইটি স্বল্প-পরিসর গল্পে ও কয়েকখানি উপন্যাসে ইহার দূরপ্রসারী প্রভাবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'রায়বাড়ী' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্ত শৌর্য, ভোগলিপ্সার মধ্যে অটল ভগবদ্‌ভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্তহস্ততা ও বৈরনির্যাতনে অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প—এই সমস্ত দোষ গুণ মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে রাজোচিত বিশালতা দিয়াছে। অল্প কয়েকটি রেখাপাতে ও ক্ষুদ্র দুই একটি ইঙ্গিতের দ্বারা একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। তবে এই চরিত্রাঙ্কনে একটা ত্রুটি লক্ষিত হয়। প্রজাদের যে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার দারুণতর শাস্তি দিতে গিয়া রাবণেশ্বরের জীবনে দৈবের অভিশাপ অতর্কিত বজ্রপাতের ন্যায় নামিয়া আসিল, গল্পের মধ্যে তাহার কোন পূর্বসূচনা দেওয়া হয় নাই। জমিদারের ভীম-কান্ত গুণ যে প্রতিবেশ-প্রভাবের ফল তাহার কোনই ইঙ্গিত মিলে না। লেখক বাঘ আঁকিয়াছেন, কিন্তু বাঘের স্বাভাবিক বিচরণভূমি সুন্দরবনের আরণ্য ভীষণতার উপর এক ঝলক আলোক-পাত করেন নাই। রাবণেশ্বরের প্রতিহিংসাও কাপুরুষোচিত--তাঁহার উদার, তেজঃপূর্ণ পৌরুষের সহিত ইহার কোন সংগতি নাই। প্রজাশাসনে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কালী বাগ্দীর নিঃশব্দ, অন্ধকার-লুপ্ত সক্রিয়তার রহস্যটি তুলির একটি স্বচ্ছন্দ টানেই আশ্চর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে —"নাট-মন্দিরের থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।"

দ্বিতীয় গল্প 'জলসাঘর'-এ ঐশ্বর্যের এই সগর্ব আড়ম্বর, এই উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া নির্বাণের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, অর্থী-প্রত্যর্থী, দাস-পরিজনের কর্মমুখরতা পারাবত-গুঞ্জনের করুণ নিঃসঙ্গতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপ্রকাশ-রুদ্ধ আভিজাত্যাভিমান এখন ক্ষুব্ধ, বেদনাবিদ্ধ আত্মমর্যাদাজ্ঞানে রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার, নিঃসঙ্গ গৃহকোণে আত্মগোপন করিয়াছে। অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ শীর্ণ ও সংকুচিত হইয়া পূর্ব-গৌরবের লুপ্তাবশেষ একটি হাতীর ও একটি ঘোড়ার প্রতি করুণ স্নেহাতিশয্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। দুই একটি পুরাতন ভৃত্য ও কর্মচারীর অপরিবর্তিত সম্ভ্রম ও সেবাযত্ন ভগ্নস্তূপের উপর শেষ সূর্যাস্তরেখার ন্যায় তাহার করুণ অসহায়তাটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নূতন ধনী বংশের সবিদ্রূপ প্রতিযোগিতা ও ছদ্ম-সমবেদনার স্পর্ধিত অপমান লাঞ্ছনার কণ্টক শয্যা বিছাইয়া দারিদ্র্য-দুঃখকে আরও অসহনীয় করিয়াছে। শেষে একদিন এই প্রতিযোগিতার আহ্বানের রন্ধ্রপথ দিয়া সুদূর অতীতে নিমজ্জিত, বিগত যৌবনের বিলাস-বিভ্রমের স্মৃতি এক সঙ্গীত-সুরা-বিমুগ্ধ, বিহ্বল বসন্ত রজনীতে নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আকস্মিক দীপ্তি নির্বাণোন্মুখ দীপের স্বল্পাবশেষ জীবনীশক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে; স্মৃতিজর্জর বিশ্বম্ভর রায় যৌবনের ফেনিলোচ্ছল সুরা আকণ্ঠ পান করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত গল্পটির উপর সন্ধ্যার ম্লান ছায়া, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের গাঢ় বিষাদ সঞ্চারিত হইয়াছে। 'জলসাঘর'-এ সাড়ম্বর ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের গূঢ় ব্যঞ্জনা চমৎকারভাবে সংক্রামিত হইয়াছে।

জমিদার-জীবনের আরও কয়েকটা বিচিত্র দিক 'হারানো সুর' গ্রন্থের 'পুত্রেষ্টি', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' ও 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম গল্পটিতে নিঃসন্তান জমিদার সন্তান-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মস্তিষ্কবিকৃতির প্রান্তদেশে পৌঁছিয়াছে—ইহার

সহিত ধর্মোন্মাদ যুক্ত হইয়া তাহার প্রকৃতি-বিপর্যয়কে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর আর্ত, মর্মভেদী চীৎকারে পরের ছেলে বলি দিতে উদ্যত মেজবাবুর ধর্মান্ধতার নেশা টুটিয়াছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে নিঃস্ব, উপাধি-মাত্র-সর্বস্ব জমিদারের লুপ্ত সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টা যুগপৎ করুণ ও হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। ঢোঁড়া সাপের গোখুরার অভিনয় করার মত এই প্রচেষ্টা একাধারে হাস্যকর ও মর্মান্তিক। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের অবাধ্যতা, নিজ পরিবারের বিরোধিতা, ধনী অংশীদারের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পা, এমন কি নিজ পেয়াদার পর্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ অসহযোগ এই আত্মপ্রতারণার স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। জমিদার আদায়-তহসিলের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। তৃতীয় গল্পে ভীমকায় রতন বাগ্‌দী নিজ দুর্দান্ত প্রকৃতির মিথ্যা আস্ফালনের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া ও জমিদার সরকারের চাকরি যোগাড় করিয়া স্বচ্ছন্দ জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেদিন তাহার উপর সত্যিকার দুঃসাহসিক, নৃশংস কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছে সেইদিনই তাহার বড়াই-এর শূন্যগর্ভতা ধরা পড়িয়াছে। রতনের মুখর আত্ম-প্রচারের সহিত 'রায়বাড়ী' গল্পের কালী বাগ্‌দীর নীরব, অথচ ভয়াবহ আজ্ঞানুবর্তিতা তুলনীয়।

'কুলীনের মেয়ে' গল্পে রাঢ়দেশস্থ ব্রাহ্মণপরিবারসংস্থানের একটি শোচনীয় বৈশিষ্ট্যের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এখানেও জমিদার-বংশের অধিষ্ঠাত্রী ক্রূরা নিয়তিদেবী কুলীন-কন্যা তরুবালার মর্মান্তিক পরিণামের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। খেয়ালী, সংসারজ্ঞানহীন জমিদার পিতার অদূরদর্শিতা তরুবালার অবাঞ্ছিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তাহার জীবন-নাট্যে ট্র্যাজেডি অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল প্রকৃতি সত্ত্বেও সে নিয়তির অনতিক্রম্য প্রভাবে ভ্রাতার সাংসারিক দুর্দশার অংশভাগিনী হইয়াছে। তারপর কঠোর দারিদ্র্য, আত্মসম্মানজ্ঞানের বিলোপ, চৌর্যবৃত্তির কলঙ্কস্পর্শ, আত্মহত্যা—তাহার ক্রমা-বরোহণের স্তর নির্দেশ করিয়াছে।

বংশানুক্রমিক অনর্জিত আধিপত্যের অস্থির-ভারকেন্দ্র উচ্চমঞ্চে আরূঢ় এই হতভাগ্যদের জীবনে যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অস্বাভাবিকরূপে তীব্র তাহাদের রক্তমধ্যেই যে নানাবিধ বিকৃতি, অপ্রকৃতিস্থতা, উদ্ভট, বাস্তববিমুখ খেয়ালের বীজ উপ্ত থাকে, প্রকৃতিদেবী যে গোড়া হইতেই তাহাদিগকে একপেশে ও উৎকেন্দ্রিক (eccentrio) করিয়া সৃষ্টি করেন, তারাশঙ্করের জমিদারবিষয়ক গল্প ও উপন্যাসগুলি এই সত্যটিকে চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্রই বাংলা উপন্যাসে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান।

'পদ্ম বউ' গল্পটিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অক্লান্ত স্বামিসেবার মধ্যে সুপ্ত বিদ্রোহ অন্ধ বিশ্বাসের অহিফেন-নেশায় অসাড় হইয়াছিল। যেদিন এই বিশ্বাস ভাঙিল সেদিন এই বিদ্রোহ অগ্নিস্রাবের ন্যায় অসংবরণীয় জ্বালায় আত্মপ্রকাশ করিল। আবার পদ্ম বউ-এর বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয় ইহা যখন প্রমাণিত হইয়াছে তখন সে সমস্ত বোঝা-পড়ার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—ইহাই গল্পটির বিদ্রূপাত্মক সারাংশ। 'ডাক-হরকরা' গল্পটিতে দীনু ডোমের নিজের কর্তব্যের প্রতি একপ্রকার অগাধ আস্থা, প্রশ্ন-সন্দেহের অতীত ধর্মনিষ্ঠার ন্যায় মনোভাব ইহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।' তাহার কর্তব্যপরায়ণতা হিসাব-নিকাশ বা বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যাপার নহে—ইহা একপ্রকার সহজাত সংস্কার। গল্পের প্রথমে শ্রাবণ-নিশীথে নির্জন

পথে খদ্যোৎ-দীপ্তির সহিত অভিন্ন, ডাক-হরকরার লণ্ঠনের আলোকবিন্দুর যেরূপ ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, গল্পটি ঠিক সেরূপ উঁচু সুরে বাঁধা নহে। দীনুর কর্মত্যাগ তাহার নিরুদ্দেশ পুত্রের প্রাপ্য স্নেহ-ঋণের পরিশোধ।

'হারানো সুর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'চৌকিদার' গল্পটি নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য সেবকের জীবনযাত্রা-চিত্রণের চেষ্টা। তবে 'ডাক-হরকরা'র ন্যায় চৌকিদারের জীবনে কোন কঠোর কর্তব্যসংঘাত বা আদর্শনিষ্ঠার আলোড়ন সঞ্চারিত হয় নাই। নির্জন নিশীথে গ্রাম-পর্যটন তাহাকে কতকগুলি বিচিত্র অনুভূতির সহিত পরিচিত করিয়াছে মাত্র—সে সময় সময় প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের সীমারেখায় পদক্ষেপ করিয়াছে। মর্মান্তিক দাম্পত্য বিচ্ছেদ তাহার জীবনে একটা আকস্মিক পরিণতি, গল্পের মূল সুরের সহিত ইহা সম্পর্কবিহীন।

'মধু মাষ্টার' গল্পে এক গ্রাম্য শিক্ষকের আত্মভোলা প্রকৃতির ও অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহার ও তেজস্বিতার বিবরণ আছে। চিত্রটি বেশ সজীব, শেষের কয়েক পংক্তিতে তাহার বিধবা স্ত্রীর মুখে যে গভীরপ্রেমব্যঞ্জক দুই একটি কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের একটা নূতন গৌরবময় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তারিণী মাঝি দীনু ডাক-হরকরার ন্যায় রাঢ়-দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক—কিন্তু তাহার সহজ ভদ্রতা ও উচ্চবংশীয় স্ত্রী পুরুষের সহিত সসম্ভ্রম হাস্য-পরিহাস তাহার নিরক্ষরতার ত্রুটি সংশোধন করিয়াছে। তাহার কথাবার্তায় রাঢ়-দেশের টান ও দেশ-প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার তাহার ভাষাতে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনা বেশ চমৎকার হইয়াছে। স্ত্রী সুখীর প্রতি তাহার প্রেম আত্মরক্ষার ভীষণ প্রয়োজনে অন্তর্হিত হইয়াছে—যে প্রেমালিঙ্গন আমাদের শ্বাসরোধ করে, তাহার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রিয়াকে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতেও আমাদের বাধে না। জীবনের সহিত প্রেমের বিরোধের এই বাস্তব দিকটা মনস্তত্ত্বের এক কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। 'রাখাল বাঁড়ুয্যে' গল্পে কৃপণ, অর্থলোভী, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের অপরিমেয় নীচতা ও বিধবা হৈমর দৃপ্ত তেজস্বিতার বিপরীত চিত্র বড় উপভোগ্য হইয়াছে। উভয়ের চরিত্রই অল্প পরিসরের মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গল্প সংগ্রহের প্রায় সমস্ত গল্পই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ মণ্ডিত হইয়াছে।

'রসকলি' গল্পসংগ্রহেও অধিকাংশ গল্প বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাবের অকৃত্রিমতার জন্য প্রশংসনীয়। 'রসকলি' (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) তাঁহার প্রথম গল্প হিসাবে পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করে। ইহাতে বৈরাগী জীবনের সরস উচ্ছলতা ও প্রণয়-ব্যাপারে স্বাধীনতা উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মঞ্জরী ও গোপিনীর প্রণয়-প্রতিযোগিতা ও কথা-কাটাকাটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় খর হইলেও ইহা তাহাদের হৃদয়ের বেগবান্ ঘাত-প্রতিঘাতের যোগ্য বহিঃপ্রকাশ। শেষ পর্যন্ত মঞ্জরীর উদার আত্মত্যাগে পুলিন ও গোপিনীর দাম্পত্য সম্পর্ক গ্রন্থিমুক্ত হইয়াছে। এই প্রথম রচনাটি লেখকের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয় ও ইহাতে লেখকের 'রাই-কমল' উপন্যাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 'শ্মশান-বৈরাগ্য' ও 'অগ্রদানী' দুইটি গল্প 'জলসাঘর'-এর 'রাখাল বাঁড়ুজ্যে' গল্পের সমজাতীয়। একটিতে সুদখোর মহাজনের চরিত্রের অদ্ভুত অসামঞ্জস্য, অপরটিতে লোভী, আত্মসম্মানবর্জিত অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর আবির্ভাব শুধু অর্থপিশাচ মহিম বাঁড়ুজ্যে নয়, প্রতিবেশী

সমস্ত স্ত্রী পুরুষের অন্তরে যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য জাগাইয়াছে, তাহার সহিত তাহাদের চিরাভ্যস্ত সংসারাসক্তির বৈপরীত্য এক কৌতুকাবহ অথচ মর্মস্পর্শী অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে। উদর-সর্বস্ব অগ্রদানী ব্রাহ্মণ যে রাজভোগের লালসায় নিজ পুত্র জমিদারকে সঁপিয়া দিয়াছিল অকাল মৃত সেই পুত্রের শ্রাদ্ধে পিণ্ডভক্ষণে সেই সর্বগ্রাসী লোলুপতার নিবৃত্তি হইয়াছে। 'প্রতিমা' গল্পে প্রতিমা-নির্মাতা কুমারীশ মিস্ত্রীর নির্দোষ সৌন্দর্যোপাসনা ইতর-সন্দেহপরায়ণ পরিবার বর্গের দ্বারা কুৎসিত ব্যাখ্যা-বিকৃত হইয়া বাড়ির ছোট বউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করিয়াছে। এই মূল ব্যাপারের সহিত ছোট বউএর স্বামী অমূল্যের মাতাল অবস্থায় গোঁয়াতুর্মির বর্ণনা ঠিক খাপ খায় নাই। গল্পটির বিভিন্ন সূত্রগুলি সুগ্রথিত হয় নাই। 'তাসের ঘর' গল্পে অতিরঞ্জনপ্রবণা অথচ সরলহৃদয়া এক বধূর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে—বিষয়ের নূতনত্ব উপভোগ্য। 'মতিলাল' গল্পে গাজনের সং এর প্রধান নায়ক মতিলালের বীভৎস ছদ্মবেশ-ধারণের দ্বারা দর্শকবৃন্দের মনে বিভীষিকা সঞ্চারে পটুতার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই বাহাদুরীর বাড়াবাড়িতে একদিন তাহার ভাগ্যে পুরস্কারের পরিবর্তে প্রহার মিলিয়াছে। সেই প্রহারের তাড়নায় তাহার সরল, আমোদপ্রিয় মনে নিজ কুৎসিত আকারের জন্য আত্মগ্লানির এক তীব্র উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিয়াছে। সরল, অনভিজ্ঞ গ্রামবাসীর মনে যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যসন বিলাস, জুয়াখেলার উন্মত্ত লোলুপতা সুপ্ত থাকে, তাহা মেলার উৎসবের উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবেশে বৎসরের মধ্যে কয়েক দিনের জন্য বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করে। লেখক 'জুয়ারী' গল্পে গ্রাম্যজীবনের এই মত্ত অসংযমের ভাগ্যপরীক্ষার এই সর্বনাশী নেশার চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। মেলার উজ্জ্বল আলোক, গীতবাদ্যের সম্মোহন প্রভাব, বিচিত্র পণ্যসম্ভার, অগণিত জনসমাবেশ—চাষার ধূসর মনে রং ধরাইয়া দেয়। তাহার স্তিমিত রক্তধারায় জোয়ারের উচ্ছ্বাস জাগে, কণ্ঠস্বর ও হাসি উচ্ছৃঙ্খলতার উচ্চগ্রামে পৌঁছায়। জীবনব্যাপী নিয়ম-সংযমের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, শোভন-অশোভন, সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়, তাহার শিষ্ট-শান্ত জীবনযাত্রায় ঘূর্ণিবায়ুর দুরন্ত আবেগ সঞ্চারিত হয়—সুমিষ্ট, শীতল পানীয় এক মুহূর্তে সুরার ফেনিল আবিলতায় কলুষিত হইয়া উঠে। তারাশঙ্করের গল্পটিতে এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্র নাই বটে, তবে ইহার নিগূঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে।

'কালাপাহাড়'-এ আমাদের কৌতূহল মনুষ্য ও পশুজগতের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া রসানুভূতিতে বাধা পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত বংশালের গৃহ-বিপ্লব গৌণ হইয়া কালাপাহাড়ের শোকোন্মত্ত তাণ্ডব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'মুসাফিরখানা'য় রেলস্টেশনের চঞ্চল খণ্ডচিত্র-গুলি খুব সজীব বটে, কিন্তু ইহারা কোন কেন্দ্রীভূত রসানুভূতির সহিত সংলগ্ন হয় নাই। এই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যসমষ্টির মধ্যে বক্তার দাম্পত্য সমালোচনার তীব্র ঝাঁজ একটু বেসুরো ঠেকে। এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প 'হুটু মোক্তারের সওয়াল'। হুটুর বক্তৃতার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা দুইই সমভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। শেষ পর্যন্ত আভিজাত্যমর্যাদার মোহের নিকট আত্মসমর্পণ ও দুঃস্থ আত্মীয়বর্গের প্রতি রূঢ় আচরণ তাহার চরিত্রে দুর্বলতার গোপন বীজটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এই সুন্দর গল্পের মধ্যে যে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল তাহা লেখকের পরবর্তী নাটক 'দুইপুরুষ'-এ চরিতার্থ হইয়াছে।

'বিষপাথর' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪) কয়েকটি কিঞ্চিৎ ক্ষীতকায় ছোটগল্পের সমষ্টি। প্রথম

নাম-গল্পটি এক সমৃদ্ধ, অথচ উৎকেন্দ্রিক চাষী গৃহস্থের কাহিনী। সে একটি ভিতরে আলো-জ্বালা বড় পাথরকে কুড়াইয়া পাইয়া উহাকে হীরা মনে করিয়াছে এবং এই অসম্ভব ঐশ্বর্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নানা কল্পনাজাল বুনিয়াছে। তাহার উৎকট উত্তেজনা হৃৎস্পন্দন বন্ধ করিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক তাহার পরিবার-জীবনের জটিল, দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি আমাদের গোচর করিয়াছেন ও মহাজন ও সুদখোর রমণ ঘোষের অব্যবস্থিত, বিশ্ববিধানের প্রতি ক্ষুব্ধ চরিত্রটিকেও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'রবিবারের আসর'-এ তারাশঙ্কর অনেকটা পরশুরামের কল্পনাপ্রধান রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তবে তাঁহার পৌরাণিক কল্পনা অনেক সমৃদ্ধতর ও সৃষ্টি-প্রেরণার আদর্শের সহিত নিবিড়তরভাবে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বশান্তি ও মানব মহিমার প্রতি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস এই দুই মনোবৃত্তি ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত। গল্পটি লঘু, বৈঠকী চালে আরম্ভ হইয়া উদার ও উদাত্ত আদর্শবাদের সুরে শেষ হইয়াছে। 'হেডমাষ্টার' গল্পটিও এক প্রাচীন শিক্ষকের চরিত্রগৌরব ও আদর্শনিষ্ঠার হৃদয়গ্রাহী কাহিনী। তবে ইহা ছোট গল্পের সীমা ছাড়াইয়া হেডমাষ্টারের পরিবার-জীবন ও বিদ্যালয়-পরিচালনা নীতির বহুবর্ষব্যাপী অনুশীলনের মধ্যে প্রসারিত। শেষ পর্যন্ত যুগের অমোঘ ভাবান্তরের নিকট তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। তিনি স্কুল ছাড়িয়াছেন কিন্তু আদর্শের সহিত আপোষ করেন নাই। এই আপাত ব্যর্থ সাধনার কাহিনীতে ট্র্যাজিক মহিমার রস ঘনীভূত হইয়াছে। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রের সমবায়ে গঠিত, উহাদের পারস্পরিক স্নেহ ও সংঘর্ষে জটিল চিত্রও চমৎকার ফুটিয়াছে। সকলের চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক 'বাবুরামের বাবুয়া' তারাশঙ্করের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন। অতি নিম্ন শ্রেণীর মেথর-দম্পতির অতৃপ্ত সন্তানক্ষুধা কিরূপ অদ্ভুত উপায়ে ও বিভিন্ন আধারে বাৎসল্যরসের পরিতৃপ্তি খুঁজিয়াছে তাহা মানবের সার্বভৌম মৌলিক প্রকৃতির উপর বিস্ময়চমকমিশ্র আলোকপাত করে। বাবুরামের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব যেমন তাহার সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে ও অট্টহাস্যে তেমনি তাহার আচরণের প্রখর রীতিস্বাতন্ত্র্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যও তাহাদের প্রণয় ও কলহের অকস্মাৎ-উদ্দীপ্ত ঝটিকাবেগে, শান্তি ও বীররসের আপাত-অকারণ অভিনয়ে মূর্ত হইয়াছে। পরের ছেলে লইয়া স্নেহ ও যত্নের এরূপ আতিশয্য, পালিত-সন্তান-পরম্পরার মধ্যে একাধারে এরূপ আকুল আসক্তি ও নির্মম বর্জন ও এই পরিবর্তনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এরূপ নিরাসক্ত প্রশান্তি ও অক্ষুণ্ণ জীবনানুরাগ মানব প্রকৃতির এক নিগূঢ় রহস্যের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে। ছেলে সম্বন্ধে তাহাদের অস্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধও একটি অদ্ভুত মানসপ্রবণতার পরিচয়বাহী। হাজার হাজার লোক যে দৃশ্য দেখিয়াছে ও কিঞ্চিৎ বিস্ময়ানুভবের পর ভুলিয়াছে, তারাশঙ্কর তাঁহার স্রষ্টা মন লইয়া সেই সর্বজনবিদিত অভিজ্ঞতারই মর্মতাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 'হৈমবতীর' প্রত্যাবর্তন'টি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর গল্প।

'আলোকাভিসার' (২য় সং, আষাঢ়, ১৩৬৮), আলোকাভিসার ও প্রসাদমালা দুইটি বড় গল্পের সমষ্টি। পল্লীর বাস্তব জীবনচিত্রের ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশের সঙ্গে খানিকটা উদ্ভট, অতি-আদর্শায়িত কল্পনাবিলাসের খেয়ালী সংমিশ্রণ। জোনাকীলালের মাতা হেমাঙ্গিনী

চরিত্রকল্পনার মৌলিকতা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়—অস্বাভাবিক সমাজ ও পরিবার-পরিবেশে লালিতা কুলীন কন্যার মনোভাবের বিকারলক্ষণগুলি, অবদমিত সত্তার বৃত্তিসমূহের তির্যক অভ্যাসগুলি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সে বিনয়ের অন্তরালে নিজ দাবীকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, ক্ষমা চাহিয়া অন্যায় আচরণের পোষকতা করে, অনুনয়ের ছদ্মবেশে অত্যাচারের উগ্রতা প্রচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু উপন্যাসে তাহার কোন যথার্থ কার্যকারিতা নাই, এমন কি জোনাকাললেনর উপর তাহার প্রভাবও বিশেষ পরিস্ফুট নয়। অন্ধ মাসী—আর একটি থবরতরা পল্লীনারী—গল্প মধ্যে অবান্তর। জোনাকের বেপরোয়া চরিত্রটি খানিকদূর পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক ঠেকে। কিন্তু তাহার অন্তিম পরিণতি অনেকটা আকস্মিক ও চরিত্রসঙ্গতিহীন এবং এই মাত্রাহীনতার জন্যই উপন্যাসটির শেষ পর্যন্ত রসহানি ঘটিয়াছে।

প্রসাদমালা-য় গ্রাম্য জীবনের সংস্কার-বঞ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সম্পর্কের উন্মেষ, নূতন যুগের অর্থগৃধ্নুতা, আত্মীয়তার মর্যাদানাশী সর্বগ্রাসী লোভ ও নারীর হঠাৎ উদ্রিক্ত ঈর্ষা ও সন্দেহের জন্য তাহার উন্মূলন। গোপাল ও ললিতার বিবাহিত বাল্যপ্রণয়ে তাই বিচ্ছেদ আসিয়াছে। তাহার পর গোপাল কীর্তনরসে মগ্ন ও ললিতা কলিকাতার ধনিভবনে দাসী দুহিতারূপে বিকৃত বড়মানুষী চালের ছোঁয়ায় অশুচি। কাজেই উহাদের পুনর্মিলন স্থায়ী হইল না। গোপাল কীর্তনগানের বিরহ-পালার মধ্য দিয়া নিজ অন্তরবেদনাকে মুক্তি দিয়াছে। ললিতা ভগবৎকৃপায় ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আবার চিত্তবিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবার উহাদের মিলন সুখের হইয়াছে ও গোপাল বিরহ হইতে মিলনের পালায় নিজ কীর্তনভাবনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। পল্লীগ্রামে যাহার উদ্ভব, বৈষ্ণবপ্রেমবাসিত কল্পলোকে তাহার পরিসমাপ্তি। তবে বাস্তব গ্রামজীবন হইতে ভাববৃন্দাবনের তীর্থযাত্রার পথটি না লেখক না পাঠক কাহারও নিকট সুচিহ্নিত হইয়া উঠে নাই। বাস্তবতা-সাহিত্য হইতে ভাবসুরভিত পরিবেশে প্রয়াণটি লেখকের কল্পনাবিলাসের ধারা অনুসরণ করিয়াছে এবং উপন্যাস হিসাবে ইহাই লেখাটির দুর্বলতা।

ছোট গল্প-লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণাগ্র সাংকেতিকতা, হৃদয়ের জটিল অরণ্যপথে বিচরণের স্বচ্ছন্দনৈপুণ্য বা সুবোধ ঘোষের অর্থগূঢ় প্রতিবেশরচনাকৌশলের অভাব। মনে হয় যে, ছোট গল্পের আঙ্গিকও তিনি সর্বত্র আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি ছোট গল্পে গঠন শিথিলতা, দৃঢ়বদ্ধ সংহতির অভাবের উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় এমন একটা জীবনের রসোচ্ছলতা ও ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর আন্তরিকতা বিদ্যমান যাহাতে আঙ্গিকের এই সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায়। তিনি ততটা আর্টিষ্ট নহেন যতটা জীবনরসের রসিক। আর্টিষ্টের সদাজাগ্রত উদ্দেশ্যবোধ ও নিগূঢ় কলাকৌশল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দবিচরণের মধ্য দিয়া জীবনের সুগভীর রসোপলব্ধি, ইহার বৈচিত্র্যের স্বাদ-গ্রহণ, ইহার সহজ, সরল বিকাশগুলির প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের মূল নিহিত। দুর্ভেদ্য জটিলতার প্রতি মোহে তিনি রুগ্ন, ক্ষয়িষ্ণু মনোবিকারের দিকে আকৃষ্ট হন নাই; বিরল, বীভৎস ব্যতিক্রমের মধ্যে তিনি জীবনের তাৎপর্য খোঁজেন নাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সুবোধ ঘোষের সূক্ষ্ম কারুকলার মধ্যে কিছু পরিমাণ সচেষ্টতা ও অস্বাভাবিকতার সন্ধান মিলে। তারাশঙ্করের অপেক্ষাকৃত ঋজু ও সরল রীতি—অন্ততঃ যেখানে তিনি রাজনীতির সুলভ উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হন নাই—স্বাস্থ্য ও সহজ শক্তির পরিচয় বহন করে।

(২)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় উপন্যাসের মধ্যে অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রমিকের যে অতৃপ্ত, অশান্ত বুভুক্ষা ও রুদ্ধ বিদ্রোহোন্মুখতার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে সত্যসত্যই প্রধূমিত বহ্নিশিখার উত্তাপ ও দীপ্তি অনুভূত হয়। অন্যান্য লেখক শ্রমিকদের দুর্গতি বর্ণনা করিতে কেবল তথ্য-সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা-দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও তাহাদের রিক্ত, ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকাহিনীতে করুণরসসঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের ভাষার শুষ্ক কঠোর ভাব-ব্যঞ্জনাশক্তি ইঁহাদের নাই; ভাষার এই সাংকেতিকতার সাহায্যে তিনি এক ধূসর, উদাস, মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময়, ছায়ালেশহীন জীবন-প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

'নীলকণ্ঠ' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)—এক সচ্ছল অবস্থাপন্ন কৃষক-পরিবার দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণে কিরূপ ছন্নছাড়া যাযাবর জীবন-যাপনে বাধ্য হইয়াছে তাহার করুণ ইতিহাস। শ্রীমন্ত নিজ ভাগিনেয়ীকে অযোগ্যপাত্রে সম্প্রদান হইতে রক্ষা করিতে গিয়া একদিকে সর্বস্বান্ত হইয়াছে, অপরদিকে অসহ্য ক্রোধের বশে তাহার ভগ্নীপতির মাথায় লাঠি মারিয়া মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহাতিশয্যের রন্ধ্রপথে তাহার জীবনে শনির প্রবেশ ঘটিয়াছে। অভাবের চাপে এই কৃষক-পরিবার আত্মসম্মান হারাইয়াছে—ঋণ ও প্রবঞ্চনা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও মিথ্যাভাষণের হীনতা তাহাদের জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছে। শ্রীমন্তের জেলের পর গিরির সমস্যা আরও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ়সংকল্প ও স্বাধীনচিত্ততা দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। স্বামীর বন্ধু বিপিনের লালসা-ক্লিষ্ট হিতৈষণা সে প্রথম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার অনশন ও আত্মহত্যার বৃথা চেষ্টার জ্বালাময় চিত্র লেখকের বর্ণনাশক্তির সুন্দর নিদর্শন। গত্যন্তর না দেখিয়া সে বিপিনের আগ্রহাতিশয্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রামে যে কলঙ্ক-রটনা ও লাঞ্ছনার বান ডাকিয়াছে—তাহাতে গিরি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গিরি এক দানবীয় জিঘাংসায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরে দ্বারে আগুন দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে ও নদীর জলে প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার পিতৃপরিচয়হীন সন্তান নীলকণ্ঠ, মাতৃপরিত্যক্ত হইয়া গ্রামের লোকের অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার সাহায্যে মানুষ হইয়াছে। এই অবস্থায় সদ্য-জেলমুক্ত শ্রীমন্তের সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছে ও পরস্পরের পরিচয় না জানিয়া উভয়ে একসঙ্গে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়াছে। এই উপন্যাসে, অপরিপক্বতার অনেক লক্ষণ থাকিলেও শ্রীমন্ত ও গিরির মনোজগতে সংঘটিত বিপর্যয়ের বিবরণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান, লিপিকুশলতা ও দারিদ্র্যের প্রতি সত্যিকার সমবেদনার পরিচয় দেয়।

'রাইকমল' উপন্যাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) শক্তির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার অপ-প্রয়োগেরও নিদর্শন আছে। বাঙালী সমাজে বৈষ্ণবের জীবনযাত্রা যেন রোমান্সের শেষ আশ্রয়স্থল। ইহার অসামাজিক স্বাধীনতার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া হিন্দু সমাজের রুদ্ধ ঘরে দক্ষিণ

বায়ুর স্পর্শ কতকটা স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হইতে পারে। বৈষ্ণবের স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা, সংগীত প্রভৃতি ললিতকলায় অনুরাগ ও নৈপুণ্য, স্বভাবের উদারতা ও মাধুর্য ও কচিৎ মহাপ্রভুর ধর্মের অনুপ্রেরণায় সত্যকার চরিত্রগৌরব—হিন্দুর বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের হেতু হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাস্তবানুগ বলিয়া ঔপন্যাসিকের উপজীব্য হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঠিক মাত্রা রাখিতে পারেন না—সুর চড়াইয়া ও অতিরঞ্জিত বর্ণবিন্যাসের দ্বারা বিষয়কে বিকৃত ও অবিশ্বাস্যরূপে আদর্শায়িত (idealise) করিয়া ফেলেন। শরৎচন্দ্রের কমললতা ও তাহার আবাসকুঞ্জ এই অসংযত আদর্শবাদের উদাহরণ। তারাশঙ্কর এখানে শরৎচন্দ্রেরই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রাইকমলের স্বপ্নবিভোর তন্ময়তা, তাহার প্রণয়াবেশের পার্থিব হইতে অপার্থিব স্তরে উন্নয়ন সাধারণ বৈষ্ণবের অনুভূতির অনেক উর্ধ্বে। ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইলে যে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, লেখক তাহা দেন নাই। রসিক-দাসের সহিত রাইকমলের মালা-বদল ঘটনা হিসাবে অবিশ্বাস্য হইলেও, এই ব্যাপারে রসিকদাসের মানস প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আসক্তি ও বৈরাগ্য, পার্থিব ও ঐশ প্রেমের অবিরত অন্তর্দ্বন্দ্বে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—যদিও আত্মগ্লানি রসিক-দাসেরই বেশি ও বন্ধনচ্ছেদের প্রথম প্রেরণা তাহার দিক্ হইতেই আসিয়াছে। উভয়ের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আচরণ, কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাস সমস্তই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা—পদের কলির খণ্ডাংশ তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে সুরভি নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যায় আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে খেদ ও ক্ষোভের সহিত যে সূক্ষ্ম, সুকুমার সুষমা জড়িত আছে, তাহা সাধারণ বৈষ্ণবের অনধিগম্য। বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার এই বিকাশ বাস্তব জীবনের প্রতিবেশে, সাধারণ স্তরের নর-নারীর চরিত্রে বিসদৃশ মনে হয়।

রঞ্জনের সহিত চির-প্রতীক্ষিত মিলনের পর কমলের জীবনে যে পরিণতি আসিল তাহা অধিকতর বাস্তবানুগামী। অবশ্য তাহাদের এই জীবনযাত্রাকে বৈষ্ণবধর্মের রসমাধুর্যে পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণব উৎসবসমূহের ললিত ছন্দে ইহার গতি নিয়মিত করার কবিত্বপূর্ণ চেষ্টা লেখক যথাসাধ্য করিয়াছেন। তথাপি ঝুলন-রাস-দোলের মধুস্মৃতি-সুরভিত প্রণয়োচ্ছ্বাসে অনিবার্য-ভাবে ভাটার টান আসিয়া পড়িয়াছে। শেষে কমলের প্রত্যাখ্যানে পরীর অভিশাপ ফলিয়া বাস্তব জগতে যে ন্যায়নীতির প্রাদুর্ভাব, তাহার মর্যাদা রক্ষা হইল। তাহার জীবনের এই শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বাস্তবধর্মী না হইলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমা-বহির্ভূত নহে। গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের লিপি-চাতুর্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় থাকিলেও উপন্যাস হিসাবে ইহা অপরিণত। কমলের প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু ইহার ধারা নানা উদ্ভট, অকারণ খেয়ালের শাখাপথে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রধান ত্রুটি ভাবাবেগমত্তা, বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া উচ্ছ্বাসের অপব্যয়, জীবনের সত্যকে অতিক্রম করিয়া উহার কাল্পনিক কাব্যসৌন্দর্যের প্রতি অসংযত প্রবণতা।

বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮)—এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার বৈরাগী-বৈরাগিনীরা বাস্তব সমাজ-জীবনের সহিত বেশ সুসম্বদ্ধ—অতিরিক্ত আদর্শ-বাদের দ্বারা স্ফীত ও বাষ্পায়িত হয় নাই। ইহারা অনেকটা উদাসীন, নীড়-রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহহীন; সমাজের সহিত সংস্রবও অনেকটা শিথিল। মনে সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ, মুখে গানের ফোয়ারা, সমাজের নৈতিক শাসন অপেক্ষা স্বাধীন খেয়ালের দ্বারাই ইহাদের জীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সাধনায় আড়ম্বর নাই, বিধি-নিষেধের কঠোরতা নাই। তবে এই বৈষ্ণব সাধনা যে জীবনের উপর সত্যই প্রভাবশালী তাহা প্রমাণিত হয় চিত্তের নির্মল শান্তিতে ও পারিবারিক বন্ধনের মোহমুক্ত শিথিলতায়। রসময়, গৌরহরি ও ললিতার মধ্যে এই সহজ ও নির্লিপ্ত মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ললিতা ও রসময়ের সম্বন্ধের মধ্যে সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য-অধিকার-প্রতিষ্ঠার তীব্র অসহিষ্ণুতা একেবারেই নাই। ললিতার মন এমন সংস্কারমুক্ত যে, তারাপদর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও তাহার কোন গ্লানি বা অশুচিতার স্পর্শ লাগে নাই। রসময়ও কোনদিন ললিতার উপর অসপত্ন অধিকারের দাবী রাখে নাই—দাম্পত্য বন্ধন তাহার নিকট মাকড়সার জালের মত ক্ষণভঙ্গুর। বিনোদিনীর সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধে জড়িত হইবার পর গৌরহরির মনে আত্মগ্লানি অপেক্ষা বিমুখতাই জাগিয়াছে বেশি—তাহার নীতিবোধ অপেক্ষা রুচিই ইহার দ্বারা অধিক বিড়ম্বিত হইয়াছে। তাহার বিমুখতা আসিয়াছে বিনোদিনী তাহার কৈশোর কল্পনার দাবী মিটাইতে পারে নাই বলিয়া, সে যে অপরের বিবাহিত পত্নী সেজন্য নহে। এই নৈতিকতার প্রভাবমুক্ত ও সাংসারিক আসক্তির দ্বারা অশৃঙ্খলিত মনের স্বচ্ছন্দ গতি বাউল জীবনের বিশেষত্ব। এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণব সমাজের ইতর জনসাধারণের মধ্যে স্থূল, অমার্জিত রসিকতা ও মেলামেশার নিঃসংকোচ স্বাধীনতা এই উপন্যাসগুলিতে বেশ সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও একটা কারণে বৈষ্ণব সমাজ ঔপন্যাসিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কেবল মাত্র এই সমাজেই নরনারীর অবাধ মিলনের ও স্বাধীন-ইচ্ছা-অনুবর্তনের ফলে প্রাক্-বিবাহ পূর্বরাগ স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইতে পারে।

এই কয়েকটি বৈরাগী নর-নারীর জীবনের সহিত বিনোদিনী ও হারাণের জীবনযাত্রা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই কৃষক-পরিবারের দাম্পত্য সংঘর্ষ, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প, ঘরসংসার পাতিবার প্রবল ইচ্ছা ও সমাজ-শাসনের নিকট অসহায় অবনতি বৈরাগীর আলগা, উড়ুউড়ু, অর্ধ-যাযাবর জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে যেমন পাখা মেলিবার আগ্রহ, এখানে তেমনি সহস্র-শিকড়জালে মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা। ইহাদের চরিত্রে অস্বাভাবিক গভীরতা নাই, আছে হিল্লোলিত, সহজ প্রাণপ্রবাহ। হারাণের সরল, উত্তেজনাপ্রবণ, রুক্ষ পারুষ্যের আড়ালে অসহায়, স্নেহাতুর প্রকৃতিটি বেশ সজীব হইয়াছে। বিনোদিনীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত জটিল। পূর্বপ্রেমের স্মৃতি হারাণের প্রতি তাহার মনোভাবকে অস্পষ্ট ও সংশয়জড়িত করিয়াছে। স্বামীর সহিত নিত্য কলহ-বিরোধের সঙ্গে তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভর ও গৃহস্থালীর প্রতি মায়া অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। একদিকে গৌরহরি, আর একদিকে তারাপদ তাহার এই দোদুল মনে স্পর্শ দিয়া তাহাকে আরও উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। স্বামি-গৃহত্যাগের পর ললিতার আখড়াতে তাহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মনের অন্তর্দেশে দুর্জয়

অভিমান ও প্রকাশবিমুখ আত্মনিরোধের পাষাণ-ভার প্রচ্ছন্ন আছে—কিন্তু তথাপি রসময়, ললিতা, তাম্রকূটভক্ত স্কুল-পলাতক দুইজন ছাত্র ও সাময়িকভাবে অভ্যাগত তারাপদ এই সকলে মিলিয়া যে হাস্য-পরিহাসমুখর, প্রীতিস্নিগ্ধ আবেষ্টন রচনা করিয়াছে সে তাহার সহিত বেশ সহজভাবে মিশিয়া গিয়াছে। গৃহস্থ রমণী আখড়ার ভারমুক্ত আবহাওয়ায় তাহার সাংসারিক দুশ্চিন্তাকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছে।

'সোমলতা'য় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর বিনোদিনীর সমস্যা চরম জটিলতার স্তরে পৌঁছিয়াছে। এই বিচারালয়ের মত ক্ষমাহীন, বিরুদ্ধভাবাপন্ন আবেষ্টনে তাহার প্রকৃতি আরও সংকুচিত হইয়া মূক যান্ত্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গৌরহরির প্রতি তাহার আকর্ষণ অসংবরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে নির্লজ্জভাবে গৌরহরির অনুসরণ করিয়াছে, তাহার হতবুদ্ধি, বিপন্নভাবে হিংস্র, উন্মত্ত ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছে, সে গৌরহরির বিবাহের ভাবনায় ঈর্ষ্যা ও বিদ্রূপে দেহ-মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই জ্বালা প্রশমিত হইয়া সে নিজ নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে ও অনেকটা প্রসন্ন মনে স্বামি-গৃহে ফিরিয়াছে। এই প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তে লেখক তাহার প্রতি সাংকেতিক গৌরব আরোপ করিয়াছেন—সে যেন কলঙ্কে ও মহিমায় মাখামাখি, ধূলি ও চন্দনে অনুলিপ্ত বসুন্ধরার প্রতীক।

লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র-পরিকল্পনায় ও মন্তব্য-প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই। আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব—over-emphasis বা সুর চড়াইবার প্রবণতা। ইহার চরিত্রগুলি সর্বদাই বিস্ফোরণের (explosion) সীমান্তে দণ্ডায়মান, বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িবার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রধূমিত। লেখকের মন্তব্য-বিশ্লেষণও যেন পাঠককে বধির ভাবিয়া লইয়া তাহার কর্ণে অবিমিশ্র উচ্চ চীৎকার। সর্বত্র অস্বাভাবিক তীব্র গতিবেগ, পরিবর্তনের ঘূর্ণিবায়ু, ভূমিকম্পের ভারকেন্দ্রচ্যুত বিপর্যয়, ভাব-বিলাসের অনিশ্চিত বাষ্পাকুলতা। এই সাধারণ প্রবণতার মধ্যে সরোজকুমার একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। তাঁহার উপন্যাস খুব গভীর বা জটিল নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি মৃদু, শান্ত সত্যপ্রিয়তা বর্তমান। বাংলার কৃষক-প্রধান পল্লীজীবনের যে ব্রত-পার্বণ উৎসবে চাষার আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ উথলিয়া পড়ে, কৃষিকার্যের বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করিয়া তাহার মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভক্তি-বিশ্বাসের মৃদু কম্পন দোলা দেয় লেখক তাহা কোনরূপ অতিরঞ্জন না করিয়া, খুব সহজ ভাবে আঁকিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থত্রয়ে অতিরঞ্জন-প্রবণতার মাত্র দুইটি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথম, বিনোদিনীর মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার অবিশ্বাস্য প্রসার; দ্বিতীয়, রাত্রিতে রাস্তাচলায় তারাপদর রোমাঞ্চকর অনুভূতি ('গৃহকপোতী', ৬ অধ্যায়)। তথাপি মোটের উপর তাঁহার জীবন-আঁকার প্রণালী ও সমালোচনার ভঙ্গী অত্যুক্তিবর্জিত ও সত্যসন্ধানশীল।

এই প্রসঙ্গেই সরোজকুমারের পরবর্তী কালে রচিত কয়েকটি উপন্যাসের আলোচনা শেষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নীলাঞ্জন (ফাল্গুন, ১৩৬৩)—এক জমিদার পরিবারের দুই শাখার মধ্যে তীব্র ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী। সমরেশ ও তাহার বিমাতা হরসুন্দরী এই দ্বন্দ্বের নায়ক ও প্রতিনায়িকা। ইহাদের সংঘর্ষের ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনা-পটভূমিকা নিপুণভাবে অঙ্কিত। দুই প্রতিযোদ্ধার চরিত্র প্রায় একই উপাদানে গঠিত। উভয়ের চরিত্রেই আত্মকেন্দ্রিক

নিঃসঙ্গতা, মনগুন্থির অসাধারণ দৃঢ়তা ও অন্তররহস্তের দুর্বোধ্যতা সাধারণ লক্ষণরূপে উপস্থিত। তবে হরসুন্দরী পরিবারের কর্ত্রীরূপে যতটা সহজ ও স্বাভাবিক, সমরেশের একক জীবনযাত্রা তাহা না হইয়া উৎকেন্দ্রিকতার সীমা স্পর্শ করিয়াছে। তাহার বিবাহও তাহার জীবনছন্দে কোন পরিবর্তন ত আনেই নাই, বরং তাহার নব-বিবাহিতা স্ত্রী অরুন্ধতীকে তাহার বিপক্ষপক্ষাবলম্বিনী করিয়া তাহার উৎকেন্দ্রিকতাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। হরসুন্দরীর মৃত্যুর পর সমরেশের বাহিরের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া দাম্পত্য সংঘর্ষের নীরব বিরোধিতা আরও অসহনীয় হইয়াছে। অরুন্ধতী ও সমরেশের এই সম্পর্ক-সমস্যা খুব নিপুণ বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে না—ইহার কেন্দ্রস্থলে কোথাও যেন একটা শূন্যতা বা অবাস্তবতা বর্তমান ইহা অনুভব করা যায়। এই অবাস্তবতার চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে অরুন্ধতী ও সমরেশের শেষ মিলনের অভাবনীয় মৃত্যু-পরিণতিতে। অবশ্য দাম্পত্য সম্বন্ধের বহুব্যাপ্ত অনির্দেশতায় নিবিড় ঘৃণা, নিদারুণ বিজিগীষা ও অদম্য আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী ভাবের সহাবস্থান অভিজ্ঞতা-সমর্থিত। কিন্তু এখানে সমরেশের নীরব-অবজ্ঞাপূর্ণ বিমুখতা ও অরুন্ধতীর আতঙ্কিত আত্মসঙ্কোচনের মধ্যে দেহকামনার কোন অঙ্কুর লক্ষ্য করা যায় না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটনা ও ফল উভয় দিক দিয়াই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

অরুন্ধতীর মৃত্যুর পরে সমরেশের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ তাহার বৈমাত্র ভাই-এর পরিবারের বিরুদ্ধে তাহার অনির্বাণ বৈরিতার ক্রমোপশম, তাহার হিংসা-বৃত্তির স্তিমিততা ও একপ্রকারের সাংসারিক ঔদাসীন্য। কিন্তু ইহা তাহার অন্তর্জীবনে কোন বিপ্লব সূচিত করে না। অরুন্ধতীকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার ভ্রাতৃপরিবারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল, তাহার মৃত্যুতে সেই আক্রোশ সমিধ্‌হীন অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শেষ পর্যন্ত তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শিশু ছেলে অনিমেষের মধ্যবর্তিতায় সমরেশের জীবনে এক নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত হইল ও উভয় পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ-ব্যবধান দূরীভূত হইল। শিশুর ক্রীড়াশীল হাত ধরিয়া এই আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশের কাহিনীটি সুলিখিত হইলেও ইহা উচ্চতর অনুভব-শক্তির নিদর্শন বহন করে না। তাহার প্রধান কারণ লেখক অন্তরের নিগূঢ় ক্রিয়া অপেক্ষা বহির্ঘটনার বর্ণনায় উপরই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা অন্তররহস্য-প্রকটনের পরম বিস্ময় অপেক্ষা সুবিবৃত কাহিনীর মৃদু আকর্ষণ বেশী করিয়া অনুভব করি। অন্যান্য চরিত্র—মণিমালা, সুমিত্রা প্রভৃতি বিশেষত্ববর্জিত।

অরুন্ধতী-সমরেশের দাম্পত্য সম্পর্কের উপর রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর মধুসূদন-কুমুদিনী সম্পর্কের ছায়াপাত হইয়াছে মনে হয়। শিশুর স্নেহাকর্ষণে নবীভূত জীবনাগ্রহের বর্ণনা জর্জ এলিয়টের Silas Marnerএ পাওয়া যায়। সরোজকুমারের জীবনচিত্রণ মননধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। তথাপি ইহা আমাদের সতর্ক ও সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন দাবী করে।

'নাগরী' (ভাদ্র, ১৩৬৮)—অপূর্ব ও সুমিত্রার ভিন্নকেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। সুমিত্রা প্রমোদ-নৃত্যকলাচর্চায় গার্হস্থ্যকর্তব্যবিমুখ। অপূর্ব শান্ত, কিন্তু অভিমানী; সে সুমিত্রাকে নিজের পথে চলিবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছে। খ্যাতির মোহ, জনপ্রিয়তার

আস্বাদন ও দলনেত্রীর অকুণ্ঠ অধিকার সুমিত্রাকে যেন এক অবিমিশ্র সৌন্দর্যলোকের অধিবাসিনী করিয়াছে। অপূর্ব তাহার ঔদাসীন্যে আহত হইয়া তাহার মৃতা প্রথম পত্নীর সহিত ধ্যানসংযোগ স্থাপন করিতে প্রণোদিত হইয়াছে। এই অবাস্তব ধ্যানকল্পনার ফলে তাহার গুরুতর স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে ও ইহাই তাহার উদাসীন পত্নীর কর্তব্যবোধ উদ্দীপিত করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের বহির্জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাই, কিন্তু অন্তর্জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশের বিশেষ কোন নিদর্শন নাই। বিশেষতঃ অপূর্বের অলৌকিক অনুভূতি ফুটাইতে যে রহস্যবোধ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন উপন্যাসটিতে তাহার অভাব। ইহাতে সরোজকুমারের ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের কোন নূতন প্রমাণ মিলে না।

'নীল আগুন' (আষাঢ়, ১৩৭০)—সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক উপন্যাস। ইহাতে লেখক বাঙলার একটি মসীকৃষ্ণ অধ্যায়, উদ্বাস্তুসমাবেশের ন্যক্কারজনক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক একটি বে-আব্রু উদ্বাস্তু পরিবার অশালীন প্রকাশ্যতায়, বহিঃপ্রতিবেশের রুক্ষ শ্রীহীনতা ও অন্তরের নৈরাশ্যক্লিষ্ট শূন্যতার মধ্যে, অতীতের স্মৃতিচর্চা ও ভবিষ্যতের লক্ষ্যহীন বিমূঢ়তায়, যেন মনুষ্যত্বের দুঃসহ অবমাননার জীবন্ত প্রতীকরূপে সময় কাটাইতেছে। এই অগণ্য পাশবিকতায় নিমগ্ন জনতার মধ্যে তিনটি পরিবার ও উহাদের তিনটি মেয়ের জীবনসমস্যাসমাধানের দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকায় ভরা প্রয়াস উপন্যাসটির বর্ণনীয় বিষয়। অঞ্জনা, রঞ্জনা ও খঞ্জনা এই তিনটি কিশোরী মেয়ের শুধু নামেই মিল নাই, দুর্ভাগ্যে ও দুর্নীতিতে একটি করুণতর বীভৎসতর সাদৃশ্য আছে। ইহারা যে চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে অদৃষ্টের নির্মম পেষণ ইহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখে নাই, অবস্থা-নির্যাতনের কাহিনীর মধ্যেও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের মধ্যে অঞ্জনার চোখে এই গলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিষদিগ্ধ বিদ্রোহের নীল আগুন জ্বলিয়াছে; সে নারীমাংসলুব্ধ পাষণ্ড পুরুষের পশু প্রবৃত্তিকেই নিজ ক্রূর প্রতিশোধের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে কৃত-সঙ্কল্প। সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ রায়বাহাদুরের গৃহশিক্ষিকার কার্যে নিযুক্তা তাহার প্রতি আসক্তি ও ইহারই ফলস্বরূপ রায়বাহাদুর গৃহিণীর আত্মহত্যা অভিজাতসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষবাষ্প সঞ্চিত হইয়াছে তাহার জ্বালাময় বিস্ফোরণ। এই তিনটি মেয়েকেই উদ্বাস্তু-ঋণ আদায় করিতে সরকারী কর্মচারীর কামুকতা-বহ্নিতে আত্মবিসর্জন করিতে হইয়াছে—সেইখানেই তাহাদের দেহবিক্রয়ের প্রথম পাঠ লইতে হইয়াছে।

রঞ্জনা ভদ্র উপায়ে জীবিকার্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। সে উদ্বাস্তু উপনিবেশে একটা স্কুলপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী সাহায্য পূর্বোক্ত ঘৃণিত মূল্যে যোগাড় করিয়াছে। তাহার এই সংকল্প ব্যর্থ হইয়াছে কোন বাহিরের বাধায় নহে, উদ্বাস্তু সমাজেরই অপরিসীম হীন চক্রান্তে ও দলাদলিতে। এমন কি নারীধর্ষণ ব্যাপারেও যে এই পলাতক বীরপুঙ্গবেরা পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী দুর্বৃত্তদের অপেক্ষা কম যান না লেখক সেই চরমগ্লানিকর কল্পনারও প্রয়োগ করিয়াছেন। সমস্ত পথ বন্ধ দেখিয়া শেষ পর্যন্ত রঞ্জনাকেও অঞ্জনা-প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা খঞ্জনার ভাগ্যে জুটিয়াছে। সে পঙ্ককুণ্ড হইতে নিরাপদ ভদ্র আশ্রয়ে স্থান লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই দৈবের ক্রূর পরিহাসে

আবার অসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকলের চেয়ে বীভৎসতর ভাগ্যবিপর্যয় তাহার বাগদত্ত স্বামীর তাহার দেহবিক্রয়বৃত্তি-অবলম্বনে নিরুপায় সম্মতিজ্ঞাপনের মধ্যে নিহিত। বরুণ ও সে তাহাদের পূর্ববঙ্গ-জীবন হইতেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিল ও উহাদের বিবাহ অভিভাবকদের সোৎসাহ সম্মতিতে প্রায় স্থির হইয়াছিল। কিন্তু দেহত্যাগের অবর্ণনীয় দুর্গতি ও জীবনসংগ্রামের অসহনীয় তীব্রতার মধ্যে সেই সোনার স্বপ্ন মরীচিকাতে বিলীন হইল। নীড় বাঁধিবার আর কোন উপায় না পাইয়া এই ভীরু পক্ষী-মিথুন পূতিগন্ধময় আবর্জনাস্তূপ হইতে খড়কুটা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি কালরাত্রির অবসানে উষার ন্যায় এক খাদ-মিশানো স্বর্ণসম্ভাবনা ইহাদের দিগন্তে আপাত-উজ্জ্বল রহিল। এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি এই তিনটি দুর্ভাগিনীর চরিত্র ও আবেষ্টনগত সমস্ত পার্থক্যকে চূর্ণীকৃত করিয়া তাহাদিগকে একই অবক্ষয়-সঞ্চয়ের অভিন্ন উপাদানরূপে মিশাইয়া দিল। নেতাজী (?) মাসাজ ক্লিনিকের পরিচারিকার শুভ্রবসনের আচ্ছাদনে তাহারা গণিকাবৃত্তির একটি স্বচ্ছ অন্তরাল রচনা করিয়া যুগসমাজের নিকট নিজেদের অনিবার্য ঋণ পরিশোধ করিল। অমর-গোষ্ঠী যেমন টেসের সহিত খেলা শেষ করিয়াছিল, তেমনি যুগদেবতা ইহাদের সহিত এক ব্যঙ্গকটাক্ষময় লীলাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন।

উপন্যাসটিতে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জীবননাটকে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে অবস্থানের প্রথম ও পুনর্বাসনের দ্বিতীয় অঙ্কের একটি অতি বস্তুনিষ্ঠ, মানসবিপর্যয়দ্যোতনায় তাৎপর্যময় বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে এই দুইটি দিকের মধ্যে বস্তুবিবৃতিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। উদ্বাস্তু-কাহিনী ও সরকারী সাহায্যবিতরণের দুর্নীতি এখন আমাদের সকলেরই সুপরিজ্ঞাত সমকালীন ইতিহাসের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই উপন্যাসে এই পরিচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করে না। ঔপন্যাসিকের নিকট যাহা প্রত্যাশিত তাহা ব্যক্তি-চরিত্রের উপর এই ঘটনাবলীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার পরিস্ফুটন। লেখক তাঁহার উপন্যাসের নামকরণে আমাদের এই প্রত্যাশা খানিকটা উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন। অঞ্জনার কাল চোখে মাঝে মধ্যে যে নিবিড় ঘৃণা, যে বেপরোয়া বিদ্রোহের নীল আগুন ঝলসিয়া উঠিতে দেখি, তাহারই ভয়াল আলোকে এই পরিচিত দৃশ্যাবলী কিরূপ অভাবনীয়রূপে বদলাইয়া যায়, মানুষের কবন্ধরূপ কিরূপ আশ্চর্যভাবে প্রকটিত হয়, তাহাই আমরা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম ও লেখক এই আশার ইঙ্গিতকে পরিণতি দেন নাই, ইহাই আমাদের অতৃপ্তির কারণ।

(৩)

এবার আবার তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর আলোচনার পরিত্যক্ত সূত্র পুনঃ গৃহীত হইবে।

'পাষাণপুরী' উপন্যাসটি তারাশঙ্করের গোড়ার দিকের রচনা; কিন্তু ইহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। জেলের নিরানন্দ, তিলে তিলে আত্মমর্যাদা-ক্ষয়কারী, নৈরাশ্য ও অবসাদের গুরুভারগ্রস্ত আবহাওয়াটি অতি তীক্ষ্ণভাবে অথচ অনবদ্য ভাবসংহতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কয়েদীদের বিভিন্ন নৈতিক স্তরগুলি চমৎকারভাবে পৃথক্ করা হইয়াছে। নিম্নতর স্তরের কয়েদীগুলি—সাইদ, গৌর, কেষ্ট, সাইদের প্রিয়পাত্র ছেলেটি, চৈতন, গোঁসাই, ওস্তাদ প্রভৃতি—জেলের অভ্যস্ত অধিবাসী। দীর্ঘ সংস্রবের ফলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইতর আমোদ-প্রমোদের

সঙ্গে সমস্ত সুকুমার বৃত্তির ক্রমিক লোপ হইতে উদ্ভূত একটা রুক্ষ, বেপরোয়াভাব ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। মাঝে মধ্যে সহানুভূতির স্নিগ্ধ, বিরল উচ্ছ্বাস, পারিবারিক জীবনের স্নেহ-প্রেম-মমতার সাময়িক স্মৃতি ও অসহনীয় বেদনার তীব্র আঘাত তাহাদের অসাড় জীবনের মরিচা-ধরা তারে ঘা দিয়া তাহাদের উচ্চতর মনুষ্যত্বকে সময় সময় স্ফুরিত করে। মোটের উপর ইহারা হাসিয়া খেলিয়া, ঈর্ষ্যা-দ্বেষের লঘু অভিনয় করিয়া, জেলের নিয়ম ফাঁকি দিতে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া, জেলের অনিবার্য আকর্ষণে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া একরকম স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটায়।

এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম খুনের আসামী কালী কামারের মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। খুনের রক্তাক্ত স্মৃতি, গৃহদাহের লেলিহান অগ্নিশিখার উত্তপ্ত স্পর্শ, মৃত্যুভীতি, নির্জনবাসের উন্মাদকর আতঙ্ক—সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে আরোগ্যাতীত চিত্তবিকারের অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। বাসিনীর সহিত সাক্ষাতের মুহূর্তে মনের এই ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া একটা তুচ্ছ সম্ভাষণ ও একটু তৃপ্তির হাসি মাত্র বাহিরে আসিবার পথ পাইয়াছে। তাহার প্রণয়পাত্রীর সহিত শেষ বিদায়ের পর ও ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে তাহার কণ্ঠে যে আর্ত, মর্মভেদী চীৎকার ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই তাহার চিত্তবিভ্রমের আচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃতির মধ্যে ব্যর্থ-করুণ জীবনলোলুপতার নিদর্শন।

কয়েকটি ভদ্রলোক আসামী মিলিয়া কারাজীবনে এক উচ্চতর অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা অন্যান্য আসামীদের সহিত সংস্পর্শহীন এক স্বতন্ত্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ এই শ্রেণী-সাম্যের মধ্যেও চরিত্র-বৈচিত্র্য সূচিত হইয়াছে। চাটুজ্যে, সুরেশ ও অমর বিভিন্ন মনোভাব ও জীবনাদর্শের প্রতিনিধি। চাটুজ্যে জেলের আবহাওয়ায় বেশ স্বচ্ছন্দ-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে; সুবিধাবাদ, ইতর ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা, যেমন জেলের বাহিরে তেমনি জেলের ভিতরেও, তাহার জন্য আরামের নীড় রচনা করিয়াছে। তাহার স্থূল, ভোগ-সর্বস্ব মনে অন্ধ ধর্মনিষ্ঠা সত্যিকার কোন অনুশোচনার উদ্রেক করে নাই। সুরেশ ও অমর উচ্চতর মনোবৃত্তির অধিকারী; সুরেশের চিন্তাশীলতা ও মননশক্তি ও অমরের মিথ্যা কলঙ্কে লাঞ্ছিত চরিত্রগৌরব এই পাষাণ বেষ্টনীর গ্লানিকর অবরোধের বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সময় সময় ইহারা এই অবিরাম আত্মদ্বন্দ্বে শ্রান্ত হইয়া চাটুজ্যে-প্রদত্ত গাঁজার ধূমে বিস্মৃতি খুঁজিয়াছে ও চাটুজ্যের নৈতিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর লৌহশলাকার উপর ডানা-ঝটপটানি ইহাদের জীবনের গতি ও প্রচেষ্টার যথার্থ প্রতীকরূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরের মধ্য হইতে মানব-মহিমার তুঙ্গতম শৃঙ্গ মাথা তুলিয়াছে। যেখানে মানবাত্মার চরম অবমাননা সেইখানেই তাহার সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় বিকাশ। অনশন-ব্রতে মৃত্যুবরণকারী নরুর মধ্যে মানবত্বের উচ্চতম গৌরব মূর্ত হইয়াছে। উপন্যাসে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই; কিন্তু তথাপি তাহার প্রভাব জেলের সমস্ত শ্বাসরোধকারী আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। জেলের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা তাহার উপস্থিতিতে যেন নীরব ভর্ৎসনায় কুণ্ঠিত হইয়াছে, ইতর কয়েদীর দল তাহার মহান্ আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য না বুঝিয়াও যেন এক অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র কয়েদীরা এই

মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সান্নিধ্যে এক নিগূঢ় অস্বস্তি ও আত্মধিক্কার অনুভব করিয়াছে। জেলের কর্মচারিবৃন্দ তাহাদের সমস্ত লৌহনিগড়বদ্ধ, যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে নরুর জীবনাদর্শ কিছু দিনের জন্য জেলের আবহাওয়াকে রূপান্তরিত করিয়া ইহার মধ্যে এক ঝলক অপার্থিব জ্যোতির সঞ্চার করিয়াছে। এই প্রভাব যে জীবনে স্থায়ী হয় না, মাধ্যাকর্ষণের নিম্নগামিতাকে যে কোন শক্তিই চিরতরে প্রতিরোধ করিতে পারে না, ইহাই মানব-জীবনের উপর বিধাতার নিষ্ঠুরতম অভিশাপ।

'আগুন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)—নরুর পূর্বস্মৃতির মধ্য দিয়া চন্দ্রনাথ ও হীরু নামক তাহার দুই সহপাঠীর সহিত সম্পর্কের বর্ণনা। চন্দ্রনাথ দৃপ্ত তেজস্বিতায় পূর্ণ, স্বাধীনচেতা; হীরু বড়লোকের ছেলে, খেয়ালী, ব্যসনপ্রিয়। উভয়েই সংসার-বিষয়ে উদাসীন ও প্রথানুগত্যের বিরোধী। চন্দ্রনাথ কল-কারখানার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি করিতে চায়; হীরু সৌন্দর্যপিয়াসী। চন্দ্রনাথ পরুষ ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক, হীরু কোমল রমণীয়তার আধার। উভয়েরই জীবন-রহস্য দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ মানদণ্ডের সাহায্যে অনধিগম্য। চন্দ্রনাথের প্রখর, অস্থিরমতি ব্যক্তিত্বের পাশে তাহার পাঞ্জাবী স্ত্রী মীরা ম্লান, শীর্ণ ও সংকুচিত; তাহার প্রবল আত্মপ্রচার মীরার ব্যক্তিত্ব ও সহজ স্ফূর্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ফলে মীরা, একদিনের অতর্কিত, অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের পর, পাগল হইয়া গিয়াছে। হীরুর খেয়ালী উচ্ছৃঙ্খলতা যাযাবরীর মধ্যে মত্ত, ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ ও মীরার প্রেমের অসম গতি ও হীরুর প্রতি যাযাবরীর মুগ্ধ আকর্ষণ—উভয়ই সুচিত্রিত; তবে দ্বিতীয়টির মধ্যে একটু উদ্ভট আতিশয্য আছে।

মানভূমের আরণ্য প্রকৃতি ও যন্ত্রের বিরাট দৈত্যশক্তি-বর্ণনায় লেখক উচ্চাঙ্গের লিপি-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই উভয়বিধ প্রেমের চিত্রণে ও ইহাদের প্রাকৃতিক পটভূমিকা-বিন্যাসে লেখকের মিতভাষিতা ও সংযম সুপরিস্ফুট। তারাশঙ্কর বুদ্ধ-অচিন্ত্যের ন্যায় কাব্য-প্লাবনে গা ভাসাইয়া দেন নাই। উচ্ছল গিরিনির্ঝরের পাশে মীরার চন্দ্রালোকনৃত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এ আনন্দের চন্দ্রকলানৃত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; কিন্তু তারাশঙ্করের চিত্রে মানিকবাবুর উদ্ভট, অবাস্তব সাংকেতিকতার স্পর্শ নাই—ইহা মীরার চরিত্রকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাহার অভ্যস্ত আবেগ-নিরোধের প্রতিক্রিয়ার সুসংগত অভিব্যক্তি। প্রেমকাহিনীতে গভীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ নাই, কিন্তু ইহাদের মৃদু, দীপ্তির আতিশয্যহীন স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যময় সার্থক আবেষ্টনরচনা লেখকের শক্তির সুস্থ পরিমিতি-বোধের নির্দেশক। এই উপন্যাসে লেখকের ক্রমোন্নতি সূচিত হইয়াছে।

'কবি' (মার্চ, ১৯৪২) তারাশঙ্করের আর একটি মনোরম সৃষ্টি। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরসতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল-সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ। গ্রন্থে এইরূপ একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্বশক্তিস্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকার কবির মত, স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী—জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তাহার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে, গীতি-গুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। তাহার

মনের এই রুক্ত, অবাধ সংবেদনশীলতা ও উদাস, উদার নির্লিপ্ততা তাহাকে প্রকৃত কবির সগোত্রীয় করিয়াছে। এই কবিত্ববিকাশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তেজনাময় সুন্দরে-কুৎসিতে মিশ্রিত প্রতিবেশ ইহার সূতিকাগৃহ, তাহার চমৎকার ছবি দেওয়া হইয়াছে। অশিক্ষিত, ইতর শ্রোতৃবৃন্দের অশ্লীল রুচি ও যৌনলালসামিশ্র ভক্তি কবিয়ালদের কাব্যানুশীলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা; এই বিকৃত ছাঁচেই তাহাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি। ঝুমুরের দলের যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা যেমনি বাস্তব তেমনি চিত্তাকর্ষক; ইহার বীভৎস কদাচারের মধ্যে সত্যিকার শিল্পানুরাগ ও খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শবাদ আছে। বসন, ললিতা, নির্মলা, মাসী ও পুরুষ-শিল্পীরা মিলিয়া যে পরিবার গড়িয়াছে, যে যাযাবর জীবনযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণিকতা ও নির্মম স্বার্থপরতার সহিত কতক পরিমাণে বন্ধনহীনতার আনন্দ ও স্নেহ-মায়া-সমবেদনা মিশ্রিত হইয়াছে। বসন্তের চরিত্রে তীক্ষ্ণ, হিংস্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম, বেপরোয়া জীবনোপভোগস্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা উপলব্ধির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। তাহাকে রাইকমলের মত অসম্ভব রকম আদর্শায়িত করিবার চেষ্টা নাই; গণিকাবৃত্তির পঙ্কে এইরূপ মলিন ও কীটদষ্ট পঙ্কজই ফুটিয়া থাকে। এই উপন্যাসে লেখক বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রেমের বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করিয়াছেন। ঠাকুরঝি ও নিতাই-এর মধ্যে সম্বন্ধটি একটি মধুর, অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগের রহস্যমণ্ডিত; প্রেমিকের কল্পনায় তাহার চলমান মূর্তিটি যে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের রূপক-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাই এই সম্বন্ধের কাব্যমাধুর্যের দ্যোতক। বসন্তের ভালবাসায় তীক্ষ্ণতর স্বাদবৈচিত্র্য অনুভূত হয়। নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয়কুণ্ঠিত আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্রগৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।

(৪)

✓ 'ধাত্রীদেবতা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯), 'কালিন্দী' (আগষ্ট, ১৯৪০), 'গণদেবতা' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী ১৯৪৪)—তারাশঙ্করের ক্রমপরিণতির আর একটা উচ্চতর পর্যায় সূচিত করে। এই উপন্যাসগুলিতে রাঢ়ের জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিভিন্ন স্তর চমৎকারভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম দুইখানিতে মধ্যযুগের আদর্শে লালিত জমিদার-গোষ্ঠীর জীবনে আধুনিক প্রভাবের বিক্ষোভ ও শেষ দুটিতে রাঢ়ের একটি জনপদে সমগ্র প্রজাসাধারণের সংসার-যাত্রায় নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভবই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। পূর্ববর্তী উপন্যাসের সহিত তুলনায় এগুলিকে বিষয়গৌরব, গঠনসংহতি, রসের গাঢ়তা ও বর্ণনা-ও বিশ্লেষণ-শক্তির দিক্ দিয়া উৎকর্ষ ও অগ্রগতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট। এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিকসংঘে প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার অধিকার সুদৃঢ় হইয়াছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় জমিদারের ছেলে শিবনাথের শৈশব হইতে কৈশোর ও যৌবন পর্যন্ত পরিণতির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাল্যে যে দুঃসাহসিকতা তাহাকে যুদ্ধাভিনয় ও নেকড়ের বাচ্চা ধরিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, কৈশোরে তাহাই তাহাকে মহামারীর প্রতিষেধক প্রচেষ্টায় ও যৌবনে সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রেরণা দিয়াছে। সুতরাং তাহার চরিত্রে একটা জীবনব্যাপী অখণ্ড আদর্শের ঐক্য অনুভব করা যায়। লেখক তাহার জীবনে দুই বিরোধী প্রভাবের সংঘর্ষ দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার পিসীমা

তাহাকে সনাতন আভিজাত্যগৌরব, জমিদারের পুরুষপরম্পরাগত নেতৃত্বসংস্কারের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাহার মাতা তাহার মনে স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার বীজ অঙ্কুরিত করিতে চাহিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত শিবনাথের নিজ ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয় নাই, ততদিন প্রখরব্যক্তিত্বসম্পন্না, অভিমানপ্রবণা পিসীমার প্রভাবই তাহার শান্ত, আত্মনিরোধশীল মাতার প্রভাবের উপর জয়ী হইয়াছে। তাহার বাল্যবিবাহ ও জমিদারী আদব-কায়দার দীক্ষা পিসীমার প্রভাবের ফল; তাহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতাযাত্রায় একবার মাত্র তাহার মাতার ইচ্ছা কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্য-গৌরবের খোলস সম্পূর্ণভাবে শিবনাথের মন হইতে খসিয়া গিয়াছে—পিসীমার শিক্ষাপ্রসূত দৃপ্ত মর্যাদাবোধ মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশপ্রীতি ও জনসেবার অভিনব পথ অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাতার আদর্শ-ই শিবনাথের চরিত্রে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথের উপর এই দুই বিপরীতমুখী, অথচ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-স্ফুরণের পক্ষে সমভাবে উপযোগী, প্রভাবের ফল সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

কিন্তু নায়কের জীবনে কেবল বাহিরের বিক্ষোভ নহে, অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিয়াছে তাহার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যবর্তিতায় এবং ইহাই শিবনাথের চরিত্রকে এত সজীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কিশোরী পত্নী গৌরীর ধনগর্ব, বিষাক্ত সন্দেহপরায়ণতা ও নিঃস্নেহ কাঠিন্য ও তাহার শ্বশুর পরিবারের বিদ্রূপ-মিশান অবজ্ঞা তাহাকে রাজনৈতিক আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপযুক্ত প্রচণ্ড গতিবেগ যোগাইয়াছে। শিবনাথের শেষ আত্মোৎসর্গ গৌরীর মনের সুপ্ত মহত্ব, গভীর হৃদয়াবেগ ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমকে জাগাইয়াছে। কারাবরোধের মধ্যে গৌরীর ক্ষণিক অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বামী-সম্ভাষণ তাহাদের ভবিষ্যৎ মিলনের ভূমিকা রচনা করিয়াছে, ইহা অনুভব করা যায়, কিন্তু গৌরীর এই অতর্কিত পরিবর্তন-কাহিনী আমাদের অবিশ্বাসকে নিঃশেষে উন্মূলিত করিতে পারে না।

শিবনাথের জীবনের সন্ধিস্থলগুলিতে কয়েকটি পরম অনুভূতি নূতন পরিণতির সূচনা করিয়াছে। প্রথম মহামারীর নিদারুণ অগ্নিস্পর্শ ও মিথ্যা কলঙ্কের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাকে কল্পনাপ্রবণ কৈশোর হইতে দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কলিকাতায় আগমন ও সুশীল-পূর্ণের সাহচর্য তাহার সম্মুখে বিভীষিকাময় বিপ্লববাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার জ্যোৎস্না ও ছায়াতে মেশানো বন্যপথ বাহিয়া ভূতপূর্ব বিপ্লবপন্থীর আশ্রমে গমন ও তাহার প্রসন্ন চিত্তে, ক্ষমাস্নিগ্ধ ঔদার্যের সহিত মৃত্যুবরণ শিবনাথের জীবনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে ও তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়াছে। মাতৃবিয়োগের রাত্রিতে তাহার বৈরাগ্যোদ্ভাসিত চিত্তে জীবন-মৃত্যুর অসীম রহস্যের স্বরূপ-উপলব্ধি তাহার আর একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উদার অনাসক্তি ও অতন্দ্র সাধনা যেন এই অনুভূতির সুরে বাঁধা। সর্বশেষে ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভে প্রদোষান্ধকারের রহস্য-ঘেরা অস্পষ্টতার মধ্যে সুশীলের সহিত তাহার দীর্ঘকাল পরে মিলন আবার তাহার শান্ত পল্লী-সংগঠন-প্রচেষ্টার মধ্যে রণোন্মাদের দুঃসহ আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে—সে তাহার অখ্যাত, নিরাপদ, উত্তেজনাহীন কর্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মুহূর্তগুলির প্রভাব

যে ঔপন্যাসিক পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নয়; এই বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি শিবনাথের জীবনে কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমরা ইঙ্গিতে-আভাসে বুঝি যে, এই অনুভূতি-সমষ্টিই শিবনাথের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে পিসীমা তাঁহার উগ্র মর্যাদাবোধ, প্রখর তেজস্বিতা ও মুহুর্মুহুঃ-উত্তেজিত অভিমানপ্রবণতা লইয়া খুব জীবন্ত হইয়াছেন। বধূ গৌরীর সহিত মনোমালিন্যের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই—তাঁহার কর্কশ শাসনের নীচে সত্যিকারের স্নেহশীল হিতকামনার পরিচয় মিলে না। গৌরীর প্রত্যাগমনের পরদিনই কাশীযাত্রা তাঁহার উৎকট অসহিষ্ণুতার আর এক নিদর্শন। শিবনাথের মাতার সহিত তাঁহার মতভেদ যখনই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন নিছক জিদ ও অভিমানের জোরেই পিসীমার জয় হইয়াছে। কাশীবাসের ফলে পিসীমা যে শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার আদর্শের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা ঠিক স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ঠেকে না। বরং শিবনাথের সান্নিধ্যে, তাহার কার্যাবলীর সস্নেহ বিচারে ও তাৎপর্য-গ্রহণে এই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ছিল। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে সর্ববিরোধ-সমন্বয় ঘটাইবার প্রলোভন সাধারণতঃ লেখককে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া আদর্শলোকের কাল্পনিক সুষমার প্রতি লোলুপ করিয়া তোলে; পিসীমার মতপরিবর্তন যেন সেই আদর্শ-লোলুপতার একটা দৃষ্টান্ত। জ্যোতির্ময়ী প্রখরতরা ননদিনীর দ্বারা অনেকটা আচ্ছাদিত হইয়াও নিজ স্বাধীন মতবাদ শান্ত দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অতর্কিত মৃত্যু উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার সক্রিয়তার পরিধি অযথা সংকুচিত করিয়াছে। মাষ্টার রামরতন বাবু, সন্ন্যাসী গোঁসাই-বাবা, ঝি, পাচিকা, প্রভৃতি সমস্ত গৌণ চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নায়েব রাখাল সিংহ তাহার সম্পদে-বিপদে অপরিবর্তিত বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি লইয়া জমিদারী-প্রথার একটা প্রশংসনীয় পরিণতির প্রতীক। ডোম বৌ ও দুর্ভিক্ষপীড়িতা, রোগজীর্ণ স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য চৌর্যবৃত্তিপরায়ণা ভিখারিণী স্ত্রীলোক—এই দুইজন, নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যেও অপ্রত্যাশিত মহত্ত্বের বিকাশ ফুট'ইয়া তুলিবার যে ক্ষমতা লেখকের আছে, তাহার চমৎকার নিদর্শন।

শুধু চরিত্রসৃষ্টি ও জীবনের মধ্যে মহান্, গৌরবময় ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত ফুটাইয়া তোলার মধ্যেই তারাশঙ্করের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। রোগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনওরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে পল্লীজীবনে যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহার ভারসাম্য যে সাংঘাতিকভাবে বিচলিত হইয়া উঠে তাহার চমৎকার বর্ণনার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মিলে। এই বর্ণনাতে ভাবাবেগপূর্ণ তথ্যবিবৃতির চারিদিকে এক ভয়াবহ ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতর পরিমণ্ডল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলেরার আক্রমণে গ্রামবাসীদের ত্রস্ত, অসহায় ভাব, ইতর শ্রেণীর মধ্যে, পারিবারিক বন্ধন-ছেদন, সনাতন ধর্মসংস্কারের নিকট ব্যাকুল, অন্ধ আত্মসমর্পণ, উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে নানা অর্ধ-অবাস্তব বিভীষিকার ছায়ামূর্তি-পরিগ্রহ—এই সমস্ত মিলিয়া এক ভীতিশিহরণস্পন্দিত, শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যারাত্রে রক্ষাকালী পূজার বর্ণনায়, অনাবৃষ্টিতে শুষ্যমান শস্যক্ষেত্রের সোঁ সোঁ ধ্বনিতে এক অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির ভীষণ আভাস ছায়াপাত করিয়াছে। সর্বত্রই

উপন্যাসটি আদর্শপ্রবণতার আতিশয্য সত্ত্বেও—বা উহারই জন্য—করুণ-গভীর আবেদনে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

পরবর্তী উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের। 'ধাত্রীদেবতা'-তে জমিদার-গোষ্ঠীর প্রতিদিনের সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিতে খাজনা-অনাদায়ের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা আলোচিত হইয়াছে। 'কালিন্দী'তে জমিদারের সমস্যা জটিলতর। জাতিবিরোধ, প্রজাবিদ্রোহ, নবোদ্ভিন্ন চরের স্বত্ব লইয়া মামলা-মোকদ্দমা, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রবলতর ও অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির সহিত সংঘর্ষ; বিশেষতঃ, একটি ভাগ্যহত, রিক্তসম্পদ্ অভিজাত-পরিবারের উপর নির্মম দৈবাভিশাপ—এই সমস্ত জটিল সূত্র মিলিয়া উপন্যাসের বিষয়বস্তু বয়ন করিয়াছে। এই সৈন্য-সমাবেশে দুর্ভেদ্য রণস্থলে কোন চরিত্রই প্রধান সেনাপতির গর্বোন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে নাই। চরিত্রগৌরব ঘটনার প্রাধান্যে গৌণ হইয়াছে। ইন্দ্ররায় কিছুক্ষণের জন্য দৃঢ়হস্তে রথরশ্মি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তাহার ক্ষীণ নিয়ন্ত্রণশক্তিকে উপহাস করিয়া মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র এই ক্ষুরধার স্রোতে বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে। আর যাহারা গৌণ চরিত্র তাহারা নিয়তির উৎসমুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত কালিন্দীর এই বেগবান্ প্রবাহের তীরে দাঁড়াইয়া জটলা করিয়াছে, নদীগর্ভে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের জাল ফেলিয়াছে, কিন্তু ইহার গতির প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি—এক, মানুষ রামেশ্বর; ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি, কালিন্দীর চর। একজন ট্র্যাজেডির বীজ বপন করিয়া নিজেও অভিশপ্ত জীবন যাপন করিয়াছে ও নিজ সন্তান-সন্ততির উপর এই অভিশাপ সংক্রামিত করিবার হেতু হইয়াছে। আর নদীগর্ভ হইতে নিয়তির ইঙ্গিতে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কালিন্দীর চর বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া উপন্যাসের দুই প্রধান পরিবারের অদৃষ্টরথের চক্রাবর্তন-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে।

অবশ্য এই দুই দিক দিয়াই লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উপন্যাসের মধ্যে ঠিক সার্থক রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে পরিমাণ কল্পনাসমৃদ্ধি থাকিলে জড় প্রকৃতি-প্রতিবেশকে মানবীয় বিরোধের কেন্দ্রস্থলে সক্রিয় অংশভাক্‌রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, লেখক ততখানি বিদ্যুৎ-শক্তিপূর্ণ কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে সুনীতির ক্ষুব্ধ, অস্বস্তিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া প্রকৃতির এই দৈবপ্রভাব সম্বন্ধে একটা মজ্জাগত সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; লেখকের নিজ মন্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গীও চরের এই সাংঘাতিক প্রবণতার ইঙ্গিত বহন করে। ঋতু-ভেদে, দিবা-রাত্রির প্রহর-মুহূর্তভেদে, চরের বিচিত্র-পরিবর্তনশীল রূপের অন্তরালে যে একটা অগ্নিগর্ভ ক্রূরশক্তি অবিচলিত উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টায় তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন এইরূপ দাবী করা যায় না। মহীন্দ্রের পরিণামের জন্য চরের দায়িত্ব আছে, কিন্তু ইহা পরোক্ষ রকমের। রায় ও চক্রবর্তী-বংশের দীর্ঘকালের বিরোধ ইহা নূতন করিয়া জ্বালাইয়াছে; কিন্তু অহীন্দ্র-উমার বিবাহে এই বৈরানল শান্তিবারিপ্রক্ষেপে চিরনির্বাণ লাভ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অহীন্দ্রের যে দুঃখময় পরিস্থিতি ঘটিয়াছে, তাহার মূল চরের পলিমাটিতে না খুঁজিয়া কলিকাতার বৈপ্লবিক-শোণিত-সিক্ত, পাথর-বাঁধানো রাজপথেই অনুসন্ধেয়। অবশ্য গ্রামের চাষী প্রজার মধ্যে ইহা একটা লোলুপতার তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে

শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র দীপ্তিও জ্বালাইয়াছে কাহাকেও কাহাকেও প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের রসাতলে পাঠাইয়াছে। যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথ্যের বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহশীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে —চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জির লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্যপ্রকৃতি হারাইয়া যান্ত্রিক সভ্যতার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যন্ত্রোচিত নির্মমতার সহিত ইহার পূর্বতন প্রভুর সর্বনাশ-সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীর চর যে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে ইহার ভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব প্রধানতঃ অপ্রধান চরিত্রের উপরই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডির Egdon Heath-এর সহিত তুলনা করিলে কালিন্দীর চরের পরিকল্পনার আপেক্ষিক অপকর্ষ পরিষ্কার হইবে। হার্ডির উপন্যাসে ঊষর প্রান্তরের সহিত মানুষের একেবারে শতপাকে জড়ানো নাড়ীর সম্পর্ক রচিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি খেয়াল, সীমাহীন বিস্তৃতির উপর রৌদ্রছায়ার খেলা, গাম্ভীর্য-চাপল্যের প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল মুখভঙ্গী, ইহার বন্য প্রকৃতির চিরন্তন উদাসীনতা এক নিগূঢ় উপায়ে মানব-চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তরে সংক্রামিত হইয়াছে। কালিন্দীর চর উহার প্রতিবেশী মানব-জীবনকে দূর হইতে স্পর্শ করিয়াছে, ইহার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

রামেশ্বরের তরুণ যৌবনের গোপন পাপ উপন্যাসের নৈতিক ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। শূন্যগর্ভ সুড়ঙ্গের উপর নির্মিত জীবন-ব্যবস্থা বারে বারে ধসিয়া পড়িয়াছে। পিতার কলুষিত নিঃশ্বাস নিরপরাধ পুত্রদের জীবনে বিষ-বাষ্প ছড়াইয়াছে। মহীন্দ্রের নরঘাতী পিস্তলে যে বারুদ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা তাহার পিতৃ-অপরাধের ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সংগৃহীত। অহীন্দ্রের ক্ষেত্রেও সুখ-শান্তির প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জীবন যে তিক্ত ও বিকৃত হইয়া গেল তাহারও মূল কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে সংক্রামিত মনোবিকার; শুধু জমিদারী প্রথার শোষণ-ব্যবস্থার উপলব্ধি ও প্রজার অসহায় রিক্ততার প্রতি সহানুভূতি তাহাকে বৈপ্লবিকতার রক্তাক্ত পথে পরিচালিত করার যথেষ্ট কারণ নহে। পত্নীহন্তার ধমনী-প্রবাহিত উন্মত্ত শোণিতোচ্ছ্বাস উহার ব্যাধিগ্রস্ত স্পর্শে পুত্রদের সুস্থ, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিয়াছে —কোথাও বা অসংযত ক্রোধ, কোথাও বা আদর্শবাদের আতিশয্য সর্বনাশের উপলক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং রামেশ্বরই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ চরিত্র—সে তাহার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও অদৃষ্ট-পরিণতির উপর তীব্রতম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কিন্তু লেখকের মনোগত উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উপন্যাসের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে নাই। রামেশ্বরের পঁচিশ বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত পত্নীহত্যা উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায় নাই। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান আর্টের সেতু বন্ধনে বিলুপ্ত হয় নাই। পরবর্তী শোচনীয় পরিণতিকে এই অস্বাভাবিক নৃশংসতার অপ্রতি-বিধেয় ফলরূপে আমরা অনুভব করি না। তাহা ছাড়া পত্নীহত্যার ব্যাপারটাও ঠিক সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ঠেকে না। রামেশ্বরের কাব্যানুরাগ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত এই সাংঘাতিক উপাদান কি করিয়া মিশিল তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হয় নাই। হয়ত জীবনে এরূপ অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়া থাকে—লেখকের সম্মুখে হয়ত সুদূর অতীতের কোন

জনপ্রবাদ সমর্থক প্রমাণরূপে উপস্থিত ছিল। কিন্তু লেখকের বিশ্লেষণে এই উদ্ভট রাসায়নিক সংযোগের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই—তিনি হয়ত শোনা কথা পাঠককে শোনাইয়াছেন, নূতন সৃষ্টি করেন নাই। ব্যক্তিগত চরিত্র হিসাবে রামেশ্বরের পরিকল্পনা প্রশংসনীয়—তাহার রোগজীর্ণ, অসুস্থ-কল্পনাপ্রবণ মনোবিকারের অভিব্যক্তি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপর যে সাংকেতিক গৌরব আরোপিত হইয়াছে, সেই গুরুভার বহনের যোগ্যতা তাহার নাই। কেবল একবার মাত্র, কলওয়ালা সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া তাহার স্তিমিত, ধূমাচ্ছন্ন চিত্ত উত্তেজনার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষণিকের দীপ্তি অবসাদের ভস্মাবশেষে বিলীন হইয়াছে। রামেশ্বর উপন্যাস-মধ্যে অর্ধাধিগম্য প্রহেলিকাই রহিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্ররায় প্রাচীন জমিদারী মনোবৃত্তির যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু আধুনিকতার প্রবলস্রোতে সে ঠিক হালে পানি পায় নাই—তাহার পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ও রণনীতি এই পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যর্থ হইয়াছে। নেতৃত্বের দণ্ড তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে—তাহার মনের প্রশংসনীয় বৃত্তিগুলিও উপযুক্ত পরীক্ষার অভাবে ক্ষুব্ধ, নিঃ . অভিমানে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ বেদনা-বিদ্ধ কৌতূহলের উদ্রেক করে। হয় সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অতিকায় প্রাণীর ন্যায় বর্তমান যুগের প্রতিকূল প্রতিবেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, না হয় তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা শূলপাণির ন্যায় আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার দাসত্ব স্বীকার করিবে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত রায়ের কাশীবাস-সংকল্প দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপনের ন্যায় একসঙ্গে কৌতুকাবহ ও করুণ। মজুমদার নায়েব—জমিদার-নারায়ণের হাতের সুদর্শন চক্র—প্রভুর ন্যায়ই মলিন ও হৃতগৌরব। সেও তাহার কূটবুদ্ধি যন্ত্রশক্তির সেবায় নিয়োগ করিয়াছে, কেননা সে বুঝিয়াছে যে, অতীত যাহারই হউক না কেন ভবিষ্যৎ এই নূতন আবির্ভাবের। 'ধাত্রীদেবতা'র রাখাল সিংহের সহিত তুলনায় সে অধিকতর বাস্তব ও সুবিধাবাদী। অচিন্ত্যবাবু তাহার কাল্পনিক ব্যবসায়বুদ্ধি লইয়া মোসাহেবের রূপেই জমিদারগোষ্ঠীচক্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—তবে সে নূতন আগন্তুক বলিয়া এই ব্যবস্থার সহিত অনেকটা শিথিলভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিকে যেমন তাহার জমিদারের প্রতি নিবিড় আনুগত্য নাই, তেমনি অপরদিকে তাহার তোষামোদবৃত্তিও অস্থিমজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়ায় নাই। সে জমিদারী গুড়ে নূতন-আকৃষ্ট মক্ষিকা—মিষ্ট নিঃশেষ হইতেই পলায়নের জন্য ডানা মেলিয়াছে।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে ভদ্র মহিলাগুলি প্রায় এক ছাঁচের—বিশেষত্ববর্জিত। হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি আদর্শ-সহোদরা—তাঁহাদের যাহা কিছু পার্থক্য তাহা অবস্থাভেদ হইতে উৎপন্ন। সুনীতিকে বেশি সহিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার সহিষ্ণুতার অধিক প্রসার হইয়াছে। হেমাঙ্গিনীর অন্তরে প্রিয়জনের যে অমঙ্গলাশঙ্কা ছায়ার ন্যায় সঞ্চারমান তাহাই সুনীতির দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তবে হেমাঙ্গিনী জীবনে এক উদার, আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ অতীতের সুখস্মৃতিশুকতারার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া আছে—সংস্কৃত-কাব্যের সুরভিস্পৃষ্ট, কাদম্বরীর সৌজন্যপরিপ্লুত প্রিয়সম্ভাষণরীতি, হাস্যপরিহাসসরস কুটুম্বপরিচর্যার প্রীতিমাধুর্য তাহার মনের এক কোণে লগ্ন থাকিয়া উহার নবীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সুনীতি

এই কাব্যসুষমামণ্ডিত আনন্দালোকে প্রবেশাধিকার পায় নাই—হেমাঙ্গিনীর সহিত ইহাও তাহার একটা গুরুতর প্রভেদ। উমার কিশোর মন পূর্ণ পরিণতির অবসর পায় নাই—তাহার অন্তরে দাম্পত্য প্রেমের যে অতৃপ্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা অপরিস্ফুট অবস্থাতেই আছে। শ্বশুরের সঙ্গে তাহার যে কাব্যাস্বাদমূলক সৌহৃদ্য গড়িয়া উঠিতেছিল স্বামীর উপর বজ্রপাতের ফলে তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল তাহাও অনিশ্চিত রহিয়া গেল। সাঁওতাল রমণী সারী তাহার কৃত্রিমবন্ধনহীন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও পরবর্তী কলঙ্ক-লাঞ্ছনা লইয়া স্বকীয়তা অর্জন করিয়াছে।

অহীন্দ্র ও অমলের সহৃদয় বন্ধুত্ব তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচয়কে ছাপাইয়াছে। অহীন্দ্র শিবনাথের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় নাই। সাঁওতালদের প্রদত্ত আখ্যা তাহার বাহিরের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর আলোকপাত করিয়াছে, তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপর নহে। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা তাহার ঠাকুরদাদার সহিত তাহার চরিত্রগত মিল নিতান্ত আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার পূর্বতন জীবনে এই পরিণতির কোন ইঙ্গিত নাই। শিবনাথের বৈপ্লবিকতা তাহার চরিত্র ও সংসর্গের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে—অহীন্দ্রের ক্ষেত্রে ইহা যেন লেখকের একটা বদ্ধমূল মানস প্রবণতার নিরর্থক অনুবর্তন। চরিত্রস্ফুরণের দিক্ দিয়া শিবনাথের সমকক্ষ কোন সৃষ্টি 'কালিন্দী'তে মিলে না।

সাঁওতালগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সমাজবন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্রসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উদ্ভট কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা-ও-বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দেয়, কিন্তু উপন্যাসের সহিত ইহার সংস্রব নিতান্ত শিথিল। রাত্রের অন্ধকারে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অপসরণশীল সাঁওতালসংঘ চরের আশ্রয়ের নির্ভরযোগ্যতার অভাব সপ্রমাণ করে, কিন্তু উপন্যাসের সম্পর্ক-জটিলতার মধ্যে ইহাদের কোন স্থান নাই। একমাত্র সারী উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত একটু বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাহিনীও মোটের উপর অবান্তর। উপন্যাসে যে অনেক অনাবশ্যক লোকের ভিড় ও কতক অসংলগ্ন ঘটনার যদৃচ্ছ সমাবেশ হইয়াছে তাহা ইহার নাটকীয় রূপে আরও উগ্রভাবে প্রকট। উপন্যাসের গঠন-শিথিলতার মধ্যে যাহা চোখ এড়াইয়া যায়, নাটকের কঠোরতর সংহতির মধ্যে তাহা বিচারবুদ্ধিকে পীড়িত করে।

(৫)

'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে পল্লীজীবনের আর একটা সমস্যাসংকুল দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে আধুনিক অবস্থা-পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে; গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা, সমাজশৃঙ্খলারক্ষার প্রয়াস বর্তমান যুগের অনুপযোগী প্রতিবেশে কিরূপে প্রতিহত হইয়াছে তাহাই উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়। উপন্যাসের চরিত্রসমূহ প্রায় সমান অবস্থার চাষী গৃহস্থ; তাহাদের মধ্যে সমাজনেতার উচ্চ আসনে সমাসীন কোন অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি নাই; কাজেই এই গ্রাম্যজীবনে গণতান্ত্রিক সাম্যের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। এই সমাজে চারিজন ব্যক্তি সাধারণ সমতার মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছেন। (১) দ্বারিক চৌধুরী জমিদারী-

চ্যুত হইয়া সাধারণ চাষীর পর্যায়ে নামিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্নিগ্ধ ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তিনি অর্থগৌরব হারাইয়াও তাঁহার চরিত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। (২) ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল—চাষী হইতে জমিদারে উন্নীত, উচ্চ ও নীচ প্রবৃত্তির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শ্রীহরির সদ্য-অর্জিত সম্পদ্ তাহাকে এখনও আভিজাত্যের কালজয়ী মর্যাদা অর্পণ করে নাই। বুনিয়াদী ঘরের প্রতিষ্ঠালাভই তাহার জীবনে সর্বপ্রধান কাম্য; ইহার প্রতি লুব্ধতাই তাহাকে জনহিতকর কার্যে রত করাইয়াছে। (৩) দেবুপণ্ডিত অতর্কিতভাবে এক অত্যুচ্চ আদর্শলোকে উন্নীত পল্লীগ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা ও মনোভাবের অনধিগম্য দূরত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পরিকল্পনায় আদর্শবাদের আতিশয্য গ্রাম্যজীবনের গতিধারার ছন্দোপতন ঘটাইয়াছে। অশিক্ষিত জনসাধারণ ঘেঁটুর গানে তাহার প্রশস্তিরচনার দ্বারা তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। দেবুর স্ত্রী-পুত্রকে মৃত্যুকবলিত করিয়া লেখক তাহার চরিত্রে এক লোকাতীত, পৌরাণিক মহিমা অর্পণ করিয়াছেন। (৪) সর্বশেষে মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন তাঁহার পুণ্যভাস্বর ব্রাহ্মণ্য মহিমা লইয়া এই বিরোধ-তিক্ত, নীচ স্বার্থপরতা ও ইতর লোলুপতার ধূলিজালসমাচ্ছন্ন গ্রাম্যসমাজের উপর জ্যোতির্ময়, প্রসন্ন দেবাশীর্বাদের প্রতীকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপন্যাসমধ্যে তাঁহার বিশেষ কোন কার্য নাই। পূর্বযুগের সুনিয়ন্ত্রিত, কর্তব্য ও অধিকারের ভারসাম্যে দৃঢ়ীভূত, কল্যাণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার আশ্রয়চ্ছায়াস্নিগ্ধ, গ্রাম্যসমাজসৌধের শীর্ষদেশে বিন্যস্ত রত্নময় মঙ্গলকলসের ন্যায় তিনি অপার্থিব জ্যোতিতে দেদীপ্যমান। সমাজের বন্ধনশক্তি যখন শিথিল হইয়া গেল, যখন ইহার বিভিন্ন অংশ সংহতিভ্রষ্ট হইয়া খণ্ডীকৃত হইল তখন সমাজচূড়ার এই গৌরব, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। উপন্যাসমধ্যে দেবুর ভক্তিপ্রণত শিরে ন্যায়রত্নের আশীর্বাদ-বর্ষণ সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত—সমাজজীবনের চরম সার্থকতার ইঙ্গিত ইহাতে নিহিত।

এই নির্জীব, নিশ্চেষ্ট গ্রাম্যজীবনের প্রাণশক্তির একমাত্র পরিচয় ঈর্ষ্যাবিক্ষুব্ধ দলাদলিতে। দলাদলির সূত্রপাত কামার, নাপিত, ছুতার প্রভৃতি শিল্পীদের কাজ-ও-পারিশ্রমিক সম্বন্ধীয় সনাতনব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডবিধানচেষ্টাতে। মুমূর্ষু, অক্ষম সমাজ দীর্ঘ অবহেলার পর হঠাৎ শৃঙ্খলারক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠতা সমাজশাসনের ভিত্তি ছিল তাহা বহু পূর্বেই ধসিয়া পড়িয়াছে। কল-কারখানার সস্তা দ্রব্যজাত গ্রামশিল্পীর আয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে কর্তব্যপালনে শিথিল করিয়াছে। সুতরাং গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিরুদ্ধে তাহার খুব যুক্তিপূর্ণ উত্তর আছে। ইতিমধ্যে গ্রাম্যসমাজে ধনের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া উহার শাসনের নৈতিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যে সমাজ শ্রীহরিকে শাসন করিতে পারে না, অনিরুদ্ধ তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। এইরূপে বহু শতাব্দীর যত্নরচিত বিধি-বিধান, বাহিরের অভিভব, নিজ অন্তর্জীর্ণতা ও ঐশ্বর্যের নিকট নতি-স্বীকার এই ত্রিবিধ অস্ত্রে খণ্ডিত হইয়া নিজ কল্যাণশক্তি হারাইয়াছে। সমাজশাসনে দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া ব্যক্তিগত অত্যাচার ও প্রতিশোধ-স্পৃহার অরাজকতা আবার মাথা তুলিয়াছে। এই চমৎকারভাবে অঙ্কিত প্রতিবেশের মধ্যেই আধুনিক যুগে পল্লীর জীবনযাত্রা অভিনীত হইতেছে।

বিরোধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় কয়েকটি লোক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অনিরুদ্ধ কামার। তাহার মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুকূল পবন-প্রবাহে সর্বগ্রাসী অনলশিখায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। এই আগুনে সে তাহার সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য, দাম্পত্য সুখ-শান্তি, সামাজিকতা, আত্মমর্যাদাজ্ঞান সমস্ত আহুতি দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে একটা দুরন্ত, উন্মাদ ধ্বংসশক্তির বাহনে পরিণত হইয়াছে। স্বেচ্ছায় কারাবরণ তাহার নিঃশেষিত-প্রায় মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নস্বরূপ তাহার ভবিষ্যৎ উদ্ধারের আশ্বাস বহন করে। দ্বিতীয়, শ্রীহরিপাল। তাহার ইতর, লম্পট, প্রভুত্বগর্বোদ্ধত চরিত্রে অতর্কিতভাবে মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নৈতিক দায়িত্ববোধ স্ফুরিত হইয়াছে। তাহার শাসন সমাজের কল্যাণার্থী নেতৃত্ব-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সময় সময় এই সদ্যোজাগ্রত নীতিজ্ঞানকে অভিভূত করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ আদিম বর্বরতা অন্ধ রোষে গর্জন করিয়া উঠে; কিন্তু এই পাশবিক স্তরে অবতরণ তাহার বাস্তবতাকে বাড়াইয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তি, দুর্গা মুচিনী। তাহার প্রকাশ্য স্বৈরিণীবৃত্তির মধ্য দিয়া অনেক-গুলি সদ্‌গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সপ্রতিভতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, হৃদয়ের উদারতা, প্রতিবেশীর দুঃখে-কষ্টে সহানুভূতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সৎসাহস তাহাকে নীচকুল ও হেয় বৃত্তির গ্লানি হইতে অনেক উর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। তাহার দাম্পত্য প্রেমের স্বাভাবিক প্রসার প্রতিরুদ্ধ হইবার ফলে তাহার দেহ-মনে নানা জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। দেহে মূর্ছারোগের ব্যাপ্তি ও মনে একপ্রকার নিষ্ক্রিয়, উদাস অসাড়তা তাহার ব্যাধির লক্ষণ। তাহার বিকারগ্রস্ত মনের বিচিত্রতম বিকাশ রাজবন্দী যতীনের প্রতি তাহার অদ্ভুত মাতৃভাবের স্ফুরণ। যতীনের সহিত বয়সের তারতম্য ও পরিচয়ের স্বল্পকালীনত্ব বিবেচনা করিলে এই ভাবের অকৃত্রিমতার প্রতি সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। লেখকের জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নবর্জনপ্রবণতার প্রমাণ এইখানে পাওয়া যায়—শুক্তি-গর্ভে মুক্তার জন্মের ন্যায় সন্তানস্নেহবুভুক্ষিতা পল্লীরমণীর হৃদয়ে এই তির্যক-সঞ্চারী বিচিত্র মমতার আবির্ভাব তিনি স্বতঃস্বীকৃতির মত ধরিয়া লইয়াছেন, ইহার বিকাশ ও পরিণতি দেখাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। একবার মাত্র যতীনের মুখ দিয়া এই সম্বন্ধের দুরধিগম্য বিস্ময়ের বিষয়ে তিনি সচেতনতা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও সক্রিয় না হইয়া পল্লীসমাজের জটিল সংঘাতের মধ্যে নিজ নিজ অপ্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে, উহার সম্মিলিত জীবনধারায় নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি মিশাইয়া দিয়াছে। রাজবন্দী যতীন, গ্রামের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও, গ্রামের অর্ধস্ফুট রাজনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক বিবেকবুদ্ধিকে স্পষ্টতর আত্ম-সচেতনতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

দেবুপণ্ডিত তাহার অতিউগ্র আদর্শবাদ লইয়া এই সমাজের সহিত খাপ খায় না ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাকে বাদ দিলে উপন্যাসের মধ্যে নায়কের অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী কেহ নাই। কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় স্বার্থসংঘাতে ক্ষুব্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত-রসাতলগামী পল্লীসমাজের চিত্র খুব বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে। দূর পূর্ব দিক্‌-চক্রবালে, দিগন্তবিস্তৃত কুয়াশার মধ্য দিয়া অরুণোদয়ের ঈষৎ আভাষ এই মৃত্যুপথযাত্রী সমাজের সম্মুখে

আশার ক্ষীণতম রশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রভাব সমাজ-জীবনে কতদিনে কার্যকরী হইয়া ইহার মরণোন্মুখতার প্রতিষেধক হইবে তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। ইতিমধ্যে গ্রাম তাহার ব্রত-পূজা-পার্বণ, তাহার কৃষিলক্ষ্মীর উদ্বোধনকারী উৎসবচক্র, তাহার অন্ধ ভক্তিসংস্কার ও ক্ষুদ্র, আত্মঘাতী কলহ লইয়া চিরাভ্যস্ত কক্ষপথের আবর্তনের মধ্যে অবিচলিত ধৈর্যে নবজীবনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

'পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) 'গণদেবতা'র শেষাংশ—'গণদেবতা'য় পল্লীসমাজের যে ধারাবাহিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হইয়াছে তাহারই অনুবর্তন। এই উপন্যাসে পল্লীজীবনের অভ্যস্ত কক্ষাবর্তন কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের চাপে সংকটময় পরিণতির উগ্রতর আবেগ ও দ্রুততর গতিবেগ অর্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ, মুসলমান চাষীদের দৃঢ়তর ইচ্ছাশক্তি ও ঐক্যবোধ জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধি-প্রস্তাবের প্রতিরোধে ব্যূহবদ্ধ হইয়া এমন একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সহিত তুলনায় হিন্দুদের তুচ্ছ সামাজিক আত্মকলহ ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। এই মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল হিন্দুদের সহিত প্রায় অভিন্ন-রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষি-জীবনের প্রয়োজনসাম্যে, একত্রাবস্থানে ও একইরূপ সমস্যার নিষ্পেষণে হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার মৌলিক প্রভেদটুকু পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ষার মেঘকে আবাহন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান কৃষক প্রায় একই গান গায়; বঙ্গমাতার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রতিবেশ তাহাদের মনে একইরূপ সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ করে। মুসলমানের উৎসব ও পূজা-পার্বণগুলি অবশ্য হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্র—এগুলি আরবের ঊষর মরুভূমি হইতে বাঙলার আর্দ্র-কোমল আবহাওয়ায় স্থানান্তরিত হইয়া সব সময় প্রতিবেশের সহিত ঠিক খাপ খায় নাই। ঘরে যখন শস্যভাণ্ডার নিঃশেষিত তখন উৎসবের কালনির্দেশ মুসলমান চাষীর মনে আনন্দ অপেক্ষা অস্বস্তিই বেশি জাগায়। তারাশঙ্কর মুসলমান সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন—তথাপি মনে হয় যে, তিনি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই এগুলিকে লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুসলমান ধর্মজীবন, ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও মহাপুরুষের প্রভাব, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যায়িকা ও লৌকিক কাহিনী—লেখকের জ্ঞানপরিধি ও অঙ্কনশক্তির বহির্ভূত। ইরসাদ দেবুরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, দৌলতশেখ শ্রীহরি ঘোষ ও কঙ্কণার জমিদারবাবুদের স্বগোত্রীয়; কেবল রহমচাচা, অনিরুদ্ধের মত অতিরিক্ত কোপনস্বভাব ও গোঁয়ার হইলেও, তীব্রতর ঝাঁজ ও উগ্রতর আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য তাহার মুসলমানী মেজাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। জমিদার-পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য সাময়িক আত্মগ্লানি, দেবুর প্রতি বিরুদ্ধতার মধ্যে স্নেহশীলতা ও ভাবপ্রবণতার আতিশয্য তাহার চরিত্রকে সজীব ও অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে।

করবৃদ্ধির সম্ভাবনায় পঞ্চগ্রামের কৃষকদের মধ্যে ধর্মঘট চালাইবার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরাট ঐক্যবোধের সূচনা হইয়াছে, গ্রামের স্তিমিত জীবনধারায় প্রাণশক্তির যে উচ্ছ্বসিত জোয়ার আসিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও আত্মকলহের জন্য, নৈতিক শক্তি ও অধ্যবসায়ের অভাবে, দারিদ্র্যের তাড়নায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ও জমিদারের ষড়যন্ত্র-কুশলতায় তাহা স্থায়ী হয় নাই। একজন আদর্শবাদী ছাড়া প্রায় সকলেই জমিদারের সঙ্গে আপস করিয়া দেবুর নেতৃত্বের অমর্যাদা

করিয়াছে। এই উৎসাহ ও অবসাদের ক্রমপর্যায়টি, আদর্শবাদের সহিত আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রাম্য জীবনের আরও কয়েকটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা মহাকাব্যোচিত প্রসার ও উদাত্ত, গৌরবময় বর্ণনাভঙ্গীর সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঘনান্ধকার নিশীথে ডাকাতির সংকেতধ্বনি সুপ্ত গ্রামগুলির ভিতর এক ভয়াবহ সম্ভাবনার রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ময়ূরাক্ষীর কূলপ্লাবী বন্যার ধ্বংসলীলা—ইহার ভীষণ পূর্বসূচনা ও প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এই আগন্তুক বিভীষিকার প্রতি সম্পন্ন ও নিঃস্ব গৃহস্থের বিভিন্ন মনোভাব, বিপন্ন গ্রামবাসীর করুণ অসহায়তা ও যুগযুগান্তরনির্দিষ্ট পন্থায় আত্মরক্ষার প্রয়াস, সর্বোপরি ইহার ফলে গ্রাম্যজীবনের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যঘটিত বিপর্যয়—এই সমস্ত দৃশ্য কি দৃঢ়, অকম্পিত রেখায়, কি বলিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায়, কি সংযত-গভীর ভাবাবেগের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর সহিত তারাশঙ্করের পল্লীজীবনচিত্রের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে পল্লীসমাজের একটি খণ্ডাংশ নির্বাচন করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ রমেশ ও রমার বিরোধ-তিক্ত, অথচ অস্বীকৃত প্রেমের ফল্গু-প্রবাহে স্নিগ্ধ সম্পর্কের পটভূমিকা-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; আর গৌণতঃ ইহা পল্লীজীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও হীন নৈতিক আদর্শের বাস্তব চিত্র। তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের মূল প্রবাহ অনুসরণ করিয়াছেন—ইহার উৎসাহ-অবসাদ, গৌরব-গ্লানি, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও মরণধর্মী জড়তা, নূতন ভাবের ও প্রয়োজনের সংঘাতে ও পুরাতন আদর্শের ভাঙ্গনে ইহার অসহায় কর্তব্যবিমূঢ়তা—এই সমস্তই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কেন্দ্রানুগ না হইয়া তাঁহার রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ঘটনার সরল অগ্রগতি কোন বিশেষ জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে পাক খায় নাই, কোন অতলস্পর্শ গভীরতার ইঙ্গিত বহন করে না; সূর্যকরোজ্জ্বল ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় পথ চলার মধ্যেই হৃদয়াবেগের ক্ষণিক দীপ্ত দাহ বিকিরণ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় তারাশঙ্করের রচনাতেও চরিত্রসৃষ্টি আখ্যায়িকার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত আছে; গল্পকে থামাইয়া মন্তব্য ও বিশ্লেষণের অতিপ্রাচুর্যকে তিনি কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই। সেইজন্য তাঁহার উপন্যাসে প্রেমের জটিল, ঘাত-প্রতিঘাতসংকুল স্বরূপ-উদ্ঘাটন প্রাধান্য পায় নাই। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আবেগের সামান্য ছোঁয়াচ, অসামান্য রক্ত-চাঞ্চল্যের ক্ষণিক অনুভূতি, ইহাই তাঁহার প্রেমসম্বন্ধে সচেতনতার নিদর্শন। সমাজচিত্রের ব্যাপক সমগ্রতা, সমাজনীতির সূক্ষ্ম, গভীর আলোচনা, চলমান ঘটনাপ্রবাহের সার্থক, ভাবব্যঞ্জনামূলক বর্ণনা, প্রেমের আপেক্ষিক অভাব—এই সমস্ত লক্ষণ তাঁহার রচনাকে উপন্যাস অপেক্ষা মহাকাব্যের সহিত নিকটতর সম্পর্কান্বিত করিয়াছে।

তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনার সহিত তুলনায় 'পঞ্চগ্রাম' সমধিক ঔপন্যাসিকগুণসম্পন্ন। ইহাতে আখ্যায়িকার মালভূমি হইতে বিশেষ কয়েকটি ঔপন্যাসিক মুহূর্ত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথের আদর্শ-বিরোধ একটা তীব্র ও সাংঘাতিক পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তথাপি এই কাহিনীতে কিছু মাত্রায় অতিনাটকীয়ত্ব অনুভূত হয়—এ সংঘর্ষ যেন রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে নয়

প্রস্তর-কঠিন যান্ত্রিক আদর্শের মৃঢ় ঘাত-প্রতিঘাত। বিশ্বনাথের সহিত জয়ার সম্পর্কের অস্পষ্টতা লেখকের প্রেমসম্বন্ধে উপেক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত। অভাবের তাড়নায় ভদ্রগৃহস্থ তিনকড়ির ডাকাতের দলে যোগদান রহস্তমণ্ডিত মানবাত্মার একটি চমকপ্রদ বিকাশ। তাহার সমস্ত ব্যর্থ মনুষ্যত্বের ক্ষোভ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল, জীবনব্যাপী প্রতিবাদ, কতকটা অভিমানে, কতকটা উপায়ান্তরের অভাবে এই হিংস্রতার অভিযানে ফাটিয়া পড়িয়াছে। পদ্মের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, গৃহিণীত্ব ও মাতৃত্বের অবরুদ্ধ কামনা, দীর্ঘদিনের প্রধূমিত ভস্মাবরণ ত্যাগ করিয়া এক শেফালিগন্ধবিধুর বর্ষারাত্রিতে প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে পদ্মের মানবিক পরিচয় তাহার সমস্ত দ্বিধাগ্রস্ত জড়তা ও অসুস্থ মনোবিকারের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়াছে। ক্রিস্টান জোসেফ নগেন্দ্র রায়ের স্ত্রীরূপে নিজ চিরপোষিত স্বপ্নকে সফল করার দৃঢ়সংকল্প সে নিজ নবলব্ধ শক্তির উৎস হইতে আহরণ করিয়াছে। এতদিনে যেন সে উপন্যাসের পাত্রী-হিসাবে নূতন জন্মলাভ করিয়াছে। দুর্গাও তাহার উন্নত বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ফলে ও দেবু ঘোষের সংসর্গ-প্রভাবে আত্মবিশুদ্ধির দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু এই উপন্যাসে যাহার পরিচয়-রহস্য সম্পূর্ণরূপে অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে সে উপন্যাস-দ্বয়ীর নায়ক দেবু ঘোষ। পূর্ববর্তী উপন্যাসে তাহার ব্যক্তিত্ব আদর্শলোকের জ্যোতিঃতে অনেকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। বর্তমান উপন্যাসে সে আদর্শবাদের উচ্চশিখর হইতে সাধারণ গ্রাম্যজীবনের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। গ্রাম্যসমাজের হীন অবিশ্বাস তাহার নেতৃত্বের শুভ্র নিষ্কামতায় কলঙ্কস্পর্শ ঘটাইয়াছে; পদ্ম ও দুর্গার সহিত তাহার সম্পর্কও প্রতিবেশীর কুৎসা-রটনায় গ্লানিকর হইয়াছে। এই প্রতিবেশ-প্রভাব তাহাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতির নিগূঢ় পরিচয় ধরা দিয়াছে বিলু ও খোকনের স্মৃতি-তন্ময়তার মধ্যে তাহার মুহুর্মুহুঃ আত্মবিস্মৃতিতে। এই সমস্ত রন্ধ্রপথে দেশপ্রেমিকের লৌহ-বর্মের নীচে স্পন্দনশীল মানবহৃদয় উঁকি মারিয়াছে। তাহার অনলস কর্মনিষ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে জোর-করিয়া-চাপা গার্হস্থ্য জীবনের স্মৃতি মুক্তি পাইয়া তাহার সমস্ত মনকে উদাস করিয়া দিয়াছে। শিউলিতলার আধ-আলো, আধ-অন্ধকারের মধ্যে একবার পদ্ম, আর একবার দুর্গাকে বিলু বলিয়া ভ্রম করিয়া সে নিজ অন্তঃরুদ্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে নিঃসারিত করিয়াছে। বিলু ও খোকনের জ্বালাময় স্মৃতি তাহাকে অনুশোচনায় পূর্ণ করিয়াছে ও গ্রামসেবাব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তীর্থভ্রমণে পাঠাইয়াছে। সর্বোপরি ময়ূরাক্ষীর বালুময় গর্ভে শীতসন্ধ্যার গোধূলিতে জঙ্গলের ভিতর বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্ররাশির প্রেতপদধ্বনি তাহার মনে বিলু ও খোকনের আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ক্রীড়ার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাকে এক দীর্ঘস্থায়ী অতীন্দ্রিয় অনু-ভূতির মোহাবিষ্ট করিয়াছে। এইখানে তারাশঙ্কর উপন্যাসোচিত উপায়ে তাঁহার নায়কের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশসেবকের পরিচয় বাহিরের পরিচয়; এই আত্মবিভোর মোহাবেশের মধ্যে নায়কের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তা ছাড়া তাহার মুহুর্মুহুঃ ভ্রান্তি ও অবসাদ, দ্বিধা ও চিত্তবিক্ষেপ, নূতন নূতন উপলব্ধি ও ভাবুকতাময় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাহাকে জীবন্ত সৃষ্টি হিসাবে *'পথের পাঁচালী'*র অপুর সহিত সমসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। স্বর্ণের সহিত গ্রন্থশেষে তাহার ভাব বিনিময় বোধ হয় উভয়ের মধ্যে এক নূতন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূচনা করে।

কিন্তু তারাশঙ্করের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সমগ্র সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রণে। 'গণদেবতা'তে সমাজবন্ধন কেমন করিয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সামাজিক দলাদলির ক্রূরতা ও দুর্নীতিতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজ যে কয়েকটি অসাধারণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে ইহার অন্তর্জীর্ণতা ও যুগধর্মের সহিত ব্যবধান আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ সংগঠনও অদূরদর্শিতা ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের অভাবের জন্য আধুনিক জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারিতেছে না। হিন্দুসমাজ ত ধীরে ধীরে অপ্রতিবিধেয় মরণের দিকে চলিয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেশত্যাগ সুদীর্ঘকাল হইতে সক্রিয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হাল ছাড়িয়া দেওয়ার দ্যোতক। যে বিশাল বটবৃক্ষ এতদিন পর্যন্ত সমাজকে স্নিগ্ধ ছায়াশ্রয়ে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার উন্মূলনে ইহাকে অভাব ও অসন্তোষের খররৌদ্রতাপ হইতে আচ্ছাদন করিবার আর কিছু রহিল না। এই বণিকধর্মী যুগে কুলদেবতা পর্যন্ত কেনা-বেচার সামগ্রীতে দাঁড়াইয়াছেন। অতীত আদর্শের পরিবর্তে আর কোন নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা এখনও সুদূর-পরাহত। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করিয়া ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করিয়া সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছে—কিন্তু এই নূতন মতবাদের মুখের বক্তৃতা হইতে সমাজের মর্মমূলে সঞ্চারিত হইতে অনেক দেরি। চাষী গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়া মজুরে পরিণত হইয়াছে—শ্রমজীবীরা চাষ ছাড়িয়া সহরস্থ কল-কারখানার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যখন কোন গণ-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, তখন এই মুমূর্ষু, জড়তাগ্রস্ত জনসাধারণ তাহাতে সাড়া দেয়, দেশের মরা গাঙ্গে আবার নূতন জোয়ার আসে। কিন্তু এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এইরূপে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত সমাজ প্রাণধারণের সমস্ত গ্লানি বহন করিয়া পথ চলিতেছে। এই পথ কোথায় লইয়া যাইবে - মৃত্যুর অতল-স্পর্শ গহ্বরে না নবজীবনের সিংহদ্বারপানে—তাহা অনিশ্চিত। উপন্যাসের শেষে দেবুর কণ্ঠে আশাবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধ্যানতন্ময় কল্পনার সম্মুখে, ভবিষ্যতের সার্থক, নিরাময় জীবনের উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কি কল্পনার মরীচিকা না অনাগত বাস্তবের পূর্বগামী ছায়া তাহা কে বলিবে? এই উদ্‌ভ্রান্ত, অনিশ্চয়তার বাষ্পে রুদ্ধদৃষ্টি, অগ্রগতির পথ-খোঁজায় বিমূঢ়, সমাজের ছবি তারাশঙ্করের উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'মন্বন্তর' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) তারাশঙ্করের পরবর্তী রচনা। ইহাতে লেখক বোমা-বর্ষণের ভয়ে আতঙ্কবিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারুণ দুর্দশা, মহাত্মা গান্ধীর একবিংশতি-দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষে সমস্ত দেশের অসহ্য উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা—ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের চিত্তকে তদানীন্তন কালে আলোড়িত করিয়াছে, সেইগুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র, তাহাদিগকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত করায় উপন্যাসের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ জাগে যে, ইহা কি সংবাদপত্রের ঢেঁকির সাহিত্যের পুষ্পকরথে

স্বর্গারোহণ সাময়িক ঘটনাবিবৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনধিকার-প্রবেশ? কালের সূতিকাগার হইতে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত নবজাত শিশুকে কি সাহিত্যলোকের চিরন্তনতায় উন্নীত করা সম্ভব? যে আঘাত এখনও আমাদের শিরা-স্নায়ুতে অনুরণিত হইতেছে, যে আতঙ্ক আমাদের রক্তপ্রবাহে এখনও সক্রিয়, যে হিমশীতল স্পর্শ এখনও আমাদের হৃৎস্পন্দনকে অবশ ও অসাড় করিয়া দিতেছে, তাহারা কি এত শীঘ্র এই অচির-উপলব্ধ ভয়ের মুখোস খুলিয়া আর্টিষ্টের নিকট নিজ সনাতন সত্যরূপটি উদ্ঘাটিত করিবে? ইহারা কি আমাদের ভীতিবিহ্বলতার ধূম্রলোক অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের সূর্যালোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার দূরত্ব ও রূপবৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে? এই ঘটনাগুলি আমাদিগকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে সত্য; লেখকও গভীর আবেগপূর্ণ অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি মনে হয় যে, আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপন্যাসের কাঁচামাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্পসৌন্দর্য নহে।

অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য যে আবেগময় তথ্যবিবৃতি তাহা নহে; এই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে তিনি এক যুগান্তর-সূচনাকারী ধ্বংসোন্মুখতার প্রতিবেশ রচনা করিতে চাহেন। এই চেষ্টার সাফল্যের উপরই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে। এই সর্বব্যাপী আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা, ভয়তাড়িত পশুর ন্যায় সমাজসংহতি হইতে দূরোৎক্ষিপ্ত নর-নারীর উন্মত্ত পলায়ন, পারিবারিক বন্ধনচ্ছেদ, সমাজব্যবস্থায় চরম বৈষম্যের বীভৎস আত্মপ্রকাশ, দানবীয় ধ্বংসশক্তির অবাধ তাণ্ডবলীলা, একদিকে; অপরদিকে, এই প্রলয়-দুর্যোগের মধ্যে মানবের কল্যাণকামনা ও সেবাপ্রবৃত্তির উদ্বোধন, মহাত্মার কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থ-নৈতিক সাম্যের উপর নূতন সমাজ ও অহিংসার উপর নব রাষ্ট্রশক্তি-গঠনের মহান্ পরিকল্পনা; এই উভয়ের সমাবেশ এক সুদূরপ্রসারী সাংকেতিকতার অর্থগৌরব বহন করে। কিন্তু এই সাংকেতিক অর্থটি কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারের মানস পরিস্থিতির মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য; এইখানেই রাজনৈতিক আলোচনার সহিত উপন্যাসের প্রভেদ। তারা-শঙ্কর এই লক্ষ্য আন্তরিকতার সহিত অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাইরেনের ধ্বনি সর্বসাধারণের মনে যে ভীতিশিহরণ জাগায় তিনি তাহাই ফুটাইয়াছেন; কিন্তু ইহা যখন ঘনায়মান অন্তর-দুর্যোগের তীক্ষ্ণ ও সার্থক বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হয় তখনই যে ইহা ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে আপনার বস্তু হয়, এই সত্য তিনি সর্বদা স্বীকার করেন নাই। উপন্যাস মধ্যে যে কয়েকবার সাইরেন বাজিয়াছে তাহার মধ্যে ইহা একবার মাত্র থিয়েটারের রাত্রে কানাই ও নীলার পরস্পরের প্রতি ক্ষুব্ধ-অনুযোগভরা, উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তির ও কানাই-এর প্রতি হীরেনের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হিংস্র মনোভাবের সহিত এক সুরে বাঁধা বলিয়া ঠেকে। শেষবার ইহা শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়া ভাবার্দ্রতার আতিশয্য দ্বারা আমাদের অশ্রুসিক্ত জীবনপথকে আরও কর্দম-পিচ্ছিল করিয়াছে। অন্য সময় ইহা কেবলমাত্র বিপদের যান্ত্রিক সংকেতের অংশ অভিনয় করিয়াছে।

'মন্বন্তর' গ্রন্থে ঔপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়। গ্রন্থারম্ভে সুখময় চক্রবর্তীর পরিবারের ব্যাধিবিকৃত, দারিদ্র্যপিষ্ট, অন্তর্জীর্ণ আভিজাত্য-মোহের চিত্রে একটি চমৎকার উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। এই ধ্বংসোন্মুখ

পরিবারের যে বংশানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগকে Galsworthy-র Forsyte Saga-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বংশ-শাখার ধাপে ধাপে এই বিকৃতির লক্ষণ যে স্ফুটতর ও ক্ষয়জীর্ণতা প্রকটতর হইয়া আসিতেছে তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। মেজকর্তার যে আভিজাত্যগৌরব একটা স্পর্ধিত বেপরোয়া উদারতায় স্তিমিত শিখায় বাঁচিয়া আছে, কানাই-এর পিতার মধ্যে তাহা স্বার্থপর, অক্ষম ভোগলোলুপতায় নির্বাপিত হইয়াছে; আবার কানাই-এর ছোট খুড়িমার মধ্যে তাহা শ্লেষব্যঙ্গ-বক্রোক্তিপ্রবণতায় নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ তুলিবার প্রবৃত্তিতে, এক বিকৃত রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই বংশের গৃহিণীদের অন্ধ পাতিব্রত্য ও মূঢ় ভক্তিবিহ্বলতা ইহার শোচনীয় ক্ষয়শীলতাকে করুণ অসহায়তার ম্লান গোধূলিছটায় অভিষিক্ত করিয়াছে। কানাই-এর উপর মেজকর্তার তীব্র রোষের অগ্ন্যুৎক্ষেপ ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পর ক্ষমাস্নিগ্ধ আশীর্বাদবর্ষণ, তাঁহার মধ্যে যে সত্যিকার মহিমান্বিত বংশপ্রেরণা ছিল তাহার শেষ-রশ্মি-বিকিরণ। গীতাদের বাড়ির আভ্যন্তরীণ অবস্থাও উপন্যাসের প্যাটার্ণের মধ্যে পড়ে, কিন্তু দেবপ্রসাদের গার্হস্থ্য জীবনে রাজনৈতিক প্রভাবেরই প্রাধান্য। লেখক চক্রবর্তী বংশের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উপেক্ষা করিয়া বোমাবিভ্রাটে পর্যুদস্ত সাধারণ নাগরিক জীবনের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য চক্রবর্তীবাড়ির উপর বোমা ফেলিয়া তিনি কতকটা তাঁহার প্রথম পরিকল্পনার অনুবর্তন করিয়াছেন—দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জীবনের সুস্থ অগ্রগতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মাকড়সার জালের মত নিজ অসুস্থ মনোবিকারের জটিল পাকে বন্দী, অতৃপ্ত ভোগকামনার অন্তঃরুদ্ধ উত্তাপে দেহে ও মনে জীর্ণ, বংশের উপর বিধির অমোঘ ব্যবস্থায় প্রলয়ের বজ্র নামিয়া আইসে। কিন্তু এই প্রমাণে অনিবার্যতা অপেক্ষা আকস্মিকতারই উপাদান বেশী। লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদ-সংকলনে অতি-মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি সদ্য-জনপ্রিয়তার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়া ঔপন্যাসিকের উচ্চ চূড়া হইতে সাংবাদিকতার (journalism) সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন, সাধারণ বিপৎপাত যে অভিন্ন যৌথ অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কানাই-গীতার ব্যক্তিগত জীবন সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। কানাই ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। নীলার প্রতি আকর্ষণে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আদর্শসাম্যই অধিকতর প্রভাবশীল। গীতার তরুণ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। নীলা ও নেপীর ব্যক্তিত্ব রাজনীতি ও সমাজসেবার রথচক্ররজ্জুর সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা পড়িয়াছে। নীলাকে আমরা ঠিক প্রেমিকারূপে উপলব্ধি করিতে পারি না—পিতার সন্দেহপরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সে নিজ স্বাধীন জীবন খুঁজিয়া পায় নাই, বোমা-বিস্ফোরণের ঘূর্ণাবর্তে অন্ধ বেগে ঘূর্ণিত হইয়াছে। বরং হীরেনের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিছু পরিচয় মিলে—কানাই-এর উপর তাহার ছুরিকাঘাত এই প্রাণশক্তিরই মুহূর্তের জন্য স্ফুরণ। বিজয়দার পারিবারিক জীবনের বালাই নাই—তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন; কাজেই এই নিম্নতর স্তরে তিনি বেশ সজীব।

এই অর্ধজীবিত, প্রতিবেশের সর্বগ্রাসী প্রভাবে রাহুগ্রস্ত, প্রাণীগুলির মধ্যে মেজকর্তা জরাজীর্ণ সিংহের ন্যায় দৃপ্ত কেশর ফুলাইয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার থিয়েটারী অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সত্যকার বীরত্বের সুর লাগে। ইহারই প্রাণস্পন্দন লেখক মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছেন —বাকী সমস্ত চরিত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করে নাই।

(৬)

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (আষাঢ়, ১৩৫৪)—তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে তাহাই নয়, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তরপ্রেরণা এই যুগান্তকারী উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয় নাই, ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেও গৌণ; সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ প্রত্যেকের উপরেই গভীর রেখায় মুদ্রিত। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণীয় সমাজ—যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মে ও চিন্তায়, জীবনাদর্শের সর্বস্বীকৃত ও প্রাণমূলজড়িত প্রভাবে, এক জীবন্ত, অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হইয়াছে। হাঁসুলি বাঁকের ইতিহাসের অতি সামান্য অংশ মাত্র মানুষের চেষ্টায় রচিত হইতেছে। ইহার মানুষ অধিবাসীগুলি উহাদের ব্যক্তিগত প্রীতি-দ্বেষ-ঈর্ষ্যা-লালসা-কামনার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে আকাশ-বাতাসকে ক্ষুব্ধ করিলেও আসলে এক মহত্তর শক্তির হাতে ক্রীড়নক। উহার বনোয়ারি-করালী-সুচাঁদ-পাখী-নসুবালা-কালোবৌ-পরম প্রভৃতি আপন আপন জীবন-কক্ষাবর্তনের পথে চলিতে চলিতে পরস্পরের মধ্যে নানা দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সৃষ্টি করিলেও এক দুর্নিরীক্ষ্য, অথচ তাহাদের নিকট অতি প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট দৈব রহস্যের অঙ্গুলি-সংকেতে পরিচালিত অক্ষগুটিকা মাত্র। যে মাটি তাহাদের কর্মক্ষেত্র ও জীবনের রঙ্গভূমি তাহার উপরের বায়ুস্তর সদা-সক্রিয়, অদৃশ্য দেবাত্মার পক্ষসঞ্চালনে চঞ্চল। বালক যেমন সূক্ষ্ম সূত্রাকর্ষণে আকাশের ঘুড়ির গতিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি এই দৈবশক্তি-অধ্যুষিত হাঁসুলি বাঁকে আকাশবিহারী কালারুদ্র ও বিষবৃক্ষসঞ্চারী কর্তাবাবা সমস্ত মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলিতেছেন; তাঁহাদের সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী প্রভাব প্রতি মানুষের চিন্তাধারায়, জীবনরহস্য-উপলব্ধিতে ও স্থূল কর্মপ্রয়াসে সুপ্রকট। এই উপন্যাসে প্রাচীন মহাকাব্যের নিয়তিবাদ, ও দেবতা-মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে রচিত, স্বাবা-পৃথিবীর মিলনসংবেগপ্রসূত, দ্বিস্তর-বিন্যস্ত জীবনযাত্রা যেন অতি-আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশে এক আশ্চর্য মন্ত্রকুহকে অক্ষুণ্ন, অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নহে, উপকথা। ইহার জীবনযাত্রা অতিপ্রাকৃতের ঘন-কুহেলিকা-মণ্ডিত; পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান, সদ্য অতীতের ঘটনা-প্রতিফলিত জীবনদর্শন—এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। হাঁসুলি বাঁকের কাহারদের জীবনদর্শন অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত—তাহাদের জীবনে যাহা কিছু ব্যতিক্রম ও বিপর্যয়, যাহা কিছু আকস্মিক ও অসাধারণ সবই দেবলীলা, অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য অভিপ্রায় হইতে উৎক্ষিপ্ত। সূর্যালোক ও বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এই অলৌকিক সত্তার

রশ্মিবিকিরণ তাহাদের আকাশ-বাতাসের প্রতিটি অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। অশীতিপর বৃদ্ধা সুচাঁদ এই দৈবশক্তির অধিকারিণী ও ব্যাখ্যাত্রী ; হাঁসুলী বাঁকের জন্মবৃত্তান্ত, উহার অতীত কাহিনী, উহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সমস্ত উদ্ভট কল্পনা ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা পারলৌকিক জগৎ হইতে অভ্যাগত প্রতিটি ধ্বনি ও স্পর্শ, দেবতার রোষ ও প্রসাদের প্রতিটি নিদর্শন তাহার স্মৃতির ঐতিহাসিক আধারে অখণ্ড সমগ্রতায় ও প্রথম অনুভূতির গাঢ় বর্ণলেপে অবিস্মরণীয়ভাবে রক্ষিত। সে এই সম্প্রদায়ের prophet বা অধ্যাত্মলোকের সহিত যোগাযোগরক্ষার সেতু। তাহার অতীতস্মৃতিপুষ্ট, তীক্ষ্ণ অনুভূতির বেতার-যন্ত্রে দেব লোকের নিগূঢ় অভিপ্রায়, আগামী বিপদের ছায়া, বর্তমান ঘটনার তাৎপর্য সমস্তই অভ্রান্ত ভাবে লিপিবদ্ধ ও বোধগম্য হয়।

সুচাঁদ যে কাহার-সমাজের ঐতিহ্যরক্ষক ও আধিদৈবিক বিপদের সংকেতবাহী, মাতব্বর বনোয়ারি তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচালক ও ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধনের প্রধান হোতা। সুচাঁদের দৃষ্টি অতীত-পরাবৃত্ত ও উর্ধ্বলোক-নিবিষ্ট—বর্তমান তাহার নিকট জীবনধারণের কালাধার হইলেও তাহার মানসলোকে ইহা গৌণ। ঠিক অতীতের ছাঁচে বর্তমান ঢালা হইতেছে কিনা ও কালারুদ্র ও কর্তাবাবার ইঙ্গিত ঠিক মত ইহার মধ্যে অনুসৃত হইতেছে কিনা, সেদিকে তাহার অতন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বনোয়ারির সহিত তাহার সাময়িক মতানৈক্য ঘটিলেও, উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক সংযোগ আছে। বনোয়ারির মনোযোগ বর্তমান ও অতীতের, ঐহিক সুখ-সচ্ছলতা ও চিরাচরিত, দেবনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণের মধ্যে তুল্যরূপে বিভক্ত। সে সুচাঁদের মত সর্বদা অতীত স্মৃতিরোমন্থনে বিভোর নয়, কিন্তু ঐতিহ্যশাসনের প্রতি তাহার অনুল্লঙ্ঘনীয় আনুগত্য। যে মুহূর্তে তাহার প্রতীতি বা সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, বর্তমানের কর্মধারা অতীত চক্রচিহ্নিত পথ হইতে লেশমাত্র বিচ্যুত হইয়াছে, অমনি সে গতিশীল রথের রাশ টানিয়া ধরিয়া উহার মোড় ফিরাইয়াছে। সে সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার চরম ও পরম দৃষ্টান্ত। কোন নূতন, অপরীক্ষিত কর্মপদ্ধতির প্রতি তাহার আপসহীন বিরোধ ও অপ্রশমিত সংশয়। কুলাচার তাহার জীবন-নিয়ামক ধ্রুবতারা—ইহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম তাহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। সমাজ-পতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার মধ্যে রূপায়িত—সমগ্র কাহার-সমাজের কল্যাণকামনা তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম করিয়া তাহার একাগ্র সাধনার বিষয়। তাহার চরিত্র-পরিকল্পনায় সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা এরূপ নিবিড় একাত্মতায় মিশিয়া গিয়াছে, যাহা উপন্যাস-সাহিত্যে দুর্লভ। কাহার-বংশের সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাস, সমস্ত ঐতিহ্যগত মানস রূপ বনোয়ারিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাহার চরিত্র যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-অনুশীলনের ফল, কতটাই বা সমষ্টিগত সমাজ-প্রেরণার পরিণতি তাহার ভেদরেখানির্ণয় অসম্ভব। বনোয়ারিই কাহার-সমাজ, এবং কাহার-সমাজের ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা বাদ দিলে যে সর্বসাধারণ সারাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই বনোয়ারি।

এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, হাঁসুলি বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও এই উভয়ের বেষ্টন-রেখায় সংহত একটি মানব-সমাজ। বাস্তবিক সমস্ত সমাজ-মনের এরূপ ভাবঘন, অন্তঃসংগতিশীল, নিবিড় নিশ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথা-

সাহিত্যে বিরল। প্রতিটি ব্যক্তিচরিত্রের ভিতর দিয়া এই সমগ্র সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন আংশিক বা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। তাহাদের হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিরোধ, লোভ-অসংযম, স্বার্থসংঘাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই এক সমীকরণকারী জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত। পান্নুর কূটনীতি ও শঠতা, পরমের হিংস্র জিঘাংসা, কালো বৌর মদির লালসাময় মোহবিহ্বলতা, বনোয়ারির ক্ষণিক অসংযম, নসুবালার রমণীসুলভ হাব-ভাব ও আচরণ, পাগলের উদাসীন সংসার-নির্লিপ্ততা ও স্বতঃস্ফূর্ত কবি মনের বিকাশ যেন একই গভীরস্তরশায়ী জীবনরস-প্রবাহের উপর বিভিন্ন রংএর বুদ্‌বুদ্‌লীলা। এই সমাজের সমগ্র চিত্র শুধু যে বাস্তব নিখুঁত ফটোগ্রাফ তাহা নহে; ইহার উপরে সঞ্চরমান দৈবশক্তি, প্রতিটি কর্মের পিছনে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা, চিত্তের নিগূঢ় ক্রিয়াশীল ভাবকল্পনা ও ঐতিহ্যপ্রভাব, এবং ইহার মধ্যে প্রবাহিত একটি প্রাণবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনানন্দলীলা—মনোলোকের এই সমস্ত নিগূঢ় পরিচয় এই উপন্যাসে স্বচ্ছ-সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে।

যে জীবননীতি কাহার-সমাজের সংসারযাত্রার পিছনে উদ্দেশ্য ও গতিবেগ যোগাইয়াছে তাহাতে শাসন ও প্রশ্রয়, দেবতার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা ও ইন্দ্রিয়লালসার যদৃচ্ছ অসংযম এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সামাজিক হীনতা ইহারা শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে মানিয়া লইয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রতি ইহাদের মনোভাব শ্রদ্ধা-বিনয়ে মধুর, অখণ্ডনীয় দৈববিধানরূপে স্বীকৃত ও সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ-ও-হীনম্মন্যতা মুক্ত। সাম্যবাদনির্ভর আধুনিক সমাজবিজ্ঞান এই মনোভাবকে দাসসুলভ ও অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ধিক্কার দিবে ও ইহাকে উৎসাদন করাই যে অগ্রগতির একমাত্র উপায় এই মতবাদ সমর্থন করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আনন্দময় সার্থকতাবোধই যদি সমাজসংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে উগ্র প্রতিযোগিতা ও অপ্রশমিত ঈর্ষা ও অসন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ভবিষ্যৎ সমাজ কি দরিদ্রের মনে অনুরূপ শান্তি ও সংহতিবোধ আনিয়া দিবে? ইহাদের চৌর্যবৃত্তি, সুরাসক্তি ও অবৈধ যৌনলালসা সবই যে বিধাতা তাহাদিগকে নিম্নবর্ণের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই বিধানের অঙ্গীভূত—সুতরাং এই সমস্ত পাপাচরণে তাহারা কোন বিবেকদংশন অনুভব করে না। উচ্চবর্ণের সহিত তাহাদের স্ত্রী-সকলের অবৈধ সংসর্গও তাহারা উপেক্ষার চক্ষে দেখে। এ বিষয়ে যদি তাহাদের কিছু আপত্তি বা প্রতিবাদ থাকে, তাহা নিজেদের পারিবারিক পবিত্রতার জন্য নহে, বরং উচ্চবর্ণের মর্যাদা-হানির সম্ভাবনা-বিষয়ক। তাহাদের নীতিজ্ঞানের এই অদ্ভুত অসঙ্গতিপূর্ণ চিত্রটি যেরূপ অন্তর্ভেদী মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অঙ্কিত ও সামগ্রিক জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিপ্রতিভা ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত কল্পনাগত সমপ্রাণতার নিদর্শন।

এই শিথিল, অথচ দৈব সমর্থনের দ্বারা দৃঢ়ীভূত, নৈতিক পরিবেশের মধ্যে ভালবাসা উহার সমস্ত বন্য, উদ্দাম শক্তি লইয়া আবির্ভূত হয়। ভদ্র-সমাজে যে প্রবৃত্তিকে আত্মপ্রকাশ করিতে নানা দুর্নিরীক্ষ্য রন্ধ্রপথ ও বিরল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হয়, এই নিম্নশ্রেণীর জনসমাজে তাহা বর্ষাস্ফীত কোপাই এর দুর্বার বন্যাস্রোতের মতই মানবজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়ে—চারিদিকে উদ্ভিদ্-প্রকৃতির আরণ্য অজস্রতার মতই ইহার বহু-বিসর্পিত, অন্ধ মাদকতায় চিত্তবিভ্রমকারী, উন্মত্ত প্রকাশ। এই আদিম, অসংস্কৃত প্রবৃত্তির বেগমান

উচ্ছ্বাসকে কাহার-সমাজে 'রং-এর খেলা' এই চিত্রল (picturesque) বর্ণনার দ্বারা অভিহিত করা হয়। উপন্যাস-মধ্যে রং-এর খেলার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে ও কাহার-সমাজে প্রধান আলোড়নগুলি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই ঘটিয়াছে। এই অবৈধ প্রেমের অনিবার্য বিস্ফোরক শক্তির মাধ্যমে মানবের দৈবনিরপেক্ষ স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণ হইয়াছে। বনোয়ারির প্রথম যৌবনে এই জাতীয় একাধিক অবৈধ হৃদয়-সম্পর্ক ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার দায়িত্বপূর্ণ মাতব্বরি পদ এদিকে তাহাকে সংযত ও সাবধান করিয়াছে। পূর্ব প্রেমের স্মৃতির রং সে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার বাহ্য আচরণে সে সমাজনেতার উপযুক্ত অনিন্দনীয় আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নয়ানের মার অসামাজিক মনোভাব ও ঈর্ষ্যা-দ্বেষের আতিশয্যকে সে পূর্ব প্রণয়ের খাতিরে প্রশ্রয় দিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনে শনি প্রবেশ করিয়াছে কালো বৌ-এর প্রতি তাহার অপ্রতিরোধনীয়, দৈবাভিশপ্ত আকর্ষণের রন্ধ্রপথে। এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত প্রণয়ের ফলে কাহার-সমাজে ভূমিকম্পের ফাটল ধরিয়াছে—কালো বৌ দেবরোষের বাহন সর্পদংশনে প্রাণ দিয়াছে। পরমের সহিত বনোয়ারির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে হলাহলের ন্যায় এক অসহনীয়, সমাজ-উন্মূলনকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ইহার সদ্যো-ফল বনোয়ারির প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির কারণ হইলেও শেষ পরিণতিতে ইহা সুবাসীর অবিশ্বাসিতায় ও করালীর সহিত সংঘর্ষে বনোয়ারির সম্ভ্রম-মর্যাদার অবসান ঘটাইয়া উহাকে মরণের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। অপরাধের এমন অমোঘ, ন্যায়দণ্ডমূলক শাস্তি, এরূপ নিয়তির সূক্ষ্ম বিচাররহস্য এক গ্রীক ট্রাজেডি ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে এত মর্মান্তিক-ভাবে প্রকটিত হয় নাই ও পাঠকের মনে দৈববিধানের প্রতি এরূপ ভীতিমিশ্র, অথচ ন্যায়ানুমোদিত স্বীকৃতি জাগায় নাই। করালী ও পাখীর প্রণয়সঞ্চার ও উহার ভয়াবহ পরি-সমাপ্তি ঐ একই সত্যের পরিপোষক। একমাত্র বসনের প্রেম শান্ত একনিষ্ঠতার গৌরবমণ্ডিত হইয়া প্রবৃত্তিপ্রধান দুরন্ত হৃদয়াবেগের বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। আবার পাগলের গ্রাম্য ছড়ায় এই প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও অতর্কিত বিস্ফোরণের প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। কাহার-সমাজ শুধু যে সমাজবিরোধী প্রেমের নায়ক-নায়িকার লীলাভূমি তাহা নয়; যে কবি ইহার প্রতি সারস্বত অভিনন্দন জানায় তাহারও প্রসূতি।

বহু শতাব্দীর সংস্কৃতিপুষ্ট, নিবিড় ঐক্যবদ্ধ এই সমাজের অবসান আমাদের মনে এক কারুণ্যমণ্ডিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্মো ভয়াবহ'—গীতার এই অমর উক্তি বনোয়ারি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল। করালীর প্রতি তাহার ক্ষমাহীন, অনমনীয় বিরোধিতার মূলই এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস। কিন্তু সমস্ত সমাজবিন্যাস অধ্যাত্ম-ভাবাত্মক হইলেও মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তিনির্ভর। অর্থনীতির গুরুতর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। কাহার-সমাজে অতীতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তখন নীলকর সাহেবদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফাটল মন পর্যন্ত পৌঁছাইবার সুযোগ পায় নাই—বন্যা-দুর্ভিক্ষের পীড়ন দ্রুত উপশমিত হওয়ায় তাহাদের পূর্বতন ঐতিহ্য ও মনোভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও জীবননীতি উচ্চবর্ণের ভাব-তটভূমি উপচাইয়া কাহার-জীবনের সুরক্ষিত বেষ্টনী-রেখাতে আঘাত হানিয়াছে ও উহার মানসলোকে এক অস্বস্তিকর কম্পন জাগাইয়াছে।

তাহাদের আধুনিক মুনিবদের স্বার্থপরতা ও সহানুভূতির অভাব তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে ঘনীভূত করিয়া তাহাদের সামগ্রিক চিত্তকে পরিবর্তনোন্মুখ করিয়াছে। মহাযুদ্ধের আহ্বান, যন্ত্রযুগের আত্মকেন্দ্রিক আমন্ত্রণ তাহাদের নির্জন বাঁশবনের জঙ্গলের দুর্ভেদ্য পরিবেশকে ভেদ করিয়া তাহাদের কানে পৌঁছিয়াছে ও জীবিকার্জনের দুর্দম প্রেরণা তাহাদের বহুশতাব্দীর অধ্যাত্ম-সংস্কার-শাসিত চিত্তে এক কর্তব্যভারমুক্ত, বিলাস-বিভ্রমে লোভনীয়, স্বেচ্ছাচারে নিরঙ্কুশ, অভিনব জীবন-আস্বাদনের রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজন কালারুদ্র ও কর্তাবাবার দেবস্থানকে রণসম্ভারের গুদামে পরিণত করিয়া, কোপাইএর ধারের নিবিড়চ্ছায় বৃক্ষরাজি ও বাঁশবনের উৎসাদন করিয়া তাহাদের মনের আধিদৈবিক আশ্রয়কে বিলুপ্ত করিয়াছে —তাহারা এক মুহূর্তে প্রদোষান্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনের পাকা সড়ক ধরিয়া যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটা সমগ্র সভ্যতা, একটা বহুযুগের জীবনাদর্শ, অধ্যাত্মপ্রভাবিত মানবজীবনের একটা অর্ধমূঢ় অবশেষ যেন আধুনিকতার বিস্ফোরণ-বহ্নিতে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু যদি যুগপ্রভাব ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন এই মধ্যযুগীয় সমাজ-সত্তা-বিলোপের একমাত্র কারণ হইত, তবে তারাশঙ্করের উপন্যাসটি কেবল সমাজতাত্ত্বিক-তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিত্ররূপেই পরিচিত হইত। কিন্তু গ্রন্থকারের ঔপন্যাসিক প্রতিভা এই সমস্ত কারণকে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ, আধুনিকতার উদ্ধত বিদ্রোহ ও আত্মনির্ভরশীল সাহসিকতার প্রতিমূর্তি পুরুষের মধ্যে সংহত করিয়া ইহার মানবিক আবেদন ও মহাকাব্যোচিত সংঘর্ষ বহুগুণে তীব্রতর করিয়াছে। করালী উপন্যাসের প্রতিনায়ক ও আগামী যুগের নূতন সম্ভাবনার ধারক ও বাহক। সমস্ত উপন্যাসটি যেন অতীত ও আধুনিক যুগের দুই প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিসত্তার শক্তি-প্রতি-যোগিতার রঙ্গভূমি। বনোয়ারির বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অনমনীয় জীবননীতির পিছনে যেমন বহুযুগাগত প্রাচীন আদর্শ ও কুলাচারের সঞ্চিত শক্তি ক্রিয়াশীল, তেমনি করালীর মধ্যে যন্ত্রযুগের আত্মা, উহার নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও বিচিত্র কর্মোদ্যম ও উদ্ভাবন-কৌশল লইয়া, মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বনোয়ারি সমাজের সংহত পরাক্রম, শাশ্বত নীতিবোধ ও অপরিবর্তনীয় অন্ধসংস্কারের সহযোগিতায় আপাতত অজেয়রূপে প্রতিভাত হইলেও করালীর একক শক্তি, যে অমিত তেজে ভূগর্ভপ্রোথিত বীজ মাটির কঠিন স্তর ভেদ করিয়া অদম্য প্রাণলীলায় অঙ্কুরিত হয় তাহারই মত, সমস্ত রক্ষণশীল জড়তার উপর শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। মানবমনের অর্ধচেতন স্তরে জীবনকে নূতনরূপে আস্বাদন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা গোপন বাসা বাঁধিয়াছে, যুগের সেই অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত অভিলাষ তাহাকেই বাহনরূপে অবলম্বন করিয়াছে। বনোয়ারি-নেতৃত্বের অভিভবপীড়িত কাহারেরা যখন সেই পুরাতন জাঙুল-বাঁশবাদি-কোপাইনদীর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেহ-পরিক্রমা করিয়াছে, তখন তাহাদের মন নূতন সভ্যতার কেন্দ্র, নূতন ঐশ্বর্যলীলার রঙ্গভূমি, মানব মনীষার নব বিকাশতীর্থ, প্রাণশক্তির আতিশয্যসুরার মাতালখানা চন্নপুর রেলওয়ে স্টেশন ও সেখানকার বিরাট, অতিকায় যন্ত্রশালার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়াই ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল রচনা করিয়াছে।

অতীত-ভবিষ্যতের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নবীনের জয়ই অবশ্যম্ভাবী কেননা তাহারই পিছনে

প্রাণৈষণা, অগ্রগতির দুর্বার স্পৃহা। যেমন পরম-বনোয়ারির দ্বন্দ্বে অধিকতর প্রগতিশীল ও উন্নততর জীবননীতির প্রতীক বনোয়ারির জয় সুনিশ্চিত, তেমনি সেই একই কারণে বনোয়ারি-করালীর দ্বন্দ্বে দীর্ঘকাল জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী নবীনের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। সে নবতর জীবনপ্রেরণায় বাহন বলিয়াই কর্তাবাবার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপকে পোড়াইয়া মারিবার অকুতোভয়তা সঞ্চয় করিয়াছে। নানা বিচিত্র, ঐতিহ্যলঙ্ঘী পরিকল্পনা তাহার মনোলোকের অধিবাসী। পাখীকে নয়নের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই ও সমাজ-সমর্থনের মুখাপেক্ষী হয় নাই। বনোয়ারি কতকটা রংএর খেলার প্রতি তাহার নিজের দুর্বলতা ছিল বলিয়া ও কতকটা প্রেমের স্বাধীন মর্যাদার অনুরোধে এই অসামাজিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়াছে। সে করালীকে পোষ মানাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু করালীর স্বাধীনচিত্ততা কোন দলপতির শাসন মানিয়া সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয় নাই। তাহার দুঃসাহসিক স্পর্ধা ও নভোচারী আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কুলাচার ও প্রাচীন অনুশাসনকে লঙ্ঘন করিয়া আত্মতৃপ্তির নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়াছে। দোতলা কোঠা বাড়ী নির্মাণ লইয়া বনোয়ারির সহিত তাহার চরম বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সমাজশক্তির অযৌক্তিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়াছে, কিন্তু নিজ নূতন আদর্শ ও জীবননীতি সে তরুণ সমাজে প্রচার করিয়া গোপনে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে ও পুরাতনের সম্পূর্ণ উৎসাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের সম্পর্কের মধ্যে যে হীনতা ও অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল, মনিবের প্রতি কৃষাণের পুরুষপরম্পরাগত, ভক্তিরসস্নিগ্ধ, নম্র আনুগত্যের মধ্যে যে অবিচার ও শোষণ আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি উহার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে ও নবযুগের সাম্যের দৃপ্ত বাণী তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার গতি গ্রাম হইতে সহরের দিকে, সামন্ততান্ত্রিক, চিরনির্দিষ্ট অবস্থিতি হইতে যন্ত্রযুগের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে, নির্বিচার ঐতিহ্যানুস্মৃতি হইতে নূতন প্রয়োজনমূলক কর্মপন্থার দিকে। তাহার স্বজাতির ধর্ম ও আচারকেন্দ্রিক জীবন হইতে সরিয়া সে বৈষয়িক উন্নতি ও ভোগমূলক জীবনে আপনাকে স্থাপন করিয়াছে। বনোয়ারির নিকট হইতে সুবাসীকে অপহরণ করিয়া সে একাধারে নিজ অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে ও বনোয়ারির উপর নিয়তির নিগূঢ় ন্যায়বিচারের দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। শেষ যুদ্ধে সে বনোয়ারিকে পরাজিত করিয়া প্রাচীন যুগের অবসান ঘোষণা করিয়াছে ও মাতব্বরি-শাসিত সমাজজীবনকে চিরতরে উন্মূলিত করিয়াছে। শেষের দিকে করালীর মনে যে অতর্কিত অতীত-প্রীতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা চরিত্রসঙ্গতি ও ঘটনাপরিণতির দিক দিয়া আকস্মিকতা-দুষ্ট মনে হয়। বনোয়ারির জীবনাদর্শের সঙ্গে তাহার যে দুস্তর ব্যবধান তাহা এরূপ সুলভ ভাবপরিবর্তনের দ্বারা সেতুবদ্ধ হইবার নহে। মনে হয় এখানে লেখকের পক্ষপাতমূলক ভাববিলাস তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও মানবচরিত্রজ্ঞানকে অভিভূত করিয়াছে।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' গভীর সাঙ্কেতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস। কাহারকুলের জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক একটি আমূল সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের যে সমাজসংগঠনী প্রতিভার প্রেরণা উচ্চবর্ণের

মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাহার লুপ্তাবশেষ অল্পদিন পূর্ব পর্যন্তও পূর্ণ-মাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ছিল। এই অন্তিম স্ফুলিঙ্গের নির্বাপণ, এই ধর্মবোধচালিত, আচার-সংস্কারবদ্ধ জীবনযাত্রার শেষ-নিশ্বাস-ত্যাগ, এক বিরাট প্রাণলীলার দিক্‌পরিবর্তন এই উপন্যাসের মহিমান্বিত ভাবপ্রেরণা। গঠন ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন-কৌশলের দিক দিয়া ইহা অনবদ্য, উপন্যাসরচনার চরম কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। ইহার জীবনধারা, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভাবের দ্বারা সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত প্রেরণার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এক সর্বাঙ্গসুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ ভাবাবহের মধ্যে রোমাঞ্চকর প্রারম্ভ হইতে বিষাদ-করুণ অনিবার্য পরিণতি পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। কর্তাবাবার বাহনের রহস্যময় শিষধ্বনি সমস্ত কাহারসমাজে যে অতিপ্রাকৃত। অনির্দেশ্য ভীতি-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে তাহাই সমগ্র উপন্যাসের ভাবজগতের ভূমিকা রচনা করিয়াছে—ইহাই ঔপন্যাসিক সংঘটনের মূল কারণ। এই বাহনকে হত্যা করিয়াই করালী নিজ সমাজের চক্ষে যে পাপ করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—সে নিজ আত্মীয়দের নিকট অপাংক্তেয় হইয়াছে। করালীকে ক্ষমা করিয়া বনোয়ারি যে সমস্ত কাহারসমাজের উপর দেবরোষের অভিশাপ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে এ সংশয় তাহার সত্তার গভীরতম স্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত কর্মজাল, সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা এই আধিদৈবিক প্রভাব ও অলৌকিক সংস্কারের কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। প্রতিটি কাহারপরিবারের প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের মধ্যে দেবলোকের অদৃশ্য, কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে অনুভূত, প্রভাব সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত হইয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহা হয়ত অতি তুচ্ছ ও সাধারণ ব্যাপার—কিন্তু ইহার পিছনে যে গভীর একনিষ্ঠ অনুভূতি, পারলৌকিক রহস্যের যে নিগূঢ় সর্বব্যাপী অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই এই সাধারণ সংঘটনগুলির উপর মানব-চিত্তের লীলাময় প্রকাশ ও জটিল-সূত্র-গ্রথিত নিয়তিবাদের মহিমা আরোপ করিয়াছে। কাহার-জীবনে যাহা কিছু দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমস্তই হয় এই দৈবশক্তির সহিত বোঝাপড়ার আকৃতি না হয় হৃদয়াবেগঘটিত রংএর খেলা হইতে উদ্ভূত। সব শুদ্ধ মিলিয়া যে সমাজ-চিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কেন্দ্রগত প্রেরণায় নিবিড়-সংহত, সতেজ প্রাণলীলায় বেগবান, দৃঢ় আদর্শবাদে স্থির, ঊর্ধ্বলোকের আলো-ছায়ার বিচিত্র অনুভূতিতে রহস্যময়। হিন্দুর অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মর্মকথা, হিন্দুসমাজসংগঠনের মূলতত্ত্ব, হিন্দু মনের ব্যাকুল অভীপ্সা সমস্তই এই অজ্ঞানান্ধ, মূঢ় সঙ্কীর্ণতার কারাগারে আবদ্ধ কাহারসমাজের মধ্যে, মৃৎপিণ্ডে চিন্ময়ী চেতনার ন্যায়, ঘটে বিরাট আকাশের প্রতিবিম্বের ন্যায়, তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা, বিলোপের-প্রাক্-মুহূর্তে আবিষ্কৃত ও অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল বর্ণে ও সুস্পষ্ট রেখায় চিরতরে অঙ্কিত হইয়াছে।

(৭)

'আরোগ্য-নিকেতন' (চৈত্র, ১৩৫৯) তারাশঙ্করের আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার উপজীব্য জীবনলীলা নহে, জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম-ছন্দে রূপায়িত জীবনদর্শন; ইহার অনুভূতি উপরিভাগের বিচিত্র জীবন-চাঞ্চল্যে সীমাবদ্ধ নহে, জীবনের চরম পরিণতি ও আপাত-বৈরী মৃত্যুর গহনরহস্যময়, গুহানিহিত স্বরূপ-আবিষ্কারে নিয়োজিত। এখানে

জীবন-সংঘটন মরণের ছায়াতলে অভিনীত, ইহার বহির্বিকাশগুলি মরণের মহাসঙ্গমে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। কাজেই সাধারণ উপন্যাসে জীবন-পদ্ম যেমন সমস্ত পাপড়ি মেলিয়া পূর্ণবিকশিত হয়, জীবনের গতিবেগ ও সম্পর্কজটিলতা যেমন ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া চরম পরিণতি লাভ করে, এখানে সেই ব্যাপক সর্বাভিমুখী চলিষ্ণুতা সমুদ্র-সন্নিহিত স্রোতস্বিনীর ন্যায় নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এক পরম অবসানে আত্মসংবরণ করিয়াছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, জীবনের লীলাছন্দ ও বিসর্পিত ভাববৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত এবং এই জন্যই কোন কোন সমালোচক ইহাতে তারাশঙ্করের শক্তির ক্ষীয়মানতার পরিচয় পাইয়াছেন। আমার বিচারবুদ্ধি এইরূপ মত-প্রকাশে সায় দিতে পারিতেছে না। প্রতি উপন্যাসেই সমস্যার প্রকৃতির উপর উহার ঘটনাসন্নিবেশ ও জীবনাবেগের রূপায়ণ নির্ভর করে। যে উপন্যাস মৃত্যুর স্বরূপ-উপলব্ধিকেই বিষয়বস্তু-রূপে নির্বাচন করিয়াছে, যাহা বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীর অন্তর্নিহিত দার্শনিকতত্ত্বকেই পরিস্ফুট করিতে ব্যাপৃত, যাহা মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, শোকবিমূঢ়, আকস্মিক বিপৎপাতে সন্ত্রস্ত-বিহ্বল জীবনখণ্ডাংশগুলিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, তাহাতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ, উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রবাহ ও চরিত্রাঙ্কনের গভীরপ্রবেশী জটিলতা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। মৃত্যুর খর কৃপাণে খণ্ডিত, উহার শৃঙ্গ-আস্ফালনে ছত্রভঙ্গ, উহার বজ্রমুষ্টিতে কৃচ্ছ্রশ্বাসক্লিষ্ট জীবনসমষ্টি পীত-পাণ্ডুর বর্ণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ছায়ামূর্তির প্রেত-শোভাযাত্রার ন্যায়, উত্তর হিমবায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় ধাবমান হইয়াছে। ইহাতে মৃত্যুতত্ত্বই প্রধান, জীবনের সতেজ, বিচিত্র বিকাশ, উহার প্রাণযাত্রাসমারোহ, উহার রক্তিম পরিপূর্ণতা নাই। তত্ত্বাশ্রয়ী, তত্ত্বনির্ভর জীবন আত্মপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যকে বিসর্জন দিয়াই এই উপন্যাসের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ মৃত্যুর গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত নির্ঝরিণীর আকুল আর্তিতে, ক্ষণ-উৎসারিত, পরমুহূর্তে শুষ্ক প্রাণধারার এক চরম সঙ্কটময় ভাবোচ্ছ্বাসে বিঘূর্ণিত হইয়াছে—সবটুকু জীবনাবেগ, ক্ষয়রোগীর সমস্ত রক্ত গণ্ডদেশে সঞ্চিত হইবার মত, অন্তিম ক্ষণের করুণ আসক্তি ও উদ্‌ভ্রান্ত মতিবিপর্যয়ের মধ্যে জমাট বাঁধিয়াছে। অজাগরের দৃষ্টি-সম্মোহিত পশুর ন্যায় মৃত্যুবিভীষিকার সম্মুখীন জীবন আপনার স্বভাবধর্ম হারাইয়া দোলকযন্ত্রের (pendulum) কাঁটার মত একবার বামে, একবার দক্ষিণে হেলিয়া বৃথা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছে।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সন্ধিস্থাপনের দৌত্যকার্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর ন্যস্ত। ব্যবসায়-মধ্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বৃত্তি আর নাই। চিকিৎসাব্যবসায়ের পিছনে যে মনোভাব ও কর্তব্যনিষ্ঠা বিদ্যমান তাহাই একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ড। এই বৃত্তিসম্পর্কিত সদাচার (professional etiquette) বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলনা-মূলক আলোচনার দ্বারা উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভাবদৃষ্টি ও জীবনতাৎপর্যের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসা কেবল ব্যাধি-নিরাময়ের ব্যবহারিক উপায়মাত্র নহে। ইহাতে রোগীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, জীবনযাত্রানির্বাহের সমগ্র নীতি, সুস্থ জীবনাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত। ইহা অপরা বিদ্যা

হইলেও পরা বিদ্যার সগোত্রীয়, অধ্যাত্ম ভাবসাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চিকিৎসকের নাড়ীজ্ঞান সমস্ত জীবনরহস্যের ধ্যানোপলব্ধি, গুহানিহিত, অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়-গঠিত প্রাণতত্ত্বের মর্মভেদ। চিকিৎসক এক প্রকার ধ্যানযোগী, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় শারীরতত্ত্বজ্ঞান তাহার পক্ষে কেবল ব্যবহারিক কৌশল নহে, নিগূঢ়, অন্তর্ভেদী দিব্যদৃষ্টি। তাহার চরিত্রও এই ধ্যানযোগের উপযুক্ত নির্লোভ, নিরাসক্ত আদর্শপরায়ণতার প্রতিবিম্ব।

ইহার সহিত তুলনায় আধুনিক ডাক্তারের রোগীসম্বন্ধে মনোভাব সম্পূর্ণ বহির্মুখী ও প্রয়োজনাত্মক। সে বৈজ্ঞানিক, মায়ামমতাহীন মনোভাব লইয়া চিকিৎসা-কার্যে ব্রতী, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য কোনও শক্তি সে স্বীকার করে না। তাহার চিকিৎসা যেমন বহির্লক্ষণনির্ভর, রোগীর প্রতি তাহার কর্তব্যবোধও সেইরূপ তাহার অন্তর্জীবন-নিরপেক্ষ। নূতন নূতন আবিষ্কারের গৌরবে সে দাম্ভিক, বিজ্ঞানের উপর আস্থায় সে আকুণ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়শীল, রোগের বিরুদ্ধে তাহার স্পর্ধিত যুদ্ধঘোষণা। তাহার কর্তব্যবোধ রোগীর ব্যক্তিসীমা ছাড়াইয়া সমস্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত—সমাজকল্যাণের জন্য সে যে কোন রোগীকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কবিরাজী চিকিৎসার বিনয়-নম্র, মাতৃমমতাস্নিগ্ধ দৈবনির্ভর, অধ্যাত্মরহস্যের স্পর্শলোলুপ মানস প্রবণতার সহিত তুলনায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিধির ভাবাবেগহীন নিয়মানুবর্তিতা ও ইহসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কবিরাজ জীবন মশায় ও ডাক্তার প্রদ্যোত এই দুইজন বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতিনিধি চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ও মানস গঠনে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ও সমস্ত উপন্যাস ব্যাপিয়া এই বৈপরীত্যের স্বরূপ ও পরিণতি দেখান হইয়াছে।

এই উপন্যাসে এক প্রকারের মনস্তত্ত্ব আছে—ইহা রোগবিকারে কুটিল ও সন্দিগ্ধ, আসন্ন মৃত্যুবিভীষিকায় আতঙ্কবিমূঢ়, কোথাও অতৃপ্ত ভোগপিপাসায় অতি উচ্ছ্বসিত, কোথাও নৈরাশ্যে ও আসক্তিহীনতায় স্তিমিত-ধূসর, কোথাও বা অতর্কিত উপলব্ধিতে, ভাঙ্গিয়াপড়া তরঙ্গের মত রোদন-বিবশ। এই রোগশয্যার চারিপাশে স্বাভাবিক জীবনপ্রতিবেশও, ভয়াবহের আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ, অনভ্যস্ত প্রয়োজনের কক্ষাবর্তনে সহজছন্দভ্রষ্ট, অস্বাভাবিক মানস উৎকণ্ঠায় অসাড়। ইহা অনিশ্চিত কল্পনায় ও বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় জালে দিশেহারা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নানারূপ মানস প্রতিক্রিয়া-কৌতূহল উদ্রেক করে—কেহ শান্ত স্থির, অধ্যাত্ম বিশ্বাসে দৃঢ়, কেহ সমস্ত আত্মসংযম হারাইয়া বেতসপত্রের ন্যায় কম্পমান, কেহ কূট-বৈষয়িকতার স্বার্থান্ধতায় আবিলদৃষ্টি, কেহ আঘাতের তীব্র আকস্মিকতায় অপ্রত্যাশিত প্রবৃত্তিনিচয়ের আবির্ভাবে নূতন পরিচয়ে প্রকাশমান। এই সমস্ত রোগজর্জর সত্তার মধ্যে মানবাত্মার নানারূপ তির্যক প্রকাশ। রাণা পাঠক, মহাপীঠের মোহান্ত সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ বায়েন—ইহারা মৃত্যুর সম্মুখীন ধীর স্থির, অচঞ্চল। কেহ বা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে, কেহ বা প্রতিযোগী মল্লযোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুর সহিত শক্তিপরীক্ষায় উৎসুক, কেহ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া জীবন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে উল্লসিত, কেহ বা জীবনের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দায়মুক্তভাবে মহা অভিযানে বাহির হইতে প্রস্তুত। অন্যদিকে জীবন মহাশয়ের নিজ পুত্র বনবিহারী, মতির মা, মঞ্জরী, দাঁতু ঘোষাল প্রভৃতি জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য

অশোভনরূপে ব্যস্ত, অতৃপ্ত জীবনপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, জীবনরসের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করিবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় উতলা-উন্মাদ। ইহাদের মধ্যবর্তী স্তরে বিপিন অকালমৃত্যুর সম্মুখে লজ্জা-কুণ্ঠিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত বীরের ন্যায় আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান। মৃত্যুর নিকষকৃষ্ণ যবনিকার উপর ব্যাধির দমকা হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবন-দীপশিখার এই বিচিত্র ভঙ্গিমার, নানা ছন্দের ও বিবিধ অন্তরভাবদ্যোতনার ছায়ানৃত্য লেখক এই উপন্যাসে অপরূপ রেখাবর্ণ-সমাবেশে ও তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও ভাবব্যঞ্জনার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই নিগূঢ়-অন্তলোকবিহারী উপন্যাসে নায়ক জীবন মশায় ও নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী, মানবজীবনের রন্ধ্রসঞ্চারিণী, প্রাণের গভীর রহস্যকেন্দ্রে বীজরূপে অধিষ্ঠিতা মৃত্যুদেবী। এখানে নায়কও সম্পূর্ণরূপে নায়িকার উপর নির্ভরশীল, উহারই তত্ত্বরূপ নিরূপণে ও রহস্য-নির্ণয়ে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োজিত, উহারই অঙ্গদ্যুতিতে উহার ব্যক্তিসত্তা আলোকিত ও বিকশিত। অন্যান্য চরিত্র কেবল মৃত্যুরহস্য ও নায়কের ব্যক্তিত্ব উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের অবস্থাসঙ্কট বিচ্ছুরিত চকিত আলোকে মৃত্যুর অবগুণ্ঠিত আনন-মহিমা ও জীবন মশায়ের মনোগহনশায়ী প্রাণসত্তা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবন মশায়ের চরিত্র খুব গভীরভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত। একদিকে কুলধর্ম ও পারিবারিক ঐতিহ্য ও অপর দিকে পরিবর্তনশীল যুগের বাস্তব প্রেরণা এই উভয়ে মিলিয়া তাঁহার দ্বৈত প্রকৃতির টানা-পোড়েন বয়ন করিয়াছে। ডাক্তারি ও কবিরাজীর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত চিত্তই তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির এই বিদারণরেখার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কুলধর্মের মর্যাদার সঙ্গে আধুনিক যুগের ভোগবিলাসপ্রবণতা ও তরুণ বয়সের অসংযম ও ক্ষমতা মাদকতা মিশিয়া তাঁহার চরিত্রকে প্রাণশক্তির নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা-পিতামহের চরিত্রের অব্যভিচারী আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মযোগের নিরাসক্তি পূর্ণ মাত্রায় পান নাই—ইহার সঙ্গে নূতন কালের রক্তচাঞ্চল্য, বৈষয়িক উন্নতির জন্য উদগ্র স্পৃহা, ভাগ্যপরীক্ষা ক্রীড়ায় জুয়াড়ির নেশা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার চরিত্রের নির্মলতাকে যে পরিমাণে আবিল করিয়াছে সেই পরিমাণে ইহার মানবিক আকর্ষণকে বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার তরুণ বয়সের রূপমোহ ও নিদারুণ আশাভঙ্গের পর তাঁহার সহিত মন-মেজাজের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির স্ত্রীর সহিত অবাঞ্ছিত মিলন, তাঁহার কুলাচারনিষ্ঠা ও ধ্যানাবিষ্টতার, তাঁহার মৃত্যু-রহস্যোদ্ভেদের জন্য আজীবন সাধনার এক বিসদৃশ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের এই তিক্ততা ও একমাত্র পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতাকে আরও প্রখর করিয়াছে। তাঁহার ব্যর্থতাবোধ ও আত্মগ্লানিই তাঁহার নাড়ীপরীক্ষার ভিতর দিয়া অধ্যাত্মলোকের স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক সাধনা হইতে ব্যক্তিগত জীবনাকৃতির পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে—এই অজ্ঞেয়কে জানার ইচ্ছা, এই সূক্ষ্ম অনুভূতিময়, রহস্য-নিবিড় পরিমণ্ডলে আপনাকে বিলীন করিবার চেষ্টা যেন দিব্যৌষধির ন্যায় তাঁহার রক্তস্রাবী অন্তরক্ষতে শান্তির প্রলেপ লেপন করিয়াছে। তাঁহার কর্মজীবনে নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য ও প্রতিকূল আঘাতও এই ধ্যানতন্ময়তাকে এক গভীর-করুণ তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, চিত্তের সমস্ত অশান্তি ও অন্তর্জ্বালা, প্রতিবেশের সমস্ত নিষ্করুণতা, ভাগ্য-বঞ্চনার সমস্ত অবিচার, মুখরা, অভিমানদাবদগ্ধা স্ত্রীর সমস্ত কটুভাষণ

যেন এই মৃত্যুগহন, দেহযন্ত্রের জটিলতার অভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল দিব্যানুভূতিগভীরতার মধ্যে অবগাহন করিয়া প্রশান্ত জীবনস্বীকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। যন্ত্রণার সূচিবেধের রন্ধ্রেই এই অলৌকিক রহস্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ তাঁহার গভীরতর চেতনায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। জীবনের সবটুকু আকুতি দিয়া তিনি মরণকে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই মরণ তাঁহার অন্তরে জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবন মশায় যতটুকু কাজ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী চিন্তা ও অনুভব করিয়াছেন। মৃত্যু-উপলব্ধির অন্তর্গূঢ় আলোকে তাঁহার নিজ প্রাণসত্তা আত্মোপলব্ধির স্পষ্টতায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া, সীমা ও অসীমের সঙ্গমস্থলে যে মহারহস্যের লীলাভিনয় চলিতেছে তাহার দর্শক ও মর্মজ্ঞরূপে তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় অনুভূতিকেন্দ্রের উপরই উজ্জ্বলতম আলোকপাত করিয়াছেন, পরিপূর্ণ আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। মৃত্যুর গোধূলি-অন্ধকার ভেদ করিবার জন্য তিনি অন্তরে যে দিব্য সাধনার দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতিরহস্য স্বচ্ছ ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনাবিন্যাসের দিক দিয়া জীবন মশায়ের সমগ্র জীবনকাহিনীটি পরিস্ফুট করিবার যে কৌশল লেখক অবলম্বন করিযাছেন তাহা সর্বথা সার্থক ও প্রশংসনীয়। এই ঘটনা-বিন্যাসে ধারাবহিকতার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। কোনও ভাবঘন মুহূর্তে, মানসিক বিপর্যয়ের কোন তরঙ্গোৎক্ষেপে তাঁহার মন পূর্বস্মৃতিরোমন্থনের উজান বাহিয়া অতীত জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আবার নূতন করিয়া অনুভব করে ও এইরূপে তাঁহার সমগ্র অতীত জীবনযাত্রা তাঁহার কল্পনায় ও পাঠকের সম্মুখে পুনরভিনীত হয়। এই প্রণালীতে আমরা তাহার তরুণ জীবনে মঞ্জরীর প্রতি মোহাকর্ষণ ও ভূপী বোসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানিতে পারি, ও মঞ্জরীব ছলনাময় আচরণ তাহার সমস্ত অন্তরকে কিরূপ বিষাক্ত করিয়াছিল তাহা অবগত হই। এই ভয়ানক আঘাতে তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবন ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া বাহিরের সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার দিকে অনিবার্যভাবে ধাবিত হইয়াছে। তাহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিদাহ আতর-বউ-এর ঈর্ষা ও অভিমানের নির্মম খোঁচায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রংলাল ডাক্তারের সহিত তাহার পরিচয় ও শিষ্যত্ব-স্বীকারও এই অতীত-পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। এগুলি কেবল ঘটনাবিবৃতি নহে, যে আবেগময় পরিমণ্ডল ও ব্যক্তিমানসের তীব্র আকুতির সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট, তাহারই পুনর্গঠন। তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার অভাবনীয় চিকিৎসা-সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার বর্তমান যুগের নৈরাশ্যপূর্ণ ও সংশয়ক্লিষ্ট মনোভাবের বৈপরীত্য-সূচনার উদ্দেশ্যেই উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ণনার এই বিশেষ রীতি, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এই আগু-পাছু-হাঁটার গতিভঙ্গী নায়কের ভাবুকতাপ্রধান, অন্তঃসমাহিত প্রকৃতির সহিত বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে—শুধু কালানুসারী একটানা অগ্রগতি তাহার রোমন্থনপ্রবণ, বাহ্য ঘটনাকে জীবন-দর্শনের মধ্যে গলাইয়া লইতে অভ্যস্ত চরিত্রের সহিত খাপ খাইত না।

জীবন দত্তের সুদীর্ঘ চিকিৎসক-অভিজ্ঞতার মধ্যে দুইটি ঘটনা তাঁহার চিকিৎসক জীবনকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার গভীর অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। একটি, তাঁহার পুত্র বনবিহারীর মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বজ্ঞান ও অবিচলিত সংযম ও চিত্তপ্রস্তুতি; দ্বিতীয়,

শশাঙ্কের আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনায় তাহার তরুণী স্ত্রীকে সাধ মিটিয়া খাওয়াইবার আমন্ত্রণের রূঢ় প্রত্যাখ্যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার আপাত-প্রশান্তি আতর বৌ-এর শ্লেষপূর্ণ অনুযোগের অঙ্কুশে আজীবন বিদ্ধ হইয়াছে। এই আঘাতে তাঁহার পারিবারিক জীবনে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহা তাহার নিঃসঙ্গতাকে ঘনীভূত করিয়া তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার সমস্ত চিত্তকে বর্তমান-পরাঙ্মুখ করিয়া অতীত-রোমন্থনে নিবিষ্ট করিয়াছে। উপন্যাসের যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই মর্মান্তিক শোকের পরবর্তী—পুত্রের মৃত্যুর পর পাঁচবৎসরব্যাপী বৈরাগ্য ও অন্তঃপুরনিরুদ্ধ জীবন যাত্রার পর কিশোরের জনসেবার জন্য আহ্বান আবার তাহাকে আশু কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। উপন্যাসে আমরা যে জীবন দত্তের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাই, সে তাহার পূর্ব জীবনের প্রেতচ্ছায়া, তাহার ব্যক্তিত্ব লক্ষ্যহীনতা ও জীবনা-বেগরিক্ততার রাহুকবলিত। দ্বিতীয় ঘটনায় শশাঙ্কের স্ত্রী তাহার স্নেহদুর্বল আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে যে অপ্রত্যাশিত আঘাত হানিয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত পূর্ব ধারণা বিপর্যস্ত হইয়াছে ও সে জীবন ও মৃত্যুর ও চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছে। জীবনের উপর আসন্ন মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কেবল যে অশ্রুপ্লাবিত, সমবেদনার জন্য কাঙ্গাল, ভাঙ্গিয়া-পড়া ভাবপ্রবণতাই নহে, লৌহকঠিন সত্যস্বীকৃতি ও সুলভ সান্ত্বনার দৃঢ় প্রত্যাখ্যান—শশাঙ্কের তরুণী স্ত্রী তাহাকে এই নূতন শিক্ষা দিয়াছে।

মহাদেবের নীলকণ্ঠের ন্যায় জীবন মশায়ের সমস্ত অন্তর মৃত্যুবিষজারিত হইয়া নীল হইয়া গিয়াছে; তাঁহার অনুভূতি মৃত্যুধ্যানভাবিত হইয়া তাঁহার পরিবারপ্রতিবেশের সর্বত্র মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে। মঞ্জরী তাঁহার কল্পনায় মৃত্যুদূতীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আতর বউ মৃত্যুরূপিনী শক্তিরূপে তাঁহার সমস্ত জীবনকে বিষজর্জর ও বেদনা-নীল করিয়াছে। মৃত্যুস্বরূপের সহিত ধ্যানাধিগম্য গভীর একাত্মতা এই সাদৃশ্য-কল্পনার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের মরণ তাঁহার জীবনব্যাপী মৃত্যুরহস্যভেদ-প্রয়াসের অন্তিম পর্ব; মৃত্যুকে রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিষয়রূপে অনুভব-সাধানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।

উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী, অলক্ষ্যসঞ্চারিণী, রহস্যাবগুণ্ঠিতস্বরূপা মৃত্যুদেবী। সমস্ত উপন্যাসে তাহারই কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিচিত্র অবস্থা-ভেদের মধ্যে তাহার আবির্ভাবের আভাস উপন্যাসের ভাববৈচিত্র্যের মূল উৎস। তাহারই অলক্ষ্য সত্তা নানা আভাসে-ইঙ্গিতে, জীবনবীণায় নানা রাগিণী বাজাইয়া, মানব-মনের গভীরে নানা আবর্ত-চক্র জাগাইয়া, তাহার ভাষায় ও আচরণে নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার রেখাজাল অঙ্কন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফিরিয়াছে। রাহুগ্রস্ত সূর্যমণ্ডল যেমন কম্পমান রশ্মিজালে, বেদনা-পাণ্ডুর ম্লান আলোকে নিজ অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটিত করে গ্রহণাভিভূত চন্দ্র যেমন নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া উহার স্নিগ্ধরশ্মির অন্তরালস্থিত ঊষর মরুভূমি ও পর্বতমালাকে প্রকটিত করে, তেমনি মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মানবজীবন প্রাত্যহিকতার অবগুণ্ঠন সরাইয়া উহার প্রাণকেন্দ্রের সূক্ষ্মতম, গোপনতম স্পন্দন, উহার হৃৎপিণ্ডের আদিম

সংজ্ঞার অনুভূতিগুলিকে অনাবৃত প্রকাশ্যতায় মেলিয়া ধরে—মৃত্যুকবলিত জীবনের বেদনা-বিধুর, নগ্ন রূপটি সমস্ত গোপনতার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসে। এই মৃত্যু কোন ভয়াবহ বীভৎসতায় আত্মপ্রকাশ করে নাই, ইহা জীবনসূত্রের কোন আকস্মিক ছেদ নহে, ইহা বিশ্ববিধানের নীরব অথচ অমোঘ ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ইহা অন্তরের ধ্বংসবীজের শান্ত পরিণতি। মৃত্যুর এই রূপকল্পনা উপনিষদ ও পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত; তথাপি ইহা লেখকের বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও নিগূঢ় অনুভূতির সাহায্যেই ও পাঠকের ঔচিত্যবোধের সমর্থনে সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যে দেশে অধ্যাত্মরহস্যকে অনুভূতিগম্য করিবার জন্য সাধনার শেষ নাই, দিব্য দৃষ্টি যেখানে স্থূল বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রকৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যেখানে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেখানে বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক যে জীবনবেষ্টনকারী চরম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষগোচর করিতে চেষ্টা করিবেন, জীবনের যে খণ্ডাংশগুলির মধ্য দিয়া ওপারের আলো আংশিকভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে সেইগুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন, দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা লইয়া জীবনরস আস্বাদনে অগ্রসর হইবেন, তাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক অনুবর্তন ও সম্প্রসারণরূপেই গণনীয়। এখানে ঔপন্যাসিকের জীবনসাধনা জীবনকে অস্বীকার করে নাই, জীবন-অন্তরীপের যে সূক্ষ্মাগ্র মৃত্যু-মহাসাগরের কল্লোলিত স্তব্ধতার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়াছে তাহার মধ্যেই সমুদ্র-রহস্যের পরিমাপ করিতে চাহিয়াছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও কল্পনাগাম্ভীর্যের দিক দিয়া ইহা এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছে।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও বড় উপন্যাস একই সূত্রে গাঁথা, একই দোষগুণের আকর। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃত্রিম সরলতা চরিত্রসৃষ্টি ও জীবনসমালোচনায় তুল্যভাবে প্রকটিত। তাঁহার মধ্যে জটিল বিশ্লেষণের আতিশয্য নাই: তাঁহার চরিত্রগুলি সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণশক্তি-সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক। তাঁহার উপন্যাসের কোন দৃশ্য অবিস্মরণীয়ভাবে মর্মমূলে মুদ্রিত হয় না—সর্বত্রই একটা পরিমিত সুসমঞ্জস ভাবগভীরতার উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। রাঢ়দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার কয়েকটি অধ্যায়, বিশেষতঃ জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আর্টের চিরন্তন সৌন্দর্যে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র অপ্রধান ও প্রেম গৌণ। স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, অতিরঞ্জনের রং না ফলাইয়া, বিশ্লেষণের আতিশয্যে চরিত্রসংগতি বিসর্জন না দিয়া যে উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লেখা সম্ভব তারাশঙ্কর তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণে রাজনৈতিক আবেদনের অপব্যবহার-খাদ মিশানো আছে। এই খাদের পরিমাণ-নিয়ন্ত্রণের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ আর্টের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি আশু-জনপ্রিয়তার মোহ অতিক্রম করিয়া চিরন্তনতার দুরূহতর অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন কি না এই প্রশ্ন সমালোচকের মনে আবর্তিত হইতে থাকিবে। তাঁহার শেষ দুইটি উপন্যাসে তিনি এই মোহ কাটাইয়া ও সার্বভৌম জীবনবোধের স্তরে আপনাকে উন্নীত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আশঙ্কাকে অপনোদন করিয়াছেন।

(৮)

তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক উপন্যাসাবলী তাঁহার মূল রচনাধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ

রাখিয়াও কিছু বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত মনে হয়। তাঁহার উপন্যাসের বিরাট আয়তন সঙ্কুচিত হইয়া জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডাংশের রসবৈচিত্র্য-আবিষ্কারে নিয়োজিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বহির্জীবন অপেক্ষা তাহার ধর্মসাধনার বিশিষ্ট ছন্দ ও অশান্ত, সংশয়দষ্ট আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রতিই লেখকের লক্ষ্য দৃঢ়নিবদ্ধ। বাঙালীর জীবনে দীর্ঘযুগের অভ্যাস-সংস্কার-পুষ্ট, কখনও অর্ধমূঢ় আচারনিষ্ঠায় স্তিমিত, কখনও বা হঠাৎ-শিখায় উদ্দীপ্ত, সংস্কৃতি-চেতনাই যে মনস্তত্ত্ব ও অস্তিত্ব-গৌরবের দিক দিয়া সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ইহাই তারাশঙ্করের ধ্রুব প্রত্যয়। এই ধর্মজীবনের ব্যাখ্যাতারূপে তিনি অন্যান্য সমকালীন ঔপন্যাসিক হইতে স্বতন্ত্র। তারাশঙ্করের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্মস্থান লাভপুরের সমাজে প্রাক্-আধুনিক যুগের সমাজবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন উপাদান একটা কৌতূহলোদ্দীপক, নানামুখী ধর্ম-ও-আচার-সংঘাতের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল। এই সমাজের রাঢ়দেশে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাধান্যও ছিল। এখানে শাক্ত-বৈষ্ণব, প্রাচীন কৌলীন্যপ্রথার-গোঁড়া সমর্থক বিভিন্নদলভুক্ত সমাজপতিসমূহ, একদিকে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতবংশ ও সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি ও অপরদিকে হঠাৎ-ধনী শিল্পপতিগোষ্ঠী, কূটচক্রী প্রৌঢ় ও বেপরোয়া উষ্ণরক্ত যুবক, রাজভক্ত জমিদার ও আধুনিককালের রাজনৈতিক বিপ্লবী—এই সকলের পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও দারুণ নেতৃত্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমস্ত বাতাবরণকে উত্তেজনাচঞ্চল ও নাটকীয় সংঘাতের প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিল। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক চেতনা এই সংগ্রামোদ্যোগের উন্মাদনাপূর্ণ প্রতিবেশে উহার মানব-চরিত্রজ্ঞানের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এইখানেই মানবপ্রকৃতির বিচিত্রতার দৃশ্য ও চরিত্রবিকাশ ও জীবনদ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি তাঁহার দৃষ্টির নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। যে সমাজব্যবস্থা ও ধর্মানুশাসনের সম্মিলিত প্রভাবে বাঙালীর ব্যক্তিজীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তারাশঙ্করের উপন্যাসে তাহাদেরই প্রাধান্য। তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত, সমাজ-বন্ধনবিচ্ছিন্ন, সার্বজনীন মানবিকতার চিন্তা-ও-প্রবৃত্তিসাম্য-চিহ্নিত, সহরের ফ্ল্যাটের আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার চিত্রকর নহেন। সেইজন্য তাঁহার নর-নারী সাম্প্রতিক যুগে বাস করিয়াও ঐতিহ্য-প্রভাবিত, অতীত-নিয়ন্ত্রণের বশীভূত, তাহাদের ব্যক্তিত্ব সেই পুরুষ-পরম্পরাগত, ধর্ম-ও-সমাজকেন্দ্রিক জীবনসংস্কারেরই ফল। সেইজন্য বাঙলার সমাজ ও পরিবার-জীবনে যাহা দুর্লভ সেই অবৈধ প্রেমের কাহিনী তাঁহার উপন্যাসে দুর্লভতর; ব্যভিচারের পিছনে কোন উন্নততর নীতিবোধের সমর্থন নাই। তাঁহার সমস্ত চরিত্রাঙ্কন ও জীবনসমীক্ষার মুখ পিছন-ফেরা—যে অতীতের লুপ্তাবশেষ অস্তগগনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার শেষ কয়েকটি ম্লানরশ্মি তাঁহার উপন্যাসে অন্তিম আশ্রয় লাভ করিয়াছে। যাহাদের জীবনে ধর্মের যথার্থ প্রেরণা নাই, তাহাদের চিন্তায়-কর্মে অন্ততঃ উহার বাহ্য খোলসটি জড়াইয়া আছে—অলঙ্কারশূন্য দেহে অন্ততঃ অলঙ্কারের শূন্যতার আবরণরূপ কলঙ্কচিহ্ন বর্তমান। তারাশঙ্কর বোধ হয় বাঙলার শেষ জীবনশিল্পী যিনি জীবনকে কেবল প্রবৃত্তির রমণীয়তায়, সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের শিল্পসৌন্দর্যে বর্ণাঢ্যরূপে চিত্রিত করিতে চাহেন নাই—একটা বৃহত্তর, আত্মসীমা-বহির্ভূত তাৎপর্যের সহিত যুক্ত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তারাশঙ্করের সমস্ত ছোট-বড় উপন্যাসে একটা মহত্তর জীবনসত্য-আভাসের প্রয়াস লক্ষণীয়। ইহাই আধুনিক ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার বিশেষত্ব।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) তারাশঙ্কর-প্রতিভার আর একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বাঙলার সমাজবিন্যাসের অদ্ভুত জটিলতা ও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নিম্ন-শ্রেণীর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-আচার বিষয়ে তাঁহার যে কি আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসটিতে তাহার বিস্ময়কর প্রমাণ মিলে। যে সমস্ত অনার্যজাতি ক্রমশঃ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া আর্যধর্মের অধ্যাত্মভাবপ্রধান নিয়ম-সংযমের সহিত তাহাদের প্রাচীন সমাজপ্রথা ও জীবনবোধকে এক উদ্ভট সমন্বয়ে গ্রথিত করিয়াছিল, বেদে সম্প্রদায় তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সর্পসঙ্কুল বাঙলা-দেশে যে প্রেরণা হইতে মনসাপূজার উদ্ভব, ঠিক সেই প্রেরণাই বিষবৈদ্য বেদে সম্প্রদায়ের নানা জটিল বিধিনিষেধকণ্টকিত ও অন্ধবিশ্বাসের আবেগতাড়িত জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠার মূলে। সাপের সঙ্গে মানুষের যে চিরবিরোধ তাহাই ইহাদের জীবনবেদের অদ্ভুত জারণক্রিয়ার ফলে এক অপরূপ স্নেহশঙ্কামিশ্র অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হইয়াছে; বেদেদের বাসস্থান সাঁতালি গ্রাম সুদূর মধ্যযুগের স্মৃতিরোমন্থনে আবিষ্ট, সাপের বিষনিঃশ্বাসে উগ্র, নানা অলৌকিক সংস্কারচর্যায় কল্পনা-রোমাঞ্চিত, এক আশ্চর্য ধর্মনিষ্ঠা ও সমাজশাসন-স্বীকৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ, জীবনের অমোঘ দুঃখময়তা ও নিয়তিবাদের অনিবার্যতায় মহিমান্বিত। এই বেদে-জগতের বাতাবরণ মা-বিষহরির অদৃশ্য উপস্থিতির আভাসে-ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ; হিংস্র বন্যজন্তুর চাপা গর্জন ও বিষধর সর্পের হিস্‌হিসানি এবং ক্ষিপ্র আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ইহার দিনের মুহূর্তগুলিকে চকিত ও রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারকে রহস্যময় করিয়া রাখে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই বাতাবরণটি অপূর্ব বর্ণনাকৌশলে ও ব্যঞ্জনাধর্মিতায় অপরূপ সঙ্কেতভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। উহার মানুষগুলি যেন এই বাতাবরণেরই অঙ্গীভূত—অরণ্যমর্মরে মেশা পতঙ্গগুঞ্জনের ন্যায় এই মন্ত্রশক্তিতে অভিভূত আবহাওয়ায় মানুষের স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর কখনও স্তিমিত অস্পষ্টতায়, কখনও বা প্রখর উন্মত্ততায় শোনা যায়। বেদে অধিবাসীদের লৌকিক জগৎ যেমন হিন্দুসমাজছাড়া হইয়াও উহার প্রান্তদেশ-সংলগ্ন, সেইরূপ উহাদের ধর্মসংস্কারের জগৎ আর্যধর্ম হইতে পৃথক, অথচ আর্যধর্মানুসারী নিজস্ব পুরাণকল্পনা ও উদ্ভট কিংবদন্তীসমবায়ে রচিত হইয়াছে।

কিন্তু এই অদ্ভুত ও যাযাবর জীবনযাত্রার মুখ্য আশ্রয় হইল শিরবেদের দলপতি-শাসন ও নাগিনী কন্যার দেবলোকরহস্যের তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটন। একজন তাহাদের লৌকিক জীবনের রীতি ও জীবনপ্রয়াসের পর্যায়ক্রম নিরূপণ করে, অন্যজন লৌকিকের মতই অবশ্য-প্রয়োজনীয় অলৌকিক জগতের বার্তা বহন করিয়া আনে, দেবানুগ্রহনিগ্রহের নিগূঢ় তত্ত্বটি ধ্যান-বলে প্রকটিত করে। এই দ্বৈত শাসনের অক্ষরেখাকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের জীবনধারা আবর্তিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজশক্তি ও যাজকশক্তির দ্বন্দ্বের মত শিরবেদে ও নাগিনী কন্যার শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেদে জাতির ইতিহাসে একটা চির-আবৃত ঘটনাক্রম। তারাশঙ্করের উপন্যাসে একবার মহাদেব ও শবলা আর একবার গঙ্গারাম ও পিঙ্গলার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ পরিণতি ও নির্মম ঘাত-প্রতিঘাত দেখান হইয়াছে। শিরবেদে সমাজনেতা, কিন্তু তাহার কোন অলৌকিক শক্তি নাই। নাগিনী কন্যা মা-বিষহরির সেবায় উৎসর্গীকৃতা, বিশেষ-অবয়বচিহ্নাঙ্কিতা, জীবনসংঘটনের একটি বিশেষ-পরিণতি-পরিচিতা যুবতী নারী। সেই

বেদে জাতির ধর্মবোধের প্রতীক, উহাদের অপরাধস্খালনকারিণী ও চারিত্র্যবিশুদ্ধিরক্ষয়িত্রী পুণ্যশক্তি, দেবমানসের প্রত্যক্ষসংস্পর্শজাত দিব্যদৃষ্টির অধিকারিণী। অতন্দ্র, নির্নিমেষ, অন্তর-রহস্যাবগাহী বিধাতৃ-চেতনা যতই ক্ষীণভাবে হউক তাহার মধ্যে সক্রিয়; দেবতার ইচ্ছা তাহারই মধ্যে অন্ধকার রাত্রির খদ্যোৎদীপ্তির স্থায় ক্ষণিক আলোকবিন্দুতে উদ্ভাসিত। সমস্ত সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম জীবন তাহারই অঙ্গুলি-হেলনে সঞ্চালিত। প্রাচীন সমাজজীবনের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না, ধ্যানমহীয়সী নারীর (prophetess) স্থায় বাঙলাদেশে উনবিংশ শতকে এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মৃত্যুদূতের সহিত নিবিড় সংশ্লেষাবদ্ধ, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাগিনী কন্যা যেন অবলুপ্ত অতীতের শেষ বিস্ময়কর নিদর্শনরূপে বর্তমান।

নাগিনী কন্যার পরিকল্পনাটি আশ্চর্য রকমের মৌলিক; বাংলাদেশের অসংখ্য অনার্য মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে একটির গোপনতম জীবনরসনির্যাস যেন ইহারই মধ্যে নিহিত। সর্পবিষের মন্ত্র ও ঔষধির মত উহার অস্তিত্ব ও দুর্বোধ্য ক্রিয়াকলাপ জাতির গণ্ডীবহির্ভূত সমস্ত মানুষের নিকট হইতে প্রাণপণ প্রয়াসে সংবৃত। তারাশঙ্কর যে কেমন করিয়া রহস্যের দুর্ভেদ্য গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই গুহ্যতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন তাহা একটা পরম আশ্চর্যের বিষয়। মনসার পূজাবিস্তারের পিছনে যে কি প্রেরণা ছিল, নাগিনী-কন্যাতত্ত্ব হইতে তাহার কিছু ইঙ্গিত মিলে। হিংস্র, ক্রূর সর্পরাণীর উপর মাতৃত্বের স্নিগ্ধতার ও দেবীত্বের ভক্তিসাধনার আরোপ সম্ভব হইয়াছিল ভীতিনিরসনের কোন চাটুকৌশলপ্রয়োগে নহে, কিন্তু এক অভাবনীয় ধ্যানকল্পনার তন্ময়তায় সর্পের সহিত মানুষের একাত্মীকরণের দ্বারা। নাগিনী কন্যা সেই একাত্মীকরণের আশ্চর্যতম নিদর্শন। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অঘটনঘটনপটীয়সী সমীকরণ-শক্তি নাগের দেহ-আত্মা মানবিক সত্তাচেতনায় স্থানান্তরিত করিয়াছে, নাগিনীর সঙ্গে মানবীর সমপ্রাণতা ঘটাইয়াছে। ইহাদের কৃচ্ছ্রসাধন, অবদমিত যৌবনবুভুক্ষা ইহাদের দেহে ও মনে এক রহস্যময় দাহজ্বালা সঞ্চার করে, ও অনুভূতিতে এক আশ্চর্য কল্পনাবিভ্রমের বিকার ছড়ায়। যৌনমিলনেপ্সু নাগিনীর স্থায় যৌবনক্ষুধাসন্তপ্তা নাগিনী কন্যার দেহ হইতে চম্পক-সৌরভ বিকীর্ণ হয়—দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের কি অচিন্তনীয় গোত্রান্তর। উপন্যাসটি প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ-পটভূমিকা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসের সর্বব্যাপিত্ব, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনা—এই পাঁচটি উপাদানের সার্থক সমবায়ে একটি অপূর্ব অবয়ব-ঘনত্ব ও গীতিকবিতাসুলভ নিবিড় সুরসঙ্গতি অর্জন করিয়াছে। হিজল বিলের ঘন কাশবন ও শরের ঝোপ, উহার তীরস্থ আরণ্য জটিলতা, হিংস্র পশু-ও-সর্পসঙ্কুলতা, উহার পশু-পক্ষীর অভ্যস্ত সংস্কার ও সঙ্কেতময় গতিবিধি যে রহস্যবিভীষিকাময় পটভূমিকা উন্মোচন করে সমস্ত কাহিনীটি তাহার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা।

বিষবৈদ্যদের সমাজপ্রথা ও কঠোর নিয়মাধীন জীবনযাত্রা উপন্যাসের কেবল বাহ্য উপাদান নহে, উহার অন্তরছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। শিরবেদে ও নাগিনী কন্যার পুরুষানুক্রমিক বৈরভাব তাহাদের মনের গহনে সংক্রামিত হইয়া সমস্ত সমাজজীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছে ও চরম সঙ্কটের পথে লইয়া গিয়াছে। ভদ্রসমাজের সহিত বেদেগোষ্ঠীর সম্পর্ক কেবল কবিরাজকে বিষযোগান, গৃহস্থের বাড়ীতে সাপধরা ও ভিক্ষাযাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জীবননীতিতে উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এই সমাজের

আকাশ-বাতাসে ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষতা ও ব্যাপ্তি ইহাকে এক দুর্বোধ্য ভয়াল দৈবশক্তির ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। সর্প ইহাদের জীবনে দেবতার রোষ ও প্রসাদের প্রতীক—মা-বিষহরির ইচ্ছায় বিদ্যুৎজ্বালাময়, অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। এই সর্পই তাহাদের সহিত অদৃশ্য, কিন্তু সদা-সন্নিহিত দেবলোকের সংযোগসূত্র। মনসার উপস্থিতি তাহাদের মধ্যে যে কত প্রত্যক্ষবৎ সত্য, উহার বেষ্টন যে কত নিবিড়, অলৌকিক জগৎ যে তাহাদের অনুভূতি-সীমায় কত সহজে ধরা দিয়াছে তাহা তাহাদের প্রতি চিন্তায় ও কর্মে পরিস্ফুট, তাহাদের প্রতি উৎসবে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। তাহারা নিজের পুরাণ ও কিংবদন্তী নিজেরা রচনা করিয়াছে—তাহাদের ধর্মকল্পনা আর্যশাস্ত্রের ঈষৎ ইঙ্গিত-অবলম্বনে নিজ আন্তর দীপ্তিতে পরলোকরহস্যের নূতন নূতন দিক আলোকিত করিয়াছে ও নর ও নাগের সম্পর্কঘটিত নূতন পুরাণকাহিনীর উদ্ভাবনে নিজ সজীবত্বের পরিচয় দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাপবোধ এত উগ্র ও কর্তব্যনিষ্ঠা এত দৃঢ় যে, বিধিপালনের তিলমাত্র বিচ্যুতিতে ইহাদের উদ্বেগ অসংবরণীয় হইয়া উঠে। শিরবেদে নাগিনী কন্যার আদর্শচ্যুতির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি মেলিয়া রাখে; ও নাগিনী কন্যা নানা উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে আত্মপরীক্ষা করে ও নিজ জাতির মান ও ধর্মনিষ্ঠা সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে।

এই জটিল ও পূর্বনির্ধারিত পটভূমিকায় ইহাদের মানবিক চরিত্রের স্ফুরণ হয়। শিরবেদে ও নাগিনী কন্যা—এই দুইজন মাত্র নিজ নিজ বৃত্তিগত অনুশীলনের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। ইহাদের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার আগুন জ্বলিয়া উঠে, সেই উত্তেজনার বিস্ফোরকতার প্রাবল্যে তাহাদের ব্যক্তিসত্তা সমষ্টি-চেতনার নির্মোক ভেদ করিয়া নির্গত হয়। ইহার উপর যৌনকামনার দাহজ্বালা নাগিনী কন্যাকে দারুণ অস্বস্তিতে জর্জরিত করিয়া এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে উৎক্ষিপ্ত করে ও শিরবেদের সঙ্গে তাহার দ্বন্দ্বকে এক ক্রূর নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের পর্যায়ে লইয়া যায়। শবলা এক তরুণ বেদের প্রতি আসক্তি অনুভব করিয়া তাহার দুশ্চর ব্রতপালনে শিথিল-সংকল্প হইয়াছে ও মহাদেব শিরবেদেকে তাহার প্রতি দেহলালসায় প্রলুব্ধ করিয়া নাগদন্তের আঘাতে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছে। মহাদেবও তাহাকে সর্পদংশনে মারিবার চেষ্টায় কিছুমাত্র ইতস্তত: করে নাই। শেষ পর্যন্ত শবলা নাগিনী কন্যার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এক মুসলমান বেদের সহিত সংসার বাঁধিয়াছে। তাহার পরবর্তী নাগিনী কন্যা পিঙ্গলা নাগুঠাকুরের প্রেমে পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নাগদংশনে নিজ জীবন আহুতি দিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমিক নাগুঠাকুর শিরবেদেকে হত্যা করিয়া সাঁতালি গ্রাম হইতে সমস্ত বেদেকে উদ্বাস্ত করিয়াছে। তারাশঙ্কর অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা নাগিনী কন্যার আকৃতি-অঙ্গভঙ্গীতে, চোখের চাহনি, গতির দ্রুততা ও নিঃশব্দতা, দেহসজ্জার ও কবরী-রচনার লাস্যে, উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগে, স্বভাবের হিংস্রতার হঠাৎ দ্যোতনায় মানবীর মধ্যে নাগিনীর আত্মাকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। যে কালনাগিনী লখিন্দর-হননের অভিযানে বাহির হইয়া বিষবৈদ্যের কন্যার ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিল ও তাহার সতর্ক প্রতিরোধকে এড়াইয়াছিল, সেই যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নাগিনী কন্যার মধ্যে নব নব জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। পুরাণকল্পনা ও অন্ধ ধর্মসংস্কার যে বাস্তব জগতে রক্তমাংসের প্রাণীরূপে মূর্ত হইতে পারে নাগিনী কন্যা তাহারই বোধ হয় একমাত্র আধুনিক দৃষ্টান্ত।

এইভাবে নাগিনীকন্যার ধারা বিলুপ্ত হইয়াছে ও বেদেজাতির সমাজবন্ধন ও জীবননীতি বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ শতাব্দী-পরম্পরা ধরিয়া গড়িয়া-উঠা এক সাম্প্রদায়িক জীবন-ক্রম এইভাবে চিরবিলুপ্তির অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইয়াছে—এক ধর্মকেন্দ্রিক, আচারে-সংস্কারে দৃঢ়বদ্ধ, সমষ্টিগত জীবননাট্যের উপর যবনিকা পড়িয়াছে। তারাশঙ্করের ইতিহাস-জ্ঞান ও ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিরল সমন্বয়েই এই প্রাচীন-ঐতিহ্যময় জীবনকাহিনী ভবিষ্যৎ কালের জন্য সাহিত্যের স্বর্ণপেটিকায় অবিস্মরণীয়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। আমরা সর্পবিদ্যা, বিষচিকিৎসার মন্ত্রৌষধি চিরকালের জন্য হারাইয়াছি; কিন্তু বেদে-জীবনের সংস্কৃতি বাস্তব জীবন হইতে লুপ্ত হইলেও যে সাহিত্যে নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গেল, সেজন্য আধুনিক পাঠক তারাশঙ্করের নিকট চিরঋণী থাকিবে।

'কালান্তর' (আগষ্ট, ১৯৫৬) তারাশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক ও তাঁহার স্বগ্রামসমাজ-সম্পর্কিত উপন্যাস। ইহাতে তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা দুই-এরই নিদর্শন মিলে। উপন্যাসের নায়ক গৌরীকান্ত তারাশঙ্করেরই ছদ্মনাম—তারাশঙ্করের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা, এমন কি তাঁহার সাহিত্যকৃতিও তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরে গ্রাম হইতে বিতাড়িত গৌরীকান্ত সাহিত্যসাধনার যশোমুকুট মস্তকে পরিয়া এক আকস্মিক প্রেরণার বশে স্বাধীনতার পর প্রথম নববর্ষের দিন গ্রামে ফিরিয়া পূর্বস্মৃতিরোমন্থনে মগ্ন ও গ্রামজীবনের বিপর্যয়-দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া এক বিপ্লবীর ভাগিনেয়ী তাহার পূর্বপরিচিতা শান্তির সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে। উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়িয়া অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি—ইহার মধ্যে প্রাচীন সমাজবিন্যাস ও কৌলীন্যপ্রথার খুব কৌতূহলো-দ্দীপক বিবরণ মিলে, কিন্তু উপন্যাসে ইহার মূল্য ভূমিকা বা পশ্চাৎপটের অতিরিক্ত নহে। এই পূর্বকথনের মধ্যে আবার পুরাণকাহিনী আছে, প্রাচীন কিংবদন্তী ও ইতিহাসের ছায়া আছে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আদর্শগত বিরোধের বিবরণ আছে, নাগের মাঠের অতীত মহিমা ও বর্তমান জনপ্রসিদ্ধির বর্ণনা আছে, কিন্তু এ সমস্তই উপন্যাসের গৌণ উপাদান। গৌরীকান্তের এই পুরাণবিলাস সম্বন্ধে শান্তি যে তীব্র, তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছে তাহা যেন তারা-শঙ্করের কাল্পনিক পুরাতত্ত্বপ্রিয়তার উপর তাঁহার নিজেরই সমালোচনা। আধুনিক জীবনে এই জাতীয় আলগা ধর্মসংস্কার অবান্তর প্রক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনার যে অংশটুকু বর্তমান উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক, তাহা বিশ্বেশ্বরীর প্রতি কিশোর গৌরীকান্তের সাহিত্যআস্বাদনভিত্তিক আকর্ষণসঞ্চার, বিশ্বেশ্বরীর আত্মহত্যা, এই লইয়া গ্রামসমাজে তুমুল আলোড়ন ও গৌরীকান্তের উপর বহিষ্করণের আদেশ-জারি। ইহা হইতে আমরা গৌরীকান্তের অতীত জীবন ও গ্রামের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের স্বরূপটি সম্বন্ধে জানিতে পারি।

গৌরীকান্তের ফেরার পর গ্রামসমাজে শান্তিকে লইয়াই আলোড়ন শুরু হইল। আধুনিক যুগে যাহারা সমাজজীবনের অংশভাক্, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ-শিষ্য আদর্শবাদী, অধুনা প্রায়-বাতিল কিশোরবাবু, গৌরীকান্তের জ্ঞাতি-ভ্রাতা হঠকারী বিজয়, বিশ্বনিন্দুক ইতর মহাদেব সরকার, জমিদারপুত্র, এখন সহর-প্রবাসী গুণীবাবু, শান্তির প্রণয়ী বামপন্থী কপিলদেব, অক্ষয় ঘোষাল, ধর্মরাজের পুরোহিত নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ রামহরি চক্রবর্তী ও মেয়েদের মধ্যে

শান্তি ও রমা উল্লেখযোগ্য। এই সমাজে কোন বৃহৎ সত্য বা মহৎ জীবনপ্রয়াস নাই, আছে ছোটখাট বিরোধ ও শক্তি-অধিকারের অশোভন ব্যগ্রতা। অবশ্য শেষ মুহূর্তে দুইটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটিয়াছে—প্রথম, গৌরীকান্তের সঙ্গে শান্তির মিলন ও কপিলদেব কর্তৃক কিশোরবাবুকে গুলিবিদ্ধ করা। এ যেন নিস্তরঙ্গ পল্বলে হঠাৎ সমুদ্রের জোয়ার জাগা। যে জীবনধারার ইতিহাস আমরা উপন্যাসে পাই, এই দুইটি ঘটনা তাহার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে হয় না।

উপন্যাসে এই জীবনধারার দুইটি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা পাই। এই ভাষ্যকারদের একজন উগ্র বিপ্লববাদী নাস্তিক কপিলদেব, দ্বিতীয়, গোঁড়া প্রাচীনপন্থী কুলীন-সন্তান সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। কপিলদেবের বিশ্লেষণে আধুনিক বাঙালীর জীবন বিসদৃশ উপাদান-সাংকর্যে যুগসামঞ্জস্য হারাইয়াছে। বিপ্লবী, বিপ্লবের সঙ্গে গীতাতত্ত্ব মিশাইয়া, শান্তি, ধর্মের কুয়াশাকে তাহার স্বাধীন চিন্তার স্বচ্ছতা হইতে মুক্ত না করিয়া, জীবনের বিকার ঘটাইয়াছে। রমার মধ্যে সুস্থ প্রাণকণিকা প্রচুরতর; তাহার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রবল ভোগস্পৃহা কোন কৃত্রিম আদর্শের চাপে দুর্বল হয় নাই। সুতরাং রমার মত মেয়েই ভবিষ্যতের জীবনস্রোতের সমস্ত বেগকে ধারণ করার যোগ্য। আবার, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের নবগ্রামমঙ্গল জগতের বিবর্তনে কল্যাণশক্তিরই ক্রমিক জয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। "চেতনা থেকে চৈতন্যে; অসৎ থেকে সতে; হিংসা থেকে অহিংসায়, প্রীতিতে, প্রেমে, আনন্দে" ও শেষ পর্যন্ত সচ্চিদানন্দে ক্রম অগ্রসরশীল প্রাণযাত্রার পরম পরিণতি। এই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে তারাশঙ্কর অবশ্য দ্বিতীয়ের সত্যতাতেই আস্থাবান। কিন্তু ইহা তাঁহার বিশ্বাসমাত্র, উপন্যাসবর্ণিত ঘটনার অনিবার্য ফল নহে। উভয় তত্ত্বই উপন্যাসের সহিত নিঃসম্পর্ক মননের সিদ্ধান্ত। আমরা লেখকের তত্ত্বজিজ্ঞাসার গভীরতাকে অভিনন্দন জানাইতে পারি, কিন্তু উহাকে ঔপন্যাসিকের মহৎদৃষ্টিপ্রসূত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক কালে লেখা উপন্যাসের মধ্যে 'বিচারক' (আগষ্ট ১৯৫৬), 'সপ্তপদী' (ডিসেম্বর, ১৯৫৭), 'রাধা' (মার্চ, ১৯৫৮,) 'উত্তরায়ণ' (নভেম্বর, ১৯৫৮), 'মহাশ্বেতা' (জুলাই, ১৯৬০) ও 'যোগভ্রষ্ট' (আগষ্ট, ১৯৬০)—এই কয়েকখানি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'বিচারক' উপন্যাসে বিচার শুধু যে আসামীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সত্যনির্ধারণ লইয়া চলিতেছিল তাহা নহে। উহার সঙ্গে সঙ্গে বিচারকেরও আত্মসমীক্ষা, নিজ মানস অপরাধের স্বরূপ-বিচার চলিতেছিল। এই দুই বিভিন্ন-অবস্থাভিত্তিক কিন্তু সমকেন্দ্রিক বিচারকার্যের যুগপৎ আবর্তন উপন্যাসের সমস্যাটিকে বিশেষ ঘোরাল করিয়াছে। আসামীর বিচারকালে বিচারক মুহুর্মুহুঃ নিজ মনের অতল গভীরে ডুব দিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে আসামীর আচরণের সঙ্গতি মিলাইয়া লইতেছিলেন। কাজেই যে নৈর্ব্যক্তিক অপক্ষপাত ন্যায়বিচারের প্রধান অবলম্বন, এ ক্ষেত্রে তাহারই ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। বিচারক নিজ অনুভূতির আলোকে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিগূঢ়গুহাশায়ী মনোভাবটি পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের উকিলের বক্তৃতার সহায়তা ব্যতীত ও মুখ্যতঃ এই আত্মোপলব্ধির দ্বারাই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বাহিরের বিচারক্রিয়া গৌণ হইয়া গিয়াছে;

অন্তরের নীরব আত্মদ্বন্দ্বই উপন্যাসে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ক্ষীণ হইয়াছে, আত্মবিচারিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে সংশয়ান্দোলিত বিচারকই অপরাধী ও শাস্তিদাতা উভয়ের পরস্পর-বিরোধী অংশ আশ্চর্যভাবে মিলাইয়া উপন্যাসের নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বাহিরের আদালতে তাঁহার বিচার নাই বলিয়াই অন্তরের ধর্মাধিকরণে তিনি নিজের উপর আরও ক্ষমাহীন হইয়া উঠিয়াছেন।

অবশ্য নগেনের দোষ সম্বন্ধে অভিপ্রায়-খোঁজার একটু আতিশয্যই হইয়াছে—নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে সে যে নিমজ্জমান ভাই-এর শ্বাসরোধী গলবেষ্টন হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল ইহা যে কোন জুরি ও জজ মানিয়া লইয়া তাহাকে খালাস দিতেন। প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তির পিছনে ঠেলা দিয়াই থাকে তথাপি প্রত্যক্ষ-প্রয়োজনটাই অপরাধক্ষালনের সঙ্গত কারণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিবে। ঝড়ে যদি গাছ পড়ে, তবে কে কোন্‌দিন কুঠারের দ্বারা উহার মূলকে শিথিল করিয়া উহার পতন-প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল তাহার হিসাব লওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে সরকারী উকীলের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক বক্তৃতা উপন্যাসের পক্ষে মানানসই হইলেও বাস্তব বিচারপদ্ধতিতে ভাববিলাসের বাড়াবাড়ি। সুমতি ও সুরমার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে ও এই ব্যাপারে জ্ঞানেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-সন্ধানী দৃষ্টি যে তাঁহার অন্তরের গোপনতম স্তর পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ নির্দোষিতার প্রত্যয়ে স্থির করিয়াছে তাহাই উপন্যাসে ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ বিচারের চরম নিদর্শন। সুমতির নিদারুণ ঈর্ষা ও কুৎসিত সন্দেহ তাহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বালিয়াছিল তাহারই বহির্জগতে বিস্তৃতি গৃহদাহের ও তাহার নিজের অগ্নিদগ্ধ মৃত্যুর কারণ হইল। ইহা কাব্যোচিত ন্যায়বিচারের সুন্দর নিদর্শন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অগ্নিবেষ্টনী হইতে আত্মরক্ষার সহজ-সংস্কারগত প্রয়োজনে সুমতির হাত ছাড়াইয়াছিলেন, তাহাকে আঘাত করেন নাই—ইহাই তাঁহার সঙ্গে অভিযুক্ত আসামীর পার্থক্য। কিন্তু এইরূপ পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল আত্মপ্রসাদ যে অসার তাহা তাঁহার মত সূক্ষ্ম বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারকের কেন মনে হইল না তাহা বিস্ময়কর। আসল কথা যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট, ততদূর পর্যন্তই বাহিরের ও অন্তরের উভয়বিধ বিচারেই উহা ক্ষমার্হ। নগেনের ভাইকে আঘাত করা ও বিচারকের স্ত্রীর হাত ছাড়ান একই পর্যায়ের শক্তিপ্রয়োগ, ও একই মানদণ্ডে বিচার্য। যদি সুমতিকে আঘাত করা জ্ঞানেন্দ্রনাথের আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য হইত, তখন তিনি নিজ আচরণকে নির্দোষ মনে করিতে পারিতেন কি না তাহাই আসল প্রশ্ন। যাহা হউক, শেষ দৃশ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ যে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নৈশ আকাশে নিখিল-বিচারকর্তার এক মহাসত্তার অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন তাহাই তারাশঙ্করের ঊর্ধ্বচারী ভাবসমুন্নতির চমৎকার দৃষ্টান্ত। সুরমার সঙ্গে তাঁহার দাম্পত্য সম্পর্ক এই নূতন অনুভূতির স্পর্শে বিশুদ্ধ ও মহত্তর আত্মবিসর্জনের সম্বন্ধে মহিমান্বিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'সপ্তপদী' উপন্যাসেও এই উদার ভাবমহিমা বিভিন্নরূপ প্রতিবেশে উদাহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণেন্দু ধর্মত্যাগ করিয়া রিনাকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিল, কিন্তু রিনার প্রত্যাখ্যানে তাহার মনে যে দারুণ আঘাত লাগিল তাহারই পরিণতিতে সে ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ,

সেবাব্রতী ধর্মযাজক কৃষ্ণস্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তাহার এই পরিবর্তন যবনিকার অন্তরালে ঘটিয়াছে—পরিবর্তনক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পর লেখক তাহাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। বরং কৃষ্ণস্বামী অপেক্ষা রিনার মানস পরিবর্তনের বিবরণটি আরও মনস্তত্ত্বসম্মত হইয়াছে। যে রিনা ধর্মত্যাগী কৃষ্ণেন্দুকে অসংকোচে ত্যাগ করিয়াছিল সে একটা প্রকাণ্ড আঘাত পাইয়া ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। ফিরিঙ্গি-সমাজের অবিচার ও লাঞ্ছনায় মর্মাহত হইয়া সে স্বৈরিণী-জীবনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। যদিও কার্যকারণশৃঙ্খলা বিশদভাবে দেখান হয় নাই, তথাপি মোটামুটি একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে এ সমস্ত আখ্যানবস্তু আসল উপন্যাসের ভূমিকা। উপন্যাসের সারাংশ হইল অভাবনীয় পরিবর্তনের পর পূর্ব প্রেমিকযুগলের আকস্মিক সাক্ষাৎ ও উহার ফলে উভয়ের মানস প্রতিক্রিয়া। রিনার এই পাশবিক অধঃপতনে কৃষ্ণস্বামীর মনে জাগিয়াছে প্রগাঢ় সমবেদনা ও ঈশ্বরের নিকট তাহার সংশোধনের জন্য আকুল প্রার্থনা; আর রিনার মনে এক প্রচণ্ড ঘৃণা ও হিংস্র অসহিষ্ণুতা কৃষ্ণস্বামীকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে—সে তাহার পূর্ব প্রণয়ীর এই শান্ত, ঈশ্বর সমর্পিত জীবনকে যেন বিষাক্ত দংশনে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহে। রিনার মর্মদাহী অস্বস্তি ও কৃষ্ণস্বামীর করুণাঘন প্রশান্তি পরস্পরের সান্নিধ্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের মূর্তির উপর গুলিচালনা করিয়া রিনা তাহার অন্তরের বিদ্রোহ-বিস্ফোরণকে মুক্তি দিল এবং কালাপাহাড়ী ধর্মদ্বেষের এই দারুণ অভিব্যক্তির পর কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুষ্ঠরোগীর সেবাব্রতী কৃষ্ণস্বামী নিজেও ঐ ঘৃণিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ-ভারতে এক আরোগ্যালয়ে চলিয়া গেলেন। এই সময় ক্লেটনের সহিত সদ্যোবিবাহিতা রিনা স্বামীকে লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। রিনা এই সাক্ষাতে তাহার উপর কৃষ্ণস্বামীর অদৃশ্য, সদাজাগ্রত প্রভাবের কথা বলিয়া তাহার উদ্ধার-প্রাপ্ত নবজীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। এই বিবৃতিতে যে গভীর হৃদয়াবেগ, চরাচরের সমস্ত দুঃখের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কৃষ্ণস্বামীর অলৌকিক সত্তার যে আশ্চর্য অনুভূতি রিনার চেতনাকে আবিষ্ট করিয়াছিল তাহার অপরূপ কাব্যময় ও মনস্তাত্ত্বিক-প্রত্যয়নিষ্ঠ বর্ণনা লেখকের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যুদ্ধের অভিঘাতে বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কগ্রস্ত জীবনযাত্রা ও বাঁকুড়া অঞ্চলের পল্লীজীবনের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়, তাহা একসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ ও সংকেতধর্মী। একটি ক্ষুদ্র আখ্যানকে ভাবমহিমামণ্ডিত করার শক্তি এই উপন্যাসে প্রকাশিত।

(৯)

'রাধা'কে (মার্চ, ১৯৫৮) তারাশঙ্করের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। বাংলাদেশের ইতিহাস ঠিক রাজনৈতিক ঘটনামূলক নয়, ইহা ধর্মসাধনার মর্মকথা। এখানে যুগান্তর ঘটিয়াছে ইতিহাসের বহির্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নয়, অন্তরের ধর্মসন্ধানের এক একটি বেগবান প্রবাহের অনুসরণে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-ও এই ভাবোন্মত্ত অধ্যাত্ম সাধনার দেশপ্রেমে রূপান্তরের কাহিনী, ধর্মৈষণার আবেগকে স্বদেশোদ্ধারব্রতের প্রণালীতে প্রবহমান করার প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ধর্মতত্ত্বের মূলে প্রবেশ করেন নাই, তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শক্তি-আরাধনাকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহাকেই

এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক-আদর্শমূলক কর্মপ্রেরণার রূপ দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনায় যেটুকু প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য তাহা এই যে, মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসমুহূর্তে দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্যে ধর্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের দিকে ঝুঁকিয়াছিল, অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য বলিষ্ঠ সংগ্রামনীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মের অনিয়মিত উচ্ছ্বাস ও অনভিজ্ঞ কর্মোদ্যোগ যে রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অক্ষম, দেবপূজা ও গুরুবাদ যে দেশশাসনের জটিল দায়িত্ব-গ্রহণে অপটু ইহারই গূঢ় ইঙ্গিত বঙ্কিম সত্যানন্দের প্রতি মহাপুরুষের নির্দেশের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

তারাশঙ্কর তাঁহার 'রাধা' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বঘটিত মতবাদ-সংঘর্ষের কাহিনীকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস-কাল 'আনন্দমঠ'-এর ৩০ বৎসর পূর্বে, এবং তিনি প্রধানতঃ বাঙলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির বর্ণনাতেই নিজ ইতিহাস-প্রতিবেশ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সন্ন্যাসীনায়কেরা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি অভিনিবেশপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ যে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত হানিয়াছে তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্ন্যাসীসম্প্রদায় তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। তাহাদের বিপ্লবাত্মক কার্যের জন্য কোন্‌টা সর্বাপেক্ষা অনুকূল মুহূর্ত তাহার সন্ধানে তাঁহারা শ্যেনচক্ষু। তথাপি তারাশঙ্করের উপন্যাসে ধর্মই মুখ্য, রাজনীতি গৌণ। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক মাধবানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রান্ত ধর্মমত নিরসন করিয়া বিশুদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার সংগ্রামে বৈষ্ণব-ধর্মের রাধাতত্ত্বের বিকার, পরকীয়া সাধনার বিরুদ্ধে। অতি ধীরে ধীরে, অনেকটা অনিচ্ছা-সহকারে, ঘটনার অনিবার্য তাগিদ ও তাঁহার সহকারীদের প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এ সন্তানসম্প্রদায় দেশোদ্ধারমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহাদের ধর্মসাধনার ইতিহাস অন্তরালে রহিয়াছে। 'রাধা'-য় ধর্মের দ্বন্দ্বই প্রধান, ইহা অনেকটা অজ্ঞাতসারে, ধর্মসাধনার প্রতিবন্ধক দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, রাজনৈতিক চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রে ধর্ম গোড়া হইতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে ইহা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সাধনা সীমা ছাড়াইয়া ক্ষাত্রশক্তির আশ্রয় লইয়াছে।

ধর্মাবেগের বিপরীতমুখী তরঙ্গের সমস্ত আবর্ত-সংঘাত পূর্ণভাবে দোলায়িত হইয়াছে মাধবানন্দ চরিত্রে ও অপেক্ষাকৃত আংশিকভাবে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীর জীবননাট্যে। মাধবানন্দ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে রাধাকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে দৃঢ়সংকল্প, কেননা তাঁহার ধারণা যে রাধাপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবসমাজে কৃত্রিম ভাববিলাস ও পরকীয়া সাধনার দারুণ বিকার প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ভোগাকাঙ্ক্ষাকে ধর্মসাধনার নামাবলী পরাইয়া সমাজের অনুমোদন এমনকি পুণ্যানুষ্ঠানের মর্যাদাদান করিলে সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ও পাপ-পুণ্যের সীমারেখা পর্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রাধাতত্ত্বের প্রতি মাধবানন্দের অনমনীয় বিরোধিতা। কৃষ্ণদাসী ও তাহার মেয়ে কিশোরী মোহিনীর সংস্পর্শেই এই বিরোধের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণব সিদ্ধপীঠের অধিকারিণী

ও ইসামবাজারের বড় ব্যবসায়ী রাধারমণ দাস সরকারের সাধন-সঙ্গিনী ; কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষুব্ধা ও উন্নততর নৈতিক জীবনের অভিলাষিণী। সে ও তাহার মেয়ে মোহিনী মাধবানন্দের তেজঃ-পুঞ্জ, অরুণরাগদীপ্ত রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি মোহাবিষ্ট ও তাহাদের ভক্তিনিবেদনে দেহকামনার কলুষিত ইঙ্গিত তির্যকভাবে প্রকাশিত। অবশ্য ইহাদের চিরাভ্যস্ত ধর্মসংস্কার এই দেহ-সমর্পণের আমন্ত্রণের মধ্যে দূষণীয় কিছু দেখে না, বরং ইহাকে একটা ধর্মানুষ্ঠানরূপেই গণ্য করে। সুতরাং মাধবানন্দের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে তাহারা কিছু বিস্মিতই হইয়াছে। ধর্মসাধনার নামে এই যে ব্যভিচার ইহাই তাহাদের প্রতি মাধবানন্দের ঈষৎ-করুণা-মিশ্র তীব্র ঘৃণা উৎপাদন করিয়া তাঁহার জীবনে প্রথম সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

মাধবানন্দের দ্বিতীয় সংকট বাধিয়াছে ধর্মসাধনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার ঔচিত্য লইয়া তাঁহার সহিত তাঁহার প্রধান শিষ্য কেশবানন্দের মতভেদের মধ্য দিয়া। মাধবানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্রব রাখিতে অসম্মত—ধর্মের প্রয়োজন ব্যক্তি ও সমাজের চিত্ত-শুদ্ধি ও ভগবানের বিশুদ্ধ স্বরূপ-অনুভূতিতে সহায়তা। কিন্তু কতকটা ঘটনাচক্রে ও কতকটা শিষ্য কেশবানন্দের প্রবলতর ইচ্ছাশক্তি ও কর্মতৎপরতার জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে ধর্মের সহিত রাজনীতিকে যুক্ত করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীকে দুর্বৃত্ত দাস-সরকার ও বর্গীর দলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অস্ত্র ধরিতে হইয়াছে ও রাজনীতির জটিল পাকে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে। পরিণামে কংসারির উপাসনার সহিত সংহারের দেবতা রুদ্রের আরাধনা তাঁহার ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই মিশ্র ব্রতগ্রহণের ফলে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিলতর হইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত সরলা কিশোরী মোহিনীর উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে দাস-সরকারের বাড়িতে দস্যুতার প্রশ্রয় দিতে ও তাহার ভাণ্ডার হইতে লুণ্ঠিত সম্পদ দেবোদ্দেশ্যসাধন জন্য নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে হইয়াছে। মোহিনী শেষবার তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে গিয়া রূঢ় প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়াছে ও তাঁহার অবজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য চিরতরে ত্যাগ করিয়াছে। এই প্রত্যাখ্যানের পর মাধবানন্দের সক্রিয় ধর্মসাধনা শেষ হইয়া তিনি এক নিষ্ক্রিয়, দেহ-মনে অবসন্ন, জীবনের উদ্দেশ্যহীন ছায়া সত্তায় পরিণত হইয়াছেন। শ্যামের নিকট হইতে আনন্দস্বরূপিণী রাধাকে নির্বাসিত করিয়া, প্রেমের পরিবর্তে কঠোর শক্তির উপাসনা করিয়া, তিনি এক বিরাট, সর্বব্যাপী শূন্যতাবোধের কবলিত হইয়াছেন, সীমাহীন, নীরন্ধ্র অন্ধকার মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নবাব-সৈন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া তিনি গুরুতর আহত হইয়াছেন ও এই অচেতন অবস্থায় তাঁহার প্রত্যাখ্যাতা কিশোরীর শুশ্রূষায়, সস্নেহ পরিচর্যায় তিনি আবার সংজ্ঞা ও জীবন ফিরিয়া পান। এই অন্তিম অভিজ্ঞতা তাঁহার সমস্ত পূর্ব-বিদ্বেষ জয় করিয়া তাঁহাকে রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী করিয়াছে ও ভগবানের এই প্রেমময় দ্বৈতস্বরূপে বিশ্বাস ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়-সাধিকার যুগপৎ জীবনাবসানে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা শাশ্বত আদর্শের মহিমায় অভিষিক্ত হইয়াছে।

মাধবানন্দের সাধনা-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি, তাঁহার অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রত্যয়ের বিকাশ ও পরিণতি অপূর্ব তত্ত্বজ্ঞতার সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। বিভিন্ন বৈষ্ণব ও শাক্ত

সম্প্রদায়ের সাধনাপ্রণালী ও ভাবাদর্শ সম্বন্ধেও লেখকের আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। কেন্দুলির মোহান্তের জয়দেব-প্রভাবিত সাধনাপ্রণালী, আনন্দচাঁদ গোস্বামীর তন্ত্র ও বৈষ্ণব আদর্শে, সাংসারিকতায় ও বৈরাগ্যে, প্রশ্রয় ও নির্লিপ্ততায় মিশ্রিত, ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশে রহস্যময় ধর্মানুশীলন, কৃষ্ণদাসী ও তাহার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর লৌকিক বৈষ্ণবতার বিকার ও ডাকিনী-সিদ্ধির বুজরুকির পিছনে কিছুটা সত্য আচারনিষ্ঠা ও ভক্তিবিহ্বলতার স্পর্শ, মাধবানন্দের পূর্ব-জীবনের ইতিহাসে তাহার রাধাবিদ্বেষের প্রেরণা, বাঁশরীওয়ালী প্যারেজীর নৃত্যগীতবিহ্বল, ভাবোন্মত্ত সাধনা ও প্রেমাস্পদ মানবের মধ্য দিয়া ভগবৎপ্রীতির অন্বেষণ—বাঙালী ধর্মসাধনার এক অপূর্ব তথ্যপূর্ণ, তত্ত্বানুভূতিময়, বিচিত্র বিবরণ এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই বিবরণ কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন নয়, ইহার মধ্যে লেখকের গভীর উপলব্ধির পরিচয় নিহিত। জীবনের যে রহস্য কেবল বহির্জগতের প্রভাব ও বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণশক্তির অনধিগম্য, যাহা প্রাণচেতনার গভীর মর্মনিহিত, ধর্মসাধনায় আভাসে-ইঙ্গিতে যাহার চকিত উপলব্ধি মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তারাশঙ্কর সেই অতল গভীরে অবতরণ করিয়া এই রহস্যের কিছুটা সহজসংস্কারলব্ধ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। মাধবানন্দের ধ্যানতন্ময়তার নিকট এই পরম জীবনসত্য, অস্তিত্ব-প্রহেলিকা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গবৎ ক্ষণকালের জন্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সাধনার সঙ্কট-মুহূর্ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটি স্তরে বিশদভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবনে কামনার সর্বাতিশায়ী প্রভাব, মোহের অনিবার্য সঞ্চার, দিব্যপ্রেমের জৈব কামে রূপান্তর, চৈতন্যদেবের রাধাভাব-বিভোরতার পক্ষে সর্ব-জনগ্রাহ্যতার অনৌচিত্য, সত্ত্বগুণসাধক পুরুষের দুর্বলতার রন্ধ্রপথে প্রকৃতির তামসী শক্তির অলক্ষিত অনুপ্রবেশ—অধ্যাত্ম সাধনার পথে এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, অবচেতনমন হইতে উত্থিত, আচ্ছন্নকারী বাষ্পবিভ্রান্তি-বিষয়ে তারাশঙ্করের অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। শাস্ত্রকারদের নিগূঢ়, রূপকাবরণে প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ইঙ্গিতে আভাসিত অভিপ্রায় তিনি যে শুধু অনুধাবন করিয়াছেন তাহা নহে, ব্যক্তিজীবনকাহিনী ও সমাজ-ভাবনার মাধ্যমে উহাকে মূর্তও করিয়াছেন। 'রাধা' উপন্যাসটি সাধনারহস্যের অপরূপ কাব্যময় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ।

মানবের আন্তরধ্যানধারণার সহিত রাঢ়ের আরণ্য প্রকৃতির এক জীবন্ত সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই আরণ্য প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা আখ্যায়িকার ফাঁকে ফাঁকে মুমুক্ষু সাধকের আত্মবিচারণার সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে; প্রকৃতির অন্তর্জীবন মানবের অন্তর্জীবনের সহিত দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছে। বনের ঘনপল্লব, সবুজ বৃক্ষশীর্ষের উপর নীলমেঘের সমারোহ, বজ্র, বিদ্যুৎ ও ধারাবর্ষণের ছন্দে বাঁধা অতর্কিত মানস উপলব্ধি বনতলে কীট-পতঙ্গ ও নানাবিধ জীবজন্তুর জীবনোল্লাস ও উহারই ইঙ্গিত-অনুসরণে সৃষ্টিরহস্যের চকিত স্ফুরণ, ক্ষান্তবর্ষণ লঘুমেঘের নীচে রজতাভ জ্যোৎস্নার স্তিমিত দ্যুতি, ছায়াম্লান চন্দ্রিকার মায়াবরণ-বিস্তার—এই প্রকৃতিচিত্রণের বর্ণাঢ্যতা ও অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা মানব মনের রহস্যানুসন্ধানকে আরও নিবিড়-আবেশময় ও সার্ব-ভৌমতাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই সঙ্কেতময়, অথচ বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতিচিত্রণই উপন্যাসের আবেদন-গভীরতার অন্যতম কারণ।

কৃষ্ণদাসী চরিত্র বাংলা উপন্যাসে উৎকট ধর্মোন্মাদের বোধ হয় একমাত্র দৃষ্টান্ত। অবশ্য তাহার এই ধর্মোন্মাদপ্রসূত আচরণের কেবল তথ্যমূলক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, কোন

মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। সে সাধারণ বৈষ্ণবীর সাধন-ভজনের সহিত সহজিয় মতানুসারী পরপুরুষসঙ্গকে ধর্মসাধনার উপায়স্বরূপ মিশ্রিত করিয়াছিল—ইহাতে তাহার সাম্প্রদায়িক প্রথানুবর্তন ছাড়া ব্যক্তিস্বভাবের কোন বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয় নাই। তবে স্থানীয় বৈষ্ণবসমাজে তাহার একটা প্রাধান্য ছিল ও নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ-অভ্যাসের জন্য তাহার নিজ মন্ত্রসিদ্ধিতেও তাহার কিছুটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে মস্তিষ্কবিকারের কোন প্রবণতা থাকিবার কথা নয়। মাধবানন্দকে দেখিয়া তাহার মনে যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, যে অর্ধস্বীকৃত কামাগ্নের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যেই তাহার অপ্রকৃতিস্থতার মূল খুঁজিতে হইবে। অবশ্য সে নবীন সন্ন্যাসীকে চাহিয়াছিল তাহার কন্যা মোহিনীর জন্য, কিন্তু অন্ধ ধর্মসংস্কারে আবিলচিত্ত, শিথিলচরিত্র এই জাতীয় স্ত্রীলোকের কামপ্রেরণায় নিজ কন্যার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতেও বাধে না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সে নিজেও এই সন্ন্যাসীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, ও তাহার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবার ফলে এই অতৃপ্ত কামনা-বহ্নিই তাহার চেতনায় বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। তারাশঙ্কর এই সমস্ত সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই তাহার এই হঠাৎ-জ্বলিয়া-ওঠা চিত্তবিকারের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসীর যে পরিচয়টুকু আমরা পাইয়াছি তাহাতে তাহাকে ধীরমস্তিষ্ক, প্রখর ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও আচার-ব্যবহারে লোকমতের অনুবর্তী সাবধান স্ত্রীলোক বলিয়াই মনে হয়। এমন কি দাস-সরকারের সঙ্গে তাহার গোপন সাধনা সম্পর্কেও সে যথেষ্ট আত্মসংযম ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছে, গণিকাসুলভ প্রগল্‌ভতা ও বেহায়াপনা সে সযত্নে বর্জন করিয়াছে। সুতরাং তাহার এই আকস্মিক উন্মত্ততা তাহার চরিত্রানুযায়ী বলিয়া ঠেকে না। অবশ্য যাহারা ধর্মান্ধতার প্রভাবে অস্বাভাবিক ও অশোভন সাধনপ্রক্রিয়ার অনুশীলনে অভ্যস্ত তাহাদের মনের অবচেতন স্তরে অসুস্থ মনোবিকারের বীজ সুপ্তই থাকে—অনুকূল উপলক্ষ্যে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়। কৃষ্ণদাসীর কামজর্জরতা ধর্মসাধনার প্রশ্রয়ে এতই অতিপুষ্ট হইয়াছিল যে, আশাভঙ্গের এক দারুণ আঘাতে ইহা তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উৎখাত করিয়াছিল। তাহার নিখোঁজ অন্তর্ধান ও লেখকের সে বিষয়ে অনাগ্রহও তাহার উপন্যাস মধ্যে প্রাধান্যের মর্যাদা রক্ষা করে নাই।

মোহিনীর চরিত্রে কোন জটিলতা নাই—সে পরকীয়া প্রেমের দূষিত আবেষ্টনে লালিতা সরলা কিশোরী। শ্যামের স্থলাভিষিক্ত কোন পুরুষের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, দিব্য-প্রেমের নির্দেশে আপন রূপ-যৌবন-সমর্পণ তাহার কাম্য জীবনাদর্শ। অক্রূর দাস সরকারের প্রতি তাহার বিমুখতা নীতির দিক দিয়া নহে, তাহার বীভৎস আচরণ ও কুৎসিত আকৃতির জন্য। সে মাধবানন্দের নিকট প্রেমবিহ্বল চিত্তে, ফলাফলজ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিতে ব্যাকুল। প্রত্যাখ্যানের পর সে যে কেমন করিয়া প্যারেবাই বাঁশরীওয়ালীতে পরিবর্তিত হইয়াছে, কেমন করিয়া সন্ন্যাসিনী ভূতপূর্ব বাইজীর আশ্রয়ে নৃত্যগীতের অর্ঘ্যোপচারে রাধাকৃষ্ণের ভজনারতিতে নিজ সমুদয় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। ইহা রোমান্সের কাহিনী, মনস্তত্ত্বের নিয়মের ধার ধারে না। যাহা হউক, উপন্যাসের উপসংহারে তাহার আবির্ভাব মাধবানন্দের রাধাতত্ত্বের প্রতি বিরূপতা

দূর করিয়া তাহার শূন্যতাবোধকে অপূর্ব জীবনানন্দে ভরিয়া দিয়াছে ও উভয়ের মিলনের মৃত্যুমাধুরী উহাদের জীবনে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অনুরূপ বিকাশ সাধন করিয়াছে। উপন্যাসের ভাবসাধনার সুর উহার সমাপ্তিতে এক সঙ্গীতোচ্ছ্বাসময় পরিণতিতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

উপন্যাসের ক'য়ো চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ধর্মসংস্কৃতির যেমন উচ্চতম তেমনি নিম্নতম প্রতিনিধিও দৃষ্টিগোচর হয়। বৈষ্ণব ধর্মের যে লৌকিক রূপ তাহার অধোতম বিন্দু ক'য়ো-চরিত্রে প্রতিফলিত। সে পূর্ণ-পরিণত মানুষ নয়, অর্ধ-জান্তব অস্তিত্বের নিদর্শন। কাক-পক্ষীর স্থির-আশ্রয়হীন, খুঁটিয়া-খাওয়া, সংবাদসংগ্রহশীল, লঘুপক্ষে সঞ্চরমান প্রকৃতি যদি মানবের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে, তবে তাহা ক'য়োর মধ্যে করিয়াছে। এই পক্ষী-মানবের মধ্যে কৃষ্ণদাসী, বিশেষতঃ মোহিনীর প্রতি একটা অবোধ আনুগত্য, একটা অকারণ হিতৈষণা, একটা বিনীত আত্মলোপপ্রবণতা তাহার বৈরাগী সংস্কারের চিহ্নরূপে বিদ্যমান। চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত তাহার একটা অদ্ভুত আত্মিক যোগ আছে, তাহার কথাবার্তা, তাহার মনোভাব-প্রকাশরীতি সবই এই আবেষ্টনের সহিত অন্তরঙ্গতার বিশিষ্ট-চিহ্নাঙ্কিত। গৃহরক্ষক কুকুরের মত সে কৃষ্ণদাসীর আশ্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্তর্হিতা মোহিনীর প্রতি উচ্চারিত ব্যাকুল আহ্বান তাহার জীবনমমতার একটিমাত্র নিদর্শন-রূপে আমাদের মনে চির-অনুরণিত হইতে থাকে।

উপন্যাসটি নামে ঐতিহাসিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্তর্জীবনের কাহিনী। ইহার বহির্ঘটনাসমূহ এই অন্তর্জীবনের আবেগ-চক্রে ঘূর্ণায়িত। ইহার ঐতিহাসিক অংশ অনেকটা বাহির হইতে আরোপিত, ইহার মর্মকথার সহিত শিথিল-সংলগ্ন। নাদির শাহের দিল্লী-আক্রমণ ও বর্বরোচিত অত্যাচার, বাঙলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা ও রাজশক্তির সহিত সন্ন্যাসী-গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, দেশব্যাপী অরাজকতা ও আতঙ্ক—এগুলি কোথায়ও বা পরোক্ষ অতীত-বর্ণনা কোথায়ও বা প্রত্যক্ষ-বর্ণনার বিষয় হইয়াও উপন্যাসের মূল ঘটনার সহিত অসংযুক্ত। এগুলি প্রতিবেশ-চিত্রণের বহিরঙ্গমূলক প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, উপন্যাসবর্ণিত জীবনকাহিনীর জটিলতা ও গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া উহার সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিহাসের বিশাল ঘটনাচক্র নিয়ন্ত্রণ করিতে ও ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সহিত উহার নিগূঢ় সংযোগ দেখাইতে তারাশঙ্কর বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি এক নূতন ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রবর্তন করিতে ও বাঙালীর ধর্মচেতনার বিবর্তনকে উহার অঙ্গীভূত করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। ধর্মজীবনকে অবলম্বন করিয়াই বাঙালী চলমান ইতিহাসধারার গতিচ্ছন্দ নিজ রক্তপ্রবাহে অনুভব করিয়াছে—এই জীবনসত্যটিই এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(১০)

'উত্তরায়ণ' (নবেম্বর, ১৯৫৮)—১৯৪২ সালের জাপানী আক্রমণের সময় হইতে ১৯৪৬ সালের রক্তাপ্লুত ও দানবিকতায় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্যন্ত এই চারি বৎসরের কাল-সীমার মধ্যে বিধৃত এই উপন্যাসের ঘটনাবলী। আরতি ও প্রবীরের মধ্যে যে সমপ্রাণতা ও প্রীতির সম্পর্ক মধুর প্রণয়ের আবেশে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বাধা পাইল প্রবীরের যুদ্ধযাত্রায়

ও আরতির সান্নিধ্য হইতে তাহার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আরতির জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল ও সে সহানুভূতিহীন, হুজুকপ্রিয়, সুবিধাবাদী মাতুল-পরিবারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। এই আতঙ্কবিমূঢ়তার মুহূর্তে অকস্মাৎ মোটর-চালক রতনের ছদ্মবেশধারী প্রবীরের সঙ্গে আরতির দেখা হইল। প্রবীরের জীবনে যে আশ্চর্য পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার কাহিনী প্রবীর তাহার নিকট এক পত্রের মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছে। যে রতন মোটর-চালককে সে বর্মার জঙ্গলে মৃত্যুযন্ত্রণালাঘবের জন্য গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার মাতা ও স্ত্রীর পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে তাহাকে মিথ্যা পরিচয়ে স্থান লইতে হইয়াছে। রতনের স্ত্রী তাহার ছদ্মপরিচয় ধরিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পুত্রগতপ্রাণা মাতার প্রাণ বাঁচাইতে তাহাকে স্বামীরূপে স্বীকৃতি দিয়াছে। উহাদের মধ্যে দেহলালসাহীন, অথচ রূপবিহ্বল এক অদ্ভুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাতার মৃত্যুর পর এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে ও উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই অভিনব দাম্পত্যকল্প সম্বন্ধে যতটা তত্ত্ব আছে ততটা রস নাই, ইহার উপপত্তি সবস্বতার (theoretical) মধ্যে বাস্তব ভাবানুভূতি সঞ্চারিত হয় নাই। মোট কথা আখ্যানভাগের মধ্যে খানিকটা রোমান্সসুলভ অবাস্তবতা অনুভূত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনা ও উপদ্রুত মানুষের মনের বিভীষিকার চিত্র খুব উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু আরতি বা উপন্যাসের অন্য পাত্র পাত্রীর চরিত্রস্ফুরণ খুব গভীর হয় নাই। ইহারা মোটামুটি অবস্থার ক্রীড়নক, ইহাদের ব্যক্তিত্ব অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। প্রবীরের আচরণও খুব সঙ্গত বা স্বাভাবিক মনে হয় না, সে এক অপ্রত্যাশিত অবস্থার নিকট অনেকটা অসহায়তায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। উপন্যাসের ঘটনাও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশে বিভক্ত হইয়া সংহতিলাভ করিতে পারে নাই, কোন নিবিড় ভাব ঐক্য-গ্রথিত হয় নাই।

'মহাশ্বেতা (জুলাই, ১৯৬০) উপন্যাসে একটি অসাধারণ মেয়ের ব্যক্তিত্ব তাহার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা-প্রভাবে কিরূপে স্ফুরিত হইয়াছে তাহাই দেখান হইয়াছে। উপন্যাসটির উপস্থাপনারীতি নাটকের আঙ্গিকবিন্যাসধারার অনুবর্তন করিয়াছে। নীরা আশ্রমের অধ্যক্ষ ও তাহার হিতৈষী অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা দেশসেবক বিনয় সেনকে তাহার প্রতি প্রেমনিবেদনের অপরাধে হিংস্র আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। এই উগ্র নাটকীয়তার অগ্ন্যুৎক্ষেপ উপন্যাসের প্রারম্ভ বিন্দু, এখান হইতেই নীরা নিজের অতীত জীবন পিছন ফিরিয়া দেখিয়াছে ও তাহার এই নাটকীয় আচরণের পূর্বতন সূচনাস্তরসমূহ আবিষ্কার ও পর্যালোচনা করিয়াছে। নিঃস্নেহ ও ঈর্ষাবিকৃত যৌথ পরিবারের মধ্যে তাহার যে শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হইয়াছে তাহাই তাহার সর্বদা প্রতিরোধে উদ্যত, সংগ্রামোন্মুখ ও সংসারের প্রতি একপ্রকার নিরানন্দ বিতৃষ্ণায় বিস্বাদ মনোভাব-উন্মেষের হেতু। বিশেষতঃ তাহার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে যে জ্যেঠামহাশয়ের সংসারে ও জ্যেঠাই মা-এর তত্ত্বাবধানে তাহাকে জীবন কাটাইতে হইয়াছিল তাহারই প্রভাব তাহার মনের রুক্ষতাবিধানে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। সে পরিবার মধ্যে, তাহার জ্যেঠতুতো ভাই-বোনেদের সংসর্গে থাকিয়াও, এক আত্মকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গতার বৃত্তচারিণী হইয়াছে। সে সকলেরই ঈর্ষার পাত্র, বিদ্রূপের বিষয়, তির্যক সমালোচনার লক্ষ্যস্থল।

বিশেষতঃ জ্যাঠাইমার নিঃস্নেহ ঔদাসীন্য ও সময় সময় শ্লেষতীক্ষ্ণ মন্তব্য তাহার চিত্তকে পারুষ্য-কর্কশ ও আত্মনির্ভরশীলতায় অনমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কৈশোর জীবনে তাহার জ্যাঠতুতো ভগ্নী হেনাকে চটুল প্রেমাভিনয়ের জন্য পারিবারিক নির্যাতন হইতে বাঁচাইতে সে সমস্ত কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া জ্যেঠাইমার বিরাগভাজন হইয়াছে ও সংসার মধ্যে একক বন্দীজীবনে অবরুদ্ধ হওয়ার শাস্তি ভোগ করিয়াছে। মাঝে একটি বৎসরের জন্য হঠাৎ জ্যেঠাইমার অবরুদ্ধ স্নেহপ্রস্রবণ তাহার জন্য কিছুটা উন্মুক্ত হয় ও মাতৃস্নেহের পর এই অপ্রত্যাশিত মমতা তাহার উষর জীবনে একটু সরসতার স্পর্শ দিয়াছিল। কিন্তু এই সুখ তাহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই। তাহার বিদ্রোহবিক্ষুব্ধ জীবনে একবার যে বিবাহের নির্ভর-যোগ্য ও সম্মানিত আশ্রয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহা মায়া-মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া তাহাকে পারিবারিক জীবন হইতে উৎক্ষিপ্ত করিল ও তাহার মনকে আরও দাহ্য উপাদানে পূর্ণ করিয়া উহাকে চরম বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত করিল।

এই পর্যন্ত তাহার অভিজ্ঞতা সাধারণ বাঙালী পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। ইহার পর সে আকস্মিকতার ঝোড়ো হাওয়ায় তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় নানাস্থানে ক্ষণিক আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ এক সদানন্দ চিত্রশিল্পীর পরিবারে সে কতকটা মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনযাপনের সুযোগ পাইয়াছে এবং এখান হইতেই সে বিনো সেনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মীরূপে যোগ দিয়াছে। তাহার এই পর্যায়ের জীবনযাত্রার পরিবেশও যেমন অস্পষ্ট, জীবনবিকাশও সেইরূপ লক্ষ্যহীন ও অনিয়ন্ত্রিত। মোটের উপর বৃহত্তর জগতে বাস করার ফলে যে মুক্তির আস্বাদ ও নূতন নূতন বৃত্তির অনুশীলন তাহা তাহাকে জীবনপরিণতির পথে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

নীরার আশ্রয়-জীবনই তাহার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত প্রবণতাগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখী ও জীবনের গভীরতম রহস্য যে প্রেম তাহার সম্মুখীন করিয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্বে তাহার ভ্রাতৃজায়া এণাক্ষী তাহার রূপহীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া ও নিজ সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগাইয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবের জন্য ভূমিকা রচনা করিয়াছে। প্রেম তাহার অন্তরে আসিয়াছে তির্যক ভাবে, প্রবল বিমুখতার বাঁকা পথে। আশ্রমে সে বিনো-দার সঙ্গে প্রতিমার সম্পর্কের জটিলতা অনুভব করিয়া উভয়ের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে। প্রতিমার দারুণ ঈর্ষা ও অভিমান ও বিনো-দার তাহার প্রতি অকুণ্ঠিত প্রশ্রয় উভয়ের মধ্যে যে একটা হৃদয়াবেগের আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা চলিতেছে সে বিষয়ে তাহার সংশয় জগাইয়াছে। এই পটভূমিকায় বিনো-দার তাহার প্রতি প্রেম-নিবেদন তাহার নিকট নিতান্ত বিসদৃশ লঘু-চিত্ততার নিদর্শনরূপে ঠেকিয়াছে ও তাহাকে এক অতিনাটকীয় বিস্ফোরণে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই অসংযত রোষোচ্ছ্বাস ও অশোভনরূপে তীব্র ভর্ৎসনা শুধু যে তাহার লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার পরিণত ফল তাহা নহে, ইহারই মাত্রাহীনতা প্রচ্ছন্ন ও অস্বীকৃত প্রেমের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সে যে প্রতিমার সঙ্গে বিনো-দার প্রেমসম্পর্ক অনুমান করিয়াই উহার প্রেমনিবেদনকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও আপনাকে শালীনতার সংযমে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহার মন বিনোর প্রতি উদাসীন ছিল না। প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যে নাটকের অভিনয়ই অন্তর মধ্যে নাটকীয়

উপাদানের আলোড়নের ইঙ্গিত করে। ইতিমধ্যে সে ইংলণ্ডে পড়িবার জন্য বৃত্তি লইয়া বিদেশে চলিয়া যায়। ফিরিয়া আসার পর বিনো-দার সঙ্গে প্রতিমার সম্পর্কের স্বরূপটি তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও এই আবিষ্কারের পর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বিনোর প্রতি তাহার এতদিনকার নিরুদ্ধ প্রেম অসংবরণীয় উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নীরার মানস পরিণতির চিত্র এইখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। দীর্ঘ-অবদমিত চিত্তবৃত্তি, অনেকদিনের চাপে বাঁকা, বিকৃত স্বভাব, সংসারবিমুখতা ও আত্মনিরোধের অতিরঞ্জিত বিদ্রোহপ্রবণতা অভিজ্ঞতা-চক্রের আবর্তনে আবার সহজ, স্বাভাবিক, ও মধুররসাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের বামদৃষ্টি প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে সুস্থতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রথম দিকটাই সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় বহন করে, শেষের পরিবর্তন-পরম্পরা অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক ও অতিনাটকীয়তা-স্পৃষ্ট। স্বভাবের বঙ্কিমতা স্বাভাবিক; উহাকে সোজা করা হইয়াছে সু-পরিকল্পিত কৃত্রিম নিযন্ত্রণে।

'যোগভ্রষ্ট' (জুলাই, ১৯৬০) তারাশঙ্করের এতাবৎ-লেখা শেষ উপন্যাস। এখানেও তিনি বর্তমান যুগে ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার মর্মান্তিক অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার কাহিনীকে প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুদর্শনের বাল্যজীবনে তাহার নিজের অসাধারণত্বে দৃঢ় প্রত্যয় ও দুঃসাহসিকতা নানা ঘটনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই মনোভাবের মূল প্রেরণা ঈশ্বরতত্ত্বরহস্যের ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসায়। রাজবন্দী ধীরেনবাবু তাহার অন্তরে এই ঈশ্বরবিশ্বাস দূর করিয়া সেখানে মানবশক্তিনির্ভরতায় বিকৃত কুটিল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই চেষ্টায় তিনি সফল হন নাই, কিন্তু তাঁহার অশুভ প্রভাবে তাহার ভগবৎ-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে। সুদর্শনের চরিত্রে তাহার স্বভাব ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত লেখক দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছেন মনে হয় না।

ইহার পর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুদর্শনের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে যে ঐশীরহস্য-উদ্‌ঘাটক দিব্যদৃষ্টি সে চাহিয়াছিল তাহা মিলে নাই। এই সন্ন্যাসীকে গ্রামবাসীর অত্যাচার ও মিথ্যা সন্দেহ হইতে বাঁচাইবার জন্য সে বালবিধবা শান্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিল ও তাহার মনে প্রথম রূপজ মোহের সঞ্চার হইল। ইহার পর সে পাঁচ বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থে তীর্থে ভগবানের অন্বেষণ করিতে বাহির হইল।

এই পাঁচ বৎসর সুদর্শন একাগ্রভাবে ঈশ্বরানুভূতি কামনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিংশশতকীয় বিজ্ঞানপুষ্ট, প্রত্যক্ষপ্রমাণাকাঙ্ক্ষী মন ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে আভাস-ইঙ্গিত মাঝে মধ্যে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। সে ঈশ্বরকে জানা অপেক্ষা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের নিশ্চিন্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিতেই বেশি উৎসুক। শেষ পর্যন্ত বহুভ্রমণ-ক্লান্ত, নিষ্ফল জিজ্ঞাসায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে স্থির করিল যে, সে ভগবৎ-অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া দেহবৃত্তির তৃপ্তিতে মানবজীবনের যে প্রত্যক্ষ সার্থকতা তাহারই অনুশীলন করিবে। এই তীর্থভ্রমণকালে সে একজন মুমূর্ষু সাধুর নিকট একটি চুরি-করা সোনার রাধামূর্তি ও কিছু অর্থ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিল।

প্রত্যাবর্তনের পথে বিহারের ভূমিকম্পের মর্মান্তিক ধ্বংসলীলার মধ্যে সে জড়িত হইয়া

পড়িল। এই ভূমিকম্পের লোমহর্ষক বর্ণনা ও ভয়াবহ ব্যঞ্জনা তারাশঙ্করের লেখনীতে চমৎকার ফুটিয়াছে। প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের মধ্যে সে মানবের নীতিবিপর্যয়ের আরও ভয়াবহ ভূমিকম্পের একজন নারী-বলিকে তাহার জীবনসঙ্গিনীরূপে আহরণ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপলক্ষ্যে অপহৃতা ও ধর্ষিতা যুবতী নীলনলিনী অকস্মাৎ মুক্তি পাইযা সন্ন্যাসীবেশী সুদর্শনের শরণাপন্ন হইয়াছে ও উভয়ে একযোগে ক্ষণস্থায়ী নীড় রচনা করিয়াছে।

কিন্তু একটি সূক্ষ্ম ধর্মবিষয়ক অনৈক্য উভয়ের মিলনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। সুদর্শন যে ধর্মজীবন ত্যাগ করিয়া গৃহস্থজীবনে প্রত্যাবর্তন করিতে মন স্থির করিয়াছে তাহা নীলের ঠিক মনঃপূত হয় নাই। সে তাহার আশ্রয়দাতার এই মতপরিবর্তনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছে। সুদর্শন যখন কালাপাহাড়ী প্রতিক্রিয়ায় রাধামূর্তিকে ভাঙ্গিয়া উহার স্বর্ণটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন নীল তাহার ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে ও নিরুদ্দেশযাত্রায় আত্মগোপন করিয়াছে।

এই অভিঘাতে ঈশ্বরবিশ্বাসের আশ্রয়চ্যুত, দৈবশক্তির অধিকারলোলুপ সুদর্শন সর্বতো ভাবে অহংসর্বস্ব হইয়া উঠিল ও চূড়ান্ত শক্তিবৃদ্ধি ও দেহোপভোগকামনার নিরঙ্কুশ তৃপ্তিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিল। এই কালসীমায় সে নানারূপ উপায় অবলম্বনে ও নানা মানুষের সহিত পরিচয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে উন্মুখ হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার স্বগ্রামবাসী বিপ্রপদ ও শান্তির ও রাজবন্দী ধীরেনবাবুর সঙ্গে আবার তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। সে শান্তির সহিত অবৈধ দেহসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু এই নিছক দেহকামনা-মূলক মিলনে সে শান্তি পায় নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবির্ভাবে সে তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও নির্মম নেতৃত্বের পূর্ণ প্রয়োগের অবসর পাইয়াছে ও হিন্দুদের দলপতিরূপে বহু মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ-প্রতিরোধ ও উৎসাদন করিয়াছে। শান্তি ও বিপ্রপদ মুসলমানের গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করায় স্বহস্তে উহাদিগকে খুন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া সে হাইকোর্টে নরহত্যার অভিযোগে আসামী হইয়াছে ও বিচারক তাহার ফাঁসির আজ্ঞা দিয়াছেন। এই চরম দণ্ডের জন্য প্রতীক্ষার অবসরে তাহার এই আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই উপন্যাসটি অধ্যাত্মজিজ্ঞাসামূলক হইলেও ঠিক যেন অধ্যাত্মভাবভাবিত হইয়া উঠে নাই। সুদর্শনের চরিত্রে ধর্মচিন্তা কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থমধ্যে বহুস্থলে উচ্ছ্বাসময় ধর্মাকৃতির প্রকাশ আছে, কিন্তু চরিত্রে তাহার প্রত্যক্ষ পরিণতি লক্ষ্যগোচর হয় না। আসল কথা, সুদর্শন একজন দুরন্ত প্রাণশক্তিপূর্ণ পুরুষ। নিরঙ্কুশ আত্মপ্রাধান্যবিস্তার ও সর্ববিধ শাসন-অসহিষ্ণুতাই তাহার জীবনের মূল প্রেরণা। এই আত্মপ্রসারের সঙ্গে ধর্মের যোগ অনেকটা আকস্মিক। জীবনের কোন ঘটনাতেই সে বিশুদ্ধ ধর্মভাবপ্রবণতার কোন পরিচয় দেয় নাই। ধর্মপ্রেরণা মুখ্যভাবে তাহাকে কখনই নিয়ন্ত্রণ করে নাই। আগ্নেয়গিরির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত লাভাস্রোত যদি উহার আকাশবিহারপ্রবণতার নিদর্শন হয়, তবেই সুদর্শনের আত্মসর্বস্বতা, ঈশ্বর-এষণার উপলক্ষ্য-আশ্রয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল বলিয়া, যথার্থ ভগবৎকেন্দ্রিকতার দাবি করিতে পারে। এক একজন অতিরিক্ত মাত্রায় অহংভাবাপন্ন ব্যক্তি এক একটি বিষয়ের অনুসরণে নিজেদের অন্তর্নিহিত আত্মপ্রসারণশীলতারই

অভিব্যক্তি সাধন করে। এখানে উপলক্ষ্য গৌণ, আসল কথা হইল ব্যক্তিত্বাভিমানের আতিশয্য। সেইরূপ সুদর্শনও দৈবশক্তির অধিকারী হইতে চাহিয়াছিল নিজ মানবিক শক্তির পরিপূরকরূপে, সত্যকার ধর্মপিপাসার বশবর্তী হইয়া নহে। মানুষ যে প্রেরণায় গুপ্তধনের সন্ধান করে, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব-আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে বা অলৌকিক বিভূতির প্রতি লোলুপতা দেখায়, সুদর্শনের ঐশী জিজ্ঞাসা অনেকটা সেই জাতীয়। সে যুগচিত্তের অনুসন্ধিৎসার প্রতিনিধি হইতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিজীবনে ধ্যানাবিষ্ট অন্তর্মুখিতা একেবারেই অনুপস্থিত। তাহার ব্যক্তিপরিচয় তাহার বাল্যজীবনের উদ্ধত আচরণে ও তাহার প্রৌঢ়জীবনের ভোগসর্বস্বতায় ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত আস্ফালনে। লেখক অবশ্য এইগুলিকে তাহার ব্যর্থ ধর্মসাধনার মানস প্রতিক্রিয়ার ফলরূপেই দেখাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় যে, প্রতিক্রিয়াটিই তাহার আসল স্বরূপ; তাহার ধর্মানুশীলন তাহার সীমাতিসারী ব্যক্তিত্বের মরীচিকা-অনুসরণ।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শান্তি-চরিত্রের রূপান্তর পর্যাপ্তকারণসঞ্জাত বলিয়া মনে হয় না। গ্রাম্য সরলা যুবতী কেমন করিয়া একজন সর্বসংস্কারবর্জিতা, স্বেচ্ছাচারিণী ইতর নারীতে পরিণত হইল তাহার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মিলে না। অবশ্য লেখক ধীরেনবাবুর দলগত রাজনীতির প্রভাব ও বিপ্রপদর স্থূলকামনামূলক সাহচর্যকেই এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু লেখকের উল্লেখই ইহার একমাত্র ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইতে পারে না। যাহাকে আমরা দেবনির্মাল্যের শুভ্র-শুচি ফুলরূপে দেখিয়াছিলাম, কয়েক বৎসর ব্যবধানে তাহার এই ম্লান, কলঙ্কলাঞ্ছিত অশুচি রূপ আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতায় দারুণ আঘাত হানে। বিপ্রপদর আশ্রয়ত্যাগ, সুদর্শনের আশ্রয়স্বীকৃতি, ধীরেনবাবুর সহিত একটা প্রায়-প্রকাশ্য কলঙ্কিত সম্পর্কস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাহার যেরূপ নিঃসঙ্কোচ উদার আতিথেয়তার পরিচয় মিলে তাহা কারণনির্দেশের অপেক্ষা রাখে।

নীলনলিনীর আবির্ভাব ও তিরোধান উভয়ই একই রূপ চকিতদীপ্তিতে ক্ষণ-উদ্ভাসিত। ভূমিকম্পের ফাটল দিয়া যে মাটি ফুঁড়িয়া আসিয়াছিল, সে তেমনি আকস্মিকতার সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। এই স্বল্পকালীন অবস্থিতির মধ্যে তাহার যে আদর্শমূলক ভাবপরিচয় পাই, তাহা দৈনিক আচরণের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় নাই। মনে হয় সুদর্শনের নির্বাপিতপ্রায় ধর্মানুরাগশিখা নীলের মধ্যে একটি শেষ স্তিমিতরশ্মি আশ্রয় লাভ করিয়াছে ও যে ধর্ম তাহার ছন্নছাড়া জীবনে শান্তি দিতে পারে নাই তাহাই নীলের হাত দিয়া তাহার অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ পরিবেশন করিয়াছে।

বিষয় উপস্থাপনারীতিও সম্পূর্ণ অনবদ্য হয় নাই। শিবনাথ উপন্যাসে সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয়। তাহার নিজের কিছুই বলিবার নাই, সে যখন বক্তা হইয়াছে তখনও কেবল সুদর্শনের উক্তিরই উদ্ধার করিয়াছে। বরং তাহার হস্তক্ষেপে আখ্যানের ধারাবাহিকতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সুদর্শনের অন্তিম পর্যায়ের জীবনকথা শুধু বিচ্ছিন্ন তথ্যসমাবেশ-পর্যায়ের—সুদর্শনের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে এই সমস্ত যদৃচ্ছ, বিক্ষিপ্ত ঘটনাসূত্রসমূহ সংহত হয় নাই। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, লেখক অধ্যাত্ম অভীপ্সাকে উহার মুখ্য বিষয়বস্তু-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জীবন হইতে ধর্মের একান্ত নির্বাসনের যুগেও ধর্মকেন্দ্রিক

উপন্যাস রচনা করিয়া তারাশঙ্কর দেশের ঐতিহ্যের সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন মানসযোগের পরিচয় দিয়াছেন।

(১১)

নবনব উন্মেষশালিনী সৃষ্টিশক্তি যদি প্রতিভার স্বরূপলক্ষণ হয়, তবে তারাশঙ্করের প্রতিভা অনস্বীকার্য। বাংলার জীবনযাত্রার নূতন নূতন অধ্যায় তাঁহার ঔপন্যাসিক সৃষ্টির উপকরণ যোগাইয়াছে। তিনি জীবনকে নবনব পরিবেশে স্থাপন করিয়া, অভিনব অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রভাবাধীন করিয়া, মানবসাহচর্যের ও সমাজ-আধারের নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিসত্তায় প্রতিফলিত করিয়া, উহার এক চির-নবীন, চির-চঞ্চল, পরিচিতের মধ্যে রহস্যদ্যোতনাময় রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবণতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে নয়, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী অতি জটিল, প্রহেলিকাধর্মী, আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তপথে আবর্তনশীল নয়। সকলেই ঘটনার প্রবাহের সহিত আগাইয়া চলে, জীবনপ্রতিবেশের সহিত নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও আদান-প্রদানের প্রভাবেই বিকশিত। সমাজমানসের পরিবর্তনের সমতালেই ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তন ঘটিতেছে ও মানুষও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত সংস্কার ও জীবনবোধকে অতিক্রম করিয়া যুগাদর্শের সহিত ছন্দ মিলাইতেছে।

তারাশঙ্করের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই বাঙালী জীবন-ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঢ়ের সমাজব্যবস্থার নানা প্রথা-সংস্কার-লোকাচার-রচিত মানস পরিবেশই তাঁহার নর-নারীর কর্ম, জীবনচর্যা ও বিকাশ-পরিণতির ক্ষেত্র। অন্যান্য কোন কোন আধুনিক ঔপন্যাসিকের ন্যায় তাঁহার চরিত্রাবলী জাতি-পরিচয়হীন, বিশিষ্ট ঐতিহ্য-চিহ্নবর্জিত বিশ্বমানবিকতার প্রতীক মাত্র নয়। তাহাদের জীবন-নাটক কোন বড় শহরে ফ্লাটবাড়ির ক্ষুদ্রতম রঙ্গমঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাহাদের ব্যক্তিসত্তা নির্জনতায় লালিত নয়, সকলের সঙ্গে একত্রাবস্থানের মধ্যেই, প্রতিবেশী ও পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত প্রীতি ও সংঘর্ষের মাধ্যমেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। তাঁহার সাম্প্রতিক কালের দুইখানি উপন্যাস 'ভুবনপুরের হাট' ও 'মঞ্জরী অপেরা' আলোচনা করিয়া উপরি-উক্ত অভিমতের সত্যতা নিধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

'ভুবনপুরের হাট'—১৩৭০ শারদীয় 'নবকল্লোলে' সদ্য-প্রকাশিত এই উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কর দ্রুতপরিবর্তনশীল গ্রামসমাজের নবতম রূপকে তাঁহার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন ধর্মসংস্কারের পটভূমিকায় আধুনিক জীবনযাত্রার নূতন ছন্দটি সমাজবিবর্তনের এক ক্রমোদ্ভিন্ন রূপরেখার দৃশ্যপটে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার কেন্দ্রস্থলে আছে ভুবনপুরের মন্দির ও উহারই সহিত জড়িত ধর্মসংস্কার ও ক্ষীয়মান দৈবনির্ভরতা। কিন্তু আসলে মন্দির ও দেবতাকে আড়াল করিয়া ও উহারই নামডাক আত্মসাৎ করিয়া কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ভুবনপুরের হাট। এই হাটও উহার পূর্বেকার জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া আধুনিক বণিকবৃত্তির উপযোগী বহু চাকচিক্য, অন্তঃসম্পদ ও প্রচার-আকর্ষণের নূতন ত্বকে সজ্জিত হইতেছে। বস্তুতঃ আধুনিক হাট আধুনিক মানুষের দ্রুতপ্রসারশীল রুচি ও বিলাস-প্রয়োজন-বোধের মেলা, তাহার অর্জনস্পৃহা, আরামের দাবি ও মুনাফাশিকারের মৃগয়াক্ষেত্র। ক্রয়বিক্রয়ের স্ফীতভর প্রণালী বাহিয়া এখানে মানুষের মনোবৃত্তিরই একটি প্রধান শাখা নানা

ক্ষুদ্রতর প্রশাখা-উপশাখার পথে প্রবাহিত হইয়াছে। হাটের সহিত রেজিস্টারি অফিস, গ্রাম-উন্নয়ন অফিস, ভূমিসংস্কার অফিস প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যুক্ত হইয়া উহারই কোলাহল, জনসংখ্যা, মানবমনের পরিচয়-বৈচিত্র্যকে বাড়াইয়া দিয়াছে।

উপন্যাসের যথার্থ নায়ক এই হাট। ইহার জনস্রোতবাহিত যে দুই-একটি ব্যক্তি অনামিক জনতা হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহাদের কর্মক্ষেত্র এই হাট ও প্রেরণা এই হট্টাভিমুখী জীবনাবেগ। এই হাটের টানে পরিবারজীবন উহার স্থিতিশীলতা ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় হারাইয়া কেনাবেচার জীর্ণ চালায় পরিণত হইয়াছে। ধর্মজীবন হট্টগামীদের উদ্বৃত্ত বদান্যতা ও লুপ্তাবশেষ ভক্তিবৃত্তির মুষ্টিভিক্ষায় কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া আছে। ভুবনেশ্বরের জয়ধ্বনি হাটের কোলাহলে ডুবিয়া যায়। মন্দিরের উদ্ভব-ভূমিকায় শাস্ত্র-কিংবদন্তী, কিন্তু উহার আধুনিক পরিণতি ইহসর্বস্ব বাণিজ্যিকতায়। শ্রীমন্ত বৈরাগী, চাঁপা, মালতী নবু ঠাকুর, ধরণী দাস, কুণ্ডুবাবু, গানের ওস্তাদ শরৎ ও তাহার পুত্র রাজনৈতিক নেতা বসন্ত মুখুয্যে, শ্রীমতী হোটেলওয়ালী—এ সবই হাটের ঘোলা জলে সঞ্চরণশীল ও উহার আবিলখাদ্যপুষ্ট ছোট বড় মাছের ঝাঁক। হাটের বৃত্তে ইহাদের চলাফেরা, হাটের বহুজনসমাগমদূষিত বায়ু ইহাদের নিশ্বাসে, হাটের মনোবৃত্তিই কমবেশি বিশুদ্ধরূপে ইহাদের মানসপ্রেরণায়, ইহাদের ঊর্ধ্বচারিতার নীলাকাশ হাটেরই সংকুদ্ধ উপরিকার বায়ুস্তর। হাটেরই রূপবৈচিত্র্য বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত।

ইহাদের মধ্যে সত্যিকার নায়িকাপদবাচ্য মালতী। যেমন ছোট ডোবার মাছকে বড় পুকুরে ফেলিলে সে বড় হইয়া উঠে, তেমনি মালতী ছোট হাট হইতে জেলের বৃহত্তর ও বিচিত্রতর হাটে স্থানান্তরিত হইয়া এক অদ্ভুত সংকল্পদৃঢ়তা ও সংস্কারমুক্তি অর্জন করিয়াছে। ভুবনপুরের মধ্যযুগশাসিত হাটে সে এক তীক্ষ্ণ আধুনিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার সংমা ও সহচরী চাঁপা বৈষ্ণব সাধনার সাহায্যে যতটুকু সপ্রতিভ ও আধুনিক হওয়া যায় ততদূর অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু মালতীর অবিমিশ্র সঙ্কোচহীনতার সহিত সে তাল রাখিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িয়াছে। মালতীর জেলখানার অভিজ্ঞতা [illegible] তাহার নূতন জীবনদর্শনগঠনের হেতু হইয়াছে তাহা লেখক চমৎকার ভাবে দেখাইয়াছেন [illegible] যে জীবননীতি অসংজ্ঞান সংস্কার, জেলের সুনিয়ন্ত্রিত অপরাধীদের [illegible] সচেতন [illegible] উদ্‌বর্তিত হয়। মালতী এই দীক্ষার তিলক ললাটে ধারণ করিয়াই জেল হইতে ফিরিয়াছে। বসন্তের প্রতি তাহার প্রণয়[illegible]তা তাহার পূর্বজীবনের শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে তাহাকে মুহুর্মুহুঃ উদাস ও উন্মনা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বসন্তের প্রতিদানবিমুখতায় ও গোপার সহিত তাহার সহকর্মিতার অন্তরঙ্গতা বিবাহ-পরিণতি লাভ করায় সে বসন্ত হইতে নিজ মন সংহরণ করিয়াছে। তাহার এই প্রণয়বিষয়ক অস্বস্তি ও উদ্‌ভ্রান্তিবোধ তাহার সামাজিক অবস্থা ও জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সুন্দর সামঞ্জস্যে গ্রথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের সচেতন বিশ্লেষণ তাহার মানসশক্তির বহির্ভূত। একজন চাষার মেয়ে যেরূপভাবে প্রণয়মুগ্ধতা প্রকাশ করিতে সক্ষম তাহাই তাহার চিন্তা ও আচরণে পরিস্ফুট। শেষ পর্যন্ত সে নবু ঠাকুরকে তাহার মনের মত প্রণয়পাত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছে। ইহাতে তাহার সেবাপ্রবৃত্তি ও অসহায়কে আশ্রয়দানের আত্মপ্রসাদ পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইয়াছে। মালতী ফুটিয়াছে প্রেমের উত্তাপে নহে, একপ্রকার মৃদু নিরুত্তাপ হৃদয়দাক্ষিণ্যবিকিরণে। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর

জনজীবনের এক গতিচাঞ্চল্যময়, নানা কর্মপ্রেরণার সংঘাত-সহযোগিতায় উচ্চমন্দ্রিত, যৌথ অভিযানের স্মরণীয় চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহারই মধ্যে কোথাও কোথাও চলমান প্রাণতরঙ্গ উত্তুঙ্গ ও ফেনশীর্ষ হইয়া উঠিয়া ব্যক্তিজীবনের স্বতন্ত্র মহিমার ইঙ্গিত দিয়াছে।

'মঞ্জরী অপেরা' (বৈশাখ, ১৩৭১)—তারাশঙ্করের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। এখানেও বিষয়ের অভিনবত্বে ও পরিকল্পনার মৌলিকতায় তারাশঙ্কর নিজ প্রতিভার বিস্ময়কর অম্লান নবীনত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই উপন্যাসের উপজীব্য এক মেয়ে যাত্রার দলের জীবনসংগ্রামের ও উদ্যোগ-আয়োজনের কাহিনী। যাত্রার দলের নরনারী সাধারণতঃ এক ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'বোহেমিয়ান'। সুরাসক্তি, যৌন আকর্ষণ ও এক প্রকারের অতৃপ্ত অস্থির জীবনতৃষ্ণা—তাহাদের জীবন এই অক্ষত্রয়ের উপর উন্মত্তভাবে বিঘূর্ণিত। ইহারই মধ্যে কলানুরাগ স্থির কেন্দ্রবিন্দুর মত তাহাদিগকে একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়া রাখে, খানিকটা দলের প্রতি আনুগত্য-বিশ্বস্ততাও তাহাদের রসাতলমুখী জীবনের পতনবেগকে প্রতিহত করে।

যাত্রার দলের মেয়ে-পুরুষেরা খুব হীন স্তরের হইলেও তাহারা যাত্রার মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে কিছুটা বিকৃত জীবনমহিমার অধিকারী। গত শতকে যাত্রা ভক্তিসাধনার একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল ও দেবতার সহিত ভক্তিসূত্রে মানবের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ঘোষণায় পুরাণের দেবপ্রভাবিত জীবনকল্পনাকে বর্তমান যুগের নিকট উজ্জ্বল বর্ণে ও প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের ন্যায় উপস্থাপিত করিত। এই ভাবাদর্শের বাতাবরণে বাস করিয়া যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ তাহাদের কদর্য জীবনযাত্রার মধ্যেও দিব্য অনুভূতির স্পর্শ এক আধটু লাভ করিত ও ইহারই প্রভাবে তাহাদের জীবনে খানিকটা মর্যাদা ও সৌন্দর্যবোধ সঞ্চারিত হইত। তা ছাড়া তাহাদের অভিনয়-শিল্পের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও মানবহৃদয়ের বিচিত্র বিমিশ্র ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা সত্যই উচ্চস্তরের ছিল। যাহারা নিজেদের রাজা, রাণী, রাজপুত্র, দেব-দেবী, রাজসভার বিদগ্ধ সভাসদ প্রভৃতি ভাবিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহাদের নিজের জীবনে কতকটা মহান্ ভাব ও সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি সংক্রামিত না হইয়া পারে না। পুষ্প সঙ্গে কীটও দেবতার শিরোদেশে স্থানলাভের সৌভাগ্য অর্জন করে।

এই যাত্রার ঐতিহ্য, ভাবপ্রেরণা, উহার নাট্য ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে তারাশঙ্কর যে অগাধ জ্ঞান ও গভীর অনুভূতি দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই আশ্চর্যজনক। পালাগুলির সংলাপ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে উহাদের কাব্যগুণ ও নাট্যোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত স্থাপন, উহাদের দৃশ্যসংস্থাপনের উপযোগিতাপ্রদর্শন, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের সূক্ষ্ম পার্থক্যনির্ণয় ও অভিনয় মাধ্যমে উহাদের মিশ্রভাবনিচয়ের মধ্যে কখনও একের কখনও অপরের প্রাধান্য-ব্যঞ্জনা—এই সমস্ত বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ও বহুবিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহার যাত্রাবিষয়ে জ্ঞানভাণ্ডারকে ও অভিনয়-চেতনাকে এমন আশ্চর্যভাবে পুষ্ট করিয়াছে।

যাত্রার নট-নটী-সমাজ কী আশ্চর্য জীবন্ত ও চঞ্চল প্রাণকণিকার সমবায়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেশা, প্রণয়বন্ধনলোলুপতা, মান-অভিমান, মর্যাদার দাবি ও অসঙ্গত আবদার—এই সমস্ত বিচিত্র প্রবৃত্তিই এই নীতিসংযমহীন, ক্ষণিক উত্তেজনাযন্ত্র

প্রাণিগুলিকে কী প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কী তুমুল কলরব ও আলোড়ন জাগাইয়াছে! সময় সময় ইতর কলহ উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, কুৎসিত কটুভাষণ আবহাওয়াকে দূষিত করিতেছে, অশ্লীল জীবনক্ষুধার উৎকট অভিব্যক্তি হইতেছে। তথাপি সবশুদ্ধ মিলিয়া প্রাণশক্তির উচ্ছলতায়, জীবনানন্দের পাবন প্রভাবে বীভৎসতা কোথাও শ্বাসরোধী হইয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ এই সব নট-নটী যে রমণীয় মায়ালোকসৃষ্টিতে সহায়তা করিতেছে তাহাই তাহাদের সমষ্টিগত আচরণের হীনতার উপর এক দিব্য সুষমার প্রতিচ্ছায়া আরোপ করিয়াছে।

কিন্তু তারাশঙ্করের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁহার ইতিহাসজ্ঞানের বিপুলতা ও পরিবেশ-সৃষ্টিদক্ষতার মধ্যে নিহিত নহে, কতকগুলি মুখ্য চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-স্বকীয়তার প্রবর্তনে। অভিনয়শিল্পীরা একদিক দিয়া জটিলতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাহারা যে বিচিত্র চরিত্রাবলীর অভিনয় করে তাহাদের সূক্ষ্ম আত্মা তাহাদের ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে অলক্ষিতভাবে সঞ্চরণশীল হইয়া থাকে। পোশাক ছাড়িলেই তাহাদের সমস্ত সংশ্রব এড়ানো যায় না। আর অভিনয়কলার ভিতর দিয়া ব্যক্তিমনের তীব্র অনুভূতি-অভিঘাতগুলি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শ্রোতার মনের তন্ত্রীতে ঘা দেয়। নায়ক-নায়িকার নাটকীয় উক্তির মধ্য দিয়া অভিনয়শিল্পীর অন্তরের কত আবেগ, কত মিনতি, কত ভর্ৎসনা, কত বিরাগ, কত রূঢ় প্রত্যাখ্যান ধ্বনিত হইয়া একই কথাকে ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিচিত্রভাবমণ্ডিত করিয়া তোলে। কত কটাক্ষে গরল মেশানো থাকে, কত কণ্ঠস্বরে নূতন সম্পর্কের ইঙ্গিত ও পূর্ব সম্বন্ধের অবসান সূচিত হয়, অভিনয়ের আগুনে কত ব্যক্তিজীবনব্যবস্থার বাঁধা ঘর পোড়ে তাহা তারাশঙ্কর নাট্যলোকের অন্তররহস্যভেদী দৃষ্টির আলোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অভিনয় শুধু জীবননিরপেক্ষ শিল্প নয়, শুধু পরের হৃদয়রহস্যের অভিব্যক্তিও নয়; পরের সঙ্গে নিজের অদম্য জীবনাবেগও মিশিয়া নাটকীয় হৃদয়োচ্ছ্বাসে তীব্রতর ঘূর্ণিবেগ সঞ্চার করে। শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুলসীর তীব্র ভর্ৎসনা নাট্যসম্মত তাপমানকে ছাড়াইয়া গিয়া মঞ্জরীর নিজ অন্তর্দাহের উত্তাপ বিকিরণ করিয়াছে। শঙ্খচূড়রূপী গোরাবাবু উহার মর্মার্থ তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছে ও উহার প্রতি কষ্ট প্রতিবাদ জানাইয়াছে। আবার মোহিনীমায়ারূপিণী অলকার প্রায়-নগ্ন নৃত্য দর্শকদের মনে যতটা বিস্ময় জাগাইয়াছে, ততোধিক সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে প্রবীর-রূপী গোরাবাবুর মনে। অলকার আসল লক্ষ্য ছিল গোরাবাবু, অভিনয়ের প্রয়োজন নিজ আকর্ষণীশক্তিপ্রদর্শনের উপলক্ষ্য মাত্র! মঞ্জরী তাহা বুঝিয়া নিজেই মোহিনীমায়ার অংশ অভিনয় করিয়া নিজেও যে অলকার মত মোহসৃষ্টিপটীয়সী—গোরাবাবুকে তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছে। এই যে অভিনয়ের অন্তরালে উভয়ের মর্মান্তিক গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইহাই সুদূর পৌরাণিক ঘটনার শান্ত, মৃদু আক্ষেপের মধ্যে বাস্তব জীবনের অসহনীয় উত্তাপ সঞ্চার করিয়াছে। অলকার নগ্ন সৌন্দর্যের আমন্ত্রণে গোরাবাবুর দীর্ঘদিনের প্রণয়বন্ধন টুটিয়াছে, তাহার বিষদিগ্ধ কটাক্ষের নিকট সে আপন শালীনতা ও সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়াছে।

আবার রাতুবাবুর মত পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিও এই অকস্মাৎ-প্রজ্বলিত কামনা-বহ্নির হাত হইতে উদ্ধার পান নাই। তিনিও হঠাৎ দীর্ঘকাল পরে অভিনয়ের উত্তেজনায় মঞ্জরীর প্রতি প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিলেন। মঞ্জরীও আর আত্মপ্রত্যয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না।

নটনটীগণের ব্যক্তিসর্বস্ব, বন্ধনহীন জীবনের মধ্যে এই আদিম মিলনাসক্তিই, দুয়ে জোড় মিলিয়া এক হওয়াই বিচ্ছিন্নতার একমাত্র প্রতিষেধক। এইটুকুই ইহাদের সংহতি-মমতা কেন্দ্রের মূল বিন্দু। ইহাকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের মধ্যে যথাসম্ভব স্নেহ-মমতা প্রভৃতি কোমলতর হৃদয়বৃত্তির বিকাশ হয়। রীতুবাবু ও মঞ্জরীর পারস্পরিক আকর্ষণের শেষ আঘাতেই দলটি ভাঙিয়া পড়িল। মঞ্জরী আর প্রলোভনের মধ্যে না গিয়া দল তুলিয়া দিল। তাহার অক্ষুণ্ণ আদর্শবাদ ও পাতিব্রত্যের উচ্চতর দাবিতে দলের দাবি গৌণ হইল। মঞ্জরী অপেরার শেষ অভিনয়ের উপর চিরযবনিকাপাত হইল।

ইহার পর কয়েকটি পৃষ্ঠায় উপন্যাসটির করুণ-মধুর পরিসমাপ্তি। অলকা গোরাবাবুকে ত্যাগ করিয়া চিত্রতারকাগগনে উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্করূপে উন্নীত হইল। মঞ্জরী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গোরাকে আবার নিজের স্নেহাঞ্চলে টানিয়া লইয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিল, কিন্তু দেহান্তের পর তাহার প্রত্যাখ্যানকারিণী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় রক্তসম্পর্কের জোরে তাহার পারলৌকিক কল্যাণের ভার লইল। মঞ্জরী সেই শাস্ত্রবিধিনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ হইতে নির্বাসিতই থাকিল।

উপন্যাসটি সাধারণ-অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত এক জগতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া, সমাজে যাহারা অপাংক্তেয় এইরূপ এক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিয়া, উহাদের চাল-চলন, ধারা-ধরন, ও বে-পরোয়া, অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ও আদর্শপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োজিত জীবনচর্যার বর্ণনা দিয়া, এবং উহাদের কচিৎ-প্রকাশিত গভীরতর হৃদয়াবেগের পরিচয় দিয়া কথাশিল্পজগতে একটি অনন্য স্থান অধিকার করিয়াছে ও তারাশঙ্কর-প্রতিভার একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

'গন্না বেগম' (আশ্বিন, ১৩৭১)—তারাশঙ্করের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের আর একটি নিদর্শন। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়-যুগে যে অরাজকতা ও ধনপ্রাণের অনিশ্চয়তা যেরূপ নিদারুণভাবে প্রকট হইয়াছিল তাহারই অস্থির ছন্দটি তিনি বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। যুগান্তের প্রলয়-ঝটিকা যে মানুষের নীতি, জীবনবোধ ও আচরণের আদর্শকে বিপর্যস্ত ও উন্মূলিত করিতেছিল তাহাই তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনাঙ্কনকে নূতন পথে চালিত করিয়াছে। সম্রাটের প্রাসাদে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুহুর্মুহুঃ অদৃষ্ট-প্রহেলিকার প্রকাশ, সমস্ত রাজ্যে বিদ্রোহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত শক্তির বুদ্‌বুদের মত উত্থান ও বিলয়; ভারতের রাজনৈতিক দাবাখেলার ছকে নব নব শক্তিসমাবেশের আকস্মিক বিপদসঙ্কেত ও হারজিতের পালাবদল—এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দৈববলের উপর অসহায় নির্ভরশীলতা, সন্ন্যাসী-ফকির-জ্যোতিষীমহলের অদৃশ্য প্রভাব, নাচ-গান-বাইজীর আসরে একদিকে আমীর-ওমরাহের সুরাসক্তি ও ভোগলোলুপ প্রমোদবিলাস অপর দিকে কবিত্বশক্তিচর্চার মধ্য দিয়া উর্দু গজলের সুকুমার প্রেমার্তি ও কখনও কখনও ঐশী ভক্তি-প্রেরণার হৃদয়মনদ্রবকারী অনুভব—এই বিচ্ছিন্ন, যোগসূত্রহীন গতিচক্রে দ্রুতঘূর্ণ্যমান ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিণতির পরিচয় লাভ দুরূহ, উপন্যাসের গভীরতর তাৎপর্য ত আরও অনধিগম্য। আকাশে সঞ্চরণশীল মেঘমালার ন্যায় মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলান এই ইতিহাস—ধূম্রলোকের মধ্যে দুইটি ঘটনা ভূমিকম্পের ন্যায় বিরাট বিপর্যয়সাধনের দ্বারা ইতিহাসের পাতায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে—নাদির শাহ্‌ ও আহম্মদ শাহ্‌ আবদালীর

ভারত আক্রমণ ও দানবীয় লুণ্ঠন ও হত্যাতাণ্ডব। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষুদ্রতর ঘটনাবলীর সহিত ইহাদেরও কোন গুণগত পার্থক্য নাই।

ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই রক্তপিচ্ছিল, বৃহত্তরতাৎপর্যহীন, ভূকম্পনের ছোট বড় নানা অভিঘাতে টলমল ভূমিখণ্ডে দৃঢ় পদক্ষেপের অবসর নাই। 'রাজসিংহ' বা 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাসদ্বন্দ্বের যেটুকু পরিচয় আছে তাহা উন্নত নীতিশৃঙ্খলে গ্রথিত ও বিপুল ভাবাবেগে মহনীয়। এই সংগ্রামক্ষেত্রে যে বিরুদ্ধ শক্তির আত্মিক মহিমার প্রকাশ তাহা ঘটনার বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর তুঙ্গতায় প্রতিষ্ঠিত। এই মহান্ ভাবতাৎপর্য ও উদাত্ত জীবনবোধ বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বগৌরবকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছে। তারাশঙ্করের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে এরূপ কোন গভীরার্থক ইতিহাসচেতনা বা শ্রদ্ধা-উদ্দীপক ব্যক্তিত্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঘটনাস্রোতের একপথবাহী ভাঙ্গা-গড়ার নিষ্ফল পুনরাবৃত্তিতে আমরা কোন স্মরণীয় জীবনসত্যদ্যোতনা লক্ষ্য করি না—এই পরিবর্তন প্রবাহের গতিবেগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াছে ও মিলাইয়াছে,—কেহই আমাদের চক্ষুর সামনে এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই। বাদশাহগোষ্ঠী ত ছায়ামূর্তিপরম্পরার ন্যায় ইতিহাসদৃশ্যপটে ক্ষণলগ্ন থাকিয়া পর মুহূর্তেই যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। উজিরগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তমাংসের পরিমাণ হয়ত সামান্য বেশি, কিন্তু উহারা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখিতে হীন ষড়যন্ত্রে এত বেশি ব্যস্ত যে, উহাদের সেই আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর তাগিদ ছাড়া ব্যক্তিপরিচয়ের আর কোন গূঢ়তর লক্ষণ দেখা যায় না। এই ছায়ার রাজ্যে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়পিনদ্ধতা যেন অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হয়।

উপন্যাসের মধ্যে সুরাইয়া বাই গজলওয়ালী, তাহার স্বামী কাব্যপ্রেমিক আলি কুইলি খাঁ ও উহাদের মেয়ে ও উপন্যাসের নায়িকা ভগবৎপ্রেমিকা ও ধর্মমূলক গজলরচয়িত্রী মন্না বেগমই কিছুটা সজীব চরিত্র। ইহারা রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের গভীর রসাত্মক হৃদয়বৃত্তি ও আত্মভাবস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের জীবনকাহিনী যেন উষর, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ, সর্বগ্রাসী লবণসমুদ্রের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ শ্যামল দ্বীপ। অবশ্য ইতিহাসের অত্যাচার ইহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে প্রচুর পরিমাণে; রাষ্ট্রবিপ্লবের রথচক্র ইহাদের জীবনে গভীর বিদারণ রেখা রাখিয়া গিয়াছে ও ইহাদের পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বার বার বিপর্যস্ত করিয়াছে। ইহাদের জীবন দ্বীপের শ্যামশ্রী অবিরল অশ্রুধারানিষিক্ত। তথাপি সঙ্গীতমাধুর্য ইহাদের জীবনক্ষতে অনেক সান্ত্বনা-প্রলেপ লাগাইয়াছে। সরস্বতীর প্রসাদ ইহাদের রাজনীতিরাহুগ্রস্ত জীবনে মাঝে মাঝে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারা ছড়াইয়াছে। মন্না পিতা-মাতার সঙ্গীতপ্রিয়তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত ঐশী প্রেমে নিবিড় তন্ময়তা ও কাব্যমূর্ছনার মাধ্যমে উহার মর্মস্পর্শী, আবেগঘন প্রকাশ—এই উভয় শক্তিই মিশাইয়াছে। তথাপি তাহার সুকুমার জীবনলতা রাজনীতির মত্ত হস্তীর দ্বারা দলিত মথিত হইয়া সমস্ত উপন্যাসটিকে করুণরসাপ্লুত করিয়াছে। তাহার বিবাহ তাহার মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ও মনোবেদনার কারণ হইয়াছে। আহম্মদ শাহ্ আবদালীর নিষ্ঠুর নির্দেশে সে তাহার সপত্নীর বাঁদী হইতে ও স্বামীর সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াও তাহার উপপত্নীত্বের চরম অমর্যাদা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইতিহাসের নিষ্পেষণে

একটি কুসুমকোমল, পবিত্র হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও কলঙ্কলিপ্ত হইয়াছে। একটি নির্মল-সুন্দর মানবাত্মার এই অসহায় অধঃপতনকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের কলাসম্মত পরিণতিরূপে গ্রহণ করিতে আমাদের সমস্ত শিল্প-ও-সঙ্গতিবোধ বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

তবে উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কর কিছু নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গজলগুলি সত্যই অনুবাদ না তাঁহার স্বাধীন কবিত্বশক্তির প্রকাশ তাহা ঠিক না জানিলেও এগুলির কবিত্ব ও ভাবমাধুর্য খুবই উপভোগ্য ইহা বলা যায়। উর্দু কবিতায় লৌকিক ও দিব্য প্রেম অনেকটা আমাদের বৈষ্ণব কবিতার মত একইরূপ মধুর সাঙ্কেতিকতার মৃদু সৌরভে আমোদিত। উপন্যাসের গজলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিতার তির্যক বাচনভঙ্গী ও রহস্যানুভূতির সৌরভ অনুভব করা যায়। তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সংলাপও অনেকটা ব্রজবুলিধর্মী; ইহাতে আরবী-পারসী শব্দ ও বাংলার কাব্যভাষার সুষ্ঠু মিশ্রণে গঠিত একপ্রকার শোভন প্রকাশরীতি লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদের নবাবী দরবারে এইরূপ ভাষাদর্শই প্রচলিত ছিল। এই ভাষারীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে তারাশঙ্কর উত্তর-ভারতীয় অভিজাতশ্রেণীর মনোভাবপ্রকাশের ছন্দটি সুন্দরভাবে আমাদের অনুভূতিগম্য করিয়াছেন।

(১২)

রোমান্সপ্রবণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তাঁহার দুইটি ছোট গল্পসমষ্টির ('মেঘমল্লার' ১৯৩১, 'মৌরীফুল' ১৯৩২) মধ্যে তাঁহার এই বিশেষত্বের চমৎকার পরিচয় মিলে। তাঁহার কতকগুলি গল্পে ক্ষীণ ঐতিহাসিকতা রোমান্স-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। 'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব' ও 'দাতার স্বর্গ' এই তিনটি গল্পে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশরচনার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রকৃত শক্তি প্রাচীন যুগের ঈষৎ-ব্যঞ্জনা-সমন্বিত প্রকৃতিবর্ণনায়, ঐতিহাসিকতায় নহে। প্রথমোক্ত গল্পে মন্ত্রশক্তির বলে সরস্বতী দেবীর বন্দিনী অবস্থার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আত্মবিস্মৃতা দেবীর ম্লান, স্তিমিত সৌন্দর্যের সংযত বর্ণনাই ইহার প্রধান প্রশংসা। সুনন্দার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের প্রেমের চিত্রটি একটা মধুর কোমল সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধযুগের বিবরণটি বিশেষত্ববর্জিত ও বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়হীন। 'প্রত্নতত্ত্ব'-এ দীপঙ্করের বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতায় ছায়াদৃশ্য স্বপ্নের রহস্যজড়িত অস্পষ্টতার ভিতর দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বর্জিত কল্পনারই প্রাধান্য। 'নাস্তিক' একজন হিন্দু দার্শনিকের ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার কাহিনী; এখানেও প্রকৃতিবর্ণনা জীবনবিশ্লেষণকে নির্বাসন করিয়া একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছে। 'নব-বৃন্দাবন'-এ ভক্তিরসাত্মক ভাবাবেগের দ্বারা গল্পের নিজস্ব শীর্ণতাকে পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

পারিবারিক জীবন লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে—'উমারাণী', 'উপেক্ষিতা' ও 'মৌরীফুল'—তাহাদের মধ্যে সহানুভূতিস্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ করুণ রস ও যৌন প্রেমের একান্ত বর্জন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা নাই, কিন্তু ভাবের ঐকান্তিকতা ও করুণরসের গভীরতা ইহাদের প্রধান গুণ। 'উপেক্ষিতা' গল্পে অনাত্মীয়

নারী-পুরুষের মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠার কাহিনী শরৎচন্দ্রের প্রভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়। তবে এই সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা অপেক্ষা স্নেহসিক্ত মাধুর্যের উপরই বেশী জোর দেওয়াতে লেখকের নিজস্ব রীতি অনুবর্তিত হইয়াছে। 'মৌরীফুল'-এ একটি সংসার-বুদ্ধিহীনা, একগুঁয়ে, অথচ স্নেহশীলা গৃহস্থবধূর করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র গল্পগুলির মধ্যে যে-গুলি সর্বাপেক্ষা মৌলিকতাগুণসম্পন্ন, তাহারা অতিপ্রাকৃত-বিষয়ক। এই বিষয়ে বিভূতিভূষণের স্বভাবসুলভ প্রবণতা ও নৈপুণ্য আছে। কতকগুলি গল্পে অনৈসর্গিকের অবতারণা যতদূর সম্ভব ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রকৃতির বিজনতার মধ্যে যে অতি-প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা আছে তাহাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'বউচণ্ডীর মাঠ'-এ এক স্বামী-সংসর্গবিমুখা বধূ সম্বন্ধে প্রচলিত লৌকিক প্রবাদ ভৌতিক আবির্ভাব-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছে। 'জলসত্র'-এ জলশূন্য মরুপ্রান্তরে দারুণ পিপাসায় গতপ্রাণা এক কলুবালিকার অশরীরী উপস্থিতি অনুভূত হইয়াছে। 'খুঁটী দেবতা'য় মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির বর্ণলীলার মধ্যে দেবতার উদ্ভবকল্পনার বিশ্লেষণ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কীট্সের কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাঘবের বিনিদ্র অবস্থার বর্ণনার মধ্যে কতকটা মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনার ছাপ থাকিলেও গল্পটির প্রধান আকর্ষণ প্রকৃতিবর্ণনামূলক।

'অভিশপ্ত' ও 'হাসি' এই দুইটি গল্পের অতিপ্রাকৃত ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 'অভিশপ্ত' গল্পে মধ্যযুগের বাঙলা ইতিহাসের সহিত জড়িত এক ভৌতিব কিংবদন্তী তীব্র অনুভূতি ও আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত বিবৃত হইয়াছে। কীর্তিরায় ও নরনারায়ণের বিরোধকাহিনীতে যে অতর্কিত আক্রমণ ও অমানুষিক প্রতিহিংসার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্যযুগের হিংস্র, পরাক্রান্ত বর্বরতার সুন্দর পরিচয় দেয়। সুন্দরবনের দুর্গম আরণ্যপ্রদেশের বর্ণনা 'অপরাজিত'-এর অনুরূপ দৃশ্যের কথা মনে করাইয়া দেয়—বস্তুতন্ত্রতা ও উচ্চতর কল্পনার আভাস উভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয়। এই ঘোর অরণ্যানীর কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত তীব্র রোদনধ্বনি যেন প্রেতলোকেরই অকৃত্রিম স্বরটি আমাদের কানে পৌঁছাইয়া দেয় ও আমাদের স্নায়ুশিরায় তাহারই অপার্থিব শিহরণ জাগাইয়া তোলে। 'হাসি' গল্পের ঐতিহাসিক প্রতিবেশ এতটা পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু অন্ধকার নদীবক্ষে রুদ্ধনিঃশ্বাস প্রতীক্ষার মধ্যে অতর্কিত অট্টহাস্য ছুরিকার মত তীক্ষ্ণতার সহিত আমাদের মর্মমূলে কাটিয়া বসে। প্রেত-লোকের সহিত মনুষ্যলোকের বার্তা-বিনিময়ের যে গোপন সুড়ঙ্গপথ আমাদের অন্তরালে খনিত আছে, বিভূতিভূষণ তাহার চাবীর কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

'কিন্নরদল' (অক্টোবর, ১৯৩৮) গল্পসংগ্রহে তিনটি প্রথম শ্রেণীর গল্প আছে। 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প'-এ তন্ত্রসাধনার দ্বারা যোগিনী বশীভূত করার রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বরাকর নদীর নির্জন, চন্দ্রালোকস্নাত, বালুকাস্তীর্ণ দূরদিগন্তে, শালবনের অস্পষ্ট নীলরেখাঙ্কিত তটভূমিতে, মন্ত্রাকর্ষণে অলোকসম্ভবা সুন্দরীর আবির্ভাব আমাদের মনে এক অজ্ঞাত কৌতূহলমিশ্র ভয়ের শিহরণ জাগায়। সুন্দরীর মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল মনোভাব—হাস্য হইতে ভ্রূকুটি, প্রেম হইতে জিঘাংসা, সহজ ভাববিনিময় হইতে দুরধিগম্য নীরবতা—তাহার সহিত রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে এক নামহীন ভয়াবহতার সঞ্চার করে।

লেখকের গল্পে এই ভীষণ ও রমণীয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ চমৎকার ফুটিয়াছে। 'বুধীর বাড়ী ফেরা' গল্পে কশাইখানা হইতে পলায়িত একটি গাভীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বোদ্‌ঘাটন পাঠককে মুগ্ধ করে। উদার, মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য, পরিচিত আবেষ্টনের মাধুর্য, মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতির উন্মাদনাপূর্ণ আনন্দ--সমস্ত প্রাণীরই সাধারণ অনুভূতি; মানুষের মত গরুও তাহা নিজ জাতিসুলভ বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করে। 'কিন্নরদল গল্পে শিক্ষিতা, সুন্দরী সংগীত-অভিনয়-নিপুণা শ্রীপতির বৌ নিরানন্দ পল্লীসমাজে কেমন করিয়া স্বল্পদিনস্থায়ী একটা আনন্দের ঢেউ বহাইয়া দিল, কি করিয়া ব্যবহার মাধুর্যে সংকীর্ণমনা পল্লীগৃহিণীদের পরশ্রী-কাতরতা ও কুৎসাপ্রিয়তা দ্বারা রচিত অন্তরদুর্গে একটা সপ্রশংস স্নেহের স্থান করিয়া লইল তাহার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বহুগুণান্বিতা বৌটির অকালমৃত্যু প্রত্যেক প্রতিবেশীর মনে একটা করুণ, বেদনাপূর্ণ স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে—সংসারের ঊষর মরুদেশে একটা শ্যামস্নিগ্ধ, ছায়াশীতল আশ্রয়ভূমি রচনা করিয়াছে। পরিকল্পনার মৌলিকতার জন্য গল্পটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। অন্য দুই একটি গল্পে—যথা, 'একটি দিনের কথা'য় স্থানে স্থানে উৎকর্ষের লক্ষণ থাকিলেও মোটের উপর আঙ্গিকের শিথিলতার জন্য ইহাদের রস জমিয়া উঠে নাই।

'বেণীদির ফুলবাড়ী' (১৯৪১) গল্পসংগ্রহে বিশেষ উচ্চাঙ্গের কোন গল্প নাই। 'তিরোলের বালা' গল্পটিই ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গল্পে এক উন্মাদগ্রস্তা সুন্দরী তরুণী কেমন করিয়া পাগলামির ঝোঁকে তাহার দাদাকে খুন করিয়া ফেলিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা অনিশ্চিত ভয়াবহ সম্ভাবনা এই রক্তাপ্লুত দুর্ঘটনার মধ্যে শোচনীয়, অথচ আর্টের দিক্ হইতে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত, পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'বাঁশি' গল্পে এক তরুণী বিধবা স্বামীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার বাঁশিটিকে কিরূপ ব্যাকুল, একনিষ্ঠ যত্নের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহার করুণ কাহিনী। 'কুয়াশার রঙ' গল্পে বহুদিন পরে প্রত্যাগত প্রৌঢ়বয়স্ক প্রতুলের কণার প্রতি যৌবনের স্বপ্নমধুর আকর্ষণ প্রথম সাক্ষাতেই উবিয়া গিয়াছে। বাস্তবতার রূঢ় অভিঘাতে প্রেমের বিলোপ—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস বৈশিষ্ট্যের বিশেষভাবে উপযোগী বিষয়। এখানে বিভূতিভূষণ ইহাদের সহিত তুলনায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। নানা অবান্তর বিষয়ের প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় সমস্যার তীব্রতা ও অবিভাজ্য আকর্ষণ মন্দীভূত হইয়াছে। ছোট গল্পের আঙ্গিকে বিভূতিভূষণের নিখুঁত পারিপাট্যের অভাব। কতকগুলি গল্প কল্পনাসমৃদ্ধি ও অনুভূতির গাঢ়তার জন্য খুব চমৎকার হইয়াছে--কিন্তু গঠনের শিথিল আকস্মিকতা, দ্বিধাকম্পিত রেখাঙ্কনপ্রবণতা ও কেন্দ্রসংহতির অভাবের জন্য তাঁহার অনেক গল্পের আর্ট ক্ষুন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি চাহেন বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, ধীর-মন্থর স্বেচ্ছাবিচরণ, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, দরদী মনের স্মৃতিরোমন্থন ও স্বপ্নজালবয়নের প্রচুর অবসর। ছোট গল্পের সংকীর্ণ অঙ্গনে তাঁহার এই অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া তিনি সকল সময় ইহার মাপে নিজেকে সংকুচিত করিতে পারেন না।

(১৩)

'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) দুইখণ্ড—বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস একটি কল্পনাপ্রবণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির মহাকাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ-উপন্যাসের গতানুগতিকশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। শিশুমনের রহস্যময়তা সম্বন্ধে কাব্যে ও দর্শনে যে সাধারণ উক্তি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত, এই উপন্যাসে তাহা পুঞ্জীভূত উদাহরণ ও বিচিত্র প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাপকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া এই শৈশব-রহস্যের ইতিহাস ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের Prelude এর সহিত তুলনীয়—অপুর অধ্যাত্মদৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনিবার্যভাবে Prelude-এ কবির তুল্যরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুর মনে যে সোনার কাঠি পরিচিত জগতের তুচ্ছতার মধ্যে এক অলৌকিক মায়ারাজ্য সৃজন করে, বিভূতিভূষণ সেই রূপকথার রাজ্যের রহস্যটি আমাদের আদর্শলোকচ্যুত বয়স্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ইন্দ্রজালশক্তি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। বিশ্লেষণের মধ্যেও যে ইহার অপরূপ মায়াডোর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই ইহাই লেখকের চরম কৃতিত্ব।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অপুর এক দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা পিসি ইন্দির ঠাকুরাণীব লাঞ্ছনা-দুর্গতিব ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বজয়ার নির্মমতা ও দুর্গার স্নেহশীলতা এই প্রসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অধ্যায়ের সহিত মূল গ্রন্থের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই—ইহা মোটামুটি অপুর পিতৃবংশের পূর্ব ইতিহাস ও যে কৌলীন্যপ্রথাবিড়ম্বিত পবিবারব্যবস্থার যুগ আমাদের চোখের সামনে চিরকালের মত অন্তর্হিত হইল তাহারই করুণ অসহায়তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। একবার মাত্র নিজ পরবর্তী জীবনের দারিদ্র্য-অবহেলার মাঝে সর্বজয়া ইন্দিব ঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করিয়া নিজ যৌবনকৃত অপরাধের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইযাছে। এই অধ্যাযে অপু জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার দিদির মনে একটা সানন্দ বিস্ময়েব ভাব জাগাইয়াছে—কিন্তু তাহাব নিজের অনুভূতি 'অর্থহীন আনন্দ-গীত ও অবোধ কল-হাস্যের' অধিক অগ্রসর হয় নাই।

পরেব দুইটি অধ্যায়—'আম আঁটির ভেঁপু' ও 'উড়ো পায়রা'তে -অপুর শৈশব-জীবনের আশা-কল্পনা ও ক্রীড়া-কৌতুকের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায। এই দুইটি অধ্যায়ে নায়িকা অপুর দিদি দুর্গা। অপু এখানে দুর্গার প্রখর অধিনায়কত্বের সর্বতোভাবে অধীন। দুর্গার চরিত্রে এমন একটা তীক্ষ্ণ মৌলিকতা, নির্ভীক বিচরণ-স্পৃহা, নূতন নূতন খেলা-উদ্ভাবনের শক্তি ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা আছে, যাহাতে সে আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নিকট আর সকলে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহাকে আদর্শবাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র রূপান্তরিত করা হয় নাই। তাহার মধ্যে সাধারণ দরিদ্র গ্রাম্য বালিকার লোভাতুরতা, আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব, এমন কি প্রলোভনের বশে চুরি করিবার প্রবৃত্তিও আছে। তথাপি তাহার এমন একটা অদম্য প্রাণশক্তি, অফুরন্ত আহরণের ক্ষমতা আছে যাহাতে তাহার দোষত্রুটি সত্ত্বেও সে আমাদের চিরপ্রিয়, শৈশব-চাপল্যের চিরন্তন প্রতীক হইয়া থাকে।

অপুর জীবনে যে সমস্ত প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুর্গার সাহচর্যই প্রথম ও প্রধান। দুর্গাই অতি সহজে তাহাদের খেলা-ধুলায় নেতৃত্ব লইয়াছে; সেই হাত ধরিয়া অপুকে আরণ্য প্রকৃতির রহস্যময় নির্জনতার মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্গা অপুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে কোন নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে নাই; বন্য ফল ও উজ্জ্বল লতা-পাতা অপেক্ষা কোন নিগূঢ়তর উপহার সে প্রকৃতি দেবীর প্রসারিত হস্তে দেখিতে পায় নাই। কল্পনাপ্রবণতা, প্রকৃতির ইন্দ্রজালের অনুভূতি ও মন-ব্যাকুল-করা হাতছানি—অপুরই নিজস্ব আবিষ্কার। দুর্গা না জানিয়া তাহাকে প্রকৃতির অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; সে যখন বহিরঙ্গনে দুটা তুচ্ছ ফল-ফুল-আহরণে ব্যস্ত রহিয়াছে, তখন অপু অন্তঃপুরের লীলাখেলা, তথাকার গোপন প্রাণস্পন্দন ও অনির্দেশ্য ইঙ্গিতের সহিত পরিচিত হইয়া এক কল্পলোকে উধাও হইয়াছে।

প্রকৃতিপরিচয়ের মধ্য দিয়া কল্পনার বিকাশ—ইহাই অপুর জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কথা। এই কল্পনাপ্রসার আসিয়াছে নানা প্রভাবের বশে—(১) নিশ্চিন্তপুরের ঘন লতাগুল্মসমন্বিত পটভূমিকায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর অভিনয়-কল্পনায় তাহার কবিত্ব-শক্তির প্রথম উদ্বোধন হইয়াছে। দূর দেশ ও অতীতকালের শৌর্যবীর্যের আখ্যায়িকা জন্মভূমির পরিচিত, শ্যামস্নিগ্ধ প্রতিবেশে যেন নিতান্ত আপনার হইয়া তাহার বক্ষোরক্তে দোলা দিয়াছে। (২) আতুরী বুড়ী ডাইনীর সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ তাহার শিশু-মনের সমস্ত অপরিচয়ের ভীতিশিহরণকে তীব্র অভিব্যক্তি দিয়াছে। (৩) গ্রামের পরিচিত সীমা অতিক্রম করিয়া প্রথম প্রবাসযাত্রা তাহার কৌতূহলের আংশিক তৃপ্তিবিধান ও তাহার মানসপরিধি-বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। (৪) শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশপথে উড়িবার দুরাকাঙ্ক্ষায় তাহার কল্পনার মধ্যে একটু হাস্যকর অসংগতি ও আতিশয্য সংক্রামিত হইয়াছে। (৫) যাত্রাদলের আবির্ভাবে তাহার কল্পনা প্রথম সাহিত্যিক অভিব্যক্তির দিকে ঝুঁকিয়াছে—প্রকৃতির সহিত ক্রীড়াশীলতা সক্রিয় সৃজনেচ্ছায় পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যাত্রাগানের প্রভাবই অপুর জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম সোপান রচনা করিয়াছে। (৬) ইহার পরবর্তী স্তরে দুর্গার মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব তাহার এই সাহিত্যিক প্রেরণাকে আরও প্রবলতর করিয়াছে। (৭) এইবার অপুর মনের একটা বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে—তাহারা নিশ্চিন্তপুরের বাস উঠাইয়া কাশী যাত্রা করিয়াছে, এবং এই যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া নব নব অভিজ্ঞতার প্রবল ঢেউ তাহার শিশু-মনকে প্লাবিত করিয়া সেখানে নূতন সম্ভাবনার বীজ বপন করিয়াছে।

কাশীযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অপুর জীবনে শৈশব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও কৈশোরের আরম্ভ। কাশীতে তাহার যে সমস্ত নূতন অভিজ্ঞতার আহরণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে বহির্বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নিশ্চিন্তপুরের নিবিড় তন্ময়তা নাই। তাহার মন চঞ্চলপক্ষ প্রজাপতির মত নানা নূতন দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই আকর্ষণে পূর্বযুগের গভীর আত্মবিস্মৃত একনিষ্ঠতার অভাব। কাশীর অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন্‌টি তাহার মনে গভীর ছাপ মারিয়াছিল, কোন্‌টি তাহার মানসিক পরিণতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন; চিত্তবিকাশের গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। গাছের যেমন, মানুষেরও তেমনি, শৈশব অবস্থায় বৃদ্ধির অনুকূল উপাদানগুলি

সহজেই ধরা যায়। কিন্তু শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করিলে গাছ যেমন সূর্যালোক ও বায়ুর অনির্দেশ্য প্রভাবে পুষ্টিলাভ করে, মানুষও তেমনি চারিদিকের প্রতিবেশ হইতে নিগূঢ় রস আহরণ করিয়া পরিণতিপথে অগ্রসর হয়। সুতরাং এই স্তর হইতে অপুর পরিণতির প্রক্রিয়া কিছু দুর্বোধ্য হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি কথক ঠাকুর ও তাহার পিতার সংগীতপ্রিয়তা ও কথকতার পালা-রচনা তাহার মনের কাব্যপ্রবণতাকে আরও গতিবেগ দিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু তাহাদের অসহায় অবস্থাকে তীব্রতর করিয়া দাসত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানের সহিত অপুর পরিচয় ঘটাইয়া দিল। বড়লোকের বাড়িতে আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের তীব্র দ্যুতি ও গর্বপূর্ণ, উদ্ধত অবহেলা অপুর অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়াইয়াছে ও বড়বাবুর বেত্রাঘাত সর্বপ্রথম তাহাকে গ্লানিকর যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত করিয়াছে। লীলার সহানুভূতিই এই মরুভূমে একমাত্র নির্ঝরপ্রবাহ। এই অসহ্য অবস্থা হইতে প্রত্যাশিত উদ্ধার আসিয়াছে তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদামহাশয়ের আহ্বানে। তাহার মা তাহাকে লইয়া নূতন প্রতিবেশের মধ্যে মনসাপোতায় আবার ঘর বাঁধিয়াছেন। অপুর ভাগ্য-দেবতা তাহাকে জন্মভূমির পরিচিত আবেষ্টনে না ফিরাইয়া তাহাকে নূতন বৈচিত্র্যের পথে চালিত করিয়াছেন।

মনসাপোতার জীবনে অপু নিজ ভবিষ্যৎ স্থির করিয়াছে। সে মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রাম্য পৌরোহিত্যের সহজ সচ্ছলতা বর্জন করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই সময়কার এক স্মরণীয় দিনের অনুভূতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে—যেদিন সে মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভের সংবাদ পাইয়া স্কুল হইতে ফিরিতেছিল, সেদিন প্রকৃতির শ্যাম-স্নিগ্ধ দীর্ঘপক্ষচ্ছায়া-শীতল চক্ষুতে মাতৃনয়নের পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু টলমল করিতে দেখিয়াছিল। তাহার পর দেওয়ানপুরে তাহার স্কুল-জীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছু লক্ষিত হয় না। তাহার ভূগোল ও নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে অসাধারণ আগ্রহ, বন্ধুত্বলাভের ক্ষমতা ও ভালোমানুষী ধরনের বেহিসাবী খরচপত্রের অভ্যাস—এইগুলিই তাহার স্কুল-জীবনের বিশেষ সঞ্চয়। মাম্‌জোয়ানের মেলাতে নিশ্চিন্তপুরের বাল্য-সঙ্গী পটুর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাহার মনে মোহময় শৈশবের আকর্ষণ আবার নবীভূত করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে—তাহার মাতার সহিত আজন্ম অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বিচ্ছেদরেখা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা একা অপুর নহে, সমস্ত যৌবনধর্মীরই সাধারণ পরিবর্তন।

কলিকাতার কলেজ জীবনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ছাড়া আর কোন লক্ষণীয় বিশেষত্ব নাই। স্কুল-কলেজের রিক্ত, বালুকা-ধূসর মরুভূমির মধ্যে অপু বিশেষ কোন সঞ্জীবনী অমৃতনির্ঝর পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে সে স্বাতন্ত্র্যহীন যূথবদ্ধতার প্রভাবে অপর দশ জনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। দুই একটি সতীর্থের সহানুভূতি তাহাকে লঘুভাবে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার মনে কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করে নাই। মোটের উপর সংসারের রুক্ষ অকরুণতা, কলিকাতা-জীবনের উদাসীন যান্ত্রিকতা অপুর তরুণ, বিকাশোন্মুখ মনের উপর দিয়া তাহার রথচক্র চালাইয়াছে—তাহার সমস্ত পূর্ব প্রবণতার বিরোধী এক অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে। দুই একটি

নারীর প্রতি আকর্ষণমূলক মনোভাবের প্রথম অঙ্কুর এই অবস্থায় দেখা দিয়াছে, কিন্তু নারীপ্রেম অপুর জীবনে কখনই সর্বগ্রাসী প্রবলতা লাভ করে নাই। লীলার সহানুভূতি দূর গগনের ক্ষীণ নক্ষত্রদীপ্তির ন্যায় তাহার অন্ধকার পথের উপর ম্লান আলোকপাত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস হয় নাই। হেমলতার সহিত প্রণয়-ব্যাপারটা একটা কৌতুককর পরিণতির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

ইহার ঠিক পরবর্তী স্তরে অপুর জীবনে দুইটি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহার মাতার মৃত্যু ও বিবাহ। তাহার পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু মাত্র বলা দরকার যে, বিবাহও অপুর মনে গাঢ় প্রণয়-অনুরাগ অপেক্ষা কৌতূহলের অধিক উদ্রেক করিয়াছে। অপর্ণার শান্ত, সংযত শ্রীর মধ্যে মাদকতা কিছুই ছিল না—তাহার দ্বারা এক স্নেহবুভুক্ষা ছাড়া অপুর যে আর কোনও গভীরতর প্রয়োজনের তৃপ্তি সাধন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। অপর্ণা যেন অপুর স্বর্গগতা মাতারই একটা তরুণ সংস্করণ—সেবানিপুণতা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, গৃহস্থালীর কল্যাণসাধন, দুঃখে সহানুভূতি, একটু মৃদুকৌতুকমণ্ডিত হাস্য-পরিহাস—এ সমস্ত বিষয়েই তাহার মাতা ও স্ত্রী এক। তাহার রূপে ও ব্যবহারে চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতার পরিবর্তে শ্যাম বনানীর স্নিগ্ধতা; সে সংসারক্লান্ত হৃদয়ের শান্তিপ্রলেপ, উত্তেজক সুরা নহে। বিভূতিভূষণের সমস্ত স্ত্রী-চরিত্র প্রায় এই ছাঁচে ঢালা।

অপু অপর্ণার সাহচর্যে একটা ক্ষণস্থায়ী শান্তি-নীড় রচনার চেষ্টা করিয়াছে, কখনও মনসাপোতার মাতৃস্মৃতিসমাকুল পুরানো ভিটায়, কখনও বা কলিকাতার সংকীর্ণ জনাকীর্ণতার মধ্যে। কলিকাতার ধূমধূলিমলিন আকাশের তলে তাহার সমস্ত রঙীন যৌবনস্বপ্ন ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়াছে—তারপর অপর্ণার অতর্কিত মৃত্যু তাহার মনকে নিঃসঙ্গ শূন্যতার পাষাণ-ভারে অভিভূত করিয়াছে। তাহার শোকে তীব্রতা নাই, আছে এক প্রকারের গুরুভার অসাড়তা। এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় লীলার বিবাহ-সংবাদ তাহার জীবনকে মোহভঙ্গের বিষাদে তিক্ত করিয়াছে।

এই নিদারুণ আঘাত অপুর জীবনকে চরম সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য বিধি-নির্দিষ্ট অঙ্গুলিসংকেতের মত দাঁড়াইয়াছে। প্রথম অবসাদের প্রভাবে সে দ্রুত অবনতির সোপান বাহিয়া নামিয়া গিয়াছে। চাঁপদানিতে তাহার উদ্দেশ্যহীন, ইতর-সংসর্গে অতিবাহিত জীবনযাত্রা হইতে তাহার পূর্বতন আদর্শবাদের সমস্ত জ্যোতি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। এক প্রকারের অলস ক্লান্তি, নিরুদ্যম অপরিচ্ছন্নতা ও তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে আসক্তি তাহার আজন্মের উচ্চ অভীপ্সাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। পটেশ্বরীর প্রতি স্নেহপূর্ণ সহানুভূতিই তাহার চাঁপদানি-জীবনের নির্বাপিতপ্রায় আদর্শবাদের শেষ স্তিমিত শিখা। কোন অদৃশ্য প্রেরণায় এই ধূলিশয্যা হইতেই গা ঝাড়িয়া সে একেবারে নীলাকাশের দিকে পক্ষ-সঞ্চালন করিয়াছে।

চাঁপদানি হইতে দিল্লীর পূর্বগৌরবের স্মৃতিসমাকুল ভগ্নাবশেষ ও মধ্যপ্রদেশের আরণ্য বিজনতা—বৈপরীত্যের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্। শুধু মধ্যপ্রদেশের গভীর বিজন অরণ্য নহে, নিশ্চিন্দিপুরের

গ্রাম্য বনজঙ্গলের বর্ণনাতেও লেখকের অনন্যসুলভ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বর্ণনা সম্বন্ধে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও সমস্ত লেখকের তথ্যসমাবেশ প্রায় এক প্রকারের, তথাপি যাঁহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা এই সমস্ত বস্তুপুঞ্জ-সমাবেশের মধ্যে এমন একটা নবীনতা প্রবর্তন করেন, দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে এমন একটা প্রাণস্পন্দনের বা ভাবগত ঐক্যের আবিষ্কার করেন যাহার জন্য বর্ণনাটি সম্পূর্ণ তাঁহাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে। নিশ্চিন্দিপুরের জঙ্গলে লেখক যে সমস্ত বন্য গাছপালা ও লতা-গুল্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ঠিক ভব্য, অভিজাত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে—কোন কবি তাহাদের চারিদিকে একটা সুপরিচিত ভাবব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া রাখেন নাই। অথচ এই সমস্ত দৃশ্যের সরসতা, শ্যামলতার প্রাচুর্য, অযত্নবিন্যস্ত স্নিগ্ধ ঘন ছায়া—এই সমস্তই বাংলার পল্লীশ্রীর নিজস্ব আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ এই বর্ণনাকে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ করিয়াছেন—বাংলাদেশের ঝোপ-ঝাপ শর-বন, নদীতীরের কাশ-শ্রেণী, দুর্ভেদ্য কাঁটার জঙ্গল তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শিতার কল্যাণে নবলব্ধ আভিজাত্য-গৌরবে সমুদ্র, পর্বত, প্রভৃতি প্রকৃতির বিরাটতর দৃশ্যের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিয়াছে। অরণ্য বর্ণনায়, ঋতুপরিবর্তন ও দিবারাত্রির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অরণ্য-পর্বতের বর্ণলীলার পরিবর্তনশীলতা আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। আর শুধু বাহিরের রংএর খেলা নয়, অরণ্যের ভিতরকার রহস্য, ইহার বিরাট্ নিঃশব্দতা, ইহার অপরিমেয় গভীরতা ও অসীমের ব্যঞ্জনা সমস্তই আমাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অরণ্যের নিভৃততম বাণী লেখক অনুভব করিয়াছেন ও এই অনুভূতির ফল আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।

প্রকৃতির অবাধ বিজনতায় এই নবদীক্ষার পর অপু বাংলাদেশে ফিরিয়াছে। কয়েক বৎসর প্রবাসের পর বাংলার পরিচিত শ্যামল শ্রী তাহার চোখে আবার নূতন হইয়া দেখা দিয়াছে—সে কবিত্বের অঞ্জনমাখা দৃষ্টিতে, প্রেমিকের ব্যাকুল প্রতীক্ষা লইয়া আবার জন্ম-ভূমির মায়াময় সৌন্দর্যকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। লীলার সহিত সম্বন্ধ মধুর সমবেদনার মধ্য দিয়া প্রেমের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে—অপর্ণার স্মৃতি এই নূতন সম্বন্ধের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু লীলার অতর্কিত আত্মহত্যার মধ্যে এই উপনীয়মান প্রেমের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অপুর হৃদয়সম্পর্কিত জটিলতার মধ্যে লীলার প্রতি মনোভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেমের লক্ষণাক্রান্ত; অপর্ণার প্রতি ভালোবাসায় সরল সহৃদয়তা আছে, প্রেমের তীব্র আবেগ নাই। এই সময় অপুর জীবন একদিক দিয়া পরিণতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছে—সে তাহার আবাল্যসঞ্চিত মূলধন লইয়া সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হইয়াছে—তারপর একটা হঠাৎ প্রয়োজনে কাশীযাত্রার উপলক্ষ্যে তাহার জীবনের দ্বিতীয় স্তর উন্মুক্ত হইয়াছে—সেখানে নিশ্চিন্দি-পুরের বাল্যসহচরী লীলাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া আবার তাহার চিত্ত শৈশবস্মৃতির পবিত্র তীর্থোদকে অভিস্নাত হইয়া নূতন পরিণতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে আবার নিশ্চিন্দিপুরের পুরাণ ভিটা" স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের ঘুঘুর করুণ উদাস ডাকে উতলা বনচ্ছায়ার মধ্যে ঘর বাঁধিবার সংকল্প করিয়াছে।

এই সংকল্পগ্রহণ সে একা নিজের জন্য করে নাই, তাহার মাতৃহারা পুত্র কাজলের জন্যও। [illegible]কান্ত ইচ্ছা যে, সে যেরূপ প্রতিবেশে শৈশব-জীবন কাটাইয়া প্রকৃতির অপরূপ সম্পদে

নিজ মানস ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, তাহার পুত্রের তরুণ, আগ্রহভরা হৃদয়েও সেইরূপ মধুচক্র রচিত হউক। কাজলের শৈশব একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবেষ্টনেই অতিবাহিত হইয়াছে—তাহার শিশু হৃদয়ের অস্ফুট আশা-কল্পনা, তাহার অতৃপ্ত কৌতূহল-ক্ষুধা সমস্তই সহানুভূতিহীন অভিভাবকের কড়া শাসনে মুকুলেই শুকাইবার মত হইয়াছে। সর্বদা বাধা-অবহেলার মধ্যে বাস করিয়া সে একপ্রকারের ভীত, সংকুচিত, বিকৃত মনোভাব অর্জন করিয়াছে। অপু তাহাকে নিজ স্নেহাশ্রয়ে লইয়া গিয়া, তাহার এই অস্বাস্থ্যকর বিকৃতিকে আরোগ্য করিতে চাহিয়াছে, তাহার সমস্ত স্বপ্নময় কল্পনাকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়া তাহার হৃদয়ের নবীন সরসতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কাজলের শৈশব-চিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও আকর্ষণের উপাদানের অভাব নাই—তথাপি অপুর বাল্যজীবনের অপূর্ব নিবিড়তার সহিত তুলনায় তাহার জীবন ফিকা ও পানসে দেখাইয়াছে। অপুর নিকট বন্য-প্রকৃতির আবেদন এক দুর্গা ছাড়া আর কাহারও মধ্যবর্তিতার তাহার কানে পৌঁছায় নাই। কাজলের সঙ্গে প্রকৃতির যে পরিচয় তাহাতে পদে পদে অপুর নির্দেশ ও প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। অপু তাহার নিকট সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে, প্রকৃতির মোহময় প্রভাবের মহিমাকীর্তনে রত হইয়াছে, প্রতি দর্শনীয় বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া কাজলের পলাতক মনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাজল ও প্রকৃতির মাঝে অপুর প্রভাব ছায়া ফেলিয়াছে, অপুর মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহার সৌন্দর্যানুভূতি ঘটিয়াছে। প্রতিভা বংশানুক্রমিক নহে এই বৈজ্ঞানিক সত্য যে কাজলের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না। তাহার আগ্রহপূর্ণ চঞ্চলতা ও শৈশবসুলভ ভাব-ভঙ্গী খুব চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সে যে দ্বিতীয় অপু হইবে না তাহা সাহস করিয়া বলা যায়।

নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তন কাজলের পক্ষে কতখানি প্রভাবশীল হইয়াছে তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু অপুর পক্ষে ইহা একেবারে মানস পুনর্জন্ম। সে তাহার শৈশবের অমৃতকুণ্ডে আবার তাহার জীবনযাত্রার কঠোর প্রচেষ্টায় ক্লান্ত পক্ষ সিক্ত করিয়া লইয়া নূতন অভিযানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বাল্যস্মৃতিরোমন্থনের অপরূপ সুখ সে সমস্ত অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়াছে। অতীত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিগূঢ় পরিবর্তন উপলব্ধি করিয়া সে নিজ শক্তির বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছে। এই নিশ্চিন্দিপুরে স্বল্পপরিসর, সংকীর্ণ বনে ঘেরা পরিধির মধ্য দিয়াই সে অসীমের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে। যে দিব্যদৃষ্টি জগতের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্মতলস্থ গভীর রহস্যসংকেতটি স্বচ্ছ করিয়া ধরে, জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড-প্রকাশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া যুগযুগান্তরব্যাপী অশেষ পরিবর্তনের মধ্যে জীবনধারার অনন্ত, অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য আবিষ্কার করে, পৃথিবীকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির জটিল কক্ষাবর্তনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখে ও জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত জীবনের অসীম, উদার সম্ভাবনায় নিবিড়, সংশয়লেশহীন আনন্দ অনুভব করে, তাহাই তাহার প্রিয় সন্তানকে নিশ্চিন্দিপুরের পরম উপহার। নিশ্চিন্দিপুর অপুকে বাল্য-জীবনে কবি করিয়াছিল—প্রৌঢ় বয়সে তাহাকে দার্শনিকের ও যোগীর ধ্যানদৃষ্টি উপহার দিয়া তাহার দিগ্‌বিজয়-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিয়া দিল। এই উচ্চতম দার্শনিক সুরেই এই মহাকাব্যের ন্যায় বিরাট উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

পূর্বোক্ত সার-সংকলনের মধ্যে সমালোচনার যতটুকু প্রয়োজন ছিল তাহা প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে—অপুর চরিত্র ও তাহার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনসম্বন্ধ। অপুর চরিত্রে একপ্রকার উদার আসক্তি-হীনতা, স্নেহ-মায়ায় অনভিভূত, চঞ্চল অগ্রগমনশীলতা আছে। এইজন্য সে জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে নিতান্ত লঘুতার সহিত, অনেকটা অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সংসারের কোন আঘাতেই তাহার ভাব-কেন্দ্র গুরুতরভাবে বিচলিত বা স্থানচ্যুত হয় নাই। দুর্গার মৃত্যু, পিতা-মাতার মৃত্যু, বিবাহ ও স্ত্রীবিয়োগ এই সমস্ত চিত্তবিক্ষেপকারী ও শোকাবহ সংঘটনেও অপুর চিত্তের মুক্তস্বাধীনতা, তাহার চঞ্চল সক্রিয়তা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হয় নাই। দুর্গা ও পিতার মৃত্যুতে তাহার মনোভাব-বিশ্লেষণের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই—তবে তাহার ব্যবহারে গভীর কোন শোকেব চিহ্ন মিলে না। হয়ত বালকের এইরূপ নিরাসক্ত মনোভাবই স্বাভাবিক; আমরা বয়স্ক মনের মোহাকুলতা ও দুশ্ছেদ্য মায়া-বন্ধন লইয়া বালকের সদানন্দ, মুক্ত প্রকৃতির বিচার করিতে বসি। দুর্গার মৃত্যুতে প্রকৃতির সহিত তাহার তন্ময়তার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। পিতার মৃত্যু একটা আকস্মিক বিপৎপাতের ন্যায় তাহাকে বিমূঢ় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চিত্তের স্থিতিস্থাপকতাকে নষ্ট কবে নাই। মাতার মৃত্যুতে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে—যে বন্ধন তাহার অগ্রগতির পায়ে বেড়ির মত ছিল তাহা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে সে মুক্তির আরাম অনুভব করিয়াছে। অপর্ণার মৃত্যু তাহাকে অভিভূত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানেও শোকের প্রাবল্য বা আবেগেব গভীরতা নাই, আছে মোহভঙ্গের বিষাদ ও শূন্যতার অনুভূতি। এইখানে অপুর চরিত্র-পরিকল্পনায় যেন একটু ত্রুটি আছে। আমরা সাধারণতঃ ভাবগভীরতার যে মাপকাঠি লইয়া চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচাব করি, অপু সেই আদর্শ পূরণ করে না। বোধ হয় গভীবতা ও প্রসারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্কবিরোধ আছে। অপুর জীবন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পবিধিতে প্রসারিত হইয়াছে, বিচিত্রস্বাদ অনুভবের জন্য সে পরিচিতের গণ্ডি ছাড়িয়া কেবলই সুদূর অপরিচিত দিগন্তের দিকে ডানা মেলিয়াছে; পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহ তাহাকে নিশ্চল স্থিতিশীলতার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারে নাই। কাজেই যেখানে আমরা একনিষ্ঠ গভীরতাব প্রত্যাশা করি, সেখানে আমরা পাইয়াছি বন্ধনহীন, বিরামহীন গতিশীলতা, জটিল ঘূর্ণিপাক ও ক্ষুব্ধ পুনরাবৃত্তিব পরিবর্তে আমরা পাই নদীব চিব-চঞ্চল প্রবাহ। অপুব চরিত্র প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত নূতন অভিজ্ঞতা আহরণ ও নূতন প্রবাহ আত্মসাৎ করিতে কবিতে পরিণতির স্তর হইতে স্তবান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে চরম পবিণতির উচ্চ চূড়ায় আসীন হইয়া আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে নিজ হৃদয়াবেগের গভীরতা মাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং তাহার সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হওয়ায় ও জীবনের সন্ধিস্থলগুলিতে গভীব আবেগেব আপেক্ষিক অভাবের জন্য অপু সাধারণ ঔপন্যাসিক চরিত্র হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র-প্রকৃতির। সে যে অত্যন্ত জীবন্ত-মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জীবন-বৈদ্যুতীতে পূর্ণ, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি তাহার বাস্তব জীবনের ভিত্তিব উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; তাহা কেবলমাত্র কাব্যমূলক আকাশ-বিচরণ নহে। আধ্যাত্মিক অনুভবের যে শিখরদেশে সে দণ্ডায়মান সেখানে সে পায়ে হাঁটিয়া,

বাস্তব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই পৌঁছিয়াছে, কোন কল্পনা স্ফীত বায়ুযানের সুলভ সাহায্যে নহে। শৈশব হইতে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ এই আদর্শের অভিমুখেই চালিত হইয়াছে; পথের প্রত্যেক বাঁক ও মোড়ে ইহার পদচিহ্ন সুস্পষ্ট ও গভীরভাবে অঙ্কিত। প্রকৃতিবর্ণনা, শৈশব-চিত্র ও বাস্তবতার স্তর বাহিয়া আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ—এই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাবপরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করিয়াছে।

(১২)

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'দৃষ্টি-প্রদীপ' (১৯৩৫) ঠিক তাহার পূর্ব গ্রন্থের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার নায়ক জিতুর মধ্যে অপুর আকর্ষণী শক্তি ও প্রাণময়তা নাই। জিতুর বাল্যজীবনের মোহ এত নিবিড় নহে—দার্জিলিং-এর শৈলশ্রেণী ও চা-বাগানের দৃশ্যে বিদেশের চোখ-ঝলসানো একটা তীব্র স্মৃতি আছে, নিশ্চিন্তপুরের চিরপরিচিত শ্যামলতার স্নিগ্ধ-সরস, গভীর আবেদন নাই। জিতুর প্রথম প্রকৃতি-পরিচয়ের মধ্যে হৃদয়ের অপেক্ষা চোখের তৃপ্তিই প্রবলতর। তারপর তাহার বাল্যজীবন যে প্রকার গ্লানি ও লাঞ্ছনার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে তাহাও অপুর অভিজ্ঞতা ইহাতে বিভিন্ন। অপুর দারিদ্র্যের মধ্যে স্বাধীনতা ও প্রকৃতির সহিত মিলনের অবাধ সুবিধা ও নিবিড় আনন্দ ছিল—যাহাকে অপুর অভাব মনে করা যাইতে পারে তাহা কেবল' বস্তুতন্ত্রতার অতিরিক্ত পেষণ হইতে অব্যাহতি। জিতুর জীবন পদে পদে অপমানকর বাধা-নিষেধ ও অকারণ তিরস্কারের দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে। সুতরাং অপুর গভীর অনুভূতি হইতে তাহার জীবন বঞ্চিত। বিশেষতঃ, জিতুর প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে তাহার অলৌকিক শক্তি, অদৃশ্য জগতের দুই একটি প্রতিচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা। এই অনৈসর্গিক বিভূতিকে আমরা ঠিক সহানুভূতির চক্ষে দেখি না—জিতু যেন আমাদের হইতে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী বলিয়াই আমরা মনে করি। জিতুর পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনসমালোচনার মধ্যে অপুর নবীন মৌলিকতা যেন অনেকটা ম্লান হইয়াছে—তাহার মধ্যে একটু ধর্মালোচনার প্রাধান্য, একটু নীতিবিদের মঞ্চারোহণের ছায়াপাত হইয়াছে। তাহার প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতা ভগবদ্ভক্তির সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি তাহাকে ভগবানের নূতন পরিকল্পনাতেই উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। তাহার অনুভূতি অনেকটা theological বা ধর্মবিচারের প্রভাবান্বিত হইয়াছে —অপুর অবাধ মুক্তি অপরিমেয় বিস্তার তাহার নাই। বিশেষতঃ, প্রকৃতি হইতে ভগবান পর্যন্ত অধিরোহণের ব্যাপারে যেন কতকটা কষ্টকল্পনা, বর্ণনার মধ্যে উঁচু সুর লাগাইবার একটা চেষ্টাকৃত অধ্যবসায় অনুভূত হয়। অপুর জীবনের সঙ্গে তাহার অধ্যাত্ম অনুভূতির যে একটা সহজ সম্পর্ক আছে, জিতুর দৈবী অনুভূতির মধ্যে সেরূপ বাস্তব ভিত্তির অভাব— তাহার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সেরূপ সুস্পষ্ট নহে।

আরও একটা দিক দিয়া অপু ও জিতুর মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। অপুর বন্ধন-হীন, উদার অনাসক্তির সহিত জিতুর আসক্তিপ্রবণতা তুলনীয়। জিতু উদাসীন সন্ন্যাসীর

মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অন্তরে গৃহী। নীড়রচনায় একাগ্র কামনা, প্রেমের উত্তপ্ত নিবিড় স্পর্শ—তাহার জীবনে প্রধান আকাঙ্ক্ষা। ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থন তাহার প্রধান অবলম্বন। মালতীর চিন্তা তাহার সমস্ত প্রকৃতি-সৌন্দর্যোপলব্ধির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে; কহলগাঁয়ের পাহাড় ও নদীর বিচিত্র, পরিবর্তনশীল রূপ প্রেমের ব্যর্থ-মধুর স্বপ্নে উন্মনা হইয়াছে। অপুর প্রকৃতিরহস্যানুসন্ধানের মধ্যে কোন প্রেম-বিহ্বলতা আত্মপ্রসারণের চেষ্টা করে নাই। জিতুর প্রেমপ্রবণতা মালতীতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষে হিরণ্ময়ীতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত অনধিগম্যা প্রিয়ার নিকট সে যে আকুল আবেদন পাঠাইয়াছে, তাহাই তাহার বৈরাগ্যের বহির্বাসপরা মনের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা। এমনকি যে ভগবৎ-প্রেম তাহার প্রধান সাধনার বিষয় ছিল তাহা এই বিরহ-ব্যথায় অভিষিক্ত হইয়া মানুষের প্রতি ভালবাসার অশ্রুসজল কোমলতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রেমের চিত্রাঙ্কনে লেখকের যে উচ্চাঙ্গের স্বভাবকুশলতা আছে তাহা বলা যায় না। তিনি প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে প্রেমের স্বপ্নাবেশ সঞ্চার করিতে পারেন। কিন্তু স্বপ্ন বাদ দিয়া আসল প্রেমের তীব্র আবেগ তাঁহার মনে কোন উত্তেজনা আনে না। সমস্ত মালতী-উপাখ্যানটি একটু আজগুবি, অবিশ্বাস্য ধরণের বলিয়া ঠেকে। বিশেষতঃ, ইহা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ কমললতার অসংকোচ অনুকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবের মঠে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—এই স্বপ্নের মধ্যে প্রেমেরও ঈষৎ আমেজ ছিল। শরৎচন্দ্র এবং তাঁহার অনুকরণে বিভূতিভূষণ ইহাকে স্বাধীন প্রেমের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব-সমাজে সমাজবন্ধনের আপেক্ষিক শিথিলতাই ইঁহাদিগকে এই দিকে প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা এই অনুকূল প্রতিবেশের সুবিধায় সন্তুষ্ট না হইয়া আবার ইহার মধ্যে আশ্চর্য রূপগুণসমন্বিতা নায়িকারও সন্ধান পাইয়াছেন। এই নায়িকারা মতে উদার, রুচি ও অনুশীলনে মার্জিত, সেবাতে অনলস, এমনকি ললিত-কলাতেও কৃতী ও সংযমে অবিচলিত। কমললতা কাব্যজগতের সুরভি নিজ দেহ-মনে বহন করিত, কিন্তু সে নিজে কবি ছিল না। বিভূতিভূষণ মালতীকে কবিপ্রতিভার অধিকারিণী করিয়া তাহাকে একেবারে সরস্বতীর তুল্য পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। সমস্ত পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে অত্যধিক পীড়িত করিতে থাকে। হিরণ্ময়ী বিশ্বাস্যতার দিক দিয়া মালতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার উপরেও শরৎচন্দ্রের তেজস্বিনী, দৃঢ়সংকল্পা নায়িকাদের ছায়াপাত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ছোট বৌ-এর ব্যাপারটাও ছেলেমানুষী ও সত্যকার প্রেম এই দুই-এর মাঝামাঝি অবস্থায় পৌঁছিয়া অনেকটা আত্মবিমূঢ় ভাবের মধ্যে অবসান লাভ করিয়াছে। মনে হয় যেন এই প্রেম-প্রবর্তনের ব্যাপারে বিভূতিভূষণ নিজ প্রতিভার সহজ নির্দেশের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের চিরপ্রথাগত, প্রত্যাশিত কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

মোটের উপর জিতুর জীবনে অপুর সুনির্দিষ্ট ঐক্য ও প্রাণচঞ্চলতার অভাব। তাহার জীবনেতিহাস যেন শিথিল-বদ্ধ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। তাহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সে যে সাড়া দিয়াছে তাহার মধ্যে ক্ষীণতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

অভাব অনুভব করা যায়। তথাপি 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর সঙ্গে তুলনায় হীনপ্রভ হইলেও 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এর জীবন ও প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে সরসতার অভাব নাই। দার্জিলিং-এ চা-বাগানের জীবনযাত্রা, দশঘরার জ্যাঠাইমার উদ্ধত ধন-গর্ব ও শুচিতার অহংকার ও তাহার মায়ের দীন নম্রতা, বটতলার মেলায় অশিক্ষিত নিয়চাঁদের মূঢ় ভক্তিবিহ্বলতা, প্রভৃতি দৃশ্যের সরস বর্ণনাভঙ্গী উপভোগ্য। প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে পূর্বপরিচিত অসীমের সুর ও গভীর ঐকান্তিকতা ধ্বনিত হইয়াছে। রাঢ়ের তারকাখচিত নীলাকাশের তলে, অতিবাহিত রাত্রি, স্বারবাসিনীর মঠে প্রেমের বিহ্বলতা-ভরা বিনিদ্র জ্যোৎস্নারজনী, কহলগাঁয়ের পাহাড়ের স্মৃতিবিধুর বিভিন্ন দৃশ্য, গরুর গাড়িতে যাত্রাকালে অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় ভগবানের চির-পথিক মূর্তির পরিকল্পনা—এই সমস্ত দৃশ্যবর্ণনাই শিল্পচাতুর্যে ও গভীর ভাবসঙ্কারে প্রশংসনীয়, যদিও ইহারা 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর মত বক্তার জীবন হইতে স্বতঃউদ্ভূত বলিয়া মনে হয় না। ইহার শেষ সুর লেখকের পূর্ব গ্রন্থেরই অনুরূপ—লৌকিক জীবনের লাভ-ক্ষতিকে তুচ্ছ করিয়া অফুরন্ত, অনন্ত যাত্রাপথের জয়গান। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবগভীরতাকে বিসর্জন না দিয়া সীমাহীন ব্যাপ্তির দিকে প্রবণতা, এই অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অপরাজিত মানবাত্মার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সা যদি বাংলা সাহিত্যে ও উপন্যাসে স্থায়ী হয়, তবে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই।

'আরণ্যক' (এপ্রিল, ১৯৩৯) উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর—ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, দিবা-রাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না-অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীল রূপ ও সূক্ষ্ম আবেদন আশ্চর্যরূপ বস্তুনিষ্ঠা ও কাব্যব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর, অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জন-হীন, বিশাল আরণ্যপ্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে—যাহাকে বলে cosmic imagination তাহাকেই—স্ফুরিত করিয়াছে, কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টিক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ-শিহরণ, ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি-পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম, আরণ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ একদিকে বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা টাঁড়বারো দেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে; অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা করা সম্ভব সেই যুগযুগান্তপ্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যান-

তন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।

এই চেতনাশক্তিসম্পন্ন, নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি-প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের সংকুচিত উপস্থিতি চমৎকার সামঞ্জস্যবোধের নিদর্শন। বিরাট অরণ্যের নিকট মানুষ আকারে যেরূপ ক্ষুদ্র, ইহার শক্তিশালী প্রাণব্যঞ্জনার নিকট মানুষের ছোটখাটো প্রচেষ্টা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-গুলিও সেইরূপ নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। এখানে মানুষের জীবন বনের ব্যবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের মতই দ্বীপধর্মী ও ধারাবাহিকতাহীন—প্রকৃতির অনুগ্রহদত্ত, কুণ্ঠিত অধিকার। প্রকৃতি তাহাকে যেটুকু সংকীর্ণ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার মধ্যেই সে, যেমন বাহিরে, তেমনি অন্তরেও, কোনমতে মাথা গুঁজিয়া আছে। এখানে মানব-মনের সে উদ্দাম চাঞ্চল্য, সে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, সে আকাশস্পর্ধী পক্ষবিস্তার নাই। নির্জন, আত্মসমাহিত শান্তি, সমস্ত বাহুল্য-আয়োজনসম্ভারের বর্জন, আকাঙ্ক্ষা-পরিধির নির্মম সংকোচ—এখানকার জীবনবৃত্তির বৈশিষ্ট্য। বহির্ঘটনার আশ্রয়চ্যুত জীবন কেবল কয়েকটি ক্ষীণ, বিচ্ছিন্ন অনুভূতির সমষ্টি। মানুষের আদিম বৃত্তিগুলি এখানে ইন্ধনহীন অগ্নির মতই ম্লান ও নিস্তেজ। ঝগড়া-বিবাদ ও অত্যাচার আছে, কিন্তু ইহারা অরণ্যের দাবানলের মত হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া অল্পক্ষণ পরে দাহ্য পদার্থের অভাবে নিভিয়া যায়। কৃত্রিম সমাজব্যবস্থায় বিরোধের যে অগ্নি আইনরচিত চিমনির সাহায্যে ও উভয়পক্ষের প্রচণ্ড জিদে বহুবর্ষ জিয়াইয়া রাখা হয়, এই আরণ্য সমাজে একদিনের লাঠি-বাজিতে তাহার চির-নির্বাণ। এক রাসবিহারী সিংহ ও দ্বিতীয়, নন্দলাল ওঝা এই বন্য সরলতার মধ্যে সভ্যতার জটিল ক্রূরতার প্রতীক—কিন্তু ইহারা বনে বাস করে বলিয়া সোজাসুজি বিনা ছদ্মবেশে হিংস্রপশুস্থানীয় হইযাছে—সভ্য সমাজের আদর্শানুযায়ী নাম ভাঁড়াইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ইহার মহাজন ধাওতাল সাহু পর্যন্ত সরলবিশ্বাসী, আত্মভোলা লোক—অরণ্যমর্মরের নিগূঢ় মন্ত্র তাহাকে কুসীদজীবী-সুলভ ধূর্ততা ভুলাইয়াছে। এখানে দারিদ্র্যের রুক্ষ ত্বক্ স্নিগ্ধ সন্তোষের শ্যামশৈবালমণ্ডিত, ভিক্ষায় গ্লানিবর্জিত, মৃত্যুতে বিলয়ের প্রশান্তি ও শোকে অশান্ত তীব্রতার পরিবর্তে বিষণ্ণ, ঘুম-পাড়ানিয়া আচ্ছন্নতা। এখানকার আমোদ-প্রমোদে সহজ আনন্দে ছন্দ-সুষমা, মেলা-পার্বণে লুব্ধ বণিকবৃত্তির কোলাহলের স্থলে স্বতঃউৎসারিত স্ফূর্তির একদিনব্যাপী উচ্ছ্বসিত জোয়ার। এখানকার সরল পারিবারিক জীবনে সপত্নীবিদ্বেষ ঈষৎ ব্যঙ্গ-মধুর, সস্নেহ মনোভাবে রূপান্তরিত , বৃদ্ধ স্বামীর ঘর হইতে তরুণী ভার্যার পলায়ন ফাঁদ পাতিয়া বন্য পাখি ধরার মত করুণ, বেদনাসিক্ত সহানুভূতির বিষয়। এখানে জীবন ও মরণ, কবিকল্পনায় নহে, প্রতিদিনকার বাস্তব আবর্তনে, "চুপি চুপি কথা কয়"।

এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্‌গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা—উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্না ও তাহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া—সকলের উপরেই আরণ্য মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত প্রজাসাধারণও—রাজু পাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুন্তা রাজপুতানী, গনোরী

তেওয়ারি, নকছেদী-তুলসী-মঞ্চী, গিরিধারীলাল প্রভৃতি—বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপজঙ্গলের মত— এই আরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি বাঙালী ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা—ইহারাও বাঙালী সমাজের বহুশতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্যসমাজের আভিজাত্যগৌরবহীন, শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে। সরস্বতী কুণ্ডীর অপরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ বনস্থলীর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুরের সপরিবারে বনভোজনবিলাস অমৃতহ্রদে মক্ষিকা-নিমজ্জনের মত, ইহার বিসদৃশ অসংগতির দ্বারাই, অরণ্য-প্রকৃতির সুগম্ভীর, অধৃষ্য মহিমাকে স্ফুটতর করিয়াছে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (অক্টোবর, ১৯৪০) বিভূতিভূষণের পরবর্তী উপন্যাস। রাণাঘাটে হোটেলপরিচালনার অতিজাগ্রত ব্যবসায়বুদ্ধির একটি সরস ও উপভোগ্য চিত্র ইহাতে আঁকা হইয়াছে। কিন্তু এই নাগরিক চাতুর্য ও কারবারি মারপেঁচ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক যে সরল, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ, ঘন বাঁশবন ও আগাছার জঙ্গলের আড়ালে অযত্নবিকশিত বন্য কুসুমের ন্যায় মৃদুসৌরভপূর্ণ পল্লীজীবনের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নিজেরও স্বাভাবিক রুচি ও পাঠকেরও সমধিক তৃপ্তি। হাজারি ঠাকুরের চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দৈবের যে প্রসাদ-পরম্পরা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যেরূপ একটানা সৌভাগ্যের স্রোতে, চারিদিক হইতে প্রবাহিত অনুকূল বায়ুর প্রেরণায়, তাহার জীবনতরী সাফল্যের বন্দরে ভিড়িয়াছে তাহা বাস্তব প্রতিবেশ অপেক্ষা রূপকথার সহিতই অধিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট। উপন্যাসটি মোটের উপর রূপকথার লক্ষণান্বিত ; এবং বোধ হয় আধুনিক যুগের সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনযাত্রার বৈপরীত্য সূচনার জন্য মিষ্ট।

'বিপিনের সংসার' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পুরাতন আবেষ্টনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়া কতকটা নূতন মনোরাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেরই একটা সাধারণ লক্ষণ—প্রেমের আপেক্ষিক বর্জন। প্রেমের দুঃসাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বিক্ষোভের প্রতি তাঁহার একটা প্রকৃতিগত বিমুখতা আছে। তাঁহার রচনায় হৃদয়াবেগ শান্ত, স্নিগ্ধ সমবেদনা, নিরুত্তাপ, দ্রবীভূত কোমলতার আকারেই দেখা দেয়। তাঁহার দাম্পত্যসম্পর্কবর্ণনা এই উষ্ণ আবেগের অভাবের জন্যই কতকটা অপূর্ণ বলিয়া ঠেকে। নিষিদ্ধ প্রেমের ত্রিসীমানাতেও তিনি ঘেঁষেন নাই—এই তীব্র হৃদয়-মন্থনে যে অমৃত-হলাহল উঠে তাহা পান করিতে তিনি রুচির দিক দিয়া অনিচ্ছুক ও সম্ভবতঃ শক্তির দিক দিয়া অসমর্থ। এই উপন্যাসে কিন্তু নারী-পুরুষের সমাজের অননুমোদিত আকর্ষণকে তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সহিত, আগুনে হাত না পোড়াইয়া, ছুঁইয়াছেন। বিপিনের জীবনে মানী ও শান্তি এই দুই বিবাহিতা রমণীর প্রভাব এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। বিপিনের প্রতি ইহাদের মনোভাব সস্নেহ হিতৈষণা ছাড়াইয়া আর এক পর্যায় উপরে উঠিয়াছে—প্রেমের অস্বস্তি, যত মৃদুভাবেই হোক, ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক এই আকর্ষণের দৈহিক লালসার দিকটা একেবারে চাপিয়া ইহার উচ্চতর প্রেরণা ও নিষ্কলুষ আবেগের দিকটাই বড় করিয়াছেন। মানীর প্রভাবে তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে,

এমন কি তাহার স্ত্রী মনোরমার প্রতি মনোভাবেও মমতাপূর্ণ কোমলতার সঞ্চার হইয়াছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রেমের অহেতুক আবির্ভাব ঘটিয়াছে নারীর হৃদয়ে; বিপিন কেবল তাহাদের আবেদনে, কতকটা নিষ্ক্রিয়ভাবে, সাড়া দিয়াছে মাত্র। স্নেহ-যত্ন কেমন করিয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইল তাহার কাহিনী লেখক যবনিকার অন্তরালেই রাখিয়াছেন—মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা এড়াইয়া গিয়াছেন। নারীকে গায়েপড়া হইয়া পুরুষের প্রেমার্থিনী করিলে ঔপন্যাসিকের কিছু সুবিধা আছে; নারী-হৃদয়ে প্রণয়োদ্ভবের প্রাথমিক স্তরের দুরারোহ সোপানাবলী ভাঙিবার ক্লেশ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় না। বিশেষতঃ, বিপিনের মধ্যে প্রণয়কে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত কোন গুণের বা মানী ও শান্তির বিবাহিত জীবনে কোন অতৃপ্তির ইঙ্গিতও তিনি দেন নাই। মানীর ক্ষেত্রে না হয় বাল্যসাহচর্যের একটা মোহময় স্মৃতি ছিল—শান্তির ক্ষেত্রে সেরূপ কোন ক্ষীণ অজুহাতও নাই। কাজেই এই অনায়াস-অঙ্কুরিত প্রেমের প্রভাব যতই সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হউক না কেন, ইহার জন্মের আকস্মিকতা আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

লেখকের অভ্যস্ত সংকোচ একবার ভাঙিয়া যাওয়ায়, তিনি যেন একটু অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত উপন্যাসে এই নিষিদ্ধ প্রেমের নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম, বিপিনের বিধবা ভগ্নী বীণার সহিত প্রতিবেশী পটলের প্রণয়সঞ্চার; এই প্রণয় কয়েকটি প্রকাশ্য ও নিভৃত আলাপ-সংলাপের বেশী অগ্রসর হয় নাই। দ্বিতীয়, গ্রাম্য পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের এক বাগ্দী মেয়ের সঙ্গে সমাজ-ত্যাগ। এই প্রেমের সহিত আমাদের পরিচয় হয় মরণাপন্ন মেয়েটির রোগশয্যাপার্শ্বে তাহার প্রণয়ীর ব্যাকুল সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়া, ও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে তাহার মৃত্যুতে। কাজেই জীবনের সক্রিয়তার ভিতর দিয়া ইহার কোন যাচাই হয় নাই—ইহা মনের মধ্যে কেবল একটা করুণ স্মৃতির সজল রেখা রাখিয়া যায় মাত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্ত বিপিনের পিতা বিনোদ চাটুজ্যের প্রতি অধুনা-বৃদ্ধা কামিনী গোয়ালিনীর যৌবন-প্রণয়ের পূর্ব ইতিহাস—ইহা বিপিনের মনে একটু কোমলতার আভাস দিয়াছে এবং বিপিনের স্বগত চিন্তার বেনামীতে লেখকেরও কিছু সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। এই ঘটনাটি যেন উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে—ইহা যেন উপন্যাসটিকে প্রেমের উর্বর ক্ষেত্র পরিণত করিবার উপযোগী বারিসেচন। প্রকৃতিচিত্র এখানে অনেকটা সংক্ষিপ্ত; পল্লীজীবনের প্রতিবেশও, অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায়, নাতিস্ফুট। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে একটু নূতন প্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যু তাঁহার প্রতিভার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সমস্ত অনুমান ও কৌতূহলকে রুদ্ধ করিয়া পাঠকের মনে একটা আশাভঙ্গ-জনিত গভীর অতৃপ্তিরই সৃষ্টি করিয়াছে।

মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' (১৩৩০) বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্র-উৎস-সঞ্জাত রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের দৃষ্টান্ত। উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যেন ইহা রবীন্দ্রকাব্যেরই ঘটনা-শৃঙ্খল-গ্রথিত ও মনস্তত্ত্বসম্মত আখ্যানরূপ। এই রোমান্টিকতা যেমন বহিঃপ্রকৃতির বর্ণমায়াবর্ণনায় ও ভাবসংকেতদ্যোতনায় তেমনি প্রেমের বিচিত্র লীলাপদ্মের দল-উন্মোচনে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট মনোলোকের চির-চঞ্চল রহস্য ব্যঞ্জনায়। আখ্যানটিও এক বিষণ্ণ-করুণ জীবনবোধের সুরসঙ্গতিতে স্বপ্নময়।

রজত শিল্পী ও প্রেমরহস্তের চারিপাশে ঘুরিয়া-মরা স্বপ্নবিভোর তরুণ। রমলা ঝরণার ন্যায় চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল, খেয়ালখুশীতে পূর্ণ কিশোরী। মাধবী অপেক্ষাকৃত স্থির, গভীর, আত্মসমাহিত, জীবনসমস্যাপীড়িত তরুণী। যোগেশবাবু ও কাজি ব্যর্থ প্রেমের হতাশাভরা, পূর্বস্মৃতিরোমন্থনে বিহ্বল দুই ক্লান্ত জীবনপথযাত্রী। রজতের মামাবাবু এক উদারহৃদয়, আত্মভোলা, শিশুস্বভাব বৈজ্ঞানিক। আর যতীন যন্ত্রবেগঘূর্ণিত, ঝটিকামত্ত, কর্মরথের আরোহী। এই কয়েকজনের জীবনসূত্র, কাহারও বা দৃঢ়ভাবে, কাহারও বা আলগাভাবে উপন্যাস-কাহিনীতে গাঁথা পড়িয়াছে।

এক জ্যোৎস্নামত্ত রাত্রিতে প্রথম চারিজন মানুষ, যেন একইরূপ অজ্ঞাত প্রেরণায় আত্ম-সমীক্ষার নিগূঢ় লোকে অবতরণ করিয়াছে। রজত প্রথম প্রেমের স্পর্শে উন্মনা হইয়া নিজ জীবনের ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছে। বিজ্ঞান নিখিলের যে বিবর্তনধারার স্তরপরম্পরা উদ্ঘাটন করিয়া উহার কুৎসিত -হইতে সুন্দরের দিকে অভিযানের সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনা করিয়াছে, সেই ক্রমপরিস্ফুট শুভ পরিণতির সহিত সে নিজ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গতি খুঁজিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি মধ্যে প্রবাহিত আনন্দরসই তাহার শিল্পী মনকে স্পর্শ করিয়াছে। যোগেশবাবু ও কাজি আপন আপন অতীত-চিন্তায় মগ্ন, তবে জীবন-সায়াহ্নে তাহাদের যে এই চক্রাবর্তন হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই সে সম্বন্ধে তাহারা সচেতন। মাধবীর মনে তাহার পিতার সমস্যাও গুরুভার হইয়া চাপিয়াছে। কিন্তু রজতের প্রতি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ তাহার মনকে অনভ্যস্ত চঞ্চলতায় অস্থির করিয়াছে। রমলার হরিণীর মত চঞ্চল, সদ্যআনন্দ-আস্বাদনতৎপর স্বভাবটি রজতের বাঁশির সুরে কেমন যেন একটা ভাবমুগ্ধতার পাশে বন্দিনী হইয়াছে। এই জ্যোৎস্নারাত্রিই উপন্যাসের মুখ্য ও পাত্র পাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভূমিকা রচনা করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পর স্নিগ্ধ, শিশিরার্দ্র অন্ধকারে কোমল উষায় মাধবী হঠাৎ তাহার চিত্তের নিশ্চলতা হারাইয়া রজতের প্রভাতকিরণোজ্জ্বল সুঠাম রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও উভয়ে অরুণরাগরঞ্জিত প্রাতর্ভ্রমণের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি খানিকটা মনের রংও মিশাইয়াছে। এ আবেশ রজতের পক্ষে খুবই ক্ষণিক, মাধবীর ক্ষেত্রেও তাহার স্বাভাবিক কুণ্ঠাবশতঃ ইহা স্থায়ী হইল না। সেই দিনেরই পূর্ণিমা সন্ধ্যায় কিন্তু রজত ও রমলার মিলন সঙ্গীতের আবেদনে আরও আবেশময় ও উভয়ের ভাববিনিময়ের নিবিড়তায় আরও রহস্য-রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। লেখক তাঁহার শব্দের ইন্দ্রজালকুহকে, বর্ণনার কবিত্বময় অন্তরঙ্গতায় "সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত" এই জ্যোৎস্নাভিসারের পার্থক্য চমৎকার ফুটাইয়াছেন। এই আত্মার গভীরে বিদ্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি উভয়ের চিত্তকেই আবিষ্ট করিয়াছে। রজতের ভাবরোমন্থনে তাহার প্রেয়সী রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর ন্যায় বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের সহিত একাত্মরূপে প্রতিভাত হইয়াছে; এমন কি লেখকের ভাবকল্পনা ও শব্দচিত্রপ্রয়োগও একেবারে রবীন্দ্রকাব্যের হুবহু প্রতিধ্বনি। সমস্ত ঘটনাবিবৃতি যেন রবীন্দ্র-কবিকল্পনারই একটি বস্তুরূপায়ণ।

ইতিমধ্যে যতীনের আগমনে এই কল্পলোকের ভাবসুষমা রূঢ় আঘাত পাইল। সে

ব্যস্তবাগীশ লোক, সূক্ষ্ম অনুভূতির বিশেষ ধার ধারে না। তবু তাহার মনেও প্রেমের সুকুমার স্ফুরণ উন্মেষিত হইয়াছে। তবে তাহার লক্ষ্য রমলা কি মাধবী তাহা তাহার আচরণে ঠিক বোঝা যায় নাই। অন্ততঃ রজত রমলাই তাহার প্রেমপাত্রী এই ভুল ধারণায় একটা গভীর বিতৃষ্ণা অনুভব করিয়াছে ও হঠাৎ হাজারিবাগ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর যবনিকা উঠিয়াছে রজত-রমলার বিবাহের পর পুরীর নিকটস্থ নির্জন সমুদ্রবেলা-ধিষ্ঠিত গ্রামাঞ্চলে মধুচন্দ্রযাপনের স্বপ্নসুধামাখান প্রণয়রস আস্বাদনের অপরূপ কবিত্বময় বর্ণনার মধ্যে। লেখক রহস্যনিবিড় রাত্রিতে উভয়ের কোনারক-যাত্রার বর্ণনায় নিজ সমস্ত কাব্যানুভূতি ও বর্ণনার ঐশ্বর্য উজাড় করিয়া দিয়াছেন। হাজারিবাগ-যাত্রার সূর্যাস্তকালের রক্তরাঙা মেঘবিচ্ছুরিত আলোকের আমন্ত্রণে যাহা শুরু, এই সমুদ্র-বেলাভূমি-নীলাকাশের অনন্তভাব-দ্যোতনার ত্রিবেণীসঙ্গমে তাহারই পরম পরিণতি। এই পরিবেশে নবদম্পতির প্রেম যেন সমস্ত বস্তুতন্ত্রতা ও প্রয়োজনের বন্ধন হারাইয়া এক অপার্থিব স্বপ্নরোমাঞ্চে আত্মহারা হইয়াছে। নিখিলের নিগূঢ় আনন্দসত্তা যেন এই মানবিক অনুভূতির মধ্যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

অতঃপর কয়েকটি অধ্যায়ে লেখক এই প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি দেখাইয়াছেন। কলিকাতায় মামাবাবুর স্নেহময় অভিভাবকত্বে ইহার পেলব দলের উন্মোচন, বন্ধুপ্রীতির স্নিগ্ধ কৌতুকস্পর্শে ইহার রক্তিমাভার গাঢ়তা-সম্পাদন, ঋতুপরিবর্তনে ইহার বিচিত্রলীলায়িত প্রকাশ, প্রথম সন্তানের জন্মে ইহার আনন্দরহস্যের ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব চিন্তার প্রথম ছায়াপাত, সংসারের চাপে রজতের শিল্পস্বভাবের মুক্তির অবরোধ, রমলার কল্যাণীমূর্তির পূর্ণতর বিকাশ, মামাবাবুর মৃত্যুতে জীবনের রুদ্ররূপের প্রথম অভিজ্ঞতা, রজতের অসুখ ও সংসারের অভাবের নগ্ন বীভৎসতার সহিত পরিচয়, রজত ও রমলার সংসারক্লান্ত চিত্তে নিঃসঙ্গতা ও অবসাদের ঘনায়মান ছায়া, এই শূন্যতার রন্ধ্রপথে রজতের সঙ্গে মাধবীর ও যতীনের সঙ্গে রমলার, রজত-রমলার পূর্ব প্রেমাদর্শের ব্যঙ্গবিকৃতিরূপ এক অবাঞ্ছিত মেলা-মেশার ক্রমপ্রসার, উভয়ের মধ্যে স্বল্পব্যাপী গভীর বিচ্ছেদ ও অশ্রুসিক্ত, অনুতাপবিদ্ধ পুনর্মিলন, প্রথম প্রণয়ের মাদকতাময় স্মৃতির পুনরুদ্দীপক হাজারিবাগের পুরাতন পরিবেশে সহজ সম্পর্কের পুনরুদ্ধার ও সাত বৎসর পরে হাজারিবাগেই স্থায়িভাবে সংসার-প্রতিষ্ঠ রজতের বিশ্বশিল্পীর অফুরন্ত রূপসৃষ্টির সহিত নিজ শিল্পীজীবনের আনন্দময় রূপানুভব ও সৌন্দর্যনির্মিতির একাত্মতার দৃঢ় প্রত্যয়জাত আত্মনিবেদন—এই স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়া মানবিক প্রেম অনন্তের নানামুখী স্পর্শে গভীর ও ব্যাপ্ত হইতে হইতে ভগবৎপ্রেমের মহাসমুদ্রে নিজ ধারা নিঃশেষিত করিয়াছে। রূপ ও সৌন্দর্যপিপাসু চিত্ত সংসারলীলার বিচিত্র পথ বাহিয়া অরূপের মহাতীর্থে, অনন্ত সৌন্দর্যের মূল প্রস্রবণে পৌঁছিয়া এক অবিচল ঐক্যবোধে স্থির হইয়াছে।

ইহারই সমান্তরালে মাধবী-যতীনের বাধা-বিক্ষুব্ধ, অশান্ত আকর্ষণ নিজ ঝটিকাবিপর্যস্ত পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া সম্মুখের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। উহাদের প্রথম প্রেমের স্বল্পস্থায়ী মোহাবেশ বড় শীঘ্রই টুটিয়াছে। যতীনের কাজ-পাগল মন প্রণয়বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া যন্ত্রের প্রবলতর আকর্ষণে ধরা দিয়াছে। মাধবী তাহার প্রেমস্বপ্ন হইতে জাগিয়া রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছে ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে জীবনপথে মায়া-মরীচিকার অনুসরণ করিয়াছে। মনের

এই অস্থির উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে রজতের শিল্পী প্রকৃতির সুষমা ও রমলার স্নেহস্নিগ্ধনিবিড় আশ্রয়-নীড় তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কারখানার যে সর্বধ্বংসী বহ্নিলীলা যতীনের যান্ত্রিক স্বপ্নবিলাসকে ভস্মীভূত করিয়াছে ও তাহার চিত্তকে কর্মবন্ধনমুক্ত করিয়া তাহাকে অজ্ঞাতবাসে জীবনযাপনের প্রেরণা দিয়াছে তাহাই মাধবীকে তাহার অসার সুখমোহ হইতে জাগ্রত করিয়া তাহাকেও তাহার স্বামীর যাযাবর জীবনের সহযাত্রী করিয়াছে। ইহারই অনুসরণে এক নবীন জীবনোদ্দেশ্য তাহাদের মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে, যন্ত্রদাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা মানবসাধারণের কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য এই দ্বিতীয় দম্পতির জীবন রমলা-রজতের জীবনের মত গভীরভাবে পরিকল্পিত হয় নাই ; ইহা অনেকটা বিপরীতধর্মী ও পরিপূরক রূপেই কল্পিত হইয়াছে। উভয় জীবনতরীর যাত্রীচতুষ্টয় নানা ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া, অন্তরের ও বাহিরের নানা আবর্ত-সংঘাত উত্তীর্ণ হইয়া, নানা ভুল-ভ্রান্তির কুয়াসার মধ্যে পথ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরীক্ষিত জীবনবোধের নিরাপদ বন্দরে স্থির আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

'রমলা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসক্ষেত্রে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের সহিত ইহা সম-প্রকৃতির। ইহাতে কাব্যগুণের বিস্ময়কর আতিশয্য নাই, উদ্‌বৃত্ত সৌন্দর্যবোধের বিভ্রান্তকারী দীপ্তি নাই, আছে উহার স্থির কেন্দ্রনিষ্ঠ প্রয়োগ। সৌন্দর্যপ্রবাহ তটভূমিবন্ধনের মধ্যে দৃঢ়বিধৃত, বিশেষ কোথায়ও সীমা ছাড়াইয়া উদ্বেল হয় নাই। চিত্রপটের স্বল্পায়তন পরিধি সু-অঙ্কিত কয়েকটি চরিত্রের জীবনলীলা-বর্ণনায় সুবিন্যস্ত। লেখক শুধু সৌন্দর্যস্রোতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, কুশল মনস্তত্ত্বনির্দেশেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। হয়ত লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গতার তুলনায় বৈচিত্র্য কম ছিল। কারণ যাহাই হউক, প্রথম রচনার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি লেখক পরবর্তী জীবনে পূর্ণ করিতে পারেন নাই এই অনুযোগ তাঁহার কৃতিত্বকে কিছুটা ম্লান করিবে।

বিংশ অধ্যায়

রোমান্সধর্মী-উপন্যাস—দ্বিতীয় স্তর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রমথ বিশী, সুবোধ ঘোষ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশের দীর্ঘ-প্রসারিত, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একটি পার্বত্য বন্ধুরতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতার প্রাচীরবেষ্টনী আছে, তেমনি তাহার শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বন্যা-দুর্বার আবেগের গভীর রেখাঙ্কিত সীমান্তপ্রদেশ আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্যজাতির সহিত তুলনায় বাঙালীর রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রণ সুপ্ত আছে। মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও অতর্কিতভাবে তাহার রক্তে দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরেখা কোন কোন মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া উঠে। বাঙালী জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি এই ভূগর্ভলুপ্ত খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে, নূতন করিয়া উপলব্ধি করার একটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমান্তে, সুন্দরবনের আরণ্য সর্পিলতার শেষ ফণাশীর্ষে, সমুদ্রগর্ভ হইতে সদ্যো-জাগিয়া-ওঠা, কর্দমাক্ত-পিচ্ছিল, জল-স্থল-আকাশের দুর্দম আসঙ্গলিপ্সাপ্রসূত, অপরিণত ভ্রূণ পিণ্ডের ন্যায় অবয়বহীন চর ইসমাইলে। এখানে মানবজীবনের উপর প্রকৃতি-পরিবেশেরই একাধিপত্য—সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস মানবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্দম ঝটিকালীলার গতিবেগ মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চর ইসমাইলের অধিবাসীর মধ্যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের দুর্ধর্ষ জলদস্যু পোর্তুগিজের আধুনিক বংশধর, আরাকানী ও মগের বন্য, অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার রক্তবাহী কয়েকটি নর-নারী, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের দুঃসাহসিক, ভাগ্যান্বেষী, যাযাবর কয়েকটি পরিবার, ও সরকারী চাকরী ও নিয়মিত ব্যবসায়ের শৃঙ্খলবদ্ধ, পোষ-মানা কয়েকটি মধ্যবিত্ত বাঙালী সন্তান।

'উপনিবেশ'—তিন খণ্ড (১৯৪৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা এবং ইহাতেই তাঁহার নূতন জীবনদৃষ্টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসত্রয়ীতে তিনি বাঙালীর রক্তে আদিম বন্য প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার আবেগটি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম পর্বে ডি. সুজা, জোহান, লিসি, গঞ্জালেশ ও বর্মী চোরা-ব্যাবসাদার—প্রাচীন পোর্তুগিজ রক্তধারার ও জলদস্যুতার বাহক—তাহাদের ভালবাসা-বিরাগের উগ্র

উন্মাদনা, তাহাদের দুঃসাহসিক বাণিজ্যাভিযান ও নৃশংস জিঘাংসা লইয়া চর ইসমাইলের জীবনযাত্রায় একটি রক্তরঞ্জিত রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। ইহারা বাঙলাদেশে স্থায়িভাবে বাস করে বলিয়া কেবল ভৌগোলিক অর্থে বাঙালী। বাঙালী জীবনধারার সহিত তাহাদের জীবনধারা মেশে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে, আক্রমণ-আত্মরক্ষার আকস্মিক প্রেরণায়। চর ইসমাইলের সমুদ্র-তটভূমিতে তরঙ্গের অভিঘাত-চিহ্নিত ফেনিল রেখার ন্যায় এই বহিরাগত জীবন-উদ্বেলতা বাঙালীর শান্ত জীবন-দিগন্তে একটি রক্তরাঙ্গা সরু পাড়ের মতই প্রতীয়মান হয়। তারপর দ্বিতীয় উপাদান, মণিমোহন ও বলরাম ভিষগ্‌রত্নের জীবনসমস্যার জটিলতা-প্রসূত। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রতার প্রতীকদের অন্তরে লাগিয়াছে প্রতিবেশ উদ্ভূত ঝড়ের দোলা। মণিমোহন সরকারী খাজনা আদায় করিতে যে নির্জন দ্বীপের উপান্তে নৌকা ভিড়াইয়াছে, সেইখানে মগ রমণী মাফুন সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ার মত তাহার জীবনের উপর আপতিত হইয়াছে। তাহার ভদ্র, সংস্কারকুণ্ঠিত, বিধি-নিষেধের ও কর্তব্য-বোধের বেড়ায় সুরক্ষিত জীবন এই দারুণ অভিঘাতে আমূল কাঁপিয়া উঠিয়াছে ও এই দুর্বার আকর্ষণের মদির স্বাদ তাহার সমস্ত রুচিবোধকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রভাব তাহার জীবনে স্থায়ী হয় নাই—সমুদ্রোত্থিত ভেনাস তাহার চিরজীবনের সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত না হইয়া আবার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বলরামের স্ত্রীসম্পর্কবঞ্চিত জীবনে মুক্তা আসিয়াছে অনেকটা অযাচিত প্রসাদের মত, কিন্তু উহাদের সম্পর্কটি কোনদিনই সুস্থ, স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। বনের টিয়া পাখী খাঁচার মধ্যে পোষ মানে নাই, ডানা ঝাপটাইয়া ও ঠোঁট বাঁকাইয়া বরাবরই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। মুক্তা-চরিত্র উপন্যাসের সাংকেতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সুস্পষ্টতা লাভ করে নাই, তাহার অনুরাগ-বিরাগের রহস্যটি কোনদিনই উন্মোচিত হয় নাই। নূতন ভাসিয়া-ওঠা দ্বীপে নবসংগঠিত সমাজে যেমন বহু অতর্কিত আগন্তুক জীবনপ্রেরণার নানা স্রোতোবাহিত হইয়া আবির্ভূত হয়, কিন্তু উহার মধ্যে নিশ্চিন্ত-নির্ভর আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না, মুক্তাও সেইরূপ এই দ্বৈপায়ন জীবনযাত্রার সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে নাই। বলরামের মধ্যেও প্রেমিকের কোন লক্ষণই নাই—এই বনবিহঙ্গিনীর চিত্ত জয় করার মত কোন সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই। সে এই দুর্লভ, ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্যকে লইয়া বিব্রত-ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, ইহার অবৈধ আনন্দকে সে যথাসম্ভব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। চর ইসমাইলের বিদ্রোহ তাহার রক্তকণিকার ক্ষুদ্রতম অংশেও কোন চাঞ্চল্য জাগায় নাই, নব-সৃষ্টি অভাবনীয়তার মধ্যে সে পূর্ব সংস্কার ও প্রাচীন প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার পদক্ষেপ, তাহার কুণ্ঠিত, লজ্জাজড়িত আচরণ, নারীর অতর্কিত আবির্ভাবে তাহার অনিশ্চিত সংশয়চ্ছিন্ন মনোভাবই মুক্তার সহিত তাহার সম্বন্ধকে প্রেমের মহনীয়তা হইতে দূরে রাখিয়াছে। অবাঞ্ছিত সন্তানের আবির্ভাব-সম্ভাবনা উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু একটি অতি সাধারণ দুর্ঘটনা এই দ্বন্দ্বের একটা সুলভ সমাধান আনিয়া দিয়াছে। এই উভয়বিধ চরিত্রের মাঝখানে পোস্টমাস্টার হরিদাস পালের সংসার-বিমুখ দার্শনিকতা ও দেশপর্যটনের তীব্র কৌতূহল একটা নূতন প্রবণতার সন্ধান দিয়াছে। পোস্টমাস্টার চর ইসমাইলের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, কিন্তু উহার শিথিল

অসামাজিকতা ও নিঃসঙ্গ আত্মনিমগ্নতা উহার জীবনে সংক্রামিত হইয়া উহাকে বন্ধন ছিন্ন করার প্রেরণা যোগাইয়াছে। চরের জীবন হইতে সে অনির্দেশ্য ভ্রমণের আকুতি, লক্ষ্যহীন পাদচারণার মাদকতা আহরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডের ঘটনার অনুস্থতির মধ্যে কাল-পারম্পর্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই—জোহানের হত্যার পূর্ববর্তী কাহিনী হত্যার পর বিবৃত হইয়াছে ও গঞ্জালেশের সহিত ডি. সুজার প্রথম পরিচয়ের উপলক্ষ্য ও বর্মী-দ্বারা লিসির অপহরণ কালানুক্রমিকতার অনুসরণ করে নাই। সুতরাং দ্বিতীয় পর্বের মোটামুটি ৫০ পৃষ্ঠা প্রথম পর্বের ঘটনার আগেকার ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছে। এই ধারাবাহিকতার ছেদের জন্য ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতি যেন চক্রাবর্তনে পর্যবসিত হইয়াছে। বলরামের সঙ্গে মুক্তার সম্পর্ক-জটিলতার মধ্যে গর্ভজাত সন্তানের আবির্ভাব, ভীতি ও বিরাগের উগ্রতর উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছে। মণিমোহন-মাফুন-সমস্যাও মণিমোহনের অকস্মাৎ-প্রজ্বলিত কামনার স্পর্ধিত দুঃসাহস সত্ত্বেও, মাফুনের অপ্রমত্ত বাস্তববাদ ও যাযাবর জীবনের দুর্নিবার আকর্ষণের জন্য, ভদ্রগোছের সমাধান লাভ করিয়াছে। মণিমোহন-পতঙ্গ আগুনের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে, কিন্তু দগ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে নূতন আবিষ্কার ঘটিয়াছে নুরুল গাজীর—তিনি প্রথম ডি. সুজা বর্মী-কোম্পানির অবৈধ বাণিজ্যের অংশীদাররূপে উপন্যাসে প্রবেশলাভ করিয়া পরে মুক্তাকে বলরামের আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইয়া উপনিবেশের বর্বর সমাজে নিজ স্বাধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত নূতন চরিত্র-পরিণতি চর ইসমাইলের আদিমপ্রবৃত্তিমূলক প্রতিবেশের সহিত কি বিশেষ সূত্রে আবদ্ধ তাহা অনেকটা অস্পষ্ট থাকিয়াই যায়। • গঞ্জালেশের পোর্তুগিজ রক্ত ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-প্রভাব খুব অতিরঞ্জিত গাঢ় বর্ণে চিত্রিত হইলেও কার্যে ইহার পরিচয় যৎসামান্য মাত্র। মধ্যে মধ্যে সে দুঃসাহসিক প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার ব্যবসায়ী মনোভাব তাহার জলদস্যুর নৃশংস উত্তরাধিকারকে যে স্মৃতি-মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে তাহা তাহার আচরণেই সুস্পষ্ট। মুক্তার অবিশ্বাস্য আচরণের কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখক দিতে চেষ্টা করেন নাই—বেচারা বলরামের প্রতি যাহার এত তীব্র বিরাগ সে গাজী সাহেবের অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য এরূপ বিস্ময়কর তৎপরতা কেন দেখাইল লেখক সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। প্রতিবেশের প্রতি অতিমনোযোগই যেন লেখককে মানুষের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদাসীন করিয়াছে। বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন যে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার উচ্ছ্বাস বা কালবৈশাখীর প্রলয়ঝটিকার মত চর ইসমাইলের প্রতিবেশে মানবের হৃদয়াবেগেও অকারণে ও আকস্মিকভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, এবং এই বিস্ফোরণপ্রবণতায় মগ-রমণী মাফুন ও বাঙালী ঘরের শতসংস্কারজড়িত গৃহস্থকন্যা মুক্তার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। যিনি আকাশ হইতে বজ্রপাতের জন্য সদা উৎকর্ণ, তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের কার্য-কারণ-নিয়মিত অগ্নিলীলার অনুসরণের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহেন না।

তৃতীয় পর্বে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবর বর্বরতা এক লম্ফে আধুনিক যুগের উগ্র রাজনৈতিক চেতনায় ও সমাজজটিলতার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—দশবৎসরের ব্যবধানে জীবনযাত্রার ছন্দটি অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যুদ্ধকালীন বিপর্যয় ও দারুণ অর্থনৈতিক সংকট এই পরিবর্তনপ্রেরণাকে দ্রুততর করিয়া দিয়াছে—মাটির চরে প্রথম

শস্যের অঙ্কুরের মত আদিম সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন মনে নূতন বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়াছে। যাহারা ঢেউ-এর তরঙ্গে তরঙ্গে অনিশ্চিত জীবিকার বন্য পশুকে শিকার করিতে অভ্যস্ত, যাহাদের রক্তে দুঃসাহসিকতার জোয়ার ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে, তাহারা যখন প্রকৃতির দাক্ষিণ্য-পুষ্ট আত্মনির্ভর জীবনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, তখনও তাহাদের উগ্র উন্মাদনা একেবারে স্তিমিত হইয়া যায় নাই—একটা নূতন উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া আবার নূতন উদ্দাম ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাজন ও আড়তদারের চোরাবাজারি সঞ্চয় ক্ষুধিত কৃষকের সম্মুখে যে মৃত্যুবিভীষিকা প্রকট করিয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের প্রকৃতির আদিম দুর্দমতা অশান্ত ছন্দে দুলিয়া উঠিয়াছে। চর ইসমাইলের কৃষক-আন্দোলন ঠিক প্রগতিশীল সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ রাজনৈতিকচেতনাপ্রসূত নহে, ইহা যেন আদিম মানব-গোষ্ঠীর বাঁচিবার অন্ধ আবেগ, দুর্জয়, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনাকূতি হইতে উৎসারিত। যে জমির প্রথম পর্বে মজঃফর মিঞার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল সে তৃতীয় পর্বে একটা দুরন্ত গণবিক্ষোভের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বব্যাপী দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছে।

এই আধুনিক বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শাসন-প্রকরণের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, থানা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সুনির্দিষ্ট সমাজনিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও কার্যক্রম চর ইসমাইলের প্রথম প্রাণোন্মেষের আলগা মাটিতে শিকড় চালাইয়াছে। আমরা যেন এক নিঃশ্বাসে ভগবানের দশ অবতারের প্রথম কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিয়া, তাঁহার মৎস্য-কূর্ম-বরাহরূপের অপরিণত ভ্রূণ-সম্ভাবনাকে বহু দূরে ফেলিয়া, এক জরাজীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ, ক্রূর-কুটিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পরিচিত নামগুলির মধ্যে নূতন তাৎপর্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, ঘটনাবিন্যাসের পূর্ব-খোলসের মধ্যে নূতন শাঁসের আস্বাদ আমাদের রসনাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। উপনিবেশ—অস্থির, অস্ফুট, নানা অজ্ঞাত সম্ভাবনার পথে ধাবমান, আত্মপরীক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত ও স্বপ্নাবেশমদির জীবনের প্রতীক—যেন এক মুহূর্তে প্রস্তর-কঠিন, নিয়মশৃঙ্খলের অমোঘতায় বন্দী মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। ডি. সুজার আদর্শ বীর গঞ্জালেশ কিছুদিন লিলির অনুসন্ধানরূপ আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার পর যুদ্ধের বিপর্যয়ে আবার সে বাণিজ্য ছাড়িয়া আত্মরক্ষার তাগিদে চর ইসমাইলের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়াছে। তাহার চর ইসমাইলে আগমন হারানো প্রেমের স্মৃতিরোমন্থনের জন্য নয়, পলাতকের উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতা-প্রণোদিত। এখানে আসিয়া সে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা তাহার স্বজাতি ডি. সিলভার পীড়ার সুযোগ লইয়া তাহার সর্বস্ব-অপহরণের হেয় তস্করবৃত্তি। লেখক এই পূর্বগৌরবের কঙ্কালের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর বীরত্বের কাল্পনিক মুকুট পরাইয়াছেন, এই তথাকথিত 'বিদ্রোহী শিশু'কে পূর্বপুরুষের মত দিগ্বিজয়-যাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যে চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই কল্পনার কোন সমর্থন মিলে না। *গঞ্জালেশের মধ্যে অগ্নিশিখা নিঃশেষে নির্বাপিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, সে দুরন্ত শৈশব* ও শৌর্যদৃপ্ত যৌবন হইতে স্খলিত হইয়া দিশাহারা প্রৌঢ়ত্বের যাযাবর জীবন অবলম্বন করিয়াছে—ষোড়শ শতকের রণদুর্মদ পোর্তুগিজ জলদস্যুর প্রতিনিধিত্ব করিবার তাহার

বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নাই। শুঁটকি মাছের কারবারে যাহার যৌবন কাটিয়াছে তাহার প্রৌঢ় বয়সের অভিযান যে ছিঁচকে চুরির পর্যায়ে নামিয়াছে ইহা পুর্বাপর সঙ্গতই হইয়াছে।

বলরাম ভিষগ্‌রত্ন ও মণিমোহন এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে আরও সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে—উপনিবেশের দুরন্ত বেগবান জীবনধারা উহাদের চিত্তে যে ক্ষীণ রহস্যদীপ্তি জাগিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নিবিয়া গিয়াছে। মণিমোহনের এখন একমাত্র পরিচয় যে, সে হাকিম, তাহার পদোন্নতি তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্যকে গ্রাস করিয়াছে। রাণীর শান্ত, নিস্তরঙ্গ প্রেম উহার নিবিড়, স্নিগ্ধ-শীতল বেষ্টনে তাহার অনুভূতির উপর পুরু, নরম আস্তরণ বিছাইয়া তাহাকে নির্বিঘ্নে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য তাহার অতীত জীবনের রোমাঞ্চকর, বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা মাফুনের প্রহেলিকাময় মূর্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছে—সেই জ্বালাময়ী বিদ্যুৎরেখা হইতে সভয়ে সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া গিয়াছে। অস্বস্তিকর রোমান্সের চোখধাঁধানো দীপালি হইতে সে ধুসর মধ্যবিত্ততার পরিচয়-বিলোপী বাষ্পাবরণের তলে আত্মগোপন করিয়াছে। বলরামের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর—সে কেবল প্রেম-ব্যাপারে নয়, ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বিগর্হিত চোরা কারবারের সুড়ঙ্গপথের অনুসরণ করিয়াছে। তাহার চরিত্রের এই দিকটার উদ্‌ঘাটন সত্যই অপ্রত্যাশিত। কে অনুমান করিতে পারিত যে. এই প্রাণখোলা, আমোদপ্রিয়, বন্ধুবৎসল লোকটির অন্তরে দুইটি বিপরীতধর্মী, অবৈধ লালসা জটিলতার জাল বিকীর্ণ করিয়াছে। বিপ্লবের আগুনে তাহার গোপন সঞ্চয় ভস্মসাৎ হইয়াছে; আর দশ বৎসর পূর্বে তার হারানো প্রিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহমন লইয়া ঝটিকাবিধ্বস্ত পক্ষিণীর ন্যায় আবার তাহার আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বলরামের দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে এবার নিশ্চিত অধিকারবোধের দৃঢ় সুর ফুটিয়াছে। সে মুক্তাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য শহরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জীবনের ভীরু গোপনতার পালা শেষ হইয়াছে। ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার উপর এইরূপে যবনিকাপাত ঘটিয়াছে। যেমন ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ ঝটিকার বেগ, সমুদ্রতরঙ্গের উত্তালতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতার রহস্যাবগুণ্ঠন্ মুক্ত করিয়া মানবনিয়ন্ত্রণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তেমনি মানবচিত্তেও রক্তধারার দুর্বার উত্তেজনা অনিশ্চিত জীবনযাত্রার অসম দ্রুত পদক্ষেপ বিধিবদ্ধ সমাজব্যবস্থার ফলে এক অভ্রান্ত কক্ষপথের শান্ত নিয়মিত ছন্দের অনুবর্তন করিয়াছে। উপনিবেশের মদিরবিহ্বল, স্বপ্ন-উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে এক সুনিশ্চিত প্রৌঢ় বাস্তবতার শান্ত বিষন্ন স্বীকৃতি স্থিরদীপ্তির প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁহার অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। শব্দপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ সংকেতময়তা ও চিত্রধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগে, প্রতিবেশরচনায় কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্রই সুস্পষ্ট। তাঁহার শক্তিও যেমন সুপ্রকট, তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও তেমনি সুপ্রচুর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কেবল জোড়ালো ভাষা ও ব্যঞ্জনাপ্রধান বর্ণনায় কাব্যধর্মিত্বই যথেষ্ট নহে—উহাতে আরও প্রয়োজন জীবনদর্শনের গভীরতা, মানবপ্রকৃতির জটিল রহস্যের উন্মোচন। লেখক একটা বিশেষ উপপত্তিমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই এই উপন্যাস লিখিয়াছেন ইহাই মনে হয়। অতীত যুগের বংশপরম্পরাগত জীবনপ্রেরণা কিরূপ অলক্ষ্য অনিবার্যতায়

আধুনিক জীবনে সংক্রামিত হয় ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে প্রত্যেক নূতন-জাগা মৃত্তিকাস্তর, উপনিবেশের আদিম, অনার্য রূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্মৃত-প্রায় জীবনাকৃতিতে, সৃষ্টি-প্রারম্ভের কম্পমান পৃথিবী ও ঝটিকামত্ত জলরাশির সহিত মানুষের ছন্দ মিলাইবার প্রাণান্তিক সাধনাকে পুনরুজ্জীবিত করে। পায়ের তলায় কাঁপা মাটি, মাথার উপর ভাঙ্গিয়া-পড়া আকাশ, ও হিংস্র, গ্রাসলোলুপ, সর্পিল তরঙ্গের অবিশ্রাম আঘাত—এই প্রতিবেশে যে জীবনযাত্রা শুরু হয় তাহার মধ্যে অনিবার্যভাবে মানুষের আদিম সংস্কারগুলির আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এ যে জীবন-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে এই অতীতের প্রভাব বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়—ইহা যেন অতর্কিত আবির্ভাব, আধুনিক জীবনের সহিত কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। ডি-সুজা, জোহান, গঞ্জালেশ, বর্মী চোরা-ব্যবসায়ী, মাফুন—ইহারা সেই সদ্যোজাত, মূঢ় হিংসায় অন্ধ ও আত্মপরিচয়হীনতায় রহস্যগহন আদি মানবের প্রতি-রূপ রূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ইহারা নিজেরাই নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি, ইহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ, ইহাদের বন্য বর্বরতা আধুনিকতার যাঁতাকলে চূর্ণাস্থি। আধুনিকতার জীবন-কল্লোলে ইহারা ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া বিলীন হইতেছে। বাঙালী জীবনের প্রধান ধারায় ইহাদের অংশ নিতান্ত নগণ্য—ইহারা বাঙলা জননীর শ্যামাঞ্চলে দ্রুত-বিলীয়মান, বিবর্ণ-হইয়া-ওঠা একটি অলক্ষ্য রক্তবিন্দু। ইহাদের জীবনে আকস্মিক উৎক্ষেপের চিত্রসৌন্দর্য থাকিতে পারে, অস্থিমজ্জাগত মানস প্রভাবের তাৎপর্য-গভীরতা নাই। উহাদের সমস্ত শক্তির নৃশংস আস্ফালন, যুগ-প্রতিনিধিত্বের সমস্ত ছদ্ম-গৌরব লইয়া, উহারা ঝটিকাবেগে দিগন্ত-প্রক্ষিপ্ত ধূলার ঘূর্ণিপাক বা শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় বাঙলার জীবনযাত্রা হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আর যে কয়টি আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালী এই উপন্যাসের চরিত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাদের জীবনেও উপনিবেশের স্থায়ীচিহ্নাঙ্কিত কোন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে নাই। মণিমোহন বা বলরাম কেহই আদিম, অসংস্কৃত প্রাণোচ্ছ্বাসের খরস্রোতে নিজ জীবনতরণীকে ভাসাইয়া দেয় নাই, পরিচিত কূলের অতিসতর্ক আধুনিক জীবনের নিরাপদ আশ্রয় ও কৃত্রিম সুবিধাই খুঁজিয়াছে। পোস্টমাস্টার হরিদাসের নিরাসক্ত, ভ্রাম্যমাণ জীবন আধুনিক দার্শনিকতারই ফল, ইহাতে পৃথিবীর জন্মকালীন জরাতুরতার কোন ছোঁয়াচ নাই। উপনিবেশের কুমারী-গর্ভকোষে যে নবজাত বৈপ্লবিকতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে লেখক তাহার উদ্ভবরহস্য খুঁজিয়াছেন শিশু মানব-সমাজের আকস্মিক, অকারণ বিস্ফোরণপ্রবণতার মধ্যে—কিন্তু এই জন্মকোষ্ঠীর অকৃত্রিমতায় আমরা আস্থা স্থাপন করিবার মত উপাদান পাই না। এ যেন চকমকি ঠুকিয়া বিদ্যুৎশিখা জ্বালিবার ব্যর্থ প্রয়াস। ক্ষুধার হিংস্রতা সব কালেই আছে। কিন্তু জমির সেখের নেতৃত্বে বঞ্চিত কৃষক-সমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ আগ্নেয় দীপ্তিতে শিখা মেলিয়াছে তাহা নখরদন্তায়ুধ প্রাচীন সমাজের রক্তকলুষিত শ্বাপদবৃত্তি নহে, ইহার মূল আছে আধুনিক চেতনাপ্রসূত সাম্যবোধ ও অধিকারপ্রতিষ্ঠার ন্যায্যতার মধ্যে। এই উভয়বিধ সংগ্রাম যে একই প্রেরণা হইতে সঞ্জাত, উপনিবেশের কাঁচা মাটিতে যে বিপ্লবের বীজ সহজে অঙ্কুরিত ও দ্রুত বর্ধিত হয়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের সফলতার জন্য যে আবশ্যক হিংস্রতার সহায়তা অপরিহার্য—এই মতবাদ যে পরিমাণ কল্পনাবিলাসের ও ভাবোচ্ছলতার পরিচয় দেয়

ঠিক সেই পরিমাণে ইতিহাস-সংকেতের মর্মোদ্‌ঘাটনের পরিচয় দেয় না। 'উপনিবেশ' উহার বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশে মহনীয়, ইহার ব্যঞ্জনাশক্তিতে রমণীয়, লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতে প্রত্যাশা-চমকিত, কিন্তু ইহার দ্বৈপায়নতা কোন অখণ্ড মহাদেশের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারে নাই।

'উপনিবেশ'-এর আদিম প্রবৃত্তিশাসিত, প্রকৃতিপরিবেশের দোর্দণ্ড প্রতাপের দ্বারা অভিভূত জীবননেপথ্য অতিক্রম করিয়া লেখক বহুসংখ্যক দ্রুতরচিত উপন্যাসপরম্পরার মধ্য দিয়া আধুনিকতার জনাকীর্ণ জটিলতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (চৈত্র, ১৩৫১), 'মন্ত্রমুখর' (চৈত্র, ১৩৫২), 'মহানন্দা', 'স্বর্ণসীতা' (শ্রাবণ, ১৩৫৩), 'ট্রফি' (আষাঢ়, ১৩৫৬), 'লালমাটি' (চৈত্র, ১৩৫৮) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিয়াছে ও বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছে। এই সমস্ত রচনাতেই তাহার কয়েকটি বিশেষ মানসপ্রবণতা ও তাঁহার উচ্ছ্বাসময়, সংকেতদ্যোতনা-দীপ্ত বর্ণনাভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই তাঁহার ইতিহাস-চেতনা ও রাজনৈতিক বোধের প্রখর প্রাধান্য তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনদৃষ্টিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাসত্রয়ে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব, একদিকে উহার পৌরুষদৃপ্ত সংস্কৃতি ও জনশ্রুতির মধ্যে সংরক্ষিত ঐতিহ্যগৌরব, অপরদিকে উহার নদ-নদীর প্রবল-স্রোতধারা-চিহ্নিত, ঢেউখেলানো বিরাট লাল মাটির প্রান্তর—কাহিনীর বাহিরের পটভূমিকা অন্তরপ্রেরণার বিস্মৃতপ্রায় মূল উৎসরূপে আবির্ভূত হইযাছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদাপ্রবুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনা এই সুদূর, মহিমান্বিত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অথচ নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাবটি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে। যেখানে একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়গোষ্ঠীর মধ্যে অতীত যুগের সংস্কারটি এখনও সজীব, ও ইহার উচ্ছল প্রাণশক্তি কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি-নীতি ও আচরণের ভিতর পরিস্ফুট, সেখানে লেখকের এই পশ্চাৎ-অভিমুখী দৃষ্টি ইহাদের জীবনাসক্তি ও জীবনের মর্যাদাবোধের মূলসূত্রটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া মানব-প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। পক্ষান্তরে কোন কোন স্থানে ঐতিহ্যচিত্র উপন্যাসের কাহিনীর সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত না হইয়া কেবল কল্পনাবিলাস ও বর্ণনাবৈচিত্র্যের ভঙ্গীকুশলতা মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে—অতীতের মুখের অবগুণ্ঠন খসিয়াছে কিন্তু ইহাতে ভাষা ফোটে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'-তে রূপাপুরের কামার-গোষ্ঠী, 'লালমাটি'-তে আহীর-সম্প্রদায়, কালোশশী ও মুসলমান সমাজে অপাংক্তেয় জেলে পরিবার—ইহারা অতীতশাসিত জীবনযাত্রা ও সমাজের বৃহত্তর সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, গোষ্ঠীসংকীর্ণতামূলক মনোভাবের উদাহরণ। ইহাদের অন্তররহস্যে প্রবেশ কবিতে গেলে বিস্মৃত অতীতে জ্বালা প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাদের ক্ষেত্রে অতীত সত্যই জীবিত ও জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। দ্বিতীয় প্রবণতার দৃষ্টান্ত 'মহানন্দা' উপন্যাসটিতে উদাহৃত। মহানন্দার যে চমৎকার ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে তাহার সত্য সার্থকতা উপন্যাসে কোথাও পাই না। হিমালয়ের তুষার-গলা উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন মহানন্দার অধুনা-শীর্ণ, বালুকা বিস্তার লুপ্ত জলধারাকে

বাংলার আদর্শভ্রষ্ট, প্রাণপ্রবাহের সহিত সংযোগরহিত, আত্মকেন্দ্রিক জীবনধর্মের প্রতীক-রূপে কল্পনা করা আশ্চর্য সঙ্গতিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু উপন্যাস মধ্যে এই সংকেতের বিস্তার ও প্রয়োগ দেখা যায় না। কলিকাতায় কল-কারখানায় ধর্মঘট উত্তেজিত করা ও ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব করার মধ্যে মহানন্দার প্রভাবের ইঙ্গিতের কি অনিবার্য পরিণতি আছে তাহা দুর্বোধ্য। যাহারা শহরে গণসংযোগকে বাংলার জাতীয় উজ্জীবনের একমাত্র কার্যকরী কর্মপন্থারূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মনে মহানন্দার কূলপ্লাবী স্রোতোচ্ছ্বাস, ইহার তীরস্থ আমবাগানের নিবিড়, ছায়াঘন শান্তি, ইহার অধিবাসিবৃন্দের প্রাচীনপন্থী জীবনাকৃতি কি স্বপ্ন-মোহ জাগায়, কি প্রেরণার উদ্রেক করে, ভবিষ্যতের কোন্ ছবিকে কি বর্ণে আঁকিয়া তোলে তাহা অনুভব করা যায় না। মানসপ্রবণতার দিক দিয়া নীতীশ ও তাহার গণসংযোগপ্রয়াসী শহরবাসী সহকর্মীদের কোথায় পার্থক্য? যে মহানন্দা উত্তর-বঙ্গের প্রাণধারারূপে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা গৌড়ের অপরূপ সমৃদ্ধ সমাজ-সংস্থা, সাম্রাজ্য ও শিল্পকলার প্রেরণা যোগাইয়াছে, হিমালয়শিখরনিঃসৃত অজস্র সলিল-প্রবাহ যাহার কলেবরে তরঙ্গের উত্তাল, যোজনব্যাপী বিস্তার ও মনে বিশুদ্ধ ভাবাদর্শের উন্নত মহিমার সঞ্চার করিয়াছে, একটি রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ মতবাদের পল্বল-অবরোধে তাহার সমুদ্র-স্বপ্ন সমাধি লাভ করিয়াছে—ইহা অপেক্ষা ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিকৃতি ও উন্নত কল্পনার ধূলিশায়ী পরিণতি আর কি হইতে পারে? অনুরূপভাবে চৈতন্যদেবের সকল বাঁধ-ভাঙ্গা প্রেমধর্মের যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আমরা গ্রন্থারম্ভে পাই, উপন্যাসে তাহার সার্থকতা কোথায়? যতীশ ঘোষের বৈষ্ণবতার ভান ও মল্লিকার অর্ধচেতন আচারনিষ্ঠাকে নিশ্চয়ই চৈতন্যধর্মের যোগ্য বিকাশরূপে গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক উপন্যাসে অতীত ইতিহাসকে আবাহন করিতে হইলে ইহার মর্যাদারক্ষা ও প্রয়োগকৌশল উভয় দিকেই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

এইবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসাবলীর দ্বিতীয় উপাদান, রাজনৈতিক চেতনার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাসে রাজনীতিমূলক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের একটা সর্বব্যাপী প্রভাব দেখা যায়। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু-সমস্যা উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। মনে হয় যেন যুগের সমগ্র মানবিক আবেগ ও চরিত্রপরিচয় এই রাজনীতির খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যে রাজনৈতিক জীব (political animal) এই নূতন সংজ্ঞা অন্ততঃ বাংলা উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রাবলীর পক্ষে নিখুঁতভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে জাতির চিত্তে যে ক্ষণিক অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পায়িত আবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল, বাংলা উপন্যাস গত বার বৎসর ধরিয়া যেন তাহারই মুক্তি-নিষ্ক্রমণের পথ রচনা করিতেছে। এই সংগ্রামবিক্ষুব্ধ, মুক্তির নেশায় পাগল, এক-লক্ষ্যাভিমুখী মানব-প্রকৃতির যে আগ্নেয় বিস্ফোরণ, মতবাদের ঘূর্ণিতে আবর্তিত, উদ্‌ভ্রান্ত, যে জীবনরসবিমুখ কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উপন্যাসে তাহারই কল্পনাস্ফীত, মাত্রাতিসারী আবেগে অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ পাই। এই মুক্তিসংগ্রামের কতটা শাশ্বত সাহিত্যিক মূল্য আছে, পঞ্চাশ বৎসর পরে ইহার প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিতে

কোন সাড়া জাগাইবে কিনা, ও বিপ্লবের বাঁধা বুলি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয় কি পরিমাণে নিহিত আছে এই সমস্ত প্রশ্ন অনুচ্চারিত ও অমীমাংসিত থাকিয়াই যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চার অধ্যায়'-এ ব্যক্তিক স্বাধীন ভাবজীবন ও বিপ্লবীর বহিঃশক্তিনিরূপিত কক্ষপথের যান্ত্রিক অনুবর্তন—এই দুয়ের মধ্যে মর্মান্তিক পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই সতর্কবাণী যাহারা আধুনিককালে মানবজীবনের কারবারী তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা সন্দেহ। রাজনীতি-বায়ুগ্রস্ত লেখক আর একটা কথাও বিস্মৃত হন—উপন্যাসের হৃদয়সমস্যার সমাধান উপন্যাস-বর্ণিত মতবাদের পরিণতিতে হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতির প্রকৃতিই হইল যে, ইহা অনন্তপ্রবাহ, ইহা কোন মুহূর্তে স্থির হইয়া পরিসমাপ্তির ছেদ টানে না, অনন্ত কালচক্রে আবর্তিত হইয়া, অসংখ্য জনচিত্তের উৎক্ষেপে গতিবেগ আহরণ করিয়া, ইহা অনির্দেশ্য, অনায়ত্ত লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলে। ইহার বাস্তব রূপ অনির্ণেয় সম্ভাবনা ও ক্রমবিবর্তিত ভবিষ্যৎ সাধনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। সুতরাং উপন্যাসের নায়ক যখন এক বিশিষ্ট মতবাদের মধ্যে তাঁহার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজিয়া পান, তাঁহার অশান্ত চিত্তবৃত্তি ও অনিশ্চিত অনুসন্ধানের চরম নিবৃত্তিতে পৌঁছেন, তখন এই পরিণতি পাঠকের সমর্থন লাভ করিতে পারে না; নায়কের স্বস্তি পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় না। পারিবারিক জীবনে সমাধানের ছেদ টানা চলে, বিবাহ, বা মৃত্যু বা চিরবিরহ সমস্যার চরম পরিণতিরূপে, সন্তোষজনক কর্মজাল-সংহরণরূপে পাঠকের চিত্তে স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনীতিতে একটা বিশেষ মতবাদে যাত্রাসমাপ্তির মধ্যে এই ধারণা গড়িয়া উঠে না। লেখকের কাছে যাহা পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়ি, ভিন্নমতাবলম্বী পাঠকের নিকট তাহা অবিরাম জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত উদ্যত সংশয়। সুতরাং রাজনৈতিক উপন্যাসের পক্ষে আর্ট-অনুমোদিত সীমারেখায় থামিয়া যাওয়া দুরূহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সবগুলি উপন্যাসেই এই প্রবণতার উদাহরণ পাওয়া যায়। 'লালমাটি'-তে জমিদার ও প্রজার স্বার্থসংঘাত ও হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে একদিকে রঞ্জন, নগেন, উত্তমা, অন্য দিকে মুসলিম লীগের স্বপ্নবিভোর আদর্শবাদী মাস্টার আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনের মনে আবার মুসলমান জমিদারের উৎপীড়ন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেখাকে বিদীর্ণ করিয়াছে শোষিত-শোষকের আরও মর্মান্তিক শ্রেণীবিভাগ। উপন্যাসটি আগাগোড়া একটি সংঘাতময় উত্তেজনা ও আকাশবিহারী আদর্শবাদের পরিমণ্ডলে ভ্রমণশীল—শেষে রঞ্জনের দূরপ্রয়াণ ও বুলেটবিদ্ধ আলিমুদ্দিনের মহিমান্বিত তিরোধানে এই দেবলোকস্পর্ধী মর্ত্য সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে। লেখক তাঁহার সমাপ্তিসূচক মন্তব্যে এই উঁচু সুরের রেশ টানিয়াছেন, মাতৃভূমির প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি-নিবেদনে, অতীত মহিমার সহিত আত্মিক যোগসাধনের সচেতন সংকল্পে; তাঁর লেখনী যেন তরবারির দ্যুতিতে ঝলসিত হইয়া উঠে এই অভিপ্রায়-জ্ঞাপনে তিনি উপন্যাসটিকে গীতি-কবিতার মূর্ছনার সুরে শেষ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী সত্যই তরবারির তীক্ষ্ণ দ্যোতনাতে নিজ শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিঘূর্ণিত অসি-দীপ্তিতে মানবপ্রকৃতির

গহনশায়ী রহস্যের কতটুকু আলোকিত হয়? আমরা এই রোশনাই-জ্বালা, অতিরঞ্জিত আবেগের উচ্চভাষণমুখর সংগ্রামের মাদকতা হইতে সরিয়া আসিয়া একটি ক্ষুদ্র, নেপথ্যচারী পারিবারিক বিচ্ছেদলীলার শান্ত-করুণ গভীরতায় নিমগ্ন হইয়া যাই। লেখক যে বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক শক্তিতে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, তাহার প্রমাণ রণকোলাহল হইতে বহুদূরে সংঘটিত ক্রু সাহেবের পারিবারিক বিপর্যয়বর্ণনার অনাদৃত অধ্যায়গুলি। এইখানেই সর্ববিধ অভিভবমুক্ত, আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত জীবন সহজ, মর্মান্তিক সুরে কথা কহিয়া উঠিয়াছে।

'মহানন্দা'-য় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ আরম্ভের অপঘাত-মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নীতীশের পারিবারিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যুগপৎ আকস্মিক সমাধান আমাদের সম্ভাবনীয়তাবোধকে পীড়িত করে। একই মুহূর্তে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়াছে ও অলকার রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তাহার সমাজ-জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অলকাকে লইয়া আত্মছায়াঘন, মহানন্দার তীরবর্তী গ্রামখানিতে সে যে নূতন ঘর বাঁধিবে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে সংশয় থাকিয়া যায়। সেখান হইতে গণসংযোগের বেড়াজাল সমস্ত দেশকে কেমন করিয়া আচ্ছন্ন করিবে? মহানন্দাতে জোয়ারের রুদ্ধ মুখ কি একটি বিবাহিত পরিতৃপ্তির শান্তচ্ছন্দ নিঃশ্বাসেই খুলিয়া যাইবে? যে আনন্দ নিজের আয়ত্ত ও যে মুক্তি সহস্রের সম্মিলিত সাধনায় সম্ভব উভয়কে ঔপন্যাসিকের খুশীমত এক গাঁটছড়ায় বাঁধিয়া দিলেই কি তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য-সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে?

'মন্দ্রমুখর' ও 'স্বর্ণসীতা'—আগস্ট আন্দোলনের ও বিদেশী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুবশক্তির প্রতিরোধ-প্রয়াসের ভূমিকায় রচিত এক দুর্দান্ত, প্রভুত্বপ্রিয় জমিদারের উৎপীড়নের কাহিনী। 'মন্দ্রমুখর' আগাগোড়া রাজনীতিমূলক—ইহাতে সংসারচিত্র প্রায় নাই বলিলেই হয়। মহকুমা সহরের ভৌগোলিক পরিচয় ও ইহার সাধারণ জীবনযাত্রার কিছুটা বর্ণনা আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, দেশব্যাপী বহ্ন্যুৎসবের ক্ষুদ্র আধার ও স্বল্পায়তন পরিবেষ্টনী মাত্র। অগ্নিশিখায় মানুষগুলির মুখ উদ্ভাসিত ও এই মুখে কিছু কিছু ভাবান্তর—উৎসাহের দীপ্তি, অনিশ্চয়ের উদ্বেগ, বিরোধ ও বিরাগের পাথরের ন্যায় জমাট ভাব, নৈরাশ্যের ছায়া প্রভৃতি—খেলিয়া যাইতেছে। উহাদের আর কোন পরিচয় বা প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের নির্মম প্রয়োজনে সুকুমারভাবপ্রধান জীবন হইতে স্বেচ্ছানির্বাসনের প্রতীকরূপে প্রভাস একবার মাত্র উপন্যাসে আবির্ভূত হইয়া পরমুহূর্তেই ছায়াতে বিলীন হইয়াছে, রেখার অন্তর্গূঢ় বেদনা নিমেষমাত্র দীপ্ত হইয়া নীরবতার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু যেখানে আগুনের শিখা আকাশ ছুঁইয়া জ্বলিতেছে সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির ক্ষীণ বিদ্যুৎ-ঝলক চোখে পড়িবে কেন?

'স্বর্ণ সীতা'য় রাজনৈতিক ভূমিকা পারিবারিক অশান্তির পূর্বসূচনার তাৎপর্যবাহী হইয়াছে। অরুণ ও অনুপমার কৈশোরে মেলামেশার ফলে অনুপমার মনে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু অনুপমার দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তির সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব নাই। তাহার স্বামী সোমনাথ অস্থিরমতি, যথেচ্ছাচার ও আত্ম-অহমিকার চরম দৃষ্টান্ত। স্ত্রীর সহিত ব্যবহারেও তাহার কোমলতার লেশমাত্র নাই। এ হেন চরিত্র পূর্বরাগের দিনগুলিতে কেমন

করিয়া প্রণয়ীর অভিনয় করিয়াছিল ভাবিতে বিস্ময় লাগে। সোমনাথের চরিত্র অবিশ্বাস্য ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের (caricature) পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় রাজনীতির আসরে চড়া সুরে গান গাহিতে অভ্যস্ত লেখক পারিবারিক চিত্রাঙ্কনেও এই অতিরঞ্জনপ্রবণতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুপমার মধ্যেও জীবনীশক্তির বিশেষ পরিচয় পাই না—সে পাষাণ প্রতিমার মত নীরব সহিষ্ণুতার সহিত তাহার স্বামীর সমস্ত দুর্ব্যবহার ও অভব্যতাকে গ্রহণ করিয়াছে। অরুণের আশ্রয়-যাচ্ঞার মধ্যে তাহার নির্যাতিত প্রকৃতি মুহূর্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভাববিপর্যয় জাগাইয়াছে। তাহার অরুণের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বামীর নিকট আবেদন যেমন চরিত্রসঙ্গতিহীন, সোমনাথেরও ঘরে আগুন লাগাইয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও তেমনি অভাবনীয়। তাহার বন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি মারণাস্ত্রে দক্ষতা ও বীরত্বের আস্ফালন-পূর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব এইরূপ গোপন অস্ত্রাঘাতের হীনতা কেন স্বীকার করিল তাহা দুর্বোধ্য। তবে কি তাহার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র মনুষ্যেতর জীবের প্রতি অগ্নি উদ্‌গিরণ করিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল?

কম-বেশী রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত উপন্যাসের মধ্যে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী,' 'ট্রফি' ও 'কৃষ্ণপক্ষ' উল্লেখযোগ্য। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে অতীত ইতিহাস ও অঞ্চলের ভূসংস্থানবৈশিষ্ট্যের অভ্যস্ত বর্ণনা আছে। এখানে উপন্যাসের ঘটনার সহিত ইহাদের যোগসূত্র অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। ঘটনাবলীর নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি ও নাটকীয় সংঘাত পটভূমিকার সহায়তা-নিরপেক্ষ—আপন স্বতন্ত্র মর্যাদায় দণ্ডায়মান। কাহিনী-সংস্থাপনার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও ইহার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে একটি উত্তেজনাময়, অথচ সহজ পরিণতি আছে। তা ছাড়া উপন্যাসের সমাজচিত্রণে একটা সুসংবদ্ধ অঙ্গবিন্যাস ও সামগ্রিকতার ধারণা জন্মে। রূপাপুরের কামারগোষ্ঠীর জীবননীতির বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—আল্‌কাপের দলও এই সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে, দুই পরস্পর-বিরোধী নেতৃত্ব-প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্যরূপে উপন্যাসে স্থান পাইবার অধিকার অর্জন করিয়াছে। কুমার বিশ্বনাথের চরিত্রে পূর্বপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ আধিপত্যস্পৃহার খানিকটা প্রভাব থাকিলেও মোটের উপর তিনি আধুনিক জীবনের প্রতিবেশ হইতেই তাঁহার বেপরোয়া যথেচ্ছাচারের প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন। বণিকশক্তির প্রতীক লালাজীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বের পর্যায়সমূহ ও শেষ পরিণতি অনবদ্য শিল্পবোধ ও ভাবসংযমের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। লালাজীর বিনয়-নম্র আচরণের পিছনে শক্তিমত্তার দম্ভ ও আত্মশ্রেষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠার কৌশলময় দৃঢ় সংকল্প চমৎকার-ভাবে ফুটিয়াছে। তাঁহার পূর্বপুরুষের হীনতার লজ্জাকর স্মরণচিহ্ন কালো ঘোড়ার উপর তাঁহার অদ্ভুত বিরাগ ও ক্রোধ একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটনের নিদর্শন। অপর্ণার রাজনৈতিক অতীত জমিদার-পত্নীর নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে অবলুপ্ত হইলেও শেষ মুহূর্তে ইহার আকস্মিক পুনরুজ্জীবন উপন্যাসের সংঘাতের মধ্যে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। বণিকের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রতিপদে পরাজিত ও আধুনিক জীবনের সহিত খাপ খাওয়াইতে অক্ষম ধ্বংসোন্মুখ জমিদার একটা নূতন চাল চালিয়া নিজ প্রতিষ্ঠার ও সহজ নেতৃত্বের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছে। সে প্রজার প্রতিনিধিরূপে শ্রেষ্ঠীর সর্বগ্রাসী আধিপত্যকে

প্রতিরোধ করিবার অব্যর্থ উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। জমিদার-প্রজার সংঘাত ধনী-শ্রমিকের সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়া এক নূতন রণনীতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজনীতির ভূত ঘাড় হইতে নামিলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের হইতে পারে, 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' তাহার চমৎকার উদাহরণ।

'ট্রফি' আর একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস—ইহার মধ্যে অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাস থাকিলেও ইহা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। বিক্রমজিতের বহুধা-বিড়ম্বিত জীবনের, তাহার দৈবাহত প্রেমাকাঙ্ক্ষার কাহিনীটি যেন ঝড়ো হাওয়ার উত্তাল ছন্দে আমাদের অন্তরে দোলা দেয়। অবাঙালী বিক্রমের বাঙালীত্ব-লাভের সাধনা, তাহার কাব্যচর্চা ও প্রেমবুভুক্ষার মাধ্যমে বাঙালীর অন্তরলোকে প্রবেশের ব্যর্থ করুণ প্রয়াস এই জীবন-ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ক্রূর দৈব তাহাকে বার বার আঘাত হানিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহার পরাজয়ের মধ্যে পরিহাসের তিক্ততাও সঞ্চারিত করিয়াছে। সে বাঙালীত্বের সাধনায় বীতস্পৃহ হইয়া যখন পরুষ ভাবাবেগহীনতাকেই বরণ করিয়াছে, যখন বাঙালী মেয়ের প্রেমলাভে হতাশ হইয়া রাজপুতানার ক্ষাত্রবীর্যপ্রধান বিবাহে তাহার অন্তরজ্বালাকে প্রশমিত করিতে চাহিয়াছে, তখন ভাগ্যের বঙ্কিম কটাক্ষ তাহাকে নূতন লাঞ্ছনার গ্লানি অনুভব করাইয়াছে। সে যখন দৈহিক শক্তি ও রুক্ষ আচরণের দ্বারা প্রেমকুমারীর উপর নিজ দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সাধনায় রত, তখন প্রেমকুমারী এক বাঙালী যুবকের হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যাহাকে সে আজীবন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়রূপে খুঁজিয়াছে, তাহাই হঠাৎ শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। শেষে ভাগ্যের একটি নিদারুণ ব্যঙ্গ তাহার বিড়ম্বনার ইতিহাসকে চরম অসঙ্গতিপূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। তাহার প্রথম কৈশোরের প্রিয়া কলেজের সহপাঠিনী মণিকা সেন তাহার ঝটিকাতাড়িত জীবনের শেষ পোতাশ্রয়রূপে দেখা দিয়াছে। যাহাকে সে প্রথম যৌবনের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন ও স্ফটিক-শুভ্র, নির্মল তারুণ্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রেমারতি দিয়া আহ্বান করিয়াছিল, সে আসিল অপগতমোহ, আবিল প্রৌঢ়ত্বের জৈব প্রয়োজনে, জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত জুয়াড়ীর দৈবপ্রসাদ-লোলুপতার মর্যাদাহীন পুরস্কাররূপে। দীর্ঘকাল ব্যবধানে যখন প্রেমের পেলবস্পর্শ পুষ্পমাল্য নায়কের কণ্ঠলগ্ন হইল, তখন ইহা রূপান্তরিত হইয়াছে শ্বাসরোধী লৌহশৃঙ্খলে।

'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৫১) উপন্যাসটির ঘটনা-অংশ আজগুবি, অসম্ভব কাহিনীসমাবেশে লেখকের খেয়ালীপনার পূর্ণ নিদর্শন। বিবৃতির বঙ্কিমরেখাবিন্যাস যেন উদ্ভট কল্পনারচিত ব্যঙ্গচিত্র বলিয়াই মনে হয়। শিল্পী প্রতুলের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আকস্মিকের ঝড়ো হাওয়াতে ইহা যেভাবে নাগরদোলায় দুলিয়াছে তাহা কোন শিল্পীর বাস্তবজীবনে ঘটে না। লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনচিত্রণ নহে, শিল্পীর মানস জগৎ ও জীবনসমস্যার একটা আদর্শায়িত ও সঙ্কেতময় আলেখ্য-অঙ্কন। ঘটনার এই সম্ভাব্যাতিসারী রেখাজালে শিল্পস্রষ্টার আবেগময় প্রাণসত্তা, শিল্পপ্রেরণার মূলীভূত রহস্য গভীর অনুভূতি ও অদ্ভুত শক্তিমত্তার সহিত মূর্ত হইয়াছে, আকস্মিকতার শিথিল ফাঁকের ভিতর দিয়া আদর্শ স্বপ্নের বস্তুবিমুখ কল্পনাভিসার যেন ব্যাকুল পাখা মেলিয়া

নীল দিগন্তের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। প্রতুলের জীবনে এক একটি নিদারুণ আঘাত যেন তাহার শিল্পসাধনায় এক একটি স্তরের দ্যোতনা, পরিপূর্ণতার পথে এক একটি দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কটের বাধা। শিল্পী-জীবনের আবেগ-আকৃতি, উদার মানস সংস্থিতির এত অন্তরঙ্গ পরিচয় ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রূপায়ণ বাংলা উপন্যাসে বড় একটা দেখা যায় না। শিল্পপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন, চিত্রবিচারের মন্তব্য ও আলোচনার যাথার্থ্য ও গভীরতা, সৌন্দর্যানুভূতির নিবিড় ও অভ্রান্ত রসবোধ উপন্যাসটির পাতায় পাতায় উদাহৃত হইয়াছে। রচনাটি উপন্যাস-কাহিনীর ছদ্মবেশে শিল্পী মানসেরই অপরূপ রেখাচিত্র, উহার বাস্তব জগতের সহিত সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া বোঝাপড়ার রূপক-ইতিহাস।

উপন্যাসটি সম্পূর্ণ রূপকধর্মী না হইলেও উহার চরিত্রগুলির কোন মানবিকরসপূর্ণ ব্যক্তিজীবন নাই। প্রতুলের মাতা, উহার বন্ধু অপূর্ব, উহার জীবনের পথে যাহারা বন্ধু বা শত্রুরূপে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি উহার প্রেয়সী সুজাতা—সকলেই তাহার শিল্পী-প্রকৃতিকে উন্মেষিত করিবার উপায় মাত্র, তাহার মানস অভিজ্ঞতার বিচিত্র উপাদান-স্বরূপ। এই মানুষগুলি তাহার শিল্পীমনকে আনন্দে উদ্বেল বা বিরাগে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার চোখে আদর্শের স্নিগ্ধ দীপ্তি বা ভূতগ্রস্তের নিবিড় শঙ্কা ও ক্রূর জিঘাংসা জ্বালাইয়াছে, তাহার চিত্রতুলিকায় নানা রঙের খেলা ও রেখার টানে জীবনের সুস্থ গ্রহণ বা বিকৃত বর্জনের প্রেরণায় নিজ নিজ প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রতিবেশ যেন তাহার অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রকৃতির উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে—তাহার প্রথম জীবনের স্পর্ধিত আভিজাত্যমর্যাদা হইতে, আদর্শের সাড়ম্বর স্বাতন্ত্র্যঘোষণা, ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতি, গভীর শূন্যতাবোধ, ক্ষুরধার শ্লেষ ও তীব্র বিকৃতির স্তরের ভিতর দিয়া তাহাকে সহজ জীবনের স্বতঃউৎসারিত রূপলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেম এখানে আসিয়াছে শিল্পীজীবনের এই রক্তক্ষরানো শান্তির, এই কষ্টার্জিত জীবনসার্থকতার অভিনন্দন-অর্ঘ্য লইয়া, আর্টের মন্দিরে প্রজ্বলিত কল্যাণ-দীপের মূর্তিতে, রণজয়ী বীরের ললাটে বিধাতার স্বহস্তে আঁকা জয়তিলকরূপে। প্রেম এখানে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া যেন ছবির একটি উজ্জ্বলতম, কোমলতম বর্ণবিন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

'বিদূষক' (নভেম্বর, ১৯৫৯) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নূতন দিক-পরিবর্তন সূচনা করে। এই উপন্যাসে তিনি তাঁহার অভ্যস্ত বিষয়নির্বাচন ছাড়িয়া জীবনবোধের এক সূক্ষ্ম বিবর্তন ও পরিণতি দেখাইয়াছেন। এক কুরূপ, বিকৃতদেহ বালক তাহার দৈহিক যন্ত্রণা হইতে অদম্য হাস্যোচ্ছ্বাসের অদ্ভুত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করিত। নিঃস্নেহ পরিবারে মানুষ হওয়ার জন্য প্রহার ও নির্যাতনের উপলক্ষ্য তাহার জীবনে প্রায়ই ঘটিত। কিন্তু সে যেমন শত পীড়নেও কাঁদিত না, সেইরূপ অপরকে যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যেও সে কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত আচরণ দেখিত না। ইহারই ফলে তাহার বাল্যজীবন এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক বিকারে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার এই একটানা মনোবিকারের মধ্যে একমাত্র সুস্থ অভিজ্ঞতা ছিল তাহার সহপাঠী আনন্দের সুষমাময় পারিবারিক জীবন ও চিত্রাঙ্কনের রূপজগতের সহিত পরিচয়। এই স্মৃতিটুকু মাত্র সম্বল করিয়া সে এক উদ্ভট ও বীভৎস জীবনযাত্রার

অনুসরণ করিল। সে কলিকাতায় আসিয়া এক গুণ্ডা ও পকেটমারের দলে ভর্তি হইল ও এই কুৎসিত পরিবেশে তাহার কৈশোর অনুভূতি সমস্ত সুস্থ সৌন্দর্যবোধবর্জিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিকৃতভাবকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। এমনকি পতিতা নারীর সংসর্গও তাহার নিকট অরুচিকর হইল ও তাহাদের কৃত্রিম জীবনে সে নিজেরই উদ্ভট অসঙ্গতির প্রতিরূপ লক্ষ্য করিল। শুধু যন্ত্রণার উৎসনিঃসৃত, হাড়পাঁজর-ফাটানো হাসিই তাহার জীবনবৃন্তে একমাত্র কাঁটাফুলরূপে বিকশিত থাকিল—ইহাই তাহাকে অসীম শূন্যতাবোধ হইতে রক্ষা করিয়া জীবনের সহিত যোগসূত্র রচনা করিল।

তাহার এই হাসির অকারণ আতিশয্যই সার্কাস দলের ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এক নূতন জীবনবৃত্তে স্থান দিল। সার্কাসের বিদূষকরূপেই তাহার নূতন পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এইখানেই তাহার জীবনে কতকগুলি নূতন আবেগধারা প্রবেশ করিল। রামাইয়া ও বিঠুর হিংসা, রাধার দুর্বার কামনাপ্রসূত আকর্ষণ, বাঘের সঙ্গে লড়াই, সার্কাসের সেরা খেলোয়াড়নী ও ম্যানেজারের প্রণয়পাত্রী পদ্মার প্রতি এক অদ্ভুত মোহ, ম্যানেজারের হিংস্র ও অপমানকর শাসন—এ সবই তাহার আবাল্য-বিকৃত মনের খাঁজে খাঁজে গভীরতর বিপর্যয়রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। এই অধ্যায়গুলিতে তাহার মানস-প্রতিক্রিয়াসমূহ তাহার বাল্যজীবনের জীবনসংস্কারের পটভূমিকায় চমৎকার সঙ্গতির সহিত সন্নিবিষ্ট ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই প্রথম তাহার একপেশে, সৌন্দর্যের আলোবাতাসরুদ্ধ জীবনে প্রেমের আবেশময় অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার অতীত জীবনে সৌন্দর্যের একমাত্র প্রতীক আনন্দের সঙ্গে বর্তমান জীবনে তাহার প্রতি অনুরক্তা রাধা দুই আলোকরেখার ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে। উভয়েই তাহাকে পদ্মাপ্রেমের মরীচিকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে। অনায়ত্ত পদ্ম তুলিবার আশায় অতল জলে নিমজ্জন একটি চমৎকার রূপকব্যঞ্জনায় তাহার উদ্‌ভ্রান্ত, মুগ্ধ মনের পরিচয় দিয়াছে স্ত্রী-হন্তা হরেন দাসের পল্লীসঙ্গীতের মাধ্যমে তাহার করুণ পূর্বপ্রণয় রোমন্থনের ছোঁয়া নায়কের মনকে প্রেমসচেতন করিতে সহায়তা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাধার সহিত পলায়ন করিয়া শস্যশ্যামল অন্ধ্রপ্রদেশে শান্তিময় প্রেমনীড় বাঁধিবার কল্পনা তাহাকে ক্ষণিকের জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহার নিয়তিনির্দিষ্ট জীবন-প্রবণতা এই সুখস্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিয়া দ্রুতগামী ট্রেনের চাকার নীচে মাথা পাতিয়া দিয়াছে ও তাহার অলভ্য প্রণয়িনীর ট্র্যাপিজ দোলার দড়ি কাটিয়া দিয়া তাহারও মৃত্যুর আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। যাহার জীবন আগাগোড়া বিকৃত, লাঞ্ছনার কষাঘাতে জর্জর, ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত তাহার এই আত্মঘাতী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ উপসংহার, আপনার ও পরের সুখকে ধ্বংস করিবার আকস্মিক সংকল্প যথার্থই চরিত্রানুযায়ী হইয়াছে। সুখ যাহার প্রকৃতিবিরোধী সে সুখে খেলনাকে ভাঙ্গিয়াই তাহার দানবিক শক্তির প্রচণ্ডতা ঘোষণা করিয়াছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার ক্ষিপ্রতা তাঁহার উদ্ভাবন-কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন, কিন্তু এই দ্রুত-রচিত উপন্যাসপরম্পরার মধ্য দিয়া কোন সুনিশ্চিত অগ্রগতি, কোন পরিণত জীবনবোধের আশ্বাস এখনও লক্ষ্যগোচর হয় নাই। তাঁহার উপর তারাশঙ্করের প্রভাব

সুপরিস্ফুট। রাঢ়ের জীবনযাত্রাপরিবেশ ও অতীত-সাধনা নারায়ণের বারেন্দ্রভূমির অনুরূপ পরিচয়প্রদানপ্রয়াসের মূল উৎস—তারাশঙ্করের খামখেয়ালী জমিদারগোষ্ঠী ও উৎসাদিত-প্রায় সামন্ততন্ত্র তাঁহার পরবর্তী ঔপন্যাসিকের প্রেরণারূপে অনুভূত হয়। অবশ্য তারাশঙ্কর তাঁহার পরিণতির স্তরে এই সামন্ততন্ত্রবিলাস ও রাজনীতিমোহ অতিক্রম করিয়া শাশ্বত জীবনের উপরই তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। রাজনীতির ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের চোরাবালি ও জমিদারের বিলাসব্যসনগ্রস্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব-আস্ফালনের অর্ধবাস্তব অভিনয় হইতে তাঁহার জীবনপর্যালোচনার ক্ষেত্রকে সরাইয়া তিনি শাশ্বত মানবমহিমার উপর ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর মধ্যে অতীতের বিলীয়মান সংস্কৃতির জন্য বিষণ্ণ-করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাসে তিনি যে শ্রেণীর মানুষের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাঁরা অতীতের সতেজ পূর্ণ জীবন-শক্তিতে, প্রাণময় প্রতিবেশে পুষ্ট,—অতীতের আকাশ-বাতাসে তাহারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতসম্প্রদায়ের স্মৃতিরোমন্থনের রুগ্ন, অক্ষম ভাববিলাস তাহাদের সত্তায় বলিরেখাকুঞ্চন প্রসারিত করে নাই। নারায়ণের উপন্যাসে এই সামগ্রিক সমাজপ্রতিবেশে সহজ জীবনবোধের স্ফুরণ, সংস্কৃতির আনন্দরসে উপচীয়মান জীবনের সতেজ, বলিষ্ঠ প্রকাশ এখনও পরিপূর্ণ রূপ পায় নাই। জীবনের বহিরঙ্গমূলক পটভূমিকা রচনায় ও ইহার সাময়িক বিক্ষোভে আলোড়িত গতিবেগদ্যোতনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার বর্ণনায় বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে, তাঁহার ইতিহাসবোধ জীবন্ত ও জ্বলন্ত, তাঁহার আবেগপ্রকাশের ভাষা সাঙ্কেতিকতার রহস্যে ভাস্বর, তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা সূর্যকরদীপ্ত হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঊর্ধ্বলোকচারী। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতার পক্ষে এই সমস্ত গুণ বাহ্য, জীবনের নিগূঢ়রহস্যভেদী অনুভূতির সহিত সমবায়ে ইহারা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। নারায়ণের শক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মনে হয় যে, তিনি এই শক্তিপ্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র এখনও খুঁজিয়া পান নাই। তিনি এখনও তরুণ-বয়স্ক; জীবনের সহিত পরিপূর্ণ বোঝাপড়া হইতে হয়ত এখনও তাঁহার কিছু সময় লাগিবে। যে সমস্ত বিচিত্র পাত্রে তিনি জীবনের রস আস্বাদন করিয়া ফিরিতেছেন তাহাদের কারুকার্য চমকপ্রদ, ও জীবনমদিরার ফেনিল উচ্ছ্বাস তাহাদের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে উত্তপ্ত ও ঝাঁঝালো হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে কমণ্ডলু জীবনের স্নিগ্ধ অমৃতরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যাহাতে জীবনপিপাসার পরম তৃপ্তি সাধিত হইবে, তাহা এখনও তাঁহার শিল্পশালায় পরিকল্পিত ও অনুভূতির গভীরতায় উৎসারিত হয় নাই।

(২)

মনোজ বসু

মনোজ বসুর রচনার মধ্যে তাঁহার 'বন-মর্মর' ও 'নরবাঁধ' (১৯৩৩) এই দুই ছোটগল্পের সমষ্টি তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। অতিপ্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। 'বন-মর্মর'-এ আরণ্য-প্রকৃতির মর্মস্থলে যে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা গুপ্ত থাকে, তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বন-মর্মরই' তাঁহার সর্বপ্রধান গল্প। গঠন-

কৌশল, ব্যঞ্জনাসমাবেশ, সম্ভাবনীয়তার সীমার মধ্যে কল্পনাসংকোচ—এই সমস্ত গুণে ইহা অতিপ্রাকৃতজাতীয় গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

'নরবাঁধ' গল্পটির মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে যে দুইটি ভাগ আছে তাহার মধ্যে যোগসূত্র অপেক্ষাকৃত শিথিল। প্রথম গল্পে বল্লভ রায়ের বাঁধ দেওয়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, স্বপ্নে দেবীর নররক্ত-দাবী, বলি-সন্ধানে মৃত্যুঞ্জয়কে প্রেরণ, উত্তেজিত কল্পনার ভিতর দিয়া, দীর্ঘ, প্রতীক্ষা-দুঃসহ অন্ধকার রাত্রির প্রত্যেক মর্মরধ্বনির, হৃদয়স্পন্দনের সহিত নিবিড় যোগসাধন, বল্লভ ও মৃত্যুঞ্জয়ের অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় জোয়ারের জলে প্রাণবিসর্জন—এ সমস্তই অতিপ্রাকৃতের অপার্থিব শিহরণটি চমৎকার-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গল্পের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রসভ্যতার অভিযানে এই অতিপ্রাকৃতের বিলোপকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বিলে সাঁকো বাঁধা, প্রজাদের দারুণ দুর্দশা, প্রজা ও জমিদারের তুমুল সংঘর্ষ, ঘনশ্যাম নায়েবের ক্ষুরধার পাটোয়ারী বুদ্ধি, চাষী প্রজাদের নেশাখোর কলের মজুরে পরিবর্তন ও এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আত্মসম্মানলোপের শোকাবহ ইঙ্গিত—এই সমস্তই খুব জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এই বিরোধের কোলাহলে প্রেতলোকের রোমাঞ্চকর গুঞ্জন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। গল্পের শেষে অন্ধকারে ছায়াময় প্রেতমূর্তিবৎ প্রতীয়মান ভিখারীর দল অতিপ্রাকৃতের লুপ্তপ্রায় সুরটি ফিরাইয়া আনিয়াছে।

'মাথুর' গল্পটির রসও বহুধাবিভক্ত হওয়ার জন্য জমে নাই। ইহার কেন্দ্র হইতেছে ক্ষেত্রনাথ-জগদ্ধাত্রীর অধুনা বিকৃত ও বিশুষ্ক বাল্যপ্রণয়স্মৃতি। ক্ষেত্রনাথ একজন ঘোর কৃপণ বিষয়ী। বাল্যপ্রণয়ের মর্যাদা রক্ষা করার মত সরসতা তাহার আর নাই। তথাপি জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাবে তাহার পাকা বিষয়বুদ্ধির মধ্যে ফাটল ধরিয়া বহুকালসুপ্ত প্রণয়ের অঙ্কুর উঁকি মারিতেছে। শেষে মাথুর গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সে আপনাকে বৃন্দাবনপ্রত্যাবর্তনোন্মুখ নায়কের সহিত একাত্ম কল্পনা করিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর চরিত্রে স্নেহের সহিত তীক্ষ্ণ আঘাতপ্রবণতার সমন্বয় হয় নাই। গল্পের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণা ইহার ঐক্যকে বিধ্বস্ত ও রসকে ফিকে করিয়াছে।

মনোজবাবু পরবর্তী কালে অনেকগুলি জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বৃষ্টি, বৃষ্টি' (এপ্রিল, ১৯৫৭), 'আমার ফাঁসি হল' (জানুয়ারী, ১৯৫৯), 'রক্তের বদলে রক্ত' (১৯৫৯), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৫৯), 'রূপবতী' (১৯৬০), ও 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উল্লেখযোগ্য। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও রচনার দ্রুত পারম্পর্য উভয়েই প্রমাণ করে যে, মনোজবাবু উপন্যাসক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দগতি ও জীবন-পর্যবেক্ষণশক্তি অর্জন করিয়াছেন। 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত'—দুইটি উপন্যাসের বিষয় একইরূপ। মনে হয় যেন প্রথমটিই অপেক্ষাকৃত বেশী উপন্যাসিকগুণসমৃদ্ধ। 'বন কেটে বসত'-এ সুন্দরবনের অরণ্যপরিবেশে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা, মাছ-ভেড়ির অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যেন চরিত্রবোতন্ত্র্যকে অভিভূত করিয়াছে। যে নর-নারীর পরিচয় এই উপন্যাসে পাই তাহারা যেন প্রতিবেশ-প্রভাবে অনেকটা সঙ্কুচিত, বহিঃপ্রকৃতির তীব্রতর শক্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠাভূমি হইতে বিতাড়িত। কো— বিশুদ্ধ মানবিক রস জমাট বাঁধিবার পূর্বেই বাহিরের প্রবল অভিঘাত উহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বিষয়বস্তুর

কিছুটা অতিপল্লবিত বিস্তার মানব সত্তার বিকাশকে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত করে। গগনের জীবন কেবল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, তাহার স্বাধীন চরিত্র-স্ফূর্তির সেরূপ অবকাশ নাই। সে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় জীবিকার্জনের দুরন্ত চাহিদার নিকট অসহায়ভাবে ভাসিয়া গিয়াছে। বাদা অঞ্চলের সাধারণ জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র খুবই সরস, কিন্তু এই জল হইতে সদ্য-উত্থিত কর্দমভূমিতে চরিত্রানুশীলনের দৃঢ় আশ্রয় মিলে না। উপন্যাস মধ্যে দুইটি চরিত্র মাত্র আত্মমহিমায় অধিষ্ঠিত, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—চারুবালা ও জগন্নাথ। শেষ পর্যন্ত এই আত্মভিত্তিক দৃঢ়তার জন্যই উভয়ে একই প্রেরণায় পরস্পরের অতিসন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে। বাকীগুলি পরাশ্রয়ী, অবস্থার দাস, জীবিকার অধীন, জীবনের ক্রীড়নক। নগেনশশী, পচা, রাধেশ্যাম, অন্নদাসী, মহেশ, অনিরুদ্ধ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রগুলি বাদা অঞ্চলের বিরাট, বিশৃঙ্খল পটভূমিকায় আপন আপন ক্ষুদ্র অংশ অভিনয় করিয়া যাইতেছে—ঘটনাস্রোতে ছোট ছোট মানব-বুদ্‌বুদ্‌। সীমাহীন প্রান্তরে ক্ষণিক খদ্যোতদীপ্তির ন্যায় ইহারা একটু বৈচিত্র্য—সৃষ্টির সহায়ক মাত্র, কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু অস্তিত্বমর্যাদাহীন। আশ্চর্যের কথা যে, লেখক এই আঞ্চলিক জীবনযাত্রার, উহার নৌকা-বাওয়া, মাছ-ধরা, ভেড়ি-বাঁধা প্রভৃতি বৃত্তির, উহার অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসের, উহার ক্ষণিক আনন্দোচ্ছ্বাস ও বে-পরোয়া জীবন-নীতির একটি নিখুঁত, তথ্যসমৃদ্ধ, প্রাণরসোচ্ছল চিত্র আঁকিয়াছেন ও তাঁহার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাংলা উপন্যাসের একটি সম্পূর্ণ নূতন জগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

দশ বৎসর পূর্বে লেখা 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে কিন্তু মানব-জীবনকে উহার পরিবেশনির্ভরতা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূলবর্তী বনে-জঙ্গলে বনবিবির নৈতিক রাজত্ব অনেকটা নির্দিষ্ট আদর্শানুসারী, একেবারে অবিমিশ্র অরাজকতার পর্যায় হইতে কিছুটা উন্নততর। এখানে মানুষের হৃদয়লীলা, প্রতিবেশপ্রভাবিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির খামখেয়ালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানুষ এখানে যেমন নিজের ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে, প্রকৃতির বন্যশক্তিকে জয় করিতে কতক ব্যর্থ ও কতক সার্থক অভিযান চালাইয়াছে, তেমনি নিজ অন্তর-রহস্যের স্বাধীন বিকাশের উপযোগী কিছুটা পরিষ্কৃত অনুশীলন-ক্ষেত্র অরণ্যগ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। দুর্লভ, এলোকেশী, মধুসূদন রায়, কেতুচরণ, উমেশ, পদ্মমণি—ইহাদের স্বাধীন সত্তা প্রতিবেশের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। বিশেষ করিয়া মধুসূদন ও এলোকেশী আপন পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়াও অত্যন্ত সজীব ও মানবিক মর্যাদার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদন অরণ্যরাজের মানব-প্রতিযোগীরূপে প্রকাশিত—তাহার মধ্যে এক প্রকারের স্বভাব-মহিমা, দৃপ্ত মর্যাদাবোধ ও দুর্জ্ঞেয় অন্তঃপ্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত দুর্জয় সংকল্পের মর্মান্তিক পরিণতি, তাহার কল্প-সৌধের ভূমি-সমাধি তাহাকে ট্রাজিক চরিত্রের গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। এলোকেশী একটি অসাধারণ স্ত্রী-চরিত্র। সে কেতু-চরণকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সহায়তায় দুর্লভের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু দুর্লভের

ইতর চরিত্র ও অশালীন আচরণের মধ্যে তাহার প্রেমকামনা তৃপ্তি লাভ করে নাই। সে উচ্চতর অভিজাতসমাজে তাহার মোহজাল বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে তাহার সে স্বপ্ন টুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে কেতুচরণকেই আশ্রয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে। কিন্তু কেতুচরণের অপ্রত্যাশিত কূটবুদ্ধি ও মোহভঙ্গ তাহাকে আবার দুর্লভের আশ্রিতা হইতে বাধ্য করিয়াছে। এই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে একটা কাব্যোচিত ন্যায়বিচার আভাসিত হইয়াছে, বিবেকহীনা, স্বার্থবুদ্ধি-কলুষিতা স্বৈরিণীর যোগ্য দণ্ড মিলিয়াছে। এলোকেশীর চরিত্রে একটি সূক্ষ্ম জটিলতা, নারীহৃদয়ের একটি দুর্বোধ্য গতিরহস্য রূপলাভ করিয়াছে। কেতুচরণ যে শেষ পর্যন্ত এলোকেশীর মায়াজাল ছিন্ন করিয়া নির্মমভাবে তাহাকে দুর্লভের জুগুপ্সিত আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহাতে তাহার প্রাকৃতজনদুর্লভ একটি প্রতিশোধস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। উমেশের চরিত্র ও তাহাব শিশু-স্নেহ তাহাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। মোট কথা, উপন্যাসটিতে নৌকা বাহিয়া সমুদ্রোপকূলে মাছ-ধরার ও আরণ্য জীবনের নানা চিত্তাকর্ষক বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে প্রতিবেশ ও ঘটনার একাধিপত্য নাই—মানবহৃদয়ের লীলাই এই পটভূমিকার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

'বৃষ্টি, বৃষ্টি' উপন্যাস একটি হাস্যরসোচ্ছল পটভূমিকাব মধ্যে এক তীক্ষ্ণঝাঁজপূর্ণ প্রেমের কাহিনী বিন্যস্ত হইযাছে। বিশ্বেশ্বর বাঙলায় ইংরেজরাজ্যসূচনাকালের ঐতিহাসিক —তিনি পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া ইংরেজের চর-রূপে বন্ধু রামনিধি সরকারকে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্বক ধরাইয়া দেওযাব অপরাধে কলঙ্কিত কাশীশ্বর রায়ের কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর সেই রামনিধি সরকারের প্রপৌত্র ও কাশীশ্বরের প্রপৌত্র অম্বুজাক্ষ রায়ের গ্রামবাসী। অম্বুজাক্ষর ছেলে অরুণাক্ষ ও বিশ্বেশ্বরের মেয়ে ইরাবতী এক প্রবল বর্ষণের উপলক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইযাছে ও অরুণাক্ষ ইরাবতীর প্রেমে পড়িয়াছে। ইরাবতীর প্রখর আত্ম-সম্মানবোধ ও উগ্র মেজাজ সামান্য কারণেই অরুণাক্ষব সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া উহাদের মিলনের সম্ভাবনাকে বিপর্যস্ত করিযাছে। শেষ পর্যন্ত নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে উহাদের বিবাহ হইয়াছে ও আর এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে একই ডাক-বাংলায় রাত্রিযাপনকাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে ইরাবতীর সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন হইয়াছে। সুতরাং এই উপন্যাসে বৃষ্টিই ঘটনাসংস্থানের জটিলতা ও পরিণতি ঘটাইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দিক দিযা বিশ্বেশ্বর সজীব ও যুগপৎ হাস্যাস্পদ ও করুণরসসিক্ত হইয়াছে। ইরাবতীও তাহার রোষপ্রবণতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য জীবন্ত হইয়াছে ও বিবাহের পরে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে প্রথম আলাপের মধ্যেও তাহার এইরূপ মেজাজের জন্যই সে তাহাদের চিত্ত জয় করিয়াছে। অরুণাক্ষ ইরার প্রখর ব্যক্তিত্বের নিকট সর্বদাই কুণ্ঠিত ও আত্মসংকোচন-শীল বলিয়া কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু লেখকের আসল কৃতিত্ব চরিত্রসৃষ্টিতে নহে, পরিহাসরসসিক্ত ঘটনাবর্ণনায় ও প্রতিবেশরচনায়। রাজনৈতিক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর হাল-চাল ও আত্মপ্রচারকৌশল সুনিপুণ, সরস অতিরঞ্জনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। মোটের উপর উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ব্যঙ্গচিত্র ও বর্ণনা-কৌতুকে পরিপূর্ণ এবং ইহাই উহার প্রধান আকর্ষণ।

'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসটিতে সাধারণ জীবনের আবেষ্টনে একপ্রকার নূতন অতিপ্রাকৃত

অনুভূতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিরাটগড়ের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সদ্যো-অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত বিভীষিকার স্মৃতি, এবং সরকারী আফিসের নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রা ও কয়েকটি স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী-গঠিত গতানুগতিক সমাজ এই উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। ইহারই মধ্যে বিগত সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের বলি, অতৃপ্তযৌবনকামনা একটি তরুণী পরলোক হইতে ইহলোকে যাতায়াত করিয়া এক করুণ স্বপ্ন-মরীচিকা বয়ন করিয়া নায়কের মনে ধাঁধা লাগাইয়াছে। সে যখন-তখন নায়কের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহার প্রণয়লালসা উদ্রিক্ত করিয়াছে ও নিজ বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার মনে বিভ্রম জাগাইয়াছে। এই অশরীরী বায়ুমূর্তি কেবল প্রণয়ীর বাহুবন্ধনে ধরা দেয় না; কিন্তু এই অস্পৃশ্যতা ছাড়া তাহার আর কোন মানবিক বৃত্তির ব্যত্যয় হয় নাই। সে তাহার প্রণয়ীর সহিত কথা বলে; এমন কি তাহার নিজের করুণ ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্যও ব্যক্ত করে। আমরা তাহার নিকট হইতেই জানিতে পারি যে, কি নৃশংস ও কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্রজাল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। নায়ক এই রূপসী তরুণীকে দয়ালহরির কন্যা-ভ্রমে তাহার সহিত বিবাহে রাজি হইয়াছে ও ভুল ভাঙ্গিবার পর নিদারুণ মানস-প্রতিক্রিয়ার বশে তাহার শ্বশুরকে গুলি করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। এই উপন্যাসের আকাশ-বাতাসে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি মৃদু বিস্ময় ও রহস্যবোধ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যেন স্বপ্ন-জাগরণের মত একটি কুহেলিকার ব্যবধান। এই পরলোকরহস্যের উদ্বোধন ও যথাযথ বিন্যাসে লেখক প্রশংসনীয় সঙ্গতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ঘটনা, মন্তব্য ও অনুভবপ্রকাশের ভাবসঙ্গতি এই অবাস্তব কাহিনীকে পাঠকের নিকট প্রত্যয়যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে ও কলাসংহতির প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়াছে। প্রকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন বায়ুস্তর লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে বেশ স্বাভাবিকরূপেই মিশিয়া গিয়াছে।

'রক্তের বদলে রক্ত' উপন্যাস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। লাহোরের রক্তস্রোত কেমন করিয়া কলিকাতার রক্তস্রোতের সহিত মিশিয়া এক দুস্তর সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছে, উপন্যাসে দ্রুতসঞ্চারী ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে চরিত্র গৌণ, ঘটনারোমাঞ্চই মুখ্য। যাহারা নিষ্ঠুর হত্যার বলি, তাহাদের আর চরিত্র স্বাতন্ত্র্য-স্ফুরণের অবকাশ কোথায়? হিন্দু পক্ষে সুরেশ ও মুসলমান প্রতিনিধি লায়লা এই দুইজনই রক্তস্রোতের ঊর্ধ্বে একটি মিলনভূমি-রচনার প্রয়াস পাইয়াছে। এই দুইটি চরিত্রই যাহা কিছু জীবন্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে লায়লার হিন্দুবিদ্বেষজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব স্ফুটতর রূপ পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত নবনলিনীর স্নেহপক্ষপুটে আশ্রয় পাইয়া ও মুসলমানী নৃশংসতার ফলে সদ্যোবিধবা অমলাকে দেখিয়া সে হিন্দুবিদ্বেষ ভুলিয়াছে ও হিন্দুপরিবারের সঙ্গে একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

'রূপবতী' উপন্যাসটি দরিদ্র ঘরের একটি রূপসী মেয়ের বীভৎস আত্মবিনাশের কাহিনী। উহার রূপই উহার সর্বনাশের হেতু হইয়াছে। মাতুল-গৃহের অবহেলা-মিশ্র-অনুগ্রহপুষ্ট এই কিশোরী নিজের রূপের ছটায় মামাত বোনদের বিবাহের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক বড়লোকের ঘরের নপুংসক প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিবাহ তাহার দাম্পত্যজীবনকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতিষ্ঠাবান উকীল মুরারি জোর করিয়াই তাহার সতীত্বনাশের কারণ

হইয়াছে। তাহার পর সে শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়াছে ও নানা স্থানে ভদ্র আশ্রয় খুঁজিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কি সমস্ত নিরাশ্রয়া বিধবার আশ্রয় কাশীতেও তাহার স্থান হইল না। সর্বত্রই দেহবিক্রয় করিয়া তাহাকে স্বল্পতম গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার মামাতো বোনের অবৈধপ্রণয়জাত একটি ছেলের মাতৃত্ব স্বীকার করিয়া সে নিজ কলঙ্কের অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়াছে। দেশে ফিরিয়া তাহার উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়াছে —আবার ছেলের নিকট নিজ কলঙ্কিত ইতিহাস-গোপনের চেষ্টায় সে আরও বিব্রত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেকে তাহার নিজের মায়ের আশ্রয়ে পাঠাইয়া সে নিজ আত্মকেন্দ্রিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কদর্যরোগগ্রস্ত হইয়া সকলের অবহেলা ও ধিক্কারের মধ্যে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

রাধারাণীর এই একান্ত অসহায়তা যেন অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। তাহার সমস্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে তাহার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কোন পরিচয় মিলে না। মুরারির নিকট তাহার অসহায় আত্মসমর্পণ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য, কেননা, সংসারের কর্তার ও তাহার হিতৈষী অভিভাবকের এইরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণ তাহাকে স্তম্ভিত ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়াছে। তাহার স্বামীর ক্লীবত্বে তাহার নির্বিকার ভাব তাহার যৌন কামনার অভাবই সূচিত করে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী ছাড়ার পর সে যে অদৃষ্টের ক্রীড়নক হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়াছে ইহা অবিশ্বাস্য ঠেকে। সে যদি প্রকাশ্যভাবে রূপোপজীবিনীর বৃত্তি অবলম্বন করিত, তবে সে অনেকটা সম্রান্ততর ও সম্মানিত জীবন যাপন করিতে পারিত; এই পথ খোলা থাকিতেও দেহব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াও সে যে কেন সুখস্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবন যাপন করিল ও শেষে কুৎসিত রোগে প্রাণ হারাইল তাহা দুর্বোধ্য। দেহবিক্রয়ে তাহার বিশেষ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরুচি দেখা যায় না—সে দায়ে পড়িয়া হীনতার নিম্নতম স্তরে নামিয়াছে। কিন্তু সে যখন ধর্মপথ ছাড়িয়া অধর্মের পথে পা বাড়াইয়াছে তখন সমাজের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিবার শক্তি তাহার কেন হইল না তাহা বোঝা দুরূহ। যে গণিকা-জগতে রাজরাণী হইতে পারিত সে গার্হস্থ্য জীবনের আস্তাকুঁড় আঁকড়াইয়া থাকিয়া আপনাকে সর্বসাধারণের অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্রী করিয়াছে। তাহার অন্তররহস্যের এই অসঙ্গতি আমাদের বিশ্বাসবোধকে পীড়িত করে। পরিবার ও সমাজচিত্র অঙ্কনে লেখকের যথেষ্ট পটুতা আছে, কিন্তু তাঁহার রূপবতী নায়িকার মনস্তত্ত্ব অনেকটা সংশয়াচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে।

'মানুষ গড়ার কারিকর' উপন্যাসে লেখক একটা সম্পূর্ণ নূতন বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষকের জীবন লইয়া প্রবন্ধ লেখা ও সভা-সমিতিতে আলোচনা করা হয়, কিন্তু উপন্যাসের বিষয়রূপে ইহার উপযোগিতা এ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয় নাই। কেননা, শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা এরূপ উচ্ছ্বসিত মনোভাব পোষণ করি যে, ইহাদিগকে এক আদর্শ-যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। লেখক এই আদর্শ-যবনিকা সরাইয়া ইহাদের প্রকৃত বাস্তবরূপ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। আদর্শব্রতে দীক্ষিত শিক্ষক আজ পেটের দায়ে তাহার মহিমান্বিত আদর্শ ভুলিয়া যে কতটা হীন কৌশল, ঈর্ষ্যাদিগ্ধ প্রতি-যোগিতা ও উঞ্ছবৃত্তিতে নামিয়াছে উপন্যাসে তাহাই দেখান হইয়াছে। অবশ্য এই বাস্তব-চিত্রণে নীতিগত নিন্দা অপেক্ষা সরস কৌতুকই বড় হইয়া উঠিয়াছে। এক মহিম ছাড়া অন্য

কোন শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা হয় নাই। বিদ্যালয়ের পরিচালনাপদ্ধতি ও শিক্ষক-জীবনের নিয়মে বাঁধা সাধারণ ছকটিই কৌতুকরসসিক্ত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। মহিমের জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষকবৃত্তির স্বল্পকালীন সাফল্যগৌরব ও অনিবার্য করুণ ব্যর্থতার গ্লানি উদাহৃত। শিক্ষকের সাফল্যের মানদণ্ড বাড়ীতে ছেলে পড়ানোর সংখ্যাধিক্যে ও উপার্জনের আপেক্ষিক প্রাচুর্যে। অতীত যুগের শিক্ষকের সঙ্গে আধুনিক বণিকবৃত্তি-অনুসারী শিক্ষকের পার্থক্য এইখানেই—যাঁহারা জীবনশিল্পী ছিলেন তাঁহারা আজ কল-কারখানার কারিগরে রূপান্তরিত হইয়াছেন। হাতের দক্ষতা হারাইলে কারিগরের যেমন চাকরি যায়, পাশ করাইবার কৌশল নষ্ট হইলে শিক্ষকের সেইরূপ মূল্য কমে। মহিমের জীবনে এই শোচনীয় তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটি পড়িয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে অনুসৃত সংকীর্ণ নীতি ও শিক্ষকজীবনের ক্ষুদ্রতা ও মহৎ প্রেরণার অভাবই খুব বেশী করিয়া চোখে পড়ে ও মনকে নৈরাশ্যে অবসন্ন করে। ঔপন্যাসিক শিক্ষকজীবনের সরস ছবি আঁকিয়া, শিক্ষকদের ছোট-খাট খোসগল্প, কুৎসা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও পরস্পরের জীবনের পিছনে উঁকিমারার প্রবৃত্তি, হাসিমস্করা, দুর্নীতির পোষকতা প্রভৃতি মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতি হাস্যকরভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি নীতিসংস্কারকের গুরুগম্ভীর সমালোচনা দিয়া নহে, পরন্তু হাস্যরসপূর্ণ লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই, এবং সম্পূর্ণ উপন্যাস-অনুমোদিত উপায়েই এই গুরু সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

'নিশিকুটুম্ব' (১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩)—চৌর্যবৃত্তির প্রাচীন বাস্তবসম্মত ও ভাবাদর্শ-মূলক কাহিনী। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে চৌর্যক্রিয়াও যে একটা বিধিনিষেধসমন্বিত নীতিনির্দেশ, দেহমনের সাধনপ্রস্তুতি ও শিল্পোৎকর্ষ ছিল এই উপন্যাসে তাহারই একটি রোমান্স-রমণীয় চিত্র আঁকার প্রয়াস দেখা যায়। উপন্যাসবর্ণিত চোরের দলের সহিত কর্মজীবনে সাধু, প্রলোভনজয়ী পুলিশ কর্মচারী ও নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া এই দলের লোকেদের মধ্যে গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি, পরস্পরের সহিত সহৃদয় বিশ্বাসরক্ষা ও যথাসাধ্য আচার-বিধি পালনের প্রয়াস প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। বিশেষতঃ দলের যে মধ্যমণি—সাহেব—তাহার চরিত্রে দুঃস্থের প্রতি দয়া, ন্যায়নীতির প্রতি ঝোঁক, সৎগৃহস্থের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মানুরাগ মাঝে মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সে যেন তস্কর-জগতের হ্যামলেট—দার্শনিক চিন্তার আধিক্যে তাহার হাত হইতে সিঁদকাঠি স্খলিত হইয়া পড়ে ও অপহৃত ধন আবার গৃহস্থের ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়। তাহার এই ভাবাতিশয্য কতকটা তাহার প্রকৃতিগত, কতকটা পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এই সাহেবের জন্মরহস্য ও বাল্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লেখক কালিঘাট-বস্তির পতিতা-জীবনের এক সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সুধামুখীর গণিকাবৃত্তি-অবলম্বনের মধ্যে বিশেষ ভাবালুতার সিক্ত স্পর্শ নাই—সে চোখ খুলিয়া ও সাহসিকতার সঙ্গেই এই পাপপিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ গঙ্গার ঘাট হইতে সাহেবকে কুড়াইয়া পাইয়া তাহার মধ্যে অবরুদ্ধ মাতৃত্বের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে ও তাহার জীবন স্নেহের প্রেরণা ও জীবিকার অপরিহার্য প্রয়োজন এই দুই বিরুদ্ধশক্তির দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। তাহার দেহবিক্রয়ের

কলহও বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া কালিমার গাঢ়তা হারাইয়াছে। তাহার যে সমস্ত ধনী ও খেয়ালী স্নেহলোভী অতিথি আসিয়াছে তাহারাও তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বাল-গোপালের সেবার অর্ঘ্য যোগাইয়াছে। বিষের প্রস্রবণ হইতে মাতৃস্নেহের অমৃতরস উপচিত হইয়াছে। নফর কেষ্টর সহিত তাহার আটপৌরে, ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালিতে ইতর, অথচ সত্যিকার ভালবাসায় মধুর সম্পর্ক সাহেবকে একটা পিতৃত্ববোধের আশ্রয় দিয়া তাহার জীবনে কিছুটা স্থিরতা আনিতে সহায়তা করে। আবার এই নফরই চৌর্যবিদ্যায় সাহেবের হাতে খড়ি দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ামক হইয়াছে। পারুল ও রাণীর সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা তাহার জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, তবে রাণীর কৈশোর অভিলাষ-পূরণ তাহাকে চৌর্যবিদ্যার অনুশীলন ও দৈবশক্তির প্রতি একপ্রকার অর্ধ-আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তাহার পালিকা মাতা সুধামুখীর শোচনীয় মৃত্যু তাহার মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই, তবে তাহার অবচেতন মনে নারীর কল্যাণী মূর্তি অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। মোট কথা, কলিকাতার বস্তিজীবন সাহেবের মনে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। সে পরিত্যক্ত সন্তানরূপে গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে কলিকাতার ঘাটে সংলগ্ন হইয়াছিল, আবার ঘটনাস্রোত তাহাকে কলিকাতার মাটি হইতে উন্মূলিত করিয়া নদী-নালা-খালের দেশে, নৌকাবাহিত যাযাবর জীবনধারার চিরচঞ্চল প্রবাহে, ছন্নছাড়া, অ-সামাজিক প্রাণোচ্ছলতার অভিযাত্রায় খড়কুটার ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই নদীমাতৃক, খাল-বিলের অন্তর্বর্তী, দূর-বিক্ষিপ্ত পল্লীঅঞ্চলের সঙ্গেই তাহার সত্যিকার নাড়ীর যোগ।

দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপন্যাসে চোরের ইতিহাসকে যেন একটা ছলনালীলা বলিয়াই মনে হয়। ইহারই অজুহাতে আমরা অসংখ্য, বিচিত্র নর-নারীর জীবনমেলায় কৌতূহলী দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাই। চোরের পথ অনুসরণ করিয়া আমরা কত গ্রামে প্রবেশ করি, কত গৃহস্থের অন্তঃপুরের পরিচয় পাই, কত হৃদয়-রহস্যের ইঙ্গিতে উন্মনা হই। নববিবাহিতা অলঙ্কারগরবিণী আশালতার বাপের বাড়ীর খবর, তাহার মায়ের স্নেহময় আতিথেয়তা, তাহার দাদা মধুসূদনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম, চোরের দীক্ষাগুরু পচা বাইটার প্রতিষ্ঠাবান পুত্রদের সংসার, পচার নিঃসঙ্গতা ও সাধু পুত্রদের প্রতি অভিমান-অনুযোগ, কড়া সংসারী নায়েব মুরারি, ধর্মনিষ্ঠ স্কুলপণ্ডিত মুকুন্দ, মুকুন্দ ও সুভদ্রার অভিমানবিদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্ক, চৌর্যবিদ্যাশিক্ষার জন্য সাহেবের পচার শিষ্যত্বস্বীকার ও অনলস সেবা, সুভদ্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্কের অনির্দেশ্য মাধুর্য—এই সমস্তের মধ্য দিয়া গার্হস্থ্য জীবনের উজ্জ্বল চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। বিশেষতঃ পচাকে একটা সিদ্ধপুরুষ বানাইবার চেষ্টা ও তাহার গৃহের প্রতি একটা সিদ্ধপীঠের মহিমা আরোপ যেন একটা নবদেবমূর্তিপ্রতিষ্ঠার ভক্তিরসাপ্লুত দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। তাহার উপর কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ী, কনিষ্ঠ সহোদর হাকিমের পেশকার অনন্ত, তাহার নিষ্ঠাবতী, গোপনপ্রেমলীলাবিহারিণী বিধবা ভগ্নী নমিতা ও সাহেবের চুরি করিতে গিয়া এই ব্যভিচার নিবারণচেষ্টায় আসল উদ্দেশ্য বিস্মরণ—সবই যেন একটা কৌতুকোজ্জ্বল কমেডির পাতার মত আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই সরস সমাজচিত্রগুলি এই চোরকাহিনীর উপরি পাওনা।

কিন্তু এই চোরকাহিনীর চোরগুলি কে? এই তথাকথিত চোরদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় চৌর্যবৃত্তি তাহাদের অভিনয়মাত্র, একটা চোর-চোর খেলা। তাহারা চুরির লাভ অপেক্ষা উহার রোমান্সের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। নৌকায়-নৌকায় নানা নদী-নালায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ, মুক্ত জীবনোল্লাসের উপভোগ, নানা বিচিত্র জীবনযাত্রার সহিত পরিচয়, চুরির শিল্পচাতুর্যের অনুশীলন, সহচরদের সহিত প্রীতিকৌতুকবিনিময়—এগুলিই যেন তাহাদের মুখ্য আকর্ষণ বলিয়া মনে হয়। সব মানুষের মনেই যে অতৃপ্ত কামনার স্বপ্নলোক বর্তমান, চৌর্যবৃত্তি যেন তাহারই রুদ্ধদ্বার খুলিবার চাবিস্বরূপ। সবাই অন্তরে অন্তরে রূপ-কথার যে কল্পনা পোষণ করে সেই মায়ালোকে পৌঁছিবার ইহাই যেন অরণ্যবীথি। বলাধিকারী মহাশয় দারোগা-জীবনে যে কর্তৃত্বপ্রয়োগে ও ন্যায়নীতিপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন, চোরের দলপতিরূপে সেই কল্যাণময় অভিভাবকত্বের বাসনাই তৃপ্ত করিয়াছেন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য তাঁহার পুরাণপাঠে ও জ্যোতিষশাস্ত্রচর্চায় যে অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন চোরের দলের খোঁজদার রূপে সেই রহস্যময় সূত্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন—চোরমহিমা-কীর্তনে ও চৌর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্তবে সেই মহামায়ারই একটা প্রকাশ দেখিয়াছেন। বংশী চুরি করে, কিন্তু উদাস, আত্মবিস্মৃতভাবে। আর সাহেব ত চুরির মধ্যে একটা স্বপ্নসঞ্চরণের আচ্ছন্ন মনোভাবই বহিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই চোখে একটা ভাবাবেশের ঘোর, বঞ্চিত জীবনের এক করুণ দিবাস্বপ্ন। এই স্বপ্নাচ্ছন্নতাই প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই সাধারণ লক্ষণ। সুধামুখী ও পারুলের চিরন্তন আকৃতি গণিকাজীবনের কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া ভদ্র পদবীতে উন্নয়ন। এই অনায়ত্ত আদর্শের সমস্ত করুণরস তাহাদের অপরাধী জীবনে সঞ্চিত হইয়াছে। সাহেবও বার্ধক্যে এক বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া সেখানে অভিভাবকহীন এক খোকা-খুকির শিশু-কল্পনার মধ্যে জড়িত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য ভুলিয়াছে। সে যেন রূপকথার রাজ্যে এক ভগবৎপ্রেরিত দেবদূত হইয়া কাল্পনিকভয়ত্রস্ত শিশুচিত্তে সাহস ও নিশ্চিন্ততা আনিয়াছে। লেখক সমস্ত মন্দের মধ্যে ভাল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মানুষের মন্দ রূপ একটা কৃত্রিম ছদ্মবেশ মাত্র; উহার অন্তরালে ভাল আত্মপ্রকাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। চোরের জীবনে, বেশ্যার জীবনে, নিঃস্নেহ কঠোরহৃদয় নর-নারীর জীবনে লেখক এই রূপকথা-সুলভ সত্যের সমর্থন পাইয়াছেন এবং চোরকাহিনী একটি পরমশুভান্ত, সব-হারান সুখ কল্পনার পরম প্রাপ্তিতে দিব্য আভায় দীপ্যমান রূপকথার সুরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

মনোজ বসুর উপন্যাস-রচনা এখনও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বরঞ্চ এই সাম্প্রতিক কালেই তাঁহার উপন্যাসের সংখ্যা ও বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নিদর্শন দিয়াছে। কোন কোন উপন্যাসে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বও অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশের সময় এখনও আসে নাই, তবে তিনি যে বাংলা উপন্যাসের পরিধি-বিস্তার, নূতন নূতন বিষয়ের প্রবর্তনের দ্বারা উহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার কার্যে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিতেছেন তাহা সর্বথা স্বীকার্য।

(৩)

প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথ বিশীর রচনায় প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের অনেক উপাদান বর্তমান।

অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও রহস্যবোধ, তাহার বাহিরের রূপ ও অন্তরের আবেদনের সুকুমার, কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি, ভাষার ঐন্দ্রজালিক সম্পদ, অর্থগৌরবপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত রেখাবিন্যাসে বৃহৎ পটভূমিকার মর্মোদ্ঘাটন, স্থানে স্থানে মন্তব্যের গভীরতা ও চিত্ত-বিশ্লেষণকুশলতা—এই সমস্ত গুণই উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি। কিন্তু তাঁহার রচিত তিনখানি উপন্যাসে 'পদ্মা' (১৯৫৩), 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৮), ও 'কোপবতী' (১৯৪১), এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় নাই। লেখকের সমস্ত মানস ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থলে ব্যর্থতার গূঢ় বীজ নিহিত আছে। তাঁহার প্রকৃতি-প্রতিবেশের সহিত তুলনায় তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি রিক্ত ও নির্জীব। কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির ও গভীরচিন্তাশীল মন্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষাপ্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতায় তিনি যে বিচিত্র, কারুকার্যখচিত রাজপরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাবদরিদ্র নর-নারীর অঙ্গে তাহা মোটেই শোভন হয় নাই। 'পদ্মা'-তে বিনয়ের মনে তিনি যে পদ্মার নৈশ-অন্ধকারব্যাপ্ত, নক্ষত্রদীপ্তি-ঝলসিত নির্জনতার অপরিমেয় রহস্যবোধ বা 'কোপবতী'তে বিমলের মধ্যে প্রকৃতির সহিত যে নিগূঢ়তম একাত্মতামূলক অন্তর্দৃষ্টির আরোপ করিয়াছেন, তাহাদের এই মহিমান্বিত দার্শনিক অনুভূতি ধারণা করিবার কোন যোগ্যতাই নাই। তাহাদের ব্যবহার ও মানস পরিস্থিতির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড, হাস্যকর অসংগতি ও অসামঞ্জস্য প্রকটিত হইয়াছে। বরং প্রথম উপন্যাসে বিনয় ও কঙ্কন সজীব হইয়াছে। শেষ উপন্যাস 'কোপবতী'তে বিমল ও ফুল্লরার মধ্যে জীবনীশক্তির একান্ত অভাব। বিশেষতঃ, ফুল্লরার চরিত্রে নারীসুলভ রমণীয়তার কোন বৈদ্যুতী আকর্ষণ নাই। আরণ্যভূমিতে বনলক্ষ্মীর প্রতীকস্বরূপ তাহাকে যে পেলব পুষ্পাভরণসম্ভারে ভূষিত করা হইয়াছে তাহা তাহার অন্তরমাধুর্যের সহযোগিতায় দৃঢ়সংবদ্ধ হয় নাই; ঋণ-করা প্রসাধনের মত তাহার শ্রীহীন দেহমন হইতে তাহা স্খলিত হইয়াছে। কোপাই নদীকে ফুল্লরার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে পরিকল্পনাও যে সার্থক হয় নাই তাহার কারণ ফুল্লরার অযোগ্যতা, নদীর দুর্বার প্রাণাবেগ ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল ভাববৈচিত্র্যের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা করিবার একান্ত অক্ষমতা। বিমলের জীবনে নদীর প্রভাব যেন অনেকটা কবিসুলভ কল্পনা-বিলাস, নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণ নহে। মানুষের কামনাক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে উদাসীন প্রকৃতিকে জড়াইতে হইলে উভয়ের মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তা ফুটাইতে হয় এখানে তাহা পরিস্ফুট হয় নাই।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'-এ পটভূমিকা ও নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে এই ব্যবধান আরও তীব্র অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভবের যে কৌতূহল-পূর্ণ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার আলোকে উদ্ভাসিত সমাজপ্রতিবেশচিত্র রচিত হইয়াছে, জমিদারের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী তাহার তুলনায় কত ম্লান ও নিষ্প্রভ দেখায়। মুখবন্ধের সহিত গ্রন্থ একসুরে বাঁধা নহে। উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, পরন্তপ—ইহাদের মধ্যে শ্রেণীসুলভ দুঃসাহসিকতা ও দুর্বলতার কোন পরিচয় পাই না। উদয়নারায়ণের বীরত্ব মাঝে মধ্যে অট্টহাসি দ্বারা খণ্ডিত মৌন গাম্ভীর্য ও অন্দরে আস্ফালনের মধ্যে পর্যবসিত —ইতিহাসের চাকা ঘুরাইবার মত শক্তির উৎস তাহার কোথায় তাহা দেখা যায় না।

দর্পনারায়ণ তাহা অপেক্ষাও রক্তহীন। ঘটনাবিন্যাসের শিথিলতা ও লেখকের মনোভাবের উদ্ভট খেয়ালপ্রবণতা উপন্যাসের রসকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনের সংকটমুহূর্তগুলির উপর দিয়া লেখক দায়িত্বহীন দ্রুতগতিতে সঞ্চরণ করিয়াছেন—ইহাদিগকে কার্য-ও-কারণ-শৃঙ্খলায় গাঁথিয়া গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই। তাহা ছাড়া উদ্ভটচরিত্রপ্রবর্তনের দিকে লেখকের একটা দুর্বলতা আছে। উদ্ভট চরিত্রগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় সজীব ও আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে না পারিলে তাহারা লেখকের অনভিপ্রেত হাস্যরসের হেতু হয়—এই কৌতুকবোধ কতকটা তাহাদের বীভৎস অসংগতি, অনেকটা লেখকের অক্ষমতায়। ইন্দ্রাণীর চরিত্রপরিকল্পনা যেমন চমৎকার তাহার বাস্তব স্ফুরণ সেই অনুপাতে নৈরাশ্যউদ্দীপক। সজীব, প্রাণবেগচঞ্চল নরনারী অঙ্কন ঔপন্যাসিকের প্রধান গুণ ও ইহার অভাবে অন্যান্য সমস্ত উৎকর্ষ আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। লেখকের নিসর্গানুভূতি অসাধারণরূপে তীক্ষ্ণ ও গভীর; তাঁহার উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকৃতি-চিত্রের অম্লান সৌন্দর্য ঝলমল করিতেছে। ইহার সহিত গভীর চিত্তবিশ্লেষণ ও জীবন্ত সৃষ্টিকুশলতা যোগ হইলে উপন্যাস-সাহিত্যে লেখকের স্থান খুব উন্নত স্তরে নির্দিষ্ট হইবে।

দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' (১৯৫৮) গ্রন্থে প্রমথনাথের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা, তাঁহার উপন্যাসসৃষ্টির বিক্ষিপ্ত খণ্ডাংশগুলি স্থির সংহতি ও রূপপরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানেও তাঁহার উদ্দেশ্য ঠিক উপন্যাসধর্মী নহে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ননির্দেশ ও ইংরেজ-বাঙালীর মিলনোদ্ভূত নূতন সমাজচেতনার পরিচয়দানই তাঁহার মুখ্য প্রেরণা। এই নবযুগের প্রতীকরূপে তিনি বাংলা গদ্যের প্রবর্তয়িতা কেরী সাহেবকে ও বাঙলা সমাজে মোহমুক্ত বুদ্ধিবাদের ও জীবনস্বাতন্ত্র্যের প্রথম প্রতিনিধি রামরাম বসুকে গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইংরেজ-বাঙালীর প্রণয়াকর্ষণের প্রথম মদির মধুরতা তিনি স্বামীর চিতাশয্যা হইতে দৈবক্রমে পলায়িতা ও পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতিতে দীক্ষিতা রেশমীর সঙ্গে ইংরেজ যুবক জনের আবেগময় সম্পর্কের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

উপন্যাসটির ঘটনাপরিধি বিরাট ও বিচিত্র উপাদানে পূর্ণ। কলিকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন ও উহার প্রাচীন ভৌগোলিক বিন্যাস ও ইতিবৃত্ত সবই গ্রন্থমধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। নবাগত ইংরেজের প্রাণোচ্ছলতা ও কল্পনাপ্রসার নগরীর বস্তুসত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাকে যেন একটা মানবিক-আবেগ-চঞ্চল মায়াপুরীর রূপ দিয়াছে। উপন্যাসের বিপুলসংখ্যক চরিত্র তাহাদের নানামুখী কর্মধারা ও ভাবপ্রেরণা লইয়া ইহার মধ্যেই নিজ নিজ জীবননাট্যের পটভূমিকার আশ্রয় পাইয়াছে। অনভ্যস্ত পরিবেশের উত্তেজনায় দুই বিভিন্ন আদর্শের নর-নারীগুলি উদ্বেলিত প্রাণপ্রবাহে তাহাদের অস্তিত্ব-গৌরবের পরিচয় দিয়াছে। সকলের সম্মুখেই যেন একটা নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত, জীবন-লীলার এক নূতন রঙ্গমঞ্চ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ধর্মযাজক কেরী তাহার খৃষ্টধর্মপ্রচারের মধ্যে বাঙালীর অন্তরলোকের পরিচয় পাইয়া ও তাহার মুখে নূতন ভাষা আরোপ করিয়া জীবন-বোধের এক নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামরাম বসু কেরীর সংস্পর্শে আসিয়া ও তাহার সাহিত্যকর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার স্বভাবশিথিলতার মধ্যে এক অজ্ঞাত মানসমুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে—তাহার উদাসীন নিঃস্পৃহতা এক অভিনব জীবনদর্শনের

দ্যোতক হইয়াছে। সর্বোপরি কিশোরী রেশমী এক অনাস্বাদিত-পূর্ব প্রণয়স্বপ্নের করুণ মাধুর্যে নিজ চিতানলদগ্ধ জীবনের শূন্যতাবোধকে পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াসে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে আর সাধারণ ইংরেজ প্রভুত্বমদগর্বে, অপরিমিত বিলাস-ব্যসনে, নেটিবের সহিত তুলনায় আপনাকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন বাঙলা তাহার কুসংস্কার, গ্রাম্য দলাদলি ও ষড়যন্ত্র ও সাহেবের মোসাহেবি লইয়া নূতন যুগের জীবনচ্ছন্দের কোথাও বা খোলাখুলি বিরোধিতা করিতেছে, কোথাও বা সুবিধাবাদের কপট আনুগত্যের সমর্থন জানাইতেছে। উপন্যাসের বিরাট পরিসরে এই বিচিত্র জীবনের দ্রুতসঞ্চারী খণ্ড ছবিগুলি শিথিল-সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে ট্র্যাজেডির বিষাদ-মহিমার মধ্যে—মতিরায়ের বাগান-বাড়িতে বন্দিনী রেশমী স্বহস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটি বহ্ন্যুৎ-সবের-দীপ্তিতে ভাস্বর—রেশমী নিজে এই অগ্নিবলয়বেষ্টনে যেন এক বহ্নিস্নানশুদ্ধ জ্যোতির্ময়তা লাভ করিয়াছে। তাহার অন্তঃনিরুদ্ধ প্রণয়াকূতি যেন স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তিতে বহিঃপ্রদীপ্ত হইয়াছে, নববধূর রক্তিম প্রসাধন যেন তাহাকে অন্তিম বিবাহ-বাসরের জন্য সজ্জিত করিয়াছে। লেখকের বর্ণনাও এখানে অগ্নিভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিসৌন্দর্য ও প্রণয়রোমাঞ্চ-বর্ণনায় লেখকের সূক্ষ্ম, কবিত্বময় অনুভূতি অপরূপ লাবণ্যময় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনসমীক্ষাও স্থানে স্থানে তীক্ষ্ণ মনীষার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ সমস্তই উপন্যাটির উচ্চকোটিক উৎকর্ষের নিদর্শন।

কিন্তু তথাপি উপন্যাসটি প্রমাদশূন্য নহে। আখ্যানের শিথিলগ্রন্থন ও যদৃচ্ছ বিচরণ প্রমাণ করে যে, লেখকের ঔপন্যাসিক বিবেক পূর্ণভাবে সক্রিয় নহে। প্রমথনাথের মন স্বভাবতঃই বন্ধন-অসহিষ্ণু, একই উদ্দেশ্যের অস্খলিত অনুবর্তন তাঁহার প্রকৃতিবিরোধী। তাঁহার নিকট ঔপন্যাসিক রস প্রত্যাশা করিলে তাঁহাকে অবাধ ভ্রমণের অধিকার দিতে হইবে। বিশাল পটভূমিকা, নানা ঘটনার ভিড়, অসংখ্য নর-নারীর খেয়াল-খুশি মত আসা-যাওয়া, অনাবশ্যক চরিত্রের প্রাচুর্য, কৌতূহলময় পর্যবেক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও মন্তব্য, বর্ণনার ও রসিকতার যথারুচি বিস্তার—ইহাদেরই অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যে তাঁহার উপন্যাসের দলগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। অতিরিক্ত মাপা-জোকা প্রাসঙ্গিকতার চুলচেরা বিচার, বাড়তি ও কাজের কথার মধ্যে কঠোর সীমানির্দেশ তাঁহার আখ্যানশিল্পের স্বচ্ছন্দ বিকাশে পরি-পন্থী। এই গঠন-শিথিলতা লইয়া পাঠকের অনুযোগ করিবার বিশেষ কারণ নাই—কেননা এই স্বেচ্ছাবিহারের ফল তাহার পক্ষে রুচিকর। তবে একটা ত্রুটি বিশেষ অমার্জনীয়ই মনে হয়—আখ্যানটির ট্র্যাজিক উপসংহার। বিষাদময় পরিণতির জন্য পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন—অতর্কিত করুণান্তিকতা আর্টের সঙ্গতি নষ্ট করে। লেখক বরাবর একটি সুখময় পরিণতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন—রেশমীর উদ্ধারের আশা ও মধুর মিলনের সম্ভাবনাই তিনি পাঠকের প্রত্যাশায় জাগরূক রাখিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহার উদ্ধারের জন্য যে সেনা-সমাবেশ হইয়াছে তাহার বিসদৃশ উপাদানসমূহ ও ভাবের অসঙ্গতি আমাদের মনে এক অসংবরণীয় হাস্যোচ্ছ্বাসেরই উদ্রেক করে। এ যেন Quixote-জাতীয় একটি অভিযান। সুতরাং উপন্যাসের আকস্মিক বিয়োগান্তিক পরিণাম আমাদের সমস্ত ন্যায্য প্রত্যাশার বৈপরীত্য

সাধন করিয়া গ্রন্থের রসোপভোগে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ধনুকের ছিলা টান করিয়া না বাঁধিলে তাহাতে ট্র্যাজেডির ঝঙ্কার শোনা যায় না—শিথিলগুণ ধনুক হইতে উৎক্ষিপ্ত অস্ত্র একটু আধটু আঁচড় কাটিতে পারে, কিন্তু মর্মান্তিক আঘাত হানিতে পারে না।

(৪)

সুবোধ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রসার যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এই দাবী সহজেই করা যায়। ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌবনের পরিপূর্ণ, নিটোল সৌন্দর্যলাভ করিয়াছিল—প্রৌঢ় জীবনের সমস্যাসঙ্কুলতাও তাহারই প্রবর্তন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ঠিক ছোট গল্পের উপযোগী ছিল না, কিন্তু অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ ইহাতে সৃষ্টির মৌলিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। সীতা ও শান্তাদেবীর কয়েকটি রচনা, অচিন্ত্যকুমারের 'অকালবসন্ত', তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা' ও 'ধূলিধূসর', অগ্রগতির নিশ্চিত নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের দুইখানি গল্প-সংগ্রহ-গ্রন্থ—'ফেনিল' (১৯৪১) ও 'পরশুরামের কুঠার' ইহার আর্টকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়াছে। পরিকল্পনার মৌলিকতা ও আলোচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য—ছোটগল্পের এই উভয়বিধ উৎকর্ষই গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে প্রচুরভাবে বিদ্যমান। ছোটগল্পলেখকের আবিষ্কারকের চক্ষু থাকা চাই—তিনি জীবনের এমন সমস্ত খণ্ডাংশ নির্বাচন করিবেন যাহারা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, যাহারা যুগপৎ অপ্রত্যাশিত ও রসসমৃদ্ধ। সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পের উপরই এই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়—ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবনসংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল পথিক সীমান্তপ্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদুসৌরভপূর্ণ বন্য ফুল চয়ন করিয়াছেন।

মাতৃত্বের দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক, ও সেই অপরাধের অমোঘ শাস্তিস্বরূপ অপরিচিত সন্তানের কামনার বিষয়ীভূতা, অতিক্রান্তযৌবনা রূপজীবিনীর অনির্বাণ লালসা (পরশুরামের কুঠার), ভগ্নস্তূপে পরিণত মন্দির ও দেবমূর্তির সহিত প্রায় একাঙ্গীভূত, অতীত গৌরবের স্বপ্নে বিভোর ও অতীত আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাশীল পিতার সহিত আধুনিকমনোভাবাপন্ন পুত্রের সংঘর্ষ (ন তস্থৌ), অভ্রের খনির ওভারম্যান যুবকের জীবনে ইরানী যাযাবরী ও খনির তিমিরগর্ভের প্রস্তরকঠিন লাবণ্যের প্রতীক কুলী রমণীর দ্বৈত আহ্বান—প্রথমটি যেন দিগন্তলীন রঙের মায়ামরীচিকা, দ্বিতীয়টি পাতালপুরীর মৃত্যুগহন আকর্ষণ (উচলে চড়িনু), পাগলা সাহেবের বাঙালীসমাজের ভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতর স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার খেয়ালে অদ্ভুত ক্রমাবরোহণপ্রবৃত্তি (শক্ থেরাপী), মোটর-চালকের নিজ পুরাতন কুদর্শন ট্যাক্সীর উপর আশ্চর্য মমত্ববোধ (অযান্ত্রিক), ফাঁসির আসামীর মৃতদেহের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের অনিবার্য উচ্ছ্বাসে জেলের সিপাহীর নিয়মভঙ্গ—তাহার সুদৃঢ়, যন্ত্রবদ্ধ নিয়মানুবর্তিতার দুর্গে ফাটলধরা (দণ্ডমুণ্ড); পারিবারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তির আবিষ্কারের ফলে, মোহভঙ্গে নির্মম এক ভদ্র শিক্ষিত যুবকের চরিত্রভ্রংশ ও বিশ্বাসঘাতকতা (গোত্রান্তর)—এই সারসংকলন হইতে তাঁহার বিষয়বৈচিত্র্যের ধারণা করা যায়।

কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা পটভূমিকারচনায় লেখক উচ্চতর কৃতিত্বের অধিকারী। কোন বিশেষ ঘটনাপরিস্থিতি বা অন্তরের সূক্ষ্ম, অলক্ষ্যপ্রায় আবেগ ফুটাইয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাহার সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগূঢ় বাক্যাবলী তীক্ষ্ণধার বর্শাফলকের মত বর্ণিত বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে। স্বল্প কয়েকটি সুনির্বাচিত রেখায়, অর্থভূয়িষ্ঠ সামান্য কয়েকটি মন্তব্যে পাঠকের সম্মুখে এক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া ওঠে, এক অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই atmosphere বা অন্তরপ্রতিবেশরচনায় লেখক অসাধারণ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। 'পরশুরামের কুঠার'-এর 'ন তস্থৌ' গল্পে ভগ্নস্তূপে পরিণত সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ দেবমূর্তি ও "জরাজীর্ণ, শ্রীহীন কল্যাণঘাট মৌজার" বর্ণনা যে রসঘন, আবেশময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাদের মনকে ভৌতিক রোমাঞ্চের মত অধিকার করিয়া বসে। এই মোহময় পরিবেষ্টন অনুভূতির তীব্রতায় ও প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্য, ব্যঞ্জনাপূর্ণ সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সহিত তুলিত হইবার অযোগ্য নহে। এক অস্তমান জ্যোৎস্না রজনীর শেষ যামে, ক্ষীণ, তামাটে চন্দ্রালোকে, অবিশ্বাসী বিরুদ্ধভাবাপন্ন সোমনাথের মনেও এই মৃত্যু-কবলিত দেবমন্দির ইহার প্রভাবের যাদু বিস্তার করিয়াছে। কল্যাণঘাটের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গতিচ্ছন্দও যেন এই মন্দিরের সুরে বাঁধা—আধুনিকতার সমস্ত বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য যেন এক প্রস্তর-ঘন ঔদাস্য ও নিশ্চলতায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে পাত্রীনির্বাচন হয় কাব্য নাটকের নায়িকা বা শাস্ত্রবর্ণিত দেবীমূর্তির লক্ষণের সহিত মিলাইয়া—এখানে চিকিৎসা চলে আধ্যাত্মিকতায় মোড়া ব্যবসায়বুদ্ধির সাহায্যে, কেননা কবিরাজ পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা-পয়সা লন না, লন সাত্ত্বিক দানের অন্তর্ভুক্ত রৌপ্য ও তাম্রখণ্ড। এখানে স্নেহব্যাকুল পিতা মনে করেন যে, সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিতে পারিলে পুত্রের বিমুখ, বিদ্রোহী চিত্তকে প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের আশ্রয়ে স্থির করা যাইবে। এখানে আধুনিক তরুণীর চোখে হাসির আভা যেন সর্বনাশের বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তকে নামহীন আতঙ্কে শিহরিত করে। গল্পের সর্বত্রই এই আশ্চর্য ভাবসমন্বয়ের নিদর্শন।

'গরল অমিয় ভেল' গল্পে মানবপ্রকৃতির একটি বিচিত্র উচ্ছ্বাসের আলোচনা হইয়াছে। মালা বিশ্বাসের যৌবনের শুভলগ্ন বহিয়া গিয়াছে, রূপমুগ্ধ নয়নের সপ্রশংস অর্ঘ্য আহরণের দীর্ঘদিনব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, রূপহীনাকে আড়াল করিয়া বিস্মৃতি ও উপেক্ষার যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে, সজ্জাসমারোহ ও আত্মপ্রচার পরিহসিত হইয়া আত্মগ্লানির উপাদান যোগাইয়াছে। এমন সময়ে এক আচম্বনীয় সুযোগ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। শহরের এক অনামিক কুৎসা-রটনাকারী কয়েকটি তরুণীর প্রণয়-ইতিহাসের গ্লানিকর অধ্যায়গুলির উপর অভ্রান্ত ইঙ্গিত ও নিপুণ বক্রোক্তির দ্বারা এক ঝলক সন্ধানী আলোকপাত করিয়াছে। যে তরুণীরা এই আক্রমণের লক্ষ্য তাহাদের মনে কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে—এক অভিনব পুলক-হিল্লোলে অভিষিক্ত হইয়া তাহাদের ম্লান, মুমূর্ষু যৌবন আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এই দৃশ্য বঞ্চিতা মালার মনে ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাসের সহিত নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। সে নিজের নামেই এক কুৎসালিপি রচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে ক্ষীয়মাণ আগ্রহকে আবার জাগাইতে চাহিয়াছে—এই নবজাগ্রত

কৌতূহলের অনুকূল বাতাসে নিজ অবসন্ন, ধূলিমলিন যৌবনের বিজয়-পতাকা উড়াইবার শেষ চেষ্টা করিয়াছে। নীতিবাগীশ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে অবরুদ্ধ যৌন-ক্ষুধার কোন ইঙ্গিত না থাকাতে, তাঁহাকেই এই কুৎসালিপির রচয়িতারূপে নির্দেশ আমাদের মনে অবিশ্বাসের চমক জাগায়।

'কর্ণফুলির ডাক' আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। বর্তমান মহাযুদ্ধের আবর্তে দেশব্যাপী উদ্‌ভ্রান্তি ও বিহ্বলতা ও একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র সংসারে ভাঙন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। গল্পের নায়ক ইতিহাসের টান তাহার রক্তের মধ্যে একটু বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছে। সে ইতিহাসের কঠোর বস্তুতন্ত্রতা ও অমোঘ নিয়মানুগত্যের পরিবর্তে গ্রহণ করিয়াছে ইহার উষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় বিগলিত হৃদয়াবেগ। মহাযুদ্ধের সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত-গরল ফেনায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দিয়া সে হৃদয়ের পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। চট্টগ্রামের অখ্যাত পল্লীতে বৈদেশিক আক্রমণপ্রতিরোধচেষ্টায় প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ঠিক ঐতিহাসিক যুক্তিবাদের অনুবর্তন নহে, ইহা ভাবাবেগমত্ততার রঙিন নেশা। লেখক ইতিহাসের বিবর্তনধারার যে আশ্চর্য রূপ-ব্যঞ্জনা, বহির্ঘটনার অন্তরালে ইহার অন্তরলীলার যে আভাস দিয়াছেন, তাহা ঠিক এই আত্মোৎসর্গপ্রবণতার দিব্যোন্মাদের সহিত খাপ খায়। জড় হইতে জীব, চেতনা হইতে সৌন্দর্য ও মহিমা, নিয়তি-পারতন্ত্র হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে ঊর্ধ্বমুখী অভিযান মানব-ইতিহাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ তাহাকে গতিতে ঋজু ও লক্ষ্যে স্থির রাখিয়াছে, লেখক সেই নিগূঢ় রহস্যকে নিম্নলিখিতরূপ ভাষার ইন্দ্রজালে বন্দী করিয়াছেন।

"সেই ইতিহাসের মানুষ। যে মানুষের মনের বনের শাখায় পৃথিবীর সুখ-দুঃখের পাখীর দল কলরব করে ফেরে। প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামে সুন্দর এই পৃথিবীর রূপের বালাই নিয়ে সে এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে যায়। যে দ্বন্দ্বের মহিমায় হিমগিরি আকাশ ছুঁয়েছে, ধানের ক্ষেত হয়েছে সবুজ, চেতনার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠলো মানুষ। যে পরিবর্তনের স্রোতে পদার্থ গলে গিয়ে হলো প্রবৃত্তি—সুখের হাসি, বিরহের বেদনা। মানুষ যেখানে স্বয়ং বিধাতা হয়ে আপন পরিণাম গড়ে তোলে আপন হাতে।" শুষ্ক ঘটনার শৈবালপুঞ্জের আবরণের অন্তরালে ইতিহাসের রক্তিম, দলের পর দলে, বর্ণে-গন্ধে বিকাশমান, হৃতপদ্মের কি অপরূপ উদ্‌ঘাটন!

বোমা পড়িবার সম্ভাবনায় আমাদের মূঢ়, সংক্রামক আতঙ্কের হাস্যকর অসংগতি ও বাতিকগ্রস্ত বিশৃঙ্খলা—কাণ্ডজ্ঞানহীন পলায়নের সমস্ত বীভৎসতা লেখক একটি ধারালো মন্তব্যের খোঁচায় নগ্নভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। মহাযুদ্ধের গতি ও পরিণতির যে ছবি তিনি স্বল্প পরিসরের মধ্যে, কয়েকটি ব্যঞ্জনাগূঢ় শব্দপ্রয়োগে আঁকিয়াছেন তাহা সাধারণ লেখকের বহুভাষিতা ও অস্পষ্ট ধূম্রজালরচনার মধ্যে আপনার তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্যে সূর্যালোকস্পৃষ্ট গিরিশৃঙ্গের মতই উজ্জ্বল ও লক্ষ্যণীয় হইয়া থাকে। এই মহাসংগ্রামের অন্তর্হিত সত্য রাজনৈতিক আদর্শবাদের পার্থক্যের অজুহাতে যাহারা অস্বীকার করিতে চাহে, তাহাদের বিভ্রান্তি, উটপাখির চোখ-বোজা আত্মপ্রতারণা, লেখক কত সহজে ও অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রবাসী গ্রামের ছেলের প্রতি গ্রামবৃদ্ধদের সাগ্রহ আমন্ত্রণ-জ্ঞাপনের মধ্যে তাঁহার ইতিহাসপুষ্ট কল্পনা মানবসমাজের প্রাথমিক যুগের গোষ্ঠীপ্রীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছে। গল্পের সর্বত্র বলিষ্ঠ মননশক্তি ও সূক্ষ্মদর্শী কল্পনার ছাপ সুপরিস্ফুট।

'উচলে চড়িনু' গল্প হিসাবে একেবারে অনবদ্য নহে। দিনেশের জীবনে বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে ঠিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। বিলাসীর অনাবাস লব্ধ, নানা সুখদুঃখে পরীক্ষিত কিন্তু অনেকটা অনিচ্ছার সহিত স্বীকৃত ভালবাসা উহার মদিরতা ও তীক্ষ্ণ স্বাদ হারাইয়াছে। যাযাবরীর প্রেম অপ্রত্যাশিত, অসাধারণ ও পৌরুষধর্মের উত্তেজক বলিয়াই লোলুপতা জাগাইয়াছে। কাজেই এই শেষোক্ত মরীচিকাকে করায়ত্ত করার প্রয়োজনে বিলাসীর প্রাণ পর্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত অনাদরে, অবহেলায় আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঘরের গাভীকে কসাই-এর হাতে সঁপিয়া দিয়া মায়ামৃগীকে ধরিবার জন্য সোনার ফাঁদ পাতা হইয়াছে। এইরূপ সর্বস্বপণ জুয়াখেলার যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহাই ঘটিয়াছে—বন্য হরিণী স্বর্ণজাল সমেত উধাও হইয়াছে। লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগের প্রধান কারণ এই যে, বিলাসীকে কখন যাযাবরীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখান হয় নাই, দিনেশ কখনও তাহার প্রতি কোন সত্যকার টান অনুভব করে নাই। সে ভাগ্যের প্রতি গাত্রজ্বালা প্রশমনের জন্যই মাঝে মধ্যে এই অন্ত্যজ প্রেমকে বুকে টানিয়াছে—কিন্তু পাতালপুরীর হৃদয়দৌর্বল্য মর্ত্যের আলোকে লজ্জিত হইয়াছে। এই ভারসাম্যের অভাবে গল্পটির রস পূর্ণভাবে জমাট বাঁধে নাই।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও গল্পটিতে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রকাশনৈপুণ্যের নিদর্শন প্রচুরভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। অভ্রখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথের বাহিরের রূপ ও অন্তরের প্রেরণা সমান কৌশলের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সেখানে ব্যবসায়ীর নখরাঘাত, জীবনের আদিম ইঙ্গিত, প্রেমের আবেগ-রক্তিমা সবই আপন আপন স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। আবার ইরাণী যাযাবরীর জীবনযাত্রার রহস্য-চঞ্চলতা ও নীড়বিধ্বংসী, অফুরন্ত গতিবেগ লেখকের ভাষার মধ্যে ধৃত ও ধ্বনিত হইয়াছে। "কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমরালের পাখার মত পথের প্রেমে যাহাদের স্নায়ু-শিরা সতত চঞ্চল।...ভাষা, গান, উৎসব সবই পথ থেকে কুড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন-ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কি না। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়?"

'তমসাবৃতা' গল্পে ধুলগড়া গ্রামে আকস্মিক দারিদ্র্য যে রুক্ষ শ্রীহীনতা বিস্তার করিয়াছে তাহার পটভূমিকায় তাঁতীর ছেলে মোহনবাঁশি ও বাউড়ীর মেয়ে জবার অসামাজিক প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জবার মনে তাহার পূর্বস্বামী দয়ারামের সংসর্গে আহৃত বেশভূষার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে আভিজাত্যবোধ বিবস্ত্রপ্রায় কোন বাউড়ী যুবকের সঙ্গে তাহার ঘর বাঁধার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ও সুবেশ মোহনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের হেতু হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার এই প্রসাধন-মোহ তাহার জাতীয় সংস্কারকে হঠাইয়া তাহাকে মোহনের নিকট আত্মসমর্পণে উৎসুক করিয়াছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই রক্তের দুরতিক্রম্য টান তাহাকে তাহার বিবস্ত্রা স্বজাতীয়াদের দলে মিশিয়া, নৈশ অন্ধকারের লজ্জাহারী যবনিকার আশ্রয়ে মাঠে কাজ করিতে পাঠাইয়াছে। জবার ব্যক্তিগত সমস্যা অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত দুর্দশার চিত্রটিই অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। চড়া দামে সঞ্চিত-শস্য-বিক্রয়ের মূঢ় অবিবেচনা দুঃসহ গ্লানিরূপে সমস্ত গ্রামের বক্ষে পুঞ্জীভূত হইয়াছে—উহার স্বাচ্ছন্দ্যের আশা, মুমূর্ষু শিল্পসত্তার পুনরুজ্জীবনের কল্পনা দূরে সরিয়া গিয়াছে "বেলাশেষের ছায়ার মত"। এই নিঃস্বতার ঘ্রাণ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা বিচিত্র প্রকারের শোষণশক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছে—মৃতপশুর

মাংসলুব্ধ শকুনিপালের ন্যায়। এই শোষকগোষ্ঠী যে প্রলোভনের নাগপাশ ছড়াইয়াছে তাহাতে বন্দী হইয়াছে শুধু বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ, শুধু মজুদ সম্পত্তি নহে, অনাগত শস্য-সম্পদের সম্ভাবনা পর্যন্ত। তাহাদের উৎসবের ছদ্মসজ্জার পিছনে আছে অভাবের শীর্ণ কঙ্কাল, সন্ত্রস্ত হাসির পিছনে, টেকাইতে-না-পারা দুর্ভাবনার প্রতিচ্ছায়া। "চারিদিকের বাসি ও বিবর্ণ ফুল শুকনো পাতা আর রুক্ষ মাটির সঙ্গে এরা ছন্দে ছন্দে মিলে গেছে।" এই দুর্দশার নিম্নতম গহ্বর হইতে সৃষ্টিবিপর্যয়ের প্রলয় নাগিনীর মত বাহির হইয়াছে "বিবসনা মৃত্তিকা-বধূর দল", পঞ্চসহস্র বৎসরের সভ্যতার আবরণ যাহাদের অঙ্গ হইতে জীর্ণপত্রের ন্যায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা বিদ্রোহ করে নাই, বিদ্রোহ ইহাদের ধাতে নাই—বোধ হয় যেন, বসুমতীর অঞ্চলতলেই ইহারা শেষ আশ্রয়ের জন্য প্রতীক্ষমানা। রিক্ততার এমন করুণ ও গ্লানিকর চিত্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

পূর্ববর্তী রচনা 'ফসিলের' সহিত তুলনায় 'পরশুরামের কুঠার'-এ লেখকের শক্তি আরও পরিণত, গল্পের পরিকল্পনায়, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিশ্লেষণে সর্বত্রই ক্রমোন্নতির নিদর্শন পরিস্ফুট। কিন্তু 'ফসিল'-এও এই সমস্ত গুণের যথেষ্ট পরিচয় মিলে। অতি সাধারণ বিষয়ে পূর্ণ রসের উদ্বোধনে ছোটগল্পের যে উৎকর্ষ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'অযান্ত্রিক'। অর্ধসচেতন যন্ত্র ও তাহার চালকের মধ্যে যে এক মধুর, মান-অভিমান মিশ্র, স্নেহ উদ্বেল, নিষ্ঠায় অবিচল, হতাশায় হিংস্র হৃদয়সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা দেখাইয়া লেখক যেন আমাদের অনুভূতির একটা নূতন দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। কেবল বিশুদ্ধ গল্প হিসাবে এইটি সমুদয় সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 'ফসিল' গল্পটিতে অঞ্চলগত নেটিভ স্টেটের শাসন সমস্যার জটিলতা কয়েকটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে ও সুনির্বাচিত কথার মাধ্যমে স্ফটিক-স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন, স্তিমিত সমারোহ, প্রজার ভাল-মন্দ সব বিষয়েই রাজশক্তির যথেচ্ছাচারপ্রবণতা, একদিকে নামমাত্র রাজার অভ্রভেদী আত্মগরিমাবোধ, অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকসংঘের কূট ষড়যন্ত্রজাল ও ইহাদের অঙ্গুলিসংকেতে মূঢ় প্রজাসাধারণের বিদ্রোহোন্মুখতা—এই সমস্ত বিপরীত তরঙ্গের মাঝে মুখার্জির আদর্শবাদ ও উদারনীতির বানচাল; রাজা ও বণিকসংঘের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ ও সাময়িক স্বার্থসাম্যের প্রয়োজনে সহযোগিতা, রাজশক্তির গুলিতে ও ব্যবসায়ীর অব্যবস্থায়, খনির তিমির গর্ভে একত্র মৃত ও নিশ্বাসবায়ুরুদ্ধ জীবিতের একত্র সমাধি—এই সমস্ত মিলিয়া দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও জীবনযাত্রার এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ও তথ্যবহুল চিত্র আমাদের সম্মুখে রূপায়িত হয়। 'দণ্ডমুণ্ড'-এ আছে অনুকূল সিপাহীর নৈশ পাহারার অপূর্ব বর্ণনা, যেখানে অজ্ঞাত সম্ভাবনার শিহরণে রাত্রি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, আঁধারের সহিত মনের কল্পনা মিশিয়া ক্ষণিক ভ্রান্তির ছায়ালোক সৃষ্টি করে, যেখানে দিনের লৌহকঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে কল্পনাবিলাসের কুজ্ঝটিকায় বিলীন হয়। 'সুন্দরম্' গল্পে সৌন্দর্য সম্বন্ধে ময়না-ঘরের শবব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে গঠিত এক নূতন আদর্শ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বহিরাবরণের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া দেহান্তঃপুরের নাড়ী-শিরা-ধমনীর জটিল জালবেষ্টনীর মধ্য দিয়া, অস্থিমজ্জাবিন্যাসের আশ্রয়ে দৈহিক রূপের এক অভিনব মূর্তি প্রকটিত হয়, যাহা মানবের স্থূল, অনভ্যস্ত দৃষ্টির নিকট এখনও অননুভূত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, সূক্ষ্মরুচি সুকুমারের কদর্যদর্শন ভিখারীর মেয়ের প্রতি আকর্ষণ লেখকের

অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ পরিণতি সৃষ্টি করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয়। 'গোত্রান্তর'-এ শিক্ষিত বেকার ভদ্র যুবক সঞ্জয় বুঝিয়াছে যে, পারিবারিক সম্পর্কের স্নেহপ্রীতিভক্তি প্রভৃতি আপাত-নিঃস্বার্থ সদ্‌গুণসমূহ প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী ব্যবসায়বুদ্ধি; কাজেই এগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া জীবনকে খাঁটি স্বার্থপরতার নীতিতে চালাইতে হইবে। ইহারই ক্রমপরিণতি মিলে চাকরী-গ্রহণ, পুরাকালের বরব ডাইন ও ডাইনীর প্রতীক নেমিয়ার ও রুক্মিণীর সঙ্গে কলঙ্কিত সহযোগিতা, মিলে ধর্মঘট বাধাইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা, ক্যাশের চাবি-চুরিতে দুর্বল সম্মতি ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিম্ন পাতালমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভ। গল্পটির ঘটনাবিন্যাস খুব সুনিপুণ নহে—মিলের আবহাওয়া-রচনার মধ্যে অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা ও ফাঁকিতে ভুলিবার প্রবৃত্তি বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে—সঞ্জয়ের ব্যবহারও ঠিক অভিনয়কৌশলের আদর্শ বলিয়া অভিনন্দনযোগ্য নহে। তথাপি রচনানৈপুণ্য, মন্তব্যের তীক্ষ্ণ যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য ও স্থানে স্থানে সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ গল্পটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। গল্পের শেষ কয়টা ছত্র এই আভাস নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ—সঞ্জয়ের ধূর্ত জম্বুকবৃত্তির উপর এক ঝলক সন্ধানী-আলোর নিক্ষেপ।

গল্পসংগ্রহগুলির ছোটখাট ত্রুটির আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের আঙ্গিক সব সময় নিখুঁত হয় নাই। অনেকগুলি গল্পের রসধারা শাখা-পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সকলে মিশিয়া মূল প্রবাহকে পুষ্ট ও স্রোতোবেগপূর্ণ করে নাই। আকস্মিকতার রেখাগুলি সর্বদা কেন্দ্রাভিমুখী হয় নাই। 'ফসিল' গল্পটির নামকরণ ঠিক সার্থক মনে হয় না। কেননা মূল বিষয়ের সহিত ভূগর্ভ সমাহিত মৃতদেহগুলির ফসিলে পরিণতির যোগসূত্র অতি সামান্য। 'দণ্ডমুণ্ড'-এ অনুকূলের আকস্মিক পরিবর্তনে সামঞ্জস্যহীনতার নিদর্শন সম্পূর্ণ গোপন করা যায় না। 'গোত্রান্তর' ও 'উচলে চড়িনু' গল্পদ্বয়ে ঘটনাবিন্যাসের ত্রুটির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'তমসাবৃতায়' জবার চরিত্রের সঙ্গে গ্রামের শীর্ণ, দারিদ্র্যপিষ্ট রিক্ততার যোগ খুব নিবিড় হইয়া উঠে নাই। 'পরশুরামের কুঠার'-এও ধনিয়ার জীবনসমস্যা যোগসূত্রহীন তথ্যের বাহুল্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—তাহার শেষ জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে এই নিঃসম্পর্ক ঘটনাগুলি একযোগে অঙ্গুলিসংকেত করে নাই। মাতৃত্বের কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করিয়া সে যে সম্ভাব্য সন্তানেরই কামোপভোগের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে, একদল মাতৃহন্তা পরশুরামেরই সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা তাহার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি নয়, একটা গৌণ অসুবিধা মাত্র। সে যেমন সন্তান পরিত্যাগেও উদাসীন, তেমনি সন্তানের লোলুপ বাহু-বিস্তারেও অবিচল রহিয়াছে। এই ঘৃণ্য সম্ভাবনার শঙ্কাজনক শিহরণ ধনিয়ার মন হইতে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় নাই—লেখক যেন গল্পের একেবারে উপসংহারে খিড়কির দরজা দিয়া ইহাকে প্রবেশ করাইয়াছেন।

'শুক্লাভিসার' (এপ্রিল, ১৯৪৪) গল্পসমষ্টিতে উপরি-উক্ত গুণ ও দোষের নূতন উদাহরণ মিলে। প্রতিবেশরচনায় অসামান্য নৈপুণ্য, দুই একটি সংক্ষিপ্ত, সাংকেতিকতায় তীক্ষ্ণ, উক্তির সাহায্যে একটা বিশেষ পরিস্থিতির মর্মোদ্‌ঘাটন ও বিষয়ের চমকপ্রদ অসাধারণত্বের সঙ্গে গঠনে শিথিল অসংলগ্নতার যোগ ইহার সাধারণ লক্ষণ। মনে হয় গল্পগুলির বিষয়বস্তু যেন প্রতিবেশের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—ইহারা যেন সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ফ্রেমের

মধ্যে আল্‌গা, অস্পষ্ট পোঁচের ছবি। 'শুক্লাভিসার' গল্পে ত্রিপাঠী ও পুষ্করের মধ্যে দোদুলচিত্ত বকুত্রী পুষ্করের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ত্রিপাঠীর উদার মহানুভবতার পক্ষপুটে গর্ভস্থ সন্তান সহ আশ্রয় পাইয়াছে। গল্পটি নানাবিধ সূক্ষ্ম, কিন্তু অসমাপ্ত ইঙ্গিতে পূর্ণ। ত্রিপাঠীর হৃদয়াবেগ-হীন হিতৈষণায় ও তাহার অন্তররহস্যের অপরিচয়ে বকুত্রীর মনে যে নীরব ক্ষোভ জাগিয়াছে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে ত্রিপাঠীর নিরুদ্ধ প্রেমের অনিবার্য প্রকাশে অথবা তাহার আত্মোৎ-সর্গের পূতকারী উচ্ছ্বাসে—তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। সেইরূপ বকুত্রীর প্রতি পুষ্করের আকর্ষণের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশবাসীর সম্পর্কে বাঙালীর আত্মম্ভরি আভিজাত্যগৌরব ও তাহার ভদ্র পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার প্রতি সনাতন পক্ষপাতিত্ব অনিশ্চয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই বকুত্রী যখন আদর্শে সহযোগিতাকেই প্রেমের অবিচল ভিত্তিরূপে দাবী করিয়াছে, তখন পুষ্করের ভালোবাসা সেই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া পিছাইয়া আসিয়াছে। 'একতীর্থা' গল্প এক বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর শিষ্যবাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতির চমৎকার বর্ণনা। বীণা দিদিমণির বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় ভূতপূর্ব ছাত্রীদের সহিত একত্র ছায়াচিত্র দেখিয়া, প্রেক্ষাগৃহের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে তাহাদের আচরণের সংগতি-অসংগতির নির্দেশ দিয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ-ব্যর্থতার পরিমাপ করিয়া এক বিষাদমণ্ডিত তৃপ্তি খুঁজিয়াছে। 'বৈর-নির্যাতন'-এ বোমাবর্ষণের অভিযানে ব্রতী বাঙালী বৈমানিক দিলীপ দত্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ঊর্ধ্ব-ব্যোমবিহারী তাহার চোখে পৃথিবীর যে অনভ্যস্ত, বিচিত্র-পরিবর্তনশীল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় তাহার দৃঢ়সংকল্পে শিথিলতা আসিয়াছে অহিংসানীতিপরায়ণা শোভার প্রভাবে নহে, রসিদ খলিপার মামাবাড়ির প্রতি মমতায়। ডোরার সোৎসাহ সমর্থন ও শোভার তীব্র বিরোধিতা অপেক্ষা বাল্যস্মৃতির এক অতর্কিত উদ্বোধন তাহার জীবনে কেন অধিক কার্যকরী হইল তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। 'নতুন শালিখ' গল্পে কাঁকুলিয়ায় শহর-পাড়াগাঁয়ের দ্বন্দ্ব মানুষের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া ধনী-দরিদ্রের বিরোধে এবং সুধা ও মীর্ণার খাঁটি ও মেকী আন্তর্জাতিকতার সংঘর্ষে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পশুজগৎকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্তরের এই প্রচ্ছন্ন বিমুখতা বিস্ফোরকের ন্যায় সশব্দে ফাটিয়া পড়িয়াছে। 'ভাটতিলক রায়' গল্পটি অপূর্ব মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। পুরাকালের স্মৃতির আধার ভাটতিলক রায় আধুনিকতার এলোমেলো, কেন্দ্রভ্রষ্ট কর্মজটিলতার সম্মুখে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের চারণ আধুনিক যুগে কুলি-ধর্মঘটের প্ররোচকে পর্যবসিত হইয়াছে। যে যুগে রাজপুত্র হরিণীর প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইত, মানুষের আদিম সত্তা সৌন্দর্যবোধের প্রথম পাপড়িতে বিকশিত হইত, ক্ষাত্রশক্তি কুটিল নীতির বর্ম উপেক্ষা করিয়া হেলায় আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিত, তিলক রায় সেই যুগের আবহাওয়ায় মানুষ। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে তাহার অন্তরের সমস্ত কল্পনাপ্রবণতা ও সংস্কার এক অস্পষ্ট সন্দেহে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই দানবীয় যন্ত্রশক্তির সহিত কিছুদিন সহযোগিতার ব্যর্থ চেষ্টার পর সে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—ইহার গভীর-প্রোথিত মূলে ডিনামাইট লাগাইয়া পাথর স্তম্ভের সঙ্গে নিজ জীবনকেও অণুপরমাণুতে উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার যে সাংকেতিক পরিচয় যন্ত্রযুগের আদর্শনিয়ন্ত্রণহীন, মূঢ় প্রচেষ্টার সংস্পর্শে কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু তাহাকে সেই পরিচয়ের অম্লান মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং লেখক

তাহার এই পরিচয়ই গল্পটির শেষে আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'কালাগুরু' গল্পে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদার, ক্ষমাস্নিগ্ধ শাসনপ্রণালী শেষ পর্যন্ত পশুবলপ্রয়োগে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গল্পের এই তথ্যকাঠামোর মধ্যে লেখকের ব্যঞ্জনাশক্তি অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। প্রভাত-ফেরীর গান যেন প্রেত-লোকের শব্দমরীচিকা। ইহার উৎস সিপাহী-বিদ্রোহ-সময়ের এক রক্তাক্ত কিংবদন্তীর শোকাবহ স্মৃতি। টেনব্রুক সাহেব গেজেটিয়ারের বিবৃতি পরিবর্তন করিয়া জাতিবিদ্বেষের এই বিষপ্রস্রবণ রুদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বদলাইয়াছে—উহার শাশ্বত শুভ্রজ্যোতিঃ এক ভীরু, হিংস্র, গোপনসুড়ঙ্গচারী কুটিলতার উচ্ছ্বাসে আবিল হইয়া পড়িয়াছে।

'জতুগৃহ' (১৯৫২) সুবোধ ঘোষের পরবর্তী গল্পসংগ্রহ। ইহাতে লেখকের নূতন নূতন-বিষয়নির্বাচনে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রায় পূর্বের মতই উদাহৃত। 'জতুগৃহ' গল্পটিতে শতদল ও মাধুরীর—এক বিবাহসম্পর্কবিচ্ছিন্ন ও নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ পূর্বদম্পতির—রেলওয়ে স্টেশনের প্রতীক্ষাগারে হঠাৎ দেখা হওয়ায় উভয়ের যে মানস আলোড়ন জাগিয়াছে তাহারই বর্ণনা আছে। উভয়েরই পূর্বস্মৃতি অতীত জীবনের মাধুর্য ও স্বাভাবিকতায় পৌঁছিবার পূর্বে যে লজ্জা, সংকোচ ও অস্বস্তির বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে লেখক বিশেষভাবে সেই মধ্যবর্তী স্তরের সঞ্চারী ভাবসমূহের উপরই জোর দিয়াছেন। গল্পের শেষে মহিলাটির নূতন স্বামী আসিয়া পড়াতে এই ক্ষণিক মোহজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া এক করুণ বঞ্চনাবোধের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। 'কাঞ্চন-সংসর্গাৎ' ও 'দুঃসহধর্মিণী' আধুনিক নরনারীসম্পর্কের নবোদ্ভিন্ন জটিলতার দুইটি দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। প্রথমোক্ত গল্পে হঠাৎ-ধনী অটলনাথ ও তাঁহার সাধু সহযোগী কান্তিকুমার উভয়েই লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য কিন্তু এই শরনিক্ষেপ কান্তি-কুমারের ক্ষেত্রে আরও বিষদিগ্ধ ও মর্মান্তিক হইয়া বিঁধিয়াছে। যেখানে দুর্নীতি ও অপরাধ সুস্পষ্ট বা সামান্য একটু ভণ্ডামির আড়ালে অর্ধসংবৃত, সেখানে আর কৌতুক ও ব্যঙ্গবোধ শাণিত হইয়া উঠিবার অবসর পায় না—অটলনাথের শরক্ষেপজর্জর দেহে আর তীর বিঁধিবার নূতন স্থান নাই। কিন্তু কান্তিকুমার- -শর্করাবাহী বলদ, অসাধু ব্যবসায়ের সাধু সহকর্মী, যে নীতিশাস্ত্রের তুলাদণ্ডে হৃদয়াবেগের পরিমাপ করিতে দৃঢ়সংকল্প, যে অধীর প্রেমকে ধৈর্যের মন্ত্রে শান্ত করিতে চাহে—সেই কান্তিকুমার নিঃসন্দেহে শিকার-যোগ্য নূতন জন্তু। তাহার অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠার সাত্ত্বিক উত্তরীয়ের তলে তাহার পৌরুষ নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ও তাহার নিষ্ক্রিয়ত্বের ফলে তাহার প্রণয়িনী অটলনাথের কাঞ্চন-মূল্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'দুঃসহধর্মিণী'তে স্বামী, স্ত্রীর রূপ, গুণ ও চটুল লীলা-বিলাসের মূল্যে বৈষয়িক উন্নতি খুঁজিয়াছে; শেষে তাহারই নীতির চরম প্রয়োগের উদ্যোগ তাহার মনে এক বিষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার অনুসৃত উপায়ের হেয়তা সম্বন্ধে তাহাকে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে। 'হঠাৎ গোধূলি-লগ্নে' এক তরুণ স্বামীর দাম্পত্য সৌভাগ্য বিষয়ে অত্যধিক আত্মপ্রসাদ ও অশোভন প্রচার এক অবাঞ্ছিত পরিণতির সূচনা করিয়াছে—বন্ধুকে পরিহাস করিবার জন্য সে স্ত্রীকে যে কপট প্রেমনিবেদনের অভিনয়ে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেমন করিয়া যেন আন্তরিকতার সুর লাগিয়া গিয়াছে। 'বারবধূ'

গল্পে সহধর্মিণীর মিথ্যা পরিচয়ের ছদ্মগৌরবমণ্ডিতা বারবনিতা লতা বরাকরের কলোনীর ভদ্রসমাজে মিশিবার প্রয়োজনে কুলবধূর শালীনতার অভিনয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছুদিনের যোগাযোগের ফলে এই অভিনয়ই তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিল; শেষে প্রসাদ যখন আভার প্রতি সদ্যোজাত আকর্ষণে তা|কে জীবন হইতে চিরবিদায়ের প্রস্তাব জানাইল, তখন লতা বিনা অপরাধে প্রত্যাখ্যাতা সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় অভিমান-ভরা খেদোচ্ছ্বাসে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিল। বেশ্যার ইতর প্রতিশোধস্পৃহা, হাটে হাঁড়িভাঙ্গার কদর্য অশালীনতা এক অকস্মাৎ-উদ্বুদ্ধ সম্ভ্রমলোলুপতার যাদুদণ্ডস্পর্শে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

'অলীক' গল্পটির গল্পাংশ কতকগুলি অসম্ভাব্য ঘটনাকে সম্ভবরূপে দেখানোর রূপকথাধর্মী প্রয়াস। কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ হইল অলীকের ফাঁকিপ্রবঞ্চনাভরা জীবনের পাষাণ স্তর হইতে স্নেহমায়ামমতার নির্ঝরোৎসারের চিত্র—আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল মানব-চিত্রাঙ্কনে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ। এই সাংকেতিক নির্দেশই গল্পটিকে বাস্তবের গ্লানি-বীভৎসতা হইতে এক সুকুমারব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপক-রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে গৌণ করিয়া আকাঙ্ক্ষা-লোকের করুণ সুষমা প্রধান হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা মৌলিক পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 'চতুর্ভুজ-ক্লাব' গল্পে। চারিজন কিশোরের সম্মিলিত জীবনযাত্রায় অকস্মাৎ একজনের পরিণীতা নববধূ আসিয়া এক বিপরীত স্রোতের টান সৃষ্টি করিল। প্রথমদিকে পক্ষপাত ও একাধিপত্যের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই—বধূ যেন কৈশোরগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হইয়া খেলাধূলায় একজন নূতন সঙ্গীরূপে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই দৃঢ়বদ্ধ, অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যে স্বত্বপ্রতিষ্ঠার ঈর্ষ্যা ও পরিধিসংকোচজাত বিদারণ-রেখা দেখা দিয়াছে ও এই বিচ্ছেদপ্রবণতার পরিণতিতে বালিকা বধূ স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ও তাহার স্বামিত্বের অংশীদারদের মুখের উপর বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়াছে। আর যেখানে চলে চলুক, দাম্পত্য ব্যাপারে যৌথ কারবার চলে না এই সত্যই গল্পটিতে প্রমাণিত হইয়াছে।

'জতুগৃহ' গল্পসমষ্টির বিষয়বৈচিত্র্য পূর্বোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখকের উদ্ভাবনকৌশল অক্ষুণ্ন থাকিলেও তাঁহার মনীষার প্রখর দীপ্তি ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য যে পুনরাবৃত্তির ফলে খানিকটা নিষ্প্রভ হইয়াছে এইরূপ ধারণাই জন্মে। আঙ্গিকবিন্যাসের দিক দিয়াও পূর্বের শিথিলতা সংহতি-নিবিড়তায় পৌঁছায় নাই। সমাজজীবনে সর্বদা অসাধারণ ব্যতিক্রমকে খুঁজিতে গেলে জীবনবোধের গভীরতা খেয়ালী কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হয়; লেখকের ঘটনাবিন্যাস ও জীবনের তাৎপর্যবিশ্লেষণ সর্বজনস্বীকৃত গভীরতম জীবনসত্যের নির্দেশ দেয় না। ঘটনাবলী লেখকের লঘু-উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাহার মননসূত্রে শিথিল-গ্রথিত হইয়া খানিকটা আল্‌গাভাবেই ঝুলিতে থাকে। শিল্পবোধের চতুর আলিম্পন জীবনরহস্যের স্বতঃস্ফূর্ত রূপরেখাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়—প্রসাধনকৌশল অঙ্গসৌষ্ঠবকে গৌণ পর্যায়ে ফেলে। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের কারুকার্য ও শিল্পসমাবেশের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়াও জীবনধর্মিতার দিক হইতে ইহার প্রতি কিছু সংশয়পোষণের অবসর আছে বলিয়া মনে হয়।

ছোটগল্পের ত্রুটি-উল্লেখের সময় ইহা মনে রাখা উচিত যে, অতি-আধুনিক উপন্যাসে গঠনসুষমার আদর্শ অনুসৃত হইতেছে না। আধুনিক যুগের তথ্যভারাক্রান্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সমস্যাপীড়িত মন উপন্যাসের সীমাহীন আধারে নিজ সমস্ত পুঞ্জীভূত বোঝা উজাড় না করিয়া স্বস্তি পাইতেছে না—এই বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যেই সমাধানের পরশ পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কাজেই আজ উপন্যাস সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরীক্ষিত সত্য ও মানস জিজ্ঞাসা-কৌতূহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিবেশের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া অনুভূত হইতেছে—পটভূমিকার অনির্দেশ্য বিশালতায় ইহার আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষ রূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যদি এই অবান্তর-প্রক্ষেপকে স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া উঠে, অন্ততঃ ছোটগল্পকে এই প্রবণতা হইতে মুক্ত না রাখার কোন সংগত কারণ নাই। উপন্যাসের বিশাল জলাভূমিতে আলেয়ার আলো ইতস্ততঃ জ্বলিয়া উঠুক, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে একটিমাত্র দীপশিখা তাহার স্নিগ্ধ, সংযত রশ্মি বিকিরণ করুক। উপন্যাসের আঙ্গিকের অপরিহার্য শিথিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপ ছোটগল্পের গঠন আরও দৃঢ়সংবদ্ধ ও কেন্দ্রাভিমুখী হওয়া উচিত। ললিত-কলার এই শৈথিল্যকে সর্বত্র অবারিত প্রশ্রয় দিলে মানবের মনীষা দীর্ঘ শতাব্দীর অনুশীলনে অর্জিত একটি বিশিষ্ট সম্পদ, বিদগ্ধ মনের একটি মূল্যবান আভিজাত্য-পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। সুতরাং আশা করা যায় যে, সুবোধ ঘোষের মত একজন শ্রেষ্ঠ ও মননশক্তিসমৃদ্ধ শিল্পী গঠনসৌষ্ঠবের দিকে একটু অবহিত হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনার উৎকর্ষ আরও উন্নত ও অনবদ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন।

'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) সুবোধ ঘোষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তাহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে যে গঠনশৈথিল্য লক্ষিত হইয়াছে, উপন্যাসের বিশালতর পরিধির মধ্যে তাহা প্রচুরতর অবসর পাইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা ও এই সংকটকালে কর্তব্যনির্ধারণে বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশের মধ্যে শিশির ও সিতার পারস্পরিক আকর্ষণের দীপশিখাটি দ্বিধাকম্পিত ও ধূম্রবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবেশরচনার মধ্যে দুইটি স্তর আছে—প্রথমটি, মতবাদের বিতর্কমূলক ও দ্বিতীয়টি, দুর্ভিক্ষের সংস্কৃতিবিধ্বংসী, সভ্যতার মূলোচ্ছেদকারী, নিদারুণ বিশৃঙ্খলার বর্ণনা-বিষয়ক। তর্কবিতর্কে লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও যুক্তিবাদের পরিচয় মেলে—কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিকের উদার অপক্ষপাতের একান্ত অভাব। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মপদ্ধতিকে যে শানিত বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহার সপক্ষে তিনি কোন হেতু দেখান নাই। কাজেই পাঠককে ইহা আপ্তবাক্যের ন্যায় মানিয়া লইতে হয়। সমস্ত আলোচনাটি সাহিত্য অপেক্ষা প্রচারকার্যে সমধর্মী বলিয়া ঠেকে। জাগৃতি সংঘের আদর্শ-অনুসরণ যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ তাহাই ঘোষণা করিবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতাতেই লেখক যেন মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন। সাহিত্যকে সাংবাদিকতার স্তরে নামাইলে উহার যে মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। 'কর্ণফুলির তীরে'

গল্পে অনবদ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি ও দূরপ্রসারী অর্থব্যঞ্জনার সহায়তায় লেখক যে যুদ্ধবিষয়ক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এখানে কি তিনি তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত মতপ্রচারের দ্বারা তাঁহার কংগ্রেস-বিরোধিতা পাপের সাড়ম্বর প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিয়াছেন? মতবাদ ভ্রান্ত কি যথার্থ—সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর না হইলেও গৌণ। এখানে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ভ্রান্ত মতসংশোধনের জন্য লেখক যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন তাহা সার্থক সৌন্দর্যসৃষ্টির কিরণসম্পাতে প্রসন্নতর হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের জয়ঘোষণার মধ্যেও প্রচারকের উচ্চকণ্ঠ অশোভনভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসকর্মী অবনীনাথ, অরুণা, জ্যোৎস্না ও কংগ্রেসমতে নূতন দীক্ষিত ইন্দ্রনাথ—ইহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবন দলগত আবেষ্টন হইতে স্বাতন্ত্র্য-অর্জনে সক্ষম হয় নাই।

দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতার যে চিত্র উপন্যাসে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ আছে। এই মন্বন্তরের ছবি বিভিন্ন ঔপন্যাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আঁকিয়াছেন। কেহ বা ইহার অন্তর্নিহিত করুণ রসটিকে নিঃশেষে ক্ষরিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবার্দ্রতার সনাতন ধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন। কেহ বা ইহাতে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার হীনতা অনুভব করিয়া সংযত-গম্ভীর আবেগের সহিত নিজ ক্ষোভ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ বা সাইরেনের বিপদ-সংকেতের সহিত এই মূঢ়, গ্লানিকর বিশৃঙ্খলাকে সংযুক্ত করিয়া এই সমস্ত দৃশ্যে আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস-মহিমা অনুভব করিয়াছেন। সুবোধ ঘোষ অনেকটা দ্বিতীয় ধারা অনুসরণ করিলেও ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য-প্রবর্তনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এই আশ্রয়চ্যুত, অণু-পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন, সর্বস্বহারা নিরন্নদের অভিযানে এক উৎকট বীভৎসতা ও অসংগতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা, তীব্রশ্লেষাত্মক মন্তব্য ও উপমানির্বাচন সমস্তই ইহার করুণ রসের দিকটা আড়াল করিয়া ইহার শোচনীয় অসামঞ্জস্যের দিকটাই বড় করিয়া তুলিয়াছে। বিপিন, টুনার মা, টুনা ও পুনি কেউটানি সকলে মিলিয়া যে বায়ুবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় একটা প্রেতনৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কারুণ্য অপেক্ষা বীভৎসতাটাই চিত্তকে বেশী অভিভূত করে। শোকের পরিমিত বর্ণনা সমবেদনার উদ্রেক করে; যখন ইহা উৎকট অসামঞ্জস্য ও উন্মাদ বিশৃঙ্খলার রূপ পরিগ্রহ করে, তখন ইহার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর আত্মধিক্কারের জুগুপ্সায়। নরক-যন্ত্রণার দৃশ্য যদি মর্ত্যলোকবাসীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে এক ন্যক্কারজনক অনুভূতির চাপে পিষ্ট হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক সমবেদনা অসাড় হইয়া পড়ে।

এই বিতর্কমূলক ও বর্ণনাত্মক আবেষ্টনের মধ্যে শিশির ও সিতার কাহিনী আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৈশিষ্ট্যে ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের কুশলতায় উপন্যাসোচিত অর্থগৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। শিশিরের স্বদেশপ্রেমের সহিত শিল্পানুরাগ মিশ্রিত হইয়া তাহার মনোভাবকে বৈচিত্র্য দিয়াছে। সে শিল্পসাধনার পথ দিয়া দেশসেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের পরিবর্তন-স্তরগুলির মৌলিক প্রেরণা অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। তাহার সিতার প্রতি আকস্মিক মোহে ও অবনীনাথের প্রতি সহসা-উচ্ছ্বসিত ঈর্ষ্যাবশে কংগ্রেসের আদর্শবর্জন, জাগৃহি সংঘে যোগদান ও সেখানকার কর্মপদ্ধতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পুনরায় পূর্বনীতিতে প্রত্যাবর্তন, তাহার আত্মমর্যাদাবোধের অতর্কিত লোপ ও পুনরাবির্ভাব—এই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরা কেবল

খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসমধ্যে সিতার চরিত্রই সর্বাপেক্ষা জটিল ও সূক্ষ্মভাবে আলোচিত। তাহার মধ্যে প্রেম ও ঐশ্বর্যমোহ এই উভয় বিরোধীভাবের দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে চরম কঠোর সত্য তাহার এক প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী, জয়ন্ত মজুমদারের প্রমুখাৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে—সে নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসে না। প্রেমের সুকুমার অনুভূতি ও আদর্শবাদ, উহার সমস্ত উদার, আত্মবিলোপী হৃদয়াবেগের অন্তরালে সে এক বদ্ধমূল আত্মপ্রীতিকেই পোষণ করিয়া আসিয়াছে।

উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের অভ্যস্ত প্রকাশনৈপুণ্য, ভাষার তীক্ষ্ণ সাংকেতিকতার প্রাচুর্য ও স্থানে স্থানে বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলেও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের নিবিড় সমন্বয় সাধিত হয় নাই। আঙ্গিকের শিথিলতা, ঘটনা-বিন্যাসের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বিভিন্ন অধ্যায়ের বিচ্ছিন্ন রসধারা এক অপরিহার্য ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয় নাই। অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী আবেগ ফুটাইয়া তুলিবার মোহে চিরন্তন রসবিশুদ্ধির দাবী রক্ষিত হয় নাই। ছোট গল্পের ও উপন্যাসের আঙ্গিকের পার্থক্য লেখক এখানে সম্পূর্ণ অধিগত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

'গঙ্গোত্রী' (১৩৫৪) সুবোধবাবুর আর একখানি রাজনৈতিক আন্দোলন-সংক্রান্ত উপন্যাস। কিন্তু এখানে রাজনীতি গৌণ বা পটভূমিকা-রচনার কার্যে নিয়োজিত। আসলে এই রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি গ্রামের জীবনযাত্রায় ও উহার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনে যে তরঙ্গবিক্ষোভ ও হৃদয়াবেগের দ্রুতপরিবর্তনশীল জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে লেখক তাহাই আঁকিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাংকেতিক রীতি ও ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান তির্যক বর্ণনাভঙ্গীর সাহায্যে এই সংঘাতসংকুল চিত্রটিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে এই বিষয়টি এইরূপ আলোচনার উপযোগী নহে। স্পষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ পরিকল্পনা না থাকিলে ও তাহারা পাঠকের আগ্রহপূর্ণ সমবেদনা উদ্রিক্ত না করিতে পারিলে তাহাদের জীবনসমস্যা চিত্রণে এইরূপ ব্যঞ্জনাগর্ভ কাব্যোচ্ছ্বাস অপপ্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। এখানে মান্দারগাঁয়ের আত্মার কথা লেখক পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার সামগ্রিক সত্তার মধ্যে এরূপ কোন সূক্ষ্মচেতনাবিশিষ্ট আত্মা পাঠকের অনুভূতিতে জাগ্রতই হয় নাই। তারপর মাধুরী, বাসন্তী, কেশব, অজয়, সঞ্জীববাবু ও সারদা—ইহাদের জীবনকাহিনী অনাবশ্যক-ভাবে জটিল ও ঘাত-প্রতিঘাতের অহেতুক পৌনঃপুনিকতায় অস্পষ্ট ও আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিহিসাবে ইহাদের কোন পরিচয় না দিয়াই হঠাৎ ইহাদের মধ্যে নানা সম্পর্ক-জটিলতার কল্পনা যেন ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত মায়াবৃক্ষে ফল ধরার মত মনে হয়। বিশেষত মাধুরীর চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা প্রহেলিকার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে—ইহা যে কেবল পাঠকের বোধশক্তিকে প্রতিহত করিয়াছে তাহা নহে, লেখকেরও ইহার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। সে কবে কোন্ অজ্ঞাত অতীতে কেশবকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাই নদীবক্ষে মগ্নশৈলের ন্যায় তাহার সমস্ত জীবনে আবর্ত রচনা করিয়াছে, কিন্তু এই শুষ্ক প্রতিশ্রুতি কেবল তথ্যের কঠিন বাধা ছাড়া হৃদয়াবেগের কোন দুর্বার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও সে পরিতোষকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কেশবের প্রতি

তাহার মনোভাব গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে অস্থিরভাবে ও অকারণে আন্দোলিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অজয়ের অনুমতি অনুরাগের উপর ভিত্তি করিয়া তাহার চিত্ত অজয়ের প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বাসন্তী আবার কেশবের প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণ করে, এবং সে কোন অজ্ঞাত কারণে এক অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধনস্পৃহার বশবর্তী হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে অনুরাগহীন বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। সে মাধুরীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে বিচার করিয়াছে ও কেশবের নিকট হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এমন কি প্রৌঢ় সঞ্জীববাবুও সারদার প্রতি অনুরাগের স্মৃতিকে সম্বল করিয়া মহকুমা সহরে বৈষয়িক জীবন কাটাইয়াছেন—গ্রামে ফিরিয়া সারদার সহিত বোঝাপড়ার পর তাঁহার জীবনে শান্তি আসিয়াছে। সমস্ত উগন্যাস ব্যাপিয়া এই অন্তর-সম্পর্কের জোয়ার ভাটা খেলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনে পাঠকের কিছুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি না করায় ও ইহাদের মানস পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে কোন নির্ভরযোগ্য কারণ না থাকায় ইহাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইয়াছে। বরং ভজু বাউড়ি সমস্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের মধ্যে খানিকটা জীবন্তরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটির মধ্যে রূপক-রীতি ও বিশ্লেষণচাতুর্যের অসার্থক প্রয়োগই উদাহৃত হইয়াছে।

সুবোধ ঘোষের সাংকেতিকতার প্রতি প্রবণতা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাঁহার 'ত্রিযামা' উপন্যাসে। তাঁহার এই রূপকধর্মিতা ইতিপূর্বে উপযুক্ত বিষয় ও পরিকল্পনার গভীরতার অভাবের জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল—ইহার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আলোককণাগুলি সংহত জ্যোতির্মণ্ডলের পরিবর্তে একটা অস্পষ্ট মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ের মতবাদপ্রাধান্য ও বুদ্ধিসর্বস্বতা এইরূপ রহস্যদ্যোতনার পক্ষে ঠিক অনুকূল নহে। 'ত্রিযামা' উপন্যাসে তাঁহার শিল্পীমনের রূপকাকৃতি এক আবেগ গভীর জীবনকাহিনীর সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বচ্ছ আত্মবিকাশের মধ্যে নিজ ভাস্বর প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইয়াছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের বর্ণনাত্মক অভিধানের মধ্যেই এক অন্তর্লোকের ব্যঞ্জনাময় ছায়াপাত হইয়াছে—আনন্দসদনের ছেলে, ফুলবাড়ী ও হ্যাপি স্লকের মেয়ে যেন তাহাদের জীবনের স্থূল ঘটনার চারিদিকে বহিঃপ্রতিবেশ ও অন্তরাত্মার বিস্ফুরিত-আলোকগঠিত এক একটি বিদ্রোহী ভাবপরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। প্রভাত-সন্ধ্যার দৃশ্যপটের মধ্যে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-অংশের মধ্য দিয়া আলো-আঁধারে বোনা, বর্ণপ্লাবনে তরঙ্গায়িত, ইন্দ্রিয়াতিসারী মায়া-আবরণটিই বড হইয়া অনুভূতিগম্য হয়, তেমনি ইহাদের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনোরহস্যের আভাসে, অন্তরোৎক্ষিপ্ত আবেগ ও কল্পনার গাঢ় বর্ণপ্রলেপে, গভীরশায়ী আত্মার অতর্কিত আত্মোদ্ঘাটনের দীপ্তিতে এক নিগূঢ় প্রাণলীলার দ্যোতনা-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ঘটনা রূপক-রসে জারিত হইয়া, অন্তরসত্যের স্বচ্ছতায় অবগাহন করিয়া একটি সূক্ষ্ম ভাবলোকের স্পন্দনে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

কুশল, নবলা ও স্বরূপার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত, মানসলোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উহাদের সুনির্দিষ্ট রূপ ও মনস্তাত্ত্বিক যাথার্থ্য না হারাইয়া সমগ্র পরিবেশব্যাপ্ত বিস্তার ও ব্যক্তিসত্তার গহনলোকনিহিত গভীরতা অর্জন করিয়াছে। স্বরূপার দীর্ঘদিনব্যাপী নীরব প্রতীক্ষা ও বাহ্যবিক্ষেপহীন আকুলতা তাহার জীবনসংগ্রামদীর্ণ, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসানো,

রুক্ষ জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের ছন্দে নিয়মিত। নবলার ভোগৈশ্বর্যপুষ্ট, নীতিজ্ঞানবর্জিত, সংসারের অবিমিশ্র সুবিধাবাদের আরামশয়নে সুখসুপ্ত ও মাতৃশাসনের প্রখরতায় আত্মপরিচয়হীন, পরমুখাপেক্ষিতায় লালিত জীবনে ভালবাসা আসিয়াছে এক অশ্রান্ত গতিবেগ ও মুহুর্মুহুঃ খেয়ালী পরিবর্তনশীলতার অশান্ত ছন্দে। তাহার মাতৃশাসিত অপরিণত জীবনে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কোনও দিন স্ফুরিত হয় নাই; কাজেই আত্মপরিচয়ের অভাবে সে ভালবাসার স্বরূপেরও সত্য পরিচয় লাভ করে নাই। দেবী রায়ের সহিত তাহার প্রেম ছেলেমানুষী দৌড়ঝাঁপ, অবিরত ছুটিয়া চলার উত্তেজনার পর্যায় অতিক্রম করে নাই—আপনাকে-না-জানা কামনার প্রতীক, টু-সিটার কারটি তাহাদের মৃগতৃষ্ণাতাড়িত পারস্পরিক আকর্ষণের একাধারে বাহিরের আশ্রয় ও অন্তরের সার্থক প্রতিরূপ। কুশলকে সে ঠিক প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহাকে ভুলিয়া প্রবলতর শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে মাত্র। মাতার প্রকৃতির পরিচয়লাভের বিভ্রান্তকারী অভিজ্ঞতার পর একবার মাত্র তাহার ব্যক্তিত্ব ক্ষণিকের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—কুশলের নিকট লিখিত পত্রে পথনির্দেশলাভের জন্য ব্যগ্রতা তাহার সমস্যাপীড়িত মনের এই ক্ষণিক সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু মাতার কঠিন আদেশ ও নিঃসংকোচ লালসা আবার তাহার ক্ষণোত্থিত ব্যক্তিসত্তাকে সম্মোহিত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে বিনা প্রতিবাদে দেবী রায়ের সহিত সম্পূর্ণ হৃদয়াবেগহীন, যান্ত্রিক বিবাহসম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইল। দেবী রায়ের তথ্যোদ্‌ঘাটনের ফলে সে বিশেষ বিচলিত হয় নাই—তাহার জীবনে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব আর কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে না। সে যেন এক মুহূর্তে কৈশোরের বিলাসস্বপ্নবিভোরতা হইতে প্রৌঢ়ত্বের রসলেশহীন, নির্বিকার মোহভঙ্গের পর্যায়ে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে—এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যৌবন তাহার জীবন হইতে চিরনির্বাসিতই রহিয়া গেল।

দেবী রায়, মৃগেনবাবু ও নন্দা দেবী সকলেই প্রতীকধর্মীরূপে চিত্রিত। তাহারা এক একটি প্রবৃত্তিরই রূপকোর্ধ্বায়ণের নিদর্শন, সম্পূর্ণরূপে জটিলতা-ও-অন্তর্দ্বন্দ্ববর্জিত। মৃগেনবাবুর মনে দাম্পত্য অধিকারলাভের স্পৃহা বা ঈর্ষা কোনদিনই জাগে না—তাঁহার সমস্ত জীবন স্ত্রীর ইচ্ছানুবর্তনে আত্মনিয়োজিত; এই আত্মনিরোধের ফলে মাঝে মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রান্তি ও অবসাদ তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে কোন বিদ্রোহপ্রবণতা ভস্মাচ্ছাদনের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করে নাই।

দেবী রায়ও এক সরলরেখায় জীবনকে ছুটাইয়া দিয়াছে। মেয়ে হইতে মায়ে প্রণয়পাত্রীর পরিবর্তন তাহার এই ঋজু, বেগবান জীবনধারায় বিন্দুমাত্র যাত্রাবিরতি বা আবর্তবিক্ষোভের সৃষ্টি করে নাই। এই একরোখা জীবনগুলিই সাংকেতিকতার ক্যামেরায় ধরিয়া রাখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বসংকুল, বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রসারিত জীবনকাহিনীর মধ্যে সার্বভৌম ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে; কিন্তু রূপকদ্যোতনার ছোট আয়নার মধ্যে এইরূপ জীবন প্রতিবিম্বিত করা যায় না। কাজেই দেবী রায় তাহার টু-সিটার কারের মত সর্বদাই সামনের দিকে ছুটিয়া চলে। কুশলের সহিত সংগ্রামে তাহার ধূর্ততার দিক খানিকটা অভিব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর চরিত্রের সরলরেখাঙ্কিত সুবোধ্যতাই উহার আসল পরিচয়।

নন্দা দেবীর মধ্যে যে অসাধারণ জটিলতার সম্ভাবনা দেখা যায়, লেখকের রূপকবিলাসের

ফলে তাহা একটি অস্পষ্ট দ্যোতনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, নীতিজ্ঞানের একান্ত অভাব, দুর্নিবার লালসা ও পারিবারিক শুচিতা ও শালীনতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বে-পরোয়া অবজ্ঞা—এত বড় একটা বিরাট, অসামাজিক ব্যক্তিত্ব রূপকের ঠুনকো রঙীন কাচাধারে রক্ষিত হওয়ার মত নহে। হ্যাপি নুক ও শুকতারার গৃহসজ্জার আড়ম্বরে ও চায়ের টেবিলে প্রসাধনের সৌখীন দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে লঘু পাদক্ষেপে ও নূতন মোটর গাড়ীর স্ফীত গৌরবে একটা ছোট সহরের পথে ঐশ্বর্যদীপ্ত যাতায়াতে, স্বামী ও কন্যার প্রতি মৃদু তর্জন-তিরস্কারে এ হেন সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ গভীর ও তরঙ্গোচ্ছ্বাসক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শন করিতে গেলে সাংকেতিকতার ভারসাম্যগত সামঞ্জস্য বিধ্বস্ত হয়। কাজেই স্বভাব-হিংস্রা ব্যাঘ্রীকে দেখান হইয়াছে বিলাসিনী, প্রভুত্বপ্রিয়া নারীর নিরীহ রূপে। বাস্তবের মসৃণ, ভাবসুষমার সীমাবদ্ধ সংস্করণই রূপকের সুকুমার, পরোক্ষ আভাস-ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে।

কুশলের চরিত্রের পরিবর্তন আসিয়াছে দুঃখময় অভিজ্ঞতা, তাহার পিতার আদর্শ-প্রভাব, প্রাচীন মূর্তির প্রতি তাহার শিল্পী-মনের অনুরাগ ও পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধার ও তাৎপর্য-বিশ্লেষণের প্রতি তাহার আন্তরিক নিষ্ঠার ভিতর দিয়া। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির রূপক-গৌরবের মূল উৎস হইতেছে এই অপরূপ দেহসৌষ্ঠব ও আত্মিকমহিমাসমন্বিত শিলামূর্তি-সমূহ ও তাহাদের আশ্রয়স্থল হরভবন। ইহারাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রভাব—উহার মানব চরিত্রগুলি এই আদর্শ রূপলোকের ছায়াতলে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে। কুশলের ব্যক্তিগত জীবন ও সাংস্কৃতিক অনুশীলননিষ্ঠা পরম্পরের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার অলস, আত্মকেন্দ্রিক, সাংসারিক-উন্নতিকামী মন এই অতীত যুগের ধ্যানসমাহিত, অতীন্দ্রিয় প্রেরণায় প্রাণময়, প্রশান্ত জীবনায়নের সংস্পর্শে আসিয়াই আদর্শে স্থির ও সংকল্পে অটুট হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপলোকের আলোকে সে আপন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে—ফুলবাড়ীর মেয়ের স্নিগ্ধ মহিমা ও শুকতারার মেয়ের অস্থির আত্মরতির পার্থক্য বুঝিয়াছে। গঙ্গাধরের আশ্রয়প্রার্থিনী গঙ্গামূর্তির কল্লোলিত প্রশান্তি তাহার জীবনকে এক স্নিগ্ধ প্রত্যাশায় ও পরিপূরক শক্তির আজীবন অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাহার জীবনসমস্যার সহিত এই কলাবিচারের সমস্যা অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। অতীত ভারতের সাধনার নিদর্শনরূপ এই শিলামূর্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটন তাহার নিজের জীবনের পথসন্ধানের সহিত সমার্থবাচক হইয়াছে। স্বরূপার সহিত তাহার মিলন-সম্ভাবনা যখনই উজ্জ্বল হইয়াছে, তখনই এই মূক মৌন সৌন্দর্যলোকের চাবি-কাঠি সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। যখনই সংশয়-সন্দেহ তাহার মনে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে তখনই সে এই রূপতত্ত্বের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছে ও এই ভগ্ন ও বিকলাঙ্গ মূর্তিস্তূপ তাহার নিকট মরীচিকার আলেয়া জ্বালিয়াছে। শেষ অধ্যায়ে মিলনের সার্থকতায় সে এই গোধূলিছায়াচ্ছন্ন শিল্পসৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। স্বরূপার সহিত তাহার সম্বন্ধের দ্রুতপরিবর্তন-[illegible]লি যেমন মনস্তত্ত্বে তেমনি রূপকসঙ্গতির দিক দিয়া অনবদ্য হইয়াছে।

[illegible]ভিলাপায় প্রকৃতি সিদ্ধির মুহূর্তে এক দুর্নিরীক্ষ্য

সংকোচের ব্যবধান অনুভব করিয়া পিছাইয়া আসিয়াছে ; আবার নবলার আমন্ত্রণ উভয়ের মনেই বিপরীত তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মিলন-মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করিয়াছে। এমন কি নবলার বিবাহের পর যখন সমস্ত বাহিরের বাধা কাটিয়া গিয়াছে, তখন কুশলের মন অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, সে নবলার প্রতি উদাসীন নহে ও স্বরূপাকে অনন্যনিষ্ঠ চিত্তসমর্পণের অধিকার তাহার নাই। শেষ পর্যন্ত আত্ম-অবিশ্বাস স্থির প্রত্যয়ের মধ্যে বিলীন হইয়াছে ও গঙ্গাধর-প্রত্যাশিনী গঙ্গার মূর্তির মধ্যে সংশয়হীন এক নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষার স্থির জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে এই রূপকব্যঞ্জনার বহিরাবরণভেদী আলোক কুশল হস্তে, অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। শুধু চরিত্র-পরিকল্পনায় ও বিশ্লেষণে নহে, সাধারণ বর্ণনা ও আখ্যানের মধ্যেও এই তির্যক-প্রসারী ব্যঞ্জন-রশ্মির কম্পন অনুভব করা যায়। ত্রিযামা রজনীর নানা বিভীষিকাময় অন্ধকার প্রহরের আবর্তনের পরে উষার নির্মল জ্যোতির উদ্ভাসন, নীলকণ্ঠ পাখীর নীড়-হইতে-বাহিরে-আসা, প্রভাত-আলোক-প্রত্যুদ্গামী গীত সবই এই রূপকের রেশটি বহন করিয়া আনিয়াছে। মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নিপুণ প্রয়োগ, আখ্যান-বস্তুর কুশল সন্নিবেশ ও সর্বোপরি ব্যঞ্জনাবিন্যাসের সার্থক পরিবেশনে এক অপরূপ ভাবসঙ্গতিপূর্ণ আবহ-সৃষ্টিতে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রূপে গণ্য হইতে পারে।

'শ্রেয়সী' (আগষ্ট, ১৯৫৭) উপন্যাসটিতে এক অন্তিম অবক্ষয়ের সম্মুখীন অভিজাত পরিবারের দারিদ্র্যজীর্ণ, মলিন ও চক্রান্ত-কুটিল জীবনযাত্রার প্রতিবেশে কয়েকটি জীবনের উদ্দামখেয়ালতাড়িত, উৎকেন্দ্রিক আচরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রসিকপুর রাজবাড়ির ক্ষয়ক্ষীণ, ইতর ফাঁকিবাজি ও করুণ আত্মপ্রতারণার যুগ্ম সম্মোহে অন্ধ, ভবিষ্যতের আশা সন্তান-সন্ততির দ্বারাও প্রবঞ্চিত এক বৃদ্ধ দম্পতি—কমল বিশ্বাস ও সুধামুখী—জীর্ণ অসহায়তার নিম্নতম ধাপে নামিয়া নিঃশব্দে শেষ প্রয়াণের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের সমস্ত সংলাপ, আচরণ ও পারিবারিক সম্পর্কের এক সার্বিক শূন্যতাবোধের গহ্বর নৈরাশ্য-নিঃশ্বাস-ক্ষুব্ধ প্রেত-প্রতিধ্বনিতে কুহরিত। মরা ডালের ভিতরে চৈত্রবায়ুর উদাস হাহাকারের ছন্দে তাহাদের সব আলাপ-ভাববিনিময়, জীবনচর্যার সমস্ত ক্ষীণ প্রয়াস যেন সুর মিলাইয়াছে।

জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, অবসন্ন এই দম্পতি নিবিবার আগে পারিবারিক কর্তব্যপালনের শেষ শিখায় মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফাঁকি দিয়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়াছে। মেয়ে বাসনার বিবাহের খরচ যোগাইতে পুত্র অতীনের এক কুরূপা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে। এই পুত্রবধূ কেতকীই কিন্তু ভাগ্যের *অলক্ষ্য দাক্ষিণ্যে হার পাশার দান হইতে অভাবনীয় জয়ের ঘুঁটিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।* স্বামী-প্রত্যাখ্যাতা এই তরুণী বধূ অসাধারণ চরিত্রগৌরবে নিজ দুর্ভাগ্যকে জয় করিয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া এই মগ্নপ্রায় সংসার-তরীকে নিরাপদ বন্দরের দিকে চালনা করিয়াছে। অনাসক্ত, যৌবনাবেশবিভোর স্বামী নিজ পৌরুষগর্বের রূঢ় প্রয়োগে কেতকীর নারীত্বের চরম অবমাননা করিয়াছে—তাহার উপর অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কলঙ্ক-বোঝা চাপাইয়াছে। তাহার পরেই তাহার নিকট বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন লিখাইয়া লইয়া উহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের চির অবসান ঘটাইয়াছে।

কেতকী-চরিত্রের অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন ও অভূতপূর্ব আদর্শনিষ্ঠা কেবল রসিকপুর রাজবাড়ির শূন্যময়, জীবনবৃন্তের শেষ প্রান্তে শিথিল-সংলগ্ন ভাব-পটভূমিকাতেই সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে। যেখানে একদিকে ভাগ্যের চরম বঞ্চনা, সেইখানেই আর একদিকে উহার পরম দানশীলতা ভারসাম্য রক্ষার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কেতকীকে অন্য কোথায়ও সরাইলে তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে না। সেইজন্য তাহার সঙ্গে নির্মলের প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহ আমাদের মনে কোন রেখাপাত করে না।

রসিকপুরের রাজবাড়ি ও উহার চক্রান্তজালের মাঝখানে বন্দী এক জীর্ণপঞ্জর, রক্তহীন, শূন্যতাগ্রস্ত বৃদ্ধ দম্পতিই উপন্যাসের রসকেন্দ্র। অন্যান্য চরিত্র কম বেশী আলঙ্কারিক সংযোজনা। কাজরী উপন্যাসমধ্যে দীর্ঘ স্থান ও প্রধান ভূমিকা অধিকার করিয়াছে, কিন্তু অতীনের সঙ্গে তাহার প্রেম, বিবাহ ও বিচ্ছেদ যেন একটা রক্তমাংসসংস্রবহীন রূপকছায়া মাত্র মনে হয়। অতীনের মোহ ও বিরাগ ও প্রণয়ের অভিনয়কারী মুগ্ধ বন্ধুমণ্ডলীর উচ্ছ্বাসস্ফীত প্রশস্তির অতিরিক্ত তাহার আর কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নাই। তাহার আলিঙ্গন যেমন অবাস্তব, তাহার প্রত্যাখ্যানও তেমনি আঘাতহীন। তাহার শেষ পরিণতিও কুহেলি-রাজ্যের অনিশ্চয়তায়, ছায়া-জগতের অপরিস্ফুটতায়। একটা সুন্দর বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া গেলে যতটা কষ্ট হয়, কাজরীর জীবনের ব্যর্থতায় তাহার বেশী বেদনা অনুভূত হয় না।

অতীনের সহিত বিজয়ার বিবাহও তেমনি অকারণ ও খেয়াল-প্রসূত ঠেকে—অতীনের খানিকটা বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্বের সঙ্গে বিজয়া যেন সঞ্চরণশীল ছায়ার ন্যায় মিশিয়াছে। কেতকীর ছেলেও যেন রূপকসর্বস্ব; সে রূপকথার ছেলের চেয়েও বেশীমাত্রায় অতনু। তাহার অস্তিত্বের একমাত্র তাৎপর্য বুড়া-বুড়ীর জীবনে খানিকটা বাঁচার প্রেরণা সঞ্চার ও তাহার মায়ের প্রেমিককে আবিষ্কার ও আকর্ষণ করা। কথা-সাহিত্যে কোন শিশু এরূপ আরোপিত জীবনাভাসের পেঁচোয়-পাওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় নাই।

দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখক দুইটি নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। যে স্ত্রীর সন্তানের ভার লইতে পারে সেই স্বামী আর যে স্বামীকে সন্তান উপহার দিতে পারে, সেই স্ত্রী। এই সংজ্ঞার সার্বভৌম প্রয়োগের যৌক্তিকতা যাহাই হউক, উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাপরিবেশে উহার বিশেষ উপযোগিতা আছে।

'শতকিয়া' (আগষ্ট, ১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের আর একটি শক্তিশালী উপন্যাস। ইহাতে মানভূম-অঞ্চলের আদিমসংস্কারপ্রধান জীবনযাত্রার সহিত উহার প্রকৃতিপরিবেশের এক আশ্চর্য অন্তঃসঙ্গতি ও একাত্মতা রূপ পাইয়াছে; দাশু ঘরামী ও সকালীর জীবনে এই আরণ্য-প্রকৃতি উহার নদী, পাহাড়, জঙ্গল, এমন কি হিংস্র জন্তু সমেত যেন নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ ও বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসটির সংলাপে ও চরিত্রদের জীবন-আলোচনায় এই অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর বাগ্‌রীতি উহার চিত্রলতা ও ব্যঞ্জনাধর্ম লইয়া চমৎকারভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ভাষা যেন উহার অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সহজ কবিত্বময় অনুভূতি ও রসোচ্ছল জীবনবোধের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। ইহাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে অসংস্কৃত যৌন আকাঙ্ক্ষা ও সন্তান-কামনাই প্রধান উপাদান। ইহার মধ্যে কোন তত্ত্ব নাই, আছে সুস্থ, ইন্দ্রিয়নির্ভর জীবনবোধের রস-নির্যাস।

এই সরল মাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবনের বিরুদ্ধে যন্ত্র-সভ্যতা ও খৃষ্টান বিজাতীয় আদর্শের যে অভিভব তাহাই বিভিন্ন নর নারীর জীবনসংঘাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন জীবনযাত্রা-অনুসারী দাশু, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত পলুশ ও ডাক্তার রিচার্ডের সহিত মুরলীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ঔদাসীন্যের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সমস্তই একই ঐতিহ্য-সংঘর্ষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। উহার মূল ব্যক্তিজীবন ছাড়াইয়া গোষ্ঠীচেতনার নিগূঢ় প্রভাবের মধ্যে প্রসারিত। আবার সকালী ধর্মান্তরিত, গোষ্ঠী-সংস্কৃতি-ত্যাগী পলুশকে অন্তরাত্মার সমস্ত বিমুখতার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ভিক্ষুক, কিন্তু স্বধর্মনিষ্ঠ দাশুকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিতে উন্মুখ। এইরূপ যুক্তিতর্কাতীত, বদ্ধমূল-সংস্কারপ্রভাবিত অনুরাগ-বিরাগের দুর্বার স্রোতোধারা রুক্ষ, কঙ্করময় প্রস্তরভূমির উপর আরণ্য-নদীর ন্যায় ইহাদের জীবনভূমির উপর প্রবাহিত হইয়াছে। উপন্যাসের প্রায় সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই ব্যক্তিসত্তার সহিত একটা সুদূর অতীত-সংস্কৃতিজাত, প্রতিনিধিত্বমূলক সত্তা গোপন-সঞ্চারী প্রভাবে মিলিত হইয়াছে।

দাশুর ভূতপূর্ব স্ত্রী মুরলীর জীবনে এই সংঘাতের সমস্ত স্তরগুলি সুস্পষ্ট, গভীর রেখায় ফুটিয়াছে। দাশুর পাঁচবৎসরব্যাপী জেল-খাটার সময় সে নেহাৎ বাঁচিবার দায়েই খৃষ্টান সভ্যতা ও উন্নত জীবনমানের প্রতীক সিষ্টার দিদির হিতৈষণার ফাঁদে ধরা দিয়াছে; এই প্রভাবে তাহার একটি রুচিগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হইয়াছে। দাশু ঘরে ফিরিলে তাহার দেহের প্রতি রক্তকণা, তাহার অন্তরের গভীরশায়ী সন্তান-কামনা দাশুর সহিত যৌন মিলনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার সচেতন চিন্তা, তাহার পালিশ-করা জীবনের প্রতি নবজাত আকর্ষণ তাহার মনে দাশুর প্রতি প্রবল বিরোধিতা জাগাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত দাশুর পরিবার-পোষণে অক্ষমতা ও প্রাচীন সংস্কারনিষ্ঠা মুরলীকে বিবাহবন্ধনছেদনে বাধ্য করিয়াছে। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত পলুশ উহার বাহ্য চাকচিক্য ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে মুরলীকে বাহ্যত আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু উহার সংস্কারপুষ্ট মন এই মিলনকে কোন দিনই প্রসন্ন স্বীকৃতি দেয় নাই। আবার পলুশকে ছাড়িয়া ভদ্র জীবনযাত্রার আরও উন্নততর শাখায় নীড় বাঁধিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুরলীকে ডাক্তার রিচার্ড সরকারের সহধর্মিণী হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছে এবং সে অনেকদিন ধরিয়া এই রুচিবান সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবার সাধনা করিয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর তাহার স্বামীর ক্লীবত্বের আবিষ্কার তাহার উপর রূঢ় আঘাত হানিয়া তাহার মনে সমস্ত জীবনানন্দের প্রতি একটা ঔদাসীন্য জাগাইয়াছে। তাহার বাকী জীবনটা সে কাচের আলমারিতে রাখা কৃত্রিম ফলের মতই কাটাইয়াছে। সে অন্তরের দারুণ শূন্যতাকে বাহ্য সম্ভ্রম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার রঙীন আবরণে ঢাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ আদিম সংস্কারে লালিত, সমস্ত মৃত্তিকা-পরিবেশের সহিত একটি সহজ আনন্দময় সম্পর্কে জড়িত, ফুলের ন্যায় বিকশিত একটি রসোজ্জ্বল জীবন পরধর্মের মরীচিকাময় আকর্ষণে, কৃত্রিম জীবনাদর্শের বিকৃত প্রভাবে অকালে শুকাইয়া গেল।

এই উপন্যাসে লেখকের পূর্ব-উপন্যাসে অনুসৃত সাঙ্কেতিকতার আরও সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে। 'ত্রিযামা'-য় এই রূপক চরিত্রাবলীর মনোভাবপ্রকাশ ও ঘটনার তাৎপর্যনির্দেশের একটা সাহিত্যিক রীতি মাত্র। ইহার সহিত তুলনায় 'শতকিয়া'-য় রূপকপ্রয়োগ আরও

উন্নততর কলারীতির নিদর্শন—ইহা সমস্ত পাত্র-পাত্রীরই স্বরূপদ্যোতনা ও প্রকৃতির নিগূঢ় পরিচয়। 'শতকিয়া' সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'চুয়াচন্দন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪২), 'বিষের ধোঁয়া' (ভাদ্র, ১৩৫১, ২য় সং), 'ছায়া-পথিক' (আশ্বিন, ১৩৫৬), 'কানু কহে রাই' (বৈশাখ, ১৩৬১), 'জাতিস্মর' (৭ই আষাঢ়, ১৩৬৩)।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস ও ছোটগল্পসংগ্রহ উভয়বিধ রচনারই প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি সুলিখিত, উহাদের আখ্যানভাগ সুসংবদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার রচনারীতি সুমিত বাক্যপ্রয়োগ, ভাবগ্রন্থন ও মন্তব্য-সংযোজনা প্রভৃতি গুণে সুখপাঠ্য ও পাঠকের রসবোধের তৃপ্তিবিধায়ক। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন-পরিচয়ের বিশেষ নিদর্শন মিলে না। 'বিষের ধোঁয়া'-তে একটি ঈর্ষ্যা-বিমিশ্রিত কিন্তু পরিণাম-রমণীয় প্রেম কাহিনীর মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। অবশ্য বিধবা বন্ধু-পত্নী বিমলা ও তরুণ যুবক কিশোরের মধ্যে সম্বন্ধটি একটি ঊর্ধ্বায়িত, সর্বকলুষমুক্ত আদর্শের নিরাপদ সীমাতে রক্ষিত হইয়াছে—ইহার বিষয়ে লেখক কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। অগ্নিকে শীতল রাখার অলৌকিক রহস্যের উপর লেখক কোন আলোক-পাত করেন নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলি সাধারণ স্তরের—উহাদের ব্যক্তিসত্তা অপরিস্ফুট ও অন্তঃপ্রকৃতির জটিলতাও অনুপস্থিত। ঘটনাপ্রবাহই চরিত্রসমূহের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী শক্তি। 'ছায়া-পথিক'-এ ছায়াচিত্রজগতের কিছু মনোজ্ঞ কাহিনী, কিছু ব্যবসায়গত গোপন তথ্য আমাদের নূতনত্বের আস্বাদ দেয়। এখানেও চরিত্রের বিশেষ কোন জটিলতা নাই। তবে রত্নার আত্মনিরোধ ও মনোভাবকে চাপিয়া রাখার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কিছুটা দ্বন্দ্বাভাসের সৃষ্টি করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মধুর মিলনে গল্পের পরিসমাপ্তি। আধুনিক জগতেও রূপকথার যুগ অতিক্রান্ত হয় নাই উপন্যাসটিতে সেই বিশ্বাসেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

'কানু কহে রাই' গল্পসংগ্রহের ছোটগল্পগুলির অনেকগুলি ঘরোয়া কাহিনী-অবলম্বনে লেখা। উহাদের মধ্যে 'কানু কহে রাই', 'ভক্তিভাজন' ও 'গ্রন্থি-রহস্য' লেখকের সরস ও পরিহাসস্বাদু দৃষ্টিভঙ্গীর দৃষ্টান্ত। ভৌতিক কাহিনীর মধ্যে 'নিরুত্তর'-এ অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত আছে, সমাধান নাই। আর 'ভূত-ভবিষ্যৎ' গল্পে নিতান্ত ঘরোয়া ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। উপন্যাস লিখিয়া দেনা শোধ করিতে দৃঢ়সংকল্প, নির্জন প্রবাসে আত্মগোপনকারী লেখকের নিকট ভূত সঙ্গ ও গুপ্ত-ধনের সন্ধান উভয়ই দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ভূত বিবাহের ঘটকালির পরোক্ষ উপায়-স্বরূপ হইয়া লেখকের নিঃসঙ্গতা ও জীবনে পরাজয়বোধের স্থায়ী প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিয়াছে। ভৌতিক আবির্ভাব-বর্ণনায় লেখক যেমন কোন বিশেষ কলাকৌশল দেখান নাই, তেমনি বিশেষ ভ্রম প্রমাদও করেন নাই। এই জাতীয় ভূতকে আমরা বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না, সহজেই মানিয়া লই।

শরদিন্দুবাবুর প্রধান কৃতিত্ব অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগে। বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-যুগের সমাজবিন্যাস ও জীবনছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা বিশেষ সচেতন ও গঠনশিল্পনিপুণ। তাঁহার 'চুয়াচন্দন' গল্পসংগ্রহে নাম-

গল্পটি চৈতন্য-যুগের স্মারক। ইহার ঘটনার মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নাই, কিন্তু অন্তরঙ্গ মর্মজ্ঞতারও কোন প্রত্যয়াভিজ্ঞানসূচক লক্ষণও নাই। ইহা যে-কোন অতীত যুগে ঘটিতে পারিত—যুগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ চৈতন্যদেবও এখানেও এক অজানা, অনুমান-সিদ্ধ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার 'রক্ত-সন্ধ্যা' গল্পটি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রথম সংঘর্ষের একটা অতি-উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয়, তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্বে ভাবঘন রেখাচিত্র। লেখক সেই সুদূর অতীতের বাহিরের রূপসজ্জা ভেদ করিয়া উহার অন্তঃপ্রকৃতির গভীরতায় অবতরণ করিয়াছেন ও আমাদিগকে সেই রক্তাপ্লুত, ঈর্ষ্যান্বিত যুগের হৃৎস্পন্দনটি শোনাইয়াছেন। অতীত যুগের কথা বলিতে গিয়া লেখক এক অত্যন্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন—উহাকে বর্তমান প্রতিবেশের কাঠামোতে অনুপ্রবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই গল্পে ও তাঁহার 'জাতিস্মর' গ্রন্থের গল্পগুলিতে এই ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ইহাতে আখ্যায়িকার আবেদন বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না; বরং এক অলৌকিক বিশ্বাসের পূর্ব-স্বীকৃতি ইহাদের বাস্তবতার প্রতি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ও পরিহার্য সংশয়ের উদ্রেক করিয়াছে। ঘটনাগুলি যে বক্তা বা পাত্র-পাত্রীর পূর্বজন্মের স্মৃতির সহিত জড়িত এই স্বীকৃতির যথার্থ সার্থকতা হইত, যদি ঘটনা-বিবৃতির সঙ্গে বর্তমানের মানস প্রতিক্রিয়াটিও সংযুক্ত হইত। কিন্তু লেখক ইহাদিগকে সেই দ্বিকোটিক মনস্তত্ত্বের বিষয়ীভূত করেন নাই।

'জাতিস্মর'-এ গল্পগুলি হিন্দু-ও-বৌদ্ধযুগ-সম্বন্ধীয়। প্রথম গল্পটির রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা ও সামরিক কূটনীতি অমিতাভ বুদ্ধের অতর্কিত আবির্ভাবে আকস্মিক পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে—বুদ্ধের স্পর্শ এই মায়া-প্রাসাদকে যেন মন্ত্রবলে উড়াইয়া দিয়াছে। আমরা যে নাটকীয় পরিণতির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এক মুহূর্তে মিথ্যা হইয়া গিয়া সমস্ত গল্পের শিল্পরসটিকেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'মৃৎপ্রদীপ' 'জাতিস্মর'-এর শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহাতে গুপ্ত যুগের রাজ্যশাসনব্যবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গুপ্তচরবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, কামকেলি ও ধর্মবিরোধের সূক্ষ্মশিল্পমণ্ডিত চিত্র পাই। সর্বোপরি এখানে মানব-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল, বিপরীত-উপাদান-গঠিত চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা—আধুনিক উপন্যাসে সুপরিচিত সতী বারবনিতার—সাক্ষাৎ লাভ করি। 'রুমাহরণ' গল্পটি প্রাগৈতিহাসিক বর্বর মানব-গোষ্ঠীর কাহিনী—ইহার প্রতিবেশ যত সুন্দর, মানবিক পাত্র-পাত্রী সেরূপ নহে। ইহার মধ্যে ইতিহাস-কল্পনা অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্বেরই প্রাধান্য। 'চুয়াচন্দন'-এ যে কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্প আছে সেগুলিতে সূক্ষ্ম ভৌতিক অনুভূতি খুব বেশী না থাকিলেও মোটামুটি আমাদের স্বীকৃতি লাভ করে। 'কর্তার কীর্তি' গল্পটি পরিবারজীবনের এক অতিপরিচিত অধ্যায়ের পরিহাসকুশল ও রসোজ্জ্বল পুনরাবৃত্তি। শরদিন্দুবাবুর রচনাবৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহার স্থান রোমান্টিক ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর সমশ্রেণীতে।

'মায়াকুরঙ্গী' (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫) গল্প-সংগ্রহ প্রায় সব কটিই ভৌতিক কাহিনীর সমষ্টি। ইহাতে লেখকের ভূত-কল্পনা একেবারে উদ্দাম ও সর্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়াছে। সাধারণতঃ জন্মান্তরীণ স্মৃতিপথ বাহিয়াই এই অতিপ্রাকৃত আবির্ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অজন্তাগুহার এক ভিক্ষু শিল্পী সিদ্ধার্থ ও গোপার চিত্র আঁকিতে গিয়া রাণী কুরঙ্গিকার প্রতি তাহার অনুরাগ-রক্তিম মনোভাব গোপার চিত্র-মধ্যে অজ্ঞাতসারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শিল্পীর এই কামনাকলুষস্পৃষ্ট সম্মোহ রাজার চোখে ধরা পড়িয়াছে। তিনি ভিক্ষুকে

রাজসভায় ফিরিবার উপদেশ দেওয়াতে অনুতাপবিদ্ধ ভিক্ষু আত্মহত্যা করিয়াছে। গল্পটি পরিবেশচিত্রণে, ভাবসন্নিবেশ ও মনস্তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে অনবদ্য। কিন্তু ভূতাবিষ্ট লেখক ইহার সহিত জংলী-বাবার সংযোগ ঘটাইয়া ও সমস্ত ঘটনাকে পূর্বজন্মস্মৃতি-উদ্দীপনের পটভূমিকায় বিন্যস্ত করিয়া গল্পটিকে সুষম হইতে আজগুবি শিল্পে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পুণার গণপতি-মন্দিরে চিরঞ্জীব বা বিরিঞ্চি বর্মা প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া একই প্রতিহিংসার সূত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে ও লেখকের নিকট বিনা ভূমিকায় ও অকারণে এই গোপন তত্ত্ব ফাঁস করিয়াছে। মধু-মালতী—দুই মহারাষ্ট্রীয় তরুণ-তরুণী—তাহাদের আত্ম-হত্যার পরেও সাইকেল চাপার অভ্যাসটি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে ও প্রতি রাত্রিতেই তাহাদের বিদেহী আত্মা এই যন্ত্রবাহনে প্রেমবিহারে যাত্রা করে। 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' গল্পটি আজগুবি ভৌতিক কল্পনার চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে—এ যেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভট-কল্পনাবিলাসের এক অতি-বিলম্বিত, যুগপরিবেশের সহিত সঙ্গতিহীন পুনরাবির্ভাব। 'সতী' সুসঙ্গত ও অভিনব কল্পনার ও কলাসংযমের জন্য উপভোগ্য। 'নখদর্পণ' গল্পটিও এক বহু-প্রচলিত, কিন্তু অধুনা-লুপ্ত লৌকিক সংস্কারের কাহিনী। ইহার চমৎকারিত্ব অতিপ্রাকৃতে নহে, ইন্দ্রজাল-শক্তি দ্বারা অপরাধীর অভাবনীয় আবিষ্কারে। 'গুহা'-তে সেই বহুধা-পুনরাবৃত্ত আদিম সমাজ ও পূর্বজন্মের স্মৃতিকাহিনীর নূতন উদ্বোধন। 'কালো মোরগ' গল্পে এক যুক্তিবাদী অধ্যাপক শিকারী কেমন করিয়া এক কালো মোরগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ভৌতিক প্রতিহিংসার বলি হইয়াছিলেন তাহারই কাহিনী। এখানে বনভূমির দুর্ভেদ্য ও বিভ্রান্তিকর পরিবেশ অতিপ্রাকৃত বিভীষিকার সহজ পটভূমিকা রচনা করিয়াছে ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের উপর উহার অতর্কিত প্রতিক্রিয়া আরও বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। 'নীলকর'-এ নীলকর সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের লীলাভূমিতে তাহাদের পাপ প্রেতমূর্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে; এক স্বৈরিণী নারী এই ভৌতিক রিরংসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। গল্পটিতে ভৌতিক আবির্ভাবের এক নূতন পরিবেশ ও ক্রিয়া দেখান হইয়াছে। শরদিন্দুবাবুর ভৌতিক কাহিনীগুলিতে যেন ভূতের সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের দৃষ্টান্ত উদাহৃত। ইহাদের সকলগুলিতে বিশেষ কলাকৌশল খুঁজিয়া পাই না। তিনি ভূতের অধিকার-বিস্তৃতির আয়োজক; উহার সূক্ষ্ম রহস্য-ভেদ সম্বন্ধে উদাসীন।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' (আগষ্ট, ১৯৫৮) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা। এই উপন্যাসে তিনি তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা ও পরস্পরের সহিত সামান্য ব্যাপারে বিরোধ ও মনোমালিন্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। এই বিপর্যয়ের আসন্ন সঙ্কেত তাঁহার ব্যঞ্জনাময় নামকরণে ও কবিত্বময় ভাষায় যতটা ফুটিয়াছে, বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে ততটা সংক্রামিত হয় নাই। সন্ধ্যার মেঘের রক্তচ্ছায়া যতটা ভূমিকায় সংকেতিত হইয়াছে, মূল আখ্যানে ততটা হয় নাই। বিক্রমশীল বিহারের মহাচার্য দীপঙ্করকে যুগপুরুষরূপে অঙ্কিত করিবার যে প্রয়াস তাহা তাঁহার রঙ্গভূমি হইতে অপসারণের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ... বঙ্গ তিব্বত ভিক্ষুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিস্ফোরক অগ্নিগোলকই উপন্যাসে তাঁহার দান ... প্রায়ই প্রচণ্ড বিস্ফোরণশক্তি সঙ্কটমুহূর্তে উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

উপন্যাসটির আসল বিষয় হইল মগধরাজকুমার বিগ্রহপাল ও চেদিরাজকুমারী যৌবনশ্রীর মিলনে বাধা ও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র দ্বেষ ও বৈরিতা। চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ হঠাৎ মগধ আক্রমণ করিয়া তিব্বতী ভিক্ষুদের আনীত আগ্নেয়াস্ত্রে পরাজিত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার সহিত মগধরাজপুত্রের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু রাজধানীতে ফিরিয়া তিনি এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভুলিয়া কন্যার জন্য স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করিয়াছেন ও জয়চন্দ্র-পৃথ্বীরাজের বিরোধের পূর্বাভাসরূপে মগধরাজকুমারের এক বিকৃত মর্কটমূর্তি সভাতে স্থাপন করিয়া তাহাকে অপমানিত করিতে চাহিয়াছেন। বিগ্রহপাল ছদ্মবেশে এক বন্ধু সমভিব্যাহারে স্বয়ংবরের পূর্বে চেদিরাজধানী ত্রিপুরী যাত্রা করিয়াছেন ও সেখানে চেদিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতার সহযোগিতায় নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাক্ষাৎ ও প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। প্রেমিকযুগলের গোপনে পলায়নের ব্যবস্থা সমস্ত ঠিক হইয়াছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যৌবনশ্রী এই ক্ষাত্রধর্মবিগর্হিত তস্করবৃত্তির প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় প্রকাশ্য হরণের উপায় নিরূপিত হইল। এই উপায়টাও খুব নির্ভরযোগ্য এ ধারণা লেখক সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এবং হরণের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে একটা সামান্য, অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক বাধা এই ঠুনকো কৌশলকে বানচাল করিয়াছে। আবার উভয় পক্ষে রণসজ্জা হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের পূর্বরাত্রে আফিমের নেশায় রক্ষীসৈন্যদের নিদ্রাভিভূত করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা বীরশ্রী তাহার ভগ্নীকে পিতার শিবির হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রেমিকের শিবিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহার পর চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। অব্যবস্থিতচিত্ত লক্ষ্মীকর্ণ হঠাৎ যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কন্যা-জামাতাকে স্কন্ধে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং অপর পক্ষের সেনানায়কেরাও এই নৃত্যে যোগ দিয়াছে। ভয়াবহ রণক্ষেত্র এক মুহূর্তে উৎসবপ্রাঙ্গণের রূপ ধরিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

উপরি-উক্ত বিবৃতি ও মন্তব্য হইতে বোঝা যাইবে যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীত যুগের জীবনচিত্রসংবলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে পরিমাণ লঘু, খেয়ালী কল্পনা আছে, সে পরিমাণ উদ্দেশ্যের স্থিরতা বা বস্তুনিষ্ঠ জীবনসত্যদ্যোতনা নাই। সমস্ত যুগই যেন বিলাস-ব্যসনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সমাজচিত্রবর্ণনায় কালিদাসের সৌন্দর্যরুচির প্রভাব আছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী প্রকট জয়দেবের রতিসর্বস্বতা। রাজা, রাজপুত্র, সচিব, সেনাপতি সবই যেন এক বর্ণাঢ্য পুতুলখেলায় আত্মহারা। হয়ত ইহাই সে সময় দেশের যথার্থ রূপ ছিল। কিন্তু দেশব্যাপী বিলাসকলা-কুতূহলের মাঝখানে কোথাও না কোথাও একটা ক্ষুদ্র শক্তিকেন্দ্রও নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল। উপন্যাসে সেই সুস্থ প্রাণচেতনার কোন পরিচয় পাই না। লেখক বাঙলা ও মগধের রীতি-নীতি, আহার ও অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্য, রুচির স্বাতন্ত্র্যের বিস্তৃত এবং হয়ত ইতিহাসানুমোদিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু যে জীবন্ত মানবাত্মার গ্রথিত সংযোগে ইহাদের সার্থক প্রাণদ্যোতনা, তাহার অভাবে ইহারা কেবল ইতিহাসের বস্তুসর্বস্ব আসবাবে পরিণত হইয়াছে।

চরিত্রায়ণের দিক হইতেও সব নর-নারী কেবল শ্রেণীপ্রতিনিধি, ব্যক্তিস্বরূপহীন। বিশেষতঃ যৌবনশ্রীর অকস্মাৎ ক্ষাত্রধর্মের দৃপ্ত আদর্শের প্রতি পক্ষপাত তাহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন। শেষ পর্যন্ত যে উপায়ে সে দয়িতের সহিত মিলিত হইল তাহার মধ্যে গৌরবের

কিছু নাই। আফিমের নেশার প্রয়োগ কি প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে পলায়নের অপেক্ষা বেশী বীরত্বমণ্ডিত?

লেখকের ভাষার উপর অধিকার ও বর্ণনাকৌশল প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ চিত্রল বর্ণনা ও কাব্যের সার্থক ইঙ্গিতের সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি সেই সুদূর অতীতের একটা রূপময় ছবি ফুটাইয়াছেন। আমাদের অতীত যদি ছায়াময় হয়, তবে তাহাতে কায়াসংযোগ প্রত্যাশা করাই হয়তো দুরাশার বিড়ম্বনা।

একবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষামূলক ও সাম্প্রতিক উপন্যাস

(১)

এই অধ্যায়ে কয়েকজন লেখকের রচনা হইতে আধুনিক উপন্যাসের যাত্রাপথ ও প্রবণতা সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ-লাভের চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ উপন্যাসের গন্তব্যপথ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার না থাকিলে নূতন লেখকেরা সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজনীতিমূলক সংঘটনের সুলভ ইঙ্গিত অনুসরণ বা বিষয়ের নূতনত্ব দ্বারা একপ্রকার অগভীর বৈচিত্র্যসম্পাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বর্তমানের বন্ধুর পথেরই পথিক হন রসসন্ধানের কোন প্রকৃত অনুপ্রেরণায় নহে, কেবল অভিনবত্বের মোহে—সুতরাং তাঁহাদের উপন্যাসও খুব উচ্চ-অঙ্গের হয় না। অনেকে আবার নূতনত্বের সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া সর্বশেষ প্রতিভাশালী লেখক যে পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই যুগসন্ধিক্ষণের দ্বিধা-জড়িত, অনুকরণমূলক পরীক্ষা (experiment)। ইহারা কেবল সাহিত্যধারাকে প্রচলিত প্রণালীতে প্রবহমান রাখিয়া আগন্তুক প্রতিভার নূতন জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করে।

এই সমস্ত লেখকের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও প্রফুল্লকুমার সরকার উল্লেখযোগ্য। রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক দিয়া শৈলজানন্দ সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী। তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনটিই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কয়লা-কুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ও প্রণয়-লীলা হইতে বৈচিত্র্য-আহরণের চেষ্টাতেই তাঁহার প্রধান মৌলিকতা। সাঁওতালদের ব্যবহার ও কথাবার্তায় ঋজু সারল্য ও কৃত্রিম আদব-কায়দার অভাব, এক প্রকারের গণতান্ত্রিক সাম্যভাব (democratic equality) আছে, এই বিষয়ে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের আচার-ব্যবহার হইতে তাহাদের গভীর পার্থক্য। সেইরূপ প্রণয়-ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে একটা অকুণ্ঠিত ইচ্ছাপ্রকাশ ও তীব্র, সংকোচহীন ভাবপরিবর্তন লক্ষিত হয়। তাহারা ভদ্র সমাজের মানসম্ভ্রম, লোক-লজ্জা ও অসারল্যের ধার ধারে না। সুতরাং এই সমস্ত দিক দিয়া সাঁওতাল-জীবন ঔপন্যাসিকের নিকট একটা আকর্ষণের বিষয়। দুঃখের বিষয় সাঁওতাল-জীবনের সমস্তায়

যেরূপ লঘু পরিবর্তনশীলতা আছে সেরূপ ব্যাপক গভীরতা নাই, সুতরাং ইহার সাহিত্যিক প্রকাশ ছোট গল্পের পরিধি অতিক্রম করিতে পারে না। সেইজন্য শৈলজানন্দের যাহা কিছু ভাল রচনা সমস্তই ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত। বড় গল্পের মধ্যে "নারীমেধ" (১৯২৮) নামক গল্পত্রয়সমষ্টিতে আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী-নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে লেখকের করুণরসসঞ্চার ও গভীর সহানুভূতির পরিচয় মিলে ও একটিতে Hardy'র বিখ্যাত Tess উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। অন্যান্য উপন্যাসের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রফুল্লকুমার সরকারের 'বিদ্যুৎ-লেখা' ও 'লোকারণ্য' উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমাজের মূঢ় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই তাঁহার উপন্যাসগুলির উদ্দেশ্য। অস্পৃশ্যতা, সামাজিক উৎপীড়ন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিক আন্দোলনে বৈপ্লবিকতার বিষ-সঞ্চার—ইহারাই ইঁহার বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য। লেখকের ভাষার সংযম ও করুণরসসঞ্চারের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তথাপি চরিত্রগুলি কেবল উদ্দেশ্যের বাহন হওয়াতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিবেশে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আত্মগোপন করিয়াছে। ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে কয়েকটি প্রণয়সঞ্চারকাহিনীই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমোক্ত উপন্যাসে লেখকের যুক্তি-তর্ক বেশ সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত, কিন্তু এই যুক্তিব্যূহের মধ্যে হৃদয়ের আবেগধারা শীর্ণ ও মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যুক্তি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া হৃদয়াবেগের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে আকস্মিকতা ও অতিনাটকীয়তার (melodrama) প্রাদুর্ভাব ও প্রেমের বিরহ-মিলন-বিষয়ে গতানুগতিক ধারার অনুবর্তন উপন্যাসের সরসতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই সমস্ত দোষই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। লেখকের 'বালির বাঁধ' উপন্যাস (এপ্রিল, ১৯৩৪) উদ্দেশ্যমূলক নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই উপন্যাসে লেখকের আবেগগভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রগুলি সুলভ অতিনাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত। ভাবাসংযম ও চিন্তাশীলতার দিক দিয়া প্রফুল্লকুমার প্রশংসার উপযুক্ত।

সজনীকান্ত দাসের 'অজয়' জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর প্রণালীতে লিখিত; কবিত্বপূর্ণ সাংকেতিকতার ভিতর দিয়া নায়ক অজয়ের শৈশব হইতে যৌবনের শেষ পর্যন্ত প্রণয়-অভিজ্ঞতার ইতিহাস। প্রথম, প্রতিবাসিনী ডলি ও ভেজির প্রতি প্রণয়সঞ্চার; তার পর কলিকাতায় নূতন প্রণয়সম্পর্কের সূত্রপাত—মামাতো বোনের সহপাঠিনী রেণুর সঙ্গে। রেণু অজয়ের পল্লীবালকসুলভ, সংকুচিত আত্ম-কেন্দ্রিকতার (self-centred state) বাঁধ ভাঙিয়া তাহার জীবনে দীপ্ত প্রণয়শিখা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কুহেলিকায় অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার চমৎকার আভাস কবিতাগুলির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রেণু অন্ধকারে, জননী-গর্ভমধ্যে শিশুর প্রাণস্পন্দনের ন্যায়, প্রেমের নিঃশব্দ আবির্ভাব জানিতে পারে। তাহার নিঃসংকোচ অগ্রসর হইতে পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়া অজয় কবিতার মারফৎ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, সে চির-অনাসক্ত, পথিক বৈরাগী ও তাহার নিকট স্থায়ী আশ্রয়-

লাভের আশা করা ভুল। রেণুর সহিত মিলন ঘটিয়াছে সাংকেতিকতার রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে। রেণু আবার বন্যার দুর্বার বেগে চিরকালের মত আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সতর্কবাণী, ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাহার আবেগকে বরফের মত জমাইয়া দিয়াছে—সে অজয়কে ছাড়িয়া বিবাহের নিরাপদ আশ্রয়ে শান্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

এদিকে বিবাহিতা ডলির মনে বাল্য-প্রণয়ের স্ফুলিঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া এক নামহীন বেদনায় দীপ্ত হইয়া উঠে। জাগ্রতে স্বামী ও স্বপ্নে তাহার গোপন, অস্বীকৃত প্রেম তাহার হৃদয়ের উপর স্বৈরাজ্য বিস্তার করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তির অদৃশ্য ব্যবধান থাকিয়া যায়। ডলি বহুদিন পরে অজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সুপ্ত বাল্য-প্রণয়কে আবার জাগ্রত করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে ষ্টিমার-পার্টিতে আর একটি ভবিষ্যৎ-প্রণয়িনী বিমলার সহিত নায়কের পরিচয় ঘটে।

এই বিরুদ্ধ আকর্ষণের অন্তর্দ্বন্দ্বে নায়কের মনে এক প্রবল পরিবর্তনের স্রোত আসিয়াছে। তাহার চিত্তে দৈহিক ক্ষুধার প্রচণ্ড উদ্রেক হইয়াছে ও কাম-প্রবৃত্তির বীভৎস চরিতার্থতা-সাধনে সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। অজয়ের এই পরিণতিতে সর্বাপেক্ষা অভিভূত হইয়াছে রেণু। সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাহার মূর্ছারোগ জন্মিয়াছে। অবশেষে স্বামীর নিকট স্বীকারোক্তি দ্বারা চিত্তভার লঘু করিয়া কোন প্রকারে সে নিজ অসহ্য আবেগ সংযত রাখিয়াছে।

অল্পদিনের মধ্যেই রক্ত-মাংসের কারবারে অজয়ের অরুচি ধরিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনার পর একটা গ্লানিকর প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে। পঙ্কস্নানের পর অকস্মাৎ পঙ্কজের ন্যায় তাহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। এই সময় বিমলা তাহার প্রেমাস্পদকে আত্মক্ষয়কারী প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট বিনা সর্তে, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। উভয়ে অজয়ের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া লোকনিন্দা ও কলঙ্কের মধ্যে আশ্রয়নীড় রচনা করিয়াছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বিমলার অসুখ ও গ্রামবাসীর উৎপীড়ন তাহাদিগকে আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাধ্য করিয়াছে।

ডলি, রেণু ও বিমলা একই প্রণয়াস্পদের আকর্ষণরূপ একটা নিগূঢ় সাম্য পরস্পরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে। বিমলার গর্ভে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার মাতৃত্বে যেন সকলেরই অংশ আছে। ডলি অজয়ের উপর বুদ্ধদেবের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের গরিমা আরোপ করিয়াছে। নিরুদ্দেশ-যাত্রার মধ্যেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসটি ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া, বিশেষতঃ স্থানে স্থানে কবিত্বের সহিত মনস্তত্ত্বের শোভন সামঞ্জস্যের জন্য, প্রশংসার উদ্রেক করে। কিন্তু মোটের উপর একটা ঐক্যের অভাব থাকিয়া যায়। সাংকেতিকতার বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ চমকপ্রদ হইলেও, অকম্পিত আলোক-শিখায় পরিণতি লাভ করে না। অজয়ের জীবনকাহিনী, অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদ বাদ দিলে, না কবিত্ব, না মনস্তত্ত্ব কোন দিক দিয়াই সমন্বয়-সুষমায় পৌঁছে না। চরিত্রগুলি অস্পষ্ট-জ্যোতি-র্মণ্ডলবেষ্টিত, ধূসররহস্যময় দিগন্ত হইতে উপন্যাসের সহজবোধ্যতায় নামিয়া আসে না। উপন্যাসে কাব্যের উপাদান ও সাংকেতিকতার ইঙ্গিতের জন্য যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু

তথাপি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য যে পরিণত কলাকৌশল ও মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বর্তমান উপন্যাসে লেখকের আয়ত্তাধীন হয় নাই।

(২)

পদ্মার রহস্যময় সাংকেতিকতা, মানুষের রক্তধারার উপর তাহার দুঃসাহসিকতার ইঙ্গিতপূর্ণ প্রভাব সুবোধ বসুর 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'তে (১৩৩১) সুন্দরভাবে ফুটান হইয়াছে। এই প্রভাব রঞ্জতের মাতার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কে এক উদ্‌ভ্রান্তকারী ভীতিবিহ্বলতার রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রঞ্জতের মনে ইহা সুস্থ, নির্ভীক উদারতা ও কৃত্রিম জীবনবিধিকে অস্বীকার করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রঞ্জতের বাল্যজীবনের চিত্র হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; শিশুমনের উৎসাহ ও কৌতূহল তাহার প্রতি কার্যে উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার পরবর্তী তরুণ জীবনের রূপটি যেন তাহার শৈশবের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ঠেকে না। মনে হয় যেন প্রতিবেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের ভারকেন্দ্র বদলাইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় তাহার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান, প্রেমের অসহনীয় তীব্র আবেগের প্রথম উপলব্ধি, শোকের নিদারুণ আঘাত, নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ চিত্তে জীবনকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা ও শান্তির আশায় বৈরাগ্য-অবলম্বন—এ সমস্ত স্তরগুলি তাহার বাল্যজীবনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করানো কঠিন। লেখক অবশ্য পুনঃপুনঃ পদ্মার উল্লেখের দ্বারা তাহার জীবনের এই দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্র গাঁথিতে, পদ্মার ঘরভাঙা উন্মত্ততার মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের বৈরাগ্যের পূর্বাভাস দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু শিশু রঞ্জত ও যুবক রঞ্জতের মধ্যে ব্যবধান পদ্মার মধ্যবর্তিতায়ও সেতুবদ্ধ হয় নাই। তথাপি উপন্যাসটি মোটের উপর সুলিখিত। প্রণয়িনীর মৃত্যুতে রঞ্জতের মনে যে বিপর্যয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, লেখক তাহার বিধ্বস্তকারী আলোড়ন আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন। যমুনা বৈষ্ণবীর বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের স্নেহবুভুক্ষা, কতকটা শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, লেখকের অল্প পরিসরের মধ্যে গভীর ভাবাবেগ ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির পরিচয় দেয়।

সুবোধ বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'নটি' (১৩৩৭), 'স্বর্গ' (১৩৩৮) ও 'বন্দিনী'র (১৩৩৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার এই সমস্ত রচনাতেই সূক্ষ্ম নিসর্গানুভূতি, কবিসুলভ সুকুমার-ভাবমণ্ডলসৃষ্টি ও প্রতিবেশরচনা, ও ভাষার উপর অধিকার দৃষ্ট হয়। তবে তাঁহার বিষয়বস্তুর মধ্যে ইহার উপযুক্ত গভীরতা বা গৌরব নাই; 'নটী'তে আশালতার কৈশোর জীবন—তাহার রাজীবের প্রতি ব্যর্থ আকর্ষণ, তাহার পল্লীবালিকাসুলভ লজ্জাসংকোচ, কলিকাতায় তাহার অত্যাচারজর্জরিত, আত্মমর্যাদানাশক অভিজ্ঞতা—একটা সাধারণ সুপরিচিত ধারারই অনুবর্তন। কিন্তু তাহার মণিকা বাইজীতে রূপান্তর সবদিকেই চমকপ্রদ। ভীরু, বিবেকহীন সমাজের বিরুদ্ধে তাহার বিজাতীয়, বিষজ্বালাপূর্ণ বিদ্বেষ তাহার মনুষ্যত্বহীন, সমাজভীত পূর্ব প্রণয়ী রাজীবের নিকট তীব্রশ্লেষপূর্ণ, মর্মভেদী অনুযোগ, গণিকাজীবনের সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও মিথ্যা সম্ভ্রমের মধ্যে অশান্তির অগ্নিদাহ ও কুলবধূর শান্ত, একনিষ্ঠ জীবনের মধুর স্বপ্নে সাময়িক বিস্মৃতিলাভের প্রয়াস—তাহার অনিচ্ছাকৃত নরকপ্রবাসের তিক্ত, গ্লানিময় ইতিহাস—কল্পনার মৌলিকতা ও মনস্তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনের উপাদেয়তা এই দুই দিক দিয়াই প্রশংসার্হ।

'স্বর্গ' ঠিক উপন্যাসপদবাচ্য নহে—ইহার প্রথম খণ্ডে প্রেমিক-প্রেমিকার স্বল্পকালব্যাপী বিবাহিত জীবনে প্রেমের আদর্শ সুষমা ও নিবিড় নীরন্ধ্র মায়াবিস্তার, লঘু চপলতা ও কৃত্রিম বিরোধের ছদ্ম অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রণয়ের গাঢ় আবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রশান্ত ও চামেলীর কোন ব্যক্তিগত ইতিহাস নাই, তাহারা প্রেমের পূজারীর সনাতন প্রতিনিধি; আধুনিক যুগের বাধা-বিক্ষেপ ও সুযোগ-অবসর, উভয়েরই সহায়তায় তাহারা পূজার নূতন অর্ঘ্যোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে মাত্র। এই পটভূমিকায় নিয়তির অতর্কিত আঘাতে দম্পতীর জীবনব্যাপী ছাড়াছাড়ি ঘটিয়াছে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে মৃতদার প্রশান্তের, মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকাব অন্তরালে পরলোকগতা প্রণয়িনীর অস্তিত্বের ক্ষীণতম আভাস-উপলব্ধির প্রাণান্ত চেষ্টা, করুণ. হৃদয়গ্রাহী আকুলতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সে তাহার সমস্ত কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তি একাগ্র করিয়া মৃত্যুর গহন অন্ধকারে প্রেরণ করিয়াছে; কখন স্পর্ধিত দুঃসাহসে, কখন ব্যাকুল অসহায়তায় হারান প্রিয়ার নিকট আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। মাঝে মধ্যে প্রিয়ার অশরীরী স্পর্শ ক্ষণকালের জন্য তাহার উদগ্র অনুভূতির নিকট ধরা দিয়াছে; কিন্তু পূর্ণ প্রাপ্তির আশা, রহস্যোদ্ভেদের সম্ভাবনা বার বার তাহাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রশান্তের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া পরলোকের একটা জ্যোতির্ময় রূপসত্তা রচনা করিয়াছে। আধুনিক যুগে মানবের মন এত জটিল ও তাহার আকাঙ্ক্ষা এত সূক্ষ্ম হইয়াছে, তাহার আশা ও অভিলাষ এরূপ সীমাহীন, সংজ্ঞাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, পরলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন পরিকল্পনাই তাহার তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। পৌরাণিক স্বর্গ, দান্তে ও মিলটনের স্বর্গ, এমন কি আধুনিক কবি রসেটির প্রেমের অনুধ্যান-নিবিড় স্বর্গও তাহার মানস-কল্পনার উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান লেখকের স্বর্গের ছবি কতকটা মধ্য-যুগের Pearl কবিতার রচয়িতার সমধর্মী ও কতকটা রসেটির বস্তুপ্রধান কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। সে যাহাই হউক বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর কোন ঔপন্যাসিক মানুষের জীবনের চারিদিকে যে অজ্ঞাত রহস্যবোধের পরিমণ্ডল প্রসারিত আছে তাহার একটা সুস্পষ্ট, রংএ, রেখায় ও অনুভূতিতে রূপায়িত, আকার দিবার চেষ্টা করেন নাই। সুবোধ বসুর প্রচেষ্টা হয়ত সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, কিন্তু বিরহী মনের অন্বেষণ-ব্যাকুলতা, অতীন্দ্রিয় আভাসগুঞ্জনের প্রগাঢ় অনুভূতি লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয়।

'বন্দিনী' (১৯৩৭) গল্পটিতে পূর্ববঙ্গের পল্লীশ্রীর সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টনে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি সাধারণ। এখানে এক দীপঙ্কর ছাড়া আর কোন চরিত্রই সজীব মনে হয় না। বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথার অতিমাত্রায় আস্থাশীল নায়িকার পিতামহ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ও রূপকথার রাক্ষসজাতীয় সৃষ্টি। এমন কি নায়িকা উত্তরা পর্যন্ত চারিদিকের প্রকৃতিসৌন্দর্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন নিজস্ব রূপ বা আকর্ষণ লাভ করিতে পারে নাই। এখানে মানুষের রিক্ততা পূর্ণ করিয়াছে প্রকৃতির অজস্র, অকৃপণ সম্পদ্। পশ্চাৎপট চিত্রকে আড়াল করিয়াছে; কাব্যানুভূতি চরিত্রসৃষ্টি ও চিত্তবিশ্লেষণকে একেবারে উপেক্ষণীয়, গৌণ পর্যায়ে ফেলিয়াছে।

(৩)

জীবনময় রায়ের 'মানুষের মন' (১৯৩৭) প্রেম-সমস্যার আলোচনায় অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা ও মননশক্তির জন্য প্রশংসার্হ। অবশ্য সমস্যার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব একটা অবিশ্বাস্য সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুম্ভমেলার ভিড়ে কমলার নিশ্চিহ্ন অন্তর্ধান ও রোগের প্রভাবে তাহার আংশিক স্মৃতিবিলোপ উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। এই প্রারম্ভিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটির পরবর্তী আলোচনা বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দেয়। শচীন ও পার্বতীর মধ্যে সম্বন্ধটি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। শচীন অন্তর্হিতা পত্নী কমলার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের ভাববিহ্বলতায় পার্বতীর প্রতি তাহার ক্রমবর্ধমান হৃদযাবেগকে জোর করিয়া কৃতজ্ঞতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে, ইহাকে প্রেম বলিয়া স্বীকার করে নাই। পার্বতী ও কমলার বিষয়ে তাহার অনিশ্চিত অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পূর্ব-প্রেমের সাড়ম্বর স্মৃতিপূজার ফাঁকে ফাঁকে পার্বতীর প্রভাব শচীনের মনে অন্ধকারে ছায়াপথের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। পার্বতীর মনোভাব অসংবরণীয় প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাহার অনুভূতি এতই অভ্রান্ত যে, প্রেমের প্রতিদানে ছদ্মবেশী শিষ্টাচার বা কৃতজ্ঞতার নিবেদন তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত শচীন পার্বতীর প্রতি তাহার মনোভাবকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য তাহার সংসর্গ পরিহার করিয়াছে।

ইতিমধ্যে কমলার পুনঃপ্রাপ্তি তাহাদের পরস্পর-সম্পর্কের মধ্যে নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। তুচ্ছ আত্মসম্মানবোধের খাতিরে প্রেমকে অস্বীকার করার জন্য অনুতপ্তা পার্বতী কমলার পুনরাবির্ভাবে তাহার চিরপোষিত আশার উন্মূলনে নৈরাশ্যক্লিষ্টা হইয়াছে, কিন্তু নিজ অন্তরবেদনা গোপন রাখিয়া সে মিলনোৎসবে সানন্দ সহযোগিতা করিয়াছে। কমলার নিষ্ক্রিয়, আত্মপ্রকাশবিমুখ চিত্ত শচীনের আদর-সোহাগের অপরিমিত উচ্ছ্বাসে আরও সংকুচিত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। শচীনের অন্তরেই সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে। কমলার প্রতি তাহার সংস্কার ক্ষীয়মাণ হৃদয়াবেগ বহিঃপ্রকাশের আতিশয্যের দ্বারা উহার পাণ্ডুর রক্তহীনতাকে গোপন করিতে চাহিয়াছে—তাহার স্বামিত্বের সহজ মহিমা যেন ভিক্ষুকের উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে বুঝিয়াছে যে, কমলার প্রতি একনিষ্ঠতার অহংকারে পার্বতীর যে উন্মুখ প্রেমকে সে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার দাবী না মিটাইলে, ঋণ শোধ না করিলে তাহার জীবনে আর ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং তাহার জীবনের প্রধান কর্তব্য এই দুই বিরোধী আকর্ষণের সামঞ্জস্য-বিধান, কমলার শুষ্ক ধমনীতে পার্বতীর প্রেমের উষ্ণশোণিতসঞ্চার। কমলা ও পার্বতীর প্রেমের পার্থক্য একটি সুন্দর উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। কমলার প্রেম মূক অন্ধ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বীজ; পার্বতীর প্রেম ইহাকে উন্মুক্ত, আলোকোজ্জ্বল আকাশতলে আহ্বানকারী সৌরকর।

এবার পার্বতী দ্বিধাহীন, ছদ্মবেশবর্জিত, আত্মপরিচয়প্রতিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। যে মুহূর্তে শচীনের প্রেম, নিজ অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে, নিজ সার্থকতার প্রেরণায়, উদ্যত আলিঙ্গন লইয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়াছে সে মুহূর্তে পার্বতীর আত্মদানে সমস্ত সংকোচ প্রবল, বিশুদ্ধ আবেগধারায় ভাসিয়া গিয়াছে। এক মিলন-রাত্রির পর চির-বিরহ তাহাদের প্রেমের উপর যবনিকাপাত করিয়াছে। কমলার মধ্যে তাহার উত্তপ্ত আবেগ-

সন্ধানের ইঙ্গিত ও উপদেশ দিয়া পার্বতী শচীন-কমলার সংসার-জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপন্যাসমধ্যে আর দুইটি গৌণ উপাখ্যান. মূল বিষয়ের সহিত শিথিলভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটি, নন্দলাল-মালতীর পারিবারিক জীবনচিত্র। নন্দলাল তাহার গৃহে আশ্রিতা কমলার প্রতি যে স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তি অনুভব করিয়াছে, তাহার প্রতি মালতীর মনোভাব অবজ্ঞা ও ক্ষমাশীলতায় মিশ্রিত ; ইহার মধ্যে হৃদয়াবেগের বাড়াবাড়ি বা কাব্যোচ্ছ্বাস একেবারেই নাই। ইহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক পাশ্চাত্য-ভাবগন্ধহীন, ঈষৎ স্নেহমিশ্রিত, বাস্তব প্রয়োজনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। মালতীর বিশেষত্ব তাঁহার সরলতা ও সুনিপুণ গৃহিণীপণায়, প্রণয়িনী-হিসাবে নহে। নন্দলালের মৃত্যু নিতান্ত আকস্মিক, বিপ্লবপন্থীদের গণ্ডীমধ্যে অসতর্ক পদক্ষেপের ফল।

গ্রন্থের তৃতীয় আখ্যান সীমা ও নিখিলনাথের শিথিল-গ্রথিত সম্পর্কবিষয়ক। এই অংশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার যুক্তিবাদমূলক বিশ্লেষণ যেমন চমৎকার, তাহার অন্তর্নিহিত আবেগগত প্রেরণা, মৌলিক বিস্ফোরক শক্তি সেই পরিমাণে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। লেখকের কল্পনাশক্তি বা আবেগগভীরতা তাঁহার মননশীলতার সমকক্ষ নহে। এই বৈপ্লবিক অধ্যায়ের গ্রন্থমধ্যে বিশেষ সার্থকতা নাই—ইহা উপন্যাসের গতিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে মাত্র। সীমা বিশিষ্ট মতবাদের প্রতীক, তাহার ব্যক্তিগত জীবন এই মতবাদের অন্তরালবর্তী হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়। তাহার কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা শুনি, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণা গোপনই থাকে। নিখিলনাথের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ। সে কমলা ও সীমার মধ্যে যোগসূত্র ; আবার সে-ই কমলার স্বামীর আবিষ্কারক। কিন্তু এই দৌত্যকার্য ছাড়া গ্রন্থমধ্যে তাহার অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

উপন্যাসের ভাষার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই নিপুণ বাক্যসন্নিবেশ ও ভাবের সূক্ষ্ম অনুবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি লেখকের ভাষাপ্রয়োগ আতিশয্যদোষমুক্ত নহে। বিশেষণের আধিক্য সময় সময় বাক্যকে ভারাক্রান্ত ও বোধসৌকর্যকে প্রতিহত করে। এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও উপন্যাসটির গভীর বাস্তব অনুভূতি ও উন্নত মননশক্তি উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত।

(৪)

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) উপন্যাসটি আধুনিক মনের যৌনবোধের বিকার ও অতৃপ্তির উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ। অফুরন্ত অগ্রগতি মানবমনের উচ্চাভিলাষ, অজ্ঞাতসারে চক্রাবর্তন সেই উচ্চাভিলাষের উপর প্রকৃতির ব্যর্থতার অভিশাপ। রামপ্রসাদের সেই সুপরিচিত আধ্যাত্মিক জীবনের খেদোক্তি—'মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ-ঢাকা বলদের মত' সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনে, সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে আস্থাশীল প্রগতিবাদীদের মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। 'বৃত্ত' সেই তৃপ্তিহীন চক্রভ্রমণের কাহিনী।

বিবাহিত প্রেমে অতৃপ্তি, নূতন প্রেমের আস্বাদগ্রহণে ঔৎসুক্য মানবমাত্রেরই একটা প্রাকৃত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শাস্ত্রকার ও নীতিবিদ্‌গণ মানবের এই সমাজ-ও-শৃঙ্খলা-বিরোধী মনোবৃত্তির তীব্রতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই নানারূপ কড়া বিধি-নিষেধের দ্বারা এই প্রবণতাকে রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পদস্খলনকে সোজাসুজি রূপমোহ

হইতে উদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দুর্বলতার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল; কিন্তু উচ্চতর সমাজকল্যাণের জন্য তিনি ইহাকে প্রলোভন বলিয়াই আঁকিয়াছেন এবং ইহাকে জয় করার চেষ্টাতেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ ও গৌরবের চিহ্ন দেখিয়াছেন। আধুনিক যুগে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পিছনে একটা মহান্ আদর্শবাদ আরোপ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হইয়াছে। যে জ্বলন্ত আবেগ হইতে প্রেমের উদ্ভব, কিছুদিন একত্রবাসের ফলে তাহা স্তিমিত হইয়া জড়, অভ্যস্ত গতানুগতিকতার ভস্মরাশিতে পরিণত হয়—কাজেই আত্মার স্বাধীন, বাধাহীন স্ফুরণের জন্যই আবার নূতন আবেগের দীপশিখা হইতে এই নির্বাপিত-প্রায় আলোকটিকে জ্বালাইয়া লইতে হয়। প্রেমের এই পাত্র-পরিবর্তনে লজ্জা-সংকোচের কোন কারণ নাই, কেননা এই উপায়েই জীবনের সার্থকতা, তাহার তেজোগর্ভ, জ্যোতির্ময় স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই স্বতঃস্বীকৃতির উপরেই আধুনিক উপন্যাসের প্রেমের আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন ঔপন্যাসিকই এই প্রেমের চরিতার্থতা কেমন করিয়া জীবনের মহনীয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তাহার কোন চিত্র আঁকেন নাই। বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি-অপূর্ণতা, ইহার ক্ষোভ ও অতৃপ্তির ধারণাটির নির্মম বিশ্লেষণ ও পুঞ্জীভূত তথ্যসন্নিবেশের দ্বারা আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নততর ব্যবস্থার প্রতি দূর হইতে ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যে দুই একজন অতি-সাহসী লেখক—যথা হাক্সলি ও ওয়েলস্—এই অনাগতের যবনিকা তুলিয়া তাহার বাস্তব জীবনযাত্রা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিকল্পনায় প্রেম একটা বিজ্ঞান-চালিত যন্ত্রশক্তিতে পরিণত হইয়া তাহার সমস্ত মাধুর্য ও বৈদ্যুতীশক্তি হারাইয়াছে।

বর্তমান উপন্যাসে এই সমস্যাই কয়েকটি স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মানস-প্রতিবেশের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সত্যবান—অধুনা মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক—পনর বৎসর পূর্বে সতীকে বিবাহ করিয়াছে। সতী সমাজের অনুমোদন ও পিতা-মাতার আশীর্বাদ ছাড়া এই বিবাহ করিয়া অনন্যসাধারণ সাহসিক 'র পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর সতী তাহার চিত্ত-স্বাধীনতা হারাইয়া গার্হস্থ্য কর্তব্য ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তনে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সত্যবানের জীবনে আরও উত্তেজক সাহচর্য ও উষ্ণতর প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। সুরমার সঙ্গে তাহার ক্ষণিক অন্তরঙ্গতা তাহাকে যৌন সম্বন্ধের বৈপ্লবিক দিকের সহিত পরিচিত করিয়াছে। তারপর তাহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছে বনানীর তরুণ জীবনের নির্ভীক, উত্তপ্ত আবেগ। কিন্তু বনানীর সহিতও তাহার মিলন সার্থক হয় নাই। বনানীর কর্মজীবনের সহিত সে স'শ্রবহীন; শুধু মধ্যে মধ্যে কোমল ভাবাবেগের ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার বিবাহের পঞ্চদশবার্ষিক উৎসব-সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা আত্মবিশ্লেষণের ফলে সে সতীর মধ্যে মননশীলতার পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি বিমুখতা জয় করিয়াছে। সে অনুভব করিয়াছে যে, সে স্ত্রীর নিকট যে স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তাহা সম্পূর্ণ নহে, নিজ স্বার্থ ও আত্মাভিমানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, চরমপন্থী নহে, মধ্যপন্থী। সে বনানীকে কামনা করিয়াছে সতীর তরুণ জীবনের প্রতিনিধি ও স্মারক হিসাবে, সতীর যৌবন-উন্মাদনার রোমাঞ্চ-অনুভবের জন্য। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সতীর প্রভাব তাহার জীবনে চিরস্থায়ী ও চিরকাম্য এই ধারণায় স্থির হইয়া সে পুরাতন চিঠিপত্রের সহিত নিজ

অতৃপ্ত হৃদয়াবেগকে পোড়াইয়াছে। ইহাই হইয়াছে তাহার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পরিবর্তে ব্যর্থ বৃত্তানুবর্তন।

অন্যান্য সমস্ত চরিত্রের ক্ষেত্রেও এই বৃত্তাঙ্কনপ্রবণতার অভিনয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুষমা প্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর। সে স্বামী ত্যাগ করিয়া একাধিক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, তথাপি তাহার জীবনে ব্যর্থতার ক্লান্তি আসিয়াছে। বিদ্রোহের যে তীব্রতা তাহাকে চরিতার্থতায় তৃপ্তি দিতে পারিত, তাহার সামাজিক আবেষ্টন হইতে সেই পরিমাণ দাহিকা শক্তি সে আহরণ করিতে পারে নাই। বিদ্রোহের পরিমণ্ডল প্রস্তুত না থাকিলে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ-প্রয়াস "পরিবর্তনের সিঁড়ি মাত্র", নূতন বাসগৃহ নহে। 'শেষপ্রশ্ন' ও 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে তাহার মতামতও তাহার গভীর অবসাদ ও মধ্যপন্থী আপোষপ্রবণতার প্রমাণ। কমলের ক্ষণিকবাদ মত হিসাবে সমর্থনীয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে ইহার অবাধ প্রয়োগ যৌন প্রবৃত্তির ন্যায্য সীমার উল্লঙ্ঘন। পক্ষান্তরে অমিত-লাবণ্যের সম্পর্কে যৌন আকর্ষণকে আদর্শ-লোকে উন্নয়নে যে প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহাও অস্বাস্থ্যকর, কেননা ইহা যৌনবোধকে অভদ্র ও অশ্লীল ধরিয়া লইয়া ইহাকে কবিত্বময় প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছে ও কল্পনার রংএ রাঙাইয়াছে। মোট কথা, এই জৈব সংস্কারকে লইয়া কোন ভাবোচ্ছ্বাসমূলক আতিশয্য বা নূতন মতপ্রচারের উৎসাহ—উভয়ই অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয়। ইহাকে মনের স্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া নিছক শারীরিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার একনিষ্ঠতাকে সতীত্বের গৌরব বা স্বৈরাচারকে সমাজসংস্কারের প্রেরণাশক্তির মর্যাদা আরোপ করিলে সহজ ব্যাপারকে অনর্থক জটিল করিয়া তোলা হইবে। তাই বনানী যখন সত্যবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সুষমা বাধা দেয় নাই। কিন্তু তাহার বুদ্ধি যাহা মানিয়া লইয়াছে, হৃদয় তাহা সমর্থন করে নাই। সেইজন্য নিজের জীবনে দুর্বহ শ্রান্তি অনুভব করিয়া সে অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার কারণ সে নিজেই নির্মমভাবে নির্দেশ করিয়াছে—আধুনিক যুগের মানুষের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, মতে ও ব্যবহারে বৈষম্য এক অসাধ্য ব্যাধির বিকার হইতে উদ্ভূত।

বনানী যুদ্ধোত্তর যুগের সন্তান—কাজেই সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতি সে সহজ সংস্কারের মতই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনেও ঐক্য ও শান্তি নাই। তাহার কর্ম-সহচর ও যৌন পরিতৃপ্তির পাত্র বিভিন্ন। তাহার সহপাঠী ও সম্ভাব্য প্রণয়ী শিশির তাহার সমাজনৈতিক মতবাদের অত্যুৎসাহে প্রেম-মমতা প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকে আপাততঃ ঠাণ্ডা-গুদামজাত (in cold storage) করিয়াছে—সমাজ পুনর্গঠন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এই সমস্ত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। কাজেই হৃদয়াবেগের মোহপরিতৃপ্তির জন্য বনানী মধ্যবয়স্ক ও পূর্বযুগের প্রতিনিধি সত্যবানের আশ্রয় লইয়াছে—চোখে ঘনায়মান ক্লান্তি ও মনে বর্ধমান শূন্যতাবোধ লইয়া কর্মক্ষেত্রে শিশিরের সহযোগিনী হইয়াছে। এই দ্বিধা-বিভক্ত মন লইয়া সে জীবনের কি চরিতার্থতা প্রত্যাশা করে তাহা বুঝা কঠিন। যৌনবোধের পরিমিত অসংকোচ উপভোগ ও ইহাকে মানস-বিলাসের সহিত জড়িত না করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাহার মত তাহার মাতার মতের প্রতিধ্বনি; তাহার মাতারই জীবনাভিজ্ঞতা

মতবাদরূপে তাহার অনভিজ্ঞ মনে সংক্রামিত হইয়াছে। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত লীলাচঞ্চলতা ও নিশ্চিন্ত উপভোগস্পৃহা তাহার নব-উন্মেষিত যৌবনের দুঃসাহসিকতারই বিচ্ছুরণ; ইহার মূল কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মানস সাম্যে নিহিত নাই। মনে হয় যৌবনের জোয়ারে ভাটা পড়িলে তাহার এই সরসতাও শুকাইয়া যাইবে; বয়োবৃদ্ধির সহিত সেও সুষমার দ্বিতীয় সংস্করণে রূপান্তরিত হইবে। এই আশা ও আনন্দে পূর্ণ, নবযুগের প্রতীক তরুণীরও বিধিলিপি অনিবার্য ব্যর্থতার চক্রাবর্তন।

এই ব্যর্থতাবোধ অনুভব করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রবীণ মাস্টার মশাইও। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে সীমাবদ্ধ মানস মুক্তির জয়গান করা হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে মাস্টার মশাই নিজ জীবনে বৃহত্তর স্বাভাবিক মুক্তিকে আহ্বান করিতে পারেন নাই—তাঁহার তথাকথিত মুক্তি-মন্দিরের চারিদিকে সংকীর্ণতার দেওয়াল তুলিয়াছেন। মানস আভিজাত্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রোমান্টিক সৌন্দর্যোপভোগ—ইহাদেরই নেশায় মশগুল হইয়া তিনি আধুনিক যুগের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধি-জীবীর আভিজাত্যাভিমানে তিনি বিবাহ করেন নাই—যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের সহিত কৌমার্যব্রত-গ্রহণের সম্পর্ক মোটেই স্পষ্ট নহে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত বনানীর সংস্পর্শে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন—সত্যবানের প্রতি অকস্মাৎ-উত্তেজিত ঈর্ষার বিদ্যুৎঝলকে তিনি নিজের মনের রহস্য পাঠ করিয়াছেন। এই আত্মোপলব্ধির অব্যবহিত পরেই প্রশংসনীয় ত্বরার সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া মাস্টার মশাই নিজ জীবনকে বৃত্তানুসরণের চিরাভ্যস্ত কক্ষপথে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

রজতের জীবনে সত্যকার কোন সমস্যারই উদ্ভব হয় নাই। সুষমার সহিত সম্পর্ক তাহার একটা আকস্মিক খেয়াল; ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়াছে তাহার নিষ্ক্রিয়, নিরুৎসাহ সম্মতির উপর। যে মুহূর্তে বাহিরের চাপ আসিয়াছে, সেই মুহূর্তেই এই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তাহার জীবনের কক্ষাবর্তন সাময়িকভাবে স্বাধীন ইচ্ছার সরলরেখায় চলিয়া আবার চিরাচরিত প্রথার টানে নির্দিষ্ট চক্রপথে ফিরিয়া আনিয়াছে।

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে একমাত্র সতীই নিজ চিত্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিবাহের পর হইতে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিয়া সংসার-চক্রের কেন্দ্রস্থলে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই চক্রবিঘূর্ণনের সহিত সে আপন জীবনগতিকে এমন নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীর জীব যেমন তাহার আবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন থাকে, সেও তেমনি তাহার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা হারাইয়াছে। এই যান্ত্রিক গতির সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া সে আপনাকে চিত্তবিক্ষেপ হইতে রক্ষা করিয়াছে ও অক্লান্ত সেবা ও নিজ দৈহিক আকর্ষণের দ্বারা স্বামীর উৎকেন্দ্রিকতার প্রতিবিধান করিতে চাহিয়াছে। তাহার বুদ্ধি সজাগ ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়াই সে অভীষ্ট ফল-লাভে সমর্থ হইয়াছে—তাহার স্বামীর চঞ্চল চিত্তবৃত্তি তাহাকেই বেষ্টন করিয়া ডানা ঝটপট করিয়াছে। বিদ্রোহের দুরন্ত অগ্নিশিখাকে সে গার্হস্থ্য প্রয়োজনের চিমনিতে আবদ্ধ করিয়া শান্ত ও নিয়মিত করিয়াছে—তাহারই স্থির আলোকে সে নিজ জীবনকে ব্যর্থতার অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিরানন্দ হইতে দেয় নাই।

গ্রন্থের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য বিশেষ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত মনে হয় না। সত্যবানের পঞ্চদশ

বর্ষব্যাপী জীবনাভিজ্ঞতার, দুই ঘণ্টার অতীতস্মৃতিপর্যালোচনা ও বর্তমান অনুভূতির চতুর্দিকে বিন্যাস, গঠনশক্তির একটা দুরূহ পরীক্ষা বলিয়াই ঠেকে। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে এতগুলি স্মৃতির পুঞ্জীভূত হওয়ার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। নাভের মধ্যে ঘটনার ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা বিভ্রান্ত হয় ও চেষ্টা করিয়া উহাকে আবার সময়ের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে সজাগ করিতে হয়। তাহার জীবনসমস্যার উপর বাল্যস্মৃতির কোন প্রভাব লক্ষ্য হয় না—সুতরাং ইহার প্রবর্তন কাহিনীকে অযথা ভারাক্রান্ত করে।

এই উপন্যাসটি সমস্যামূলক—a novel of ideas, সুতরাং চরিত্রবিকাশ এই ideaর স্তরেই সীমাবদ্ধ আছে। সত্যবান ও সতী ছাড়া আর কাহারও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই। সমস্যার ব্যূহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকেরই জীবন আরম্ভ; ব্যূহনিষ্ক্রমণচেষ্টাই প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস। জীবনের যতটুকু সমস্যার ছায়ায় আচ্ছন্ন, ততটুকুতেই লেখকের কৌতূহল সীমাবদ্ধ। জীবনের নদীকে সমস্যার ক্যানেলে পুরিয়া এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাহার জলোচ্ছ্বাসের আকুলতা তাঁহার আলোচ্য বিষয়। সুরমার জীবনে সমস্যার কি করিয়া উদ্ভব হইল, বনানী কিরূপে সত্যবানের প্রেমে পড়িল—সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যাখ্যা নাই। এগুলি স্বতঃ-স্বীকৃতির মত মানিয়া লইয়া পাঠককে লেখকের অনুসরণ করিতে হইবে। কাজেই এই জাতীয় উপন্যাসের জীবনালোচনা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী। ইহাতে জীবন সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম মন্তব্য আছে, জীবনীশক্তি নাই। যাহা হউক, সমস্যাপ্রধান উপন্যাসই আধুনিক যুগের বিশেষ সৃষ্টি—ইহাতে যেমন আক্ষেপের কারণ আছে, তেমনি আত্মপ্রসাদেরও সুযোগ একেবারে দুর্লভ নহে। আধুনিক মানব ideaর বাহন ও দাস; তাহার জীবনে সমস্যা আবেগকে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে। সুরঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসটি এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার আলোচনার মধ্যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি এবং নিপুণ বিশ্লেষণ ও প্রকাশভঙ্গী তাঁহার শক্তির পরিচয়।

(৫)

বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবন ছাড়া সাহিত্যেও যে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' ও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রমাণ করে যে, বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকেরাও বৈপ্লবিক উন্মাদনার মধ্যে স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত অতীত সংঘটনের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ যুগের বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতি ও ইহার ব্যর্থতার প্রতি গূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব, অসম্পূর্ণ সহানুভূতি ও অবাস্তব কল্পনাবিলাসের লক্ষণ বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র এতবড় একটা আবির্ভাবের প্রসব-যন্ত্রণা, ইহার সূতিকাগারের দৃশ্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আত্মবিকাশের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিকতার আত্মঘাতী, অচেতন যন্ত্রশক্তির ন্যায় মূঢ় প্রচেষ্টার প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। কাজেই তিনি ইহার দুর্বলতা, আত্মপ্রতারণা, সুকুমার অনুভূতি ও উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সহিত অসামঞ্জস্যের উপর তীক্ষ্ণ শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে বিপ্লব-দর্শনের পূর্ণ সমর্থন আছে—কিন্তু ইহাতে বিপ্লবপন্থীর অন্তঃনিরুদ্ধ বহ্নিশিখা, তাহার হৃদয়ের অনির্বাণ তুষানলের পরিচয়

নাই। সব্যসাচী পাষাণ দেবতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনুরাগ-বিরাগ তাহার বক্ষপঞ্জরে কোন কোলাহল জাগায় না। কোন্ নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাহার এই নির্মম ঔদাসীন্য দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, দুঃখের কোন্ কামারশালার আগুনে পুড়িয়া ও হাতুড়ির ঘা খাইয়া তাহার হৃদয় অটল নিঃস্পৃহতার লৌহবর্মাবৃত হইয়াছে তাহার কোন ইঙ্গিত আমরা পাই না। আবার তাহাকে অনেকটা অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মত দেখান হইয়াছে। তাহার কর্মক্ষেত্রের অতি-বিস্তৃত পরিধি, বিধি-ব্যবস্থার অমোঘ শৃঙ্খলা, পুলিশের চোখে ধূলা দিবার অদ্ভুত কৌশল, অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইবার ঐন্দ্রজালিক শক্তি, অনুচর ও সহকর্মিসংঘের উপর সম্মোহনপ্রভাব—এই সমস্তই তাহাকে সাধারণ মানবের বোধগম্যতা ও সহানুভূতির ঊর্ধ্বে অতিমানবের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। আদর্শবাদের শ্বেতদীপ্তি-বিচ্ছুরিত মসৃণ তুষার-আস্তরণের নীচে তাহার মানব-হৃদয়টি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক বন্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উচ্চাঙ্গের মননশক্তি ও প্রখর জ্বালাময় অনুভূতির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইহার ছত্রে ছত্রে বৈপ্লবিকতার প্রলয়ংকর দাহ ও দীপ্তি, ইহার উন্মত্ত, আত্মঘাতী বিক্ষোভ অনুভব করা যায়। যে সুদূর, অনায়ত্ত আদর্শের মোহে বিপ্লবী জীবনের সুলভ আংশিক সফলতা প্রত্যাখ্যান করে তাহা ইহাতে মর্মভেদী আন্তরিকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। মনীশ, সুনীল, অমিত—ইহারা একের হাত হইতে অপরে সন্ত্রাসবাদের দীপ্ত শলাকা গ্রহণ করিয়া এই ভয়াবহ দীপালি-উৎসবের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিয়াছে—প্রজ্বলিত হোমানলে একে একে আত্মাহুতি দিয়াছে। সাধারণ প্রতিবেশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ পদে পদে। মুনসেফ শৈলেন ও এটর্নি সাতকড়ির মধ্যে মূর্ত, জীবনের ক্ষুদ্র, মেদমাংসবহুল সার্থকতা ইহাদের তীব্র বিরাগ জাগায়। অধ্যাপক ও কলাবিদের মননশক্তিসমৃদ্ধ, সৌন্দর্যানুভূতিতে স্নিগ্ধ, সরস জীবনযাত্রা তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এই বৈষম্যপীড়িত, কুৎসিত সমাজব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়ের সৌন্দর্যচর্চা একটি মানস-বিলাসের মতই প্রশ্রয়ের অযোগ্য। এই সমস্ত রুক্ষ নিরবসর জীবনে স্ত্রীলোকের প্রভাব সহযোগিতা-ভালবাসার পর্যায়ে উঠে না—বৈপ্লবিকতার তীক্ষ্ণ উত্তপ্ত হাওয়ায় প্রেমের দলগুলি শুষ্ক, শীর্ণ হইয়া যায়। ইন্দ্রাণী, সুর, সুধীরা, সবিতা, সুনীলের বৌদিদিরা আপন আপন রমণীয়তার চকিত ইঙ্গিত লইয়া, হাস্য-কৌতুক-স্নেহ-প্রীতির অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া, ঊষর মরুভূমির দিগন্তলীন, ক্ষীণ শ্যাম-রেখার ন্যায় সুদূর, দুরতিক্রম্য ব্যবধানে অধিষ্ঠিত। বিপ্লববাদীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অস্বস্তিকর—পরিবার-মণ্ডলের সহিত তাহার সম্বন্ধের গোপন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য। অমিত ও সুনীলের জীবন এক জটিল, বিস্তীর্ণ প্রতারণা-জালে জড়াইয়া গিয়াছে—পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নীর সহিত সহজ, স্নেহমধুর সম্পর্ক প্রাণপণ যত্নে আবৃত এক নিদারুণ বিদারণ রেখায় খণ্ডিত হইয়াছে। এই হীন আত্মগোপনচেষ্টা তাহাদের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে, প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে, যেন কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ করিয়াছে। অশ্রান্ত আত্মদ্বন্দ্ব ও প্রতিবেশের সহিত মর্মান্তিক বিচ্ছেদই ইহাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ। ইহার সহিত তুলনায় রাজশক্তির ক্ষমাহীন অনুসরণ, অতন্দ্র প্রতিহিংসা যেন একটা গৌণ অসুবিধার মতই অনুভূত হয়। বৈপ্লবিকের জীবনের দিকটা—পুলিসের সহিত

লুকোচুরি খেলা, মাথা গুঁজিবার স্থানের জন্য অশান্ত অনুসন্ধান, অর্থাভাবের জন্য ক্লেশ—গভীর সহানুভূতি ও তীব্র আবেগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তরের তীব্র বহ্নিজ্বালার নিকট এই ক্ষুদ্র বহিঃশক্তির অভিভব যেন তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় মনে হয়।

তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর আবেগের সহিত মনীষাদীপ্ত জীবনবিশ্লেষণ এই উপন্যাসের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। জীবন ও জীবনাদর্শ কি, এই সম্বন্ধে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা গ্রন্থের প্রতি পাতায় অনুরণন তুলিয়াছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবন জীবিকার্জনের একটা অচেতন যন্ত্র মাত্র। ভিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীর নিকট জীবন জীবন-বিমুখীনতা—জীবনের গতিবেগকে অস্বীকার করিয়া স্রোতোহীন, সমগ্রতার সহিত নিঃসম্পর্ক, পল্বলের পঙ্ককুণ্ডে আরাম-শয়ন, চোরাবালিতে আটকাইয়া "মরুশয্যায় ধীর-সমাধি"। বুদ্ধিপ্রধান কালচারবিলাসীর দল জীবনকে সমস্ত বিভ্রান্তকারী, বিক্ষেপক্ষুব্ধ সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া স্বপ্ন-সৌন্দর্য-সৃষ্টি, সাহিত্য-আলোচনা, বিস্মৃতলুপ্ত অতীত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সৌখীন মানস-বিলাসে আত্মনিয়োগ করিতে চাহে। অধ্যাত্মবাদীরা অপার্থিব ধ্যানধারণার কৃত্রিম অভিনয়ে অন্ধ আত্মপ্রতারণাকে বরণ করে। এই সমস্ত বিভিন্ন পথেরই অন্তঃসারশূন্যতা অমিতের সত্যসন্ধানী মনের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার নিকট এগুলি শুধু "এহো বাহ্য" নয়, ভয়াবহরূপে ভ্রান্তও। সৌন্দর্যানুশীলন ও ইতিহাসচর্চায় তাহার যে সত্তার বিকাশ হইবে, তাহা ক্ষুদ্র, আত্মকেন্দ্রিক—সুতরাং বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুযোগে তাহার চিত্ত সময় সময় এই আদর্শাভিমুখী হইতে চাহিলেও, সে কঠোর আত্মদমনের দ্বারা এই আপাত-মধুর প্রলোভনকে জয় করে। মানব-জীবনের জয়যাত্রায় তাহার প্রকৃত কার্য—ইতিহাসের কল্পান্তব্যাপী ক্রম-বিকাশের মধ্যে বর্তমান যুগের স্থান-নির্ণয়, ও যে অনাগত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত ক্ষুব্ধ অনিশ্চয়ের মধ্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে তাহার সূতিকাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া মঙ্গলশঙ্খ-নিনাদে তাহার প্রত্যুদ্গমন। মহাকালের রথচক্রনির্ঘোষে জীবনের যে গতিচ্ছন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহারই সুরটি বর্তমানের সমস্ত উন্মাদ ছন্দোহীনতার মধ্যে উপলব্ধি করাই তাহার মননশীলতার প্রকৃত পরীক্ষা ও পরিচয়; বিশ্বছন্দের সহিত নিজ জীবনের সংযোগ-সাধন ও এই একাত্মতার আনন্দময় অনুভূতিই তাহার বৃহত্তর সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই মহত্তর চরিতার্থতার সম্ভাবনায় সে তাহার জীবনের সমস্ত অপচয়, খণ্ডিত অসম্পূর্ণতা, আপাতঃ-লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি, নিজকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া অণু-পরমাণুতে উড়াইয়া দেওয়া, আশাভঙ্গের অসহ্য তিক্ততা মূল্যস্বরূপ দিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই সে বুঝিয়াছে যে, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বর্তমান যুগকে আত্মবলিদান দিতে হইবে—সৃষ্টিসুষমা, চিন্তাস্থৈর্য, মননক্রিয়ার স্বচ্ছতা এক হিংস্র, মূঢ় কর্মপ্রবাহের পঙ্কিল আবর্তে তলাইয়া যাইবে। বৈপ্লবিকতার দিগন্তব্যাপী দাবানলের ধূম্রযবনিকার অন্তরালে নবযুগের অরুণোদয় হইবে।

বিপ্লববাদের দার্শনিক আশ্রয় ইহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসটির দার্শনিক মননশীলতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। ইহার সহিত মানব হৃদয়ের চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যুক্তিবাদের স্থিরতা আবেগ-জড়িত হইয়া মুহুর্মুহুঃ বিচলিত হইয়াছে। চিন্তার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর্মক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধা-দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অমিতের মন বারবার

সংশয়রুদ্ধ হইয়া উত্তরহীন জিজ্ঞাসার আবর্তে ঘূর্ণপাক খাইয়াছে। যে চিরন্তন, সমাধানহীন প্রশ্ন যুগে যুগে মানব চিত্তকে মথিত করিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিচিত্র পটভূমিকায়, তাহার পূর্ব সংস্কৃতির ও বর্তমান প্রয়োজনের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ-সংঘাতের কুরুক্ষেত্রে, পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বিপ্লবীর হিংস্র আঘাত ও উন্মত্ত আত্মবলিদানের রক্তপিচ্ছিল পথ দিয়াই কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের বিজয়-অভিযান সম্ভব হইবে? যে আদর্শের উদ্দেশ্য এত মহনীয়, তাহার উপায় কি এত হেয় হইবে? ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে নবসৃষ্টির বীজ কি সত্যসত্যই আত্মগোপন করিয়া আছে? এই সংশয়োত্তেজিত প্রশ্ন-পরম্পরার মধ্যেই উপন্যাসের **human interest.** এই প্রশ্নের কোন বাঁধাধরা উত্তর নাই বলিয়াই ইহা সমাজনীতি ছাড়াইয়া সাহিত্যের উপজীব্য হইয়াছে। স্বাধীন দেশসমূহেও এই প্রশ্ন শ্রেণীবৈষম্যসমস্যার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহার জীবন সব দিক দিয়া পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ, যিনি জীবনের বিচিত্র রসধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার চরম সার্থকতা সম্বন্ধে এইরূপে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি মূঢ় মূক জনসাধারণের মুখে ভাষা দিতে পারেন নাই বলিয়া খেদোক্তি করিয়াছেন ও ভবিষ্যতের যে কবি এই আদর্শ সফল করিবেন তাঁহার আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়াছেন। **Intense living,** অনায়ত্ত আদর্শের প্রাণপণ অনুসরণের ইহাই অপরিহার্য অভিশাপ।

উপন্যাসে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা **Virginia Woolf** প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের প্রভাবান্বিত। একদিনের পরিধির মধ্যে পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনার সাহায্যে বহুবর্ষবিস্তৃত কাহিনীটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। অমিত ও সুনীলের পূর্বজীবনে যে সমস্ত অর্থপূর্ণ অধ্যায় বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কান্বিত সেগুলি যথাযোগ্য প্রতিবেশে পুনঃসন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য অমিতের কলেজ-জীবন, তাহার সহজ বন্ধুপ্রীতি, জ্ঞানচর্চার পরিকল্পনা, স্বাভাবিক সুস্থভাবে জীবনযাত্রানির্বাহের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বর্তমান বিকৃত জীবনাদর্শের সহিত স্মৃতির সূত্রে গ্রথিত—কাজেই সেগুলি অপরিহার্য তুলনার প্রয়োজনে স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কিন্তু অমিতের স্মৃতিমন্থন করিয়া সুনীলের প্রাক্-বৈপ্লবিক জীবনের পুনরুদ্ধার ঠিক সেই পরিমাণে স্বাভাবিক ঠেকে না। যেখানে সুনীলের এই অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের সহিত অমিতের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, সেখানে তাহার স্মৃতিপথ বাহিয়া ইহাদের আবির্ভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। এইসব স্থানে মাত্র দুই-একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের সাহায্যে একের খোলে অন্যের শাঁস অনুপ্রবিষ্ট করাইবার দুর্বল চেষ্টা করা হইয়াছে। সুর বা সুধীরাকে যে কেবলমাত্র গৌণ উল্লেখের দ্বারা আমাদের নিকট পরিচিত করা হইয়াছে, তাহা হয়ত বেমানান না হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রাণীর প্রভাব এত প্রখর যে, তাহাকে সম্পূর্ণ অন্তরাল-বর্তিনী করাতে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারি না। অন্তত গ্রন্থমধ্যে ইন্দ্রাণীর স্থান যে ললিতা বা সবিতা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি শেষোক্ত রমণীদ্বয় আমাদের নিকট যত জীবন্ত, ইন্দ্রাণী সেরূপ নহে। তাহার বিপ্লববাদ রূপগৌরবের মত একটা বিলাস-ব্যসন ময়ূরের সপ্তবর্ণ পেখমের মত মেলিয়া ধরিবার বস্তু—ঠিক দুরূহ জীবনব্রত বা সাধনা নহে। ইহাই তাহার বৈপ্লবিকতার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাহার সমস্ত প্রকৃতিটি সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র অসংগতি সত্ত্বেও

উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্ব, ইহার আবেদনের তীক্ষ্ণতা অনস্বীকার্য। বৈপ্লবিক মনোভাবের বিশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় অন্তর্জালা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়।

ইহার দ্বিতীয় খণ্ড—'আর এক দিন'-এ বৈপ্লবিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়, সক্রিয় সন্ত্রাসবাদের অবসানে সাধারণ জীবনযাত্রার অনুবর্তন-প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন বিপ্লবী মুক্তি পায় ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থার উন্মাদনা তাহার প্রৌঢ় জীবন হইতে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন তাহার দেহে মনে যে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে তাহাই এই দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনীয় বস্তু। এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও সে ঠিক সাধারণ প্রতিবেশের সহিত একটা সুস্থ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে না। যে উন্মত্ত প্রেরণা তাহাকে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকার দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলিয়া দিয়াছিল তাহা কর্মের সোজা পথে মুক্তি না পাইয়া চিন্তা ও মননের মধ্যে জটিলতাজাল রচনা করিতে থাকে. মনের অন্ধ গহ্বরে আত্মকেন্দ্রিক আবর্তনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আগুনের দিকে তাকাইয়া যাহার চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে সে সাধারণ জীবনযাত্রার সহজ গতিছন্দটি অনুভব করিতে পারে না। নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরির চারিদিকে অঙ্গারস্তূপের ন্যায়, তাহার নির্বাপিত-বহ্নি জীবনকে ঘিরিয়া এক ম্লান-উদাস, সর্বদা বিশ্লেষণতৎপর, জীবনাবেগশূন্য দার্শনিকতার বালুকা-বলয় পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। জীবন-নদীর তীরে দাঁড়াইয়া সে ঢেউ গোণে, তাহার বেগবান প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে না। প্রখর মধ্যাহ্ন-দীপ্তিকে এড়াইয়া সে ম্লান অপরাহ্ণ-স্বপ্নের অলস কল্পনাজাল বুনিতে থাকে। হয়ত সে আমাদিগকে তাহার পরিণত জীবনদর্শনটি উপহার দেয়, কিন্তু বর্তমানের ঘটমান জীবন তাহার নিকট কোন নূতন প্রেরণা, কোন অপ্রত্যাশিত স্রোতোবেগ আহরণ করে না। ভূতপূর্ব বৈপ্লবিক তাহার অতীত জীবনের অগ্নিময় অভিজ্ঞতার স্মৃতি-অন্তরালে বর্তমানের প্রতি একটা সুদূর নির্লিপ্ত মনোভাব পোষণ করে—সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে প্রগতিশীল না হইয়া অতীতপন্থী হইয়া পড়ে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈপ্লবিকতার এই নিরুত্তাপ, আত্মমগ্ন পশ্চাৎ-পরিণতিই অঙ্কিত হইয়াছে—ইহাতে প্রচুর জীবন-সমালোচনা ও মননশীলতার পরিচয় আছে—জীবনের কলোচ্ছ্বাস নাই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উপন্যাসের নবরূপায়ণ—বনফুল

(১)

উপন্যাসের উদ্ভব-যুগে আমরা দেখিয়াছি যে, বহুবিধ উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ও মানবচিত্তবিশ্লেষণরূপ উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতায় উহাদিগকে সংহত করিয়া এই নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠে। উপন্যাসের স্বর্ণযুগের এই ভাব-ও-গঠন-সংহতি উহার সমস্ত বৈচিত্র্য ও আখ্যানবস্তুর নানামুখীনতার মধ্যেও উহাকে একটি নিবিড় আঙ্গিক-সমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীণ শিথিলতা ও বহুধা-বিভক্ত হইবার প্রবণতা একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। লেখকের অপক্ষপাত সত্যচিত্রণ যে কোন কারণে—হয় অতিরিক্ত উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতায় অথবা জীবনকৌতূহলের অনিয়ন্ত্রিত আতিশয্যে, কিংবা মেজাজের খেয়ালী ভ্রাম্যমাণতায়—বিচলিত হইলে উহার অন্তরের বিদারণ-রেখাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ও উহার মধ্যে সংমিশ্রিত বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলি ঐক্যবন্ধন অস্বীকার করিয়া আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। অতি-আধুনিক যুগে উপন্যাসের এই বিকেন্দ্রীকৃত রূপ আবার প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কেননা এযুগে মানবজীবন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসাকে অতিক্রম করিয়া এতৎ-বিষয়ক নানাবিধ অভিনব মতবাদ, উহার প্রবৃত্তিসমূহের উদ্ভট ব্যাখ্যা, তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক নিয়মশৃঙ্খলার লৌহনিগড়ে মানব-মনের অগণিত ও অপ্রত্যাশিত ক্রিয়াগুলিকে বাঁধিবার চেষ্টা, দ্রুত-পরিবর্তনশীল সমাজপ্রতিবেশে সম্ভাবিত সমাজবিন্যাসের কাল্পনিক রূপান্তরে, উহার অচিন্তিতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করিতেছে। যে ব্যক্তিসত্তার দৃঢ় রেখাবিন্যাস ও নানাপ্রকার বাহ্য অভিভবের মধ্যে অটুট মহিমা পূর্ববর্তী উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ বিষয় ছিল তাহা বর্তমানযুগে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অবস্থা-শাসিত ও মতবাদ-প্রভাবিত অনির্দেশ্যতায় অর্ধবিলীন হইয়াছে। চরিত্র এখন ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, বা মতবাদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উত্তাপে বাষ্পায়িত হইয়া নানা কিম্ভূতকিমাকার আকার ধারণ করিতেছে। এখন মানবাত্মা উহার স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভর মহিমা হারাইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রাম, জনসেবা বা অন্য কোনও আদর্শবাদমূলক প্রচেষ্টার সহযোগিতায় নিজ চরিত্রসমুন্নতির পরোক্ষ পরিচয় দিতেছে, রণক্ষেত্রের কৃত্রিম উন্মাদনার সাহায্যে সে গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। সহজ জীবনের শান্ত ছন্দে তাহার জীবনের কি রূপ ফুটিয়া উঠিত তাহা কেবল আমাদের অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রতিবেশ-শৃঙ্খলিত মানবসত্তা সম্বন্ধে লেখকের কৌতূহল ক্রমশ গৌণ হইয়া আসিতেছে; তাহার মুখ্য আকর্ষণ, নানা বিপরীত ঝটিকায় আন্দোলিত, বিরুদ্ধ মতবাদের তাড়নায় অস্থির, প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনের নৈতিক আশ্রয়ের উন্মূলনে ভারকেন্দ্রচ্যুত সমাজ-পটভূমিকা। অরণ্যে বন্য পশুর ন্যায় এই সমাজ-অরণ্যের গোলকধাঁধায় পথহারা মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতায় ছোটাছুটি করিয়া মরিতেছে—তাহার পলায়নের ত্রস্ততা, তাহার আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার মূঢ় প্রয়াসপরম্পরা, মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্পের বিপর্যয়ের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টাসমূহ আধুনিক উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

উপরি-উক্ত মন্তব্যসমূহ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের রচনার মধ্যে বিশেষ সমর্থন লাভ করে। বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু-সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। উপন্যাসের আঙ্গিক বা রূপরীতির মধ্যে নানা নূতনত্বের প্রবর্তনও তাঁহার অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। তাঁহার খেয়ালী ও দুঃসাহসিক কল্পনা মানুষকে নানা অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত মানস প্রতিক্রিয়াগুলিকে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তি ও হাস্যরসিকের উৎকেন্দ্রিকতা-বিলাসের সহিত উপস্থাপিত করিতে আগ্রহশীল। তাঁহার দ্রুতসঞ্চরণশীল ও বৈচিত্র্য-পিয়াসী মন কোন এক স্থানে স্থির হইয়া ব্যক্তিসত্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করিতে অনভ্যস্ত ও হয়ত অসমর্থ। খেয়ালের দমকা হাওয়া, পরীক্ষার অদম্য কৌতূহল, অন্বেষণের বহুচারী প্রেরণা ও অসঙ্গতি-আবিষ্কার-ও-উপভোগের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহাকে উপন্যাস-শিল্পের কেন্দ্রীয় আদর্শ অপেক্ষা উহার প্রত্যন্ত প্রদেশের অনিশ্চিত সীমারেখার প্রতি অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। উপন্যাসের সামগ্রিকতা ও ভাবনিষ্ঠা তাঁহার হাতে বিক্ষিপ্ত-বিখণ্ডিত হইয়া আদিম যুগের অসম্পূর্ণ পিণ্ডাবস্থায় ফিরিবার প্রবণতা দেখাইয়াছে—অথচ মননের শানিত দীপ্তি ও ক্ষিপ্রগতি মন্তব্য-আলোচনার উৎকর্ষ তাঁহার আধুনিক মনের পরিচয় বহন করে। তিনি গভীর অনুভূতির অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইবার শ্রম স্বীকার না করিয়া তাঁহার মানস দ্রুতির বায়ু-সঞ্চালনে চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছেন। তাঁহার রচনায় আদিম যুগের বিকলাঙ্গ বস্তুসমাবেশ ও আধুনিক যুগের সর্বত্রচারী, অতিমাত্রায় নব-নব-পরীক্ষা-প্রবণ, পথিকৃৎ মানসিকতার এক আশ্চর্য ও খানিকটা বিসদৃশ সমন্বয় ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন তাঁহার শিল্পীমন নূতন সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার ডাক্তারী ছুরি উপন্যাসের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা উহার বিভিন্ন-জাতীয় উপাদানগুলিকে পৃথক করিয়া নিজ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মিটাইতে চাহিয়াছে। তাঁহার শক্তিমত্তার চিহ্ন সর্বত্র সুপরিস্ফুট, কিন্তু এই শক্তির সহিত শক্তি-প্রয়োগে ঔদাসীন্য ও অবহেলার ভাবও মিশিয়া আছে। তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করিতে যতটা আগ্রহশীল, তাহার অপেক্ষা স্বল্পতম উপাদানে ও ক্ষীণতম ভাবসূত্রের অবলম্বনে উপন্যাসজাতীয় সৃষ্টি সম্ভব কি না তাহা প্রমাণ করিতে অনেক বেশী বদ্ধপরিকর। উপন্যাসের কঙ্কালের উপর রক্ত-মাংসের একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়া, নিজের মনোধর্মী প্রাচুর্যের ফুৎকার-বায়ু উহার নাসারন্ধ্রে সঞ্চার করিয়া, যবনিকার অন্তরাল হইতে পুতুলবাজির নিয়ন্ত্রণ-সূত্র আকর্ষণ করিয়া, উহাকে জীবন্ত ও প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ করা যায় কি না এই পরীক্ষাই তাঁহার উপন্যাস-রচনার মুখ্য প্রেরণা বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, মনস্তত্ত্বঘটিত জটিল সমস্যা ও প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিবর্তনধারার সরস ও তথ্যপূর্ণ চিত্র প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে প্রবর্তন করিয়া তিনি যে উপন্যাসের পরিধি-সম্প্রসারণে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাও তাঁহার কৃতিত্ব-পরিমাপকালে স্মরণ করিবার যোগ্য।

(২)

বনফুলের রচনার প্রথম পর্বে যে কয়েকখানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহারা তাঁহার

ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। রোগগ্রস্ত জীবনে মানব মনস্তত্ত্বের যে বিকৃত, সমস্ত সংযমের বাঁধ-ভাঙা, আত্মকেন্দ্রিক রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়, লেখকের কৌতূহল উহারই পর্যবেক্ষণে ও চিত্রাঙ্কনে। ইহার সঙ্গে লেখকের নিজের একটি কাব্যপ্রবণ, আত্মভোলা, মননক্রিয়াবিষ্ট ব্যক্তিসত্তারও পরিচয় মিলে। এই উভয় উপাদানের সমাবেশেই লেখাগুলির উপন্যাসধর্মিত্ব অনুভূত হয়। ডাক্তারের দিনলিপি বা পূর্বস্মৃতিমন্থন, কবি-প্রেমিকের আত্মবিশ্লেষণমূলক ভাবোচ্ছ্বাস ও দার্শনিকের ঈষৎ উদাস, দূরদিগ্‌বলয় প্রসারিত জীবনালোচনা মিলিয়া এক প্রকারের উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত রচনায় মানব-মনস্তাত্ত্বিক অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ—এগুলিকে কোনও বৃহত্তর তাৎপর্য-সূত্রে গাঁথিয়া তোলার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। মনোজগতের এই তারকাগুলি এক একটি সংকীর্ণ কক্ষপথকেই আলোকিত করিতেছে, তাহাদের রশ্মিসমূহ সংহত হইয়া মানবের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তহীন রহস্য ও জটিলতার সন্ধান দেয় না। 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'বৈতরণী-তীরে' (১৩৪৩), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৪), 'সে ও আমি' (১৩৫০), 'অগ্নি' (১৩৫৩) প্রভৃতি রচনাকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

'তৃণখণ্ড'-এ ডাক্তারি ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার মারফৎ এক ভাবুক লেখকের মানবজীবনের অসহায়তার উপলব্ধি বিবৃত হইয়াছে। অসুস্থ জীবনের নানাপ্রকার স্ববিরোধপ্রবণতা, করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা বিভিন্ন রোগের কাহিনীর মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কাহিনীগুলির মধ্যে লেখকের মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশগুলি কোন পূর্ণ সত্যের ইঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয় নাই। কাল-স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডগুলি অজানার উদ্দেশে চলিয়াছে, কখনও কখনও স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে উহাদের নিম্নদিকটা উল্টাইয়া গিয়া অতর্কিত অনুভূতির সূর্যকিরণে ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া মানব-মনের গভীরশায়ী রহস্যরূপ মত্ত মাতঙ্গকে বাঁধিবার শক্তি অর্জন করে নাই। 'বৈতরণী-তীরে' গ্রন্থে ডাক্তারি অভিজ্ঞতার আর একটা ভয়াবহ, বীভৎস দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—যাহারা আত্মহত্যার পথে অস্বাভাবিক, জ্বালাময় মৃত্যু বরণ করিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে ডাক্তারের তীক্ষ্ণধার ছুরির বিদারণ-রেখাচিহ্নিত হইয়াছে, সেই প্রেতমূর্তিগুলি হঠাৎ এক দুর্যোগময় রাত্রে ডাক্তারের স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তাহার চারিদিকে ভিড় জমাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতলোকের রহস্যবোধের পরিবর্তে মানসিক অন্তর্জ্বালা ও কৌতূহলই বেশী মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলেই জানিতে চাহে যে, ডাক্তারের ছুরির তীক্ষ্ণাগ্রভাগে তাহাদের অন্তরের গোপন ব্যথা কতটা বাহিরে আসিয়াছে—ইহারা পৃথিবীর কাদাকাঁটির জের পরলোকে পর্যন্ত টানিয়া আনিতে চাহে। ডাক্তারের নিজের পারিবারিক বিপৎপাত ও প্রণয় লোলুপতা তাহাকে এই প্রেতলোকের আসরে প্রধান শ্রোতা হইবার যোগ্যতা দিয়াছে, এই বীভৎস অপরাধ-স্বীকৃতির ঐকতানে সে নিজের জীবনসমুত্থিত একটি অনুরূপ সুর মিলাইয়াছে। পাপ ও অসংযত কামনার নানা অনুতাপ-বিদ্ধ, অন্তর্জ্বালা-জর্জরিত খণ্ড চিত্র একত্র সমাবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানির মূল-সুরে খানিকটা ঐক্যের সঞ্চার করিয়াছে।

'কিছুক্ষণ' গ্রন্থে ট্রেন-দুর্ঘটনায় একটা ছোট স্টেশনে প্রতীক্ষমাণ যাত্রীগুলির স্বল্পকালীন একত্রাবস্থিতির মধ্যে যে ছোট-খাট মানবিক সম্পর্কের সূচনা হইয়াছে, ক্ষুদ্র সংঘাতের যে মৃদু কম্পন জাগিয়াছে তাহাদের একটি সরস, উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব নাই, আছে ঝিরঝিরে নদীর মৃদু ঢেউ-এর ন্যায় একটি সরল ঘটনা-প্রবাহ ও উহাতে প্রতিবিম্বিত মানব-প্রকৃতির একটি অস্পষ্ট ছায়ারূপ। বিভিন্ন জনসমষ্টির বিভিন্ন প্রকার আচরণ, কাহারও ইতরতা, কাহারও ভয় ও ধৃষ্টতা, কোন পরিবারের দুর্ভাগ্যের করুণ, বেদনাময় ইঙ্গিত, কাহারও বা অপরিচিতের সহিত বন্ধুত্ব জমাইবার আগ্রহ, স্টেশন কর্মচারীদের পয়েন্টসম্যানকে বাঁচাইবার জন্য ছেলেমানুষী ষড়যন্ত্র—এই সমস্তই জলে ঢিল ফেলিবার ফলে তরঙ্গবৃত্ত-প্রসারের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার কেন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত মৃদু কম্পনরেখারূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাখনবাবুর চরিত্র ও দাম্পত্যজীবন আপেক্ষিক স্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। লেখক এখানেও ডাক্তারি ছাত্র, তবে খানিকটা সংবেদনশীল হৃদয় ছাড়া গ্রন্থমধ্যে তাহার বিশেষ ব্যক্তি-পরিচয় পাই না। স্বল্পতম উপকরণের সাহায্যে ঔপন্যাসিক রস-সৃষ্টি-প্রয়াসের ইহা একটি সুন্দর নিদর্শন।

'অগ্নি' (১৩৫৩) সময়ের দিক দিয়া অনেকটা পরবর্তী হইলেও রচনা-ভঙ্গীতে প্রথম পর্বের অনুরূপ। ইহার গঠনপ্রণালী প্রথম পর্বের ন্যায় episodic, অর্থাৎ ইহা নানা খণ্ড-উপাখ্যানের সমবায়ে গঠিত ও নানা বিচ্ছিন্ন ভাবোচ্ছ্বাসের একমুখীনতায় কেন্দ্রসংবদ্ধ। ইহার বিষয় বাংলা উপন্যাসের অতি-পরিচিত আগস্ট-আন্দোলন, তবে ইহার উপস্থাপনায় উচ্ছ্বাসাধিক্য ও কাব্যময়তার সঙ্গে বনফুলের অভ্যস্ত স্বকীয়তার নিদর্শন মিলে। অংশুমান এই আগস্ট আন্দোলনের নেতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যের প্ররোচকরূপে ধৃত হইয়া কারাগারে বন্দী ও তাহার নিকট স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য পুলিশী জুলুমে অতিষ্ঠ। সে এই কারাকক্ষে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি বই পড়িবার অনুমতি পাইয়াছে এবং সদা-উত্তেজিত ও একনিষ্ঠ কল্পনার বশে বিজ্ঞান-রাজ্যের সমস্ত মহারথিবৃন্দকে তাহার তীব্র মানস সংঘাতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্নরূপে অনুভব করিতেছে। তাহার নিঃসঙ্গ চিন্তাজাল ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্মম প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর নীতি-বিশ্লেষণের মধ্যে এক একজন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক তাহার উত্তপ্ত কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া নিজ জীবন-অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি হইতে তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন ও তাহার ক্ষীয়মাণ মানস শক্তিকে পুন-রুজ্জীবিত করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী ছাড়া আর যে সমস্ত দিব্য আত্মা কারাকক্ষে অংশুমানের নিকট প্রেরণা বহন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন জয়দেব-বর্ণিত শ্রীভগবানের দশম বা কল্কি অবতার ও স্বামী বিবেকানন্দ। হয়ত ইহারা ক্ষাত্র শৌর্যের ও সংগ্রামশীলতার আদর্শরূপেই অংশুমানের মানস অবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন মধ্যযুগের চিত্রাবলীতে দেবদূত ও ধর্মসাধকদের প্রতিকৃতিতে আমরা একটি জ্যোতির্বলয়-বেষ্টনী দেখিতে পাই, তেমনি অংশুমানের আত্মমগ্ন চিন্তা এক একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্পর্শে আদর্শলোকের দিব্যবিভামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শ-কল্পনা-বিহারের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব জগতের দারোগা, CID প্রভৃতির আনাগোনা, স্বাধীনতা-অভিযানের মধ্যে যে অদম্য শৌর্যের ইতিহাস আছে তাহার ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ-বিকিরণ

ও ইহাদের সঙ্গে অংশুমানের পূর্বস্মৃতি-অবগাহন উপন্যাসটিকে বস্তুজগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ অন্তরা সেনের মানস বিপর্যয়ের কাহিনী। প্রথম অংশে কল্পনার আধিক্যের প্রতিষেধকস্বরূপ দ্বিতীয় অংশে কমিউনিজমের তীক্ষ্ণ ও মননসমৃদ্ধ মতবাদ-বিশ্লেষণ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্তরা ও তাহার প্রণয়ী ও পতিত্বে বৃত নীহার সেন উভয়েই কমিউনিস্ট দলের উৎসাহী সভ্য ও সমর্থক ছিল। নীহার ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটিগিরি গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহার পূর্ব মতবাদে অবিচলিত—এই চাকরী-গ্রহণ তাহার রণকৌশল মাত্র, পূর্ব আদর্শের প্রত্যাহার নয়। সে আগস্ট আন্দোলনকে নির্মম হস্তে দমনে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়াছে, কেননা ইংরেজ রাশিয়ার মিত্রশক্তি ও মহাযুদ্ধের সংকটমুহূর্তে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টির অর্থই হইল ফাশিষ্ট শক্তির বিজয়ের পথ পরিষ্কার করা। সুতরাং নৃশংস নির্যাতনের মধ্যেও তাহার বিবেকে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই। কিন্তু অন্তরার মানস ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কমিউনিজমের ফাঁকি সম্বন্ধে অত্যন্ত উগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের বহুবিঘোষিত সাম্যবাদ যে পরশ্রীকাতরতার ছদ্মবেশ মাত্র তাহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু এই মত-পরিবর্তনের মূলে যাহা ক্রিয়াশীল তাহা নূতন সত্য-আবিষ্কার নহে, অংশুমানের ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় আকর্ষণ ও তাহার বীরোচিত আচরণের মুগ্ধকারী প্রভাব। অংশুমানের জন্য অন্তরার অন্তর্দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে কিন্তু শক্তিমত্তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে—তাহার অস্বস্তি, উদ্দেশ্যহীন গতিবিধি ও মানস উদ্‌ভ্রান্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি—পুলিশ ইন্‌সপেক্টরকে ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা—একটু আকস্মিক ও তাহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আগস্ট আন্দোলনের অগ্নিযুগের দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে, অন্তরার পক্ষে এইরূপ সাংঘাতিক কার্যানুষ্ঠান, হত্যার অতর্কিত সংকল্প-গ্রহণ ঠিক অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে। তবে তাহার চরিত্রের যে পূর্ব পরিচয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এরূপ নৃশংস, বে-পরোয়া ভাবের কোন ইঙ্গিত মিলে না। শেষ দিনে ফাঁসিমঞ্চের সম্মুখে অংশুমান ও অন্তরা একই চরম শাস্তির বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

'সে ও আমি' উপন্যাসটি লেখকের আঙ্গিকবিষয়ক অভিনবত্ব প্রবর্তন-প্রয়াসের একটি দৃষ্টান্ত। ইহাতে কোন পূর্বাপর-সম্বন্ধ আখ্যায়িকা আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ। ইহার মধ্যে যাহা সত্যই ঘটিয়াছে. যাহা বর্তমানে ঘটিতেছে, যাহা ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই, ও যাহা রূপকরূপে নায়কের চিন্তাধারার মধ্যে একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দিতেছে—এ সমস্তই মিশিয়া গিয়া এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। বাস্তব ঘটনা, অতীত ও বর্তমান, তীব্র-আকূতি-প্রসূত স্বপ্ন-বিভ্রম, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাজাল, অন্তর-সত্তার দ্বিধা-বিভক্ত বহিঃপ্রকাশ—সবই অঙ্গাঙ্গীরূপে পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া মনোলোক-গহনতার একটি রূপকচিত্র রচনা করিয়াছে। মেঘলা দিনের মেঘ-চোঁয়ানো ঘোলাটে আলোর সাহায্যে বেলার পরিমাপের মত আখ্যানের ক্রমপরিণতিনির্ণয় অনেকটা অনুমানসাপেক্ষ। 'সে ও আমি' উপন্যাসের এই নামকরণের বিশেষ তাৎপর্যটি লেখক সম্পূর্ণ পরিষ্কার না করিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা অনুধাবন করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার ন্যায় 'সে'

নায়কের সত্তারই একটি অন্তরশায়ী রূপ—তাহার জীবনের সমস্ত জটিলতাজাল, আত্মপ্রবঞ্চনা, স্ব বিরোধী অভিপ্রায়সমূহের কেন্দ্রস্থ সত্য পরিচয়, তাহার স্বচ্ছ ও ধূম্রাবরণভেদী অন্তর্দৃষ্টি, তাহার গহন কামনালোক হইতে উদ্ভূত, অভিসারিণী নারীরূপে পরিকল্পিত আত্মবোধ। অবশ্য এই অন্তর্গূঢ় পরিকল্পনাটি যে উপন্যাসে সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে এরূপ দাবি করা যায় না। 'সে' অকস্মাৎ নায়কের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহার অনেক গোপন দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসন্তুষ্টিকে বিড়ম্বিত করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত তাহাকে সদুপদেশ দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ দিয়াছে। কিন্তু সে যে নায়কের অন্তর-সত্তারই ছায়া, তাহার আত্মপরিচয়েরই একটি অভ্রান্ত মানদণ্ড তাহা মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্যতার সহিত প্রতিপন্ন হয় নাই। তাহার আবির্ভাবের আকস্মিকতা ও পৌনঃপুনিকতা, তাহার চটুল ও সময় অসময় উদ্দেশ্যহীন সংলাপ, তাহার মুরুব্বিয়ানা চাল ও অলৌকিকত্বের ভড়ং অস্খলিত মনস্তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা খেয়ালী কল্পনা-বিলাসেরই অধিক অনুরূপ। নায়কের অবচেতন মন যে মূর্তি ধরিয়া তাহার চেতন-সত্তার সম্মুখীন হইয়াছে ও তাহাকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—লেখকের এই অভিপ্রায়নিহিত তত্ত্ব উপন্যাসোচিত রসস্ফূর্তি পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

এই পূর্বস্মৃতি, কল্পনা, রূপক ও ঘটমান কাহিনী যে দুনিরীক্ষ্য আঙ্গিকের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রেমসিন্ধু ও মালতীর হৃদয়সম্পর্কজনিত সমস্যাই খানিকটা সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রেমসিন্ধু মালতীর পিতার অর্থসাহায্যে আই সি এ. পাস করিবার উদ্দেশ্যে বিলাত গিয়া সেখানে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজ ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে মহত্ত্বের কিছু স্পর্শ ছিল, সেই জন্য মালতীর কপটতামূলক প্রত্যাখ্যান-পত্রের আক্ষরিক অর্থ করিয়া সে মালতীর উপর সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছে ও গবেষণাব্রতী গোবর-গণেশ রমেশের সঙ্গে মালতীর বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছে। কিন্তু এই আকর্ষণের বীজ তাহার অন্তরের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে—যতই সে এই প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে, ততই ইহার গোপন অস্বস্তি প্রচ্ছন্ন বহ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় তাহার সুখশান্তি বিধ্বস্ত করিয়াছে, ও উহাকে একদিকে নানা স্বপ্নরোমন্থনে আবিষ্ট ও অন্যদিকে নানা খাপছাড়া, এলো-মেলো কাজের গোলকধাঁধায় ঘুরাইয়া মারিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মালতী তাহার প্রতি ভালবাসার পরোক্ষ পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু প্রেমসিন্ধুর বিবেক-সত্তা তাহাকে গরীবের মেয়ে মিনতিকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়া তাহার উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতাকে একটা স্থির পরিণতিতে লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসটিতে আঙ্গিকের অভিনবত্ব লক্ষণীয়, ও চরিত্র বিশ্লেষণও নানা কল্পনাস্বপ্নের বিচিত্র ছায়াছবির রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সচেতন মনের রূপরেখার পরিবর্তে অবচেতন কামনালোকের স্বপ্নসঞ্চরণই এখানে চরিত্র-পরিচিতির প্রধান অঙ্গ ও উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। লেখকের কলাকৌশল ও চিত্রণ-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ভবিষ্যৎ রূপের কতটা সার্থক ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা সংশয়ের বিষয়।

(৩)

পরবর্তী পর্বে 'দ্বৈরথ' (বৈশাখ, ১৩৪৪), 'মৃগয়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭), ও 'নির্মোক' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) লেখকের উপন্যাস-রচনার আর একটি স্তরের নিদর্শন। এগুলিতে লেখক

মোটামুটি উপন্যাসের নির্দিষ্ট গঠন-প্রণালীরই অনুবর্তন করিয়াছেন ও আঙ্গিকের ব্যাপারে তাঁহার পরীক্ষামূলক মনোভাবকে অনেকটা সংযত করিয়াছেন। 'দ্বৈরথ'-এ পারিবারিক সম্পর্কের দিক দিয়া নিকট আত্মীয় দুই জমিদারের পরস্পরের রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী এই দ্বৈরথ যুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার রণনীতি অবলম্বন করিয়াছে। একজন দুর্দান্ত গোঁয়ার ও হঠকারী, আর একজন শান্ত ও মার্জিতরুচি, কিন্তু বাহিরের এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরে একই প্রকারের অনমনীয় দার্ঢ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্প ক্রিয়াশীল। ইহারা হয়ত পূর্বশতকের জমিদারগোষ্ঠীর খামখেয়াল ও নিরঙ্কুশ শক্তিমত্তার যথার্থ প্রতিচ্ছবি, কিন্তু ইহাদের গোষ্ঠীপরিচয় অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিসত্তারহস্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে ইহাদের চরিত্রচিত্রণে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু মোটের উপর লেখক ঘটনার চমকপ্রদ অনুসরণেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, চরিত্ররহস্য উদ্ঘাটনে তাঁহার সেরূপ আগ্রহ নাই। কল্পনার প্রবলবায়ু-তাড়িত হইয়া ঘটনার পর ঘটনা দ্রুতগতি ছায়াচিত্রের ন্যায় আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথাও রহিয়া-সহিয়া উপভোগ করার, ঘটনার পিছনকার মানস প্রেরণা পর্যন্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবসর নাই।

'নির্মোক' উপন্যাসে আবার ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এবার খণ্ডাংশের সাংকেতিক অর্থগূঢ়তার পরিবর্তে ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী উপন্যাসের অবয়ব গঠন করিয়াছে। বেকার বিমল যে আত্মজীবনী শুরু করিয়াছিল, চাকরী পাওয়ার পর তাহাতে আকস্মিক ছেদ পড়িয়াছে। আবার একেবারে পরিসমাপ্তিতে এই আত্মজীবনীর পরিত্যক্ত সূত্র পুনঃসংযোজিত হইয়াছে। প্রারম্ভে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ও সেখানকার শিক্ষার ইতিহাস, শেষে ডাক্তারী জীবনের পরিণত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত দার্শনিক মূল্যায়ন। মাঝের অধ্যায়গুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গী-পরিবর্তনের কারণনির্দেশরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মোটামুটি এই জীবন-ইতিহাসে অসাধারণ কিছু নাই, আধুনিক দলাদলি ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার অধিকার লইয়া নীতিজ্ঞানহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে প্রায় প্রত্যেক চাকুরে ডাক্তারের সাধারণ জীবনই ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। রোগীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও তাহাদের সহিত আচরণের মানবিকতা, হাসপাতাল কমিটির সদস্যদের মন যোগাইয়া চলা, নানা মেজাজের লোকের সঙ্গে পরিচয়, অন্যান্য স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-সহযোগিতা-মিশ্রিত সম্বন্ধের তারতম্য, সামাজিক মেলামেশায় প্রীতি-সৌহার্দ্যের সঙ্গে কুৎসাকলঙ্করটনার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব—ইত্যাদি বিষয়ই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে অধিকার করিয়া আছে। একটি উপভোগ্য, সরস কাহিনী-বিবৃতি ও এই প্রসঙ্গে চরিত্রের কিছু স্বল্প আভাস—ইহাই উপন্যাসটির আকর্ষণ। কোথাও কোন গভীর উপলব্ধি বা অনুপ্রবেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

'মৃগয়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭) রচনাটি একাধারে লেখকের বিষয়নির্বাচনে ও পটভূমিকা-রচনায় অনায়াস-নৈপুণ্য ও সঙ্গে সঙ্গে উহাদের সার্থকতম প্রয়োগ সম্বন্ধে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যের নিদর্শন। লেখক যেন উপন্যাসের একটি চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া নিজের খেয়ালী কল্পনাবিলাস ও দায়িত্বপালনে অসহিষ্ণু, যদৃচ্ছ সংক্রমণশীল মনোভাবের

প্রভাবে ঐ পরিকল্পনাটিকে অসমাপ্ত রাখিয়াই গ্রন্থটি শেষ করিয়াছেন। গদ্যছন্দপ্রধান কাব্য, গদ্য ও নাটকে লেখা এই রচনাটি লেখকের ত্রিধা বিভক্ত প্রকৃতিরই যেন যথার্থ প্রতিরূপ। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও চরিত্রসমূহের প্রারম্ভিক পরিচয় গদ্য কবিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিসদৃশ, পরিহাস-তরল বাহনের মধ্য দিয়া লেখক জমিদার-পরিবারের তিন ভ্রাতা, তাহাদের তিন স্ত্রী, ও অন্যান্য পরিজন ও পারিষদবর্গসমন্বিত গ্রামপরিমণ্ডলের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রবিশ্লেষণ, সরস বিবৃতি ও জীবনরস-উচ্ছলতার অপূর্ব সমন্বয় আমাদের চিত্তকে একটি পরিণাম-রমণীয় প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা-চঞ্চল করিয়া তোলে। বিশেষতঃ ভাইদের চরিত্র ও তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বিশিষ্টতার মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা নিহিত আছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। গদ্যে রচিত ঘটনাবহুল দ্বিতীয় খণ্ড 'পথে' অভিজাতবংশীয়দের অনেকটা গৌণ স্থান দিয়া, মৃগয়াব্যাপারে অনুগামী প্রাকৃত শিবির-সহচরদের ছোট-খাট হৃদয়-সংঘাত, ও যাত্রাপথে বিঘ্ন-বিপদ-বিসদৃশসংঘটনের চিত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উচ্চবংশীয়দের অন্তরে যে ভাবের ঢেউ উঠিয়াছে তাহারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, একটা মৃদুতর কম্পন যেন সহচরদের অন্তরেও অনুরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। বৃহৎ সরোবরে বড় মাছের আলোড়নের সঙ্গে ছোট-ছোট পুঁটি-সফরী-মাছেরও উল্লম্ফন সমগ্র পরিবেশকে একটা উদ্বেল প্রাণোচ্ছলতায় স্পন্দিত করিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড 'প্রান্তরে', জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ফাঁকা মাঠে যে সারি সারি তাঁবু খাটান হইয়াছে তাহারই অনভ্যস্ত পরিবেশে পরিচিত নর-নারীর এক অভূতপূর্ব, অপরূপ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সারা জীবনের ছদ্মবেশ, লৌকিক মানসম্ভ্রম-অভিনয়ের বহিরাবরণ যেন জ্যোৎস্নাধারার ও গোগুনিয়ার নৃত্যের মাদকতায় একমুহূর্তে খসিয়া পড়িয়াছে। বড়বাবু মদ খাওয়া ভুলিয়া বড় বৌ-এর রূপ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়াছেন; বড় বৌ তাঁহার জীবনব্যাপী আত্মনিরোধকে এক অবারিত আত্ম-উন্মোচনের অদম্য প্রেরণায় বিসর্জন দিয়াছেন—প্রৌঢ় দম্পতি আজ চন্দ্রালোকে পাশাপাশি বসিয়া সমস্ত ব্যবধান সরাইয়া পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হইয়াছেন। মেজবাবু ও মেজ বৌ আজ দাম্পত্য-নিবিড়তায় পরস্পরের মধ্যে ফাঁককে পুরাইয়া ফেলিয়াছেন। মেজবাবুর বন্য দুর্বারতা আজ স্বেচ্ছায় বশ্যতা মানিয়াছে; মেজ বৌ-এর অতন্দ্র গৃহিণীপনা আজ প্রথম যৌবনের বসন্ত-পবনে ঈষৎ বিচলিত, আজগুবি খেয়ালের মাদকতায় আত্মবিস্মৃত। শেষে তিনি তাঁহার চিরকালের কর্তব্যবদ্ধ পদাতিক জীবন ছাড়িয়া স্বামীর সহিত হাতীর পিঠে সওয়ারি হইয়াছেন, জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের মধ্যে এক স্বপ্নময় কল্পনাবিলাসের অনির্দেশ্য আহ্বানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ছোটবাবু ও ছোট বৌ-এর দাম্পত্য লীলা আরও উদ্দাম ছন্দে ও চমকপ্রদ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছোট বৌ পুরুষের ছদ্মবেশে স্বামীর সহিত বাদল ডাক্তারের মোটর-বাইকের পার্শ্ব-আসন অধিকার করিয়া তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের বেড়ী-পরা চঞ্চলতাকে এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবিহারে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। এক উতলা বায়ু যেন প্রত্যেককেই তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ভারকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া, তাহার আত্মসংবৃতির যবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত করিয়া, তাহার গহন-মন-সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে

মুক্তি দিয়াছে ও তাহার সত্তার একটি নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এমন কি বৃদ্ধা ঠাকুরমা পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে হরিনামের জপের মালার পরিবর্তে স্মৃতির তলদেশে সুপ্ত অতীত প্রেমের প্রতীক-স্বরূপ শুক ফুলের মালা অঙ্গুলিতে আবর্তিত করিয়া চলিয়াছেন। শেক্স‌পিয়রের নাটকের ন্যায় যেন কোন রহস্যময় দৈবশক্তি নর-নারী-সংঘের সমস্ত সতর্কতাকে প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের গোপন অভিলাষের ছন্দে পরিচালিত করিতেছে। উষা হীরেনের সঙ্গে দোলনায় দোল খাইতেছে, নূতন জামাই সুরেন কোন-না-কোন অজুহাতে উষার বান্ধবী মীনার নিত্যসহচররূপে আবির্ভূত হইতেছে। প্রাত্যহিক জীবনের অলক্ষিত প্রবণতাগুলি এই জ্যোৎস্নারজনীর কুহক-মন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছেলেপিলেদের আবদারে হরিশখুড়ো যে রূপকথা শোনাইয়াছেন—যাহাতে রাজকন্যা চম্পাবতী তাহার প্রণয়-ভিখারী সূর্যদেবকে চোরকুঠরিতে বন্দী করিয়া জ্যোৎস্নার রাজত্বকে চিরস্থায়ী করিয়াছে—তাহাতেই যেন এই আখ্যায়িকার মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। এক অবাস্তব মায়া বাস্তব জীবনের প্রখর সূর্যালোককে অভিভূত করিয়া প্রত্যেক চিত্তে স্বপ্নাবেশের ক্ষণিক বিভ্রান্তিকে চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এমন কি যে বাঘ-শিকারের জন্য এত রাজকীয় আয়োজন, সেই বাঘও এই জ্যোৎস্না-বিহ্বলতার বশবর্তী হইয়া বাঘিনীর গা চাটিতে চাটিতে শিকারীর লক্ষ্যের বাহিরে প্রণয়-অভিসার-যাত্রায় আত্মগোপন করিয়াছে। এই স্বপ্নমায়াভরা রজনীতে দুইটি সক্রিয় শক্তি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—এক কৌমুদীর কুহক-মন্ত্র, অপরটি গোহমনির মদিরা-বিহ্বল পরী-নৃত্য। উপন্যাসের কঠোর বাস্তবতা এক গীতিকবিতার অনির্দেশ্য সাংকেতিকতায় বিলীন হইয়াছে।

(৪)

বনফুলের রচনার তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলি—'মানদণ্ড' (১৩৫৫), 'নবদিগন্ত' (১৩৫৬), 'কষ্টিপাথর' (১৩৫০), 'পঞ্চপর্ব' (১৩৬১), 'লক্ষ্মীর আগমন' (১৩৬১) খানিকটা বিষয়গত ও রীতিগত পরিবর্তনের নিদর্শন। এগুলি মোটামুটি ঘটনা ও মনস্তত্ত্বপ্রধান; ইহাদের মধ্যে এক 'লক্ষ্মীর আগমন' ছাড়া অন্যত্র স্বপ্নময় সাংকেতিকতা ও আখ্যানের ধারাবাহিকতা পরিহারের প্রভাব তাদৃশ লক্ষণীয় নহে। 'মানদণ্ড'-এ বৈজ্ঞানিক আদর্শবাদ, খেয়ালী ও ললিতকলাসক্ত আভিজাত্যবোধ, হিংসাপ্রণোদিত ও ধ্বংসাত্মক মন্ত্রে দীক্ষিত রাজনৈতিক মতনিষ্ঠা ও দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়ায় আন্দোলিত, রাজনৈতিক মতবাদ ও মানবিক কোমলতার মধ্যে দ্বিধাবিভক্তচিত্ত নারী-প্রকৃতি—এই সব নানা বিপরীতধর্মী চরিত্র ঘটনার এক অদ্ভুত ও আকস্মিক আলোড়নে পরস্পরের উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়া, এক দারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এতগুলি বিভিন্ন রকমের উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের একত্র সমাবেশ যে রস উৎপাদনের হেতু হইয়াছে তাহা প্রধানত উদ্ভট অসঙ্গতিমূলক। তথাপি লেখকের সৃষ্টিনৈপুণ্যে চরিত্রগুলি একেবারে অবাস্তব হয় নাই। মেঘসুন্দর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপজাতীয় হইলেও লেখকের সহানুভূতি-স্পর্শে জীবন্ত। তুঙ্গশ্রী প্যাঁচালো বুদ্ধিতে হিরণ্যগর্ভের নিকট হার মানিয়া ক্রমশ উহার চরিত্রগৌরব ও কর্মশক্তির জন্য উহার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। কেশব সামন্তের প্রতি তাহার ক্রমবর্ধমান বিরাগ তাহার চরিত্রে খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছে। হিরণ্যগর্ভ ঘোরতর

আদর্শবাদী হইলেও, formula অনুসারে জীবন যাপন করিলেও তাহার সহজ সহৃদয়তা ও সপ্রতিভতা, তাহার কৌতুকপ্রবণতা ও ফিকির-ফন্দী-নৈপুণ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাহার মৌলিক চিন্তাপদ্ধতি তাহাকে আদর্শ পুরুষের অবাস্তবতা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণবায়ুচঞ্চল করিয়াছে। সকলের উপর লেখকের বে-পরোয়া কল্পনা সম্ভব-অসম্ভব, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের ভেদরেখা বিলুপ্ত করিয়া অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইয়াছে। পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তাঁহার কোন মাথা-ব্যথা নাই। চুল চিরিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিলে যাহা সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করিত, লেখকের প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়, তাঁহার নিজের নিঃসংশয় ভাললাগা, তাঁহার কল্পনা-কৌতুকের নিরঙ্কুশ লীলা-প্রবাহ সেই সমস্ত আপত্তিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বানরের উপর টাইফয়েড বীজাণুর পরীক্ষা কার্যকরী হওয়াতে ভৃঙ্গশ্রীর মুখে যে প্রসন্নতা দেখা দিয়াছে, তাহা যেন প্রেমের অরুণরাগের অগ্রদূত-রূপেই লেখক পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় যে, উপন্যাসে সঞ্চিত কৌতুকরস যে মিলনের মধুররসের পূর্বাবস্থা এই ইঙ্গিত দিয়া লেখক উপন্যাসের খাপছাড়া ঘটনাগুলিকে আরও অপ্রত্যাশিত-চমক-চকিত করিয়াছেন।

'নবদিগন্ত' বনফুলের পক্ষে অনভ্যস্ত, অথচ প্রচলিত রীতিসম্মত উপন্যাস। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, এবং এই আলোচনার সহিত লেখকের সরস ও কৌতুককর কল্পনা মিশ্রিত হইয়া মনস্তত্ত্বের গাম্ভীর্য অনেকটা লঘু হইয়াছে। সূর্য চৌধুরী ও তাঁহার বন্ধু গোবিন্দ সান্ন্যালের পারস্পরিক মনোভাব-বিনিময় এই কূট মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেয়। দিবসের দিবাস্বপ্নবিভোরতার মধ্যেও মানস ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়মাধীনতার দৃঢ় বেষ্টনীরেখা আছে। কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ বিষয় জীবনচর্যার কতকগুলি পরীক্ষামূলক নবরূপায়ণ-প্রচেষ্টা। দিবস ধনী পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া মেসের চাকরের হীন বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে—শারীরিক শ্রমের মর্যাদা দ্বারা সে বুদ্ধিসর্বস্ব জীবনের ফাঁকিকে পূরণ করিতে চাহিয়াছে। আবার রঞ্জনা দিবসের সহিত একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াও কলুষিত যৌন আকর্ষণকে প্রতিরোধ ও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। দিবসের বাসস্থানও বেশ্যাপল্লীতে ও সে বস্তিবাসিনী নারীদের সহিত একটা নিষ্কলুষ আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। দিবসের বন্ধু কিরণ ট্রাম কণ্ডাক্টারির সঙ্গে কবিত্বচর্চাও করিয়া থাকে। ঊর্মি সমস্ত যৌন সংস্কার বিসর্জন দিয়া কিরণের শুভাভ্যুধ্যায়িনী বান্ধবীরূপে তাহার সহিত অন্তরঙ্গতা-প্রার্থিনী হইয়াছে। এতগুলি সনাতন সংস্কারের ব্যতিক্রম ও স্পর্ধিত উপেক্ষা যে উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে, তাহা আর যাহাই হউক বিশুদ্ধ বাস্তবধর্মী বলিয়া দাবী করিতে পারে না। এগুলি লেখকের মানবসমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরীক্ষামূলক কল্পনার নিদর্শন। অবশ্য বাস্তব আলোচনাপদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক কারণনির্দেশের সাহায্যে এই কল্পনাক্রীড়াকে যতদূর সম্ভব বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবিরূপে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গহনচাঁদ ও তাঁহার পারিষদবর্গ এক আদর্শবাদপ্রধান, ভাববিলাসিক পরিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস মধ্যে তাঁহাদের, সঙ্গীতের সুরভি বায়ুহিল্লোল প্রবাহিত করা ছাড়া, আর বিশেষ কোন কার্যকারিতা নাই। ইহাদের মধ্যে চুনীলাল অবশ্য সুবিধাবাদের ও বিষয়বুদ্ধির একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহার চারিপাশের ভাব-কুয়াশায় অস্পষ্ট পরিবেশে

তাহার বাস্তবতাবোধ নিজ প্রকৃতিধর্মের পূর্ণ অনুশীলনের সুযোগ পায় নাই। শেষ পর্যন্ত বিমল তাহার খেয়ালী কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুশীলনের পথে ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সহজ পথে ফেরার ব্যাপারেও তাহার খেয়ালপ্রবণতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানের মাত্রাহীন আতিশয্য প্রকট হইয়াছে। বিলাত যাইবার খরচ সে পিতার নিকট হইতে স্বাভাবিক অধিকারবশে গ্রহণ না করিয়া হরিদাসবাবুর বদান্যতার নিকট ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার নীতিগত পার্থক্যটি দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। রঙ্গনার সহিত তাহার সম্বন্ধটি অনির্ণীত রহিয়াই গেল ও রঙ্গনা সম্বন্ধে তাহার যে কোন বিশেষ কর্তব্য আছে তাহাও তাহার আচরণ হইতে অনুমান করা গেল না। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ও স্থানে স্থানে শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়; কিন্তু ইহাতে খেয়ালী কল্পনার ও আকস্মিক সংঘটনের এত বেশী প্রাদুর্ভাব যে, ইহা সমগ্রভাবে কোন গভীর জীবনবোধের ধারণা জন্মাইতে পারে না। কল্পনাবিলাসকে মনস্তত্ত্বের জালে আবদ্ধ করিলেও উহাকে সত্য জীবনচেতনায় রূপান্তরিত করা যায় না—উপন্যাসটি হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়।

'পঞ্চপর্ব' ডিটেক্‌টিভ-জাতীয় উপন্যাস। নানারূপ চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ, রহস্যের জাল-বয়ন ও শেষে রহস্যোদ্ভেদের কৌশলময় পরিণতি—উপন্যাসে এইরূপ বস্তুবিন্যাসই পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে চরিত্রসৃষ্টি বা গভীর জীবনবোধ অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্য ও উহার সাহায্যে পাঠকের ঔৎসুক্য-উৎপাদনই প্রধান স্থান অধিকার করে। তথাপি মোটের উপর এই নিম্নতর স্তরেও ইহা লেখকের রচনার মুন্সিয়ানা ও ঘটনাসন্নিবেশে কুশলতার পরিচয় বহন করে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্যন্ত বাঙলা দেশবিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সর্বরিক্ত, প্রতিবেশচ্যুত, করুণ দিকটাই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বনফুলই একমাত্র ঔপন্যাসিক যিনি ইহার বৈষয়িক বিপর্যয়ের দিক, ইহার মধ্যে কূটবুদ্ধিপ্রয়োগের অবসরটি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বেদনাময় কাহিনী, হিন্দু পুরুষের প্রাণরক্ষার জন্য ধর্মান্তরগ্রহণ ও হিন্দু নারীর ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন এই উপন্যাসে ঘটনা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে কোন শোকোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে নাই। কিন্তু পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের মধ্যে সম্পত্তি-বিনিময়ের আইন-ঘটিত জটিলতা, উত্তরাধিকার-নির্ণয়ের দুরূহতা ও অনিশ্চয় ও বৈষয়িক লাভের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপনের প্রয়াস দেশবিভাগসমস্যার সুদূরপ্রসারী ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের চিত্তকে সচেতন করিয়া তোলে। এই বহু-আলোচিত, বাদানুবাদতিক্ত ও ভাবাতিশয্যে পিচ্ছিল বিষয়ের যে একটি নূতন দিক বনফুলের রচনায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা তাঁহার চিন্তার মৌলিকতার একটি প্রশংসনীয় নিদর্শন।

'লক্ষ্মীর আগমন' (কার্তিক, ১৩৬০) উপন্যাসের ছদ্মবেশে একটি জ্যোৎস্নারাত্রের স্বপ্নময় কল্পনা-পদ্ম। ইহার প্রধান উপাদান হইল কৌমুদী-ব্যঞ্জনাময় ভাবাবহের কুহক সৃষ্টি। কোজাগরী পূর্ণিমার যে শঙ্খধবল চন্দ্রিকাজাল পৃথিবীকে মায়াময় করিয়া উহাকে লক্ষ্মীর পাদপীঠে পরিণত করে, তাহাই এই গল্পের আকাশ-বাতাসের সূক্ষ্ম ভাবদেহ গঠন করিয়াছে।

ইহার আধুনিকতা ইহার ঘটনাবিন্যাসে, ইহার চরিত্রসমস্যা-উপস্থাপনায়, ইহার সুকুমার-তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত-সন্নিবেশে ও ইহার বাইরের সীমা-ছাড়ানো অন্তর্মুখীনতায়। যে কল্পনার জোয়ারে প্রকৃত-অতিপ্রাকৃতের সীমা ভাসিয়া যায়, যাহা মনের অস্ফুট অভিলাষকে শরীরী মূর্তিরূপে ফুটাইয়া তোলে, যাহা লৌকিককে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার স্থূল অবয়বের মধ্যে অলক্ষিতভাবে অলৌকিক ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, তাহাই নিবিড় জ্যোৎস্নাবেশরূপে উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে। ইহার মানব চরিত্রগুলি যেন এই জ্যোৎস্না-সমুদ্রের এক একটি ফেন-শুভ্র বুদ্বুদ্। ইহার পুরুষগুলি—অভিভাবকত্বে স্নেহপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ সুখেন, দ্বিজু, বিজু, রাজু, এই ভ্রাতৃগণ, ইহারা যেন জ্যোৎস্নার মাদকতার এক একটি কণিকা—ইহাদের বিভিন্ন পথ ও সমস্যা যেন চরাচরব্যাপী পূর্ণিমা রজনীর শুভ্র আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুখেন নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, দ্বিজু ও বিজু প্রেমের নেশায় মশগুল, কিশোর রাজু নারীপ্রেমের উগ্রতর মদিরা ধরিবার পূর্বপ্রস্তুতিরূপ সিগারেটের নেশায় শিক্ষানবীশী করিতেছে। কিন্তু ইহারা সকলেই জ্যোৎস্না-তুফান-তাড়িত খড়কুটার ন্যায় অসহায়, স্বাধীন-ইচ্ছাহীন। সুখের গল্প বলিতে বলিতে হাজারবার খেই হারাইয়া ফেলে, অন্তর্গূঢ় প্রেরণার সূত্রে জড়াইয়া পড়ে। দ্বিজু ও বিজুর প্রেমজনিত মানস অস্বস্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায়, এই জ্যোৎস্নারজনীর ইন্দ্রজালে বারে বারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে—বিজুর কাব্যতত্ত্বব্যাখ্যা প্রেমিকের ভাব-গদ্গদ প্রিয়া-প্রশস্তির রূপে সামান্য (general) হইতে বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করে। এই মায়ামুগ্ধ, অশরীরী প্রভাবের আনা-গোনায় রহস্যময় প্রতিবেশে অবনীশ ও নিমাই ডাক্তার খানিকটা বহিরাগত প্রক্ষেপের মতই ঠেকে। অবনীশ যে সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত চন্দ্রালোক-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে অন্ততঃ সে তাহার অনুভূতিশীলতার পরিচয় দিয়াছে। সে যে এই সর্বব্যাপী গূঢ়সঞ্চারী ভাবরোমাঞ্চের অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গী ও মন্তব্য হইতেই পরিস্ফুট। আগ্রহশীল, কৌতূহলাবিষ্ট শ্রোতারূপেও সে উপন্যাসে একটা ন্যায্য অধিকার অর্জন করিয়াছে। তথাপি সে যে মৃদুলাকে লাভ করিবার যোগ্য পাত্র, মানবরূপিণী লক্ষ্মীকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার উপযুক্ত অধিকারী, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা আমাদের মনে জন্মে না। নিমাই ডাক্তারের পূর্বতন তিক্ত প্রেম-অভিজ্ঞতা তাহাকে এই দিব্যলোক-বিহারের খানিকটা স্বত্ব দিয়াছে। সে চন্দ্রাহত বলিয়াই চন্দ্রকিরণে সঞ্চরণে তাহার যোগ্যতা জন্মিয়াছে। তথাপি তাহার উপস্থিতি অনেকটা অভাবাত্মক (negative); সে অনুভব করে না, সতর্ক করে। আকাশপৃথিবীব্যাপী জ্যোৎস্নাপুলক তাহার নৈরাশ্যতিক্ত মনে একমাত্র লুব্ধক নক্ষত্রের ক্ষণিক উজ্জ্বলতায় সংকুচিত হইয়াছে। সুখেনের মন হইতে জাতিভেদের আপত্তি দূর করিবার জন্য তাহার আমন্ত্রণ হাস্যকরভাবে অসার্থক। জ্যোৎস্নার নীরব মন্ত্র অবলীলাক্রমে যে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম, সেই কাজের জন্য মানব প্রতিযোগীরূপে নিমাই-এর আবির্ভাব ও সাধারণ যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহার মত-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রতিবেশের সহিত বলিয়া মনে হয়।

নারীচরিত্রসমূহের মধ্যে নি[illegible] কয়েকটি রেখাতে আভাসিত, তাহাদের পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। নিরু শিক্ষিতা, ঈষৎ দারিদ্র্যকুণ্ঠিতা ও সূক্ষ্মতর অনুভূতিসম্পন্না;

তাহার প্রেম সহজেই উদ্রিক্ত ও সামান্য মাত্রা উপলক্ষ্যে উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। ফুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদানে গঠিত ও অনেকটা আত্মতৃপ্ত। পূর্ণিমা রজনীর প্রভাব ও মৃদুলার ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যবস্থাপনা তাহার চরিত্রে প্রেমিকোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতির উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছে। সে অনেকটা অজ্ঞাতসারে রামধনের রুগ্ন স্ত্রী ও কাঁদুনে ছেলেটার যত্ন করিতে প্রণোদিত হইয়াছে ও সোয়েটার বোনার পরীক্ষানবীশীতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখেনের চিত্ত জয় করিয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর সান্নিধ্যে ও তাঁহার নির্দেশ-অনুসরণে সেও কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্-ভাবভাবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ পরিকল্পনা মৃদুলা-চরিত্রে মূর্ত হইয়াছে। সুখেন নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে গল্পটি শেষ করিয়াছে তাহাতে মৃদুলার শৈশব-ইতিহাস রহস্য মানবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে পৌরাণিক অতিপ্রাকৃত অবতারবাদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কুভাগ্যয়েয়ে সোজাসুজি লক্ষ্মীপূজার প্রতিমার জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে। পরে অবশ্য মানবিকতার ছদ্মবেশ বজায় রাখিবার জন্য প্রতিমার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে ও সুখেনের মাতুলপরিবারে প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ও প্রকাশ্য অবজ্ঞার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে। তাহার মানবজন্মের ইতিহাস তাহার নিগূঢ় দেবলীলার হঠাৎ স্ফুরণে মানব অভিজ্ঞতার অতীত এক অতলস্পর্শ রহস্যগভীরতায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নার দিগন্তপ্লাবী বর্ষণ যেন কোন এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় এই শান্ত, অল্পভাষী, আত্মগোপনশীল অথচ সর্বদর্শী মেয়েটির মধ্যে সংহত হইয়াছে—রজনীর সমস্ত মায়া কল্লোলিত জ্যোৎস্না-সমুদ্রের সমস্ত ভাব-আলোড়ন এই মায়াবিনীর অন্তর-কন্দরে বন্দী হইয়া কয়েকটি সাধারণ কথাবার্তা, দুই একটি সামান্য সাংসারিক কাজের ছন্দে স্থির অচঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মাঝে মধ্যে কাহারও কাহারও চোখে ইহার মানসিক ছদ্মবেশ হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে; একটি জ্যোৎস্নার রেখা তাহার শান্ত মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়া উহার অন্তর্নিহিত দেবমহিমাকে হঠাৎ অবারিত করিয়াছে; অন্ধকারের একটি ক্ষীণ অন্তরাল উহার অর্ধস্ফুট দেহভঙ্গিমাকে অপার্থিব ভাবগহনতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। কেহ কেহ দ্ব্যর্থহীনভাবে তাহার মধ্যে অতি-প্রাকৃত শক্তির লীলা দেখিয়াছে। তাহার যেটুকু পরিচয় উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সে যেন অন্তর্যামীরূপে সকলের মনের কথা টের পায়, সকলের অকথিত ইচ্ছাকে সফল করে, ভবিষ্যতের প্রত্যেক প্রয়োজন পূর্বানুমানবলে অবগত হইয়া তাহার পূরণের ব্যবস্থা করে। তাহার অন্তর্যামিত্ব, নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও পরার্থপরতা এবং অন্তরালবর্তী আত্মগোপনশীলতাই তাহার দেবপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ। তাহাকে যদি কেহ কেবল গৃহিণীপনায় দক্ষ, কাজের মেয়ে বলিয়া মনে করে তাহাতে আপত্তির বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু এই উদ্বেলিত জ্যোৎস্নাপারাবারের তীরে দাঁড়াইয়া, জ্যোৎস্নার বিভ্রান্তিকর মাদকতা অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করিয়া ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গীর ইঙ্গিত সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া মেয়েটিকে কেবল মর্ত্যলোকচারিণী বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে না। গ্রন্থখানি উপন্যাস নয়, দেবলোকের রহস্যানুভূতিকে মানব মনে সার্থকভাবে সংক্রামিত করার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রচেষ্টা।

(৫)

বনফুলের চতুর্থ পর্বের রচনায় 'স্থাবর' (১৩৪৮) ও 'জঙ্গম'-এ (১৩৫০) আর একপ্রকার নূতন উপস্থাপনা-রীতি উদাহৃত হইয়াছে। ইহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের এক শ্রেণীর আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় মহাকাব্যের বিশাল আয়তন ও সামগ্রিক সমাজপ্রতিবেশের অন্তর্ভুক্তিকে আঙ্গিকের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। 'স্থাবর' রচনার দিক্ দিয়া পরবর্তী হইলেও শিল্পকলা ও ঔপন্যাসিক পরিকল্পনার দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিণত। এই উপন্যাসে লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রাগৈতিহাসিক অতীতের অনুমানসিদ্ধ, কুহেলিকাময় কাহিনীকে চিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল রূপ দিবার ও মানবিক কল্পনা ও আবেগের সহিত যুক্ত করার আশ্চর্য ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আদিম মানব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারণা ও যুগে যুগে পরিবর্তিত প্রতিবেশে মানবের বোধশক্তি ও সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষের কাহিনী এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়। যাহা মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় ও আদিম মানবগোষ্ঠীর বিবরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত নৃতত্ত্ববিদের আলোচনার বস্তু ছিল তাহা ঔপন্যাসিক রীতি ও হৃদয়াবেগ-চিত্রণের অনুগামী হইয়াছে। লেখক ধারাবাহিক কাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিবেশ-বর্ণনার সাহায্যে এই অস্পষ্টরূপে উপলব্ধ মানব অগ্রগতির রেখাচিত্রটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। দলপতির অসপত্ন-অধিকার-পীড়িত ও রিপুশাসিত আদিম মানবের যাত্রারম্ভ-কালে সে কেবল পশুত্ব হইতে কিঞ্চিৎমাত্র উন্নত হইয়াছে। কেবল ক্ষুধা ও কাম এই দুই জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়াছে। এমন কি কামের সহিত যে ভালবাসার একটা কম-বেশী শিথিল সংযোগ থাকে তাহার ক্ষেত্রে উহারও অভাব ছিল। নারী-মাংসের রূপক নহে আক্ষরিক অর্থটাই তাহার জানা ছিল। তাহার অগ্রগতির প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ প্রতিযোগী যুবক শিশু ও নারীর অকুণ্ঠিত হত্যার দ্বারা ভয়াবহ ও ঘৃণাকারজনক। ধীরে ধীরে একত্র বাসের ফলেও পরস্পর-নির্ভরতার প্রয়োজনে পারিবারিক জীবনের প্রথম অঙ্কুর উন্মেষিত হইল। সর্বব্যাপী মৃত্যু আতঙ্ক ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অভিভবের মধ্যে উচ্চতর অনুভূতির স্ফুরণ জাগিল। যে গাছ, পাথর, অগ্নি তাহাকে প্রকৃতির দুরন্ত ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহারাই তাহার মনে দৈবশক্তির প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছে। তাহার অন্ধ, প্রবৃত্তিশাসিত মনে দয়া-মায়া-কৃতজ্ঞতা-ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে জাগিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিয়াছে। অর্ধস্ফুট মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এই চিত্রটি উপন্যাসধর্মী হইয়াছে।

মানব সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও জটিলতা মানবের জীবন-ইতিহাসের অধ্যায়গুলির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। পশুকে পোষ মানান ও শস্যের প্রথম সংগ্রহ ও পরে উৎপাদনের দ্বারা মানব তাহার খাদ্যসমস্যার চিরন্তন সংকটের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রেমের লীলা আরও মাদকতাপূর্ণ, ছলনাময় ও বিভ্রান্তি-জনক হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুধা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিচিত্র-নিগূঢ় আকর্ষণ ক্রমশঃ মানবের নিয়ামক শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইহার সহিত মানবের অধ্যাত্মবোধ নানা বিকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লোকান্তরিত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা মানব-কল্পনায়

নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহার মনকে নিবিড় অপ্রাকৃত ভীতিতে আবিষ্ট করিয়াছে—এই ভীতির মোহ স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্বারা অপনোদন করিতে মানুষকে বহুদিন লাগিয়াছে। গোষ্ঠীদলপতি ক্রমশঃ অলৌকিক শক্তির অধিকারীরূপে, তন্ত্র-মন্ত্র-ইন্দ্রজাল-বিদ্যার পারংগমরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। নানা রহস্যময় ক্রিয়া-কাণ্ডের ভিতর দিয়া মানুষ দৈবশক্তির পরিচয়-লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ক্রমশঃ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ও মিত্রত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—একদল অন্যদলকে আক্রমণ করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছে। এইরূপে নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্য দিয়া, নানা সুষ্ঠু কল্পনার সার্থক প্রয়োগে, আদিম মানুষের অর্ধবিকশিত, নানা মূঢ় সংস্কার ও ধারণার জালে আচ্ছন্ন চিত্তের উপর আলোকপাত করিয়া লেখক মানবের অগ্রগতির ইতিহাসকে বৈদিক যুগের সংস্কৃতির সমীপবর্তী করিয়া আনিয়াছেন। রচনাটি অন্ধকারময় আদিম যুগের জীবনযাত্রার উপর পরিণত ঔপন্যাসিক রীতির ও তথ্যানুযায়ী বিশ্লেষণকুশলতার বিস্ময়কর প্রয়োগের উদাহরণ-রূপে উল্লেখযোগ্য।

তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'জঙ্গম' উপন্যাসটিকে বনফুলের ঔপন্যাসিক সৃষ্টির সার্থকতম নিদর্শনরূপে অভিনন্দিত করা যাইতে পারে। এই উপন্যাসে আধুনিক জীবনযাত্রার বিরাট, সুদূর-প্রক্ষিপ্ত দিগ্‌বলয় ও কেন্দ্রভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খল, বহুমুখী, স্বপ্নসঞ্চারণবৎ লক্ষ্যহীন প্রচেষ্টার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত, আদর্শের আশ্রয়হীন জীবনলীলার মহাকাব্য—এক সীমাহীন সমুদ্র বিস্তারের তটাভিমুখী তরঙ্গ-পরম্পরার অকারণ ওঠা-পড়া। এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা-অভিনেত্রী নিছক জীবনপ্রেরণার উচ্ছ্বাসে কত খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ নাটকের দৃশ্য অভিনয় করিতেছে! এই অভিনয় অর্ধপথে থামিয়া যাইতেছে, কোন অখণ্ড তাৎপর্য ইহার মধ্যে রূপ পাইতেছে না; বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি কোন উদ্দেশ্যগত ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়িতেছে না। এই অসংলগ্ন দৃশ্যপরম্পরা এক বিরাট, উদ্বেলিত, নানা শাখাপথে ঢুকিয়া-পড়া ও শুকাইয়া-যাওয়া প্রাণোচ্ছ্বাসের পরোক্ষ পরিচয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইয়াছে; কিন্তু ইহারা যে কোন্ নীতির সপক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছে, কোন্ আদর্শের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে, কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইতেছে। এই অবারণ চলা, অকারণ শক্তির প্রয়োগ ও অপচয় নানা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় দ্বিধা, জীবনমত্ততার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনোচ্ছ্বাস, দার্শনিক নিরীক্ষার দৃষ্টিবিভ্রমকারী ঘূর্ণী-চক্র—ইহাই আধুনিক জীবন।

এই অস্থির, অশান্ত, পাকে-পাকে বিঘূর্ণিত আলোড়নরাশি—উপন্যাসের নায়ক শঙ্করের মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহার অনুভূতি-কেন্দ্রে যথাসম্ভব সংহত হইয়া একটা জীবনতাৎপর্যবোধের উদ্দীপক হেতুরূপে দেখা দিয়াছে। অবশ্য উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই যে প্রত্যক্ষভাবে শঙ্করের সম্পর্কে আসিয়া তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নয়; অনেকেই তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক ও তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কেবল পরোক্ষ জ্ঞান আছে। এই সমস্ত চরিত্রের অবতারণা কেবল দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্যসম্পাদনের জন্য বা আধুনিক জীবনের জটিল প্রকরণবহুলতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আবার কোন কোন লোকের সাহচর্যে শঙ্করের বহিরঙ্গমূলক অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে মাত্র, ইহাদের প্রভাব তাহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট

হইয়া তাহার ব্যক্তিসত্তাকে পুষ্ট করে নাই। সুতরাং শঙ্করের জীবনদর্শন-পরিণতির বিষয়ে ইহাদের খুব যে একটা সার্থকতা আছে তাহা স্বীকার করা যায় না। তবে ঢেউ-খেলানো তড়াগে মাছের দল যেমন ইতস্ততঃ দ্রুত সঞ্চরণ করিয়াই বড় হইয়া উঠে, তেমনি বর্তমান যুগের নানা ঘাত-প্রতিঘাত-সংক্ষুব্ধ, বেগবান ও বিচিত্ররসাশ্রয়ী জীবন-ধারার স্রোতোবাহিত হইয়াই তরুণের সংবেদনশীল চিত্ত স্বীয় গঠন ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর আবিল, নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবহমান জীবনস্রোতে কোন যুবককে ছাড়িয়া দিলে সে যে কতরকমের হাবুডুবু খাইবে, কত বিচিত্র সন্তরণ-কৌশল প্রদর্শন করিবে ও নানা ঘাট-আঘাটায় থামিতে থামিতে শেষ পর্যন্ত কোন্ তটভূমিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইবে তাহার অভাবনীয়তা আমাদের সমস্ত মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতা ও পূর্বানুমানকে বিপর্যস্ত করিবে। শঙ্করের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে— আকস্মিকতার স্পর্শে তাহার চরিত্রে অপ্রত্যাশিত স্ফুরণ হইয়াছে। তাহার বন্ধুরাও যে তাহার জীবনবিকাশের পথে বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভন্টু নিজে খানিকটা কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র, তাহার উদ্ভট আচরণ ও অদ্ভুত, অর্থহীন ভাষাতত্ত্ব-প্রয়োগ তাহার উৎকেন্দ্রিক জীবনবোধের নিদর্শন। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে সে অনেকটা স্তিমিত ও বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে পরিবারের জন্য সে চরম আত্মোৎসর্গ ও কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছে তাহার সহিত তাহার সম্পর্ক একদিন হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ও এই বিচ্ছেদের ফলে তাহার সম্ভাবিত মানস প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক একেবারে নীরব। ভন্টু বন্ধু হিসাবে শঙ্করের জীবনে খানিক সরসতা ও সমবেদনা আনিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। এমন কি যে উৎপলের সঙ্গে তাহার আজীবন সৌহার্দ্য ও সমপ্রাণতা, যে তাহাকে জনসেবার একটা বিরাট আদর্শের পরিকল্পনা ও উহাকে রূপ দিবার উপযোগী কর্মক্ষেত্র যোগাইয়াছে, তাহারও প্রভাবের কোন বিশেষ নিদর্শন শঙ্কর-চরিত্রে দেখা যায় না। বরং উৎপলের প্রতি খানিকটা ঈর্ষা ও তাহার সহিত কর্মনীতির পার্থক্যটিই বিশেষ করিয়া প্রকট হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাসটি ঠিক শঙ্করকেন্দ্রিক হয় নাই। শঙ্কর-জীবনের পটভূমিকায় অন্যান্য চরিত্রের খানিকটা গৌণ, অথচ প্রয়োজনীয় স্থান আছে এই পর্যন্ত বলা যায়।

তথাপি শঙ্করের জীবন-পর্যালোচনাই এই সুবৃহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ অভিপ্রায়, সুতরাং এই কেন্দ্রীয় চরিত্র উপস্থাপনায় লেখকের কৃতিত্বের বিচারই সমালোচনার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। শঙ্করের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি, তাহাদের মধ্যে প্রধান অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় সাহিত্যিক প্রতিভা, তৃতীয় চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও চতুর্থ জনকল্যাণবিধানের প্রেরণা। বন্ধু উৎপলকে বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে বিদায় দিতে গিয়া বন্ধুপত্নী মুন্নায় সলজ্জ-মধুর, শালীনতাপূর্ণ আচরণ অকস্মাৎ তাহার অন্তরে সুপ্ত যৌন কামনাকে উগ্রভাবে উদ্রিক্ত করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে স্টেশনে উপস্থিত বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে মিটিদিদি ও রিণি প্রত্যক্ষভাবে শঙ্করের কামনা-বহ্নিতে ইন্ধন-সংযোগের হেতু হইল। হাওড়া স্টেশন হইতে ফিরিবার পথে মূর্ছিতা বারবনিতা মুক্তার সহিত অতর্কিত যোগাযোগ এই হুতাশনে ঘৃতাহুতির উপায় উন্মুক্ত করিল। ইহার পর রিণিকে ঘিরিয়া তরুণ মনের

অর্থ অবাস্তব মোহরচনা তাহার চিত্তকে দাহ্য উপাদানে পরিপূর্ণ করিল। মিষ্টিদিদির চটুল হাবভাব ও কামপ্রবৃত্তি-উদ্দীপনার প্রায় প্রকাশ্য প্ররোচনা তাহার প্রথম পদস্খলন ঘটাইয়া তাহার অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রিণির সহিত প্রণয়-স্বপ্ন চূর্ণ হওয়াতে সে সমস্ত সংযম হারাইয়া মুক্তার সংসর্গে আত্মবিস্মৃতি খুঁজিয়াছে। মুক্তার হিতৈষণা-প্রণোদিত, রূঢ় প্রত্যাখ্যানে তাহার এই কামের নেশা টুটিয়াছে ও সে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই যৌন উপভোগের অভিজ্ঞতা তাহার মানস পরিণতিতে কি উপাদান যোগাইয়াছে তাহা লেখক স্পষ্টভাবে বলেন নাই, তবে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইহা তাহার কৈশোর জীবনের স্বপ্নবিলাসের অবসান ঘটাইয়া তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সত্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই যৌন লালসার দুর্বারতা তাহার জীবন হইতে কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছে, শুধু আদর্শের খাতিরে নহে, শুধু পিতার বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীনমত-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, তাহার নারীসঙ্গপিপাসু মনের গোপন প্ররোচনায়ও বটে। অবশ্য অমিয়ার সহিত তাহার বিবাহিত জীবনে কোন উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নাই; অমিয়ার শান্ত, স্বামীনির্ভর জীবন ও নিজ অধিকারবোধ সম্বন্ধে তাহার একান্ত নিস্পৃহতা শঙ্করের বাত্যাতাড়িত জীবনে নিশ্চিন্ত ও স্থির আশ্রয়ের আরাম আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রী অপেক্ষা মেয়েই তাহার স্নেহকে অধিক উদ্রিক্ত করিয়াছে। অমিয়ার সহিত আচরণে তাহার পূর্বজীবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবারও শিখায়িত হইয়া উঠে নাই—বোধ হয় তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে তাহার প্রত্যাশা ও আগ্রহকে সংযতই করিয়াছে। কিন্তু সুরমার মোহ তাহার মনে বারবার প্রবল ও সময় সময় অসংবরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সুরমার আকর্ষণ তাহার রূপলাবণ্যের জন্য নহে, তাহার মার্জিত রুচি, অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধ ও স্নিগ্ধ-মধুর শিষ্টাচারের জন্যই। এই আকর্ষণ শঙ্করের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে ইহা আমাদিগকে জানানো হইয়াছে; কিন্তু ইহার রহস্য উন্মোচিত হয় নাই। শঙ্করের রুচিতে সুরমাকেই কেন বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল তাহার মূল শঙ্করের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখানো হয় নাই।

শঙ্করের সাহিত্যিক জীবনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহার এক সাংবাদিক গোষ্ঠীর সহিত মিশিয়া যাওয়ার কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সাংবাদিক গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট মতবাদ ও আদর্শ, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উগ্র আত্মসম্মানবোধ ও উদগ্র আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি, খানিকটা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও উদ্দাম তার্কিকতা—শঙ্করের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই তর্ককোলাহলমুখর মজলিশে শঙ্করের সাহিত্য-চর্চা যতখানি অগ্রসর হউক আর না হউক, তাহার সামাজিকতা ও আত্মপ্রত্যয় অনেকখানি বাড়িয়াছে। শঙ্কর নিজেও বুঝিয়াছে যে, এই কবির লড়াই-এর প্রতিবেশ ঠিক কাব্যসাধনার অনুকূল নহে; সে মাঝে মধ্যে মনের মধ্যে একটা গ্লানি ও ব্যর্থতাবোধও অনুভব করিয়াছে। তথাপি তীক্ষ্ণ শ্লেষ-বিদ্রূপের প্রয়োগনিপুণতায়, সমাজের বিরুদ্ধ মতবাদীদের ভণ্ডামি ও দুর্নীতিকে চাবুক মারার ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের জ্বালা গ্লানিকটা প্রশমিত হইয়াছে ও সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বিবিধ প্রকৃতির লোকের সহিত মেলা-মেশায় মানুষের চরিত্র-বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও তাহার অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে।

সোমনাথবাবু ও নিপুরার সহিত তাহার সম্বন্ধ কেবল সাহিত্যিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—তাহাদের অন্তরের জটিলতা ও বিকৃতির পরিচয়ও সে পাইয়াছে। মোটের উপর এই অধ্যায় শঙ্করের চরিত্রে একটা দৃঢ়তা ও পরিণতি আনিয়াছে। কৈশোরের রূপমুগ্ধতা ও ভাববিলাস হইতে প্রৌঢ় জীবনের জনসেবা ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ ভারগ্রহণে যে পরিবর্তন, তাহার প্রস্তুতি আসিয়াছে মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে সংগ্রামশীলতার অনুশীলনে।

ইহার পর শঙ্কর উৎপলের আমন্ত্রণে দেশে ফিরিয়া বন্ধুর জমিদারি-পরিচালনার ভার লইয়াছে ও উৎপলের পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বহুমুখী কার্যধারার প্রবর্তন করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানসমূহ মোটামুটি অধুনা সুপরিচিত সরকারী পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। এখানে শঙ্কর ভারতের দরিদ্র, অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী, আত্মোন্নতিবিমুখ জনসাধারণের সত্য পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহারা দুঃখ ও অভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও জীবনের সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত নহে। ইহাদের উন্নতির জন্য সমস্ত চেষ্টাই ইহারা ব্যর্থ করিয়া দিবে—ইহারা পালপার্বণে অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়িতার তাগিদে তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট ও অসংকোচে ঋণজালে নিজদিগকে জড়িত করিবে। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়াও ইহাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় না। ইহারা মদ খাইবে, চুরি করিবে, অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত হইবে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া বৈজ্ঞানিক যুগের নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করিবে। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কিছুটা ইহাদের মধ্যেই সজীব আছে। তা ছাড়া, উপকারী ভদ্রলোক সম্বন্ধে ইহাদের একটা সহজ অবিশ্বাস ও বিমুখতা আছে। এই ভদ্রলোকেরা যে মার্জিত রুচি, পরিচ্ছন্ন পোশাক ও খানিকটা জ্ঞানের উন্নত গরিমা লইয়া ইহাদের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করিবে, ইহাদের শিশুর ন্যায় শাসন ও তর্জন করিবে ও ভাল হইবার পথ দেখাইয়া দিবে, তাহা ইহারা কিছুতেই মনে-প্রাণে স্বীকার করিবে না। নটবর ডাক্তারই উহাদের প্রকৃত হিতৈষী, শঙ্কর নহে। এই অভিজ্ঞতার ফলে শঙ্করের বইএ-পড়া ধারণা ও রূপকথাসুলভ মোহ বহু পরিমাণে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও অশিক্ষিত, মূঢ় গ্রামবাসীর উন্নয়নের প্রায়-অসম্ভাব্যতা বিষয়ে সে অবহিত হইয়াছে।

এই অংশে গ্রাম্য চরিত্রের ও জীবনযাত্রার সরস বর্ণনা ও প্রচুর উদাহরণের সহিত সমাজ-তত্ত্বের মনীষা-দীপ্ত বিশ্লেষণ সংযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত গ্রাম-সমাজ যেন উহার অগণিত জনসমাবেশ ও এই জনগণের বিচিত্র চরিত্র ও জীবনানুভূতি, উহাদের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, বেদনা-আনন্দের সম্ভার লইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মত চলিয়া গিয়াছে। জীবনের চঞ্চল, বেগবান প্রবাহ আমাদের উপলব্ধিকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া যেন একটা অজ্ঞাত প্রাণোচ্ছ্বাসের লীলানৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের এই পূর্ণতা, ছোটখাট বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের সার্থক ব্যঞ্জনাতেই উপন্যাসটির গৌরব। লেখক কোন চরিত্রকেই খুঁটিয়া বিচার করেন নাই; কাহারও অন্তর-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান নাই, কিন্তু সকলে মিলিয়া এক বিরাট জীবনযাত্রার অঙ্গরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মেলায় অভিযাত্রী জনসংঘের ন্যায় সকলকেই জীবনের বিপুল আনন্দ-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়াছে—

তাহাদিগকে ঘিরিয়া জীবনের মহোৎসব-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। শঙ্করের মত যে দুই একজন দার্শনিক প্রকৃতির লোক এই চলমান জনসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহাকে লক্ষ্য ও পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সমুদ্রের অগণিত ঢেউ গুনিবার ব্যর্থ প্রয়াসে বিব্রত ও অভিভূত হইয়াছে। সময় সময় শঙ্কর তাহার ব্যক্তিগত জীবনাসক্তির-দ্বারা এই নাম-পরিচয়-চিহ্নিত, অথচ প্রকৃতপক্ষে অনামিক জনতার সান্নিধ্য হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, নিজের সংকীর্ণ কামনার কক্ষাবর্তনে এই বিরাট সৌরমণ্ডলের যাত্রাপথ হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই অপসরণপ্রবণতাই তাহার আত্মকেন্দ্রিকতার নিদর্শন। শেষ পর্যন্ত শঙ্কর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহা বিপরীত রকমের ভাববিলাসের পর্যায়ভুক্ত। সে ঠিক করিয়াছে যে, চাষীদের সহিত মাঠে খাটিয়া, তাহাদের সহিত অভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া, নিজ উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তির অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সে উহাদের সত্যিকার হিতসাধনের অধিকার অর্জন করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই সমাধানও একটা বিপরীতমুখী ভাবোচ্ছ্বাস-প্রসূত এবং গ্রহণযোগ্য নহে। চাষীদের মধ্যে নামিয়া আসিয়া নহে, উহাদের জীবনমান দীর্ঘ প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নত করিয়া, উহাদের চিত্তকে উন্নতর জীবননির্দেশের প্রতি অনুকূল ও গ্রহণশীল করিয়া জনসাধারণের উন্নয়ন সম্ভব হইবে। হয়ত ঔপন্যাসিকের গ্রন্থসমাপ্তির নির্দিষ্ট কালে ও সীমিত পরিধিতে এই ফল পাওয়া যাইবে না, হয়ত উপন্যাসের পাতায় এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার সমগ্রতা উদাহৃত হইবে না; কিন্তু তত্ত্বান্বেষীর নিকট এইটিই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া মনে হয়। ঔপন্যাসিক যদি একাধারে জীবনরসিক ও তত্ত্বদর্শী হইতে চাহেন, তবে হয়ত তাঁহাকে এই উভয় আদর্শের মধ্যে একটির নিকট অপরটিকে বলি দিতে হইবে।

উপন্যাসটির প্রধান গুণ ইহার বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রাচুর্য। অন্ধকার রাত্রিতে জোনাকি-পুঞ্জের ন্যায় এই উপন্যাসে শত শত প্রাণকণিকা জীবনরসপানে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করিতেছে। প্রত্যেক চরিত্রই তাহার স্বল্প আবির্ভাব-কাল ও কর্মপরিধির মধ্যে জীবন্ত। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে তনুটু, করালীচরণ বকসি, তনুটুর বাবা বাঙ্কু, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী, অপূর্ব পালিত, ওরিজিন্যাল দশরথবাবু—এগুলি যেন ডিকেন্সের অতিরঞ্জনপ্রবণতাপ্রসূত, উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের উদাহরণ। লেখক এক একটি ফুৎকারে ইহাদের মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে যদৃচ্ছসঞ্চরণের ছাড়পত্র দিয়াছেন। এছাড়া অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও অপরাধ-চক্রে নিরত ভ্রাম্যমাণ চরিত্রেরও অভাব নাই। মৃন্ময়ের সমস্ত জীবন ভাবাতিরেকের চরম দৃষ্টান্ত। সে অপহৃতা প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রেমপত্র লেখে, দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি উদাসীন থাকে ও যখন সেই দুর্বৃত্ত অপহারকের নাম জানিতে পারে, তখন তহবিল ভাঙিয়া একই জেলে ভর্তি হয় ও সুযোগ খুঁজিয়া তাহার জীবনব্যাপী প্রতিহিংসা-ব্রতের উদ্‌যাপন করে। উৎপলও কৌতুকরসিক, নির্লিপ্ত গোছের লোক—সে অনেকটা নিস্পৃহভাবে ও সপ্তরের মধ্যবর্তিতায় সাহিত্যচর্চা ও জনসেবার সহিত আপনাকে সংশ্লিষ্ট করে। সে কখনও নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয় নাই, পরের উপর কার্যের ভার দিয়া উদাসীন দর্শকের ন্যায় দূর হইতে দেখে। কিন্তু তাহার এই আপাত-ঔদাসীন্যের মধ্যে যে দৃঢ়সংকল্প প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার গ্রাম্য সমাজে অত্যাচারের প্রতিবিধানের প্রচণ্ডতায় ও মহাযুদ্ধে সৈনিকরূপে যোগদানে। মুখুজ্যে মশায় সম্পূর্ণরূপ আদর্শ চরিত্র—

বঙ্কিম-যুগের পরোপকারী সন্ন্যাসীর আধুনিক সংস্করণ। সন্ত্রাসবাদ ও রহস্যপ্রধান উপন্যাসের ন্যায় নারীসম্ভোগের জন্য নানা কৌশলময় ব্যবস্থার অবলম্বনও উপন্যাসের বিশাল পরিধিতে বিধৃত জীবনচিত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা ও পারিবারিক সম্পর্কবিকারের উদাহরণ পাই অধ্যাপক মিত্র ও গুপ্তের জীবনে।

স্ত্রীচরিত্রগুলি আরও বিচিত্র ও বহুমুখী। প্রাচীন প্রথার গোঁড়া সমর্থক কুন্তলা দেবী হইতে অধুনিক সংস্কৃতির ছদ্মবেশধারিণী স্বভাব-স্বৈরিণী মিষ্টিদিদি—এই দুই বিপরীত সীমার মধ্যে নানা পর্যায় ও প্রবণতার প্রতীক নারী-চরিত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে। হাসির মত নিষ্ঠাবতী পতিব্রতা, বেলা মল্লিকের মত দৃপ্ত আত্মসম্মানজ্ঞানে অটল, মুক্তা ও ফুলশরিয়ার মত আচরণে চরিত্রহীনা, কিন্তু অন্তরে নানা উচ্চবৃত্তির অধিকারিণী, চুনচুনের মত নীরব ও রহস্যময়ী, শৈলর মত বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত, অমিয়া, সুরমা ও ভন্টুর বৌদির মত হৃদয়সমস্যাহীন ও গৃহকর্মে সন্তুষ্টভাবে নিয়োজিত—নারী-বৈচিত্র্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক দুই-একটি তুলির টানে ইহাদিগের মধ্যে সনাতন-রমণীর কোন-না-কোন দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু কাহারও অন্তরের গভীরে অবতরণ করেন নাই। এক ঝিলিক আলো, একটু অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস, অন্তর-বেদনার একটু ক্ষণিক চাঞ্চল্য, মনোভঙ্গীর একটু বিসর্পিত উচ্ছ্বাস নীরবতার পিছনে অনুদ্ঘাটিত রহস্যের একটুখানি ইঙ্গিত—ইহাতেই ইহাদের নারীসুলভ দুর্জ্ঞেয়তা ও হৃদয়াবেগের কথঞ্চিৎ পরিচয়-পরম্পরা মিলে। সংসারের ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত হইয়া বা আকস্মিকতার ধাক্কায় যাহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সব নর-নারীর সম্পর্কবৈচিত্র্যের মধ্যে যে অপরূপ জাল বয়ন হইতেছে, লেখকের দৃষ্টি তাহারই প্রতি নিবদ্ধ। এই জালের ফাঁক দিয়া মানুষগুলির যে অস্পষ্ট মুখ দেখা যায়, লেখক তাহার বেশি আমাদের দেখাইতে উৎসুক নহেন। আখ্যায়িকা-গ্রন্থনের ভিতর দিয়া লেখকের মননশীলতা ও সরস বর্ণনাকৌশল এই দুইই পরিস্ফুট হইয়াছে। এত জটিল ও বিরাট ঘটনাপুঞ্জ ও কর্মশীলতার মধ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দ-বিচরণ সত্যই প্রশংসার্হ।

(৬)

'মানসপুর' (আশ্বিন, ১৩৭১) বিশ্বরহস্যভেদী কবি-কল্পনার উপন্যাসের আঙ্গিকে এক আশ্চর্য প্রকাশ। আমাদের চারিপার্শ্বের জগতের জড় আবরণের অন্তরালে যে অপরূপ প্রাণ-লীলা আদিম যুগের মানুষের নিকট স্বতঃপ্রতিভাত ছিল উপন্যাসটিতে আধুনিক যুগে সেই **myth-making faculty**, প্রাণস্পন্দিত রূপকল্পনার পুনরুদ্বোধন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীগুলি রূপকব্যঞ্জনার রঞ্জনরশ্মিতে বাহিরের নির্মোক ভেদ করিয়া অস্তিত্বের এক নূতন চেতনায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে এককালের সার্বজনীন, অধুনাতন, বিরল ও অপার্থিব যে মায়াঞ্জন বিশ্বের মানুষ, প্রকৃতি, জড়, জীব, উদ্ভিদ প্রভৃতি সমস্ত জীবনকেই এক নিগূঢ় প্রাণরহস্যের অনুভবে একই সত্তার অঙ্গীভূতরূপে প্রতীয়মান করিত তাহারই ক্ষণিক উল্লাস এই যন্ত্রযুগের লৌহ ব্যবধানে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জীবলোককে দিব্য বিভায়মণ্ডিত করিয়াছে। নায়ক বিশ্বদীপ যেন বিশ্বের ঘনীভূত সৌন্দর্যসত্তা, সে তাহার দৃষ্টির দীপালোকে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সুষমা আবিষ্কারে উন্মুখ। কুষ্ঠব্যাধি এই বিশ্বের অভিশাপ

উহার কুৎসিৎ. প্রকাশগুলি যেন এই বীভৎস, দুরারোগ্য অঙ্গবিকৃতির প্রতীক। বিশ্বদীপ নিজেও এই কুষ্ঠরোগের সম্ভাবিত আক্রমণে বিষণ্ণ ও অবসাদগ্রস্ত। বিতুলা—মানব জীবনের সুকুমারকল্পনাধিষ্ঠাত্রী রূপলক্ষ্মী—বিশ্বদীপের প্রণয়বিধুরা কিন্তু রক্তমধ্যে দূষিতরোগবীজাণুবাহী বিশ্বদীপ এই লক্ষ্মীবরণে আরতি সাজাইতে ভরসা পায় না। সে বিতুলার আমন্ত্রণ এড়াইয়া চলে। তাহার ব্যাধিঘোষণার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ারূপে বিশ্বের এই অন্তরলক্ষ্মী আত্মহত্যায় নিজ অস্তিত্বশিখা নির্বাপিত করিয়াছে।

বিতুলার বিশেষ কোন তাৎপর্য নাই—সে বাস্তব জীবনের যুগযুগান্তরের শাশ্বতী প্রেয়সীর রূপচ্ছটা ও প্রেম-তৃষ্ণা মানসলোকের কল্পনার মধ্যে তাহার সত্তা নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া যায় না। আবার কবি শ্যামলের নিকট তাহার স্বরূপের একটি নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সে প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা নয়, মানুষের সচেতন শিল্পসৃষ্টিবিচ্ছুরিতা নবনব-আলোকরশ্মিমধ্যবর্তিনী চারুকলা-শ্রী, আধুনিক সভ্যতার কাঁটাবনে প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বকণ্টক-বিদ্ধ কমল-রাণী। সেইজন্যই বোধহয় সে মানবসভ্যতার ব্যাধি-নিরাময়ে আস্থাহীন। কলিকাতার যান্ত্রিক, শিল্পসংবর্ধিত জীবন কোনদিনই তাহার নিকট মানসপুরের কল্পলোকে বিলীন হইবে না। বিশ্বের অন্তর-উৎসারিত, অরূপলোকবিহারী সৌন্দর্যকল্পনার মধ্যে সচেতন শিল্পকলার রূপনির্মিতির সংহরণ সে সম্ভব মনে করে না। প্রজাপতির সৃষ্টির আনন্দ যে সম্পূর্ণ বহিঃপ্রকাশনিরপেক্ষ হইতে পারে, বিরাট বহির্মুখী সভ্যতা যে আবার রূপকল্পনাবিন্দুতে গুটাইয়া আনা যাইতে পারে, আত্মার স্বচ্ছন্দলীলা যে আত্মচেতনাবিভোর হইয়া প্রকাশপ্রেরণার অতীত হইতে পারে, ইহা সে ধারণা করিতে পারে না। কাজেই বিশ্বদীপের সহিত বিতুলার মিলন হইল না; বিশ্বের স্বয়ং আলোকিত বিস্ময়-লোকে রূপ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইল না। শ্যামল সোমের কবিতায় ও বিশ্বদীপ-বিতুলার আত্মচিন্তায়, বাতাসে কাঁপা দীপশিখার ন্যায়, এই প্রেমের স্বরূপ কম্পিত ছায়াপাত করিয়াছে।

রূপকের বহুবিস্তৃত জালে অনেক সুন্দর কল্পনার রূপালি মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। রুদলবাবু নিষ্কাম আনন্দপ্রেরণার দ্বারা বিশ্বের প্রাণসম্পদ বিকশিত করার যে সাধনা তাহারই প্রতীক। তিনি পাকা ধান কাটেন না, পক্ব শস্যক্ষেত্রে বুলবুলিদের ভোজন নিমন্ত্রণ করেন; তাহাদের ভোজনোদ্‌বৃত্ত শস্য গোলাতে তুলিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। প্রজাপতি যেমন প্রয়োজনাতীত সৃষ্টির আনন্দে বিভোর, রুদলবাবুও তেমনি সঙ্গীতরসের অনুপানে ধরিত্রী কর্ষণোৎপন্ন সুমিষ্ট ফলশস্য প্রভৃতি উপভোগ করেন। তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টির নিকট সমস্ত বীভৎসতা সুস্থ সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়। কুষ্ঠরোগীর গলিত অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন সুঠাম লাবণ্যরেখায় মিশাইয়া যায় ও রোগগ্রস্তের প্রতি ঘৃণা ও ভয় নিবিড় প্রেমে আত্মবিলোপ করে।

সৃষ্টিতে প্রজাপতি-স্রষ্টার যেমন প্রয়োজন, বিশ্বকর্মার ন্যায় কারুশিল্পী ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যাখ্যাতা ও পরিদর্শকেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। মুরুব্বি সেই সৃষ্টিরহস্যাভিজ্ঞ বিশ্বকর্মার প্রতিরূপ। সে নানারূপে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্যবিকাশের সহায়তা করে। সে নানা ছদ্মবেশে জড় ও জীবজগতের সমস্ত অলিতে-গলিতে সঞ্চরণশীল। সৃষ্টির উদ্যানে যে মালীর ন্যায় ফুল ফুটাইয়া, ফল পাকাইয়া, বিভিন্ন পদার্থের অদৃশ্য যোগসূত্রটি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত জগতের প্রাণচেতনাটি অবারিত করিয়া, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র, উপেক্ষিত

প্রাণিবৃন্দের মর্মবাণী-উদ্ঘাটনের ইঙ্গিত দিয়া বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য-পরিচর্যা কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'টেম্পেষ্ট' নাটকে এরিয়েলের যে কাজ উপন্যাসে মৃকজিনর অনেকটা সেই কাজ। নিখিল-ব্যাপ্ত প্রাণভাণ্ডারের চাবি-কাঠি তাহার হাতে; নীরব ও নিরলস গৃহিণীপণায় সে এই বিশ্ব-গৃহস্থালীর সৌন্দর্য-স্বষমাকে অম্লান রাখে।

অসাধ্যসাধন, শ্রীমন্তপ্রতিম ও সাগর-সঙ্গম তিনপ্রকার অসাধারণ মানসবৃত্তির মানবিক প্রতিরূপ। অসাধ্যসাধন জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার, শ্রীমন্ত সদাগর যাযাবরত্বের আকর্ষণমুক্ত অর্জন-স্পৃহার ও সাগর-সঙ্গম সীমা ও অসীমের মিলনাকৃতি সম্ভব, অপরূপ স্বপ্নাভিসার-কল্পনার প্রতীক। ইহারা মানসপুরের স্থায়ী অধিবাসী নয়; উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে বিরল মুহূর্তে অবতীর্ণ হইয়া ইহারা মানসপুরের আবহাওয়াকে কল্পলোকের রঙে রঙীন ও দিব্যপ্রেরণার পারিজাতগন্ধে স্বর্গস্থরভি করিয়া তোলে। ইহাদের মধ্যে অসাধ্যসাধন ও শ্রীমন্ত সদাগরের স্থান উপন্যাসে গৌণ। প্রথোমক্ত ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করে ও জ্ঞান-আহরণে মানবের মননশক্তি বৃদ্ধি করে। আর দ্বিতীয়োক্তের প্রধান সক্রিয়তা নিজ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুশীলনে নহে, কিন্তু তাহার নৌযাত্রায় সাগরসঙ্গমকে সহযাত্রীরূপে লইয়া গিয়া উহার দিব্যদৃষ্টি ও কল্পনালীলায় উপযুক্ত ভাবাশ্রয় সৃষ্টি করায়। মানসপুরের আকাশ যে ইন্দ্রধনুরঞ্জিত তাহার বর্ণাঢ্যতা প্রধানতঃ সাগর-সঙ্গমের অনুভূতি-বিচ্ছুরিত। মানব মনে কবিকল্পনা ও রূপমায়ার উৎস শ্রীমন্তের দূরাভিযানের বিস্ময়ে ও সাগর-সঙ্গমের অসীমাভিসারের রহস্যঘন জীবনসত্যসঙ্কেতে।

অসাধ্যসাধন ও শ্রীমন্তপ্রতিম প্রত্যেকে এক একটি গল্প বলিয়া মানসপুরের জীবনে ঐতিহ্যগত নীতির দৃঢ় আশ্রয় ও রমণীয়কল্পনা দ্বন্দ্ব-সমস্যাজটিলতার নিগূঢ় মর্মসত্য ব্যঞ্জিত করিয়াছে। অসাধ্যসাধন ইতিহাস শোনাইয়াছে আর শ্রীমন্তপ্রতিম কল্পনা-মরীচিকার জালে বিধৃত সত্যের মায়ারূপটি দেখাইয়াছে। শ্রীমন্ত পরশপাথরের খোঁজে পাড়ি দিয়া ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছে, কিন্তু এ ঝটিকা প্রাকৃত নয়, সপ্তর্ষির মানস বিক্ষোভ। এই সপ্তঋষিও পৃথিবীর প্রধান অভিশাপ কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাবে ব্যথিত হইয়া কুষ্ঠরোগীর আরোগ্যের জন্য এক দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিয়ম করিয়াছেন যে, কুষ্ঠরোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির বাধ্যতা-মূলক বিবাহ হইবে। কিন্তু মানুষ এই বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ও সঙ্গীতনীতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ ব্যক্ত করায় ঋষিরা মহা বিপদে পড়িয়াছেন। সঙ্গীতের মোহস্পর্শে তাঁহারা বিগলিতপ্রায় হইয়াছিলেন, এমন সময় সাগর-সঙ্গমের বেসুরো ধমক ঐ মোহাবেশ ছুটাইয়া ঋষিদের রক্ষা ও সত্যের সংহার সাধন করিল।

সাগর-সঙ্গমে গল্পটি আরও রোমাঞ্চকর ও মর্মস্পৃকতায় আবরণে গভীরভাবে জীবনঘনিষ্ঠ। পুরাণের কমলে-কামিনী-আখ্যান তাহার কল্পনাতে অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক-যুগোপযোগী রূপকার্থ লাভ করিয়াছে। কমলে-কামিনী এখন হাতীর পরিবর্তে বোমা গ্রাস করিতেছেন—নারী-শক্তি সে যুগের মূঢ়তার পরিবর্তে আধুনিক কালের আরও শতগুণে মারাত্মক বিভ্রমের সমতাসাধনে নিরত। কমলে-কামিনী আধুনিক মূর্তিতে আলোকপ্রতিমা-ভাস্বর হইয়া ভক্তের মুগ্ধ বিস্ময় আকর্ষণ করিতেছেন। এক একটি ভক্তিস্মৃতির স্ফুরণ যেন প্রণতির নদীতে বিগলিত হইয়া অতল রহস্যের মহাসমুদ্রে মিলিত হইতেছে। এই আশ্চর্য

কল্পনাবৃত্তে আধুনিক নারীর রূপ ও কল্যাণমূর্তি এবং দৈবী শক্তি মনে এক সমুদ্র-বিস্ময়ের আলোড়ন জাগাইয়া, জানা-অজানার সীমারেখায় ক্ষণিকের জন্য ফেনপুষ্পবৎ ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই মানব কল্পনা-বিগ্রহগুলি ছাড়া মানসপুরে উহার দৈনন্দিন শ্রমের প্রয়োজন মিটাইতে আছে শ্রমিক-প্রতিনিধি চিরপথিক সিংহ। এ লোকটিও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, বিকৃত সভ্যতার রোগচিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া বর্তমান। এই সিংহের অমিত শক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, ইহার দেবত্ব-স্বীকৃতি হইল বর্তমান জীবনবোধের দুরূহতম তপশ্চর্যা, উহার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পুরুষ-সিংহের অন্তরে যে অনির্বাণ জ্বালা, উহার যে বেদনাবিদ্ধ, নীরব অনুযোগ তাহার অপনোদনই হইল প্রধান যুগ-সমস্যা। ইহার সমাধান হইবে হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত, স্বার্থান্ধ শ্রমিক বিপ্লবের পথ দিয়া নয়, কুন্দনবাবুর সর্বসমন্বয়কারী, সর্বব্যাধিপ্রতিষেধক প্রেমদৃষ্টির ব্যাপক প্রয়োগে। তাহারই চোখ দিয়া দেখিলে ব্যাধিবিকৃতদেহ, অস্পৃশ্য পশু সুস্থ-সবল সৌন্দর্যপ্রতিমূর্তি মানব যুবকে রূপান্তরিত হইবে।

মানসপুরের মানবেতর, কিন্তু মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন, অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে বধূসরা নদী, উহার জলবিহারিণী পঙ্ক-অপ্সরা, রংবিহারা, সবুজ-ফুটকি, নওরঙ্গী, সোনাহলুদ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ-প্রজাপতির দল, ফিঙে, টুনটুনি প্রভৃতি পাখী, লম্ফ-সিং ব্যাঙ, লালফুলে ভরা, ছায়াঘন আতিথেয়তার মূর্তবিগ্রহ কৃষ্ণচূড়া গাছ, এমন কি সবুজ ঘাস ও শৈবাল পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া এই জগতকে ক্রীড়াশীল, আনন্দময়, মিলনমধুর প্রাণলীলাছন্দে হিল্লোলিত করিয়াছে। বিশেষতঃ বধূসরা এই প্রাণময়তার কেন্দ্রশক্তি। সে মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব রঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, নানা খেয়ালী কল্পনার রামধনু আঁকিতেছে। দিকে দিকে সমস্ত প্রতিবেশী প্রাণিসভাকে নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছে, মাঝে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়া কত অপূর্ব কল্পস্বপ্ন দেখিতেছে ও শেষ পর্যন্ত রাজহংসনন্দিত উৎপলেশ্বরী হ্রদের সীমাশোভনতা ছাড়াইয়া অসীম সমুদ্রের অভিসারাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া চারিদিকে এক বিপুল প্রাণবেগের দুরন্ত আলোড়ন ছড়াইয়াছে। বধূসরা নদীই মানসপুরের স্বপ্নজগতের প্রাণধারাপ্রবাহিণী নাড়ী।

মানসপুরের সহিত সমান্তরাল রেখায় আধুনিক কলিকাতার বিলাসবহুল, কর্মমুখর, যন্ত্র-কর্কশ জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে এবং এই দুই জগতের মধ্যে এক কুহেলিকার যবনিকা ক্ষণে ক্ষণে সরিয়া যাইতেছে আবার সেইরূপ আকস্মিকভাবেই পুনর্বিন্যস্ত হইতেছে। উপন্যাসটির দুই অংশের মধ্যে কোন সমন্বয় রক্ষা করিতে লেখক মোটেই ব্যগ্র নহেন। দুই বিরোধী আবহাওয়া পরস্পরের মধ্যে লেখকের খেয়ালমত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; কখনও সুনিপুণ কলা-সঙ্গতির নিয়ন্ত্রণে মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। কলিকাতার জগতে যন্ত্রশিল্পের সমস্ত আসবাবপত্র ও মালমসলা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। শ্রমিক-মালিক-সংঘর্ষ, মোটর-টেলিফোন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের প্রাচুর্য, সমস্যাপীড়িত জীবনের অস্বস্তি ও ছন্দোপতন প্রভৃতি যন্ত্র-সভ্যতার সমস্ত অতিপরিচিত লক্ষণগুলি এখানে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। সাধারণতঃ স্বপ্ন-জাগরণের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান মানসপুর-কলিকাতার মধ্যে তাহাই দেখা যায়। কতকগুলি চরিত্র দুই জগতের মধ্যেই পা রাখিয়া অস্থিরভাবে দুলিতেছে, তাহাদের মানস গঠনে আদর্শ-বাস্তবের অনিয়মিত সংমিশ্রণের বর্ণসাঙ্কর্য সুপরিস্ফুট। বিশ্বদীপ শেষ পর্যন্ত যন্ত্রসভ্যতার মায়া

কাটাইয়া আফ্রিকার জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে—সেখানে বিহ্বলার পিয়ানোর সুর ও কমলবাবুর ছায়ামূর্তি তাহার চক্ষে স্বপ্নবিভ্রমের সৃষ্টি করে।

কিন্তু পাঠকজি, ডাক্তার ঘোষাল প্রভৃতি ব্যক্তি শিল্পজগতেরই অধিবাসী। কারখানার শ্রমিকেরা বিশ্বদীপের উদার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে নাই। মহুয়া কিন্তু উভয় লোকেরই মধ্যবর্তিনী ও বিশ্বদীপের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করায় মনে হয় সে মানসপুরের আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়াছে।

শ্যামল সোম, অনন্ত রায়, অনঙ্গ সেন, বিজনবালা, নয়নতারা চিত্রশিল্পী নবনী দাস ও তাহার স্ত্রী আলেয়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, কিন্তু মানসপুরের স্পর্শ তাহাদিগকে কিছু পরিমাণে বাস্তববিমুখ ও স্বপ্নমন্থর করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামল কবি ও কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির বলে সে মানসপুরের রহস্য ভেদ করিতে ও বিশ্বদীপ ও বিহ্বলার মধ্যে অস্বস্তিকর প্রণয়াকর্ষণের তত্ত্বটি অনেকটা ধরিতে পারিয়াছে। ইহারা সকলে ব্যবহারিক, স্থূলপ্রয়োজনশাসিত জগতের অধিবাসী হইলেও মানস গঠনের দিক দিয়া রুচি ও খেয়ালেরই বশবর্তী। ইহাদের মধ্যে যে সমাজপ্রচলিত নীতির লঙ্ঘনপ্রবণতা দেখা যায় তাহা মানসপুরের আদর্শকল্পনাঘন জীবনদর্শনের কাঁচা উপাদান বলিয়া মনে হয়। ইহারা মানসপুরের উতলা হাওয়ার স্পর্শে উন্মনা, কিন্তু উহার জীবনমন্ত্রে পূর্ণ দীক্ষিত নয়।

বনফুলের ঔপন্যাসিক মূলধনের মধ্যে মৃত্তিকার যতখানি স্থান আছে, নিম্ন আকাশের খেয়ালী পবন ও উচ্চ আকাশের দিব্য কল্পনাসুষমার প্রায় ততখানি স্থান আছে। যে যুগে জীবন বস্তুপিণ্ডে ঠাসা ও মৃত্তিকার পেষণনিবিড়তা সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহকে প্রায় অসাড় করিয়া তুলিয়াছে, সে যুগেও যে তিনি নভোবিহারের রোমাঞ্চ ও নীলাকাশের আলোকধারায় স্নানের শুচিতা বজায় রাখিয়াছেন তাহা উপন্যাসের ভাববৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক দিয়া খুবই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। যে দূর-দিগন্তে আকাশ ও পৃথিবী সহজ আলিঙ্গনে এক, যেখানে পার্থিব মানুষের ভাব-চিন্তা জীবনাশ্রয়ী হইয়াও স্বাভাবিক উদ্বর্তনে ঊর্ধ্বলোকচারী, সেই প্রত্যন্তপ্রদেশে তাঁহার বিচরণ খুব স্বচ্ছন্দ নয়। তিনি যখন আকাশ-কল্পনায় বিভোর, তখন মানুষের সূক্ষ্মতম অভীপ্সাগুলিকে পাখা দিয়া উহাদিগকে ঊর্ধ্বলোকে উধাও করিয়া সম্পূর্ণরূপে সেই কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত করেন; উহাদের মানবপ্রকৃতিসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একান্তভাবে উদাসীন থাকেন। তিনি কবির মনোভাব ও কাব্যজগতের সুকুমার উপাদানকে দিয়া ঔপন্যাসিকের কাজ করিতে চাহেন, তাঁহার শ্রীমন্তপ্রতিমের বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতিবাহন রথের ন্যায় উপন্যাসের স্থূল বস্তুময় শকটে কাব্যের দিব্য অশ্ব সংযোজনা করেন। ইহাতে উপন্যাস-শকটের গতি যে খুব মসৃণ হয় বা উহার নির্দিষ্ট লক্ষ্য যে পাঠকের প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় তাহা দাবী করা যায় না। কিন্তু মানব-সত্তার যে কতকগুলি নিগূঢ় বাসনা, বাস্তবের দ্বারা অবরুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের যে একটি অপরূপ দ্যোতনা এই মিশ্র প্রক্রিয়ার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, অন্তরের যথার্থ আকৃতির সূত্রে যে কয়েকটি দিব্য কল্পনাকুসুমমালা গ্রথিত হইয়া আমাদের নিঃশ্বাসবায়ুকে সুরভি-মধুর করে তাহার সন্দেহ নাই। ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর পদাতিকশ্রেণীর মধ্যে তিনি একজন নীল আকাশের বার্তাবাহী স্বর্ণপক্ষ বিহঙ্গম।

সর্বশেষে বনফুলের ঔপন্যাসিক প্রবণতার সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ ও মূল্যায়নের একটা প্রয়াস করা যাইতে পারে। কোন হৃদয়-জটিলতার ফাঁকে তিনি ধরা পড়েন নাই বলিয়া তাঁহার মনোভাবের মধ্যে ক্ষীণঔৎসুক্যপূর্ণ নিরপেক্ষতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের দুর্বোধ্যতার তিনি কোন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন নাই, উদার দৃষ্টি দিয়া ইহার বিসর্পিত বিস্তারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষের অন্তরের জটিলতা নহে, সমাজব্যবস্থার দুর্বোধ্য ও দুরতিক্রম্য প্রভাব, জীবনদৃশ্যের নানা অতর্কিত বিকাশ ও বর্ণবৈচিত্র্য তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও বিশ্লেষণ-প্রবণতাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। তাঁহার ছোটগল্পসমূহের মধ্যে ব্যঙ্গরসিকের, জীবনে অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্ণ কৌতূহলের মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও ঘটনাবিন্যাসের যথাযথতা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই—স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে ইহার অন্তর্নিহিত পরিহাসটুকু ব্যক্ত করিয়া, অতর্কিতের ধাক্কায় পাঠককে খানিকটা চকিত করিয়া, গল্প শেষ করিয়াছেন। কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্প-সংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বহু-অনুশীলিত, কুতূহলী মন, তাহার পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁহার জীবনের প্রতিবেশ ও বহিরঙ্গবিন্যাস সম্বন্ধে মানস আগ্রহ, তাঁহার নূতন নূতন পরিকল্পনার চমকপ্রদ আবেদন ও সমস্ত মিলাইয়া বুদ্ধির দ্রুতগামী ক্ষিপ্রতা তাঁহাকে আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। নূতন যুগে উপন্যাসের যে রূপান্তরসম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, নিজ শিল্পসুষমা ও স্বভাবধর্ম কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জন দিয়াও ইহার মধ্যে যে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা-কল্পনার তাত্ত্বিক ও ছান্দসিক রূপটি আত্মসাৎকরণের প্রবণতা লক্ষিত হইতেছে, বনফুলের উপন্যাসাবলী সেই আসন্ন পরিবর্তনের সংবেগ-বায়ুতে পাল মেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সৃজ্যমান উপন্যাস-সাহিত্য

(১)

উপন্যাসের মত প্রতিদিন নব নব রূপে সৃজ্যমান, নূতন নূতন প্রেরণায় প্রাণবন্ত, পাঠকের রুচি ও তাগিদা মিটাইবার প্রয়োজনে অবিরত আত্মপ্রসারণশীল সাহিত্যের আলোচনায় কোন সীমারেখা টানা স্বতঃই অসম্ভব। সমালোচক যেখানে পরিসমাপ্তির ছেদ টানিবেন, ঠিক সেই গণ্ডির অব্যবহিত পরেই নূতন সৃষ্টির অভ্যুদয় তাঁহার সীমানির্ধারণপ্রয়াসকে বিপর্যস্ত করিয়া, তাঁহার শ্রেণীবিভাগের পরিপাটি বিন্যাসকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, মানচিত্রের মসৃণতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। যুগের প্রারম্ভ বা পরিসমাপ্তি কোনটাই কালের নির্দিষ্ট সীমায়নের শাসন মানে না। সাহিত্যের ইতিহাসকে একেবারে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করিলে হয় অনেক জীবিত লেখকের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রচনাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাদ দিতে হইবে, নতুবা সাধারণ-লক্ষণ-নির্দেশের সুশৃঙ্খলতাকে বিসর্জন দিয়া সদ্যোপ্রকাশিত গ্রন্থতালিকা হইতে নামচয়নপূর্বক আলোচনার কলেবরকে অসম্ভব-রকম স্ফীত করিতে হইবে। সুতরাং এই উভয়সংকটের মধ্যে একটা সুবিধাজনক মধ্যপন্থা গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অন্যান্য সাহিত্য-শাখার সহিত তুলনায় উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন অগ্রসর-শীলতা ও অফুরন্ত বৈচিত্র্য-প্রকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। কাব্য যতই প্রগতিশীল ও নিরীক্ষাপ্রবণ হউক না কেন উহার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত প্রথানুগত্য আছে। কাব্যে বৈপ্লবিক অভিনবত্ব কিছুদিন পরে একটি প্রথার সৃষ্টি করে এবং এই প্রথার রাজত্বকাল বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়। আজকাল আমরা যাহাকে আধুনিক কবিতা বলি, তাহা এখন আর ঠিক আধুনিক নহে, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কাব্য-রীতির কোথাও বা মৌলিক, কোথাও বা অনুকরণাত্মক অনুবর্তন। কিন্তু উপন্যাসে, ভারতের ইতিহাসে দাস-রাজবংশের দ্রুত নৃপতি-পরিবর্তনের ন্যায় স্বল্পকালের ব্যবধানে আদর্শ ও রচনারীতির একটা ত্বরিত ভাঙাগড়া চলিতেছে। ইহার কারণ উপন্যাসের আঙ্গিকের স্থিতিস্থাপকতা ও ঔপন্যাসিক সৃষ্টিপ্রেরণার অতর্কিত অভিনবত্ব। উপন্যাসের গঠন কংক্রিটে গাঁথা নয়, ঘটনার ও মানব-মনের চলতি প্রবাহের কোমল পলিমাটি দ্বারা রচিত। তা ছাড়া ঔপন্যাসিক যে মনোভাব লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসেন, তাঁহার মধ্যে যে ক্রিয়াশীল প্রাজাপত্য-লীলা তাহা কাব্যরচনার ন্যায় এতটা ঐতিহ্যশাসিত নহে, বহু পরিমাণে স্ব-তন্ত্র। প্রবহমান ঘটনাধারা ভাবকল্পনার স্বচ্ছন্দ-বায়ুতরঙ্গ-তাড়িত হইয়া উপন্যাসের তটভূমিতে যে কিভাবে প্রহত হইবে, কিরূপ বঙ্কিম সুষমা-বেষ্টনীতে উহার রেখাচিত্র অঙ্কিত করিবে ঘূর্ণিপথে উহার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া উহার ভূমিসংস্থানের কি রূপান্তরসাধন করিবে তাহা পূর্বতন ঐতিহ্যের দৃষ্টান্তে নির্ণয় করা যায় না। এই স্বাতন্ত্র্যবিকাশের উদাহরণগুলি

কালের দিক দিয়া যতই আধুনিক হউক, উপন্যাসের রীতিবৈচিত্র্য উদাহৃত করিবার জন্য ইহাদের আলোচনা অনেকটা অপরিহার্য। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'আরণ্যক', 'মহাস্থবির জাতক', 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'পাতালে এক ঋতু'—এই কয়টি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাদের আবির্ভাব উপন্যাসের প্রাক্-নির্ধারিত রূপরীতির সাহায্যে পূর্ব হইতে অনুমান করা যাইত না।

সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে উপন্যাসের নবতম যাত্রাপথ ও প্রবণতার কিছু পরিচয় দিবার জন্য অচিরকাল পূর্বে প্রকাশিত কিছু কিছু উপন্যাসের আলোচনা করিতে হইবে। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই আলোচনা কেবল ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্য চূড়ান্ত মূল্যনির্ধারণের অভিপ্রায়ে নহে।

(২)

আমাদের চোখের সামনে যে উপন্যাস-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে উহার মধ্যে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের আবেগময় সাধনা ইহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। ঔপন্যাসিকের বিষয়নির্বাচন প্রধানতঃ সমসাময়িক ঘটনাবলীর জনপ্রিয়তা ও জনমনে অভাবনীয় আলোড়ন জাগাইবার শক্তির উপর নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিক অনেকটা সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত গণ-আন্দোলনগুলির দিকে চোখ রাখিয়াই নিজ সাহিত্যসাধনার প্রেরণা আহরণ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহা বহু লোককে আকর্ষণ করিতেছে তাহা স্বতঃই সাহিত্যসৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তাধারার ফলে, ঘটনার আপাত-আকর্ষণীয়তার উপর অতিরিক্ত আস্থা-স্থাপনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্য দ্রুত সাংবাদিকতার পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। গণ-আন্দোলনের যে বিপুল উত্তেজনা জোয়ারের বানের মত সাহিত্যের উভয় তট প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া আসে, তাহার মধ্যে যদি কোন চিরন্তন ভাবতাৎপর্য, সার্বভৌম প্রেরণা না থাকে, তবে তাহা জোয়ারের উচ্ছ্বাসের মতই ক্ষণস্থায়ী হইবে। পৃথিবীব্যাপী যে সমস্ত বিরাট ভাব-জাগরণ ও রাজনৈতিক উৎক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এক ফরাসী-বিপ্লবই শাশ্বত সাহিত্যিক আবেদনে কালজয়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কেননা ইহার মধ্যে মানব-মর্যাদার এক চিরন্তন স্বীকৃতি, বস্তুবিপর্যয়ের ভিতর এক আত্মার উদ্বোধনকারী ভাবসত্যপ্রতিষ্ঠা ইহাকে সাময়িকতার ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে। অচিরকাল পূর্বে যে রুশ-বিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহা মানবিক অধিকারের আরও ব্যাপকতর সম্প্রসারণ ও গণরাজপ্রতিষ্ঠার আরও বাস্তব রূপায়ণ সত্ত্বেও, মানবচিত্তে আত্মিক সত্যের সূক্ষ্মতর সঞ্চরণশীলতার রূপ গ্রহণ করিতে পারিল না। হয়ত ইহার অর্থনীতির উপর অত্যধিক জোর, মানবের খাওয়া-পরার মানের উন্নয়নের জন্য অতি-আগ্রহ, ইহার কল-কারখানা-যান্ত্র-সংগঠনের বস্তু-কাঠামোর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ও জাতির কল্যাণের জন্যই সমস্ত জাতীয় চিন্তা ও কর্মধারার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, জাতির ঐহিক শক্তি ও সুখ-বৃদ্ধির জন্য ইহার স্বাধীন আত্মার গূঢ়নি অবমাননা ইহার ভাবগত আবেদনকে সংকুচিত করিয়াছে। ইহার বাস্তব সংগ্রামশীলতায় সাফল্যই ইহার ভাবজগতে আপেক্ষিক বিফলতার কারণ

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে আগস্ট-আন্দোলন ও বাস্তুহারা-সমস্যা আপাততঃ আমাদের সাহিত্যসৃষ্টিকে ও বাস্তববোধকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু ইহাদের মানস প্রতিক্রিয়া একটা অস্পষ্ট বিহ্বল ভাবোচ্ছ্বাসের পর্যায় ছাড়াইয়া কোন নিগূঢ় ভাবানুভূতির ধ্রুব দীপ্তিতে পরিণতি লাভ করে নাই। আগস্ট-আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী ও ব্যাপক প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া জাতির বিদেশী অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার যে দৃঢ়সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংকল্পটির ললাটে সাহিত্যিক অমরতার জয়-তিলক ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ আমাদের সাহিত্যিক অক্ষমতা ততটা নহে, যতটা ইহার অন্তর্নিহিত ভাব-অনিশ্চিতি। তেমনি উদ্বাস্তু-সমস্যার মধ্যে জাতির যে শোচনীয় দৌর্বল্য ও চরম অসহায়তা উদাহৃত হইতেছে, তাহার ঔপন্যাসিক প্রতিরূপও তেমনি করুণ ও বীভৎস রসের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইতেছে।—এই বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা-শেকড়ছেঁড়া-উন্মূলনের দুঃস্বপ্ন-আবর্তনের মধ্যে কোন স্থির মানবিক আবেগের নিঃসংশয় সুরটি, কোন হৃদয়ের গভীরশায়ী, অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত হাহাকার-ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে না। যেমন রাজনৈতিক স্তরে আমরা বক্তৃতায় আত্মসম্মোহিত হইয়া এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কোন প্রতিকার খুঁজিয়া পাইতেছি না, তেমনি সাহিত্যের স্তরেও এক বোবা গুঞ্জন, এক মূঢ় উদ্‌ভ্রান্তি, মৃত্যুতাড়িত পশুর চোখে এক আর্ত বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ছাড়া ইহার আর কোন সার্থকতর রূপ দিতে আমাদের সাহিত্যিকেরাও কৃতকার্য হইতেছেন না। দান্তের নরকে আর্তজীবনের হাহাকারের মধ্যে এক স্থির অধ্যাত্মবিশ্বাসের ঐকতান শোনা যায়; আধুনিক বাংলার নরকে মর্মবিলাপও নানা বেসুরো, আত্মকেন্দ্রিক চীৎকার-ধ্বনিতে বিভক্ত হইয়া উহার ভাবসঙ্গতি ও রসমর্যাদা হারাইয়াছে।

এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও দেশত্যাগের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও প্রীতি-মধুর জীবনযাত্রা রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ সাহা (প্রাণগঙ্গা) প্রমুখ পরিণতবয়স্ক লেখকদের রচনার উপজীব্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই উপন্যাস-গুলিতে চিরদিনের জন্য হারানো ও শতস্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমিকে এক আদর্শায়িত ভাবমাধুর্য-রোমন্থন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া রমণীয়ভাবে কল্পনা করিবার স্বাভাবিক প্রবণতাই ক্রিয়াশীল। ইহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিচিত্র অপেক্ষা সামগ্রিক পল্লীজীবনের শান্ত ছন্দ, পল্লীবাসীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘর্ষে বিচিত্রায়িত জীবনধারার ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক বেশি। পূর্ব-বঙ্গের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবনযাত্রাকে যেরূপ নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধেও লেখকেরা বিশেষভাবে সচেতন। উপন্যাসগুলিতে প্রধানতঃ মুসলমান চাষী-ব্যবসায়ীর জীবনকাহিনী, তাহাদের সামাজিক আচার ও ধর্মসংস্কার, তাহাদের জীবনাবেগ-অভিব্যক্তির বিশেষ উপলক্ষ্য ও ছন্দটি রূপ পাইয়াছে—ইহাদের সহিত নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কটিও চিত্রিত হইয়াছে। মোটের উপর এই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে অতীত জীবন-যাত্রার তিরোভাবের জন্য করুণ দীর্ঘশ্বাস, অনুচ্চারিত অথচ অনুভূতিগম্য মৃদু খেদোচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্তে একটি সজল স্পর্শ রাখিয়া যায়। বাস্তব জীবনের ছবি, বস্তুনিষ্ঠার সহিত রূপায়িত হইতে গিয়া, যুগধর্মে ও লেখকদের বিশেষ মনোভাবের জন্য, দূর হইতে দৃষ্ট দিগন্ত-রেখার ন্যায়, স্বপ্নসুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী লইয়া যে সমস্ত উপন্যাস সাম্প্রতিককালে রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' (জুলাই, ১৯৫৮) ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' (আগষ্ট, ১৯৬০) এই দুইখানি উপন্যাসে পূর্ব-বঙ্গের ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থির-বিক্ষুব্ধ, দুর্দৈবের ঝটিকাবেগতাড়িত জীবনসমস্যা উপন্যাসের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি ও চরিত্রাশ্রয়ী কেন্দ্রতাৎপর্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ঘটনাচক্রে বিঘূর্ণিত, অন্ধ বিভীষিকায় বিমূঢ় মানবিক অণুপরমাণুগুলি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির ও জীবনবোধে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা এতদিন বিশুদ্ধ ঘটনাসঞ্জাত সমস্যা ছিল তাহার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মকর্তৃত্বমূলক হৃদয়সমস্যা অঙ্কুরিত হইয়াছে। মর্মান্তিক আঘাতের অসাড়তা হইতে মানবের সনাতন বৃত্তিগুলি আবার জাগিয়া উঠিয়া হিংসা-দ্বেষ-শাঠ্য-সমবেদনা-ভালবাসা-করুণস্মৃতিরোমন্থন প্রভৃতি জীবনের বিচিত্র লীলাজালবয়নে পুনরায় ব্রতী হইয়াছে। একটানা হাহাকার ও নৈরাশ্য-সমুদ্রের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনাকৃতির ছোট ছোট দ্বীপগুলি পুনরায় মাথা তুলিয়াছে। ভাগ্যহত জীবনের উদ্‌ভ্রান্ত, যান্ত্রিক গতিবিধির মধ্যে ঔপন্যাসিক যেন একটি সচেতন উদ্দেশ্যানুবর্তনের সূত্রপারম্পর্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের দুইদিনের ক্ষণভঙ্গুর উইটিপির মত আচ্ছাদনের একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ে পরিণত করার উদ্বিগ্ন, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে অস্থির, সাধনার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই আত্ম-অবিশ্বাসে করুণ, দলাদলিতে উত্তপ্ত, বিরোধের নানা শাখাপথের স্রোতোতাড়িত সাধারণ পরিস্থিতির কেন্দ্রস্থলে একটি অভাবপিষ্ট ভদ্র পরিবারের আদর্শচ্যুতি, ইতর সন্দেহ ও মর্মান্তিক বন্ধনচ্ছেদের বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে একটি উচ্চতর ভাবসঙ্গতি দিয়াছে। প্রতিবেশের সমস্ত নীতিহীনতা ও স্বার্থপর, সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি যেন হরিপদ চক্রবর্তীর পরিবার-জীবনে নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—উহার সমস্ত অশুভ সম্ভাবনা যেন এইখানেই একটি বস্তুকাঠিন্যময় রূপ লইয়াছে। চক্রবর্তী-পরিবার এই নিদারুণ অবস্থাসংকটে উহার ঐক্য হারাইয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পুত্রবধূ কামিনীর পরিবারে ভার লইবার দৃঢ়সংকল্প ও তাহার ছোট দেবর বাবলুর সহিত সকলের অজ্ঞাতে ট্রেনে চানাচুর-বিক্রয়ের গোপন আয়োজন, পরপুরুষের উগ্র লালসার বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম, তাহার সতীত্বে সন্দেহপরায়ণ শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদের প্রতি অটল মনোভাব ও বাবলুর মৃত্যু-আশঙ্কায় তাহার ভাঙ্গিয়া পড়া নতিস্বীকার—সবই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক যাথার্থ্যের সহিত চিত্রিত। এই পরিবারের নমিতা আর একটি দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, আত্মনির্ভর চরিত্র। ভূষণের সঙ্গে তাহার প্রত্যাশা-মধুর সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝির জন্য করুণ পরিণতি আমাদিগকে এই প্রণয়-সার্থকতা হইতে বঞ্চিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা তরুণীর প্রতি সহানুভূতিতে দ্রবীভূত করে। ভাগ্যের ও যুগের নিদারুণ পরিহাসে তাহার নিজেরই ছোট বোন, অকালপক্ব কিশোরী লতিকাই তাহার প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র, নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ মনে দিদির কথা একেবারেই স্থান পায় নাই—সে বিবাহের স্বাদু ফলটা যে একান্তভাবে তাহার প্রাপ্য ইহা ধরিয়া লইয়াছে। নমিতা উদ্বাস্তু উপনিবেশের নেত্রীরূপে দুই দল উদ্বাস্তুর মধ্যে দাঙ্গায় জড়িত হইয়া পড়িয়া আততায়ীর লাঠিতে প্রাণ দিয়াছে। বোধ হয় লতিকার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক-

জটিলতার প্রতিক্রিয়ার অপ্রীতিকর দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই লেখক তাহাকে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছেন। উদ্বাস্তুসমস্যার সমাধানের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা লেখক বলিয়াছেন, উহাদের বেকারত্ব-মোচন ও নেতৃত্ব-স্ফুরণের জন্য যে সমস্ত পন্থা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিদর্শন। কিন্তু উপন্যাসের এই অংশগুলি অনেকটা ঘটনা-ও-তত্ত্বমূলক, ঠিক ঔপন্যাসিকগুণসমৃদ্ধ নয়। উদ্বাস্তু জীবনের বহু অকর্ষিত, ঊষর ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নিজ সৃষ্টির বীজ বুনিবার অবসর পান না, কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে আকস্মিকতার নৈরাজ্যে মানব-কর্তৃত্বের শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে ইহা বোঝা যায়।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' পশ্চিম রাঢ়ে বনভূমির প্রান্তস্থিত ঊষর প্রান্তরে গড়িয়া-উঠা উদ্বাস্তু-শিবির-জীবনের একটি সূক্ষ্ম-অনুভূতিময় হৃদয়রহস্যের নানা চমকপ্রদ পরিচয়ের বিচিত্র কাহিনী। এই শিবিরেরই একজন কর্মাধ্যক্ষ তাঁহার কোমল সংবেদনশীল মন লইয়া এই সর্বরিক্ত হতভাগ্যদের জীবনছন্দটি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও তাঁহার সমবেদনাস্নিগ্ধ, কবিত্বময় মন্তব্য সহযোগে উহা আমাদের অন্তরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। মানবচরিত্রের কি বিচিত্র রূপ, ভাল-মন্দের কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ, তির্যক মনোবিকারের কি স্মরণীয় রেখাচিত্রই না এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সমষ্টিগত, সংকীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। লেখক প্রকৃত জীবনশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত ইহাদের বহির্জীবনের বিক্ষোভকে গৌণ স্থান দিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ও ইহারই মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির গূঢ় চরিত্র-রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। উপন্যাসের আরম্ভ জমিদারের বিরুদ্ধে বহির্বিক্ষোভ দিয়া। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের এই উগ্র, হিংস্র লোলুপতা উহাদের জীবনকাহিনীর পটভূমিকা মাত্র। এই আশ্রয়-শিবিরের মরা ডালে কত দেশের পাখী আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে ও তাহাদের অদ্ভুত কলরবে আকাশ বাতাসকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এই শিথিলমূল, ঝটিকাবিপর্যস্ত জনসংঘের মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তি আত্মপরিচয়ে সুস্পষ্ট হইয়াছে। মুরারি সিদ্ধান্ত এই ঘোলা জলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত সুযোগ সন্ধানী। দুর্বলকে উৎপীড়ন, অসহায়ের নামে কুৎসারটনা, অসন্তোষের ধূমে ফুৎকার দিয়া উহা হইতে আগুন জ্বালান—এইগুলি তাহার স্বভাবসিদ্ধ দুর্বৃত্ততা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যে বীভৎস, অস্বাভাবিক আচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহা অভাবনীয়। সে নিজের মেয়ের সতীত্বের বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা খুঁজিয়াছে ও সেই মেয়ে যখন অসহ্য দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে তখন কল্পনাতীত নির্লজ্জতার সহিত উহার দায়িত্ব শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার উপর চাপাইয়াছে। সাধারণ ভদ্র মানুষের মধ্যে যে অচিন্তনীয় নীচতা প্রচ্ছন্ন আছে অবস্থা-বিপর্যয় তাহা বীভৎসভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায় ও 'মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

কপিলের নিদারুণ অভিজ্ঞতা মানব-প্রকৃতির আর একটি চমকপ্রদ উদ্‌ঘাটন। আন্দামানের নূতন উপনিবেশে বাঙালীর অভ্যস্ত মূল্যবোধ ও সামাজিক মানসম্ভ্রমের আদর্শ যে একেবারে উল্টাইয়া যায় তাহাই এখানে রূঢ়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কপিলের

শ্রমবিমুখতা ও উপার্জনে অক্ষমতার জন্য তাহার নিজ পরিবারের নিকটই তাহার দাম কমিয়াছে ও তাহার স্বগ্রামবাসী ও এযাবৎকাল তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ এক নমঃশূদ্র যুবক সমাজনেতৃত্বের স্বীকৃতি পাইয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা এই নূতন পরিবেশে তাহার অঙ্গ হইতে স্বতঃই স্খলিত ও আভিজাত্যের নূতন মান নির্ণীত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় তাহার স্ত্রী ও ছেলেপিলে তাহাকে একবাক্যে বর্জন করিয়া চিরপোষিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে বিসর্জন দিয়াছে ও হীন বর্ণের এক ধনী ব্যবসায়ীর পরিবারভুক্ত হইয়াছে। আমাদের পবিত্রতম জীবনাদর্শ যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিবেশনির্ভর তাহা এই মহাপ্রলয়ের রূঢ় অভিঘাত আমাদিগকে বুঝিতে বাধ্য করিয়াছে।

সুরশিল্পী সুরেশ ও তাহার মেয়ে গীতকুশলা রুচি, আত্মগ্লানিতে খিন্ন জিতেন ডাক্তার, কোলের ছেলে হারাইয়া উন্মাদিনী বিন্দী, স্বৈরিণী, সন্তান-স্নেহাতুরা কমল, অবস্থার উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নটবর, নিকুঞ্জের শোভা ও বাসন্তীর মধ্যে দ্বিধাজড়িত হৃদয়-সম্পর্ক—এ সমস্তই অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে মানব-জীবনের অচিন্তিতপূর্ব মনোবৃত্তি-স্ফুরণের পরিচয় বহন করে। লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত জীবনলীলার এই অভিনব রীতিবৈচিত্র্য গভীররসাত্মক, যথাযথ মন্তব্যের সাহায্যে আমাদের অনুভবগম্য করিয়াছেন। এ যেন আলো-ছায়ার নূতন সমাবেশে, অতর্কিত আবেগের দোলায়, ঐতিহ্যভারমুক্ত, চিরাভ্যস্ত-পথরেখালংঘী প্রাণচেতনার এক অজ্ঞাতপূর্ব রেখাচিত্রবিন্যাস। লেখক গল্পের উপসংহারে এই জীবন-শোভাযাত্রায় ভাল-মন্দের, আলো-আঁধারের, উজ্জ্বল ও মলিন বর্ণের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখানে যেমন অপরিসীম কৃতঘ্নতা ও নীচতার পরিচয় আছে, তেমনি জীবনের আস্থা হারাইবার পর আবার নূতন জীবনের প্রেরণাও আছে। শাশ্বত মানব-মহিমা কলঙ্কিত হইয়াও আবার স্বভাব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহৎ সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রয়ে নবভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছে। গোপালপুরের উদ্বাস্তু শিবির লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই অরণ্যসীমিত, পলাশফুলের রক্ত আভায় দীপ্ত, রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে করুণ স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। মানুষের ঘর-বাঁধার চিরন্তন আকুতি বর্ষার শ্যামল সৌন্দর্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, শোভার আত্মত্যাগের নীরব মহিমা অন্ধকার রাত্রির নক্ষত্রদীপ্তির ফাঁকে ফাঁকে দ্যুতি বিকিরণ করিয়াছে। উদ্বাস্তু-কাহিনী শুধু ভাগ্যাহত মানুষের ক্ষুব্ধ অভিযোগ ও নিষ্ফল ঘটনা-বিড়ম্বিত জীবন-প্রয়াসের পর্যায় ছাড়াইয়া সাহিত্যের অমৃতনিঃস্যন্দী রসে অভিসিক্ত ও করুণ-অর্থবহ জীবনসমীক্ষার আভিজাত্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাষ্ট্রচর্চার পর্যায়ভুক্ত উপন্যাসসমূহের মধ্যে দুইখানি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যগুণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—একখানি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও অপরটি দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'। প্রথম উপন্যাসটিতে কারাগারে বন্দী একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধার মৃত্যুমুহূর্তপ্রতীক্ষায় দুর্বিষহ, স্মৃতিভারাকুল ও কল্পনা-জালবয়নে রুদ্ধশ্বাস, অন্তিম জীবনের দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকার এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও আবেগ-তপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা তাহার সমস্ত অনুভূতিকে এমন একাগ্র ও একলক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে যে, ইহারই টানে তাহার পূর্বজীবনের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত স্মৃতি-

সূত্রগুলি অনিবার্যভাবে এই সর্বগ্রাসী ভাবকেন্দ্রে সংহত হইয়াছে। মরণের অঙ্গুলিস্পর্শে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, উহার বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশগুলি, উহার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবর্তিত আশা-কল্পনাসমূহ নানাতারসমন্বিত বীণার ন্যায় এক দুঃসহ-করুণ, উদ্দাম-ক্ষুব্ধ স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বহুমুখী কর্মোদ্যম, তরুণ মনের বিচিত্র স্বপ্নবিলাস, অসম্ভব আদর্শকে রূপ দিবার জন্য নানা অসম্পূর্ণ প্রয়াস, উত্তেজনার তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিয়া-চলা শক্তির অভিযান ও উহাকেও বহুদূরে ফেলিয়া আগাইয়া-যাওয়া কল্পনার অভিসার—জীবনের এই বিরাট প্রবাহ বিলোপের সংকীর্ণ গিরিসংকটে প্রবেশোন্মুখ হইয়া এক দুর্দম, ফেনিল সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে ছন্দিত হইয়াছে। বিপ্লবের বস্তুরূপটি মানবাত্মার অপ্রশমিত আর্তির নিবিড় স্পর্শে একটি সূক্ষ্মতর ভাবসত্তা অর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রসর্বস্ব জীবনবোধের সহিত ঐতিহাসিক কল্পনা ও মনন-তীক্ষ্ণ সমাজবিশ্লেষণ যুক্ত হইয়া 'পাতালে এক ঋতু'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্ভাব্য রূপ শাসনব্যবস্থা ও মানবিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লেখক এই উপন্যাসে কল্পনা-সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রধান ও অপরাপর নায়ক সবই মধ্যবিত্ত পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হইতে আগত। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় ধর্মাত্মক জীবনদর্শনের সমন্বয়ে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গত শতাব্দীর শেষ দিকে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই ধ্বংসজীর্ণতার ফাটল হইতে এই সমাজবিপ্লবের কীটসমূহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নির্মমতম আক্রোশ এই মধ্যবিত্তশাসিত, বুদ্ধিজীবী, খানিকটা আদর্শনিষ্ঠার হাল্‌কা অভিনয় ও খানিকটা পারিবারিক জীবনের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির স্বপ্নাবেশের সংমিশ্রণে গঠিত, অন্তঃসঙ্গতিহীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবার বিপ্লব-নায়কদের মনে পূর্বতন আদর্শের প্রতি একটা করুণ, দুর্বল, মরিয়াও-না-মরা মোহের জন্য বাহিরের সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতাও সমতালে বাড়িয়াছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রধান নেতা দীপক চৌধুরী নিজ কুলধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, পারিবারিক স্নেহ-ভক্তি-আনুগত্যের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়জনের চিরপোষিত আদর্শের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত হানিয়া নূতন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু এই সিংহাসনে বসিয়া সে শান্তি পায় নাই। বিবেকের দংশন, নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ, পূর্বজীবনের বেদনাময় স্মৃতি, অবদমিত হৃদয়বৃত্তির চাপা ক্রন্দন লৌহ যবনিকার অন্তরাল হইতে এক করুণ গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়াছে। গুপ্তচরবৃত্তির নীরন্ধ্র প্রয়োগ, কপটশিষ্টাচার ও মৌখিক আনুগত্যের অন্তরালে প্রতিযোগিতার সদা-জাগ্রত ঊর্ধ্বাভিলাষ, প্রতি-মুহূর্তে নিয়মিত জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতা—এই সমস্ত মিলিয়া এক শ্বাসরোধকারী, অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিজীবনসম্ভূত অস্বস্তিকে বাদ দিলে ও ক্ষমতালাভের জন্য অবলম্বিত উপায়ের নীতিহীনতাকে অনিবার্য রণকৌশলের পর্যায়ে ফেলিলে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ ও পক্ষপাতিতাবর্জিত। ইহার কর্মপন্থা ক্রূর ও নির্মম; ইহার ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মূলন সামগ্রিক ও আপসহীন; ইহার দলগত যন্ত্রপরিচালনা

নিশ্ছিদ্র ও কার্যকরী শক্তিতে অতুলনীয়; ইহার যুক্তিবাদ ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ব্যাখ্যা গাণিতিকভাবে নির্ভুল ও উচ্চতর নীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অস্পৃষ্ট। ইহা দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের জন্য মোটেই চিন্তিত নহে; দৈবদুর্বিপাককে ইহা বিরুদ্ধবাদীদের উৎসাদনের অস্ত্ররূপে অকুণ্ঠিত-ভাবে প্রয়োগ করে। ভারতীয় জীবনে ইহার বাস্তব প্রয়োগ প্রধানতঃ দুইটি বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া প্রবল প্রতিরোধ উদ্রিক্ত করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা কৃষকের ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্ব অস্বীকার করিয়া ও সকলকে মজুর হিসাবে রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিতে বাধ্য করিয়া ভূমিগতপ্রাণ কৃষকের মনে বিদ্রোহ জাগাইয়াছে। চৌধুরী-বংশের মেয়ে মুক্ত যৌন-জীবনের তৃপ্তি ও নির্ভর হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া ভুষণ্ডির মাঠে পুরাতন সমাজবোধ, সম্ভ্রম-মর্যাদা ও দাম্পত্য জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। বাস্তহারা অবনী মণ্ডল ও ধর্মপ্রাণ ওবাইদ মোল্লা পুরাতন ধর্মের আকর্ষণকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত স্বাধীন-জীবন-স্ফুরণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে ও নবরাষ্ট্র উহার সমস্ত শক্তি-প্রয়োগে বিপ্লবকে উল্টাইবার এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছে। গ্রন্থের প্রতিশ্রুত তৃতীয় খণ্ডে এই সংগ্রামের শেষ পরিণতি দেখান হইবে লেখক এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত দীপক চৌধুরীর আত্মকাহিনী কোন চমকপ্রদ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই—তাহার আত্মবিলাপ ও পাঠকের মনে একটা রোমাঞ্চকর, অভাবনীয় প্রত্যাশা জাগাইবার কলাকৌশল কোন সার্থক ফলশ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। কমিউনিস্ট নীতির বীজ ভারতীয় সংস্কৃতির ভূমিতে উপ্ত হইয়া যে বৃক্ষের জন্ম দিয়াছে তাহা হয়ত বিষবৃক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অরণ্যতরুর নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় উৎপাদন করে না। লেখকের রচনাশক্তি ও মননশীলতা উচ্চ কৃতিত্বের অধিকারী, কিন্তু তাঁহার শাণিত ও সুমার্জিত ধীশক্তি কমিউনিজম-বৃত্রাসুরের বধোপযোগী বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

'পতঙ্গ মন' (বৈশাখ, ১৩৬৯)—এক ব্যর্থ শিল্পী-প্রেমিকের অদ্ভুত খেয়াল ও এই আপাত-অর্থহীন খেয়ালের পিছনে এক সুপরিকল্পিত, অথচ নিপুণভাবে সংবৃত প্রত্যাঘাতের কাহিনী। নিবারণ গুপ্ত প্রণয়ে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দার্জিলিং-এ তাহার পূর্ব প্রণয়িনীর পাশের বাড়ি কিনিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ও তাঁহার পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি বিড়ালকে লালন-পালন করিয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলেন। মানব সমাজ হইতে প্রতিহত ভালবাসা এই জন্তুগুলির উপর এক বিকৃত আতিশয্যের সহিত বর্ষিত হইল। তাঁহার পূর্ব প্রণয়িনী একজন বড় চাকুরেকে বিবাহ করিয়া এক আপাত-নিরুদ্বেগ, ও সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তিপ্রদ সুখনীড় রচনা করিয়াছেন। এই নিশ্ছিদ্র জীবন-ব্যবস্থায় তাঁহার কন্যা সুকৃতির দুর্দম প্রেমাকর্ষণে তাঁহার প্রথম যৌবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। সে এক নিঃসম্বল, শিশুর মত অসহায়, সংসারজ্ঞানহীন শিল্পী তরুণকে ভাল-বাসিয়া তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতামাতার অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাহার মা তাহার জন্য যে মুনসেফ পাত্র স্থির করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহার প্রবল অসম্মতি। শেষ পর্যন্ত নিবারণবাবুর অজ্ঞাতবাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তিনি কেমন করিয়া সুপ্রিয় ও

সুকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন ও বিড়ালের বিবাহের আড়ম্বরময় আয়োজনের অন্তরালে এই তরুণ-তরুণীর মিলন সম্পন্ন করিয়াছেন ও সুকৃতির মাতার ঐহিকসুখসর্বস্বতার উপর গূঢ় প্রতিশোধ লইয়াছেন। এই গল্পের যিনি বিবৃতিকার তিনি একজন লেখক ও তাঁহার মাধ্যমে ঘটনার অগ্রগতি ও বিভিন্ন চরিত্রের সংঘর্ষ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার চরিত্র বরাবর নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে, তিনি কেবল বিমূঢ় দর্শকরূপে ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন ও উহার দুর্বোধ্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। উপন্যাসে তাঁহার কোন সক্রিয় ভূমিকা নাই। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র—যথা ব্রজেনবাবু, সুমতিদেবী এমন কি সুকৃতি পর্যন্ত খানিকটা অস্পষ্টই রহিয়াছে। তাহাদের ব্যক্তিত্ব কোথাও পূর্ণ-উন্মোচিত হয় নাই। তরুণ শিল্পী সুপ্রিয়ই একমাত্র জীবন্ত চরিত্র; তাহার জীবনদৃষ্টি ও আচরণে ঔচিত্যবোধ এক সম্পূর্ণ নূতন, লৌকিক-সংস্কার নিরপেক্ষ মানদণ্ডের অনুসরণ করিয়াছে। স্মৃতির জামা গায়ে দার্জিলিং যাওয়া ও ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া—এই দুইই তাহার চরিত্রের অনুরূপ সুসঙ্গত অভিব্যক্তি। এই একটি চরিত্রই উপন্যাসের বিশেষ দানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

(৩)

নবীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় শ্রমিক-কৃষক ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের চরিত্রাঙ্কনের একটু নূতন ধরনের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্বে ইহাদের যে উপন্যাসে স্থান দেওয়া হইত তাহা রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য। ইহারা কেবল ধনিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্ররূপেই, এক তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভে মুখপাত্ররূপেই উপন্যাসে আবির্ভূত হইত। তাহাদের দারিদ্র্য, অমর্যাদা ও অর্থনৈতিক সমস্যাই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অর্থনীতি ও রাজনীতির সংগ্রামক্ষুব্ধ রূপ ছাড়াও তাহাদের জীবনযাত্রার একটা নূতন রূপ উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মানিয়া লইয়া, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে তাহারা যেটুকু অধিকার অর্জন করিয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহারা জীবনের একটা নূতন রীতি ও ছন্দকে, জীবনকে উপভোগ করিবার উপযোগী একটা বিশেষ রুচিবোধ ও মূল্যমানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আগ্নেয়গিরি চিরকালই যে অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকিবে এমন কোন শাশ্বত নিয়ম নাই। অগ্নিস্রাব নিবৃত্ত হইলে, আভ্যন্তরীণ উত্তাপ স্তিমিত হইলে, লোকে পর্বতের অঙ্গারদগ্ধ, গলিত ধাতুর জমাট-বাঁধা পিণ্ডে আকীর্ণ সানুদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া জীবনধারণের একটা পাকাপকি-রকম ব্যবস্থা করিয়া লয়। আমাদের কল-কারখানার কুলি-মজুর, অর্ধবুভুক্ষু, প্রাচীন জীবনাদর্শের আশ্রয়চ্যুত, একটা অনির্দেশ্য শূন্যতাবোধে উদ্‌ভ্রান্ত চাষী-ব্যবসায়ী নূতন যুগের চিত্তবিনোদনের স্থূল আয়োজনকে, নূতন রুচির আদর্শ ও সহকর্মিতার নিবিড়-হইয়া-ওঠা আকর্ষণকে স্বীকার করিয়া জীবনের একটা নূতন ছন্দ-তাৎপর্য অনুভব করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বৃত্তির পূর্বতন মর্যাদাবোধ নাই, ইহাদের কণ্ঠে প্রসাদী সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না, পল্লীজীবনের সহস্র টান ইহারা শিরা-স্নায়ুজালের মধ্যে আর পূর্বের মত অনুভব করে না। ইহারা সিনেমা

রেখে, ইতর স্ফূর্তির উত্তেজনায় গা ভাসাইয়া দেয়, মদ ও তাড়ির নেশায় জীবনের যান্ত্রিক একঘেয়েমি ভুলিতে চাহে ও কাহারও সহিত গলাগলি ভাব ও কাহারও সহিত কাটাকাটি ঝগড়া করিয়া জীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রিক্ততার কঙ্কালকে মানবিক সম্পর্কের মসৃণ আস্তরণে আবৃত করিতে খোঁজে। যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই নূতন শ্রেণীসমাজের উদ্ভব, তাহার প্রভাব উহাদের মনের তলদেশে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে; একটু খুঁড়িলেই এই অন্তরশায়ী চেতনার উত্তাপ বাহিরে ফুটিয়া উঠে। তথাপি রাজনীতির কেন্দ্রাকর্ষণচালিত ও উহার প্রত্যক্ষপ্রভাববর্জিত উভয়বিধ জীবনবোধই সাম্প্রতিক উপন্যাসে ইহাদের পরিচয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে।

(ক) রাজনৈতিক সংঘর্ষপ্রধান শ্রমিক-জীবনকাহিনী

বিরাট কল-কারখানার যান্ত্রিক আবর্তনে বিঘূর্ণিত ও শ্রমিক আন্দোলনের নানা মতভেদ ও চক্রান্তে বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবীর জীবনযাত্রার নূতন ছন্দ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' (জুলাই, ১৯৫৬) ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'কেউ ফেরে নাই' (এপ্রিল ১৯৬০)—এই দুইখানি উপন্যাসে স্মরণীয়ভাবে বিধৃত হইয়াছে। কাব্যে মহাকাব্যের যুগ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আশ্রয়ে জীবন ও সাহিত্যে একটা নূতন মহাকাব্যিক বিস্তৃতি রূপ গ্রহণ করিতেছে। এই সত্যটি পূর্বোক্ত দুইটি উপন্যাসে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতিকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অসংখ্য শ্রমিকগোষ্ঠী একত্রিত হইয়া পরস্পরের ও মালিকের সহিত স্বার্থসংঘাতে এক নূতন জীবনাদর্শে ও প্রাণোচ্ছলতায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে। পল্লীজীবনের শান্ত, ক্ষুদ্র পরিবেশ ও পরিবার-সংস্থার সুরক্ষিত আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই বিপুল জনসংঘ তীব্র কর্মব্যস্ততায়, দৃঢ় অধিকারবোধে, রুচি ও ভোগস্পৃহার নানা নূতন আকর্ষণে, যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উদ্ধত উন্মুখরতায়, জীবনের এক অভিনব বিন্যাসরীতি রচনা করিতেছে। শ্রমিকের সংসারে গৃহস্থ ও যাযাবরের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষিত হইতেছে। পুরাতন আবেগ ও সংস্কারগুলি ঘূর্ণনের বেগে ও কক্ষপথের প্রসারে এক নূতন অস্থির ছন্দে আবর্তিত হইতেছে। জীবনের উত্তেজনা, মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নূতন সম্পর্কপ্রতিষ্ঠার অনভ্যস্ত প্রয়াস সমস্ত পূর্বনির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করিয়া ফেনিল উচ্ছ্বাসে ও অসংবরণীয় গতিবেগে ফাটিয়া পড়িতেছে। এই বিরাটকায় উপন্যাসগুলি যেন আবার, যেমন আয়তনে তেমনি জীবনোদ্যমের সংগ্রামশীলতায়, মহাকাব্যের গৌরবে প্রতিস্পর্ধী হইতে চাহিতেছে। ইহাদের মধ্যে মহাকাব্যের স্থির আদর্শ-গৌরবের অভাব; ইহাদের দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় জীবনের কোন মহিমান্বিত বিকাশের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। প্রাচীন মহাকাব্যগুলি এক প্রাচীনতর অতীত সংস্কৃতির পরিপূর্ণ কায়াবিন্যাস, মহত্তম পরিণতির নিদর্শন। শিল্পযুগের মহাকাব্য জীবনের এক সদ্যো-আরব্ধ, অসম্পূর্ণ পরীক্ষা—অপরিমেয় জড়শক্তির কেন্দ্রাকর্ষণে অগণিত মানবকণিকাসমূহের এক বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত সমাবেশ, চোখ-ধাঁধানো বহ্নিদীপ্তিতে মানুষ-পতঙ্গের এক দুর্নিবার পতনপ্রবণতার রেখাচিত্র।

'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসে ঘটনাক্রমের প্রধান তিনটা স্তর বিভাগ করা চলে। প্রথম হইল, বিশুদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনবিষয়ক, শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের ও শ্রমিকদের বিভিন্ন

দলের সাংগঠনিক সংস্থার মধ্যে তীব্র বিরোধ-সংঘর্ষের কাহিনী। লেখক এখানে হুবহু যাহা শিল্পজগতে অচিরকাল পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহারই তথ্যানুগ বিবৃতি দিয়াছেন—এমন কি নেতৃবৃন্দের নামগুলিও গোপন রাখেন নাই। এখানে ব্যক্তিগুলির মানবিক পরিচয় নিতান্ত গৌণ; পরস্পরের প্রতি প্রীতি-সহযোগিতা, সংঘর্ষ-ঈর্ষ্যা, দলের প্রতি আনুগত্য-বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই তাহাদের জীবনকাহিনী সীমাবদ্ধ। যন্ত্ররাজের অনুচররূপেই তাহারা জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছে। অভিজিৎ, অবিনাশ চাটুজ্যে, দত্ত গুপ্ত, কিষণরাম, জিলানী, রাম অওতার সিং, রামকিষণ তেওয়ারি, পটলা প্রভৃতি এই যন্ত্রকবলিত, অর্ধস্ফুরিত জীবনযাত্রার উদাহরণ।

দ্বিতীয় স্তরে, যন্ত্রজীবনের সহিত ব্যক্তিজীবনের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতকগুলি ব্যক্তি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষমূলক জীবনের সহিত নিজেদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও অভীপ্সা এমন ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাদের সম্বন্ধে শিল্প-নিঃসম্পর্ক স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। অনিরুদ্ধ মল্লিকের স্ত্রীকন্যাসমন্বিত পরিবার-জীবন আছে; তাহার প্রথম যৌবনের ব্যর্থ প্রেমের ক্ষুব্ধ স্মৃতিও তাহার অন্তরের দাহজ্বালাকে অনির্বাণ রাখিয়া শ্রমিদের প্রতি তাহার কঠোর দমননীতি ও নৃশংস আচরণের প্রেরণা দিয়াছে। তাহার মেয়ে মন্দাকিনীর সঙ্গেও তাহার আচরণে পিতৃসুলভ প্রশ্রয়ের সঙ্গে নীতির দিক দিয়া এক অনমনীয় বিরোধিতা অদ্ভুত সমন্বয়ে মিশিয়াছে। মন্দাকিনী তাহার প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা পোষণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তথাপি অনিরুদ্ধের যথার্থ পরিচয় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নয়, যন্ত্রদানবের মানবিক সংস্করণরূপে বিরাট জটিল ব্যবসায়-পরিচালনার উপযোগী ক্রূর, হিংস্র, চক্রান্তকুশল প্রেরণাশক্তিরূপে। তাহার সম্বন্ধে আমরা রুষ্টপ্রতিবাদমিশ্র সহানুভূতির ভাব পোষণ করি; তাহার ট্র্যাজিক মহিমা নৃশংসতা-কলুষিত হইলেও আমাদের মনে কিছুটা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

উপন্যাসের নায়ক দেবজ্যোতির জীবন জনসেবা ও পরিবারনিষ্ঠার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। সে পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও প্রধানতঃ শ্রমিক-কল্যাণব্রতে, শ্রমিক-আন্দোলনের নেতৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু আদর্শবাদীদের চিরন্তন অভিশাপ—অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভীষ্ট-ব্যর্থতা—তাহার অদৃষ্টে আসিয়াছে। যে শ্রমিকের সে সেবা করিতে চায়, তাহাদেরই নীতিহীনতা ও মূঢ় দলাদলি তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত ও তাহার সমস্ত উৎসাহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে সক্রিয় শ্রমিক নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল নির্লিপ্ত উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে। ব্যর্থতার গ্লানি ও নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধ তাহার মনে বোঝারূপে চাপিয়া বসিয়াছে ও সে ক্রমশঃ পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণ পরিধিতে আশ্রয় লইয়াছে। মন্দাকিনীর সহিত তাহার সম্পর্ক কর্ম-সহযোগিতার পর্যায় অতিক্রম করিয়া প্রেমের অন্তরঙ্গতায় সন্নিহিত হইয়াছে, কিন্তু দেব-জ্যোতির দিক হইতে মন্দাকিনীর ব্যাকুল আহ্বানের পূর্ণ সাড়া আসে নাই। তাহার স্বাভাবিক বাধা-সংকোচ ও চিত্তবৃত্তির শ্লথ মন্থরতা কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহারই একটি ভুল চাল ও আপসমূলক নির্দেশ মন্দাকিনীর মত

উগ্রমতবাদসম্পন্না মেয়েকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিয়াছে। অবশ্য মন্দাকিনীর আত্মহত্যাও অবিশ্বাস্য খেয়ালপ্রবণতা বলিয়াই মনে হয়—তুচ্ছ একটু অভিমান, তাহার প্রণয়াস্পদের সামান্য একটু ঔদাসীন্য এত বড় একটা সাংঘাতিক পরিণতির যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয় না।

দেবজ্যোতির পিতা-মাতা ও ভগ্নীদেব প্রতি মনোভাবের মধ্যে বিশেষ কোন দৃঢ়তা বা গ্রন্থি-উন্মোচনের সবল সংকল্প দেখা যায় না—সকলের সম্বন্ধেই তাহার কেমন একটা শিথিল, অধিকারবোধহীন মনোভাব। পরিবাবের অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে সে নিজ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে একান্ত কুণ্ঠিত। বাবার সহিত তাহার মোটেই বনে না, অথচ তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কোন দৃঢ় প্রতিবাদ তাহার মুখে ধ্বনিত হয় না। তাহার তিনটি ভগ্নী সম্বন্ধেও সে কিছুটা স্নেহশীল অভিভাবকের ভাব দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে উদাসীনই রহিয়াছে, কাহাকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে নাই। তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল মিণ্টুকেও সে শেষপর্যন্ত নিতান্ত কর্তব্যবোধে ও আবেগহীনভাবে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এই দাম্পত্য সম্পর্কে নিরুত্তাপ সেবা ও পরস্পরনির্ভরতা ছাড়া আর কোন উষ্ণতর আকর্ষণ সঞ্চারিত হয় নাই।

দেবজ্যোতির প্রতি অমলার দুর্নিবার, কষ্টনিরুদ্ধ প্রণয়াকর্ষণ তাহার চরিত্রের দুর্বল অসহায়তার দিকটা আরও স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। অমলার এই আকস্মিক দুর্দমনীয় আবেগ দেবজ্যোতিকে কতকটা হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছে—সে ইহাকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যবর্তী অবস্থায় হৃদয়ে অনিশ্চিত আশ্রয় দিয়াছে। মোট কথা কোন অভিজ্ঞতার আঘাতেই তাহার অন্তরের পূর্ণ প্রস্ফুটন হয় নাই। শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব নেতৃত্বের সহিত দার্শনিকসুলভ চলচ্চিত্ততা, প্রখর, অগ্নিদীপ্ত সংঘর্ষের সহিত অনিশ্চিত মনোভাবের গোধূলিচ্ছায়াব সংমিশ্রণ তাহার ব্যক্তিসত্তার মূল প্রেরণাকে অস্পষ্ট রাখিয়াছে। মন্দাকিনীর দুর্বহ শোকস্মৃতি, মিণ্টুর নিরুত্তাপ দাম্পত্য নির্ভরশীলতা ও অমলার অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত নিষিদ্ধ প্রেমনিবেদন, শ্রমিক বিক্ষোভ ও সাংসারিক মতবিরোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা—এই সমস্ত বিচিত্র ধারাই তাহার হৃদয়ের প্রশান্ত আতিথেয়তায় নিস্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছে।

তৃতীয় স্তরে এমন অনেকগুলি নর-নারীর জীবনের কথা আছে, যাহারা শিল্পনগরীর অধিবাসী, কিন্তু উহার দ্রুত ছন্দ ও প্রখর উত্তেজনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে তাহারা ছোট ছোট সংসারাশ্রয় নির্মাণ করিয়া চিরপরিচিত জীবন-যাত্রার শান্ত, মন্থর গতিকেই অবলম্বন করিয়াছে। মাণিকপুর তাহাদের ভৌগোলিক প্রতিবেশ রচনা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মনে লৌহপুরীর জলন্ত স্বাক্ষর রাখে নাই। সীতানাথ ও দীনদয়াল—এই দুইজন লৌহনগরীর পুরাতন কর্মচারীরূপে উহার যন্ত্রবদ্ধ কার্যধারার সহিত আজীবন সংশ্লিষ্ট। হয়ত একজনের ক্ষুদ্র, ইতর আত্মকেন্দ্রিকতা ও অপরের উদার, বিশাল-পরিধিব্যাপ্ত মানস প্রসার তাহাদের বৃত্তিজীবনের প্রভাবজাত। কিন্তু উভয়েরই গার্হস্থ্য জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহিঃপ্রভাবমুক্ত বলিয়া মনে হয়। উভয়েরই ব্যক্তিপরিচয় তাহাদের সংসারজীবননিহিত। সীতানাথ পরিবারের পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহহীন, নির্মম ও আত্ম-সুখপরায়ণ কর্তারূপেই আমাদের নিকট প্রকাশিত, দীনদয়ালের সংসারযাত্রার বিপরীত

রূপটিই তাঁহার মানবিক পরিচয়দ্যোতক। অবসরগ্রহণের পর সীতানাথের সাধনসহচরীরূপে বৈষ্ণবী-সংসর্গ ও বৃন্দাবন-প্রবাস তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সহিত ধর্মবিষয়ক তত্তাদি ও কলুষিত রুচিকে যুক্ত করিয়া তাঁহার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। দীনদয়াল মানুষ হিসাবে অনেক উচ্চতর শ্রেণীর হইলেও সজীব চরিত্ররূপে সীতানাথের সহিত তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ—তাঁহার আদর্শবাদ তাঁহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করিয়াছে।

সীতানাথের তিনটি মেয়ে—মুকুল, মল্লিকা ও দেবিকা—স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট। ইহাদের মধ্যে মুকুলের চরিত্রে একটি বে-পরোয়া, জুয়ারি মনোভাব, আত্মতৃপ্তিসাধনে একাগ্র, নিঃসংকোচ জীবননীতি উদাহৃত হইয়াছে। সে গায়ে পড়িয়া অবিনাশের সঙ্গে নির্লজ্জ মেলামেশা করিয়া ও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হইয়া তাহার মেজো বোনের প্রণয়াস্পদ ললিতকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে ও মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া উধাও হইয়াছে। বর্তমান যৌনসম্পর্ক-শিথিলতা ও স্বেচ্ছাচারের যুগেও কোন ভদ্র পরিবারের মেয়ের পক্ষে এরূপ আচরণ কেবল নীতি নয়, শালীনতারও সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া ঠেকে। এই বিবাহলোলুপতার ফল মোটেই ভাল হয় নাই—ললিত দাম্পত্য সম্পর্কের বিশেষ কোন মর্যাদা দেয় নাই। মুকুল দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত তাহার স্বামীনির্বাচনের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়াছে। গৃহিণীরূপে মুকুলের চরিত্রে যে দায়িত্ববোধ ও প্রৌঢ় অভিজ্ঞতা স্ফুরিত হইয়াছে তাহা তাহার তরুণ বয়সের অসংযম ও উৎকট স্বার্থপরতার অনেকটা ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। মল্লিকা কোমল, অভিমানপ্রবণ ও সংসারে সমর্পিতপ্রাণ তরুণীর প্রতীক। অমলের সহিত তাহার বিবাহ রোমান্সহীন ও সমপ্রাণ দম্পতির মিলনসুখধন্য। দেবিকা সম্পূর্ণ অন্য ছাঁচে গড়া—সে পারিবারিক জীবনের কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় দিগন্তে খরদীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছে। তাহার কমিউনিজম-নিষ্ঠা অতিমাত্রায় ঝাঁজালো ও নির্ভেজাল, কিন্তু তাহার কর্মক্ষেত্র কারখানার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। যে কোন শহরে বাস করিয়াই সে উগ্র, আপসহীন রাজনৈতিক মতবাদ নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লইতে পারিত। তাহার নিঃসংকোচ সুবিধাবাদরূপ পিতৃগুণ কিছুটা তাহার মধ্যে রহিয়াছে—তাহার পূর্বপ্রেমিক অম্লানকে হারাইয়াও সে তাহার নিকট বিদেশযাত্রার ব্যয়রূপে কিছু মোটা টাকা আদায় করিতে উৎসুক। মিণ্টু একেবারে ঘরোয়া মেয়ে, আধুনিক যুগের ও অব্যবহিত পরিবেশের সর্বসংস্পর্শমুক্ত; এখানে সমাজজীবনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মেয়েদের বিবাহসমস্যা খুব লঘু হইয়া গিয়াছে। যন্ত্র-শহরের তরুণ-তরুণীরা অতিরিক্ত হৃদয়াবেগ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়াই ও ঘটনার প্রতিকূলতা এড়াইয়া যেন যন্ত্রশক্তি-উৎপাদিত ত্বরিত গতিতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও এই আকর্ষণের বিবাহ-পরিণতিতে পৌঁছিতে বিশেষ কোন বিলম্ব হয় না। মিণ্টু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেবজ্যোতিকে পাইয়াছে, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কোন প্রার্থনা জানায় নাই। তাহার যে মুহূর্তে হৃদয়ের কপাট খুলিয়াছে, প্রায় সেই মুহূর্তেই তাহার প্রণয়াস্পদ সেই মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়াছে।

এই উপন্যাসটি আয়তনে বিপুল, বহুমুখী কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত, অসংখ্য চরিত্রের সক্রিয়তায় প্রবলভাবে আন্দোলিত, ও উহার বিরাট ঘটনাসমাবেশের ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়রহস্য-উন্মোচনের আকস্মিক চমকে চঞ্চল। যন্ত্রশিল্পের ক্রূ আমাদের হৃদয়ের গভীর স্তরে প্যাঁচ

কাটিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উহার স্পর্শ এখনও ঠিক মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছে নাই। বিজ্ঞানের জটিল ক্রিয়া যে অনতিকাল মধ্যেই আমাদের হৃৎস্পন্দনের গতিবেগ নিয়মিত করিবে জীবিকার প্রয়োজন যে শীঘ্রই জীবনপ্রেরণারূপে দেখা দিবে, বাহিরের পরিধিবিস্তার যে মনের তাৎপর্যময় পরিবর্তন আনিবে এই সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা এই বিরাটকায় উপন্যাসে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'কেহ ফেরে নাই' (এপ্রিল, ১৯৬০) কয়লাখনির, অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ-সঞ্চারী মৃত্যুর আতঙ্কগহন জীবনযাত্রার দুঃস্বপ্ন-রোমাঞ্চিত বর্ণনা। অচিরকালপূর্বে চিনাকুড়ি কয়লাখাদের যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা সমস্ত দেশবাসীর মনে একটা নারকীয় বিভীষিকার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল এই উপন্যাসে তাহার শুধু সংঘটনমূলক বাহ্য বর্ণনা নয়, উহার অন্তরের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবও আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তি ও অনুভূতি-বিদারণকারী আবেগ-কম্পনসহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। লেখক এই জীবনযাত্রার বাহিরের দিকটা গৌণ করিয়া উহার অন্তরের নিগূঢ় ছন্দটিকেই প্রধানতঃ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কুঠির নীচে দিয়া প্রবহমান দ্রুতসঞ্চারী দামোদর-স্রোতের উন্মত্ত গর্জন ও তাহার পরপারে মানভূমের শালপলাশবৃক্ষসমন্বিত বনভূমির ছায়াভরা স্নিগ্ধ প্রশান্তি, আদিম যাযাবরগোষ্ঠীর আনন্দোচ্ছল বাঁশীর সুরে আত্মপ্রকাশশীল জীবনলীলা এই সংঘাত-ক্ষুব্ধ, বঞ্চনাক্লিষ্ট, কঠোর নিয়মের লৌহবন্ধনজর্জর পাতালজীবনের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই পটভূমিকার সুরেই যেন সমস্ত বঞ্চিত, বুভুক্ষু সুস্থ জীবনবোধ হইতে উৎখাত মালকাটার দল স্বীয় অন্তর-চেতনাকে মিলাইতে চাহিয়াছে ও ইহারই মানদণ্ডে বিচার করিয়া আপনাদের জীবনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হইয়াছে। ইহারা মাঝে মধ্যে উৎপীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইয়াছে, কিন্তু কোন স্থায়ী আন্দোলনে আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে পারে নাই। 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-এ শ্রমিক বিক্ষোভের সাংগঠনিক দিকটাই বড় হইয়া উহার মানবিক পরিচয়কে আড়াল করিয়াছে। বর্তমান উপন্যাসে আবেগ ও হৃদয়ের মিলন-সংঘর্ষের ছন্দোবিধৃত অন্তর-পরিচয়টিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানে সাধারণ ভূমিকার মধ্যেও প্রতি মানুষেরই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-এর ন্যায় এখানে বিরাট যন্ত্রপ্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের স্বাধীন আত্মার বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরুদ্ধ করে নাই।

বসন্ত—শিল্পপতি শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জির পরিত্যক্ত সন্তান—শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়াছে ও খনির মালিক ও উপরওয়ালা কর্মচারিবৃন্দের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিরোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে। ধনী পিতার প্রতি ক্ষুব্ধ অভিমান তাহার অনমনীয় দৃঢ়সংকল্পের প্রেরণা দিয়াছে। বসন্তের সঙ্গে পুরুষের ছদ্মবেশধারিণী, একই খাদে আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া কর্মরতা মালুর একটু স্নিগ্ধ হৃদয়াবেশের স্পর্শ লাগিয়াছে। স্বামী-নির্যাতিত গৌরীও বসন্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তবে বসন্ত—যাহার পূর্বনাম দেবেশ—পূর্বস্মৃতিরোমন্থনে এতই নিবিষ্ট যে, তাহার অব্যবহিত সমাজপ্রতিবেশ তাহার নিকট একদিকে যেমন নির্মম, বাস্তব সত্য, অন্যদিকে তেমনি অলীক, অবাস্তব কল্পনা। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিমেষ,

তাহার স্ত্রী ও দেবেশের পূর্ব-প্রণয়িনী নমিতা, স্নেহশীলা তন্বী এবা ও তাহার নিঃস্নেহ পিতা মিঃ চ্যাটার্জি সকলেই কয়লাখনির মালিকানাস্বত্বে তাহার পূর্বস্মৃতির বেদনাকে নূতন করিয়া জাগাইয়াছে ও তাহাকে যেমন একদিকে শ্রমিক কল্যাণব্রতে দৃঢ় তেমনি মানস অবস্থার দিক দিয়া আরও উন্মনা করিয়াছে। তাহার বিষাদময় মৃত্যুর ভিতর দিয়া এক উদাস, বেদনামথিত সুরে উপন্যাসটির উপর যবনিকাপাত হইয়াছে।

অন্যান্য নর-নারীর জীবনলীলাছন্দটি ঘটনার ক্ষুদ্র আবর্তে, বঞ্চিত আশার ক্ষীণ দীপ্তিতে, ইতর চক্রান্তের কুটিল জালবিস্তারে, মানব-চরিত্রের ভালো-মন্দ দুই দিকের চকিত উদ্ঘাটনে একটি চমৎকার আত্মান্ততা ও সমষ্টিগত নিবিড় সংহতি লাভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছোটসাহেব, বড়সাহেব ও উহাদের অঙ্গুলিচালিত দালালগোষ্ঠী—ভূতপূর্ব জমিদার মেজ চৌধুরী, ইয়াকুব শেখ, লালাজী, নারকাটিয়া, শরণ সিং—কয়লাকুঠির ধূম্রধূলিসমাচ্ছন্ন আবহাওয়াকে আরও নৈতিক আবিলতাপূর্ণ করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে কোন কোন সুবিধাবাদী নীতিজ্ঞান-হীন শ্রমিক যোগ দিয়া ইহাদের দুষ্ক্রিয়াসক্তিকে প্রচুরতর অবসর যোগাইতেছে। তাহার পর সাধারণ শ্রমিকের দল—পরিত্যক্তা স্ত্রীর জন্য স্বপ্নাতুর ফকির, স্ত্রীকে লালাজীর কামনানলে উৎসর্গ-করা ইতর-চরিত্র পাঁচু, স্বার্থপর, মালকাটার হিসাবরক্ষক ফড়িং সরকার, স্বৈরিণী, মুখরা, অথচ পূর্বপ্রেমের স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠাবতী সৌরভী, খাদকাটা কুলিদলের সর্দার ফকির, খাদের তলায় আবদ্ধ, অথচ মুক্ত, উদার অরণ্যের আকর্ষণমুগ্ধ সাঁওতাল যুবক বুধনা, কেষ্টা, ভক্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণস্ফুলিঙ্গগুলি এই জীবন-বহ্ন্যুৎসব হইতে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে। সকলে মিলিয়া একটি বিপুল অখণ্ড জীবনলীলাপরিবেশ রচনা করিয়াছে। উপন্যাস জুড়িয়া এই ক্ষণিক জলা-নেভার ছন্দ-স্ফুরিত খদ্যোৎদীপ্তিকণাসমূহ একটা সামগ্রিক প্রাণচঞ্চলতার দিগন্তব্যাপ্ত দীপালি-মহোৎসবে সংহত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিজীবনেরই বিস্তারিত পরিচয় নাই, সকলের সমবায়ে একটি সমষ্টিগত প্রাণোচ্ছলতার জোয়ার রহিয়াছে।

উপন্যাসের জীবন্ত বর্ণনাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যায় খনি-দুর্ঘটনার অপূর্ব আবেগময়, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বমথিত কাহিনীতে। কয়েকজন শ্রমিক খনির অন্ধকারগর্ভে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ ছাদ ধসিয়া পড়িয়া বহির্জগৎ, আলোক-বাতাস হইতে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনসপ্তাহব্যাপী এই অবরোধের সময় তাহাদের প্রত্যেকের মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আসন্ন মৃত্যুর সহিত সর্বস্বপণ সংগ্রাম, মরণের আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় তিলে তিলে অবসাদ ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়া, এক একজনের মৃত্যুর পর অপ্রাকৃত বিভীষিকার হিমশীতল অনুভূতি, মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাঁচিবার উপায়ের ব্যাকুল অনুসন্ধান—এই সমস্ত ঘটনাপর্যায় আশ্চর্য অনুভবশক্তি, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও নাটকীয় রোমাঞ্চসঞ্চারকুশলতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। লেখক আমাদিগকে এই দুঃসহ, রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার সমস্ত মানস-দ্বন্দ্বের তীব্রতা, শিরাস্নায়ুতন্ত্রীকম্পনের সমস্ত উন্মত্ত গতিবেগ, দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সমস্ত বঞ্চনাময় অনিশ্চয়তা অনুভব করাইয়াছেন—ইহাই তাঁহার বর্ণনার অসাধারণ কৃতিত্ব। শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ জীবনধারা ও অসাধারণ ভাগ্যবিপর্যয়—এই দুই দিকেরই বর্ণাঢ্য ও আবেগসংঘাতপূর্ণ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই উপন্যাসটির উৎকর্ষ নিহিত।

(খ) রাজনীতি-নিঃসম্পর্ক জনজীবন

এই নবছন্দান্বিত, নূতন জীবনবোধের সম্ভাবনায় অঙ্কুরিত গণজীবনের ছবি যে সমস্ত উপন্যাসে আঁকা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমরেশ বসুর 'জি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে' ও বিমল করের 'ত্রিপদী'। 'শ্রীমতী কাফে'তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬০) ভজু লাট, ভুলু গাড়োয়ান, চরণ, মনিয়া প্রভৃতি মানুষগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিবেশে বাস করে, রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা তাহাদের জীবনপথকে বারবার বিপর্যস্ত করে, তথাপি তাহাদের প্রাণসত্তা যেন রাজনীতির উপর নির্ভরশীল নয়। যে পাখীরা ঝড়-বিক্ষুব্ধ নীড়ে বাস করে, ঝড় উঠিলে যাহারা কুলায় ছাড়িয়া দিকদিগন্তরে উড়িয়া যায়, যাহাদের জীবনবোধের মধ্যে অতর্কিত বিপদের আশঙ্কা গোপন অস্বস্তির মত পীড়া দেয়, অথচ যাহাদের কল-কাকলী এক অদম্য, নিগূঢ়শায়ী প্রাণশক্তির উৎস হইতে নিঃসৃত, তাহাদের সহিত এই ভাগ্যহত, জুয়াড়ী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, অথচ প্রাণবেগচঞ্চল নর-নারীর তুলনা হয়। 'শ্রীমতী কাফে'-তে রাজনৈতিক বিক্ষোভ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে; উপন্যাসের নর-নারীর স্তিমিত প্রাণধারা এই জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ইহারই উত্তাপ তাহাদের শিরা-স্নায়ুতে বিচিত্র স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করে। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে আবার ইহারা ঝিমাইয়া-পড়া, অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় ফিরিয়া যায়। 'জি. টি. রোডের ধারে' রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবশূন্য, যদিও যন্ত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-জীবনের অনিশ্চয়তা, ছাঁটাই-এর ভয়, ও সমাজবন্ধন ও মানবিক সম্পর্কের অনিয়মিত, নীতিহীন শিথিলতা এই উপন্যাসের জীবনচিত্রের পটভূমিকায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই বস্তিবাসীদের সমস্ত জীবনপ্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা করুণ উদ্‌ভ্রান্তি, জীবনের কৃপণ হস্ত হইতে যতটুকু দাক্ষিণ্য আদায় করা যায় তাহার জন্য একটা রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততা, একটা ক্ষণিক, বঞ্চনাপ্রবণ আরামের জন্য সম্ভ্রমবোধহীন কাঙ্গালপনা, অসুস্থ দেহে রোগবিকাশের লক্ষণের মত উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। ইহাদের জীবন একটু অসম, অস্বাভাবিক ছন্দের দোলায় অস্থির ও অশান্ত। ইহাদের হাসি-কান্না, আমোদ-ব্যসন, ভালবাসা-বিরাগের মত্ত আতিশয্য ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীলতা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ—মিতালির দ্রুত ওঠা-নামা, খেয়ালের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে অতর্কিত মোড়-ফেরা এবং অপরিণত-বুদ্ধি শিশুর ন্যায় এক বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের নিকট আত্মসমর্পণপ্রবণতা—এ সমস্তই গণজীবনের এক নূতন বিন্যাসরীতি, মানবিক বৃত্তিসমূহের এক অজ্ঞাতপূর্ব কক্ষাবর্তনের সূচনা করে। ইহাদের সম্মিলিত জীবনোচ্ছ্বাস যেন মৌচাকের মধুমক্ষিকাদলের স্ফুটবাক্ গুঞ্জনধ্বনির ন্যায় শোনায়। ইহাদের আবেগের মধ্যে স্থির ছন্দ-নিয়ন্ত্রণের অভাব বলিয়াই ইহার বহিঃপ্রকাশ অস্বাভাবিকরূপে তীব্র ও মাত্রাতিরিক্ত। ইহাদের ভালবাসা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, অপরিমিত সোহাগে নিঃশেষিত হয়, হঠাৎ-টানে ছিঁড়িয়া যায়; ইহাদের প্রণয়-প্রতিযোগিতা অন্ধকারে নিঃশব্দসঞ্চার সরীসৃপের মত অকস্মাৎ বিষদাঁত বসাইয়া দেয়, কখনও বা ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যে উৎকট আত্মপীড়নের গহ্বরে মাথা লুকায়। এখানে জীবনের রুগ্ন, শীর্ণ, বঞ্চিত রূপটি বড় করুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মৃত্যুপথযাত্রী শিশু বিলাত গিয়া বড়লোক হইবার স্বপ্ন দেখে; যে জীবন এ যাত্রায় তাহাকে ফাঁকি দিল তাহার অনাস্বাদিত মাধুর্য কল্পনার সাহায্যে উপভোগ করে। রূঢ় সভ্য শঙ্কাতুর, আত্মবঞ্চনাপ্রবণ মাতার নিকট হইতে

অনেক স্নেহময় ছলনার দ্বারা গোপন করিতে হয়। অনেক মিথ্যা কলহ মিটাইতে হয়, অনেক অলীক অভিমানে সান্ত্বনা দিতে হয়, অনেক ব্যর্থ প্রণয়ের হতাশাকে আশার স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রশমিত করিতে হয়, অনেক অবুঝ ঝোঁককে শান্ত করিয়া ঠিক পথে চালাইতে হয়। এই উপন্যাসের ছন্নছাড়া জীবন-জটিলতার কেন্দ্রস্থলে বসিয়া যে ব্যক্তি জট ছাড়াইয়াছে ও সূত্রসংযোজনের কৌশলে প্রত্যেকটি জীবনকে সরল পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে সে গোবিন্দ ছুতার ওরফে ফোর-টোয়েনটি। তাহারই নির্ভুল ও স্নেহশীল পরিচালন-নৈপুণ্যে, তাহার মানবচরিত্রজ্ঞানপ্রসূত কেন্দ্রনিয়ন্ত্রণে আমরা এই বস্তির বিকৃত, তির্যক-রেখাঙ্কিত, পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সমাবেশে দুর্বোধ্য জীবনযাত্রার সত্য ও সহজ রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

বিমল করের 'ত্রিপদী' উপন্যাসে কয়লাকুঠির শিল্পাঞ্চলের তিন বন্ধুর—মন্মথ, চারু ও দেবলের—ইয়ারকি ফুর্তির রঙ্গীন সূতায় জড়ানো, একত্রীভূত জীবনের বিসর্পিত গতি, উহার নানা দমকা হাওয়ায় আল্গা-হওয়া ও খুলিয়া-যাওয়া বিচ্ছেদপ্রবণতার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই বন্ধুত্রয়ের মধ্যে যোগসূত্র নিতান্তই আকস্মিক ও পল্কা, এক জায়গায় বসিয়া মদ খাওয়া ও হল্লা করা ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোনও গভীরতর সমপ্রাণতার নিদর্শন নাই। তথাপি এই ইতর আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়াও তাহাদের মধ্যে যে খানিকটা সত্যিকার সৌহার্দ্য ও যৌথজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনকি, চারুর সহিত বকুলের বিবাহিত সম্পর্কের উপরেও এই যৌথ প্রভাব খানিকটা প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার পর মন্মথর সাংসারিক জ্ঞান ও স্বেচ্ছাবৃত সংযমের জন্যই অপর দুই [illegible] হৃদয়ের অধিকারের অংশীদারত্ব প্রত্যাহার করে। কিন্তু তথাপি দেখা গেল যে, র[illegible] যেমন জলের চেয়ে ভারি, তেমনি নারীর আকর্ষণ বন্ধুত্বের বন্ধন অপেক্ষা শক্তিশালী। [illegible]র্কাসের দলের মেয়েদের লইয়াই এই ত্রয়ীর সম্পর্কে বিচ্ছেদরেখা পড়িল। লীলাবতীর প্রণয়-অর্জনের তাগিদে দেবল তাহার দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া পূর্ব-প্র[illegible]য়ী [illegible]কে স্থানচ্যুত করিল। চারুর কোমলতর প্রকৃতি এই মোহিনীর আকর্ষণ-জা[illegible] [illegible]ড়াইয়া পড়িয়া তাহার পূর্ব-প্রণয়িনীর প্রতি বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষা এই উভয় প্রকার কর্তব্যকেই অস্বীকার করিল। লীলাবতী শেষ পর্যন্ত দেবলের অসুর শক্তি অপেক্ষা চারুর কোমল নমনীয়তাকেই বেশী পছন্দ করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে পদক্ষেপ করিল। এই আকস্মিক আঘাত দেবলের প্রাণোচ্ছল সত্তার উপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া জাগাইল। সে কম্পাউণ্ডারের ভ্রাতুষ্পুত্রী, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনায় উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত গৌরীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। লীলাবতী তাহার মনে যে [illegible]বোধ জাগাইয়াছিল, তাহা পূর্ণ করিবার একটা প্রবল প্রয়োজনবোধ তাহার মনে চঞ্চল বুভুক্ষার ন্যায় অশান্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিল। যাহার প্রেমের চেতনা একবার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে সে আর ভাটিখানায় বন্ধু সংসর্গে তৃপ্তি পায় না—প্রণয়ের উগ্র সুরা যাহার রক্তে নেশা জাগাইয়াছে, সে আর বন্ধুত্বের জলো মদের স্বাদ অনুভব করে না। যখন সে বুঝিয়াছে যে গৌরী তাহার অপ্রাপনীয়া তখন সেও পরিচিত আবেষ্টনের মায়া কাটাইয়া,

অজানা পথে উধাও হইয়াছে। ত্রয়ীর মধ্যে একা মন্মথই বাকী রহিল—তাহার হিসাবী ব্যবসায়বুদ্ধি ও প্রেমের উত্তাপ-অসহিষ্ণু, ইতরব্যসনরত ভোগাসক্তি তাহাকে প্রণয়ের দুর্গম পথের পথিক হইতে দেয় নাই। এই উপন্যাসে এক দেবদের চরিত্রই খানিকটা গভীরভাবে আলোকিত হইয়াছে, অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় খুব আলগাভাবেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব প্রতিবেশরচনার সুষ্ঠু সঙ্গতিবোধ ও রূপায়ণকৌশলে, সার্কাসের ভিতরকার জীবনের বাস্তবানুগ চিত্রণে ও আখ্যানবিন্যাসের সুপরিকল্পিত ও সুমিত সীমানির্দেশে। এখানেও আমরা আধুনিক যুগে মানবের মিলনক্ষেত্রের যে অভাবনীয় প্রসার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে সমাজজীবনের এক নূতন গঠনসূত্রের পূর্বাভাস অনুভব করি।

(৪) আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল ও তাঁহার পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের এই জাতীয় উপন্যাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় যুগ জীবনকল্পনা ও সৃষ্টিপ্রতিভার অভাব ছিল, তথাপি কোন কোন ঔপন্যাসিক ব্যাপক তথ্যসঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা সচল রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ও অতি-আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্বসূচনারূপে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' (১৯২৮) এই দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা তাঁহার অন্যান্য-বিষয়ক উপন্যাসের সঙ্গেই করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারও পূর্ববর্তী যুগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাসজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অতীত যুগের জীবনযাত্রা ও রাজনৈতিক আলোড়নের সংগঠনপ্রয়াস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অন্ততঃ বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের পক্ষে প্রয়োজন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল' ও 'লুৎফ-উল্লা' এই তিনখানি উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়; দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের যুগপরিচয়প্রতিষ্ঠাই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে জীবনচিত্রণ সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসঘটনার অনুগামী। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত, ইহার মধ্যে কোন স্বাধীন রসস্ফুরণের প্রয়াস নাই। ইতিহাস নায়কদের জীবনে প্রেমের প্রবর্তন দ্বারা যে রোমান্স-সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে তাহার মানবিকতা এত ক্ষীণ যে, ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইতিহাসের ঘটনানিয়ন্ত্রণ হইতে বিন্দুমাত্র মুক্ত হয় নাই। লেখক 'ধর্মপাল'-এর যে ভূমিকা সংযোজনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ইতিহাসানুগত্যই নিঃসন্দেহভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি মানবিক রস-আস্বাদনলোলুপ ঔপন্যাসিকের নয়, ইতিহাসের নষ্ট-কোষ্ঠী-উদ্ধারকামী ঐতিহাসিকের। ইতিহাসের জীর্ণ বৃক্ষকাণ্ডে মানবিক সম্পর্কের যে লতা-তন্তুজাল সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত ক্ষীণ ও বৃক্ষের জীর্ণতা আচ্ছাদনের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। কোন সতেজ, নবীন জীবনলতিকা এই বলিরেখাঙ্কিত বনস্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া উহার ক্ষয়িষ্ণুতাকে প্রাণরসে অভিসিঞ্চিত করে নাই।

'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল'-এ তিনি উত্তর-ভারতে সার্বভৌম সাম্রাজ্যস্থাপনের ক্ষণস্থায়ী

প্রচেষ্টাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য সার্বভৌম অধিকারবিচ্যুত হইল। ইহার অল্পদিন পরেই বাঙলার সামন্তরাজগণ কর্তৃক গোপালদেবের সার্বভৌম সম্রাট-পদে বরণ ও তৎপুত্র ধর্মপালের রাষ্ট্রকূটরাজের সহায়তায় সমগ্র উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার বাঙালীর মনে একটা নূতন আশার দীপ্তি সঞ্চার করিয়াছে। শশাঙ্কের নৈরাশ্যকুব্ধ পরাজয় ও বিষাদময় মৃত্যু ও ধর্মপালের ক্রমপ্রসারশীল আধিপত্যগৌরব উত্তর-ভারতের আলোতে-আঁধারে মেশা, আশা-নিরাশায় গ্রথিত এক ইতিহাসবৃত্তাংশ রচনা করিয়াছে, কিন্তু এই আপাত-বিপরীত ফলের অভ্যন্তরে এক অভিন্ন সমস্যা উহার জটিল জাল বিস্তার করিয়াছে। পতনশীল ও উত্থানশীল কোন সাম্রাজ্যই উহার স্থির ভারসাম্য খুঁজিয়া পায় নাই। অন্তর্বিপ্লবের মৃদু ও প্রবল ঢেউ, বহিরাগত উপপ্লবের সদা-চঞ্চল অভিঘাত, অতিকায় বহু-বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রের সংহতিশিথিলতা ও স্বয়ং-ভঙ্গুরতা, প্রান্তবর্তী সামন্তমণ্ডলসমূহের বিদ্রোহোন্মুখতা ও রক্ষাব্যবস্থার অপ্রাচুর্য—এ সবই সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল খনন করিয়া উহার স্থায়িত্বকে সর্বদা অনিশ্চিত ও বিপন্ন করিয়াছে। দেশব্যাপী অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা, অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ, জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও আশঙ্কা, খাদ্যদ্রব্যের নিদারুণ অভাব প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লবের সমস্ত উপাদানই সদা-সক্রিয় থাকিয়া নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থাকে সব সময় বিপর্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছে। এইরূপ অবস্থায় মহাপরাক্রান্ত সম্রাটও যে তাঁহার সিংহাসন আগ্নেয়গিরির অগ্নিগর্ভ শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়া প্রতিমুহূর্তে দূরোৎক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে?

সাম্রাজ্যধ্বংসের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বৌদ্ধসংঘের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও চক্রান্তবিস্তার। গুপ্ত সম্রাটগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ষড়যন্ত্রজাল সর্বদা সক্রিয় ছিল। শশাঙ্ক বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শত্রুতা ও আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন। তাঁহার রাজশক্তিকে ক্ষুণ্ন করিবার জন্য তাহারা সর্বপ্রকার অপকৌশল ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অহিংসা, মৈত্রী, করুণা যাহাদের ধর্মের অবশ্যপালনীয় নীতি তাহারা বৈরনির্যাতনের জন্য ধর্মান্ধতার বশে গুপ্তচরবৃত্তি, প্রজা ও সামন্তবর্গকে রাজবিদ্রোহে প্ররোচনা ও নৃশংস হত্যা প্রভৃতি তাহাদের ধর্মনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অনুসরণেও ত্রুটি করে নাই। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে বৌদ্ধদের এই রাষ্ট্রবিরোধী, ধ্বংসাত্মক কার্য ও নীতির নিদর্শন সর্বব্যাপ্ত। এমন কি কিশোর শশাঙ্ককে হত্যা করিতে ও নৌযুদ্ধে বিব্রত রাজা শশাঙ্কের অতর্কিত আক্রমণে সলিল-সমাধি ঘটাইতে তাহারা সর্বদা উদ্যোগী। ইহাদের সহিত তুলনায় হিন্দুরা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিলেও উহাদের সাধারণ নাগরিক অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এই বৌদ্ধ পঞ্চমবাহিনীর দৌরাত্ম্যে শশাঙ্ক রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে রাঢ়ের কর্ণসুবর্ণে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে শশাঙ্ক প্রচণ্ড বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজারূপে নিন্দিত ও থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। রাখালদাস এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি রাজ্যবর্ধনের দ্বৈরথ যুদ্ধে মৃত্যুকে আকস্মিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শশাঙ্কের

বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের বদ্ধমূল আক্রোশের নিশ্চয়ই কোন একটা কারণ ছিল। নতুবা শুধু মঠবাসী ভিক্ষু নয়, বঙ্গদেশের সমস্ত প্রজাশক্তি তাঁহার প্রতি এতটা আপোষহীন বিরোধের ভাব পোষণ করিত না। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ ও চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণে শশাঙ্ক যে হীনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন তাহার সমস্তটাই যে বিদ্বেষবিকৃত তাহা মনে হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা হিংসা ও উচ্চাভিলাষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণের এই অতন্দ্র বিরোধিতা ও শত্রুতাচরণ শুধু কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মিথ্যাপ্রচারজাত হওয়া সম্ভব? এই উপন্যাসে স্কন্দগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের দেশবিজয়-উপলক্ষ্যে রচিত চারণগাথা দুইটি রাখালদাসের ইতিহাসজ্ঞান ও উন্মাদনাময় গীতিকবিতার উপর অধিকার উভয়েরই সুন্দর নিদর্শন।

'শশাঙ্ক' উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের একাধিপত্য। শুধু সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে অশ্রান্ত ছোটাছুটি। প্রতিটি চরিত্রই ইতিহাসের এই আবর্তে বিঘূর্ণিত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। ঘটনার বেগবান প্রবাহ ও চরিত্রের সংখ্যাধিক্য আমাদের অভিনিবেশকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। ইতিহাসের এই দারুণ স্রোতোবেগে প্রেমের আবেশ কোথাও জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। প্রেম-আখ্যানগুলি কোথাও রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে চিত্রিত তরণীর ন্যায় উহারা ঢেউএর আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। চিত্রা, লতিকা, যূথিকা, তরলা প্রভৃতি প্রেমিকাগোষ্ঠী ইতিহাস ঝটিকায় স্থির পদাশ্রয় পায় নাই। শশাঙ্কের ব্যর্থ প্রেম তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থতার সহিত তুলনায় আমাদের মনে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। শশাঙ্কের রাজ্য ও জীবননাশে যে সার্বিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহার গভীর, সান্ত্বনাহীন বেদনা অন্য সমস্ত ব্যক্তিগত বেদনাকে গ্রাস করিয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যক্তিজীবনের অসার্থক সংযোজনা উপন্যাসটির ইতিহাসসর্বস্বতাকে আরও সুপ্রকট করিয়াছে।

শশাঙ্কের আমলে সাম্রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণুতার যে লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইতেছিল, 'ধর্মপাল' উপন্যাসে তাহা দেশব্যাপী মাৎস্য-ন্যায় ও অরাজকতায় ঘনীভূত হইয়া উপন্যাসটির পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। 'শশাঙ্ক' এ যাহা বীজরূপে উপ্ত হইয়াছিল, 'ধর্মপাল'-এ শতাব্দী-ব্যবধানে তাহা শাখা-প্রশাখাসমৃদ্ধ বিষবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। 'শশাঙ্ক'-এর সহিত তুলনায় 'ধর্মপাল'-এ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গুপ্ত সম্রাটেরা বোধ হয় অবাঙালী ছিলেন; তাহাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মগধ হইতে ইহা ক্রমশঃ পূর্বদিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ও পশ্চিমে কান্যকুব্জ-থানেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু বাঙলা দেশের সহিত তাঁহাদের আদি সম্পর্ক বিজেতার। তাঁহারা মনে-প্রাণে বাঙালী ছিলেন না এবং সেই জন্যই বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ঠিক আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। বাঙলায় সর্বদা প্রধূমিত বিদ্রোহ, বাঙালী সম্বন্ধে সর্বদা দমননীতি প্রয়োগের প্রয়োজন এই হৃদয়জাত রাজভক্তিমূলক সম্পর্কের অভাবের কথাই ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে গোপালদেব ও ধর্মপালদেব জন্মসূত্রে বাঙালী, তাঁহারা বারেন্দ্রমহামণ্ডলের অধিপতি হইতে সামন্তরাজবৃন্দের স্বেচ্ছানির্বাচনে গৌড়রাজপদে উন্নীত হন এবং গুপ্ত সম্রাটবংশের বিজয়াভিযানের অনুসরণে এই ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যকে সমগ্র উত্তরাপথপ্রসারিত সার্বভৌম সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার নীতি গ্রহণ করেন। এই আধিপত্যবিস্তারে তাঁহাদের সমস্যা গুপ্ত সম্রাটদিগের সহিত প্রায়

অভিন্নই ছিল। তবে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। পালবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও প্রকৃতি-পুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত বলিয়া বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণের অকুণ্ঠিত সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যে বিজিত রাজ্যগুলির বিক্ষোভ সর্বদাই অশান্তি উৎপাদন করিত, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙালী ভূম্যধিকারিবৃন্দ প্রজাসমূহের অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের দ্বারা ও নিজেদের মধ্যে ছোটখাট ঈর্ষ্যাপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া দেশ মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিত। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের মত পাল সম্রাটদের অন্তর্ঘাতী চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। মণিদত্তের গুপ্তগৃহে সংরক্ষিত সমস্ত ধনরত্ন বৌদ্ধসংঘ ধর্মপালের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। অবশ্য এই সমর্পণের পূর্বে সংঘ তাঁহার নৈতিক আদর্শসমুন্নতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্মপালের যুদ্ধ চালাইবার উপযোগী অর্থসম্ভারও বৌদ্ধ সংঘের ধন-ভাণ্ডার সম্রাটকে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিয়াছে। কেবল একবার মাত্র সংঘের অধিনেতা গুর্জর রাজদূতের সহিত গোপন সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ধর্মপালের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে ও তাঁহার প্রত্যাশিত অর্থবরাদ্দ হঠাৎ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে ও গৌড় আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করিয়া গৌড় রাজ্যে রক্তস্রোত বহাইয়াছে। ইহার জন্য অনতিবিলম্বে সে অনুতপ্ত হইয়া সম্রাটের মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং শশাঙ্কের সহিত তুলনায় ধর্মপালের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ ইহা স্বীকার্য।

ইতিহাসের নির্মম-প্রয়োজন-চিহ্নিত যুদ্ধাভিযানের সহিত উপন্যাসঘটনার কক্ষ-পরিক্রমা অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত। ইতিহাস-বিজিগীষা যে যে স্থানে চলিয়াছে ঔপন্যাসিক গতিবিধি নিজ স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া তাহারই অনুবর্তী হইয়াছে। মগধ, কান্যকুব্জ, গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইতিহাসরথ ধাবমান হইয়াছে, উপন্যাসের মানবমিছিল তাহারই অনিবার্য বেগের সহিত নিজ মন্থরতর গতিচ্ছন্দ মিলাইয়াছে। ব্যক্তিজীবন রাষ্ট্রজীবনের প্রতিচ্ছায়ারূপেই সর্বত্র আবির্ভূত হইয়াছে। তথাপি শশাঙ্ক'-এর সহিত তুলনায় 'ধর্মপাল'-এ ব্যক্তিজীবনের কিছু আপেক্ষিক স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ং মহারাজ ধর্মপালের প্রেমিকসত্তা তাঁহার রাষ্ট্রসত্তার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নাই। কল্যাণী চিত্রা অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত ও মানবিক আবেগে স্পন্দিত। সর্বেশ্বর-অমলার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, বিরহ-উদ্বেগে অস্বস্তিময় দাম্পত্য জীবন যুদ্ধবিগ্রহবিড়ম্বনা হইতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট। চরিত্র ও ঘটনার ভিড় পূর্ব উপন্যাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া কোন কোন ব্যক্তির মুখের আদল এক-আধটু চোখে পড়ে। উদ্ধব ঘোষ, স্বামী বিশ্বানন্দ, রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম প্রভৃতি যুদ্ধ ও গার্হস্থ্য জীবনের সীমান্তপ্রদেশে দাঁড়াইয়া কতকটা মানবিকগুণ-মণ্ডিত হইয়াছেন। দেশের সামগ্রিক চিত্রের মধ্যেও কিছু স্বাভাবিকতা ও মৃদু প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। গুর্জর রণনীতি ও রাষ্ট্রকূটের বাঙলার রাজবংশের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রবল ইচ্ছা, বায়কুণ্ঠ বৌদ্ধ মহাস্থবিরের অর্থসংরক্ষণের প্রলোভন—এ সবই রাজনীতির উষর ক্ষেত্রে প্রাণরসবাহী তৃণোদ্গমের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।

সর্বোপরি এই উপন্যাসের অন্ততঃ তিনটি দৃশ্য সাধারণ জীবনের সমতলভূমি হইতে ইতিহাস-প্রেরণার সোপান বাহিয়া মহিমার অভ্রভেদী তুঙ্গতায় দণ্ডায়মান আছে। প্রথম, সামন্তবর্গের গোপালদেবকে সার্বভৌম রাজপদে বরণ, দ্বিতীয়, সম্রাট ধর্মপালদেবের রাজ্যচ্যুত

কান্যকুব্জকুমার চক্রায়ুধকে আশ্রয়দানের কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রতিজ্ঞা ও তৃতীয়, দেশের ও জাতির মঙ্গলার্থে কল্যাণীর মহনীয় আত্মোৎসর্গ। এই তিনটি ঘটনা ইতিহাসের গিরিশৃঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত স্বর্ণদীপ্তিতে জীবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া ইতিহাসকে নিগূঢ় জীবনানুভূতির অন্তরঙ্গতায় অভিষিক্ত করিয়াছে, ইতিহাস বাহির হইতে আমাদের অন্তরের ভাবলোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

'লুৎফউন্না' উপন্যাসটি মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়যুগে নাদির শাহার দিল্লী আক্রমণের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে তথ্যসন্নিবেশ হয়ত ইতিহাসসত্যানুগামী, কিন্তু লেখকের মনোভাবে খেয়ালী কল্পনারই প্রাধান্য। নাদির শাহের আক্রমণ ক্ষয়োন্মুখ মোগল আধিপত্যে যে সর্বধ্বংসী বিপর্যয়ের ঝড় বহাইয়াছে, লেখক শান্তি-শৃঙ্খলার সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এক বাঙালী অভিজাত আনন্দরাম রায়ের উদ্ভট ইচ্ছাশক্তির অসাধ্যসাধনক্ষম ভোজবাজীর খেলা প্রবর্তন করিয়া বাস্তব নরকবিভীষিকার মধ্যে প্রেম, রোমান্স ও আদর্শবাদের এক অবাধ কল্পলোকলীলার মায়াসৌন্দর্যবিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। এ যেন ইতিহাসের রক্ততাণ্ডবের মধ্যে দোল উৎসবের আবীর ছড়ানোর এক অভাবনীয় সুযোগগ্রহণ, দানবীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এক পরীরাজ্যের ঐন্দ্রজালিক রূপসুষমার খেয়াল-খুশিমত সুপ্রচুর প্রক্ষেপ। বৈদেশিক উৎপীড়নক্লিষ্ট মোগল রাজধানীর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আনন্দরামের নব নব মুস্কিলআসানের উপায়-উদ্ভাবনশক্তিকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তাহার কল্পনাকে আরও উদ্দাম ও বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছে। নাদির শাহের সমস্ত সৈন্যবল, সমস্ত কড়া বিধি-নিষেধ, সমস্ত রক্তলোলুপতা তাহাকে বাধা-উত্তরণের নূতন নূতন ফন্দির সন্ধান দিয়াছে। বাস্তবের বজ্রকঠোর পেষণ তাহার কল্পনাস্বপ্নের আরও পেলব রূপদানে সহায়তা করিয়াছে। মনে হয় যেন ঐতিহাসিকেরই এই যুগের নামকরণে একটা বিরাট ভুল হইয়াছে, ইহাকে নাদির শাহ, মহম্মদ শাহের নামে অভিহিত না করিয়া আনন্দ-রামের যুগ বলিলেই ঠিক হইত। অবশ্য কেহ কেহ আনন্দরামের ক্রিয়াকলাপকে দিল্লীর নাগরিকবৃন্দের বৈদেশিক অধিকারের বিরুদ্ধে একটি সার্থক প্রতিরোধপ্রয়াসের নিদর্শনরূপে গণ্য করিয়া ইহার মধ্যে একটা গূঢ় ঐতিহাসিক তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তবে মনে হয় যে, এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনার পর্যায় ছাড়াইয়া ঐতিহাসিক সত্যের সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। ফুলদল দিয়া বিধাতা সাধারণতঃ শাল্মলী তরুবরকে কাটেন না। মোট কথা উপন্যাসটি ইতিহাস ও আবু হোসেন-জাতীয় পরী-কাহিনীর বিসদৃশ সম্মিলন বলিয়াই মনে হয়। মনে হয় রাখালদাস তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাসসমূহে ইতিহাসতথ্যের অবিচল অনুবর্তনে কিছুটা ক্লান্ত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের অন্তিম পর্যায়ে লিখিত এই উপন্যাসটিতে তিনি কল্পনাকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়া তাঁহার পূর্বানুসৃত প্রণালীর মধ্যে অভিনবত্ব প্রবর্তনের সাধনা করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) 'কাঞ্চনমালা' (১২৮৯, ইং ১৮৮২) ও 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) দুইখানি উপন্যাস বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়। প্রথমটিতে অশোকের রাজত্বকালে সম্রাটের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ও তজ্জনিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী প্রজাবৃন্দের সংঘর্ষ ও অশোক-মহিষী তিষ্যরক্ষিতার যুবরাজ কুনালের প্রতি অতৃপ্তির অবৈধ আসক্তির প্রতিশোধকল্পে কুমারের

চক্ষুর্দ্বয়-উৎপাটন ও বন্দিত্ব প্রভৃতি নানা শাস্তিপ্রয়োগের কাহিনী উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়-বস্তু। উপন্যাসে কুনাল ও কাঞ্চনমালার নিবিড় একাত্ম প্রেম ও বৌদ্ধধর্মপ্রচারে উৎসর্গিত জীবনকথা এবং তিষ্যরক্ষিতার দৃঢ় প্রতিহিংসাসঙ্কল্প ও চক্রান্তনিপুণতা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে কাঞ্চনমালাকে উপন্যাসের নায়িকা বলা যায় না, কেননা উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাবলীতে তাহার স্থান অত্যন্ত গৌণ ও উহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত শিথিল ও নিষ্ক্রিয়। মহারাজা অশোকও দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বলচিত্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। অশোকের সময় ভারতের বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা—অতএব সে যুগে উহার আদর্শবিশুদ্ধি ও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভক্তি ও ত্যাগের ঐকান্তিকতা স্বভাবতঃই খুব উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়াছে। কুনাল ও কাঞ্চনমালা এই আত্মনিবেদনের একনিষ্ঠতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ভগবান বুদ্ধের জীবনকাহিনীর নাট্যাভিনয় ও এই অভিনয়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য উপগুপ্তের বুদ্ধরূপে অংশ-গ্রহণ ও বৌদ্ধ সংঘের নানা জনসেবামূলক কার্য বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্য রাজশক্তির সর্বাত্মক প্রয়াসের প্রমাণ দেয়। হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্কবিরোধের চিত্রটি ঠিক পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে না। তক্ষশীলায় বিদ্রোহ মূলতঃ রাজনৈতিককারণসঞ্জাত, তবে উহার তীব্রতা ও হিংস্রতা যে বহুলাংশে বৌদ্ধবিদ্বেষপ্রসূত তাহা অনস্বীকার্য। তবে অশোকের কাল বৌদ্ধধর্মের প্রসারের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় উহার অগ্রগতি কোন প্রতিকূল শক্তি রোধ করিতে পারে নাই। মগধ ও কিছুদিন পরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্লাবন সমস্ত পূর্ব আচার ও ধর্মকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। স্বভাবিক নিয়মানুসারে এই জোয়ারের স্রোত হীনশক্তি হইলে বৌদ্ধধর্মের সংগঠন ও আদর্শনিষ্ঠার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ক্রমশঃ সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও সমাজবিন্যাসের বিচিত্র নিদর্শনের অপূর্ব সংগ্রহশালা। ইহার রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানবিক চরিত্রগুলি কেবল এই রত্নভাণ্ডার প্রদর্শনের উপলক্ষ্যসৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উপন্যাসের পটভূমিকায় বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক বিলুপ্তি ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানকাহিনী সন্নিবেশিত। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে বাঙলা দেশের সংস্কৃতি ও সমাজে যে নিগূঢ় পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল তাহারই একটি অতি উজ্জ্বল ও তথ্যসমৃদ্ধ চিত্র উপন্যাসটিতে পাই। সপ্তগ্রামের বাগদী রাজা রূপার সিংহাসনচ্যুতি ও রাঢ়দেশে শ্রীহরিবর্মদেবের রাজ্যবিস্তার এই পরিবর্তনের রাজনৈতিক পূর্বপ্রস্তুতি। উপন্যাস-মধ্যে হরিবর্মদেব বা বেনে রাজা বিহারী দত্তর সক্রিয়তা খুবই সীমাবদ্ধ; ইহারা উভয়েই ভবদেব ভট্ট ও ভবতারণ পিশাচখণ্ডী এই দুই দূরদর্শী সমাজ-সংগঠকের মন্ত্রণা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চালিত হইয়াছেন। বরং বিহারীদত্ত বণিকরূপে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, রাজারূপে তাহা হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে সচিবায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উপন্যাসের নায়িকা বেনের মেয়ে মায়ার কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তাহাকে লইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে তাহাই মুখ্যতঃ তাহার আকর্ষণবৃদ্ধির হেতু। তাহার পতিস্মৃতিতন্ময়তা তাহাকে হিন্দু ধর্মসাধনার দিকে প্রবর্তিত করিয়াছে ও বৌদ্ধসংঘের অর্থগৃধ্নুতা ও সহজ-সাধনার মধ্যে যৌন বিকারের প্রভাব শুধু তাহার নহে, সমগ্র বেনে জাতির বুদ্ধানুগত্যকে বিচলিত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বঙ্গবাসীই তাহাদের এই বিরুদ্ধ

ধর্মমতের মধ্যে দোলাচলচিত্ততা ও যদৃচ্ছ বিমিশ্রতা ত্যাগ করিয়া নবসংগঠিত হিন্দু আচার ও ধর্মের শাসন স্বীকার করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রায় দেড় হাজার বৎসরের গৌরবময় ইতিহাসের পর উত্তর-ভারত ও বাঙলা দেশ হইতে পিছু হটিয়াছে ও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রমবর্ধিত প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্যে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার গণজীবনের কতকগুলি মূল্যবান উপাদানও দেশের মানসলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আর আমরা বাগ্‌দী রাজা ও পদাতিক বাহিনী এবং ডোম অশ্বারোহী সেনা পাইব না। বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক সমতাবোধের মধ্যে হীনবর্ণের যে দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ, যে উন্নত রাজ্যপরিচালনাকৌশল স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণ নষ্ট না হইলে আধুনিক কালে তপ্‌শীলী জাতির বিশেষ অধিকার-সংরক্ষণের প্রশ্নই উঠিত না। বৌদ্ধসংঘের মঠ, বিহার, চৈত্য প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলি শেষের দিকে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিলেও বহুদিন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুশীলন, ধ্যান-ধারণার সাহায্যে অধ্যাত্ম সাধনা ও চারুশিল্পচর্চার পবিত্র পীঠস্থান-রূপে বাঙলার সর্বাঙ্গীণ মানস বিকাশের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। হিন্দুধর্মে যে তপোবন বা ঋষির আশ্রম উপনিষদের যুগের পরেই লুপ্ত হইয়াছিল বৌদ্ধধর্মে তাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছিল। বৌদ্ধদর্শন ও নিরীশ্বরবাদ হিন্দুধর্মকে বরাবর আত্মরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণে নিযুক্ত রাখিয়া শঙ্করাচার্যের দীপ্ত মনীষাকে প্রজ্বলিত করিবার ইন্ধন ও বায়ুপ্রবাহ যোগাইয়াছিল। বৌদ্ধ উৎসবগুলি হিন্দুধর্মের আশ্চর্য গ্রহণশীলতার কল্যাণে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ও আরাধ্য দেবতার কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে হিন্দু লৌকিক উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়াছে। বৌদ্ধ কবিই প্রথম বাংলা কবিতা লিখিয়াছে, বৌদ্ধ গায়কই প্রথম সুরতালসমন্বিত ও সমবেত-কণ্ঠগীত কীর্তনগানের আদি রূপটি প্রবর্তন করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে গুণিজনপুরস্কারের সভার বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা বাঙলা দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্য, কাব্যপ্রতিভা, বিবিধ ভাষাজ্ঞান ও সুকুমার শিল্পসৃষ্টির একটি অপূর্ব সমৃদ্ধিময় চিত্র পাই। দুই মুখ্য ধারায় প্রবাহিত বাঙলার প্রাণশক্তি যেন উহাদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বিচিত্র শ্রী ও সৌন্দর্যে, মানস ও আর্থিক ঐশ্বর্যসম্পদে মণ্ডিত করিয়া এক রাজরাজেশ্বরী মাতৃমূর্তির পটভূমিকারূপে উপস্থাপিত করিয়াছে।

'বেনের মেয়ে'-তে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে উহার সমাজবিন্যাসবিধিরও একটি নূতন নীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমাজসংগঠনের মূল নিয়ন্তা হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট। যখন বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর ভূতপূর্ব বৌদ্ধেরা হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইল, তখন বাঙলার সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইল। জাতিভেদপ্রথা পুনঃ-প্রবর্তনের ফলস্বরূপ প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায়ী ও বৃত্তি অনুসারী সম্প্রদায়কে এক একটি জাতিবর্ণের মধ্যে স্থান দিতে হইল। ইহারা বৌদ্ধ অসদাচারী ছিল বলিয়া উচ্চবর্ণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল—কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি বর্ণই স্বীকৃতি লাভ করিল। বেনেরা শূদ্র হইল; দত্তকপ্রথা প্রবর্তিত হইল। সমস্ত সমাজকে নূতন করিয়া, নানারূপ বিধি-নিষেধে বাঁধিয়া, গঠন করার দায়িত্ব সমাজনেতারা গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধযুগের বিশৃঙ্খলা

ও স্বেচ্ছাচারকে দণ্ডনীয় করিয়া নূতন সমাজদণ্ডবিধি প্রণীত হইতে আরম্ভ হইল। হিন্দুসমাজ আঁটাআঁটি করিয়া নিজ ঘর বাঁধিতে লাগিল। স্মার্ত রঘুনন্দনে গিয়া এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিল। বাংলার সমাজ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার প্রথম ভিত্তি-স্থাপন এই যুগেই হইল, এবং 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে এই বৌদ্ধ পরাভবের যুগে, অথচ বৌদ্ধ কীর্তির প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করিয়াই লেখক এই হিন্দুসমাজসংগঠনের প্রথম প্রয়াসটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ঔপন্যাসিক অংশ গৌণ; বাঙলার সাংস্কৃতিক ও রীতিনীতিগত পরিচয়ই ইহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক যুগে নানা নূতন গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের ফলে যে ঐতিহাসিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তরুণ ঔপন্যাসিকগোষ্ঠির মধ্যে কেহ কেহ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস-রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু অতীত যুগের আদর্শকে অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের উন্মাদনা নাই বা রোমান্সের চকিত অভাবনীয়তাও দীপ্তি বিকিরণ করে না। কোন ইতিহাসবিশ্রুত নায়কও ইহার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার ঘটনার রশ্মিজাল ও ভাবকল্পনার ঊর্ধ্ব-চারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এগুলি নিতান্তই তথ্যসংকলন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-রচনার সাহায্যে যুগের বাস্তব পরিচয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করে। বর্তমান যুগের ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার রীতি ও অর্থনৈতিক মানের বিবরণ। কাজেই ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসও এখন মাটির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে। পূর্বতনকালে অতীত জীবনচিত্র-পুনর্গঠনের ব্যাপারে যে কল্পনাশক্তির সৃষ্টিধর্মী, অন্ধকারনিরসনকারী প্রয়োগের অবসর ছিল, এখন তাহার কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। সে যুগের মনেরও যে চমকপ্রদ অভাবনীয়তা, আদর্শ-নিষ্ঠা, অধ্যাত্ম সাধনা ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারে মেশানো আলো-আঁধারি রহস্যগহনতা ছিল, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষা-দীক্ষার সমীকরণ-প্রভাবে অনেকটা বৈশিষ্ট্যহীন ও সাধারণধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ শাসনের প্রবর্তনে দেশের শিল্প-বাণিজ্য কি করিয়া ক্ষয় পাইল, সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি করিয়া বাড়িয়া গেল, বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইল ও স্থানচ্যুত শিল্পীরা কৃষির ক্ষেত্রে ভিড় বাড়াইল, নূতন আইন-কানুন, কল-কারখানা, রেল-প্রতিষ্ঠা, ভিটে-মাটি হইতে গৃহস্থের ব্যাপক উচ্ছেদ জনসাধারণের মনে কি বিস্ময়-উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিল—এই সমস্ত অর্থনীতির মূল কথাগুলিই গল্পের সাহায্যে ও সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের জীবনযাত্রার মাধ্যমে উপন্যাসে বলা হইয়াছে। সদ্যো-অতীত যুগের চরিত্রসমূহও খুব জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, তাহাদের সমস্যার গুরুভার তাহাদের জীবনশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। দূরের ইতিহাসের কুহেলিকা যেমন হাতছানি দিয়া টানে, কাছের ইতিহাসের ধূলি-যবনিকার আড়ালে সেরূপ কোন রহস্যময় আমন্ত্রণের আকর্ষণ নাই।

এই নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার,' সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' ও বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দনডাঙার হাট' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'গৌড়মল্লার' সুদূর অতীতের কাহিনী; 'উত্তরঙ্গ' ও 'চন্দনডাঙার হাট' অদূর

অতীতে সংঘটিত ইংরেজ বাণিজ্য-পত্তনের ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগঠনের ইতিহাস। 'উত্তরঙ্গ'-এ সিপাহী-বিপ্লবের রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত এক হিন্দুস্থানী সিপাহীর সেন-পাড়া-জগদ্দলের এক বাগ্‌দী-পরিবারে আশ্রয়গ্রহণ ও ঐ পরিবারভুক্ত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত অন্ধ ধর্মসংস্কার তাহাকে মনসার কৃপায় পুনর্জীবিত মৃত ব্যক্তি ও মনসার অনুগ্রহভাজন—এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার পুনর্জন্ম ও গ্রামে আবির্ভাব সমকালীন বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাহার পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল প্রশমিত হইয়াছে। তাহার আসুরিক শক্তি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার সঙ্গে শিশুসুলভ সরলতা ও পারিবারিক আনুগত্য মিশ্রিত হইয়া তাহাকে একাধারে সমাজের মধ্যে বিশিষ্টতা ও সমাজজীবনের সহিত সহজ সংযোগ দিয়াছে। কাঞ্চন বৌর উপর অধিকার লইয়া তাহার সহিত নারায়ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ যুগবৈশিষ্ট্যের একটি সত্য ইঙ্গিত দেয়—কিছুদিন পূর্বে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নারী যে কখনও কখনও বীর্যশুল্কা ছিল ও এইরূপ অবৈধ সম্পর্ক যে সমাজপতির অনুগ্রহে সমাজ-সমর্থন লাভ করিতে পারিত জীবনযাত্রার এই পরিচয়ই ইহাতে নিহিত আছে। তথাপি লখাই স্বভাবতঃ শাস্ত্র ও সমাজশাসনের বাধ্যই ছিল; সে যে অসামাজিক যৌন-আকর্ষণ স্বীকার করিয়াছে, সে জন্য নারীর দিক হইতেই প্ররোচনা বেশি আসিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায় গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন—গ্রামের চাষা-কারিকর অভাবের তাড়নায় চটকলে কাজ করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছে ও কারখানার নূতন আবহাওয়া ও কুঠিয়াল সাহেবদের অসংকোচ ইন্দ্রিয়-লালসা ও যথেচ্ছাচার তাহাদের সমস্ত শৃঙ্খলাবোধ ও ধর্মসংস্কারকে উন্মূলিত করিয়াছে। রেলগাড়ীর প্রচলনও উৎপন্ন শস্যকে বিদেশে চালান দিয়া কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে নষ্ট করিয়াছে। উচ্চবর্ণের জীবনচিত্রও অল্পাধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে—সেন বাবুদের প্রবাদ-বাক্যে পরিণত বদান্যতা, সংস্কৃত টোলের ছাত্রের আদিরসপ্রবণতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধতা, প্রথম ইংরেজী শিক্ষার উন্মাদনা, 'দুর্গেশনন্দিনী'র শিক্ষিত মহলে বিপুল সমাদর ও বিস্মিত অভিনন্দন প্রভৃতিও সংক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এক মুহূর্তের জন্য অশ্বারোহীবেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু গেঁয়ো লোকের নিকট তাঁহার পরিচয় যুগান্তরকারী সাহিত্যস্রষ্টারূপে নয়, উচ্চপদস্থ হাকিমরূপে। যাহা হউক, মোটের উপর উপন্যাসের গ্রাম্য নর-নারীর জীবনছন্দটি, তাহাদের জীবনের সামগ্রিক রূপ ও ভাবদ্যোতনা অতীত যুগের চিহ্নাঙ্কিত হইয়াছে ও তাহাদের স্বাভাবিকত্ব আমরা মোটামুটিভাবে মানিয়া লই।

'চন্দনডাঙার হাট'-এ বিদেশীবণিকের অত্যাচারে ও বিদেশী সুতা ও কাপড়ের আমদানিতে বাঙলার বস্ত্রশিল্পের বিপর্যয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাঙালী দালালের সহযোগিতা ও ঘরভেদী বিভীষণের অংশ অভিনয়ের ফলেই তাঁতির উৎসাদন দ্রুততর ও নিশ্চিততর হইয়াছে। জমিদার তাঁতিদের রক্ষা করিতে গিয়া সিপাহীর গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন ও সমাজের স্বাভাবিক নেতা ও রক্ষকের অভাবে সমাজও ছন্নছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের পটভূমিকায় রতন ও চন্দ্রা, ও প্রহ্লাদ ও নীরুর প্রেমের কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেমচিত্রগুলি আধুনিক যুগের

ছাপমারা বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসের মানুষগুলির চলা-ফেরা, কথাবার্তা ও জীবননীতির মধ্যেও অতীতযুগ-বৈশিষ্ট্যসূচক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সূতা-কাটুনির দুঃখ নিবেদন করিয়া যে চিঠিখানি 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এই গ্রামেরই এক হতভাগিনীর লেখা—এই কল্পনার দ্বারা লেখক তাঁহার উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিকতার সুর ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে যে, এই চিঠির মনোভাব ও সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে যে মনোভাব ও জীবনদৃষ্টি ফুটিয়াছে তাহা এক নহে। Thackeryর Esmond-এ Spectator হইতে উদ্ধৃত রচনাগুলির সহিত সমগ্র উপন্যাসের রচনাভঙ্গী এমনই অভিন্ন যে, উপন্যাসটি Spectator-এর সমকালীন বলিয়া মনে হয়, ইহা যে পরবর্তী যুগের কল্পনাপ্রসূত এরূপ ধারণা হয় না। যাহা হউক সাম্প্রতিক লেখকের মধ্যে অচিরগত অতীতের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার, উহার জীবনযাত্রার মধ্যে আমূল রূপান্তরের ক্রমবিবর্তিত ছন্দটি নিরূপণ করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছে, উহার তথ্যানুসন্ধিৎ-সার সহিত প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী কল্পনার সংযোগ ঘটিলেই আমরা উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ করিব এরূপ আশা যুক্তিসঙ্গতভাবে পোষণ করা যাইতে পারে।

প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ও গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা' আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংযোজনা। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'বহ্নিবন্যা' ১৮৫৭ খৃঃ অঃ-র সিপাহী-বিপ্লবের কাহিনী। লেখক ইহাতে ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। এই বিপ্লবের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পিছনে এমন এক নির্মম জিঘাংসা ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন আছে যাহার মূলে কোন গভীরতর ব্যক্তিগত কারণ অনুমান করা স্বাভাবিক। লেখক সেইরূপ ইতিহাসসম্মত অনুমানের আশ্রয় লইয়া ঘটনাবলীর মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বিদ্রোহী নেতা নানা সাহেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্রকৌশল, তাঁতিয়া তোপীর কূটবুদ্ধি, সিপাহীদের অসন্তোষ ও কুসংস্কারপ্রবণতা—ইত্যাদি রাজনৈতিক কারণে, আন্দোলনের সমস্ত বীভৎসতা, অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত বিস্ফোরক শক্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। লেখক সেইজন্য ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও আমিনা ও আজিজন এই দুই ভগ্নীর সমস্ত ইংরেজ জাতির উপর মর্মান্তিক প্রতিশোধস্পৃহাই এই ভয়াবহ সংঘটনের মূল কারণরূপে দেখাইয়াছেন। এই দুই ভগিনী—তাহাদের ইংরেজ প্রণয়ীদের দ্বারা অসম্মান ও প্রণয়ীর বন্ধু দ্বারা ধর্ষণের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। যুদ্ধ বাধাইতে ও সমস্ত আপোষ-মীমাংসা-প্রয়াসকে ব্যর্থ করিতে সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের চক্রান্ত ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে; যুদ্ধে নৃশংসতম উপায় প্রয়োগ করিতে ও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহার বহ্নিদাহকে অনির্বাণ রাখিতে আপ্রাণ প্রয়াসী হইয়াছে। উহারা স্বাভাবিকতা হারাইয়া অতিনাটকীয় চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। তবুও উহাদের চরিত্রে একটা রমণীসুলভ কোমল দিকও আছে ও উহাদের দানবীয় প্রবৃত্তি সত্ত্বেও উহাদের প্রতি পাঠকের একটা সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকে।

উপন্যাসটির আর একটি উৎকর্ষ উহার বিপ্লবের উপযোগী এক সমাজ বৃহত্তর পরিবেশ-

রচনায় সাফল্য। বিপ্লবের উৎকট দাহ ও অগ্নিদীপ্তি সাধারণ মানুষের সমাজেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লেখক কয়েকটি ব্যবসায়ী, দালাল, ছোটখাট জমিদার, নৌকার মাঝি, লুঠতরাজরত সিপাহী, চোর-ডাকাত-প্রভৃতি-জাতীয় চরিত্র-প্রবর্তনের দ্বারা সমগ্র সমাজজীবনে বিদ্রোহের ব্যাপক প্রভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়া ইহাকে একটি বাস্তব বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়াছেন। হীরালাল একদিকে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও বিদ্রোহনায়ক ও অপর দিকে নিম্ন পর্যায়ের জনসাধারণ—এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়া, আমিনার প্রেমাস্পদরূপে তাহার কোমল মনোভাবের উদ্দীপন করিয়া, উপন্যাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। উপন্যাসের বিভিন্ন কোণ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকরেখাগুলি তাহার মধ্যে অনেকটা কেন্দ্রসংহত হইয়াছে ও তাহার মনোভাব অনুসরণ করিয়া আমরা উপন্যাসের নানাস্তরবিন্যস্ত ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধটি অনুধাবন করিতে পারি।

গ্রন্থখানির বিরাট পরিধিতে একটি জটিল ও বহুধা-বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের স্বরূপটি সার্থকভাবে বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য কিছু আকস্মিকতা ও অতিনাটকীয়তার সূত্র রহিয়া গিয়াছে। তথাপি সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহা জাতীয় জীবনের একটি রোমাঞ্চকর অভ্যুৎক্ষেপের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। বিদ্রোহনায়কদের চরিত্রে অসঙ্গতি ও দুর্বলতা, বিশেষতঃ নানা সাহেবের দু'মুখো নীতি ও চলচ্চিত্ততা উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কন-কৃতিত্বের হানি করে। যে বজ্রবিদ্যুৎঝঞ্ঝাবাত ভারতের রাজনৈতিক আকাশে একটি ক্ষণিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পিছনে কোন বজ্রধরের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। ইহা যেন নেতৃত্বহীন, সাধারণ মানুষের খেয়ালে পরিচালিত আন্দোলন। তাছাড়া আরও দুইটি ত্রুটি লক্ষিত হয়। এই বিরাট দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে আমরা ইংরাজদের সক্রিয়তা ও মনোবলের বিশেষ কোন পরিচয় পাই না। আলোক যাহা কিছু সবই সিপাহী নেতাদের উপর নিক্ষিপ্ত; ইংরেজেরা ছায়ার অন্ধকারে আত্মগোপনশীল। দ্বিতীয়তঃ, আমরা উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে কোন কেন্দ্রীয় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া সংহতরূপে দেখি না—কোন সুমহান ব্যক্তিত্ব ইহার কেন্দ্রগত তাৎপর্যটি অনুভব করিয়া উহা আমাদিগকে অনুভব করায় নাই। হয়ত ইহাই সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু ইহা সত্য হইলেও যে সাহিত্যিক উন্নয়নের পরিপন্থী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দেবেশ দাসের 'রক্তরাগ' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) প্রায়-সমকালীন-ঘটনাভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রয়াসের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর ও বীরত্বমণ্ডিত উদাহরণ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয়-বাহিনী-গঠন ও দেশের স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের জন্য উহার ত্যাগদীপ্ত, গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের কাহিনী লইয়া লেখা। কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক—বাঙালী দেবল, উত্তরপ্রদেশের রবীন ও পাঞ্জাবের উরায়ম সিংহ—ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিয়া মালয় ও সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে যাত্রা করিয়াছে। যাত্রার পূর্বরাত্রে এক নাচের উৎসবে সৈন্যাধ্যক্ষেরা সমবেত হইয়াছেন ও সকলেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পদক্ষেপের পূর্বে একরাত্রির জন্য সুরা-নৃত্য-নারীকটাক্ষের আনন্দকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে ব্যগ্র। সমবেত সেনানীর মধ্যে কেবল দেবল উন্মনা, তাহার প্রণয়িনী মিতার বিচ্ছেদবেদনাময় স্মৃতিরোমন্থনে বিভোর ও উৎসববিমুখ। আর একজন ইংরেজ সৈনিক

কর্মচারী জো সদ্যোপ্রাপ্ত পত্রে প্রণয়িনীর প্রত্যাখ্যান-সংবাদে বিষণ্ণ ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে দেবলের অন্তররহস্য পাঠ করিবার অধিকারী। তাহার পর জঙ্গলযুদ্ধের নানা কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায়, উহার অভিনব রণনীতির প্রয়োগকৌশলব্যাখ্যায়, পাঠকের মন এক নূতন ধরণের চমৎকৃতি অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজের আত্মসমর্পণ, সিঙ্গাপুরের যুদ্ধবিরতি ও তাহাদের সৈন্যদলভুক্ত ভারতীয়দের সম্বন্ধে কূট ভেদনীতি ভারতীয় সৈন্যদের মনে এক অবস্থাসঙ্কটের অসহায়তা ও তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সময় সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে এই পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যদল দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য এক নূতন শপথ গ্রহণ করে ও দুর্জয় সংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক সমরসরঞ্জাম ও রসদের দারুণ অভাব সত্ত্বেও এক অসম যুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। ঘটনা-পরিণতির এই স্তরে দেবলের ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয় সাধারণ সংগ্রামকাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র নাটকীয় রোমাঞ্চের বিষয় হইয়াছে। তাহার প্রণয়িনী মিতা ইংরাজপক্ষের সংবাদ-আদান-প্রদানের কার্যে পূর্বরণাঙ্গনে আসিয়াছে ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দেবলের সঙ্গে তাহার আকস্মিক সাক্ষাৎ হইয়াছে—এই প্রেমিকযুগল দুই বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ বৈরসম্পর্কের লৌহবন্ধনে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। তারপর দেবলের আত্মগোপনের দীর্ঘ চেষ্টার পর তাহার গ্রেপ্তার ও সামরিক বিচারালয়ে তাহার বিচার ও এই আদালতে সওয়াল-জবাবের দীর্ঘ বিবরণ।

মিতা ও মণিপুরী তরুণী উত্তমার জবানবন্দী, ব্যারিস্টার শ্রীরায়ের জেরার কৌশ রীতি খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই, কিন্তু একদিকে পরিমিতিহীন ও অপরদিকে প্রা বিচারপদ্ধতির নিয়মকানুনের সহিত প্রায় নিঃসম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত দেবল অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইয়া দিল্লীর লাল কেল্লায় বন্দী হইয়াছে। মিতা ব্যারিস্টার মিঃ রায়ের প্রণয়িনী ও তাহারই প্রভাবে মোকদ্দমাটি দেবলের অনুকূলে গিয়াছে। মিতা দেবলকে বিদায় জানাইতে আসিয়াছে; উত্তমা তাহার অন্তররাজ্যে প্রবেশের জন্য সংকুচিতভাবে প্রতীক্ষমাণা। এক প্রেমের অস্তগমন ও আর এক নূতন প্রেমের আসন্ন আবির্ভাব দেবলের চিত্তে রক্তরাগের সঞ্চার ও উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা-বিধান করিয়াছে। যে গণমনের অভূতপূর্ব আবেগপ্লাবনে জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরাজের সমস্ত শাস্তিদানের সংকল্প ভাসিয়া গিয়াছে ও তাহাদের অপূর্ব আত্মোৎসর্গময় বীরত্ব জাতির হৃদয়ে মর্যাদার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা লেখকের পরিকল্পনার ঠিক বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি সদ্যোঅতীত ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ও আমাদের প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত আবেগ-উদ্দীপনার বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে এক জ্বলন্ত প্রেরণা সঞ্চার করিতে সমর্থ। ইহাতে বৃহত্তর জাতীয় তাৎপর্য ও ব্যক্তিগত প্রেমের রোমাঞ্চের সার্থক সমন্বয় হইয়াছে। ইহার ভাষায়, বর্ণনায়, সংলাপে ও মন্তব্যে আধুনিক যুদ্ধের স্বাভাবিক আবহাওয়াটি আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যন্ত্রপ্রধান, বিজ্ঞানশক্তিনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধে মধ্যযুগের কৃত্রিম বীরত্ব, আদর্শবাদমূলক ভাবসমুন্নতি নিতান্তই বে-মানান। ইহার পরিণতি এত ভয়াবহ ও মৃত্যুসম্ভাবনা এতই আসন্ন, যে বেপরোয়া মনোভাব, হাসিখুশি-তরল

আমোদ, সরস বাগবৈদগ্ধ্য ও মননের লঘুসঞ্চারী ক্ষিপ্রতা দিয়াই ইহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে হয়। পূর্বানুমানের দ্বারা ইহার আতংককে ঘনীভূত করা মনস্তত্ত্ববিরোধী। দেবেশের উপন্যাসে যুদ্ধের এই নূতন ভাবছন্দ, অরণ্যসংগ্রামের এই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল স্তরপরম্পরা মূল ঘটনার সহিত তুলনায় প্রস্তুতি-ও-আয়োজন-পর্বের প্রাধান্য, খবরদারীর নিখুঁত ব্যবস্থা ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, অতর্কিত খণ্ডযুদ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব—এই সমস্তই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও উপস্থাপনা-কৌশলের পরিচয় বহন করে। আধুনিক রণনীতিতে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ অপেক্ষা ক্রুসেল্সের নাচই যুদ্ধের স্বরূপদ্যোতনায় অধিকতর কার্যকরী। সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ছিটে-ফোঁটাই এখন আমাদের অনুভবশক্তিকে বেশি উদ্দীপ্ত করে। দেবেশের উপন্যাসটি এই নূতন রীতির প্রথম সার্থক প্রয়োগ।

(৫) গার্হস্থ্য জীবনকাহিনী

গার্হস্থ্য পল্লীজীবনের সাধারণ রূপ ও সমস্যাগুলি অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় ও বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের সহিত আলোচিত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসগুলিতে। ইহা হইতে মনে হয় যে, অতিরিক্ত আদর্শবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস ও মনস্তাত্ত্বিক ঘোর-প্যাঁচের আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আবার সহজ জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন কোন কোন ঔপন্যাসিককে আকৃষ্ট করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' (বৈশাখ, ১৩৫৯) ও 'দূরভাষিণী' (আশ্বিন, ১৩৫৯) উপন্যাসগুলিতে এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলে। ইহাদের মধ্যে 'দ্বীপপুঞ্জ' সম্পূর্ণ পল্লীজীবনের কাহিনী ও উহার ছোটখাট সমস্যা ও হৃদয়সংঘাতের মনোজ্ঞ ও বাস্তবানুসারী চিত্র। নানা-পরিবার-সমন্বিত, প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও সদ্ভাব-সহৃদয়তার ক্ষণভঙ্গুর ঢেউএ স্পন্দিত ও এই পারস্পরিক প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষপথ হইতে মুহুর্মুহুঃ বিচলিত সমগ্র গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা এখানে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের মন্তব্য পরিমিত, উপলক্ষ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও মনস্তত্ত্বের আড়ম্বর-বর্জিত হইলেও চরিত্র বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের ইঙ্গিতবাহী। নবদ্বীপ তাহার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র মুরলীর আচরণে একসঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত; এই শাসন-প্রশ্রয়, লজ্জা-গৌরবের সংমিশ্রণেই তাহার পিতৃপ্রকৃতি গঠিত। উপন্যাস মধ্যে প্রধান সমস্যা মঙ্গলার সহিত তাহার স্বামী সুবল ও প্রেমিক মুরলীর সম্পর্ক জটিলতাবিষয়ক। স্ত্রীর পরপুরুষাসক্তির আবিষ্কারে সুবলের আচরণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু মুরলীর ফাঁদে ধরা দিবার সময় মঙ্গলার মনোভাব অনেকটা অনিশ্চিতই রহিয়া গিয়াছে। সুবলের সহিত সম্পর্কে সুদীর্ঘ আত্মনিরোধই তাহার নূতন আকর্ষণে আত্মসমর্পণের মূল কারণ বলিয়া মনে হয়—তাহার দৃঢ় চরিত্র ও পাতিব্রত্য-খ্যাতির নীচে যে গোপন অতৃপ্তির ফাঁক ছিল সেই ফাঁক দিয়াই কলঙ্কিত প্রেম তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মুরলীর প্রতি তাহার সতীস্ত্রীসুলভ ঘৃণা ও অবজ্ঞার মধ্যে তাহার বেপরোয়া আচরণের জন্য একটা সপ্রশংস স্বীকৃতিও প্রচ্ছন্ন ছিল—ইহাই আক্রমণ-মুহূর্তে তাহার প্রতিরোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছে। মুরলীর কামনার নিবিড় আলিঙ্গন যখন তাহার দেহকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে তখন তাহাকে যেন অনেকটা সম্মোহিত ও অসাড় বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহার পরবর্তী আচরণ প্রমাণ করে যে, তাহার দেহের অধঃপতনে তাহার মনেরও সায় ছিল। গ্রাম্য লম্পট মুরলীর ভোগবাসনায় আবিল ও আত্মতৃপ্তিতে স্থূল

মনোলোকে ভাবের আনা-গোনা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে; তথাপি মনে হয় যে, তাহার মান-অপমানজ্ঞানহীন, লালসাময় চরিত্রে কিছুটা মহত্তর উপাদান যেন আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষমাণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, লেখক কোথাও মঙ্গলার এই অবৈধ প্রেমকে আদর্শদীপ্তিমণ্ডিত করেন নাই—ইহা তাহার মনের কক্ষে কক্ষে ধূমায়িত হইয়াছে, কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও অসংকোচ প্রকাশের উগ্রশিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই। অশিক্ষিত পল্লীনারীর যে রোমান্সের নায়িকা হইতে কোন ইচ্ছা নাই তাহার প্রমাণ শেষ দৃশ্যে মঙ্গলার সুবলকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জলে ডোবা হইতে আত্মপ্রাণরক্ষার ব্যাকুল প্রচেষ্টা। সে আত্মহত্যার সংকল্প গ্রহণ করিয়া নৌকায় উঠিয়াছিল, কিন্তু মরণের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া জীবনমমতাই তাহার মনে জয়ী হইল। মনে হয় যে, ইহা তাহার ভাবীজীবনের ইঙ্গিত – সে সুবলকে ধরিয়াই সংসার-নদীর ঘোলা জলে নিমজ্জন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। মঙ্গলার চরিত্রবিশ্লেষণে আরও একটু গভীরতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু মোটের উপর পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি ও সরল ধারার মধ্যে যতটুকু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থাকা স্বাভাবিক, লেখক তাহা নিপুণতা ও পরিমিতিজ্ঞানের সহিত পরিবেশন করিয়াছেন।

'দেহমন' উপন্যাসে রুবি অবাধ যৌন সম্পর্কে আস্থাশীল, দেহসৌন্দর্যের বিনিময়ে ভোগ-বিলাসপরিতৃপ্তির জন্য উৎসুক আধুনিক এক শ্রেণীর তরুণীর প্রতিনিধি। তাহার পরিকল্পনার মূলে আছে নারী-প্রগতির একটি বিশেষ theory. রুবির জীবন এই theory-র ছাঁচে ঢালা —সে যাহা ভাবে, যাহা বলে, যাহা করে সবই এই পূর্বধারণার মূর্ত বিকাশ। কিন্তু theory-র কৃত্রিমবাষ্পস্ফীত সত্তার মধ্যে তাহার জীবনের সহজ নিঃশ্বাসবায়ু প্রবাহিত। তাহার সংলাপের মধ্যে আঘাত প্রতিঘাতের তীক্ষ্ণতা, চরিত্রদ্যোতক স্বাভাবিকতা ও উদ্দাম জীবন শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। কুহেলিকার অস্পষ্টতা ঘেরা দ্বীপে জাতা মৎস্যগন্ধা theory-র ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সহজ জীবনের পদ্মগন্ধা নারীতে পরিণত হইয়াছে। উমা ও বিভাস প্রখর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-জীবনের বৈশিষ্ট্যহীন, বাঁধা ছকের জীবনযাত্রা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। কিন্তু উপন্যাসের যেটি প্রধান সমস্যা—উমা ও বিভাসের সহিত রুবির সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন—সেটির সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত হয় নাই। উমার সহিত তাহার গলায় গলায় ভাব, তাহার অন্তরঙ্গ সখিত্ব এক মুহূর্তেই ঈর্ষ্যার আঁচে ঝলসাইয়া গিয়া নিবিড় ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিভাসের শুচিবায়ুগ্রস্ত বিমুখতা রুবির কলঙ্কিত জীবনকাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার পর যে কেমন করিয়া বেপরোয়া উদ্দাম প্রণয়-আকর্ষণে রূপান্তরিত হইল তাহার রহস্য অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে। হয়ত বাস্তব জীবনে এইরূপ অতর্কিত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উপন্যাসে আমরা এই পরিবর্তনের বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হই না, ইহার আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করি। লেখক সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের নামকরণ প্রেমের আকর্ষণের মধ্যে দেহ ও মনের যে বিভিন্নরূপ অংশ ও আবেদন আছে তাহার স্বীকৃতি ও স্বতন্ত্র অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে, বিভাসের প্রেম যে কেবল রুবির মানস সঙ্গের জন্যই আকাঙ্ক্ষিত তাহা তাহার পরিবার ও সমাজ স্বীকার করে নাই—সুতরাং উহার মধ্যে দৈহিক লালসা

প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও দেহ মনের আধার বলিয়া ইহা অপরিহার্যভাবে দেহ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে খুঁজিয়াছে। Theory-প্রভাবিত জীবনরূপায়ণের মধ্যে লেখক যে এতটা উত্তপ্ত জীবনীশক্তি ও বাস্তববোধ সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব।

'দূরভাষিণী' (আশ্বিন, ১৩৫৯) টেলিফোনে কাজ-করা মেয়েদের জীবন কাহিনী ও হৃদয়-চর্চার ইতিহাস। কিন্তু ইহাদের যে সমস্যা তাহা যে কোন অফিসে চাকরী-করা তরুণী-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, টেলিফোনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। মধ্যবিত্ত সংসারের দারিদ্র্যের পীড়নে অকস্মাৎ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার জোয়ালে বাঁধা এই মেয়েদের বঞ্চিত, বুভুক্ষু হৃদয়ে ভালবাসার জন্য একটা প্রবল আকুতি জাগিয়া উঠে; কিন্তু যান্ত্রিক কর্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বভাব-সৌকুমার্য ও আবেগের সরসতা শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাই তাহাদের জীবনের ট্রাজেডি। তাহারা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পরুষ ঝাঁজালো মেজাজের জন্য উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন, অপ্রসন্ন চিত্তে ক্ষোভ সহজেই সঞ্চিত হয় ও সামান্য মাত্র উপলক্ষ্যে ফাটিয়া পড়ে। আবার কর্মসূত্রে পুরুষের সহিত অবাধ মেশামেশা উভয় পক্ষেই একটা অলীক প্রেমের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বীণা ও মৃন্ময়ের সম্পর্ক এই প্রতিকূল প্রতিবেশ প্রভাবে সংশয়ে আবিল ও আত্ম-পরিচিতির অনিশ্চয়তায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে—উপচিকীর্ষা ও কৃতজ্ঞতা প্রেমের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া মোহভঙ্গে আরও তিক্ত প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। কমলার সমস্যা অন্যবিধ—সে স্বামীর অমতে চাকরী লইয়া, স্বামীর অন্যায় জিদে ও তাহার নিজের স্বাধীনচিত্ততার বাড়াবাড়িতে নিজ দাম্পত্য সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বীণা মৃন্ময়ের রূঢ় প্রত্যাখ্যানের দুঃখ ভুলিবার জন্য ও নিজের মাতৃমনোভাবের তৃপ্তির জন্য অসহায়, অস্থিরমতি, শিশুর ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক ও পরনির্ভরশীল শিল্পী কমলার দাদা বিমলকে বিবাহ করিয়াছে। কমলার মৃত্যুতে একই প্রকারের শোক-বিহ্বলতা এই দুই বিপরীত-প্রকৃতি নর-নারীর মধ্যে একটা স্নেহ-বন্ধন রচনা করিয়াছে। বীণার মত মেয়ের উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির-অবলম্বনহীন, ও নানা কাজের হৈ-চৈ-এর মধ্যে আত্মবিস্মৃতি-খোঁজা জীবনে বিবাহ যেন প্রেমের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই, টেলিফোনের ডাকের মত আকস্মিকভাবেই হাজির হয়। মৃন্ময় বিবাহ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত মন ঠিক করিতে পারে নাই—বীণার প্রতি তাহার একটা অস্বীকৃত আকর্ষণ যেন রহিয়াই গিয়াছে। যে সাংবাদিক এই গল্প-রচয়িতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার মন্তব্য ও উপন্যাসের গঠন ও প্রেরণার সমস্যা বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কল্পনা, ঔপন্যাসিক রসটিকে ঘনীভূত না করিলেও, উহার বাস্তব উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে।

একটি নির্ভেজাল সংসারজীবনের বেদনামথিত, অথচ না-পাওয়া সুখের বঞ্চনাবিধুর ছবি অঙ্কিত হইয়াছে প্রতিভা বসুর 'বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাসে (বৈশাখ, ১৩৬১)। এই উপন্যাসে জীবনের যে স্থূল, বস্তুতন্ত্র, নির্লজ্জ অধিকারপ্রয়োগের দ্বারা বিড়ম্বিত দাম্পত্য সম্পর্ক রূপায়িত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন সুলভ ভাববিলাস বা কল্পনাপুষ্ট আদর্শবাদের স্থান নাই। প্রমীলার চরম ইতরতা, অমার্জিত অশালীন রুচি ও নীরন্ধ্র স্বার্থপরতার যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহার রেখাবিন্যাস ও বর্ণপ্রলেপের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিত্রকরের তুলির কোন অনিশ্চিত কম্পন অনুভূত হয় না। বোধহয় গ্রন্থকর্ত্রী নারী বলিয়াই নারীচিত্র অঙ্কনে এতটা

নির্মম, ভাবলেশহীন বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। অথচ প্রমীলা যে অতিরঞ্জনের জন্য অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে—তাহার মধ্যে যে বাস্তবতার বীজ নিহিত তাহাই পারিবারিক দৃষ্টান্ত ও অনুকূল প্রতিবেশের সহায়তায় এইরূপ উৎকট আতিশয্যে পল্লবিত হইয়াছে। তাহার প্রাণকেন্দ্র কোন মানবিক সম্পর্কের কোমল ভূমিকে আশ্রয় করে নাই, লোভ ও স্বার্থপরতার নিরস, নিরেট পাষাণখণ্ডের মধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। পিতা যজ্ঞেশ্বরের প্রতি তাহার আনুগত্যের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির কোন স্পর্শ নাই—যে মুহূর্তে পিতার সহিত তাহার স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে সেই মুহূর্তেই সে তাহার আজীবন স্নেহসম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার স্বার্থবুদ্ধির স্প্রিংএ দম-দেওয়া যান্ত্রিক গতির পরিবর্তনে সে একবার যজ্ঞেশ্বর, আর একবার তাহার ঘৃণিত, অবজ্ঞাত স্বামী সুনির্মলের পায়ে মাথা কুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার অটল আত্মবিশ্বাস ও অসংকোচ আত্মপ্রসারণ সমস্ত বাধা-বিঘ্নের উপর জয়ী হইয়া তাহাকে ভাঙ্গা সংসার ও জলিয়া-পুড়িয়া-যাওয়া গৃহস্থালীর অবিসংবাদিত একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—পাথর ও মাথার সংঘর্ষে পাথরেরই টিঁকিয়া থাকার শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রমীলার বিরুদ্ধে যে সমস্ত শক্তি প্রতিরোধের উদ্যম করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা উচ্চতর জীবনাদর্শপ্রসূত দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার শাশুড়ী হিরণ্ময়ী, স্বামী সুনির্মল ও মাতা সুধাময়ী তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির স্রোতোচ্ছ্বাসে তাড়িত হইয়া দাঁড়াইবার দৃঢ় ভূমি পান নাই। মা ও ছেলের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম অভিমান, একটু নীতিগত পার্থক্য উঁহাদের প্রতিরোধশক্তিকে সংহত হইতে দেয় নাই, প্রমীলা এই দ্বিধা-বিভক্ত, চলচ্চিত্ততায় চঞ্চল ও আত্ম-অবিশ্বাসী বিরোধের মাঝখানে স্থির অটল পাষাণমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই ঈষৎ অভিমানস্পৃষ্ট মনান্তর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। হিরণ্ময়ী, সুনির্মল, সুধাময়ী সকলেই ব্যর্থ, সকলেই ভদ্র সংস্কারের, মিথ্যা পারিবারিক আদর্শের মোহে বিমূঢ়, সকলেই আত্মবিশ্লেষণের চক্রাবর্তনে অগ্রগতির পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই যোগ্যতমের উদ্বর্তননীতির ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে।

এই অত্যন্ত স্থূল ও রুক্ষ বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে একটি বিপরীত স্নিগ্ধ-করুণ প্রেমের রোমান্স ভীরু পুষ্পসৌরভের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুনির্মল ও শকুন্তলার মনের স্বপ্নময় প্রণয়াবেশটি তুলির অতি লঘু টানে, বর্ণবিন্যাসের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে, একটি সুকুমার, আত্মবিস্মৃত অনুভূতির রূপে উপন্যাসের শ্বাসরোধী দাবদগ্ধ আবহাওয়ায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রেম-চিত্রাঙ্কনে কোন আতিশয্য, কোন অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাস, কোন সচেতন কাব্যস্পর্ধী প্রয়াস নাই—ধূলিজঞ্জালস্তূপের মধ্যে অকস্মাৎ-বিকশিত ফুলের ন্যায় ইহা যেন কুৎসিতের মর্মস্থলে সুন্দরের অলক্ষিত অভিযান। যে প্রাকৃতিক নিয়মে অসহ্য গুমোটের পর গ্রীষ্ম অপরাহ্ণে মেঘের স্নিগ্ধ শ্যামলতা সারাদিনব্যাপী তাপের উপশমরূপে আবির্ভূত হয়, ঠিক সেই নিয়মেই প্রমীলার জুগুপ্সিত সংসর্গের পরে মনের নিদারুণ শূন্যতা ও অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য শকুন্তলার সুধাসিঞ্চিত স্নেহস্পর্শ সুনির্মলের প্রতি প্রসারিত হইয়াছে। এই রোমান্স বাহির হইতে আরোপিত নহে, ইহা উপন্যাসের অন্তরলোক হইতে স্বতঃ-সমুত্থিত, ইহার ভারসাম্য-রক্ষার সুষ্ঠু উপায়স্বরূপ উন্নত শিল্পবোধের দ্বারা প্রবর্তিত। রোমান্স এখানে উদগ্র বা

অভিমুখর হইয়া উঠে নাই; ইহার সংযত সুষমা ও কুণ্ঠিত মাধুর্য, মরুভূমির উপরে প্রসারিত স্বচ্ছনীল আকাশের ন্যায়, উপন্যাসের ঊষর, বস্তুপিণ্ডপীড়িত ভূমিসংস্থার সহিত এক অদ্ভুত ছন্দসঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

উপন্যাসটির আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গার্হস্থ্য জীবনের পরিপূর্ণ ও সার্থক রসাস্বাদন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান যুগে পরিবার উহার স্বতন্ত্র ভাবসত্তা হারাইয়া কেবল একটা বৈষয়িক আশ্রয়ভূমির হীনতর পর্যায়ে অবনমিত হইয়াছে। আজকাল পারিবারিক জীবন কেবল মাথা-গোঁজার ঠাঁই; ইহা কেবল বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যের উপলক্ষ্য ও কারণ; কেবল উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষীশাবকের ভঙ্গপ্রবণ আশ্রয় ডিমের খোলস। ইহা টানিয়া রাখে না, কাটিয়া যাইবার প্রেরণা যোগায়; ইহা শান্তির নীড় নহে, অশান্তির বিস্ফোরক শক্তির আধার। সুতরাং আধুনিক উপন্যাসে পরিবারজীবনের এই অভাবাত্মক, আদর্শসংঘাত ও রুচিবৈষম্যের উত্তেজক রূপটিই পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কি মহিলা-ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও পরিবারের সমষ্টিগত সত্তাসম্বন্ধে চেতনা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বর্তমান উপন্যাসটি একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। হিরন্ময়ী যে সংসারের কর্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত, যাহার সেবা-পরিচর্যা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, সেই সংসারটি তাঁহার কাছে একটি জীবন্ত সত্তা। ইহার আনন্দরস, ইহার পুরুষপরম্পরাসংক্রামিত সমৃদ্ধিসম্ভার, ইহার স্মৃতি ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, ইহার অলঙ্কারসঞ্চয়ের মধ্যে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদের অনুভূতি, ইহার সুখ ও আনন্দের উত্তপ্ত স্পর্শ-মাখানো গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র—সমস্ত মিলিয়া পরিবারজীবনের একটি ভাবঘন, রসসমৃদ্ধ, বস্তু-অতিসারী মহিমা রূপ পাইয়াছে। পরিবার সম্বন্ধে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুদ্ধারের নিদর্শনরূপে এই উপন্যাসটি এক নূতন ভবিষ্যতের নির্দেশ বহন করিতেছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' (জুলাই, ১৯৫৭), 'উপকণ্ঠে' (আগস্ট, ১৯৬১) ও 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১লা বৈশাখ, ১৩৭১) ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের কালপরিবেশবিন্যস্ত অতি দরিদ্র ভদ্র পরিবারের রূঢ় ও শ্রমকর্কশ জীবনকাহিনী। এই পরিবারের মধ্যে যেমন অদ্ভুত জীবননিষ্ঠা ও শ্বাসরোধকারী দুর্ভাগ্যের মধ্যে টিকিয়া থাকিবার দুর্জয় সংকল্প দেখা যায়, তেমনি দারিদ্র্যের সহিত অবিরত সংগ্রামে জীবনের কোমল প্রবৃত্তির উৎসাদন ও আত্মমর্যাদার বিলোপেও মানুষগুলির দেহ ও মনে একটা রুক্ষতার ছাপ লক্ষিত হয়। এই জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের প্রভাবে গ্রন্থের নায়িকা শ্যামা একজন যখের-ধন আগলানো, সদা-সন্দিগ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক জীবন-যাত্রায় যান্ত্রিকভাবে বিঘূর্ণিত, লোলচর্মা বৃদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। লেখক এই গ্লানিময় পরিণতি হইতে পিছু হাঁটিয়া শ্যামার কৈশোর ও যৌবনের বিবাহিত, পুত্রকন্যাসমাবৃত জীবনের পরিচয় দিয়াছেন। শ্যামা সে কালের দরিদ্র গৃহিণীর প্রতিনিধি। স্বামীপরিত্যক্তা, আত্মনির্ভরশীলা শ্যামা নিছক ছেলেপিলে মানুষ করার তাগিদে সমস্ত প্রকার উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সকলের লাঞ্ছনা, অবমাননা সহ্য করিয়া, এমন কি ছোট-খাট চুরি-চামারিতেও পিছ-পা না হইয়া, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বিবিধ উপায় উদ্ভাবনকৌশলের সাহায্যেই বাঁচিয়া

আছে ও সংসার প্রতিপালন করিয়াছে। সে তাহার ছেলে-মেয়েদের মানুষ করিয়াছে, মেয়েদের বিবাহ দিয়াছে, ও কঠোর মিতব্যয়িতা ও আত্মপীড়নের দ্বারা জায়গা কিনিবার জন্য কিছু অর্থসঞ্চয়ও করিয়াছে। তাহার মনে একটা ইস্পাত-কঠিন স্তর ছিল, সুতরাং সে কোন দুঃখকষ্টের চাপেই হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহার জীবন-যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর জীবনযাত্রা, তাহার ছেলে-জামাইদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস, তাহাদের ছোট-খাট দ্বন্দ্ব সংঘাত, আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী বিস্তৃত হইয়া একটি পারিবারিক মহাকাব্যের বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র সমস্যার মধ্য দিয়া যে অকৃত্রিম জীবনাবেগ, প্রাণৈষণার যে ছন্দ স্ফুরিত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের মানবিক আবেদন ও সাহিত্যিক রসোচ্ছলতা।

যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও জীবনসংস্কার মুকুন্দরামের যুগ হইতে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙালী পরিবারভুক্ত ও সমাজশাসনাধীন নর নারীর জীবনাসক্তির মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে, শ্যামার মধ্যে তাহার শেষ পরিচয়। যে ফুল্লরা জীর্ণ ঘরে বাস করিয়া ও গর্তে আমানি খাইয়া জীবনরসোচ্ছলতায় পূর্ণ ছিল, তাহার সঙ্গে শ্যামার আত্মিক যোগ বর্তমান। শ্যামার অবস্থা আরও করুণ, কেননা উচ্চবর্ণের সামাজিক দায়িত্ব ও অপদার্থ স্বামীর নানাবিধ আবদার তাহাকে পূরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সনাতন ঐতিহ্য ও নীতিবোধের আশ্রয় তাহার অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়া সমস্ত বিপদের মধ্যেও তাহার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিয়াছে, পরের বাগানে শাক-সব্জি চুরি করিয়াছে, নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়া চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, ও এই সমস্ত হীন কর্মের মধ্যেও তাহার অন্তরে এতটুকু গ্লানি সঞ্চিত হয় নাই। সংসারপালনের পবিত্র কর্তব্য, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব উপায়ের সমস্ত হেয়তার দোষ ক্ষালন করিয়াছে। তাহার এই মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটুকুই আধুনিক যুগে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন। বর্তমানকালের নায়িকার সূক্ষ্ম রুচি ও রমণীয় আদর্শবাদের কণামাত্র তাহার মধ্যে নাই। কিন্তু হিন্দু নারীর যুগযুগান্তরসঞ্চিত জীবনচেতনা ও ঔচিত্যবোধ তাহার মনোভাব ও আচরণে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। তাহার শত অভাব-দুঃখের মধ্যেও, তাহার দাম্পত্য জীবনের নিদারুণ বঞ্চনা সত্ত্বেও সতীত্বআদর্শচ্যুতির ক্ষীণতম কল্পনাও তাহার মনে উদিত হয় নাই। তাহার অত্যাজ্য সংস্কারের সিমেণ্ট-গাঁথা অন্তরের কোন ফাটল দিয়াই অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা, যৌন বুভুক্ষার সামান্যতম অনুভূতিও প্রবেশ করিতে পারে নাই। বঙ্গনারীর সনাতন রূপটি তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। তাহার জীবনের যাত্রাপথ তুচ্ছতম গার্হস্থ্য কর্তব্যের অক্ষরেখাকে আশ্রয় করিয়া অস্খলিতভাবে আবর্তিত হইয়াছে।

'উপকণ্ঠে' (সেপ্টেম্বর, ১৯৬০) 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসে বিবৃত ঘটনার পরবর্তী অংশ। ইহাতে শ্যামার কাহিনী প্রধান হইলেও তাহার সম্পর্কিত অন্যান্য পরিবারের কাহিনীও যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্যামার ভগ্নী কমলা ও উমার ভাগ্যবিড়ম্বিত গার্হস্থ্য জীবন, শ্যামার দুই মেয়ে মহাশ্বেতা ও ঐন্দ্রিলার শ্বশুরবাড়ীর জীবনযাত্রা—ইহাদেরও কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়া ঔপন্যাসিক জীবনধারার চিত্রকে সমগ্রতা ও বৈচিত্র্য দিয়াছে। পূর্ব উপন্যাসে যাহারা ছেলেমানুষ ছিল—যেমন হেম, গোবিন্দ, মহাশ্বেতা, ঐন্দ্রিলা, মধ্যম

জামাতা হরিনাথ, জ্যেষ্ঠ জামাতার ভাই অম্বিকাপদ প্রভৃতি—তাহারাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ চরিত্রস্বাতন্ত্র্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ও সুদূর অতীতের ঘটনাকে অব্যবহিত অতীতের সহিত সংযুক্ত করিয়া জীবনসমস্যায় আধুনিক কালের উপযোগী জটিলতা-তন্তু বয়ন করিয়াছে। কিছু কিছু প্রাত্যহিক জীবনবহির্ভূত রোমান্সজাতীয় ঘটনাও কাহিনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া উহার চমক ও বর্ণাঢ্যতা বাড়াইয়াছে। গোবিন্দের শরীর সারাইতে গিয়া বিবাহবন্ধনস্বীকৃতি, হেমের থিয়েটারের অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রণয়লীলাসংঘটন, অভয়াপদর সংসারে মেজ বৌর সহিত ছোট ভাই দুর্গাপদর এক অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা ও তাহার মামার বাড়ীর গোপন রহস্য—এ সবই প্রাচীন আচার-ও-আদর্শনিষ্ঠ সমাজ ও-পরিবারসংস্থার এক নূতন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং হৃদয়াবেগপ্রাবল্য ও রুচিবিভ্রমের অনুপ্রবেশের সাক্ষ্য দেয়। ঐন্দ্রিলা ও হরিনাথের অসংযত প্রণয়মুগ্ধতা, দুর্গাপদর স্ত্রী তরলা ও হেমের স্ত্রী কনকের স্বামিপ্রেম-বঞ্চিত দাম্পত্য জীবনও সুশাসিত পরিবাররাজ্যে এক নবোদ্ভূত অনিয়মের সূচনা করে। সমাজে যে একটা নূতন অনুভূতির সঞ্চার উহার যুগযুগান্তরনির্ধারিত প্রথাভ্যাসের মধ্যে অনির্দেশ্য, অপরিচিত আবেগের কেন্দ্রাতিগ কাঁপন জাগাইতেছে তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

এই সামান্য ব্যতিক্রমপ্রবণতা সত্ত্বেও সমাজের জীবনধারা মুখ্যতঃ অতীত নিয়মনিষ্ঠারই অনুবর্তন করিতেছে। কমলা, শ্যামা ও উমা প্রাচীন সংসারযাত্রার এই তিনটি প্রতীকের মধ্যেই পুরাতনের প্রভাব অপ্রতিহত। কমলা গৃহিণীরূপে তাহার দুই বৌএরই স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা দিয়াছে। বিশেষতঃ রাণীর ন্যায় সপ্রতিভ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণীর মধুর সংসার-লীলাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগদান তাহারও আধুনিক উদারতারই নিদর্শন। উমা তাহার বেশ্যাসক্ত, কিন্তু হৃদয়ের অনুশাসনের প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ স্বামী শরতের রুগ্ন শরীরের সেবাশুশ্রূষার ভার লইয়া তাহাকে ঘরে স্থান দিয়াছে সত্য, কিন্তু এই নিষ্কাম কর্তব্যনিষ্ঠার প্রেমে রূপান্তর সম্বন্ধে আমরা কোন ইঙ্গিত পাই না। সুতরাং তাহার অবস্থার পরিবর্তনে হৃদয়ের পরিবর্তন সূচিত হয় না। শ্যামার সুকঠোর জীবনসংগ্রাম ও আত্মনিগ্রহ তাহাকে খানিকটা অর্থস্বাচ্ছল্য দিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলিকে আরও নিষ্পেষিত করিয়াছে। যাহা ছিল মিতব্যয়িতা তাহা এখন হৃদয়বৃত্তিশোষক কৃপণতায় পরিণত হইয়াছে। জামাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ও সে তাহার পুঁজি ভাঙ্গাইতে রাজী নয়। তাহার উঞ্ছবৃত্তি হেমকে চৌর্যে প্রণোদিত করিয়া তাহার চাকরি খোয়াইয়াছে। নরেনের শেষ অবস্থায় সে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও সাধ্যমত সেবা করিয়াছে, কিন্তু স্বামী-বিয়োগসম্ভাবনাও তাহাকে উদার ও মুক্তহস্ত করিতে পারে নাই। অশীতিপরা, লোলচর্মা বৃদ্ধা শ্যামার যে চিত্র উপন্যাসের আরম্ভে পাই উপন্যাসের বর্তমান খণ্ডে শ্যামা দেহে ও মনে সেই অবজ্ঞেয় পরিণতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। যতদিন সংসাররথরজ্জু ইহাদেরই হাতে আছে, ততদিন রথ এক-আধটু হেলিলে-দুলিলেও সেই মামুলি চক্রক্ষুণ্ন পথরেখা ধরিয়াই চলিয়াছে। জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে শক্তি নিহিত তাহা নিদারুণ অভাব-ক্লিষ্ট, কৌলীন্যপ্রথার কল্যাণে ও অদৃষ্টবিড়ম্বনায় ভর্তৃপোষণবঞ্চিত, সুতরাং আত্মনির্ভরশীল বাঙালী ভদ্র স্ত্রী-লোকের অত্যাজ্য নীতিসংস্কার ও নীড় বাঁধিবার অদম্য আগ্রহ। বাঙলার অনেক ধনী-

পরিবারের সৌভাগ্যের মূলে যে শিরদাঁড়াবাঁকা, ঘুটেকুড়ুনী বুড়ীর কর্মকুশলতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির অনমনীয় নৈতিক মেরুদণ্ড ছিল, আধুনিকতার সুলভ চাকচিক্যের মোহে বিস্মৃত এই সত্যের পুনরাবিষ্কার উপন্যাসটিকে সমাজ-ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায়ের মর্যাদা দিয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র নরেন। এক হিসাবে সে শ্যামা অপেক্ষাও জীবন্ত। শ্যামার আদর্শ ও কর্মনীতি তাহার প্রথম যৌবনের অসহায়তার মধ্যেই অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থির হইয়াছে। যে-কোন নূতন পরিস্থিতিতে তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বানুমান করিতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। এক নরেনের প্রতি লুপ্তপ্রায় বিরক্তিমিশ্র ভালবাসার দুই-একটি মৃদু উচ্ছ্বাস ছাড়া তাহার জীবনে অপ্রত্যাশিত কোন আবেগের স্থান নাই। আর দুঃশীলতার সহিত তুলনায় সাধুতা প্রায়শঃ একই সোজা পথে গতিবিধি করিয়া থাকে। কিন্তু নরেনের দুষ্টবুদ্ধি ও দায়িত্বহীনতা নানা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহার নির্লজ্জতা ও লোভ কখন যে কি দাবী করিয়া বসিবে তাহা অভাবনীয়। তাহার আত্মীয়-কুটুম্ব সকলকেই সে যত রকমে পারে শোষণ করিয়াছে। ধর্মজ্ঞান ও অনুতাপ তাহার সম্পূর্ণ-রূপে প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ফকিরির মধ্যেও তাহার আমীরী মেজাজ বড়মানুষের অভিনয় করে। ভিক্ষার মধ্যেও কৌলীন্যগর্ব মাথা তোলে, চুরির মধ্যেও ধর্মের বুলি আওড়াইতে সে সঙ্কোচ বোধ করে না। ফলস্টাফ্ যেমন হাসির রাজা, নরেন তেমনি অপকর্মের শ্রেষ্ঠ মহাজন। কিন্তু এই আপাদমস্তকঠাঁসা দুঃশীলতার মধ্যে তাহার মধ্যে কোথাও একটু শিশুসুলভ সরলতা, একটু স্বভাবের উদারতা লুকানো আছে যাহার জন্য সে আমাদের প্রশ্রয় আকর্ষণ করে। বৃষোৎসর্গের ষাঁড় যেমন খেত খামারে অবাধ বিচরণ ও প্রভূত ক্ষতি করিয়াও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থের মার্জনা লাভ করে, তেমনি কৌলীন্যপ্রথার ছাপ মারা, সংসারাশ্রমে উপপ্লবকারী এই ষণ্ড-রাজটিও আমাদের মনের কোণে একটি প্রশ্রয়স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না।

রাসমণির বংশ-ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায় 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১লা বৈশাখ, ১৩৭১) কাহিনীকে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী বংশচরিত পরিকল্পনার বিশালতায়, পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনে ও চরিত্র বিস্তারে গল্‌স্‌ওয়ার্দির বিখ্যাত **'Forsyte Saga'**-র কথা মনে পড়াইয়া দেয়। অবশ্য গল্‌স্‌ওয়ার্দির উপন্যাস ধনী ও সম্পত্তিশালী পরিবারের কাহিনী। লক্ষ্মী সব কয়টি পরিবারেই অচলা হইয়া আছেন। যুগভেদে ও সমাজচেতনার নূতন পথে অভিযানের ফলে ইহাদের এক এক পুরুষের নর-নারীর মনে রুচি ও জীবনাদর্শে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নব-উন্মেষ ঘটিয়াছে। ইহাদের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্তর্জীবনকেন্দ্রিক; বাহিরের কোন রূঢ় অভিঘাত এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় গতিবেগ আরোপ করে নাই। প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের দরিদ্র বাঙালী ভদ্রপরিবারের ইতিহাস কিন্তু বিশেষ ভাবে অভাব অনটনের সহিত একটানা সংগ্রামে চরিত্রসৌকুমার্য ও আদর্শনিষ্ঠার ক্রমিক অবক্ষয়ের কাহিনী।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামাও তাহার পুত্রকন্যাদের বহু-বিস্তৃত, নানা বিভিন্নরুচি পরিবারে ছড়াইয়া-পড়া জীবনকাহিনী এই উপন্যাসের বস্তুসত্তা ও ভাবমর্ম গঠন করিয়াছে। সকল পরিবারের সমস্যা প্রায় একই—নির্মম ভাগ্যের সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিয়া,

নানা উঞ্ছবৃত্তির উচ্ছিষ্টপুষ্ট হইয়া কোন মতে অস্তিত্ব ও ভদ্র গৃহস্থের ন্যূনতম মান বজায় রাখা প্রায় কোন সংসারেরই সচ্ছলতার মুক্ত নিঃশ্বাস গ্রহণের উপযোগী প্রতিবেশ নাই, সত্তার স্বচ্ছন্দ বিকাশের কোন অবসর নাই। দারিদ্র্য-উপবাসের পীড়ন হইতে আরও মর্মান্তিক পরিবারের অন্তর্বিরোধ ও অকল্পনীয় নীচতা। এই তথাকথিত ধর্মলোলুপ জাতির নিজ রক্তসম্পর্কীয়দের সহিত আচরণেও ধর্মভয় বা ন্যায়নীতির বিন্দুমাত্র পরিচয় মিলে না। প্রায় প্রতি পরিবারেই ভ্রাতৃবিরোধ, জা-দের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এমন কি শাশুড়ীরও পুত্রবধূর প্রতি নীচ ঈর্ষ্যা ও স্নেহহীনতা শোচনীয়ভাবে পরিস্ফুট। ঐন্দ্রিলার শ্বশুরবাড়ী পৈশাচিক হৃদয়হীনতায় ও কূট স্বার্থাভিসন্ধিতে বাঙালী সমাজেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাহার দেবরেরা যে ভাবে তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে ও যে ভাবে তাহার একমাত্র অনাথা মেয়ে সীতাকে অর্থলোভে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পাত্রের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে তাহাতে আমাদের সমাজের জঘন্যতম রূপই প্রকটিত। এমন কি মহাশ্বেতার মেয়ে স্বর্ণর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সংসারেও দাম্পত্য জীবনের যে কালিমালিপ্ত, চক্ষুলজ্জাহীন সুবিধাবাদের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অপেক্ষা কোন শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্য জীবনও অধিক ভয়াবহ নহে। ইহাদের সহিত তুলনায় শ্যামার ভগ্নী—কমলা ও উমার সংসার তীব্র অভাবের মধ্যেও কতকটা শান্তি ও সহনীয়তা বজায় রাখিয়াছে। অভয়াপদদের সংসারে জা দের মধ্যে কিছুটা রেষারেষি থাকিলেও ভ্রাতাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমপ্রাণতা উহাকে একটি আদর্শনিষ্ঠ, সম্ভ্রমশীল পরিবারের মর্যাদা দিয়াছে; কেবল দুর্গাপদর নির্লজ্জ ও নির্বিচার কামপ্রবৃত্তি উহার গোপন মর্মক্ষতের একটি ন্যক্কারজনক নিদর্শন।

এই প্রাণরসশোষণকারী অভাবের জ্বালা চরিত্রভেদে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি ও স্বভাব-বিকৃতি ঘটাইয়াছে। শ্যামার কৃপণতা ও সঞ্চয়প্রবৃত্তি ক্রমশ তাহার হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তিকে শুষ্ক করিয়া তাহাকে এক জড়-অভ্যাসাবিষ্ট, প্রস্তরীভূত আত্মসর্বস্বতায় শৃঙ্খলিত করিয়াছে। তাহার পু॰, কন্যা পুত্রবধূ, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রিয়জনই তাহার অন্তর হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। শ্যামার এই বিজনপুরী ও আলোহাওয়ারোধী ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্যে সঞ্চরণশীল, নিঃসঙ্গ প্রেতমূর্তি আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও করুণার সৃষ্টি করে। নানাভাবপ্রবাহতরঙ্গিত মুক্ত মানবাত্মার এইরূপ পাষাণরূপান্তব পৌরাণিক অহল্যার কথাই মনে পড়াইয়া দেয়। শ্যামার বার্ধক্যে পিঠ বাঁকার মত অবস্থার নিদারুণ চাপে এই মানস স্থাণুতা লেখকের নিপুণ কার্যকারণবিন্যাসের দ্বারা চারিত্রিক পরিণতিসংঘটনের উজ্জ্বল নিদর্শন। ঐন্দ্রিলা বঞ্চিত জীবনের সমস্ত ক্ষোভ ও তিক্ততাকে আত্মীয়স্বজনের সংসারে ঈর্ষ্যা ও হিংসার আগুন ছড়াইয়া, তুমুল কলহের দ্বারা সর্বত্র অশান্তির ঝড় বহাইয়া মুক্তি দিয়াছে। তাহার মায়ের নির্বিকার ঔদাসীন্যের জন্য তাহারই আচরণ প্রধানতঃ দায়ী। তরু দুঃখের আঘাতে পাগল হইয়া গিয়া আত্মহত্যায় সব জ্বালা জুড়াইয়াছে। মহাশ্বেতা মায়ের অর্থগৃধ্নুতার উত্তরাধিকার পাইয়াছে। সে অতিরিক্ত সুদের লোভে স্বামীর ও নিজের সাংসারিক মর্যাদা খোয়াইয়াছে। তবে তাহার স্বভাব-সারল্য ও অদম্য জীবনাগ্রহ সমস্ত দুর্দৈবের চাপেও একেবারে নষ্ট হয় নাই। সে গৃহকর্ত্রীর পদমর্যাদা ও মেজবৌএর সঙ্গে আজীবন প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া শেষ জীবনে মেজ কর্তা ও মেজবৌএর অভিভাবকত্ব মানিয়া লইয়াছে। উমার কঠোর আত্মমর্যাদাবোধ স্বামীকে আশ্রয় দিয়াও তাহার স্নেহকে

প্রশ্রয় দেয় নাই। রাণী বৌএর ব্যক্তিত্বমাধুর্য ও বুদ্ধিপ্রাখর্য অভাবপীড়িত সংসারেও শান্তি ও আনন্দের শীতল ছায়া বিস্তার করিয়াছে। আর হেমের স্ত্রী কনক কেবল ধৈর্যগুণে স্বামীর চিত্ত জয় করিয়া শাশুড়ীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ সান্নিধ্য হইতে দূরে গিয়া স্বাধীন গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণশ্রী অর্জন করিয়াছে।

এই দারিদ্র্যদুঃখদগ্ধ জীবনগুলির মধ্যে মৃত্যুর চরম দুর্ঘটনা বারে বারে ঘটিয়াছে। লেখকের এই মৃত্যুদৃশ্যবর্ণনার মধ্য দিয়া সংযত কারুণ্য ও গভীর মমতাবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর প্রত্যেকটি মৃত্যুদৃশ্যে বিশেষ অবস্থার উপযোগী এক একটি নূতন সুরবৈচিত্র্য আনিয়াছে। উমার মৃত্যু ঘটিয়াছে আকস্মিক পথদুর্ঘটনায়; এই স্বামিপরিত্যক্তা, নিঃসন্তান প্রৌঢ়ার মৃত্যুর করুণতা স্বামীর উদ্‌ভ্রান্ত অনুতাপের মাধ্যমেই পরিস্ফুট। হারাণের মৃত্যুশোক তরুর অসহায়তা, ও শ্যামার বাড়তি চাপের ভারে বিব্রত ভাব হইতেই পরোক্ষভাবে আভাসিত। তরুর আত্মহত্যারও বিশেষ কোন উল্লেখই নাই; কেবল শ্যামার মাতৃহীন বলাইকে শেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিবার আগ্রহেই এই বিষয়ের যাহা কিছু গৌণ গুরুত্ব। সীতার পুলিশের গুলিতে মৃত্যু তাহার সমস্ত পূর্ব চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়া একেবারেই অবান্তর ও ভাবতাৎপর্যহীন বলিয়া ঠেকে। দুইটি মৃত্যুদৃশ্যে মৃত্যুপথযাত্রীর জীবনের মাধুর্য ও মহিমা দুই প্রকারের ভাবপরিমণ্ডলের মাধ্যমে অপূর্ব করুণরসের উদ্বোধন করিয়াছে। রাণীবৌর মৃত্যুতে যেন তাহার সমস্ত জীবনের কৌতুকরস সিঞ্চিত, আনন্দময় মধুররসটি চির-বিদায়ের পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে, মরণেই যেন তাহার জীবনমাধুর্যের সুন্দর-তম বিকাশ। আর, অভয়াপদ স্বল্পভাষী, মিতাচারী, আত্মলোপী জীবন মৃত্যুর অন্তিম উজ্জ্বলতায় এক মুহূর্তে আপনার সমস্ত লুকানো মহিমাকে অবারিত করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর জন্য নীরব প্রস্তুতিনিরুদ্বেগ প্রশান্তি, নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ রশ্মিঝলকের ন্যায় ক্ষণিক আত্মউদ্‌ঘাটন সবই যেন তাহার মৃদুগুঞ্জিত জীবন রাগিণীর সমাপ্তি-সুরোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহার সমস্ত অস্তিত্বের সহিত অপূর্ব তাৎপর্য সঙ্গতিতে বাঁধা, এক অনির্বচনীয় সমন্বয়-সুষমার দ্যোতক গজেন্দ্রকুমার এই মৃত্যুদৃশ্যগুলিবর্ণনায় এক অসাধারণ শিল্পবোধ ও ভাববৈচিত্র্য-সঞ্চারের পরিচয় দিয়াছেন।

ধূসর, সমস্ত মাধুর্য-ঝলসানো, দারিদ্র্যের অনল-দগ্ধ জীবনগুলিতে মাঝে মাঝে দৈব-প্রসাদের সান্ত্বনা ও অযাচিত দাক্ষিণ্য বর্ষিত হইয়াছে। মরুভূমির দিগন্তবিস্তারী তপ্ত বালুকায় মাঝে মধ্যে এক আধ ফোঁটা অভাবনীয় রোমান্সের শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ে। হতদরিদ্র কান্তির জীবনে রতনের অসম মোহাকর্ষণের উন্মত্ত আতিশয্য নিদারুণ অভিশাপই আনিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী মায়ামরীচিকার মুগ্ধ আবেশ অবিস্মরণীয়। ঐন্দ্রিলার বহু-ঝটিকাতাড়িত জীবনতরণী কোলাঘাটের মহাপ্রাণ ডাক্তারের আতিথেয়তায় কিছু দিনের জন্য স্থির পোতাশ্রয় লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্তের অসংযমে সেই আশ্রয় ভাঙিয়া গেল। সর্বাপেক্ষা রোমান্সের বর্ণোজ্জ্বলতা আসিয়াছে স্বর্ণের জীবনে। অসুখে পড়িয়া সে এক নিমেষে রূঢ় বাস্তব-হইতে রোমান্সের রঙ্গীন রাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছে। আদর্শ প্রেমের মধুর স্বপ্ন তাহার বাস্তব-বিড়ম্বিত জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে—বাল্যপ্রণয় তাহার যৌবনোত্তর অভিজ্ঞতায় স্বর্গসুষমাময় মূর্তি ধারণ করিয়াছে। অথচ লেখকের নিরুচ্ছ্বাস সত্যনিষ্ঠার জন্য এই

কল্পনার স্বর্গখণ্ডগুলিকে অবাস্তব মনে হয় না, ঘরোয়া পরিবেশে তাহারা বে-মানান হয় নাই।

বাঙালী জীবনে সত্যকার জটিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত উহার গার্হস্থ্যপরিবেশসম্ভব। উহার জন্য চমকপ্রদ বহির্ঘটনার মধ্যবর্তিতা বিশেষ প্রয়োজন হয় না। একই পরিবারের ব্যক্তিবৃন্দের বিভিন্ন রুচি, মেজাজ ও স্বার্থবোধই গৃহে গৃহে আগুন জ্বালায় ও ছোটখাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। ভ্রাতৃবিরোধ, জা-দের মধ্যে মনোমালিন্য, শাশুড়ী-বৌএর কর্তৃত্বদ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ও চারিত্রিক পরিবর্তনের উর্বরতম ক্ষেত্র। ভাল রাধুনি যেমন তুচ্ছ উপকরণে সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করিতে পারে, তেমনি সূক্ষ্মদর্শী, জীবনরসের শিল্পী ঔপন্যাসিক একটি পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমানিবদ্ধ জীবনকাহিনী লইয়া মানব প্রকৃতির বিচিত্র লীলা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। গজেন্দ্রকুমার তাঁহার এই বিপুলায়তন উপন্যাস-ত্রয়ীতে এই সত্যই প্রমাণ করিয়াছেন। প্রতি মুহূর্তের অভিঘাতে, একই মানস বৃত্তির পৌনঃপুনিক উত্তেজনায়, চির-পোষিত ক্ষোভ ও বিরোধের উত্তাপে চরিত্রের তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য যতটা বদ্ধমূল হয়, বাহিরের কোন গুরুতর আলোড়নেও তাহা সম্ভব হয় না। উপন্যাসে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলে। দুর্গাপদর প্রতি তরলার শান্ত বিমুখতা, কনকের প্রতি হেমের মনোভাব-পরিবর্তনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, শ্যামার প্রতি বিনতার স্থূল অসম্মান ও ঔদ্ধত্য, অভয়পদর সমস্ত আত্মপ্রতারণার মুখোশ খোলা, জীবন সমীক্ষা, মহাশ্বেতার বিলম্বিত জীবন-স্বরূপের উপলব্ধি, সর্বোপরি শ্যামার প্রস্তরকঠিন, ভাবলেশহীন নির্বিকারত্ব—সবই গৃহস্থালীর ছোটখাট ঠোকাঠুকির ফলে কিরূপ গুরুতর মানস পরিবর্তন সাধিত হয় তাহারই উদাহরণ। দুঃসংবাদের জন্য প্রতীক্ষা-দুর্বিষহ রাত্রির প্রহরগুলি ক্ষুদ্র শব্দ ও ইঙ্গিতে শিরাস্নায়ুর সংবেদন-শীলতাকে কিরূপ তীব্র করিয়া তোলে ও ঘূর্ণিবাত্যার বিভীষিকা কেমন করিয়া বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে সংক্রামিত হয় তাহার বর্ণনায় লেখক আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড নিহিত তন্ত্রশাস্ত্রের এই সত্য গার্হস্থ্য জীবনের এই মহা-কাব্যে চমৎকারভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। রসদৃষ্টি যে অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে-জীবনরহস্যকে পরিস্ফুট করিতে পারে এই সিদ্ধান্তই এখানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন আধুনিক যুগের প্রান্তদেশে পৌছিয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইবার পূর্বে উহার অন্তর্জীর্ণতার মধ্যে এক কালজয়ী ভাবসম্পদ রাখিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ এই গ্রন্থগুলিকে "এঁটো-ফেলা বাসন-মাজার মহাকাব্য" নামে শ্লেষ-কটাক্ষ করিয়াছেন—কিন্তু এই তুচ্ছ, গতানুগতিক কর্তব্যনিষ্ঠার পিছনে মনোভাবের যে আদর্শ-নিষ্ঠা ও সংকল্পদৃঢ়তা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহার মহিমা কোন অংশেই কম নহে। হিন্দুনারীর এই অন্তর-গঠনের মধ্যে বাঙালীর প্রাণরহস্য বহু শতাব্দী ধরিয়া নিহিত ছিল—চিরাবলুপ্তির পূর্বে সাহিত্যের কষ্টিপাথরে ইহার কনকদীপ্তি একবারের জন্য স্মরণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গার্হস্থ্য জীবনে নারীভূমিকার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক দ্বিল কন্যা' (এপ্রিল, ১৯৬০)। এই উপন্যাসের নায়িকার জীবন শুধু তথ্যবিবৃতি ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের

ক্ষেত্র নহে, ইহা একটি আদর্শলোকের মৃদু আলোক উদ্ভাসিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী-চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের ন্যায় মৃগনয়নীও এক বিশিষ্ট, হিন্দুধর্মসম্মত ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলে লালিত। পার্থক্য এই যে, অরাজকতার যুগে প্রফুল্লকে রাণীগিরির অভিনয় করিতে হইয়াছিল ও গার্হস্থ্য জীবনের সচ্ছলতায় তাহাকে সপত্নীর সঙ্গে মানাইয়া চলা ছাড়া আর কোন দুরূহতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে মৃগনয়নীর জন্য কোন রাণীর সিংহাসন নির্দিষ্ট ছিল না ও রক্তক্ষয়কারী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহাকে আজীবন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আর আদর্শবাদের যে মণিমুক্তাখচিত রাজপরিচ্ছদ সোজা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে প্রফুল্লের অঙ্গে বিন্যস্ত হইয়াছিল, মৃগনয়নীর ক্ষেত্রে বাস্তবজীবন-অভিজ্ঞতার খনি হইতে জীবনব্যাপী সাধনার খনিতে উত্তোলিত মণিখণ্ডের ন্যায় তাহা তাহার চীর-বস্ত্রে একটি অলক্ষ্যপ্রায় দ্যুতিরূপে মাঝে মধ্যে ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে। প্রফুল্ল গার্হস্থ্য জীবনে বাস করিলেও কবিকল্পনার দ্বারা দেহ-মনে প্রসাধিত রোমান্স-নায়িকা। মৃগনয়নীর বাস্তব সংগ্রামে ধূলিধূসর সত্তার উপর একটা অধ্যাত্ম সাধনার স্তিমিত দীপ্তি আমাদিগকে এক অতর্কিত মহিমার সন্ধান দিয়াছে।

তথাপি মৃগনয়নী-সম্বন্ধে উপন্যাসের নামকরণ এক রূপকথাধর্মী অসাধারণত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এই নায়িকা নিতান্ত প্রাকৃতকুলোদ্ভবা নহে, সে এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও বংশগৌরবের একটা স্মৃতি তাহার বাহিরের আচরণে প্রকট না হইলেও তাহার অন্তরের একটি সূক্ষ্ম কৌলীন্যবোধ উদ্দীপ্ত করিয়াছে। তাহার পিতৃপরিবারের মেয়েদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও হৃদয়দ্বন্দ্ব তাহার চিত্তের কিছুটা প্রসার ঘটাইয়াছে। তরঙ্গিণী ও পুঁটির বিদ্রোহস্ফীত ও করুণ জীবনকথা অজ্ঞাতসারে তাহার মানস প্রশান্তির বীজ বপন করিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব তাহার পিতা রামতারণের ধ্যাননিমগ্ন নির্লিপ্ততা ও মাঝে মধ্যে দুই একটি সহজ উপদেশবাণী। তাহার প্রাক্-বিবাহিত জীবনে কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে না। তাহার রুগ্ন ও দরিদ্র স্বামীর সহিত বিবাহই তাহাকে দৃঢ় সংকল্পে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। এইখানেই তাহার জীবনসাধনার সূচনা।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়া তাহাকে ননদ প্রমদাসুন্দরীর বিষজ্বালা-উদ্গারণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার স্বামী ও শাশুড়ী নিষ্ক্রিয়, তাহার জা কালো বৌ প্রতিবিধানে অক্ষম। কিন্তু এখানে তাহার তেজস্বিতামিশ্রিত সহিষ্ণুতা ছাড়া কোন উচ্চতর গুণের বিকাশ হয় নাই। বাপের বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইয়া বড়দিদি তরঙ্গিণীর নিঃসংকোচ ব্যভিচার ও ছোটদিদি পুঁটির দাম্পত্যসুখ-বিতৃষ্ণা তাহাকে জীবনের দুর্বোধ্যতা বিষয়ে সচেতন করিয়াছে ও তাহার জীবনসমীক্ষা জাগাইয়াছে।

কলিকাতায় বাসা করিতে গিয়া তাহাকে প্রবলতম জীবনসমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ও তাহার চরিত্রে যে মহত্ত্বসম্ভাবনা ছিল তাহা ঘটনা-সংঘাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। মেজ ভাসুর ও নূতন বৌ-এর সঙ্গে তাহার অন্যায়ের প্রতিবাদসূচক অসহযোগ চরিত্রদৃঢ়তার পরিচয় দিলেও কোন বিশেষ অধ্যাত্ম উৎকর্ষের নিদর্শন দেয় না। কিন্তু সে যখন স্বামী বনবিহারীর সহিত স্বতন্ত্র বাসা বাঁধিল তখনই তাহার যেমন গৃহিণীপণা তেমনি তাহার

অসাধারণ চরিত্রগৌরবও স্ফুরিত হইল। সে তাহার স্বামীর সমস্ত নির্যাতন, তাহার মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানাইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই তাহার চেতনা জাগিয়াছে যে, নীরব সেবা ও সহিষ্ণুতাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। শেষ পর্যন্ত সে হিন্দুধর্মের পরম আদর্শে পৌঁছিয়াছে—সে সমস্ত দুঃখকষ্টকে এক লীলাময়ের লীলাবিলাসরূপে গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে ও দেহের কষ্ট ও মনের নির্লিপ্ততাকে একসূত্রে বাঁধিতে শিখিয়াছে। তাহার সমস্ত ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের উপর এই অপার্থিব অনুভূতি এক স্নিগ্ধ প্রশান্তির অন্তরাল রচনা করিয়াছে। আত্মা যে দেহবিযুক্ত, দৈহিক অভিজ্ঞতার দ্বারা অস্পৃষ্ট হিন্দু সাধনার এই পরম তত্ত্ব তাহার জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অথচ ইহার মধ্যে আদর্শ-বাদের কোন গাঢ় অনুরঞ্জন, কোন অবাস্তব ভাববিলাস নাই—বাস্তব জীবনের সহিত এই অধ্যাত্ম অনুভূতি অতি সহজভাবে সমন্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমের মত ভাবোচ্ছ্বাস বা অবতার-বাদের আরোপ নাই মৃগনয়নী সাধারণ হইয়াও অসাধারণ। লেখকের ঘটনানির্বাচন, পরিমিত ও সুষ্ঠু মন্তব্য, সমুন্নত আদর্শের অতি সহজ উপস্থাপনা ও যথাযথ ইঙ্গিত, বর্ণনা-সংযম—সমস্তই এই উপন্যাসটিকে গার্হস্থ্য উপন্যাসের এক উচ্চতম পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছে। ঘরের মেয়ে কোন অলৌকিক উপায়ে নহে, অতি সুসঙ্গতভাবে, বাস্তবের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া, দেবীত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের জীবনবোধের অনির্দেশ্য অস্থিরতা ও নিরাশ্রয় শূন্যতা কয়েকজন লেখকের পারিবারিক জীবনচিত্রণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যোৎকর্ষ ও সংঘাতবিশ্লেষণনিপুণতার দিক দিয়া সমরেশ বসুর 'ত্রিধারা' উপন্যাসটি বিশেষ প্রশংসনীয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে ও বালিগঞ্জে বসতিকারী মহীতোষবাবুর তিন কন্যা, সুজাতা, সুগতা ও সুমিতার জীবনে আধুনিক যুগের দাম্পত্য-সমস্যা মর্মান্তিক তীব্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহীতোষ স্নেহশীল পিতা, কিন্তু কন্যাদের হৃদয়াবেগের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে একান্ত অসমর্থ ও তাহাদের নিষ্ঠুর আত্মপীড়নের অসহায় দর্শক। তিন ভগ্নীর মধ্যে হয়ত স্বাভাবিক স্নেহের অভাব নাই, কিন্তু প্রত্যেকে আপন আপন জালে এরূপ দুচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, বাহির হইতে কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করা ছাড়া পরস্পরের মধ্যে আর কোনও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-স্থাপন বা সক্রিয় হিতসাধনপ্রয়াস সম্ভব হয় না। প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণ বৃত্ত আবর্তন করিয়াছে ও সমস্যাক্লিষ্ট অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতম বেদনায় উন্মথিত হইয়াছে। কেবল কনিষ্ঠা কন্যা সুমিতা তাহার বয়সের অসমতার জন্য বাড়ীর আর তিনজন লোক হইতে খানিকটা বিচ্ছিন্ন জীবনানুভূতির দোলায় আন্দোলিত হইয়াছে ও খানিকটা মানস ব্যবধান হইতে সকলের অন্তরে গভীরভাবে-কাটিয়া-বসা গ্রন্থির রক্তক্ষরা পেষণ-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার বয়ঃসন্ধিকালের কৌতূহল-চাঞ্চল্য ও হৃদয়সমস্যানির্মুক্ততাই তাহাকে আর দুই ভগ্নীর ও পিতার মনোবেদনার অতল গভীরতা ও আত্মরক্ষার ব্যাকুল প্রয়াস সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে। বয়ঃস্থ নর-নারীর মনোগহনের রহস্য তাহার কিশোর, অনভিজ্ঞ চিত্তে যে অনির্দেশ্য অস্বস্তি জাগাইয়াছে, উপন্যাসের তাহাই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। উপন্যাসের

সমস্ত ঘটনাবলী ও অন্তর-আলোড়ন সুমিতার দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমেই আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে।

উপন্যাসের আরম্ভেই সুজাতা ও গিরীনের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কচ্ছেদের সম্ভাবনা সুমিতার মনে যে আসন্ন, অথচ দুর্বোধ্য বিপদের ছায়াপাত করিয়াছে, যে ভীতিকণ্টকিত প্রতীক্ষার কম্পন জাগাইয়াছে তাহাই যেন সমস্ত উপন্যাসের স্থায়ী সুরের সূচনা করিয়াছে। সুজাতা ও গিরীনের বিচ্ছেদের কারণ এত অনির্দেশ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় যে, উহার মূল তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—ইহা যেন একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যুগমানসের আত্মপরিচয়হীন উদ্‌ভ্রান্তিপ্রসূত বিকাররূপেই প্রতিভাত হয়। উহারা যে কেন মিলিয়াছিল, পরস্পরের প্রতি কেন আকৃষ্ট হইয়াছিল, একে অপরের মধ্যে কি প্রত্যাশা করিয়াছিল ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ এক সর্বব্যাপী অরাজকতার শূন্যগর্ভতায় বিলীন হইয়া যায়। গিরীনের দিকটা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সুজাতার যে প্রবল প্রতিক্রিয়া আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে তাহার মনের সত্য কোন পরিচয় মিলে না। গিরীনের বিরুদ্ধে তাহার কি অভিযোগ, এই মনোমালিন্যের মীমাংসা কেন সম্ভব নয়, বিচ্ছেদের পর তাহার জীবন কোন্ নূতন অবলম্বন আশ্রয় করিবে, তাহার জীবনদর্শনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিল ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব-পরিচায়ক কোন প্রশ্নের উত্তর মিলে না। একপ্রকার অবোধ অভিমান ও জীবনবিতৃষ্ণা তাহাকে ক্লাবজীবনের ব্যসনবিলাস ও অমিতাচারের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটাইয়াছে। তাহার পিতার স্নেহময় কল্যাণেচ্ছা ও পূর্বপ্রণয়ী রবির সান্ত্বনাদানপ্রয়াস তাহার অধীরতা ও স্বেচ্ছাচারপ্রবণতাকে আরও উদ্দাম করিয়াছে। গিরীনের একরাত্রির স্বামীর অবাঞ্ছিত অধিকারপ্রয়োগ তাহাকে বোম্বাই-এর সুদূর প্রবাসে ঠেলিয়া পাঠাইয়াছে। সেখানে তাহাকে লইয়া আবার নূতন হৃদয়সম্পর্কজালের সূচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিণতি অনিশ্চিত। সুজাতার সমস্ত চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে, উহার অন্তঃকরণ ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিস্থালীর ন্যায় সর্বদা একটা অস্পষ্ট বিস্ফোরণপ্রবণতায় উত্তেজিত এবং উহা কোন নির্দিষ্ট আদর্শবাদ ও জীবনানুভূতির স্থির আশ্রয় লাভ করে নাই। অতি-আধুনিককালের তরুণ-তরুণীর দাম্পত্য জীবন যেন আগ্নেয়গিরির অন্তর্জ্বালাজীর্ণ চূড়ার উপর দাঁড়ান ও একটা নিরবলম্ব শূন্যতাবোধই যেন উহার যথার্থ আশ্রয়ভূমি। কম্পমান সদাজ্বলন্ত শিখার আড়ালে উহার মুখাবয়ব সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়াছে।

সুজাতা যখন এই মর্মান্তিক অবস্থাসংকটে দিশাহারা ও বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সুগতাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উচ্চতর ভাবজগতে বিচরণশীল, স্থিরবুদ্ধি তরুণী বলিয়া মনে হইতেছিল। সুজাতার ভুল যে সুগতাতে পুনরাবৃত্ত হইবে না সেবিষয়ে আমরা প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। যে ছাত্র-রাজনীতির নেত্রী, গম্ভীর, রাশভারি প্রকৃতির মেয়ে, হৃদয়াবেগচর্চার ছেলেমানুষী করা যেন তাহার পক্ষে অচিন্তনীয়। তাহার দিদির নির্বুদ্ধিতায় সে যেন শ্রেষ্ঠত্বের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে, সে শুধু যে প্রেমে পড়িল তাহা নয়, বিবাহের একবৎসরের মধ্যে প্রেমের বন্ধন ছিন্নও করিল। তাহার মন মৃণাল ও রাজেনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া মৃণালকেই বরণ করিল।

সুগতা ও মৃণালের এই প্রেম কোন আবেশে মুহূর্তের জন্যও রঙ্গীন হইয়া উঠে নাই, কোন অসংবরণীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস উহাদের অন্তর-যবনিকাকে ক্ষণকালের জন্যও অপসারিত করে নাই। উহাদের মিলন দুই প্রৌঢ়, আবেগহীন সত্তার ক্ষণিক সাহচর্য-কামনার ঊর্ধ্বে ওঠে নাই। উহাদের যখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে তখন উভয়েই একটা অলীক দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া নিজ নিজ পূর্বতন কর্মধারারই অনুবর্তন করিয়াছে। মৃণাল ব্যবসায়ে মাতিয়াছে, সুগতা আবার ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। প্রেমের স্মৃতি তাহাদের কাহাকেও যে উন্মনা করে নাই তাহা নিঃসন্দেহ। প্রেমানুভূতির আন্তরিকতা বা গভীরতা উভয়েরই অনায়ত্ত। সুগতার পুরুষালি তাহার মধ্যে রমণীসুলভ কমনীয়তার অভাবই সূচিত করে। দিদির দারুণ চলচ্চিত্ততা, বাবার করুণ অসহায়ত্ব ও ছোটবোন সুমিতার বিমূঢ়তা কিছুই সুগতার দুর্লঙ্ঘ্য আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গে কোন প্রবেশপথ খুঁজিয়া পায় নাই। একটা দুরধিগম্য প্রহেলিকার মত সে আমাদের বোধগম্যতা বা সহানুভূতির সীমার বহির্দেশে পাথরের ভাবলেশহীন মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। আধুনিক জীবনে সুগতার মত হৃদয়াবেগহীন, আত্মসন্তুষ্ট তরুণী যে সত্যই আছে ইহা যুগজীবনের অলঙ্ঘনীয় অভিশাপ।

এই ঊষর, বহ্নিদগ্ধ মরুপ্রান্তরে একটি বিরলপত্র বৃদ্ধ বট ও একটি শ্যামল, নবীন অঙ্কুর সুস্থ জীবনের চিহ্ন বহন করিয়া কোনমতে একটু স্নিগ্ধছায়াবিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াসে আত্মপীড়নের ক্লেশ অনুভব করিতেছে। ইহাদের মধ্যে মহীতোষবাবু কোন বিশেষ জীবনতাৎপর্যের প্রতীক নহেন। সাবেক যুগের পিতা আধুনিককালের মেয়েদের জীবন-প্রহেলিকার সম্মুখীন হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরতায় ঘুরপাক খাইতেছেন। তিনি না পারিতেছেন তাহাদিগকে বুঝিতে, না পারিতেছেন তাহাদের জীবনবিকারকে সুস্থ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিতে। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ স্বপ্নসঞ্চরণশীল ব্যক্তির চলনের ন্যায় দ্বিধাগ্রস্ত ও লক্ষ্যহীন। তিনি যেন অতীত জীবনযাত্রার এক লুপ্তাবশেষ, অপরিচিত জগতের তীরে হঠাৎ অবতরণ করিয়াছেন ও প্রতিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যে সর্বদা ক্লিষ্ট হইতেছেন। উপন্যাসে তাঁহার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য যুগ-পরিবর্তনের গভীরতার পরিমাপক যন্ত্রহিসাবে। খরস্রোতা নদীর জলে তটভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িলে তীরবাসীদের মতই মহীতোষ-বাবু একান্ত বিব্রত ও অসহায়—প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সংকল্প যেন তাঁহার কল্পনাতীত।

এই সর্বব্যাপী ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াইয়া সুমিতাই একমাত্র ব্যক্তি যে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের কথা ভাবিতে পারে। তাহার কৈশোর হইতে সে তাহার দিদিদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে। দিদিদের জীবনসমস্যা না বুঝিয়াও সে উহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছে—দুরু দুরু কম্পিতবক্ষে উহাদের অন্তঃনিরুদ্ধ যন্ত্রণা ও পাষাণের ন্যায় নিশ্চল, ভাবলেশহীন মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে, বাহিরের লৌহ যবনিকা সরাইয়া সহানুভূতির স্নিগ্ধ আলোকে তাহাদের অন্তর-রহস্য ভেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই স্নেহময় উদ্বেগে তাহার দিদিদের হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই, কিন্তু তাহার নিজের জীবনবৃত্ত আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র কক্ষপথকে ছাড়াইয়া প্রসারিত

হইয়াছে। বাবার জন্যও সে ভাবিতে শিখিয়াছে ও তাহার উদ্বেগের মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে। এই কোমলতর বৃত্তি ও ব্যাপকতর সহানুভূতির অনুশীলনের ফলে তাহার ব্যক্তিসত্তা সহজভাবে বিকশিত হইয়াছে ও যুগের অভিশাপকে সে অনেকটা এড়াইতে পারিয়াছে। তাহাদের দিদিদের সঙ্গে তাহার জীবনচর্যার প্রধান পার্থক্য হইল যে, সে আত্মতৃপ্তি ও মতবাদমূলক পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া মানবিক পরিচয়ের প্রতি একান্তভাবে আগ্রহশীল হইয়াছে। সুজাতা গিরীনকে একেবারেই চেনে নাই—ঐশ্বর্যের মুখোশ তাহার সত্য পরিচয়ের মুখকে আবৃত করিয়াছে। সুগতা মৃণাল ও রাজেন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে মতবাদের বাটখারায় ওজন করিয়াছে ও মৃণালের নিষ্ক্রিয়তা তাহার নিজের মতবাদচর্চাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে এই আশায় সে তাহাকেই নির্বাচন করিয়াছে। মৃণালকে মতবাদের তুলার কৌটায় স্বচ্ছন্দে শোয়াইয়া রাখা যায় বলিয়া প্রেমিক হিসাবে সে অধিকতর প্রার্থনীয়। রাজেনকে এই কোমল শয্যায় ঘুম পাড়ান কঠিন বলিয়াই সুগতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভাব বিলাসের কুহেলিকা ভেদ করিয়া কাহারও ব্যক্তিস্বরূপনির্ণয় সুগতার অনভিপ্রেত ছিল। দর্জির দোকানে মাপ করিয়া জামা করার ন্যায় প্রেমিককে মতবাদসাম্যের মানদণ্ডে মাপিয়া লওয়াই তাহার জীবননীতি।

সুমিতার স্বপ্নময় ও অনুভূতি-স্পন্দিত কৈশোর অনেকটা সহজ পরিণতির সূত্র ধরিয়াই প্রথম যৌবনের ভীরু প্রণয়োন্মেষের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে এই সহজ পরিণতিও নানা ভ্রম-প্রমাদের বঞ্চনা কাটাইয়া আশ্রয়পাত্রের একাধিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নিজ অভীপ্সিত লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে। প্রথম, সহপাঠী লাজুক বিনয়, ও পরে দেশের সব কিছুর উপরই বিরূপ আশীষ তাহার কুমারীমনে প্রণয়ের প্রথম অস্পষ্ট অনুভূতি জাগাইয়াছে। সুমিতার সুস্থ জীবনবোধের পরিচয় এইখানেই যে, সে গভীর হৃদয়ানুভূতির মানদণ্ডে বিচার করিয়া ইহাদের কাহাকেও নিজ জীবনের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করে নাই। বর্তমান যুগে প্রেমের নব-জাগরণ ভাবকল্পনা লইয়া খেলা করিয়াই তবে নিজ যথার্থ মনোভাবের পরিচয় পায়। এই প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর সে শেষ পর্যন্ত সুগতার প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী রাজেনকেই নিজ জীবনসঙ্গীরূপে বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু সে রাজেনকে পছন্দ করিয়াছে তাহার রাজনীতি বা সমাজসেবার জন্য নহে, তাহার শ্রমিককল্যাণপ্রচেষ্টার পিছনে তাহার যে মানব-হৃদয় ক্রিয়াশীল তাহারই জন্য। এইখানেই তাহার দিদিদের সহিত তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। সুমিতা রাজেনের সমস্ত রাজনীতিচর্চার পিছনে আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছে, কেননা তাহার প্রয়োজন কোন মূর্ত মতবাদ নয়, সুখে-দুঃখে কম্পমান, স্নেহ-প্রীতি-মমতায় কোমল ও অনুভবশীল একটি মানবিক সত্তা। যতদিন রাজেনের ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই, ততদিন সে তাহাকে পরিহার করিয়াছে। শেষে যখন রাজেনের শ্রমিক নেতার, মানবকল্যাণব্রতীর রাজকীয় ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িয়া তাহার আর্ত, সমবেদনার কাঙাল, আত্ম-অবিশ্বাসে দুর্বল প্রকৃতিটি অনাবৃত হইয়াছে, তখনই সুমিতা তাহার প্রণয়ের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছে। অবশ্য

বয়োজ্যেষ্ঠ রাজেনের প্রতি তাহার আকর্ষণ-অনুভবে তাহার দিদিদের জীবন-অভিজ্ঞতার পরোক্ষ প্রভাবই যেন কার্যকরী হইয়াছে—ইহাতে যেন কুমারী-অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত, প্রণয়োচ্ছল আবেগের পরিচয় নাই। তাহার দিদিরা যেখানে খোসার রংএই সন্তুষ্ট, সুস্মিতা যেখানে খোসার অন্তরালস্থিত শাঁসের রস-আস্বাদনেই তৎপর। এইখানেই এক নূতন জীবনাদর্শের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

এই উপন্যাসটি আধুনিক জীবনের ভয়াবহ উদ্‌ভ্রান্ত ও নেতিমূলক শূন্যগর্ভতার চিহ্নাঙ্কিত। লেখকের বিশ্লেষণনৈপুণ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু শূন্যকে বিশ্লেষণ করা চলে না। লেখক সুজাতা ও সুগতার মনোগহনে অবতরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ জীবনসত্য আহরণ করিতে পারেন নাই। উহারা নিজেদের নিকটই দুর্বোধ্য, লেখকও তাহাদের রহস্যোদ্ভেদে বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। এযুগে যেন নব শূন্যপুরাণ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মনে হয়।

বারো ঘর এক উঠোন' (মার্চ, ১৯৫৫)—উপন্যাসটি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে বেকার সমস্যার অসহনীয় চাপে বাঙালী জীবনে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় অধোগতির কি নিম্নতম সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহার একটি বিভীষিকাময়, অথচ তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধের সহিত চিত্রিত আলেখ্য। বারোটি পরিবার অভাবের তীব্র তাড়নায় চিরাভ্যস্ত ভদ্রজনোচিত শালীনতা বিসর্জন দিয়া একটি বস্তিবাড়ীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। একই উঠান, স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবহার, বিশেষতঃ প্রত্যেকটি ঘরেই পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব প্রতিটি পারিবারের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারটিকেও সাধারণ কৌতূহলের বিষয় করিয়া তুলিয়া রুচির ইতরতা ও পরনিন্দা-পরচর্চাকে জীবনচর্যার অনিবার্য উপাদানে পরিণত করিয়াছে। প্রত্যেকে পরস্পরের হাঁড়ির খবর রাখে বলিয়াই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ, ঝগড়া-বিবাদ, কর্দমনিক্ষেপ সর্বদাই আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। অবস্থার হীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ঘরে পুরুষ ও নারীর স্বভাবে এমন নীচতা আসিয়া গিয়াছে যে, দারিদ্র্যদুঃখ প্রতিবেশীর হাসি-টিট্‌কারী ও নিন্দা-কুৎসারটনার অতি-ঔৎসুক্যে শতগুণে মর্মান্তিক হইয়া উঠে। যাহারা একেবারে নিঃস্ব তাহাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি সমবেদনার লেশমাত্র নাই; যাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাহারা তাহাদের হতভাগ্য প্রতিবেশীদের প্রতি রূঢ় আক্রমণ ও অশিষ্ট ভাষণের কোন সুযোগই ছাড়ে না। ইহারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া অপর দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য ও অভিযোগ করে, যে হীন উদ্দেশ্যের আরোপ করে তাহাতে মানব জীবনের মর্যাদার শেষ বিন্দু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। দারিদ্র্যের এরূপ ভয়াবহ, সর্বধ্বংসী পরিণতি কল্পনা করিতেও দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় কিন্তু এই মসীলিপ্ত চিত্র যে বাস্তব অবস্থারই যথার্থ প্রতিচ্ছবি তাহা আমাদের সার্বভৌম অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়।

এই সঙ্কীর্ণ জীবনবৃত্তে ঘূর্ণ্যমান ও উঞ্ছবৃত্তির সুড়ঙ্গপথচারী নর-নারীর প্রাত্যহিক গতিবিধি ও আচরণপদ্ধতির মধ্যে প্রাণধারণের নিম্নতম তাগিদ মেটানোর যান্ত্রিক অভ্যাস ছাড়া কোন বৈচিত্র্য বা চরিত্রের মৌলিক বিকাশ আশা করা যায় না। তথাপি লেখক এই ক্ষুদ্রতম পরিধির জীবনপ্রয়াসবর্ণনায় ও উহার অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর স্বার্থ[illegible] ঈর্ষ্যাক্ষুব্ধ ও বিকৃত

কৌতূহলে রসান্বিত পারস্পরিক সম্বন্ধ-উদ্‌ঘাটনে যে জীবনৌৎসুক্যের ও উদ্ভাবনকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অসাধারণ বলিয়াই বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। কাহিনীটি স্বল্পতম উপকরণে গঠিত ও ন্যূনতম আয়তনের কক্ষপথে আবর্তিত হইলেও ইহার মধ্যে কোথাও পুনরাবৃত্তি ও জীবনরসের অপ্রাচুর্য নাই—ইহার প্রতিটি মুহূর্ত চরিত্রদ্যোতনায় সরস ও স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সঙ্গতির সীমা অক্ষুণ্ণ আছে। বল্মীকস্তূপে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় এই মনুষ্যপিপীলিকার দলও এক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদের মনে এক অমোঘ জীবনপ্রেরণার ধারণা জন্মায়।

উপন্যাসের চরিত্রাবলীর পরিচয় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে নয়, সমষ্টিগত সক্রিয়তায়। যাহারা হীন প্রয়োজনের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তাহাদের স্বাধীন সঞ্চরণশক্তি যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তাহা সহজেই বোঝা যায়। কেহই জীবনযুদ্ধে আত্মনির্ভরশীলতা ও নীতিগত সাধুতার পরিচয় দিয়া ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নাই। ইহাদের মুখে ভিন্ন ভিন্ন বুলি, কিন্তু অন্তরে একই পরাজিত মনোভাবের কুটিল প্রেরণা। ইহাদের বিভিন্ন বোল-চালের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা-রুচি-মেজাজের ছাপ, কিন্তু এই সব বিভিন্নতা জৈব প্রয়োজনে নিয়োজিত বলিয়া ইহাদের পরিণাম-ফল অভিন্ন। ইহাদের কাহারও মধ্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থার বা উচ্চতর জীবননীতি ও সূক্ষ্ম সৌজন্য বা সৌন্দর্যবোধের লেশমাত্র নাই। হয় স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হীন স্তাবকতা না হয় রূঢ় সমালোচনা ও অতন্দ্র ছিদ্রান্বেষণতৎপরতা ইহাদের পারস্পরিক মনোভাবের মানদণ্ড। পরস্পরের দুঃখে সমবেদনা বা বিপদে-আপদে সামান্যতম অর্থসাহায্যও এই প্রতিবেশীমণ্ডলের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। অবশ্য ইহাদের মধ্যে বিশেষ কাহারও যে কোন উদ্বৃত্ত আর্থিক সঙ্গতি নাই তাহাও স্বীকার্য।

দারিদ্র্যের স্টীমরোলারের চাপে যে মানুষগুলির ব্যক্তিত্ব-অঙ্কুর চূর্ণীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কে গুপ্ত ও তাহার পরিবারবর্গের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কে. গুপ্তর নির্লজ্জ ভিক্ষুক বৃত্তির পিছনে একটা বে-পরোয়া জীবননীতি ও সংসারচিন্তামুক্ত নিরাসক্তির অদ্ভুত পরিচয় মিলে। সে শিক্ষিত ব্যক্তি ও তাহার শতধাজীর্ণ বাইরের খোলসের মধ্যেও ইংরাজী কাব্যানুরাগের ভাববিলাস এখনও সক্রিয়। মনে হয় প্রায় এক শতাব্দী পরে নিমচাঁদের আত্মা গুপ্তর সুরাসক্তি, কাব্যপ্রীতি ও একটা ক্ষীণ মানসমুক্তির মধ্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু নিমচাঁদে নব্য বাঙলার যে ব্যসনবিড়ম্বিত, অথচ প্রতিশ্রুতি-উজ্জ্বল প্রথম উন্মেষ, কে. গুপ্তে তাহার বার্ধক্যজীর্ণ, ক্লেদপঙ্কমগ্ন, অন্তিম সমাধিশয়ন। নারী সৌন্দর্যমোহ কে. গুপ্তর আর একটি অতীত অভিজাতব্যসনের স্মৃতিবাহী মানস বিলাস—ইহা যেন তাহার বর্তমান জীবনের বীভৎস ছদ্মবেশের মধ্যে একটি অক্ষম অভ্যাসরোমন্থন। তাহার ছেলে রুণু ও মেয়ে বেবি উভয়েই অল্পাধিক পরিমাণে নিন্দনীয় প্রণয়াকর্ষণ ব্যাপারে জড়িত হইয়া ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতবংশীয়ের অকালপক্বতার পরিচয় দিয়াছে। রুণু মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়াছে, বেবি এক আকস্মিক-উত্তেজনা-প্রণোদিত ভ্রাতৃহত্যার উপলক্ষ্য হইয়া উপন্যাসে একটি গুরুতর জটিল পরিস্থিতি ঘটাইয়াছে। পত্নী সুপ্রভা এই নরককুণ্ডে বাস করিয়াও অভিজাত-সুলভ ঔদাসীন্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা বজায় রাখিয়াছে। মুখ বুজিয়া দিনের পর দিন উপবাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার চারিদিকের ইতর কলহ ও অসংবৃত আত্ম-উদ্‌ঘাটন হইতে সম্পূর্ণ

বিবিক্ত রহিয়াছে। পুত্রের মৃত্যু ও কন্যার কলঙ্ক তাহার নীরব গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে নাই ও তাহার কঠোরভাবে প্রতিরুদ্ধ শোকাবেগ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথে মুক্তি পাইয়াছে। কে. গুপ্তও বরাবর তাহার অবিচলিত নির্লিপ্ততায় স্থির আছে—তাহার পারিবারিক বিপর্যয়ের পরেও তাহার মুখরোচক পরচর্চাপ্রীতি অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। অভাবের বহ্নিদাহের ফলে এক এক জন লোক তুচ্ছতার রসোপভোগে ও আত্মাবমাননার প্রতিবাদহীন স্বীকৃতিতে একটি দার্শনিক নিষ্কামতার আদর্শে উন্নীত হয়। কে. গুপ্ত সেই আবর্জনা-জগতের দার্শনিক, ধ্বংসস্তূপের শীর্ষদেশে প্রজ্বলিত সর্বনাশের রক্তআলো। এইখানে ব্যক্তিসত্তা প্রতিবেশ-বিষে জারিত হইয়াই প্রতিবেশ-নিরপেক্ষতা অর্জন করিয়াছে, মানবাত্মা চরম অসম্মানের মধ্য হইতে একপ্রকারের বিকৃত মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে নবাগত শিবনাথ ও রুচি খানিকটা স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে। ইহারা উভয়েই উচ্চশিক্ষিত ও শিবনাথ বেকার হইলেও রুচি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এবং উহারই উপার্জনে উহাদের ছোট সংসারটি একরকম চলিয়া যায়। সমগ্র উপন্যাসটি শিবনাথের দৃষ্টিকোণ হইতে কল্পিত হইয়াছে। বস্তিজীবনেব যাহা কিছু গ্লানি ও কুশ্রীতা সবই শিবনাথের অবজ্ঞা-বিস্ময় ও প্রবল বিমুখতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। শিবনাথ খানিকটা নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া সকলেই তাহাকে শ্রোতা হিসাবে পছন্দ করে ও প্রত্যেকেরই গোপন কথাটি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছে। শিবনাথ একজন দলনিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে বস্তির জীবননাট্যটি বেশ কৌতূহলের সহিত উপভোগ করে। রুচির সহিত তাহার দাম্পত্য সম্পর্ক যেমন ভাবাবেগহীন, তেমনি অনেকটা সমস্যামুক্ত। রুচি তাহার বেকার অবস্থার জন্য তাহাকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখে ও কোনরূপ ঘনিষ্ঠতাব প্রশ্রয় দেয় না। সে অনেকটা স্বপ্রভার মত, কিন্তু বিভিন্ন কারণে, আত্মমর্যাদার প্রতি প্রখর দৃষ্টির জন্য, বস্তির জীবন-কোলাহল হইতে দূরে থাকে।

উপন্যাসের শেষের দিকে কাহিনীর ভাবকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়াছে ও রুচি ও শিবনাথের জীবনে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে। শিবনাথ বস্তির মালিক পারিজাত ও তাহার পত্নী দীপ্তির সহিত প্রথমে চাকরির উমেদাররূপে পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই, বিশেষতঃ দীপ্তির স্বামিত্যাগের পর, পারিজাতের সহিত তাহার সম্পর্ক আরও অন্তরঙ্গ হইয়াছে। সে পারিজাতের নির্বাচনসংগ্রামে বিশ্বস্ত সহকর্মীরূপে যোগ দিয়াছে ও তাহার আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার হীনম্মন্যতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। এখন সে রুচির সহিত সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে।

রুচির দিকেও পরিবর্তন সূক্ষ্মতর হইলেও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সে প্রথম তাহার স্বামীর পারিজাত-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাকে বিরূপ চোখে দেখিয়াছে, কেননা দীপ্তির সৌন্দর্য ও অটুট যৌবনশ্রী তাহার মনে একটা ঈর্ষ্যাসঞ্জাত অভিমানের উদ্রেক করিয়াছে। ইতিমধ্যে দীপ্তির স্বামিগৃহত্যাগে তাহার প্রধান বাধা দূর হইয়াছে ও যখন পারিজাত ও রুণুর পার্ক ষ্ট্রীটের অভিজাত কিশোর বন্ধুরা তাহাকে সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদিকা পদে বরণ করিতে উৎসুক হইয়াছে ও তাহাদের কণ্ঠে তাহার উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে যে সুপ্ত কলানুরাগ ও প্রতিষ্ঠালালসা এতদিন অনুকূল সুযোগের অভাবে

অবদমিত ছিল তাহা হঠাৎ পূর্ণ প্রাণশক্তিতে উচ্ছল হইয়া উঠিয়া . ইহারই মধ্যে ছায়াচিত্র-প্রযোজক ও নারীসৌন্দর্যের রসগ্রাহী চারু রায় তাহার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সংগঠনশক্তির জয়গানে তাহার আত্মতৃপ্তির উত্তেজনাকে মদির বিহ্বলতার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। এই মুহূর্তে কে গুপ্ত তাহার পারিবারিক শোক-তাপকে উপেক্ষা করিয়া তাহার যে আদি-রসচর্চা অনুশীলিত কলাবিদ্যার শাণিত সূক্ষ্মতা অর্জন করিয়াছে তাহারই প্রয়োগে শিবনাথের মনে সন্দেহের বীজ বপন করিল। সে নাকি দেওয়ালের ফুটা দিয়া চারু রায়কে রুচির মুখ চুম্বন করিতে দেখিয়াছে। রুচি আসিয়া শিবনাথের মনে যে খুন করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল তাহাকে সাময়িকভাবে শান্ত করিল। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় যে এই সংবাদটি রুচি-শিবনাথের দাম্পত্য সম্পর্কে যে অভাবিতপূর্ব জটিলতার সঞ্চার করিয়াছে, যে, ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়াছে তাহার এত সহজ মীমাংসা হইবে না। লেখক যেন এই দম্পতিকে বস্তি-জীবনের বাস্তব গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে এক সূক্ষ্মতর অন্তর্দাহের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

উপন্যাসের শেষ অংশে এক নূতন উপন্যাসের ভূমিকা রচিত হইয়াছে—ইহার পটভূমিকা স্বতন্ত্র, পাত্র-পাত্রী বস্তুতঃ এবং অন্তরের দিক দিয়া বহুলাংশে রূপান্তরিত এবং জীবনসমস্যার গতি-প্রকৃতিও ভিন্নপথগামী। উপন্যাসটি দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধান্তিক বাঙালী জীবনের অবক্ষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে সাহিত্যে স্মরণীয়। লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, এই চিত্রাঙ্কনে তিনি একদিকে ভাবাতিশয্য, অন্যদিকে নৈতিক ক্রোধ ও নিন্দার উগ্রতা এই দুইই বর্জন করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজ-ইতিহাসের এই বিষাদময় অধ্যায়টি বিবৃত করিয়াছেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (মার্চ, ১৯৫৭) বিগত দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগের পটভূমিকায় বাঙলার এক সীমান্ত-অঞ্চলের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার কাহিনী। এই উপন্যাসে প্রধানতঃ সমাজের নিম্নতম শ্রেণী, মাঝামাঝি অবস্থার কৃষক সম্প্রদায় ও তখনও সচ্ছল সমাজনেতা ও গ্রামহিতৈষী জমিদারগোষ্ঠীর, আসন্ন পরিবর্তনের আভাসে অস্থির, নূতন পরিস্থিতির সহিত খাপ-খাওয়াইবার চেষ্টায় বিব্রত জীবনবৃত্ত অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার পাত্র-পাত্রীগণ পরস্পরের সহিত শিথিল-সংলগ্ন ও মোটের উপর আপন আপন জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম, একেবারে নিঃস্ব, নির্দিষ্টবৃত্তিহীন ও স্বভাব-অপরাধী, যাযাবর মান্দারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ও কিছু হিন্দু শ্রমিকবর্গ। ইহাদের মধ্যে আছে সুরো, ফতিমা, রজবালি, ইয়াকুব, ইয়াজ, জয়নাল, সোভান, টেপি, টেপির মা, প্রভৃতি। ইহারা জীবিকার্জনের উপায়ান্তর অভাবে চাউলের চোরাকারবারীতে লিপ্ত। এই সূত্রে তাহাদের স্বগ্রামবাসী, গোরুকে বিষ দিবার অভিযোগে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত, অধুনা দিঘা রেলস্টেশনে খালাসীর কাজে নিযুক্ত মাধাই বায়েনের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যতটুকু ভার ও স্থিতিশীলতা থাকিলে পুরা মানুষ হয় ইহাদের তাহা নাই বলিয়াই ইহারা মানবিক খণ্ডাংশের পর্যায়ভুক্ত। যে উপাদান-সংশ্লেষে চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব গড়িয়া ওঠে তাহার অপ্রাচুর্যে ইহারা নির্দিষ্ট-আকারহীন, প্রয়োজন, মেজাজ বা ক্ষণিক আবেগের বায়ুপ্রবাহে ঘূর্ণ্যমান প্রাণকণিকার শিথিল সমষ্টিরূপে

প্রতিভাত হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-নিরপেক্ষ এক অদ্ভুত সমতাবোধ ও জীবনমমতা ক্রিয়াশীল। নিছক প্রয়োজনের তাগিদে ইহাদের প্রাণশক্তির এত অধিক ব্যয় হয়, যে-কোন উদ্বৃত্ত সুকুমার কামনা ইহাদের মনে একটা ক্ষণিক কম্পনমাত্র জাগায়, কোন পরিণত রূপের স্থায়িত্ব লাভ করে না। পিপীলিকা বা মৌমাছির মত একটা নিম্নতম সমবায়বৃত্তি ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। ইহারা বিপদে পরস্পরকে আশ্রয় দেয়, অভাবে যথাসাধ্য আতিথেয়তায় কার্পণ্য করে না, পরের ছেলেকে নিজ ক্ষণিক মাতৃক্রোড়ে টানিয়া লয়, পারস্পরিক নির্ভরতায় একটা বৃহত্তর মণ্ডলীর সংহতি অনুভব করে। কিন্তু যে প্রেম বা চিরন্তন হৃদয় সম্পর্ক পরিণত ব্যক্তিত্ববোধের ফল তাহা তাহাদের প্রয়োজনের সূচিবিদ্ধ, ক্ষণিক আবেগে তরলায়িত, শতচ্ছিদ্র মনোলোকে স্থান পায় না। সেইজন্যই সুরোর সঙ্গে মাধাই-এর সেবা পরিচর্যা ও প্রীতিসহৃদয়তায় হৃদয়ানুকূল সম্পর্কটি প্রেমে পরিণতি লাভ করিতে পারিল না। অনুরূপ কারণে সুরো ও ইয়াজের মধ্যে যে একটু আকর্ষণের রং ধরিতে শুরু করিয়াছিল তাহার পাকা হইবার কোন সুযোগ রহিল না। জীবিকার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার সংশয়াচ্ছন্ন গতিতে এই সমস্ত নারী-পুরুষের মনোগঠনই একনিষ্ঠ হৃদয়াবেগের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। টেপি রূপজীবিনীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, টেপির মা এক বৈরাগীর ভ্রাম্যমাণ জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হইয়াছে, ফতিমা তাহার প্রৌঢ়জীবনে অকস্মাৎ যৌন লালসার তাড়নায় সন্তানসম্ভাবিতা হইয়া জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দুলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সমগ্র জীবনের সহিত এই আবেগঘন অধ্যায়গুলির কোন নাড়ীর সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। লেখক খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই অনতিস্ফুট, স্তিমিতচেতন অংশ চরিত্রগুলির অন্তররহস্য অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহাদের অন্ধকারমগ্ন জীবনানুভূতিকে অনেকটা আবছা-ই রাখিয়াছেন, কোন কৃত্রিম সংযোগসূত্র বা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার সাহায্যে ইহাদের মনের গোধূলি-রহস্যকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিতে চাহেন নাই। ইহাই ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।

ইহাদের ঠিক উর্ধ্বতন স্তরের কৃষক-চরিত্রগুলিও তাহাদের স্বভাব শিথিলতা ও মন্থর জীবনবোধের ছন্দে অঙ্কিত হইয়াছে। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণদাস, মুঙলা, ছিদাম, পদ্ম, ভানুমতী, চৈতন্য সাহা, আলেফ সেখ, এরসাদ শেখ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের নর-নারীদের মধ্যে প্রকৃতিসাম্যের পরিমাণ খানিকটা অনুশীলনগত পার্থক্যের প্রভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহারাও পূর্ণ মানুষ নয়, কিন্তু পূর্ণতালাভের পথে আরও অধিকদূর অগ্রসর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অপেক্ষাকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠ। ইহারা যেমন সৃষ্টিকর্তার হাতে, তেমনি জীবনশিল্পীর রূপায়ণেও কিছুটা স্থূল, পালিশহীন, ভাবপ্রকাশে অপরিণত পাথরের মূর্তির ন্যায়। ইহাদের দায়িত্ব বেশি, সমস্যার ভারও অপেক্ষাকৃত গুরু, জীবনবোধ প্রথাগত আদর্শের দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু হৃদয়ের সূক্ষ্মতর অনুভূতি অবিকশিত ও জীবনসমস্যা বৃত্তভ্রমণপ্রবণতায় চরম পরিণতি হইতে প্রতিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণদাস, পদ্ম ও ছিদাম—ইহাদের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্কের উত্তাপ ও অস্বস্তি ক্ষীণভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু চাষীর স্থূল জীবনসমীক্ষায় হৃদয়াবেগ একটা সৌখীন ভাববিলাস মাত্র—উহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া যায়!

সেইজন্য পদ্ম ও ছিদামের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে শ্রীকৃষ্ণদাস সংসার ছাড়িয়া তীর্থবাসী হইয়াছে। সেই কারণেই ছিদামের আত্মহত্যা তাহার মনোবৃত্তির পক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকে—প্রণয়সমস্যাপীড়িত, বিবেকদংশনক্লিষ্ট চাষার ছেলের পক্ষে এই উগ্রতম ব্যবস্থা অবিশ্বাস্য ও চরিত্রসঙ্গতিহীন মনে হয়। বরং পদ্মর অনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া ও রামচন্দ্রের সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট মনোভাবই যেন তাহার চরিত্রানুযায়ী। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে ইহারা এক অন্ধ আবেগে ঘূর্ণিত হয়, কিছুই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করে না ও উহার অপ্রত্যাশিত পরিণতি ইহাদের মনে এক আচ্ছন্ন বিমূঢ়তা ছাড়া আর কোন তীক্ষ্ণতর ভাব উদ্দীপন করে না। মুঙলার সঙ্গে ভানুমতী ও পদ্মর সম্পর্কটিও সেইরূপ অনিশ্চিত পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছে। লেখক এই জাতীয় চরিত্রের মনের ছবি হুবহু আঁকিতে গিয়া এই কুহেলিকাকেই গাঢ়তর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে পদ্মের যে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ভবিষ্যৎ ছিল তাহা কৃষক-সমাজের এই অর্ধমূক প্রতিবেশে অপরিস্ফুটই রহিয়া গেল। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-এ কুসুমের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পল্লবিত হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ তাহার ভদ্র সমাজ সাহচর্য-প্রভাবিত। যেখানে মূক ধরিত্রীর সংস্পর্শে মানুষের জীবন কাটে, যেখানে মাটির মৌনতা মানবের মধ্যে সংক্রামিত হয়, সেখানে হৃদয়াবেগ আত্মপ্রকাশে বঞ্চিত হইয়া অন্তর মধ্যে নীরবে পাক খাইতে থাকে। ইহার উপর দেশবিভাগের সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় গ্রাম্য লোকের সহজেই অর্ধচেতন চিত্তবৃত্তিকে আরও দুর্বোধ্যতার পাষাণভারে পীড়িত ও অভিভূত করে।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ জমিদার-পরিবারের জীবনচিত্রবিষয়ক। সান্ন্যাল মহাশয়, অনসূয়া, নৃপনারায়ণ, সুমিতি, মনসা, সদানন্দ প্রভৃতি অভিজাতবংশীয় মানুষগুলি যেন অনেকটা আড়ষ্ট ও অবাস্তব, ইহারা আধুনিক জীবনে যে অনেকটা অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন এই বোধ-বিড়ম্বিত। ইঁহারা তত্ত্ব ও আদর্শের রাজ্যে বিচরণ করেন, কিন্তু ইঁহাদের জীবনীশক্তি এই তত্ত্ববেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া স্বতোৎসারিত হয় নাই। ইহার কারণ যে, ইহাদের জীবনবোধই অস্বচ্ছ ও গোধূলিছায়াচ্ছন্ন। বৃত্তির সুস্পষ্টতা যে বোধের সুস্পষ্টতা আনে তাহা ইহাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বঙ্কিমের জমিদার-প্রতিনিধি কৃষ্ণকান্ত ও নগেন্দ্রনাথ নিজ সুনির্দিষ্ট কর্তব্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত—প্রজাপালনের দায়িত্ব, অধিকার-প্রত্যয় তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার। বিংশ শতকের জমিদার এক ক্ষুণ্ণমনোবল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত, পরাশ্রয়ী জীব। সে বিলুপ্তির শেষ ধাপে দাঁড়াইয়া অনাগতের জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমাণ। জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ সে হারাইয়াছে—নানাবিধ ভাববিলাস, নানা অপরীক্ষিত জীবনচর্চার উদ্যম, কল্পনাপ্রধান নানারূপ জন-হিতৈষণা, বৈপ্লবিকতার নানা বুদ্‌বুদ্‌-বিস্ফোরণ—সবই তাহার জীবনছন্দকে মুহুর্মুহুঃ অস্থির ও কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতেছে। কাজেই ইহাদের আলাপ-আচরণের মধ্যে একটা পরোক্ষ জীবনাশ্রয়ের ক্ষীণ সুর শোনা যায়। সান্ন্যাল মহাশয় ও অনসূয়ার দাম্পত্য সম্পর্কের মূল বন্ধনটি ধরা যায় না—তাঁহাদের কথাবার্তায় জীবনঘনিষ্ঠতার পরিবর্তে পুঁথি-এবং-প্রথানির্ভর, নিরুত্তাপ সাহচর্যের স্পর্শটি অনুভূত হয়। বরং প্রাচীন সামাজিকতার অনুষ্ঠানবহুল, স্মৃতিসুরভিত, রঙ্গীন পরিবেশে ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবের স্বল্পতার কতকটা ক্ষতিপূরণ

হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের নৃপনারায়ণ ও সুমিতির সম্পর্কটি একেবারে শূন্যগর্ভ ও ভিত্তিহীন বলিয়া ঠেকে। রাজনৈতিক সহযোগিতাকে ইহাদের একমাত্র মিলন-প্রেরণা বলিয়া ধরিলেও এই সহযোগিতার চিত্রও অত্যন্ত অস্পষ্ট। উহাদের বিবাহোত্তর মিলনেও আবেগের বাষ্প মাত্রও সঞ্চারিত হয় নাই—মনসার অভিমতই উহাদের আকর্ষণের যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া ধারণা জন্মে। মোট কথা, আধুনিক যুগে প্রেম ও বিবাহের আভিজাত্যগৌরব একেবারে ধূলিসাৎ হইয়াছে—চায়ের বাটিতে চুমুক দেওয়ার মত প্রণয়ের মদির আস্বাদনও একেবারে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়াছে। এই জমিদার-পরিবারে একমাত্র রূপনারায়ণই কৈশোর কৌতূহলের ঝিলিমিলি আলোকে কথঞ্চিৎ দীপ্ত—মনে হয় যে, বিলাত হইতে ফিরিলে সেও ধূসর অপরিচয়ের মধ্যে বিলীন হইবে।

উপন্যাসের যে তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করা হইল, উহাদের মধ্যে সম্পর্কসূত্রটি অসংলগ্ন ও আকস্মিক। সব খণ্ডগুলি মিলিয়া এক অখণ্ড জীবনের স্তরবিন্যস্ত ছবি ফুটিয়া উঠে না। মনে হয় যে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ঘটনাস্রোতে ভাসমান। যে পরিণত শিল্পবোধ অংশের মধ্যে সমগ্রের দ্যোতনা আনে তাহা এখানে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। তথাপি লেখকের জীবনচিত্রণ ও গভীরতাৎপর্যবাহী মন্তব্য-সমাবেশ সমুন্নত মনীষার নিদর্শন বহন করে। এই উপন্যাসে আমরা এমন এক শ্রেণীর নর-নারীর পরিচয় পাইলাম যাহারা সচরাচর উপন্যাসের বিষয়ীভূত হয় নাই। মাটির কাছাকাছি যে মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন কাব্যে তাহাদের দর্শন এ যাবৎ না মিলিলেও এই উপন্যাসে যে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে এই ধারণা অযৌক্তিক নহে। আদিম, আপনাকে-না-জানা মানুষের অন্তরের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত না করিয়াই লেখক জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে দৌত্যকার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার মৌলিকতার কৃতিত্ব।

বিমল করের 'দেওয়াল' (দুই খণ্ড), (মে, ১৯৫৬; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮) আধুনিক যুগের গার্হস্থ্য জীবনছন্দ কেমন করিয়া যুদ্ধ, বোমার আতংক, জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতি ও অর্থনীতিপ্রসূত কারণের দ্বারা গভীরভাবে বিচলিত হইয়াছে তাহারই তথ্যসমৃদ্ধ, অত্যন্ত খুঁটিয়া-দেখা বিবরণ। প্রথম খণ্ডে অর্থনৈতিক বিপর্যয়-কবলিত দরিদ্র পরিবারের সংসারযাত্রানির্বাহের দুর্বহতা প্রধানভাবে বর্ণিত। পল্লীগ্রাম হইতে অধিকতর সচ্ছলতার আকর্ষণে কলিকাতায় আগত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গকে সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। মা রত্নময়ী, জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধা, পুত্র বাসু ও পালিত কন্যা আরতি—এই চারিজনে মিলিয়া সংসার। রত্নময়ীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুধাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অফিসে চাকরি লইতে হইয়াছে। বাসু আড্ডাবাজ ছেলেতে পরিণত হইয়া তাহার দায়িত্বহীন ও বে-পরোয়া আচরণে সংসারে অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছোট মেয়ে আরতি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া সংসারকার্যে মাতার সহায়তা করে। এই সংসারটি আর পাঁচটা সংসারের মত অভ্যস্ত জীবনধারারই অনুবর্তন করিয়াছে। রত্নময়ী সুধার প্রতি ঠিক প্রসন্ন নহেন ও তাহার উপার্জনে

জীবনধারণ করিতে গ্লানি অনুভব করেন। সুধা নিজ বঞ্চিত জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্য ক্ষোভ ও বিরাগের বারুদে-ভরা ও বিস্ফোরণোন্মুখ—মায়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। বাসু উদ্ধত, দুর্বিনীত, পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন ও আত্মসুখপরায়ণ—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া ও সমাজবিরোধী আচরণে লিপ্ত থাকাই তাহার একমাত্র কাজ। আরতির চরিত্র এখনও অপরিস্ফুট—সে সংসারযন্ত্রের একটি আজ্ঞাবহ ও কর্তব্যনিষ্ঠ অঙ্গ। প্রথম খণ্ডে এই ছোট পরিবারের অন্তর্বিক্ষোভের চিত্রটিই প্রধানরূপে অঙ্কিত। নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে সুধার সঙ্গে অফিসের সহকর্মী সুচারুর মৃদু প্রণয়সঞ্চার ও সুচারুর যুদ্ধবিভাগে যোগ দেওয়ার জন্য সুধার মনে এই সম্পর্কের একটা করুণ, অস্বস্তিকর স্মৃতিরোমন্থন। সুধা ও সুচারুর প্রণয়সঞ্চারের দৃশ্যটি অত্যন্ত সংযম ও সুরুচির সহিত, অত্যন্ত ফিকে রং-এ আঁকা হইয়াছে। বাসুর সহিত তাহার স্বগ্রামবাসী, অবস্থাপন্ন মোহিতবাবুর বিধবা কন্যা মীনাক্ষীর যৌন কামনার উদ্দীপন উপন্যাসের উদ্দেশ্যের দিক হইতে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। ইহাতে বাসুর চরিত্রে বিশেষ কোন অর্থপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই—তাহার জীবনের ভারকেন্দ্র বন্ধুসাহচর্য হইতে স্খলিত হইয়া নারীলালসার অক্ষরেখাসংলগ্ন হয় নাই। মোটামুটি সংসাররথটি, অনেক হোঁচট খাইয়া, অসম বন্ধুর পথের অনেক টাল সামলাইয়া প্রত্যাশিত পথেই অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক নূতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা হইয়াছে। নীচের ঘরগুলিতে গিরিজাপতিবাবু ও তাঁহার ভাইপো ও ভাইঝি—নিখিল ও উমা—ভাড়াটেরূপে আসিয়া সুধাদের পরিবারের সঙ্গে অনেকটা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন। গিরিজাপতিবাবু একজন চিন্তাশীল ও ভাবুক লেখক—তাঁহার মুখে আগস্ট-আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সহিত অহিংস গান্ধীবাদের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্ম ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সমালোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ লেখকের মনীষার পরিচয়বাহী কিন্তু ঔপন্যাসিক ঘটনাধারার সহিত নিঃসম্পর্ক নিখিল ও উমার চরিত্র সাধারণ ছাঁচে-ঢালা, বৈশিষ্ট্যহীন। উপন্যাসে তাহাদের চরিত্রের যে অংশটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিখিলের বোমা-বিভীষিকা ও উমার সংসার-পরিচালনা ও বাসুর প্রতি একটু আকর্ষণের অনুভব। অবশ্য বোমা পড়ার আতংক একটা সাময়িক আপদ মাত্র, তাহাতে চরিত্রের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং বোমা পড়ার কালে বিভিন্ন চরিত্রের যে মানস প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় মিলে কি না সন্দেহ। অন্ততঃ উপন্যাসের মধ্যে সেরূপ কোন ইঙ্গিত অনুপস্থিত। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও বোমাপতনে জীবনবিপর্যয়ের বর্ণনা লেখকের ভয়াবহ ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে এই বর্ণাঢ্য ও আবেগময় বর্ণনাশক্তির বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় খণ্ডে নূতন পরিণতি ঘটিয়াছে সুধার চাকরি-পরিস্থিতিতে নীতিভ্রষ্টতার ইঙ্গিতে, মায়ের সহিত তাহার প্রকাশ্য সংঘর্ষে ও আরতির প্রকৃত-পরিচয়-উদ্ঘাটনের বেদনাময় অস্থিরতায়। সুধা প্রলোভনের প্রথম পিচ্ছিল সোপানে পদক্ষেপ করিয়াছে, রত্নময়ীর সহিষ্ণুতা নিঃশেষিত-প্রায় হইয়াছে ও আরতি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়া তাহার কিশোর মনে

প্রথম কর্তব্যবিমূঢ়তা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সূত্রগুলি কোন্ জটপাকানো পরিণতিতে পৌঁছিবে তাহা বুঝা যায় না। 'ছোট ঘর' ও 'ছোট মন' কেমন করিয়া 'খোলা জানালা'র মুক্তিসমন্বয়ে পৌঁছিবে তাহা অনিশ্চিত অনুমানের পর্যায়েই রহিয়াছে।

মল্লিকা (মহালয়া, ১৩৬৭)—একটা ছোট শহরের সমাজপ্রতিবেশের পটভূমিকায় এক শীর্ণ সঙ্কুচিত, দ্বিধাদ্বন্দ্বক্লিষ্ট প্রেমের অর্ধ-উন্মেষিত জীবন-ইতিহাস। একটা ধূসর অনিশ্চিয়তা এই প্রেমের বক্তিমাভাকে গ্রাস করিয়াছে। এক অনির্দেশ্য ও অনতিক্রমণীয় বাধা প্রেমিক প্রেমিকার মিলনাকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়াছে। প্রতিবেশবর্ণনায় লেখকের কুশলতা আছে, কিন্তু যে দুইটি মানবাত্মা এই প্রতিবেশকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের হৃদয়রহস্য অব্যক্তই রহিয়া গিয়াছে। বরং মল্লিকা অনেকটা দ্বিধা কাটাইয়া অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক কখনই মন স্থির করিতে পারে নাই। মনে হয় বর্তমানযুগে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ যে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের পথে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে এই উপন্যাসে তাহারই প্রতীকী সত্তা চিরগোধূলিচ্ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'বন পলাশির পদাবলী'তে (জুন, ১৯৬২)—সাম্প্রতিক পল্লীজীবনের একটি নূতন রূপরেখা ও অন্তরস্পন্দন মনকে দোলা দেয়। ইহা নিছক বস্তুবর্ণনা বা ঘটনাবিবৃতি নয়, বা আদর্শায়িত ভাবচিত্রও নয়, অথচ উভয় উপাদানেরই সংমিশ্রণে গঠিত। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'এ পল্লীর যে হীন কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা, দলাদলির প্রাদুর্ভাব ও সামাজিক উৎপীড়নের মসীময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সাম্প্রতিক কালে তাহার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। এখন গ্রামাঞ্চলের প্রধান প্রবণতা হইল নিরুৎসাহ, ঔদাসীন্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করার ঝোঁক। সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা হয়ত নূতন নূতন জনকল্যাণপ্রতিষ্ঠানের প্রেরণা যোগাইতেছে, কিন্তু গ্রামবাসীর নিষ্প্রাণ রিক্ততার মধ্যে কোন নূতন শুভ সংকল্পের বীজ বপন করে নাই। দীর্ঘকাল প্রবাসযাপনের পর কোন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়া গ্রামে ফিরিলে সে গ্রামের সহিত কোন আত্মীয়তাবোধ অনুভব করে না, গ্রামের জীবনপ্রবাহের সহিত সে মিশিয়া যাইতে পারে না। ইহারই মধ্যে গ্রাম নিজ ক্ষুদ্র কাজ, নিজ তুচ্ছ কলহ-বিবাদ, নিজ স্বল্পধূমায়িত ক্ষোভ অসন্তোষ লইয়া নিরানন্দ-ভাবে আপন অভ্যস্ত গতিপথে চলিতে থাকে। গ্রাম-সমাজের অন্তরের আগুন নিবিয়া গিয়া অঙ্গাররাশি যেন স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

এই বৈচিত্র্যহীন জীবনাবর্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত হয়, একটু বিরলবর্ণ রোমান্সের লীলা অভিনীত হয়, কোথাও বা একটু অখ্যাত, অ-নাটকীয় ত্যাগ-মহিমা নীরবে এই ধূসর পরিবেশকে কল্পলোকের বর্ণবৈভবে রঙীন করিয়া তোলে। এই ক্ষণিক আলোকরেখা ইতিহাসের পাতায় বা গ্রামবাসীর মূঢ় চেতনায় কোন চিহ্ন না রাখিয়াই অন্ধকারের বুকে মুখ লুকায়। কিন্তু এই ক্ষণদীপ্তির মধ্যেই অতীত গৌরবের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা পুনর্বার ঝলকিত হইয়া উঠে ও গ্রাম্য জীবনের রূঢ় প্রয়াসের কর্কশ কোলাহল অকস্মাৎ পদাবলীসঙ্গীতের মাধুর্যে ও সুরময়তায় আবেগের ঊর্ধ্বসীমা স্পর্শ করে।

তাই বন পলাশির অন্তর হইতে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গীতমূর্ছনা পদাবলী-সাহিত্যের দিব্য সঙ্গীতের ঐকতানে সুর মিলাইয়াছে।

বন পলাশির সবই রুক্ষ, শ্রীহীন, গন্ধময়, প্রাত্যহিকতার কাঁটাঝোপকণ্টকিত। গ্রামের লোকগুলির মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা স্বভাব-মহান কোন পর্যায়ের মানুষই নাই। সবাই অর্থ-কৌলীন্যের নিকট বদ্ধাঞ্জলি ও দরিদ্রের প্রতি উদাসীন। গ্রামে সৎ প্রতিষ্ঠান সকলেই চাহে, তবে তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। এই ধূসর মধ্যবিত্ততার মধ্যে যে কয়েকটি ব্যতিক্রমস্থানীয় চরিত্র আছে, তাহারাই বনপলাশির জীবনে স্বাতন্ত্র্য আনিয়াছে ও উহার ইতিহাস-রচনার প্রেরণা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধা অট্টামা। সে গ্রামের পূর্ব গৌরবের স্মৃতিবাহিনী ও নিজেও অতীতের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তাহার অনুভূতিতে বন-পলাশির প্রাচীন গৌরব-গাথার অস্তমিত মহিমার অন্তিম কনককিরণ চিরসঞ্চিত আছে। সে প্রথম যৌবনে ধর্মের জন্য, কুলমর্যাদার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়াছে। সময় সময় তাহার মনে হয় যে, একটা মিথ্যা সম্ভ্রমের সে অত্যধিক মূল্য দিয়াছে ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী স্বামীর জন্য তাহার চিত্ত মাঝে মধ্যে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু আদর্শকে আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিলে তাহার ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী সান্ত্বনা ও চিত্তপ্রসন্নতা জীবনকে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, অভাব-অপচয় বোধের উর্ধ্বে একটি অক্ষয় আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই আনন্দবিন্দু অট্টামার প্রতিটি দন্তহীন হাসি, শতজীর্ণ কন্থা ও দারিদ্র্যের সর্বাঙ্গব্যাপী আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া অবিরল ধারায় ক্ষরিত হইয়াছে। সে অপরের আনন্দে নিজে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, জীবন-বঞ্চনা তাহার মনে কোন তিক্ততার স্বাদ রাখিয়া যায় নাই ও সে গ্রাম-জীবনের সমস্ত হাসি-কান্না, সমস্ত বৈষম্য-অসঙ্গতির সহিত এক আশ্চর্য একাত্মতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার সমস্ত সংলাপের মধ্যে যে প্রবাদ-বাক্যের অবিরল ও সুসঙ্গত প্রাচুর্য স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় বহিয়া গিয়াছে তাহাই তাহার অতীত গ্রাম-সমাজের আনন্দরসশোষণের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এই প্রবাদবাক্যগুলি যেন জীবন-অভিজ্ঞতার ইক্ষুদণ্ডচর্বনের গাঢ় রসনির্যাস, জীবন-তাৎপর্যের অর্থগূঢ় ভাষ্য। অট্টামা একটি স্মরণীয় প্রতীকধর্মী চরিত্র।

বংশী ও গোঁসাইদিদি বৈষ্ণবভাবাদর্শের প্রভাব পল্লীজীবনে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া মানুষের আচার-আচরণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত ও জাতিভেদপ্রথার দ্বারা কঠোরভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম যে মুক্তি ও আনন্দময় জীবন-উপলব্ধির প্রেরণা জাগাইয়াছিল ইহাদের চরিত্রে তাহাই উদাহৃত হইয়াছে। বংশীর কীর্তনানুরাগ ও গানরচনার শক্তি আধুনিক যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনীতি-যুদ্ধের নব মাদকতায় শ্লেষের তীক্ষ্ণতা অর্জন করিয়াছে। আর গোঁসাইদিদি ক্রমশঃ যুগের আনুকূল্য-বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে নীরব বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

অবিনাশ ডাক্তার তিক্ত অভিজ্ঞতায় জীবনের সুস্থ স্বাদ হারাইয়াছে। যুদ্ধে তাহার পায়ের সঙ্গে তাহার মানস ভারসাম্যও কাটা পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে কিছুটা আশাবাদ ও গঠনমূলক সংকল্প সজীব আছে। নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন গ্রাম্য সমাজে সে এখনও ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশা পোষণ করে। কিন্তু সে বাহির হইতে আগন্তুক ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের বলিয়া বনপলাশির সমাজে তাহার কোন নেতৃত্বপ্রভাব নাই। পদ্মর

সহিত তাহার সম্পর্কও ভাবাত্মক নয়, অভাবাত্মক, গ্রামসমাজের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত প্রতিবাদ, নিজ অন্তরের অনুরাগ-প্রসূত নয়।

উদাস ও পদ্ম খানিকটা গ্রামজীবনের অনুবর্তী, খানিকটা বিদ্রোহী। পদ্মর বিশেষ কোন ব্যক্তিত্ব নাই। তবে উদাস তাহার অভিনয়নিপুণতায়, তাহার যান্ত্রিক বৃত্তি অবলম্বনের আগ্রহে, উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে তাহার অনুচ্চারিত ক্ষোভে ও শেষ পর্যন্ত নিজ প্রবল ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে পদ্মর বিমুখতা-জয়ে সে পল্লীজীবনের নির্দিষ্ট মাপকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মোটরচালকরূপে সে যে গিরিজাপ্রসাদকে কিঞ্চিৎ বিশেষ সুবিধা দিয়া তাহার পূর্বকৃত ঋণশোধে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে ইহা তাহার চারিত্রিক মনস্তত্ত্বের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্যনির্দেশ।

কিন্তু মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম দীপ জলিয়াছে সর্বাপেক্ষা অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যহীন একটি অন্তঃপুরিকার অন্তর-লোকে। মোহনপুরের বৌএর নাম পর্যন্ত উপন্যাসে অনুক্ত—গৃহিণী-পরিচয়ে তাহার ব্যক্তিপরিচয় সম্পূর্ণভাবে আবৃত। সাধারণ গৃহিণীর একঘেয়ে কর্তব্যপালনে তাহার জীবন গুরুভারগ্রস্ত—মনে হইয়াছিল যেন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এখানে সম্ভব হইবে না। তাহার ভাসুর-জা-এর সহিত সম্পর্কে, তাহার মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধের বিষয়ে সতর্ক গোপনীয়তায় ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে সে যেন আমাদের সহস্র সহস্র গৃহলক্ষ্মীর বিশেষত্বহীন প্রতিনিধি। তাহারই মৃৎপ্রদীপে হঠাৎ দিব্য আরতির শিখা জলিয়া উঠিল। সে ভাসুরঝি বিমলার সহিত প্রভাকরের পূর্বরাগ নারীচিত্তের সহজ, অথচ অভ্রান্ত সংস্কারবশে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সে অসাধ্য সাধন করিল, টিয়ার জন্য নির্বাচিত পাত্রটি, সমস্ত অলঙ্কার ও পণের টাকা'র সহিত, বিমলার হাতে তুলিয়া দিল। হয়ত মেয়ে যে এ বিবাহে সুখী হইবে না এই অশুভ পূর্বজ্ঞান তাহার এই সংকল্পের মূলে কাজ করিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতেও তাহার কাজের প্রায় অমানুষিক দীপ্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না। আর এই চরম আত্মবিসর্জনের মধ্যে কোন নাটকীয় অত্যুক্তি বা ভাববিলাস নাই—সংসারের আর পাঁচটা কাজের মত এই কাজও কোন আত্মঘোষণা বিনা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাই ঔপন্যাসিকের চরম কৃতিত্ব—এই অসাধারণ আত্মোৎসর্গের সঙ্গীত আধুনিক সমাজপ্রতিবেশে বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত সুরসাম্যে মিলিত হইয়াছে।

গিরিজাপ্রসাদের গ্রামত্যাগের বর্ণনার মধ্যে এক বিষাদের সুরে, এক ভাবগত অসামঞ্জস্যের বেদনায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের প্রবাসী সন্তানের সম্পর্কের অনিশ্চয়তা পাঠকের চিত্তকে প্রশ্নমথিত করিয়া রাখে।

(৬)

সাম্প্রতিককালে বাংলা উপন্যাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে, যাহাকে আঞ্চলিক বা বৃত্তিজীবনমূলক আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত, সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ও ধর্মবিশ্বাসসংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোন বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবীগোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন। আঞ্চলিক সাহিত্যে সংজ্ঞানির্দেশ কিছুটা দুরূহ। প্রতিবেশ সাধারণতঃ সকল মানুষের উপরই

প্রভাবশীল; মানবজীবনলীলার স্বাধীন ছন্দও উহার নিগূঢ়, কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করে। এই জাতীয় সাধারণ-প্রতিবেশ-প্রভাবচিহ্নিত মানবজীবন, কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে। বাঙলাদেশে রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের জীবনকাহিনীতে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ও সমাজরীতিমূলক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিলেও ইহারা এক অখণ্ড বাঙালী সংস্কৃতির অংশ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণও অধিকতর পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া, এই বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও উগ্রভাবে প্রকট; আধুনিক যুগের সমতাবিধানকারী প্রভাব উহাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে অনেকাংশে প্রতিহত করিয়াছে। যে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কবলিত, যেখানে আদিমযুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার, সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার নির্মম-ভাবে কণ্ঠরোধ করিয়াছে, যেখানে ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসনই মানব-প্রকৃতির স্বরূপনির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এ আমরা আঞ্চলিক জীবনযাত্রার কিছুটা আভাস পাই, কিন্তু এই দুইটি উপন্যাসে নানাস্থানের অধিবাসী তাহাদের নিজস্ব জীবনবোধ লইয়া ঘটনায় অংশগ্রহণ করিয়াছে ও নিজ নিজ চরিত্রের ছাপ রাখিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না।

বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনকাহিনী কিছুদিন পূর্বে হইতেই বাংলা উপন্যাসে রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসতি' এই বৃত্তিজীবনের ঘটনাবহুল বিপদ্‌সংকুল ইতিহাস। বিশেষতঃ মৎস্য-জীবীদের মাছধরার রোমাঞ্চকর, নদীতরঙ্গের আবর্তসংকুল, অতর্কিত মরণের ফাঁদ-পাতা, ক্রূর শক্তির সহিত নিয়তসংগ্রামশীল অভিযানই ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর কৌতূহলপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের The Old Man and the Sea সমুদ্রে মৎস্য-শিকারের অভিযানের মধ্যে নিয়তিনির্যাতিত মানবাত্মার অদম্য সংকল্প ও পরাজয়ের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ গৌরববোধের রূপক পরিস্ফুট করিয়াছে। বিশাল, ঝটিকাতাড়িত সমুদ্র মানুষের নিকট যে শক্তি পরীক্ষার স্পর্ধিত আহ্বান পাঠাইয়াছে, মানুষ তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্য কিন্তু দুর্জয় মনোবল লইয়া তাহারই যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছে। উপন্যাসটির উৎকর্ষ এই অসম সংগ্রামে মানব-মহিমার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'—উপন্যাস পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবিকান্বেষণরত মানুষের সংগ্রামের দিকটাকে গৌণ স্থান দিয়া তাহার গতিবিধির ত্বরিত অনিয়মিত ছন্দ ও ঘরোয়া জীবনের ছোটখাট দ্বন্দ্ব-অতৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। ইহা ততটা নদীতে মাছমারার কাহিনী নহে যতটা নদী হইতে গৃহপ্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয়সমস্যার অশান্ত আন্দো-লনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ। পদ্মা উহার তীরের অধিবাসীদের রক্তধারায় কিছুটা অস্থির যাযা-বরত্বের প্রেরণা আনিয়াছে, ঘরের মায়া কাটাইয়া নিরুদ্দেশযাত্রায় তাহাদের প্রবৃত্তি দিয়াছে। আর হোসেনমিঞার কুতুবদিয়া দ্বীপ উহার সমস্ত কল্পিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অজ্ঞাত বিভীষিকা লইয়া চুম্বকের প্রচণ্ড শক্তিতে ঘড়ছাড়া, সমাজবন্ধনোৎক্ষিপ্ত মানবকণাগুলিকে উহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। নদী এখানে তাহার বাস্তব সত্তার ঊর্ধ্বস্থিত একটি অর্ধরূপক-সত্তায়

অধিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহার প্রভাব মানুষের গার্হস্থ্যজীবনের স্থাবরত্ব বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়াছে ও অনির্দেশ্য যাত্রাপথের ইঙ্গিত দিয়াছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) জীবনবৃত্তিনির্ভর উপন্যাসের চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইহাতে লেখক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে একটি অখ্যাত নদীর তীরে বাস-করা জেলে-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ-উৎসব ও রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভেই তিতাস নদীর সমৃদ্ধ রূপ ও উহার আশ্রিত মৎস্যজীবীদের নিশ্চিন্ত জীবিকা-প্রাচুর্য বিজয় নামে আর একটি প্রতিবেশী জলহীন নদীর তীরস্থিত ধীবরদের উৎকণ্ঠা ও দুরবস্থার সহিত তুলনায় দেখান হইয়াছে। নদীর এই বিবরণে লেখকের কবিত্বময় বর্ণনাশক্তি ও মনোৎকর্ষের পরিচয় মিলে। শুধু জেলেদের জীবন নহে, তাহাদের প্রতিবেশী কৃষিজীবীদেরও জীবন-যাত্রা ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবও উপন্যাসের সমাজচিত্রটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে।

জেলেদের চৌয়ারি-ভাসানর উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া সাত বছরের মেয়ে বাসন্তীর প্রতি অনুরাগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মালো তরুণ—কিশোর ও সুবল—রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। উপন্যাসের প্রথম অংশে তাহাদের মৎস্যাভিযানে দূর প্রবাসে নৌযাত্রার মনোজ্ঞ বর্ণনা পাই। নৌকায় যাইতে যাইতে বড় নদীতে প্রবেশ, জনাকীর্ণ বন্দরের কর্মব্যস্ততা, দুইধারের অরূপণ প্রকৃতিসৌন্দর্য, পারের স্বজাতীয়দের আগ্রহপূর্ণ আতিথেয়তা ও ধর্মসাধনসংযুক্ত গান-বাজনার নিবিড় আনন্দ, বড় জেলে-মহাজনের আশ্রয়লাভ ও নদী হইতে প্রচুর মৎস্যপ্রাপ্তি, শুকদেবপুরে অন্তর-বাহিরে ফাগ-রাঙানো দোল-উৎসব, দুই পার্শ্ববর্তী গ্রামের জেলেদের মধ্যে অকস্মাৎ দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এ সমস্তই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যেমন চিত্রসৌন্দর্য তেমনি জেলে-সমাজের রীতি-নীতিও মৃদু, কিন্তু অকৃত্রিম হৃদয়াবেগেরও পরিচয় আছে। এই দোল-উৎসবের মন-মাতান, আবেগ-রক্ত, লাজ-ভাঙ্গান পরিবেশেই কিশোর তাহার প্রথম প্রিয়াকে লাভ করিয়াছে ও সেখানকার মালো-সম্প্রদায় তাহাদের এই গান্ধর্ব মিলনকে সমাজস্বীকৃতি দিয়া উহাদিগকে কিশোরের পিতৃগ্রামে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছে। গ্রামে পৌঁছিবার ঠিক পূর্বেই ডাকাতেরা তাহার নববিবাহিতা কিশোরী স্ত্রী ও সঞ্চিত অর্থ দুইই অপহরণ করিয়া কিশোরের সুখের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। এই নিদারুণ আঘাতে কিশোর উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাকাল প্রথম খণ্ডের চারি বৎসর পরে। ইতিমধ্যে মালোদের বসতিগ্রামে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাগল কিশোর তাহার পিতা-মাতার সংসারকে ছন্নছাড়া করিয়াছে—বুড়া-বুড়ীর জীবনে সুখশান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। সুবল বাসন্তীকে বিবাহ করার পর এক নৌকা-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। কিশোরের নব-পরিণীতা ও দস্যু-অপহৃতা বধূ পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জেলে-পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে ও তাহার বালক পুত্র অনন্তকে সঙ্গে লইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতারূপে তাহার শ্বশুরের গ্রামে নূতন বাসা বাঁধিয়াছে। এই দুই দুর্ভাগিনী নারী তাহাদের আপন নাম হারাইয়া অনন্তর মা ও সুবলের বউ এই পরোক্ষ পরিচয়ে গ্রাম্য সমাজে স্থান পাইয়াছে।

এই অংশে উপন্যাসের কাহিনী অনন্তর মার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রয়াস, সুবলের বউএর সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা ও অনন্তর শৈশব-কৌতুহলের ক্রমপ্রসার, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার কল্পনা-মনন-মিশ্র অনুভবের স্ফুরণকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্বখণ্ডের সঙ্গে কেবল স্থানগত ঐক্য ছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডের বিশেষ কোন যোগ নাই। অনন্তর মার জীবিকার্জনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া মালোসম্প্রদায়ের গ্রামসমাজের ও বিশিষ্ট জীবনচর্যার সুন্দর পরিচয় মিলে। জাতির আচরণের বিচারের জন্য আহূত মাতব্বরের মজলিশ ও সেখানে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের সিদ্ধান্ত মালোদের সমাজ-শাসনপ্রণালীর উপর কৌতুহলোদ্দীপক আলোকপাত করে। সন্তান-জন্ম ও বিবাহের উৎসব, কালীপূজার বারোয়ারী আয়োজন, উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পিঠাপার্বণের আতিথেয়তা —এ সমস্তের মধ্য দিয়া নবাগতা অনন্তর মা গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া পড়িল। তাহার পাগল স্বামীকে ঠিক চিনিতে না পারিলেও অনন্তর মা তাহার প্রতি একটা বেদনাময় আকর্ষণ অনুভব করিল ও লোকলজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া স্নেহময় সেবা-পরিচর্যার দ্বারা তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার সাধনায় সে রত হইল। অনন্তর মা-এর প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যের জন্য বাসন্তীর বাপমায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটিল ও পিতামাতার আপত্তিসত্ত্বেও সখীকে সাহায্য করিবার অকুণ্ঠিত ইচ্ছা-প্রকাশের মধ্যে তাহার দৃঢ়চিত্ততা ও বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া গেল। দোল-উৎসবের দিন পাগল কিশোরকে কুমকুমে রাঙাইয়া তাহার প্রথম প্রেমের স্মৃতি-উদ্বোধনের জন্য তাহার স্ত্রী বিশেষ যত্নশীল হইল। সেইদিন পাগলের স্মৃতিপথ বাহিয়া এক অতীত দোলের দিনে দাঙ্গায় তাহার স্ত্রীর মূর্ছার কথা অসংলগ্নভাবে তাহার মনে উদিত হইল ও সেই স্মৃতিবিকারজাত আদরের আতিশয্যে সে তাহার স্ত্রীকেও গুরুতর জখম করিল ও নিজেও প্রতিবেশীদের হাতে দারুণ মার খাইল। এই দুঃখময় পরিস্থিতিতে উভয়েরই প্রায় একসঙ্গেই জীবনাবসান ঘটিল ও এই ভাগ্যহত দাম্পত্য সম্পর্কের উপর অন্তিম যবনিকা নামিয়া আসিল।

তৃতীয় খণ্ডে অনাথ বালক অনন্তের নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নূতন চাষী ও জেলে-চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে। আমিনপুরের চাষী কাদির, জেলে বনমালী, বনমালীর ভগ্নী উদয়তারা আর পূর্বপরিচিতা সুবলের বউ—ইহারাই এখন ঘটনার অগ্রগতিকে পরিচালনা করিয়াছে। অনন্তের মাতৃশ্রাদ্ধ সুবলের বউ-এর যত্নেই হইয়াছে ও পিতামাতার প্রবল বিরোধিতাসত্ত্বেও সেই মাসীরূপে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু একদিন পারিবারিক কোন্দলে তিক্ত বিরক্ত হইয়া সে কঠোর ভর্ৎসনাপূর্বক অনন্তকে তাড়াইয়া দিয়াছে ও অনন্ত উদয়তারার সঙ্গে তাহার পিত্রালয়ে গিয়া বনমালীর পরিবারভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রামের আনন্দময় পরিবেশ ও জীবনযাত্রাবর্ণনায় লেখক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বনমালীর গ্রামের এক বুড়া বৈষ্ণব প্রভাতী গান গাহিতে গাহিতে বৈষ্ণবোচিত বাৎসল্যরসে বিভোর হইয়া অনন্তকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে ও তাহার মধ্যে যশোদাদুলাল ও শচীনন্দনের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছে। এখানে সমস্ত শ্রাবণ মাস ধরিয়া মনসার গান ও পদ্মা-পুরাণ-পাঠ, বেহুলার চির-এয়োতির স্মারক চিহ্নরূপে মেয়েতে মেয়েতে অভিনব বিবাহ-অনুষ্ঠান ও উহার আনুষঙ্গিক হাসি-খুশি, ঠাট্টা-পরিহাস, অনন্তের সঙ্গে

অভিন্ননামধারিণী অনন্তবালার প্রণয়াভাস-সরস পরিচয়, কাদিরের ছেলে ছাদিরের অদ্ভুত খেয়ালে নৌকা-প্রতিযোগিতায় যোগদান, রমুর শৈশব সাধ-আহ্লাদ, বাইচ নৌকার আরোহীদের বাউল-ভাটিয়ালি-সারী গানে উৎসারিত হৃদয়োচ্ছ্বাস—এই সমস্ত মিলিয়া পল্লীজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম আনন্দময়তার কি অপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়াছে! ইতিমধ্যে নৌকার বাইচখেলার উপলক্ষ্যে অনন্ত ও তাহার মাসীর আবার দেখা হইয়াছে ও বাসন্তীর প্রতিহত স্নেহ হিংস্র আক্রমণে রূপান্তরিত হইয়াছে। সে অনন্তকে বেদম মারিয়াছে ও অনন্তের বর্তমান রক্ষকদের কাছেও সাংঘাতিক মার খাইয়াছে। এই অংশে অনন্তের কল্পনাপ্রবণ চিত্তের ও মননশীল জীবনবোধের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়—হঠাৎ আকাশে-ওঠা রামধনু তাহার কিশোর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ও বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডে তাহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে পাঠান হইয়াছে ও এই নূতন পারবেশে ও দেশসেবার নবজাগ্রত উৎসাহে তাহার কিশোর-কল্পনার পরিণতি অবরুদ্ধ হইয়াছে। অনন্তবালা তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিযাছে কিন্তু সমাজকল্যাণব্রতী অনন্ত আর তাহার বাল্যজীবন-প্রতিবেশে ফিরিয়া যায় নাই।

চতুর্থ খণ্ডই সমাজচিত্র হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে আমরা মালো-সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আধুনিক চটুল ও বর্ণসংকর রুচি-আমোদের প্রভাবে উহার বিপর্যয় ও বিলুপ্তির একটি গভীর জীবনবোধসমৃদ্ধ পরিচয় পাই। প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, সুরের উন্নত রুচি ও অন্তরের গভীরে ক্রিযাশীল বিশুদ্ধ আবেগের যে সমন্বিত রূপ দেখি তাহা নিম্নবর্ণ, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবনীয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি যে সমাজের নিম্নতম স্তর পযন্ত উহার আবেদন সঞ্চারিত করিয়া সর্বসাধারণকে রুচি ও অনুভূতির এক মহিমান্বিত পর্যায়ে উন্নত করিয়াছিল ইহা উহার অসাধারণ প্রাণশক্তি ও চিত্তরঞ্জিনী প্রেরণার নিদর্শন। সুলভ চটকদার আধুনিকতার মোহে এই অমূল্য উত্তরাধিকারের অবলুপ্তি বাঙলা সমাজ-বিপর্যয়ের একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। লেখক আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই সংস্কৃতিলোপের সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখাইযাছেন। এই সংস্কৃতি-হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংহতি, সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, জীবনের মর্যাদাবোধ ও বাঁচিবার ইচ্ছা সবই একে একে বিলুপ্ত হইযাছে। ইহার সঙ্গে নদীতে চর পড়িয়া অনুকূল ভৌগোলিক প্রতিবেশের পরিবর্তন তাহাদের অর্থনৈতিক সর্বনাশকে আরও নিদারুণ ও প্রতিকারহীন করিয়াছে। গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে মন এক গভীর বেদনা-করুণ অনুভূতিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় ও আমাদের ধ্বংক্ষয়ের সার্বিকতায় অসহায়তা অনুভব করে। গীতার মহতী উক্তি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—আমাদের নিকট এক নূতন তাৎপর্য-দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

উপরি-উক্ত মন্তব্য-সমর্থিত ঘটনা-অনুসৃতি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নহে। উহার ঘটনাবিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহুস্তরবিভক্ত; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন। উহার ঘটনাপরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একভাবসূত্রগ্রথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে। প্রথম খণ্ডে কিশোর ও সুবল, দ্বিতীয় খণ্ডে উহাদের পত্নীদ্বয়, তৃতীয় খণ্ডে অনন্ত ও

উদয়তারা ও চতুর্থ খণ্ডে মালোসমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কাহিনী পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা গৌণ চরিত্র, বহুবিধ সরস সমাজচিত্র, নদীযাত্রা ও নদীতীরস্থিত গ্রামগুলির বর্ণনা সমস্ত উপন্যাসটিকে প্রাণসমৃদ্ধ ও গতিবেগচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কোন চরিত্রই কেন্দ্রীয়তাৎপর্যবিশিষ্ট নহে; অনন্ত কিছু সময়ের জন্য উপন্যাসের মর্মবাণীদ্যোতক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মিলিত ও সমষ্টিগত জীবনাবেগই উপন্যাসের আসল রসকেন্দ্র। মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ-ধরার বর্ণনা ইহার একটি প্রধান অধ্যায়; কিন্তু নদীপ্রবাহের সহিত উহাদের জীবনধারার সম্পর্ক নিবিড় হইলেও উহা নিছক প্রয়োজনাত্মক। উহাদের জীবনদর্শন নদীর অনন্তগতিশীল ও বিচিত্ররহস্যময় সত্তার নিগূঢ়প্রভাবচিহ্নিত নহে। লেখকের প্রকৃত আকর্ষণ নদীতীরের গ্রামসমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দগ্রথিত জীবনযাত্রায়, সরলবিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধ-শান্ত জীবনস্পৃহায়, ধর্মবিশ্বাসউদ্ভূত, বদ্ধমূল সংস্কৃতিচর্চায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, এই সমষ্টিজীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অকালমৃত্যু বাংলা উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজনাপথ অবরুদ্ধ করার জন্য আমাদের মনে গভীর ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করে।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'য় আমরা পাই মৎস্যজীবীসমাজের অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসে আবিষ্ট, নদী-সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা-টান-আবর্ত প্রভৃতি প্রকট ও গোপন বিপদের সহিত অবিরত সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুরহস্যের সম্মুখীন, জলস্রোত ও মনোস্রোতের বেগবান প্লাবনের মধ্যে অত্যাজ্য সংস্কারে পরিণত জীবননীতির নোঙরে দৃঢ়সংবদ্ধ জীবনের অপূর্ব পরিচয়। প্রবহমান নদী ও রহস্যময় সমুদ্রের মধ্যে যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাহাদের মনে প্রাকৃতিক বিপদ ও অতিপ্রাকৃতের অনুভব যেন একই অভিজ্ঞতার ভিতর ও বাহির দিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। উহাদের আঁকে-বাঁকে, অসীম বারিবিস্তারের বিভ্রান্তিকর নিঃসঙ্গতায়, ঢেউএর ওঠা-নামায়, ঝড়ের দুর্দম ঝাপটে ও আবর্তের অদৃশ্য আকর্ষণে এক কুটিল রহস্যময় শক্তির অতন্দ্র হিংসা, এক মানববোধাতীত মায়াসত্তার সর্বব্যাপ্ত, নিঃশব্দ সুযোগ-প্রতীক্ষা জলবিহারী মানুষের মনে এক আতংক-কুহকের অনুভূতি জাগায়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এক অজ্ঞাত বিভীষিকার আবির্ভাব-প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত করে। Coleridge-র The Ancient Mariner হইতে সমরেশ বসুর গঙ্গা পর্যন্ত জলচর মানুষের একইরূপ মানসপ্রবণতা উদাহৃত। সীমা-অসীমের সঙ্গমে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া সে হয়ত প্রায়ই প্রয়োজনের ঘাটে, কিন্তু অন্ততঃ একবার পথ-ভোলান মায়াবিনীর দুরন্ত আকর্ষণে, সর্বনাশের আঘাটায় গিয়া জাল গুটায়। নিবারণ সাঁইদার সমুদ্ররহস্যের তত্ত্বজ্ঞ, গহীন জলের সমস্ত লুকানো বিপদসংকেতের দিশারী, সুদৃঢ় জীবনদর্শনের বর্মে সুরক্ষিত। কিন্তু সমুদ্রের অপার রহস্য হইতে উৎক্ষিপ্ত একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাহাকে কোন্ অতলের মৃত্যুপুরীতে ভাসাইয়া লইয়া গেল! তাহার সুদীর্ঘ নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতা, তাহার অপ্রাকৃত মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞানের প্রতি অগাধ বিশ্বয় ও তাহার অন্তিম অদৃষ্টের সম্বন্ধে এক মূঢ়

বোবা ভয় তাহার শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে তাহার অনুজ ও ভক্ত শিষ্য পাঁচুর মনের গভীরে সংরক্ষিত থাকিল।

পাঁচু দাদা নিবারণের স্থলাভিষিক্ত জালবাহীদের নূতন নেতা, কিন্তু দাদার মত অদম্য ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড দুঃসাহস ও দূরাভিযানেব আমন্ত্রণস্বীকৃতির মনোবল তাহার নাই। গঙ্গা এবং তাহার কয়েকটি শাখানদীর নির্দিষ্ট কক্ষপথে যাতায়াতই তাহার ভ্রাম্যমাণতাব দূরতম সীমা। কিন্তু এই সংকীর্ণতর গণ্ডীব মধ্যেই সে জেলে-জীবনের সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিপদ্, সমস্ত রহস্যময তত্ত্ব, বদ্ধমূল জীবনদর্শনের একান্ত আশ্রয় ও পরম নিশ্চিন্ততাবোধের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও উপলক্ষ্য আহরণ করিয়াছে। মাছমারার জীবনের অনিশ্চিত ভাগ্যবিপর্যয় ও উহার অনতিক্রম্য নিয়তি—দুই তাহার মনে স্থির সংস্কারের মত ক্রিয়াশীল। তাহার জীবনদর্শন এই উভয় উপাদানের সমন্বয়-গঠিত। সে জানে যে, সে যে নিয়মে মাছ মারে, ঠিক সেই নিয়মেব অনিবার্যতায় মাছও তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। মীনচক্ষুর রৌপ্য-উজ্জ্বল, ভাবলেশহীন, নৈর্ব্যক্তিকতায় স্থির লেখপত্রে তাহার নিজের ভাগ্যলিপি চিরতরে ক্ষোদিত হইয়াছে। তুচ্ছ জীবিকা-অনুসরণের সহিত বিশ্বরহস্যবোধের গভীর সংযোগ, দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে শাশ্বত বিশ্বনীতির সদাজাগ্রত অনুভূতি, স্বেচ্ছাবিহারের মধ্যে পদে পদে অমোঘ নীতি-নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি—এই মৎস্যজীবীর জীবনের উপর এক অস্থিমজ্জাগত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের মহিমা আরোপ করিয়াছে। তাই বাংলার অশিক্ষিত জেলেরা শুধু মাছ মারিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে না, প্রতি দিনরাত্রি নৌকাচালানোর মধ্যে এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রী-শক্তির আকর্ষণ অনুভব করে, শিকারের সঙ্গে শিকারীর মৃত্যুকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধরূপে দেখে, নিজেদের পাতা জালের নীচে নিয়তি-বিকীর্ণ দুশ্ছেদ্যতর জালের সন্ধান পায়, দার্শনিকতার তুঙ্গ শিখরে সমারূঢ় হইযা প্রাত্যহিক জীবনটাকে বিরাটের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে। জাল ফেলিতে ফেলিতে রামপ্রসাদের গানের কলি 'জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে' অনিবার্যভাবে তাহার অন্তরে গুঞ্জিত হইয়া উঠে।

পাঁচুর কেবলমাত্র আধখানা চোখ নিজের লাভের দিকে ও বাকী আধখানা দলপতির বৃহত্তর-কর্তব্য-পালনে নিযুক্ত থাকে ও দ্বিতীয় চোখটি অখণ্ডভাবে তাহার ভাইপো বিলাসের প্রতি নিবিষ্ট থাকে। বিলাস জেলেসমাজে একটি অসাধারণ ব্যতিক্রমরূপে জন্মিয়াছে। জেলেদের সামাজিক রীতি-প্রথার প্রতি তাহার মৌখিক আনুগত্যের অভাব নাই, কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠা নাই। তাহার খুড়ার সঙ্গে তাহার জীবননীতির পার্থক্য এইখানে। তাহার মানস দিগন্ত আরও সুদূরপ্রসারিত, লৌকিক কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাহার পিতার অশান্ত রক্ত তাহার নাড়ীস্পন্দনকে দ্রুততর করে ও সমুদ্রাভিযানের দিকে তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিসত্তাস্ফুরণে। তাহার অন্তর যৌবনরসে টলটল, তাহার মুখে প্রেমপিপাসার অভিব্যক্তি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় জলযাত্রায় অস্থির ছন্দের ও চিত্ররূপকের সহিত আশ্চর্য সঙ্গতিপূর্ণ। তাহার এই উড়ু উড়ু, বাঁধন ছিঁড়িতে সদা-উদ্যত মনোভঙ্গীর জন্য তাহার খুড়ার ভাবনার অন্ত নাই ও শাসনসতর্কতার বিরাম নাই। কিন্তু বিলাসের দুর্দম

ব্যক্তিত্ব ও দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কোন সমষ্টিগত নীতিবন্ধনে সংযত হয় নাই। গঙ্গার আগালি-পাথালি তরঙ্গবেগ তাহার বুকে সংক্রামিত হইয়াছে। পাঁচুর প্রশ্রয়হীন নৈতিক অভিভাবকত্ব তাহার সমস্ত অসংযত, সমাজবিধানলংঘী হৃদয়াবেগকে কঠোরভাবে তিরস্কৃত করিয়াছে ও এই ভৎর্সনা-বাক্যের মধ্য দিয়া তাহার সুসমঞ্জস, আচারনিষ্ঠ জীবননীতির অপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়াছে। সংযমপূত, নীতিনিয়মিত রক্ষণশীলতার উন্নততম রূপ এখানে উদাহৃত।

কিন্তু বিলাস প্রাচীন রক্ষণশীলতার নিয়ম-সংযমকে ছিন্ন করিয়া নিজ অসংস্কৃত হৃদয়াবেগকেই প্রাধান্য দিয়াছে। হিমির সঙ্গে তাহার প্রণয়োন্মেষের কাহিনী চমৎকার পরিবেশ-ও-চরিত্র-অনুযায়ী অভিব্যক্তি পাইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তির মনে প্রেমের আবেগের মন্থর, সংস্কারের বাধাতিসারী সঞ্চার সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে হিমিকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মমর্যাদা ও জাতিসংস্কারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া। তাহার খুড়ার মৃত্যুকালের অনুমোদন এই বিষয়ে তাহাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-গ্রহণে সহায়তা করিয়াছে। এই বলিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কোন সূক্ষ্মতর ভাববিলাস নাই, আছে দেহ-মনের একটা অপ্রতিরোধনীয় যুগ্ম আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত হিমি স্থলচর প্রাণীর জল সম্বন্ধে যে একটা ভীতি আছে, তাহারই প্রভাবে জলচর প্রণয়ীর সান্নিধ্য পরিহার করিয়াছে। বিলাসও তাহার মানবী প্রণয়িনীর হৃদয়রহস্যপরিমাপে হার মানিয়া আরও অতলরহস্যভরা সমুদ্রের আহ্বানকে স্বীকার করিয়াছে। এই দুইটি, প্রয়োজনের আকর্ষণে সম্মিলিত নর-নারী স্বল্পকালস্থায়ী প্রণয়লীলা সূচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত অভ্রান্ত ভাবসঙ্গতির সহিত উহাদের আদিম জীবনবোধের নিখুঁত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবীসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ। লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই বিচিত্র করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জেলেদের জীবনের সহিত তিনি এরূপ গভীরভাবে একাত্ম হইয়াছেন যে, নৌকাচালনাসংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষা, নানারকমের ঢেউএর স্বরূপ ও সংজ্ঞা,—যাহার উল্লেখ ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না,—তাহাও তিনি অবলীলাক্রমে আয়ত্ত ও যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। নদীর বুকের ন্যায় জেলের মনেও নানা গভীর স্তরের ছল্‌কানি, নানা অস্ফুট রহস্যের ঝিকিমিকি, নানা তলশায়ী ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার জড়াজড়ি, নানা আবর্তের হেঁচকা টান। আবার নদীপ্রবাহের মত জেলের চরিত্রেও একটি সরল, একটানা গতি, একটি মৌলিক নীতিনির্ভরতা, একটি বলিষ্ঠ, উদার জীবনবোধও বর্তমান। তাহাদের তীরের জীবন, তাহাদের ফেলিয়া-আসা পুত্র-পরিবার, তাহাদের গৃহের মমতা বন্ধন আকাশের এককোণে একটা ধোঁয়াটে মেঘের মত, তাহাদের মানস দিগন্তে একটুকরা করুণ স্মৃতির ন্যায় সংলগ্ন। তাহাদের নদীবক্ষে অতিবাহিত আসল জীবনের সঙ্গে উহার সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, আকাশের সুদূর নীলিমায় উড়ন্ত ঘুড়ির সঙ্গে বালককরধৃত লাটাই-এর মতো এই বিশেষ-দর্শন-প্রভাবিত জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পূর্বে ঔপন্যাসিক ইহার এ টি প্রতিচ্ছবি সাহিত্য-চিত্রশালায় অক্ষয় করিয়া রাখিলেন।

সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' (সেপ্টেম্বর ১৯৬০) ঘটনাবৈচিত্র্য ও প্রেমাকর্ষণের অসাধারণত্বের দিক দিয়া কিছু মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। উপন্যাসটির কাহিনী মদের চোরাই কারবারীদের বে-আইনী মদ চালান দেওয়ার নানা উপায়কৌশল উদ্ভাবন ও আবগারী বিভাগের সহিত তাহাদের ফাঁকির লড়াই-এর বিচিত্রবিবরণসম্পর্কিত। সুতরাং ইহার মধ্যে খানিকটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের পরিণতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা রোমান্সের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়াছে। সুরাব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রার ছন্দও কিছু পরিমাণে বন্ধুরও উৎকেন্দ্রিক। মনে হয় স্কটের উপন্যাসে আবগারী চোরা কারবারীদের যে দুর্ধর্ষ ও সমাজবিরোধী জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, লেখক বাঙলাদেশে তাহারই একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা মোটামুটি বাঙলার সাধারণ জীবনের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট হইলেও স্থানে স্থানে কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিম অতিরঞ্জনের লক্ষণও দুর্লক্ষ্য নহে।

কিন্তু উপন্যাসের প্রকৃত ভারকেন্দ্র ঘটনাবিন্যাসে নয়, চরিত্রচিত্রণে এবং এইখানেই মনস্তত্ত্বের কিছু অতিরিক্ত ও চেষ্টাকৃত জটিলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। চোরাচালানের সর্দার ব্রাহ্মণ সন্তান চিরঞ্জীব ও উত্তরাধিকারসূত্রে এই ব্যবসায়ের সহিত জড়িত প্রখররসনা বাগদী-তরুণী দুর্গা উভয়ের প্রণয়-সম্পর্কের মধ্যে রং-ফলানোর মাত্রাতিরিক্ততা দৃষ্টি এড়ায় না। চিরঞ্জীবের সংযম-প্রয়াস যেমন অহেতুক তাহার আত্মসমর্পণও তেমনি অনাবশ্যকভাবে সমস্যাকণ্টকিত মনে হয়। প্রেমের জটিলতাকে অস্বীকার করিলে আধুনিক উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ রীতির লঙ্ঘন করা হয় এই পূর্ব-প্রত্যয়বশতঃই যেন লেখক বিশেষ করিয়া ফাঁসের দুশ্ছেদ্যতা বাড়াইয়াছেন। দুর্গার নব-বিবাহিতা বধূর ছদ্মবেশে মদ চালান করিবার কৌশলটি ঠিক স্বাভাবিক ঠেকে না এবং যে অবস্থায় সে নরহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারও সম্ভাব্যতা প্রশ্নাতীত নয়। লেখকের বোধ হয় বিচার সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, নতুবা প্রথম কোর্টেই দুর্গার প্রতি চরমদণ্ডপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন না। চিরঞ্জীবও দুর্গাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা না করিয়াই তাহার জীবননীতি আগাগোড়া পরিবর্তন করিয়া ফেলিল ও তাহার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক নেতা শ্রীধরের সহিত আপোষ করিয়া তাহারই পথ গ্রহণ করিল। সমস্ত ব্যাপার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কেমন একটা অসঙ্গতিদুষ্ট ও অতিরিক্ত প্যাঁচ-কষার বিপরীত প্রতিক্রিয়ারূপে আলগা মনে হয়। শ্রীধরের চিরঞ্জীব-বিরোধিতা ও কৃষক-আন্দোলনের মধ্য দিয়া মদ-চোলাই-এর বিপক্ষে জনমতসৃষ্টির প্রয়াস আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

আবগারী দারোগা বলাইও একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়া আঁকা। চিরঞ্জীব ও দুর্গার বিরুদ্ধে তাহার জেহাদ-ঘোষণা সরকারী কর্তব্যনিষ্ঠার মাত্রাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহাতে যেন একটা বিকৃত আদর্শবাদের, একটা ধর্মমোহাচ্ছন্ন বিজিগীষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। তাহার স্ত্রী মলিনার সঙ্গেও তাহার আদর্শসংঘাত ও সম্বন্ধবিপর্যয়ের কারণটিও স্পষ্ট হয় নাই।

মোট কথা নায়িকার 'বাঘিনী'-পরিচয় ঠিক সুপ্রযুক্ত ও চরিত্রমহিমা দ্বারা সমর্থিত ঠেকে না। সমস্ত বন্য জন্তুই বাঘ হয় না ও বাগদিপাড়ার বাঘিনী বৃহত্তর জীবনপটভূমিকায় বাঘের সগোত্রীয়া বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

যন্ত্রনগরীর জীবনযাত্রার যে ত্বরা-তাড়িত, জ্বর-তপ্ত গতিবেগ আধুনিক উপন্যাসের একটি বহু-আলোচিত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমল দাসগুপ্তের 'কারানগরী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩) তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা কোন ধারাবাহিক কাহিনী বা জীবন-পরিণতির বিবরণ নহে; কয়েকটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে এই জাতীয় শিল্পনগরীর অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপদ্যোতনা, কয়েকটি ভয়াবহ বিকার-লক্ষণের অর্থগূঢ় অভিব্যক্তি। লেখকের ক্ষুরধার মনীষা এই সমস্ত নবগঠিত সহরের জীবনবিন্যাসপদ্ধতির মর্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মধ্যে এক অবক্ষয়ের ব্যাধিবীজাণু, ইহার বাহ্য চাকচিক্যের অভ্যন্তরে অন্তর্জীর্ণতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। যে বিরাট যন্ত্রশিল্পপ্রতিষ্ঠান নব ভারতের সমৃদ্ধির প্রধান স্রষ্টারূপে অভিনন্দিত, তাহাই যে মানবিকতার অবমাননায়, পদগৌরবের মূঢ় আস্ফালনে ও সামাজিক সহৃদয়তা ও ন্যায়নিষ্ঠার স্পর্ধিত অস্বীকৃতিতে সাংস্কৃতিক জীবনকে এক অন্ধ তামসিক বর্বরতার কলুষলিপ্ত করিতেছে ইহাই স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অভিশাপ।

প্রথম দর্শনে নগর বিন্যাসের শিল্পসুষমা কাব্যসৌন্দর্যাভিষিক্ত বলিয়া মনে হয়। তাহার পর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের পিছনের কঙ্কালগুলি একে একে বাহির হইয়া পড়ে। সর্বপ্রথম, যন্ত্রনগরীর ভিত্তিস্থাপনের উদ্যোগপর্বে আদিম সাঁওতাল অধিবাসিবৃন্দের বাস্তুচ্যুতি ও ব্যর্থ প্রতিরোধের একটি করুণ ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। লেখক আবার ইহার সঙ্গে একটি সাঁওতাল শিশুর বুলডোজারের পেষণে চূর্ণীকৃত হইয়া মাটির অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মর্মন্তুদ ঘটনা আভাসে সংযোজিত করিয়া সমস্ত আকাশ-বাতাসকে একটি অব্যক্ত বিলাপগুঞ্জনে শিহরিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকেই তিনি 'অহল্যার কান্না' নামে সাংকেতিক কবিত্বময় সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। এখনও নিশীথ রাত্রে টেলিফোনের তারে যে চাপা কান্নার মত একটা করুণ অনুরণন অফিসার-গৃহিণীদের অপ্রাকৃত ভীতি-সংস্কারকে জাগাইয়া তোলে তাহা যেন সেই অশরীরী ক্রন্দনের বৈজ্ঞানিক বহিঃপ্রকাশ। লেখক কেবল নাটকীয় আবেদনটি ঘনীভূত করিবার জন্য এই বিবৃতিকে আভাস-সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। উৎসাদিত পলাশবৃক্ষশ্রেণীর দিগন্তরঞ্জিনী রক্তিমাভা এখন কারখানার অগ্নিপিণ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত আকাশচুম্বী রক্তসন্ধ্যারূপে উহার পূর্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

তাহার পর লেখক বিরূপাক্ষ, অনন্ত ও গানের সুরের মত ঘোমটা-টানা তাহার বৌ-এর মাধ্যমে লেখক এই যন্ত্রদানবের কুক্ষিগত আদিম সরল জীবনযাত্রার প্রতীক কয়েকটি নর-নারীর পরিচয় দিয়াছেন। বিরূপাক্ষ এই অপরিচিত জীবনাদর্শকে সবলে অস্বীকার করিয়া নিজ অতীত পল্লীজীবনের সুখস্বপ্নকেই অবিচলিত নিষ্ঠায় লালন করিতেছে ও সেই স্বপ্ন-সফলতার দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। অনন্ত তাহার সরলতা লইয়া এই কুটিল জীবন-চক্রান্তের সহিত পাল্লা দিতে পারিল না, খাপ-খাওয়াইবার প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াসের পর সর্বস্বান্ত হইয়া তাহাকে এই রাক্ষসের জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইয়াছে। তাহার পর এখানকার যন্ত্রমনোভাব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এমন কি অর্থনৈতিক বিন্যাসক্ষেত্রেও সংক্রামিত হইয়া সুস্থ জীবনবোধের কিরূপ নিদারুণ বিপর্যয় ঘটাইয়াছে লেখক তাহারই কয়েকটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্র যদি সত্য হয় তবে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সমস্ত উচ্চপদবীতে আসীন কর্মকর্তৃগোষ্ঠীর মধ্যে

যদি এই অপরিসীম নীচতা, ক্রূরতা, প্রভুত্বপ্রিয়তা ও হীন চক্রান্তের সর্বব্যাপী প্রচলন রূঢ়ভাবে প্রকট হইয়া উঠে, তবে বাঙালী যে পৃথিবীর সর্ব জাতির মধ্যে হেয়তম এই স্বীকৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইহার সহিত মহিলাদের উন্নাসিকতা ও প্রতিষ্ঠামোহ ও সাধারণ ভদ্রসমাজে স্ত্রীলোকের নামে হীন কুৎসা রটাইবার ধিক্কারজনক রুচিবিকার যদি যোগ করা যায় তাহা হইলে এই যন্ত্রপুরীর নিকট নরকবিভীষিকাও প্রার্থনীয় মনে হয়। আশা করিব এই চিত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যিক রং-ফলানোর যতটা মুন্সীয়ানা আছে, ততটা সত্যানুস্মৃতি নাই। শম্পা মেয়েটি তার অবিকৃত প্রাণশক্তি ও আনন্দময়তা লইয়া এই নারকীয় ব্যবস্থার জীবন্ত প্রতিবাদ। তাহাকে ও লেখককে জড়াইয়া যে কুৎসাপ্রচার ও মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের ও লেখকের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পদচ্যুতি ও স্থানত্যাগে বাধ্যকরণ যদি সত্যই ঘটিত, তবে শুধু একজন লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির তীব্রশ্লেষাত্মক বর্ণনার মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বাঙলার জনমতের সদাজাগ্রত প্রহরী সংবাদপত্রের শত কণ্ঠে তাহা বজ্রনিনাদে উদ্গীরিত হইত।

উপন্যাসের শেষের দিকে লেখক সাধারণ শ্রমিক আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষীয়দের পক্ষে উহার নিরোধ-চেষ্টার কাহিনী বর্ণনা করিয়া শিল্পনগরীর জীবনের গতানুগতিক ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। এই শেষের পরিচ্ছেদগুলিতে পূর্বগামী অংশের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গনাশক্তি ও আঘাত-কুশলতার মৌলিকতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন ত হইয়াছেই, উপরন্তু ঐ অংশের শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতার প্রতিও কিছুটা সংশয় উদ্রিক্ত হয়।

সাম্প্রতিককালে লিখিত এই উভয় প্রকারের কয়েকখানি উপন্যাস অসাধারণ সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আঞ্চলিক সাহিত্যের নিদর্শন রূপে শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭)) ও 'সিন্ধুপারের পাখী' (মার্চ, ১৯৫৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে 'পূর্ব পার্বতী' বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা সর্বতোভাবে পূরণ করে। ইহা ভারতের পূর্ব-সীমান্তের অধিবাসী পার্বত্য নানা-উপজাতির একটি গোষ্ঠীর বিচিত্র রোমাঞ্চময় জীবন-কাহিনী। এই নানা জাতির জীবন প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের নাগপাশে দৃঢ়বদ্ধ ও যুগযুগান্তনির্ধারিত সামাজিক রীতি-আচার ও গোষ্ঠীপতির বজ্রকঠোর শাসনের অচ্ছেদ্যভাবে শৃঙ্খলিত। লেখক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও সু-নির্বাচিত তথ্য-সঞ্চয়নের সাহায্যে অরণ্য-ও-পর্বতচারী কয়েকটি মানবগোষ্ঠীর আদিম-প্রবৃত্তিপ্রধান জীবনচিত্রটি অপূর্ব বর্ণাঢ্যতা ও সঙ্গতিবোধের সহিত আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। উপন্যাস-বর্ণিত নাগাজাতি বর্বরতার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম না করিলেও উহার বিশিষ্ট জীবনবোধ, অবিচল সমাজানুগত্য, সর্বব্যাপী অতিপ্রাকৃত সংস্কারাধীনতা ও ক্ষাত্র আদর্শের একটা হিংস্র, রক্তলোলুপ বিকৃতির জন্য আমাদিগকে অনেক সভ্যতর হোমারিক যুগের গ্রীক রাজন্যবর্গের, এমন কি স্কটলণ্ড-ইংলণ্ডের সীমান্ত-প্রদেশের গোষ্ঠী-বিরোধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই গোষ্ঠীজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি, বংশাভিমানসর্বস্বতা, দুইটি দলের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরায়, অনির্বাণ বিরোধ, উহার অত্যাজ্য সমাজবিধি, উৎসবের বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও প্রকরণ, দলপতির নির্বিচার শাসন, অপরাধবোধের সদাজাগ্রত উপস্থিতি, উহাদের

মুখের ভাষায় মনের অনাবৃত প্রকাশ, আবেগের জ্বালাময় দাহ—সমস্তই ছবির ন্যায় গাঢ় বর্ণপ্রলেপে ও যথোপযুক্ত গতিবেগ ও নাটকীয়তার সহিত আমাদের নিকট অবিস্মরণীয়-ভাবে অংকিত হইয়াছে। নাগাসমাজের পুরুষ এবং নারী উভয় বিভাগই পূর্ণভাবে সক্রিয় ও আপন আপন বিশিষ্ট অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গী লইয়া এক অখণ্ড সমাজচিত্রের পূর্ণতা বিধান করিয়াছে। রোমিও-জুলিয়েটের ন্যায় দুই চিরবৈরী গোষ্ঠীর এক তরুণ ও তরুণী—সেঙাই ও মেহেলী—মানব-প্রকৃতির অলজ্য্য প্রেরণায় পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছে ও দল দুইটির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বহুমুখী প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাইয়াছে। নানা অবস্থাবিপর্যয়ের ভাগ্যচক্রের নানা অনুকূল ও প্রতিকূল আবর্তনের, মানবিক আবেগের ও দুঃসাহসের নানা অদ্ভুত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত প্রেমিকযুগল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও ঘটনার অনিবার্যতায় উহাদের সুকুমার হৃদয়ানুভূতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। অপ্রতিবিধেয় ট্র্যাজেডি উহাদের তরুণ জীবনের প্রণয়-স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে।

কিন্তু এই পরিণতি ঘটিয়াছে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশে। নাগাজাতির কয়েকজন ব্যক্তি কোহিমা ও শিলঙে গিয়া ইংরেজী সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থার একটু প্রাথমিক পরিচয় লইয়া আসিয়াছে ও চোখে অবোধ বিস্ময় ভরিয়া তাহাদের নবার্জিত জ্ঞানের কথা তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে শোনাইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি চিরাচরিত সমাজবিধি ও গোষ্ঠীশাসনের হিংস্র নিষেধকে অতিক্রম করিয়া বিস্ফোরক শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ও ধীরে ধীরে সমাজশাসনের মূলকে শিথিল করিতে সাহায্য করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্মযাজক, ইংরেজ শাসনব্যবস্থাসংশ্লিষ্ট কর্মচারী, গুইডালো ও সমতলভূমির শিক্ষিত-মানুষ-প্রবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলন—সমস্তই নাগাজীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও বর্বর প্রথাবদ্ধতায় বিপর্যয় আনিয়াছে—শেষ পর্যন্ত ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে নাগা-গোষ্ঠীদের বংশানুক্রমিক বিরোধের রক্তাক্ত অবসান ঘটিয়াছে। মেহেলী প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাহার নিজ গোষ্ঠীতে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে ও সেঙাই ইংরেজের জেলে বন্দী হইয়া নবজীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আদিম সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণভাবে বহির্জীবন-বিমুখ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আধুনিকতার প্রবল ও অতর্কিত অভিভব যেন কিয়ৎ পরিমাণে ঘটনা-সংস্থানের কেন্দ্রবিচ্যুতি ঘটাইয়াছে ও কেন্দ্রসংহত জীবনবোধের মধ্যে বহিরাগত প্রভাবের আতিশয্য প্রবর্তন করিয়া ভাবাবহের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে। এই আকস্মিক সংঘর্ষ ইতিহাস-সমর্থিত কিন্তু ভাবজীবনের সংহতি ইহার দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছে মনে হয়। তথাপি লেখক এই ইংরেজ শক্তির আক্রমণকে বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীবিরোধের সহিত সংযুক্ত ও চিরন্তন বৈরসাধনার নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া, উপন্যাসের প্রাগৈতিহাসিক ও অতি-আধুনিক স্তরের সংমিশ্রণটি যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়াছেন।

লেখকের উদাত্ত বর্ণনাভঙ্গী, খরবেগ বিবৃতিকৌশল ও সুষ্ঠু মন্তব্য-সংযোজনা, গহন-

অরণ্য-ও-দুর্গম পর্বতমালা-রচিত, ভয়াবহ ব্যঞ্জনাবহ প্রকৃতি-পরিবেশের সহিত দুর্দান্ত, রক্তপিপাসু আরণ্যক মানুষের আত্মিক যোগের সার্থক দ্যোতনা উপন্যাসটিকে একটি মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। এখানে আমরা এমন একটি কৌম সমাজের পরিচয় আমরা পাই, যেখানে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি বিচারবিবেচনাহীন অগ্ন্যুৎক্ষেপের জন্য সদা-উদ্যত, যেখানে হত্যাবিভীষিকা প্রতিটি মুহূর্তের অন্তরালে প্রতীক্ষমান, যেখানে অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস কুয়াশাঘেরা দিগন্তের মত মানবচিত্তকে সর্বদাই আলোক-মুক্তি হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে, যেখানে নর-নারী সকলেই আদিম উল্লাসে মত্ত, অজানা আশঙ্কায় বিমূঢ়, ও অকারণ, শ্রান্তিহীন কর্মোদ্যমে ও স্নায়বিক উত্তেজনায় অশান্ত। যে পৃথিবীতে তাহারা বাস করে, যে বায়ুমণ্ডলে তাহারা শ্বাস গ্রহণ করে, তাহা সর্বদাই ভূমি-কম্পের আলোড়নে অস্থির ও ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষুব্ধ। তাহাদের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের মধ্যেই একটা অসংযত আতিশয্য ও আত্মহারা ঘূর্ণাবেগ প্রকট। তাহাদের হৃদয়াবেগের ফুটন্ত বাষ্প কখনও তাপহীন শীতলতার স্থির আকৃতি-গ্রহণের সুযোগ পায় না। এই উপন্যাসে লেখক আমাদিগকে এক ঊর্ধ্বশ্বাস, বিহ্বল জগতে লইয়া গিয়াছেন, যাহার জীবননীতি ও নিয়ামক শক্তি আমাদের পরিচিত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই উপন্যাসের নর-নারীদের মধ্যে সভ্য মানবের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য দুর্নিরীক্ষ্য। ইহারা সকলেই এক সুপ্রাচীন ও স্বতঃস্বীকৃত জীবনবোধের মহাসমুদ্রে ভাসমান বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহের ন্যায় কোন-প্রকারে মাথা তুলিয়া আছে। ইহাদের চরিত্রের মূল সেই সার্বভৌম সংস্কৃতির মধ্যেই মগ্ন; এই গভীর-প্রোথিত মূল মুক্ত আকাশে বিশেষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নাই। সমাজদ্রোহী চিন্তা হয়ত কাহারও মনে মৃদু স্পন্দন তুলিয়াছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের শ্বাসরোধী অভিভবে ইহা অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। সেঙাই ও মেহেলী তাহাদের অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের ব্যাকুলতায় এক স্বাধীন, সমাজনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়াছে, কিন্তু গোষ্ঠীচেতনার বিপুল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে এই আশা-কল্পনা নিতান্ত ক্ষীণজীবীরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া-ধরা কণ্ঠনালী দিয়া কতটুকু নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে? আধুনিক-কালে যাহাকে প্রণয় বলে এই প্রেমিকযুগল তাহার প্রথম স্পন্দন অনুভব করিয়া উহাদের প্রতিবেশের সঙ্গে সহজসম্পর্কভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের জীবনের কক্ষপথ যেন নূতন অক্ষরেখাকে অবলম্বন করিয়া আবর্তিত হইয়াছে। এই অনাস্বাদিতপূর্ব মধুপানের ফলে তাহাদের পায়ের তলা হইতে শাশ্বত আশ্রয়ভূমি সরিয়া গিয়াছে! সমাজের চিরপ্রথাগত বিধি-নিষেধের মধ্যে, সংস্কারজীর্ণ মানস পরিমণ্ডলের সংকীর্ণতায় এই নূতন আবির্ভাবকে স্থান দিবার প্রয়াসে তাহারা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

নাগাসমাজের নানাবিধ রীতি-প্রথা, উৎসব, অতিপ্রাকৃত সংস্কার ও পাপ-পুণ্য-ন্যায়-অন্যায়-মূলক জীবননীতির এক মনোজ্ঞ, তথ্যবহুল ও বাস্তব জীবনচর্যার সহিত দৃঢ়সংলগ্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্দারের স্বেচ্ছাচার, মোরাঙ-এ অবিবাহিত যুবকদের স্ত্রীসংসর্গ বর্জিত রাত্রিবাসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, ঋতুচক্রের ও কৃষিকর্মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎসবমণ্ডলী, আনিজার ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা, ডাইনী নাকপোলিবার ইন্দ্রজাল ও বশীকরণমন্ত্র, বিবাহের পূর্বে বর-কন্যার দুইমাসব্যাপী বাধ্যতামূলক অদর্শন, শিকার-যাত্রার

পূর্বে অশুচি স্ত্রীসংসর্গ পরিহার ইত্যাদি নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রথা ইহাদের জীবনকে একটা অত্যন্ত ঠাসবুনানো জটিল বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ করিয়াছে। লেখকের তথ্যজ্ঞান ও বর্ণনাসরসতায় এই জীবনচিত্র পাঠকের নিকট অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বোপরি লেখকের ভাষার অসাধারণ প্রকাশ ও দ্যোতনাশক্তি সমস্ত কাহিনীটিকে আমাদের নিকট জীবন্ত ও রসোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। নাগাদের সংলাপ ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটি বাংলাভাষায় আশ্চর্য সজীবতার সহিত ভাষান্তরিত হইয়াছে। আমাদের নিশ্চিত প্রত্যয় জাগে যে, যদি নাগারা বাংলাভাষা জানিত তবে নিঃসংশয়ে এইরূপ ভাষাতেই তাহাদের ভাব ও সীমাবদ্ধ জীবনবোধটি প্রকাশ করিত। তাহাদের প্রচুর রোষ-ব্যঙ্গ-ভর্ৎসনা মিশ্রিত সম্বোধন-প্রণালী, তাহাদের স্পর্ধা জানাইবার ও গালাগালি দিবার বিশিষ্ট ভঙ্গী, তাহাদের প্রেম-বন্ধুতা সহৃদয়তা প্রভৃতি কোমলতর ভাব-প্রকাশের রীতি, তাহাদের অতিপ্রাকৃত বিভীষিকাবোধ, এমনকি তাহাদের দৈহিক প্রয়াস-প্রতিক্রিয়ার রূপটিও আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের যুবক-যুবতীদের যৌন আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত নিঃসংকোচে ও শিশুসুলভ সরলতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের এই ভাষাপ্রয়োগনিপুণতা তাঁহার বক্তব্যকে আমাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও এক অপরিচিত, প্রাচীন বর্বর সমাজের জীবনরহস্যটি আমাদের সহজবোধ্য করিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসের দ্বারা বাংলা উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও জীবনপরিচয়ের পরিধি বর্ধিত করিয়াছেন। ব্যক্তিচরিত্রের গভীর বিশ্লেষণের আপেক্ষিক অভাব ব্যাপক সমাজ-চিত্রের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পুনর্গঠনের ও নূতন ধরনের জীবনলীলার অন্তঃসঙ্গতিময় উপস্থাপনার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখী' (মার্চ, ১৯৬৯) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কারাবন্দীদের বঞ্চিত জীবনেব অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও করুণ দিবাস্বপ্নের ইতিবৃত্ত। অবশ্য ইহা ঠিক আঞ্চলিক পর্যায়ে পড়ে না; কেননা যদিও ইহাতে আন্দামানের ভৌগোলিক বর্ণনা ও প্রতিবেশচিত্র প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তথাপি ইহার মানব-প্রকৃতি-পরিচয় স্থান-প্রভাবিত নহে। বরং ভারত ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহিরাগত, জেল-আইনের নানা কঠোর-বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রিত ও অমানুষিক-অত্যাচার-জর্জরিত কয়েদীরাই ইহার পরিবারমণ্ডলী রচনা করিয়াছে। সুতরাং ইহা প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে নির্বাসিত রাজদণ্ডভোগী বন্দীদেরই কাহিনী। ইহারা ইহাদের মানসপ্রবণতা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য, অপরাধপ্রবণ চিত্তের নানা জটিল বিকার দেশ হইতেই বহন করিয়া আনিয়াছে। আন্দামানের কারা-ব্যবস্থায় ইহারা আরও উৎকট শাস্তি ও দৈহিক অত্যাচার ভোগ করিয়া মনোবিকারের একপ্রকার জান্তব অসাড়তায় প্রস্তরীভূত হইয়াছে। ইহারা সকলেই কোন-না-কোন দিক দিয়া মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাইয়াছে—অপ্রকৃতিস্থতার কম-বেশী লক্ষণ সকলের মধ্যেই পরিস্ফুট। স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদী উভয় শ্রেণীই আপন আপন অর্ধোন্মাদ খেয়ালের চক্রপথে ঘূর্ণ্যমান—পরস্পরের সহিত নানা জটিল,

অসুস্থ মনোভাবের জালে জড়িত—সকলেরই জীবন বিচিত্র, তির্যকসঞ্চারী বলিরেখায় আচ্ছন্ন। কয়েদীদের জীবনকাহিনী খুব কৌতূহলোদ্দীপক, নানা উদ্ভট চরিত্রের সমাবেশে চমকপ্রদ প্রবৃত্তির অদ্ভুত ঘাত-প্রতিঘাতে তটভূমিপ্রহত তরঙ্গের ন্যায় উৎক্ষেপশীল। আবার কারাপ্রহরীদের নানা নূতন উৎপীড়ন-কৌশল, খেয়ালী, যথেচ্ছাচার, অনুরাগ-প্রশ্রয়-বিরাগের দুর্বোধ্য প্রয়োগ এই মানবপ্রকৃতির ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রকে আরও উত্তাল ও উদ্‌ভ্রান্তিবিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে। লখাই, ভিখন, বন্দা নওয়াজ খাঁ, চান্নু সিং, জাজিরুদ্দিন, পরাঞ্জপে, সোনিয়া, রামপিয়ারী, এতোয়ারী, তোরাব আলি, বিরসা, ভি-কুনহা, মা-পোয়ে, লাডিন, কপিলপ্রসাদ, উজাগর সিংহ, মিমিথিন—এই বিচিত্র নর-নারীর মেলার একটা প্রাণোচ্ছল, জীবনরহস্যময়, ক্ষণিক মিলন-বিচ্ছেদে ঈষৎ-আভাসিত দৃশ্য আমাদের নিকট দ্রুতসঞ্চরণশীল ছায়াচিত্রেব বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছে।

এই দ্রুতচলমান ছায়াশোভাযাত্রার মধ্যে কয়েকটি আমাদের মনের পর্দায় স্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া কিছুটা অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যসূত্রে বিধৃত হইয়াছে। জনসমুদ্রের কয়েকটি চঞ্চল বিন্দু কতকটা আয়তন লাভ করিযা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্থিরত্ব অর্জন করিয়াছে। সোনিয়ার প্রতি লখাই ও চান্নু সিংহের অনিশ্চিত মোহময় আকর্ষণ খানিকটা দানা বাঁধিয়া আবাব বাঁধন-ছেঁড়া রেণুকণায় চূর্ণিত হইযাছে। রামপিয়ারীর সহিত তাহার একটা বিকৃত অচ্ছেদ্য বন্ধন তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত ও সুস্থ যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। ইহা যেন মানব জীবনরহস্যেব এক দুর্বোধ্য, বিরল উৎসারণ। জাজিরুদ্দিনের সঙ্গে বিরসার সাংঘাতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেন একটি হোমাব-বর্ণিত সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয যে, কয়েদীদের হিংস্রতম ও নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তি-সংঘর্ষেব মধ্যে ধর্মাদর্শমূলক এক সমুন্নত ভাবপ্রেরণা উভয় বন্দীর মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামের হেতু হইয়াছে। কয়েদীদের সমাজে বন্দা নওয়াজ খাঁ এক অসাধারণ ব্যতিক্রম—স্বাধীনতাকামী সৈনিকের মহিমান্বিত ভাবাদর্শের প্রভাবেই তিনি নির্বাসনদণ্ড বরণ করিয়া আন্দামানে আসিয়াছেন। সন্ত্রাসবাদীদের আন্দামান আসার সংবাদে তিনি তাঁহার চিরপোষিত আশার সফলতা-প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নির্মম রাজশক্তি দ্রুত প্রতিষেধক ব্যবস্থার অবলম্বনে তাঁহাব সমস্ত আশাব মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। ঘৃণিত চরিত্র, পশুপ্রকৃতি, দীর্ঘ অত্যাচারের ফলে মনুষ্যত্বহীন কয়েদীদের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহার আগুন জ্বালাইবার বৃথা চেষ্টায় তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহার নিঃসঙ্গ-করুণ, ব্যর্থতায় কুণ্ঠিত, জীবনব্যাপী প্রতীক্ষায় অবসন্ন চরিত্রগৌরব আন্দামান-জীবনের একটি মহত্তম স্ফুরণ।

উপন্যাসের দ্রুত-পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের মধ্যে যদি কাহারও কিছুটা কেন্দ্র-তাৎপর্য থাকে তবে তাহা লখাই-এর। লেখক যেন বিশেষ আগ্রহ সহকারে লখাই-এর মন্থর, অলক্ষিত-প্রায় মানস পরিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন। বন্দিজীবনেব নানা নিষ্ঠুর আঘাত, নানা নূতন নূতন অপ্রত্যাশিত, বিসদৃশ অভিজ্ঞতা তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মনের গভীরে একটি অভিনব জীবনবোধের সঞ্চার করিতেছিল। শেষ পর্যন্ত বর্মী আত্মীয়ের দ্বারা প্রবঞ্চিত বাঙালী তরুণী বিন্দীর করুণ, কলঙ্কিত জীবন-ইতিহাস ও তাহাকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি তাহার চিরসুপ্ত পৌরুষ ও ভোগলালসামুক্ত, বিশুদ্ধ সমবেদনাকে উদ্‌বুদ্ধ

করিয়া তাহার নৈতিক পুনর্বাসনের ইঙ্গিত বহন করিয়াছে। লেখকের দুইটি উপন্যাসেরই নায়ক—সেঙাই ও লখাই—তাহাদের যন্ত্রণাময়, গ্লানিদুর্ভর, মনুষ্যত্বের অবমাননায় দুঃসহ অভিজ্ঞতাপরম্পরা উত্তরণ করিয়া এক শান্ত স্বীকৃতি ও নূতন আনন্দ-বেদনায় মৃদুস্পন্দিত পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। উভয়েরই আদিম, স্থূলপ্রবৃত্তিসর্বস্ব জীবনের অবসান ঘটিয়া এক প্রজ্ঞাশাসিত, সূক্ষ্মঅনুভূতিভিত্তিক জীবনবোধের পর্বের উদ্বোধন হইয়াছে। লেখকের বহির্মুখী বর্ণনা ও ঘটনারোমাঞ্চের মধ্যে এই জীবনসত্য ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই—ইহাকে যেন অনেকটা কৃত্রিমভাবে আরোপিত সংযোজনা বলিয়াই মনে হয়।

আন্দামানের বহিঃপ্রকৃতির দীর্ঘ, পৌনঃপুনিক বর্ণনা আছে, কিন্তু মানবচরিত্রের সহিত সূক্ষ্মসঙ্গতিময় রূপবৈচিত্র্যের অভাব। আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের দর্শন পাই না, তবে ঘন জঙ্গলের আড়াল হইতে নিক্ষিপ্ত তাহাদের দুই একটি তীর আমাদের নিকট তাহাদের অন্তরালবর্তী অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। 'পূর্ব পার্বতী' হইতে ইহা অনেকটা নিম্নতর শ্রেণীর হইলেও বিষয়ের অভিনবত্বে ও বর্ণনাকৌশলে ইহার উৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নহে।

(৭)

উপন্যাসে বিষয়ের নূতনত্ব-প্রবর্তনের যে নানামুখী প্রয়াস সাম্প্রতিক যুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, বারীন্দ্রনাথ দাসের "চায়না টাউন" (নবেম্বর, ১৯৫৮), তাহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আধুনিক কলিকাতার পুনর্গঠনের মধ্যে যে সন্ত অতীত নগরবিন্যাস ও সমাজ-জীবনের যে আকারটি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে ও তাহারই পটভূমিকায় যে সুদূরতর অতীত কালগর্ভে বিলীন হইয়া কেবল লোকস্মৃতিতে কিছুটা জীবিত আছে, লেখকের উদ্দেশ্য নিকটতর অতীতের সাহায্যে সেই দূরতর অতীতের ছায়ামূর্তির আভাস দিয়া অপরিচয়ের মোহসৃষ্টি। চীনাপাড়ার রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রার সুড়ঙ্গপথবাহী সর্পিল গতিই উপন্যাসের আসল নায়ক। এই চীনারা চোরাকারবার ও বোম্বেটেগিরির পিচ্ছিল পথ বাহিয়া বা রাষ্ট্র-চক্রান্তের কুটিল পাকে ঘূর্ণিত হইয়া কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতার একটি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিল ও সেখানে পীত মহাদেশের একটি অংশ প্রতিষ্ঠা করিল, বাঙালী-সমাজের সহিত তাহাদের বৈষয়িক ও সামাজিক সম্পর্ক কোন্ নির্দিষ্ট সীমারেখা-অবলম্বনে অগ্রসর হইল তাহারই রোমাঞ্চকর ইতিহাস এই উপন্যাসের দিগন্ত রচনা করিয়াছে।

উপন্যাসে সাম্প্রতিক তরুণ সম্প্রদায়ের আচরণ ও পূর্বস্মৃতি-উদ্দীপনের মধ্য দিয়া অতীত ও আধুনিক চীনা-সমাজের যে ছবি পাওয়া যায় তাহাতে চীনের বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্যগোচর হয় না। বর্তমান চীন অন্যান্য আধুনিক জাতির মত জীবনচর্যায় অনেকটা আন্তর্জাতিক আদর্শানুসারী এবং অধিকাংশ চীনেরই আচার-ব্যবহার, এমন কি প্রেম ও বিবাহ প্রভৃতি গভীর হৃদয়াকর্ষণপ্রসূত মনোবৃত্তির প্রকাশও প্রাচীন-প্রভাবমুক্ত ও পাশ্চাত্ত্যসুলভ স্বাধীন-ইচ্ছা-নিয়মিত। অধিকাংশ চীনে তরুণীই যেমন দেহ-প্রসাধনে ও অঙ্গসজ্জায়, তেমনি প্রণয়ানুভূতিতে ও সামাজিক মেলা-মেশাতেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্বচ্ছন্দচারিণী। নূতনের মধ্যে চীনে অন্তর্বিপ্লবের আলোড়ন—চিয়াংকাই শেক ও মাও-সে-তুঙের রাষ্ট্রনৈতিক মতবিরোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কলিকাতা সমাজে পর্যন্ত মৃদু কম্পন জাগাইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের প্রতিনিধি ওয়াং তখন বার্ধক্যে পূর্ব জীবনের দুর্ধর্ষতা ভুলিয়া অত্যন্ত স্তিমিত ও ঢিলে-ঢালা হইয়া

পড়িয়াছে। সে এখন ছেলে-মেয়ের আচরণ-শিথিলতা ও বৈবাহিক স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। ওয়াং-এর বড় ছেলে আমেরিকা-প্রবাসী হইল, ছোট ছেলে ফিরিঙ্গী মেয়ে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পাতিল, ছোট মেয়ে মিনি ও বড় মেয়ে জেনীও, দিলীপের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের পর, চীনা যুবকদ্বয়ের সঙ্গে বিবাহসম্পর্কে আবদ্ধ হইল।

উপন্যাসের কাহিনী-অংশ খুব ক্ষীণ—উহার কালসীমা ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৬ পর্যন্ত এই আট বৎসর বিস্তৃত। উহার শেষ অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনার ব্যাখ্যা ও পরিণতি-নির্দেশ। বক্তা রঞ্জন নিতান্ত নিষ্ক্রিয় দর্শক—অপরের অভিজ্ঞতার ন্যাসপাত্র মাত্র। সে সরল ও ভাবপ্রবণ যুবক, কতকটা দিলীপের চাতুরীতে, কতকটা ভাগ্যদোষে নিজ প্রণয়সার্থকতা হইতে বঞ্চিত। তাহার বন্ধুমণ্ডলীর যাযাবর জীবনদর্শন ও সুরা-নিষিক্ত, মাদকতাময়, উচ্ছল জীবনরসপরিবেশন, তাহার মনে এক বিস্ময়বিমূঢ় ভাব ছাড়া আর কোন উগ্রতর প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাহাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া তাহার অন্তরাল হইতে পাঠকের বোধশক্তির প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণশরনিক্ষেপের রণনীতি বিশেষ বোঝা যায় না। দিলীপ, যোগীন্দ্র সিংহ, জয়প্রকাশ ত্রিবেদী—ইহারাই রঞ্জনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে নানা দেশ-বিদেশের বিচিত্র—জটিল হৃদয়াবেগের কাহিনী শোনাইয়াছে ও মূল গল্পের ক্ষীণ দেহকে নানা আগন্তুক রসধারায় পুষ্ট করিয়াছে। আরব্য রজনীর মূল কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট নিত্য-নূতন-শাখা-চিত্রের ন্যায় এই অবান্তর আখ্যানগুলিই উপন্যাসের জীবনখণ্ড-চিত্রগুলিকে রঙীন ও রসোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। দিলীপকে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সপ্রতিভ সামাজিকতা সত্ত্বেও নিতান্ত হীন চরিত্র বলিয়া মনে হয়, তবে বাঙলা দেশে চীন-উপনিবেশস্থাপনের আদি কথাটি অতি সরসভাবে বিবৃত করিয়া সে আমাদের মানস দিগন্তকে বহুদূর প্রসারিত করিয়াছে। জেনীর সহিত তাহার অকল্পনীয় হীন আচরণের জন্য লজ্জা তাহারও মধ্যে যে একটা সুপ্ত বিবেক ছিল তাহারই প্রমাণ দিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত জেনী যে তাহার অভাব্যতার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে ইহাই আমাদের ন্যায়বোধকে তৃপ্তি দেয়। জয়প্রকাশ সাংহাই-এ দূতাবাসের নিমন্ত্রণের যে উজ্জ্বল চিত্র দিয়াছে তাহাতে আমরা নানাজাতীয় নর-নারীর সাক্ষাৎ পাই ও তাহাদের অন্তরসমস্যার জটিলতার পরিচয়লাভে আমরা যে বিশ্ব-মানবতাবোধের দিকে কতটা অগ্রসর হইতেছি তাহা অনুভব করি। গ্রন্থটির জীবনাবেগ তাহার মূল কাহিনীতে নয়, তাহার এই বহু-বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় অনর্গল ধারায় প্রবাহিত।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) একখানি নূতন ধরনের উপন্যাস। ইহাতে একটি তরুণী নারীর ব্যক্তিসত্তা কেমন করিয়া মনন ও অনুভূতি-প্রবাহে নানা জটিল ও স্ববিরোধী উপাদান-সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিতেছে ও উহার মুহূর্তে মুহূর্তে কিরূপ বিচিত্র রূপান্তর হইতেছে তাহার একটি সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ আছে। তাহার শ্রদ্ধা-বিরাগ, স্নেহ-মমতা-অবজ্ঞা, ঔদাস্য-জীবনাগ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী বৃত্তিসমূহ কেমন করিয়া পরস্পর-গ্রথিত, তাহার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী, দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা কিভাবে বহুমুখী-তাৎপর্যদ্যোতক হইয়া উঠিতেছে তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত পারম্পর্যসূত্রের মাধ্যমে তাহার সত্তাস্বরূপটি নূতন নূতন রূপে ঝলসিয়া উঠিতেছে। তাহার পরিবর্তনশীল চেতনা ও অনুভূতিসমূহ নদীস্রোতের

ন্যায় তাহার সত্তাকে যুগপৎ ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। ইহারা একসঙ্গে সেই সত্তার আধার ও আধেয়। চরিত্রের স্থিরতা, ব্যক্তিত্বের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা যেন প্রতিমুহূর্তের চিন্তা ও ভাবধারার চলমানতায় তরল ও আধারোৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার নূতন গঠন-সুষমার রূপ লইতেছে। তরুণী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে জয়তী মুখোপাধ্যায়ের দ্রুতধাবমান অনুভূতির মধ্যে এই দুর্নির্ণেয় সত্তারহস্যটি উদাহৃত হইয়াছে।

জয়তীর সকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত কালসীমায় বিবৃত জীবন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই তাহার উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্বের পরিচয় আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই দিনব্যাপী মানস সক্রিয়তার মধ্যে তাহার চরিত্রের চারিটি স্তর পরিবর্তন তরঙ্গের অনিশ্চিত ছন্দে দেখা দিয়াছে। প্রথম, তাহার পারিবারিক সম্পর্ক; দ্বিতীয়, তাহার সুহাসিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা-বৃত্তি; তৃতীয়, তাহার কলেজের ছাত্রীরূপে আবির্ভাব, এবং চতুর্থ, তাহার প্রণয়-রহস্যের পরিস্ফুটতায় অস্বস্তিকর চলচ্চিত্ততা। এই সব কয়েকটি দিকেই তাহার মানস চিত্রটি রেখার দ্রুত টানে ও সার্থক সুনির্বাচিত ইঙ্গিতে আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহার বাবা, মা, ভাই, বোনের সহিত সম্পর্কের ঈষৎ-বিকৃত, প্রয়োজনের হীনতাস্পৃষ্ট রূপটি আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি। এই পরিবার-জীবনের পশ্চাৎপটে তাহার দিদির বাপ-মায়ের অমতে অসবর্ণ-বিবাহ ও গৃহত্যাগ এক উদ্বেগজনক বিভীষিকার, এক অশুভ অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলিয়াছে। ইহারই অস্থির আলোকে সমস্ত পারিবারিক ব্যবস্থাটিকে যেন অন্তর্জীর্ণ ও টলটলায়মান দেখাইতেছে। মুসলমানের সহিত প্রেমে-পড়া জয়তীর মনে এই আশঙ্কা আরও তীব্র ও ঘনীভূত অস্বস্তির কারণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, তাহার শিক্ষিকা-জীবনের সমস্যাগুলি তাহার ব্যক্তিত্বের যে সব উদ্বোধন ঘটাইয়াছে তাহাও সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক নূতন দায়িত্ববোধ, মেয়েদের শান্ত রাখার জন্য কৌশল-উদ্ভাবন, বয়োজ্যেষ্ঠা শিক্ষিকাদের পারস্পরিক ঈর্ষ্যা-কলহের মধ্যে নিরপেক্ষতা-রক্ষা-সমবয়সী শিক্ষিকাদের সহিত তরুণ প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিনিময়, প্রধানা শিক্ষিকার সহিত স্কুল-পরিচালনা বিষয়ে মতদ্বৈধ ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহার মন এক নূতন কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সে যখন কলেজের ছাত্রী, তখন যেন সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সহপাঠী-সহপাঠিনীদের সঙ্গে মজা-করা, ছাত্রসংঘে রাজনীতি-চর্চা, প্রকাশদা, মায়াদি প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত অন্তরঙ্গ আলোচনা, ভবিষ্যৎভাবনাহীন তারুণ্যের অগাধ আত্ম-বিশ্বাস—এই বৈশিষ্ট্যগুলি তখন তাহার চরিত্রে পরিস্ফুট। এই অংশের উৎকর্ষ ব্যক্তি-জীবনবিকাশে নহে, ছাত্রীজীবনের একটি চমৎকার উজ্জ্বল চিত্রে। চতুর্থতঃ, তাহার প্রেমসমস্যা প্রকাশদার সহিত একটু গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার স্বীকৃতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া প্রকাশও নিজ ব্যর্থ প্রণয়ের গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রকাশের জীবনাভিজ্ঞতা জয়তীকে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিতে সহায়তা করিয়াছে। সে ঠিক করিয়াছে যে, সে প্রেমের সহিত সাংসারিক কর্তব্যের একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করিবে, কিন্তু প্রেমের শ্রেষ্ঠ দাবিকে কোনরূপ খর্ব না করিয়া; আত্মবঞ্চনা করিয়া সংসার-সেবা তাহার নিকট মহৎ কর্তব্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। উপন্যাসটির

মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ অত্যন্ত কুশল, দ্রুতসঞ্চারী ও উজ্জ্বল-রেখাচিত্র-বিন্যস্ত। জয়ন্তীর প্রেম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ছাড়া তাহার সম্ভারহস্যের উন্মোচন সর্বত্রই যথার্থ ও উপভোগ্য। কিন্তু হৃদয়সমস্যাসমাধানকে আর পাঁচটা গৌণ ইচ্ছা বা বিচারের সহিত একপর্যায়ভুক্ত করিয়া উহার সমান দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তিসাধন ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। এক মুহূর্তের চিন্তায়, ক্ষণিক মননের সাহায্যে মনের অ-গভীর বৃত্তিগুলিকে চেনা সম্ভব। কিন্তু প্রেমরহস্যগ্রন্থির এইরূপ দ্রুতগামী ভাব-ভাবনার ক্ষিপ্রঅস্ত্রপ্রয়োগে মর্মচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষতঃ তার প্রণয়ী আসাদ বরাবরই যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গেল। তাহার হৃদয়মাধুর্য কেবল পরোক্ষ বর্ণনার সাহায্যে অনুমেয়। তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে ও প্রেমিককে বাদ দিয়া প্রেমিকার এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চয়ই প্রেমের মর্যাদার অনুকূল নহে। আর সিদ্ধান্তটিও আপোষমূলক ও প্রথানুগত—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য অন্তর্ভেদী আত্মবিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন হয় না।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইরাবতী', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রহ্মদেশে জাপানী বোমাবর্ষণ ও ব্রহ্মের স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের জনসাধারণকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার ঐকান্তিক প্রয়াসের পটভূমিকায় রচিত প্রণয়রোমাঞ্চ কাহিনী। এখানে সীমাচলম নামে এক ব্যর্থ প্রণয়ী মাদ্রাজী যুবকের দেশ-ত্যাগ ও ব্রহ্ম-প্রবাসের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিবৃত হইয়াছে। সীমাচলম ব্রহ্মে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয়ে ও অন্যদিকে ব্রহ্ম-বিপ্লবী নেতাদের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রেমিক সত্তা তাহার অর্ধ-অনিচ্ছুক বিপ্লবী সত্তার নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য তাহার প্রণয়াবেগ যেরূপ অনিয়মিত ও প্রণয়পাত্রীদের সহিত মিলন যেরূপ আকস্মিক, তাহার বিপ্লবী প্রয়াসও সেইরূপ বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল। জাপানী আক্রমণ ও বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত ব্রহ্মের জীবনযাত্রাবিপর্যয়ের সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তি, উহার জনগণের লক্ষ্যহীন, আতঙ্ক-তাড়িত ছুটাছুটি, উহার শ্রমিক আন্দোলনের মুহুর্মুহুঃ গতিপরিবর্তন ও উৎসাহ ও অবসাদের মধ্যে অস্থির আন্দোলন ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিপ্লব-প্রচেষ্টার এক হিংস্র, নির্বিচার জাতিবৈর ও লুট-তরাজে পরিণতি—সবই এলোমেলো ও তাৎপর্যহীনভাবে উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। বর্ণনার কুশলতা ও ঘটনার রোমাঞ্চ আছে; মাঝে মাঝে স্বাজাত্যবোধের আবেগ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা মনে পড়াইয়া দেয়। তবে শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ ইতিহাসের গোলকধাঁধা এড়াইয়া ইতিহাস-কল্পনায় ও কাল্পনিক কয়েকটি চরিত্রের অন্তর-উদ্‌ঘাটনে আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। বর্তমান লেখক ইতিহাসের বিশাল দিক্‌চিহ্নহীন প্রান্তরে যথার্থ ঘটনার মায়ামৃগকে অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার আসল লক্ষ্য জীবনসত্যকে হারাইয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মদেশের বস্তুবর্ণনার প্রাচুর্য ও ঘটনার প্রাধান্য সমস্ত চরিত্রকেই চলমান বহির্জীবনের ক্রীড়নকরূপে পর্যবসিত করিয়া উপন্যাসের উদ্দেশ্যকে বহুপরিমাণে ব্যর্থ করিয়াছে।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' (এপ্রিল, ১৯৫০)—কলিকাতার জীর্ণ, সরু, আলোবাতাসহীন গলির বাহিরের ক্ষয়িষ্ণুতা উহার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার রূপকতাৎপর্য-

বাহী রূপে কল্পিত। ঔপন্যাসিক যেন গলিটির একটি ক্রূর-কুটিল আত্মিক সত্তা অনুভব করিয়াছেন যাহা গলির মানুষদের জীবনবিকারে প্রতিফলিত। লেখক প্রমথ পোদ্দারকে ইহার "অজরামর" আত্মারূপে অভিহিত করিয়াছেন। সে কিন্তু গলির জীবন-প্রহসনের তির্যককটাক্ষক্ষেপী, উহার সমস্ত অসঙ্গতির রসাস্বাদী দর্শকমাত্র। সে কেবল উহার অবক্ষয়ের সমস্ত বিকাশ ঈষৎ শ্লেষদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, কোন কিছুতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। মাকড়সা যেমন জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে ও নিশ্চিত জানে যে, মাছি সে জালে ধরা পড়িবে, তেমনি প্রমথও জানে যে, গলির অমোঘ আকর্ষণ উহার সমস্ত অধিবাসীকেই সর্বরিক্ততার কুক্ষিগত করিবে, কাহাকেও এজন্য উস্কানি দিতে হইবে না। গলিও সেইরূপ নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অদৃশ্য প্রভাবে সকলকেই অন্তর্জীর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এখানে কোন সয়তান ব্যতিরেকেই তাহার অশুভ . ফল হয়।

উপন্যাসে দুইটি পরিবারের কাহিনীতে এই অবক্ষয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম হইতেছে মনীন্দ্র-শান্তি-ইন্দ্রজিৎ এই ত্রয়ীর সম্পর্কবিকারের দুঃস্বপ্নের মত বোবা আবিলতা। লেখক এই সম্পর্কদ্যোতনায় প্রশংসনীয় ব্যঞ্জনাপ্রয়োগের শক্তি দেখাইয়াছেন। শান্তি মনীন্দ্রের সাংসারিক ঔদাসীন্যের জন্য সংসার চালাইতে নানা রূপ অশালীন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। জুয়াখেলা ও ইন্দ্রজিতের সহিত অবৈধ রসবিলাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মনীন্দ্র সব দেখিয়াও না দেখার ভান করে। কিন্তু তাহার নাটকে তাহার স্ত্রীর সমস্ত ছলাকলা-দাম্পত্যনীতি-উল্লঙ্ঘনের চিত্র নায়িকাতে আরোপ করিয়া সে যে এতদিন অন্ধতার অভিনয় করিতেছিল তাহার ভয়াবহ, সমস্ত পূর্বধারণার বিপর্যয়কারী প্রমাণ দেয়। ইহার ফলে শান্তি আর মনীন্দ্রকে তাহার অসহায় পোষ্য মনে না করিয়া তাহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও মঞ্চসফল নাট্যকারের সহিত সমতা রক্ষা করিতে ছায়াচিত্রে অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা-অর্জনের অভিলাষী হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ এখন শান্তির জীবনে মাঝে মধ্যে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনে গৌণ আসন অধিকার করিয়াছে। স্ত্রীর শিকার-ধরা ও স্বামীর তাহাতে আপাতপ্রশ্রয় অথচ প্রকৃত শ্লেষতীক্ষ্ণ সচেতনতা ও শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতার মাধ্যমে উহার চিরন্তনত্ববিধান এই অবক্ষয়জীবনের একটা আশ্চর্য সঙ্কেত।

ইন্দ্রজিৎ শান্তি-মনীন্দ্র-পরিবার ও নীলার মধ্যে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র। সে একটা রুগ্ন ইচ্ছাশক্তিহীন, পরনির্ভর সাহিত্যসেবী—সম্পূর্ণ জীবনবিমুখ ও পাতালগুহাশ্রয়ী। শান্তির ঘরে সে একমুষ্টি অন্ন ও নিশ্চিন্ত পরমুখাপেক্ষিতার বিনিময়ে তাহার আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সে শান্তির জুয়াখেলার ও আরও মারাত্মক ব্যসনের সাথী—শান্তির শূন্য অর্থভাণ্ডার ও আহত আত্মতৃপ্তি উভয়কেই যথাসাধ্য রসদ যোগায়। নীলা এই জড়তা ও হীন ভোগ-শিথিলতার বন্দিশালার বন্দীকে উদ্ধার করিবার মহৎ সঙ্কল্প লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। শান্তির মোহ কাটাইবার জন্য সে শুধু বদ্ধ ঘরে আলো-বাতাসেরই পথ খুলিয়া দেয় নাই, সেবা-যত্নের স্নিগ্ধতা ও তাহার উপর নিজের দেহসৌন্দর্যের উগ্রতর সুরাও ইন্দ্রজিতের ওষ্ঠে তুলিয়া ধরিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ এই উপহারকে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে ও কিছুটা আত্ম-নির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহার অবসন্ন ইচ্ছাশক্তি পূর্ব সম্মোহের ঘোর কাটাইতে পারে নাই—শান্তির কাছে তাহার যে চিরাভ্যস্ত আত্মসমর্পণ তাহাই শেষ পর্যন্ত নীলার

হিতৈষণার উপর জয়ী হইয়াছে। নীলার প্রতি তাহার মনোভাব কোন দিনই কৃতজ্ঞতা-বোধের ঊর্ধ্বে উঠে নাই ও নীলার দেহের প্রতিও তাহার বিশেষ কোন লোভ জাগে নাই। সুতরাং নীলা দুরন্ত আবেগে যাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ইন্দ্রজিতের সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া সে বিবাহিত জীবনের মর্যাদার পরিবর্তে কেবল কলঙ্কই অর্জন করিল।

আর তৃতীয় যে পরিবারে গলির অশুভ প্রভাব সংক্রামিত হইয়াছে তাহা শকুন্তলার সেবাসত্র। অবশ্য এখানে দুষ্টগ্রহের কাজ করিয়াছে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যাত স্বামী সংবাদপত্র-সেবী বনমালী সরকার। সেই নানা কুৎসা-প্রচারের দ্বারা ও প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সেবিকাদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইহার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছে। এই প্রভাব ঠিক গলির নয়, গলির বাহিরের জগতের। কিন্তু গলির যে দুর্নাম বসাক বাবুদের দিন হইতে রোগের বীজাণুর ন্যায় ইহার আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত ছিল তাহাই এই বাহিরের ঘটনাকে এত দ্রুত কার্যকরী করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গলির বাসিন্দারা সকলেই গলি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে ও অবক্ষয়ের বীজাণুদুষ্ট এই সর্পিল সরণীটি সর্বপাপহর মহাকালের সংশোধনী অভিপ্রায়ের নিকট আত্মবিলুপ্তির অভিশাপে দণ্ডিত হইয়াছে।

যে সমস্ত অবক্ষয়ের কাহিনী উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে গলির আত্মিক প্রভাব সত্য সত্যই কতটা লক্ষ্য করা যায় তাহা আলোচ্য। শান্তি, মনীন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ ইহারাই গলির মধ্যে বেশী দিনের বাসিন্দা। নীলা ও শকুন্তলার পরিবার ইহাদের তুলনায় নূতন আগন্তুক। অবশ্য দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য-সঞ্জাত চরিত্রবিপর্যয় সব জীর্ণ গলির অধিবাসীরই সাধারণ লক্ষণ। নীলা ও শকুন্তলা—ইহারা ঠিক ক্ষয়িষ্ণু মানুষের উদাহরণ নয়, সুস্থ প্রাণশক্তিরই প্রতীক। হয়ত জীবনসংগ্রামে ইহারা পরাজিত ও পলায়িত, কিন্তু গলির ক্ষয়জীর্ণতা ইহাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে নাই। মধ্যবিত্ত সমাজের বাঁচিবার ইচ্ছা ও আদর্শ কতকটা ইহাদের মধ্যে সক্রিয়। শান্তিদের পরিবারে অবশ্য শুধু ক্ষয় নয়, বিকারের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু ঔপন্যাসিক অন্ততঃ তাহাদের অস্বাভাবিক আচরণে গলির বিকৃত প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থখানি সুলিখিত ও অসুস্থ জীবনগুলির কাহিনী যথার্থ কল্পনা ও ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত বিবৃত হইলেও, এক ইন্দ্রজিতের অন্ধকারবিলাসী, কোটরাবদ্ধ ও প্রমথর ব্যঙ্গবিলাসী জীবন ছাড়া অন্য কোথাও গলির সঙ্গে মানব জীবনের নাড়ীর যোগ দেখান হয় নাই।

চাণক্য সেন উপন্যাসক্ষেত্রে নবাগত হইলেও শক্তিশালী লেখক। তাঁহার 'রাজপথ জনপথ' (আগষ্ট, ১৯৬০) ও 'সে নহি সে নহি' (ডিসেম্বর, ১৯৬২) ভারতীয় জীবনের নূতন অঙ্করেখা ও দিগন্তবিস্তারের বার্তা বহন করে। আন্তর্জাতিকতা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ঐক্যবোধ ক্রমশঃ যে বুদ্ধির বহিরঙ্গন পার হইয়া গভীর হৃদয়াবেগের অন্তঃপুরে প্রবেশোদ্যত তাহা তাঁহার উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকার পর্যটক, আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী, উগ্রপন্থী কৃষ্ণকায়, নিগ্রো সবই ভারতের দ্বারে আতিথ্যলাভের আশায় হাজির হইয়াছে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জন মিলার, ভারত সরকারের বৃত্তিভোগী কেনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক পিটার কাবাকু, নাইসাল্যাণ্ডের নবাগত যুবক, ভারত

সরকারের মুখ্য সচিবের গৃহ-অতিথি, সলোমন কুচিরো, ভারত-সন্ধানী, লক্ষপতি ইংরেজ আরনেষ্ট লংকেলো, সংবাদপত্রচারিণী, দাবানলের মত জ্বালাময়ী সিন্থিয়া ওয়ার্ড—এইসব বিভিন্ন জাতির ও মেজাজের নর-নারী ভারতীয় সনাতন সমাজব্যবস্থায়, ভারতের যুগযুগান্তর-পুষ্ট মানস সংস্কারে এক তুমুল আলোড়ন জাগাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক মত-বিনিময়ে, বিভিন্ন জীবন-অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যোন্যপ্রভাবিত বিমিশ্র ক্রিয়ায় জীবনবোধের এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে। লেখকের অল্প কয়েকটি মর্মতাৎপর্যবাহী মন্তব্যে ও বর্ণনায় একটা সমগ্র পরিবেশ ফুটাইয়া তোলার শক্তি সত্যই অসাধারণ। নিগ্রোজাতির সমাজপ্রথা, পারিবারিক রীতি-নীতি, ও স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, হীনম্মন্যতার জন্য দারুণ অভিমান ও পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা গভীর ইতিহাসজ্ঞান ও আবেগময় তথ্যবিবৃতির সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতের আত্মার পরিচয়-লাভের জন্য নিগ্রো আগন্তুকদের একান্ত আগ্রহ তাহাদের জিজ্ঞাসায় ও আচরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিটার ও পার্বতীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও উভয় দেশের অন্তরাকৃতির অভিন্নত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পার্বতী স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে বিকৃত চিন্তাধারা উহার সত্য আদর্শকে আচ্ছন্ন করিতেছে সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন থাকায় ভারতের সত্যরূপটি তাহার সামনে উদ্ভাসিত ছিল ও তাহারই মাধ্যমে পিটার উহা উপলব্ধি করিয়াছে। আন্তর্জাতিকতার হৃৎস্পন্দনসমতার আদর্শ এখানে নূতনভাবে উদাহৃত হইয়াছে।

সামগ্রিক পরিবেশচিত্রণনৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বঘটিত কিছুটা সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিস্ফুরণের নিদর্শন ও উপন্যাসটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। নৈতিক শাসনের শিথিলতা দাম্পত্যসম্পর্কের পবিত্রতাহ্রাস ঘটাইয়াছে ও স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলমেশার সুযোগ সুনিয়ন্ত্রিত মনোরাজ্যেও একটা অসংযমের উচ্ছ্বাস জাগাইয়াছে। চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া মুখ্যসচিবগৃহিণী সুলোচনা স্বামীর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হৃদয়-ব্যবধান অনুভব করিয়া ও নিজের চিরাচরিত সংযম-সংস্কার ভুলিয়া নিজ পুরুষজয়ের মোহিনীশক্তি পরীক্ষার জন্য বিদেশী পুরুষের আলিঙ্গনে ধরা দিয়াছে—কোন দুর্বার প্রবৃত্তির বশে নয়, নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের আকর্ষণে। পঞ্চাশোত্তীর্ণ সচিবও নিজ গৃহে অতিথি বিদেশিনী প্রৌঢ়ার সহিত কামকলার চরিতার্থতাসাধনে কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব করে নাই। তথাকথিত অভিজাত-সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর এই দাম্পত্য আদর্শচ্যুতি তাহাদের পারিবারিক জীবনের ছদ্মশান্তির কোন ব্যাঘাত ঘটায় নাই। এই ছোটখাট অনাচারগুলি আধুনিক যুগের জীবনাদর্শে যে কি সাংঘাতিক ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহার প্রমাণ দেয়। জীবনে আলোচনা ও বুদ্ধির ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইতেছে, দিগন্ত যতই প্রসারিত হইতেছে, সমগ্র বিশ্ব আমাদের দ্বার ভাঙ্গিয়া যতই ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, ততই সুমিত জীবনবোধ ও সংযমশুদ্ধ আনন্দ বিপর্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। যদি আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে জীবনের নব পরীক্ষা ও উপভোগক্ষেত্রের কর্ষণ আধুনিকতার ইতিবাচক দিক (positive) হয় তবে নিছক প্রসারের মোহে ভাবকেন্দ্রবিচ্যুতি ও মূল্যবোধবিপর্যয় ইহার নেতিবাচক (negative) দিক। সমগ্র বিশ্ব-অনুপ্রবেশ নিয়মিত করিবার নূতন নীতি ভারতীয় জীবনবোধ এখনও স্বাঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে নাই।

'সে-নহি সে নহি' উপন্যাসের পটভূমিকা ইউরোপ-আমেরিকায় প্রসারিত, কিন্তু জীবনকেন্দ্র ভারতবর্ষনিহিত। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে নূতন মনোধর্মের উদ্ভব, যে নূতন সমস্যা জীবনপথকে কণ্টকিত করিয়াছে, যে নূতন ভোগবাদ পূর্ব আদর্শনিষ্ঠাকে শিথিল করিয়া দিতেছে তাহার পরিণতমননশীল নিপুণ বিশ্লেষণ লেখকের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় বহন করে। এই ইতিহাসসত্যের মূল্যায়ন উপন্যাসটির একটি প্রধান আকর্ষণ। এই সমাজ-প্রতিবেশে ব্যক্তিজীবনের চিত্রগুলি অপরিহার্যভাবে মুখ্যতঃ সমাজ-প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রী আম্মা, বাসন্তী দেবী, ডাঃ ভগবান দাস প্রভৃতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে অতীত সংগ্রাম-শীলতা ও বর্তমান নিষ্ক্রিয়তার দ্বন্দ্ব একটি বেদনাময় ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। তারুণ্যের জ্বলন্ত আদর্শবাদ বর্তমানের ভোগলোলুপ, আত্মতৃপ্ত জীবনে কোন সামঞ্জস্যবোধ খুঁজিয়া পায় না। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে পরস্পরকে না-বোঝা এক দুস্তর ব্যবধান নিদারুণ বিদারণরেখা উৎকীর্ণ করিয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় সাবিত্রী আম্মা ও তাঁহার কন্যা সরোজার বিপরীতকেন্দ্রাবর্তিত জীবনে। এমন কি যেখানে মাতা ও কন্যার মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভক্তির সম্পর্ক অবিকৃত আছে যেমন বাসন্তী দেবী ও দেববাণীর মধ্যে—সেখানেও দুইজনের অন্তর পরস্পরের নিকট চিররুদ্ধ। তৃতীয় পুরুষেও —দেববাণী ও দেবকুমারের মধ্যেও—এই মনোগহন হইতে উৎক্ষিপ্ত অজ্ঞাত ছায়া আতঙ্ক-বিমূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে। এই দ্রুতধাবমান, ত্বরাতাড়িত যুগে স্বামী-স্ত্রী যেমন পরস্পরের মনের নাগাল পায় না, কোন সাধারণ ভূমিতে মিলনের ভিত্তি নির্মাণ করিতে পারে না, তেমনি সংসারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ যে সম্পর্ক—মাতা ও সন্তানের সহজ একাত্মতার অনুভূতিও —সংশয়জালে আকীর্ণ ও রহস্যভারে দুর্ভর। অতিরিক্ত প্রগতির অভিশাপই হইল প্রত্যেক জীবনকালের অতীতের সহিত বন্ধনচ্ছেদ, সাধারণ উত্তরাধিকারের অভাব, স্থির প্রত্যয় ও দীর্ঘ অনুশীলনজাত সংস্কারের পলিমাটি জমিবার পূর্বেই স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাওয়া। তাই এক পুরুষ (generation) পরবর্তী পুরুষকে চিনিতে না পারিয়া এক দুঃস্বপ্নের বোঝা বহন করিয়া চলে—অব্যবহিত ভবিষ্যৎ বর্তমানের নিকট প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত।

এই তিন মহাদেশব্যাপ্ত বিরাট পটভূমিকায় দেববাণী ও হিমাদ্রি একই হৃদয়সমস্যার দুর্বহ ভারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। হিমাদ্রি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহার জ্ঞানসাধনা ও কীর্তিচ্ছটা প্রসারিত। দেববাণীও প্রথম যৌবনের এক অপাত্রন্যস্ত হৃদয়-সমর্পণের ব্যর্থতা ভুলিতে হিমাদ্রির সাহায্যে নিজেকে বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী করিয়াছে ও এই সাধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু বিবাহের ফল একমাত্র পুত্র দেবকুমার তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহপূর্ণ উদ্বেগের পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পুত্রই তাহার প্রেমজীবনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা এই স্বল্পভাষী বালকের মনে তাহার পিতার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে বর্তমান। হিমাদ্রির সহিত নূতন সম্পর্ক সে কি ভাবে গ্রহণ করিবে সে সম্বন্ধে সংশয়ই দেববাণীকে হিমাদ্রির উদ্যত প্রেম স্বীকার করিয়া লইতে বাধা দিয়াছে। দীর্ঘদিন তাহার সত্তার দুই উপাদান—জননী-অংশ ও প্রিয়া-অংশ —পরস্পরের সহিত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শান্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা হারাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রির দৃঢ়তায় ও দেবকুমারের প্রসন্ন অনুমোদনে এই সুদীর্ঘ আত্মদ্বন্দ্বের অবসান

ঘটিয়াছে ও যুগসমস্যার বিঘূর্ণিত চক্র যে মানবাত্মাকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করে তাহার আবর্তন বন্ধ হইয়া উহার অন্তর্নিহিত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সতীদেহ আবার জুড়িয়া এক হইয়াছে; পূর্বস্মৃতির কবন্ধ, কল্পিত বাধার দীর্ঘ ছায়া, অসুস্থ মনের বহুরোমন্থনপ্রবণতা ও কূট বিচারশীলতার কুহেলিকা সবই সুস্থ, স্বচ্ছ আবেগধারায় ধৌত হইয়া মনের দিগন্ত নির্মল-আলোকস্নাত হইয়া উঠিয়াছে।

উপন্যাসের পরিণত মননশীলতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ইহার একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বর্তমানের অপেক্ষা অতীতেরই প্রাধান্য। যাহা প্রত্যক্ষভাবে ঘটিতেছে তাহার বর্ণনা অপেক্ষা যাহা পূর্বে ঘটিয়াছে তাহার বিশ্লেষণই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যেন ঘটমান জীবনযাত্রার স্বাদ হইতে আমরা বঞ্চিত থাকি। বর্তমান আমাদের নিকট হৃদয়াবেগের অভিজ্ঞান লইয়া আসে নাই, আসিয়াছে মতবাদের বুদ্ধিগত আলোচনা লইয়া। এখানে যেন জীবনের অগ্নিশিখা তর্কের বায়ু-উৎক্ষিপ্ত ভস্মাচ্ছাদনে নিষ্প্রভ, প্রজ্ঞারচিত জীবনভাষ্যে শীতলায়িত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সাবিত্রী আত্মার পূর্বস্মৃতি-উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহ ঐতিহাসিক কাহিনী, ঔপন্যাসিক সত্য নয়। কালব্যবধানে বিদ্রোহের উত্তাপ জুড়াইয়া গিয়া এখন সমীক্ষার উপকরণে পরিণত হইয়াছে। বাসন্তী দেবীরও অতীত-কাহিনী জীবন-সায়াহ্নে পেছন-ফিরিয়া-দেখা হৃদয়াবেগের শান্ত, বেদনাবিদ্ধ স্মৃতি। উপন্যাসে পশ্চাৎ-দর্শনের (retrospect) উপযোগিতা আছে, কিন্তু তাহা চলমান জীবনপ্রবাহের তটভূমিরূপে প্রত্যক্ষকে স্পষ্টতরভাবে বোধগম্য করার জন্য। এখানে উপন্যাসের দীর্ঘ অংশ এই পিছন-টানের অতিপ্রবণতায় বর্তমানকে নিশ্চল রাখিয়াছে। হয়ত আধুনিক জীবনের স্বরূপই এই। ইহার বর্তমান অতীত স্মৃতিতে স্বপ্নাচ্ছন্ন, ভবিষ্যতের অনাগত সম্ভাবনার কল্পনায় দ্বিধা-মন্থর। ইহা যেন রাশিপ্রমাণ চিন্তা-জটিলতা হইতে এক বিন্দু জীবনাবেগের উদ্ধার, পরিবেশের শতশাখায় প্রসারিত, আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া-ধরা বেষ্টনের সঙ্গে মানবমনের সামঞ্জস্যস্থাপনের প্রাণান্তকর প্রয়াস। ইহার আপাত-পূর্ণচ্ছেদের পিছনেও অদৃশ্য জিজ্ঞাসা-চিহ্ন উদ্যত হইয়া থাকে। তাই আধুনিক উপন্যাসের কথার সমাপ্তি নাই, আছে দিগন্তশেষে অনন্ত-প্রসারিত প্রশ্নপরম্পরার শৃঙ্গশ্রেণী। যবনিকাক্ষেপের অন্তরালে নূতন নাটকের প্রস্তুতি চলিতেছে কি না কে বলিতে পারে?

(৮)

ধর্মজীবন যে অতি-আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তুনির্বাচনে ও ভাবপরিমণ্ডল-রচনায় এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের ভৃগুজাতক' (মার্চ, ১৯৫৭), স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাথুর' (জুলাই, ১৯৫৭) ও অবধূত নামধারী লেখকের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' ও আরও কয়েকটি উপন্যাস এই ধর্মপ্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য ধর্মের আকর্ষণ বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের। অবধূতের রচনায় তান্ত্রিক সাধনাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত বীভৎস ও ভয়ানক রস ও উহার অবদমিত প্রবৃত্তির পিছনে অবচেতন মনে যৌন কামনার গোপন প্রক্ষেপ আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও কলানৈপুণ্য ও হয়ত কিছুটা রুচিহীনতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মসাধনার জটিল

মনোবিকার ও ছদ্মবেশী দুর্বলতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও তাঁহার অনেক উপন্যাসে এই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি ইহা যে তাঁহার অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই প্রমাণ করে। বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য ধর্মের অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও পূজারীতির আনুষ্ঠানিক সমারোহের ও ধর্মাচরণরত ব্যক্তিদের বিচিত্র-অদ্ভুত মনোভঙ্গীর প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছে। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণবধর্মের অপ্রাকৃত প্রেমের ভাব-তন্ময়তা ও বিশুদ্ধ রসানুভবের দিকটাই আধুনিক নর-নারীর চিত্তে ও বর্তমান সমাজ-পরিবেশে স্ফুরিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

'ভৃগুজাতক'-এ খাঁটি ঔপন্যাসিক গুণের আপেক্ষিক অভাব। ধর্মের বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড, ধর্মপাগল লোকদের মনোভঙ্গীর অসাধারণত্ব, তীর্থস্থানসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উদাস-করা গাম্ভীর্য এক ভাবতন্ময়, স্বপ্নপ্রবণ বালকের অনুভূতিতে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। অবশ্য এই অলৌকিক সংস্কার বালকের মনে শিথিলভাবে সংলগ্ন আছে; ইহা কোন কেন্দ্রগত সংহতি লাভ করে নাই। শৈশব হইতে যৌবনে উত্তরণ, নানাস্থানে ভ্রমণ ও বাস, বহুবিধ ব্যক্তির সহিত আলাপ-পরিচয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অভিজ্ঞতার পরিধি-বৃদ্ধি তাহার জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনে নাই ও সক্রিয় স্বীকরণ-শক্তির উদ্বোধন করে নাই। সে বরাবরই অদৃষ্টের ক্রীড়নক, ঘটনাপ্রবাহের ভীত ও অসহায় দর্শকই রহিয়া গিয়াছে। তাহার জীবন এই সমস্ত অনুভূতির সংযোগস্থল বলিয়াই তাহার নায়কত্বের যাহা কিছু দাবী।

উপন্যাসটির চিত্রসৌন্দর্য ও অপ্রাকৃত চেতনার বিচিত্র উন্মেষ উহার মুখ্য উপজীব্য। আমাদের ভূসংস্থানের উপত্যকা-অধিত্যকায় ঢেউ-খেলানো পার্বত্য বন্ধুরতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপতা ও নাগাস্থানের আদিম-অনার্য জাতির নানা কল্পনাঢ্য কাহিনী ও কিংবদন্তী গ্রন্থটির প্রধান আকর্ষণ। মানুষের ও ঘটনার মধ্যে ক্ষেত্র-দিদি ও বনমালী কবিরাজ ও তাঁহাদের মন্ত্রতন্ত্রপ্রয়োগ, পাগলা বাবার অলৌকিক শক্তির কাহিনী, রথের মেলা, ভূতের ভয়, আজিজের মায়ের পাঁচপীরের দোয়া-ভিক্ষা, সাপে-কাটা মড়া বাঁচাইতে রোজাদের ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্র-আবৃত্তি, রমণী চক্রবর্তীর নৌকাপূজায় দৈবী করুণার আবাহন, পাহাড়ী নদীর অপূর্ব শোভা, সিদ্ধিনাথের মহাবারুণী মেলা, পাঁচপীরের দরগার ফকির, অপার্থিব, করুণ প্রেমের স্মৃতি-অনুরঞ্জিত, ভাটি, মোহন ও লবাই সর্দারের দৈবাহত জীবনকাহিনী, ভুবননাথের দর্শনার্থী নর-নারীর তীর্থযাত্রা ও সেখানে নায়কের অভাবনীয় অভিজ্ঞতা, ভৈরবী মা ও নাগাসন্ন্যাসীর অহেতুক বাৎসল্যপ্রকাশ, শেষ পর্যন্ত কলিকাতাবাসকালীন জ্যোতির্বিদ্যা-আলোচনা ও কাজরীর সহিত সাক্ষাৎ ও বিবাহ—এই সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সমাবেশ হইয়াছে নায়কের জীবনে। নায়ক সময় সময় ধ্যানসমাধিমগ্ন ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির অধিকারী—বিভিন্ন ঘটনা ও মানুষ তাহার বাস্তববিমুখ কল্পনায় এক হইয়া মিশিয়া যায়। এই ধ্যান-কল্পনার অধিকারের জন্যই সে তাহার পিতৃদত্ত অম্বুজ নামের পরিবর্তে ভৃগু এই পৌরাণিক নামেই পরিচিত হইয়াছে।

উপন্যাসের মানবিক সম্পর্কের দিকে সুব্রতার সহিত ভৃগুর মিতালিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ছেলে-মেয়ের সম্পর্কের মধ্যে পূর্বজন্মস্মৃতির কল্পনা, মাঝে মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে

ভবিষ্যতের পূর্বাভাসলাভ, সুব্রতার জীবনে এক অমোঘ অভিশাপের আতঙ্ক তাহাদের সুস্থ বাল্যসাহচর্যের উপর এক অজ্ঞাত ভীতিশিহরণের সঞ্চার করিয়াছে। জীবন পরামাণিক ও তাহার তরুণী স্ত্রী চন্দ্রার সঙ্গে নায়কের পরিচয় তাহাকে মানব-প্রকৃতির আর একটা নির্মম ও দুর্বোধ্য দিকের সন্ধান দিয়াছে। চন্দ্রা তাহার স্বামীর নির্যাতনের চিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন করিয়াও তাহার প্রতিকার চাহে না। এক নামহীন আতঙ্ক তাহাকে সব সময় মূক করিয়া রাখিয়াছে। নায়ককে সে ছোট ভাই-এর ন্যায় ভালবাসিলেও স্বামীর ক্রূর জিঘাংসার ছদ্মবেশী বন্ধুত্বের উপহার তাহার নিকট লইয়া গেলেও সে তাহার নিকট হৃদয়ের কপাট খুলিতে সাহসী হয় নাই। এক রাত্রিতে তাহার আকস্মিক মৃত্যু নায়ককে জীবনের নির্মম রহস্যের প্রতি হঠাৎ সচেতন করিয়াছে।

নায়কের জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা ও কাজলীর সহিত তাহার বিবাহ—উভয় ঘটনাই খুব আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। তাহার পুত্রের জন্মলগ্নে এই জ্যোতিষচর্চার সহিত মানবকল্যাণ-বোধের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহারই পরিণতিতে সে জ্যোতিষগণনাকে সুস্থ জীবনবিকাশের পরিপন্থী মনে করিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই সংঘর্ষের কোন পূর্বাভাস উপন্যাসে নাই; কিন্তু ইহাতে তাহার আজীবন দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস যে শিথিল হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত মিলে। উপন্যাসটি অদ্ভুতরসপ্রধান ও কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু উপন্যাসোচিত ভাবসংহতি, গঠন-ঐক্য ও চরিত্রপরিণতির কোন নিদর্শন এখানে নাই।

•

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাথুর' (জুলাই, ১৯৫৭) বৈষ্ণব রসসরোবরে বিকশিত একটি বাস্তব জীবন-শতদলের গন্ধভরা কাহিনী। যে নিবিড় ভাবানুভূতি লইয়া বৈষ্ণব সাধনার মহাজন-পদাবলী ও দর্শনশাস্ত্রগুলি লেখা তাহারই একটি বিন্দু যেন এই উপন্যাসের জীবন-আখ্যানে, আধুনিককালের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজপরিবেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। মনে হয় যেন চৈতন্য যুগেরই একটি বিস্মৃত কাহিনী এই উপন্যাসে রূপ পাইয়াছে। ঐকান্তিক আত্মনিবেদন, প্রগাঢ় শান্তি, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পরম দৈবনির্ভরতা এখানে মানব হৃদয়বৃত্তিসমূহের একক পরিচয়। সমস্ত পরিবার ও সমাজ যেন বৈষ্ণব রসসাধনার লীলাক্ষেত্রের রূপ-প্রতিবিম্ব অর্জন করিয়াছে। সমস্ত গ্রামটি বৈষ্ণব আচার-আচরণে শুদ্ধশান্ত, কীর্তন-মহোৎসবে বিভোর। পরিবারের তিনটি মানুষ - শশিনাথ, সরমা, রূপমঞ্জরী—বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলের স্থায়ী অধিবাসী। বৌদিদি সরমার মধ্যে একটু লৌকিক জীবনের ঝাঁজালো প্রতিবাদ ছিল, কিন্তু এই রসসমুদ্রে উহার দাহ অচিরাৎ প্রশমিত হইয়াছে। এই দিব্য প্রেমের নীল সায়রে যে কমলিনী বৈষ্ণব-ভাবের গন্ধানুবাসিত হইয়া রূপে ও রসে হিল্লোলিত হইয়াছে সে রূপমঞ্জরী। সে আধুনিক যুগের নামের সঙ্গে সঙ্গে উহার জটিল ও বহুমুখী চিত্তবিক্ষেপকেও পরিহার করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমসাধনায় তন্ময় হইয়াছে।

এই ভাববৃন্দাবনে বাহির হইতে দুইজন আগন্তুক প্রবেশ করিয়া ইহার নিগূঢ় প্রভাবের অধীন হইয়াছে। এক মাতাল, জুয়াড়ী, একনিষ্ঠ প্রেমে অবিশ্বাসী ও নারী-হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে অভ্যস্ত সঙ্গীত-শিক্ষক আনন্দলাল এখানে আসিয়া ইহার স্নিগ্ধ, শীতল

বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লইয়াছে ও ইহার বাতাবরণের মূর্তিমতী প্রতিমা রূপমঞ্জরীর প্রতি একটা গভীর প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। এই দিব্যপ্রেমসাধিকা, বৈষ্ণব ভাবাদর্শে সমর্পিত-চিত্তা রূপমঞ্জরী তাহার অকৃপণ, বিনয়মণ্ডিত সেবা দিয়া আনন্দলালের রোগযন্ত্রণানিবারণ ও প্রাণের আকূতি পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার নির্মল সত্তা কোন স্থূলতর আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণে রাজি হইল না। তবে রূপমঞ্জরীর প্রেরণায় আনন্দলালের চিত্তবিশুদ্ধি জন্মিয়া উমা মল্লিকের সহিত তাহার পুনর্মিলন বাধামুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসের বিশুদ্ধতম বৈষ্ণবাদর্শ-প্রভাবিত মিলনের প্রয়াস চলিয়াছে নীলকেশব ও রূপমঞ্জরীর অনুরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলার মাধ্যমে। দুই ভাবসাধনাপূত আত্মা যেন রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রণয়াদর্শের নিখুঁত অনুসরণে পরস্পরের দিকে অগ্রসর ও এক দুর্লঙ্ঘ্য আন্তর বাধায় প্রতিহত হইয়াছে। তাহাদের মনের গতি যেন চৈতন্যচরিতামৃতের সূক্ষ্মতত্ত্বের দুর্নিরীক্ষ্য রেখা অবলম্বনে অভিসারের অভিমুখী হইয়াছে। রূপমঞ্জরী নীলকেশবকে তাহার ভক্তির সমস্ত একাগ্রতা দিয়া, কৃষ্ণপ্রেমের পরম আত্মনিবেদনের নির্ভরতার সহিত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। নীলকেশব রূপমঞ্জরীকে তাহার সাধনপথের অন্তরায়রূপে সভয়ে পরিহার করিয়াছে ও কঠোর সাধনায় তাহার আকর্ষণকে প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নীলকেশব তাহার সাধনার অভিমান ত্যাগ করিয়া রূপমঞ্জরীর নিকট আপনার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছে। রূপমঞ্জরী মাথুরবিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধিকার ন্যায় তাহার দয়িতকে সাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য সমস্ত বাধামুক্ত করিয়াছে ও তাহাদের সম্পর্ক একটি বিশুদ্ধ আত্মিক মিলনের দেহবন্ধনহীন আকর্ষণে পরিণত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-মিলন-মাধুর্যের একটি প্রতিরূপ উপন্যাসের বাস্তবজীবনে ছায়া ফেলিয়াছে।

উপন্যাসের ঘটনাসংস্থান অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত, আত্মার জ্যোতির আধার হইবার জন্য যতটুকু বহিরাবরণের প্রয়োজন তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষগুলিও সহজ, সরলবিশ্বাসী ও ভগবৎলীলার রসাস্বাদনই তাহাদের মানবিক বৃত্তিসমূহের একমাত্র উপযোগিতা। লেখকের মন্তব্য ও পরিবেশরচনা অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধের সহিত এই লীলাবিলাসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। এখানে মন উদাস, নিষ্ক্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম শুদ্ধ ও শান্তির গভীরতায় বিলীন, হৃৎস্পন্দন অধ্যাত্মবোধস্ফুরণের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। গ্রন্থের প্রতি পংক্তি, চরিত্রসমূহের প্রত্যেক মানবিক প্রচেষ্টা হইতে শান্ত ও মধুর রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া সমস্ত আকাশ-বাতাসকে এক অপার্থিব দ্যোতনায় ভরিয়া তুলিয়াছে। এই উপন্যাসের কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই, ইহা বৈষ্ণব রসসাধনার একটি আধুনিক-যুগোচিত, বস্তু ও মানবিকভাবের স্বল্পতম উপাদানে গঠিত, স্বচ্ছতম পটভূমিকায় বিন্যাস করিয়াছে। লেখকের আবেগের মধ্যে অতিরঞ্জন নাই, আছে গভীর, অকৃত্রিম অনুভূতি ও গৌড়ীয় প্রেমধর্মের অস্খলিত অনুবর্তন। এখনও যে বৈষ্ণব সাধনাকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জীবনযাত্রাকে মাধুর্যসিঞ্চিত করিবার প্রয়াস অবাস্তব ঠেকে না, তাহাই বৈষ্ণবধর্মের অক্ষুণ্ণ প্রভাবের প্রামাণ্য নিদর্শন। উপন্যাসটি সেইজন্য ধর্মসাধনার অনুবর্তী হইয়াও মানবিক তাৎপর্যের সমর্থন হারায় নাই।

ধর্মসাধনার গুহ্য রহস্য ও বীভৎস মানস-প্রেরণার গভীরে অবধূতই সর্বাধিক সাফল্যের

সহিত অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। উৎকট তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভীষণতা, শ্মশান-সমাগত শোকবিহ্বল নর-নারীর আকস্মিক মানস প্রতিক্রিয়া, মৃত্যুসম্মুখীন মানবের উদাস বৈরাগ্য ও বে-পরোয়া মনোবৃত্তি তাঁহার রচনায় সার্থক আবেগবিহ্বলতা ও ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটি এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহার রচনা-তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারী। হিন্দুর ধর্মসংস্কারপুষ্ট মনে শ্মশানের যে ভাবাবেদন তাহা নানা চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সর্বপ্রথম শ্মশানাধিপতি গোঁসাই বাবা যেন শ্মশান-প্রহেলিকারই একটি মানবিক প্রতিরূপ। তিনি মানবের সমস্ত শোকে ও বুকফাটা কান্নায় শ্মশানের মতই নির্বিকার ও উদাসীন। তাঁহার প্রচণ্ড মনোবল মৃত্যুর ন্যায়ই কুণ্ঠাহীন ও অপরাজেয়। ভালবাসার ব্যাকুল আবেদন, মানব মনের সমস্ত অসংবরণীয় শোকোচ্ছ্বাস তাঁহার লৌহবর্মাবৃত হৃদয় হইতে কোন দাগ না কাটিয়াই প্রতিহত হয়। অথচ মানবচিত্তের সূক্ষ্মতম অনুভূতি, স্নেহপিপাসু অন্তরের মান-অভিমান ছদ্ম-ঔদাস্যের ক্ষীণতম কম্পন, শ্মশান-বাতাবরণের নিগূঢ়তম ভাবসংকেত তাঁহার সংবেদনশীল, তারের বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় সর্ববিধ সুর ধরিয়া রাখার উপযোগী মনে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত ও অপূর্বভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাব এই দ্বৈত ভাবের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তবে এই বিপরীত উপাদানের সহাবস্থান অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না।

শ্মশানচারী চরিত্রসমূহের মধ্যে নিতাই বৈষ্ণবী ও চরণ দাসের দেহসম্পর্কহীন, ভাবসর্বস্ব ভালবাসা, খন্তা ঘোষের প্রেমের আহ্বানে বীরোচিত আত্মোৎসর্গ ও মৃত্যুবরণ, আগমবাগীশের বীভৎস উপচারে শক্তিপূজা ও অনিচ্ছুকা সাধনসঙ্গিনীর উপর সম্মোহনশক্তির প্রয়োগ, সদ্যোবিধবা সিংহ-গৃহিণীর সহিত আগমবাগীশের সাধনসম্পর্কস্থাপন ও উহার ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত পরিণতি, শ্মশানের স্থায়ী অধিবাসী ডোম-মড়াপোড়ার দল, শবানুগামী আত্মীয়-স্বজনের ক্ষণিক ভিড়—এই সমস্ত জনতার বিচিত্র মানস প্রকাশ, আবেগের অতর্কিত স্ফুরণ, মৃত্যুর স্পর্শে বৈরাগ্য ও জীবনমমতার মধ্যে অভাবনীয় সংঘাত সমস্ত উপন্যাসটিকে একটা অদ্ভুত চিত্রসৌন্দর্য ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ইহাতে কোন চরিত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই ও উপন্যাসসম্মত বিশ্লেষণের সমগ্রতা নাই। কেবল জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত-প্রদেশে অস্থির চরণে দণ্ডায়মান কয়েকটি বিহ্বল নর-নারীর মনের হঠাৎ-জ্বলিয়া-ওঠা, বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গগুলি মানবচরিত্রের এক রহস্যময়, আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট তির্যক-বিকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। চিতানলের সঙ্গে গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জ্বালা অগ্নির যে পার্থক্য, সাধারণ মানুষের সঙ্গে শ্মশানপ্রান্তচারী মানুষেরও ঠিক সেই পার্থক্যই উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবধূত মহাশয়ের একাধিক রচনাতে ধর্মজীবন ও ধর্মচর্যারত সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, গুরু প্রভৃতি জাতীয় মানুষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ধর্মের প্রতি তাহার বিষয়গত আকর্ষণ যেমন প্রবল, ধর্মাচারীদের আত্মপ্রবঞ্চনা, অবরুদ্ধ যৌন কামনা, প্রতিষ্ঠালোলুপতা প্রভৃতি গোপন দুর্বলতার প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি সেইরূপ অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িলে ধারণা জন্মে যে, ইন্দ্রিয়বিকার যেন ধর্মগত কৃচ্ছ্রসাধনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। সুস্থ ও নির্মল ধর্মসাধনার চিত্র তাঁহার উপন্যাসে বড় একটা নাই। ধর্মব্রতী জীবনের প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গকুটিল, তির্যক-ইঙ্গিতপূর্ণ, গোপনছিদ্রান্বেষী মনোভঙ্গী সদা-উদ্যত। তাঁহার শ্লেষের বাঁকা

তরবারি ছদ্মভক্তির আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলির দূষিত অন্ত্রগুলিকে নিষ্কাষিত করিয়াছে। তাঁহার এই মানস প্রবণতার তাপজ্বালা তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার আধুনিকতম রচনা 'পিয়ারী'-তে (জুলাই, ১৯৬১) ব্যঙ্গরসিকের আশ্চর্য দ্যোতনাশক্তির মাধ্যমে উগ্রভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 'পিয়ারী' গল্পে তিনি এক সাধু-মহান্তর জবানীতে গুরু-সম্প্রদায়ের কুকীর্তিসমূহ পরোক্ষ উল্লেখের সাহায্যে ভয়াবহরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার সাক্‌রেদ জগ্‌মোহনের সকলপ্রকার অপরাধ ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাইবার একরোখা প্রবণতা তাঁহার নিজের সাধু-জনোচিত শান্তিপ্রিয়তা ও আত্মরক্ষানীতির আরামকে বার বার বিপর্যস্ত করিয়াছে। উজ্জয়িনীতে এক বড় সাধু মহারাজ যখন এক দর্শনার্থী ভক্তের রূপসী স্ত্রীকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখন জগ্‌মোহন গুরুর নিষেধবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া সাধুর তাঁবুতে হানা দিয়া ও তাঁহার হঠযোগের সাধনায় সদা-আকুঞ্চিত-বিস্ফারিত নাসিকাটিকে কর্তন করিয়া তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীক্ষেত্রে অগ্নিদগ্ধ তুলিয়া-পল্লীতে এক শিশুকে উদ্ধার করিতে গিয়া হঠকারী জগ্‌মোহন নিজেকে ও গুরুকে নানা বিপদে জড়াইয়াছিল। গুরুর একমাত্র ভয় কখন এই বিশ্বস্ত ও সেবাপরায়ণ শিষ্যকে হারান। জগ্‌মোহনের চরম পরীক্ষা ঘটে অর্ধোদয়যোগে পুণ্যসঙ্গমস্নান উপলক্ষ্যে। সেখানে স্নানরত দ্বারভাঙ্গার এক জমিদার-মাতা তাহাকে দেখিয়াই নিজ হারান নাতজামাই বলিয়া চিনিতে পারিলেন, ও বিরহতাপিতা নাতিনীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। শিষ্যের এই আকস্মিক সৌভাগ্যোদয়ে পুলকিত গুরু মুখে বিষয়-বিরক্তির বুলি আওড়াইয়া হস্তিপৃষ্ঠে শিষ্যের অনুসরণ করিয়া রাজবাড়ীর বাহিরে তাঁবু খাটাইয়াছেন। কিন্তু কুলটা রাজকন্যা স্বামীর আগমনে তাহাকে ভাল করিয়া না চিনিয়াই তাহার মুখে বিষের বাটী তুলিয়া ধরিয়াছে। সে না খাইলে রাজকন্যা নিজেই বিষ খাইবে এই ভয় দেখাইয়াছে। উচ্চবংশীয়া কুলবধূর মানরক্ষার জন্য জগ্‌মোহন নিজেই বিষ খাইয়া গুরুর চরণপ্রান্তে সমস্ত নিবেদন করিয়া হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। এই পটভূমিকায় একটি আহিরজাতীয় তরুণ-তরুণীর প্রথম মুগ্ধ প্রণয়াবেশ কেমন করিয়া হেয় ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া করুণ শোকাবহ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারই একদিকে আবেগময়, অন্যদিকে মৃদু শ্লেষে আরও মর্মভেদী বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমস্ত আখ্যানটি প্রত্যক্ষ বিবৃতি ও পরোক্ষ উল্লেখের সমাবেশে, মন্তব্য ও চরিত্রদ্যোতনার সুষ্ঠু সংযোজনায়, সংযোগসূত্রের দক্ষ সঞ্চালনে, আবেগ-স্ফুরণে ও অতি-নাটকীয় বর্ণাঢ্যতায় চমৎকার গঠনকৌশলের নিদর্শন। এই ক্ষুদ্র গল্পটিতে গুরু নিজের ধর্মজীবনের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে আধ্যাত্মিকতার অভিমান, আরামের মোহ, ভক্তি-উদ্দীপনের জন্য বুজরুকী ও অলৌকিক শক্তির আড়ম্বর প্রভৃতি দুর্বলতা শ্লেষমিশ্রিত চটুলতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প 'দাবানল'-এ চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর একান্ত আচারনিষ্ঠ, নিত্য বিগ্রহপূজায় নিবিষ্টচিত্ত, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানশুচি অন্তর্জীবনের রন্ধ্রপথে যে যৌনবুভুক্ষার নগ্ন বীভৎসতা পাতাল-নাগিনীর উদ্যত ফণার মত উঁকি মারিয়াছে তাহা মানব প্রকৃতির রহস্যময়তার উপর এক ঝলক চোখধাঁধান, শিহরণকারী আলোকপাত করে। ধর্মসাধনা প্রবৃত্তির

উৎসাদনের জন্ত অন্তর মধ্যে যে খনন-রেখা উৎকীর্ণ করে, সেই সুড়ঙ্গপথের গভীরতায় কত বীভৎসাকার সরীসৃপ আত্মগোপন করিয়া থাকে। জীবনব্যাপী সংযমের কোন শিথিলতার সুযোগে এই অদম্য প্রবৃত্তিগুলি অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হয় ও মানুষকে আত্ম-অবমাননার অমর্যাদায় লুটাইয়া দেয়। অনেক সময় এই পশু-প্রবৃত্তির স্ফুরণ মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার অবচেতন মনের অন্ধকার গুহা হইতে প্রেরণা আহরণ করে। পাপের গোপন বীজ ধর্মের নামাবলীর অন্তরাল হইতে, নানা আপাত-দৃশুমান ঊর্ধ্বারোহণপ্রয়াসের ছদ্মবেশে জীবনের উপরিভাগে, বহিরাচরণের প্রকাশুতায় অঙ্কুরিত হয়। অবদমিত প্রবৃত্তির শুষ্ক কাষ্ঠে এই দাবানলের স্ফুলিঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে। অন্তরসঞ্চিত ইন্ধনরাশিই নিজ প্রাচুর্যে ও পারস্পরিক ঘর্ষণে অনিবার্য শিখায় জ্বলিয়া উঠে। অতিরিক্ত চেষ্টাপ্রসূত সংযমনে সহজাতবৃত্তিসমূহের যে কৃত্রিম শুষ্কতা ঘটে, শিরাস্নায়ুর যে সহজ ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয় তাহাই সুপ্ত বহ্নিকণাকে উৎক্ষিপ্ত করে। ইন্দ্রিয়দ্বারনিরোধের অসহ্য গুমটই ইন্দ্রিয়বিকারের উত্তেজক কারণ যোগায়।

এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর জীবনে আশ্চর্য সুসঙ্গতি ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত উদাহৃত হইয়াছে। ত্রিবেদীবাড়ীর গঙ্গাতীরসংলগ্ন প্রতিবেশরচনার মধ্যেই এক অশুভশংসী ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। বাড়ীর পাশে প্রবহমান গঙ্গাস্রোতে নানা জাতীয় মৃত জীব-জন্তুর ভাসিয়া-যাওয়া, বাড়ীর ছাদে মৃতদেহলুব্ধ শকুনগোষ্ঠীর সমাবেশ সুপ্রযুক্ত রূপকব্যঞ্জনার সাহায্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে পচনশীল, গলিত শবদেহের অস্তিত্বের আভাস দেয়। তিনি তাঁহার মৃত্যুপ্রতীক্ষায় যে পবিত্র চন্দন ও বিল্বকাষ্ঠে প্রকোষ্ঠ বোঝাই করিয়াছেন, নিয়তির ক্রূর পরিহাসে তাহা তাঁহার জীবন্ত দেহেরই চিতাশয্যা রচনা করিয়াছে। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিলাভের সাধনা তাঁহার বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু দুইটির উপর অন্ধত্বের নীরন্ধ্র যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ধীরে ধীরে এবং হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই মোহজালে আবিল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে তাঁহার ভাই ও ভ্রাতৃবধূর প্রণয়াবেশ-চাপল্যের দুই-একটি গুঞ্জন তাঁহার কানে ঝঙ্কৃত হইয়া তাঁহাকে এক অদ্ভুত নেশায় আবিষ্ট করিল। ছোটখাট আভাস ইঙ্গিতে "তাঁহার চৈতন্যের ভাঁড়ার-ঘরে বিশেষ রকম ওলট-পালট" ঘটিতে লাগিল। তাঁহার ঘ্রাণশক্তিও পূর্ব-স্মৃতির উদ্বোধকরূপে অসম্ভব রকম তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। এই সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়-বিপর্যয় যেন একটা বিরাট মানস বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বহন করিয়া আনিল।

কিন্তু তাঁহার মানস পরিবর্তনের বীভৎসতম লক্ষণ দেখা দিল তাঁহার একটি অদ্ভুত অভ্যাস-পরিণতিতে। অন্ধকার রাত্রে বেড়ার ফাঁক দিয়া ভরদ্বাজ ও ভরদ্বাজের স্ত্রীর দাম্পত্যসম্ভোগলীলা-দর্শনে তিনি এক অস্বাভাবিক মানস তৃপ্তি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইয়া ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার পরোক্ষ কামকণ্ডূয়নকে পরোপকারের ছদ্মবেশে সংবৃত করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই কুৎসিত সত্য নিজ নগ্ন বীভৎসতায় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করিল। ভরদ্বাজ-পত্নীর কঠোর সত্যভাষণের নিকট তাঁহার ছদ্মবেশী আত্মমর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হইল।

তাঁহার চোখের আগুন দরদের ঘৃত-সিঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার মনের গায়ে ধরিয়াছে। ভরদ্বাজ-পত্নী প্রতিহিংসা লইবার জন্ত আপনার রক্তের সহিত বিষ মিশাইয়াছে ও এই

বিষ-ক্রিয়ার জন্য জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড চিবাইবার শক্তি অর্জন করিয়াছে। ত্রিবেদী মহাশয়ের কামপ্রবৃত্তি এই প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত চেতনা লইয়া পিছাইয়া আসিয়াছে। "অতি বিলম্বে" —ভরদ্বাজ-গৃহিণীর এই ধিক্কারবাণী তাহার কানকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় দগ্ধ করিয়াছে। এই সতর্কবাণীতে ত্বরান্বিত হইয়া ত্রিবেদী মহাশয় মুক্তার সহিত বোঝাপড়ায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু গিয়া দেখেন পিঞ্জর শূন্য—পাখী পলাইয়াছে।

ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত মানসলোকটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্নিগর্ভ ইঙ্গিতে আমাদের নিকট ভয়াবহরূপে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার শান্ত, আত্মসমাহিত বহিঃপ্রচেষ্টার পিছনে তাঁহার অন্তর এক বিস্ফোরণোন্মুখ জতুগৃহের ন্যায় অগ্ন্যুৎক্ষেপের প্রতীক্ষায় কম্পমান। লেখক অস্ত্রচিকিৎসকের নির্মম ব্যবচ্ছেদনৈপুণ্যের সহিত ধর্মসাধকের সমস্ত অন্তরক্ষত, সমস্ত গোপন দুর্বলতা, উৎসাদিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সমস্ত ব্যাকুল আলোড়ন, আত্মনিপীড়নের সমস্ত বীভৎস প্রতিক্রিয়া আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে অবারিত করিয়াছেন। ভদ্র, সংযত; উন্নত ভাবসাধনায় অভিনিবিষ্ট, জনসমাজে ধার্মিক বলিয়া অভিনন্দিত মানুষের যে ভয়াবহ স্বরূপ লেখক আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ধর্মাদর্শের অন্তরালবর্তী বস্তু-কঙ্কাল আমাদের মনে যুগপৎ ভীতি ও জুগুপ্সার সঞ্চার করে। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অবধূতের ইহাই বিশিষ্ট সুর-সংযোজন।

অবধূতের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (জুলাই, ১৯৫৫) উপন্যাসলক্ষণান্বিত চমৎকার ভ্রমণকাহিনী। এই তীর্থপথে মরু-উত্তরণের অসহ ক্লেশ, তপ্ত বালুকারাশির তীব্র বহ্নিজ্বালা লেখকের বর্ণনাকৌশলে যেন পাঠকের অনুভবগম্য হইয়া উঠে। ইহারই মাঝে মধ্যে দরদী মননক্রিয়া ও জীবনসমীক্ষা গ্রন্থখানির উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। তীর্থ-যাত্রীদের মনের খবর, গোপন অপরাধবোধ ও প্রত্যেকের বিশেষ জীবনসমস্যা এই ভ্রমণ-বিবরণকে অস্ফুট-রহস্যের তীক্ষ্ণ আভাসে, অন্তর্দাহের তীব্র উত্তাপে, মানবিক পরিচয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ করিয়াছে। যাত্রাপথে নানা আকস্মিক বিপৎপাত, নানা প্রাণসংশয়কারী দুর্ঘটনা, মানব মনের বিচিত্র দাহ্যপদার্থের অতর্কিত উৎক্ষেপ কাহিনীটিকে রোমাঞ্চ-চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। সব শুদ্ধ মিলিয়া লেখকের লিপিকৌশল, মানবজীবন সম্বন্ধে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও অতি-উচ্ছ্বসিত নাটকীয়তার সুষ্ঠু প্রবর্তন গ্রন্থটিকে ভ্রমণ-সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছে।

অবধূতের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও উতরোল কৌতুক-প্রবণতা—'তাহার দুই তারা' (এপ্রিল, ১৯৫৯), 'ক্রীম' (এপ্রিল, ১৯৬০)—প্রভৃতি রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।

প্রথমটিতে 'সাহানা' গল্পে প্রদ্যুম্ন ঘোষালের মোটর বাইকে ঝড়ের মত বেগে-ছোটা উৎকেন্দ্রিক জীবনকাহিনীর বিবৃতি আছে। মোটর বাইকের ঊর্ধ্বশ্বাস গতিবেগে ছিটকাইয়া-পড়া স্ত্রী অনুরাধার কল্পিত মৃত্যুতে প্রদ্যুম্ন নির্জনবাসের তপস্যা অবলম্বন করিয়াছে। স্ত্রী ও মেয়ে সাহানা যে জীবিত আছে এই আবিষ্কারে তাহার জীবনের বিচলিত ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। বর্ণনার মুন্সীয়ানা উপভোগ্য, কিন্তু ইহাতে কোন গভীর ও সত্যানুসারী জীবনবোধের পরিচয় মিলে না। 'ক্রীম'-এ-'ক্রীম', 'ভ্যানিশিং

ক্রীম', 'আইসক্রীম' ও 'ক্রীম-ক্র্যাকার' এই চারিটি ছোট গল্প অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিতে সমীর, ছায়া ও দলজিতের করুণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও ভুল বোঝাবুঝির কাহিনী বক্তার উদাসীন, বন্ধনহীন, অথচ সহানুভূতিপূর্ণ মনের মাধ্যমে বিষণ্ণগাম্ভীর্যমণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে উদ্ভট কল্পনা নিরঙ্কুশভাবে ছোটাছুটি করিয়াছে। পুনর্বসু পালিত, ওরফে, পি. পি., স্বাতী সোম, বিমান-সেবিকা নন্দা, মাসী ও মেসো সকলে মিলিয়া এক তুমুল অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের ঐকতান তুলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত পি. পি. তাহার প্রণয়াস্পদা স্বাতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া গল্পের এক চূড়ান্ত হাস্যকর পরিণতি ঘটাইয়াছে।

'আইসক্রীম'-এ লেখকের হাস্যকর পরিস্থিতি-সৃষ্টির প্রবণতা চরমে উঠিয়াছে। বাসব দত্ত, মানু মিত্র, ধ্রুবজ্যোতি, জাগুয়ার রায়—এক খেয়ালী যুবকসংঘের সদস্যবৃন্দ—তাহাদের বন্ধু ভবভূতিকে এক সাধুর স্ত্রীর সহিত পরকীয়া প্রেমচর্চা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। বাসব দত্ত অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছে যে, সাধু মহারাজ নিজেই এ বিবাহের উদ্যোক্তা, কন্যা মারমুখী ও পাত্র অনমুতপ্ত। সমস্ত দৃশ্যটি যেন একটা হাসির বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হইয়াছে। 'ক্রীম-ক্র্যাকার'-এ হাস্যরস প্রহসনোচিত আতিশয্যে একেবারে বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। তুষ্ণীম্ আচার্য বারে বারে বাড়ি ও নাম পাল্টাইয়া একঘেয়েমিকে প্রতিরোধ করিতে খুঁজিয়াছে। ডাঃ মৈত্রের স্ত্রী কনক স্টেশনে স্বামীর সাক্ষাৎ না পাইয়া জ্যেঠার বাড়িতে উঠিয়াছে এবং জ্যাঠতুত ভগ্নী সুজাতা রায় ভগ্নীপতির খোঁজে তুষ্ণীমের বাড়িতে চড়াও হইয়া সেখানে এক হুলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়াছে। ইতিমধ্যে হিরণ্ময় ব্যাণ্ডো তাঁহার নায়িকার স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহাকে সশরীরে লাভ করার প্রত্যাশায় সেই তুষ্ণীমের বাড়িতে হাজির হইয়াছে। লালবাজারের নকুড় মামা হারান স্ত্রীর সন্ধান করিতে আসিয়া আরও জট পাকাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত ডাঃ ও শ্রীমতী মৈত্রের মিলন হইয়াছে, কিন্তু এই ঘটাকালির ফাউ হিসাবে শুভার্থী শর্মার সঙ্গে শ্রীমতী সুজাতা রায়ের শুভবিবাহ ঘটিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া এক পাগলা হাওয়া অবাধে প্রবাহিত হইয়া পরস্পরকে এক খেয়ালী সম্পর্কের জটিল পাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। লেখকের সঙ্গতিরক্ষার ক্ষীণতম প্রয়াস নাই বলিয়াই তাঁহার উদ্দাম খেয়ালীপনা পাঠকের মনেও পূর্ণভাবে সংক্রামিত হইয়াছে।

'দুর্গম পন্থা'—(কার্তিক, ১৩৬৮) উদ্ভট পরিবেশের মধ্যে বীভৎস ঘটনা ও উৎকটভাবে উৎকেন্দ্রিক চরিত্রসন্নিবেশের অভ্যস্ত প্রবণতা অবধূতের সমস্ত উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও নূতন আবর্তের ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করিয়াছে। কক্সবাজারের অয়স্কান্ত বকশীর অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য জীবনকাহিনী ও পরিবেশ সঙ্গতিও জীবনমননের ফ্রেমে আঁটা হইয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ডে ও কার্যকারণ শৃঙ্খলার সূত্রে বিচার করিলে অয়স্কান্তের জীবনকে এক দুঃস্বপ্নের অকারণ খেয়ালের মতই মনে হয়। কিন্তু লেখকের কল্পনার নিবিড়তা, জীবনপ্রজ্ঞার পরিচয় ও বিষয়-তন্ময়তা এই স্বপ্নবাষ্পের মধ্যেও কিছুটা বাস্তব সাদৃশ্যের আরোপ করিয়াছে। তাহার গৃহস্থালীর রোমাঞ্চকর পরিবেশ, তাহার অভাবনীয় ভাগ্যপরিবর্তন, তাহার মানবিক সম্পর্কের উদ্ভট অনিশ্চয়তা, তাহার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের আকস্মিকতা সবই যেন আধুনিক যুগে আরব্য রজনীর ঐন্দ্রজালিক অবাস্তবতার কথা স্মরণ করায়। যেটুকু শিল্পজ্ঞান ও জীবনঘনিষ্ঠতা থাকিলে

অতিনাটকীয় বীভৎসতাকে স্বাভাবিকতার ছন্দে গাঁথা যায়, অবধূতের তাহা প্রচুর পরিমাণেই আছে।

'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' (আশ্বিন, নবকল্লোল, ১৩৭০) বইখানিতে বীভৎস রসের সঙ্গে খানিকটা মামলা-মোকদ্দমার কূটবুদ্ধি, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রোমাঞ্চ ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের হো হো অট্টহাস্যের সহিত কিছুটা কারুণ্য ও সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত বর্ণসাঙ্কর্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটনা হঠাৎ পাখা মেলিয়া কোথা হইতে কোন্ অসম্ভব পরিণতিতে উড্ডীন হইয়াছে তাহার পারম্পর্যসূত্র আবিষ্কার করা দুরূহ। একটা পাগলা ঝড় যেন সমস্ত শৃঙ্খলা-সংহতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া এক দুঃস্বপ্নরাজ্যে উধাও হইয়াছে, কিন্তু তাহার উন্মত্ত গতির মধ্যে তাহার বিপুল শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। দিগম্বর চন্দ্র কাঁঠাল তাহার বিকৃত মুখ ও খেয়ালী আচরণের সঙ্গে করুণার্দ্র হৃদয়, শরণাগতরক্ষার দৃঢ় সংকল্প, গুরুভক্তি ও আতিথেয়তা মিশাইয়া মহাদেবের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীর মত মোটামুটি হিতকর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই উপন্যাসমধ্যে লম্ফঝম্প করিয়া বেড়াইয়াছে। সবশুদ্ধ উপন্যাসটি বীভৎসরসের এক অভিনব প্রকারভেদ, এক দুরন্ত গতিবেগে উৎক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর চমক ও বাস্তবচিত্রণশক্তির নিদর্শনরূপে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

অবধূতের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় নাই, যাহা কিছু সংশয় তাহা শক্তির প্রয়োগরীতি ও বিষয়নির্বাচনসম্বন্ধীয়। তিনি বরাবরই উষ্ট্রের কাঁটাগাছে পূর্ণ ক্ষেত্রেই কর্ষণ করিতে থাকিবেন, ধর্মজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসঙ্গতি উদ্‌ঘাটন করিবেন বা উচ্চকণ্ঠ কৌতুক-হাস্যের দমকা হাওয়ায় লুটাপুটি খাইবেন না গভীর-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জীবনসত্য-আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিবেন এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর তিনিই দিতে পারেন। তাঁহার পথ-নির্বাচনের উপরেই উপন্যাস-জগতে তাঁহার স্থান শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতপা' একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উপন্যাসরূপেই সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুষ্ক পার্বত্য নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বিপুল জলাধার-নির্মাণের পরিকল্পনা উপন্যাসটির পটভূমিকা। এই পরিবেশের একদিকে সাঁওতাল কুলি-মজুর, অনার্য আরণ্য জাতির জীবননীতি ও প্রথাবৈচিত্র্য; আর একদিকে, নির্মাণদক্ষ স্থাপত্যবিশারদ কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ। ইহাদের মাঝে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে অবনী ওভারশিয়ারের মেয়ে, অদম্য জীবনপিপাসা ও কৌতূহলবৃত্তির মূর্ত প্রতীক সান্ত্বনা; তাহার মধ্যবর্তিতায় যান্ত্রিক প্রয়াসটি সদা-উৎসুক আনন্দপ্রেরণার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। নির্মাণকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত সে এই কর্মসাধনার অণু-পরমাণুতে, প্রতি ইট-পাথরে, প্রতিটি চড়াই-উৎরাই-এ নিজ সত্তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। একদিকে পাগল সর্দারের সঙ্গে তাহার স্বচ্ছন্দ মানস-সংযোগ ও সাঁওতালি নৃত্য-গীত উৎসবে তাহার সানন্দ সহযোগিতা। অপর দিকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি ও তাহার সহযোগী নরেন চৌধুরীর সঙ্গে তাহার কুণ্ঠা-লেশহীন সহজ সাহচর্য ও সৌহার্দ্য।

সান্ত্বনাই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ চরিত্র ও নায়িকা—তাহারই প্রাণপ্রাচুর্য ও কিশোর মনের

আনন্দপিপাসু, চির-অতৃপ্ত ঔৎসুক্যের মাধ্যমে আমরা উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার রস গ্রহণ করি। সে পার্বত্য হরিণীর মত লঘু পদক্ষেপে, কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে বিচরণ করিয়াছে। সে যান্ত্রিকতাবদ্ধ কর্মজালের ফাঁকে ফাঁকে তরুণ মনের জীবনসুধা দুই হাতে ছড়াইয়াছে। ভূতুবাবুর চায়ের দোকান ও ঠিকাদার ঘোষচাকলাদারের জীপে তাহার অকুণ্ঠ গতিবিধি ছিল, কিন্তু রণবীর ঘোষের আচরণে তাহার এই সরল বিশ্বাস কিছুটা ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

হোপুন ও চাঁদমণির লালসাতুর সম্পর্ক ও চাঁদমণির বহুচারী প্রেমচর্চা সান্ত্বনার কুমারীমনে প্রথম প্রণয়ানুভূতির আবেশ সঞ্চার করিয়াছে। তাহার বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই নবোন্মেষ সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নরেন চৌধুরীর সঙ্গে তাহার ঋজু, নিঃসঙ্কোচ মৈত্রী-মিলনের মধ্যে একটু যেন আবেশের রং ধরিয়াছে। মনের এক অজ্ঞাত জাগরণ যেন তাহাকে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ও তির্যকপথচারী করিয়াছে। এই সময় বাদল গাঙ্গুলির সহিত তাহার গায়ে-পড়া ও খানিকটা আক্রমণাত্মক পরিচয় তাহাকে দ্বৈত আকর্ষণের অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে তাহার মন চূড়ান্তভাবে আকৃষ্ট হইবে তাহা সে ও তাহার প্রণয়প্রার্থী নরেন কেহই জানে না। তবে বাদল সান্ত্বনাকে কখনই ভালবাসে নাই—তাহার মনোভাব বিস্ময় ও সংঘর্ষের উত্তেজনা ছাড়াইয়া উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে নাই।

কিন্তু সান্ত্বনার এই দ্বিধা-বিভক্ত চিত্তবৃত্তি তাহাকে অধিকতর প্রেম-সচেতন করিয়াছে। তাহার পর নরেন যেদিন তাহার অবাধ মেলা-মেশা ও প্রায় প্রকাশ্য প্রশ্রয়ের সুযোগ লইয়া তাহাকে দৈহিক মিলনে বাধ্য করিয়াছে সেইদিন হইতে সে নরেন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হইয়াছে। বাদলের অতীত জীবনের ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস ও তাহার বিরাট পরিকল্পনার প্রতি উদগ্র আগ্রহ তাহাকে বাদলের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সে মিথ্যা ঘটনার দ্বারা লীলা ও বাদলের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। ইহার জন্য সে বাদলের নিকট রূঢ় প্রত্যাখ্যান পাইয়াছে।

সান্ত্বনার জীবনে বাঁধের রহস্যময় আকর্ষণের যে ব্যাখ্যা লেখক দিয়াছেন তাহা নিতান্ত মনগড়া বলিয়া আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। তাহার মাতা ও পিতামহীর অন্তিম মুহূর্তের অপ্রশমিত তৃষ্ণাই জলের প্রতি তাহার আকর্ষণকে একটা অস্থিমজ্জাগত, দুর্বার মোহে পরিণত করিয়াছিল—ইহাই লেখক কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে সান্ত্বনা প্রাণ হারাইয়াছে, এবং লেখক স্বল্পভাষী, সংযত ভাবগভীরতার সহিত তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানে সমস্ত পরিবেশে যে বিষণ্ন শূন্যতার ছায়া পড়িয়াছে তাহা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই উপন্যাসটির সর্বত্র একটা passionate intensity, গভীর আবেগময়তার শক্তিময় প্রকাশের নিদর্শন পাই। উহার বিষয়বস্তুর সরস-মৌলিকতা ও নায়িকাচরিত্রে প্রখর ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নারীসুলভ রমণীয়তা উহার একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। লেখকের আর দুই একটি উপন্যাস অবশ্য এই জাতীয় উচ্চ শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এই উপন্যাস লেখকের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির যে স্বাক্ষর বহন করে তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করা সঙ্গত মনে হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল তুমি আলেয়া'—প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা কেমন করিয়া এক বৃহৎ সমাজ-শ্রেণীর জীবনযাত্রার অলক্ষ্যে প্রসারিত হইয়া বহু নর-নারীর মনোলোকে এক দুর্বোধ্য জটিলতাজাল বয়ন করে তাহার একটি আশ্চর্য শিল্পসম্মত, অথচ নীতিবোধবর্জিত বিবরণ। নেপথ্যের অন্তরালে যে কামনাশিখা প্রজ্বলিত রহিয়াছে তাহারই একটি ধূসর, স্তিমিত ছায়া উপন্যাসের নর-নারীর জীবনক্রিয়ার উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়া উহাদের গতিবিধিকে দুর্নিরীক্ষ্য ও মহাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই উপন্যাসে কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক সুস্পষ্ট নহে, সকলের মধ্যেই একটা অর্ধস্ফুট রহস্য অনিশ্চয়ের কুহেলিকা রচনা করিয়াছে। কাহারও আচরণ সহজবোধ্য নয়, প্রত্যেকেরই মনের গভীরে ডুবুরি নামাইয়া এই গোপন সম্পর্কের আভাস-ইঙ্গিত আহরণ করিতে হয়। ইহাতে কোন সত্যই প্রত্যক্ষগম্য নয়, সবই অনুমানসিদ্ধ, সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে বিভ্রান্ত অনুসন্ধান। সুলতান কুঠিতে, মিত্র পরিবারের বাসগৃহে ও কারখানায় ও চারুদেবীর ঝকঝকে নবনির্মিত অট্টালিকার কোণে কোণে অজ্ঞাত রহস্য গুঁড়ি মারিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত পরিবেশে কোথাও সূর্যালোক নাই, সর্বত্রই আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা ; বোধশক্তি এক অদৃশ্য প্রতিবন্ধকের দেওয়াল হইতে প্রতিহত হইয়া কিছু একটা নিশ্চিতকে ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ, চারুদেবীর সহিত কারখানার বড় সাহেব হিমাংশু মিত্রের সম্পর্কে আবেগহীন সাহচর্যের পিছনে যৌন আসক্তির অর্ধ-নির্বাপিত স্ফুলিঙ্গ এখনও নিগূঢ়ভাবে তাপ ও আলোক বিকিরণ করিতেছে। এই আসক্তি এখন বহিঃপ্রকাশ হারাইয়া অন্তর্লোকে একটা পারস্পরিক প্রভাব ও দায়িত্বস্বীকৃতির রূপ লইয়াছে। অমিতাভ এই মিলনেরই অস্বস্তিকর ফল বলিয়াই মনে হয়। হিমাংশুবাবু ভাগ্নে পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের রহস্যটি আবৃত রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতি তাঁহার অপরিমিত প্রশ্রয় ও তাহার আচরণ সম্বন্ধে চারুদেবীর উপর অভিভাবকত্বের চরম অধিকারস্বীকৃতি এই সম্বন্ধের আসল পরিচয়টি ব্যঞ্জিত করে। চারুদেবীও অমিতাভর উপর তাঁহার প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পার্বতীর যৌবনপুষ্ট দেহের প্রলোভন তাহার সম্মুখে বিস্তার করিয়াছেন। হিমাংশুবাবুর ইচ্ছা যে লাবণ্য মেম-ডাক্তারের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের শক্ত খোঁটায় খামখেয়ালী অমিতাভকে বাঁধিয়া তাহার অস্থিরমতিত্বকে সংযত রাখেন ও নিজের ছেলে সিতাংশুর লাবণ্য-মোহকে প্রতিরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনিও অমিতাভকে লাবণ্যের সহিত অনুচিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিয়াছেন ও অমিতাভর জীবনে দ্বৈত আকর্ষণের বিহ্বলতাকে অঙ্কুরিত হইতে দিয়া তাহার ছন্নছাড়া মতিকে আরও বিপর্যস্ত করিয়াছেন। চারু কিন্তু তাঁহার এই মতলবের সহিত সহযোগিতা করিতে একেবারেই রাজি হয় নাই। লাবণ্যও ভাগিনেয় অপেক্ষা ছেলের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে ও সিতাংশুর প্রণয়-মুগ্ধতাকে উত্তেজিত করিয়া হিমাংশুর পরিবার ও ব্যবসায়-জীবনের সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে যে সিতাংশু, লাবণ্য ও অমিতাভ এই তিনজনের মানস দ্বন্দ্বের অবিরত মন্থনে উপন্যাসের সমস্ত আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ অমিতাভর পাগলামি এক উৎকট খামখেয়ালী আচরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ধীরাপদ বাহিরের কর্মচারী ও নিরাসক্ত দর্শকরূপে এই ঘূর্ণবায়ু-উৎক্ষিপ্ত-দৃশ্যাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার পরিধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ও নিজ উত্তেজিত বাসনার তির্যক বেগসঞ্চারের দ্বারা

ঝটিকার গতি ও ক্রিয়াফলকে আরও জটিল ও দুর্জ্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছে। সে সোনাবৌদিদির প্রতি একপ্রকার অনির্ণীত আকর্ষণের ফলে ও সদ্য-উন্মেষিত যৌন কামনার লক্ষ্যহীন প্রেরণায় মনের গহনতায় যে উত্তাপ সঞ্চয় করিতেছিল তাহা কখন যে অহর্নিশ আত্মগতরোমন্থনপুষ্ট হইয়া লাবণ্য সরকারের প্রতি দুর্বার মোহে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহা পাঠক ত দূরের কথা সে নিজেও বোধ করি স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে নাই। সকলেই দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় এই কেন্দ্রস্থ বহ্নিশিখাকে নানাভঙ্গীতে, আকুলতার বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকারভেদের সহিত প্রদক্ষিণ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই কামকলাপ্রভাবিত জীবনায়নের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে প্রত্যাশিত পরিণতিতেই।

ধীরাপদ অনেকটা জোর করিয়াই অর্ধসম্মত লাবণ্যকে দখল করিয়াছে ও লাবণ্যও তাহার ধর্ষণের অপমানকর স্মৃতি ভুলিয়া ধীরাপদর গৃহিণীত্বই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রুগ্ন ও অপ্রকৃতিস্থ অমিতাভকে ভাবলেশহীনা, কিন্তু অনন্যনিষ্ঠা পার্বতীই সেবা দ্বারা জয় করিয়াছে ও সিতাংশু বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে। যে সমস্ত প্রাণী উপন্যাসের পাতায় পাতায় নিজ নিজ ক্লেদাক্ত সরীসৃপ-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল তাহারা তাহাদের উরগগতির শেষে এক একটি বিবরের আত্মতৃপ্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ধীরাপদর দার্শনিক চিন্তা তাহার জীবন-অভিজ্ঞতার দ্বারা একেবারেই সমর্থিত নয়। তাহার অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু কামযুদ্ধে সে পরাভূত সৈনিক অপেক্ষা আর কোনও মহত্তর গৌরব অর্জন করে নাই। কাল তাহার পক্ষে আলেয়া কি না তাহা উপন্যাসের ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। শেষ পরিচ্ছেদে উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার তিন বৎসর পরবর্তী পরিণতির একটা সারসংকলন পাওয়া যায়, কিন্তু উহার দার্শনিকতার অভিনয় একবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

উপন্যাসে জীবনের যে অন্যান্য খণ্ডাংশ চিত্রিত হইয়াছে তাহা প্রায় সবই ক্ষয়িষ্ণু ও বিকার-গ্রস্ত। সুলতান কুঠিতে যে সমস্ত পরিবার ও ব্যক্তি বাস করে—শকুনি ভট্টাচার্য, একাদশী শিকদার, রমণী চক্রবর্তী ও গণুদা—সকলেই ধ্বংসোন্মুখ জীবনযাত্রার প্রতীক। ইহাদের প্রাণশক্তি যেমন ক্ষীণ, হিংসা-দ্বেষ-পরনিন্দা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তিও তেমনি সদা-সক্রিয়। রমেন হালদার ও কাঞ্চন এই জরাজীর্ণ, স্থবির সমাজে কিছুটা ব্যতিক্রমস্থানীয়। রমেনের মধ্যে কিছু সমবেদনা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি ও কিশোরসুলভ স্বপ্নময়তা পরিস্ফুট। কাঞ্চনের জীবন-গতি ঘৃণিত দেহব্যবসায় হইতে মুক্তি পাইয়া ঊর্ধ্বাভিমুখী ও সুস্থ পরিবেশ-রচনায় উন্মুখ। কারখানার শ্রমিকেরা ব্যক্তিত্ববর্ণহীন, সমষ্টিগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। চারুদেবী ও পার্বতী অর্ধবিকশিত; একজন জীবনমদিরা পান শেষ করিয়া এখন অলস আত্মরতিতে অবসন্ন। আদিম প্রবৃত্তি তীব্রতা হারাইয়া পূর্ব প্রেমিকের উপর বৈষয়িকপ্রভাববিস্তারেই পর্যবসিত। মনের যেটুকু অংশ তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত তাহা ছেলের হিতসাধনে নিয়োজিত ও তাহার অশুভ-আশঙ্কায় কণ্টকিত। প্রবলভাবে খেয়ালী ও উৎকেন্দ্রিক ছেলের উপর নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে পার্বতীর প্রতি তাহার স্নেহলালসা উগ্রভাবে উত্তেজিত করিতেও সংকুচিত হয় নাই। সব শুদ্ধ মিলিয়া প্রৌঢ়া রমণীর প্রিয়া-ও-মাতৃ-রূপের এক বিবর্ণ-মলিন ও অরুচিকর চিত্রই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ধীরাপদর প্রতি তাহার অনুগ্রহের মূল উৎসও ঠিক বিশুদ্ধ হিতৈষণা নয়, বয়ঃকনিষ্ঠ কিশোরের অনভিজ্ঞ প্রণয়মুগ্ধতার প্রশ্রয়রসাপ্লুত। পার্বতী ঠিক

গোটা মানুষ নয়, এক নির্বিকার প্রস্তরমূর্তি। অমিতাভর প্রতি বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ অনেকটা যান্ত্রিক নির্দেশানুবর্তন, ইহার মধ্যে আবেগ বা অনুরাগের ক্ষীণতম রংও দেখা যায় না। প্রেম অপেক্ষা সেবাই তাহার মুখ্যতর বন্ধন। মনে হয় তাহার পার্বত্য প্রকৃতির পাষাণস্তূপের গভীরতম স্তর পর্যন্ত কোন প্রবৃত্তির বহ্নিশিখা পৌঁছে নাই। সে খানিকটা অবাস্তব ও অতিনাটকীয়ই রহিয়া গিয়াছে।

চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া মনে হয় কোন চরিত্রই এই সর্বপরিবেশব্যাপ্ত কামায়নের প্রগল্ভ ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া পূর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের মনের এক পাশে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা উজ্জ্বল হউক, স্তিমিত হউক, তাহাং তাহাদের প্রকৃতিকে আংশিকভবে আলোকিত করিয়াছে। ধীরাপদর নিজের চরিত্রও ঠিক সুপরিস্ফুট নয়। সে সমস্ত জটিলজালবদ্ধ ঘটনাবলীর গ্রন্থি-উন্মোচন-প্রয়াসী হইয়াছে, তাহার সম্মুখে প্রতিদিন যে অদৃশ্যসূত্রবিধৃত জীবননাটকের অভিনয় হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নিজের কোন স্পষ্ট পরিচয় রাখিয়া যায় নাই। জাল খুলিতে গিয়া সে নিজেও তাহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার নিজ মানস-প্রতিক্রিয়াব সূত্র অপরাপর ব্যক্তির প্রেরণাসূত্রের সহিত দৃঢ়সংলগ্ন হইযা ব্যাপাবকে আরও জটিল করিয়াছে, কিন্তু না তাহার প্রলুব্ধ অন্তরের না অপরের লালসাসম্মোহিত চিত্তের প্রতিচ্ছবিটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত রণক্ষেত্র যেন অন্তরালস্থিত অদৃশ্য আগ্নেয়াস্ত্রের ধুম-উদ্‌গিরণে আমাদের অনুভবশক্তিকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে সোনাবৌদিদি তীক্ষ্ণভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের অন্ধকারময গহ্বরগুলি আমাদের দৃষ্টিসম্মুখে পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ধীরাপদর প্রতি তাহাব আকর্ষণ কি পবিমাণে স্নেহ ও যৌন কামনায় মিশ্রিত তাহা অনেকটা অনিশ্চিতই রহিয়া গিযাছে। ৫৬৪ পৃষ্ঠায় গণুর জেল হইবার পরে ধীরাপদর আশ্বাসবাক্যে তাহার যে সমগ্র দেহ-ম বিপর্যয়কাবী, সত্তার গভীরতম দেশ হইতে উত্থিত ভূমিকম্পের মত আলোড়ন তাহাই একবারের মত তাহার সমস্ত সংযমকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার অগ্নিস্রাবী আবেগকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রকৃতিতে অতৃপ্ত ও যত্ননিরুদ্ধ যৌন বুভুক্ষার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহারই মেঘপাংশুল, অস্বাভাবিক আলোকে তাহার সমস্ত শ্লেষতীক্ষ্ণ সংলাপ ও তির্যক-কুটিল আচরণের প্রহেলিকা, অভ্রান্ত শিল্পসঙ্গতির সহিত নিঃসংশয় প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক জীবনের ক্রূর অসঙ্গতির অবিশ্রান্ত আঘাতে তাহার ব্যক্তিসত্তা যে নিদারুণভাবে বিদীর্ণ হইয়াছে তাহারই ফাটল দিয়া প্রতি মুহূর্তে অন্তঃরুদ্ধ অগ্ন্যুচ্ছ্বাস উদ্‌গিরীত হইয়াছে। পরিবেশের প্রতিকূলতায় তাহার জীবন একদিনও স্বাভাবিক পথে চলিবার অবসর পায় নাই। তাহার স্বামী ত এই অদৃষ্ট-বিরূপতার ক্রূরতম প্রতীক। কিন্তু তাহার যাহারা স্নেহপাত্র, তাহার ছেলে-মেয়েরা ও ধীরাপদও সস্নেহ শুশ্রূষার ফাঁকে ফাঁকে এই অন্তর-উৎসারিত অগ্নিকণায় সর্বদাই দগ্ধ হইয়াছে। তাহার প্রতিবেশীরা—শকুনি, একাদশী, রমণী—তাহারাও তাহার কপট বিনয়ের অন্তরালস্থিত অবজ্ঞার চাপা আগুনে ও ব্যঙ্গপূর্ণ ঔদ্ধত্যের ধূম্র-নিঃসরণে বিভ্রান্ত হইয়াছে। তাহার সমস্ত আচরণে সঙ্গতিরক্ষা ও প্রাণোচ্ছ্বাসের বিকিবণ তাহার ব্যক্তিত্বের নিঃসংশয়

প্রমাণ দাখিল করিয়াছে। যদিও তাহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়িকার চাপ দেখা যায়, তথাপি তাহার জীবনযুদ্ধের অবিমিশ্র বাস্তবতা ও নিদারুণ পরীক্ষা এবং বর্ণনায় ভাববিলাসের সম্পূর্ণ পরিহার তাহাকে সমজাতীয় ঔপন্যাসিক সৃষ্টির মধ্যে একটি মৌলিক স্থান দিয়াছে।

লেখকের জীবননীতি ও কামচেতনার সর্বাত্মক ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণার ফলে জীবনচিত্রের যে একপেশেমি দেখা দিয়াছে তাহা বাদ দিলে তাঁহার শিল্পকৌশল সর্বথা স্বীকার্য। ছয়শত পৃষ্ঠার বৃহৎ উপন্যাসে তাঁহার জীবনসমীক্ষার যে শক্তির পরিচয় মিলে তাহা পরিমিতিবোধ ও অন্তঃসঙ্গতির দিক দিয়া ত্রুটিহীন। একটা জটিল ও বহুব্যাপ্ত জীবনযাত্রা উহার নানা শাখা-প্রশাখার পারস্পরিক সংযোগকুশলতার মধ্য দিয়া সুবিন্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়াছে, কোথাও অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব ঠেকে নাই। বিশেষতঃ প্রত্যেক দিনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের ভিতরে যৌন কামনার যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা ও নিরুদ্ধ অন্তর্গূঢ় ভাবোচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে লেখকের জীবনকল্পনার উপর দৃঢ় মনস্তাত্ত্বিক অধিকারের নিদর্শন মিলে।

(৯)

অসীম রায়ের 'দ্বিতীয় জন্ম' (এপ্রিল, ১৯৫৭) উপন্যাসটিতে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব ও অসাধারণ জীবনদর্শন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যখন সুবিন্যস্ত জীবনাদর্শ ভাঙ্গিয়া গিয়া কতকগুলি খেয়াল-কল্পনার টুক্‌রা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা কোন পরিমিতির শাসন না মানিয়াই তীক্ষ্ণভাবে প্রকটিত হয়। 'দ্বিতীয় জন্ম' উপন্যাসে সেইপ্রকার একপেশে মানসপ্রবণতাই অতিরঞ্জিত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের নায়ক নিজে খুব নিরাপদ, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার অনুসরণ করিলেও অপরের সম্বন্ধে সাধারণনিয়মাতিসারী, দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অসম্ভব আদর্শ-স্বপ্নের পক্ষপাতী ছিল। তাই সে নিজে আপোষ করিলেও তাহার বন্ধু সোনার আপোষহীন স্পর্ধার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সোনা কেবল বাঁচিয়া থাকাকেই একটা অসাধারণ গৌরবমণ্ডিত অভিজ্ঞতারূপে অনুভব করিত। সোনা যাহাতে তাহার নিয়ত মৃত্যু-সম্ভাবনার আড়াল হইতে জীবনকে মহিমান্বিত ও অপূর্ব সম্ভাবনাময়রূপে দেখিতে থাকে সেজন্য নায়ক তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু যেদিন সে শুনিয়াছে যে, সোনা চাকরী লইয়াছে, সেই দিন সোনা সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ কাটিয়া গিয়াছে ও তাহার সাহচর্য তাহার নিকট আকর্ষণহীন হইয়াছে। এই উদ্ভট জীবনতত্ত্বটি সে আশ্চর্য সহনশীলতা ও গভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছে। তাহার ব্যাখ্যারীতি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইহা তাহার পক্ষে কেবল Theory-বিলাস নহে, পরন্তু সমস্ত জীবনপ্রতীতি দিয়া অনুভূত ও জীবনের স্থির আশ্রয়রূপ সত্য। এই জীবনসত্যের গভীর উপলব্ধি ও নানা-দৃষ্টান্ত-সমর্থিত উপস্থাপনা উপন্যাসটির প্রধান কৃতিত্ব।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রসমূহও কমবেশী প্রতিবেশ-বিকারের চিহ্নাঙ্কিত। সোনার মা আমাদের সংস্কারগত মাতৃমহিমার এক অদ্ভুত বিকৃত রূপ। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত কোমলতা যেন শুষ্ক হইয়া এক কঠোর, স্নেহপ্রকাশহীন অভিভাবকত্বে পর্যবসিত হইয়াছে—মা যেন বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণীর প্রতিরূপ হইয়াছেন। এমন কি সোনার বন্ধুর নিকট অর্থ

সাহায্য ভিক্ষা করিয়া সে যে পত্র লিখিয়াছে তাহার মধ্যেও একটা রূঢ় অধিকার-প্রয়োগের সুর শোনা যায়। সোনার মৃত্যুর পর তাহার প্রতিহত শোকোচ্ছ্বাস নায়কের প্রতি অহেতুক ক্রোধ ও অভিশাপ-বর্ষণে ফাটিয়া পড়িয়াছে। সোনা নিজে, তাহার ভগ্নী মিন্থ, তাহার মেজদাদা পাদরী ও তাহার আত্মীয় রমেন—সকলেই যেন অস্বাভাবিক, এক ক্ষয়িষ্ণু জীবননীতির বিভিন্নমুখী প্রকাশ। সমস্ত উপন্যাসটিতে যে জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়, তাহা যেন জীর্ণ, বিকৃত আবেগ ও কুণ্ঠিত ইচ্ছার টানা-পড়েনে গঠিত, বিবর্ণ রেখাসমষ্টি। অবশ্য সোনা একটা প্রতীক চিত্ররূপে পরিকল্পিত—তাহার প্রতিটি কথায় ও কার্যে একটা ব্যর্থ জীবনাকৃতি বে-পরোয়া নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণার ছদ্মবেশে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

নায়ক তাহার পিতার চরিত্রকে নিজের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়রূপে তুলিয়া ধরিয়াছে—তিনি জীবনকে একটা জুয়াখেলার ভাগ্যপরীক্ষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও ভাগ্যের সমস্ত বিপর্যয়কে নিরাসক্তভাবে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাঁহার এই অবিচল, প্রসন্ন মনোভাবই নায়কের বিপরীত জীবননীতিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। একটিমাত্র অধ্যায়ে পিতাপুত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের মূল জীবনাদর্শের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। পুত্রের পাত্রী-নির্বাচনে পিতার প্রত্যাশা একটু বেশী উচ্চ; পুত্র বিবাহকে নিছক একটা নিস্তরঙ্গ, অবিরোধী সহাবস্থানরূপেই গ্রহণ করিয়াছে।

উপন্যাসের শেষ অংশে নায়ক এক সমুদ্রতীরস্থ স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া সেখানকার হুলিয়া ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রাকে খুব নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে ও ইহারই ফলে তাহার জীবনতত্ত্বের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই নূতন জীবন-নিরীক্ষার ফলে তাহার মনে যে অসাধারণত্বের প্রতি অবাস্তব মোহ ছিল তাহা অনেকটা অপসারিত হইয়া সহজ জীবনপ্রীতি জাগিয়াছে। যাহারা সমুদ্রের অসাধারণ মহিমাকে সাধারণ জীবিকার্জনের কাজে লাগায় তাহাদের সান্নিধ্যই এই নূতন জীবনবোধসঞ্চারে সহায়তা করিয়াছে। লেখকের বর্ণনাকুশলতা ও মননৈপুণ্য তাঁহার সঙ্গীতের মোহময় প্রভাব ও সাঁতার দিতে গিয়া সমুদ্র-নিমজ্জনের জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমান মনোভাব-প্রকাশের মধ্যে আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছে। এই উপন্যাসে জীবনতত্ত্বের একটা নূতন দিক সার্থক বিষয়-নির্বাচন ও সুষ্ঠু মননের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জীবনরসোজ্জ্বলতার অভাব তত্ত্বসঙ্গতির দ্বারা অনেকটা পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই উভয়দিকের সামঞ্জস্যবিধান হইলে লেখক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করিবেন এই প্রত্যাশা অযৌক্তিক নহে।

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি 'জরাসন্ধ' এই ছদ্মনামে সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, বাংলা উপন্যাসে একটি নূতন সুর সংযোজনা করিয়াছেন। তাঁহার 'লৌহ কপাট' তিন পর্ব (এপ্রিল, ১৯৫৪; ডিসেম্বর, ১৯৫৫; সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮), 'তামসী' (জুলাই, ১৯৫৮) ও 'ন্যায়দণ্ড' (অক্টোবর, ১৯৬০) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি কারাজীবনের একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ, সহৃদয় ও সূক্ষ্ম মনন ও বর্ণনাকৌশলে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ও কারাবন্দীদের অভাবনীয় মনস্তত্ত্ব ও মর্মভেদী অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীগণের জীবন সহজেই প্রবৃত্তির দুর্দমতায় ভারসাম্যহীন, মানুষের অত্যাচারে করুণ ও দুর্ভাগ্যের

অতর্কিত আক্রমণে রহস্যময়। মানুষের সাধারণ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ জীবনে যে মানস সংঘাত স্তিমিত শিখায় বহুদিন ধরিয়া জ্বলিয়া বিস্ফোরক শক্তিতে দীপ্ত হয়, জেল-আসামীর পক্ষে তাহা মুহূর্ত মধ্যে, হঠাৎ উত্তেজনায়, প্রতিকূল দৈব-সংঘটনের সহায়তায়, অসংবরণীয় উত্তাপ ও দাহজ্বালায় ফাটিয়া পড়ে। সুতরাং বিচিত্র মনস্তত্ত্বের আকর্ষণ যে ইহাদের জীবনকাহিনীতে বেশী পরিমাণে আছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। কারাগার হইল মানবপ্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা তীব্র দাহ্য উপাদানসমূহের সংগ্রহশালা; উহার যত কিছু বন্য দুর্বার প্রবৃত্তি, উহার নিয়তিলাঞ্ছিত করুণতম অসহায়তা, উহার অনুশোচনার তীব্রতম আবেগ ও দুর্জ্ঞেয়তার ঘনতম আবরণ বন্দীজীবনে সর্বাপেক্ষা বেশী উদাহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং জরাসন্ধ তাঁহার বিষয়নির্বাচনে ও আলোচনাপদ্ধতির সমবেদনাস্নিগ্ধ ও উদার বোধশক্তিতে যে মানব জীবনরহস্যের একটা অজানা দিকের উপর আলোকপাত করিয়া উপন্যাসের পরিধি প্রসারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। মার্জিত পরিহাস-রসের কৌতুকোচ্ছল প্রয়োগে ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির মননশীলতায় তাঁহার সমস্ত রচনা সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'লৌহ কপাট' প্রথম পর্বের আরম্ভ লেখকের চাকরী-পূর্ব জীবনের বিব্রত ও অসহায় অবস্থার লঘুব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়া। তাহার পর দার্জিলিং জেলে চাকরীতে প্রথম হাতেখড়ি ও কাঞ্চীর সঙ্গে কৈশোর প্রেমের প্রথম স্বপ্নমধুর অভিনয়। তাহার পর ধনরাজ-কাহিনীতে চা-বাগানের সাহেব ও শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তির অশুভ ষড়যন্ত্রে বিচারের কিরূপ শোচনীয় প্রহসন ঘটিয়া থাকে তাহার চকিত উদ্‌ঘাটনে লৌহ যবনিকার এক অংশ আমাদের নিকট অপসারিত হইয়াছে। অতঃপর জেলের শাসনব্যবস্থার টুক্‌রা টুক্‌রা অংশ-বর্ণনা উপযুক্ত সরস উদাহরণ-সংযোগে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে। স্বদেশী বন্দীরা কারাব্যবস্থায় যে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারও মনোজ্ঞ ও মোটামুটি অপক্ষপাত বিবরণ পাই। জেল সুপার মিঃ রায়ের বিষণ্ণ গম্ভীর ও কিছুটা উৎকেন্দ্রিক আচরণের মধ্যেও যে সহৃদয়তার অভাব ছিল না, ও তাঁহার ইংরেজ পত্নীর অন্তরে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার অন্তরালে যে নিঃসঙ্গতার মৌন বেদনা পুঞ্জীভূত ছিল তাহা লেখক তাঁহার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছেন। জেলে দুগ্ধ সরাইবার কৌশল, রাত্রিতে রোঁদে রত উপরি-ওয়ালাকে ফাঁকি দিয়া সান্ত্রীদের নিষিদ্ধ ঘুমের উপভোগ, স্বদেশী মোকদ্দমায় আসামী ভূপেশ সেনের বিচারে বিচারকের চাবুক প্রয়োগ ও এই বে-আইনী কাজের অবাঞ্ছিত ফলভোগ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য অনুসন্ধান-কমিটির চক্রান্ত, জেলের উৎপাদন-বিভাগের কাজ চালু রাখার জন্য সুদক্ষ জেলযন্ত্রীদের খালাসের পরে বারে বারে জেলে প্রত্যাবর্তন ও কারাসংস্কারকদের হাস্যকররূপে ব্যর্থ হিতৈষণা, জেলফেরৎ গুণ্ডা রহিমের কৃতজ্ঞতা, প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা সমগ্র কারাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ কলকজ্জাগুলি আমাদের চোখের সামনে নগ্নভাবে অবারিত হইয়াছে। ইহার পর তিনটি অসাধারণ চরিত্রের কাহিনী মানবপ্রকৃতির দুর্জ্ঞেয়তার ও ভাগ্যবিড়ম্বনার উপর এক এক ঝলক আলোক-পাত করিয়াছে। কুখ্যাত ডাকাত-সর্দার বদরুদ্দীন মুনশী তাহার অনুচরের দ্বারা ধর্ষিতা এক নববিবাহিতা তরুণীর প্রতি সমবেদনায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে ও পুলিশের সমস্ত

মার হজম করিয়া তাহার দলের নাম জানিবার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যার দ্বারা ফাঁসিকাষ্ঠকে ফাঁকি দিয়াছে। তাহার সমস্ত চরিত্র-বিকারের মধ্যে এক উদার মহনীয়তার বিনষ্ট সম্ভাবনা উঁকি দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কাশিম ফকির ও তাহার তরুণী স্ত্রী কুটি-বিবি বহু ভক্তের ধর্মান্ধতা ও মূঢ় বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে অরণ্য-সমাধি-শয়নে জগৎসংসার হইতে অপসারিত করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ একজন তরুণের প্রতি মোহে এই দাম্পত্য সহযোগিতায় সাংঘাতিক ফাটল ধরিয়াছে ও স্ত্রী স্বামীকে ধরাইয়া দিয়া তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়াছে। তৃতীয় কাহিনীতে এক ভদ্র পরিবারের কিশোর ছেলে পরিমল তাহার রুগ্ন পিতার প্রতি মাতার হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের প্রতিকারের জন্য অর্থোপার্জনে বাহির হইয়া পকেটমারার দলভুক্ত হইয়াছে। একদিন দুই হাজার টাকা পকেট মারিয়া সে পিতার চিকিৎসা-ব্যবস্থা করার জন্য বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু পুত্রের এই অধঃপতনে পিতার যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহাতেই তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে ও পরিচর্যার সমস্ত প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। গ্রন্থশেষে লেখক দেশপ্রেমিক ফাঁসিবরণকারীদের সহিত তুলনায় সাধারণ ফাঁসির আসামীদের অকালমৃত্যুর জন্য, তাহাদের সম্ভাবনার অপচয়ের জন্য সংযত-গম্ভীর, সহানুভূতিতে আর্দ্র শোক প্রকাশ করিয়া রচনার মূল সুরটি ধ্বনিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পর্বে জেলসুপার রামজীবনবাবুর জেলে পদোন্নতিতত্ত্বব্যাখ্যা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, একজন পলাতক কয়েদীর পলায়নে সহায়তা করিয়া তিনি যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার কাহিনীও তেমনি মানবপ্রীতিরসে ভরপুর। সে যুগে জেলে এমন কর্মচারীও ছিলেন যাঁহারা যান্ত্রিক নিয়মপালনের উপরে মানবিক আচরণের আদর্শকে স্থান দিতেন। চট্টগ্রাম জেলের প্রতিবেশী কবিরাজ মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশা লেখককে এক সন্ত্রাসবাদী প্রণয়ীযুগলের সম্বন্ধ-রহস্য অবগত হইবার সুযোগ দিয়াছে। মিনুর উদ্দেশে বিপিনের বিদায়লিপি বিপ্লবীর জীবনে প্রেমের স্থান যে কত গৌণ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। লাবণ্য-অমিতের বিদায়-সম্ভাষণ অপেক্ষা এই পত্রখানি আরও বস্তুভিত্তিক ও ত্যাগে মহীয়ান। জেলমেট রতিকান্ত খালাসের পূর্বে লেখকের শিশুকন্যা মঞ্জুর পুতুল চুরি করিয়াছিল—মঞ্জু সেই চোরাই খেলনাটিকে দান করিয়া এই চুরিকে গ্লানিমুক্ত করিয়াছে ও কয়েদীর চোখে অনুতাপের অশ্রু বহাইয়াছে।

মল্লিকা জেলের এক পাগল খুনী। তাহার করুণ জীবনকাহিনী পাঠকের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বিবাহরাত্রে বরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও বরের বন্ধু যতীশের সঙ্গে তাহার অভাবনীয় পরিণয় তাহার দৈবাহত জীবনে ভাগ্যের প্রথম পরিহাস। যতীশের পরিবার এই দৈবসংঘটিত বিবাহকে সুনজরে দেখিল না ও নববধূ এক বিরূপ ও বক্রকটাক্ষ-কুটিল পরিবেশে তাহার বিবাহোত্তর জীবন কাটাইতে বাধ্য হইল। স্বামীর প্রেমে তাহার এই নিরানন্দ জীবন কতকটা সহনীয় হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দৈবের দ্বিতীয় ও নিষ্ঠুরতম আঘাত তাহাকে একেবারে ধূলির সহিত মিশাইয়া দিল। এক বিবাহ-বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় এক কামোন্মত্ত পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশবিক অত্যাচারের নিকট সে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল ও ইহারই নিদারুণ অনুভূতি তাহার শুচিতার সংস্কারে অনপনেয়

কালিমারেখা অঙ্কিত করিল। এখান হইতেই তাহার চিত্তবিকারের সূত্রপাত। সে স্বামীসংসর্গ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আত্মধিক্কারের নিঃসঙ্গ অন্ধকূপে আপনাকে প্রোথিত করিল। ইতিমধ্যে সে সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া নিজ বাল্যজীবনের গুরু ভগ্নীপতির নির্দেশে মাতৃকর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার পিতৃত্ব সম্বন্ধে তাহার বিষম সংশয় হইল এবং এই অসুস্থ সংশয়জালে জড়িত হইয়া এক উন্মত্ত মুহূর্তে সে সদ্যোজাত সন্তানটিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিল। এইভাবে সে জেলের পরিবেশে স্থানান্তরিত হইল ও তাহার উন্মত্ত রোগ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে স্বামীকে চিনিতে পারিল না ও তাহার সমস্ত স্নেহ-পরিচর্যাকে অর্ধচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করিল। এই কাহিনীটি কেবল যে মানবিক আবেগে অভিসিঞ্চিত তাহা নহে, জটিল-মনস্তত্ত্বপ্রকাশকও বটে। মল্লিকার বাল্যজীবনের শিক্ষাসংস্কার ও বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি ও অবদমন সূক্ষ্মভাবে তাহার অপ্রকৃতিস্থতার বীজাঙ্কুররূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট "অ্যালুমিনিয়ম" সাহেবের শাসনব্যবস্থার মৌলিকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধের অভিনব কর্মনীতি খুব উপভোগ্য সরসতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহার সক্রিয়তা জেলের ভিতর অপেক্ষা বাহিরেই বেশী। জেলে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক বা অনশন-ধর্মঘটের কাহিনীর সঙ্গে আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিচিত। কিন্তু জেল-কর্মচারীর দৃষ্টিতে উহার যে কৌতুককর অসঙ্গতি তাহা এই প্রথম আমাদের গোচরীভূত হইল। অবশ্য পাঠান সর্দারের অনশন কোন রাজনৈতিক-কারণপ্রসূত নয়, উহা ব্যর্থ প্রণয়ের অভিমানসঞ্জাত। প্রণয়িনী তাহার প্রতীক্ষায় আছে এই আশ্বাসেই তাহার অনশন ভঙ্গ হইয়াছে। বেত্রদণ্ড-জর্জরিত মধুসূদনের কাহিনী একটু উল্টা ধরণের—সে অপরাধী নয়, মুনিবের মেয়ের নির্লজ্জ প্রণয়নিবেদনই তাহার উপর অপরাধরূপে আরোপিত। এই কাহিনীতে মনে হয় যে, কারাবন্দী অপেক্ষা যাহারা জেলের বাইরে থাকে তাহারাই বেশী পাপী। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের মংখিয়া একটা সামান্য কলহের জন্য স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট ধরা দিয়াছে। ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহাকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহার সম্প্রদায়ের নৈতিক দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন সংস্কারপুষ্ট নর-নারীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতার রূপ ও উহার প্রতি-ক্রিয়ায় রীতিগত পার্থক্য চমৎকাররূপে দেখান হইয়াছে।

তৃতীয় পর্বে জেল প্রশাসনের ছোটখাট সমস্যার সঙ্গে দুইটি বড় ও একটি ছোট মানব-ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী সংযুক্ত হইয়াছে। এই বড় কাহিনীদ্বয়ের উদ্ভব হইয়াছে জেলবহির্ভূত স্বাধীন-ইচ্ছা-পরিচালিত অথচ দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত বৃহত্তর জগতে। একেবারে চরম পরিণতির কিছু পূর্বে নায়ক-নায়িকা জেলশাসনের অঙ্গীভূত হইয়াছে। প্রথম কাহিনীতে একটি ভদ্র, সংস্কৃতিবান পরিবারের কিশোরী মেয়ে অপর্ণার পথভ্রষ্ট জীবনের করুণ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই মেয়েটির দুরদৃষ্ট আসিয়াছে পারিবারিক উপেক্ষা ও উৎপীড়ন হইতে। তাহার বাবা দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া বিমাতার প্ররোচনায় তাহার প্রতি উদাসীন, এমন কি নিষ্করুণ হইয়াছেন। অপর্ণার মাতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা তাহার ধৈর্যকে নিঃশেষিত করিয়া তাহাকে পিতৃগৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছে। কলিকাতায়

আসিয়া সে বারীন নামে তাহার বাল্যসহচরের আশ্রয়ে বাস করিয়াছে ও বারীনের নানা প্রকার সদিচ্ছা-প্রণোদিত অথচ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বারীনের সঙ্গে তাহার সম্পর্কটি একটি অনির্দেশ্য ও অবাস্তব শুচিতা-সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। মোটকথা বারীন ও তাহার সহকারীবৃন্দের বে-আইনি কাজগুলি একটি অলীক আদর্শবাদ-প্রভাবিত হইলেও আমাদের সমর্থনযোগ্যতা লাভ করে না। এই অংশটি লেখকের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাবহির্ভূত, কল্পনাসৃষ্ট ভাববিলাস বলিয়াই মনে হয়। অপর্ণা ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া আপন চরিত্র-নির্মলতাটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। তাহার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এক উচ্চপদস্থ, মহদাশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতার ব্যপদেশে মিথ্যা কলঙ্করটনার দ্বারা তাঁহার নিকট অর্থ আদায়ের কুৎসিত চক্রান্তের ব্যর্থতায়। ভদ্রলোক অপর্ণার দিকে নোটের তাড়া ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার উপর গৃহের ও হৃদয়ের কপাট যুগপৎ রুদ্ধ করিয়াছেন। অপর্ণার দারুণ অনুতাপ ও টাকা ফিরিয়া লইবার জন্য কাকুতি-মিনতি তাঁহার বদ্ধমূল বিমুখতাকে একটু গলায় নাই। অপর্ণা স্বীকারোক্তি করিয়া হাজতে গিয়াছে কিন্তু বিচারের সময় ভদ্রলোক যে অপর্ণাকে টাকা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং অপর্ণার জীবনে অনির্বাণ তুষানলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গল্পটি অপর্ণার চরিত্রসঙ্গতি, প্রতিবেশরচনা বা ঘটনার অনিবার্যতা কোন দিক দিয়াই বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই—একটা অস্পষ্ট ভাবালুতা সমস্ত বিষয়টিকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

সদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের, যদিও তাহার নারীধর্ষণের অপরাধে বিনা প্রতিবাদে কারাবরণ একটু অবিশ্বাস্যই মনে হয়। নবদ্বীপের মত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে একজন প্রতিষ্ঠাভাজন ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে এরূপ একটা মিথ্যা অভিযোগ যে এত সহজে টিকিয়া যাইবে তাহা বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে। এরূপ ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাক্ষ্যে সত্যধর্ষণক্রিয়া প্রমাণ করি..., হয়। কিন্তু মানস পাপ দৈহিক সংসর্গের রূপ না লইলে উহা ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। করাল, চণ্ডী ও চণ্ডীর মেয়ে—এই তিনজনে মিলিয়া যে ষড়যন্ত্রজাল বয়ন করিয়াছে তাহার পল্‌কা সূত্রে সদানন্দকে বাঁধিয়া রাখা যাইত না, যদি সদানন্দের নিজ গোপন পাপ সম্বন্ধে উগ্র সচেতনতা তাহাকে স্বেচ্ছায় এই জালে ধরা দিতে প্রণোদিত না করিত। মোটের উপর নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী সদানন্দের সূক্ষ্ম অপরাধবোধ ও উহার মধ্যে তাহার মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় নিহিত তাহাই গল্পটির প্রধান আকর্ষণ।

জ্ঞানদার কাহিনীতে দারিদ্র্যের চাপে কামাসিক্তনে অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের সেই সুপরিচিত পরিণতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই গ্লানিজনক অভিজ্ঞতা তাহার দেহে ও মনে যে জ্বালা ধরাইল তাহা কেবল কামুক মুদির ঘর পোড়াইয়াই ক্ষান্ত হইল না। জেলখানাতেও তাহার আঁচ উদ্ধত আচরণে ও স্পর্ধিত নিয়মভঙ্গে এক উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিল। রামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি যে এই অনির্বাণ অন্তর্দাহকে প্রশমিত করিয়া সেই দুর্বিনীতা, বহ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী নারীকে কোমলশ্রীমণ্ডিতা, ভক্তিনম্রা পূজারিণীতে পরিণত করিল তাহা মানব মনস্তত্ত্বের একটি চিরন্তন প্রহেলিকা।

'তামসী' উপন্যাসে জেলের নির্মম, যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রা অকস্মাৎ প্রণয়-রোমান্সের স্পর্শে আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার বিধিনিষেধ-জর্জর আবহাওয়া যেন

অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া রোমান্সে মলয়পবনবীজিত হইয়াছে। সব কয়টি চরিত্রই কোমল সহৃদয়তায় কমনীয়। জেলর্ মহেশ তালুকদার জেল-পরিচালনায় অতি উদার সহানুভূতিময় মনোভাবের পরিচয় ত দিয়াছেনই, অধিকন্তু তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তি জেলের সীমা অতিক্রম করিয়া খালাস কয়েদী ও দুর্ভাগিনী নারীদের আশ্রয়ের জন্য একটি আশ্রমও গড়িয়া তুলিয়াছে। এমন কি জেল-জমাদারণী সুশীলাও মেয়ে বন্দীদের স্নেহময়ী মাসীতে পরিণত হইয়াছে। কয়েদিনীদের মধ্যে কমলা ও হেনা উভয়ের জীবন যেমন একদিকে অদৃষ্টবিড়ম্বিত তেমনি অন্যদিকে অনলস সেবা, অনাবিল স্নেহপ্রীতি, ত্যাগশীলতা ও মধুর প্রেমে বরণীয় ও আদর্শস্থানীয়। জেল ডাক্তার দেবতোষ হেনার প্রতি যে প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিয়াছে তাহা যে-কোন আদর্শচরিত্র নায়কের উপযুক্ত। দেবতোষের মা সুলোচনা দেবীও তাঁহার উদার সংস্কারমুক্ততার জন্য এই কল্পলোকে স্থান পাইবার অধিকারিণী হইয়াছেন—তিনি নিঃসঙ্কোচে হত্যাপরাধে দণ্ডিতা অজ্ঞাতকুলশীলা বন্দিনীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, জেলের গ্লানিকর অপরাধ ও দণ্ডের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বীভৎস পরিবেশে এতগুলি আদর্শ নরনারীর সমাবেশ হইল কোন্ যাদুবিদ্যার প্রভাবে? মনে হয় শরৎচন্দ্রের পতিতা-চরিত্রের ন্যায় জরাসন্ধের জেলবন্দীরা লেখকের সহানুভূতিস্নিগ্ধ কল্পনা-প্রয়োগে ও সুকোমল হৃদয়বৃত্তির উৎসারণে আদর্শায়িত হইয়া উঠিয়াছে। অসাধারণ ব্যতিক্রম রূপে যে দুই একটি বিরল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যেকের সমর্থন পায়, সাধারণ নিয়মরূপে তাহাদের উপস্থাপনা আমাদের সঙ্গতিবোধকে পীড়িত করে।

ইহাদের মধ্যে কমলার ইতিহাসটি সত্যই করুণ ও মর্মস্পর্শী। স্কুলমাষ্টারের মেয়ে বাবার ছাত্রদের সাহচর্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় তাহাদিগকে হারাইয়া একটু সরল আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। এই সাহচর্যের ফলে বাবার এক ধনী ছাত্রের সঙ্গে তাহার হৃদয়াকর্ষণ অনুভূত হইল। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুর ফলে কমলাকে তাহার ভগ্নীপতি ও দিদির আশ্রয় লইতে হইল ও ভগ্নীপতির দুর্বার কামলালসার অগ্নিতে সে আপনাকে আহুতি দিতে বাধ্য হইল। তাহার পূর্ব প্রণয়ী সনৎ তাহাকে জীবনসঙ্গিনী হইবার আমন্ত্রণ জানাইল এবং সে মা ও দিদিকে ত্যাগ করিয়া সনতের বাসায় আশ্রয় লইল। কমলা সনৎকে তাহার কলঙ্কিত কাহিনী জানাইতেই সনৎ মনে এমন নিদারুণ আঘাত পাইল যে, সে নিজের মন ঠিক করিবার জন্য দূরে চলিয়া গেল ও কমলাকে নবদ্বীপে পাঠাইল। সেখানে সে মৃত সন্তান প্রসব করিয়া দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে সন্তানহত্যার অভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল ও মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে এই অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া তাহার কারাদণ্ড হইল। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রণয়ী সনৎ তাহার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার অভিশপ্ত জীবনে শাপমোচন করিল। কমলার উপর অত্যাচার ও তাহার অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব বর্ণনায় লেখক হার্ডির বিখ্যাত নায়িকা টেসের কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন। তবে এখানেও ঘটনাসূত্র-সংযোজনায় কিছু দুর্বল গ্রন্থি আছে মনে হয়। মৃত সন্তান প্রসব ও জীবিত সন্তানের হত্যার মধ্যে কি কোনই দেহবিজ্ঞানগত পার্থক্য নাই যাহা ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা যাইতে পারে? আর সম্পূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে এমন একটা দুর্বল অভিযোগের প্রমাণ একটু অসম্ভব ঠেকে। যদি সত্যসত্যই

এরূপ বিচারের ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে, তবে যাহা কারাগারের প্রশংসা তাহাই বিচার-ব্যবস্থার নিন্দারূপে প্রতীয়মান হইতে বাধ্য।

হেনার জীবনকাহিনী আরও জটিল ও বিরূপ ভাগ্যের নানা বিরুদ্ধ ঝটিকাঘাতে বিধ্বস্ত। তাহার বাল্যজীবনের পরিবেশটি বড়ই সুন্দর ও পূর্ণভাবে চিত্রিত। বাবার ও দাদার সঙ্গে তাহার স্নেহসম্পর্ক, বিশেষতঃ দাদার সঙ্গে তাহার নিঃসংকোচ সমপ্রাণতা আমাদের মনে একটি আদর্শ পরিবারের চিত্র অঙ্কিত করে। এই আনন্দপূর্ণ পরিবেশেই তাহার মনে প্রথম যৌবন-সঞ্চার ঘটিয়াছে। ইহার পরেই তাহার স্নেহময় দাদার আকস্মিক মৃত্যু তাহাদের পারিবারিক ভিত্তিতে প্রচণ্ড ফাটল ধরাইয়াছে। এই সময় রাজবন্দী বিকাশের সঙ্গে তাহার পরিচয় ও হেনার মনে তাহার প্রতি এক ভীতিসম্ভ্রমরুদ্ধ নিগূঢ় আকর্ষণের সূত্রপাত। ইহা ঠিক প্রেম নয়, প্রেমের একটা অপরিস্ফুট পূর্বাবস্থা। হেনার আত্মকাহিনীতে পূর্বরাগের এই আধুনিক অনির্দেশ্যতা চমৎকার ফুটিয়াছে। এক রাত্রিতে কঠিন অসুখ হইতে আরোগ্যলাভের সংকল্প-শিথিল মুহূর্তে বিকাশ অকস্মাৎ এক অসংবরণীয় আবেগের প্রেরণায় হেনার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া সেখানে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে ও সেই শয়নকক্ষ হইতেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিন্তু তাহার পর চতুর্দিকে যে কলঙ্কের বান উত্তাল হইয়া উঠিল তাহাতে বাবা ও মেয়ে উভয়েরই জীবন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হেনা তাহার বাবার মুখ চাহিয়া আশ্রয় ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইল ও নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এক হাসপাতালে ঝি-এর কাজ লইল। ইতিমধ্যে রাজবন্দী বিকাশ মুক্তি পাইয়া তাহারই দলভুক্তা একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে এই সংবাদ হেনার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে জীবন সম্বন্ধে নির্মমভাবে নিঃস্পৃহ করিয়া তুলিল। ঘটনাচক্রে বিকাশের স্ত্রী শিবানী সেই হাসপাতালেই ভর্তি হইল ও তাহার রূঢ় আচরণে হেনার মনকে তাহার প্রতি বিদ্বেষে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিল। এই বিদ্বেষ ও পূর্ব অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধস্পৃহা হেনাকে শিবানীর চা-এর সহিত আফিং মিশাইয়া দিতে অনিবার্যভাবে প্রণোদিত করিল ও শেষ পর্যন্ত খুনের অপরাধে দণ্ডিত হইয়া সে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করিল। খালাসের পর যখন দেবতোষের সঙ্গে তাহার মিলনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, তখন গোয়ালন্দ ষ্টীমারে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, মৃত্যুপথযাত্রী বিকাশের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ আবার তাহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল, ও সে দাম্পত্য সুখের মধুর সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহার পূর্বপ্রণয়ীর অন্তিম যাত্রাকে শান্তিময় করার দুরূহ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিল। ইহাতেই প্রমাণ হইল যে, দেবতোষের প্রতি তাহার মনোভাব কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস; কিন্তু তাহার প্রেম তাহার বিশ্বাসহন্তা প্রথম প্রেমিকের নিকটই চিরতরে উৎসর্গীকৃত। হেনা সত্যই অপরাধী; এবং তাহার পূর্বজীবনের অবদমিত মনোবৃত্তি, নীরব পরনির্ভরতা ও বিকাশের আচরণের রূঢ় আঘাতই এই আকস্মিক অপরাধপ্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে।

'ন্যায়দণ্ড' উপন্যাসটি অনেকটা জেলসীমার বাহিরে পদক্ষেপ করিয়া নূতন বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছে। যদিও ইহার ঘটনাবলীর শাখা-প্রশাখা কারাপ্রাচীরের বাহিরে যে মুক্ত জগৎ আছে তাহার উপর বিস্তৃত, তবুও ইহার সমস্যার মূলবীজটি কারাঙ্গনেই উপ্ত। জজ বসন্ত

সান্যাল ডাকাতি অপরাধে অভিযুক্ত শশাঙ্ক মণ্ডলকে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু রায় দিবার পরেই তাঁহার পায়ের তলা হইতে নিশ্চিত প্রত্যয়ের মাটি সরিয়া গিয়াছে ও একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যাজাল তাঁহার সহজ নিঃশ্বাসের গতিরোধ করিয়াছে। শশাঙ্কর স্ত্রী একটি দুই বৎসরের মেয়ে জজ সাহেবের ঘাড়ে চাপাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ও জজ সাহেব শশাঙ্ক মণ্ডলের কারামুক্তির পর তাহার শিশু-কন্যাকে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, সাজান মোকদ্দমায় শশাঙ্কর দণ্ড হইয়াছে। এই বিচার-বিভ্রাট ও নূতন দায়িত্ব-গ্রহণ আত্মসমীক্ষাপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ জজ সাহেবের সমস্ত জীবনকে এক অ-কল্পিত কক্ষপথে পরিচালিত করিল।

উপন্যাসটির ঘটনাচক্রের আবর্তনের প্রধান আশ্রয় হইল জজ সাহেবের অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প ও অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সমস্ত কোমল মানবিক আবেগের বিসর্জন। তাঁহার এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন সমস্যার জাল তাঁহার শ্বাসরোধ করিয়াছে, দারুণ রক্তস্রাবী অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার স্কন্ধে দুঃসহ বোঝার ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে, নিঃসঙ্গ বেদনা তাঁহার জীবনের চিরসহচর হইয়াছে। তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্যও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার কথা ভাবেন নাই। মেয়েটির খবরদারি লইয়া তাঁহার পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামী-পরিত্যক্তা বড় বৌমার সঙ্গে দেওঘরে বাসা করিয়াছেন। শশাঙ্কর জেলের মেয়াদ ফুরাইলে তিনি বৌমার অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার স্নেহপালিত এই মেয়েটিকে তাঁহার নিবিড় মমতাবন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া জেলফেরৎ বাবার নিকট ফিরাইয়া দিতে গিয়াছেন। সেখানে শশাঙ্কর সাক্ষাৎ না পাইয়া জেল সুপারকে তাহার খোঁজের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়া তিনি দেওঘর ফিরিয়াছেন ও ফিরিয়া দেখিয়াছেন যে, বৌমা স্নেহপুত্তলিশূন্য গৃহ সহ্য করিতে না পারিয়া দিল্লীতে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা অণিমার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থাতেও তাঁহার সংকল্প অটুট রহিল। তিনি যে মায়াকে লইয়া ফিরিয়াছেন এ সংবাদ যাহাতে বৌমা না জানিতে পারে তাহার জন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। যখন একদিন ছাড়িতেই হইবে তখন আর মোহবন্ধন দীর্ঘতর করিয়া লাভ কি?

ইতিমধ্যে জজসাহেব স্থান পরিবর্তন করিয়া এলাহাবাদে আসিয়াছেন ও শশাঙ্কর কোন খবর না মিলায় মায়াকে কলেজে ভর্তি করিয়াছেন ও তাহার উন্নতমান জীবনযাত্রারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদিকে অণিমা ও তরুণী মায়ার জীবনে প্রণয়সমস্যা ঘনীভূত হইয়াছে। অণিমার সঙ্গে এক সহকর্মী মারাঠী যুবক রাঘবনের প্রেমসঞ্চারে বাধা পাইয়াছে অণিমার অদৃষ্টনির্ভর দৃঢ় জীবনবাদের প্রাচীরে। অণিমার বিশ্বাস যে, তাহাদের পরিবারে সুখী দাম্পত্য মিলনের উপর নিয়তির অভিশাপ ক্রিয়াশীল। আর নিজ জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মায়া আপনাকে সান্যাল সাহেবের পৌত্রী মনে করিয়া সহপাঠী সুবিমলের সঙ্গে একটি মধুর হৃদয়াকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। সে যখন সত্য জানিতে পারিবে ও যখন তাহার পালক পিতামহের আশ্রয় ছাড়িয়া তাহার দাগী বাবার নিকট বাস করিবে তখন তাহার কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হইবে সেই সম্ভাবনা জজসাহেবকে অহরহঃ পীড়িত করিয়াছে।

অবশেষে চরম সংকটমুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক একদিন আসিয়া হাজির হইয়াছে ও মায়াকে দাবি করিয়াছে। জজসাহেব সমস্ত ব্যাকুল উদ্বেগ চাপিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় আপাত-নির্বিকার; বধূ জয়ন্তীও শোকোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া বিদায়-মুহূর্তের জন্ত প্রস্তুত। শুধু মায়াই এই অতর্কিত পরিবর্তনে দিশাহারা—তাহার মুখে যে ত্রস্ত অসহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়াই শশাঙ্ক তাহার দাবি প্রত্যাহার করিয়াছে। সমস্তার এক প্রকার সমাধান হইয়াছে। জজসাহেব, জয়ন্তী ও মায়ার মধ্যে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা দূর হইয়াছে ও তাহারা অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু সব ছিন্নসূত্র জোড়া লাগে নাই। অণিমার স্বেচ্ছাবারিত প্রণয়-সার্থকতা কি বাধামুক্ত হইয়াছে ও মায়া ও সুবিমলের তরুণ প্রণয়াকুতি কি পরিতৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছে? এই প্রশ্নগুলি অমীমাংসিতই রহিয়াছে।

চোর-দুর্বৃত্ত-পকেটমারের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখকের যে কৌতূহল আছে তাহা নিতাই-সন্ধ্যা-শশাঙ্ক-বাদলের বৃত্তি-বর্ণনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় জীবনচিত্রণের মধ্যে না আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ, না আছে কল্পনা-যাথার্থ্যের নিগূঢ় অনুপ্রবেশ। যেমন পুকুরের মাছ ও ডাঙার মাছে পার্থক্য, তেমনি জেলে সুরক্ষিত অপরাধী ও জনারণ্যে আত্মগোপনকারী, স্বাধীনভাবে বিচরণশীল ফাঁকিবাজ গুণ্ডার মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। লেখক জেলের কয়েদী চিনেন বলিয়াই যে বড়বাজারের গুণ্ডার জীবনচিত্রাঙ্কনে সফল হইবেন তাহা দাবি করা যায় না।

জরাসন্ধ বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে যে অভিনব বিষয়বৈচিত্র্য প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা সর্বদা স্বীকার্য। তাঁহার বর্ণনাশক্তি যেরূপ বর্ণাঢ্য, তাঁহার মননও সেইরূপ বিষয়ের মর্মভেদ-নিপুণ। তাঁহার কাহিনীগুলি সুপরিকল্পিত নাটকীয়-গুণসম্পন্ন ও বেগবান। এই সমস্ত গুণের জন্ত তিনি নিশ্চয়ই স্বীকৃতি লাভ করিবেন। তবে তাঁহার সমগ্র রচনাগুলি পড়িলে উহাদের বিষয়ের একঘেয়েমি ও আলোচনারীতির পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা একটু ক্লান্তিকর ঠেকে। লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা জেলের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কারাবন্দীদের মধ্যে অসাধারণ ব্যতিক্রমস্থানীয় নর-নারীর উপর অতিরিক্ত জোর দিবার ফলে ও উহাদের মধ্যে আকস্মিক রোমান্সপ্রবণতার অতিরঞ্জিত বর্ণনার জন্ত উহার সামগ্রিক যাথার্থ্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয়। লেখকের কল্পনা তাঁহার শেষ দুইখানি উপন্যাসে জেল হইতে বাহির হইয়া আসিলেও কারাপ্রাচীরের ছায়া অতিক্রম করিতে পারে নাই। জেল-জীবনে যে রস-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার সবটুকু তিনি আবিষ্কার ও পরিবেশন করিয়াছেন। এইবার জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ত তিনি কতখানি প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা পরীক্ষিত হইবে। খোলা মন ও সহজ সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া তিনি জীবনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সেখান হইতেও তিনি পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মুমূর্ষু পৃথিবী' ও 'লীলাভূমি' সমাজের নিম্নতম স্তর—ভিখারী ও কুষ্ঠসিৎ বস্তী-জীবন-সম্বন্ধীয় অতি শক্তিশালী রচনা, কিন্তু উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—সমাজচিত্রের যথার্থতা ও সামগ্রিকতা ও চরিত্রপরিণতি—এই লেখাগুলিতে অনুপস্থিত। মনে হয় লেখক এখানে উপন্যাসের স্বীকৃত আদর্শ ত্যাগ করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'-

জাতীয় খণ্ডচিত্রসমষ্টির বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই উপন্যাস দুইখানিতে লেখক মধ্যবিত্ত সমাজকে একেবারে বাদ দিয়া অতিসৌখীন, নীতিভ্রষ্ট ও দেহচেতনাসর্বস্ব কালচার-বিলাসী সম্প্রদায় ও একান্ত রিক্ত পরিবারবন্ধনহীন ভিক্ষুকশ্রেণী—এই দুই বিপরীতপ্রান্তস্থিত মানবগোষ্ঠীর চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কনে তাঁহার সমাজসমালোচনার শাণিত ধার, সমাজনীতির মূঢ়তায় উদ্রিক্ত রোষের অগ্নিশ্বসন, আশ্চর্য ব্যঙ্গনাশক্তি ও তথাকথিত অভিজাতশ্রেণীর রঙীন প্রজাপতিদের বিলাস-ব্যসনের প্রতি মর্মভেদী ব্যঙ্গনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে বস্তিবাসী ভিখারী-দল—অতসী, পদ্ম, পুঁটি, নিবারণ,—অপর দিকে সুরেখা, শিপ্রা, খাণ্ডেলওয়ালা, চোপরা, অজিত, বালকৃষ্ণ, লীনা, বিভোর সেন, ক্লিটন, কল্পনা চৌধুরী প্রভৃতি রূপবিহ্বল, জীবনমদিরাপানে মাতোয়ারা, সুখান্বেষী সমাজ যেন পরস্পরের পরিপূরক চিত্ররূপে লেখকের মানব-চরিত্রপরিকল্পনার দিগ্‌দর্শন পরিস্ফুট করিয়াছে। এই উভয় স্তরে একইরূপ বিকৃত জীবনাদর্শ, ক্ষয়িষ্ণু, পচনশীল প্রাণচেতনা বিভিন্ন বাহ্য অবস্থার ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছে একদা কালচার-বিলাসী সমাজের নেতা সত্যেন সেন, অধুনা ভিক্ষুকের যাযাবরত্বে আত্মগোপনশীল দীনু। দীনু ও অতসীর মধ্যে এক প্রকারের হৃদয়াবেগগত আকর্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহা দীনুর পক্ষে একটা ক্ষণিক মোহ, তাহা কিন্তু অতসীর পক্ষে এক অত্যাজ্য জীবনব্যাপী সম্বন্ধবন্ধন।

এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের মধ্যে কয়েকটি ব্যতিক্রমস্থানীয় চরিত্র সুস্থ জীবনবোধের প্রতীকরূপে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ইহাদের মধ্যে জয়ন্ত চ্যাটার্জি ও সার সি. কে. রায়ের আদরিণী ধনীর দুলালী কন্যা ব্রততী এই মুমূর্ষু পৃথিবীর মধ্যে দুইটি সতেজ, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল প্রাণকণিকা। ইহারা শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য সৌখীন সমাজের প্রলোভন কাটাইয়া যথার্থ সমাজহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ও সর্বতোমুখী অবসাদের মধ্যে নূতন আশার অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে।

লেখক নিজ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক জীবনচিত্রাঙ্কনে এতই নিবিষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ধারণার অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন নাই। অতসী ও দীনু কেন বেকারী জীবনের অভিশাপ চিরকালের জন্য বহন করিয়া চলিবে তাহার কোন অনিবার্য হেতু তিনি প্রদর্শন করেন নাই। 'লীলাভূমি'র শেষ অংশে অতসী একটা কারখানার কাজ পাইয়া নিজ জীবিকার্জনে সক্ষম হইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যুর পর অন্ততঃ কলিকাতা শহরে একটা ঝি-এর কাজ জোটান তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। দীনুরও অসহায়ভাবে ভাসিয়া বেড়ানর কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। অতসী ও দীনু উভয়েই উপবাসটা এমন অভ্যাস করিয়াছে, এতবার রাস্তার দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে, জীবনব্যাপী দুর্দশা-লাঞ্ছনায় এরূপ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছে যে, তাহাদের জীবনকে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ-মিশ্র, আশা-নৈরাশ্য-জড়িত জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় মনে হয় না। ইহার মধ্যে দৈবের বিশেষ ষড়যন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির অসাধারণ বিপর্যয় সহজেই লক্ষ্য হয়। লেখক তাঁহার জীবনচিত্রণে কালো রংকে অযথা পুঞ্জীভূত করিয়াছেন। কলিকাতার নাগরিক জীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দৈবদুর্বিপাক ও মানবপ্রভাব-সঞ্জাত বিপর্যয়কে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া উহার স্বাভাবিক দুঃখকে কৃত্রিমভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি সুস্থ শিশুকে

অস্ত্রপ্রয়োগে অন্ধ করিয়া উহাকে নিয়মিত বৃত্তিভোগী ভিক্ষুকে পরিণত করার যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্র কলিকাতার সুড়ঙ্গজীবনে হয়ত মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহারও একাধিক বর্ণনা দিয়া তিনি আমাদের সহনশক্তির উপর দুর্ভর পীড়ন আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত প্রখর অনুভূতি ও শক্তিশালী কল্পনার নিদর্শন দেয়। কিন্তু সব গুদ্ধ মিলিয়া যে জীবনের ছবি আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠে তাহার যাথার্থ্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

চরিত্রপরিণতির দিক দিয়াও আমরা অগ্রগতির পরিবর্তে বৃত্তাবর্তনই পাইয়া থাকি। অতসী ও দীনুর সম্বন্ধটি চিরপ্রদোষাচ্ছন্নই রহিয়া গেল। তাহাদের জীবনে একই রকম অভিজ্ঞতার অজস্র পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জীবনবোধ অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে। অথচ এই দুইটি চরিত্রে এতটা স্বাভাবিকতা ও সুস্থ অনুভূতির সম্ভাবনা ছিল যে, ইহাদের নূতন জীবনবোধে উত্তরণ আমাদের প্রত্যাশিতই ছিল। যেমন বস্তিজীবনে তেমনি চেরি ক্লাবের জীবনেও একই রকমের মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি অভিনীত হইয়াছে। অতসীর প্রতি পদ্মর ঈর্ষা, সুরেখা ও শিপ্রার অবিমিশ্র জীবনোপভোগস্পৃহা ও প্রেমপাত্রের মুহুর্মুহুঃ, নিঃসংকোচ পরিবর্তন তাহাদের জীবনদর্শনের কোন সূক্ষ্মতর পরিণতির সূচনা করে না। কলানৃত্যের বাঁধা ছকের মত তাহাদের জীবনেরও ছকটি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। জয়ন্ত ও ব্রততীর যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নিছক প্রতিক্রিয়ামূলক, জীবন-অভিজ্ঞতার প্রসারভিত্তিক নহে।

উপন্যাসদ্বয়ের এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরিধির সংকীর্ণতা সত্ত্বেও উহাদের একক চিত্রের বর্ণঝলমল ঔজ্জ্বল্য, স্থির ·চরিত্রগুলির ক্ষণিক প্রকাশপরম্পরার মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, যথাযথ ভাবরূপায়ণ, ও সুপ্রযুক্ত মন্তব্য ও ব্যঞ্জনাশক্তির আরোপ লেখককে উচ্চাঙ্গের শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সুরেখা ও শিপ্রা হয়ত মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া চঞ্চল, বর্ণদ্যুতিময় প্রজাপতির উর্ধ্বে নয়, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি ডানার ঝলকানি, প্রত্যেকটি কৃত্রিম ভাববিলাসের সঞ্চরণ, মনের প্রত্যেকটি অনুভূতির প্রকাশ, তাহাদের সামগ্রিক জীবনপ্রতিবেশ ভাষার অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ও ভাবের চমৎকার সঙ্গতির সহিত রূপ পাইয়াছে। হীরার কাঠিন্য কোন গভীর অন্তঃপ্রবেশের অবসর দেয় না, কিন্তু উহাকে ঘুরাইলে উহার বিভিন্ন মুখ হইতে নানা বর্ণময় দীপ্তি উছলিয়া পড়ে। তেমনি লেখক যে কয়েকটি চরিত্রের আংশিক পরিচয় দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গভীরতা বা জীবনের কোমল ত্বকস্পর্শ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে স্বাভাবিক চরিত্ররূপে মানিয়া লইলে তাহাদের রূপায়ণের শিল্পকৌশল ও মনস্তাত্ত্বিক যাথার্থ্য আমাদিগকে চমৎকৃত না করিয়া পারে না। আশা করা যায় লেখক যখন তাঁহার কল্পনার মৃতকল্প পৃথিবীকে ছাড়িয়া বাস্তবরসপুষ্ট,' ও ভালোমন্দে মেশান জীবনের ছবি আঁকিবেন, তখন তাঁহার ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের আরও সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিবে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'জনপদবধূ' (ডিসেম্বর, ১৯৫৮)—উপন্যাসে নানা বিচিত্র রসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত দেবদাসীপ্রথার রূপোপজীবনী-বৃত্তির সহিত একটি সাত্ত্বিক্ আচারশুদ্ধ ভাবপরিমণ্ডল ও আদর্শানুগ নিয়মনিষ্ঠার যোগসাধন করিয়া ইহার মধ্যে ঘৃণিত দেহব্যবসায়কে সৌকুমার্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন

ঐতিহ্যে সমস্ত কলঙ্কিত বৃত্তিরই একটা ধর্মানুগত রূপ ছিল। গণিকার জীবনেও শালীনতা-মর্যাদা ও ভদ্রবৃত্তিতেও শাস্ত্রীয় নীতির অনুবর্তন উহাদের আদিম হেয়তার উপর একটা সংস্কৃতির আভিজাত্য আরোপ করিয়াছিল। বিশেষতঃ দেবমন্দিরসম্পর্কিত সমস্ত আচরণই স্থূল দৃষ্টিতে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, সূক্ষ্ম বিচারে একটা পূজারতির পবিত্রতা-মণ্ডিত হইত। দেবদাসীরা নৃত্যগীত প্রভৃতি ললিতকলাচর্চা, কৃচ্ছ্রসাধন ও অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি-আবেগের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তির উর্ধ্বে এক বিশুদ্ধ ভাবলোকে উন্নীত হইত। দেবানুগ্রহে তাহাদের বহুজনপরিচর্যা তাহাদের চিত্তে সর্ব মানবের মধ্যে ভগবৎস্বরূপের প্রতিফলনের প্রত্যয় জাগাইয়া তাহাদের কামচর্চাকেও দেবসেবার অঙ্গরূপে প্রতিভাত করিত। দেহ-ভোগবাদ বৈদান্তিকচেতনাস্ফুরণের সহায়তাই করিত।

উপন্যাসে প্রতিবেশরচনায় ও পাত্র-পাত্রীর আচরণের মধ্য দিয়া অন্ধ্রদেশের দেবমন্দিরের বাতাবরণ, উহার কঠোর আচার-নিয়ন্ত্রিত পূজাপদ্ধতির রূপ, সুকুমার শিল্পকলার মাধ্যমে অনাবিল ভক্তি-উৎসার এবং জীবনচর্যায় অধ্যাত্ম চেতনার সহজ প্রতিষ্ঠা—এই সমস্তের পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে।

লেখক সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে তাঁহার জীবনচিত্রকে আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বইখানি প্রকৃতপক্ষে অতীত চিত্র, যাহা বর্তমান পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে ও যাহাতে ধর্মমুগ্ধতা ও প্রণয়াবেশের রোমান্স মিশিয়া পরস্পরের আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়াছে। ইহা সেইজন্য অতীতাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাসের সগোত্র, তবে এখানে রোমান্স কোন চমকপ্রদ ঘটনা বা ভাবাতিশয্যের আড়ম্বরে নয়, সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাসে রূপায়িত হইয়াছে। নটরাজন্ নৃত্য ও-গীত-শিল্পী ও নিরাশ প্রেমিক; সে বীণা হইতে প্রেয়সীমিলনের বিকল্প আনন্দ অনুভব করে। চেট্টীবাবু এই দেবীপল্লীর সংগঠক ও ব্যবস্থাপক, সে প্রাচীন নিয়ম-কানুনের পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা এই দেহব্যবসায়ের মধ্যে একটা ধর্মনীতির ও অদৃষ্টনিয়ন্ত্রণের প্রয়োগক্ষেত্র রচনা করিতে চাহে। অথচ সে নিজেই নয়জন দেবদাসীর মধ্যে একজনের—সরোজার প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট ও নিজ আদর্শের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রধান ব্যবসায়ী ঘনশ্যামদাসজীর প্রতিপত্তি-প্রভাবের নিকট সরোজাকে বিকাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সরোজা এই স্বর্ণশৃঙ্খল কাটিয়া তাহার প্রণয়ীর নিকট ফিরিয়াছে ও উভয়ে শান্তিকামীর শেষ আশ্রয়স্থল, কাশী যাত্রা করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জড়বাদী এক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার আর নায়িকা নব দেবদাসীর মধ্যে অন্যতমা ভামতী। ইহাদের প্রথানিয়ন্ত্রিত প্রথম মিলন দেখিতে দেখিতে অপূর্ব প্রণয়রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ভামতীর আচারনিষ্ঠতা ও ব্যাকুল প্রণয়াবেগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সবিশেষ কৌতূহলজনক। ইঞ্জিনিয়ারের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কোন আবর্ত রচনা করে নাই। তাহার মানস পরিবর্তন আরও নিগূঢ় ও বিস্ময়কর। সেই এই প্রণয়াবেগের বশে অন্য কোন দেবদাসীর সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও ভামতীর মাতা সরস্বতী আম্মার কঠিন রোগে আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়াছে। ভামতী ও তাহার মাতা তাহার বস্তুবাদী মনে কবিত্বের বীজ আবিষ্কার করিয়াছে ও বিশ্বরহস্যের সর্বত্র যে চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে সেই কবি,

কবিত্বের এই নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে। এই প্রত্যয়ের প্রভাবে সে সত্যসত্যই কবি হইয়া উঠিয়াছে। সকলের জন্যই সে প্রেম অনুভব করিয়াছে, সকলের মধ্যেই ঐশী জ্যোতির স্ফুরণ দেখিয়াছে। তাহার মন বহির্মুখী হইতে অন্তর্মুখী হইয়াছে। ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াতীতে তাহার ক্রম-উত্তরণ ঘটিয়াছে। অন্য দেশের উপন্যাসে এই পরিবর্তন ভাববিলাসদুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভারতের শাশ্বত সাধনায় ইহা একটি বাস্তব, বহু-পরীক্ষিত সত্য। কাজেই সে অভিযোগে বিচলিত হইবার আমাদের কোন কারণ নাই। আমাদের বিচারের মানদণ্ড অন্তঃসঙ্গতি, বহির্বিষয়ক সম্ভাব্যতা নয়।

প্রকৃতিসৌন্দর্য এই অপার্থিব প্রেমের একটি দিব্য উপাদানে পরিণত হইল। শেষ পর্যন্ত ভামতী এই স্বর্গীয় ভালবাসার অবমাননার ভয়ে তাহার প্রেমিকের নিকট হইতে স্বেচ্ছা-নির্বাসন দণ্ড বরণ করিয়া লইল। সে নিরুদ্দেশযাত্রায় আত্মগোপন করিল। নায়কের হাতে নায়িকা-প্রদত্ত মণিখচিত অঙ্গুরীয়টি দুই ফোঁটা জমাট অশ্রুবিন্দুর প্রতীক্ হইয়া তাহার স্মৃতিতে চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিল। এই ত্যাগবৈরাগ্যাত্মক পরিসমাপ্তিটি বাংলা উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ অনুবর্তন, এখানে কিন্তু উহার মধ্যে একটি অনিবার্য ঔচিত্যবোধই অনুভব করা যায়।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের 'বন্দরের কাল' (জুন, ১৯৫৯) বাংলা উপন্যাসের পরিধি-বিস্তার ও ভঙ্গীবৈচিত্র্যের একটি কৃতিত্বপূর্ণ নিদর্শন। খিদিরপুর ডকে জাহাজ আসা-যাওয়ার তত্ত্বাবধান উপলক্ষ্যে জীবনোচ্ছ্বাসের যে বিচিত্র ছন্দ, জীবন-পরিচয়ের যে অভিনব রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই উপন্যাসটির উপজীব্য। সরকারী আইন-কানুন ও কর্মব্যবস্থার যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণে, নিয়মিত কর্তব্যের ফাঁকে ও ফাঁকিতে, বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদার কর্মচারিবৃন্দের পারস্পরিক আচরণে বঞ্চিত ক্লিষ্ট হৃদয়াবেগের যে আঁকা-বাঁকা স্রোতটি বহিয়া যায়, তাহা নদীস্রোতের মতই রহস্যময় ও জোয়ার-ভাটায় উচ্ছ্বসিত। বাঁশীর ছিদ্রপথে যেমন সঙ্গীতের ঢেউ-খেলান প্রবাহ নির্গত হয়, তেমনি জটিল যন্ত্রব্যবস্থার নানা রন্ধ্রমুখে মানবিক আবেগের বিচিত্রসুরসংবদ্ধ মিশ্র সঙ্গীতটি ধ্বনিত হইয়া উঠে। অতিকায় যন্ত্রদানবের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় মানব-হৃদয়ের অদ্ভুত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের এক নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের কত অজ্ঞাত বিস্ময় ও কৌতূহল, উহার উন্মথিত অনুভূতির কত বেগবান ফেনক্ষুব্ধ আলোড়ন, বন্দরের আলো-ছায়া-সতর্কতা-সংকেতের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া অন্তররহস্যের কত গোধূলিচ্ছায়াদ্যোতনা আমাদের সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। আর সহস্র সহস্র শ্রমিক-মজুরের দল তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-সমস্যা লইয়া, তাহাদের একক ও সমষ্টিগত সুখ-দুঃখের কলকোলাহলে ডকের আকাশ-বাতাসকে বিচিত্রধ্বনিসমবায়ে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। লেখক তাঁহার উপন্যাসে মানবচিত্তের এই বহুমুখী প্রকাশকে, হৃদয়াবেগের এই উত্তরোল ছন্দটিকে, জীবনসমীক্ষার সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, নবদিগন্তসন্ধানী মননক্রিয়াকে সার্থকভাবে শিল্পসুষমাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত করিয়াছেন। জীবনের অশান্ত তরঙ্গোৎক্ষেপ তাঁহার ভাষার মৌলিক শব্দবিন্যাস ও ভাবের উত্তেজিত ভঙ্গীতে যেন নিজ গতিবেগটি প্রতিফলিত করিয়াছে। ঘটনার বেগবান প্রবাহ ও পর্যবেক্ষণশীল মনের বিস্মিত আগ্রহ লেখকের বর্ণনা-বিবৃতি-মননে উহাদের আদিম আবেদনটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। জীবনোৎসুক্য শিল্পসাধনায় উহার প্রথম অনুভূতির স্পন্দনটি, উহার

সদ্যোজাত চমকটি উহার মননসমৃদ্ধ রূপান্তরের মধ্যে স্তিমিত হইতে দেয় নাই ইহাই লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব। ইহাতে চরিত্রে গভীর ও ঐকান্তিক অনুপ্রবেশ নাই. কিন্তু ইহার বিচ্ছিন্ন আখ্যানাংশসমূহের সংকীর্ণ সীমায়, সমুদ্রের জলে ফস্ফোরাস-দীপ্তির ন্যায়, মানব-জীবনরহস্যের চকিত আলোকবিন্দুগুলি আমাদের অতলের সন্ধান দেয়। মনে হয় যেন লেখক সুদক্ষ নাবিকের ন্যায় মানব-মনের বৃহৎ জাহাজগুলিকে তির্যক পথের অনুসরণে আমাদের অন্তরসমর্থনের পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা উপন্যাসের এই অব্যাহত প্রখর গতিশীলতা আমাদিগকে নূতন নূতন দিকে সমুদ্রাভিযানের ও নানা অপরিজ্ঞাত বন্দরে প্রবেশ সম্ভাবনার আশায় উৎফুল্ল করিয়া তোলে।

কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলা যায় না এমন কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সাম্প্রতিক কালে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই-চরিতমানস' উল্লেখযোগ্য। 'সাহেব-বিবি-গোলাম' সম্পর্কে যে বাগ্‌বিতণ্ডার তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষের সহিত নিঃসম্পর্ক ও প্রধানতঃ লেখকের ঋণ-গ্রহণের নৈতিকতামূলক। যদি উপন্যাসের কোন অংশ অন্য লেখক হইতে বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহা সমসাময়িক যুগের রং ফলানোর উদ্দেশ্যে—ইহা নীতির দিক দিয়া দোষাবহ হইতে পারে, কিন্তু লেখকের শক্তির দৈন্যই যে তাঁহার ঋণগ্রহণের কারণ ইহা প্রমাণিত হয় নাই। এই উপন্যাসে লেখক তারাশঙ্কর-প্রবর্তিত ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-গোষ্ঠীর জীবনচিত্রণধারার অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মৌলিকতা দৃশ্যপট-পরিবর্তনে ও চিত্রাঙ্কনের সামগ্রিকতায় ও ব্যঞ্জনাধর্মিত্বে। উপন্যাসবর্ণিত জমিদার-গোষ্ঠী পল্লীগ্রামের ভূস্বামী নহেন, কলিকাতার বুনিয়াদী ধনী পরিবার—ইহাদের সঙ্গে মৃত্তিকার খুব যোগ যৎসামান্য। ইহাদের মধ্যে আদিম বর্বর শক্তির কোন নিদর্শন নাই, ইহারা ঐশ্বর্য লাভের গোড়া হইতেই বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া নানা বিচিত্র খেয়ালচরিতার্থতাকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়া নানা জটিল পারিবারিক প্রথা ও আচারের জালে আপনাদের স্বাধীন জীবন-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত করিয়া, নিজেদের জীবনের উপর জড়তা ও অবক্ষয়ের ছাপ গভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুটুকবাবু—ইহারা সকলেই অকর্মণ্য ধনীর দুলালের একটু সামান্য ইতর-বিশেষ সংস্করণ, যদিও ছুটুকবাবু শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছেন ও ধনীবংশের সামগ্রিক বিলুপ্তি হইতে যুগোপযোগী মানসবৃত্তির সাহায্যে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের আসল আকর্ষণ ঠিক বাবুদের চরিত্র-চিত্রণে নহে, পর্দাঢাকা অন্দরমহলের অনামিকতার উপর উজ্জ্বল নাম-স্বাক্ষরে, ও ভৃত্যরাজতন্ত্রের অলিগলি-সন্ধানী, মূঢ় প্রভুভক্তির সহিত তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধির সংযোগ-বৈশিষ্ট্যের উদ্ঘাটনে। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আমরা যে ভৃত্যরাজতন্ত্রের কথা শুনিয়াছি, এখানে তাহারই একটি পরিপূর্ণ, ব্যক্তিত্বদ্যোতনায় তীক্ষ্ণ ও সমগ্র পরিবেশব্যাপ্তিতে প্রসারিত ছবি পাই। এখানে মনিব ও গৃহিণীদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে ঝি-চাকরের সহযোগিতায়,

তাহাদের পরোক্ষভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার সাগ্রহ রূপায়ণে কর্তার মদের গেলাস ও গৃহিণীর প্রসাধনের উপকরণ ইহারা হাতে হাতে যোগাইয়া ইঁহাদের মনের অর্ধব্যক্ত অভিপ্রায়কে বাস্তব রূপদান করে, ইহাদের নিরালম্ব বায়ুভূত সত্তাকে রক্ত-মাংসের উপকরণে রূপান্তরিত করে। ভৃত্য পরিচর্যার অক্সিজেন গ্যাস নিঃশ্বাসবায়ুতে টানিয়া ইহারা পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ করেন—এ পুতুল-নাচের দড়িটি তাহাদেরই কর-ধৃত।

উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি মোটামুটি সুপরিচিত শ্রেণীবিন্যাসেরই অনুবর্তন করিয়াছে—উহারা পূর্ণতরভাবে অঙ্কিত, কিন্তু উৎকটভাবে মৌলিক নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়া নারী-চরিত্রের মধ্যে উদাহৃত। অভিজাতবংশের সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত বিকার নারী-সত্তায় এক সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ায়, এক উদাসীন জীবন-নির্লিপ্ততায়, এক সর্বস্বপণ জুয়াড়ী মনোবৃত্তিতে এক দুর্নিরীক্ষ্য চারিত্রিক অবক্ষয়ে রূপায়িত হইয়াছে। ছোটবউঠাকুরাণীর জীবন-ইতিহাস বংশানুক্রমিক অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার এক অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতি। যে সুস্থ, সুনিশ্চিত দাম্পত্য জীবন নারীর রমণীয়তার সহজ বিকাশের মূলে, তাহার সুচিরস্থায়ী নিরোধ যে একটা নিদারুণ বিপর্যয় ঘটাইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত। ছোটবউ স্বামীকে বশ করিবার জন্য হিন্দু নারীর চিরপোষিত সংস্কারকে বিসর্জন দিয়া মদ ধরিয়াছে—হতভাগিনী মনে করিয়াছে যে, রূপের নেশার ক্ষীয়মাণ আকর্ষণ মদের নেশার দ্বারা পুষ্ট হইয়া পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিবে। এই গণিকাবৃত্তির অনুকরণ যে ভদ্রমহিলার পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল ইহা সে বুঝিয়াও বুঝে নাই। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভালবাসা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু মদের নেশা তাহার জীবন-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সমস্ত আচরণে এক করুণ উদ্‌ভ্রান্তি, এক বিষণ্ণ ভাগ্যবশ্যতা, স্প্রিং-ভাঙ্গা ঘড়ির মত এক অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ, হঠাৎ উত্তেজনা ও নিদারুণ অবসাদের মধ্যে এক ইচ্ছাশক্তিহীন আবর্তন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূতনাথের সহিত তাহার সম্বন্ধ এক অদ্ভুত অনির্দেশ্যতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে; ইহার মধ্যে অসহায়ের আশ্রয়-নির্ভরতা সহানুভূতি-কাঙ্গাল মনের কৃতজ্ঞতা, বঞ্চিত চিত্তের আত্মবিস্মৃতি, চাকরের প্রতি মুনিবের হুকুম-চালানো জোরের সঙ্গে এক ফাঁটা প্রেমের মাধুর্য-নির্যাস মিশিয়া এক বহু-বিমিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরাহ্নের নানা বর্ণের মেঘ-যবনিকার অন্তরালে অস্তোন্মুখ সূর্যের শীর্ণ-ক্লিষ্ট আভাসের মতই এই সম্বন্ধটি প্রেমদীপ্তির একটু করুণ, আসন্ন নির্বাণের ছায়াচ্ছন্ন, স্তিমিত প্রকাশরূপে প্রতীয়মান হয়। শুক্তির অভ্যন্তরে ব্যাধিক্ষতের নিদর্শনরূপ মুক্তার ন্যায়, ছোটবউ এই ক্ষয়জীর্ণ, মনোবিকারগ্রস্ত অভিজাতবংশের মর্মলালিত, রুদ্ধ শোণিত-সঞ্চয়ের প্রতিরূপ একটি অপরূপ-রক্তিম, অথচ বেদনা-পাণ্ডুর লাবণ্যবিন্দু।

কলিকাতার বুনিয়াদী-বংশের এই বিরাট প্রাসাদ, শোষণক্রিয়ার ও ঐশ্বর্য-মদিরার এই উদ্ধত বুদ্‌বুদ্ অনেক অতীত স্মৃতির সমাধি-আশ্রয়রূপে আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার যুগে যুগে কত কীর্তি-অখ্যাতির কাহিনী, কত বিলাস-বিভ্রম-উৎসব-সমারোহের স্মৃতি, ইহার মহলে মহলে কত দীর্ঘশ্বাস ও অপ্রকাশিত হৃদয়বেদনার চাপা রোদন, ইহার অন্ধকার কক্ষে-কক্ষে কত ভৌতিক রোমান্সের শিহরণ, ইহার প্রাণলীলার বিচিত্র কলধ্বনি ও মৃত্যুর বজ্র-দীর্ণ আকস্মিকতা, সমস্তই এই উপন্যাসের আকাশ-বাতাসের অলক্ষ্য সত্তায় সঞ্চরণশীল। ইহার অগণিত কর্মচারী, মোসাহেব, আশ্রিত-অনুগৃহীত, খানসামা-দারোয়ান-কোচোয়ান

আপন আপন কক্ষপথে অপরিবর্তনীয় জড়পদার্থের ন্যায় পুরুষানুক্রমে ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে ইহাদের যৌথ জীবনের মৃদু কলরব প্রাসাদের খোপে খোপে অলিন্দে অলিন্দে নির্বিঘ্নে আশ্রিত পারাবত-গুঞ্জনের সহিত মিশিয়া এক স্বপ্নাবেশময়, ঝিমাইয়া-পড়া, পৃথিবীর অন্তর্লীন ছন্দসঙ্গীতের ন্যায় ঐকতান-ঝংকার তুলিতেছে। এই স্মৃতিময়, যুগচিহ্নাঙ্কিত সত্তায় বিরাজিত অট্টালিকাই উপন্যাসের সত্যিকার নায়ক -নগর-উন্নয়নের রথচক্রে ইহা যখন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তখন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু অপেক্ষা ইহার বিলুপ্তি আরও মর্মান্তিকভাবে করুণ। একটা সমগ্র জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের তিরোভাব আমাদের মনে এক অব্যক্ত শূন্যতাবোধ ও বেদনার উদ্রেক করে।

'মহাস্থবির জাতক'—ঠিক উপন্যাসধর্মী নহে—লেখকের আত্মজীবনীর মধ্য দিয়া পূর্ব-স্মৃতিপর্যালোচনা। ইহার প্রথম আবির্ভাবের সময় ইহা যে প্রত্যাশার চমক জাগাইয়াছিল, পরবর্তী খণ্ডসমূহে ঠিক সেই প্রত্যাশা রক্ষিত হয় নাই। লেখকের জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য কৌতূহলের উদ্রেক করে, তাঁহার সরস বর্ণনাভঙ্গী ও মৃদু রসিকতা বিশেষভাবে উপভোগ্য, তবে জীবনদর্শনের কোন অখণ্ড গভীরতা তাঁহার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে উৎসারিত হয় কিনা সন্দেহ। প্রথমখণ্ডে বোধ হয় লেখকের শৈশব স্মৃতির স্পর্শ, শিশু-চিত্তের নিগূঢ় ভাব-কল্পনা উপন্যাসটির বিশেষ আকর্ষণীয়তার মূলে ছিল। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে লেখক যখন স্বপ্নাবিষ্ট শৈশব-জীবন ছাড়াইয়া কৈশোর ও যৌবনের, কোন গভীর মনস্তাত্ত্বিক মূলের সহিত অসম্পৃক্ত, খেয়ালী ঘূর্ণিবায়ুতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ঘরছাড়া জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন, তখন প্রথমখণ্ডের সুরবৈশিষ্ট্যটি কাটিয়া গিয়াছে। উপন্যাসটি নিছক পথিক-জীবনের পথচলার কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে ও লেখকের বিশিষ্ট সত্তাটি যেন দৃশ্য ও অনুভূতির দ্রুত পরিবর্তনের বিস্ময়-চমকের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার পথের ধারে যে-সমস্ত স্বল্প-পরিচিত নর-নারী ক্ষণেকের জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে-সমস্ত আকস্মিক ঘটনা ভাগ্যের মোড় ফিরাইয়াছে ও মনকে কৌতূহলরসে আপ্লুত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে লেখককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্রস্থলে অটুট আত্মমর্যাদায় আসীন, সকলের মধ্যে আত্মপরিণতির উপাদান-সংগ্রহে তৎপর একটি ব্যক্তিসত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে না। এখানে যেন পথ বড় হইয়া পথিক-চিত্তকে আড়াল করিয়াছে। 'মহাস্থবির জাতক'-এর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের মধ্যে ইহার কাহিনীর ও লেখক-মনের আর কি নূতন রূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহা অবশ্য পূর্বানুমানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না; তবে ইহাতেই যে যুগপরিচয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সাহিত্যিক উপভোগ্যতা অনস্বীকার্য।

প্রভাত দে সরকারের 'ওরা কাজ করে' (শ্রাবণ, ১৩৭১)—কল-কারখানার নিকটবর্তী অথচ কৃষিনির্ভর পল্লী-শ্রমিকের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার কাহিনী। চাষের কাজ শেষ হইলে এই মজুরশ্রেণী নিদারুণ বেকার-অবস্থার মধ্যে অস্বস্তিকণ্টকিত জীবন যাপন করে। নানাস্থানে কাজ খুঁজিয়া, নানা খুচরা কাজে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিয়া, অনাহার অর্ধাশনে দিন কাটাইয়া, পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক লাঞ্ছনার মধ্যে দুর্ভর জীবন বহন করিয়া,

বে-পরোয়া মেজাজে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়া ও শাসনের দণ্ডভোগ করিয়া তাহারা কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে। এই মানবের ন্যূনতম মর্যাদা ও স্বস্তিবোধহীন জীবনের কথাই এই উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে চন্দনের ন্যায় কোন কোন প্রাণশক্তি-সম্পন্ন, নেতৃস্থানীয় শ্রমজীবী মুক্ততর জীবনের আস্বাদন-বৈচিত্র্য খোঁজে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত সমাজবিন্যাসের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধি বৃত্ত রচনা করিয়াছে। সরকারী পরিকল্পনা-অনুযায়ী গ্রামোন্নয়নের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা দুর্নীতির প্রভাবে ও দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই পল্লীচিত্রের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই, সমস্তই অতি-পরিচিতের পুনরাবৃত্তি। তথাপি ঘটনার দিক দিয়া গতানুগতিক হইলেও, এই উপন্যাসে নিম্নশ্রেণীর যে জীবনাসক্তি ও গোষ্ঠী-সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতেই ইহার সাহিত্যিক মূল্য ও উপভোগ্যতা। এই সব জীবনচক্রনিষ্পিষ্ট মানবতার চূর্ণ অংশগুলি এক অদম্য প্রাণরসপিপাসার অদৃশ্য সূত্রে বিধৃত হইয়া, উচ্চ ও বিত্তশালী শ্রেণীর সহিত নানাবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্পর্ক-বৈচিত্র্যে আবদ্ধ থাকিয়া ও পরিবারমণ্ডলে কলহ-বিরোধের মৃদু বা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, পাঠকের মনে কৌতূহলরসের উদ্রেক করে। তাহাদের সমষ্টিগত জীবনসংগ্রামের তীব্রতা ও অবিরত সঞ্চালন তাহাদের ব্যক্তিজীবনের দারিদ্র্য ও নিশ্চলতার ফাঁক পূর্ণ করে।

চন্দন এই শ্রমিক সমাজের দলপতি—তাহার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাবেগই তাহাকে তাহার শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়াছে। তাহার অভিজ্ঞতাও সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অনেক দূরপ্রসারী। প্রথমতঃ, তাহার যৌন আকর্ষণ মুসলমান রমণী পর্যন্ত প্রসারিত। অন্য-পূর্বা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে গিয়া তাহার যে লজ্জাকর ব্যর্থতা ঘটিয়াছে তাহারই প্রতিক্রিয়া তাহাকে আতর বিবির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার নিজের স্ত্রী দারিদ্র্যজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে—বিবাহিত জীবনের এই বিপর্যয় তাহাকে পুনর্বিবাহের প্রতি অনেকটা উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। কাজের সন্ধানে নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে সে এক সময় মৎস্যজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সেখানে সে ভুবন, মদনের মা ও রতিকান্ত এই তিনজনের সম্পর্কে আসিয়া খানিকটা হৃদয়বৃত্তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। মদনের মাএর প্রতি তাহার ঠিক ভালবাসা নয়, রতিকান্তের সহিত তুলনায় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্পৃহা, একটা মর্যাদার প্রশ্ন জাগিয়াছে। কিন্তু মাছ ধরিবার জন্য জলে নামিয়া রতিকান্তের সহিত তাহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও শ্বাসরোধ করিয়া রতিকান্তের মৃত্যু-ঘটান তাহার জীবনে একটা অতর্কিত পারণতি। এই ঘটনাকে তাহার স্বাভাবিক জীবনছন্দের সহিত গ্রথিত করিয়া লওয়া দুরূহ। মনে হয় যেন ইহাতে তাহার চরিত্রকল্পনার সঙ্গতি-বোধ খানিকটা বিপর্যস্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার বাল্যসঙ্গিনী ও প্রতিবেশী-কন্যা, ভ্রষ্ট জীবনযাত্রা হইতে প্রত্যাবৃত্তা সুদামা সেবা ও নিপুণ গৃহব্যবস্থাপনার দ্বারা তাহার বিমুখ চিত্তকে জয় করিয়াছে ও তাহাকে লইয়া সে নূতন সংসার পাতিয়াছে। শ্রমিকজীবনের বিভিন্ন সূত্রগুলি এই উপন্যাসে নিপুণভাবে সংহত হইয়াছে। বস্তুনির্ভর জীবনের পিছনে যে ভাবকেন্দ্রিকতা না থাকিলে উহা বিচ্ছিন্ন তথ্যসমাবেশে সামগ্রিকতাৎপর্যবঞ্চিত হয়, এখানে তাহারই সক্রিয় প্রভাব অনুভূত হয়। দিনমজুরের নানা সমস্যা, নানা উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা ও চেষ্টা

এখানে যেন জীবনমমতাবৃন্তে একীভূত হইয়া রসসংহতি লাভ করিয়াছে। ইহাই এ উপন্যাসের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

সুমথনাথ ঘোষের বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পসমষ্টির মধ্যে 'বাঁকা স্রোত', 'সর্বংসহা' ও 'রোশনাই' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০) আলোচনা করা যাইতে পারে। 'বাঁকা স্রোত'-এ আলোকের বাল্যজীবনের, বিশেষতঃ তাহার স্কুল সহপাঠীদের সহিত সম্পর্কের কাহিনী, তাহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের অভিমানপ্রবণতা ও খেয়ালী মেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন-পরম্পরাগুলি খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দায়িত্বশীল পরবর্তী জীবনেও সেই একই খেয়ালের ও হঠকারিতার প্রাদুর্ভাব যেন তাহার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। বিশেষতঃ বাহিরের যে ঘটনাস্রোতে তাহার জীবন বারংবার অপ্রতিরোধ্যভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়া গিয়াছে তাহা এতই বিস্ময়কর, সাধারণ অভিজ্ঞতার এতই বিপরীতগামী যে ইহার প্রভাবে লেখকের সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রায় অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। রূপকথার খোলসে আধুনিক জীবনের শাঁস পুরিলে যেমন বিসদৃশ পরিণতি ঘটে, উপন্যাসে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। রূপকথারাজ্যের ন্যায় তাহার চিরপোষিত স্নেহতৃষ্ণা নিঃসম্পর্কীয়, দৈবলব্ধ মা ও মাসিমার সুপ্রচুর মায়ামমতার দাক্ষিণ্যে আশাতীত তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। অথচ মাসিমার স্নেহাতিশয্যের মধ্যে একটু নিগূঢ়তর অনুরাগের বীজ হয়ত প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার জন্য আলোক তাহার জামাতৃপদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কৈশোর প্রণয়িনী শান্তির প্রদত্ত অর্থোপহার সম্বল করিয়া সে তাহারই সন্ধানে নিরুদ্দেশযাত্রায় বাহির হইয়াছে। বাস্তবধর্মী জীবনের সহিত রোমান্সধর্মী বহির্ঘটনার সংযোগ এক অদ্ভুত পরিণতির দিকে যাত্রাশেষ ঘটাইয়াছে।

'সর্বংসহা' উপন্যাস অপেক্ষা সমাজচরিত্রের সহিত অধিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট। ইহাতে কোন নির্দিষ্ট প্লট বা চরিত্র-প্রাধান্য নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশে যে নীতিবিপর্যয় ও জনকল্যাণবিরোধী স্বার্থসর্বস্বতার গ্লানি প্রকট হইয়াছিল, লেখক তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন দৃষ্টি লইয়া ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগের সহিত তাহাদের খণ্ড চিত্রসমূহ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য এই চিত্রগুলি একই উদ্দেশ্যের সূত্রে গ্রথিত হইয়া জীবনের একটি বিকৃত রূপকে নানা দিক দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য ইহারা পরোক্ষভাবে পরস্পরসম্পৃক্ত। রাজ্যেশ্বর ও সর্বেশ্বর এই দুই বিপরীত-আদর্শানুসারী ভাই-ই উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র। অন্যান্য চরিত্র যথা পণ্ডিত, বিমল, কানাই প্রভৃতি উপন্যাসের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ছিন্ন মেঘের মত নানা ভাগ্যপরিবর্তনের ঝাপ্টায় পাক খাইতে খাইতে কখন বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি ছাড়া আর কোন স্থায়ী নিদর্শন তাহারা কাহিনীপর্বে অঙ্কিত করিয়া যায় নাই। রাজ্যেশ্বরের জীবনদর্শনের আমূল পরিবর্তনে ও তাঁহার পল্লীজীবন ও একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শস্বীকৃতিতে উপন্যাসের চরিত্রসম্বন্ধীয় দায়িত্ব ক্ষীণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। মনে হয় লেখক তাঁহার পল্লীপ্রীতি ও সনাতন আদর্শনিষ্ঠার ভাববিহ্বলতায় বাস্তবতাবোধের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। সমগ্র দেশব্যাপী নরকের মধ্যে একখানি গ্রামে স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতার কথা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের মধ্যে একটি পল্লীতে

প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার অস্তিত্ব আধুনিক পরস্পরনির্ভরশীল অর্থনীতিব্যবস্থায় অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ পল্লীচিত্রটি মনোহর হইলেও বাস্তবতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না।

'রোশনাই' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০) ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা নূতন দিক অবলম্বনে রচিত। সঙ্গীতবিদ্বেষী সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব তাঁহার সাম্রাজ্যে গীতবাদ্যনিষেধাত্মক যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে শিল্পীজীবনে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। ইহার মধ্যে সঙ্গীতের মোহময় ইন্দ্রজাল, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াও সঙ্গীতসাধকদের স্বরসাধনার প্রতি অক্ষুণ্ণ নিষ্ঠা ও সঙ্গীতের আকর্ষণসূত্র ধরিয়া রোমান্টিক প্রেমের সঞ্চার প্রভৃতি রোমান্সসুলভ উপাদান সূক্ষ্ম সঙ্গতিবোধের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং কূটনীতিবিশারদ ও ভাবাবেগ-হীন প্রৌঢ় সম্রাটের প্রথম যৌবনের প্রণয়মত্ততার কাহিনী ও তরুণ বয়সে তাঁহার উপর সঙ্গীতের মাদকতাময়, চেতনাবিপর্যয়কারী প্রভাবের কথা বহু-আলোচিত সম্রাট্-জীবনের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করে। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আদেশভঙ্গকারী তরুণ গায়কের সুরে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মার্জনা করিয়াছেন ও তাহার প্রণয়কামনাও চরিতার্থ করিয়াছেন। এক ব্যর্থ প্রণয়িনীর শোকাবহ আত্মবিসর্জনের করুণ মূর্ছনার মধ্যে এই মিলন-রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ এই ছোট উপন্যাসটি ইতিহাসের সহিত সাধারণ জীবনের একটি সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছে ও ইহার অন্তরলোকে প্রেম ও সঙ্গীতের সুকুমার সুরটি মধুর অনুরণন তুলিয়াছে।

'পরপূর্বা' সুমথনাথের একটি শক্তিশালী ও আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতময় উপন্যাস। সুমিতা পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় গুণ্ডা কর্তৃক পিত্রালয় হইতে অপহৃত হইয়া অবস্থাচক্রে পশ্চিম পাকিস্তানী ধনী ব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিনের সহধর্মিণী হইতে বাধ্য হয়। স্বামী ও হিন্দু সমাজ তাহাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা না করিয়াই তাহাকে জাতিচ্যুতা রূপে পরিত্যাগ করিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ করে। তাহার পুত্র সুকুমারই তাহার পূর্বজীবনের একমাত্র স্নেহবন্ধনরূপে তাহাকে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট করে। গিয়াসুদ্দিনের সহিত বিবাহের ৭।৮ বৎসর পরে ও তাহার ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যার জননী হইবার পর সে সুকুমারকে দেখিবার জন্যই তাহার পূর্বস্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয় ও তাহার দ্বারা নির্মমভাবে ভৎ'সিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই নিবিড় আকর্ষণ স্বাভাবিক প্রকাশ হইতে প্রতিহত হইয়া সর্বগ্রাসী আবেগের শক্তি অর্জন করিয়াছে ও উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ সংঘাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কের তীব্রতার কাছে সুমিতার দাম্পত্য প্রেম ও দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানবাৎসল্য গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। পিতা ও বিমাতা কর্তৃক সুকুমারের পীড়ন ও বর্তমান স্বামীর নিকট হইতে সুকুমারের প্রতি আকর্ষণ প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা সুমিতার চিত্তকে যুগপৎ আবেগ-মথিত ও গোপনচারী করিয়া তুলিয়াছে। সুকুমারের মাতৃদর্শন-লোলুপতা অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসের অজিতের পিতৃস্নেহবুভুক্ষার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। গিয়াসুদ্দিন পত্নীর হৃদয় যে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে তাহা অনুভব করে, কিন্তু এই ভাবান্তরের গভীরে অনুপ্রবেশের মত তাহার সূক্ষ্ম বোধশক্তি নাই। আশ্চর্যের বিষয় সুমিতার ছেলে নবাব ও মেয়ে আনারাও তাহাদের প্রতি মাতার ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অসাড়ই রহিয়া গিয়াছে ও ইহা লইয়া তাহাদের কোন অনুযোগ নাই। চন্দ্রের যেমন

একদিক আলোকিত ও বিপরীত দিকটি সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সুমিতারও তেমনি মাতা-ও-পত্নী হৃদয়ের একদিক তীব্রদ্যুতিতে বিদীর্ণ ও অপরদিক ঔদাসীন্যধূসর এবং এই দুই দিক সম্পূর্ণ-রূপে পরস্পরবিচ্ছিন্ন।

সুমিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব, গিয়াসুদ্দিনের সংশয়-বিমূঢ়তা, সুকুমারের অশান্ত উচ্ছ্বাস ও আনারার সহিত অভিমানাচ্ছন্ন প্রণয়সম্পর্কের উন্মেষ যথেষ্ট শক্তিমত্তা ও নাটকীয় তীব্রতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখক ঊনবিংশ শতকীয় মামুলী রোমান্স-পরিণতির মধ্যে সমস্ত নাটকীয়তা ও বাস্তব মানসচিত্রাঙ্কনের অবসান ঘটাইয়াছেন। সুমিতা তাহার পূর্বস্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার প্রতি দীর্ঘদিনসুপ্ত কর্তব্যনিষ্ঠার পুনর্জাগরণ অনুভব করিয়াছে ও হরিদ্বারে সন্ন্যাসিনীর কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া তাহার পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এমন কি সুকুমারের স্নেহব্যাকুল অনুরোধও তাহার কঠোর সঙ্কল্পে কোন শিথিলতা আনিতে পারে নাই। লেখক হয়ত ভুলিয়াছেন যে, বঙ্কিমযুগের সুলভ সমাধান অতি-আধুনিক জীবন-যাত্রার সহিত বে-মানান, ও উপন্যাসে এরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের কোন পূর্বপ্রস্তুতি নাই। আধুনিক রোমান্স অধুনাতন বাস্তব জীবনেরই দিব্য ও দীপ্ত রূপান্তর না হইলে অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য। আধুনিক উপন্যাস দুই বিপরীত সীমার মধ্যে অস্থিরভাবে আন্দোলিত। হয় উহার পরিসমাপ্তিতে কেন্দ্রসংহতিহীন ছিন্নসূত্রের বিশৃঙ্খল শিথিলতা, সমাধানহীন সমস্যার উদ্যত প্রশ্নচিহ্ন, না হয় অবাস্তব স্বপ্নসুষমার কোমল আবরণে জ্বলন্ত অঙ্গারের দাহ-নির্বাপণ-প্রয়াস। বর্তমান যুগের অনিয়মিত জীবনবৃত্তের নূতন কেন্দ্রবিন্দুর অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠাই আধুনিক উপন্যাসের দুরূহতম সাধনা।

(১১)

মধ্য বিংশ শতকের বিচিত্র-জটিল পরিস্থিতি ও অন্তর্বিরোধদীর্ণ মর্মবস্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে নানা সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। জীবনবোধের বিপর্যয়, আদর্শের কেন্দ্রচ্যুতি, নানা বিরোধী উপাদানের অসংহত সংঘাত, আচরণের উৎকেন্দ্রিকতা--এই সমস্তই বিভিন্ন উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যবাদ, সমগ্র পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন নিম্নাভিমুখিতার তীব্র আকর্ষণশক্তি কোনও একখানি উপন্যাসে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয় নাই। বিমল মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এই সাধারণ প্রবণতার একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। জীবনের প্রত্যেক স্তরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে ভাঙ্গন ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল, বিমল মিত্রের মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসে তাহার বিরাট, অসংখ্য-জীবন-প্রসারিত কেন্দ্রপ্রেরণা প্রলয়ঙ্কর মহিমায়, মনুষ্যত্বের মূলোচ্ছেদী বিদারণতীব্রতায় উদ্ঘাটিত। উহার বিপুল, বিচিত্রসংঘাতময় কণ্ঠে টাকার সর্বশক্তিমত্তা, অমোঘ প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের *কবিতায় 'যেতে নাহি দিব' এই সর্বব্যাপ্ত মূল সুরের ন্যায়, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এর পুনঃপুনঃ* উদ্গীত ধুয়া ধ্বনিত হইয়াছে। বাঁশীর সর্বরন্ধ্ররণিত সুরের ন্যায় উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা হইতে এই লৌহকঠোর, বেসুরো ঝন্ঝনা আমাদের ভাবতন্ত্রীতে নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের ঘটনাবস্তুর বিন্যাস। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই সমাজনীতিতে যে ফাটল ধরিয়াছিল, অঘোরদাদুর নীতিসংযমহীন ভোগবাদ ও

অর্থগৃধ্নুতায় তাহারই প্রকাশ। অঘোরদাদু যুদ্ধপূর্ব জগতে ও প্রাচীন আদর্শের কপট আবরণে অন্তরক্ত গোপন-প্রয়াসী সমাজে একটি প্রতীকী চরিত্র। তাঁহার আত্মকেন্দ্রিকতা, অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস তাঁহার রূঢ় নিঃস্নেহ আচরণে ও সদা-উচ্চারিত মুখপোড়া গালিতে সমগ্র বাতাবরণকে বিষাক্ত করিয়াছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ছিটে-ফোঁটায় খদ্দরাবৃত চোরাকারবারী ও মুনাফাবাজিতে ও লক্কা-লোটনের মত পণ্যনারীর ছদ্মগৃহিণীত্বগৌরবে।

প্রাক্-যুদ্ধ যুগে কিন্তু নীতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয় নাই। দীপুর মা ও কিরণের মা অসহনীয় দারিদ্র্যদুঃখের মধ্যেও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। কিরণের মার দুঃখবরণে কেবল নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা ছিল ; কিন্তু দীপুর মা বৃহৎ সংসারের দায়িত্বপালন, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতা, ছেলেকে মানুষ করার উপযোগী চরিত্রদৃঢ়তা ও বিন্তীর মত অসহায় মেয়েকে সমস্ত সংসারের তাপ ও অপমান হইতে স্নেহপক্ষপুটে আচ্ছাদনের আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি ব্যক্তিত্বসূচক গুণের অধিকারিণী ছিল। ইহারা ধর্মনীতিকেন্দ্রিক অতীত জীবনাদর্শের শেষ প্রতিনিধি। দীপুর মা উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি ও চরিত্রগৌরবের পরিচয় দিয়াছে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার মধ্যে তাদৃশ চারিত্র্যশক্তি দেখাইতে পারে নাই। চাকুরে ছেলের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে তাহার তীক্ষ্ণাগ্র ব্যক্তিত্ব যেন অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়াছে। দীপুর চাল-চলনের নিয়ন্ত্রণব্যাপারে ও ক্ষীরোদার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সে যেন অনেকটা বিহ্বলতা ও অস্থিরমতিত্ব দেখাইয়াছে। বরং কিরণের মা দীপুর সংসারে আশ্রয় লইবার পর ক্ষীরোদার সহিত দীপুর অনিশ্চিত, অস্বীকৃত সম্পর্কের অবসান ঘটাইতে তীক্ষ্ণতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সন্তোষ কাকার চরিত্রটি পল্লীসমাজের কৌতুককর অসঙ্গতি ও বিনা সম্পর্কে অধিকারপ্রতিষ্ঠার আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার দিক্‌টা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

এই সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়া সাবেকী জীবনযাত্রার ভাল ও মন্দ দুই দিকই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে ইহার মন্দের মধ্যেও এক প্রকার হাস্যকর সরলতা আছে, উহা আমাদের উগ্র প্রতিবাদ বা দারুণ জুগুপ্সার উদ্রেক করে না।

কলিকাতার অভিজাত-সমাজের স্বার্থান্ধতা ও বড়মানুষির সীমাহীন ঔদ্ধত্য রূপ পাইয়াছে শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসীর মধ্যে। এইরূপ একটা বিকৃত চরিত্রপরিণতি কলিকাতার বনিয়াদি বংশের মধ্যে কোথাও কোথাও কোন অজ্ঞাত কারণে, হয়ত বংশাভিমানের বিষক্রিয়ার জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এই সমাজে মানুষের চারিদিকে একটা দুর্ভেদ্য আত্ম-গরিমার দুর্গ গড়িয়া উঠিয়া তাহাকে জড় পাষাণে পরিণত করে। নয়নরঞ্জিনীর ভয়াবহ অস্বাভাবিকতা, তাহার ছেলে-বৌএর সম্বন্ধেও একান্ত নির্বিকারত্বে, তাহার মায়া-মমতার নাড়ীগুলির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্বে। তাহার যে বিকৃতি তাহা যুগনিরপেক্ষ, যুদ্ধোত্তর কালের নীতিবিপর্যয়ের সহিত নিঃসম্পর্ক। অঘোর দাদুর মানববিদ্বেষ হয়ত তাঁহার কঠোর জীবনাভিজ্ঞতার অনিবার্য ফল ; তিনি সংসারের নিকট যে অবজ্ঞা ও অনাদর পাইয়াছিলেন, তাহাই বহুগুণিত করিয়া সংসারকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু নয়নরঞ্জিনী ঐশ্বর্যের অপরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিয়াও এই আত্মসর্বস্ব নির্মমতা অর্জন করিয়াছে। জীবনের দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুইটি চরিত্র অতীত ও আধুনিক যুগের জীবনযাত্রাবিধির মধ্যে কতকটা ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। তবে উহাদের মধ্যে নয়নরঞ্জিনীকেই অসাধারণ, ও খানিকটা

অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। তাহার চরিত্রাঙ্কনে লেখকের কিছুটা সচেতন অতিরঞ্জন-প্রবণতা ও হয়ত কিছুটা ব্যঙ্গাভিপ্রায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধকালীন যে মূল্যবিভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহা একদিকে যেমন আকস্মিক ও অভাবনীয়, অন্যদিকে তেমনি সার্বভৌম। প্রাচীন নীতিশাসিত সমাজে মোটামুটি একটা আদর্শপ্রভাব কম-বেশী পরিমাণে কার্যকরী ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট উৎকটরূপে দেখা দিল তাহা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই একটা উন্মত্ত তাণ্ডবের ঘূর্ণিবায়ুরূপে চিরপোষিত নীতিসংস্কার ও ঔচিত্যবোধকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ছাড়িল। এই উদ্‌ভ্রান্তি সর্বাপেক্ষা উদ্ধত, বে-পরোয়া প্রকাশ পাইয়াছে লক্ষ্মীর আচরণে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার চরিত্রের যে তেজস্বী আত্মনির্ভরশীলতা তাহাকে সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়ীর সঙ্গে শান্ত গৃহনীড়রচনায় উদ্বুদ্ধ করিত, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাহাই একটা ভদ্রতার মুখোস-পরা, সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী একদল মানুষের সহযোগিতাপুষ্ট স্বৈরিণীবৃত্তির বীভৎস রূপ লইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ অভয়া-রোহিণীর সংযমপূত, একনিষ্ঠ মিলন যুগধর্মে এক কদর্য ব্যসন ও ব্যভিচার-বিলাসে বিকৃত হইয়াছে। ইহার মূলগত কারণ ধর্মসংস্কারবিলোপ ও দুর্নিবার ঐশ্বর্যমোহ। অভয়ার চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটি দরিদ্র সংসারপ্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মীর লক্ষ্য সামাজিক সম্ভ্রম ও অপরিমিত ধনসম্পদলালসা। অথচ মনের গভীরতম স্তরে লক্ষ্মীও স্বামিপুত্র লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেই চাহিয়াছিল। কিন্তু এই ন্যূনতম সাধটুকু মিটাইতেই যে বিপুল বস্তুসঞ্চয় ও ভোগোপকরণ নূতন যুগের মানদণ্ডে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল তাহাই আহরণের জন্য তাহাকে আত্মাবমাননার অন্ধতম গহ্বরে অবতরণ করিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অবদমিত ধর্মবোধ তাহার উপর প্রচণ্ডতম প্রতিশোধ লইয়াছে, অবহেলিত নীতিবিধান অমোঘ বজ্রপাতের ন্যায় তাহার মস্তকে অগ্নিবর্ষণ করিয়াছে। লক্ষ্মীচরিত্রের মধ্যে কোথায়ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই, তবে তাহার সমস্ত স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের মধ্যে একটি অকুণ্ঠিত সরলতা আছে। মাঝে মধ্যে দীপুর কাছে, স্বামিসেবায় ও পুত্রস্নেহে তাহার স্বরূপ-পরিচয়টি নিষ্কলুষ সত্যস্বীকৃতিতে, নিরুপায় অসহায়তায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রটি এত সজীব, বক্রপঙ্কিল পথে তাহার পদক্ষেপ এতই সহজছন্দময়, তাহার পাপাচরণের ও ভোগাসক্তির মধ্যেও এমন একটি স্বভাব-সুষমার পরিচয় মিলে যে, সে কখনই আমাদের সহানুভূতি হারায় নাই। আমরা নীতিবাগীশের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়া তাহার বিচার করি না, সে নাটক-উপন্যাসের প্রথাচিত্রিত পিশাচী-শয়তানীরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না।

উপন্যাসের নায়িকা সতী আরও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত, আরও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার ও লক্ষ্মীর মধ্যে চরিত্রের মূল কাঠামো সম্বন্ধে একটি পরিবারগত মিল আছে; আবার আদর্শ ও জীবনসমস্যার প্রকৃতি বিষয়ে গুরুতর প্রভেদও লক্ষণীয়। সতী গোড়া হইতেই লক্ষ্মীর পিতার অবাধ্যতার ও স্বাধীন প্রণয়চর্চার বিরোধী ছিল; পিতৃ-নির্বাচিত বরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী শান্ত পারিবারিক জীবনযাপনই তাহার একান্ত কাম্য ছিল। দীপুর প্রতি একটি অস্বীকৃত অনুরাগের বীজ হয়ত তাহার অবচেতন মনে সুপ্ত ছিল, কিন্তু অনুকূল পরিবেশে এ বীজ কোনদিনই অঙ্কুরিত হইত না।

কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে তাহার এই একান্তবাস্তব কিশোরী-কামনা মুকুলিত হইতে পারিল না। তাহার অদৃষ্ট-দেবতা এমন একটি পরিবারে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন যেখানে তাহার আশ্রয়োৎসুক প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তের রূঢ় আঘাতে, পুঞ্জীকৃত অমর্যাদা ও অবহেলার চাপে, স্নেহপ্রীতির অবলম্বনচ্যুত হইয়া সমাজবিধিসুরক্ষিত কক্ষপথ হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। সতীর অবস্থা অনেকটা হার্ডির Tess-এর মত—সে প্রতিকূল দৈবের হাতে অসহায় ক্রীড়নক হইয়াছে। সনাতনবাবুকে লেখক দার্শনিক প্রজ্ঞা ও ঋষিসুলভ সমদর্শিতার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার আচরণ কোথায়ও সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয় নাই। সে একটি অশরীরী ভাবমূর্তি মাত্র, রক্ত-মাংসের মানুষ হইয়া উঠে নাই। তাহার মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত উদার উক্তিসমূহ তাহার অন্তরসত্যের কোন্ উৎস হইতে উদ্ভূত তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় না। সে যেন কর্মজগৎ হইতে নির্বাসিত একজন গ্রন্থকীটের পরনির্ভর অসহায়তা, কর্তব্যসঙ্কটে স্থিরসংকল্পগ্রহণে অক্ষমতারই প্রতিমূর্তি রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সুতরাং দীপঙ্করের প্রশস্তি সত্ত্বেও সতীর বিমুখতা ও অবজ্ঞাকেই আমরা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে করি।

কিন্তু মানসিক গঠন ও আদর্শে পার্থক্য থাকিলেও সতীকেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর পথ অনুসরণ করিতে হইল। মা-মণির দুর্ব্যবহারে ও সনাতনবাবুর নির্লিপ্ততায় সে শ্বশুর বাড়ীতে অতিষ্ঠ হইয়া হঠাৎ দীপুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। দীপুর অতি-সতর্ক শুচিতাবোধ ও উহার ও লক্ষ্মীর হিতৈষণা সতীকে আবার শ্বশুরালয়ে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু এবারের নিদারুণ অপমান সতীকে একেবারে বে-পরোয়া করিয়া তুলিয়া তাহাকে প্রায় প্রকাশ্য রক্ষিতারূপে ঘোষালের আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য করিল। দীপুর প্রতি দারুণ অভিমান ও শ্বশুরবাড়ীর উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহা তাহাকে স্পর্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত কলঙ্কিত জীবনযাপনের প্রেরণা দিল। ঘোষালের সহিত তাহার সম্পর্কের মধ্যে বিদ্রোহের উষ্মাই প্রধান উপাদান ছিল, কিন্তু মনে হয় যে, এই আগ্নেয়গিরির পিছনে খানিকটা স্বেচ্ছাসম্মতি, এমন কি কিছুটা কৃতজ্ঞতাজাত অনুকূল মনোভাবেরও অভাব ছিল না। সে একবার নিজের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াও ঘোষালকে বাঁচাইবার জন্য আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার একটা আকস্মিক মানস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ঘোষালের ঘুষ লওয়ার প্রমাণ দাখিল করিয়া তাহাকে ফাঁসাইয়াছে। সতীর আবেগপ্রবণ, হঠকারী প্রকৃতি ও তাহার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে তাহার মনের গভীরে প্রবাহিত বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণিসংঘাত তাহার এই খামখেয়ালী আচরণকে খুবই স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত করিয়াছে। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার এই প্রয়াস তাহাকে একদিকে ঘোষালের আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল; অপর দিকে ঘোষালের স্থূল, ইতর প্রকৃতি ও যৌন স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা তাহাকে বিদ্রোহের বিস্ফোরণোন্মুখ করিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের সদা-সচলতায় তাহার আচরণে এইরূপ অতর্কিত বৈষম্য ঘটিয়াছে। শেষ দৃশ্যে ঘোষালই তাহার জীবন-রন্ধ্রে শনিরূপে প্রবেশ করিয়া তাহার উদ্‌ভ্রান্ত অপঘাত-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

ঘোষালের গ্রেপ্তারের পর সতী অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে ও

সেখান হইতে দীপঙ্করের বার বার অনুরোধে লক্ষ্মীর গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর নিকটবর্তী বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে নির্জন বাসের সময় দীপু ও তাহার মধ্যে নীরব, নিষ্ক্রিয় সাহচর্যের একটা অদৃশ্য আকর্ষণ, একটা নিরুত্তাপ, কিন্তু অমোঘ আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়াছে। ইতিমধ্যে সনাতনবাবু, এমন কি মা-মণি সতীকে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছুটা ভাবের আদান-প্রদান ঘটিলেও কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। যে রাত্রিতে সতীর সমস্যাদুর্বহ জীবনের অবসান ঘটিয়াছে সেই সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে সতীর একটা স্থায়ী মিলনের ভূমিকা প্রস্তুত হইয়া এই মৃত্যুকে আরও করুণ করিয়াছে। স্বামীর সহিত বোঝাপড়াতেও সতীর অব্যবস্থিতচিত্ততা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র সত্তার উপর যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার বোঝা চাপিয়াছে, যে নিদারুণ কর্তব্যসঙ্কট তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে তাহার শ্বাসরোধী পেষণেই তাহার ইচ্ছাশক্তি কতকটা অসহায়ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। সতীর দোলকবৃত্তি তাহার প্রাণশক্তির ক্ষীণতার জন্য নয়, যুগপরিবেশ ও পরিবার-পরিস্থিতি তাহার জন্য যে কণ্টক-শয্যা বিছাইয়াছে তাহার দুঃসহ তীক্ষ্ণতার জন্য। দীপঙ্কর, সনাতনবাবু, মা-মণি, লক্ষ্মীর অস্বীকৃত, কিন্তু নীরবক্রিয়াশীল দৃষ্টান্ত, ঘোষাল ও প্যালেশ কোর্টের বিকৃত জীবনযাত্রা ও গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর নিয়তি-চিহ্নিত, অশুভ, নিগূঢ়চারী প্রভাব—সকলের সম্মিলিত শক্তি সতীর স্বভাব-পবিত্র, আনন্দ ও উৎসাহদীপ্ত, প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিসত্তাকে এক অমোঘ ট্রাজেডির করুণ পরিণতির দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-দীপের নির্বাপণেই যুগের প্রলয়-ঝটিকার দুর্বার শক্তির যথার্থ পরিমাপ।

বিন্তী ও ক্ষীরোদা এই দুই কিশোরী হয়ত কোন যুগসংস্কৃতিপ্রভাবিত নয়, ব্যক্তিস্বভাবে বিশিষ্ট ও প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে প্রকাশকুণ্ঠ ও আত্মবিলোপপ্রবণ। কিন্তু তাহারা যে তাৎকালিক যুগপ্রতিবেশে অত্যন্ত বিহ্বল ও সমাজধারাবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের যুগে তাহাদের চাপা, আপনার মধ্যে গুমরাইয়া-মরা প্রকৃতিই তাহাদের উপর যুগের পরোক্ষ প্রভাব। এমন কি ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদেও বাঁচিয়া থাকিলে বিন্তী যে দুঃসহ শূন্যতাবোধপীড়িত হইয়া আত্মহত্যা করিত না তাহা অনুমান করা যায়। অঘোর দাদু তাহার চারিদিকে যে নিঃস্নেহ নিঃসঙ্গতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই দীপঙ্কর ও তাহার মাতার সহিত বিচ্ছেদকে তাহার পক্ষে এত মারাত্মক করিয়াছে। কড়ির ধাতব ঝঙ্কার তাহার কানে মৃত্যুর আহ্বানরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। ক্ষীরোদা তাহার মন্দ ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কেননা দীপঙ্করের আশ্রয় তাহার স্বেচ্ছাবৃত, তাহার আবাল্য জীবন-প্রতিবেশ নয়। আশাভঙ্গের গুরুতর আঘাত সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু উহাতে উহার মূলীভূত জীবনসংস্কার একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ সে আধুনিক কালের যান্ত্রিক, নির্মম—প্রয়োজননিয়ন্ত্রিত, সুকুমার বৃত্তির সহিত শিথিলসংলগ্ন জীবনপ্রত্যাশায় অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই জীবনের মুষ্টিভিক্ষাতেই সে সন্তুষ্ট, উহার বদান্যতার আশা সে করে নাই।

এই উদ্‌ভ্রান্ত পরিবেশের প্রাণপুরুষ হইতেছে দীপঙ্কর সেন। এই বিষদিগ্ধ বাতাবরণের নিগূঢ়তম যন্ত্রণা তাহার অস্থিমজ্জাতে সংক্রামিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতেই সে এক অদ্ভুত

অমৃতরস আহরণ করিয়াছে। সে একাধারে প্রতীকী ও ব্যক্তিপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র। সে যেন এক অসাধারণ চুম্বকশক্তিবলে এই অস্বাভাবিক, বিপরীত-উপাদান-গঠিত যুগপরিস্থিতির সমস্ত ভাল ও মন্দ ভাবকণিকাগুলিকে নিজ আত্মার গভীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই জীবনজিজ্ঞাসা তাহার মধ্যে এক অনিবার্য প্রেরণারূপে সর্বগ্রাসী শক্তিতে বিকশিত হইয়াছে। অঘোর দাদুর বিকৃত জীবননীতি, কালীঘাটের শুচি ও অশুচি, ভক্তি-ভোগমিশ্র পরিবেশ, সহপাঠীদের উৎপীড়ন ও সমপ্রাণতা, বিশেষ করিয়া কিরণের কৈশোর কল্পনার উদার অবাস্তবতা তাহার শিশু মনকে এক অবোধ, অস্পষ্ট বিস্ময়ে বিভোর করিয়াছে। ইহার মধ্যে শিক্ষক প্রাণমথবাবুর আদর্শবাদ ও কিরণের দুঃখজয়ী দেশসেবার মহিমা তাহার মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই স্তরে তাহার মাতার প্রভাবই তাহার উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

এই সময়ে তাহার জীবনে লক্ষ্মীদি ও সতীর আবির্ভাব তাহার মানস দিগন্তকে প্রসারিত করিয়া তাহার কৈশোর অনুভূতিগুলিকে গাঢ়তর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। লক্ষ্মীর ও সতীর জীবনের সহিত সে তাহার জীবনকে এরূপ একাত্মভাবে মিশাইয়াছে যে, উহাদের সুখ-দুঃখ, উহাদের জীবনসমস্যা যেন তাহার সম্প্রসারিত সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হইয়াছে। লক্ষ্মীর সহিত তাহার সম্পর্ক বাহিরের হিতৈষণাতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সতীর রক্তস্রাবী সমস্যাচক্রের প্রত্যেকটি পাক দীপঙ্করের মনেও প্রায় রক্তের অক্ষরেই কাটিয়া বসিয়াছে। সতীর অবস্থাসঙ্কটের একটা সুমীমাংসার জন্য তাহার জীবনে চির-অশান্তিকে সে বরণ করিয়াছে। এমন কি সনাতনবাবু, স্নেহলেশহীনা, স্বার্থসর্বস্বা মা-মণির জন্যও তাহার সমবেদনার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাদেরও ছটফটানির সে অংশীদার। চাকরিতে তাহার অভাবনীয় পদমর্যাদাবৃদ্ধি সত্ত্বেও, ঘুষ দিয়া জোগাড়-করা চাকরির জন্য তাহার গভীর আত্মধিক্কার তাহাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় নাই। অল্পবেতনের কেরাণী গাঙ্গুলিবাবুর পারিবারিক জীবনের সুগভীর লাঞ্ছনা সে নিজের জীবন দিয়া অনুভব করিয়াছে। যুগজীবনের যে গ্লানি ও তিক্ততা প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত জমিয়া উঠিতেছে, তাহার সবটুকু যোগ-ফল যেন দীপঙ্করের জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের ন্যায় যুগযন্ত্রণার সবটুকু বিষ সে পান করিয়াছে। কেবল দুইটি প্রাণী তাহার সার্বিক গ্রহণশীলতা, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত-চর্যার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—ক্ষীরোদা ও মিঃ ঘোষাল। ইহাদের অন্তরলোকে প্রবেশের সে কোন চেষ্টাই করে নাই। হয়ত ক্ষীরোদার ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল, সতীর প্রতি নিঃশেষ-সমর্পিত প্রাণ অপরকে দান করিবার কোন অধিকারই তাহার ছিল না। যে রেলদুর্ঘটনায় সতী প্রাণ দিয়াছে, সে দুর্ঘটনা দীপঙ্করকেও অক্ষত রাখে নাই—নিয়তির একই অমোঘ বন্ধন উভয়ের জীবনকে একই পরিণতিসূত্রে জড়াইয়াছে। সতীর মৃত্যুর পর দীপঙ্কর যেন ব্যক্তিসত্তা হারাইয়া একটি ভাবাদর্শের অমূর্ত রূপব্যঞ্জনায় পরিণত হইয়াছে। যে যুগ আদর্শকে হারাইয়াছে, ধন ও প্রতিষ্ঠার মোহে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহারই বধির কর্ণে সে বিস্মৃত আদর্শের বাণী শোনাইয়াছে, সব দিক দিয়া ফতুর বর্তমানকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইয়াছে। সে নিজ ক্ষুদ্র জীবনসীমা ছাড়াইয়া বিরাট ভূমিকম্পে উন্মথিত বিশ্বের বিকারের মর্মমূলে প্রতীকী মহিমায় আসীন হইয়াছে। যাহার ব্যক্তিজীবনের প্রচেষ্টা

কলিকাতার সংকীর্ণ সীমায় ও কয়েকটি নর-নারীর সহিত সংযোগরেখায় আবদ্ধ, তাহার বৃহত্তর চেতনা-তাৎপর্য সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কালের বাংলা ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে দুইজন, উপন্যাসের ঘটনাপরিধির মধ্যে নিখিলব্যাপ্ত, কল্পান্তপ্রসারী জীবনবোধের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্জীবন ও অধ্যাত্মলোকের অতল রহস্যময়তা ও অসীমাভিমুখিতা ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়, বিমল মিত্র সমগ্রবিশ্বব্যাপী বহির্ঘটনাপ্রবাহের সার্বভৌম তাৎপর্যটি বর্তমান উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র জগৎ শুধু কবির ভাষায় নয়, বাস্তব ভাবসংঘাত ও জীবননিয়ামক শক্তিরূপে, জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে এক বিপুল, অভাবনীয় আলোড়ন তুলিয়াছে। যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবী শত্রুধ্বংসের জন্য যে বিরাট মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে তাহারই নৈতিক বিস্ফোরণ সে শত্রুমিত্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নির্মম দানবীয় শক্তি বাঙালীর শান্ত, স্বল্পে তুষ্ট, নীতিসংযত জীবনযাত্রার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেখানে তুমুল বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরের উপর সমস্ত যুধ্যমান জগৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সুদূর রণ-ক্ষেত্রের গোলাগুলিবারুদ আমাদের আকাশ-বাতাসে উগ্র গন্ধ ও দাহ ছড়াইয়াছে। প্রতিদিনকার প্রয়োজনের সামগ্রীতে, নিকট প্রতিবেশী ও পরিবারগোষ্ঠীর সহিত আচরণে, যুগযুগান্তরের নীতিসংস্কার ও কর্তব্যবোধে, বিশ্বের উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভ সমস্ত স্থির সিদ্ধান্তকে অস্থির ছন্দে আবর্তিত করিয়াছে। বিশ্ব খুব স্বাভাবিক এমন কি অনিবার্যভাবেই শুধু আমাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে নাই আমাদের নিগূঢ়তম অন্তর্জীবনেও কাঁপন ধরাইয়াছে। উপন্যাসটিতে এই পরিধিবিস্তারের সার্থক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য বিশ্বের আততায়ী দস্যুরূপই এখানে প্রকটিত। শুধু আলঙ্কারিক অর্থে নয়, শুধু ক্ষুদ্রের মধ্যে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অতিকায়তা প্রবর্তনের নেশায় নয়, মৌলিক প্রয়োজনের দুরন্ত তাগিদেই আমরা বিপরীত অর্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দীপঙ্করের অন্তরতম চেতনার মধ্যে এই বিশ্বানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার এই সাঙ্কেতিক মহিমাই উপন্যাসের বস্তু-বেষ্টনীতে এক অপূর্ব আত্মিক তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। বাঙলার আধুনিকতম মানস রূপান্তরের স্মরণীয় চিত্ররূপেই উপন্যাসটির কালোত্তীর্ণ মূল্য।

বাঙালীর অন্তর্জীর্ণতার আর একটি নিম্নতর স্তর আসিয়াছে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তপ্লাবনের অনিবার্য ফলরূপে। লেখক এই চরম অধোগতির মূল্যায়ন এখনও করেন নাই। হয়ত ভবিষ্যৎকালের কোন উপন্যাসে ইহা বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইবে। কিন্তু তখন লেখক দীপঙ্করের মত সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল, উদারচরিত, বসুধৈবকুটুম্বক নায়কচরিত্র উপহার দিতে পারিবেন কি? আপাততঃ দীপঙ্করই আমাদের উপন্যাসের আকাশে সমস্ত পাংশুল ধূম্র-কলঙ্কের মধ্যে ধ্রুবতারার মত ভাস্বর হইয়া রহিল।

বাংলা উপন্যাসের ধারা ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের শাখাপথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ ইহার অন্তঃপ্রেরণা কেবল ইহার নিজের দেশের প্রত্যক্ষ সমাজবিবর্তনের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যেখানে নূতন জীবনপরীক্ষা চলিতেছে, যেখানে

বিজ্ঞান ও দর্শন নূতন জীবনভাষ্যরচনার চেষ্টা করিতেছে, যেখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারই সম্মিলিত প্রভাব এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। অধুনা নূতন সৃষ্টিসম্ভাবনা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা আজ আর কোথাও সমাপ্তিরেখা টানিবার ভরসা পাইতেছেন না। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ড দিনে দিনে রূপ বদলাইতেছে—সুবলয়িত সুষমার পরিবর্তে এখন জীবন অসমশীর্ষ অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত রেখাবন্ধনী অস্বীকার করিয়া ছোট-বড় নানা আকারের জিহ্বায় উহার প্রতিবেশকে লেহন করিতেছে। এখন প্রতিবেশ আত্মার আরামের বাসগৃহ নহে, শ্বাসরোধী কারাগার; উহা মানুষের শক্তির উৎস নহে, শোষণের যন্ত্র। মানুষের অন্তরলোকের জটিল, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিসমূহের একক মূল কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা উহার সমগ্র মানচিত্রকে বদলাইয়া দিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য আজ এই রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অন্তরে ও বাহিরে সংশয়াবিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—এই সংশয়-ভীরু মনোভাব লইয়াই উপন্যাসের ইতিহাস-রচয়িতা এই দীর্ঘ পরিক্রমার ছেদরেখা টানিয়া দিলেন।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৭৯
'দুই ঢেউ এক নদী'	৪৫৯, ৪৬১
'দুই তারা'	৭৯৩
'দুই পুরুষ'	৫৩৭
'দুই বোন'	১৮৪—১৮৭, ৫১৭
'দুখানি চিঠি'	৪৫২
'দুঃখের দেওয়ালী'	৪১১—৪১৩
'দুর্গম পন্থা'	৭৯৪
'দুর্গেশনন্দিনী'	৩১, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৬৫, ৬৬—৭১, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮৪, ১০৪, ৭৩৩
'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি'	৪১২
'দুধারা'	৪৯১, ৪৯৩—৪৯৪
'দুরাশা'	১৯৯
'দুঃসহধর্মিণী'	৬৫৩
'দুর্জন্য'	৪৭৯
'দূরভাষিণী'	৭৩৭, ৭৩৯—৭৪১
'দৃষ্টিদান'	১৯৯, ২১০
'দৃষ্টিপ্রদীপ'	৬১১—৬২৩
'দেওয়াল'	৭৫৯—৭৬১
'দেনাপাওনা' (রবীন্দ্রনাথ)	২০৩
'দেনা-পাওনা' (শরৎচন্দ্র)	২৪৫—২৪৭
'দেবদাস'	২২৩, ২৩২—৩৩
দেবেশ দাস	৭৩৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯
'দেবী চৌধুরাণী'	৪৩, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯১—৯৫, ৭৪৮
'দেবী মাহাত্ম্য'	৪১১
'দেহমন'	৭৩৭, ৭৩৮—৭৩৯
'দোটানা'	৪৩৭—৪৩৮
'দ্বীপপুঞ্জ'	৭৩৭
'দ্বৈরথ'	৬৮৮, ৬৮৯
'ধনজনযৌবন'	৫৩১
'ধর্মপাল'	৭২৫, ৭২৭
'ধাত্রীদেবতা'	৫৪৯—৫৫২
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৮৮, ৪৯৫—৪৯৯
'ধুস্তরী মায়া'	৪০১—৪০৩
'ধূলিধূসর'	৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৬৪৬
'ধূসর গোধূলি'	৪৫৭
'নখদর্পণ'	৬৬৬

বিষয়	পত্রাঙ্ক
'ন তস্থৌ'	৬৪৭
'নটী'	৩৫৯, ৬৭১
'ননীচোরা'	৪১৯
'নতুন শালিক'	৬৫২
'নবজন্ম'	৩৩৯
'নব দিগন্ত'	৬৯১, ৬৯২—৯৩
'নবগ্রহ'	৪৪৪
'নববাবু-বিলাস'	২২, ২৩—২৫
'নববিধান'	২৩৫—২৩৬
'নব-বৃন্দাবন'	৬০১
'নবীন সন্ন্যাসী'	২১৪—২১৫
'নমস্কারী'	৪১৩
'নরবাঁধ'	৬৩৪—৬৩৫
'নয়ান বৌ'	৪২৬, ৪২৭—৩১
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৭৩৭
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৪৩৪—৪৩৭
'নষ্টনীড়'	২০৮, ২৫৬, ৪৪৯
'নাগরী'	৫৪৪
'নাগিনী কন্যার কাহিনী'	৫৭৮—৫৮১
'নাথ-সাহিত্য'	১৬, ১৭
'নামঞ্জুর'	২০৯, ৪১৩
নারদ	৪০২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬২০—৬৩৪
নারায়ণ সান্ন্যাল	৭১১
'নারীমেধ'	৬৬৯
'নাস্তিক'	৬০১
'নিতাই লাহিড়ী'	৪১৫
'নির্জন পৃথিবী'	৩৩৯, ৩৪৪—৩৪৫
'নির্জন স্বাক্ষর'	৪৫৯
'নির্মোক'	৬৮৮—৬৮৯
'নিরুদ্দেশ যাত্রা'	১২৪
নিরুপমা দেবী	২৮৯, ২৯১—২৯৮, ৩২০
'নিশাচর'	৪৭৮
'নিশিকুটুম্ব'	৬৪০
'নিশীথে'	২০৫, ২০৬, ৩৯২
'নিষিদ্ধ ফল'	২১৯
'নিষ্কণ্টক'	৪৩৫
'নিষ্কৃতি'	২২৩, ২২৬—২২৭
'নীরব কবি'	৫৭১
'নীল আগুন'	৫৪৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক